ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেণভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

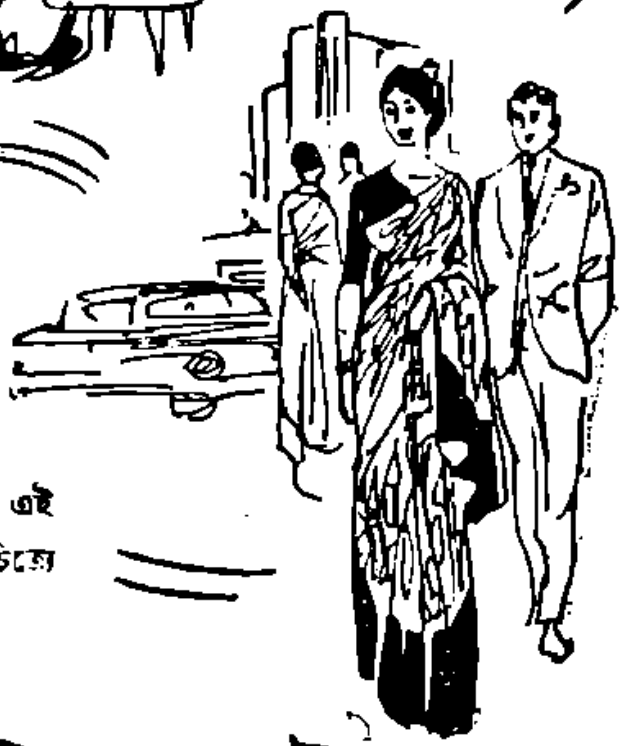

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

চাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

গণতন্ত্রী আষাঢ় ১৩৭২

NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres Limited

NR, G/40

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয় তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য কাণ্ডিত পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডমল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যান্সিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ফাউন্টেন পেনের কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এক ০.., ০.., ১২.., ০৫.. ও ৭.. এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

গল্প-ভারতী

আষাঢ়—১৩৭২

সম্পাদক :

শ্রীকালিদাস নাগ

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

BHRING-1/67-63

★ মাছ, মাংস, শাকসব্জি, টাকা পয়সা ইত্যাদি সব রকম খাবার রাখবার প্রশস্ত জায়গা।

★ আপনার ঘরে ১৫৪ লিটার ফ্রেশ-টাপের ৬৫ রকমের আরামে—দুবিধে যাদে এমন সেরা জিনিস যে কোন আধুনিক পরিবারের পক্ষেই উপযুক্ত।

★ দেখাশোনার জন্যে ভাবনা নেই— জি ই সি যে কোন অনুমোদিত ঠিকানাই তার ভার নেবে।

১৯৫৫ টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত সরঞ্জামের মধ্যে আছে
ফ্রেশ-টপ, তালাচাবি ও ক্যাস্টার।
পাঁচ বছর ইউনিটের গ্যারান্টি ও ছয় মাস।
অনুমোদিত জি ই সি ডীলারদের কাছে পাওয়া যায়।

জি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

Kalpana DEC 55.8

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী-গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেম সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

বাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম পাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেতুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, গোডনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন্, বানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; অমৃতের স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এস, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; জগদম্বা ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ ফুলচন্দ; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; লক্ষ্মী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল জাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম কেজ্রী; অমরুক অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চাঁদনীবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২১৮৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex-Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘি বিশেষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিনের এসেন্সটুকু থাকায় চুলের গোড়া মজবুত রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

এই সংখ্যায়

কথা প্রসঙ্গে— ১

উদাত্ত আহ্বান— ৩

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ৫

মেয়ে মজলিশ—

মুখটি হবে মুখপত্র—আভা পাকড়াশী ৬

সৌন্দর্যের আবার বয়স কি ?—পাকুল মিত্র ৭

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ক

চিত্রবিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ চ

দুই অধ্যায়—সুবোধ বসু ঞ

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য
প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়।
সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের
ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায়
রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর
হিমসার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ
পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

HPBA/1—15

হিমসার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

// এই সংখ্যায় //

পুরাতন পাতা—

বাল্যস্মৃতি—সরলা দেবী চৌধুরাণী ১৪

সাফল্য—সুশীল সিংহ ২১

একটি ভালবাসার গল্প—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩১

বিশ্বসাহিত্য—

যে জানালা বন্ধই থাকতো—অ্যাম্বোস বিয়ার্স

অনুবাদ—গৌরীশংকর দে ৩৪

প্রতিবেশী সাহিত্য—

সুরভী—শ্রীগুলাবদাস ব্রোকার : অনুবাদ—দিব্যেন্দুকিশোর গুহ ৩৭

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

মানুষকে যখন বিচারের জন্যে তুলে ধরা হয়...

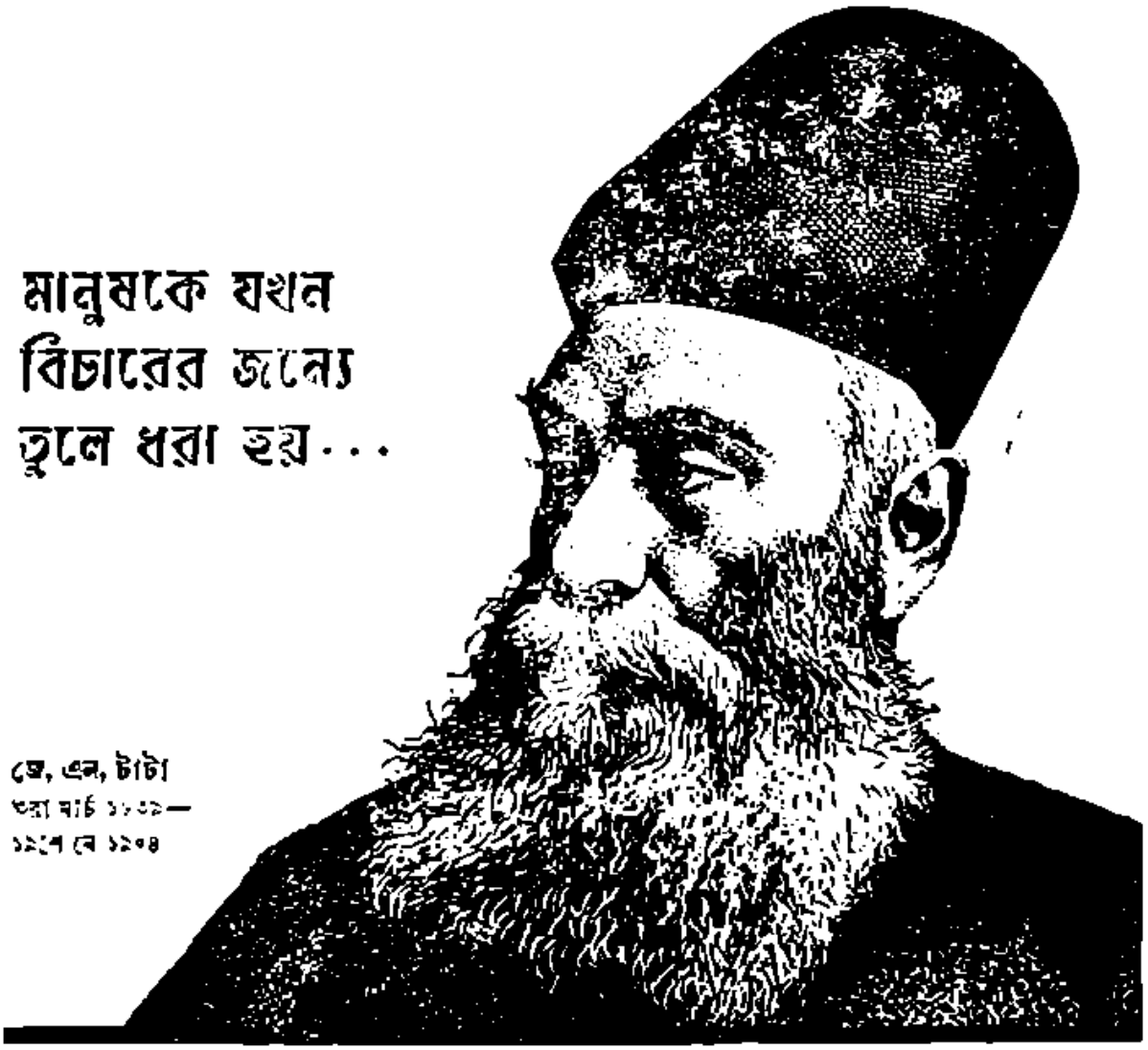

জে, এন, টাটা
৩রা মার্চ ১৮৩৯—
১৯শে মে ১৯০৪

যখন দেশের ও দশের সামনে একজন মানুষকে বিচারের জন্যে তুলে ধরা হয় তখন তাঁর টাকাপয়সা বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দেখে বিচার করা হয় না, বিচার করা হয় তিনি যে সব কাজ করেছেন তা সমাজের কতখানি কল্যাণ করেছে। জামশেদজী টাটার নাম আজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে তার কারণ তিনি কেবল শিল্প-প্রতিষ্ঠান খাড়া করেন নি, বাণিজ্যশিল্প গড়ে তোলেন নি, কলকারখানা চালু করেন নি, জামশেদজী টাটা কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতে সব কিছুই গড়ে ওঠা সম্ভব, প্রমাণ করেছেন মানুষের মননশক্তি অসীম এবং তার জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার স্পৃহা অফুরন্ত।

দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

JWTTN 240

এই সংখ্যায়

সাহিত্য সংবাদ— ৫৬

সম্রাটের নির্বাসন (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)—বরুচি ৫৯

এই প্রথম—

রোগ—সুব্রত রায় ৫৭

গুপ্তচর কাহিনী—

জলার ধারের সেই বাড়িটা—সুপর্ণ রায় ৬১

দেশবন্ধু—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৬৯

শুভবিবাহ (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৫

কোম্পানী আমলের কাহিনী—অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৮১

চলতি দুনিয়া— ৮৬

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৮৯

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-১৪৫১

শাখা

২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

৫,৬ হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯৯

১৪,হেয়ার ষ্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের

উজ্জ্বল কান্তি

যেমন মলাটের সংগে গ্রন্থের, পাতার সংগে বৃক্ষের—

তেমনি ত্বকের সংগে সৌষ্ঠবের অংগাংগী সম্পর্ক।

বোরোলীন ক্রীম

নিত্য ব্যবহারে আপনার অন্তর্লীন লাবণ্য

চোখে মুখে সর্বাংগে উদ্ভাসিত হবে।

বোরোলীন হাউস্ কলিকাতা-৪

এই সংখ্যায়

পাঠক-পাঠিকার কলম— ৯১

স্মৃতি দোলায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৯৮

বিচিত্রা— ১০৭

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সঙ্গম (সংযোজন)

বঙ্কিমের উপন্যাসে নদ নদী—নীলাদ্রি সেন ১০৮

পরকীয়া প্রেম চন্দ্রে-সূর্যে—ডঃ উমা রায় ১১১

সকাল ও সন্ধ্যায় চায়ের আসরে ঃ

ডালমা

গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, সল্ট,
রোজ ক্রীম, অরেঞ্জ ক্রীম,
পাইন-আপেল ক্রীম,
পাফ্ ক্রীম,

বিস্কুট

পরম উপাদেয়

পাতিয়ালা বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিঃ রাজপুরা-পাঞ্জাব

কলিকাতা অফিস ঃ ১০ লেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-১৩৭৩

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৩ এ, ডব্লু, সি, বনার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৩৪২

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিন্ত ও দ্রুত আরামের জন্য এনসিড। এনসিড ৭টি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অবসাদ কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এনসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকায় কামড়ে এ্যান্টল লাগান – সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং গুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকায় কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

2টের কাছে রাখুন

■ এনসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

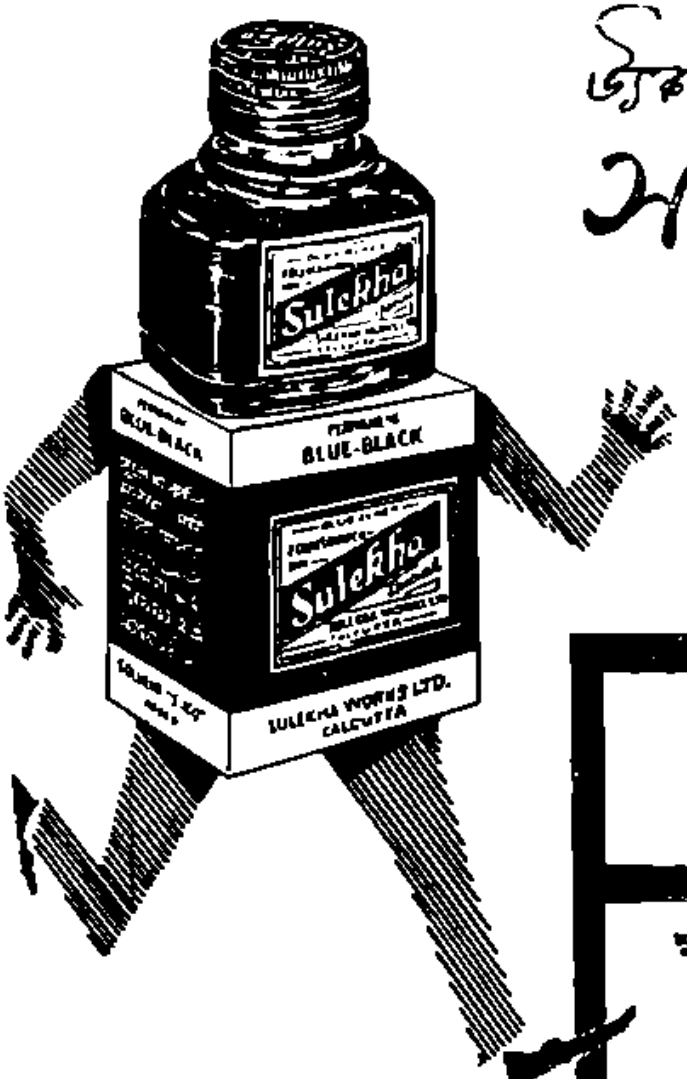

ঐতিহ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুয়্যরিক' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০এম.এস. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি, এস,(আমেরিকা), ডাকলপুর কলেজের ইলাজ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ঃ ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

উষা সারাজীবন এই দিনটির কথা ওর মনে উজ্জ্বল ক'রে রাখবে

আজ ওর নতুন জীবনের সুরু—ওর সব স্বপ্ন এবার সত্যি হ'য়ে উঠবে,
দিনের খুটিনাটি কাজগুলোতেও মধুর আনন্দের ছোঁয়া
লাগবে—আজ ওকে এমন কিছু
উপহার দিন যা পেয়ে ও সত্যিই খুশী হবে,
যা সারাজীবন ওর কাজে লাগবে।
আজকের এই শুভমুহূর্তের
জন্য উষা সেলাই কলের চেয়ে
ভালো আর কোন উপহার
হ'তে পারে না।

উষা

সেলাই কল
...ওর যোগ্য উপহার

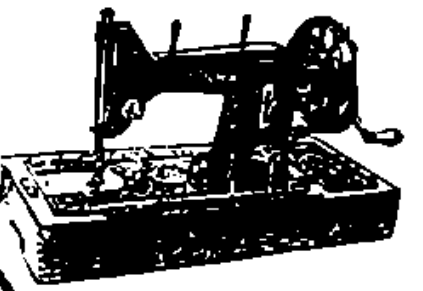

একটি JAY সামগ্রী

JSEN/O/1B

অয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওআর্কস লিমিটেড, কলিকাতা

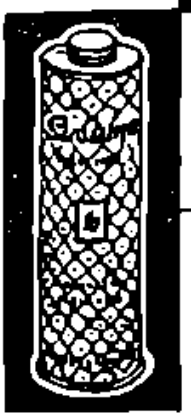

সুষমা

প্রসাধন সামগ্রী

সুষমা ফাউণ্ডেসন ক্রীম
সুষমা স্নো (শকুন্তলা)
সুষমা টয়লেট পাউডার
সুষমা ট্যালকম পাউডার

লি লি কেমিক্যাল ওয়ার্কস - কলিকাতা-৪

- মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৪½%
- সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বার্ষিক সুদ ৪%
- রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গ'ড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবায় প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র

যুগান্তর

স্বাধীন • নিরপেক্ষ • নির্ভীক

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের স্বচ্ছদর্পণ

আকর্ষণীয় বাংলা সাপ্তাহিক

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, খেলাধূলা, ছায়াছবি প্রভৃতি রচনায় সমৃদ্ধ।

প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকগোষ্ঠিকে প্রকৃত আনন্দ দান করে।

সৈয়দ মুস্ততবা আলীর

টুনিমেম (নূতন মুদ্রণ) ৭৷৷০

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬৲

জরাসন্ধের

ছবি ৪৲

ছায়াভীর ৫৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মগ্নটৈনাক ৪৷৷০

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪৲

সুনথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭৷৷০

সোহাগ রাত ৪৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ঢল ঢল কাঁচা ৬৷৷০

বিমল করের

জীবনায়ন ৫৲

তারাশংকরের

গন্নাবেগম ৮৲

মহাত্মা গান্ধীর

আমার ধর্ম ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর

চিত্র ও চরিত্র ৬৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম

স্বর্গাদপী গরীয়সী

১ম—৫৲, ২য়—৪৷৷০, ৩য়—৬৲

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !!

সমস্যা নয় সমাধান !!!

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে।

এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।

মূল্য : ৪·৭৫ নয়া পয়সা

প্রকাশক :

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :

৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫—৬৮২৭

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

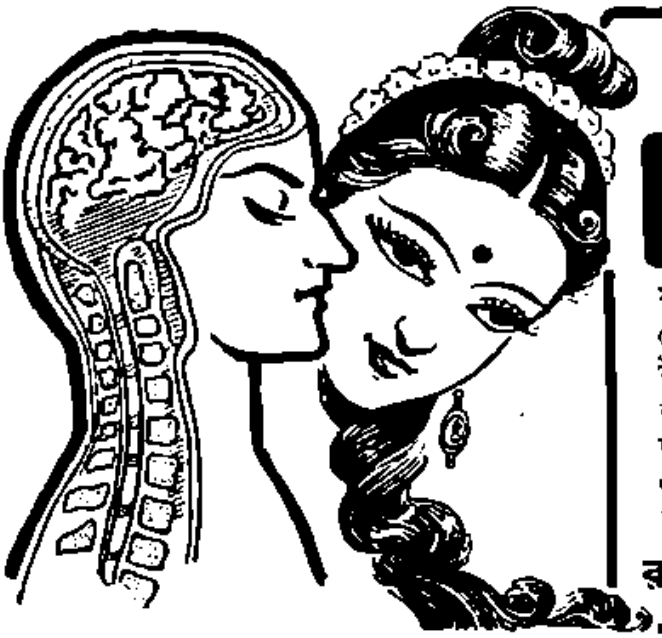

আয়ুর্বেদীয় ভৃঙ্গরাজ তৈলের সঙ্গে
কয়েকটি মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে প্রস্তুত
অভিনব কেশ তৈল

মহাভৃঙ্গম

মানসিক পরিশ্রমে বা কঠিন রোগে মস্তিষ্কের স্নেহপদার্থ ক্রমশঃ নির্জীব ও নিঃশেষ হয়ে ওঠে ; কিন্তু **মহাভৃঙ্গম** তৈল নিয়মিত ব্যবহারে করিলে স্নেহপদার্থগুলি সজীব ও সক্রিয় থাকে। ফলে কেশের শ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং মাথাও বেশ ঠাণ্ডা থাকে। **মহাভৃঙ্গমের** মধুর গন্ধ সারাদিন মন প্রফুল্ল রাখে।

রাঙ্গাডাবা কেমিক্যাল · কলিকাতা-৪০

ছোটদের হাতে তুলে দেবার মত ৩টি বই

বাদল সরকার রচিত ও চিত্রিত

ছবির খেলা ১

বইটিকে বুদ্ধির খেলাও বলা যায়। ছোটদের জ্ঞান বৃদ্ধির এমন সরস সহায়ক বই ইংরেজিতে অনেক থাকলেও বাঙলায় আর নেই। পাতায় পাতায় ছবি ও ছড়া দিয়ে বাঁধা। [২·০০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত ও শ্রীসূর্য্য রায় চিত্রিত

ছুটির দিনে মেঘের গল্প

রূপকথার আড়ালে মেঘ-বৃষ্টি-জল রূপান্তরের বিজ্ঞানকথা—অপূর্ব ছন্দ ও ছবি।
ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কারে ভূষিত। [১·৫০]

শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে

শিশুমন—গাছ—পাখি আকাশ—অন্ধকার—বেদনা—অনুভূতির সমন্বয়ে শশিবাবুর হাতের মিষ্টি ছন্দে একটি সুন্দর বই। পাতায় পাতায় চার রঙের মনভুলানো ছবি। [২·৫০]

আরো অনেক বই আছে। তালিকার জন্যে লিখুন

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

রূপ রচনায়
অপরাজেয়
ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর
হিমকল্যাণ
কেশ তৈল
HIMKALYAN
HAIR OIL
হিমকল্যাণ
গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী
আষাঢ়, ১৩৭২

॥ কথা প্রসঙ্গে ॥

নববর্ষ :

গল্প-ভারতী একুশ বছরে পড়ল। এই সংখ্যা থেকেই নববর্ষের সুরু। আর্ষবাক্য স্মরণ করে আমরা প্রথমেই কামনা করি,—

'অরম্ভারম্ভ শুভায় ভবতু!'

বিশবছর আগে এমনি এক আষাঢ়ের অপরাহ্নে গল্প-ভারতীর আত্মপ্রকাশ। সেদিন নব-ভারতের স্রষ্টা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে আমরা যাত্রা সুরু করেছিলাম।

সুদীর্ঘ বিশবছর বহু বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রশোভন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে; সুখের বিষয় গল্প-ভারতী তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি।

আজ শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও গল্প-ভারতীর সুনাম, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে,—কিন্তু এই স্বাধীনতা স্বাধীন পথচলার ক্ষেত্রে আজ কতটুকু প্রগত? তার সাহিত্যেই বা তার নবজীবনলাভের স্পন্দন কই? তার সংবাদপত্রেই বা তার জীবনের নবদিগন্তের নির্দেশ কই? গল্প-ভারতী সেই দিগন্তেরই অনুসন্ধানকারী নাবিক। শুধু ভেসে চলায় তার গন্তব্যলিপি প্রবাহ নয়।

আমাদের নববর্ষের সূচনায় সেই যাত্রাপথের 'শুভায়' মন্ত্রকেই আমরা স্মরণ করি। যে শুভ এবং কল্যাণবুদ্ধি একটি স্বাধীনজাতিকে মর্যাদার সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে,—তাই হোক্ আমাদের সম্বল। যে-সাহিত্য উদ্বোধনের নব নব সূজনীতে গড়ে তোলার সার্থকতায় কালোত্তীর্ণ হয়ে রসপ্রবাহে জাতির মানসিকতাকে সজীব করে রাখতে পারে—সেই সাহিত্যের সন্ধানে এবং পরিবেশনায় গল্প-ভারতীর নববর্ষের জীবনযাত্রা সুরু হোক—এই কামনা করে আমরা আবার যাত্রা সুরু করলাম।

এই সঙ্গে আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতৈষীবর্গকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

সন্দেশ:

দেশে দুধের অভাব। অতএব সন্দেশ বন্ধ কর। সরকারি মগজে একটা অভাবকে দূর করতে আর একটা অভাবের সৃষ্টি করার যুক্তি ঐংং পরিকল্পনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই দেখি হামেশাই। আর দেশে শুধু অভাব আর অভাব।

চালের অভাব। খাও গম। তাতেও অভাব,—খাও অন্য কিছু। সরষের তেলের অভাব। খাও বাদাম তেল, তিল তেল,—তারও অভাব। তাজা খাওয়া বন্ধ কর। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিকল্প তেল বার কর। সে তেল কি আজ পর্যন্ত বার হল?

দিনে দিনে আশ্চর্য কথা শুনতে হচ্ছে। কেন অভাব? তার প্রতিকার কীভাবে করা যেতে পারে?—এ সবের কোন যুক্তিপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা কিংবা অভাব হতে না দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের মগজে আসে না। আসে শুধু চলতি শিল্পকে বন্ধ করার আজগুবি পরিকল্পনা। সোনা বন্ধ,—তার শিল্পীরা বিকল্প কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করল। কিন্তু আসল কথা শোনা গেল, সোনা গেল সহজ রাস্তা থেকে বাঁকাচোরা রাস্তায়। এখন দুধের পালা।

দীর্ঘদিন ধরে দুধের জন্য সরকারি পরিকল্পনায় কী কাজ করা হয়েছে?

বোম্বাই শহর থেকে ঘাটাল সরিয়ে নিয়ে আরেতে দুধের কলোনি করা হয়েছে। তাতে বোম্বাই শহরের পুরোপুরি চাহিদা না মেটায় আনিতে আর একটি দুধের কলোনি করা হয়েছে। বোম্বাই-এর পক্ষে যা সম্ভবপর হল আমাদের এখানে তা হল না কেন? কলকাতা থেকে সমস্ত ঘাটাল সরিয়ে নেওয়া গেল না। গোয়ালাদের স্বার্থই এখানে প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিতে দেখা গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিদেশ থেকে ভালো গরু এনে এদেশের গোধনকে সমৃদ্ধতর করে গড়ে তোলা গেল না। এক কল্যাণী থেকে দ্বিতীয় কল্যাণীও গড়া গেল না। এখন সকলকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ধরতে সরকার ব্যস্ত।

বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির জন্য বিদেশ থেকে আর গুঁড়ো দুধ আনা যাচ্ছে না। অথচ আমরা জানি বাংলার এই নিজস্ব মিষ্টান্ন শিল্প সন্দেশের বিনিময়েই বিদেশীমুদ্রা আহরণ করা যেতো আর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবও। কিন্তু সে-সব দিক ভেবে দেখার অবকাশ কোথায়?

একজন সরকারী মুখপাত্রই জানাচ্ছেন যে 'দুধ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে দিল্লীতে ক্ষীর তৈরী নিষিদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। এখানে ছানা-সন্দেশ তৈরী বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও গুঁড়ো দুধের সরবরাহ না পেলে আমাদের ভরাডুবি ঘটবে।' অতএব কী করে বলা যেতে পারে যে-সন্দেশ নিষিদ্ধ হলে শিশুরা দুধ পাবে?

আমাদের দেশে পাল-পার্বণে, পূজা-অর্চনায় সন্দেশ ফুল-বেলপাতার মতনই অপরিহার্য। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সেদিক থেকে কী চিন্তা করছেন? আরো কথা সন্দেশ-শিল্পী যারা শুধু সন্দেশেরই কারিগর তারাও সংখ্যায় নিতান্ত ক্ষীণ নয়,—তারা কী অবশেষে স্বর্ণশিল্পীদের দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে?

বর্তমান মূল্য-সঙ্কট এবং দুষ্প্রাপ্যতার দিনে আমাদের আহার্যের সম্বল হয়েছে যৎকিঞ্চিৎ আলু, ওলের ডাঁটা, খোড় এবং ঘন্টা জোর ঘুঘো ঢিংড়ি। মাছ নেই, মাংস ছোঁয়া ভার,—প্রোটিনের চিন্তাও সুদূর। এমন সময় সন্দেশের বিদায়ের পালা। তা হলে কী খেয়ে বাঁচবো আমরা?

বাংলাদেশের শুধু বিধবারা নয়,—সন্দেশের প্রোটিন সকলের পক্ষেই হিতকর। চিকিৎসকরা পর্যন্ত সন্দেশ খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, বিশেষ করে যারা মাছ মাংস খায় না।

সন্দেশ নির্বাসনের পূর্বে জাতীয় সরকারকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বেশ ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

উদাত্ত আহ্বান

"আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে ও মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল, তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে আমাদের পথ, আমাদের নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই—আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে, অসংকুচিতচিত্তে—চলব সমস্ত সুখ দুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে' চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে—'এসো, এসো, এসো'—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চির-জীবনের সিংহদ্বার — কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ—আনন্দম্, আনন্দম্—পরিপূর্ণমানন্দম্"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরীক্ষে

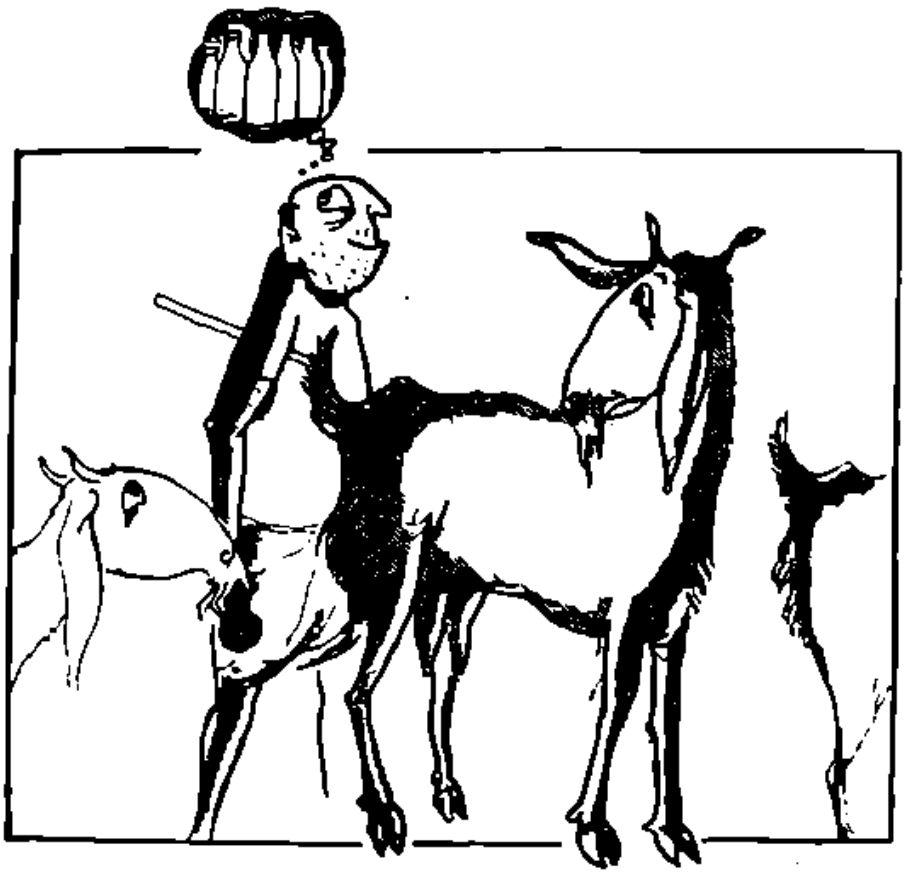

অত ভাবছেন কেন ?
এই যে আমি এসে
পড়েছি !

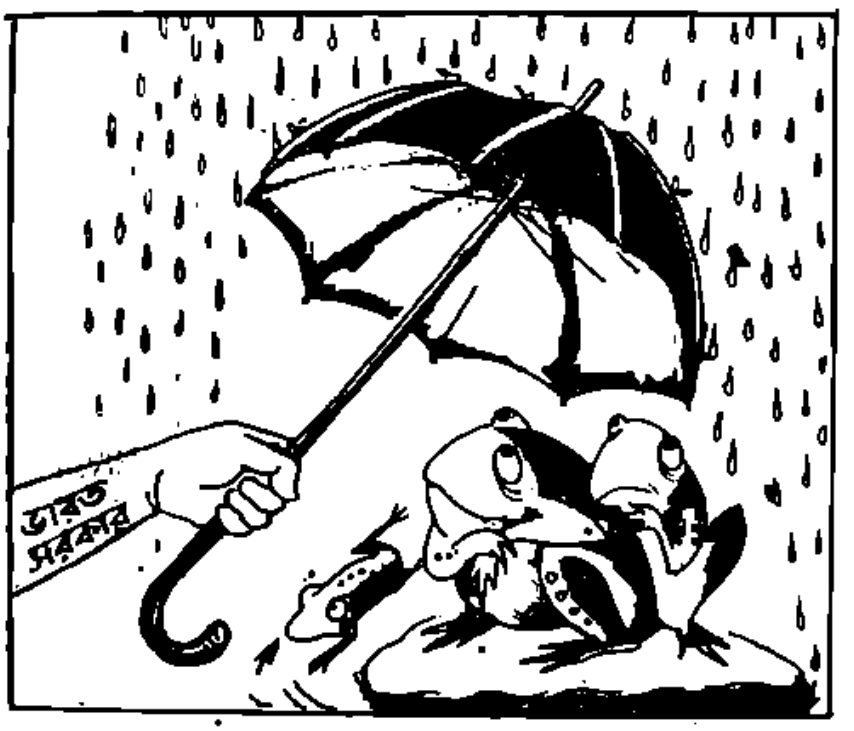

আরে, তোমরা বাঁচলে
তবেই তো আমরা !

অন্তরীক্ষে

ভাষা প্রসঙ্গে—নূতন অধ্যায়!

হিন্দী। আরো হিন্দী।

স্বরাজ্যের সৌজন্যে

মুখটি হবে মুখপদ্ম

আভা পাকড়াশী

লিপষ্টিক, রুজ, কাজল, সুর্মা, পাউডার, ক্রীম, নেইল-পলিস-এর ব্যবহার তো সকলেই জানেন আর করেও থাকেন। তবে হয়তো ঠিকমত ব্যবহার করেন না। অনেককে বেশী সাজ-গোজে মোটে মানায়না। বেশী চড়া রুজ লিপষ্টিক বা হেয়ারডু-এর ভারে তাঁর আসল সৌন্দর্যটি চাপা পড়ে যায়। এঁদের উচিত হালকা প্রসাধনে নিজের স্বাভাবিক লাবণ্যটুকু ফুটিয়ে তোলা। আবার কাউকে হয় তো বেশ বড় টিপে খলখলে গয়নায় সুন্দর মানায়। এই সবই নির্ভর করে মেয়ের গড়নের ওপর। লম্বা মেয়েরা যদি চওড়া পাড়ের শাড়ী বা বড় বড় ছাপের শাড়ী তার সঙ্গে কন্ট্রাষ্ট কালার-এর ব্লাউজ পরেন তবে মানাবে। বেশী লম্বা দেখাবেনা। এদের গলায় লম্বা ঝুলনো হার ভাল লাগবেনা, কিন্তু উঁচু গলায় কানে লম্বা কাঠ, খুব সুন্দর মানায়। আবার যাঁরা একটু বেঁটে তাঁরা একরঙা বা ভার্টিক্যালি লম্বা ডুরে বা ষ্ট্রাইপ দেওয়া শাড়ী পরুন। বেশ লম্বা দেখাবে। কিন্তু সবচেয়ে আগে মোটে দেখবে মুখখানি। তাকেই আগে সুন্দর করে সাজানো চাই, তাই নয় কি?

ভগবান সবাইকে কিছু নিখুঁত করে তৈরী করেন নি। যার যেটুকু খুঁত আছে সেটা নিয়ে খুঁত খুঁত না করে আসুন সেটিকে আমরা নিখুঁত করার চেষ্টা করি।

যাঁর চোখ দুটি সুন্দর কিন্তু ঠোঁটে বা দাঁতে দোষ আছে, তাঁর উচিত চোখ দুটি যাতে মুখের মধ্যে প্রমিনেন্ট দেখায় তার চেষ্টা করা। সাজ-গোজ সুরু করার আগে চোখে একবার হাল্কা টানে সুর্মা পরুন। এবার সবশেষে আর একবার চোখে সুর্মা টানুন। চোখের পাতা, ভুরু, আর চুলের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সুর্মা ব্যবহার করতে পারলে আরও ভাল ফল হয়। চোখের ওপরেও একটু সুর্মা দিন। এবার ভুরু দুটি তৈরী করুন। ভাল ব্যাক-গ্রাউণ্ড থাকলে যেমন ছবি ভাল ফোটে ঠিক তেমনি ভুরুই হল চোখের ব্যাক-গ্রাউণ্ড। আইব্রার্ড পেনসিল বা কাজল দিয়ে ভ্রু দুটি মানানসই করুন। চোখের চেয়ে ভুরু লম্বা হবে। বেঁটে হলে টেনে লম্বা করুন। বড় মুখে সরু ভুরু বিশ্রী দেখায়; একটু চওড়া করুন। আবার সরু মুখে চওড়া ভুরু থাকলে টিপে টিপে সরু করে সাজান। সব শেষে আলতো করে একটু ভেসলিনের ছোঁয়া দিন ভুরুর ওপরে আর চোখের পাতায়। ঠোঁটে খুব হাল্কা করে লিপষ্টিক দিন। দাঁত অসমান হলেও পরিষ্কার রাখবেন। এতেই দেখবেন আপনার মুখশ্রী কেমন ফুটে উঠেছে।

যাঁর চোখ দুটি ভাল না, ছোট বা গর্তে ঢোকা, তাঁর ঠিক এর উল্টোটি করা উচিত। চিবুক বা ঠোঁট দুটি বেশ সুন্দর করে গড়িয়ে তুলুন। চোখে খুব হাল্কা সুর্মার টান দিন। না দিলেও ক্ষতি নেই।

শুধু ভুরু দুটি একটু সাজিয়ে নিয়ে সমস্ত মনোযোগ দিন মুখের নীচের দিকে। একটু ঘোর রঙ বেছে নিন লিপষ্টিকে। লোকের দৃষ্টি আপনার চোখ বাঁচিয়ে ঠোঁটেই নেমে আসবে দেখবেন।

যাঁর কপালের গড়নটি সুন্দর তিনি সেখানেই মনোযোগ দিন। চুল দিয়ে কপালটি ঢাকবেন। বড় বা চওড়া কপালে বড় করে একটি ঘোর রঙ-এর টিপ পরুন। ঠোঁটের সঙ্গে কপালের রং-এর সমতা রাখতে হলে টিপের রঙ গভীর করুন। ছোট কপাল হলে চুল টেনে সরিয়ে দিন।

আপনার মুখের কোনটি যে সুন্দর তা বুঝতে পারছেন না মনে হচ্ছে। আয়না তা বলে দেবে। হাত আড় করে কপালটি ঢাকা দিয়ে আর অন্য হাতে ঠোঁট আর চিবুক ঢাকা দিয়ে আগে চোখ দুটি দেখুন। এবার কপালের হাত আগে সরান—তারপর আবার কপাল ঢাকা দিয়ে চিবুকের হাত সরান; দেখুন কোনটা বেশী ভাল লাগল। এইবার যেটি সুন্দর সেটিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুন।

নাক নিয়েও দুঃখ করবেন না। যাঁদের নাক ছোট তাঁরা দুরকম রং-এর পাউডার ব্যবহার করুন। সমস্ত মুখে আগে হাল্কা রং-এর পাউডারটি ব্যবহার করে পরে ঘোর রং-এর পাউডার দিয়ে কপাল, চিবুক, গাল রং করুন, নাক অমনি থাক। আবার যাঁর নাক বেশী উঁচু তিনি এক রকম পাউডার ব্যবহার করুন।

যাঁদের ঠোঁট মোটা তাঁরা সমস্ত ঠোঁটে বা ওপর ঠোঁটের সবটায় কখনো লিপষ্টিক দেবেন না। শুধু মাঝখানটুকুতে দেবেন। আবার মুখের আন্দাজে যেমনানি ছোট ঠোঁট লিপষ্টিক বুলিয়ে একটু বাড়িয়ে নিন। সাজেন তো সবাই; কিন্তু মানিয়ে সাজলেই তো সাজের সার্থকতা হবে। মুখটি হবে মুখপদ্ম!

সৌন্দর্যের আবার বয়েস কি?

পারুল মিত্র

আপনি সব সময়েই সুন্দরী থাকতে পারেন, সৌন্দর্যের কোনো বয়েস নেই। চল্লিশের পরেও আপনি টিকিয়ে রাখতে পারেন আপনার সৌন্দর্য। ইচ্ছে করলেই কমিয়ে ফেলতে পারেন আপনার বয়স। এখনকার দিনে যে কোনো মেয়ের পক্ষেই তা সম্ভব। দেহ-মনের নিয়মিত পরিচর্যাই সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার চাবিকাঠি।

মনের সুস্থতার উপরে নির্ভর করে দেহের স্বাস্থ্য। আবার যে নারী সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, তার শরীর থেকে ঠিকরে বেরোয় এক রকমের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। যারা ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ তাদের মুখ এমনিতেই বেশ তরুণ, সতেজ দেখায়। যে নারী নিজের প্রতি তিক্ত, ক্লান্ত, সব সময়েই মুখ শুমড়া ক'রে ব'সে থাকে, তাকে তার আসল বয়সের চাইতে অনেক বেশি বয়সের দেখায়।

যদি বয়সের তুলনায় আপনাকে বুড়ো দেখায় তবে মনে রাখবেন মনের স্বাস্থ্য আর যৌবন আপনি জেনে বা না জেনে নষ্ট করছেন। অনেক সময় জীবনে সামান্য পরিবর্তন এনে তা আপনি

অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারেন। যে বই পড়তে, যে খাবার খেতে, যে পোষাক পরতে আপনি অভ্যস্ত তার একটু অদল বদল করুন। দেখবেন আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসবে মনের সজীবতা।

নিজেকে সুন্দর ও সজীব রাখার আরেকটি উপায়—মানসিক ঝোঁক অনুযায়ী কোনো একটি খেয়াল নিয়ে মেতে থাকা। সেই খেয়াল-খুশীতে আপনাকে এমন ডুবে থাকতে হবে যা দেখে আপনার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অবাক হয়ে যাবেন। নিজের প্রতি অন্ত আরো পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তরুণ থাকার একটি উপায়।

যতক্ষণ পারেন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। তাহলে হতাশ বা মানসিক অবসাদ আপনাকে কাবু করতে পারবে না। যারা মানসিক অবসাদে ভোগেন তাদের সব-সময়েই বেশী বয়সের মত দেখায়। মন তেমন ভালো না থাকলেও মুখে হাসি-খুশির ভাবটুকু সব সময়ই বজায় রাখবেন। বাড়িতেই হোক আর বাইরেই হোক কাজের মধ্যে ডুবে থাকার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে।

মুখের লাবণ্য বজায় রাখার জন্ত ভালো ক্রিম ব্যবহার করুন। চুল বাঁধার ভঙ্গির জন্তও অনেককে বুড়ি মনে হয়। তাজেই. কেশ বিন্যাসের দিকে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। চুল যদি পেকে গিয়ে থাকে তবে কলপ যে মাখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ঠিক মতো চুল বাঁধতে জানলে, পাকা চুল অনেক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টি যদি ক্ষীণ হ'য়ে থাকে তাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। চশমা পরলেই যে বেশি বয়স দেখাবে তা নয়। ঠিক মতো বাছাই ক'রে চশমা কিনতে পারলে বরং বয়স কমই দেখাবে।

আরেকটা কথা। দেহের সৌন্দর্য বজায় রাখতে হলে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন। অলসতা দেহের লাবণ্য নষ্ট করে ও ধীরে ধীরে আপনার অগোচরে বার্ধক্য ডেকে আনে। কাজেই বয়স কিছুই নয়। আপনার মন যদি কাঁচা রাখতে পারেন তবে সব বয়সেই আপনার সৌন্দর্য অটুট থাকবে। সব সময়ই হাসি-খুশী থাকবেন। দুঃখ কষ্ট থাকলেও তা গায়ে মাখবেন না। সব সময়েই মনে করবেন আপনার কোন কষ্ট বা অভাব নেই। এইভাবে চলে দেখুন আপনার কত পরিবর্তন হয়। এই-আপনি আর সেই-আপনিতে কত তফাৎ তা তখন আয়নার সামনে একবার দাঁড়ালেই বুঝতে পারবেন।

"যৌবন এক আশ্চর্য সময়। দুঃখের বিষয় যুবক-যুবতীরা সেই সময় হেলায় নষ্ট করে"—বলেছেন বার্ণাড শ'।

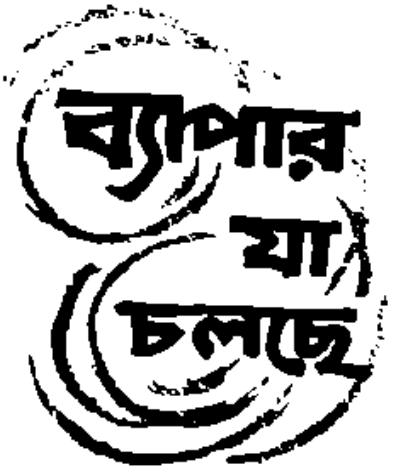

চক্রপাণি

[মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন]

দাদার শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলার কথা শোনা গেছে। এ যুগের শ্রীকৃষ্ণেরও অনেক লীলা। শ্রীকৃষ্ণ মেননের কথা বলছি। কত না নব নব রূপে তাঁকে দেখা গেল। অভিনেতা, বক্তা, সাংবাদিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাঁর নবতমরূপ যা তিনি নিজেই প্রকট করেছেন তা হচ্ছে তাঁর সম্পাদক রূপ—গ্রন্থ সম্পাদক। সম্প্রতি বোম্বাই-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্যটি তিনি দেশবাসীর কাছে পরিবেশন করেছেন, বলেছেন, জওহরলাল বড় লিখিয়ে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ তিনি লেখার বিরতি চিহ্ন দিতে জানতেন না, তাঁর বই-এর সম্পাদকরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই সব লেখা ঠিকঠাক করে দিতেন।.....কী অসহনীয় দম্ভ উক্তি! যে মহান ব্যক্তিটি রাজনীতি না করলেও কাব্যময় মানসের অধিকারী সাহিত্যিকরূপে পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতেন সহজেই, যিনি নানা রসের নানা লেখা লিখেছেন, অজস্র লিখেছেন, লেখা ছিল যাঁর কাছে চিত্তবৃত্তির তথ্যিষ্ট প্রকাশ, তিনি তাঁর লেখায় কমা, ফুলস্টপ দিতে জানতেন না, তাঁর লেখা শোধরাতে শ্রীকৃষ্ণকে পাঁচ টন কমার জোগাড় করতে হতো, এই সংবাদ জানিয়েছেন, প্রসঙ্গতত্ত্বায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অভিনেতাসুলভ ব্যক্তিত্বে আকর্ষণীয়, কায়বাঙ্ময় কূটনীতিক শ্রীকৃষ্ণ মেনন! রক্ষা এই যে তাঁর কথায় আজকাল আর কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

• • • •

মানুষকে যারা খুন করে তাদের বলা হয় খুনী, যারা পরস্ব অপহরণ করে তাদের বলা হয় চোর ডাকাত। এবং তারা কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কেন এদেরই সমগোত্রীয় বলে গণ্য হবে না সেই সব পাপিষ্ঠ ব্যবসায়ী যারা খাদ্যে মারাত্মক ভেজাল মিশিয়ে নিজেদের লাভটাইকে মেরে লক্ষপতি হয়ে সমাজের মুকুটমণিরূপে শোভা পাচ্ছে। কেন তাদের প্রতি জওহরলালের সেই স্মরণীয় উক্তি প্রযোজ্য হবে না? এই সূত্রে এক কলকাতাবাসী সরবারালী ব্যবসায়ীর কার্যকলাপের যে কথা ফাঁস হয়েছে তা পড়ে, আমরা এখনো শুধু স্তম্ভিত হয়েই আছি,

তাকে এখনো খুঁজে বার করে প্যাল্‌গ্রেসেই ঝুলিয়ে অভয়রদাসের উক্তিকে সার্থক করে তুলছি না। ব্যাপারটা সকলেই জেনেছেন। ঐ ব্যবসায়ীটি চালে পাথর কুচি মেশাবার জন্যে পাথর কুচি বানাবার একটি যন্ত্রের অর্ডার দিয়েছেন এক জার্মান কারখানায়। তারা অর্ডারটি দেখে বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে সেটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে। অনেকদিন হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাপারটা ধোবকরি চেপে যাবার চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের স্মৃতি তো ক্ষণস্থায়ী! তাই এ ধরণের অনেক সাংঘাতিক ব্যাপারও আমরা শীঘ্রই ভুলে গেছি। এটিও ভুলে যাব।

• • • •

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছিল, এই সত্য জোর গলায় লেখার জন্যে নিউ দিল্লীস্থ এক মার্কিন সাংবাদিকের চাকরি গেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ভ্যান কসিন ধোবকরি একমাত্র আমেরিকান সংবাদ-প্রতিনিধি, যিনি নিজের দেশের কাগজে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। ব্যস! আর যায় কোথায়। পাকিস্তান রেগে আগুন! করাচী-ওয়াশিংটনের মধ্যে কূটনৈতিক খোঁচাখুঁচি! মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বিচলিত! তোমাকে অমন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হতে কে বলেছিল, হে কসিন! স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বিরক্ত! তাহলে আর উপায় নেই। কসিনকে হাড়কাঠে ফেলা হল—বেচারার চাকরি গেল। মার্কিন সংবাদপত্র জগতের এই নেপথ্য কাহিনী আমাদের অভিভাবকদের কি কিছু জ্ঞান দিতে পারলো?

• • • •

একেবারে অন্দর মহলে ঢুকেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর। পৌরপিতারা যে জায়গায় বসে মাইকেল করেন তাকে শহরের অন্তঃপুর বলতে বাধা নেই। সেই অন্তঃপুরের একজন কর্মচারী নাসিরুদ্দিন আহম্মদ। তাকে সম্প্রতি পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি শ্যাঠা চুকে গেল? নাসিরুদ্দিনরা তো দলে দলে ভারতে ঢুকে নানা স্থানে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাদের ইচ্ছে মত কাজ করছে। তাদের কিছু বলতে গেলেই তারা এমন তারস্বরে চিৎকার করছে (আমরা সেলাম! আমাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করা হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিকট মিথ্যা চিৎকার) যে দিল্লীর মসনদ অবধি নড়ে উঠছে আর স্বয়ং রাজ্যপাল তাঁর বাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাদের আশ্রয় দিচ্ছেন, রীতিমত পোলাও, কালিয়া, কাবাব খাওয়াচ্ছেন—এমন চিত্র কল্পনা করা কি অসম্ভব?

• • • •

মনের মধ্যে একটা ভাল খবর এই যে দলে দলে চীনা মেয়েরা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছে। পাকিস্তানীদের বিয়ে করে রীতিমত সংসার পেতে বসেছে তারা। এক পুরুষের ওয়াস্তা। তার পরেই সমুদ্রে লাগে মিশে বর্ণশংকর! একটা গোটা জাতের জাত মারবার এমন পরিকল্পনা এর আগে শোনা যায়নি ইতিহাসে।

• • • •

ভারত সরকার অর্থকৃচ্ছতার জন্যে মাঝে মাঝে ব্যয় সংকোচ ও ব্যয় রোধের আওয়াজ তোলেন। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ক্রমেই অধিকতর তীব্র বোধ হচ্ছে, তাই ভারত সরকার সম্প্রতি একাধিক খেলোয়াড়দলকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিলেন না এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত সফর

বাহিনী করে দিলেন। তাও কথা। টাকা যখন নেই, বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে প্রায়ই টাকা কর্জ করে যখন রাজাপাট চালাতে হচ্ছে তখন বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার জন্যে এ ধরণের ব্যবস্থায় কেউই আপত্তি করবেন না। কিন্তু আর একদিকে যখন দেখি যে অনাবশ্যক কুটিরাজিতে সরকারের কোটি কোটি টাকা উড়ে যাচ্ছে, তখন ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ এবং হাস্যকর ঠেকে বৈকি! বঙ্গ আঁটুনি ফস্কা গেরো; সদর দোরে ছুঁচ চলে না, মফস্বলে হাতী, বাইরে কোঁচার পত্তন আর ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন—কত প্রবাদই মনে পড়ছে। বিদেশের কাছে চাল দেখাবার জন্যে প্রতিদিন দলে দলে ভারতীয় মেয়ে-পুরুষ বিদেশ ঘুরে আসছে—ভারত রাজকোষের লক্ষ লক্ষ টাকা ফুঁকে দিয়ে। তারা কারা? তারা সব সাংস্কৃতিক দল! ওই এক দর্শনেশে কথা এসে জুটেছে—সংস্কৃতি! তার ছোঁয়াচ লেগে যার না হচ্ছে বংবাজি করছে—নাম দিচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান! দেশের অন্যত্রাত্রে শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই, অন্নবস্ত্রের জন্যে প্রজাপুঞ্জের আর্তনাদ আকাশকে আলোড়িত করছে, ঘোর ঘোড়ায় হিংস্র শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে,—এমনি সংকটের মধ্যেও সংস্কৃতিকে আমরা ভুলতে পারছি না, শুধু ভুলতে পারছি না, নয়, বহুমূত্র রোগীর জলতেষ্টার মত সংস্কৃতি-তৃষ্ণাও যেন আমাদের অত্যন্ত বেড়ে গেছে হঠাৎ তাই অনবরত বিদেশে আমাদের সংস্কৃতির জয় ঘোষণার জন্যে দল পাঠাচ্ছি—সাইজে বাজিয়ে নাচিয়ের দল বিশ্বভ্রমণ করে ভারত সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে আসছে। একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির আওয়াজ আর অন্যদিকে এই বৈদেশিক সফরে টাকার শ্রাদ্ধ! সরকারের মতিগতির রহস্য বোঝা ভার! শুধু বৈদেশিক সফরেই বা কেন! দেশের মধ্যেও রং তামাসা সিনেমা থিয়েটারের পসার বাড়াবার জন্যে সরকার অকাতরে অর্থ বরাদ্দ করতে কার্পণ্য করছেন না, অথচ জনগণের স্থায়ী উপকারের জন্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজন রয়েছে সে সব ব্যবস্থার প্রতি সরকারের যথোচিত মনোযোগ আছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।...জানা গেছে আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে টেলিভিশন আমদানী করবার জন্যে ১০০ কোটি টাকার ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে। যেখানে দেশের প্রায় চৌদ্দ আনা মানুষকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতেও সরকার মাঠময় গোবর ছড়াচ্ছেন, যেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে, সেই সব দিকে অর্থ বিনিয়োগের কথা চিন্তা না করে ভারত সরকার নিছক বিত্তশ্রেণীর প্রমোদ বিতরণের জন্যে এই বিরাট অর্থ ব্যয় করবার পরিকল্পনা করে সার্কাসের ক্লাউন সাজলেন—দেশের লোকের কাছে এবং বিদেশের লোকের কাছেও। এই যে ১০০ কোটী টাকা খরচ হবে—এটা যাবে কোথায়? যাবে বিদেশী ব্যবসায়ীদের গর্ভে, তারা এসে দেশের ধনপতিদের ঘরে ঘরে টেলিভিশন সেট বসাবে আর টেলিভিশনে অভিনয় করবার জন্যে নতুন আংগিকে কেমন করে আধ-নেংটা নাচ নাচতে হয় তাই শিখিয়ে দিয়ে যাবে এদেশের সরকার-পুষ্ট সাংস্কৃতিক-মেয়েদের দলকে। এটা কি বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়েরই সামিল নয়?

• • • •

নাটক, অভিনয়, নৃত্যগীতানুষ্ঠান—এসবের মর্ম আমরা বুঝি। আমরা নিজেরা নাটক লিখি, অভিনয় করি। উদয়শঙ্করের 'সামান্য ক্ষতি' যে কী অসামান্য সৃষ্টি তার সম্যক বোধ আমাদের আছে। দেশের জনমানস ও গণচিত্তের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে এদের প্রয়োজনীয়তা যে অবশ্যস্বীকার্য তা আমরা মানি। কিন্তু সব কিছুরই সময় আছে, মাত্রা আছে, অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থাভেদ বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে। ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না, বাইরে গিয়ে নাচা কোঁদা—এটা তো দেখতে ভাল দেখায় না

কোনমতেই এবং এই প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়াও শুভবুদ্ধির কাজ বলে মনে করি না।...শোনা যায় ভারত সরকার নানা রাজ্যে নাইট উন্নয়নের পথে অনেক লাখ টাকা মঞ্জুর করে রেখেছেন এবং নাট্যসংস্থারা একটু তদ্বির করতে পারলেই সেই টাকার খানিকটা অংশ হাতাতে পারে। কলকাতায় কয়েকটি নাট্যসংস্থা গেয়েছে এবং পাচ্ছে। তারা তো শুধু আন্তরিকতার সঙ্গে নাট্যচর্চা করছে এবং তার প্রমাণ দিচ্ছে। শোনা গেল পশ্চিম ভারত অঞ্চলের জন্যে সরকার যে মোটা টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন তা নেবার মত উপযুক্ত নাট্যসংস্থা নেই। তা না থাক, টাকাটা হাতাবার লোকের অভাব ঘটেনি! অভিযোগে প্রকাশ, কয়েকটি ভুয়ো (অস্তিত্বহীন) নাট্যসংস্থার নামে ঐ টাকা সরকারী তহবিল থেকে বেরিয়ে গেছে।

• • • •

খেলার চূড়ামণি হলেন রাশিয়া। মনপ্রাণঢেলে খেলতে এরা জুড়ি নেই। এই খেলার মাতালে মানুষ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয় এবং তখন সে কী করে বা কি বলে তা ভেবে দেখবার মত সম্বিৎও তার থাকে না। 'কাদের সাপ' তো আমাদের দেশের একটি বহু প্রচলিত কথা। ওই রকম আত্মবিস্মৃতির কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি জানা গেছে—রাশিয়া থেকে। ওখানে তো খাবার খুব খাপট। বিশ্বখাদ্য-প্রতিযোগিতায় রাশিয়া বরাবরই বিজেতা! তাই সেখানে ঐ খেলার প্রচলনও খুব। একটি খেলায় (খেলা খুব জমেছে) একজন হেভোয়াড় খেলতে খেলতে অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর রাণীটিকে ভুলে নিয়ে গিলে ফেললেন! রাণী তো উদরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের হুঁস নেই। কিছুক্ষণ কাটল। তারপর রাণী হয়ত পেটের ভিতর থাকতে আপত্তি জানাতে লাগলেন। তখন ব্যাপারটা ধরা পড়ল, ভদ্রলোকের প্রাণ তখন কণ্ঠাগত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক পশু চিকিৎসকের কাছে। পেট চেরা হল। অক্ষত অবস্থায় রাণী বেরোলেন।...সেই সার্জন নাকি এই রকম অনেকগুলি অপারেশন করেছেন। এবং সেইসব অপারেশনের ফলশ্রুতিগুলি তিনি একটি কাঁচের শো-কেসে সাজিয়ে রেখেছেন। তার মধ্যে আছে নানা মুদ্রা, বোতাম, পেনসিল, কলম, টাইপিন ইত্যাদি। যার একটি হাতঘড়িও আছে! এ হেন খেলা সারা পৃথিবীতে যে অনুসরণীয় বলে বিবেচিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

• • • • •

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সম্প্রতি এক নতুন ধরণের উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে। তাদের উৎখাত করবার জন্যেই বোধ করি তাদের পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু ছাত্ররাই নয়, ভারতীয় নরনারী নির্বিশেষে সকলের ওপরেই রীতিমত সংঘবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত গুণ্ডামি চালানো হচ্ছে। হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সন্ধ্যার পর ভারতীয়দের রাস্তায় বেরোনোই মুস্কিল হয়ে পড়েছে, মারধোর, ছিনতাই, ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত নিক্ষেপ, টিটকারি, গাল মন্দ—যাকে বলে দুঃসহ অবস্থা। এক মহানভ্রাতৃত্বাভিমানী মহানগরে, প্রকাশ্যেই, এমন কি সময়ে সময়ে পুলিশের চোখের সামনেই, এই রকম অমানুষিক ব্যাপার চলেছে, মনে হচ্ছে এর পিছনে একটা বড় রকমের শয়তানি পরিকল্পনা রয়েছে।

• • • • •

বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কথাটা আর একবার উল্লেখ করতে হল। ভারত সরকারের নতুন আমদানি নীতির তাৎপর্য বোঝা ভার। At random অনেক জিনিষের আমদানি বন্ধ করা হয়েছে।

তার মধ্যে আছে মরণ বাঁচন নির্ণয় করছে এমন অনেক প্রাণদায়ী ওষুধ। অথচ এমন অনেক বিদেশী আমদানি করা হচ্ছে যাদের প্রয়োজন ওই সব ওষুধের তুলনায় অত্যাবশ্যকীয় কি না তা বিচার সাপেক্ষ। যেমন ধরুন সস্তা ছবিওলা নীচু শ্রেণীর বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলো অথবা ঐ শ্রেণীর অযথা সব দামী দামের বই! মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে এমন ওষুধের আমদানি বন্ধ করে ঐ সব পত্র-পত্রিকা আমদানি করার মধ্যে যে কী শুভবুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুধু ওই সব বই বা পত্র পত্রিকাই নয়, আরও নানা বিলাস ও সাজ-সজ্জার উপকরণ অবাধে আসছে। তারপর বহু অর্থব্যয়ে আসছে ক্রীড়া শিক্ষক, বক্তা এবং আরও নানা বিষয়ক দল! এদের জন্যে বহু টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ যে ওষুধ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে তার আমদানি বন্ধ। এ সম্বন্ধে বোম্বাই-এর একটি সাম্প্রতিক কাহিনী শুনুন।

বোম্বাইএর এক হাসপাতালে একটি পনেরো দিনের বাচ্চা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। বাচ্চার মা কাঁদছে। বাবা পাগলের মত ডাক্তারদের বলছেন, কোন রকমেই কি আমাদের এই প্রথম সন্তানটিকে বাঁচানো যায় না? যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে প্রস্তুত।

গম্ভীর ভাবে হাসপাতালের বড় ডাক্তার জবাব দিলেন—একটিমাত্র ওষুধ আছে যা আপনাদের সন্তানকে বাঁচাতে পারে। তার নাম কেনামাইসিন (Kenamycin)। কিন্তু তার আমদানি বন্ধ। ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না।

—অন্য কোন দেশী বিকল্প ওষুধ নেই।

—না।

—কোনক্রমেই কি ওই ওষুধ পাওয়া যায় না?

—ওষুধের দোকানে বা হাসপাতালে খোঁজ করে দেখুন। কেউ হয়ত গুপ্তপথে আনিয়ে রেখেছে।

ভদ্রলোক ওষুধের খোঁজে বেরুলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও। সহর তোলপাড় করলেন। কিন্তু কোথাও নেই। বড় ওষুধের দোকানের পাশেই বই এর দোকান। সেখানে যাবতীয় যৌনচিত্র সম্বলিত বিদেশী পত্র-পত্রিকা আর পেপার-ব্যাক বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু সেই প্রাণদায়ী ওষুধের আমদানি বন্ধ!

—কে বা কারা এমন বুদ্ধির কাজ করেছে? এমন করে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাচ্ছে?

—রাজা গণ্ডারের সেইসব মহামান্য সচিবরা যাদের কলম দিয়ে এইসব বিধিনিষেধের আদেশ বেরিয়েছে, যাঁদের কলমগুলো আমদানি করা সোনার পার্কার বা শেফার্স বা মন্ট ব্লাঙ্ক।

বিদেশের কাউকে ফোন করে এই ওষুধ আনানো যায় না? কিন্তু তার সময় কোথায়? বাচ্চাটার বাঁচার মেয়াদ আর কতক্ষণ আছে ডাক্তার?

—আটচল্লিশ ঘণ্টা! দেখুন চেষ্টা করে।

ফোন করা হল লণ্ডনে, রোমে, করাচিতে

করাচিতে এক বন্ধু সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। সোজা পথে নয়। এক ভদ্রলোক সেই ওষুধ পকেটে নিয়ে এরোপ্লেনে বোম্বাই এসে পৌঁছোলেন পরদিন। ভদ্রলোকের পয়সা খরচ করা সার্থক হল। তাদের বাচ্চাটি বাঁচলো।

কিন্তু ওই বাচ্চাটির মত ভাগ্য আমাদের দেশে ক'জনের থাকতে পারে? তাই কেনামাইসিন এবং ওই জাতীয় প্রাণরক্ষাকারী ওষুধের অভাবে কত বাচ্চা কত মানুষ যে মারা যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে?

বুদ্ধিভ্রংশের এমন উদাহরণ পৃথিবীতে বোধ করি আর কোথাও পাওয়া যাবে না!

চিত্র বিচিত্র

খেলা ধূলা

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

ফুটবল খেলোয়াড়ের দাম

দক্ষ খেলোয়াড়কে দলে পাবার জন্যে এক একটা ক্লাব অনেক টাকা খরচ করে, সেই খেলোয়াড়তে অনেক টাকা দেয়—এমন নজির আমাদের দেশেও আছে।

সম্প্রতি ব্রেজিলের ফুটবল খেলোয়াড় "পেলের" জন্যে একটি ক্লাব অবিশ্বাস্য রকম মোটা টাকা দিতে চায়। সেই খবরটি ১৭ই মে বেরিয়েছে।

"রায়ো-ডি-জেনেরো—এখানকার ফুটবল ক্লাব তাম্রোডাগামা ব্রেজিলের বিশ্বশ্রেষ্ঠ ইনসাইড ফরওয়ার্ড পেলেকে দলে পাওয়ার জন্যে সান্তপাওলোর সান্টোস ফুটবল দলকে আড়াই হাজার মিলিয়ন ক্রুসিরোস বা ভারতীয় হিসাবে সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা দিতে অগ্রণী হয়েছে। ফুটবল খেলোয়াড়ের দল বদলের জন্য এত টাকা দেবার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে এক নতুন রেকর্ড।"

একজন খেলোয়াড়কে ঘিরে এত চাঞ্চল্য আর কোনো দেশে কোনদিন হয়নি।

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার এই "গুটিং ষ্টার" সম্পর্কে কত যে কাহিনীর প্রচলন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

তাঁর জীবনের একটী চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তিনি মাসে প্রায় দেড় হাজার পত্র পান বীর-পূজকদের কাছ থেকে। তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। তাঁর আসল নাম এডসন আরন্তেস্ দো নাসিমেন্টো।

"পেলে" নাম যে কেমন করে হোলো তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। সান্টোস ফুটবল দলের হয়ে তিনি খেলেন। এই দল পরপর দু'বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

জাতে নিগ্রো, বয়স চব্বিশ। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা। ওজন সাড়ে এগার স্টোন।

যাদুকর যেমন তাঁর হাত দিয়ে খেলা দেখান, পেলে তেমনি দেখান তাঁর পা দিয়ে।

হেলে দুলে চলেছেন, কখনও আস্তে কখনও জোরে, দুপায়ে যেন চুম্বক লাগানো, বলটি সেই চুম্বকের আকর্ষণে দু'পায়ের মধ্যে এধার ওধার করছে, বাইরে যেতে পারছে না, এক এক ঝুঁকিতে এক একজনকে কাটিয়ে হঠাৎ ছুটলেন পেলে, মাঠের মধ্যে সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো, আর তার পরেই বিপক্ষদলের গোলপোষ্টের জালটা কাঁপতে লাগল·····পেলের পা থেকে বল চলে গেছে সেখানে।

এখন টাকার গদিতে শুয়ে আছেন পেলে। কিন্তু বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। জুতো পালিশ করার কাজ করেছেন রাস্তায় বসে, চানাচুর বিক্রী করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যেমন ক্রিকেট, ব্রেজিলে তেমনি ফুটবল। ফুটবল নিয়ে সেখানে প্রচণ্ড উন্মাদনা।

পেলের যখন এগার বছর বয়েস তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ফুটবলার, ওয়াল্ডমার ব্রিটো, তাঁর খেলা দেখে তাঁকে স্বচ্ছায় চার বছর শিক্ষাদান করেন এবং তারপর তাঁকে সান্‌টোস ফুটবল দলের কর্তাদের কাছে দাঁড় করিয়ে বলেন, আজ যাকে আপনাদের উপহার দিলাম সেই ছেলেটি দু'এক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুটবল খেলোয়াড় বলে স্বীকৃত হবে।

মাসে ৩৫৬ টাকা মাহিনায় পেলে সান্‌টোস দলে ভর্তি হলেন এবং প্রতি খেলাতেই নতুন নতুন চমক লাগিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করে দিলেন।

বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁর নাম ব্রেজিলের ঘরে ঘরে। এরকম খেলোয়াড় নাকি আর জন্মায়নি। তাঁর দু'পা যেন যন্ত্রপূত। যখন শুট করেন তখনও যেমন নির্ভুল, যখন পাস করেন তখনও তেমনি নির্ভুল। উদার নিঃস্বার্থপরতায় তিনি সাথীদের পায়ে যেন পাস যুগিয়ে দেন—এই নাও পাস্, তোমার সামনে আর কেউ নেই, ফাঁকা গোল, এ চান্স কেউ ফসকায় না।

আক্রমণ রচনায় অদ্বিতীয়। পাশের অন্য চারজন ফরওয়ার্ডকে নিয়ে এমনভাবে খেলেন এবং তাদের খেলান, যেন মনে হয় একটী বৈজ্ঞানিক নির্ভুল যন্ত্রমন্ত্রী নির্ভুলভাবে কাজ করছে। সুতরাং তাকে ঠেকায় সাধ্য কার।

১৯৫৮ সালে ষ্টকহলমে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় পেলে বিশ্বজয়ী খেলোয়াড়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ১৭। প্রথমে ওয়েলস তারপর সুইডেনকে হারিয়ে ব্রেজিল সে বছর বিশ্বকাপ জেতে। এবং লক্ষ লক্ষ দর্শক যাঁর খেলা দেখে চমৎকৃত হয়, সম্মোহিত হয়, তাঁর নাম পেলে।

১৯৬২ সালে লিসবনে পর্তুগালের বিরুদ্ধে পেলের খেলা দেখে পৃথিবীর সাংবাদিকরা একবাক্যে বলেছিলেন, এরকম যাদুকরী ফুটবল খেলা তাঁরা জীবনে দেখেননি।

ছোটবেলায় অনেক কষ্ট করেছেন, খেলায় জখম হয়েছেনও কম নয়, কিন্তু তার বিনিময়ে খ্যাতি আর অর্থ পেয়েছেনও প্রচুর। ১৯৬০ সালে সান্‌টোস দলের তরফে তিনি যখন কনট্রাক্ট সই করলেন তখন মাহিনা ছাড়াও পেলেন, নগদ একলক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এবং দুলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দামের একটী বাড়ী।

তাঁর অনেক জমিজমা। অনেক ব্যবসায়ে তাঁর টাকা খাটে। যদিও ক্রোড়পতি, থাকেন খুব সাদাসিধে ভাবে। ছোট ভাই জোকা সঙ্গে থাকে। সেও ফুটবল খেলে। বাবা মা থাকেন বেলের বাড়ীতে। তাঁদের প্রতি মাসে ন হাজার ক্রুজেরো পঞ্চাশ টাকা মানোহারা পাঠান।

নিজের জন্মস্থান কোয়াকোস নগরে তাঁর অনেকগুলি ছোট ছোট ভাড়া বাড়ী আছে। অনেকগুলি দরিদ্র পরিবারকে তিনি সেই সব ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেন।

ভক্তের দল সুযোগ পেলেই ঘিরে ধরে তাঁকে। পেলে প্রাণ খুলে মিশে যান তাদের সঙ্গে, কখনও বিরক্ত হন না। মদ খাননা, ধূমপান করেন না। একমাত্র সখ মোটর গাড়ী কেনা। বাবা মাকে একটী গাড়ী কিনে দিয়েছেন। ছোট ভাইকে একটী দিয়েছেন। নিজের দুটী গাড়ী। দু'চার মাস অন্তর পুরোনো গাড়ী বদলে নতুন গাড়ী কেনেন।

তিনি জানেন খুব বেশী দিন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের আয়ু নয়। মনকে সেদিক থেকে তৈরী করে রেখেছেন ইতিমধ্যেই। ১৯৬১ সালে তাঁর বর্ত্তমান কনট্রাক্ট শেষ হবে। আভাসে পেলে জানিয়েছেন যে তিনি আগামী বছরে খেলা থেকে অবসর নিয়ে বিবাহ করবেন এবং ব্যবসায়ে নামবেন।

বর্ত্তমানে তাঁর বয়স চব্বিশ। খেলোয়াড়রূপে তিনি রাজাধিরাজ।

১৯৬০ সালে 'ডিউক অফ এডিনবরা' ব্রেজিল পরিদর্শনে গিয়ে সবার আগে দেখা করতে চাইলেন পেলের সঙ্গে, তাঁর খেলা দেখতে চাইলেন। তাঁর সম্মানে একটী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই খেলায় পেলে অনেক নতুন কায়দা দেখিয়ে লক্ষ দর্শককে এবং সেই সঙ্গে ডিউক অফ এডিনবরাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

খেলার শেষে এক মহাসঙ্কট দেখা দিল ব্রেজিলের কর্তৃপক্ষের সামনে। পেলে গিয়ে দাঁড়াবেন ডিউক অফ এডিনবরার সামনে, না, ডিউক এগিয়ে আসবেন পেলেকে অভিনন্দন জানাতে?

ডিউক অফ এডিনবরা কাউকে কিছু বলবার বা চিন্তা করবার অবকাশ দিলেন না; সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করলেন। খেলাশেষের বাঁশী বাজামাত্রই তিনি মাঠের মধ্যে গিয়ে পেলের সঙ্গে করমর্দ্দন করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

উৎসবমত্ত ব্রেজিল নগরী সেদিন সারারাত পথে পথে গান গেয়ে পেলের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

• • •

দুই অধ্যায়

সুবোধ বসু

কী সুন্দর নদী গঙ্গা! দোতলার খোলা গোটিকোর উপর চেয়ারে বসে এক নদী ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না সুনন্দার। মন ভেসেছে নদীর স্রোতে, যেন নিরুদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে মন্থর গতিতে। নিচে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মোটর আর ট্রাক্ চলার বিরাম নেই, কিন্তু তাদের কোলাহল আর কানেই প্রবেশ করছে না সুনন্দার।

উত্তরপাড়ার এই বাড়ী তাদের সাতপুরুষের। এইখানেই শৈশব কেটেছে সুনন্দার। এখান থেকেই প্রতিদিন কলকাতার স্কুল ও পরে কলেজে যাতায়াত করেছে। গাড়ীতে যেতে কতক্ষণই বা লাগে। তার বাবা মেয়েকে বোর্ডিঙে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরমা জেদ করেছেন, এখান থেকেই পড়তে হবে। বউ মারা যাবার পর নাতনীর সব ভারই তাঁর উপর। তাঁর ইচ্ছার অসম্মান করা চলে না।

এই বাড়ীতেই সুনন্দার বিয়ে হয়। কলকাতা থেকে প্রায় একশো মোটর এসেছিল। বরযাত্রী আর নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। প্রায় লক্ষ্য করে এই রকম আড়ম্বর হয়েছিল। দুই বনেদী বংশের মিলন, আড়ম্বর নাকি তার মানানসই হ'তে হবে।

বর প্রমীল স্যাণ্ডহার্ট থেকে কমিশন পাওয়া মিলিটারী অফিসার, এরই মধ্যে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্কে উন্নীত হয়েছে। সুনন্দার আপত্তি ছিল। মিলিটারীর লোক তার পছন্দ নয়। তার ঠাকুমারও আপত্তি ছিল! কবে যুদ্ধে যেতে হবে, প্রাণ হারাতে হবে। তাঁর আপত্তি দূর করা হলো নানা যুক্তি দেখিয়ে। বিলেতের লর্ড পরিবারের মেয়েরা মিলিটারী অফিসারদের বিয়ে করাই গৌরবজনক মনে করে। আর যুদ্ধ! যুদ্ধ কটা হয়? আর হলেও সাধারণ সেপাই আর বড় অফিসারের বিপদ কি এক রকম? সুনন্দার আরও একটা আপত্তি ছিল। মিলিটারীর লোক মদ খায়, হুল্লোড় করে। এই আপত্তিতে কিন্তু সুনন্দা ঠাকুমার সমর্থন পায়নি। ব্যাটাছেলে মদ খাবে, এতো স্বাভাবিক। এতে এমন ভয়ের কি আছে। কিন্তু তবু সুনন্দা জেদ করতে থাকে। এই আপত্তির সমাধান করে দেন তার মামা। সহাস্যে বরের মায়ের কাছে কনের এই আশঙ্কার কথাটা পরিহাস তরল করে উপস্থিত করেন।

'ওরে সর্বনাশ! একি কথা। বলবেন গিয়ে আমার সুনন্দা মাকে, প্রমীল আমার পানটি পর্যন্ত খায় না। ছেলেবেলায় সারাক্ষণ রামকৃষ্ণ মিশনে যেত। জমিদার পরিবারের অন্য পাঁচটা ছেলের মতই নয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ নাম দিয়েছিলেন রামভক্ত।' তাঁরা যেমন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন।

দশ বছর বিয়ে হয়েছে সুনন্দার। এক ছেলে, এক মেয়ে। রাণা আর মিঠু। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছে স্বামীর চাকরির খাতিরে: একবার দেশের বাইরেও গিয়েছিল। সবাই তাদের সুখী বলেই জানে। অন্য কেউ হলে হয়তো সম্পূর্ণই সুখী হতে পারত। সুনন্দা পারেনি। সে বড় বেশি

খুঁতখুঁতে, তার ব্যক্তিত্ব বড় বেশি প্রবল। নিজে সে যেমনি চায়, ঠিক তেমনটি হ'তে হবে। তার আদর্শকে সে-ও ক্ষুণ্ণ করবে না, অন্য কাউকেও ক্ষুণ্ণ করতে দেবে না।

সুনন্দার বাপ-পিতামহ ডাক-সাইটে মদ্যপ ছিলেন। মদের প্রতি সুনন্দার বিরাগের সূত্রপাত প্রায় শৈশব থেকেই। বেশার ভাগে মানুষের অধঃপতনের অবস্থা সে খুব কাছে থেকেই দেখেছে।

বিয়ের সময় মিলিটারী অফিসার স্বামীতে তাই সে আপত্তি করেছিল। তার মামা ঘোর শাশুড়ীর কাছ থেকে যে সার্টিফিকেট এনেছিলেন, তাতে সে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হ'তে পারেনি। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি আপত্তি করার উপায় ছিল না।

প্রমীল কিন্তু এ বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণ হতাশ করেনি। বিয়ের পরেই সে হেসে বলেছিল, 'মদকে নাকি খুব ভয় পাও? পার্টিতে-উৎসবে কখনও সখনও দু'এক পেগ্ খেলেও মদের আমি পক্ষপাতী নই। এটুকুও ছেড়ে দেব, কোনও ভয় নেই।'

প্রথম কয়েক বছর এ কথা সে নিষ্ঠার সঙ্গেই রক্ষা করেছে। পার্টিতে সহকর্মীরা ঠাট্টা করে বলেছে, 'মেজর "মিস্" ব্যানার্জির জন্য একটা সফ্‌ট-ড্রিঙ্ক চাই—লেমন স্কোয়াশ…'। মেজর প্রমীল ব্যানার্জি সহাস্যেই সে ঠাট্টা হজম করেছে, কখনও পাল্টা আক্রমণ হিসেবে বলেছে, 'ভাগ্যে "মিসেস" বলোনি, তা হলে 'হার্ড' ড্রিঙ্কই নিয়ে আসত।" ইঙ্গিতটা অফিসার পত্নীদের প্রতি।

তার ক'বছর পরে লুকিয়ে চুরিয়ে সুনন্দার আড়ালে কখনও-সখনও আগের অভ্যাস শুরু হলো। প্রথমে প্রতিবাদ করেনি সুনন্দা, ক্ষমার সঙ্গে এই ত্রুটি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে, ভেবেছে নিজেকে নিজেই সংবরণ করে নেবে প্রমীল। কিন্তু এই আশা তার সফল হলো না। 'কখনও সখনও' আরও ঘন ঘন হ'তে লাগল।

প্রথম যেদিন সুনন্দা তার প্রতিবাদ জানাল, সেদিন রীতিমত লজ্জিত হয়ে গিয়েছিল প্রমীল। ক্ষমা চেয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ রকম বছর দেড় দুই চলেছিল। অপরাধ করা, অপরাধ ধরা পড়লে ক্ষমা চাওয়া এবং তারপর কিছুটা সময় বাদ দিয়ে আবার অপরাধ করা।

এই অবস্থা বেশি দিন চলবার পর যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হলো। বাড়াবাড়ি শুরু হলো। চক্ষুলজ্জা দূর হলো। ঠোকাঠুকি শুরু হলো দু'জনার মধ্যে।

'মাতাল হওয়াটা নিন্দনীয়, মদ খাওয়া দোষের নয়। আমিতে এটা এটিকেট্। আর ফুর্তি মিলিয়ে নাচটাও কিছু অযথা কাজ নয়। একে নাচের পার্টনার নিয়েছি, ওকে নিইনি, কর্তব্যে নিয়েছি, এ প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। আনন্দ করবার অধিকার কেউ কারও কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না। তুমি ইচ্ছে করলে ডিভোর্স করতে পার। পছন্দমত পার্টনার বেছে আনন্দ করতে পার, আমি আপত্তি করবো না।' একদিন ঝগড়ার পর ঘোষণা করলে প্রমীল।

এরপর থেকেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল।

গত ছ'মাস ধরে ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে উত্তরপাড়ার এই পৈতৃক বাড়ীতে বাস করছে সুনন্দা। জানাই তো আছে। শান্তিতে আছে। ঝগড়া নেই, ইচ্ছার ঠোকাঠুকি নেই। এ বাড়ী সুনন্দার নিজের সম্পত্তি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। জমিদারী উচ্ছেদ হলেও জমিদার বাড়ীর ব্যবস্থাগুলি সবই চালু আছে। সরকারমশায় এখনও খাতাপত্র দেখেন, বাড়ী ভাড়া আদায় করেন, ব্যাঙ্কের

কাপড়ের হিসেব রাখেন, চাকর-দারোয়ান সামলান। আগের সচ্ছলতা আর নেই, কিন্তু সংসার চলতে আটকায় না। মন্দ কি, যদি বাকিটা জীবন এইখানে বসে, সন্ধ্যার দিকে চেয়ে চেয়ে কেটে যায়। কি পেয়েছে সে জীবন থেকে? যা চেয়েছে তা তো পায়নি।

সহসা সুনন্দার কল্পনার সুতো ছিঁড়ে গেল মিঠুর চীৎকারে।

'মা, মা,' সে নিদারুণ উত্তেজনার সঙ্গে নিচ থেকে সশব্দে ছুটে এসে বললে 'একটা হাঙোর, মস্ত বড় একটা হাঙোর ধরা পড়েছে। গঙ্গার ঘাটে।'

'ধরা পড়েছে? কে বললে?'

'গোবিন্দকাকা দেখে এসেছে। আস্ত গরু খেয়েছে। কাল যেমন একটা লোকের পা কেটে নিয়েছিল, আজ তেমনি নিজেই ধরা পড়েছে···যাবো যাচ্ছে গোবিন্দকাকার সঙ্গে, আমি যাব?···'

'যাচ্ছে। আমাকে না বলেই।' সুনন্দা বিরক্তির সঙ্গে বলে। 'কোথায় গোবিন্দ। তাকে ডাক···।'

ডাকতে হলো না। তার আগেই বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য গোবিন্দ নিজেই হাজির হলো। সত্যই একটা হাঙর মেরেছে জেলেরা। সতকাল জেলেদেরই একটা ছেলের ঠ্যাং কেটে নিয়েছিল হাঙরে। তারপর মাছ ধরা ছেড়ে সমস্ত জেলে সারারাত সারাদিন ধরে হাঙরের খোঁজ করেছে। সন্ধ্যার মুখে সফল হয়েছে ওই অনুসন্ধান।

'খোকাবাবু জেদ করছেন। একবার দেখাতে নিয়ে যাব কি দিদিমণি?'

'আমিও যাব।' মিঠুও আবার করে' বললে। 'মরেই তো গেছে, তবে আর ভয় কি, না গোবিন্দকাকা?'

'না, ভয় কিছু নেই।' গোবিন্দ আশ্বাস দিয়ে বললে। 'বড়-মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন দিদিমণি। শঙ্করী এসে এইমাত্র খবর দিয়ে গেল।·····'

হয়তো শেষোক্ত আহ্বানের জন্যই হাঙর দেখতে যাওয়ার অনুমতি সত্ত্বেই মঞ্জুর হয়ে গেল। রানা সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করছিল। সেই প্রথমে হুড়মুড় করে নিচে নেমে গেল। মায়ের কাছে যে হাজির হ'তে হলো না, এটা মস্ত বাঁচোয়া।

হরসুন্দরী বিছানাতেই উঠে বসেছিলেন। সন্ধ্যার পর আর ও কিছু করবার থাকে না। রাতে খাওয়া নেই। বেলা দুটোয় দিনের শেষ ভোজন। এখন চোখের দৃষ্টি চলনসই রকম ভালো আছে, অবসর সময়ে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন, এক আধটু সেলাইও করেন, কিন্তু তা দিনের বেলায়। সূর্যাস্তে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিজের খাটে উঠে বসেন। সেখান থেকেই নাতী সুনন্দার সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

প্রায় আধঘণ্টা হলো বাহির মহল থেকে সুনন্দা অন্দর মহলে এসেছে। এ বাড়ীর নিয়মে মহিলারা কখনও বাহির মহলে যেতেন না—ওটা বাবুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মেয়েদের মহল তার অনেক পেছনে, দুটো দালান কাছারি বাড়ী আর ঠাকুর দালান পেরিয়ে। এখানে প্রায় সত্তর বছর আগে হরসুন্দরী তাঁর বাসা পেতেছিলেন, এখনও সেখানেই আছেন। সন্ধ্যার সময়ে বাহির মহলে এসে থাকার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। অথচ সুনন্দা এসেই বাইরের মহলে থাকে এতে তাঁর আপত্তি নেই। সময় বদলে গেছে। একালের মেয়ে অতীতের কালের বন্ধন মানবে কেন?

কিন্তু সুনন্দার এ খেলটা তিনি বুঝতে পারছেন না। জামাই চিঠি দিয়েছে, কাল সে আসবে। দু'দিন থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরবে। জামাই যখন নিজেই ঘাট মেনেছে, নিজেই যেচে এসেছে, তখন কি কঠিন হয়ে থাকা চলে? এমন অভিমান মেয়েদের সাজেনা।

'এমন ঘাট মানা কতবার হয়েছে!' খাটের উল্টো দিকের সতরঞ্জি ঢাকা তক্তপোষের উপর থেকে সুনন্দা বহুক্ষণ পরে এইবার প্রথম কথা বললে।

'ক্ষমা করতে শিখতে হয় রে, বুড়ী।' ঠাকুরমা একবার চোখ তুলে, নাতনীর মুখের উপর ক্ষীণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন। —'তোরা যে কতটা পেয়েছিস, তা বুঝিস নে। তাই আরও জোর করিস। আরও বেশি চাস্। কিন্তু প্রকৃতি তো বদলায় না। না মেয়ের, না পুরুষের। পুরুষ অত নিয়মে বাঁধা থাকবে না। মেকদ একটু লম্বা করে' দিতেই হবে। যথেচ্ছাচার না করলেই যথেষ্ট। তোদের কালের মেয়েদেরও এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তার চেয়ে বেশি জোরাজুরি করা চলবে না। অন্দর ছেড়ে তোরা বাইরে বের হয়েছিস, স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বেড়াস, ক্লাবে যাস। অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে বাধা নেই। সভাতে বসে গান করছিস, প্রাইজ দিচ্ছিস পুরস্কার বিতরণী সভায়। বহু স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খাচ্ছিস। বিলেতে যাচ্ছিস হাওয়াই জাহাজে চড়ে। স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর চেয়ে কম নয়। নিজের বাড়ীতে তোরা কর্ত্রী আর সামাজিক অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্মানের। আধুনিক ধনেশী সমাজের এই রীতির সঙ্গে আমাদের কালের ধনেশী সমাজের যদি তুলনা করিস, তবে বুঝতে পারবি কতটা তোরা পেয়েছিস।···তবে শোন, সে কথা তোকে শোনাই। আমাদের তিন জায়ের কথা।' বলে হরসুন্দরী নিজের বিছানায় নড়ে বসলেন।

'সত্তর বছর আগের কথা। জমিদার বাড়ীর বিয়ে। আমার একসঙ্গে তিন ছেলের বিয়ে। প্রকাণ্ড আড়ম্বর। খাওয়া দাওয়ার অন্ত নেই। যাত্রাগান, কবির লড়াই, বাই নাচ। প্রায় একমাস ধরে উৎসব চলল। আত্মীয় কুটুম্ব সব বিদায় হলেন ক্রমে ক্রমে। জীবনযাত্রা জমিদার বাড়ীর স্বাভাবিক স্তরে নেমে এল। তখন পেছনের অন্দর মহলে রইল সেল এক শাশুড়ী, তিন বউ আর অনেকগুলি দাসী। আর কেউ নয়।

বড় কর্তা থাকেন গঙ্গার ওধারের বাগান বাড়ীতে। কদাচিৎ এ বাড়ীতে খোঁজখবর করতে আসেন। তিন ছেলে থাকে এ বাড়ীরই বাইরের মহলে। তারা কখনও ভেতর মহলে আসেন; খোঁজখবর করতেও নয়।

রান্নাবান্না করে দাসদাসীরা, বাড়ীর ছোট বড় সব কাজই করে তারা। শাশুড়ী পুজোআচ্চা করেন, চাকর দাসীদের ধমকান, বউদের আদব কায়দা সম্বন্ধে উপদেশ দেন—এ রকম করবে না, ও রকম করবে বলে শাসন করেন; বরাদ্দমত শাড়ী গয়না নিজে পছন্দ করে কিনে দেন, কখনও-কখনও লম্বা ঘোমটা দিইয়ে, প্রকাণ্ড দুটো ওয়েলার ঘোড়ায় টানা ব্রহাম গাড়ীতে চাপিয়ে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বা কলকাতায় কোনও ধনী আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যান।

শাশুড়ীর আদর্শে বউয়েরা এটা খায় না, ওটা খায়না। এটা ছুঁলে চান করে, ওটা ঘাড়ের মাথার গঙ্গাজলের ছিটে দেয়।

এদিকে স্বামীরা যেমার সাহেব। সাহেবী সাজে সাহেবের পাড়িতে যাচ্ছে, মেমের সঙ্গে ফুর্তি মিলিয়ে কেউ কেউ নাচছে পর্যন্ত। এমন অখাদ্য নেই যা খাচ্ছে না। এমন পানীয় নেই যা পান করছে না।

তারা থাকে বাইরের মহলে। সেখানে মস্ত বাবুর্চি তাদের জন্য খানা বানায়, খোদমতগার বেয়ারা খিদমৎ করে। শোনা যায়, কখনও কখনও কলকাতা থেকে বাইজি নিয়ে আসা হয় রাত গভীর হলে।'

'তোমাদের নিজস্ব শোবার ঘর বলে কিছু ছিল না, ঠাকুরমা? সেখানে ঠাকুরদারা এসে কখনও শুতেন না।' সুনন্দা না প্রশ্ন করে পারলে না।

'শোবার আলাদা ঘর ছিল, কিন্তু স্বামীরা কখনও সেখানে আসতেন না।' হরসুন্দরী আক্ষেপলেশহীন কণ্ঠে বললেন। ক্বচিৎ কেউ অন্দরে ঢুকে মা-র সঙ্গে বা এর ওর সঙ্গে দু'চারটে মামুলী কথা বলে যেতেন। কিন্তু স্ত্রীদের সঙ্গে নয়। সেটা রেওয়াজ ছিল না; কখনও সে চেষ্টা করতেন না। করলেও বউয়েরা লজ্জায় পালিয়ে যেত। কিছুতেই এমন বেহায়াপনা সমর্থন করত না।

'স্বামীরা বাইরের মেয়ে নিয়ে থুকবে এটাই সবাই মেনে নিয়েছিল। বিয়েটা একটা পোষাকী ব্যাপার। এক বনেদী বংশের সঙ্গে আর এক বনেদী পরিবারের মিল।'

'কি যে বল, স্বামীদের সঙ্গে কখনও স্ত্রীদের দেখা হতো না?' অবিশ্বাসের সঙ্গে সুনন্দা বলল। ঠাকুরমা সব কিছুই একটু বেশী নাটকীয় করে তুলতে ভালোবাসেন, তা সে জানে।

'না, তা নয়। পুরোপুরি নয়। দু'এক সময় পাণ্ডুলী জোর করে' পাঠিয়ে দিতেন বাইরের মহলে .....কিন্তু স্বামীদেরই দোষ কি বল? এই ঘুপ্‌চুড়ীদেরই বা তাদের ভালো লাগবে কেন? লজ্জা, লজ্জা শুধু লজ্জা। আর নিষিদ্ধ খাদ্য মাংস পানীয়ের সঙ্গে ছোঁয়া লাগার ভয়। যারা এসব খান, তারা পর্যন্ত অস্পৃশ্যের পর্যায়ে। ভেতর বাড়ীতে ফিরে এসে চান করে ফেলতে হ'তো, তুলসীপাতা মাথায় ছিটোতে হ'তো। এমন ভাবেই এ বাড়ীর বৌয়েদের প্রথম থেকে তৈরি করা হয়েছিল। স্বামীরাও এসব হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চাইতেন না। তারা যা চান, বাইরেই তা পাওয়া যায়। তারা ফুর্তি করা করে বেড়াতেন। বাড়ীর মেয়েরাও এটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন। এতে দুঃখ পেতেও তারা ক্রমে ক্রমে ভুলে যেতেন। তারা এ-বাড়ীর বউ, এটাই তাদের গর্ব ছিল। আর কিছু তারা পান নি। আর কিছু দেবার কথা কেউ কখনও ভেবে দেখেনি।'

মধ্যরাত্রে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে শুয়ে সুনন্দা ঠাকুমার কাছে বিচরণ করে বেড়াতে লাগল। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠবার উপক্রম হলো। অস্পষ্টভাবে এসবই সে জানত, কিন্তু এত বিশদভাবে, ছোটখাট উদাহরণে এতটা প্রকট হয়ে তা কখনও আগে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। আশ্চর্য সইবার ক্ষমতা মানুষের; কত বড় ব্যর্থতা এরা সহজভাবে সয়ে এসেছেন। তার জন্য কোনও ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। জীবনটা নষ্ট হয়েছে, এমন মনেই করেন না।

সহসা সুনন্দার কল্পনায় বাধা পড়ল। তার নিজের খাটেই শুয়ে ছিল মিঠু, সে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। কতক্ষণ ধরেই সে ছটফট করছে; হয়তো সন্ধ্যাবেলায় হাওয়া দেখে এসে ভয় ঢুকে গেছে মনে।

তাড়াতাড়ি তার দিকে কাৎ ফিরে মাথায় মৃদু চাপড় দিতে দিতে সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কি হয়েছে? ঘুমো।'

'ঘুম আসছে না মা।'

'কেন। কি হয়েছে। ভয় করছে?'

'উঃ। কষ্ট হচ্ছে। বাবার জন্য মন কেমন করছে। কবে আমরা হায়দ্রাবাদে ফিরে যাব?...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সুনন্দা। মিঠুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, 'কালই তো আসছেরে বাবা। তার সঙ্গেই আমরা সবাই চলে যাব...'

মিঠু কিছু বলল না। শুধু হাত দিয়ে মাকে জোরে চেপে ধরলে।

পুরাতন পাতা

বাল্যস্মৃতি

সরলা দেবী চৌধুরাণী

[বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—বন্দে-মাতরম্। জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বরেণ্য দেশ-নায়ক বৃন্দ। প্রাণস্পন্দকর' সংকল্পের জোয়ার যেন দুকূল প্লাবিত করে বয়ে চলেছে।…সেই বিপুল যৌবনজলতরঙ্গের সামনে এসে দাঁড়ালেন অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী এক বঙ্গ-ললনা। বিদ্যুতের মতো চারিদিকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পুরুষের পাশে নিলেন তাঁর স্থান। অদম্য প্রেরণায় জনতার চলার পথে এক নতুন গতি সঞ্চারিত করলেন।…পথে দাঁড়িয়ে রাখি বাঁধলেন অচেনা ভাই-এর হাতে, প্রখর সূর্যকিরণ উপেক্ষা করে নগ্নপদে প্রতিবাদ মিছিলের সঙ্গে যোজনের পর যোজন অতিক্রম করলেন, বীডন স্কোয়ার কংগ্রেস সম্মেলনে দাঁড়িয়ে অশ্রুরুদ্ধ-বিম্বিত কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন —"অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান।'…স্তব্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত জনতা সেই মহীয়সী নারীর নামে জয়ধ্বনি দিল। "দেবী চৌধুরাণী" বুঝি সত্যই জন্ম নিয়েছেন বাংলা দেশে। সরলা দেবী চৌধুরাণী।…ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী, বীরাষ্টমীর প্রবর্তনকারিণী, বাংলার যুব-শক্তিকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষাদায়িনী, অগ্নি যুগের শ্রেষ্ঠ লেখিকা, কবি, লেখিকা, সাংবাদিক, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ, এক কথায় বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী সেই সরলা দেবী চৌধুরাণীর নাম আজ আমরা ভুলতে বসেছি। ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যারূপে সরলা দেবীর জন্ম। তেরো বছর বয়সে এনট্রান্স, সতেরো বছর বয়সে বি. এ পাশ করেন।…১৯০১ সালে পাঞ্জাবের আর্য-সমাজ নেতা পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরলা দেবীর কর্মক্ষেত্র বোম্বাই ও উত্তর ভারতে বিস্তৃত হল। স্বামীর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন তিনি।…১৯২৩ সালের ৬ই আগষ্ট স্বামীকে হারালেন কিন্তু তাঁর কাছে যে নতুন মন্ত্রের দীক্ষা পেয়েছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হলেন না তিনি। অব্যাহত গতিতে চলেছিল দেশের নবজাগরণে তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। ১৯২৬ সালে নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতির সভানেত্রী হয়েছেন। বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ-তে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে নেত্রিত্ব করেছেন। তাছাড়া নানাস্থানে সভাসমিতি পরিচালনা করেছেন অগণিত।…সাংবাদিকরূপে ভারতী ও বালকের পৃষ্ঠায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার ও কর্মদক্ষতার বহু স্বাক্ষর আছে। "ভারতীর" সম্পাদিকারূপে তিনি যে আদর্শের ও কৃতিত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন পৃথিবীর যে কোন দেশের যে-কোন মহিলা লেখিকার সঙ্গে তা তুলনীয়। বহু সাহিত্যিককে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁরই প্রেরণায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। শরৎচন্দ্রের প্রথম নাটক "যোড়শী" তাঁরই সম্পাদিত "ভারতীর" পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। …তাঁর বাল্যস্মৃতি নামে একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা উদ্ধার করে গল্প-ভারতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আজ উপস্থিত করতে আনন্দ বোধ করছি। —সম্পাদক গল্প-ভারতী।]

* * * *

আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিন বছরের আমি। সে সময়কার দুইটি ঘটনা মনে মুদ্রিত আছে। দাসীরা একটি দুরন্ত শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করাইতেছে। বালিকার সাবান-শিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দন ও মর্দনের দ্বারা ঘষিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অবাধ্য বালিকা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া তাহার অশ্রুসৌত সফেন জলের গতি অনুসরণ করিবার জন্য দুয়ের দরজার দিকে ছুটিতেছে। কেমন জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে কেমন এক কৌতুকরাজ্যে। দরজার দামনেটিতে মেজের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, তার ফুৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কেমন মজা দেখা যায়। রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারের পর সেখানে হঠাৎ কত আলো। আরো একটি কেমন আশ্চর্য জিনিস সেখান হইতে দেখিবার রহিয়াছে। ঠিক সেই সময় তারই মত আর একটি শিশুর স্নানক্রিয়া চলিতেছে। একটা মেম্ তার বাড়ীর উঠানে একটা মোড়ার উপর বসিয়া একটা সাদা ধবধবে ছেলেকে টবের জলে চুবাইয়া চটকাইতেছে—ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতেছে। পয়ঃপ্রণালীর অন্তরালবর্তিনী দর্শকবালিকা অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটির ঐ দিব্যি সাদা ছেলেটির আপত্তিসূচক ক্রন্দন ও চীৎকারই সবচেয়ে আমোদজনক লাগিত। তার তিন বছরের সুদীর্ঘ জীবনের বিজ্ঞতায় বুঝি মনে হইত—"কি ছেলেমানুষ! আমিত কাঁদিনা।"

নিজের সম্বন্ধে সব প্রথম স্মৃতি আমার ঐ কৌতুকময়ী। তিন বৎসর বয়সের আর একটি মাত্র ঘটনা আমার মনে আছে। শেয়ালদহ ষ্টেশনের লাইনে ৩।৪খানা খালি রেলগাড়ী পড়িয়া থাকিত। বিকালবেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকররা আমাদের কয়ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। একদিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল। সেদিন সেই অকস্মাৎ চলন্ত রেলগাড়ীর গতিতে বিস্ময়, আনন্দ, ভয় ও আগ্রহমিশ্রিত একটা তীব্র-ভাবের প্রথম নবীন তরঙ্গ শিশুহৃদয়ে খেলিয়া গেল।

যখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর, আমার পিতার বিলাত গমন উপলক্ষে, আমরা মাতুলালয়ে ছয় নম্বর জোড়াসাঁকোর বাটিতে দীর্ঘকালের জন্য বাস করি। আমার মামা ও মাসিদের ছেলেপিলে গণিয়া আমরা অনেক ভাইবোন। বয়সের ভিন্নতা অনুসারে আমাদের বয়স্কদলের ভিন্ন ভিন্ন থাক ছিল। খুব উঁচু থাকগুলির সবিশেষ খবর রাখিনা। কিন্তু আমার দিদির শ্রীমতী চিরস্মরীর বয়স্কদলটি ঠিক আমাই উপরের থাক ছিল; আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথের দলটি যদিও ছেলের দল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের সখ্য বেশী, তাই প্রায় আমাদেরই দলের আর একটি শাখা ছিল। দিদিদের দল আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেন। কিন্তু দাদাদের দলের সঙ্গে আমাদের চুলোচুলি কিলোকিলির প্রায়ই অদলবদল হইত।

দলগুলি প্রায়ই তিন-তিনজনে গঠিত ছিল। আমার দলের আমি সবচেয়ে কনিষ্ঠা, সুতরাং অল্পভাবে পরিচালিতা ছিলাম। আমাদের দলের যিনি মেজো ছিলেন তাঁকে আমি বড় ভাল-বাসিতাম, আর যিনি বড় ছিলেন তাঁকে ভয় করিতাম। তিনিই আমাদের পাণ্ডা। তাঁর দাসীদের মহলে ভারি প্রতিবিধি ছিল, সেইজন্য অনেক বিষয়ে পণ্ডিতা ছিলেন। প্রতিদিন অনেকটা সময় দাসীদের সঙ্গে যাপন করিয়া আসিয়া, নবনব জ্ঞানে পূরিত হইয়া তিনি আমাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। আর শুধু দাসদাসীদের কাছে কেন? খুব বড় ভাইয়ের দল খুব বড়বোনদের

দল—কোথায় কোথায় যে তিনি না ঘুরিতেন জানিনা, সর্বত্রই তাঁহার অবারিত গতি ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চয়ের আকর বহু ছিল। অশেষ বিষয়ে তিনি আমাদের নেত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

তাঁদের মহলে একটি ছোট কুঠরি ছিল। কোন কোন দিন আমরা তিনটিতে সেইখানে মধ্যাহ্ন যাপন করিতে যাইতাম। সেই কুঠরির তিনদিককার দেওয়াল অর্গলবদ্ধ থাকিত, একদিকে শুধু একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখা হইত। সেদিকটা গোলাবাড়ীর দিক, গবাক্ষের নীচে অনেকখানি খোলা জমি, উপরে খোলা আকাশ। তিন সখিতে এক দৌড়ে সেইঘরে আসিয়া, তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া—কবাট বন্ধ করার কারণ পাছে দিদিদের দল বা দাদাদের দল আমাদের বেদখল করিতে আসে—মেঝের পাতা ছোট বিছানার উপর যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া আসিলে, পণ্ডিতাদিদি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেন। সে কত অমূল্যতত্ত্ব! আমরা ছোট দুজনে ভক্তিভরে সবিস্ময়ে তাঁর সব কথা উৎকর্ণে শুনিতাম।

একদিন তিনি বলিলেন—"মরবার আগে কি হয় জানিস্?" আমরা বলিলাম—"না ভাই।"

তখন মরণ কি তাই জানিতাম না। আমাদের জ্ঞাতসারে কারও মৃত্যু তখনও সে বাড়ীতে হয় নাই।

তিনি বলিলেন—"মরবার একটু আগে আকাশ থেকে দুজন যমদূত নেমে আসে। তারা দেখতে ভয়ঙ্কর, শরীর প্রকাণ্ড, রং ঘোর কালো, লালপাড়ী ধাড়ী। তারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যে মরবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।"

আমাদের গা ছমছম্ করিতে লাগিল। আমরা শ্রোত্রী দুটিতে সভয়ে আমাদের ছোট ঘরের একটি মাত্র খোলা জানালার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জানলা অতি ক্ষুদ্র, তার ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড শরীর যমদূতের ঢুকিবার সম্ভাবনা নাই। কিছু আশ্বস্ত, তবুও অনেকটা ভীতভাবে আমার পাশের দিদির আর একটু গা ঘেঁসিয়া সরিয়া আসি বলিলাম—"এ রকম ছোট জানলা দিয়ে ত যমদূত ঢুকতে পারবে না?"

আমাদের তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী বলিলেন—"তা কেন পারবেনা? যমদূতেরা ইচ্ছে করলেই বড় শরীরকে ছোট করে যেখান সেখান দিয়ে যে সে ঘরে ঢুকতে পারে। যখন ইচ্ছে যাকে তাকে নিয়ে যেতে পারে।"

একটা নিরুপায় অসহায়তার ভাবে আচ্ছন্ন হইলাম। সেদিন যে তার পর কি করিয়া সেই ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারিনা। নড়িতে চড়িতে ভয়, উঠিতে পড়িতে ভয়—জানালার দিকে কেবলই সভিত চোরা দৃষ্টি—যদি দেখি জানলার ধারে যমদূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যদি আমরা এঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলে!

একদিন বিকালে আমরা বাড়ীর ভিতরের বাগানে খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ খুব হাওয়া উঠিল। আমাদের আজ্ঞাকারিণী নেত্রী—ইনি এখন ডেপুটি গৃহিণী—আজ্ঞা করিলেন—"ওড়ি ওড়ি চল্! ওড়ি ওড়ি চল্! এখনি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে!" আমাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—"কেমন করে জানলে?" কিন্তু তখন প্রশ্নাত্মক বিদ্রোহের সময় নাই—কি জানি এখনি যদি হাওয়ায় উড়ে যাই! সুতরাং আমরা ছোট দুটি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া সারা বাগানটা ওড়ি ওড়ি চলিলাম, খোলা বাগানের সীমা

অতিক্রান্ত হইলে ঘরণে আর বায়ু চলাচল নাই, সেখানে পৌঁছিয়া আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভাবী চাকির গৃহিণী তাঁর বহুমের গৌরবতায়, হাওয়ার মাথর উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে দাসীদের কাছে শ্রুত নানা সত্যমূলক কাহিনী বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করিলেন। পাপ-পুণ্য ও তার ও পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁর কাছে নানা তথ্যলাভ করিতাম। পুণ্যের কথা কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু কথায় কথায় পাপ করিতাম বোধহয়, কারণ পাপের দণ্ডভয়টা তিনি প্রায়ই দেখাইতেন। তিনি ঈশ্বরের হইয়া কতকগুলি নিজস্ব দণ্ডবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যার এক-আধটির ভিতর বাস্তবিকই তারি রঙ্গতা ও ভয়ানকতা আছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার নিজের, মানব ধর্মশাস্ত্রে তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন।

তিনি বলিতেন, কোন পাপ—যেমন বড়দের কথা না শোনা ঝগড়া করা বা মিথ্যা বলা একবার আচরিত হইলে তার জন্য ঈশ্বর ভবিষ্য-জীবনে প্রথমে খুব রকম অল্প শাস্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প শাস্তি—যেমন কিনা, সাধারণ শাস্ত্রে সচরাচর যাহা পাওয়া গিয়া থাকে,—নরকের আগুনে পোড়া, নরকের দূতেদের দ্বারা প্রহারিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পাপ যত বেশী করিতে থাকিবে, শাস্তির মাত্রা তত বাড়িতে থাকিবে। পাপের চূড়ান্ত শাস্তির কথা তিনি আমাদের কাছে যা ব্যাখ্যা করিতেন, সেইটিই তাঁর স্বকীয় বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তিনি শাসাইয়া বলিতেন,—খুব যদি পাপ করিস্ তবে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি এই হবে যে, ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধ সবাই মরে যাবে, তুই একা বেঁচে থাকবি।"

এই কথা বলিয়া আমাদের সবেমাত্র সংসারে আসা কচি মনে একটা ভয়ানক শূন্যতার উদাস শূন্যরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিতেন।

আমি একদিন তাঁর কথা মনে করিয়া, ছেতালার ছাদে উঠিয়া দিগন্তরেখার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই ভয়ঙ্কর শাস্তির দিন কল্পনায় দেখিলাম। যেন কেহ কোথাও নাই, আকাশে পাখী নাই, চিল নাই, বাহিরের ছেতালায় বড় মামা নাই; বাড়ীর ভিতরের ছেতালায় মেজমামীরা নাই; সেখানে আমার দিদি-দাদা নাই, মঙ্গলা দাসী নাই, রাজি দাই নাই;—বাড়ীর কোথাও কেহ নাই—নীচের অন্ধকার ঘরগুলার কোন কোণেও কেহ লুকাইয়া বাঁচিয়া নাই, ইঁদুরও নাই একটা পিঁপড়াও নাই, সামনে যে খোট্টাদের বাড়ী দেখা যায় তাদের ওখানেও কেহ নাই;—ব্রহ্মাণ্ডশূন্য, আমি একা রহিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল আমার যিনি শাস্তিবিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কোন এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁর কাছে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সেজন্য কোন আগ্রহ অনুভব করিলাম না, শাস্তিবিধাতার প্রতি কিছুই ব্যস্ততা বোধহয় নাই, তিনি আছেন ত আছেন! অথচ তন্মুহূর্তের জন্য একটা এই উপলব্ধি হইয়াছিল, তিনি আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ! শুধু আমার সত্তা আছে, আর তাঁর সত্তা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। ইহাতে তাঁর উপর রাগও হইয়াছিল, কেমন একটা একাত্মবোধও হইয়াছিল।

ঈশ্বর কিরাতবেশে অর্জুনের সব রোষ করিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁর স্বরূপ না জানিয়া তাঁকে স্পর্ধা করিয়া তাঁর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি ভাবি, অর্জুন যদি প্রথমেই জানিতে পারিতেন

তাঁর পথরোধক কে, তবে কি করিতেন? কবি কি তাঁহার হস্তকে অপটু করিয়া দেখিতেন, না তাহাতে বেশী বল দিতেন?

ছয় বৎসর বয়সে একা আমি শক্তরূপী ব্রহ্মাণ্ডপতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহা হইতে ভীত হইলাম না, তাঁহার শরণাগতও হইলাম না। তাঁর তথাকথিত কঠোরতম বিধানকে ফাঁকি দিবার ফন্দিই আমার অনুস্থির মস্তিষ্কে ঘুরিতে থাকিল। তাঁর পরমেশ্বর স্বরূপিনীকে আমি একদিন বলিলাম—"আমি কেমন করে একা বাঁচব? কি খেয়ে থাকব? আর কেউ যদি না বেঁচে থাকে আমাকে খাওয়াবে কে? তা'হলে তো আমিও মরে যাব।"—তাহাটা ঈশ্বর ত' তবে নিজের কাঁধে নিজে ধরা পড়িবেন। কিন্তু আমার সেই নিরীহ মুখে দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাতা সর্বজীবের অগোচর আমার ন্যায় পাপীর প্রতি দয়ালেশহীন বিধাতা বলিলেন—"তা হবে না। খাবার জিনিষ-পত্তর সব থাকবে। তোকে রোজ নিজে রেঁধে বেড়ে খেতেই হবে। বাঁচতেই হবে।"

কি নিষ্ঠুর বিধান!

ভাবিতে ভাবিতে আর একদিন একটা ফাঁকির পন্থা মনে মনে উদ্ভব করিলাম। স্ব-প্রণীত উদ্ভিজ্জ-খাদ্যে বিষুখী উক্ত দিদিরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম গোলাপ জামের বীচি বিষে ভরা খাইতে নাই, খেলেই লোকে মরিয়া যায়। আমি তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম—"ঈশ্বর যদি ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে মেরে ফেলে আমাকে একলা বাঁচিয়ে রেখে শাস্তি দেন, আমি সেদিন গোলাপ জামের বীচি খাব, তাহলে তো আমিও মরে যাব।" আমাদের ভয়ঙ্করী গুরুঠাকুরাণী ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিলেন,—"সেদিন গোলাপ জামের বীচিতে আর বিষ থাকবে না। তুই কিছুতেই মরতে পারবি নে।"

আমার উপায়কুশলতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত মানিল। এমন অমোঘতার সঙ্গে কে লড়িতে পারে?

বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিতেছিলেন—"আমাদের দেশে শিশুকে শৈশব হইতে ভয়ের দ্বারা ও ঈশ্বর নামক এক কল্পনার প্রতি নির্ভরপরায়ণতায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভারি ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিবিধানেচ্ছু হইয়া বেদান্তবাদী একটি শ্বেতাঙ্গিনী আলমোরার বেদান্তাশ্রম খুলিয়া সেখানে হিন্দু শিশুদের বেদান্ত সম্মত আত্মনির্ভরের ভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।"

বিবেকানন্দের অভিযোগ শুনিয়া আমার নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়াছিল, মানিয়াছিলাম সত্যই আমাদের কেবলই ভয়সমাকুল করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু সেই অতি শৈশবে যেদিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণীশূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, সেদিন আমার মন যেন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
দর্শম্ হ বিশ্বমর্ণতম্।"

সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধহয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।

রামচন্দ্রের দৈবী অস্ত্রের ন্যায়, এই সহজ স্বাবলম্বন প্রয়োজনের সময় স্মরণমাত্র আজীবন আমার সহায়তা করিয়াছে। ইহা মহত্ত্বে অভয়, শোকে সান্ত্বনা, মৈত্রে অক্লান্তি, তাপে তাপহরণ রূপে আমার

সেবা করিয়াছে। যখনি লতার মত লুটাইয়া পড়িয়াছি, ধূলিতে ধূসর হইবার সম্ভাবনায় বিলম্বিত হইয়াছি তখনি সে আবির্ভূত হইয়া আমায় তুলিয়াছে, ঝাড়াইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত যতই কেন বিক্ষুব্ধ হউক না, কেবল করিয়া অচিরে ধারণ্য সৌম্যযুক্ত করিয়া সকল ক্ষোভের প্রশান্তি করিয়া দিয়াছে। আমার এই ঐশ্বর্য দানের অংশ যদি আমার স্নেহের সকল বালক-বালিকার মধ্যে বণ্টন করিতে পারিতাম কৃতার্থ হইতাম।

আমাদের পরিবারে শিশুরা সর্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া আড়াআড়ি করিত। সবারই যে ভক্তি-জনকতায় তাঁর সঙ্গে আড়ি করিয়া থাকিতাম তাহা নয়। কখন তাঁহাকে ভয়মূর্তিতে দেখিতাম, আবার কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া যাইত, তাঁকে অন্তরঙ্গ সখাও মনে হইত।

শৈশবে স্বকৃত দুটি লজ্জারাঙা আচরণ আমার মনে ঢাকা দিয়াছিল। স্মৃতির গায়ে তাদের দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের দলটির মধ্যে যিনি মেজো, তাঁকে আমি ভালবাসিতাম বলিয়াছি। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন—অর্থাৎ দুই এক বৎসরের বড়, (সপ্তপতি-দিবিটি বছর চারেকের বড় ছিলেন) এঁরই সঙ্গে বেশী মিল ছিল। বাহির বাড়ীতে আমাদের পড়ার ঘর ও তাঁদের পড়ার ঘর পাশাপাশি ছিল, বাড়ীর ভিতরেও আমাদের ও তাঁহাদের মহল কাছাকাছি ছিল, তাঁর দাদারা আর আমার দাদা বন্ধু ছিলেন। আমরা অনেক সময় দাসীদের পাহারা এড়াইয়া এ উহার ঘরে নিজেদের পাথরের বেকাবীতরা জল খাবার লইয়া গিয়া খাইতাম। আমাদের আলু ভাজির সহিত উহাদের আখের গুড়ের সম্মিলন হইলেই তবে রসনা বেশী তৃপ্তি লাভ করিত।

ভোর হইতে না হইতে সব ভাইবোনেরা মিলিয়া ও-বাড়ীর বাগানে শিউলি ফুল তুলিতে যাইতে হইবে। তাই যে সেদিন আগে উঠিত সে অপরদের জাগাইয়া দিত। আমি একদিন আগে উঠিয়া উহাদের তুলিতে গেলাম। দশ দুই তফাতেই উহারা চারিটি ভাই বোনে শুইয়া আছেন, মধ্যে একজন দাসী আছে। তখনও ঘর অন্ধকার, সকলে নিদ্রিত। আমি মশারি তুলিয়া বিছানায় ঢুকিয়া আস্তাজে আস্তাজে দিদির দিকটাতে গেলাম। মনে মনে মতলব করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁর গালে চুপি চুপি একটি চুমু খাইয়া তাঁকে জাগাইয়া দিব। অন্ধকারে আন্দাজে হাতড়াইয়া দিদিকে যখন পাইলাম, তাঁর গালে ধীরে ধীরে ভারি ভালবাসার সঙ্গে একটি চুমু খাইলাম। "কে গা! কে গা!"—ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া একটা আওয়াজ হইল। ওমা—আমি করিয়াছি কি? দিদি ভাবিয়া বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিত চর্ম, অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু খাইয়াছি। সকলেই জাগিল এবং সকলেই আমার এই কুকীর্তি টের পাইয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যতটুকু ছিলাম, লজ্জায় তার চেয়ে আরও ছোট হইয়া গেলাম। এমন গলদ! তিনকড়ি দাসীকে চুমু খাওয়া! সেই লোল-স্তন মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর করা! বৃদ্ধা অতিশয় কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিল, তাকে আমরা শিশুরা কেহই ভালবাসিতাম না। কিন্তু সেদিন একটি ক্ষুদ্র বালিকার কুলকৃত স্নেহ ব্যবহারে তার প্রাণের কোন একটি তন্ত্রীতে বোধ হয় মুহূর্তের জন্য ঘা পড়িল। সে আমাকে কোলে টানিয়া—"কে? তুমি? এস মা এস"—বলিয়া আদর করিতে গেল। আমি তার এই আদরের ঘটায় সকলের বিদ্রূপ ভয়ে আরও অস্থির হইলাম। তারপর সকাল হইতে না হইতে সব দলের মধ্যে রটিয়া গেল আমি আজ ভোরে তিনকড়িকে চুমু খাইয়াছিলাম। দাদাদের দল আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দিদিদের দল সময় অসময়ে তিনকড়িকে দেখাইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন।

আমি যে অনবধানবশতঃ কত বড় দুষ্কর্ম করিয়াছি হাড়ে হাড়ে বুঝিতে লাগিলাম। তারপর হইতে তিনকড়ি বুড়ীটাকে দেখিলেই আমার সর্বাঙ্গ লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া যাইত।

আর একবার একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। তখনও মৃত্যুতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। এই পর্যন্ত জানিতাম যে কারও বাপ-মা মরিয়া যাওয়ার মানে এই যে সে বাপ-মার কাছে না থাকিয়া আর কাহারও কাছে থাকে। তাই আমি একদিন আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিলাম—"তোমার যদি তাই বাপ-মা মরে যান, আর তুমি আমাদের ঘরে সারাদিন থাক, সে বেশ হয়।"

আমাদের দলপতির দিদির কর্ণকুহরে আমার এই নির্দোষ মন্তব্যটি যেই পঁহুছিল, তিনি হুঙ্কারিয়া উঠিলেন—"কি বলছিস? দাঁড়া বলে দিচ্ছি সবাইকে।"

তিনি করিলেন কি, তৎক্ষণাৎ গিয়া ঘরে ঘরে সব অভিভাবকদের জানাইয়া আসিলেন। ঘরে ঘরে বড়দের বিচারাসনের তলে আমার তলব পড়িল। সকলে আমাকে গঞ্জনা দিলেন, লজ্জা দিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন—এমন কথা মুখে আনে!—এমন দুষ্টু মেয়ে। আমি নিতান্ত লজ্জাপীড়িত ও মর্মাহত হইলাম। শিশুর অস্ফুট মনের কাতরতা বড়রা বুঝিতে পারিলেন না। দিদিকে তারি ভালবাসি, সেই কথাটি প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, তাহাতে অন্যায়টা কোথায় হইয়াছে তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম না পারিলেও যখন ভর্ৎসিত হইতেছি তখন অজ্ঞানে একটা কিছু অন্যায় যে নিশ্চয়ই করিয়াছি তাহা বুঝিলাম। সেই পর্যন্ত নিজের অসাধুতা ও হীনতা সম্বন্ধে একটা তপ্ত জ্ঞানের অঙ্কুর বালিকার মনে উপ্ত হইয়া রহিল।

* * * *

খেলা বন্ধ থাকার পর সেবার দিলীপ রায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন বেশ দেখে ব'লে উঠলেন: "একী দিলীপ! তোমার এই বেশ কেন?"

দিলীপ রায় সলজ্জ জবাব দিলেন: "এতে সাধনের সুবিধা হয় কি না।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন: "সাধনের নয়, বলো প্রসাধনের।"

সাফল্য

সুশীল সিংহ

বন বাংলোর সাড়ী বারান্দায় ঝাঁপ দাঁড়ালে প্রথম যে লোকটি বাঁ হাতে সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে হরিণী যতটা অস্বস্তি বোধ করল ভয় পেল তার চেয়ে বেশী। লোকটার ডান হাতটা নেই। ডানদিকের সামে গর্ত। সারা মুখে সেলাইর দাগ। যে হাতে সেলাম করল সেই হাতের তিনটি আঙুল অর্ধেক নেই। ডান পাটা বোধ হয় বাঁ পায়ের চেয়ে আকারে ছোট; হাঁটে পা টেনে টেনে।

হরিণী—হরিণী নাম তার স্বামীর দেওয়া। আদরের নাম। মধুবনীর বন বাংলোতে মধুযামিনীতে আসা উপলক্ষে তাঁকে এই নামটাই বিশেষভাবে দিয়েছে তার স্বামী। সহরে ফিরে হয়তো অন্য আর এক নামে ডাকবে। অন্য কোন আদরের নামে। নব যে নব, নিত্যই নব—কবিতায় বলছে যে!

স্বামী আদিত্যবর্ধ সেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একজন নামকরা মানুষ। সার্থকনামা বলতে হবে—পুরুষের এমন রূপ বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তাকে ঘিরে থাকা নানা স্তুতি অনুনয়। তিনি কি করেন, তিনি কোথায় কখন যান, কেন যান, তাঁর মনের সাধ কি, সাহিত্যের কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাম্য, এই সব নানা সহজ ও কঠিন বিষয়ে তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা। এমনকি তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দিবিতির কাছাকাছি মধুবনীতে মধুযামিনীতে আসছেন সে কথাও জানাজানি হয়ে গেছে। কোন একটি সিনেমা পত্রিকা সোল্লাসে সেই সংবাদ ছেপে ধন্যও করেছে: আমরা আশা করবো মধুবনীতে মধুযামিনীর শেষে কলকাতায় ফিরে এসে আদিত্যবর্ধ সেন অরণ্যচারী এমন কোন মানুষের চরিত্র অথবা কাহিনী উপহার দেবেন, আমাদের সাহিত্যে যা পরম গর্বের বস্তু হয়ে থাকবে।

এমন যার রূপ, এত যার নাম—তাকে মনের কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলতে না পারলেও হরিণী একবার কোনমতে বলেছিল, মধুবনীতে না হয় পরে যাব কোন সময়। এখন চলো না অন্য কোথাও যাই, যেখানে বেশ অনেক লোকজন আছে।

আদিত্যবর্ধ বলেছিল, মানুষ দেখতে যাচ্ছি বলেই তো বনে যাবো। যেখানে অনেক লোকজন সেখানে কেবল ভীড়। এখানে দেখবে গভীর বন বন। তার মাঝখানে একটা লোক দেখবে যে বাঘ মেরেছিল।

—তাকে দেখতেই যাচ্ছো বুঝি?

—না। না। বাঘ যে মেরেছিল তার গল্প তো বাঘ মারার সঙ্গেই শেষ হয়েছে। আমি দেখতে যাচ্ছি কলিকাপ্রসাদকে। অদ্ভুত লোক। গল্প যা শুনেছি তাতে আমার বিশ্বাস হয় না আজকের দিনে এমন কোন মানুষ থাকতে পারে।

—বিশ্বাস হয় না কেন? লোকটাকে তো তুমি দেখোনি—

২-১.০২২

—তাই দেখতে যাচ্ছি। বাঘ মারার জন্তে শরীরের মনের যে জোর লাগে কালিকাপ্রসাদ হতে বলে জোর লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি। দেখে আসি। দেখবে বন তোমার ভালো লাগবে। কেমন হরিণীর মত সাদুপাদার কালোছায়ায় ঘুরে বেড়াবে সারাদিন, গুণ গুণ করবে, আর মাঝে মাঝে আমার পাণ্ডুলিপি পড়বে আর বলবে, কি ভালো! কিংবা বলবে, তাই আবার হয় নাকি! নয়তো বলবে, কি বিশ্রী!—কি বলো, হরিণী?

এই মানুষটিকে দেখতেই কি এতদূর আসা? হরিণী মনে-মনে ভাবল—এমন বীভৎস চেহারার একজন মানুষ—যাকে দেখে ভয় ভয় আবার কেমন যেন ভয় ভয় করে। এই কি কালিকাপ্রসাদ?

ইতিমধ্যে আদিত্যবর্ধ জীপ থেকে নেমে লোকটির খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমিই তো অনুরাধ?

—জী।

—তুমিই তো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলে?

—জী।

—বাঘ মেরেছিলে?

—জী।

—সাবাস।

লোকটার দুই কাঁধের উপর দুই হাত রেখে সামান্য ঝাঁকি দিল আদিত্যবর্ধ। লোকটা পড়ে যাচ্ছিল। আদিত্যবর্ধ তার কোমরে হাত দিয়ে সামলে দিল।

বসে বসে অবাক চোখে দেখল হরিণী।

এও আদিত্যবর্ধর এক নিজস্বতা। যে-কোন মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করা। সাধারণ মানুষ, সংসারী মানুষ, একপাশে পড়ে থাকা মানুষ—সবাইর সঙ্গে সে মেশে, সুখ দুঃখের কথা বলে, তাকে সহজে আপনার করে নেয়। তার বন্ধুদের মধ্যে যারা তার গুণগ্রাহী তারা বলে, আদিত্য চরিত্র সৃষ্টি করার আগে তার মডেলকে জড়িয়ে ধরে যতদূর পারে তার ভিতরটা, সেই জীবন্ত মডেলের অস্থি, মজ্জা, রক্ত জেনে বুঝে নেয়, অনুভব করে—তারপর লেখে। তার সাকসেস্ ওইখানে।

যারা তার অবিমিশ্র প্রশংসা করে না তারা বলে, লোকটার চেহারাই ঘাৎ করার মত। অমন রূপ নিয়ে যার সঙ্গে আলাপ করে সেই তিনদিনের দিন পেটের কথা খুলে বলে। তারপর সেই সব নিয়ে ও ভালো ভালো বই লেখে। চেনা লোকের দোষ গুণের সঙ্গে নিজের ভেবে নেওয়া দোষ গুণ জুড়ে ও মনোমত সিচুয়েশন খাড়া করে ও ককটেল করে। ও সত্য প্রকাশের ভান করে। হাততালি পায়। আসলে ও চালাক শুঁড়ি। ওর সাকসেস্ ওইখানে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে অপ্রশংসার ব্যাপারে আদিত্যবর্ধ বিশেষ স্পর্শপ্রবণ লেখক। যেহেতু সে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু সহ্য করতে পারেনা, তাই সে নিজের এই কথাগুলো অহরহ মনে রাখে; কিন্তু সে এ্যাবসিসাস লেখক। পাল্টা প্রচারে সে কখনোই নিরুৎসাহ নয়—সক্রিয়। বর্তমানে তার জোগান হল, সেই সব মানুষের কথা লিখতে হবে যারা বাস্তবে নেই, অথচ যারা থাকলে এই পৃথিবী ঘটটা খারাপ তার চেয়ে কম খারাপ হতো।

আদিত্যবর্ধ সাহিত্যে গাঢ় স্বরে বলে, বর্তমানের চোখে অবাস্তব অথচ যা প্রার্থিত বাস্তব সেই সব মানুষ সেই সব সংগ্রাম, আদর্শ ইত্যাদির কথা লেখাই সার্থক সাহিত্যের কাজ।

সম্প্রতি অত্যন্ত অস্থির ভাবে তাকে এই সব কথা বারবার বলতে দেখে তার ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, মহৎ সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত বেদনা স্রষ্টার মনে বন্ধমূল হওয়া উচিত আদিত্যর মনে এখন তার অনেকগুলিই কাজ করছে।

সব শুনে হরিণী মনে মনে বলেছে, হবেও বা।

অরণ্যের অন্তঃপুরে সেই বাংলোয় ওদের নামিয়ে দিয়ে জীপ নিয়ে চলে যাবার আগে সেলাম করে ড্রাইভার জানতে চেয়েছে, আবার কখন আসবো? আমার ওপর হুকুম আছে, আপনার কথামতো যেতে।

আদিত্যবর্ধ তাকে আগামীকাল বিকেলে আসতে বলে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অন্ধুরামের বৌ এসে ওদের বিছানা ও অন্যান্য জিনিষপত্র, কুকার ইত্যাদি নানা টুকিটাকি ঘরের ভিতর নিয়ে গেছে। অন্ধুরামের বৌ এসেছিল গলা পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে। কাজে ও হরিণীর সঙ্গে কথায় কথায় তার নাকের পেতলের নোলক একসময় বার হয়ে পড়েছে। ওর দুই ছেলে ঘুরছে ওদের পায়ে পায়ে। অন্ধুরাম ভারী জিনিষ ওঠাতে নামাতে পারে না। তবু স্যুটকেশটা নিয়ে যাবার সময় ও হাতলে কব্জী ঢুকিয়ে দিয়ে কনুইয়ের ভাঁজের ওপর সেটা ঝুলে নিল।

হরিণী বলেছিল, আহা থাক্ না।

অন্ধুরাম বলেছিল, আপনারা আমার মালিকের মেহেরবান। আমার মালিক। আমি পারবো।

অন্ধুরাম যখন স্যুটকেশ তুলল তখন আদিত্যবর্ধ কোন কথা না বলে লক্ষ্য করল তার উন্নসিত পেশী। সন্দেহ নেই যে মল্লযুদ্ধে শের মারার মত শক্তি ছিল লোকটার। বাহাদুর।

সারা বাংলো পরিষ্কার, ঝকঝকে। বন বাংলোর স্নানঘরে বাথটাব হরিণীর পক্ষে বিস্ময়। খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল পাতা। এক সঙ্গে জন কুড়ি লোক সমারোহ করে আহার করতে পারে এই ঘরে। মাথার কেরোসিনের ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। একটা ঘরে কাঠের পাটা পাতা। চারপাশে গ্যালারী। অন্ধুরামের বৌ জানাল, কলকাতা থেকে মালিক এসে কদিন থাকলে এ ঘরে বাইজীর নাচ হয়। আদিত্যবর্ধর পক্ষে এসব কোন বিস্ময় নয়। সিরিডির কোন এক মাইকা মাইন্স্'র মালিক, কলকাতার অনেক ধনীর মধুবনীর বন বাংলো মোটামুটি এমনি হবে এতো জানা কথাই। হরিণী বিত্তাস্ত সরল, অনভিজ্ঞা। আদিত্যর চেয়ে বয়সেও অনেক ছোট। আদিত্যবর্ধর বহু দেখা চোখ। তার বিস্ময় অন্যত্র।

অন্ধকার নামছে মধুবনীতে। আকাশে যখন আসন্ন আঁধারের আড়ালে গাঢ় রক্তরাগ তখন থেকে ছায়া চুপি চুপি বুকে হাঁটছে মাটিতে। শাখায় শাখায় ডানা ঝাপটাচ্ছে, পরস্পর পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে পাখীরা। এখনো কেরেনি কালিকাপ্রসাদ। সে নাকি দূরের সহরে রোজ জনমজুর খাটতে যায়। ফেরে রাত্রি হলে। একা হেঁটে আসে বনের ভিতর দিয়ে।

বাংলোর বারান্দার ডেক চেয়ারে বসে নতুন প্যাকেট খুলে আদিত্যবর্ধন জহুরামের দিকে এগিয়ে দিল। জহুরাম নিজেকে গুটিয়ে আছে দেখে আদিত্য বলল, খাওনা নাকি?

—খাই। তবে আপনার সামনে—

—ঠিক আছে। নাও তো। আমি দিচ্ছি নাও। তোমাদের এখানে কদিন থাকবো, তোমাদের নিয়েইতো থাকবো। আমার কাছে আসবে না, আমার সামনে বসা করবে না, কেবল সেলাম করবে, তাই হয় নাকি? সেলাম কেলাম আমার ভাল লাগে না বাপু।

জহুরাম হাসিতে দাঁত বার করে সিগারেট তুলে নিল।

আদিত্যবর্ধন বলল, আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?

জন্তুর মুখে নিজের সম্পর্কে এই সব স্তুতি শুনতে আদিত্যবর্ধনের এত ভালো লাগে!

—তোমরা এখানে কে কে থাকো জহুরাম?

—আমি। আমার স্ত্রী। দুই ছেলে, আর—

—কালিকাপ্রসাদ।

—জী। আমাদের নাম আপনি জানলেন কি করে?

—জানি, জানতে হয়। আমি তোমাদের কথা কত শুনেছি। কতদিন তোমাদের কাছে আসবো ভেবেছি। এরপর দেখো কলকাতার কাগজে তোমার বাঘ মারার গল্প সবাইকে শোনাব। সবাই তোমায় চিনবে। তুমি যে বাহাদুর।

এই কথায় অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল জহুরাম। তারপর কেঁদে ফেলল।

ঘরের ভিতর তখন গৃহিণীর কাছে তার স্বামীর বাঘ মারার গল্প করতে করতে তার বৌ কাঁদছিল।

আদিত্যবর্ধন বলল, কাঁদছো কেন? কেঁদোনা। কেঁদোনা।

জহুরাম বলল, ইয়াদ করে বাবুজী। কি ছিলাম, কি হয়েছি। তাই চোখে জল চলে আসে।

—আচ্ছা জহুরাম, তোমার চলে কি করে?

—ভগবান মালিক, তিনি চালান। এই বনের চাকরী এখনো বজায় আছে। মালিক দয়া করে রেখেছেন।

—কাজ করতে পারো?

—আমিতো করিনা। কাজ যা করার কালিকাই করে। আমি মাইনে পাই। সে সময় পেলেই সহরে খেটে পয়সা আনে। এখন তো সীজন্ নয়। এখন বেজ যায়।

—তুমি এই বনে ক'বছর আছো জহুরাম?

—চৌদ্দ বছর।

—বাঘ মারলে কবে?

—চার বছর আগে।

—বনে কি প্রায়ই বাঘ বার হয় নাকি?

—জী না। সেই বললেই চলে। কোথা থেকে ছিটকে চলে এসেছিল। খুব জোয়ান ছিলনা।

এই তোরা চৌদ্দ পনরর ছেলেরা যেমন মানুষের ঘরে হয়, অমনি আর কি! আমি জানতাম না বলে বাঘ আছে।

—তুমি কি একলা গিয়েছিলে?

—না আমার সঙ্গে কালিকা গিয়েছিল।

—সে কি তোমার কাছেই বরাবর থাকে নাকি?

—না। ও আমার এক বন্ধুর মেয়ে। আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল। আমি ওকে বন দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার হাতে চকচকে তোজালি ছিল। আমি বার হলেই ওই অস্ত্রটি হাতে রাখতাম। কালিকা অবশ্য খালি হাতেই যায়। ছেলেটা যেন কেমন সন্ন্যাসীর মতন!... যা বলছিলাম বাবুজী। আগের রাত্রে একটু বর্ষা হয়েছিল। আমরা খেয়েছিলামও খুব। কালিকার পেট সেদিন সকাল থেকে তেমন ভালো ছিল না। আমি ওকে সেদিন যেতে মানা করেছিলাম। ওর তখন কতই বা বয়স হবে—উনিশ বিশ। জিদ ধরল। আমি নিয়ে গেলাম। একেবারে জঙ্গলের ভিতর চলে গেলাম। আপনি যদি যান তাহলে দেখবেন ভেতরে এক জায়গায় একটা ছোট্ট নদীর মত আছে। তার চার পাশে অনেক পাথর আছে। ওখানে অনেক মাছ পাওয়া যায়। আমি ছেপ ধরেছি। এখন কালিকাও ধরে। আসলে সেই বাঘটা নদীতে এসেছিল—

আদিত্যবর্ধ টের পাচ্ছিল সেই বাঘ মারার গল্পটা আরম্ভ হয়ে গেছে। অথচ সে ঠিক এই ভাবে শুনতে চায় না। পরিবেশ, এ্যাটমশফিয়ার যেন জমে ওঠেনি। যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় বাঘ আসবে আর মারা পড়বে। অরণ্যের আলোছায়া, জঙ্গের কথায় রোদের ছটা, পিঙ্গল চোখ, ডোরাকাটা শরীর, এই সব অনুষঙ্গ যেন অদৃশ্য থেকে যাবে। তাই এইভাবে গল্পটা শুনতে তার ইচ্ছে ছিল না। নেইও। যেখানে বাঘ দেখা গিয়েছিল, আক্রান্ত হয়েছিল যে, লড়াই করেছিল যে, এই দু'জনকে স্পটে দাঁড় করিয়ে গল্পটা শুনবে—এই তার অভিলাষ।

আদিত্যবর্ধ বলল, যেখানটায় লড়েছিলে আমায় সেখানটায় নিয়ে যেও তো। আমি দেখবো জায়গাটা। কেমন?

অশিক্ষিত অনুরাম বুঝল বাবুর এখন মনোযোগ নেই।

আদিত্যবর্ধ মনে মনে ভাবছিল সেই সাহিত্য সমালোচকের কথা যিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, মহৎ সৃষ্টি করার জন্য স্রষ্টাকে অন্তরে মহৎ হতে হবে। ভিতরে সাত্ত্বিক হওয়া চাই। সেটি সহজ ব্যাপার নয়। বর্তমান সাহিত্যের চরিত্রগুলোই কেবল আকারে প্রকারে ছোট তাই নয়, যাঁরা তাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁরাও সমান ভাবে আকারে প্রকারে ছোট।

যিনি এ কথা বলেছেন সমালোচক হিসেবে অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আর তাই প্রশংসা অপ্রশংসার ব্যাপারে স্পর্শপ্রবণ আদিত্যবর্ধ মনে মনে কথাটা বিশেষভাবে নিজের ওপর নিয়ে বসে আছে। তার ভাবখানা হল: অপেক্ষা করো। দেখিয়ে দেবো।

আদিত্যবর্ধ ডেক-চেয়ারে। অনুরাম মেঝেয়। ওর দুই ছেলে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুর ঘুর করল। তারপর এক সময় উধাও হয়ে গেল। হরিণী এলো। হরিণী গেল। আবার এল। অনুরামের বৌ কলসী ভাঙল। অনুরাম উঠে গেল কোন ফাঁকে। অনুরামের বৌ জল তুলল। সময় সরে সরে গেল। গাছের মাথায় মাথায় নিবিড় ঘন অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রগুলোকে মালার মত দুলিয়ে দিল।

আদিত্যবর্ধ একটি কথাও বলল না।

কিছু ক্লান্তিতে কিছু ভয়ে হরিণী বারবার তার স্বামীকে ঘরে ডাকতে লাগল। ইচ্ছে এবার ঘুমিয়ে পড়ে রাত ভোর করে দেয়। বিছানায় যাবার আগে আর একবার অছুরামকে তলব করল আদিত্যবর্ধ। খবর নিয়ে জানল কালিকা এখনো ফেরেনি, আগামী কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা না করে কালিকা যেন কোথাও না যায়।

অছুরাম জানাল, জী, সাব। কোথাও যাবে না।

রোজ সন্ধ্যায় সিদ্ধি খায় অছুরাম। ওর লাল মুখে তখন সেই নেশার দাগ ঝুলছিল।

তারপর রাতে অরণ্য ওদের শিয়রে জেগে রইল। ভাঙা চাঁদের ম্লান আলোয় পাতার মর্মর, রাতচরা পাখী, বনমুরগীর ডাক একটা শিহরণের মত বারবার হরিণীকে চমকে দিল। তারপর একসময় যখন তার দুই চোখ তন্দ্রায় বুজে এলো তখন আদিত্যবর্ধ খুব ধীরে ধীরে তাকে জাগিয়ে দিল। চাপা গলায় বলল, দেখবে এসো।

স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে হরিণী দেখল বাংলোর অদূরে যেখানে আউট হাউস, যেখানে কাঁপায় অছুরাম থাকে সেখানে বাইরে একটা কেরোসিনের ডুপি জ্বলছে। পীতাভ আলো পড়ছে অছুরামের স্ত্রীর মুখে। তার মাথায় কাপড় নেই। কুয়ো থেকে একটা লোক জল তুলছে। ঘড়ি নামিয়ে বালতি তোলার শব্দ হচ্ছে। জল তোলা হলে হাত মুখ ধুয়ে ফেলল লোকটা। তারপর খেতে বসল। লোকটা যখন খাচ্ছিল তখন তার সামনে বসল অছুরামের বৌ।

ফিসফিসে গলায় আদিত্যবর্ধ বলল, দেখলে?

—কি?

—ওই কালিকাপ্রসাদ।

॥ দুই ॥

পরদিন সকালে কালিকাপ্রসাদ এসে সামনে দাঁড়াল সেলাম দিয়ে। মাথায় মাঝারিমাপ। স্বাস্থ্য দোহারা হলেও বলিষ্ঠ। আধময়লা হাফ প্যান্ট আর সার্ট গায়ে। মাথায় টুপিতন। তাতে একটা ফুল বাঁধা। পায়ে তালিমারা ক্যাম্বিসের জুতো। দাম হয়ে গেছে। কপালে মাটির তিলক। বোধ হয় সকালে পূজো করেছে। অছুরামকে যেমন, কালিকাকেও সিগারেট বাড়িয়ে দিল আদিত্যবর্ধ। কালিকা মাথা নাড়ল।

—খাওনা নাকি?

—না। খাই।

—তবে আর কি। লজ্জা কি আছে? আমি বলছি নাও। আর দাঁড়িয়ে কেন, বসো তো বাপু,—

প্যাকেটটি বাড়িয়ে ধরল আদিত্যবর্ধ।

কালিকা বসল সামনে। তবে সিগারেট নিল না। বলল, আমি কারো কাছে কিছু নিই না।

কথাটা কেমন যেন অহঙ্কারের মত শোনাল। আদিত্য এমন একজন মানুষের মুখে এমন দারুণ কথা এত সহজে বলা হবে একবারও আশা করেনি। তার অনেক দেখা চোখ, ঠিক এমন দেখেনি। যে ভাবে আলাপ করবে বলে ভেবে রেখেছিল সেভাবে চালাতে পারল না। লোকটাকে আঘাত করতে মন চাইল তার। বলল, তোমার মালিক এলেও কি তুমি বাইরে কাজ করতে যাও নাকি?

—জী না, কাল গিয়েছিলাম, আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি যে ক'দিন থাকবেন, কোথাও যাবো না।

—আরে না, না। আমার কথাটা মনে হলো, বললাম। যেও। আমি কিছু মনে করবো না।

মনের ভিতরের ভাব যথাসাধ্য গোপন করে চতুর অভিনেতার মত আদিত্যবর্ণ বলল, আমার যে একটা মুস্কিল হয়েছে। সিগারেট আনতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে বলো ত?

—সহজে।

—এনে দিতে পারো?

—নিশ্চয়।

দশটাকার নোট নিয়ে সিগারেট আনতে চলল কালিকাপ্রসাদ। যেতে আসতে মাইল পনেরো রাস্তা এই বনে বনে রোদ মাথায়। যাওয়া আসা হেঁটে। ইচ্ছে করেই পাঠাল আদিত্যবর্ণ। দেখতে হবে কারুর কাছে কোন কিছু নেয় না, সেটা তার ফাঁকা বুলি না সত্যি কথা।

চলে গেল ঘাট তবু যেন আদিত্যবর্ণকে চিন্তায় ফেলে গেল লোকটা। লোকটার সম্পর্কে শোনা ছিল। বোঝা গিয়েছিল পাঁচজনের থেকে আলাদা। এখন দেখে মনে হল গোঁয়ার। মনে হল বোকা। অথচ এই সব কথায় মনটা মানল না, লোকটার চেহারায় পোষাকে কোথাও কিছু নেই অথচ দুটি চোখে এমন কিছু আছে যা দেখে তাকে তুচ্ছ করা যায় না। মনে হয় লোকটা যেন কাছে থেকেও অনেক দূরে। যেন কোন সুদূরের বাসিন্দা।

নানা অচেনা চরিত্র নিয়ে বহু বিচিত্র গল্প লিখেছে আদিত্যবর্ণ সেন। মহাবলীপুরমের মন্দির প্রাঙ্গণে দেবদাসী সেই মেয়েটি, কামাক্ষার সেই পাণ্ডা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আনন্দবাজারের সেই বিপনী—নতুন পটভূমিতে নতুন চরিত্র এনেছে সে বাংলা সাহিত্যে। কোন কোন সমালোচকের মতে সে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল পাল্টিয়েছে। শুধু ভূগোল? চরিত্র? তার চোখ আর অনুভূতিকে ফাঁকি দেবে, যে কোন চরিত্রের সেই সাধ্য আছে নাকি? মানুষের ভিতরের চেহারাটা কেমন ডোরাকাটা তাইতো আদিত্যবর্ণ দেখায়। আপাতদৃষ্টিতে যে ভালো অন্তে সে কত খারাপ। আর যে লোকটা এমনিতে শয়তান তার অন্তরেও কত প্রেম। আদিত্যবর্ণর ভক্তরা বলে, মাইরি। লোকটার লেখা পড়লে চোখ খুলে যায়। মানুষকে বোঝে কার সাধ্যি। বোঝাই যায় না। কিসসু বোঝা যায় না। কিসসু না।

সেই আদিত্যবর্ণও কালিকাকে বুঝতে পারছে না। ধরতে পারছে না। তার চেয়েও বড় কথা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসছেই না লোকটা।

সিগারেট নিয়ে কিরল প্রায় তিন ঘণ্টা পর। দুটি প্যাকেট ও দশ টাকার বাকী নামিয়ে

রাখল আদিত্যবর্ধর সামনের টেবিলে, বাকী সবটা অর্থাৎ সাড়ে ছটাকা তার দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে আদিত্য বলল, তোমার।

কালিকা বলল, আপনি মালিকের বন্ধু। আমাদের মালিক। আমার কাজ করেছি। বখশিস্ চাইনা। মাফ করবেন।

অহঙ্কারী আদিত্যবর্ধ দপ্ করে জ্বলে উঠতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। লোকটা বলে কি? নিতান্ত লোকটা বাংলা সাহিত্যের পাঠক নয়। হলে জানত যে কত বড় একজন লোক তার কাছাকাছি আমার জন্য সাধছে।

বলল, কারো কাছে কিছু নাওনা কেন?

—আর কতো নোব বাবুজী। একজন লোক কেবল তার আনটুকু বাদ দিয়ে আর সব দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে। বেঁচে আছি মানুষ বাঁচিয়েছে বলে। আর কি কিছু নেওয়া যায়? আমি আর কারুর কাছে কিছু নোব না।

বাবে! কত সহজে বলল কথাগুলো। কত সহজ—এত অনায়াসে যে এমন কথা বলা যায় তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত। উত্তরে কোন কথা গেল না আদিত্যবর্ধর। আর একবার দেখল লোকটার চোখ দুটো।

কালিকা বলল, যদি অনুমতি করেন তবে বনের ভিতর থেকে আপনাদের জন্য মাছ ধরে আনি।

—এনো।

জীপ এলো বিকেলে যথাসময়ে। আদিত্যবর্ধ আর হরিণীর সঙ্গে তাতে চড়ে বসল জহুরামের গোটা পরিবার। কালিকাপ্রসাদ রইলো বাংলোয়। জহুরাম আর তার বাচ্চারা ও তাদের মা একবারও ভাবেনি যে তারাও গাড়ী চড়ে বনের বাইরে সহরে বেড়াতে যাবে। হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত কলরব করতে করতে তারা জীপের পিছনে ঠাসাঠাসি করে বসল।

জীপ চলে গেলে বাংলোর এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে ঘুরে কালিকাপ্রসাদ দেখল এখানে একটা আংটি পড়ে আছে, ওখানে সোনার রিং, কোথাও কাঁচা টাকা। কালিকা একবার ভাবল সোনা আর টাকাকড়ি যেখানে যা আছে তুলে নিয়ে একধারসার রেখে দেয়। কি ভেবে সে সেদিকে হাতও দিল না।

রাত্রি প্রায় আটটার কাছাকাছি ওরা সবাই ফিরে দেখল কালিকা শিলের উপর সিদ্ধি বাটছে।

আদিত্যবর্ধর প্রশ্নের উত্তরে বলল, জী। চাচার জন্যে। না হলে তো কুরুক্ষেত্র করবে।

রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হরিণী বলল, দেখলে তো। আমি বলেছিলাম না লোকটা ভালো। হাতে করে ছুঁয়েও দেখেনি। মুখে বললেও না একবার। তুমি যেমন। কি গো শুনতে পাচ্ছো?

—পাচ্ছি।

—আর জানো?

—কি!

—আজ জীপে করে আমাদের জহুরামের বৌকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি।

—কেন?

—জীপ অত লাফায়।

—তাতে কি ?

—ওর যে শরীর খারাপ !

—শরীর খারাপ মানে ? ঘাচ্ছা কাচ্চা হবে নাকি ?

—যাঃ !

—অকস্মাৎ আদিত্যবর্ধ আদরে জড়িয়ে ধরল হরিণীকে। বলল, চমৎকার খবর এনেছো, চমৎকার। আমার গল্প হবে। বলোতো হরিণী আমরা যখন ফিরে এলাম তখন কালিকা কি করছিল।

—নিজেই তো বললো, চাচার জন্যে সিদ্ধি বাঁটছে।

—ঠিক।

॥ তিন ॥

তারপর পর পর দুটো দিন আদিত্যবর্ধ কাটাল অস্থিরভাবে। বহুবার সে কাগজপত্র নিয়ে বসল। খস্ খস্ করে লিখল। কাটল। আবার লিখল। লেখা শেষ হল না। পঞ্চম দিন সকাল বেলায় আদিত্যবর্ধ কালিকাকে নিয়ে চলল ঘাটে। বাঘ সেখানে চার বছর আগে কালিকাকে আক্রমণ করেছিল। অনুরাম সেখানে বাঘ মেরেছিল। চলল তারা দুজন। অর্থাৎ আদিত্য ও কালিকাপ্রসাদ।

অনুরামের বর্ণনার মত ছোট্ট নদী দেখা গেল। ছড়ানো ছিটোনো পাথর। কালিকা যে জায়গায় পিছন ফিরে বসেছিল, অনুরাম ঝাঁপিয়ে এসে কেমন করে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল, তারপর লড়াই সুরু হল—বলল বটে, তবে যে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাত পা ছুঁড়ে চোখ বড় বড় করে প্রত্যক্ষদর্শী বাঘের সঙ্গে লড়াইর গল্পকে জীবন্ত করে তোলে কালিকাপ্রসাদ তেমন কিছুই বলল না। ঠাণ্ডা ভিজে গলায় ছেড়ে ছেড়ে সে গল্পটা শেষ করে বলল, এখন কি ফিরে যাবেন ?

আদিত্যবর্ধ শেষ চেষ্টা করার মত বলল, রক্ত বার হয়নি ?

—ভীষণ। ভাত ফোটার সময় যেমন বক্ বক্ করে ফোটে অনুরামের শরীর থেকে তেমনি করে রক্ত পড়ছিল। চোট লেগেছিল কালিকারও। খুন বার হচ্ছিল। সেই অবস্থায় সে অনুরামকে নিয়ে ছুটছিল। তার সারা শরীর অনুরামের চটচটে গরম রক্তে কাঁপছিল। চলিয়ে বাবুজী—

—তুমি এই বনে আর কতদিন থাকবে কালিকাপ্রসাদ ?

—অনু চাচার বড় ছেলে যোয়ান হলে আমি চলে যাবো।

—কারো কাছ থেকে কিছু নাওনা তুমি ?

—রোজ সকালে উঠে ভগবানকে যা পেয়েছি যা নিয়েছি তা শোধ করার শক্তি দাও। রোজ শোবার সময়ও এই কথাই বলি। রোজ। আমার আর কিছু চাই না।

আদিত্যবর্ধ মনে মনে বলল, সব বুঝলাম। কিন্তু এই যে একটা ভাবের ওপর বেঁচে থাকা, এই যে নিয়ত নিবেদন এর কেন্দ্রবিন্দুটা কি ? কিভাবে এটা ব্যালেন্সড্ হচ্ছে ?

॥ চার ॥

গল্প শেষ হয়েছে। আপাততঃ ছেদ অবস্থায় আছে। পরে সম্পূর্ণ রূপ নেবে। গল্পের শেষের দিক শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে পড়েছে হরিণী। তার চোখ মুখ থেকে থেকে কুঁচকে উঠছে। গল্প যেখানে শেষ হল তখন মধুবনীতে রাত্রি নেমেছে। সিঁড়ির নেপায় ঘুমোচ্ছে অন্নদাম। তার দুই ছেলেও ঘুমে কাদা। বাপতি নামিয়ে রশি টেনে জল তুলছে কালিকাপ্রসাদ। বাইরে কেরোসিনের কুপো জ্বালিয়ে সামনে আহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্নদামের স্ত্রী।...ইত্যাদি।

গল্প শেষ হলে হরিণী মন্তব্য করল, ছিঃ।

—মানে?

—অমন ভালো একটা লোককে তুমি এমনি খারাপ করে দিলে, সে যে ভালো, খুব ভালো তা দেখাতে পারলে না? এত ছোট করে দিলে?

—মানে?

অসহিষ্ণু আদিত্যবর্ধর কণ্ঠে এই দ্বিতীয়বার 'মানে' কথাটা শুনে থেমে গেল হরিণী। মনে হল, সামনে যে বসে তার সারা মুখে এমন অজস্র বিরক্তি সে আর কোনদিন দেখেনি। মধুযামিনীর মধুচাঁদ যেন কতকগুলো চরিত্র আর গল্পকে ঘিরে রঙীন কাগজের নকল চাঁদ হয়ে দেখা দিল। হরিণী সরে গেল স্বামীর সামনে থেকে।

॥ পাঁচ ॥

সেই চলচ্চিত্র পত্রিকায় কলকাতায় ফেরা মাত্র গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। যেন ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে তারা। সম্পাদক গল্পের শেষে বন্ধনী যোগে জানিয়েছেন যে আপাততঃ এটি কাঠামো মাত্র। ভবিষ্যতে উপন্যাস রূপে ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে বিখ্যাত এক প্রযোজক কাহিনীর চিত্ররূপ কিনে নিয়েছেন।

এখনো উপন্যাস হয়নি, তার আগেই পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেল দেখে অপরাধীর মত মুখ করে আদিত্যবর্ধর স্ত্রী বলছে, সত্যি গল্পটা খুব ভালো হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি।

• • • •

একদিন একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনাতে চাইলো। রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দিলেন। আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। যুবক গান গাইলে। গান শেষ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বললেন: "গাথ মেরে নিচ্ছি গানটা আমারই লেখা। কিন্তু গানের সুরটাও আমার এ-কথা বলে মনে রাগ দিসনে রে।"

একটি ভালবাসার গল্প

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে এই অংশী লোকটা। নামেও অংশী আর চেহারাখানাও ঠিক তাই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেতনা, যদিনা ওর ঐ ষেয়ো কুকুরটা সারারাত বাড়ীটাকে মাথায় তুলে রাখতো। কবে এই বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ীখানার নীচে সিঁড়ির তলায় অংশী তার কুকুরটাকে নিয়ে আড্ডা গেড়েছিল, তা এ বাড়ীর বাসিন্দাদের অনেকেরই অজানা। কিন্তু অংশী নামক স্বল্পবাক প্রায় বৃদ্ধ লোকটির অস্তিত্ব ঘোষণা করতে ঐ ষেয়ো কুকুরটাই যথেষ্ট।

শীতের রাতে ওর প্রবল ঘেউ ঘেউ আওয়াজে পাড়ার রাস্তাগুলো অবধি কাঁপতে থাকে। অংশী বলে, বাবুরা লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোলে চোরের চুরি করার সুবিধে, কিন্তু আমার ভৈরবের জন্যে তা হবার জোটি নেই।

পাড়ার ছেলেদের কোন নাম-বিশারদ বোধকরি অংশীর কুকুরটার ভৈরব নামকরণ করে থাকবে। সেই থেকে ভৈরব নামেই ও সর্বজনপরিচিত। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ঐ কুকুরটার ভেতর ভৈরবত্ব বিন্দুমাত্র নেই। শীতের রাতে ওর চীৎকার কান্না ছাড়া কিছু নয়। ধগধগে ঘায়ের ওপর শীতের হাওয়ার চাবুক এসে পড়লেই প্রাণপণে ও চেঁচাতে থাকে। আর গরমের দিনগুলোতে ওর ডাকের আওয়াজের পরিবর্তন ঘটে। তখন. থেকে থেকে ডাকে, শীতের দিনের মত দীর্ঘস্থায়ী একটানা ডাক নয়। আমি বলি, গরমের দিনে ওর গায়ে একধরণের পোকার উপদ্রব হয়। তখন মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে ও বেশীর ভাগ সময় পোকামারা শরীরটাকে উল্টেপাল্টে কামড়াতে ব্যস্ত থাকে।

কুকুর-পুরাণ রচনার দরকার হোতনা আমার, যদিনা সেদিন একটা ঘটনা ঘটত। কলকাতায় মাঝে মাঝে যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেদিন সন্ধ্যায়ও তেমনি আলো নিভে গেল, ঘুরতে ঘুরতে পাখা গেল বন্ধ হয়ে। বুড়ো ঝি দৌড়ল পাশের দোকান থেকে মোমবাতি আনতে। অন্ধকারে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা লাগল ভৈরবের গায়ে। অমনি দংশন। ঝিএর চীৎকার, গৃহস্বামীর গর্জন, সমস্বিলে একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হল। ভুক্তভোগী বাসিন্দারা হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে নামল নীচে। কিন্তু ভৈরব তখন বেপাত্তা। অংশী তখনও আস্তানায় ফেরেনি।

আলো জ্বলল, পাখা ঘুরল, ক্রমে রাগ পড়ে এলো। যে যার কাজে মন দিল। রাতে ফিরল ভৈরবের মালিক, শুনল সমস্ত ঘটনা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কটু মন্তব্যও, কিন্তু ভৈরব সেই পালাল, আর মুখরক্ষে হলনা।

শেষরাতে ভৈরবের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন প্রাণপণে পেটাচ্ছে ভৈরবকে। উঁকি দিয়ে দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভৈরবের গলায় দড়ি বেঁধে অংশী একটা লাঠি দিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে। আর আমোঘারটা আর্ত স্বরে চীৎকার করে নিজের কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কান্না থামল। ভোরবেলা উঠে দেখি, প্রভু ভৃত্য কারো দেখা নেই।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে শুনলাম, অংশী পেটাবার পর কুকুরটাকে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যায়

সেখান থেকে ওষুধ পত্র দিয়ে কাঁধে করে আবার বয়ে এনেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখন দুজনেই বাকি বিশ্রাম নিচ্ছে।

দৃশ্যখানা দেখার জন্য এক সময় নীচে নামলাম। উঁকি দিয়ে দেখি, ভৈরবকে কোলের ভেতর চেপে ধরে অংলী নানারকম উপদেশ দান করে চলেছে, আর ভৈরব লক্ষী ছেলের মত তা শুনছে, আর মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণস্বরে নিজের বক্তব্যকে কিছু বলার চেষ্টা করছে।

এরপর থেকে আমি ঐ দুটি জীবের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ওদের ক্রিয়া-কলাপ আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল।

একদিন দেখি অংলী ভোরবেলা দুধের সেন্টারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অত ভোরে আমি কোনদিনই উঠিনা, তাই অংলীকেও দুধ আনতে দেখিনি কোনদিন।

ফ্ল্যাট বাড়ীর কারো কাজ যে অংলী করে তা মনে হয়না। বাড়ী এসে শুনলাম, অংলীর ঘরিণবাটা দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে দুধ নেবার সংগত একটি কার্ড আছে। এবং আরও অবাক হলাম, যখন জানলাম, সে দুধের একমাত্র পানের অধিকারী ভৈরব নামক মনুষ্যেতর একটি প্রাণী। বিশেষ দুঃখের সঙ্গে এই ঘটনাটি আমাকে হজম করতে হল, কারণ হজম করে চেষ্টা করেও আমি একখানি কার্ডের ব্যবস্থা করতে পারিনি এতদিন।

অংলীর কার্ডের দুধটুকু পাবার জন্য এরপর আমি নানাভাবে চেষ্টা করেছি। বেশকিছু টাকাও খসাতে চেয়েছি, কিন্তু ভৈরবের মুখের অন্ন কাড়তে পারিনি। মনে মনে রাগ হয়েছে আমার কিন্তু কৌতূহলও কম হয়নি। একটা কুকুরের জন্যে এত! তাও বিলিতি নয় একেবারে দিশি।

অংলী সারাদিন কাজে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যের কাছাকাছি। ভৈরবকে সে বেঁধে রেখে যায় একটি গাড়িতে। পাছে রাস্তায় বের হয়, পথচারী স্বজাতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়, এই ভয়। হঠাৎ শনিবারে ঘরে এসে ঢুকলেন গৃহিণী। তাঁর মুখ থেকে যে সমাচার শুনলাম, তাতে স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না। জানালার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখলাম, কর্পোরেশনের সারমেয়বাহী গাড়িখানা দাঁড়িয়ে, আর জালের ভেতর থেকে যতটুকু দেখা গেল ভৈরব দাঁড়িয়ে আছে। সখেদে সে যেন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু গাড়ী স্টার্ট দেওয়ায় তার প্রতিবাদধ্বনি আমাদের কানে এসে পৌঁছল না।

কোন ফ্ল্যাটের ছেলে হয়তো কুকুরবয়া গাড়ী দেখে ভৈরবের গলার বাঁধন খুলে দিয়ে থাকবে। মনটা কেমন যেন ভরে গেল। একটা নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি সারা সকালটাকে বিষণ্ণ করে দিয়ে গেল।

দুপুরের দিকে আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, যখন গৃহিণী আমাকে প্রায় টানতে টানতে নীচে নিয়ে গিয়ে হাজির করাল।

ইতিমধ্যে পথের ধারে অনেকগুলি লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল।

তার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ভৈরব প্রভুর হাঁটুতে দুই চরণ তুলে দাঁড়িয়ে আছে বীরের ভঙ্গীতে আর অংলী, কেমন করে প্রথম খবরটা পেল, কিভাবে পড়ি কি মরি করে ট্যাক্সি নিয়ে কর্পোরেশনের গাড়ীর পেছনে দৌড়তে দৌড়তে প্রায় বধ্যভূমির কাছেপিঠে গিয়ে ভৈরবকে উদ্ধার করল, তার কাহিনী সবিস্তারে বলে চলেছে।

ভৈরব ফিরে আসায় আমি সত্যিই মনে মনে খুশি হলাম। এরপর অংলীকে দেখলেই মনে কেমন যেন একরকম সম্ভ্রম আসত। একটা সাধারণ ভিন্ন প্রদেশবাসী কুলিমজুর বলে তাকে মনে করতে পারতাম না।

কয়েকদিনের ভেতরেই জংলীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। আমি ওকে নানারকম পারিবারিক কাজে নিযুক্ত করে দিলাম।

একদিন ওকে একান্তে পেয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম, আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বলে যাচ্ছিল ওর জীবনের কথা।

আচ্ছা জংলী বেশে তোমার কে আছে?

কেউ নেই বাবুজী।

সে কি, তুমি সাদি করনি?

করেছিলাম হুজুর, ভালও বাসতাম তাকে, কিন্তু সে রইল না।

আহা, অল্পবয়সে মারা গেল।

একটু সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। আমার দিকে কেমন অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলল, না বাবুজী, ও মোসরা মরদের সঙ্গে ভেগে গেল।

ওর এ ধরণের উক্তিতে আমি কেমন যেন বিব্রত বোধ করলাম।

একটু থেমে ও বলল, মিথ্যে বলব না বাবুজী, আমি ঐ মরদটাকে খুন করে জেলে গেলাম।

তুমি জেলে ছিলে নাকি?

হাঁ, বাবুজী, এক দো বরষ নয়, পুরা পন্দরো বরষ। বিশ বরষ জেল হয়েছিল, কিন্তু আগাম ছুটি হয়ে গেল। জেলার সাবকে কত করে বললাম, পাও ধরে কাঁদলাম, কিন্তু ছেড়ে দিল বাবুজী, পুরা বিশ বরষ রাখল নাই।

সবিস্ময়ে বললাম, লোকে জেল থেকে পালিয়ে আসতে চায়, আর তুমি কিনা বলছ তুমি থেকে যেতে চাইলে।

ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল জংলীর বিকৃত মুখে।

বলল, কি হবে বাবুজী ঘরে ফিরে। ঘরে এসে তো সেই মানুষকে দেখতে হবে, লোকজনদের সঙ্গে এক ঠাঁই বাস করতে হবে। তার চেয়ে অনেক ভাল ছিলাম সেখানে। বললাম, সেখানেও তো বাজে লোকদের সঙ্গে তোমাকে থাকতে হয়েছিল জংলী?

আমার কাজটুকু করেই আমি খালাস। তারপর রাজ্যের পাখিরা এসে বসত আমার চারদিকে। আমার খাবার থেকে ওদের খাওয়াতাম। ওরা আমার কাঁধে, মাথায়, হাতে, কোলে বসে লুটেপুটে খেতো, আর কি বলব বাবুজী, কত আদর করত আমাকে।

এতক্ষণে বুঝলাম, জংলী কেন জেলখানা ছেড়ে আসতে চায়নি।

একটু পরে ও বলল, ওদের সব ছেড়ে আসতে হল বাবুজী। জেলের বাইরে এসে কতদিন খাবার সময় খেতে পারিনি। পথে ঘাটে চানা দানা কত ছড়িয়ে দিয়েছি। আপনার জনকে ছেড়ে আসতে কি প্রাণ চায় বাবুজী।

জংলীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। কথাটার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, ভৈরব তোমার কাছে কতদিন এসে জুটেছে?

চোখ দুটো হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে ও বলল, জেল থেকে বেরিয়ে অবধি।

সে কি!

হাঁ, বাবুজী, সেই যে পিছু নিলে আর কাছছাড়া হয়নি।

তারপর আর একবার আমাকে অবাক করে দিয়ে জংলী ম্লান হেসে বলল, ওরা পাখপাখালি অত জানোয়ার তো, তাই মায়াটা ওদের বেশী বাবুজী। মানুষের মত সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় না।

বিশ্ব-সাহিত্য

যে জানালা বন্ধই থাকতো

মূল : অ্যাম্বোস বিয়ার্স

অনুবাদ : গৌরীশংকর দে

১৮৩০ সাল। মস্ত শহরটা থেকে মাইল কয়েক দূরে প্রকাণ্ড এক বন। অঞ্চলটাতে লোকজনের বসতি খুবই কম। এখানে ওখানে কেবল সীমান্ত এলাকার লোকেদের বাস। ওরা থামতে জানে না। তাই বন কেটে বসত শুরু ক'রেই, সমৃদ্ধির সাধ পেয়েও ওরা আবার এগিয়ে যায় আরো পশ্চিমে যেখানে নতুন বিপদ, নতুন দুঃখ কষ্ট। নিজেদেরই মনের রহস্যময় তাড়নায়। যে সামান্য সুখ স্বেচ্ছায় পেছনে ফেলে এসেছে সামনে এগিয়ে যায় তাই পেতে। শহরের কাছাকাছি বন থেকে প্রায় সবাই চ'লে গিয়েছিলো আরো দূর অঞ্চলের দিকে। যারা তখনো ওখানে ছিলো তাদের ভেতরে ছিলো একজন যে অনেকের আগে ওখানে পৌঁছেছিলো। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বাড়িতে লোকটি একা থাকতো। বাড়িটিকে ঘিরে বিস্তীর্ণ বন। লোকটিকে দেখে মনে হতো সে যেন ওই অরণ্যের বিষণ্ণতা আর স্তব্ধতারই একটি অংশ। কারণ আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হাসতে কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথা বলতে দেখেনি। মাঝে-মাঝে শহরে গিয়ে বুনো জানোয়ারের চামড়া বিক্রি ক'রে কিংবা তার পরিবর্তে, অন্য জিনিস সে নিয়ে আসতো। ওতেই তার গ্রাসাচ্ছাদন চ'লে যেতো। চাষবাস সে একেবারেই করতো না। অথচ ইচ্ছে করলেই সে খানিকটা জমি বিনা বাধায় ভোগ করতে পারতো। বাড়ির চারদিকের কয়েক বিঘা জমির চেহারা এককালে সত্যি সে ফিরিয়েছিলো। সাফ করেছিলো গাছ কেটে। সেই সব গাছের গুঁড়ি থেকে এখন আবার ডালপালা গজিয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে নিতে গেছে লোকটার কৃষিকর্মের প্রেরণা।

বাড়িটাতে ঢুকবার দরজা একটাই। দরজার উল্টো দিকে একটা জানালা। জানালাটা বন্ধ। জানালাটা কেউ কখনো খোলা অবস্থায় দেখেনি। কেন যে জানালাটা সব-সময় ও রকম বন্ধ থাকে কেউ তা বলতে পারে না। এমন নয় যে লোকটা আলো-হাওয়া পছন্দ করে না। কারণ ওই নিরালা বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় শিকারীদের চোখে পড়েছে লোকটি বাড়ির দরজায় ব'সে রোদ পোহাচ্ছে। ওই জানালার রহস্য কী তা জানে এমন লোক মাত্র ক'য়েকজনই এখন জীবিত আছে। আমি সেই স্বল্প-সংখ্যক লোকদের অন্যতম।

লোকটার নাম নাকি মার্লক। দেখলে মনে হবে তার বয়স সত্তর, আসলে প্রায় পঞ্চাশ। কেবল বয়সের জন্য তার বার্ধক্য আসেনি। চুল আর লম্বা দাড়ি সাদা হ'য়ে গেছে, জ্যোতিহীন ধূসর চোখ দুটো কোটরে ব'সে, গেছে, কপালে পড়েছে অসংখ্য ভাঁজ। লোকটা লম্বা কিন্তু কৃশ। পিঠটা কুঁজো। আমি নিজে তাকে কখনো চোখে দেখিনি। আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা দিচ্ছি। লোকটার গল্পও শুনেছিলুম ঠাকুরদারই কাছ থেকে। আমার ছেলেবেলায় ঠাকুরদা বেশ কিছুদিন লোকটার প্রতিবেশী ছিলেন।

একদিন দেখা গেলো মার্লক তার কেবিনে ম'রে প'ড়ে আছে। সেই সময়ে ওই অঞ্চলে খবরের কাগজের প্রচলন হয়নি, মৃতদেহ পরীক্ষারও রেওয়াজ ছিলো না। সবাই ধ'রে নিলে স্বাভাবিক কারণেই সে মারা গেছে। অন্তত আমি তাই শুনেছিলুম। কেবিনের কাছেই তার মৃতদেহ সমাধিস্থ ক'রে লোকেরা ভালোই করেছিলো বলতে হবে। সমাধিস্থ করা হয়েছিলো স্ত্রীর কবরের পাশে। স্বামীর মৃত্যুর এতদিন আগে সে মারা গিয়েছিলো যে স্থানীয় লোকেরা সেই মহিলাটি সম্পর্কে এখন কিছুই জানে না। লোকটির জীবন-কাহিনীর এই হলো শেষ অংশ। কিন্তু প্রথম অংশও আছে—আমার ঠাকুরদা বলেছিলেন।

বনের ভেতরে মার্লক যখন বাড়িটা তৈরি করেছিলো আর কুড়ুল দিয়ে বাড়ির চারদিককার গাছ সাফ করতে লেগেছিলো তখন সে শক্তসমর্থ আশাবাদী যুবক। দেশের পূর্বাঞ্চলে এসে সে যাকে বিয়ে করেছিলো সেই মেয়েটি ছিলো তার ভালোবাসার সম্পূর্ণ যোগ্য। স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে বরণ ক'রে নিয়েছিলো স্বামীর দুঃখ-কষ্ট আর শ্রমের শরিকানা। তার নাম কী ছিলো এখন আর তা জানার উপায় নেই। দেখতে কেমন ছিলো স্বভাবই বা কেমন ছিলো তা-ও আজ কেউ জানে না। তবে তাদের জীবনে যে সত্যিকারের সুখ-শান্তি ছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একদিন মার্লক দূরের বনে শিকার ক'রে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী জ্বরে শয্যাশায়ী, ভুল বকছে। বিশ-ত্রিশ মাইলের ভেতরেও কোনো ডাক্তার নেই। কাছাকাছি কোনো প্রতিবেশী নেই। স্ত্রীর তখন এমন অবস্থা যে তাকে একা রেখে সাহায্য চাইতে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, নিজেই সে স্ত্রী-র সেবা-শুশ্রূষা শুরু করলে। কিন্তু তৃতীয় দিন স্ত্রী সংজ্ঞা হারালো, তার প্রাণ-বায়ু নির্গত হলো।

স্ত্রী সত্যিসত্যি মারা গেছে জেনে মার্লক শোক বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলো। তবু মৃতদেহ তো সমাধিস্থ করতে হবে। তা করতে গিয়ে তার নানারকম ভুল-ত্রুটি হলো। কতকগুলি সাধারণ কাজ করতে গিয়েও ভুল হয়ে যাচ্ছে দেখে সে অবাক হলো। চেনা-জানা প্রাকৃতিক নিয়ম সাময়িক ভাবে কাজ করছেনা দেখে একজন মাতাল যে-রকম অবাক হয়। আরো অবাক হলো চোখ দিয়ে একটুও জল পড়লো না ব'লে। একটু লজ্জিতও হলো। মৃতের জন্য চোখের জল না ফেলা নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরতা। নিজেকে শুনিয়েই সে বললো: "আগামীকাল আমাকে কফিন বানাতে হবে, কবর খুঁড়তে হবে। সে চ'লে যাবে চোখের আড়ালে। আর কখনো তাকে পাবো না। কিন্তু এখন তো সে মৃত।"

আলো ক'মে এসেছিলো। সামনে দাঁড়িয়ে সে ঠিক ক'রে দিলো মৃতার চুল, পোষাক—পরিচ্ছদ। তবে নিতান্তই যান্ত্রিক ভাবে। তবু তার মনে এখনো একটা বিশ্বাস কাজ করছিলো স্ত্রীকে সে আবার ফিরে পাবে। তখন সব তাকে বুঝিয়ে বলা যাবে। এর আগে দুঃখের অভিজ্ঞতা তার হয়নি। কাজেই দুঃখ অনুভবের ক্ষমতা তার তেমন জন্মায়নি। তার মন দুঃখ ধারণের মতো প্রশস্ত হয়নি। দুঃখ কী, তা কল্পনা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সে যে এত বড়ো একটা শোক পেয়েছে এখনো তা সে জানে না। জানবে পরে। তখন দুঃখ তার সঙ্গ আর ছাড়বে না। দুঃখ এক ক্ষমতাবান

শিল্পী ; বিচিত্র মানুষ তার বিচিত্র বাস্তব-বস্তু। বিভিন্ন মানুষের উপর দুঃখের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। শরাঘাতে কারুর মনে সে সঞ্চারিত করে তীব্র চেতনা, আবার যেন হাতুড়ির আঘাতে কারুর মন ক'রে দেয় নিঃসাড়। মার্লক দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। যে-টেবিলের উপরে মৃতদেহটি শায়িত ছিলো তার পাশে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে টেবিলে হাত রেখে তাতে মুখ লুকালো মার্লক। তখনো তার চোখে জল নেই। আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলো মৃতার ফ্যাকাশে মুখ। সেই মুহূর্তে খোলা জানালা পথে শোনা গেলো একটানা একটা কান্নার শব্দ। যেন ঘরের অন্ধকার বনে পথ হারিয়ে একটি শিশু কাঁদছে। লোকটি তবু আগের মতোই স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। আবার সেই অপার্থিব শব্দটা শোনা গেলো। এবার আরো কাছে। হয়তো কোনো বুনো জানোয়ার ও-রকম শব্দ করছে। কিংবা হয়তো খরগোশ রকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। মার্লক ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

কয়েক ঘণ্টা পরে তার ঘুম ভেঙে গেলো, মাথা তুলে কান খাড়া ক'রে কী যেন শুনবার চেষ্টা করলো। কী তা সে জানে না। মৃতদেহের পাশে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করলো। কী তা সে জানে না। সমস্ত অনুভূতি তখন প্রখর হ'য়ে উঠেছে, ফুরিয়ে এসেছে বুকের ভেতরকার বাতাস, বাইরের শুষ্কতার সঙ্গে তাল রেখে থেমে গেছে শরীরে রক্তের প্রবাহ। কে তাকে জাগিয়েছে? সে এখন কোথায়?

যে-টেবিলে সে হাত রেখেছিলো, হঠাৎ সেটা দুলে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সে শুনতে পেলো, অন্ততঃ মনে হলো, কে যেন খালি পায়ে মেঝের উপরে আলগোছে হাঁটছে। একবার, দুবার সেই সন্তর্পণ শব্দ শোনা গেলো!

লোকটা এত ভয় পেলো যে চেঁচিয়ে ওঠার কিংবা নড়াচড়ার ক্ষমতাও তার রইলো না। অন্ধকারে ব'সে রইলো কিসের অপেক্ষায়। যুগ যুগ যেন কেটে গেলো। স্ত্রী-র নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখ দিয়ে স্বর বেরুলো না। ইচ্ছা হলো টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখে মৃতদেহটি ওখানে আছে কিনা। কিন্তু তা-ও পারলো না। তার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছেনা। হাত-পা সিসের মতো ভারি হয়ে উঠেছে। এরপর আরো ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। একটা ভারি দেহ এমন ভাবে এসে টেবিলটার গায়ে লাগলো যে টেবিলটা কাৎ হয়ে লোকটার গ'য়ের উপর পড়ার উপক্রম হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে মেঝের উপরে কী যেন ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো। এত জোরে পড়লো যে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলো। শুরু হলো এমন হুড়োহুড়ি, তোলপাড় যার বর্ণনা অসম্ভব। মার্লক তখন দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। ভয়ে তখন তার সব-রকম চেতনা লোপ পেয়েছে। টেবিলের উপরে হাত চালিয়ে দিলো। দেখলো সেখানে কিছুই নেই!

অতিরিক্ত ভয় পেলে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়। আর তখন সে হ'য়ে ওঠে বেপরোয়া। তেমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে, পাগলের মতো মার্লক লাফ দিলো ঘরের দেয়ালের দিকে। অন্ধকারে হাতড়ে তুলি গুলি ভরা রাইফেলটা তুলে নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে গুলি চালালো। গুলি বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হ'য়ে উঠলো। সেই আলোতে দেখতে পেলো বিরাট এক চিতাবাঘ মৃতার গলায় দাঁত বসিয়ে দিয়ে তার দেহটাকে জানালার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে! মুহূর্তের মধ্যেই ঘর ঝিপ্তন-স্তব্ধ, ঝিপ্তন অন্ধকার হলো। লোকটির যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সূর্য বেশ উঁচুতে উঠেছে, বন মুখর হয়ে উঠেছে পাখি-পাখালির গানে।

রাইফেলের গুলির শব্দে চিতাবাঘটা ভয় পেয়ে জানালার ধারে যেখানে ফেলে গিয়েছিলো, মৃতদেহটা সেখানেই প'ড়ে আছে। তবে মৃতার জামা-কাপড়, চুল সব এলোমেলো। শরীরটা কোনো রকমে প'ড়ে আছে। গলার ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত বেরিয়েছিলো তার একটা ধারা শুকিয়ে রয়েছে। বাহুমূলে বাঁধা কিতেটা ছিঁড়ে গেছে। হাত দুটো মুঠি করা। মৃতার দুপাটি দাঁতের মাঝখানে জানোয়ারটার এক টুকরো কান।

———

প্রতিবেশী সাহিত্য

সুরভী

শ্রীগুলাবদাস ব্রোকার

অনুবাদক :—দিব্যেন্দু কিশোর গুহ

[বিশ্ব-সাহিত্যের সাম্মেলনে এবার থেকে আমরা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের সাহিত্যের আলাপ-আলোচনা এবং অনুবাদ প্রকাশ করবো। সাহিত্যের মাধ্যমে এ প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় এবং সংস্কৃতিগত মিলনই হবে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গুজরাটী ছোট গল্পের ক্ষেত্রে শ্রীগুলাবদাস ব্রোকার প্রখ্যাত লেখক। চরিত্র আর ঘটনা বিন্যাসে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ইনি সমকালীন গুজরাটী-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

সুরভীর মনে হোল সকলের অলক্ষ্যে একটা পায়ের শব্দ যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! তখনি সে দরজার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু না, দেখল বাসনের মাসিটা কাজ করছে! হতাশ হয়ে সুরভী বসবার ঘরে ফিরে এল! হতাশ হয়ে আবার সে শোফায় গা এলিয়ে দিল।

এবার, মুখের তেতরটা কেমন যেন শুখিয়ে উঠছে মনে হোল। অর্ধেক শেষকরা জলের গ্লাসটা টি-পয় থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করল সুরভী। আর সে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে ভরে এল স্মৃতির উজান! আবেশে চোখ বুজে এল। গ্লাসটাও হঠাৎ যেন রাঙা হয়ে উঠল। কয়েক মিনিট ধরে একটা চপল আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল তার সারা দেহে!

কিন্তু একটু পরেই নিজের কাছে যেন নিজেই লজ্জা পেল সুরভী। তখুনি চোখ খুলে, গ্লাসের বাকি জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলল!

এবার সুরভী শক্ত হবার চেষ্টা করল। নিজের মনে মনেই বলল: আচ্ছা কেমন নির্লজ্জ লোকটা! আমার সঙ্গে এ রকম একটা কাণ্ড করার ও সাহস পেল কোত্থেকে?

ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হোল সুরভী। শোফা থেকে উঠে ঘরে পায়চারী করতে লাগল। চিন্তার স্রোতটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে এল। বাবার কথা ভাবতে শুরু করল সুরভী!

"ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, সুরভীর সেই প্রতিবাদের কোন অর্থ ছিলনা! আর তেমন কোন জোরও ছিলনা তাতে!"

না না, তা কি করে হয়! বরং ও-যে এরকম একটা কাণ্ড করে বসবে সুরভী তা মোটেই ভাবতে পারেনি! তবে হ্যাঁ, ওর সাহস আছে বলতে হবে! কাণ্ডটার পর, বড় বড় চোখকরে ওর দিকে তাকাতেও কেমন বেপরোয়ার মত হাসছিল!

"না, না, ব্যাপারটায় আমার যদি সম্মতিই থাকত, তবে আমি তখুনি সেস্থান থেকে চলে আসতাম না!"

শেষের এই ভাবনাটুকুই সান্ত্বনা ছিল সুরভীকে! তবে সে শুধু ক্ষণকালের তরেই! তার পরেই মনের অতল থেকে আরেকটা বিপরীত অভিযোগের সুর ওকে আবার বিচলিত করে তুলল!

"কেন ব্যাপারটা কি সত্যিই তোমার ভাল লাগেনি? তাহলে ওকেই আবার দেখবার জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছ কেন? পায়ের শব্দ শুনলেই বা এমন আকুল হয়ে বাইরে ছুটে যাচ্ছ কেন? আর, অন্য আর কাউকে দেখে অমন হতাশই বা হচ্ছো কেন? কেন, কেন?" এই কেনর জবাব সুরভী কি করে দেবে?

ওর চোখের সামনে তখনি ভেসে উঠল নবরুণাভ এক যুবকের উজ্জ্বল মুখশ্রী! কালো কোঁকড়ানো তার চুল। পদ্মপলাশ বড় বড় চোখ! সে যেন মৃদু মধুর কণ্ঠে সুরভীকে বললে—

'আরেকটা ঢেউ! ঠিক আর একটা!'

সুরভীর ঠোঁটে কাঁপন ধরল! পরে ক্রমান্বয় তরঙ্গের মত এক রঙীন স্মৃতির-প্রবাহ তাকে উদ্বেল আকুল রোমাঞ্চিত করে তুলল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশ মদির হয়ে উঠেছে অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোয়। সেদিনই সূর্যকান্তের সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছে সুরভী। খুব বেশী দূর কোথাও যাবার ওদের কথা ছিলনা। কিন্তু কথায় কথায় সময় আর দূরত্বের সমস্ত হিসাব হারিয়ে ওরা একসময়ে এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে পৌঁছোল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়ো হতেই সাবধান হতে চাইল সুরভী! ঘরে ফিরতে চাইল। কিন্তু সূর্যকান্ত বললে—

"আরেকটু বসুননা, সূর্যাস্তটা উপভোগ করা যাক!"

"না, না খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে!" সুরভী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"আরে কয়েকমিনিটে আর এমন কি দেরী হবে! বলেই বালির ওপরে বসে পড়ল সূর্যকান্ত। সুরভীর চোখে তখন মেয়েসুলভ সতর্কতা জেগে উঠল। না, জায়গাটা অবশ্য খুব নির্জনবিজন নয়!—কিছুটা দূরেই ছোট একটা দল সমুদ্র-শোভা উপভোগ করছে। সূর্যকান্তের কাছ থেকে একটু দূরেই বসল সুরভী। ওর তখনি স্বামীর কথা মনে হোল। ভাবল, উনি জানলে কি মনে করবেন। নিশ্চই ব্যাপারটা ওঁর পছন্দ হবেনা। সুরভী আবার ভাবল, নানা, এতে আপত্তির কি আছে, সূর্যকান্ত তো আর অপরিচিত কেউ নয়! আর বেড়ানোর এই সহজ ব্যাপারটাকে এমন জটিল করেই বা দেখবার কি আছে?

ওদের অজান্তেই পড়ন্ত বেলার রক্তিম আভা এক সময়ে আকাশ থেকে বিলীন হোল। পূর্ণ-যৌবনা চাঁদ যেন আকাশে অভিসারে বেরুল রাতের সঙ্গে মিলিত হতে! ওর মায়াবী আলোয় সমুদ্র আর বেলাভূমি আরও মদির হয়ে উঠল!

আচমকা সূর্যকান্ত বলল 'শুনেছি আপনি খুব ভাল গান করেন।'

'কে বললে আপনাকে?

'যদি বলি এক পরী এসে আমার কানেকানে জানিয়ে গেছে? কেন কথাটা কি সত্যি নয়?'

'একেবারেই নয়! আমি মোটেই গান জানিনা!' কিন্তু সুরভীর মুখের মিষ্টি হাসিটুকু যেন কিঙ্কিনীর মত ওরই কথার প্রতিবাদ করে উঠল!

আরেকটু কাছে সরে এল সূর্যকান্ত। অর্থভরা দৃষ্টিতে সুরভীর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে 'বেশতো, একটা গান শোনান। আমি নিজেই বলে দিচ্ছি, আপনি ভাল গান করেন কিনা!'

ওর চোখের ভাষায় কেমন আতঙ্ক বোধ করল সুরভী। অবশ্য এরকম চোখে তাকাতে ওকে প্রায়ই দেখছে সে। সূর্যকান্ত প্রায়ই ওদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে। নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে রাত বেশী হলে ওর স্বামী ক্লান্ত বোধ করলে ওদের আলোচনাটুকু শেষ করতে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে চলে যান! তবে সে রকম অবস্থায় ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সুরক্ষিত থেকে, আর পাশের ঘরেই স্বামীর নিশ্চিন্ত উপস্থিতিতে সুরভী তেমন কোন উদ্বেগের কারণ বোধ করেনি!

কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় ও যেন ঠিক নিজেকে নিরাপদ বোধ করতে পারছে না! সূর্যকান্তের নিবিড় সান্নিধ্যে আর এই মায়াবী পরিবেশের প্রভাব ও যেন বুঝতে পারছে! তাই এবার বেশ জোর দিয়েই সুরভী বললে—

'না এবারে চলুন যাওয়া যাক। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে!' তবু সূর্যকান্তের ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! ও বললে "আপনি যতক্ষণ গান না শোনাচ্ছেন আমি উঠছিনা। আমি জানি আপনি খুব ভাল গান করেন।"

সুরভী এবার উঠে পড়ল। বললে—

"কি আরম্ভ করেছেন বলুন তো?"

"কই কিছু না! আপনার কথা শুনব। এখুনি উঠব। শুধু আমার অনুরোধটুকু আপনি রাখুন। আরে বসুন বসুন! কি করছেন!" বলেই সূর্যকান্ত ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল!

সূর্যকান্তের এই জেদ দেখে সুরভী প্রমাদ গুনল। ভাবল, চট করে একটা গান শুনিয়ে দিয়ে ওর আবারটা রাখাই বোধ হয় ভাল। নইলে শুধু শুধু আরও দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু কোন্ গানটা করবে ভেবে উঠবার আগেই সূর্যকান্ত হঠাৎ ওর হাতের ওপর হাত রেখে মৃদুস্বরে বললে—

"প্লিজ! মেয়েদের এমন নিষ্ঠুর হতে নেই!"

হাতটা সরিয়ে নিল সুরভী। বললে—

"কিন্তু কি গান করব বুঝতে পারছিনা!"

"আপনার ওই গানটা জানা আছে ওই যে তোমার প্রেমের বহ্নি জ্বলে তোমার আঁখির মাঝে!"

সুরভী ঘাড় নাড়ল।

"তাহলে ওটাই হোক।" সূর্যকান্ত বললে।

কিন্তু সূর্যকান্তের পছন্দটা মোটেই ভাল লাগলনা সুরভীর। বড় বেশী রোমান্টিক গানের কথাগুলো! তবে বাড়ী ফিরে যেতে ওর আর দেরী করার ইচ্ছে ছিলনা। তাই সুরভী গান শুরু করল।

গলা ভাল সুরভীর। বেশ মিষ্টি আর আবেগভরা। ওর অজান্তেই গানের ভাবটুকু সেই সান্ধ্য পরিবেশকে যেন আরও মদির করে তুলল। গান সুরভীর ভাল লাগে। তাই ক্রমেই ও নিজের গানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। হঠাৎ গানের রেশ ভেঙে সূর্যকান্ত বললে, 'ওকি ঘুরে কি দেখছেন! আরে, আমার দিকে তাকান! দেখি চোখের তারায় মধুর কেমন করে নাচছে। প্লিজ আমার দিকে তাকান!'

নেহাৎই অনিচ্ছার সঙ্গে সুরভীর তাকাতে হোল ওর দিকে! সূর্যকান্ত তখন মৃদু মৃদু হাসছে। ওর স্বপ্নভরা চোখের দৃষ্টিটুকু নিশ্চল হয়ে আছে সুরভীর মুখের ওপরে!

গান শেষ হতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল সুরভী! তৎক্ষণে ওর সুরের রেশটুকু ধীরে ধীরে রাতের প্রশান্ত নীরবতায় মিলিয়ে গেছে!

সূর্যকান্তের চোখে আবার চোখে রাখতেই সুরভী লক্ষ্য করল ওর চোখদুটো যেন তারার মত জ্বলজ্বল করছে! মৃদুকণ্ঠে ঠিক তখনি সূর্যকান্ত বললে—

"সত্যি কী অপূর্ব সুন্দর! আপনার গলা অদ্ভুত মিষ্টি! না, শুধু মুখের কথায় নয়, অন্য কোন ভাবে, আমার এ ভাবার প্রমাণ আমি দেখাতে চাই। একটা কিছু উপহার যদি দিই আপনাকে?"

"থাক কোন উপহারের দরকার নেই আমার! নিন চলুন এবার। সত্যি ভীষণ দেরী হয়ে গেছে!'

"কিন্তু আপনার গান যে আমার এত ভাল লাগল তার একটা প্রমান না দিয়ে কি করে যাই বলুন?"

মুহূর্তের চাপল্যে যেন সবকিছু বিস্মৃত হল সুরভী! বললে—

"কি দেবেন আবার আপনি?"

"শুধু এইটুকু—" বলেই সূর্যকান্ত আবেগে জড়িয়ে ধরলে সুরভীকে। তারপর ওর ঠোঁটে নিবিড় এক চুম্বনের রেখা এঁকে দিল।

এমন হকচকিয়ে গেল সুরভী, যে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতেই ওর সময় লাগল! যখন বুঝতে পারল, তক্ষুনি ওর খেয়াল হল, আশপাশটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ব্যাপারটা কেউ দেখে ফেলেনিতো? পাশ দিয়ে ঠিক তখনি যে-দুই ভদ্রলোক গেলেন ওঁরা কারা? চেনাশুনা কেউ নয়ত? সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেও সুরভীর চোখের ভ্রূতে ঘাম জমে উঠল!

বিরক্তি আর ঘৃণায় এবার কঠিন হয়ে সে সূর্যকান্তকে বললে 'ছিঃ, ছিঃ, আপনার সাহস তো কম নয়! অসভ্য!'

কিন্তু সরল হাসিতে ওর বিরক্তিটুকু উড়িয়ে দিতে চেয়ে সূর্যকান্ত বললে—'সত্যি কি আমি অসভ্য?'

'তা নয়ত কি? আপনার মনে এই রয়েছে জানলে আমি কখনো গান শোনাতাম না! এ রকম সুযোগ নেওয়ার সাহস হোল কি করে আপনার?'

'আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো, আপনার কি সত্যি রাগ হোল? আরেকটা হোক, শুধু আরেকটা; মনে হয় তবেই আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।'

কথা বলতে বলতে আগের মতই কেমন অনায়াসে হাসছিল সূর্যকান্ত!

'না আপনার কোন লজ্জাও নেই!' ওর প্রতিহারকে সূর্যকান্ত গায়ে মাখছেনা দেখে সুরভী এবার রেগে আগুন হতে চাইল। বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বললে—

'আর কখনো এ রকম কথা শোনাবেন না আমাকে। কক্ষনো না!'

সূর্যকান্ত সঙ্গে আসুক আর না আসুক, সুরভী এরপর আর তার জন্যে অপেক্ষা করলনা। সে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল। তবে সূর্যকান্ত সঙ্গে এল। সারা রাস্তায় আর কোন কথা হোলনা ওদের। সুরভীদের বাড়ীর একেবারে কাছে চলে আসতেই সূর্যকান্ত মৃদুস্বরে বললে—

'আপনি রাগ করুন আর যাই করুন, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আজকের এই সন্ধ্যার স্মৃতি

আপনার অনেক দিন মনে থাকবে। আর সত্যি সত্যি রাগ আপনি করেন নি! খুব শিগ্‌গীরই আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব। আবার দেখা হবে। চলি। নমস্কার।'

রাগে বিরক্তিতে নির্লজ্জ সূর্যকান্তের দিকে আর একবারও ফিরে তাকায়নি সুরভী!

হঠাৎ অস্পষ্ট কিসের একটা শব্দ উঠতেই সুরভীর চিন্তার সূত্রটা এবার ছিঁড়ে গেল! সুরভী ঠিক করল, সে উঠবেনা! বসেই থাকবে। কিন্তু পারল না। দ্রুত বাইরে ছুটে গেল! কিন্তু দেখল, একটা কুকুর কোত্থেকে এসে দরজাটাকে আঁচড়াচ্ছে!

আবার হতাশ হোল সুরভী! আবার শোকার এসে ভেঙে পড়ল! নিজের মনকে ধিক্কার দিল এবার। ছিঃ ছিঃ লজ্জাও নেই আমার। আমি কিনা এখনও ওর কথাই ভাবছি! সেই সন্ধ্যার ঘটনার পরেও ওরই পথ চেয়ে আছি? তবে কি আসলে সেই সন্ধ্যার ঘটনাটুকু আমার সত্যি ভাল লেগেছিল?

নিজের ছায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোথাও আশ্রয় খুঁজতেই এবার ব্যস্ত হোল সুরভী।.....

ওর মনে পড়ল স্বামীও ইদানীং একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন সুরভীর মধ্যে! সেদিন তো হঠাৎ জিজ্ঞেসই করে ফেললেন "কার কথা এত ভাবছ সুরভী?"। হে ভগবান! সুরভী এ লজ্জা ঢাকবে কি করে?

সেদিন নির্লজ্জের মতই মিথ্যা কথা বলেছিল সুরভী! বলেছিল—'যাঃ! তোমাকে ছাড়া আর কার কথা ভাবব!' সুরভী ভাবে সত্যি কী লজ্জাতিক মেয়ে আমি।

লজ্জা আর সঙ্কোচের প্রগাঢ় ছায়া এবার ওর মুখ আবৃত করল! 'ছিঃ ছিঃ আমি কিনা এখনও সূর্যকান্তের কথাই ভাবছি! ওকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছি!...তবে আশ্চর্য ওর আকর্ষণ শক্তি। মনটাও কেমন সুন্দর কবির মত। আর নিজের ওপর কী নিশ্চিত বিশ্বাস ওর! আর ওর সেই চোখ, সেই চোখ দুটো যেন.....

বাইরে আবার কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল! এবার আর উঠল না সুরভী!

'না-না কিছু ভাবব না আমি! যে-ই আসুক, আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।' সুরভী কঠিন হবার চেষ্টা করল।

কিন্তু শব্দটা ক্রমেই আরও কাছে এগিয়ে আসছে। ক্রমশঃ আরও কাছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শক্ত হয়ে রইল সুরভী। কিন্তু মনের কাছে ওর পরাজয় ঘটল।

"নিশ্চয়ই সে এসেছে। সূর্যকান্ত! আমার ঠিক বিশ্বাস ও-এসেছে! হে ভগবান।"

ব্যস্ত হয়ে উঠল সুরভী। ব্যস্ত হাতে ওর চুলের খোঁপাটা ঠিক করে নিল। চট ক'রে শাড়ীর ভাঁজটাও গুছিয়ে ফেলল! তারপর অধীর আগ্রহে এক নিশ্চিত পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল!

কিন্তু না! শোনা গেল পরিচিত আরেকটি গলার স্বর। ডাক-পিওনের!

"চিঠি!"

চিঠি? সুরভীর দেহে যেন আর স্পন্দন নেই। চিঠিটা নিতে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। খামের লেখাটা দেখতে দেখতে সে আবার এসে সোফায় বসল। চিঠিটা ওর স্বামীকে লিখেছে

কেউ। তার ওপর 'কনফিডেনশিয়াল' কথাটা কেন? শব্দটা যেন তীব্র কটূক্তি করে সুরভীর আপাদমস্তক প্রত্যক্ষ করছে। হঠাৎ তার্তি এক ভাবনায় ওর সারাদেহ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

"কে লিখল চিঠিটা? হে ভগবান! যে-দুই ভদ্রলোক সেদিন সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন ওঁদেরই একজন নয়ত? কে জানে হয়ত ওঁরা আমার স্বামীরই পরিচিত কেউ।" দুর্ভাবনায় সুরভীর মন তখন উত্তাল পাথার।

খামটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সুরভী। আলোর সামনে তুলে একবার ভেতরটাও দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। এমন কি ডাকঘরের সিলটাও বোঝবার উপায় নেই! ওর স্থির বিশ্বাস, গোপন এক অপরাধকে লুকিয়ে রাখতে লেখকের সঙ্গে যেন ডাকঘরের লোকেরাও সহযোগিতা করছে!

তখন বিকেল পাঁচটা! আর ঠিক একঘণ্টার মধ্যেই ওর স্বামী বাসায় ফিরবেন। আর ঠিক একঘণ্টার মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে সুরভী লজ্জাহীনা, ও বিচারিণী অবিশ্বাসী। এ বাড়ীতে এতদিন যে প্রেম আর মর্যাদায় সে অধিষ্ঠিত ছিল আর একঘণ্টার মধ্যেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

সুরভীর গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামল। ও ভাবতে বসল, বিবাহিত জীবনের এই ছেড়বছর ওর কত সুখেই না কেটেছে। স্বামী ওকে কত স্নেহ করেছেন। সব সময়েই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল। কোনদিন একটু রাগ করেননি। রূঢ় কথা বলেননি! আর আজ? ঠিক একঘণ্টার মধ্যেই আগ্নেয়গিরির এক প্রচণ্ড অগ্নুৎপাত ঘটবে! আর ভয়ঙ্কর ঘৃণা আর অসন্তোষের দলিত লাভায় সুরভীর অস্তিত্ব যাবে পুড়ে খাক হয়ে!

স্বামীর মুখোমুখি কি করে দাঁড়াবে এ চিন্তায় সুরভি অস্থির হয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর কোন বিপর্যয়ের মুখেও ওর স্বামী যে কত স্থির আর সহিষ্ণু থাকতে পারেন—সুরভীর তা অজানা নয়! সব শুনে, দুঃখে হতাশায় তিনি যদি কেবল সুরভীকে বলেন —"সুরভী, সুরু, তুমি এরকম কেন করলে? ঘরের সমস্ত মর্যাদা যে আমি তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কত বিশ্বাস ছিল তোমার ওপর! আর তুমি কিনা এই করলে? ওঃ সুরভী! একি করলে তুমি!!"

না, না স্বামীর শুধু এ রকম প্রশান্ত ধিক্কার কিছুতেই সইতে পারবেনা সুরভী। কিছুতেই না!

চিঠিটা আরেকবার ভাল করে দেখল সুরভী। না, ভেতরের কথাটুকু গোপন রাখার সমস্ত সাবধানতাই নিয়েছে লেখক। হঠাৎ সুরভীর মনে হল চিঠিটা নষ্ট করে ফেললে কেমন হয়?.....কিন্তু তার আগে একবার জানা দরকার, চিঠিতে কি লেখা আছে? ঠিক আছে, চিঠিটা আগে পড়ে দেখবে সুরভী তারপর না হয় ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে চিঠিটা তার ব্যবসা সংক্রান্ত কোন জরুরী চিঠি! তাহলে? এ অবস্থায় সে করবে কি করে? স্বামী কোনদিনই সুরভীর চিঠিপত্র খোলেন না। আর সুরভী খুলবে? এর মধ্যেই কি স্বামীকে যথেষ্ট প্রতারণা সে করেনি? এর মধ্যেই কি ওর পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী হয়ে ওঠেনি? ঘামে সুরভী ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল!

এক সময়ে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে চিঠিটা যতদূর পারল ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলল সুরভী। চিঠিটা গিয়ে আশ্রয় নেল এক আলমারীর তলায়।

সুরভী সোজা হয়ে বসল এবার। ভাবল "দূর! আমিও যেমন, চুঁচোর চিঠি নিয়ে অযথাই

পাহাড় সঙ্গে তোলার চেষ্টা করছি। ওই দুই ভদ্রলোক যদি ওর জানা শোনা কেউ হত, তবে আমি কি ওদের চিনতে পারতাম না? দূর দূর! যতসব বাজে চিন্তা!

ঠিক তখনি আরেকবার পূর্বকান্তের কথা মনে পড়ল সুরভীর। আবার পরক্ষণেই স্বামীর কথা ভাববার চেষ্টা করল দুটো মুখ ওর সামনে ভেসে উঠল ছবির মত। একজন, সুদর্শন রোমান্টিক ছিমছিমে চপল চোখের তারায় রহস্যময় ইঙ্গিত! আরেকজন প্রশান্ত, গম্ভীর, সর্বকিছুতেই সন্তুষ্ট আর একান্ত বিশ্বাস প্রবণ! ওরা যেন দুজনেই হাসছে! একজন বাসনায় উদ্বেল। আরেকজন স্নেহে বিশ্বাসে আত্মসমাহিত!

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, সুরভী সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। কাজের মাঝে ভুলিয়ে রাখতে চাইল নিজেকে। তাড়াতাড়ি এসে ঢুকল রান্নাঘরে।

তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা! ওর স্বামীর এতক্ষণে ফিরে আসবার কথা। প্রত্যেকটা মিনিট দুশ্চিন্তায় ওর কাছে যেন দীর্ঘ এক একটা ঘণ্টার মত মনে হোল।

দেখতে দেখতে সাতটা! সাড়ে সাতটা, সাতটা পঁয়তাল্লিশও বাজল এক সময়ে! সুরভী অস্থির হোল!

'কেন এত দেরী হচ্ছে ওঁর! তবে কি এর মধ্যেই কেউ ওঁকে সব বলে দিল?'—

'হে ভগবান হে ঈশ্বর! এরকম অবস্থায় আর কেউ হলে ঘর থেকে বেরই করে দিত। তবে এতটা চরম শাস্তির কথা ওর স্বামী নিশ্চয়ই ভাবতে পারবেন না। সুরভী ভাল করেই জানে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বামী নিজেই করবেন। সমস্ত দুঃখের ভার বহন করবেন নিজেই!

অনুতাপে দুচোখে জল ভরে উঠল সুরভীর। ও প্রার্থনা করে মনে মনে 'হে ভগবান ওঁকে তাড়ার তাড়ার ঘরে ফিরিয়ে দাও। ওঁর যেন কোন ক্ষতি না হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও আমি ওঁর অবিশ্বাসী হবনা। কখনো না!

আটটা পনর! সাড়ে আটটাও বেজে গেল।.....ঈশ্বরের কাছে সুরভী নীরবে প্রার্থনা জানিয়ে চলল। অজস্র প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট করতে চাইল সর্বশক্তিমানকে!

আটটা পঁয়তাল্লিশ! দেখতে দেখতে ন'টা বাজল। ক্রমেই সেই সন্ধ্যার ঘটনার কথা মনে ক'রে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ল সুরভী। গভীর এক নৈরাশ্য ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বারে বারে ও প্রার্থনা করল, "হে ঈশ্বর ওঁকে তুমি তাড়ার তাড়ার ঘরে ফিরিয়ে দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি: ওঁকে সবকিছু খুলে বলব। সবকিছু। আমার অপরাধ স্বীকার করব আমি! তারপর ওঁর সমস্ত বীভৎস দেব মাথা পেতে। যে দণ্ড উনি দেবেন নীরবে তা মেনে নেব! বাড়ী থেকে যদি বেরিয়ে যেতে বলেন তা'ও যাব।"

উঠোনের কাঁকর বিছানো পথে এবার পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা গেল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সুরভী। লজ্জা আর অপরাধের বিগলিত অশ্রুধারা যেন ওর দুচোখ অন্ধ করে দিল এবার। তাড়াতাড়ি ও এসে জানলার কাছে দুচোখ মুছে ফেলল। স্বামীকে সহাস্যে স্বাগত জানাতে সজাগ তৈরী হয়ে নিল সুরভী।

স্বামীকে খুবই পরিশ্রান্ত আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। গলার স্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে মুখে জোর করেই হাসির রেখা টানল সুরভী। তারপর জিজ্ঞেস করল—

"কিগো এত দেরী হোল যে?"

"আর বলনা, বিশুর অফরী কাজ পড়ে গিয়েছিল!" উনি যেন কথাগুলো বললেন খুবই ক্লান্ত স্বরে! তারপর একটা আরাম কেদারায় নিজের শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলেন। চোখদুটো বুজে এল ওঁর। তারপর আর কিছু বললেন না! চুপ হয়ে গেলেন! যে ভয় সুরভী করেছিল তা-ই যেন সত্য হোল। তা হোক। সুরভী শক্ত হতে চাইল! সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে! যে-করেই হোক স্বামীকে সব কথা জানাবে সুরভী। সব সে স্বীকার করবে!

স্বামী আবার চোখ খুললেন। ক্লান্ত মুখে যেন হাসি ফোটালেন! তারপর বললেন—

"ওই, খেতে দাও!"

সুরভী ব্যস্ত হল। বললে—"তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি ততক্ষণে ভাত বেড়ে ফেলছি!"

কিন্তু বিবেক ওদিকে সুরভীকে দংশন করছে। কই সুরভী অপরাধ তো স্বীকার করলেনা! কয়েক মিনিট ও অপেক্ষা করল। দারুণ বুক ধাঁধল, তারপর স্বামীকে বললে—

"শুনছ, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে। একটু পরে খেলে তোমার আপত্তি হবে?"

"বেশ বল। কি হয়েছে সুরভী?"

সুরভী চোক গিলল। কথাটা গুছিয়ে শুরু করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন কথাই ওর মুখ দিয়ে বেরুল না।

"ব্যাপার কি শুনি?" স্বামীর উদ্বেগ।

"না, মানে, তোমার···তোমার এই চিঠিটা এসেছে!" আলমারীর তলা থেকে তাড়াতাড়ি চিঠিটা তুলে এনে স্বামীর হাতে দিল সুরভী।

ওর মনে হোল বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা যেন বিরাট এক ঘড়ির মত ভয়ঙ্কর জোরে জোরে শব্দ করছে! সুরভী ওর হাতের কাঁপনটুকু লুকোবার চেষ্টা করল!

স্বামী নীরবে চিঠি পড়া শুরু করতেই প্রায় অসাড় হয়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল সুরভী। ওর মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টিকে সরাল না। স্বামীর মুখের রেখায় সামান্য পরিবর্তনও সুরভীকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অবশেষে চিঠি পড়া শেষ হোল ওঁর। ক্লান্ত স্বরে উনি শুধু বললেন "সব সময়ে একজন না একজন লেগেই আছে।"

সুরভীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হোল। সে জানত ব্যাপারটা এভাবেই আসবে। সে জানত এভাবেই ধরা পড়বে ওর অপরাধ।

ভয়ঙ্কর অবসন্নের মত স্বামী বললেন "আচ্ছা সুরু, কজনকে আমরা সাহায্য করব বলত? দেখ, এবার কাজি কিছু বার চেয়ে পাঠিয়েছে।"

সুরভীর সতর্কতা তবু দূর হোলনা। বললে "তাই নাকি? তা উনি আর কিছু লেখেন নি?"

"না, তেমন আর অফরী কিছু নয়।"

হঠাৎ স্বামীর চোখে সুরভীর মুখের ভয়ার্ত ছায়াটুকু যেন কেঁপে উঠল। সস্নেহে সুরভীর কাঁধে উনি হাত রাখলেন। জিজ্ঞেস করলেন "কি হয়েছে বলত সুরু? তোমাকে খুব উতলা দেখাচ্ছে। তুমি কি কোন কারণে ভয় পেয়েছ?"

প্রশ্নের অবসর এই সুযোগটুকু নিশ্চিন্ত করল সুরভীকে। চকিতে স্বামীর কোলে মাথা গুঁজে দিল। প্রবল এক কান্নার স্রোত ওকে উথাল করে তুলল। ওর সারাশরীর ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল! স্বামী সস্নেহে ওর চিবুক তুলে ধরলেন! শান্তস্বরে বললেন "কি হয়েছে সুরু? কান্না কিসের, বল!"

প্রেমের দৃষ্টিতে সুরভী দেখল এবার স্বামীকে। হ্যাঁ, এবারেই ওর সোপন অপরাধটুকু স্বীকার করতে হবে। ঠোঁট দুটো বিশ্রিষ্ট হোল সুরভীর। ও কথা বলার চেষ্টা করল। আবার চোক গিলল এবারেও কোন কথাই ওর মুখ দিয়ে বেরুলনা! শুধু গাল বেয়ে বড় বড় মুক্তোর মত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল।

স্বামী ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন হলেন। ওর চুলে শীতল হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। হাতে চুলের রেশমী স্পর্শটুকু নিতে নিতে সস্নেহে বললেন "বল সুরু, কি হয়েছে তোমার, বল। আমাকে বিশ্বাস কর!"

এই মহূর্তে সুরভী অভিভূত হোল! আবেগে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় ভাবে। এতক্ষণে সে কথা বলল। এতক্ষণে কথা ফোটল সুরভীর। সে বলল—

"হ্যাঁগো, তুমি বাড়ীতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারনা? আমার ভয়ঙ্কর ভাবনা হয়। বড় ভয় করে!"

* * * *

একবার একজন লোক নিজের বিপদের কথা ব'লে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেয়। টাকা নেবার সময় বলে যে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকৃতজ্ঞ, চিরঋণী থাকবে। লোকটি আর কোনোদিনই কিন্তু টাকাটা ফেরৎ দেয়নি। একদিন তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ বললেন "লোকটা কথা রেখেছে যে। সত্যি চিরঋণী ক'রে গেলো।"

সাহিত্য সংবাদ

কবি অন্তিম শয্যায়। মনে বড়ো আক্ষেপ, যে মহাকাব্য এতদিন ধ'রে লিখে সবে শেষ করেছেন তা সংশোধন করার সময় হয়ে পাবেন না। মনে-মনে যে মহাকাব্যের কথা ভেবেছেন, রচিত মহাকাব্যখানি তো তার দুর্বল প্রতিধ্বনি। তাই, কাছে যারা ছিলো তাদের বললেন সব পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসতে। সেগুলি পুড়িয়ে ফেলবেন। কথাটা রোমের সম্রাটের কানে গেলো। তাঁর কাছ থেকে আদেশ এলো কবি যেন পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে না ফেলেন। যাঁর সময়োচিত হস্তক্ষেপে অমূল্য পাণ্ডুলিপি সেদিন রক্ষা পেয়েছিলো তিনি রোম সম্রাট অগাষ্টাস, পাণ্ডুলিপিটি ছিলো বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য 'ঈনিড'-এর, আর যিনি নিজের সৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ওই খ্যাতনামা কাব্যের পাণ্ডুলিপি নিশ্চিহ্ন করতে যাচ্ছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনি প্রাচীন রোমের শ্রেষ্ঠ কবি ভার্জিল।

• • • • •

বিভিন্ন ধরণের লেখার হাত ছিলেছিলেন, আজো বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর লেখা 'ডায়েরী'র জন্য। 'ডায়েরী' লিখতে শুরু করেছিলেন ১৬৬০ সালের ১লা জানুয়ারী, এটি শেষ হয় ন বছর পরে। এত দেরি হওয়ার কারণ লেখকের দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। 'ডায়েরী' লেখেন তিনি তাঁর নিজস্ব সর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতিতে। ছাপবার ইচ্ছা লেখকের ছিল না। বহুদিন পরে ডায়েরীটির অর্থ উদ্ধার করা হয় এবং ১৮২৬ সালে প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। এই বইখানি থেকে পাওয়া যায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় রাজা চার্লসের দরবারের জীবন্ত বর্ণনা। সাহিত্য হিসেবেও 'ডায়েরীর' মূল্য অপরিসীম। এই আশ্চর্য 'ডায়েরী' যাঁর কলম থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো তিনি স্যামুয়েল পেপিস।

• • • • •

ব্যঙ্গ—পুস্তিকা রচনার দায়ে লেখক অভিযুক্ত হলেন। জরিমানা তো দিতেই হলো, তা ছাড়া তাঁকে তিন তিনটে দিন কাঠের তৈরি পিলরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো। কিন্তু সততা গৌরব, আর নির্ভীকতার জন্য ওই লেখক ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি দণ্ডিত হয়েছেন শুনে তাই দলে দলে ছুটে এলো লোক। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই পিলরী ভরে উঠলো নানা বর্ণের ফুলে। শুধু দু বছরের জন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হলো। তাঁর পিলরী বন্দনা'র কত কপি যে বিক্রি হলো তার ইয়ত্তা নেই। এমনি নির্ভীক আর জনপ্রিয় লেখক ছিলেন 'রবিনসন ক্রুশোর' খ্যাতনামা লেখক ড্যানিয়েল ডিফো।

• • • • •

উনবিংশ শতকের এক দুপুর বেলা। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে পথ হেঁটে ক্লান্ত এক পথিক ঘুমিয়ে পড়েছেন একটা বকুল গাছের ছায়ায়। পথিক সেকালের একজন বিখ্যাত কবিয়াল। যে গ্রামে এসে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তার নাম জারা গ্রাম, মুলোর জন্য তখন বিখ্যাত। সে গ্রামের লোকেরাও কবিয়ালকে ভালো ক'রেই চিনতো। তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ক'য়েকজন লোক গ্রামের জমিদারবাবুকে গিয়ে খবর দিলো। জমিদারবাবু ছিলেন কবিগানের বিশেষ ভক্ত।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ওই খ্যাতিমান কবিয়ালকে পেয়ে তাঁর তো মনে আনন্দ ধরে না। তিনি তক্ষুনি দুজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। জমিদারবাবুর আদেশক্রমে তারা ওখানে তাঁর পাঁড়িয়ে রইলো। পথিকের ঘুম ভাঙতেই জমিদারবাবুর অনুরোধের কথা জানিয়ে তাঁকে মহা সমাদরে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। তাঁর খানাপিনার সুব্যবস্থা হলো। জমিদারবাবুর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'য়ে কবিয়াল রাজি হলেন সন্ধ্যা বেলা কবি গান করতে। নির্দিষ্ট সময়ে গানের আসর বসলো। বিখ্যাত কবিয়ালের প্রতিপক্ষ হিসেবে আসরে নামলেন স্থানীয় একজন গায়ক। তাঁর নাম জগন্নাথ কি জগমোহন ধরণের কিছু হবে। তিনি গাইতে নেমেই জমিদারবাবুকে ধরণ তোষামোদ শুরু করলেন। জমিদারবাবুকে তুলনা করলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রীকে শ্রীরাধার সঙ্গে, আর জানালেন, যে জায়গা গ্রামে তাঁরা দু'জন আছেন তা সাক্ষাৎ বৃন্দাবন না হ'য়ে যায় না। ওই নির্লজ্জ তোষামোদ শুনে খ্যাতিমান কবিয়ালের ব্রহ্মরন্ধ্র শুদ্ধু রাগে জ্ব'লে উঠলো। তাঁর যখন পালা এলো, তিনি কবিয়ালের ভাষাতেই তীব্র ভিরস্কার জানালেন স্থানীয় গায়ককে, যার ভুল খোসামোদে মোটা কবিয়াল তুলকেই অপমানিত, হেয় ক'রে তুলেছে। বললেন :

"ওরে অপা, হতভাগা,
কেমন ক'রে বললি আরে বৃন্দাবন!
কোথায় রে তোর শ্যামকুণ্ড?
কোথায় রে তোর রাধাকুণ্ড?
সামনে আছে মুলাকুণ্ড, করগে মুলা বরশন,
তুই কবি গাইবি, পরলা পাবি, খোসামুদী তা কারণ।"

এমনি নির্ভীক, আর স্পষ্ট বক্তা ছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা। আজ যখন দেশ আবার অন্ধ তাবেতায় মুখর হ'য়ে উঠেছে, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারাও খোসামোদই চাচ্ছেন, সেই সময়ে আবার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ভোলা ময়রাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করার।

• • • •

নতুন দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনে প্রান্তরে নদীজলে। সে কিরণে আলোকিত হ'য়ে উঠেছে পরাক্রান্ত গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ। প্রাসাদ-দ্বারে হাজির হয়েছেন এক তরুণ কবি। হীনহীন বেশে। দারিদ্রের প্রতি চিরকালই দারুণকালের অবজ্ঞা। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। রাজার সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরে থাকুক, প্রাসাদের দ্বার থেকেই বুঝি যুবককে ফিরে যেতে হবে বুকে আশা ভঙ্গের বেদনা নিয়ে। একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে চাইলেন তরুণ। ভূর্জ পাতায় পাঁচটি শ্লোক লিখে দিলেন দ্বারীর হাতে। কাকুতি মিনতি করলেন রাজার কাছে শ্লোক ক'টি পৌঁছে দেবার জন্য। কী ভেবে দ্বারী রাজি হলো। শ্লোক ক'টি নিয়ে দ্বারী গিয়েছিলো গজাইলস্করী চালে, ফিরে এলো ভিজে চুপচুপে হ'য়ে। তার মুখের চেহারাও তখন একেবারে পাল্টে গেছে। সেই অবজ্ঞার ভাব একেবারেই নেই। রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন যুবককে। নতুন আর অসাধারণ কবি প্রতিভার আবির্ভাব ক'রে রাজা নিজেকে ধন্য মনে করছেন। ওই পাঁচটি শ্লোকের সৌন্দর্যে তিনি

মুগ্ধ। রাজা, চন্দন আর পট্টবস্ত্র দিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন, তাঁর জন্য একটা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী কবি সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করলেন। এমনি বিদ্যোৎসাহী আর কারা-অনুরাগী ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার বিখ্যাত রাজা গণেশ। যাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনি বাঙালীর প্রিয় কবি কৃত্তিবাস।

* * * *

রায় পড়বার সময় বিচক্রফ্‌ট সাহেব কৌতূহলী চোখে 'অপরাধী'দের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খেতাব কাজী ঘোষ হয় আশা করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড শুনে আসামীরা 'সখি আমায় ধর ধর' ব'লে মূর্চ্ছা যাবে। কিন্তু একজন আসামী জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন "Thank you very much"!' সাহেব একরকম অপ্রস্তুত ও নিরাশ হয়ে বাকি রায়টুকু কোনোরকমে প'ড়ে শেষ করলেন। এমনি অদ্ভুতোত্তর ছিলেন বাংলার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আর বারীন ঘোষ।

ওই সকল বীর যুবক সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন :—

.. "আমাদের বিপক্ষের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে-কালের বাঙালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল ; শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চকাঙ্ক্ষাশূন্য, নয় দুশ্চরিত্র, দুর্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সততাশূন্য। এই দুই চরমাবস্থার মধ্যবর্তে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশ জন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যৎ কালের পথ প্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তেজস্বী আত্মসম্মান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাঙালীর বুদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য; এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, নির্মলতা, ভাবনা ও সন্তাপের অভাব সে কালের উন্নতচিত্ত ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন কর্মস্রোতের লক্ষণ।"... ..

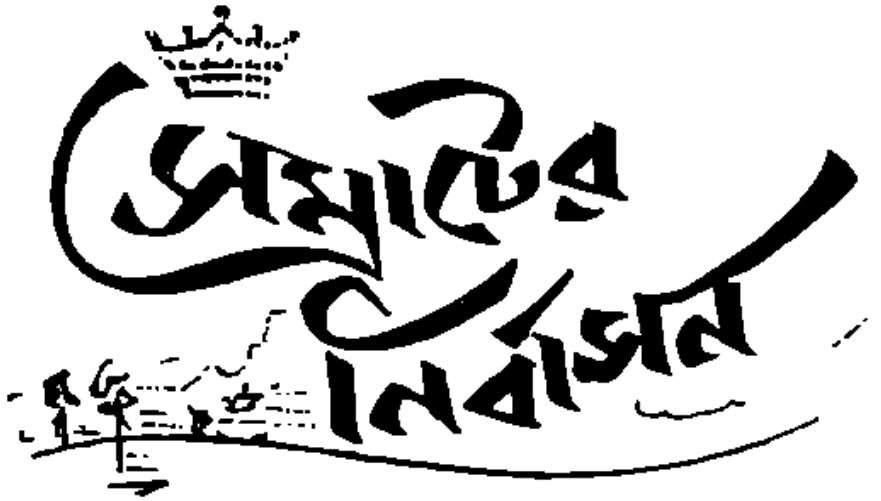

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন-রহস্য

বরুচি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কিছুদিন পর্যন্ত চার্লির দিনগুলি পরম আনন্দ এবং সার্থকতার মধ্যে কাটতে লাগল।

পলেটের সঙ্গে বিচ্ছেদ মনের মধ্যে কোন গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারেনি। তার অসার চিত্ততায় চার্লি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, দুঃখিত হয়েছিলেন। তাই পলেট যখন স্বেচ্ছায় চলে গেল তখন ক্ষণেকের জন্য বেদনা বোধ করলেও তিনি অনেকখানি স্বস্তিও বোধ করেছিলেন সেই সঙ্গে।

গ্রেট ডিক্টেটর সাফল্য লাভ করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই সার্থকতাবোধ তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল। নতুন ছবির কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

তারপরেই হঠাৎ ঝড় উঠল। কুৎসিত কালো ঝড়। সেই ঝড়ের ঝাপটে তাঁর এতদিনের সঞ্চয়, অর্থাৎ তাঁর জগৎব্যাপী যশ আর জনপ্রিয়তাকে সমূলে উৎপাটিত করে তাঁকে একেবারে রসাতলে ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করল।

শুরুতে কিন্তু তেমনতর সর্বনাশের কোন আভাসই পাওয়া যায়নি। একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। নাম, জোন বেরি, বছর বাইশ বয়েস, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, কথাবার্তায় চালচলনে যৌবন সুলভ উচ্ছলতা, মেকসিকো থেকে নিউইয়র্ক হয়ে এসেছে। ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা।

জোন বেরি চার্লির সঙ্গে ঘনিষ্ট হল. কয়েকদিন পরেই জানালো, সে যদি চার্লির কাছে থাকবার সুবিধা পায় তাহলে আর নিউ ইয়র্কে ফিরবে না।

জোনের প্রস্তাব শুনে চার্লি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। প্রস্তাবটি তাঁর কাছে বেআব্রু বলে মনে হল।

সেই সময় তিনি 'শ্যাডো অ্যাণ্ড সাবস্টান্স' নামে নাটকটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জোন বেরির নিবন্ধাতিশয্যে তিনি তাকে সেই ছবিতে একটি ভূমিকা অভিনয় করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ করলেন। মাইনে ঠিক হল, সপ্তাহে ১৫০ ডলার।

কিছুদিনের মধ্যেই গোলমাল শুরু হল।

জোন বেরি নিয়মিত স্টুডিওয় হাজিরা দেয় না। পর পর কয়েকদিন তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারপর একদিন মস্তাবস্থায় চার্লির বাড়িতে এসে মহা হৈ হল্লা আরম্ভ করে দিলে।

চার্লি বিষম চিন্তিত হলেন। তাকে তিরস্কার করলেন। এভাবে তাঁর বাড়ি চড়াও হতে নিষেধ করে দিলেন।

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। যখন তখন জোন, রাত বারোটা নেই একটা নেই, তাঁর বাড়িতে হানা, দেখা হলেই অশালীন আচরণ, অশ্রাব্য কথা—এক কথায় জোন বেরি চার্লির জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো।

চার্লি বুঝলেন, তিনি এক অত্যন্ত নষ্টচরিত্র মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন, যার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না, কী করে এই স্ত্রীলোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত সারাক্ষণ ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। কাজকর্ম শিকেয় উঠল।

শেষ পর্যন্ত জোন বেরি আদালতে গেল চার্লির ছবিতে অভিনয় করবে না। কিছু টাকা পেলে সে তার মাকে নিয়ে নিউইয়র্ক চলে যাবে।

তার সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চার্লি তখনি তাকে মোটা টাকা দিলেন। জোন বেরি চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চার্লি।

ইতিমধ্যে অর্সন ওয়েলেস-এর কাছ থেকে তিনি একটি নতুন ছবির প্রেরণা পেলেন।

বিখ্যাত ফরাসী নরঘাতক লাঁক্রর জীবনী নিয়ে ওয়েলেস একটি শুধাচিত্র করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি চার্লিকে বললেন, ঐ লোকটার জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে একটি নতুনতর ভাল ছবি তৈরী করা যায়। প্রস্তাবটা চার্লির মনে ধরল। ওয়েলেস-এর সঙ্গে আলোচনার পর চার্লি 'লাইমলাইট' বন্ধ করে নতুন ছবির কাজে লাগলেন। ছবির নামকরণ হল—মঁসিয়ে ভার্দু!

এই সময়েই উনা ওনীলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। উনার তরফে একজন থিয়েটর এজেন্ট চার্লির কাছে এক দরখাস্ত পাঠিয়েছিল, দরখাস্তকারিণী উনা ওনীল সিনেমায় অভিনয় করতে চায়, চার্লি তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

দরখাস্তটি দেখে চার্লির কৌতূহল হল। তিনি উনাকে ডেকে পাঠালেন।

উনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই চার্লি বিস্মিত হলেন। এতদিন ধরে যেসব মেয়েদের তিনি দেখেছেন, অভিনয় করিয়েছেন, তাদের সঙ্গে উনার অনেক তফাৎ। আনকোরা নতুন, কিন্তু কথায় আর আচরণে যেন একটি পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠছে। বয়েস হবে বড় জোর আঠারো। কিন্তু আলাপ আলোচনায় পরিণত মনের আভাস! মুগ্ধ হলেন চার্লি।

পরিচয় ক্রমে নিবিড় হল। উনার বয়েস আঠারো আর চার্লির পঞ্চান্ন। বয়সের বিপুল পার্থক্য। কিন্তু উনা সে পার্থক্যকে আমল দিল না। শীঘ্রই তাঁদের বিবাহ হবে স্থির হল।

এমন সময় আবার ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হল জোন বেরি।

এবার সে এলো সর্বনাশা মূর্তি নিয়ে। ষড়যন্ত্রের নায়িকারূপে।

চার্লির প্রধান গৃহরক্ষকের কাছে সে জানিয়ে গেল যে সে নিরাশ্রয় এবং তিনমাস সন্তানসম্ভবা।

সংবাদটা শুনে চার্লি তেমন কিছু বিচলিত হলেন না। মৃদুকণ্ঠে বলে দিলেন, আবার যদি সে আসে তাহলে তাকে ঢুকতে দেবেনা এবং তাতেও যদি না শোনে, পুলিস ডাকবে।

পরে প্রকাশ পেয়েছিল, জোন বেরিকে যতদূর দিয়েছিল এক বাজে সাংবাদিক। তারই নির্দেশমত জোন বেরি ঘন ঘন চার্লির বাড়িতে হানা দিতে লাগল এবং শেষ অবধি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে চার্লি পুলিসে ফোন করলেন।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন একসঙ্গে কাঁসরটা বোমা ফেটে পড়ল। সংবাদপত্রগুলো যেন তৈরী হয়েই ছিল। বড় বড় হেড লাইন দিয়ে তারা সেই খবর ছাপল:

"চার্লি চ্যাপলিন সরকার যে নারী তাঁর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে তাকে চার্লি পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছেন··· লম্পট শিরোমণি চার্লি চ্যাপলিনের নতুন কীর্তি ···" ইত্যাদি।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জোন বেরি চার্লির বিরুদ্ধে তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্বের মামলা দায়ের করল।

চার্লি তাঁর উকিল লয়েড রাইটকে ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ করলেন। রাইট বললেন, এ অবস্থায় উনাকে কিছুদিনের জন্যে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

চার্লি সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। অবশ্য মিথ্যা মকদ্দমার ভয়ে তিনি সংকল্পচ্যুত হবেন না, উনাও নিউইয়র্ক চলে যেতে চাইবে না। তাঁদের বিবাহ হবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব তিনি এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন।

আশ্চর্য মেয়ে উনা। চার্লির প্রতি কথাকে সে সমর্থন করল, তাঁকে উৎসাহ দিল, সাহস দিল।

দু'জনে চলে গেলেন সান্টা বারবারায়। সেখানে তাঁদের বিবাহ হল বিনা আড়ম্বরে —একান্ত নিভৃতে গোপনে।

দু'মাস তাঁরা রইলেন সেখানে।

সংবাদপত্রের হলাহলের বাইরে, অতিথি অভ্যাগতের আনাগোনার পীড়ন এড়িয়ে তাঁদের সেই রমণীয় অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি নিষ্কলুষ শান্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল।

মাঝে মাঝে চার্লি যখন অবসাদগ্রস্ত হতেন, যখন ভাবতেন যে তাঁর ভাগ্যদোষে সমগ্র জাতির বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি এবং তাঁর চলচ্চিত্রজীবন শেষ হয়ে গেছে তখন উনা তাঁকে সাহস দিতো সান্ত্বনা দিতো, নানা বই পড়ে শোনাতো।

• • • •

লস্ এঞ্জেলস্-এ ফিরে চার্লি তাঁর বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের জজ মারফির মুখে এক বিস্ফোরণ সংবাদ শুনলেন। কয়েকজন বিশেষ প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা নাকি বলেছেন, যে করেই হোক এবার চার্লিকে বন্ধ করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ফেডারাল গভর্নমেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হল। সরকারের পিছনে ছিল বহু সংবাদপত্রের ঐকতান।

চার্লির উকিল পিতৃত্বের মামলার জন্যে তৈরী হলেন। এটি ছিল দেওয়ানী মামলা। স্থির হল জোন বেরির যে বাচ্চা হবে তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং তার দ্বারায় প্রমাণ পাওয়া যাবে যে চার্লি সেই সন্তানের পিতা কিনা।

যথা সময়ে জোন বেরির রক্ত দূষিত হল।

এদিকে গভর্ণমেণ্ট চার্লির বিরুদ্ধে যান অ্যাক্ট ভঙ্গের এক ফৌজদারী মামলা আনলেন।

এই যান অ্যাক্ট আমেরিকার এক অতি অগ্রচলিত আইন। এই আইন অনুসারে ব্যভিচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হয়। বহুদিন এই আইন অনুসারে কোনো মামলা হয়নি। এই আইনের ধারা ছিল যেমন জটিল তেমনি একপেশে। সুদূর অতীতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করবার জন্যেই কেউ কেউ দু'একবার এই আইনের সাহায্য নিয়েছিল। সেই অদ্ভুত আইন প্রয়োগ করা হল চার্লির ওপর।

কয়েকদিন পরে চার্লির উকীল এসে তাঁকে জানালেন যে তিনি চারপাঁচ রকম অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। চার্লির মনে হল যেন গভীর অরণ্যের মধ্যে হিংস্র জানোয়ারের মাঝখানে তিনি পড়েছেন, পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। যদি সুবিচার না হয় তাহলে তাঁকে বিশবছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

চার্লি যেদিন প্রথম কোর্টে গিয়ে ফেডারাল অফিসের কর্তৃপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়মানুযায়ী কাগজপত্রে টিপ্ সই দিলেন সেদিন সংবাদপত্রের ফোটোগ্রাফাররা বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে অফিস ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর ছবি তুলতে লাগল।

কর্তৃপক্ষের দিকে তাকিয়ে চার্লি বললেন—কোন্ অধিকারে এরা এইভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে ছবি তুলছে?

কর্তৃপক্ষ উদাসীন ভাবে জবাব দিল—কি করব বলুন। এদের ঠেকানো যায়।

যথাসময়ে জোন বেরির, তার সন্তানের এবং চার্লির রক্ত পরীক্ষা করা হল।

দুদিন পরে সকাল বেলা চার্লির উকীল টেলিফোনে উত্তেজিতস্বরে চার্লিকে জানালেন—চার্লি, তুমি মুক্তি পেয়েছো, রক্তপরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে তুমি ঐ সন্তানের জন্মদাতা নও।

সরকারী ফৌজদারী মামলা কিন্তু থামলোনা।

দুই পক্ষের এজাহার এবং সাক্ষীসাবুদের জবানবন্দীর পর বিচারক জুরীদের চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। তার আগের দিন থেকে চার্লি অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় অভিভূত হয়েছিলেন।

প্রত্যহ সকাল হতে না হতেই আদালতে হাজিরা দেওয়া এবং সারাক্ষণ সেখানে বহু লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বসে থাকা চার্লির স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর দুঃসহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিলো। শেষ দিনে তাঁর উকীল বললেন—আজ তুমি কোর্ট থেকে চলে যেতে পারবেনা যতক্ষণ না বিচারক রায় দেন।

চার্লি বুঝলেন আজ তিনি স্বাধীন মানুষ নন, তিনি আজ আইনের সম্পত্তি।

জুরীর সভ্যরা আদালতকক্ষ থেকে নিজেদের ঘরে চলে গেল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবার জন্যে। আধঘণ্টা পার হল তারপর একঘণ্টা। তবুও তাদের ফিরে আসার নাম নেই। এ মামলায় তো চার্লির বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি তবুও তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? অসহ্য উৎকণ্ঠায় চার্লির সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাইরে কিন্তু তিনি অবিচল স্থির নিষ্কম্প।

অবশেষে পাঁচটা নাগাদ জানা গেল যে জুরীদের পরামর্শ শেষ হয়েছে এবং তারা তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছে।

একটু পরেই বিচারক এসে তাঁর আসনে বসলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে জুরীর সভ্যরাও আদালতের ভিতরে এসে ঢুকল। তাদের মুখপাত্র আদালতের কেরাণীর হাতে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিল।

বিচারক কাগজটি দেখলেন। তারপর আদালতের কেরাণী কাগজটি হাতে করে উঠে দাঁড়ালো।

চারিদিকে সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। সেই নিদারুণ নিঃস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে আদালতের কেরাণীর ঘোষণা শোনা গেল :

"চার্লি চ্যাপলিন, কেস নম্বর ৩৫৭০৬৮, আসামী· ···নির্দোষী।"

চারিদিকে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি উঠল। অনেকে ছুটে এসে চার্লিকে জড়িয়ে ধরল। চার্লি কল্পনা করতে পারেননি যে আদালত-ঘরের সেই প্রচণ্ড তাঁকের মধ্যে তাঁর এত শুভানুধ্যায়ী এত বন্ধু নীরবে অপেক্ষা করছিল। আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল, দুচোখে জল দেখা দিল।

বিচারক বললেন—মিঃ চ্যাপলিন, আপনি মুক্ত, আপনাকে অভিনন্দিত করি।

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। চার্লি দুহাত বাড়িয়ে তাঁর সেই হাত ধরলেন। বিপক্ষের কৌঁসুলিও এগিয়ে এসে চার্লির সঙ্গে করমর্দন করলেন।

বাড়ীতে উনা অধীর আগ্রহে মামলার ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে তখন চারমাস অন্তঃসত্ত্বা। টেলিফোনে চার্লির কাছ থেকে খবর পেয়ে উনা কিছুক্ষণের জন্যে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল।

বাড়ী ফিরে চার্লি উনাকে নিয়ে নিজেদের শোবার ঘরের মধ্যে বসে রইলেন এবং সেইখানে বসেই দুজনে রাতের আহার সমাধা করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় কোনো সংবাদপত্র তাঁরা দেখলেন না, কোনো অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করলেন না, কোনো টেলিফোন ধরলেন না। মামলা জিতলেও চার্লির মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চারিদিকে এক বিরাট শূন্যতা।

চার্লি সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। এই মনে করে তাঁরা তৃপ্তি বোধ করলেন যে পরের দিন আর তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে আদালতে দৌড়তে হবে না।

দু'একদিন পরে তাঁর এক বন্ধু রসিকতা করে চার্লিকে বলেছিলেন—বাহাদুর বটে তুমি। থিয়েটার জগতে তুমিই বোধ করি একমাত্র শিল্পী যে একটা গোটা জাতের রাজনৈতিক বৈরিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছো।

• • • •

এই বিচার আরম্ভ হবার আগে একটি ছোট্ট ঘটনায় উনার মনের একটি বিশেষ অনুভূতি উদ্ঘাটিত হয়েছিল। গভীর অনুরাগের সঙ্গে চার্লি নিজের আত্মজীবনীতে সেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

উনার একটি অর্ডোয়া-বসানো ড্যানিটিকেস মেরামত করবার জন্যে তাঁরা দুজনে একটা গহনার দোকানে গেছেন। দোকানদার জানালো আধঘণ্টার মধ্যে সেইটি তারা মেরামত করে দেবে। তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং সেই ফাঁকে একটি শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ব্রেসলেট পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। হীরা এবং চুনী বসানো একটা চমৎকার ব্রেসলেট তাঁদের

দুজনেরই খুব পছন্দ হল। কিন্তু দাম শুনে উনা হাথা নেড়ে বলল যে দাম বড্ড চড়া, সে অত দাম দিয়ে ঐ ব্রেসলেট কিনবেনা। এই বলে সে তার ভ্যানিটিকেস সাবোনো হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই দুজনে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠলেন। উনা গাড়ী চালালো। একটু পরে চার্লি বলে উঠলেন—ইস! তাইতো, কি করা যায় এখন?

ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে উনা বললে—কি হয়েছে?

চার্লি ধীরে ধীরে পকেট থেকে সেই হীরা-চুণী বসানো ব্রেসলেটটি বার করলেন, বললেন—দোকানী যখন তোমাকে অন্য গহনাগুলি দেখাচ্ছিল সেই ফাঁকে আমি এটা সরিয়ে ফেলে পকেটে পুরে ছিলাম। দোকানী জানতে পারেনি। ব্রেসলেটটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই না?

উনার মুখ দিয়ে বেরুলো—কি সর্বনাশ! তার সারা মুখ পলকে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। সে গাড়ী থামালো। তারপর অতি করুণ এবং হতাশ গলায় বলল—এ তুমি ভারী অন্যায় করেছো।

চার্লি বললেন—তাতো করেছি। কিন্তু এখন তো আর ফিরিয়ে দিতে যেতে পারিনা।

উনার চোখ মুখের অবস্থা দেখে চার্লি আর কপট অভিনয় চালাতে পারলেন না। উচ্চস্বরে হেসে উঠে উনাকে জানালেন যে তিনি এটি দাম দিয়ে কিনে এনেছেন। উনা যখন সেই কাউন্টার থেকে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল সেই ফাঁকে চার্লি দোকানীকে তাড়াতাড়ি একটি চেক লিখে দিয়ে ব্রেসলেটটি পকেটে ভরে নিয়েছিলেন। হেসে বললেন চার্লি—আচ্ছা, যদি সত্যিই এটি চুরী করেই আনতাম তাহলে কি করতে তুমি?

শান্তস্বরে উনা জবাব দিলে—অনেক বিপদের মধ্যে আছ তুমি। আর বিপদ যাতে না বাড়ে তা দেখতে হোত আমায়। সে জন্যে যে কোনো উপায় উপযুক্ত বলে মনে হতো তাই গ্রহণ করতাম।

উত্তর শুনে অভিভূত অন্তরে অবাক বিস্ময়ে চার্লি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন উনার মুখের দিকে।

* * * *

পরবর্তী অধ্যায়: মঁসিয়ে ভার্দু ছবি নিয়ে সেন্সর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ……অবশেষে তাঁরই জয়, কিন্তু শত্রুদের চক্রান্তে মঁসিয়ে ভার্দুর প্রদর্শনী বন্ধ……সেই ছবির বিরুদ্ধে পিকেটিং…… লাইম লাইট ছবির মুক্তি উপলক্ষ করে চ্যাপলিন-দম্পতির আমেরিকা ত্যাগ…ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন…

॥ দুই খণ্ড ॥

রোগ

সুব্রত রায়

চাকরির ধান্দায় নতুন আসা। স্বামীর ঘর। বিয়ের পরেই আসতে চেয়েছিল অমলা। কিন্তু শিবতোষ তখন বাসা পায়নি। মেসে থাকত। কয়েকমাস বাসার চেষ্টা করার পর একটা বাসা পাওয়া গেল।

মফঃস্বল শহরের একেবারে এ প্রান্তে। একটু ফাঁকার ওপর। সামনে মাঠ। পেছনে পুকুর। চারপাশে গাছপালা। অমলা খুব খুশী।

কিন্তু একমাসও হয়নি। সুখ সবে তিলে তিলে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। এমন সময় এই বিপত্তি ঘটে গেল। শিবতোষ কদিন ধরে চৈত্রের রোদে খুব চাকরি করছিল। সাইকেল ঠেলে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘোরা। যেটা ব্লক অফিসের চাকরির নিয়ম। শিবতোষ নতুন রোদ সহ্য করতে পারল না। ও অসুখে পড়ে গেল। প্রথমটায় আমল দেয়নি। ভেবেছে এমন একটু আধটু শরীর খারাপ করেই থাকে। জ্বর কোন কথা শুনতে রাজী হয়নি।

সমস্ত সুখটুকু চুপসে গেল অমলার। এই বিদেশ বিভূঁই বাসরা। এখানে অমলা কিছু জানে না। কাউকে চেনেনা বিশেষ।

দুপুরে ভাত খাওয়াটাও ঠিক হয়নি শিবতোষের। স্নানটা ঠিক হয়নি। ওসব মানা করা সত্ত্বেও অমলাকে আমল দেয়নি শিবতোষ।

দুপুরে ওকে জোর করে বিছানায় শোয়াল অমলা। আর তারপর জ্বর এসে শিবতোষকে চেপে ধরল।

বিয়ের আগে বাপের বাড়ীর জীবনে কখনও এরকম বিপদের স্বাদ পায়নি অমলা। একক ভাবে অমলাকে অসুখের মুখোমুখি হতে হল। নতুন ঘর। নতুন বর। তারপরেই এমনি একটা ঘটনা। শিবতোষের মাথার কাছে বসে অমলার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছিল। এমন কি বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী সেই কলকাতা সহরে। চিঠি পৌঁছতেই এখান থেকে তিনদিন লেগে যাবে প্রায়। তবু যেটুকু সাহস অমলার বুকে সঞ্চিত ছিল তাও খরচ হয়ে গেল। যখন শিবতোষ হঠাৎ জ্বরের ঘোরে বললে—আমার কি রকম মনে হচ্ছে অমলা। এবারে আমাকে অনেক দিন ভোগাবে।

অমলা হিম হতে থাকল। শিবতোষের তপ্ত কপালে হাত রেখে ও ভাবল, বাসাতে একটা থার্মমিটারও নেই। বাসা পাওয়ার সময় কেই বা জানত, যে নতুন সংসারে অসুখ ঢুকবে হঠাৎ।

সেটা শনিবার। সেই শনিবারের চৈত্রের দুপুরে নরেশবাবু তখন সামনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। শিবতোষের অফিসের সহকর্মী। উনি একবার শিবতোষের বাসায় চা খেয়েও গেছেন। সঙ্গে আরও দু একজন ছিল।

অমলা জানালা দিয়ে তাকাল। বিধায় স্থির করল মনটা। হয়ত এ সুযোগ ছেড়ে দিলে আর পাবে না। ততক্ষণে জ্বর হয়ত আরো বেড়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

—ভবেশবাবু—ও ভবেশবাবু!

প্রথম ডাকটা শুনতে পায়নি।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এল অমলা।

—শুনছেন। ভবেশবাবু—ই?

ভবেশবাবু এ পাশে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ভবেশবাবু ঘরে ঢুকলেন। শিবতোষকে বিছানায় শোয়া দেখে এগিয়ে এলেন।

—কি মশাই। এই সকাল বেলাতেও দেখলাম সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছেন। আর এর মধ্যেই আবার এসব কাণ্ড করে বসে আছেন?

ভবেশবাবুর চেহারার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ভাব আছে যার সাহচর্যে গেলেই মনে সাহস আসে। অমলা অতটা আগেকার মত অসহায় নিজেকে ভাবতে পারল না। শিবতোষের কপালে হাত রেখে ভবেশবাবু চমকে উঠলেন। দেহের তাপ ওনার হাতের চেটোতে বেশ উষ্ণ বোধ হল। ভবেশবাবু - আসছি এখুনি, বলে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেলেন। শিবতোষের সাইকেলটা নিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে ভবেশবাবু ফিরলেন। পেছনে পেছনে সাইকেল করে আর একজন ভদ্রলোক। কি যেন নামটা ওর। কমলবাবু। উনিও একদিন শিবতোষের সঙ্গে মেসে এক ঘরে থাকতেন।

অমলাদের বাসার মধ্যের টিউবওয়েলটা আজ সকালে হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। সকালে যি এসে রাস্তার কল থেকে জল ধরে দিয়ে গেছল তা খরচ হয়ে গেছে প্রায়। শিবতোষের জ্বর হু হু করে বাড়ল। শিবতোষ অসহায় হয়ে বিছানায় পড়ে।

ভবেশবাবু বললেন- কমল, তুমি ডাক্তারকে কল দাও। যাবার আগে রাস্তার কল থেকে এক বালতি জল এনে দাও। আমরা রুগীর মাথায় জল ঢালি।

জল এনে দিয়ে কমলবাবু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অমলা কেমন একরকম চুপ হয়ে গেছে। শিবতোষের অসুখ। ও এতো ছিল। প্রথমটায় ভয় পেয়েছিল খুব। তারপর কখন দৈব ঘটনার মত রাস্তায় ভবেশবাবুকে পেয়েছে। বিদেশ বাসনা। ওর এসব গুলো যেন এক সঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। নইলে এই মফঃস্বল সহরের প্রান্ত। খর চৈত্রের দিন। অমলা নতুন মানুষ। কি করত?

কমলবাবু ফিরে এলেন। সঙ্গে ডাক্তারবাবু। কিন্তু কমলবাবুর চেহারা দেখে মনে হল একটা কিছু হয়ে গেছে ওর ওপরে। পরে জানা গেল সাইকেল করে জোরে যেতে গিয়ে চাকা স্লিপ করেছিল এক বাঁকের মাথায়। অমলা কেমন যেন শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ করল। ঠোঁটের তলায় কাটা যায়গায় আইডিনের দাগ।

ডাক্তারবাবু শিবতোষকে পরীক্ষা করলেন। থার্মমিটার নিয়ে জ্বর দেখলেন। বললেন, মাথায় এখনও জল ঢালতে হবে। ওষুধপত্র লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলে ওরা দুজনেই চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা আবার আসব। সন্ধ্যের সময়। কিছুটা দ'টকেস ঠেলে দিয়ে সাইকেলে উঠলেন দুজনে। মনে হল কমলবাবু খোঁড়াচ্ছেন। ভালবাসায় কেমন টানে। হবে নাই বা কেন। এক সঙ্গে এক ঘরে মেসের পাশাপাশি

খাটে দুবছর কাটিয়েছে দু'বছর। সেই শিবতোষের অসুখ। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালাতে গিয়ে রাস্তায় আছাড় খেলেন। অমলা একবাশ মিথ্যাচার দিল শিবতোষকে।

কখন যেন সন্ধ্যা নেমে গেছে। পেরিয়েও গেল প্রায়। ভবেশবাবু আর কমলবাবু আর একবার এসে শিবতোষকে দেখে গেছেন।

কমলবাবু বললেন, এটা নিয়ে তোমার কোন ভাবনা নেই শিবতোষ। ঋতু পরিবর্তনের সময় এটা হয়েই থাকে। বৌদি চিন্তা করবেন না।

মফঃস্বলের রাত। চারপাশে গোলমাল কমে আসছে। রাস্তায় লোকজন চলাচল কমে এল। আকাশে বেশ তারা ফুটেছে। শিবতোষের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে এখন অমলা ভাবল, প্রথমে যতটা জ্বর পেয়ে গেছিল সে জ্বর কখন চলে গেছে। বস্তুত এখন শিবতোষের অসুখটা নেহাতই একবেলার জ্বরের মত ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হল। দু'একদিনে ভাল হয়ে যাবে।

পরের দিন সারাদিন শিবতোষের জ্বর থাকল। ডাক্তারের নির্দেশমত ওষুধপত্তর খেল। সাবু খেল। সকাল হতেই কমলবাবু এসেছেন। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পেতেই অমলা দোর খুলেছে।

কমলবাবু ঘুম থেকে উঠেই পাজামা আর সার্ট পরে শিবতোষের খোঁজ নিতে এসেছেন। এই কাছেই মেস।

—শিবতোষ কেমন আছে বৌদি? রাত্তিরে আর গোলমাল করেনি তো? চলি। বাইরে ঘুরে যাব এখন।

একটু পরে ভবেশবাবু এলেন। শিবতোষের খোঁজ খবর নিলেন। বললেন, অফিস থেকে ফেরার পথে আবার খোঁজ নিয়ে যাবেন। বলেই রাস্তায় নেমে পড়লেন। অমলা কাউকেই চা খাওয়ার জন্য রাজী করাতে পারল না। কমলবাবুও চলে গেলেন। ভবেশবাবু বললেন, থাক না এখন। পরে হবে। এখন বাজারটা ঘুরে ফিরব। চলি। অমলার মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

কিন্তু শিবতোষ পাঁচদিন অতিবাহিত হলেও জ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। অমলা নিজের উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তবে কি অসুখের সঙ্গে কমলবাবু যা বললেন ঋতু পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। শিবতোষ যা আশঙ্কা করছিল সে রকম কিছু হবে? অসুখটা কি কোন দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির রূপ নেবে? বুকের মধ্যে একটা উষ্ণ বাষ্প সৃষ্টি হচ্ছিল। শিবতোষের বিবর্ণ মুখের চেহারা, ঘোলাটে চোখ আর রুক্ষ চুল সব মিলিয়ে অমলার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জোয়ার বলে যাকে ভুল করা হয়েছিল সেটাই ভরা হয়ে দেখা দিল?

অফিস থেকে ফেরবার পথে কমলবাবু আর ভবেশবাবু এলেন। অমলা চিন্তাই করতে পারছিল না যে এদের সাহচর্য না পেলে কি হত? অমলা ভাবছিল। শিবতোষের রোগ। রোগের বিছানা। মফঃস্বল সহরের প্রান্তে এই বাসা। এই ঘর। আর সব মিলিয়ে অমলার মনের এই আতঙ্ক। যেন সব কুয়াশার মত চোখের সামনে পরিবেশ সৃষ্টি করছিল।

কমলবাবু আবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। যাবার সময় হঠাৎ কথাটা বলে ফেলল অমলা। বলেই ভাবল, না বললেই হত। যেন আজকে সে দিনের মত অত জোরে সাইকেল না চালায়। কি ছেলেমানুষী করল সে! না বললেই হত? কি ভাবলেন? তাছাড়া সেদিনকার মত অত জোরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই আজ। কমলবাবুর নিজেরও সেটা খেয়াল আছে।

দুর্ঘটনাও সব সময় ঘটে না। শিবতোষের অসুখেই অমলার এমন হয়ে গেছে। কি ভাবছে, কি বলছে, নিজেই ঠিক করতে পারছে না। নইলে এই পাঁচ দিনের জ্বরে এতটা উতলা হবার মত কি আছে? কমলবাবু, ভবেশবাবুরা যখন রয়েছেন। এমন কি ভবেশবাবুর স্ত্রী ও অফিসের আরো কয়েকজন ও তাঁদের স্ত্রীরাও আরো অনেকে শিবতোষকে দেখে গেছেন। অমলা দুশ্চিন্তা অসঙ্গত মন খুঁজতে চাইল। আরো কয়েকদিন কেটে গেল। শিবতোষের শরীর থেকে রোগ চলে না গেলেও রোগের কারণ নির্ণয় এবং পাকাপাকি ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যদিও শিবতোষ আরও বিছানায় মিশে গেছে, তাহলেও অমলা আর আগের মত হয়ে পড়েনি। সারা মনে প্রাণে একটা ভার বইতে বইতে কেমন একটা অবসাদ এসে চেতনায় জড়িয়েছিল।

শরীরে তাপের মাত্রা অবশ্য তিলে তিলে কমছিল শিবতোষের। শিবতোষ বিছানায় থাকলে সংসারে কি আর চলে? এটা ভবেশবাবু, কমলবাবুরা বুঝতে পেরেছিলেন। দু'জনের সংসারে একজনের অসুখ করলে আর একজনের আহারের আয়োজন নিতান্তই হাল্কা থেকে হাল্কা হয়ে যাবে। শিবতোষ অসুখে পড়বার পর দিন দু'য়েক ভাল করে খেতে বসেনি অমলা। কোন আয়োজন বিশেষ করেনি। খিদেও ছিলনা বিশেষ। কি করে যেন এটা কমলবাবুরা টের পেয়েছিলেন বা হয়ত আন্দাজ করে ফেলেছিলেন। তারপর অমলাকে চেপে ধরেছেন কমলবাবু। শিবতোষের সেবা করতে গিয়ে যদি আপনিও না খেয়ে থাকেন তাহলে আপনারও অসুখ করতে কতক্ষণ? আপনাকে আর রান্না করতে হবেনা। আমি ব্যবস্থা করছি।

ভবেশবাবুও এ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। তবে ওনার বাসাটা একেবারে সহরের ও ধারায়। অমলার না না করে কোন লাভ হয় নি। কমলবাবু মেসের চাকরটাকে দিয়ে দুবেলা টিফিন কেরিয়ারে করে অমলার খাবার পাঠাতে সুরু করে দিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! না হয় স্বামীর অসুখ করেছে। তা বলে তার জন্যে ওকে কমলবাবুদের মেস থেকে খাবার এনে খেতে হবে! অমলার অস্বস্তির একশেষ। কিন্তু কমলবাবু কোনো মানা শোনেন নি। ভবেশবাবুও সায় দিয়েছেন। মনের ভিতর এই চিন্তাটা বস্তুত যেন রোগের চিন্তাকেও সরিয়ে রাখছিল।

রাত তখন কটা হবে কে জানে। হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদের মত কানে এল অমলার। ঘুমের ঘোরে প্রথমটায় খেয়াল হয়নি। তারপরেই মনে হল শিবতোষ। শিবতোষ যেন খুব ছটফট করছে। বিদ্যুৎগতিতে বিছানা ছাড়ল অমলা। বাতি জ্বালল। শিবতোষের মুখের দিকে তাকাল। কপালে হাত রাখল। একি! এ রকম করছে কেন শিবতোষ। মনে হল শিবতোষের হাঁফানির মত হচ্ছে। কিম্বা কে যেন শিবতোষের বুকের ওপর বিরাট ওজনের একটা পাথর চাপিয়ে রেখেছে। থেমে গেছে। অর্ধমৃত প্রাণীর মত চোখ। অমলা কাঠ। রাত। ঘর। বাতি। ওষুধের শিশি। টেবিল। চেয়ার। সব বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। রোগটা গুঁড়ি গুঁড়ি মেরে এতদিন বুকে বাসা বেঁধেছিল। এতদিন ধরে ও যেন অমলার রোগ-ঘরের আয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে। আজ রাত্তিরে যেন সুযোগ পেয়ে রোগ তার শেষ পাশুপত অস্ত্র ছেড়েছে। শিবতোষ খুব হাঁফাচ্ছে।

তারপর। সেই রাত। মফঃস্বল সহরের কালিচালা রাতে অমলা কখন যেন দরজা খুলে বেরিয়েছিল। জানেনা। কি করে ও একা শিবতোষকে ফেলে রেখে অন্ধকারে ছুটে গিয়েছিল তাও

জানেনা। কি করে ওষুধে ভয় করেছিল তাও জানেনা। হয়ত দুই ভয়ের সংঘর্ষে ওকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। অন্ধকার রাতে মেসবাড়ীর দরজায় যখন পৌঁছল তখন অমলার মনে হল ও মরে গেল হাঁফাতে হাঁফাতে।

দু'জনে ফেরবার পথেও একরকম হেঁটে এসেছিল। কমলবাবুকে নিয়ে অমলা যখন ঘরে ঢুকল তখনও শিবতোষ হাঁফাচ্ছে। আর একটা হাত দিয়ে বিছানায় মাথার পাশে কি যেন খুঁজছে। বোধহয় অমলাকে। তাড়াতাড়ি অমলা মাথার কাছে গিয়ে বসল। শিবতোষের কপালে হাত রাখল।

এমনি হতে পারে। ডাক্তারবাবু সে কথা বলেছিলেন। তখনকার জন্যে ওষুধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। কমলবাবু ওষুধ খাওয়ালেন শিবতোষকে। অমলাকে বললেন, ওকে ডাকতে যাওয়ার আগে ওষুধটা শিবতোষের মুখে দেওয়া দরকার ছিল। কারণ ওষুধ খাবার একটু পরেই শিবতোষের আরাম হল। আর একটু পরে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আর অমলার বুকের ভিতরটা তখন থরথর করে কাঁপছে। মনে হল ওর বুঝি এই কাঁপুনি সহজে থামবেনা। কারণ ও কথা বলতে পারছিলনা। শিবতোষ শান্ত হলেও ওর প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সেই অশুভ চিন্তাটা আবার হাঁ করে বুঝি গিলতে আসছে। গলায় বুকে কানের তলায় পিঠে ঘাম জমছিল ওর। এসময় এক গ্লাস জল যদি কেউ এগিয়ে দিত ও একেবারেই শেষ করত। অথচ নিজের উঠতে গেলে মনে হল পড়ে যাবে। মাথা ঘুরছে।

বাইরে চুপি চুপি রাত ঘুরছিল। উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। তারাদের মধ্যে একফালি চাঁদও ছিল। ঘরটা বেশ গরম। অনেকদিন পর চাঁদ দেখল অমলা। বুকে কুকুর ডাকল। চারদিক চুপ। রাত। কত রাত? কে জানে? কমলবাবু পাশের চেয়ারে বসে আছেন। উনি তাড়াতাড়িতে উঠে এসেছেন। যা পরে শুয়েছিলেন তা নিয়ে। গেঞ্জি আর পাজামা। তার উপর একটা চাদর।……শিবতোষ ঘুমিয়ে। স্বামী। কি আশ্চর্য! কোথাকার কে কমলবাবু! কদিনের আলাপ। অপরিচয়ের সীমানা যেখানে সম্পূর্ণ পেরোয় নি। তার সঙ্গে। একই ঘরে। রাত রাতে। কমলবাবুকে চশমাটা খুললে হ্যান্ডসাম। স্বাস্থ্য মোটামুটি। বিয়ে করেন নি। হয়ত কোন মেয়েকে……না, না এসব কি ভাবছে অমলা। কিন্তু এমনিভাবে কি বসে থাকা যায়? চুপচাপ। কি করবে। ঘুমোনো যায়না। কমলবাবু জেগে। অমলা জেগে। কমলবাবু যদি ফিরে যেতেন? ওষুধ খেয়ে শিবতোষতো সামলে গেল। ফিরে গেলে কি হত? তবে কি উনি ইচ্ছে করেই বললেন যে অমলা একা এখন শিবতোষকে নিয়ে থাকতে পারবে কিনা? কেন বললেন? তবে কি—? ছিঃ ছিঃ একি ভাবছে অমলা। মানুষকে……কমলবাবুকে এতটা নীচু ভাবছে কেন ও! অমলা না বললে উনি মোটেই থাকতে চাইতেন না। তা যদি হত তাহলে এর আগেই…কিন্তু এমনি ভাবে চুপ করে বসে থাকা যায়? ঘরটাকে আর একবার দেখা যায়। চেয়ার। টেবিল। রেডিও। ক্যালেণ্ডারের সাহেবের ছবি। বিছানা। মশারি। শিবতোষ। দেওয়ালে র‍্যাট্‌ রিন্‌টন্‌ র‍্যাকেট। দেওয়াল আলমারিতে বই। কমলবাবু। ওষুধের শিশি ইত্যাদি…ইত্যাদি। সবতো কয়েকবার দেখা হয়ে গেল। একটা হাঁ করা নিষ্ফল নিস্তব্ধতা যেন অমলার দিকে ঠেলে আসছিল। শিবতোষ এবার ভাল হয়ে যাবে। কি ভাবছেন কমলবাবু? কৈ? উনি তো কোন কথা বলছেন না? কি ভাবছেন? অমলার ভাবনার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিল নেই। উনিওতো দু'একটা কথা বলতে পারেন।

বড় গরম লাগছে অমলার। বলবে নাকি যে, আজ বড় গরম লাগছে, কি বলুন কমলবাবু। যদি উনিও কথা শুনে বলে বসেন, চলুন তাহলে ছাতের উঠোনে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো যাক। হাওয়া আছে। তারপর যদি আরও বলেন, হিঃ হিঃ, এসব কি ভাবছে অমলা! কমলবাবু। সেবা। সেবা। কমলবাবুর সেবা। শিবতোষ। স্বামী। শিবতোষের অসুখ। স্বামীর অসুখ। অমলা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু নড়লনা। কমলবাবুও নড়লনা। শিবতোষ ঘুমোতে লাগল। হাত ইস্টতে লাগল। চৈত্রের হাত।

পরদিন। শিবতোষের জ্বর ছেড়ে গেল। শিবতোষের চোখে মুখেও একটা প্রচ্ছন্ন সুস্থতার রেখা ফুটে উঠল। অমলা এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারিছিল না যে সত্যিই শিবতোষ সেরে উঠল।

শিবতোষ নিজেই এবার কথা বলল। হয়ত যখন শুনল যে ওর দেহ থেকে রোগের তাপ অপসারিত হয়েছে। বলল, প্রথম সংসার করতে এসে তোমার আমাকে নিয়ে বেশ দুর্ভোগ গেল অমলা। একটু থেমে তারপর আবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কমলবাবু আর ভবেশবাবু আমাদের জন্য অনেক করেছেন। ওরা না থাকলে—

অসুখ অন্তর্হিত হলেও আরও দিন কয়েক শিবতোষকে শয্যার পর বিশ্রাম নিতে হল। যারা সব অসুখের সময় দেখতে এসেছিল তারা সবাই আবার শিবতোষকে দেখে গেল একদিন।

কমলবাবু বললেন, খুব এক হাত দেখালে ভাই। ভবেশবাবু হাসলেন, যা বলেছ কমল।

অসুখের পর আজ প্রথম শিবতোষ অফিসে যাচ্ছে। সকাল সকাল রান্না করে দিয়েছে অমলা। মাছের ঝোল আর ভাত। শিবতোষ বলছিল, অমলাকেও ওর সঙ্গে খেয়ে নিতে। কিন্তু অমলা বলল, এতদিন সংসার অগোছাল হয়ে পড়েছিল। ওসব গুছিয়ে সাবান কেচে চান করব। তারপর খাব। তুমি আজ এখাই খেয়ে নাও।

শিবতোষ যতক্ষণ বাসায় ছিল ততক্ষণ কিছুই হয়নি। কিন্তু যেই শিবতোষ চলে গেল তার একটু পরেই অমলার কি রকম যেন হয়ে গেল। শিবতোষ গেল। যাবার পর ওর ছাড়া দুতিটা তাঁজ করে আলনায় রাখতে যাবে হঠাৎ কেমন যেন করে উঠলো বুকটা। অকারণ কেমন ভারি ভারি হয়ে এল। মাথাটাও। চোখে যেন কিসের একটা নেশা লাগল। কিছুই ভাল লাগছেনা। মনে হল অমলার কি যেন হারিয়ে গেছে। কখন অজান্তে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে অমলা। এইতো। সকাল থেকে বেশ ছিল। সকাল হল। শিবতোষ আর ও চা খেল। গল্প করল। দিন কয়েক পুরীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয় কথা বলল। মাথাটা ঘোরাচ্ছে কি? না, না ওসব কিছু না। কাজে মন দিলে ঠিক হয়ে যাবে। অমলা কাজে মন দিল। আলনাটা গোছাতে লাগল। নোংরা কাপড়জামা কটা নিয়ে গিয়ে বাথরুমে ফেলল। সাবান কাচা। শিবতোষের বিছানার চাদরটা তুলবে কি? হ্যাঁ। ওটা তুলে মেঝেতে ফেলল। অসুখের ঘাম রাখবেনা। বালিশের কাছে পুরানো খবরের কাগজটা তুলে ঠিক যায়গায় রেখে এল। মশারির ঝুলন্ত প্রান্ত পরিপাটি করে চালে তুলল। টেবিলটাও নোংরা হয়ে রয়েছে। টেবিলের উপর ওষুধের শিশি। চামচ। আধখাওয়া কমলা লেবুটা ফেলে দিল। মিক্সচারের শিশিটা খালি হয়ে গেছে। তলায় লাল মত তলানি পড়ে রয়েছে। শিশিটা খালি। হঠাৎ শিশিটার ছিপিটা খুলে অমলা শিশিটায় নাক ঠেকাল। কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। নেশা নেশা। খুব পাতলা গন্ধ। শিশিটা যখন ভর্তি ছিল হয়ত আরো

বেশ ভাল গন্ধ ছিল। ক্যাপসুলের শিশিটা বাদি। শিবতোষ এসব খেয়েছে। টেবিলটা পরিষ্কার করল। কিছুক্ষণ কাজ করার পর খামল অমলা। জানলা খোলা। বাইরে রোদ। ভাত বেড়েছে। আকাশ দেখা গেল। পাশের বাড়ীর ছাদে কার্নিশে বসে একটা কাক কা কা করছে। বিরক্তিকর। ওটাকে উড়িয়ে দিলে বেশ হত। না। কৈ মন থেকে সেই কি কবি হাকানি ভাবটা যাচ্ছেনা তো! কানের মধ্যে একটা বোঁ বোঁ করে শব্দ হচ্ছে। কোথাও আশেপাশে কিছু শব্দ হচ্ছে নাকি অমলা শুনতে বা চেতনায় আনার চেষ্টা করল। দূরে কোথাও কি তবে? না। কোথাও নয়। ওর কানের মধ্যে? যেন শব্দটা একেবারে অমলাকে শোনানোর জন্যই। কাউকে পেলে ভাল হত। জিজ্ঞেস করত। সে কোন বোঁ বোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিনা।

অমলা তাড়াতাড়ি ছাদে চলে গেল। চারপাশ দেখতে লাগল। কোথাও কোন শব্দ আছে নাকি! না নেই। চৈত্রের দিন। আকাশে সূর্য। ঐ যে শিবতোষের অফিস বাড়ী। ঐ যে কমলবাবুদের মেস। ভবেশবাবুদের পাড়াটা। গোপায় পুকুর। ভাল লাগছেনা। কেমন যেন অস্থির লাগছে। কানে বোঁ বোঁ শব্দ। মাথাটা ভারি। বুকটা বলছে, কি যেন হারিয়ে গেছে। কেন এমন হল অমলার! সব তো ঠিক আছে। শিবতোষ ভাল হয়ে গেছে। ওরা সামনের মাসে পুরী যাবে। মনে হল নীচের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। কেউ কি এল তবে? শিবতোষ নাকি। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল অমলা। কেউ এসে ভাল হত। এরকম হাকানির থেকে রেহাই পাবে অমলা। কপাট খুলতে গিয়ে থেমে গেল। না না ওদের বাসায় নয়। পাশের বাসায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কি? কটা বাজে? দেওয়ালঘড়িতে টাইমপিস। এগারটা। শিবতোষ এখনি সময় একটা ক্যাপসুল খেত। আর একটু পরে মেসের চাকরটা আসত। টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে।

চারদিক পরিষ্কার করে বাথরুমে ঢুকল অমলা। ভাবল। স্নানের কাচবার সময় শব্দ হবে। সেই শব্দে বোঁ বোঁ শব্দটার কথা ভুলে যাবে।

কিন্তু কি যে হল আমলার আজকে। দুপুর প্রায় ফুরিয়ে এল। এর মধ্যে বহুবার রেডিও খুলেছে, বহুবার বন্ধ করেছে। খেলাই। ফেলে দিয়েছে। বই। না। কমলবাবু এমনি সময় মাঝে মাঝে এসে শিবতোষকে দেখে যেতেন। সঙ্গে ভবেশবাবুও হয়ত এলেন।

সারা দুপুর ধরে সেই শব্দটাকে আঘ্রাণ চেষ্টা করে যখন তাড়াতে পারলনা তখন ক্লান্ত, অবসন্ন অমলা বিছানায় পড়ে রইল।

ঠিক সেই সময় ওর সেই কথাটা মনে হল। আর মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ধাতস্থ হয়ে উঠল। বিছানায় উঠে বসল। থেমে গেল।

তাহলে কি অমলা চায়নি যে শিবতোষ এত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাক? ও কি চেয়েছিল যে আরো কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকুক শিবতোষ?

জলার ধারের সেই বাড়িটা

সুপর্ণ রায়

[গুপ্তচরদের জীবন-কাহিনী এত রোমাঞ্চকর, বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক অথচ বাস্তব যে তা নিছক গল্প—উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে গুপ্তচর আণবিক বোমার মতোই একটি শক্তিশালী অস্ত্র। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুপ্তচর-বৃত্তি দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সংখ্যা হতে আমরা গুপ্তচর-বৃত্তির কাহিনী 'গল্প-ভারতী'তে ক্রমশ পরিবেশন করবো। এই সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পটি বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। একজন জার্মান গুপ্তচর জলার ধারে একটা পুরোনো বাড়ির রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে কেমন করে রুশ গুপ্তচরদের গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা আবিষ্কার করে তারই চমকপ্রদ কাহিনী 'জলার ধারে সেই বাড়িটা'।]

—সম্পাদক গল্পভারতী

"কে ?"

মরচে-পড়া কলিং বেল-এ হাত দিয়েছে কি না দিয়েছে, কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠতে হলো : "রাত্রিবেলায় কী দরকার ?"

লেফটেনেন্ট এ. বরের রুশ ভাষায় বললেন : "দরজার ধারে একটু আসুন। দরকারী কথা আছে।"

বুড়ো চাকরটা যাই-যাচ্ছি ক'রে কাছে এলো। চোখে-মুখে সন্দেহ। হাতে একটা লণ্ঠন। সঙ্গে ছুটো কুকুর। লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে ধ'রে সে লেফটেনেন্টের মুখে আলো ফেললো। লেফটেনেন্ট বয়েরও তার মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন। দেখলেন তার মুখখানা বেশ তরুণ, অথচ মাথার চুলগুলি ধবধবে শাদা।

জিগেস করলেন : "আপনি কি জার্মানদের বন্ধু ?"

"এ-রকম প্রশ্ন করার কারণ ?

লেফটেনেন্ট বললেন : "কারণ আমি একজন ফেরারী রুশ অফিসার। যে ক'রেই হোক রুশ সীমান্তে আমাকে পৌঁছাতেই হবে।"

এ. বরের যখন কথা বলছিলেন লোকটা লণ্ঠনটা আড়াল ক'রে কী করবে তা যেন ভেবে নিলো।

"আপনি যে তাকাত কিংবা গুপ্তচর নন তার প্রমাণ কি ?" অন্ধকার থেকে আবার ভেসে এলো তার কণ্ঠস্বর।

লেফটেনেন্ট বয়ের রাশিয়ার এক বিখ্যাত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ব'লে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন: "অন্তত আজকের রাতটার জন্ত আশ্রয় দিন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, কনকনে ঠাণ্ডা। না কি আপনি জার্মানদের বন্ধু? তাহলে শত্রুর হাতে ধ'রে দেবার আগেই আমাকে স'রে পড়তে হবে।"

বয়ের বুঝলেন তার কথায় কাজ হয়েছে।

চাকরটি বললো: "এক রাতের জন্ত আপনাকে থাকতে দিচ্ছি, কিন্তু কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠেই আপনাকে চ'লে যেতে হবে। না হলে আমার বিপদ। আমাদের এলাকায় এখনো জার্মান সেন্ত মোতায়েন হয়নি। জলাভূমির ধারে এই বাড়িটা, তবু খুব বেশিদিন এরকম অবস্থা থাকবে বলে মনে হয় না। রুশ অফিসার হিসাবে যদি আপনি এখানে ধরা পড়েন তাহলে আমাকেও গুলি ক'রে মারা হবে।" তার উচ্চারণ শিক্ষিত রুশ ভদ্রলোকের মতো।

সিংহের বিবরে ঢুকে পড়লেন বয়ের। চাকরটি বললো: "আপনি আগে আগে যান।"

বিরাট হলঘর দুজনের পায়ের শব্দে মুখর হয়ে উঠলো। প্রতিধ্বনি শোনালো রীতিমতো ভুতুড়ে। দেয়ালের ধারে ছোট একটা বাতি জ্বলছে। তার আবছা আলোতে হলঘরটা আরো রহস্যময় মনে হলো। একটা কুকুর ওদের ঠিক পিছে পিছে আসছে। আরেকটা ঘরে গেছে শুঁকে।

"বাড়ির মালিকের সঙ্গে কি একবার একটু দেখা করে আসবো? এইভাবে আশ্রয় নিয়েছি তার জন্ত তো ধন্যবাদ জানানো দরকার।" নিরীহ প্রশ্ন করলেন বয়ের।

বুড়ো লোকটা বললো: "না, তা সম্ভব নয়। কাউন্ট অলিনস্কি কাউন্টেসকে নিয়ে এখন পিটার্সবুর্গে আছেন। আমি এখানে আছি একা। আমার সঙ্গী শুধু দুটো কুকুর।"

বয়ের ভেজা জামাটা খুলে রেখে গদীআঁটা ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। বাতিটা এখন টেবিলের উপরে। তার আলো এসে পড়েছে লেফটেনেন্টের মুখে। কিন্তু বিরাট হলঘরটার অন্ধকার সামান্তই দূর হয়েছে। ক'য়েক পা পরেই শুয়ে আছে কুকুরটা, বয়েরের দিকে চোখ দুটো স্থির রেখে।

পরের ক'য়েকঘণ্টার মধ্যেই যে বয়েরের জীবন বিপন্ন হ'য়ে পড়বে এতে একটুও সন্দেহ ছিলো না। সাত-পাঁচ ভাবছিলেন এমন সময় হঠাৎ ঘণ্টা বাজার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলেন। আর কোনো সন্দেহ নেই; যে শব্দটা এই মাত্র শুনেছেন তা টেলিফোনের; যেখানে বসে আছেন ঠিক তার নিচে মাটির তলার কুঠুরীতেই রয়েছে টেলিফোনটা। কুকুরটা গর গর করে উঠলো। আর বুড়ো লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে বয়েরের দিকে তাকালো। বোধ হয় জানতে চাচ্ছে তিনি কিছু লক্ষ্য করেছেন কিনা। কিন্তু তিনি নো-বেচারার মতো জিজ্ঞেস করলেন, কুকুরটা হঠাৎ ও-রকম শব্দ ক'রে উঠলো কেন। বুঝতে পারলেন বুড়ো লোকটার চোখে আবার ধুলো দিতে পেরেছেন।

লোকটা জবাব দিলো: "কেউ বোধহয় পার্কের দেয়ালের ধার দিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের সর্বত্র নিচু শ্রেণীর লোকদের আনাগোনা। এই বাড়িতে একা রাত কাটানো সত্যি বড়ো অস্বস্তিকর।"

ইজি-চেয়ারে শুয়ে বুড়োর সঙ্গে কথা বলছেন বয়ের। তার মুখের উপরে এসে পড়েছে টেবিলের বাতির আলো। হঠাৎ স্পষ্ট দেখলেন একেবারে কাছে একটা ভারি পর্দা নড়ে উঠলো। চোখের উপরে হাত রাখলেন। না, স্বপ্ন নয়; সত্যি একটি নারীর চোখ তার দিকে অপলক চেয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বয়েরের মনে একটা কথা খেলে গেলো। হয়তো ওই পর্দার পেছনেই আছে

মাটির তলার কুঠুরিতে যাবার রাস্তা। টেলিফোন থেকে ওঠার পর দু মিনিট কেটে গেছে। ওই সময়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই বহুস্তরী তরুণী টেলিফোনের জবাব দিয়েছে।

এইভাবে, বাড়িতে ঢুকবার মিনিট দশেকের মধ্যেই অনেক কিছু আবিষ্কার করলেন বয়ের। অন্তত তিনটি মূল্যবান তথ্য তিনি জেনে ফেলেছেন। প্রথমত, যে লোকটি নিজেকে চাকর ব'লে চালাচ্ছে তার মাথার চুল রং করা, বোধহয় ঘরং কাউন্ট। দ্বিতীয়ত, এই বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক রয়েছে, বোধ হয় কাউন্টেস। তৃতীয়ত, যেখানে বসে আছেন ঠিক তার নিচেই রয়েছে একটা চোরা কুঠুরি, টেলিফোনটা রয়েছে সেখানেই।

এই সময়ে চাকরটি তার অন্ত নিয়িই ঘরে ঘরেরকে পৌঁছে দিতে চাইলো। তিনি তো এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

রাস্তা থেকে যত বড়ো মনে হয়েছিলো পুরোনো বাড়িটা আসলে তার চাইতে অনেক বড়ো। বাড়িটার লম্বা-দিক পার্কটার দিকে। যে টানা-বারান্দা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন তার ছাদ এত নিচু যে প্রায় মাথায় ঠেকে। বারান্দার কেবল বাঁ দিকের দেয়ালে অনেকগুলি দরজা। ডান দিকের দেয়ালে মাঝে-মাঝে গরাদ-আঁটা জানালা। চাঁদ উঠেছিলো। তাই জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো ছায়ার মতো গাছপালা। চাকরটি বাঁ দিকের একটা দরজা খুলে সাবেকি ধরণের মস্ত একটা বাতি জ্বালালো। বললো: "এটা ঠিক শোবার ঘর নয়, তবে ঘরখানা বেশভালো, গরম। সোফার উপরে আপনার বিছানাটা ক'রে দিচ্ছি।"

লোকটা চলে যাবার পর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বয়ের। জানালার গায়ে একটা ভারি, পুরোনো পর্দা ঝুলছিলো। ঘরের ভেতরে সেকেলে, ভারি কয়েকটা আসবাব। আর দেয়ালের গা ঘেঁসে দুটো বড়ো বুককেস।

লোকটা যখন বিছানা করছিলো তখন তাকে ভালো ক'রে দেখে নিলেন বয়ের। চুল রং করা। কিন্তু রং লাগাবার পর চুল আরো বেড়ে গেছে বলে চুলের কালো গোড়াগুলি বেরিয়ে পড়েছে। আমার খাবারের ব্যবস্থা ক'রে চলে যাবার সময় সে ব'লে গেলো এবার সে দ্বিতীয় কুকুরটাকেও ছেড়ে দেবে।

কোনো গোপন জায়গা থেকে যে এবার লেফটেনেন্টের উপরে নজর রাখা হবে এতে তার একটুও সন্দেহ ছিলোনা। তাকে এই ঘরে শুতে দেবার পেছনে স্পষ্ট কোনো অভিপ্রায় রয়েছে। না হলে এত বড়ো বাড়িতে অতিথির থাকবার মতো কোনো ঘর নেই এ তো হতে পারে না।

খাবারে কি বিষ মেশানো হয়েছে? তা মনে হয় না। তবে মনে সন্দেহ কোনো ঘুমের ওষুধ মেশানো রয়েছে। তা স্পর্শ করবোনা বলেই স্থির করলেন লেফটেনেন্ট। কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করতেই চাই পেতে লাগলো। তার উপরে যে নজর রেখেছে, ইতিমধ্যে তাকে তিনি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। দুটো বুককেসের ঠিক মাঝখানে ঝুলছিলো একজন নাইটের ছবি, সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়লো ছবির নাইটের চোখ দুটো ফুটো করা, সেই ফুটো থেকে চকিতে মিলিয়ে গেলো মানুষের জ্বলজ্বলে চোখ।

বাতি নিবিয়ে সোফার উপর টান-টান হ'য়ে শুয়ে পড়লেন বয়ের। যে দেয়ালে ছবিটা

বুলছিলো তার পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তারপরই সমস্ত বাড়িটা কবরের মতো শুদ্ধ হ'য়ে গেলো। কেবল শুনতে পাচ্ছিলেন বৃষ্টির একঘেয়ে টিপ টিপ শব্দ। নিশ্চিত হলেন যে কাউন্ট এবং কাউন্টেস তাকে সন্দেহ করেছেন। খেলাতে জয়ী হবে সে-ই যে প্রথম আঘাত হানতে পারবে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিলো। তাই তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে উঠে বসলেন ঘুমের ঘোরে ঘুমিয়ে না পড়েন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একটা কিছু করতে হবে। পাশের একটা ঘরে ঢং ঢং ক'রে ব'রোটা বাজলো। তারপর আবার সব চুপচাপ। নিঃশব্দে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন লেফটেনেন্ট। ভেতর থেকে চাবি লাগানো ছিলো। কোনো রকম শব্দ না ক'রে দরজা খুললেন ঘরের। পেছনে ঠেলে রাখলেন রিভলবারের সেফটি ক্যাচ। টানা-বারান্দাটাও একেবারে চুপচাপ। কেবল বাইরে হাওয়া লেগে গাছের ডালগুলোতে এক রকম শব্দ হচ্ছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে পঞ্চাশ পা ঘুরেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্স আর পেট্রোভস্কি তার সংকেতের অপেক্ষায়।

ঘোরাল হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। হলঘরের সামনেকার শেষ দরজাটা একটু ফাঁক হ'য়ে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। টানা বারান্দার বেড়ালের মতো সন্তর্পণে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ঠিক সময়েই। কারণ কাউন্টকে বলতে শুনলেন:

"কী কারণে বলতে পারবো না, এই লোকটাকে আমার ভালো লাগছে না। রুশ ভাষায় অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছে, সেন্ট পিটার্সবুর্গের অনেক খবর রাখে তবু। তিন সপ্তাহ আগে একে আমি ওয়ারশ-এর 'রিস্টলে' দেখেছিলুম জার্মান অফিসারের বেশে।"

কাউন্টেস উত্তর দিলেন: "তিটিয়া, তা হলে তো এবার আমাদের মরতে হবে। আমি এক্ষুনি গিয়ে দেখে আসছি লোকটা ঘুমুচ্ছে কি না। মদটা যদি খেয়ে থাকে তাহলে তো এতক্ষণে তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত।" ব'লেই তিনি এগিয়ে এলেন দরজার দিকে। ঘরের লাফ দিয়ে হলঘরে ঢুকে পড়লেন। দুকান খাড়া ক'রে শুনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দূরে কাউন্টেসের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না।

• • • •

ঘরের লাফ দিয়ে পড়েছিলেন একটা টেবিলের গায়ে। উত্তেজনার ঝোঁকে তখন খেয়াল করেননি যে এর ফল তার পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে। কাউন্ট শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন···

হলঘরের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন ঘরের। ঘুটঘুটে অন্ধকার। যে পর্দাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাউন্টেস লেফটেনেন্টের উপরে নজর রেখেছিলেন সেটা হাতে লাগলো। পর্দাটা সরিয়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের। এবার খুব সাবধানে পকেট টর্চটা বের ক'রে জ্বাললেন। দেখলেন একটা সরু কুলুঙ্গির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন। আগে বোধহয় এর ভেতরে কোনো মূর্তি ছিলো। মেঝের উপরে ছোট কিন্তু ভারি একখানা পারসিক গালিচা পাতা। সেটা তুলে ফেলতেই যা আশা ক'রেছিলেন দেখতে পেলেন। কাঠের গুপ্ত দরজা।

কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন ব'লে একবারও খেয়াল করলেন না যে কাউন্ট পা টিপে টিপে

তার পেছন পেছন এসেছেন, এসে দাঁড়িয়েছেন পর্দার পেছনে। কুলুপ খুলে সুরভের দরজাটা খুলে ফেললেন। খাড়া একটা সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলার কুঠুরির দিকে। টর্চটা জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলেন সিড়ি বেয়ে। হঠাৎ, ভয়ংকর শব্দ ক'রে উপরের কাঠের দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো। কুলুপ আটকাবার শব্দ কানে এলো।

বয়ের শুনতে পেলেন কাউন্টের বিদ্রূপভরা অট্টহাসি···

• • • •

ফাঁদে পা দেছেন। তবু সেক্রেটেনেন্ট মনে মনে বলছেন, একেবারে এমনি—এমনি মরবেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাথার উপরকার দরজাটার ভেতর থেকে কুলুপ এঁটে দিলেন।

নেমে এলেন নিচে। মাটির তলার এই ঘরটা আয়তনে বেশ বড়ো। দোদহর বহুকাল আগে বিপদের আশ্রয় কিংবা শস্যাগার হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা হতো। ঘরটার একটা দেশ সুসজ্জিত। ছোট একটা টেবিলে টেলিফোন, টেবিলের ধারে খান দুই ভারি চেয়ার। টেবিলের উপরে নানা রকম কাগজপত্র ছড়ানো। দেয়ালে একটিও জানালা নেই। কেবল বাঁ দিকের দেয়ালে একটা বন্ধ দরজা। দরজার গায়ে আঁটা পুরোনো ধরণের একটা তালা।

পকেট থেকে চাবির তাড়া বের করলেন বয়ের। যদি একটা চাবি লেগে যায়, আর পাশের ঘরে যদি কোনো রাস্তামুখো জানালা থাকে তবে বেঁচে যাবেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোরা কুঠুরির ভেতরে কার গমগমে গলা শোনা গেলো। বয়ের চমকে উঠলেন। তিনি ছাড়া তো এখানে আর কেউ নেই। আবার শুনলেন। ঘরের এক কোণে লাগানো একটা নলের ভেতর দিয়ে গলার স্বরটা আসছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কাউন্টের বিদ্রূপ মেশানো কথা শুনতে পেলেন:

"জার্মান বন্ধু, তাহলে আপনি ফাঁদে পা দিয়েছেন! এ রকম বোকার মতো! আমাদের কি এতটা আকাট-মুর্খই ঠাউরেছিলেন নাকি? এই ঘর থেকে তো জীবিতাবস্থায় আর বেরুতে পারছেন না, তাই আপনার কৌতূহল মেটাবার চেষ্টাও আমি করবো। আমাদের আরেকটা টেলিফোনও আছে। সেটা রয়েছে পার্কের ভেতরকার ছোট গির্জেটাতে। চার সপ্তাহ পরে আমি চোরা কুঠুরিতে আসবো, আপনার মৃতদেহ বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতে।"

শুনে বয়েরের রক্ত জল হয়ে এলো। চব্বিশ ঘণ্টা উপরে থাকার পর কেলিস আর পেট্রোভস্কি বাড়ির ভেতরে জোর ক'রে ঢুকে প'ড়েও কি তাকে এই কুঠুরি থেকে খুঁজে বের করতে পারবে? কাউন্ট যদি কাঠের দরজার উপরে গালিচাটা আবার বিছিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে উপরে যা-ই ঘটুক, কোনো কিছুই তিনি শুনতে পাবেননা। সেই ক্ষেত্রে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী···

পকেট থেকে চাবির তাড়া বের ক'রে পুরোনো তালাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন বয়ের। এই ধরণের একটা জিনিস যে ওঁর সঙ্গে আছে কাউন্ট বোধ হয় তা জানতেন না। লোকেলে তালাটা খুবই সাধারণ শ্রেণীর। কয়েক মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে গেলো। যেন চাপা আর্তনাদ ক'রে খুলে গেলো ওক কাঠের ভারি দরজাটা। কবজাগুলো ঘরচে ধরা। সেই মুহূর্তে বয়ের জানতেন তার জীবন একটা চুলের সঙ্গে ঝুলছে। পাশের ঘরটার দেয়ালে যদি রাস্তামুখো কোনো জানালা না থাকে তবে তার সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হবে। উপবাসে ভিলে ভিলে মরতে হবে তাকে। চৌকাঠের উপরে কী

একটা ঝিনিসে পা লেগে তার হোঁচট খেয়ে পড়বার উপক্রম হলো। নিচের দিকে টর্চের আলো ফেলেই আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে এলেন। প্রায়-বৃদ্ধ একটি লোকের মৃতদেহ। প্রায় শুকিয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত আকার নিয়েছে।

কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবস্থা তখন তাঁর নয়। তিনি যে-রকম ব্যাকুলভাবে আলো চাচ্ছিলেন, এই ঘরের দেয়ালে কি তা আছে? দেয়ালের গায়ে টর্চের আলো ফেলেই আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তার পাঁচ ফুট উপরে রয়েছে ছোট একটা জানালা। গরাদ-আঁটা, জালে-ঢাকা। তিনি বেঁচে গেছেন!

জানালা-পথে টর্চের আলো ফেলে মর্স-এর পদ্ধতি অনুযায়ী বেশ ক'বারেকবার সংকেত পাঠালেন ঘরের। ওরা কি দেখতে পাচ্ছে? বাইরে চাঁদের আলো। জালে-ঢাকা গরাদ—আঁটা জানালা দিয়ে ঘরের দেখতে পাচ্ছিলেন, বিশাল সেট আর তার পেছনের বনটা। এর পরেই দেখলেন ফেলিক্স আর পেট্রোভস্কি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। ওরা তাঁর সংকেত দেখতে পেয়েছে।

চোরা কুঠুরিতে ফিরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কাঠের দরজাটার নিচে। উপরে ভারি গালিচা পাতা, তবু শুনতে পেলেন গুলির শব্দ—তারপর সব চুপচাপ। এর পরেই সেই স্তব্ধতা ভেঙে জেগে উঠলো একটা আর্ত চীৎকার। চোরা কুঠুরির দরজা বন্ধরা সহজে খুঁজে পাবেনা ভেবে আবার জানালার ধারে ফিরে গিয়ে আলোর সংকেত পাঠালেন হঠাৎ মাথার উপরকার দরজাটা খুলে গেলো। দেখলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্স।

হলঘরে এসে পৌঁছতেই ফেলিক্স আর পেট্রোভস্কি আনন্দে বয়েরকে জড়িয়ে ধরলো।

ভারি কার্পেটের উপরে বাঁধা অবস্থায় পাশাপাশি শুয়ে আছেন কাউন্ট আর কাউন্টেস। তাদের পাহারা দিচ্ছে পুলিশের কুকুর। বাড়ির যেখানে যত আলো ছিলো ফেলিক্স আর পেট্রোভস্কি নিয়ে এসেছে। সমস্ত হলঘরটা তাই এখন আলোয় আলোময়।

পেট্রোভস্কি তার হাতের অবার্থ টিপে কাউন্টের কুকুরগুলিকে আগেই নিকেশ করেছিলেন। সে-গুলি তাকে বাড়ির দরজায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলো ব'লে।

কাউন্টের দিকে তাকিয়ে এবার লেফটেনেন্টের হাসবার পালা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বিকৃত মুখে। ফেলিক্স আর পেট্রোভস্কি সঙ্গে যথেষ্ট দড়ি নিয়ে আসেনি ব'লে বন্দীদের কেবল পা দুটো বেঁধে রাখা হয়েছিলো। কাউন্ট তবু বিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। হাত দুটো খোলা থাকা সত্ত্বেও ওদের অসহায় মনে হচ্ছিল।

বয়ের কাউন্টকে বললেন: "একেবারে উল্টো অবস্থা! চোরা কুঠুরিতে আমাকে উপোস ক'রে মারবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থার ফেরফের ঘটেছে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আমাকে সত্যি আপনি ওয়ারশ-এর 'রিস্টলে' দেখেছেন। আপনি আমার পাশের টেবিলেই বসেছিলেন। তবে তখন আপনার চুলগুলো কালো ছিলো, কাউন্ট অসিনস্কি।"

অক্ষম ক্রোধে কাউন্ট শুধু দাঁত কড়মড় ক'রে উঠলেন।

ফেলিক্সকে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন বয়ের। চোরা কুঠুরিতে। টেবিলের উপরে কাগজ পত্র সে-রকম ভাবেই ছড়ানো ছিলো। কাউন্ট নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে কতগুলি সিসিটারী রিপোর্ট পর্যন্ত টেবিলের উপরে ফেলে রেখেছিলেন। রিপোর্টগুলির কয়েকটি

তার স্ত্রীর সেবা। কাজেই তারা দুজনই গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে অপরাধী। তাদের যা অপরাধ তাতে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। চোরা কুঠুরি এবং পার্কের ভেতরকার নির্জন টেলিফোন দুটো নষ্ট ক'রে ফেললেন ঘরের।

চোরা কুঠুরির পাশের ঘরটিতে যে মৃতদেহটা প'ড়ে আছে সেটা কার বারবার জিগেস ক'রেও গেস্টাপোভক্তি কাউন্টের মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারলেন না। কার এমন শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিলো?

ক'য়েদীদের হাত-পা বাঁধার মতো রজ্জু নিয়ে না এসে যে অপরাধ ওরা করেছে তার জন্য একটু পরেই ওদের আপশোষ করতে হলো। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে কাউন্ট পকেট থেকে শিশি বের ক'রে খানিকটা বিষ নিজে গলাধঃকরণ করে স্ত্রীর হাতে বোধহয় শিশিটা চালান ক'রে দিয়েছিলেন। কারণ একটু পরেই ঘরের দেখলেন তাদের দুজনের শরীর বেঁকে চুরে যাচ্ছে, গাঁজলা উঠছে মুখ দিয়ে। গেস্টাপোভক্তি সেক্রেটেরেটকে চিৎকার ক'রে ডাকলো।

ক'য়েদীরা বাঁধন খুলে ফেলেছে ভেবে ঘরের আর কেলিক্স হলঘরে ছুটে গেলো। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। একটু পরেই ক'য়েদী দুজনের দেহ স্থির হয়ে গেলো।

এর মধ্যে রাত শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তখনো বৃষ্টি পড়ছে। কাছাকাছি গির্জেটার উঠোনে কাউন্ট, কাউন্টেস, আর অপরিচিত লোকটির দেহ সমাধিস্থ করা হলো।

ওই বাড়িতে ওরা আরো দুদিন কাটালো। অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা গেলো। সেইসব তথ্যের সূত্র ধরে আর্মান সীমান্তে আবিষ্কার করলেন গুপ্তচরদের আরো তিনটি আস্তানা।

কেলিক্সের উপরে বাড়িটার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে ঘরের চলে এলেন। মিলিটারী গার্ডরা গিয়ে পৌঁছবার পর কেলিক্সও চ'লে আসবে। ওখান থেকে চলে আসার আগে ঘরের ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাড়িটার প্রতিটি ঘর। মূল্যবান আসবাব পত্রে প্রতিটি ঘরই কি চমৎকার ক'রে সাজানো। আর তা কিনা জনমানবহীন জনা এলাকায়। কত পুরুষ কেটে গেছে, কত শতাব্দী শেষ হলো এই প্রাচীন প্রাসাদে। এই প্রাসাদটিকে প্রায় ঘুমেই ঘিরেছিলো লোকে।

এখন এর মালিক কেউ আর রইলোনা। কাউন্ট অগিলবি ছিলেন তার বংশের শেষ পুরুষ। তিনিও চ'লে গেলেন তার পিতা-পিতামহদের দলে। দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলো পার্কের ভেতর দিয়ে। তাড়িয়ে নিয়ে গেলো শরতের ঝরা-পাতা। তখন জনার উপরে দুলছিল ঘুমের কুয়াশা।

দেশবন্ধু

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

মস্ত ভিড় আলীপুরের আদালতে!

মাণিকতলার বোমার মামলা চলছে। আসামী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বারীণ ঘোষ, উল্লাসকর। বাংলার বিপ্লবী বীরের দল। যাঁদের কণ্ঠে জাতীয় সংগ্রামের মুক্তিমন্ত্র, 'বন্দেমাতরম্!' সে মামলার ফল কী হয়,—তাই জানতে অধীর জনতা।

সরকার পক্ষে সেরা উকিল ব্যারিস্টার। আর অসামী পক্ষে তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ,—যিনি তখনো ব্যারিস্টারি বুদ্ধিতে পশার জমাতে পারেন নি।

শুধু আইন নয়, দেশাত্মবোধ এবং মানবতাবোধ যাঁর আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে। যিনি বিচারপতি বিচ ক্রফটের 'নসেন্স' উক্তির প্রতিবাদে অধিময় চোখে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন, 'you are on bench sir, and that language should not come from your mouth. Had you been any where else, I would know how to answer!'

এবং যাঁর ধ্বনিতে ধ্বনি অরবিন্দের সঙ্গে বাঙালী বিপ্লবীদের সত্যিকারের পরিচিতি বিঘোষিত,—'আজ যে-পুরুষ আপনাদের চোখের সামনে আসামীরূপে কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে,—সেদিন যখন মানুষ এঁর মূর্তির প্রতি অর্ঘ দেবে, আত্মবোধের ঋষি বলে, মানব-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পূজারী বলে—যেদিন ভারতবর্ষের তট উদ্ভাসন করে এঁর বাণী দেশে দেশে মরমর মানবকে উদ্দীপ্ত করবে,—তিনি শুধু আজ আপনাদের দরবারে বিচার প্রার্থী নন,—সমগ্র মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারশালায় তিনি আজ বিচারপ্রার্থী।'

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

কিন্তু বারীণ ঘোষ আর উল্লাসকরের ফাঁসীর আদেশ হল।

তরুণ ব্যারিস্টার জীবনপণে আবার উঠে পড়ে লাগলেন ওঁদের মৃত্যুদণ্ড রদ করতে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেনকিন্স্ এবং বিচারপতি কার্ণডাফের আদালতে আপীল করা হল। আটচল্লিশ দিন ধরে শুনানী হল।

প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ে লিখলেন 'আমি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে মিস্টার দাশের এই মামলা পরিচালনার গুণপনা সর্বোচ্চ প্রশংসার নজীর হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম।' বিপ্লবী বারীণ ঘোষ এবং উল্লাসকরের ফাঁসীর আদেশ রদ হল।

এই মামলার পর থেকেই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের খ্যাতির দীপ্তি। স্বদেশী-আন্দোলনের কত মামলারই না ভীরু তিনি নিয়েছেন! শুধু বিনা পারিশ্রমিকে মামলা-পরিচালনা নয়,—নিজ ব্যয়ে সেই সব মামলা চালনা আর তার জন্যে বিপুল অঙ্কের ঋণ গ্রহণ, আর সেই ঋণভার নিজেই পরিশোধ করা—ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের অনুত্তম জীবন কাহিনীর একটা বড় পরিচয়।

সারা ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন।

কিন্তু বাংলার আন্দোলনে যে নেতৃত্ব তার তুলনা কোথায়? সে নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

তাঁর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের ঘুম ভাঙে। বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লব-আন্দোলন এবং কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়। দেশবন্ধু সে-প্রেরণার ধারক। তাঁরই হাতে গড়া মন্ত্রশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং দেশগৌরব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আরো কত কত দেশনায়ক। বাঙালীর সম্পূর্ণতার ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একটি বিস্ময়কর পরিপূর্ণ অধ্যায়। জন্ম তাঁর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর।

এই কলকাতা শহরেই জন্মেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। পিতা ভুবনমোহন দাশ ব্যারিষ্টার-জীবী। মাতা নিস্তারিণী দেবী। বাঙালি সংসারের আদর্শ জননী। পূর্ববঙ্গের নদী-মাতৃকার যে ফসল ফলাবার আশ্চর্য সৃজনীশক্তি,—সেই সৃজনী প্রতিভা পূর্ববঙ্গের জমিদার বংশের বাঙালি বৈদ্য পরিবারে। গ্রাম ছেড়ে শহরে অধিবাস কিন্তু গ্রাম-বাংলার যে বিস্তৃত আকাশ,—সেই আকাশ-চেতনা মন জুড়ে। যে নদীর খর-প্রবাহ,—সেই খর-প্রবাহ চিন্তা-ধারায়। যে ভাঙনের ক্ষুধা, যে-গঠনের তৃষ্ণা,—তারই আবেগ হৃদয়ে।

নদী থেকে মহা-সিন্ধু, কলতান থেকে মহাতরঙ্গের গর্জন,—দেহের মধ্যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গর্জন করছে,—'ভাঙ, ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর!'

সেই আঘাত করার প্রথম চেতনা দেখা গেল,—সমুদ্র পারের সাদা দেশে অবস্থিত তরুণ ছাত্র-মানসিকতায়।

পরাধীন ভারতবর্ষ।

এদেশের মানুষের রং কালো। এদেশের শাসক-সম্প্রদায় ইংরেজ সাদা মানুষের জাত। অধীন ভারতবর্ষ কালা-আদমীর দেশ। সে-দেশের অধিবাসী গোলাম। যারা গোলাম,—তারা গোলামীই করবে। তাদের মুখে আবার শাসন-পরিষদের কথা কেন? তারা আবার হতে চায় পার্লামেন্টের সভ্য!

ভারতবর্ষের দাদাভাই নৌরজী শাসন-সভার সভ্য হতে চেয়েছেন। লর্ড সেলিস্‌বারী তাই তাঁকে উপহাসের তীর ছুড়ে মারলেন, 'That black man of India!'

বিলাতে পার্লামেন্টের তখনীন্তন আর একজন সভ্য হেনস্ ম্যাক্‌সিন। প্রকাশ্যসভায় তিনি সদম্ভে ব্যঙ্গোক্তি করলেন সারা ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে,—'ভারতবর্ষের আবার সভ্যতা কোথায়? তাদের আবার ইতিহাসই বা কী? তাদের ইতিহাস তো গোলামীর ইতিহাস!'

তরুণ ছাত্র চিত্তরঞ্জন তখন বিলাতে। আই, সি, এস হবার জন্যে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন মেধাবী ছাত্র। তাঁর পিতৃদেব ভুবনমোহন দাশের বাসনা আই, সি, এস হয়ে পুত্র স্বদেশে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট হবেন।

বিলাতে বহু ভারতীয়ের মাঝে মাত্র একজন তরুণ বাঙালী ছাত্রই সমুদ্রের ঢেউএর গর্জনে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। লর্ড সেলিস্‌বারীর কণ্ঠ নিস্তব্ধ হল। আর পার্লামেন্টের সভ্য হেনস্ ম্যাক্‌সিনকে বাধ্য করালেন তিনি ক্ষমা চাইতে তাঁর অশোভন উক্তির জন্যে।

সারাদেশের লোক সেদিন থেকেই চিনলে,—আঁধারের মধ্যে মানিকের উজ্জ্বলতাকে। দেশের

মধ্যে অমনি সম্পর্কের নিবিড় সম্ভাবনাকে। কালো শুধু কালোই নয়। পরাধীন ভারতবর্ষ শুধু গোলামেরই দেশ নয়। এই কারণেই হয়ত সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার ফলে দেখা গেল চিত্তরঞ্জনের নাম নীচের দিকে। যতজনকে সার্ভিসে নেওয়া হলো,—ঠিক তার পরের নামটি হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশের। কিন্তু তাতে কী আসে যায়?

যুবক চিত্তরঞ্জন বার এ্যাট্ ল হয়ে স্বদেশে ফিরলেন। পিতা ভুবনমোহন আকণ্ঠ ঋণী। একে সীমিত আয়, পুত্রকে বিলাতে পড়াবার দারুণ ব্যয়, তার ওপর বন্ধুপ্রীতির সংসারে—কাউকে বিমুখ না করার মন, পরোপকারী দয়ার্দ্র চিত্ত, দানের খেলা,—এইতে ভুবনমোহন ডুবুডুবু। আশা ছিল চিত্তরঞ্জন আই, সি, এস হয়ে এসেই মোটাবিত্তের সরকারী পাসকের কাজ পাবেন। ভুবনমোহনের সে আশা পরিপূর্ণ হল না।

নিরুপায় হয়ে পিতা এবং পুত্র দু'জনেই ইন্সল্‌ভেন্সী নিলেন। আর তার ফলে ভুবনমোহন অবসর গ্রহণ করলেন।

সমস্ত সংসারের ভার এখন যুবক চিত্তরঞ্জনের ওপর। হাইকোর্টে তরুণ ব্যারিস্টারের শুধু আসা যাওয়াই সার।

কিন্তু কর্মের অদম্য প্রেরণা যার বুকে তাঁকে অবদমিত করতে পারে কে? ভাগ্য আর পুরুষকারে চলল দিনের পর দিন ধরে শুধু লড়াই। কে হারে আর কে জেতে? নিরাশার অন্ধকার তাঁর চারপাশে,—কিন্তু তবুও পুরুষের পৌরুষ তাঁর হৃদয়ে। সেই পৌরুষ রেখার আলোয় দিগন্ত।

কলকাতার হাইকোর্ট থেকে মফঃস্বল কোর্ট। চিত্তরঞ্জনের আইনজ্ঞান, বাগ্মিতা এবং স্বকীয়তা —মফঃস্বল কোর্টে স্বীকৃত। আয়ের স্রোত এইবার বইতে শুরু করেছে।

একটি তরুণ জীবন-সংগ্রামে বিজয়ীর বর অর্জন করছেন। নিজের প্রতিভায় নিজেকে গড়ে তুলছেন, প্রতিষ্ঠিত করছেন নিজেকে,—এ দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। বিরল যা তা হচ্ছে স্বদেশ-প্রেম,—স্বজাতি-বোধ আর শুধু আত্ম-সম্মানজ্ঞান নয় যারা দেশের সম্মান-বোধের প্রদীপ্ততা।

পূর্ব বাংলার নোয়াখালী সদর কোর্ট। একটা চুরির কেসের ব্রীফ নিয়ে এসেছেন কলকাতার হাইকোর্টের তরুণ বার এ্যাট্ ল চিত্তরঞ্জন দাশ।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ মিস্টার কারসিল ব্যারিস্টার দাশের জেরায় বিপর্যস্ত। রেগে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট চিত্তরঞ্জনকে 'বাবু' বলে ব্যঙ্গোক্তি করায় তরুণ ব্যারিস্টার আবার সেই সমুদ্র-গর্জনের প্রতিবাদ কণ্ঠ তুললেন,—'বাবু বলছেন কাকে?'

'মহাশয়কে তবে কী বলে সম্বোধন করতে হবে?'

কারসিল সাহেবের এ কথার প্রত্যুত্তরে তরুণ ব্যারিস্টার আত্মসম্মান-জ্ঞান এবং জাতির সম্মানবোধে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক তোমার দেশের ব্যারিস্টারদের যেভাবে কোর্টে সম্বোধন করা হয় আর হাইকোর্টের জজেরাও যে-ভাবে সম্বোধন করেন,—সেইভাবেই।'

অপমানে কারসিল সাহেবের সারা মুখ লাল হয়ে উঠল: কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ে তারপর। মফঃস্বল কোর্ট থেকে হাইকোর্ট,—বিলাতী ব্যারিস্টারের পাশে স্বদেশী চিত্তরঞ্জন,—আইন যাঁর নখ-দর্পণে,—এখন তাঁর সমকক্ষ আর কে?

একদা যিনি শ্রীকলেস ছিলেন,—বসতবাড়ি ভবানীপুর থেকে হাইকোর্ট আর হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া পর্যন্ত যাঁর পকেটে থাকত না,—ভাগ্যদেবী এখন তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না। পুরুষকার এখন স্তবী।

ইন্সলভেন্সী নেওয়ায় যে পিতৃঋণ তাঁরাণী হয়ে গিয়েছিল,—সেই পিতৃঋণকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করলেন চিত্তরঞ্জন। সেউলিয়া পিতার সেউলিয়া পুত্র—এ অখ্যাতি ঘুচে গেল।

শুধু তাই নয়। দান সাগরের মেলা খুলেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

কন্যাদায় জানিয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চায় একশো টাকা।

চিত্তরঞ্জন চেক কাটলেন, একহাজার টাকা।

সহকর্মী সুধী সোম ভুল সংশোধন করে দিতে চাইলেন।

চিত্তরঞ্জন হাসলেন। বললেন, 'ভুল আমার লেখায় নয়, ভুল আপনার ভাবনায়।'

সুধী সোম লজ্জিত হলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের দু'চোখে অশ্রুর বন্যা,—কান্নার চোখের জল নয়,—কৃতজ্ঞতার চোখের জল।

প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে পোস্ট অফিসে মনি অর্ডারের তাড়া পাঠানো হয়। প্রেরক চিত্তরঞ্জন দাশ,—অজস্র দান। নিয়মিত দান,—মাসিক ভাতা, আরো যে যা চায়।

পোস্ট অফিস হিমসিম খেয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব জানালেন, চিত্তরঞ্জন চাইলে তাঁর নিজের বাড়িতে একটা স্বতন্ত্র পোস্ট-অফিস কর্তৃপক্ষ খুলতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স মাত্র ১০৫০৲ টাকা। মাত্র ৫০৲ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে হাজার টাকা দান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে।

ভোগের চরম শিখরে চরমভোগী চিত্তরঞ্জন দাশ।

রূপোর থালায় খান, মসলিন সজ্জা—ভোগের দেশ থেকে তা আসান হয়। মেয়ের বিয়েতে বৃহৎসজ্জার ব্যয়ই শুধু তখনকার দিনে একলক্ষ টাকা। সেলুনকারে কলকাতা থেকে দার্জিলিং যাচ্ছেন,—সেই যাওয়ার খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকা। মাসিক সংসারের ব্যয় সাতাশ হাজার টাকা। দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহে বন্ধু-অতিথি-সজ্জনকে আপ্যায়িত করবার জন্যে বাড়ির সদরের মাঠখানে বৃহৎ এক বরফের কৃত্রিম পাহাড়। ভোগী চিত্তরঞ্জনের জীবনের এই একদিক।

আর একদিক ত্যাগের। সে ত্যাগ উপনিষদের ত্যাগ। ত্যাগের দ্বারাই ভোগী। দাতাকর্ণ। সর্বস্ব দিয়েছেন। অর্থ, উপার্জন, নিজের যথাসর্বস্ব। এমন কী স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে নিজের সমস্ত বাড়িটি পর্যন্ত বিলিয়ে দিলেন জাতির সেবায়।

শুধু কী এই দান?

না, তা নয়। অর্থ, বিত্ত, সামর্থ এমন কী জীবন পর্যন্ত যিনি দিতে পেরেছিলেন তিনি শুধু চিত্তরঞ্জন দাশ নন। তিনি দেশবন্ধু। দেশের বন্ধু, জাতির বন্ধু।

পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলাদেশে তাঁর জন্ম। সে জন্মের সঙ্গে কী তিথি, কী নক্ষত্র—তা জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও গণনার বাইরের রাশিফল।

কোন এক দার্শনিক বলেছেন, 'জীবনে দু'বার রাজা হওয়া যায়। বিয়ের দিন বরবেশে, আর জীবনের শেষ নিষ্ক্রিতি দিনে।'

দার্শনিক তত্ত্বের এ সত্য দেশবন্ধুর জীবনের সত্যে পরিণত হয়েছিল।

বিয়ের দিন বরবেশে যে সঙ্গিনী তাঁর সহধর্মিনী,—তাঁর কথা এদেশের কে না জানে? সাধ্বী বাসন্তী দেবী। যোগ্য স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিনী। সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। দেশবন্ধুর জীবনের প্রেরণা-দাত্রী। সমস্ত জাতির জননী।

দেশবন্ধু পাবনায় এসেছেন। খবর পেলেন, চাঁদপুরে কুলিরা ধর্মঘট করেছে মালিকদের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে। কুলিদের এবং তাদের স্ত্রী পুত্রের ওপর মালিকদের অকথ্য অত্যাচার সুরু হল।

তার প্রতিবাদে জাহাজের শ্রমিকরাও ধর্মঘট সুরু করলে।

মালিক-শ্রমিক চরম সংঘর্ষ। কে বাঁচাবে অসহায় দরিদ্র নিপীড়িত এই শ্রমিকদের? দেশবন্ধু পাবনা থেকে এলেন গোয়ালন্দে।

কিন্তু পদ্মা পার হবেন কেমন করে? জেলে ডিঙীর মাঝিরা পর্যন্ত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পদ্মা পারে যেতে রাজি নয়। সঙ্গের সঙ্গীরা দেশবন্ধুকে নিরস্ত করতে চাইলেন, কয়েকদিন অপেক্ষা না করা পর্যন্ত উপায়ান্তর আর কিছুই নেই।

নিরস্ত হলেন না দেশবন্ধু। আর তাঁর সহধর্মিনী বাসন্তীদেবী। মায়ের প্রাণ আজ অসহায় দেশ-সন্তানের দুঃখে পীড়িত, আর্ত।

আকাশে মেঘ-ঝড়ের ঘাপট। সেই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে একটা ডিঙী মাঝিকে অতি কষ্টে রাজি করিয়ে প্রমত্তা পদ্মা পার হয়ে অসহায় কুলিদের পরিত্রাণে ছুটে এলেন যাঁরা, তাঁরা বিয়ের দিনের যথার্থ রাজা এবং রাণী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর সহধর্মিনী জননী বাসন্তী দেবী।

দু'জনেই কারাগারে আবদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বীর দেশ নায়ক এবং দেশ নায়িকা।

কারাগারের বাইরের জগত সম্পূর্ণ লুপ্ত। মাসে শুধু একবার করে দেখা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত।

বাসন্তী দেবী আসেন স্বামীর সঙ্গে কারামুক্ত হয়ে দেখা করতে স্বামীর কারাগারে।

প্রহরী ইংরেজ। স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা শুনতে এবং বুঝতে অসুবিধে হওয়ায় আপত্তি জানায়। বলে, 'speak loud!'

'I refuse to obey!' দেশবন্ধুর সুতীব্র প্রতিবাদে বাসন্তী দেবীরও সম্মতি সাব্যস্ত।

বন্ধ হয়ে গেল মাসের শেষে শুধু একবারের জন্যে চোখের দেখা। কিন্তু স্বাধীনতাকামী আত্ম এবং দেশের সম্মান জানী দেশনায়ক এবং দেশনায়িকা তা গ্রাহ্যই করেন না।

দেশবন্ধু প্রবর্তিত স্বরাজ্য দল নতুন শাসন পরিষদে।

দেশবন্ধু তখন শয্যাশায়ী। ডাক্তার, আত্মীয় পরিজন সবাই শঙ্কিত। বিনা বিচারে আটক রাখার বিল ইংরেজ সরকার আনছেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বিল। দেশবন্ধুকে যেতেই হবে।

ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে সকলেই বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বাসন্তী দেবী বললেন, 'যদি আমরা সাহের জোরে ওঁকে আটকাই,—তাহলে মানসিক উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আর তাছাড়া যেতেই হবে যেখানে,—দেশের সে কাজে কি করে আটকাই!'

না, দেশের কাজে আটকানো যায়নি দেশবন্ধুকে। তিনি যে সারা দেশের প্রাণবহ্নি।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেল দুর্দান্ত পরিশ্রম, কারাবাস এবং দেশের স্বাধীনতার চিন্তা এবং কর্মে। ডাক্তারের বারণ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। কিন্তু সে বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ কই?

দেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত যে মহাজীবন,—মরণেই তা তিনি সারা দেশকে দান করে গেলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দার্জিলিং-এ step-aside-এ মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে দেশবন্ধুর তিরোধান ঘটল।

পঞ্চান্ন বছর বয়সের যে কর্ম-জীবন, যে দেশসেবা—তা স্বল্প কথায় বলা যায় না। সে-জীবন 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।'

এই অমৃত-জীবনকে স্মরণ করে সারা বাঙালী সৌরবোদ্দীপ্ত। মৃত্যু তাঁকে মহোত্তর জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু উত্তর সাধক আজো যারা আমরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দান করি—আমরা কী সেই মহাপ্রাণের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে পেরেছি?

দেশ মাতৃকা আজো সন্তান চান। সে সন্তান বাংলাদেশে আজ কোথায়?'

চিত্তরঞ্জনের দানের কাহিনীতে বাংলা দেশ ভরা……

যখন সবে মাত্র পসার আরম্ভ করেছেন, ব্যাঙ্কে মাত্র জমা আছে ১০৫০৲ টাকা…

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তহবিলের চাঁদার জন্যে মিঃ গোখলে এলেন…মাত্র পঞ্চাশ টাকা রেখে তিনি হাজার টাকাই চাঁদা দিয়ে দিলেন ··

এক আত্মীয়ের জন্যে ৯ টাকা সুদে দশ হাজার টাকা ধার করেন, আত্মীয় সে টাকা শোধ করলেন না…মেয়াদ ফুরিয়ে গেল এটর্ণী সেই খত চিত্তরঞ্জনের কাছে নিয়ে এলেন……

তখন তিনি কারাগারে…

খত বদলিয়ে নতুন করে নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন ··

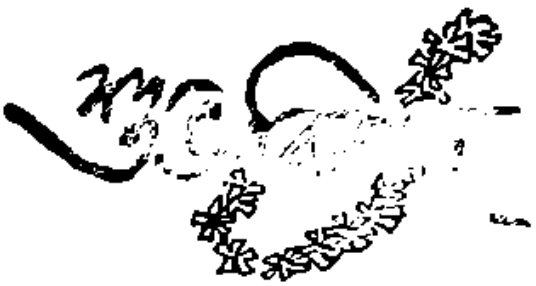

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(৭)

হাল চাল বড় বিচিত্র এই দুনিয়ার। কোন্‌দিক দিয়ে কেমন করে সবকিছু ওল্ট-পাল্ট হয়ে যায় কেউ কিছু বুঝতে পারে না। দৈব যদি প্রতিকূল হয় তো মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

মানুষের যা কিছু কাম্য—সুখ, শান্তি, সম্পদ—কোনও কিছুরই অভাব ছিল না হরেনবাবুর সংসারে। আনন্দের যেন হাট বসেছিল চারিদিকে। ভবিষ্যতের কত সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন বরদাসুন্দরী। ছবি রবি দুটি ছেলে—লেখাপড়া শিখে বড় হবে। মেয়ে ছিল না। মনের মত মেয়ে একটি তিনি পেয়েছেন। পরের মেয়ে ঘরে এনেছেন বৌ করে। এখন আর সে পর নয়। তাঁরই পুত্রবধূ। ছবির বৌ। এবার রবির বিয়ে দেবেন। দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। তারপর আবার তাদের ছেলে মেয়ে হবে। তারা দুই বুড়োবুড়ী দেখবে চেয়ে চেয়ে। জীবনের এই রকম একটি ছক্ তৈরী করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন হরেনবাবু।

বরদাসুন্দরী বলতেন, 'তোমার যা বিষয় সম্পত্তি আছে তাতে ওদের দু'জনের বেশ ভালই চলে যাবে, না কি বল ?'

হরেনবাবু বলতেন, 'নিশ্চয়ই। তিন চার পুরুষ বসে বসে খাবে।'

'বর যদি ওরা রোজগার করতে না পারে ? এমনও তো হয়! ওই ভাখো না—কৈলাস-বাবুর ছেলেগুলো এক পয়সা রোজগার করতে পারে না বলে ওদের কি রকম কষ্ট। এক একটা ছেলের ছ'সাতটা করে ছেলেমেয়ে হয়েছে। একটা ছেলে তো মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে দিয়েই কাহিল হয়ে গেল। বাড়ীটা ছিল তাই রক্ষে। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুই আছে শুধু। তাও হয়ত দুদিন বাদে থাকবে না। আমি সেদিন শুনে এসেছি। ওদের সংসারে ছেলেতে মেয়েতে ছত্রিশজন মানুষ। যা দিনকাল পড়ছে, ওদের কী যে হবে কে জানে। ছবি রবির ওরকম কিছু হবে না তো ?'

হরেনবাবু বলেন, ওরা নিজেরা যদি রোজগার করতো তাহ'লে এরকম হতো না। ছেলেরা সবাই বিয়ে করেছে আর বংশবৃদ্ধি করেছে। কেমন করে চলবে সে কথা তো ভাবেনি।'

বরদাসুন্দরী বলেন, 'তোমার ছেলেরাও তো সেই রকম করতে পারে! বাপ অনেক রেখে গেছে ভেবে ছবি রবি যদি লেখাপড়া না শেখে ? যদি রোজগার না করে ?'

ছেলেদের সম্বন্ধে হরেনবাবুর ধারণা খুব উঁচু। বলেন, 'আমার ছেলে আর কৈলাসবাবুর ছেলে ? কার সঙ্গে কার তুলনা করছো ?'

ভুলনা আমি করিনি। ভাবনা হয়, তাই বলছি তোমাকে।'

'আমার ছবি রবি হীরের টুকরো। ছবি হবে ইঞ্জিনিয়ার, আর রবিকে আমি ডাক্তারী পড়াবো।'

ইঞ্জিনিয়ার নামটাই শুধু শুনেছেন বরদাসুন্দরী। কি তাদের কাজ তা তিনি জানতেন না। তাই বলেছিলেন—'রবি ডাক্তার হবে ভাল কথা। বিপদে-আপদে ডাক্তার ডাকতে হয় আর কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ। তার চেয়ে বাড়ীতে একটা ডাক্তার থাকলে অনেক টাকা বেঁচে যায়। কিন্তু ছবিকে আমি ইঞ্জিন চালাতে দেবো না। একে বেচারা গরম সহ্য করতে পারে না। রোদ্দুরে হাঁটলে মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, তার ওপর ওই আগুনের তাতে—দেখেছি তো ঘস্ ঘস্ করে ঘোরা বেরোয়—

বরদাসুন্দরী কার কথা বলছেন হরেনবাবু প্রথমে বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী বলছো তুমি?

'ওই যে ইঞ্জিনিয়ার না কী বলছো—'

হেসে উঠলেন হরেনবাবু। বলেছিলেন, 'তোমার মত বোকা মেয়ে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুটি দেখিনি। কথাটা শুনে রেগে গিয়েছিলেন বরদাসুন্দরী।

হ্যাঁ তা বলবে বই-কি! আমাকে তো তুমি মানুষ বলেই মনে করো না। ভাখো, আমি আছি বলে তোমার এই সংসারটি এখনও ঠিক চলছে. নইলে তোমার মত বাপ্—'

'বাপ কি করলে? বাপের দোষ দিচ্ছ কেন?'

'বাপের দোষ দেবো না? বাপের দেখে দেখেই তো ছেলেরা শেখে! বাপ্ কোনোদিন একটা পয়সা রোজগার করেছে? ছিল বাপ্-ঠাকুর্দার পয়সা তাই বসে বসে খেয়েছে আর মোসায়েব নিয়ে আড্ডা মেরেছে! তোমার ছেলেরাও দেখবে ঠিক তোমারই মতন হবে।'

হরেনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর রাগের হেতু। হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

হাসি দেখে রাগটা আরও বেড়ে গিয়েছিল বরদাসুন্দরীর। বলেছিলেন, 'তা হাসবে বই-কি আমি তো তোমার লেখাপড়া জানা আজকালকার মত মেম্-বৌ নই আমি হলুম গিয়ে মোটা চিপচিপে সেকেলে মানুষ। চালাক-চতুর নই, বোকা—'

আরও কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, হরেনবাবু তাঁর হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে বোকা বলেছি কেন জানো? তুমি বলছো ইঞ্জিনিয়ার মানে যারা রেলের ইঞ্জিন চালায়। কিন্তু তা নয়। শোনো। ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিন চালায় না। তারা অন্য কাজ করে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিতে পারতুম কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না।'

'তা বুঝবো কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। যত বুঝনেওলা হচ্ছো গিয়ে—তুমি। করেন্ চাটুজ্যের মতন সমঝদার বুদ্ধিমান লোক আর দুটি নেই সিথিমিতে তা আমি জানি।'

'কি বললে? করেন চাটুজ্যে?'

'হ্যাঁ। স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই।'

হরেনবাবু বললেন, 'না না এখন আর ও-সব মানতে হবে না। আমরা বুড়ো হয়েছি। এখন তুমি আমার নাম ধরে ডেকো।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'তা আর পারলুম কই? সোয়ামীর নাম ধরে ডাকে, সিঁথিতে সিঁদুর

দেয় না—সেই রকম একটি বৌ যদি হতো তোমার, তাহ'লে দেখতে তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচাতো। আর তুমি তারই কাছে হাতজোড় করে বসে থাকতে।'

এমনি হয়ত আরও কিছুক্ষণ চলতো কিন্তু ঝাঁটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো সুরো। সুরোর ভাল নাম সুরবালা। ঝিএর কাজ করে এই বাড়ীতে। কতদিন ধরে কাজ করছে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। চেহারা দেখলেও বয়স বলা শক্ত। আঁটসাঁট গড়ন। দাঁত ভাঙেনি, চুল পাকেনি, কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজ করছে তো করছেই। কাজ করছে আর আপন মনে বকছে।

সুরোর এসে দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখেই বুঝা গেল—তোমরা একটু সরে বোসো। সে ঝাঁট দেবে। ঘরটা পরিষ্কার করবে।

হরেনবাবু সেই সুযোগে পালিয়ে বাঁচলেন। সেখান থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। একটা ইজি চেয়ার পাতা ছিল বারান্দায়। হরেনবাবু হাত-পা ছড়িয়ে বসলেন। বলেই ডাকলেন, 'মতি, তামাক দিয়ে যা।'

বরদাসুন্দরী যেখানে বসেছিলেন, সেই জায়গাটা পরিষ্কার করবার যেন খুব বেশি দরকার হয়ে পড়লো সুরবালার। খাটের ওপর বসেছিলেন বরদাসুন্দরী। সুরবালা ঝাঁটা নিয়ে বসলো তাঁর পায়ের কাছটিতে। অর্থাৎ খাটের নীচেটা পরিষ্কার করতে হবে।

খাটের নীচে ঝাঁটা চালাতে চালাতে বললে, 'কি যে হবে কে জানে বাপু, আমার তো ভাল লাগছে না।'

সুরবালার কথায় বড় একটা কান দেয় না কেউ। কিন্তু সেদিন সে কথাটা মনে হলো যেন সে গিন্নিমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললে। বরদাসুন্দরী কথা না বলে পারলেন না। বললেন, 'কি যে, কী ভাল লাগছে না তোর?'

সুরবালা উবু হয়ে বসে মুখ তুলে তাকালে বরদাসুন্দরীর দিকে। তারপর গলাটা যেন খাটো করে বললে, 'ছোট্‌কার সঙ্গে অত বেশি মাখামাখি ভাল লাগছে না।'

রবিকে সে ছোটকা বলে ডাকে, আর ছবিকে বলে বড়কা।

'রবি আবার কার সঙ্গে মাখামাখি করলে?'

সুরবালা বললে, 'জানি না বাপু, তোমাদের বড় লোকের কাণ্ডকারখানা। সেই কথায় বলে না—'ছোট মুখে বড় কথা, বল্ মা আমি যাব কোথা! কথা তো নয় আগুনের ফিন্‌কি। এক কথা সাত কানে ঘুরে-ঘুরে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসে। তাই বলছিলুম—একটু ধমকে দিও। আমি ধমকাই, আমার কথা কি শোনে নাকি কেউ? বড়কা ছোটকাকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, এখন বড় হয়ে দেখছি ওরাই আমাকে মুখ করছে।'

একে বরদাসুন্দরীর মন-মেজাজ ভাল ছিল না, তার ওপর সুরোর কথাটা ঠিক ভাল করে বুঝতে না পেরে চটে গেলেন। বললেন, 'তোর হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না সুরো। যা বলবি পষ্ট করে বল্।'

এবার বোধকরি 'পষ্ট' করেই বললে সে।

'বাইরের ঘরে যেবি কিনা তোমার বৌমাটি দিব্যি পা মেলে বসেছে, আর ছোট্‌কা একটা আলতার শিশি নিয়ে তার দু'পায়ে আল্‌তা পরাচ্ছে।'

বরদাসুন্দরী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।—'তাই বল্। আমি বলি—কী-না-কি কাণ্ড-কারখানা হয়ে গেল।'

একটুখানি প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'তা ওরা দু'জন তো খেলার সঙ্গী সুরো। দেওর-ভাজ সম্পর্ক, একটু আমোদ-আহ্লাদ করে তো করুক না!'

সুরবালা বললে, 'করুক্।'

করুক্ বলে এমনভাবে সে কাঁটা চালাতে লাগলো, মুখ দেখে মনে হলো যেন গিন্নিমার জবাব শুনে সে খুশী হয়নি। খানিক চুপচাপ থেকে সে আবার বকতে লাগলো।

'মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করতে আছে? রাম বল! নিজে আমি যে!'

'কী জানিস?'

'কিছু না মা, কিছু না। মুখ ফস্‌ফস্ করে, চুপ করে থাকতে পারি না। আমার মুখে ঝাঁটা!'

'সেই ভালো। এই নিয়ে তুই আর কোনও কথা বলিস না।'

'না মা, আর বলবো না।'

এই বলে সুরবালা কাজ করতে লাগলো আর বরদাসুন্দরী সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন হরেনবাবুর কাছে। হরেনবাবুর হাতের কাছে গড়গড়াটা এনে দিয়েছে মতি। হরেনবাবু মনের সুখে টেনে টেনে ধোঁয়া বের করছিলেন। বরদাসুন্দরীকে দেখেই বললেন, 'কি গো, রাগ পড়লো?'

'কার ওপর রাগ করবো? শরীরে রাগ থাকলে তো! ডাক্তার সেদিন কি বললে শুনলে না? রাগী মানুষ রোগা হয়। আমি তো রোগা নয়। আমার রাগ হবে কেন?'

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পরামর্শ করছিলে সুরোর সঙ্গে?'

'পরামর্শ করার মানুষটি বেশ! রবি বুঝি বৌমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। তাই না দেখে সুরো আপন মনেই গজ্ গজ্ করছিল। বলছিল—ছোটকাকে বমকে দিও।'

জবাবে কিছুই বললেন না হরেনবাবু। ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে তিনি তামাক খেতে লাগলেন। দেখে মনে হলো তিনি কি যেন ভাবছেন।

ভাবছিলেন সত্যিই। খানিক পরে বললেন, 'হ্যাঁগা তাহ'লে ভুল করলাম নাকি?'

'কী ভুল করলে?'

কথাটা যেন মুখ দিয়ে সহজে বেরোতে চাইছিল না হরেনবাবুর। শেষে বললেন, 'লক্ষ্মীর বিয়েটা কি রবির সঙ্গে দিলেই ভাল হতো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ও মা, তুমি এই কথা ভাবছো? তাই আবার হয় নাকি? বড় ভাই এর বিয়ে হলো না, ছোট ভাইএর বিয়ে হবে?'

হরেনবাবু বললেন, 'তা তো নয়, আসল ব্যাপারটা হলো অন্যরকম। তুমি একেবারে ক্ষেপে উঠলে একটি মেয়ের জন্যে। লক্ষ্মীকে দেখে তোমার আর তর সইলো না।

বরদাসুন্দরীকে রাগাবার জন্যে কথাটা তিনি বলেন নি। তবু রেগে উঠলেন বরদাসুন্দরী। বললেন, 'আমার ক্ষেপে ওঠাটাই দেখলে তুমি? এই যে অমলের ব্যারামে ভুগছি, কবে হট্ করে মরে যায় তার ঠিক নেই, আমার যদি একটা সাধ হয় সে-সাধ মেটাবো না বলতে চাও?'

হরেনবাবু বললেন, 'নাঃ, তোমার রাগ এখনও কমেনি দেখছি। আমি কিছু বলতে চাইনি। আমি শুধু ভাবছি। ভাবছি ভাল করলাম না মন্দ করলাম।'

'না কিছু মন্দ করনি। যে যা বলছে বলুক। সুরোর কথায় কান দিতে আছে নাকি? তুমিও যেমন!'

'আমি তো কান দিইনি। তুমিই তো খবরটা নিয়ে এলে আমার কাছে।'

সুরবালা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল কথাটা। শুনতে পেয়েছিল না আড়ি পেতে শুনছিল কে জানে। ঝাঁটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। যাবার সময় কত্তা গিন্নিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে গেল—'ঘাট হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, আর বলবো না।'

অন্য কেউ হলে বরদাসুন্দরী তাকে হয়ত তিরস্কার করতেন, কিন্তু সুরবালার সাত খুন মাপ।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'শুনলে তো?'

হরেনবাবু বললেন, 'শুনলাম।'

বলেই তিনি খড়গড়ার নলটা আবার তুলে নিলেন মুখে। আবার সেই একই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসলো।

বাধা পড়লো চিন্তায়। ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ শোনা গেল পায়জোরের। লক্ষ্মী আসছে।

বরদাসুন্দরী সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভেবেছিলেন আলতা পরানোর কথাটা বলবেন তাকে। কিন্তু বলবার দরকার হলো না। হাসতে হাসতে সে নিজেই এসে বললে, 'দেখেছো মা, কিরকম আলতা পরেছি। কে পরাল বল তো?'

তারই মুখ থেকে শুনতে চাইলেন বরদাসুন্দরী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে পরালে?'

লক্ষ্মী ফট করে বলে ফেললে, 'রবি।' বলেই আবার কথাটা পাল্টে নিয়ে বললে, 'ঠাকুরপো।'

'শুনলে গো!'

কথাটা বরদাসুন্দরী যাকে উদ্দেশ করে বললেন, তিনি তখন খড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। নলটা টানছিলেন না—পাছে গুড়্ গুড়্ শব্দে লক্ষ্মীর কথাগুলো শুনতে না পান।

হরেনবাবু বললেন, 'উঁ।'

বরদাসুন্দরী আবার বললেন, 'শুনলে?'

'হুঁ। শুনলাম।'

ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো রবি।

'আচ্ছা মা, তুমি বল তো—আলতা পরানো খারাপ হয়েছে? তোমার জামা নাপ্‌তানী এর চেয়ে ভাল পরায়?'

বরদাসুন্দরী কিছু বলবার আগে হরেনবাবু ডাকলেন, 'রবি।'

রবি বললে, 'কি?'

'এইখানে আয়, শোন্।'

রবি গিয়ে দাঁড়ালো তার বাবার ইজি-চেয়ারটার হাতলের কাছে।—'কি বলছো বাবা?'

বলেই সে পা ঝুলিয়ে উঠে বসলো চেয়ারটার হাতলের ওপর।

হরেনবাবু তাঁর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে রবির পিঠের ওপর রাখলেন। বললেন, 'তোমাকে পড়তে দেখছি না তো?'

'বা। জানো আমি সেকেণ্ড হয়েছি তুমি জানো না?'

হরেনবাবু বললেন, আসছে বছর তোমাকে কাই হতে হবে। তার জন্যে পড়া দরকার।'

রবি বললে, 'পড়ি তো।'

'কখন পড়ো? চব্বিশ ঘণ্টা তো দেখছি তোমার বৌদির সঙ্গে খেলা করছো।'

'মা যে বলেছে খেলা করতে!'

মা'র মুখের দিকে তাকালে রবি।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বলেছি। তাই বলে পড়তে তো বারণ করিনি!'

রবি বললে, 'বেশ। তাহ'লে এই কথা রইলো—বৌদি শোনো, তুমি আর আমার কাছে এসো না। আর মা—

বলেই সে টুপ করে চেয়ারের হাতল থেকে নেমে বরদাসুন্দরীর কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললে, 'বৌদি যদি এবার দাদার বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকে তো আমিও কিছু বলবো না এই আমি বলে রাখছি তোমাকে।'

লক্ষ্মী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠলো। তবু সে বললে, 'এই মা—কিরকম মিছে কথা বলছে ভাখো। আমি তো আমার সেই ছবির বইখানা আনতে গিয়েছিলুম। তুমিই তো ওর বিছানার ওপর নিয়ে গিয়ে রেখেছিলে!'

রবি বললে, 'মা, শুনলে তো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কী?'

'দাদার নাম মুখে আনলে, শুনলে না? বললে—ছবির বই। ও কিছু মানে না।—বেশ বাবা, বেশ আমার বয়ে গেল। তুমি এবার দাদার ঘরে গিয়ে বসে থাকো, যা খুশী তাই কর। আমি আর তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না।'

এই বলে রবি বোবহয় রাগ করেই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

• • • •

..... যাহারা বাঙ্গালাভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীর্বাদ করি।.....যাহারা দেশের জন্য ভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করি।..... যাহারা আপনার দেশের পুরাণ কথা লইয়া আলোচনা করে তাহাদের আশীর্বাদ করি।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লটারি।

আজকাল অসংখ্য লটারির প্রচলন হয়েছে। এক-একটি লটারিতে লক্ষ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়। ফাঁকতালে মোটা টাকা পাবার এই স্পৃহা মানুষের মনে বহু যুগ ধরেই বাসা বেঁধে আছে।

কোম্পানীর আমলে প্রথম বিধিবদ্ধ লটারির নাম 'ক্যালকাটা লটারি'। ১৭৮৪ সালে এই লটারি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তার আগে ১৭৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় একটি মেসমেন অফিসের বাড়ী নির্মাণ করবার জন্যে একটি লটারিতে বহু টাকা তোলা হয়।

১৭৯২ সালের মে মাসে কলকাতায় একটি সভাগৃহ নির্মানের জন্য এক লটারি হয়। এই সভাগৃহই ভবিষ্যতের 'টাউন হল'।

১৮০৫ সালে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন অনুসারে অনুষ্ঠিত 'টাউন হল লটারিতে' ৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। টাউন হলের জন্যে তিনবার লটারি করা হয়। তাতে সর্বসমেত যে টাকা ওঠে তার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রাইজ দেয়া হয়, ১৫ হাজার টাকা অনুষ্ঠানের ব্যয় বাবদ ধার্য হয় এবং অবশিষ্ট ৭৪ হাজার টাকা দিয়ে টাউন হলের নির্মাণ কার্য শুরু হয়।

কলকাতা শহরের উন্নতিকল্পে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন ক্রমে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৮১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি লটারি হয়। প্রথম প্রাইজ ছিল ১ লাখ টাকা, তারপর ছিল ৫০ হাজার টাকা, ২৫ হাজার টাকা এবং আরো অনেকগুলি ছোট ছোট অঙ্কের প্রাইজ। এই সমস্ত প্রাইজ এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে রাস্তা মেরামত, কোম্পানীর বাগান, জলনিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি শহরের উন্নতিমূলক নানা কাজ করা হয়েছিল।

সরকারী লটারি ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরাও নানা ধরণের লটারির অনুষ্ঠান করতেন। ড্যানিয়েল নামে এক ইংরাজ চিত্রকর এদেশে এসে অনেকদিন ছিলেন এবং এদেশের মানুষ ও দৃশ্যাবলী নিয়ে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন। তিনি এক অভিনব ধরণের লটারি করে তাঁর ছবিগুলি বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কোম্পানীর আমলে নানা বিচিত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নানাধরণের লটারির খবর জানানো হত। যথা :—

"ক্যাপটেন ব্রিয়ারলে তাঁর বন্ধুদের প্রীতি জানাচ্ছেন। এবং সেই সঙ্গে জানাচ্ছেন যে তিনি তাঁর ইংলণ্ডের বসতবাড়ী কলকাতায় এক লটারি করে বিক্রি করবেন। এই লটারিতে ৫০১ টিকিট থাকবে। প্রত্যেকটি টিকিটের দাম ১০০ টাকা।"

৮০ হাজার টাকা দামের একটি হীরের আংটি লটারি করে বিক্রি করা হবে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। প্রতি টিকিট ১০০ টাকা। মোট ৮০০ টিকিট বিক্রি করা হবে।

আরেকটি বিজ্ঞাপন :—

"রবার্ট চ্যাপম্যান তাঁর হুগলীর নীলমুঠী বিক্রি করবার মনস্থ করে এক লটারির আয়োজন করেছেন। এই লটারিতে ৫০০ টিকিট বিক্রি করা হবে। প্রতি টিকিটের দাম ২০০ টাকা।"

সেই সময়ে টুলো এণ্ড কোম্পানী নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি অনেকগুলি লটারির আয়োজন করেছিল। সেইসব লটারিতে বিলাতের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, চিত্র এবং মৌখীন জিনিষ প্রাইজ স্বরূপ দেওয়া হয়।

এইভাবে যখন চতুর্দিকে লটারির খেলা চলতে লাগল তখন ইংরাজ সরকার এই রকম অবাধ লটারির কুফল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে লটারির প্রচলন রোধ করবার ব্যবস্থা করলেন। ১৮০০ সালের ২০শে মে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল : "এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল এই শহরে গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে সর্বপ্রকার লটারি নিষিদ্ধ করে দিলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে কোনো লটারি অনুষ্ঠিত হলে তা বে-আইনী গণ্য হবে এবং তার উদ্যোক্তারা দণ্ডনীয় হবেন।"

ভ্রমণ

কোম্পানীর আমলে পাল্কী-ডাক এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাবার একমাত্র যানবাহন ছিল। এই পাল্কী যানে চেপে কাশী পর্যন্ত যাওয়া যেত। কয়েকটি স্থানের ভাড়া নীচে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে পাল্কী যানে ঐসব স্থানে যেতে নিম্নরূপ খরচ লাগতো :—

চন্দননগর	১৮ মাইল	টাকা	২৪৲
বংশবাটি	৩৪ ,,	,,	৪৮৲
মিরজাপুর	৫৫ ,,	,,	৭৮৲
কাশীমবাজার	১১৩ ,,	,,	১৬০৲
মুর্শীদাবাদ	১২৪ ,,	,,	১৬০৲
রাজমহল	১৯০ ,,	,,	২৪৭৲
মুঙ্গের	৩০০ ,,	,,	৪০৬৲
পাটনা	৪০০ ,,	,,	৫৪০৲
বক্সার	৪৯২ ,,	,,	৬৬৪৲
কাশী	৫৬৬ ,,	,,	৭৬৪৲

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরী শুরু হয় ১৮০৩ সালে। ১৮৫২ সালে দিল্লী পর্যন্ত এই রাস্তা প্রসারিত হয়। এই রাস্তার ধারে ধারে অল্প ব্যবধানে সৈন্যদের বিশ্রামের জন্যে ছাউনি, যাত্রীদের জন্যে সরাইখানা এবং ডাকবাংলো নির্মিত হয়। এবং রাস্তার ও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্যে ২ মাইল অন্তর পুলিশ থানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক থানাতে দু' জন করে রক্ষী থাকতো।

১৮৫৫ সালে সরকারী মহিষ-যান বেনারস, দিল্লী, মিরাট এবং আগ্রার মধ্যে প্রচলিত হয়। কলকাতা থেকে বারাকপুর পর্যন্ত বি. টি. রোড ১৮০৫ সালের ২৬শে জুলাই জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৮৫০ সালে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন হয়। ডাঁতিদল নামে এক ব্যবসায়ী এর প্রবর্তন করেন। পরে গ্রীনওয়ে এ্যাণ্ড কোং কলকাতা থেকে কানপুর পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের ব্যবসা খোলেন।

রেলগাড়ীর পত্তন হয় ১৮৪৯ সালে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একটি রেললাইন বসাবার জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করা হয়।

১৮৫৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

সেই সময় রেলগাড়ীর প্রচলনের প্রথম অবস্থায় সেইসব তল্লাটের অধিবাসীদের মধ্যে যে প্রচণ্ড কৌতূহল উত্তেজনা এবং আতঙ্ক-মিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেডি ফরবস্যাণ্ড তাঁর একটি স্মৃতি-চিত্রে :—"ট্রেন যখন চলতে শুরু করল তখন লাইনের ধারে ধারে কাতারে কাতারে লোক জমল। ট্রেনের বাঁশী শুনে তারা ভাবল বুঝি বা কোনো দৈত্য বা দানব মর্তে নেমে এসে হুঙ্কার ছাড়ছে। এই ট্রেন-ভ্রমণ এক নতুন যুগের সূচনা করল। ট্রেনের কামরায় সকলের সমান অধিকার। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, হিন্দু অহিন্দু সকলেরই।

"প্রথম যখন রেলগাড়ীর প্রচলন হলো তখন প্রশ্ন উঠল এদেশের লোক ট্রেনে চড়ে যাতায়াত করবে তো? রেলগাড়ী দেখে এদেশের লোকের মনের ভীতি এবং সন্দেহ দূর হতে কিছু সময় লাগল। প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিল, এইরকম একটা বিকট দৈত্যযানে চেপে তারা কেউই নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবে না।

"তারপর পায়ে হেঁটে বিনা পয়সায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার পরিবর্তে তারা পয়সা খরচ করে ট্রেনে চেপে যাবে কিনা তাও ছিল আর একটি প্রশ্ন। কিন্তু দেখা গেল এদেশের লোক অতি শীঘ্রই তাদের সংশয় মন থেকে দূর করে দলে দলে ট্রেনে চড়ে যাতায়াত করতে লাগল।

"যে জায়গায় যেতে আগে লাগত পুরো পাঁচ দিনের ক্লান্তিকর পায়দল-যাত্রা সে জায়গায় ট্রেনে চড়ে লাগছে মাত্র ৭ ঘণ্টা।

"আর খরচ হচ্ছে মাত্র এক টাকা চৌদ্দ আনা। আর কী আরাম! একটি ঝকঝকে কাঠের ঘরের মধ্যে গিয়ে পা ছড়িয়ে বস, ব্যস, হুহু করে তুমি সেই বসা অবস্থায় চলে গেলে তোমার গন্তব্যস্থানে।

"ভয় ছিল, যদি প্রথম অবস্থাতে ট্রেন দুর্ঘটনা বা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটত তাহলে লোকের মনে যে সংশয় ছিল তা আরও বদ্ধমূল হত। এবং তাহলে হয়ত তারা রেলগাড়ীর ত্রিসীমানায় আসত না।

"কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে একটিও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেনি। ফলে রেল ভ্রমণ অল্পকালের মধ্যেই ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল।"

লেডি ফরবস্যাণ্ড ছিলেন একজন বিদুষী এবং সাহিত্য-গুণসম্পন্না মহিলা। কলকাতা এবং বোম্বাইএ তিনি অনেকদিন বসবাস করেছিলেন।

বিজ্ঞাপনের চটক

সে সময় নানা ধরণের অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরুত। এই বিজ্ঞাপনগুলিতে তৎকালীন ইংসমাজের কিছু কিছু তথ্যও জানা যেত। কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত হলো :

এক

"চীনদেশ-নিবাসী টম ক্যাট কলকাতাবাসীদের জানাচ্ছেন যে তাঁদের বাড়ীর বা বাগানের পুষ্করিণী বা অন্যান্য জলাশয়গুলিকে যদি পরিষ্কার করাতে চান তাহলে টম ক্যাটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি তাঁর চায়নীজ পাংশের সাহায্যে এদেশের মজুরদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং ভালোভাবে তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

ঠিকানা—শালকিয়ার তাড়িখানা।

তারিখ—৪ঠা মার্চ ১৭৮৪।"

দুই

"মিষ্টার সুবাইশ জনসাধারণকে জানাচ্ছেন যে তিনি নিম্নলিখিত খরচায় তলোয়ার খেলা শেখাতে প্রস্তুত আছেন :—প্রবেশ মূল্য দুই মোহর। তারপর মাসে দু'মোহর। প্রতি সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার তাঁর বাড়ীতে এই শিক্ষা দেওয়া হবে। যদি কেউ তাঁর নিজের গৃহে শিক্ষা নিতে চান তাহলে মঙ্গলবার এবং শনিবারে মিঃ সুবাইশ শিক্ষার্থীর বাড়ীতে গিয়ে শেখাবেন। সেক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য তিন মোহর এবং প্রতি মাসে তিন মোহর।

তারিখ—২৩শে জুন ১৭৮৪।"

তিন

"ময়দার কল। ক্রিষ্টোফার ডেকষ্টার জনসাধারণকে জানাচ্ছেন যে তিনি বহু ব্যয়ে একটি ময়দার কল স্থাপনা করেছেন। এটি হচ্ছে বাংলা দেশের প্রথম ময়দার কল। সেই সঙ্গে তিনি একটি পাউরুটি তৈরীর উনুনও বানিয়েছেন। তিনি আশা করেন যে তাঁর পাউরুটি বাজার চলিত অন্যান্য পাউরুটির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

তারিখ—২১শে মার্চ ১৭৮৯।"

চার

"বাড়ী বিক্রয়। চৌরঙ্গীর ধারে দেড় হাজার টাকায় একটি সুন্দর নতুন বাগান বাড়ী বিক্রয় আছে।

তারিখ—২৪শে জানুয়ারী ১৭৯২।"

পাঁচ

"এক ব্যক্তি তাঁর পায়ের ঘড়ার জন্যে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর এই ঘড়াগুলি যে সারিয়ে দিতে পারবে তাকে তিনি ১০০০৲ দেবেন।

ঠিকানা—৮৩ জিমজ্যাগ লেন। তারিখ—২১শে মার্চ ১৭৯৩।"

* * * *

সেই সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে কলকাতায় কয়েকজন বিখ্যাত নীলাম ব্যবসায়ী ছিলেন। যথা, কিং, জনসন এ্যাণ্ড পিয়ার্স, মোয়ার্ট এ্যাণ্ড কেরিয়া, ষ্টুয়ার্ট এ্যাণ্ড ব্রাউন এবং টুলো এ্যাণ্ড কোম্পানী। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং ট্যাঙ্ক (ডালহৌসী) স্কোয়ারে ৫০ বছর একনাগাড়ে তাদের ব্যবসা চালায়।

১৭৯৪ সালে বার্বার অ্যাণ্ড পামার নামক বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁদের কাগজ আমদানী সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞাপন দেন। এই কোম্পানীর পামার সাহেবকে "কলকাতা বণিকদের রাজা" বলে অভিহিত করা হত। টাউন হলে তাঁর একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি বসানো হয়েছিল। এখন যেটি লালবাজার পুলিশবাড়ী সেটিই ছিল পামার সাহেবের বাসভবন।

• • • • •

ছয়

"এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে ১৭৯৯ সালের ১লা জুন একটি বিমা কোম্পানী চালু হবে। এই কোম্পানীর নাম ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। এই কোম্পানী জাহাজ এবং পণ্যদ্রব্যের বিমা গ্রহণ করবেন।"

সাত

"বণ্য পশু বিক্রয়। ২৫৩ নম্বর লালবাজারের অধিবাসী ভদ্রলোক জানাচ্ছেন যে তিনি নিম্নলিখিত জন্তুগুলি বিক্রয় করবেন,—একটি পূর্ণবয়স্ক বয়েল বেঙ্গল বাঘ, একটি বুলডগ, দুটি চারমাস বয়েসের ব্যাঘ্র শাবক এবং একটি পাঁচ মাস বয়েসের চিতাবাঘ।"

আট

"গৃহত্যাগ। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে আমার স্ত্রী ১৮০০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে আমার বাড়ী থেকে পলায়ন করেছে। তার নাম হারপসী মিশেরিন। তার বাবার নাম জোহানীস মলুক সেট (আর্মানি), চুঁচুড়ার অধিবাসী। এই পলায়নের কারণ অজ্ঞাত। আমি এতদ্বারা জানাচ্ছি যে আমার উক্ত পলাতকা স্ত্রী যদি কারুর কাছে কোনো টাকা ধার নেয় সেজন্য আমি দায়ী হব না।"

নয়

১৮০৯ সালের ১৮ই মে টুলো এ্যাণ্ড কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেন 'যে বেলভেডিয়ার হাউস' নিলামে বিক্রি করা হবে। ইতিপূর্বে এই বাড়ীতে মাসিক ৪৫০৲ ভাড়ায় ভারতের প্রধান সেনাপতি বাস করতেন। এই বিরাট বাড়ীর সংলগ্ন বাগান ও জমির পরিমাণ ১২ বিঘা। এই বাড়ীর আদি মালিক ছিলেন কর্ণেল টলি।

দশ

১৮০৮ সালের ৩রা নভেম্বর আর. হ্যামিলটন নামে এক অহরী বিজ্ঞাপন দেন যে তিনি ৫নম্বর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে তাঁর অহরতের দোকান খুলেছেন। এই হ্যামিলটন কোম্পানী আজও বর্তমান।

এগার

১৮৮৩ সালের ২১শে মার্চ তারিখের গভর্ণমেণ্ট গেজেটে আমরা এই বিচিত্র বিজ্ঞাপনটি দেখতে পাই।—

"একটি জলকন্যা (মারমেড) এবং একটি সমুদ্র-রাক্ষসের মাথা ইণ্ডিয়ান ওক নামক জাহাজে করে এই প্রথম ভারতে আনা হল। জাপানের সমুদ্রের ধারে কয়েকজন জেলে এদের জালে আবদ্ধ করে ডাঙ্গায় তুলে আনে। সেখানে কয়েকজন বিদেশীয় নাবিক এই দুটি আশ্চর্য জিনিষ ক্রয় করে বাটাভিয়ায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে এদের বর্তমান মালিক এই দুটি দর্শনীয় বস্তুকে কলকাতায় এনেছেন। জনসাধারণের জন্যে এদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ৬ টাকা।"

চলতি দুনিয়া

নানা রকম খাবার স্বপ্ন কখনো দেখেন কি? বিস্কুট, পায়স, পনীর? তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে আনন্দ, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, সার্থকতা, তৃপ্তি ইত্যাদি।

ঠাণ্ডা লেগে হাঁচি পাচ্ছে এ রকম স্বপ্ন? কিংবা জমা-খরচের খাতা খুলে বসেছেন? ব্যাপারটা বোধহয় আপনার ভালো লাগছে না। কিন্তু ওই ধরণের স্বপ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতির ইঙ্গিত। যদি আপনি পুরুষ হন এবং স্বপ্নে কখনো দেখেন আপনার দাড়ি গজাচ্ছে ঘাবড়াবেন না। নাপিতের কাছে ছুটে যাবার দরকার নেই। এর মানে, আপনার বিবাহ আসন্ন। যদি কখনো স্বপ্নে দেখেন আপনাকে অ্যাস্ত ঘোর ঘোরা হচ্ছে তার মানে এই নয় যে ঘুমের ঘোরে আপনি মুখে কম্বল চাপা দিয়েছেন। ওই স্বপ্ন অর্থপ্রাপ্তি যোগের সূচনা জানায়। স্বপ্নে জানুয়ারী মাস দেখলে আপনি দীর্ঘজীবি হবেন। আজকাল স্বপ্ন দর্শনের এমনি সব মজার মজার ব্যাখ্যা করছেন ও-দেশের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা।

ওয়োম্যান্স্ ওন

• • • •

সংবাদ-পত্র পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই যে-সব বিজ্ঞাপন বেরোয় এবং বিশেষজ্ঞেরা যে-সব কথা বলেন তা মেনে নিলে দাঁড়ায় যে প্রতিদিন বেশ কিছু ভিটামিন খেলে যৌবন হারাবার ভয় থাকে না। অন্তত চেহারায় বা ব্যবহারে বার্দ্ধক্য কখনো ফুটে উঠবে না। নিশ্চয়ই যৌবন ধরে রাখার ক্ষমতা ভিটামিনের বেশ খানিকটা আছে। কিন্তু তা ব'লে শরীরের প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্যাদি না খেয়ে কেবল ভিটামিন খেলেই বিশেষ কোন কাজ হবে না।

ওয়োম্যান্স্ ওন

• • • •

যখন পারদপাত ৯৫ ডিগ্রি, সমস্ত বৃদাপেস্ত অসহ্য গরমে ছটফট করছে, গ্রীষ্মের তাপদাহ থেকে রেহাই পাবার জন্য ওখানকার লোকেরা তখন কোথায় যায়? কেন, বৃদাপেস্তেই। কথাটা ঠাট্টার মতো শুনালেও সত্যি। শহরের মাঝখানে তখন জমায়েৎ হয় শহরের সব লোক। ঐখানে দানিউব নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। দ্বীপের নাম মার্গারেট। সেখানে নানা ছায়া-তরু, রং-বেরঙের ফুল, চমৎকার সব রাস্তা। যারপর গ্রীষ্মে মার্গারেট দ্বীপে আশ্রয় নেয় বুদাপেস্তের বেশির ভাগ বাসিন্দারা।

হাঙ্গারিয়ান রিভিউ

• • • •

প্রেমের ব্যাপারে ফরাসীরা একেবারে দিলখোলা। যখন তখন, যেখানে সেখানে—কখনো ব্রিজের তলায়, কখন সীন নদীর ধারে, কখনও বইয়ের দোকানের ফাঁকে, কখনও বা পাহাড়ের উপরে, কিংবা সমুদ্রের পাড়ে যত্রতত্র চোখে পড়ে যুগল মূর্তি। কখনো বা অতি অন্তরঙ্গভাবে। লাইফ

• • • •

উপহার দেওয়া এবং নেওয়া দুইই রুচি সাপেক্ষ। অনেকে দেবার বা নেবার সময় উপহার সামগ্রীর বাজার দাম কত সেই বিচার করে। কখনো মনে মনে, কখনো বা প্রকাশ্যেই। কিন্তু উপহারের তাৎপর্য তার বাজার মূল্যে নয়, উপহার দাতার আন্তরিকতায়। ইভস্ উইক্‌লি

• • • • •

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন ভাবে অবকাশ যাপন করে। অষ্ট্রিয়ার ভদ্রলোকেরা সময় পেলেই স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভিয়েনার বনপথে। দুধিকে বড়ো-বড়ো গাছ, তার ঝরা-পাতায় ঢেকে গেছে মাটি। প্রায়ই দেখা যায় সেই পাতা পায়ের আঘাতে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেছেন কোনো অষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোক, এক হাতে মেয়ের হাত, আর এক হাত দিয়ে কাঁধের ওপরকার ছেলেটিকে সামলে রেখে। তার পাশেই চলেছেন স্ত্রী। তিনি ধ'রে রেখেছেন মেয়েটির আরেকটি হাত। এমন সুন্দর অবকাশ যাপন খুব কম দেশেই দেখা যায়। লাইফ

• • • •

পশ্চিমের দেশগুলিতে বড়ো বড়ো শহরে বাগান করবার মতো জায়গা কোথায়? অথচ বাগানের শখ অনেকেরই রয়েছে। সেই শখ মেটাবার জন্য ও দেশের লোকেরা এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন ঢঙের সারি সারি বোতল। তার ভেতরকার গাছপালা বাগানকেও হার মানিয়ে দেয়। তবে একটা কথা, বোতলে এমন সব গাছই লাগানো হয় যা ধীরে ধীরে বাড়ে। এই গাছগুলিতে যখন ফুল ধরে, ঘরের চেহারা পাল্টে যায়। এরকম বাগান করার খরচাও কম। ওয়োম্যানস্ ওন

• • • •

আর্ল হোয়ে-র আঠারো বছরের মেয়ে মেরী কার্জনের একান্ত ইচ্ছা তিনি মডেল হবেন। এই তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাত্রি-দিনের স্বপ্ন। দু ঘণ্টার মেয়াদে বার চারেক মডেল বিষয়ে পাঠ নেবার পরেই তার এই পরিকল্পনা। ওয়োম্যান

• • • •

মূকের বয়স তখন ষোল। ভিক্টর মূকের কুড়ি। ওরা প্রেমে পড়েছিলো। একসঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলো—আজি থেকে ন'বছর আগেকার কথা।

মেয়েটির বয়স এখন পঁচিশ আর ছেলেটির উনত্রিশ। ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ডাইভোর্স কোর্টের বিচারক রায় দিতে গিয়ে সব নতুন নতুন প্রেমিক-প্রেমিকাদের হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেছেন বিয়ে করবার আগে যেন তারা হাজার বার ভেবে দেখে।

ডেইলি মিরর্

• • • •

মিসেস কিং নামে এক ভদ্রমহিলা জানাচ্ছেন তার স্বামী নাকি এক ধনী মহিলার সঙ্গে প্রেম-লীলায় মত্ত হয়েছেন। ধনী মহিলাটির নাম মিসেস ডোনা জোসেফস। বয়েস উনত্রিশ। সুন্দরী।

মিসেস কিং থাকেন কেন্ট-এর ব্রকম্যান রোডে। মিসেস ডোনা একদিন নিজে গাড়ি চালিয়ে এলেন তার বাড়িতে। গাড়ির পেছনের সিটে ছিলো তার দু'টি বাচ্চা। মহিলাটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস কিং-এর স্বামী সুটকেস হাতে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়লেন তার সঙ্গে। মিষ্টার কিং এর সঙ্গে মিসেস জোসেফস এর পরিচয় মাত্র দু'বছরের।

ডেইলি মিরর্

• • • •

বিলেতে আজকাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অবৈধ প্রেমের হিড়িক প'ড়ে গেছে। এই সব ছেলে-মেয়েদের অনেকের বয়েস ষোলরও কম। অনেক সময় এদের দেখা যায় বেসামাল অবস্থায়। আগে তবু পুলিশ এদের ধরে নিয়ে আদালতে হাজির করতো। এখন সেদিকেও ঢিল পড়েছে। যে কারণেই হোক তাদের তৎপরতার অভাব দেখে পার্লামেন্টের একজন সদস্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন ওই সব দুর্নীতি-পরায়ণ ছেলেমেয়েদের ধ'রে আদালতে হাজির করতেই হবে। ছেড়ে দিলে চলবে না। —মিরর্

• • • •

দুরন্ত বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে বছরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কর্মীরা প্রায় ২৬,০০০,০০০ দিন কাজে যোগ দিতে পারে না। এর ফলে ব্রিটেনের বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। লণ্ডনের 'বাতরোগ সংস্থার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার স্বামী মিষ্টার অগিলভি। ডেইলি মিরর্

• • • •

বিলেতের আদালতের আরেকটি চমকপ্রদ মামলা। আসামী পনেরো বছরের ছেলে। স্কুলে পড়ে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গোপনে মাদক-দ্রব্য বিক্রি করাই তার কাজ। হেডমাষ্টার মশাই জানতে পেরে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। ঘাঁটি ছিলো তার দুটি। একটি ছিলো একটা নাচ ঘরের আড়ালে, আরেকটি ছিলো একটি খেলা ঘরের পেছনে। সান্ডে মিরর্

• • • •

বিলাতে বিবাহ বিচ্ছেদের এমনি হিড়িক পড়ে গেছে যে দেশ-নায়করা সমাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সামাজিক কল্যাণের কথা মনে রেখে ডাইভোর্স কোর্টের সভাপতি অফিসিয়াল সাইমন প্রস্তাব করেছেন যে সব দম্পতির ছেলে-মেয়েদের বয়স ষোল বছরের নিচে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন যেন না মঞ্জুর করা হয়। সান্ডে মিরর্

———

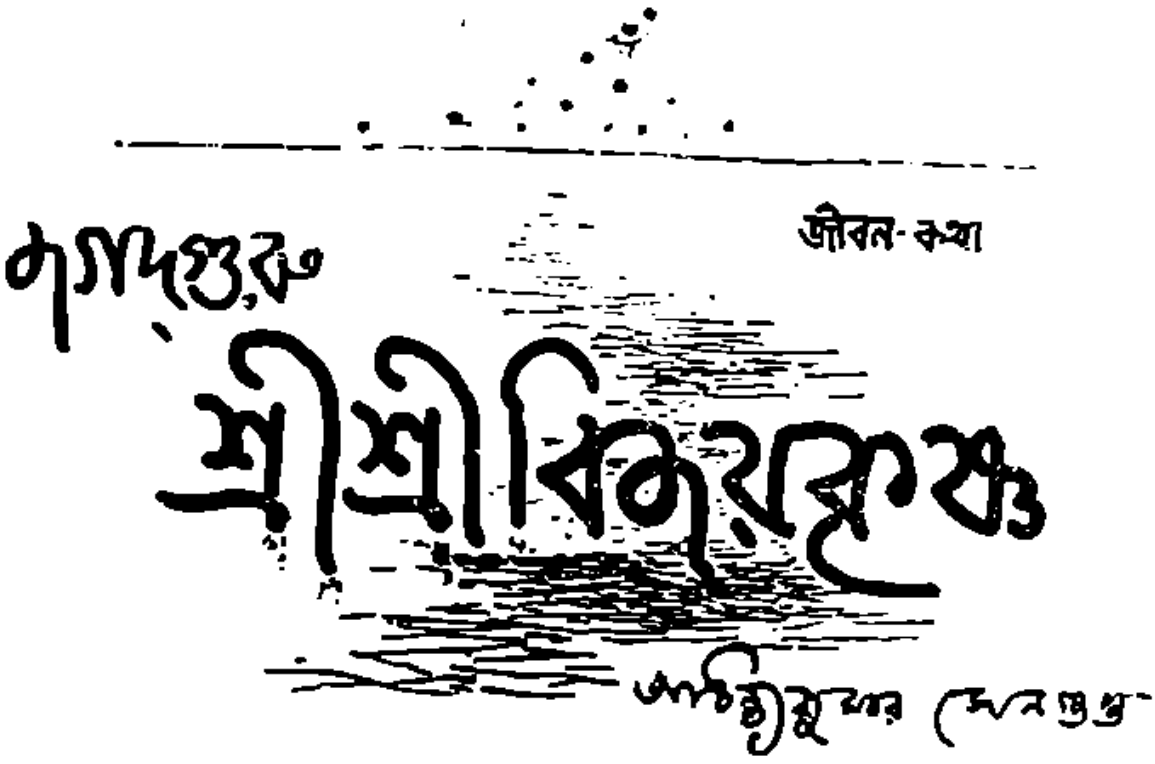

৩২

কলিশনে গোঁসাই ও তাঁর শিষ্যদের কামরাটা অটুট থাকল বটে কিন্তু গোঁসাই তাঁর পদতলে আঘাত পেলেন। কেন তাঁর আবার আঘাত কেন?

রহস্যটা কী?

গোঁসাই বললেন বটে সা-সাহেবের আশ্চর্য শক্তি, লোকেও তাই জানল বটে, কিন্তু আসল শক্তি গোঁসাইয়ের। যখন সঙ্ঘর্ষ হল গোঁসাই-ই পদতলে সমস্ত শক্তি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে কামরাটাকে স্থির রাখলেন। তাইতেই তাঁর পায়ে আঘাত। সা-সাহেবের তিনি অমর্যাদা ঘটাতে পারেন না বলেই সা-সাহেবের শক্তির প্রশংসা করলেন, আত্মপ্রচার করলেন না।

কলকাতায় এসে উঠলেন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের বাড়ি। সেখানে কদিন থেকে গেলেন কালনা। কালনা থেকে নবদ্বীপ। নবদ্বীপে এসে নিশিত উঠলেন টোলবাড়িতে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের হরিসভায়।

হরিসভায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ। এমন মনোহর ভঙ্গিমা তো দেখিনি কোথাও।

কী করে দেখবে? যে ভঙ্গিমায় বিদ্যারত্নের অন্তরে প্রকাশিত হয়েছিলেন এ বিগ্রহ তারই প্রতিরূপ।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। তার উপর আবার সন্ধ্যাতেই চন্দ্রগ্রহণ।

আজ একেবারে হুবহু মহাপ্রভুর অবতরণের দিন।

কী না জানি হয়! কে না জানি আসে! হাজার হাজার ভক্ত স্নানার্থী গঙ্গাতীরে এসে জমেছে। শতশত দলে সুরু হয়েছে কীর্তন, আর্তনাদ, হুঙ্কার-গর্জন—তুমি এস, তুমি দেখা দাও, তুমি আবার সেই হরিনামের বন্যা আনো।

জয় শচীনন্দন! জয় গৌরনন্দন! সজল কণ্ঠে মহাপ্রভুকে আহ্বান করতে-করতে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন গোঁসাই।

তাঁর সঙ্গের শিষ্য ভক্তদল সনৃত্য কীর্তনে মুখর হয়ে উঠল।

লোকারণ্য গঙ্গার ঘাট, সকলে অনুভব করল সসার্ষ্ট মহাপ্রভুই সংকীর্তন করছেন।

আর কথা নেই, সর্বব্যাপী আনন্দ-স্পন্দন, এ আমাদের মহাপ্রভুরই মহাবির্ভাব। এ আবার তাঁর নতুন করুণা।

দু-বাহু প্রসারিত করে সাধু হরবোলানন্দ ছুটে এলেন। গোঁসাইও দু-বাহু মেলে ধরলেন। পরস্পরের আলিঙ্গনে গাঢ় বদ্ধ হলেন দুজনে।

তারপর সুরু করলেন উদ্দাম নৃত্য।

'ওগো আমাদের সেই গৌর-নিতাই নাচছে গো।' সকলে বলে উঠল একবাক্যে: 'ওগো এই যে আমাদের দুই আরাধনার ধন।'

'এই যে এ্যাদ্দিন পরে পেয়েছি সামনে।' কোত্থেকে একটা লোক ছুটে এল গোঁসাইয়ের দিকে। তার হাতে একটা বাঁশ। বলছে, 'তোকে আজ বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করব।'

কী হল? কী হল? ভক্তদল তাকে রুখতে এগিয়ে এল। কেন, কী ব্যাপার?

"কী ব্যাপার! ও এ্যাদ্দিন আসেনি কেন? কেন এত দেরি করল? কোথায় ছিল এ্যাদ্দিন? আজ ওর একদিন কি আমার একদিন!'

গোঁসাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঁশকে কী করে বাঁশি করতে হয় গোঁসাই ছাড়া আর কে জানে!

ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটা হঠাৎ বাঁশ ফেলে দিয়ে গোঁসাইয়ের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল। কোথায় তর্জন-গর্জন, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ পরে উঠে পড়ে নাচতে সুরু করল। গান ধরল স্বতঃস্ফূর্ত।

'গোলোকে হতে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে
উদয় হল রে।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁই
ধরিয়া ধরিয়া প্রেম করে॥'

শুধু বাঁশকেই বাঁশি করেন না ঠাকুর, উদ্ভিদকে নিয়ে আসেন প্রভায়, হতাশকে স্পন্দনে, আড়ষ্টকে নৃত্যে আর সমস্ত অস্তিত্বকে বিন্যস্ত শরণাগতিতে।

গ্রহণ লেগেছে। গ্রহণ লেগেছে।

'ঐ ছাখ, ঐ ছাখ।' গোঁসাই আঙুল তুলে দেখালেন চাঁদের দিকে। নিজেই অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কী দেখলেন কী দেখালেন কে বলবে। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

শিষ্য ভক্তেরা তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল।

চাঁদ যতক্ষণ রাহুগ্রস্ত, রাহুমুক্ত থাকল, উঠলেন না সমাধি থেকে। তিন ঘণ্টা পর চাঁদের মোচন হল। তখন গোঁসাই জাগ্রত হলেন।

চলো চলো এবার সকলে স্নান করি।

তবুই কি স্নান? শুরু হল সেই জলকেলি, এর ওর গায়ে জল ছিটোনোর খেলা। বালকের মতই গোঁসাইয়ের দৌরাত্ম্য, বালকের মতই আবার আনন্দে ভোলানাথ।

স্নানান্তে তীরে উঠতেই কে একটি বালিকা গোঁসাইয়ের অঙ্গে সযত্নে নিয়ে এল। নাও, প্রসাদ পাও।

'কে রে মা তুই?'

মেয়েটী কিছু বলে না, মুখ টিপে টিপে হাসে।

'শুধু আমাকেই দিবি, আমার ভক্তদের দিবিনে?'

'বা, সবাইকে দেব। ভয় নেই, আমার টান পড়বে না।'

ভক্তরাও প্রসাদ পেল। কিন্তু এ যে কে, কার মেয়ে, কেউ বলতে পারে না। সযত্নে খাইয়ে চলে গেল মেয়ে। কোথায় তুমি থাক? কোথাও না।

পরদিন সকালে এক বুড়ি এক ভাঁড় দুধ নিয়ে উপস্থিত।

এ আবার কী মূর্তি!

গোঁসাইয়ের ভক্ত শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী, তোরা এখানে কী করে এলি? তোরা যে সব ব্রজের লোক। কী আশ্চর্য, তোদেরই বৈষ্ণব বলে কবে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোরা এখানে? বোস, তোদেরকে দুধ খাওয়াচ্ছি।'

একটা গ্লাসে ভাঁড় থেকে দুধ ঢালল বুড়ি। আগে গোঁসাইকে খাওয়াল। পরে আবার এক গ্লাস ভরল। এক ভক্ত খেতে আবার আরেক গ্লাস।

কতজন ভক্ত এখানে দেখেছ?

দেখেছি। আমার টান পড়বে না। আমার ভাঁড় অফুরন্ত।

ভক্তদের মধ্যে বসে আছে হরিমোহন পণ্ডিত। সে বললে, আমি খাব না।

কেন?

'পাত্র এঁটো হয়ে গেছে।' বললে পণ্ডিত।

'এঁটো কি হে? এ যে প্রসাদ। প্রসাদ কখনো এঁটো হয়?' বললেন গোঁসাই, 'নিন, খেয়ে নিন।'

তখন পণ্ডিত চোখ বুজে খেয়ে নিল।

'পাতে মোড়া ও কী?' পরমানিকে জিজ্ঞেস করল এক ভক্ত।

'ও আছে এক জিনিস।'

'দেখি না!'

'ও তোমাদের দেব না। তোমরা দুধ খাও।'

'ও কাকে দেবে?'

'দুটো ছেলে অনেক ঘুরে-টুরে হয়রান হয়ে আসে আমার কাছে, খেতে চায়। এই ক্ষীরটুকু ওদের জন্যে রেখেছি। এখানেও তো ওরা আসে—তাই না?' পরমানি তাকাল গোঁসাইয়ের দিকে।

'আসে।' গোঁসাই সস্মিতে মাথা নাড়লেন।

'আজ এলে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।' বুড়ি পরে আপন মনে বললে, 'বড় ছেলেটি বেশি ভালো, কেমন আলাভোলা, হাঁকডাক করে খায়। আর ছোটটি চাওা।'

'দেব পাঠিয়ে।'

বৃষ্টি চলে গেল ঝমঝম করে। গোঁসাই বললেন,'ঘরোয়াভাবে আছেন। খুব উচ্চ স্তরের সাধিকা।'

মহাপ্রভুর বাড়িতে রসিক দাসের কীর্তন হবে। গোঁসাই সেখানে চললেন সদলে।

পৌঁছুতেই রসিক এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল ঠাকুরকে। আশীর্বাদ ভিক্ষা করল সঙ্কীর্তন যেন সার্থক হয়।

গোঁসাই তার মাথায় হাত রেখে বললেন, মঙ্গল হোক।

আর রসিককে পায় কে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কীর্তন তুমুল জমিয়ে ফেলল রসিক। ঐ তো, ঐ তো—মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে আঙুল দেখিয়ে লাফিয়ে উঠলেন গোঁসাই—যেন পলকে সকলের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল, সভামধ্যে দেখতে পেল মহাপ্রভুকে। আকাশস্পর্শী হরিধ্বনি উঠল। জয় শচীনন্দন। জয় শচীনন্দন!

রসিক সার্থক। রসিকের কীর্তন সার্থক। রসিকের সর্বত্র মঙ্গল।

চলো রাইমাতার বাড়ি যাই।

সে আবার কে?

এক তপস্বিনী বৈষ্ণবী। শুনে কী বুঝবে? দেখবে চলো।

'ওগো আমার বাড়ি অদ্বৈত এসেছে গো।' সশিষ্য ভক্ত গোঁসাইকে দেখে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী রাইমাতা উল্লাসে হাঁক পাড়ল: 'তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা—যার ডাকে মহাপ্রভু নেমে এসেছিলেন বৈকুণ্ঠ থেকে—ওরে সে, সে আমার বাড়ি এসেছে—'

কী করবে, লোক ডাকবে না আগে বসতে দেবে, কোথায় বা বসতে দেবে—ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল রাইমা।

গোঁসাই নিজের থেকে সকলকে নিয়ে দাওয়ায় বসলেন। বললেন, 'আমরা বেশ বসেছি। তুমিও বোসো চুপচাপ।'

'ওরে তুইই তো মহাপ্রভুকে এনেছিলি, আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে জীবোদ্ধার করেছিলি—ওরে তোকে পেয়ে আমি স্থির থাকি কি করে? আমার ছেলেদের মুখ শুকনো—তাদের আমি কী খেতে দিই? তুইও তো ঐ দলে। বল কী খেতে তোর ইচ্ছে করছে? সেদিন দূর থেকে তোদের দেখে এলাম। বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে একদিন আসিস। তুই আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলি, চলে এলি সদলবলে, আপনজনের মত বসলি আমার ঘরের দাওয়ায়। এখন আমি তোদের কী খেতে দিই, আমি গরিব মানুষ, আমার কী আছে।'

গোঁসাই বললেন, 'তোমার ঠাকুরঘরে প্রসাদ বলতে যা আছে তাই আমাদের দাও, আমরা কণা কণা করে ভাগ করে খাব।'

রাইমাতা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করল।

ফিরে এল হাতে এক থালা রসগোল্লা। নিজেই সবাইকে দিল বিতরণ করে।

সাধন বেড়ে গিয়েছে রাইমার। বললে, ওটা চলবে না। এখানে দুটি অন্ন পেয়ে যেতে হবে।

কত মেয়েছেলে এসে জড়ো হয়েছে বাড়িতে, রাইমা নিজের হাতে সব রান্না করল। চোখ দুটি ঊর্ধ্ব টানা, ভাবের ঘোরে চুলুচুলু, ছুটোছুটি করে একাই একশো হয়ে কাজ করতে লাগল। কখন

যে নিজের থেকে দুচোখ জলে ভরে ওরে ওঠে, টের পায় না, বুকের আঁচল খেসে যায়। দুহাত কাজ করছে বটে কিন্তু চোখ রয়েছে কোন ভাবলোকে, কী দেখছে, কেন এত সুখেও তার কান্না, তা কে বলবে।

বেলা বারোটার মধ্যে ভোগ হয়ে গেল। সবাই তারপর বসল আসন করে।

এর মধ্যে কত কী ব্যঞ্জন তৈরি করেছে রাইমা। তৃপ্তি করে সবাই আকণ্ঠ খেল—এত বিস্তৃত আয়োজন যে কেবল না কেবল না করেও কেবল কিছু কিছু। সে সব অবশিষ্ট একত্র করে বাড়ু পাকালে রাইমা, আশ্রমে যত লোক তত বাড়ু। প্রত্যেকে পেল একটা করে।

উচ্ছিষ্ট পাতা কাউকে তুলতে দিল না রাইমা। যদি কেউ তোলো তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছে।

বিদ্যারত্নের ছেলে মধুরানাথ পদরত্ন বললে, 'একটি অদ্ভুত তমাল গাছ দেখবেন আসুন।'

বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল পদরত্ন।

একটা গাছ নয় তো শ্যামসমারোহের মন্দির! গুঁড়ি তুলে উঠে গেছে উপরে আর শাখা-প্রশাখা এমন ছত্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে যেন মাটির উপরে একটি নিভৃত ঘর তৈরি হয়েছে। গাছের নিচেটা দিনের বেলাও অন্ধকার। রহস্যসুন্দর। মনে হয় ঐ গোপনের ঘরে ঢুকলে কোন এক অনির্বচনীয়ের সঙ্গে চেনা হয়ে যাবে।

কিন্তু শ্যামগুপের বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে!

একটি তিন বছরের ছেলে। পদরত্ন বললে, আমার ছেলের ঘরে নাতি।

কিন্তু গোঁসাইকে দেখে ছেলেটি লজ্জায় হাত দিয়ে চোখ ঢাকছে কেন, আবার হাত একটু সরিয়ে নিয়ে আড়চোখে তুকে হাসছে কেন? ও কে? কই শুধু হাসছেই না তো! এখন যে দেখছি কাঁদছে নিঃশব্দে।

'তোমরা এই ছেলেটিকে ভালো করে দেখে রাখো।' শিষ্যভক্তদের বললেন গোঁসাই, 'যার জন্যে লোকে ছুটোছুটি করছে তিনি যে কখন, কোন অলিতে-গলিতে কী ভাবে লীলা করছেন, তাঁর কৃপা ছাড়া কার সাধ্য নেই জানতে পারে। তোমরা ধন্য হলে।'

সমবয়সী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল ছেলেটির গা ঘেঁষে।

এটি কে?

এ আমার দৌহিত্রী, মেয়ের ঘরের নাতনি।

মেয়েটি ডান হাত দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল বাঁ দিকে। কত যেন খেলার সাথি, কত তাকে ভালোবাসে, এমনি স্নেহঢালা সেই দাঁড়াবার ভঙ্গি।

'জয় রাধারাণী।' এক ভক্ত উল্লাস করে উঠল!

মেয়েটি ছুট দিল। পদরত্ন নাতিকে নিয়ে এল গোঁসাইয়ের কাছে। সে গোঁসাইকে প্রণাম করল। গোঁসাই তাকে বুকে তুলে নিলেন। গায়ে পিঠে মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিলেন। আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না। তুমিই নমস্য হয়ে থাকবে।

ছেলেটি কদিন পরেই দেহের ত্যাগ করল।

কিন্তু শ্রীবাসের আঙিনায় ভেট যায় কেন? এ কী অনাচার।

যারা দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে প্রেম বেচে গেল তাদের বিশ্বাস দেখতে পয়সা লাগবে? যাদের পয়সা নেই যারা কাঙাল, তারা কাঙালের ঠাকুরকে দেখতে পাবে না?

দরকার নেই দেখে। আমি বাইরে থেকেই প্রণাম করছি।

তার চেয়ে চলো পুরোণো বন্ধু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যাই। রাজকুমার ব্রাহ্ম-সমাজে গান গায়, আমার কত দিনের চেনা।

গোঁসাইকে পেয়ে রাজকুমার আনন্দে উথলে উঠল। রাজকুমারের মা এসে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

'সে কী?' গোঁসাই বললে, 'রাজকুমার আমার ভাই। সে সূত্রে আপনি আমার মা। মা কি ছেলেকে প্রণাম করে?'

রাজকুমারের মা বললেন, 'বাবা, আমি যে তোমাকে মহাদেবের মত দেখছি।'

গোঁসাই বললেন, 'তা হলে আপনি মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি।'

রাজকুমার বললে, 'রামপুরহাটে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক। কই আমার হৃদয়ে তো আপনার হৃদয়ের ছায়াটুকুও পড়ল না। আমি যেমন ছিলাম তেমনিই রয়ে গেলাম। আমার দুর্গতিতে আপনি আর চুপ করে থাকতে পারেন না। একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে।'

'কী চান বলুন।'

'আমাকে এমন কোনো সহজ উপদেশ দিন যা পালন করে আমার কলুষিত চিত্ত অন্তত এক মিনিটের জন্যে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন হতে পারে।'

'বেশ, তাই দিচ্ছি।' বরাভয়ময় কণ্ঠে বললেন গোঁসাই, 'সহজও বটে আবার শক্তও বটে। সহজ কেননা অল্প মনোযোগেই পালন করা সম্ভব, আর শক্ত কেননা লোকে জেনেও এতে আকৃষ্ট হয় না।'

'আপনি বলুন। আমি করব।'

'আপনি ওঙ্কার সাধন করুন।'

'ওঙ্কার!'

'হ্যাঁ, ওঙ্কার কী? অ, উ আর ম। অ সৃষ্টি, উ স্থিতি আর ম প্রলয়। মানে কী? যা আগে ছিল না, এখন আছে, পরে থাকবে না। যা দেখছেন সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা স্থল জল মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম—আগে কিছুই ছিল না, এখন আছে, পরে আবার থাকবে না। চরাচরে যা দেখবেন তাতে এই ভাব এই অর্থ আরোপ করুন। ছিল না, আছে, থাকবে না—শুধু এই মন্ত্র এই ব্যাখ্যানে নিবিষ্ট হতে হতে আপনার চোখ খুলে যাবে। কিছুতেই আর মমতা থাকবে না, সব অসার মিথ্যে বলে মনে হবে। ক্রমে ক্রমে হৃদয় শূন্য বোধ হবে। কী সে চিরস্থায়ী জিনিস যা দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ করা যাবে আর অভাববোধ থাকবে না? তখনই আপনার ব্যাকুলতা জাগবে।' গোঁসাই আশ্বাসে বদান্য হলেন: 'তখনই বুঝবেন আপনার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে। ওঙ্কার মন্ত্রের সাধনে আপনার ঠাকুরঘরের আবর্জনা আগে দূর করুন।'

'ঠাকুরঘর!'

'হ্যাঁ, আমাদের হৃদয়ই আমাদের ঠাকুরঘর।' [ক্রমশঃ]

পাঠক পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুইশীল মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা এই ধরণের প্রকাশ-যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

— গল্প-ভারতী-সম্পাদক]

(মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন্)

শ্রীযুক্ত গল্প-ভারতী সম্পাদক সমীপেষু,

'গল্প-ভারতী'র বৈশাখ ১৩৭২ সংখ্যা পড়লাম। খুব ভালো লেগেছে। 'মাছি' প্রমুখ কয়েকটি গল্প বেশ চটকদার। সবচেয়ে ভালো হয়েছে সংযোজন : বঙ্কিম রবীন্দ্র সংসদ। আপনি এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যার মূল্য অপরিসীম। এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিম ও রবীন্দ্র মানস। তথ্য, যুক্তি, বিচার এবং বিশ্লেষণে এই প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে এই সংখ্যার প্রধানতম প্রবন্ধ। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রমানসের উন্মোচনে তাদের পারিবারিক পটভূমি কতখানি কার্যকরী হয়েছিল—প্রথমে এই বিষয়ে আলোকপাত করে লেখক ক্রমান্বয়ে ধর্মবোধ, মানসিকতাবাদ, শিক্ষাদর্শন, সত্যান্বেষণ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং যুক্তিনিষ্ঠতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল। এত স্বল্প পরিসরে তিনি এমন একটি অনালোচিত বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা করেছেন—যা সত্যিই উচ্চমার্গের সমালোচনার মর্যাদা হিসেবে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন দাবি করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের যে কোন বিবেকবান পাঠকই এই উক্তি মেনে নেবেন : "বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার মধ্যে অমিলের কথাটা দেখাবার প্রয়াস ইদানিং লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারে অগ্রসর হলে আমরা উপকৃত হব বলে আমার ধারণা।" বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য। এই উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে আলোচনার একটি মূল্যবান কথা শুনি : "বঙ্কিমের সৃষ্টি ছিল মূলতঃ ভারতসৃষ্টি, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসৃষ্টি। বঙ্কিম সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমাজহিতায় নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।" এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রাঞ্জোক্তি : "বঙ্কিম বলেছিলেন, পরিপূর্ণ মানবের কথা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানবিক পরিপূর্ণতার কথা। মূলতঃ পটভূমিভেদে একই বক্তব্য দুই ভিন্নরূপ নিয়েছে।" এই আলোচনায় এমন অজস্র দ্যুতিময় বাক্য

ছড়িয়ে আছে। ভালো হবে আরও, যদি, আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি বিস্তৃততর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা হলে আমরা খুশি হই। 'দুর্গেশনন্দিনী ও বঙ্কিম' প্রবন্ধটি খুব ভালো হয়েছে। বেশ তথ্যনিষ্ঠ লেখা এটি। এই ধরণের রচনায় বঙ্কিম-সাহিত্যের আরো আলোকপাতে সচেষ্ট হোন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

২৩, রাধেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—১

রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ
রিসার্চ অফিসার, জেলা সেক্রেটারিয়াস,

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা উপন্যাস

গল্প-ভারতীর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নানাকারণে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থরচনার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔপন্যাসিক হিসাবে পাঠকমনে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেন তাই নয় বাংলা উপন্যাসেরও তখনই নির্দেশ মিলল। গত মার্চ মাসে দুর্গেশনন্দিনীর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সে সম্পর্কে প্রচুর আলোচনাও হয়ে গেছে। সে সমস্ত আলোচনার কথা এখনও আমরা ভুলতে পারিনি। কিন্তু দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, উপরিউক্ত আলোচনা কালে দুটি গুরুতর বিষয়কে আমরা এড়িয়ে গেছি। সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে, তার কথা আপাততঃ উহ্যই থাক। ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস কি না এবং অন্যটি দুর্গেশনন্দিনীর যথার্থ প্রকাশকাল কবে?

একথা ঠিক যে 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। কেননা 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বরচিত এমন কোন উপন্যাসের নাম পাচ্ছি না। যার মধ্যে উপন্যাসের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যথার্থভাবে। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় অন্য। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস কি না, সে সম্বন্ধে গভীর করে ভাবা দরকার।

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন ইংরেজীতে। সেটির নাম 'Rajmohan's wife'। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, এই Rajmohan's wife বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাংলা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। এই বাংলা উপন্যাসটির কোন চিহ্ন এখন আর বর্তমান নেই। না থাকার কারণ হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন একটি পুরস্কারের জন্য। কিন্তু তিনি পুরস্কৃত হননি। ঐ উপন্যাসটির কি গতি হয়েছিল, সেটাই চিন্তার ব্যাপার। এ বিষয়ে শিরিজাশংকর রায়চৌধুরী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লিখেছেন, "বঙ্কিমবাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন কলিকাতায় বঙ্গসাহিত্য লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সভা ছিল। সেই সভা হইতে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হইত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এই পুরস্কার প্রত্যাশায় উক্ত উপন্যাসখানি প্রেরণ করেন। কিন্তু তখনকার সভা সে পুস্তক পুরস্কার যোগ্য মনে না করিয়া, অন্য একখানি গ্রন্থ লেখককে সেই পুরস্কার প্রদান করেন।"

লিখিয়াপ্রসন্ন যে 'সভা'র উল্লেখ করেছেন, সে সভাটি যে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' সে কথা স্বয়ং ডঃ সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬২) সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "অনেকেরই ধারণা যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন ইংরেজি কাব্য লিখিয়া আশানুরূপ যশোলাভ করিতে না পারিয়া বাঙ্গালী কাব্য-নাটকের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি প্রথমে ইংরেজি উপন্যাস রচনায় ব্যর্থকাম হইয়া শেষে বাঙ্গালা উপন্যাস রচনায় মন দেন। এ ধারণা ঠিক নয়। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের (!) ঘোষিত পুরস্কারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ সম্ভবতঃ ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার পান নাই তাঁহার রচনাটিও বাহির হয় নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস Rajmohan's wife ইংরেজিতে লেখা। আমার মনে হয় এখানি তাঁহার পুরস্কার অপ্রাপ্ত বাঙ্গালা রচনাটিরই অনুবাদ।"

ডঃ সেনের বক্তব্য অনুসারে উপরিউক্ত 'পুরস্কার অপ্রাপ্ত রচনাটি' যদি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস' হয়ে থাকে তবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র স্থান যে দ্বিতীয় তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গেশনন্দিনী যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে তার একমাত্র কারণ—উক্ত পুরস্কার অপ্রাপ্ত রচনাটির কোন খোঁজ আজ আর মিলছে না। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার না পাওয়ার ক্ষোভে ঐ রচনাটির ইংরেজি তর্জমা করে তাকে চিরকালের মত পাঠকের দৃষ্টির বাইরে প্রেরণ করে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে এখন সেই রচনাটি সম্বন্ধে শুধু অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত পুরস্কার অপ্রাপ্ত রচনাটি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন এ বিষয়ে আমি বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দুর্গেশনন্দিনীর রচনা কাল নিয়েও কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি। কেউ বলেছেন দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। কেউ বলেছেন, ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে। আবার কেউ বলেছেন, দুর্গেশনন্দিনীর যথার্থ রচনা কাল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। অথচ দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সংস্করণের যে আখ্যাপত্রটি পাই তাতে জানা যায় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কোন মাসে প্রকাশিত হয় তার কোন হদিশ সেখানে মিলছেনা। অবশ্য অনেকে বলছেন, দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। শুধু মার্চ মাস বলে তাঁরা ক্ষান্ত হননি, তাঁদের মতে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২রা কিংবা ১১ই মার্চ। তাঁদের এই রকম সিদ্ধান্তের পিছনে অবশ্য যুক্তি যে নেই তা নয়। কেননা দুর্গেশনন্দিনী সম্পর্কিত যে সব আলোচনা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রায় সবগুলিই ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ থেকে ২৪শে এপ্রিলের মধ্যবর্তীকালের।

বিনীত—

জগন্নাথ ঘোষ

পোঃ টাবাবেড়িয়া, ২৪ পরগণা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

[পূর্ব প্রকাশিতের চুম্বক]

[স্মৃতি চারণের ভঙ্গিতে লেখা এ উপন্যাসে লেখক তাঁর কলেজ জীবনের এক বিস্মৃত বন্ধুর চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়েছে প্রথম। প্রথমে বন্ধুর পরিচয় স্মরণ করতে না পারলেও পরে আকস্মিক ভাবে অন্য একটি ঘটনার সূত্রে সমস্ত কথা লেখকের মনে পড়েছে। বন্ধুর নাম নিখিল ধর। কলেজে পড়া শেষ না করেই তাকে পিতৃবিয়োগে দেশে চলে যেতে হয়। তার ধারণা তাদের পরিবারের ওপর কোনো অদৃশ্য অভিশাপ যেন আছে। সে অভিশাপ কিছুকালের জন্যে কেটে গেছে বলেই মনে হয়েছে, দেশ ছেড়ে অন্য প্রদেশে গিয়ে তার অভাবিত ভাগ্য পরিবর্তনে। উত্তর বিহারের একটি অঞ্চলে অর্থ প্রতিপত্তি সাংসারিক শান্তি সবই নিখিল পেয়েছে। কিন্তু তারপরেই আবার সে অভিশাপের ছায়া তার জীবনে নেমেছে বলে তার বিশ্বাস। লেখকের কাছে পুরাতন বন্ধু হিসেবে নিখিল তার জীবনের রহস্য জানাতে চেয়েছে। কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হয়নি। বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার পর লেখকের সন্দেহ হয়েছে যে নিখিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়। তার স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন বলেই লেখক জেনেছে। নিখিলের ধারণা কিন্তু আলাদা। তার স্ত্রী কোনো এক অনির্দিষ্ট কারণে তার কাছ থেকে দূরে সরে আছেন ও মাঝে মাঝে রহস্যজনক ভাবে তাকে দেখা দিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেন না, নিখিল এই কথাই লেখককে জানিয়েছে। রহস্যটা জটিল হয়েছে চম্পা নামে একটি মেয়ের উপস্থিতিতে। সে সম্পর্কে নিখিলের নানা আশঙ্কা। চম্পাকে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণা একটি মেয়ে বলে মনে হয়। নিখিলের সব কিছুর ভার কিন্তু তারই হাতে। চম্পার ব্যবহারও দুর্বোধ্য। উত্তর বিহার থেকে সেই নিখিলকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় একটি নামকরা নার্সিং হোমে এনেছিল। সেখান থেকে হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে নিখিলকে নিয়ে সে বিহারের একটি ছোট শহরের নির্জন একটি বাড়িতে গিয়ে ওঠে। লেখক সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে রহস্য-ভেদের চেষ্টা করে এ পর্যন্ত বিফল হয়েছে। ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক প্রায় অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার ঘটে গেছে। চম্পা ওই অঞ্চলের একটি নির্জন মন্দিরে সেদিন অমাবস্যার রাত্রে সারারাত পূজার আয়োজন করেছিল। সেই রাত্রে নিখিলকে বাড়িতে একা থাকতে দিয়ে লেখক গোপনে তার পাহারায় থেকে রহস্যময়ী একটি নারীমূর্তিকে নিজেই নিখিলের কাছে আসতে দেখে। নারীমূর্তি আর একটু হলেই তার কাছে প্রায় ধরা পড়ে যেত বলে লেখকের ধারণা। কিন্তু তা সম্ভব

হয়নি। নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর লেখক নিজের মনের সন্দেহ নিয়ে মন্দিরেই ছুটে যায়। কিন্তু চম্পা সেখানে যে আগাগোড়াই আছে তার অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আবার নিখিলের কাছেই ফিরে আসে।]

* * * *

কিছুক্ষণ বাদেই আবার সেই মন্দিরেই যে ছুটে আসতে হবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তখন ভাবতেই পারিনি।

নিখিলকে যে ভাবে ফেলে এসেছি তাতে সে কেমন আছে সে বিষয়ে বেশ একটু উদ্বেগ নিয়েই যথাসম্ভব দ্রুতপদে বাসায় ফিরেছিলাম।

বাইরের গেটটা খোলা দেখে নিজের অন্যমনস্কতায় একটু লজ্জিত বোধ করেছি। মন্দিরে ফিরে যাবার ছল করে প্রথম যখন বেরিয়ে যাই তখনই ভুল হয়েছিল নিশ্চয়ই। তবে ওরা উচিত ছিল না। আমার অবশ্য কেমন মনে হচ্ছিল গেটের ছিটকিনিটা লাগিয়েই গেছি। সে ধারণাটাই ভ্রান্ত বলে তখন নিজেকে বুঝিয়েছি।

গেট বন্ধ করে বারান্দায় উঠে নিখিলকে দেখতে না পেয়ে বিশেষ বিস্মিত হইনি। সে বারান্দা থেকে নিজের ঘরে গিয়েই শুয়েছে বুঝে একটু বরং নিশ্চিন্তই হয়েছিলাম।

প্রথমে নিজের ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে টর্চটা খুঁজলাম। টর্চ একটা বাইরে কোথাও ট্রেনে যেতে গেলে সব সময়েই সঙ্গের সুটকেসে থাকে। এবারও এনেছিলাম বলে মনে হয়। অন্ধকারে মাঠে ঘাটে ঘোরার কোন সম্ভাবনা ছিল না বলেই সেটা খুঁজে বার করার উৎসাহ হয়নি। আজ কিন্তু টর্চটা নিতান্তই দরকার। নিখিল যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে তাহলে এখনি তাকে আর জাগাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না। এখন তার বদলে সেই রহস্যময়ীকে ধরতে গিয়ে যেখানে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। দ্রুত পালিয়ে যাবার সময় কোন চিহ্ন সেখানে তার রেখে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

সুটকেসের ভেতর টর্চটা ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল। সেটা সঙ্গে নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে বাইরে যাবার সময় টর্চটার আলোর জোর পরীক্ষা করতে একবার জ্বালিয়েই অবাক হলাম একটু।

টর্চের আলো ঠিকই আছে। অবাক হলাম টর্চের আলোটা ওদিকে নিখিলের ঘরের দরজায় পড়ায়।

সে দরজা একেবারে হাট করে খোলা।

নিখিলের দরজা এত রাত্রে এভাবে খোলা থাকার ত কথা নয়। তার স্বভাবই অন্যরকম। দিনের বেলাতেও খিল না দেওয়া হলেও দরজা তার সব সময়ে ভেজানো থাকে। সব সময়েই সে যেন নিজেকে আড়ালে রাখতে চায়।

এ সময়ে দরজা এভাবে খোলা রেখে ঘরে গিয়ে সে যদি শুয়ে থাকে তাহলে সে কি অত্যন্ত অসুস্থ? দরজাটা বন্ধ করবার মত ক্ষমতাও তার হয়নি!

ব্যস্ত হয়ে তার ঘরের দিকেই গেলাম। ভেতরে ঢুকে টর্চ ফেলে তার বিছানার দিকে চেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হতে হল।

নিখিল সেখানে নেই। সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালালাম। না, ঘর একেবারে ফাঁকা। কোথায় গেল তাহলে নিখিল?

চম্পার ঘরটা নিখিলের ঘরেরই পাশে। মাঝখানে দু'ঘরের যোগাযোগের একটা দরজা। সে দরজাটাতেও এদিক থেকে খিল দেওয়া।

খিলটা তবু খুলে ফেললাম ও ঘরে খোঁজ করবার জন্যে। কিন্তু দরজার ওদিক থেকেও বন্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ঘুরে চম্পার ঘরের বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। টর্চ জ্বালতে দেখা গেল সে ঘরের দরজা বাইরে থেকেই তালা আঁটা।

এবার সত্যিই ভয় পেয়ে বাথরুম ও অন্যান্য ঘর সমেত ভেতরের ও বাইরের চত্বর সমস্তই খোঁজ করে দেখলাম তন্ন তন্ন করে। নিখিলকে কোথাও দেখা গেল না।

নীচের মধ্যেই ভয়ে ভাবনায় তখন খেয়ে উঠেছি।

কি এখন আমার করা কর্তব্য! দুখনরামকে একবার ডাকতে পারি। কম্পাউণ্ডের পেছন দিকের এক কোণায় মালীর ঘরে দুখনরাম থাকে।

সেদিকে যেতে গিয়েই মনে পড়ল আমার সামনেই আজ দুপুরে চম্পা দুখনরামকে রাত্রের জন্যে ছুটি দিয়েছে। ছুটি দুখনরামই চেয়েছিল না চম্পা নিজে থেকে দিয়েছে তা জানবার সুযোগ হয়নি। দুপুরের খাওয়ার পর হাত মুখ ধুতে ভেতরের কলঘরে যাবার সময় রান্নাঘরের দিক থেকে চম্পাকে বলতে বলতে আসতে শুনেছিলাম, ছুটি সিরফ্ রাতকে লিয়ে। কাল সুবে সাত বজেকে পরেলে হুকর লৌট্ আনা।

দুখনরামকে তাহলে ত পাওয়া যাবে না। না, আর কিছুমাত্র সময় নষ্ট করবার নয়। এখন একমাত্র যা করণীয় তা চম্পাকে গিয়ে খবর দেওয়া। কথাটা ভাবতে মনে মনে একটু লজ্জা যে পেলাম না এমন নয়। জোয়ান পুরুষ মানুষ হয়ে বন্ধুর আকস্মিক অন্তর্ধানের এই বিপদে সাহায্য চাইতে যেতে হবে কিনা এক রত্তি ওই একটা মেয়ের কাছে! কিন্তু এসব কথা ভেবে বিধা করবার তখন সময় নেই। আবার সেই মন্দিরের দিকেই ছুটতে হ'ল। হাতে টর্চটা থাকায় একটু সুবিধে। কিন্তু একবার ছোটাছুটি করেই দম তখন ফুরিয়ে এসেছে। যতটা ইচ্ছে ছিল তেমন তাড়াতাড়ি যেতে পারলাম না।

যেতে যেতে নিখিলের অন্তর্ধান হওয়ার রহস্যটা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম।

অসুস্থ দুর্বল মানুষ। ঘর থেকে বারান্দা পর্যন্ত এসে বসতেই তার যেন কষ্ট হয়। এতদিন এসে অবধি একদিন তাকে বাড়ির বাগানেও বেড়াতে নামতে দেখিনি। সে মানুষটা নির্জন বাড়ি ছেড়ে একলা এই অন্ধকার রাতে কোথায় যেতে পারে? যাবেই বা কেন?

আমি যখন মন্দিরে ছুটে এসেছি ও তারপর মন্দিরের মধ্যে চম্পাকে রেখে আবার ফিরে গেছি তার মধ্যে আরো কিছু কি তাহলে ঘটেছে! সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তি কি আবার দেখা দিয়ে নিখিলকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে? নিয়ে যেতে পারেই বা কোথায়?

কিন্তু আমার কাছে প্রায় ধরা পড়তে গিয়ে অমন অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে যে পালিয়েছে তার পক্ষে আবার ফিরে আসা ত সম্ভব বলে মনে হয় না।

নিখিলের এই অন্তর্ধানের পেছনে আরো গুরুতর কোন রহস্য কি তাহলে থাকতে পারে!

এইসব ভাবতে ভাবতেই মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম।

পূজা পাঠ তখনও সমানেই চলছে।

ভেতরে উঁকি দিয়ে ঘোঁয়াটে আবছা আলোয় চোখ একটু অভ্যস্ত হ'তে চম্পাকেও দেখতে পেলাম।

খানে হেলান দিয়ে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে তাকানো অবস্থায় নয়, এখন সে সোজা হয়ে উঠে বসে একটি পায়ে পূজারই কি সব সাজাচ্ছে।

বাইরে থেকেই ডাকব না ভেতরে যাব ভাবছিলাম। তার মধ্যেই চম্পাই একবার মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখতে পেল।

হাতের ইসারায় তাকে বাইরে ডাকলাম।

বেশ একটু বিস্মিত ভাবেই চম্পা পূজার থালাটি রেখে বেরিয়ে এল।

আপনি এখনো এখানেই আছেন! চম্পার কণ্ঠে বিস্ময়ের চেয়ে সংশয়ের সুরই বেশী স্পষ্ট।

না, এই মাত্র এসেছি। শোনো।

মুখটা আমার ভালো করে দেখতে পাবার কথা নয়। আমার গলার স্বরেই অস্বাভাবিক কিছু একটা বোধহয় অনুমান করে চম্পা আমার সঙ্গে মন্দির থেকে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়াল উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে।

চম্পার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তা বলা সহজ নয়। বলতে গেলে অনেক ব্যাপার হাল্কাভাবেও পড়তে হয়। সে চেষ্টা করলাম না।

শুধু বললাম, নিখিলকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না।

চম্পা প্রথমটা যেন কথাটার মর্ম বুঝতেই পারল না।

আবার তাই বলতে হ'ল, একটু বিশদ করে—আমি সব ঘর বাগান ভালো করে খুঁজে দেখে আসছি। নিখিল কোথাও নেই।

এবার নিজেকে সামলাতেই চম্পাকে আমার হাতটা বুঝি ধরতে হ'ল। ঠাণ্ডা বরফের মত হাতটার কম্পন আমি টের পেলাম।

কিন্তু এ দুর্বলতা ক্ষণিকের। চম্পা সাধারণ ধাতুতে গড়া মেয়ে যে নয়, সেই মুহূর্তে আর একবার তার প্রমাণ পেলাম।

নিজেকে প্রায় তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, চলুন।

কিন্তু সেখানে তার খোঁজ যা করবার সব করেছি চম্পা। বাধা দিয়ে বললাম, বাংলো বাড়ির কোথাও সে নেই। এখন একমাত্র উপায়···

চম্পা আমার কথা শুনতে শুনতেই কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, একমাত্র উপায় কি! থানায় খবর দেওয়া?

তাছাড়া আর কি করা যেতে পারে, আমি ত বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করেই নিজের মনের আশঙ্কা এবার প্রকাশ করলাম, তার মত দুর্বল অসুস্থ একটা মানুষের এমন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। অস্বাভাবিক ব্যাপার এর সঙ্গে আরো যা দেখেছি পরে তোমায় বলছি। শুধু নিজেদের হাতে তাকে খোঁজার ভারটা রাখতে তাই আর সাহস হচ্ছে না।

এই রাত্রে থানায় গিয়ে খবর দিলেই কি তারা আপনার বন্ধুকে খুঁজে বার করে দেবে বলে আপনার ধারণা? চম্পার গলায় অধৈর্যের সঙ্গে একটু বিদ্রূপের আভাস,—বেশ পুলিশকেই ডাকবেন। তার আগে আমায় একটু চেষ্টা করতে দিতে আপত্তি আছে!

কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই। বাংলো বাড়িতে তাকে খোঁজা এখন বৃথা। শেষ প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলাম না।

বাংলো বাড়িতে খুঁজতে যাচ্ছি না। আপনি আসবেন আমার সঙ্গে, না আমি একাই যাবো।

চম্পার গলায় এবার বেশ বিরক্তি। অগত্যা তার সঙ্গেই যেতে হল।

কয়েক পা গিয়ে কিন্তু চম্পা নিজেই থেমে গেল। তারপর বললে, আপনি একটু এখানে দাঁড়ান। আমি পূজারী মহারাজের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। হয়ত টাঙ্গার ব্যবস্থা একটা হতে পারে।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে হল চম্পা! বাধা দিয়ে বললাম,—নিখিল যে কোন কারণে হোক খানিকক্ষণের জন্যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আবার ইতিমধ্যে সেখানে ফিরে গেছে এমনও ত হতে পারে, তাই এখন মনে হচ্ছে বাংলো বাড়িটা একবার না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

না, বাংলো বাড়িতে তিনি নেই। চম্পা যে রকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে দ্রুতপদে আবার মন্দিরের দিকে চলে গেল তাতে আমিই একটু বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনের ভেতর অনেক প্রশ্ন আর ভাবনাই তখন পাক খাচ্ছে।

নিখিলের এ অন্তর্ধানের খবর শুনে সত্যই বিহ্বল প্রথমটা হয়ে গেলেও ব্যাপারটা কি চম্পার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়? বাংলো বাড়িতে নিখিলকে পাওয়া যাবে না এ বিষয়ে আমার চেয়েও স্থির নিশ্চিত সে হয় কি করে? কোথায় খুঁজতে যাবে সে বিষয়ে তার একটা স্পষ্ট ধারণা যে আছে তা ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে। এ রকম ধারণার ভিত্তি কি?

অন্ধকারের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে মনের অস্থিরতা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠছিল।

নিখিলের এই বিপদের জন্যে নিজেকে খানিকটা দায়ী না করে পারছিলাম না। নিজের কৌতূহল ও সন্দেহের তাগিদে অমন করে নিখিলকে ফেলে মন্দিরে তখন ছুটে না এলে এ সর্বনাশ ত ঘটতে পারত না! নিখিলকে বারান্দা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যেতে দেখেও আমি যে তার সাহায্যে না গিয়ে নিজের সন্দেহের যাচাইয়ে আগে খুঁজেছি সেই নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতার গ্লানিতে তখন আমি দগ্ধ হচ্ছি।

নিজের ওপর তখন একটা ধিক্কার আসছে। নিখিলের জীবনের রহস্য জানতে এসে তার নিদারুণ কোন ট্রাজিডির আমিই কি মূল হলাম?

চম্পার আসতে দেরী দেখে আর স্থির হয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে পারলাম না। মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেলাম এক পা এক পা করে।

চম্পা একটা টাঙ্গার ব্যবস্থা করবার আশায় পূজারীর কাছে গেছে। টাঙ্গার ব্যবস্থা করতে যাওয়ার মানে খুব কাছাকাছি কোথাও যাওয়া নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু শহর থেকে বহুদূরে এই জনমানবহীন জায়গায় টাঙ্গা পাবে কোথা থেকে?

ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল শহর থেকে যে কজন পুরোহিত নিজেদের পূজার সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন তাঁদের একটি টাঙ্গা যেন নদীর চড়া থেকে প্রথম মন্দিরে আসবার সময় কাঁচা রাস্তার ধারে দেখেছিলাম। পুরোহিতরা বোধহয় টাঙ্গাটা রাত্রের মত রেখেই দিয়েছেন ভোরবেলা ফিরে যাবার সুবিধের জন্য।

আমার অনুমানই ঠিক। মন্দির পর্যন্ত যাবার আগেই দূর থেকে টাঙ্গার আলো দেখতে পেলাম। কাঁচা রাস্তার ওপর মার্কামারা তার আওয়াজও পাওয়া গেল।

টর্চ দেখিয়ে নিজের উপস্থিতিটা জানাতে টাঙ্গাটা আমার কাছে এসে থামল।

চম্পার সঙ্গে পূজারী মহারাজও তাতে এসেছেন। তিনি অবশ্য সঙ্গে যাচ্ছেন না। চম্পা ওঁকে কতখানি কি বলেছে জানি না, কিন্তু তিনি এমন অসময়ে টাঙ্গা চাওয়া ও তা নিয়ে যেতে নিষে কোন কথাই বললেন না।

পুজোর জন্যে কোন ভাবনা যেন চম্পা না করে। সে উপস্থিত না থাকলেও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই হবে না।—এই আশ্বাস দিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে চলে গেলেন। যাবার আগে একটা পূজার ফুলই বোধহয় চম্পার হাতে দিয়ে বলে গেলেন, চম্পা যেন কিছু ভয় না করে। তার সব বিপদ কেটে যাবে।

এ আশীর্বাদের পর চম্পা পূজারীর পায়ের ধুলো নেবে এই অনুমানই করেছিলাম। কিন্তু চম্পা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকায় একটু অবাকই হলাম।

নিস্পন্দ হয়ে সে বসে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। আমি তার পাশেই টাঙ্গার পেছনে তখন বসেছি। টাঙ্গাওয়ালাকে আগেই তার বোধহয় নির্দেশ দেওয়া ছিল। মাঠ ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ে টাঙ্গা শহরের দিকে না গিয়ে হাজিপুরের গোলের দিকেই চলেছে দেখে একটু অবাক হয়েছি।

চম্পা নীরব নিস্পন্দ হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। নিখিলকে বাড়িতে খুঁজে না পাওয়ার কথাই চম্পাকে জানিয়েছি, তার আগের ব্যাপারগুলোও এবার না জানালে নয়।

হাজিপুরের গোলের এদিকের দিয়ে টাঙ্গাটা তখন উঠছে। আর চুপ করে থেকে চম্পার বিষাদ গভীর উদ্বিগ্ন নীরবতার সম্মান রাখা সম্ভব হ'ল না।

বললাম, তুমি কি বুঝে, কোথায় নিখিলকে পাবে আশা করে যাচ্ছ, জানি না চম্পা। তুমি যা ভালো বুঝে করছ তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত আজগুবি। নিখিলকে হঠাৎ খুঁজে না পাওয়ার আগে এরকম অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপার আগে কিছু ঘটেছে। প্রথম খবর দেওয়ার সময়ে সেগুলো বলবার সময় ছিল না। সেগুলো তোমার জানা দরকার।

বেশ জানাবেন। কিন্তু এখন নয় পরে।

চম্পার গলায় কেমন একটা উদাসীনতার সুর পেয়েই এবার উত্তেজিত হয়ে বললাম,—পরে নয় চম্পা! যেখানে যাচ্ছ সেখানে পৌঁছোবার আগেই ব্যাপারটা তোমার না জানলে নয়। বাইরের লোক বলে আমার কাছে যা অস্পষ্ট হয়ত তুমি সেই হদিসই সেটা শুনে পেতে পারো।

বলুন তাহলে। চম্পার কণ্ঠ নিরুৎসুক।

টাঙ্গাটা তখন গোলের ওপর দিয়ে চলেছে। চারিদিকের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে নিচের নদীটা যেন একটা বিস্তৃত অস্পষ্ট রহস্যস্তূপ। টাঙ্গার ঘোড়ার ক্ষুরের ও চাকার শব্দে গাঢ় নিস্তব্ধতা সচকিত।

সংক্ষেপে কিভাবে কথাটা বলা যায় তাই ভেবে নিচ্ছি এমন সময় চম্পা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে টাঙ্গাওয়ালাকে তীক্ষ্ণস্বরে বললে,—এই রোখো!

গোলটা পার হয়ে তখন অন্যদিকের চালের কাছে পৌঁছে গেছি।

কেন যে হঠাৎ চম্পা টাঙ্গা থামাতে বলল বুঝতে না পেরে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

[ক্রমশঃ]

বিচিত্রা

মেয়েরা আজ আর শুধু সাজগোজ করে পুরুষদের ভোলাতে ব্যস্ত নয়!

কাগজপত্রে যারা জার্মান মেয়েদের কথা পড়ে, তারা ভাবে বুঝি জার্মান মেয়েরা কেবল সাজগোজ করে পুরুষদের ভোলাতেই ব্যস্ত কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কৈশোরের স্বপ্ন কেটে গেলেই তাদের বেশির ভাগই বেশ বাস্তব হয়ে উঠে কঠোর পরিশ্রমী হয়। মোটেওনে মনে হয় তারা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। তরুণী মেয়েদের অনেকেই আজ কাজকর্ম শিখে একটা ভালো মাইনের চাকরীতে লেগে যেতে চায়; অবশ্য তাই বলে তারা যে তাদের সাজগোজের অবহেলা করে, তা নয়।

মেয়েদের কাজ করা নিয়ে আগে যে সব কুসংস্কার ছিল, সে সব এখন আর নেই। তাছাড়া পশ্চিম জার্মানীতে পুরুষ শ্রমিকের যে রকম নিদারুণ অভাব তাতে সমাজ জীবনে পুরুষদের মত বিভিন্ন কাজ নেতে মেয়েদের এখন আর কোন বাধা নেই। আর সে সুযোগ মেয়েরা পুরোমাত্রায় নিচ্ছে।

× পশ্চিম জার্মানীর প্রতি তৃতীয় মেয়ে কোন না কোন কাজ করে।

× বস্ত্রশিল্পে, খুচরো ব্যবসায়, সবেষণাগারে, ওষুধের দোকানে, ব্যাঙ্কে, বীমা কোম্পানীতে ও ট্র্যাভেল এজেন্সীতে মেয়েরা আজকাল ক্রমশ বড় বড় কাজ করে।

× ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে মেয়ে কর্মীদের সংখ্যা শতকরা ৭৭ ভাগ বেড়েছে।

× সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে (একমাত্র ডাক ও রেল বিভাগ ছাড়া) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল মেয়ে।

× স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিভাগে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি; কর্মচারীদের মধ্যে মেয়েদের অনুপাত শতকরা ৫৬৮ ভাগ। শিক্ষাবিভাগে মেয়েদের সংখ্যা ৪২'৩ ভাগ। রেলওয়েতে নিযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা ১৭,৫০০ ও ডাকবিভাগে কাজ করে মোট ৮৮,৭০০ মেয়ে।

× মেয়েরা ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর চাষবাস অচল। এই "অবলা নারীরাই" সেখানে শতকরা ৫৫ ভাগ সাহায্য করে।

× সহশিক্ষায় পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৮'৪ ভাগ।

তবে শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েরা এখনও বেশ কিছুটা ভীরু। খুব কম মেয়েই পুরুষদের চিরাচরিত পেশা শিখতে আসে। তাই টেকনিক্যাল কিম্বা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল কলেজগুলিতে মেয়েদের সংখ্যা খুবই অল্প (১ থেকে ৪ শতাংশে)। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের মেয়েরা খুব অগ্রসর; সেখানে ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই মেয়ে। পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা হয় ডাক্তারী পড়ে নয় শিক্ষকবৃত্তি শেখে কিন্তু অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান কিম্বা আইনের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

এই কারণ বোধহয় কিছুটা সত্যসুগতিক। সাধারণত সরকারী কর্মচারীদের মেয়েরাই উচ্চশিক্ষার দিকে যায় তাই ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার হবার মত মনোভাব এখনও তাদের গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকটাও বিবেচ্য যথা তাড়াতাড়ি কোন একটা বিষয়ে সহজে লেখাপড়া শেষে একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থা হলেই তাদের স্বাধীনতা মেলে।

স্বাবলম্বী হলে ছাত্ররাও কি করতে পারে ভাবলে চমক লাগে !

ব্যবসা বুদ্ধি খাটাতে পারলে ছাত্রাবস্থায় যে কোটিপতি হওয়া যায় পিটার রাইখার্ট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পিটারের বয়স মাত্র পঁচিশ, সে নিজেও একজন ছাত্র। তবে তার ব্যবসা বুদ্ধি খুবই প্রখর। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন এ পাঠরত ছাত্রদের বাসস্থানের একান্ত অভাবটা রাইখার্টের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে ঠিক করলে যে ছাত্রদের জন্যে একটা হোস্টেল তৈরী করবে কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে শুধু পরিকল্পনা করলেই তো হয়না, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে টাকা চাই। টাকা কোথায় পাওয়া যায় ? চেষ্টা চরিত্র করে টাকা কোথাও না পেয়ে বন ছেড়ে পড়াশোনা ছেড়ে সে পাড়ি জমালে মার্কিন মুলুকে। সেখানে সে সাত মাস ছিল। এই সাত মাসে সেখানে সে প্রত্যেক 'স্বাবলম্বী মানুষ যা করেছে, সেই বাসনমাজা থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশ রকমের বিভিন্ন কাজ করেছে। সেখানে থেকে ব্যবসায় আরও হাত পাকিয়ে পকেটে হাজার খানেক ডলার নিয়ে একদিন সে দেশে ফিরে এল।

দেশে এসেই সে একটা ট্যাক্সি কিনে ভাড়া খাটাতে শুরু করলে। এই ব্যবসায় হাতে আরও পয়সা জমতে আরও মোটাকত ট্যাক্সি কিনে সে বেশ ভালোভাবে ব্যবসা ফেঁদে বসল। ব্যবসা খুবই জমে উঠল কারণ তার গাড়িগুলো এতোই ভালো যে বিদেশী অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের অভ্যর্থনা করতে তার গাড়িগুলোই সবাই চায় ও তার গাড়ির শোফাররাও নানা ভাষায় কথা বলতে ওস্তাদ বলে বিদেশীদের খুব সুবিধা হয়। এখন তার হাতে প্রচুর টাকা জমেছে ও সেও তাঁর পুরোনো পরিকল্পনার রূপায়ণে হাত দিতে ঠিক করেছে। পরিকল্পনা মত সে ঠিক করেছে রাজধানী বন-এ সে ধারোত্তলা একটা ছাত্র নিবাস তৈরী করবে যেখানে তিনশো ছাত্রদের থাকার জন্য আধুনিক ও আরামদায়ক আলাদা আলাদা কক্ষ থাকবে। ছাত্রনিবাসের একটা অংশ কেবল বিদেশি ছাত্রদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। একেবারে ওপরতলায় থাকবে একটি রেস্টুরাণ্ট। এই ছাত্রনিবাস তৈরী করতে মোট খরচ পড়বে সাড়েচার মিলিয়ন জার্মানমার্ক।

আপনারা ভাববেন বুঝি টাকার মুখ দেখে রাইখার্ট পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়েছে মোটেই নয়; এবছরেই সে অর্থনীতিতে তার ডিসিস দাখিল করবে। তরুণ, সুবেশ, সুদর্শন, বিত্তবান রাইখার্ট সত্যিই ছাত্রজগতের বিস্ময় !

রূপ চর্চায় আজ পুরুষরা মেয়েদেরও হার মানিয়েছে !

শুধু জার্মানীর মেয়েরাই নয়, পুরুষরাও তাদের চেহারার দিকে বেশ নজর দিতে শুরু করেছে। "রমণী সৌন্দর্যে" উদ্বীপ্ত হয়ে "সৃষ্টির প্রথম ভ'বরা" নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে ও সবাই তারা এখন নিজেদের "রূপবান পুরুষ" হিসেবে জাহির করার জন্য কষ্ট স্বীকার বা অর্থব্যয় করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করছে না। কথাটা যে খাঁটি তা পুরুষদের প্রসাধন সামগ্রী কেনার বহর দেখলেই ধারণা হয়। গত তিন বছরে পুরুষদের কেনাকাটার জোরে প্রসাধনীর কাটতি চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। আরও একটা জিনিষ যেটা বেশ পরিষ্কার চোখে পড়ছে সেটা হল যে দিন দিন পুরুষরা বেশি সংখ্যায় "রূপচর্চাগারগুলোতে" আনাগোনা করছে।

এই সৌন্দর্য সজাগতার হিড়িকে নাপিতরা বেশ দু'পয়সা লাভ করছে। বেশ-প্রসাধকদের দোকানেও এখন পুরুষ মক্কেলদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ। এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওষুধের দোকানও ব্যায়ামশালাগুলিতেও পুরুষদের হুড়োহুড়ি। সবাই একযোগে জার্মান "কান্তিকের" চেহারা ও চাউনি ভালো করার সাহায্য করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সব বয়সের ওজন সচেতন পুরুষদের দেখা যাবে বিছানা ছেড়ে ভোরবেলা সুইমিংপুলগুলোয় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে। নতুন স্টাইলের পোশাক পরিচ্ছদ বাজারে বেরুতে না বেরুতে পুরুষদের অঙ্গে উঠে যাচ্ছে, তাতে কাউকে মানাক চাই কি না মানাক। আজকের পশ্চিম জার্মানীতে পুরোনো টাই গলায় নয়াপাতি ভুঁড়িয়ার ও তথন চিবুকওয়ালাদের আর কোন আশা নেই। এখন তাদের দিন যারা তাদের চেহারা ও সাজপোশাক সম্বন্ধে সচেতন। পথেঘাটে এইসব সুবেশী, সুশ্রী জার্মানদেরই আজ সমারোহ !

তুষার-কণার রূপকথা

শীত-প্রধান অঞ্চলে সৌন্দর্যের একটি স্বাভাবিক উপকরণ তুষার। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশের মলিন পথ-ঘাট ঢেকে যায় শ্বেত আবরণে। কিন্তু কেবল খালি চোখে না তাকিয়ে যদি তুষার-কণার দিকে তাকানো যায়, তাহলে মনে হবে চারদিকে যেন রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। এক একটি তুষার-কণা এক একটি আকারের। যেন অসংখ্য আলপনা কে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সব বিচিত্র নক্সা দেখে অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ী কাপড়ের ডিজাইন করেন ব'লে শোনা যায়।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সংগম

বঙ্কিমের উপন্যাসে নদ-নদী

নীলাদ্রি সোম

এমন একদিন হয়তো আসবে যখন কপোতাক্ষ, পদ্মা ভাগীরথীর স্রোত আর থাকবে না। তবু, যতদিন বাংলা-সাহিত্য বেঁচে থাকবে, বাংলার নদ-নদী রইবে বেঁচে। কপোতাক্ষের কবি মধুসূদন, পদ্মার কবি রবীন্দ্রনাথ, আর ভাগীরথীর কবি বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সুজলা। ভাগীরথী, যমুনা, ত্রিস্রোতা, চিত্রা, আমোদর, মধুমতী, রঙ্গপুরের নদী কখনো মাত্র একবার, কখনো বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। সবচেয়ে বেশি এসেছে গঙ্গা। হয়তো শৈশব অভ্যস্ত, গঙ্গার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতাই এর কারণ। বাংলাদেশ নদীমাতৃক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বেশির ভাগ পটভূমি বাংলাদেশ। স্বাভাবিক কারণেই বাংলার কয়েকটি বিশিষ্ট নদ-নদী সজীব হ'য়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। রোম্যান্টিক লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। তাই অতল জলের আহ্বান তাঁর রক্তে। তবে 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'দেবী চৌধুরাণী' —এই ক'টি উপন্যাসে নদীর খুব ব্যাপ্ত ভূমিকা। স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র নদীর ছবি এঁকেছেন। তিলোত্তমা স্বপ্নে যে নদী দেখেছেন তা প্রিয়তমের সঙ্গে তার বিচ্ছেদেরই প্রতীক। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নেও দেখা দিয়েছে নদী। সৈবলিনী যে নরক দেখলেন সেখানে প্রবাহিত ফলিয়ের নদী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নদীর বিচিত্র রূপ: কখনো প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের ব্যাপ্ত-পট, কখনো নানা মানুষের বিচিত্র কর্মকেন্দ্র, কখনো রণক্ষেত্র, কখনো বা শ্মশানের সহচরী। নদীর গতি, চঞ্চলতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে।

বিশেষ ক'রে সেকালে নগর, দুর্গ, বন্দর গ'ড়ে উঠতো নদীকূলে। আত্মরক্ষা, যোগাযোগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি প্রয়োজনে। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবতা জ্ঞান ও ঐতিহাসিক বোধ প্রখর ছিলো। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আমোদর নদী গড় মান্দারণ নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। দুর্গের চতুর্দিকেই আমোদর নদী। একদিন ছিলো যখন সুদূর ফরাসীস আর রোম থেকে বণিকেরা বাণিজ্যের কারণে বাংলার সমৃদ্ধ নগর সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হতো। নবকুমারের বসতবাড়ির বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম যে সপ্তগ্রামের কথা বলেছেন তার তখন শেষ দশা। সপ্তগ্রামের অবনতির ও শ্রীহীনতার কারণ যে ওই নগর সংলগ্ন নদীর অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা জানাতে ভুলে যাননি।

নায়ক-নায়িকার চরিত্র, রূপ, আর সৌন্দর্যবোধ পরিস্ফুট করার জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে নদীর পটভূমিকায় তাদের স্থাপন করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তিলোত্তমাকে যখন আমরা প্রথম দেখি তখন তিনি একা কক্ষবাতায়নে ব'সে মুগ্ধচোখে আমোদর নদীর জলাবর্ত দেখছেন। নদীর স্রোতে প্রতিফলিত হয়েছে সন্ধ্যার আকাশ। নদীর পাড়ে উচ্চ অট্টালিকা ও দীর্ঘ তরুসার। সপ্তগ্রামে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরী। দূরে, বহুদূরে শোভা পাচ্ছে নৌকাতরণা ভাগীরথী। খোলা জানালা দিয়ে ভাগীরথীর দৃশ্য উপভোগ করছেন হেমচন্দ্র।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নদীর চরিত্র তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নদীর চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপন্যাসের শুরুতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রসুলপুরের নদী। নদী সেখানে মোহানা, সমুদ্রের মতো ব্যাপ্ত। ভয়ংকর, হিংস্র, বন্য, উদ্দাম। অনোচ্ছ্বাসকালে দেখা যায় প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত। জল লোনা, নদীতীর এখানে নির্জন। তরঙ্গে-তরঙ্গে অনিশ্চয়তা, মৃত্যুর সংকেত। কাহিনী যেখানে শেষ হচ্ছে সেই গঙ্গার তীর শ্মশানভূমি, শ্মশান। সেখানে মৃত্যুর আয়োজন। গঙ্গা সেখানে মহাকালের, অনন্ত বিচ্ছেদের প্রতীক, যার মধ্যে একবার পড়ে গেলে আর প্রত্যাবর্তন নেই। উত্তর মেলে না। জেগে থাকে শুধু অনন্ত জিজ্ঞাসা।

শুধু 'কপালকুণ্ডলা" কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আরো কয়েকখানি উপন্যাসের সূত্রপাতই নদীর পটভূমিকায়। 'মৃণালিনী' শুরু হয়েছে এমনি দৃশ্যে। যেন মঞ্চ থেকে সরে উঠে গেছে যবনিকা, পশ্চাৎপটে দেখা যাচ্ছে নদী। নট-নটী এখনো প্রবেশ করেননি। দর্শকেরা মনে মনে প্রস্তুত, উৎসুক হ'য়ে উঠেছে ঘটনার জন্য। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের যবনিকাও উঠেছে ভাগীরথী তীরে। বালক প্রতাপ স্নান সেরে জলকল্লোল শুনছে। সঙ্গে শৈবলিনী। ওই উপন্যাসে স্রোতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর আকর্ষ বর্ণনা সহজেই মনে পড়ে: "ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুদ্বয়, রক্তাম্বুরীয়মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।" শৈবলিনীকে সঙ্গে নিয়ে নদীর গভীর স্রোতে এসে প্রতাপের মনে হলো, প্রেম ও মৃত্যু অভিন্ন, মৃত্যু বিবাহেরই নামান্তর। তাই প্রতাপ জলে ডুবে মরবার প্রস্তাব করলো। সে নিজে ডুবও দিলো। কিন্তু শৈবলিনী শেষ পর্যন্ত সাহস পেলো না। প্রেমের জন্য পুরুষ সহজেই জীবন দিতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তা পারে না, বরং প্রেমের স্মৃতি নিয়ে সারাজীবন জ্বলে মরতে চায় এই সত্য যেন উদ্ভাসিত হয়েছে নদীবক্ষে। নদী এখানে যেন কঠোর বাস্তবতার প্রতীক, তার সামনে পরীক্ষায় প্রতাপ উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু শৈবলিনী উত্তীর্ণ হ'তে পারলো না।

উত্তরবঙ্গের নদী ত্রিস্রোতা (এখনকার তিস্তা) সজীব হ'য়ে উঠেছে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে। বঙ্কিমের খুব কম উপন্যাসেই নদীর এমন সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে জ্যোৎস্না 'পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো।' নদীর বুকে রূপকথার পরিবেশ। বজরায় দেবীরাণীর অধিষ্ঠান। বজরাই সেই মুহূর্তে তার রাজ্য ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তার নতুন সাক্ষাৎকার বজরার মধ্যে।

'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারাম'—এই তিনখানি উপন্যাসেই নদী রণক্ষেত্র। নৌ-যুদ্ধের বর্ণনার দিকে বঙ্কিমের প্রবণতা ছিলো। তাই ত্রিস্রোতা, ভাগীরথী আর মধুমতী মাঝে মাঝে শোণিত লাল হয়ে উঠেছে।

নদী রমণীয়; তার রূপাঙ্গের মৃত্যুরও আছে বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র, আকর্ষণ। নদী-তীরের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুন্দর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। সেই বিচিত্র দৃশ্যের দর্শক নগেন্দ্রনাথ। আবার, নদী প্রকৃতির হয়েও যে মানুষের, তাকে যে মানুষ ভরে রাখে নানা কাজে, কোলাহলে 'ইন্দিরা' গল্পের গঙ্গা সেই নদী।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নানা নদীর প্রবাহ। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নদী বোধ হয় গঙ্গা। ইন্দিরার আনন্দিত উচ্ছ্বাস—স্মরণীয়: "আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত জন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রবাহ দেখি। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর জল অগ্নিময়

আসিতে ছুটিয়াছে···গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।" 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গঙ্গার স্রোতকে প্রেমপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে জ্যোৎস্না রাত্রির গঙ্গা আশ্চর্য সৌন্দর্যে সমাহিত।

নর-নারীর চরিত্র, সুখ-দুঃখের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বারবার নদীর চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'তে সুখাকাঙ্ক্ষা কী তা বলতে গিয়ে পর্বতে জন্ম থেকে সমুদ্রে অবসান পর্যন্ত নদীর সামগ্রিক জীবনকাহিনী উপস্থিত করেছেন একটি বাক্যে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে নদীর সঙ্গে স্নেহের তুলনা করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের শোকের বর্ণনা দিতে গিয়েও ব্যবহার করছেন নদীর উপমা। আবার, নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি মনের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন: "রমণী হৃদয়ে নায়কসংস্পর্শরূপ প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।" এইসব চিত্রকল্প ব্যবহার এবং উপমার প্রয়োগ বঙ্কিম-মানসে বাংলার নদ-নদীর সুদূর-প্রসারী প্রভাবের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

• • • •

দেশী রুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী রুচি গ্রহণ করিতেছি·····আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি····· বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মঁস্যার জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা, শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা। তাই আমরা অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

—বঙ্কিমচন্দ্র

পরকীয়া-প্রেম --চন্দ্রে-সূর্যে

ডক্টর উমা রায়

সাহিত্যে নীতির স্থান নিয়ে আলংকারিক মহারথীদের সংগ্রাম কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছয়নি। আসলে এর উপরেই আদর্শ ও বাস্তবতার চুলচেরা বিচার। নীতির সঙ্গে ঔচিত্য-বোধের একটি অপরিহার্য সম্পর্ক আছে যদিও ঔচিত্যবোধের কোনো স্বরূপলক্ষণ নেই। এই কারণে একই বিষয় নিয়ে যুগে যুগে এত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতিকে সমাজচেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ধর্মবোধের উপর স্থাপিত করেছেন আর শরৎচন্দ্র করেছেন অন্তরের সহানুভূতির উপর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ লৌকিক অর্থে প্রযোজ্য নয় —সে ধর্মবোধ সর্বাঙ্গীন চেতনার একটি সুষমাময় সাহচর্য।

কোনো লেখকের পক্ষেই নৈতিক ও সাংকেতিক ঔচিত্যবোধকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। কারণ লেখকের সামনে যে পাঠকসম্প্রদায় তাঁর মনস্তত্ত্বকে বিস্তার করে তাকে এড়িয়ে চলা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এই জন্য জীবনবিচারের মানদণ্ড যাঁর যেমনই হোক না কেন - এই ঔচিত্যবোধের বেদীপীঠে প্রাণের অনেক লালিত ও ললিত ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হয়।

ধরা যাক পরকীয়া রতির কথা। পরকীয়া রতিকে তিনভাবে দেখা যেতে পারে—অনূঢ়া, পরোঢ়া ও বিধবা—এই তিন শ্রেণীর নারীকে লক্ষ্য রেখে। অনূঢ়ার প্রতি রতিকে সমাজ মেনেই নিয়েছে যদি তা বিবাহে পর্যবসিত হয়। বিবাহোত্তর কালে পূর্ব প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি প্রগাঢ় রতি সকলের রুচি অবাধে সমর্থন করেনা। কিন্তু পরোঢ়া ও বিধবা এই দুই শ্রেণীর নারীর পরকীয়া রতিকে আমাদের দুই সাহিত্য মহারথী কিভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন তা প্রসঙ্গত আলোচনা করলে মন্দ হবেনা—আর এও লক্ষণীয় যে সরলরেখা দুটি বৈপরীত্য থেকেই আসুক—এক জায়গায় একটি বিন্দুতে এসে মিশেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে পরকীয়া রতির বড়ই উচ্ছ্বাস। বিধবার প্রেম নিয়েও তিনি কম চিন্তা করেন নি। মৃণালিনী উপন্যাসে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্যেই ঘটে এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে।"

বিষবৃক্ষের আর এক জায়গায় লিখছেন—

"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়—সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?"

বিধবার দু'টি চরিত্রে বঙ্কিম নারীর প্রেমকে প্রগাঢ় বর্ণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত করে এঁকেছেন।

বিষবৃক্ষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর চরিত্রাঙ্কণে বঙ্কিম তাঁর যেটুকু সমবেদনা সঞ্চারিত করেছিলেন কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিনীর চরিত্রে তার বাষ্পচিহ্নটুকুও নেই।

কুন্দ তের বছরের বালিকামাত্র—প্রথম যৌবন সঞ্চারের মাধুর্যে ও সরলতায় চলচল। তার দেহ যেন রক্তমাংসে গঠিত নয়। যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করে বিধাতা তাকে সৃষ্টি করেছেন। নগেন্দ্রের চক্ষে সে তুলনাহীনা সুন্দরী। নগেন্দ্রপত্নী সূর্যমুখী তাকে বিয়ে দিলেন তারাচরণের সঙ্গে। তারাচরণ সূর্যমুখীর পিতৃবন্ধুর দাসীপুত্র কিন্তু স্বজাতি কায়স্থ হওয়ায় এবং শিশুকাল থেকে একত্র লালিত-পালিত হওয়ায় ভ্রাতৃবৎ। মোটামুটি ইংরেজি-জানা তারাচরণ সূর্যমুখী প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলের মাস্টার। তারাচরণ ভালোমানুষ—প্রায় গ্রাম্যদেবতার পর্যায়ে পড়েন। তারপর Citizen of the World আর Spectator পড়েছেন। তিন বুক জিওমেট্রি তাঁর পড়া—এমন কথাও রাষ্ট্র ছিল। এর উপর তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। বিধবাবিবাহ (হায়, তিনি কি জানতেন তাঁরই স্ত্রী কুন্দ বিধবা হবে !), স্ত্রীশিক্ষা, সৌত্তলিকবিদ্বেষাদি—সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ পাঠ করতেন, নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং দেবার আগে "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর" ব'লে চক্ষু মুদ্রিত করতেন। এই তারাচরণ হলেন কুন্দের স্বামী এবং একদিন পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত জমিদার দেবেন্দ্রের সঙ্গে পত্নীর আলাপ করিয়ে দিতেও একদিন বাধ্য হলেন। কেননা অধিবাহিত অবস্থায় তিনি প্রায়ই বলতেন—

"কখন যদি আমার সময় হয়, সবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব।"

হায় তারাচরণ !

তারাচরণের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি দেবেন্দ্রনাথ প্রেমাসক্ত হলেন। বিবাহের পর তারাচরণ মাত্র তিনবৎসর জীবিত ছিলেন। ষোড়শী কুন্দ বিধবা হলো—তিন বৎসর স্বামীসঙ্গ সুখের পর। কুন্দ কুমারী বেলায় নগেন্দ্রের মনোহারিণী. নগেন্দ্রও কুন্দের চিত্তহর ছিলেন। এ বিষয়ে নগেন্দ্রের উক্তি—"কোনো কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি পরতের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারিনা"।

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রমুখে কালাতিপাত করছেন—কিন্তু সূর্যমুখীর কাছে এই বসবাস বিষবৎ হয়ে উঠেছে। বৈধব্যের পরও দু'বছর কেটে গেছে—কুন্দ এখন সপ্তদশী যুবতী। কুন্দের প্রতি অনুরাগের ফলে প্রথমে নগেন্দ্রের আচরণে পরে চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। কুন্দের প্রতি আসক্ত-চিত্ত নগেন্দ্র অবশেষে আপন গৃহের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মরণাসক্ত হয়ে পড়লেন—কুন্দকে ভোলবার জন্য—না, অনন্যচিত্ত হয়ে তাকে স্মরণ করবার জন্য ? এদিকে প্রদোষকালে উদ্যানের বাপীতটে কুন্দনন্দিনী কাঁদে, ধীরে ধীরে সরোবরের দিকে যায় ডুবে মরবার জন্য। এমন সময়ে পশ্চাৎ থেকে নগেন্দ্রের স্পর্শ।

নগেন্দ্র বলে—"তুমি কুন্দ ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম—কিন্তু আর পারিলাম না।...আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না।

তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ—এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল—না।

আবার নগেন্দ্র বলিলেন—কেন কুন্দ, বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র? কুন্দ আবার বলিল—না।

নগেন্দ্র বলিল—তবে না কেন? বল—বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?

কুন্দ বলিল—না।

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন—পুষ্করিণী নির্মল, সুশীতল—কুসুমবাসসুবাসিত—পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন, উহার মধ্যে শয়ন কেমন?

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল—না বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে, তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সূর্যমুখীর উদ্যোগে কুন্দর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহের পর সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন।

বঙ্কিম বলেন—চিত্তসংযমের অভাবই বিষবৃক্ষের বীজ। নগেন্দ্র জন্মাবধি চিত্তসংযমের শিক্ষা পান নি। জগদীশ্বর তাঁকে সকল সুখের অধিপতি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। "কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য; নীরোগ শরীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল।"

কিন্তু নগেন্দ্রের চিত্তসংযম ছিল না। চিত্তসংযমের পক্ষে দু'টি বস্তুর প্রয়োজন—প্রবৃত্তি ও শক্তি। প্রবৃত্তির মূলে শিক্ষা, শক্তির মূলে প্রকৃতি। অবশ্য প্রকৃতিও বঙ্কিমের মতে শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমের পক্ষে শিক্ষাই মূল এবং এই শিক্ষা গুরুর উপদেশ নয়—অন্তঃকরণের দুঃখভোগ।

পাঠক, লক্ষ্য করুন—জীবনের বিশৃঙ্খলার মূলে সংযমের অভাব এবং সংযম শিক্ষার প্রধান উপায় বাইরে থেকে আহৃত নয়, অন্তরের দুঃখভোগ থেকে উদ্দীপিত—বঙ্কিমের এই মত রবীন্দ্রনাথেরও অনুমত। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে"র প্রতিপাদ্য বস্তু আলোচনা এবিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলকর।

চোখের বালি উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন।" কিন্তু সেদিনের সেই রসের নূতনত্ব রবীন্দ্র-আমলে হলো পুরাতন। রবীন্দ্রনাথ সেই রসকেই নতুন পাত্রে পরিবেশন মাত্র করলেন। তবুও পাঠকের রসনায় রসের অরুচিতে ঘটল না।

নগেন্দ্রের মতন মহেন্দ্রও সকল সুখের অধিপতি—"কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য; নীরোগ শরীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না।" কিন্তু মহেন্দ্রের এ সবই ঘটেছিল। বন্ধুর জন্য নির্বাচিত পাত্রীকে ভালো লাগায় বন্ধুর ভাগ্য থেকে নারীরত্ন ছিনিয়ে নিতে মহেন্দ্রের বাধেনি। মায়ের প্রতি অসীম প্রীতি আপন প্রবৃত্তির তাড়নায় বিরক্তিতে পর্যবসিত হতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। মহেন্দ্রের অসংযত প্রেমের অতি বিস্তারে—কর্তব্য-বিমুখ দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারিতায় নির্লজ্জতায় দু'টি নারী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নগেন্দ্রকেও ছেড়ে

দিয়েছিল সূর্যমুখী, তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছিল কমলমণি। বিনোদিনীর প্রেমে উন্মত্ত মহেন্দ্র আশালতাকে পরিত্যাগ করেছিল, যেমন কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে পরিত্যাগ করেছিল। পরিত্যাগ বৈকি—সূর্যমুখী যখন শুনল—"তোমাতে আমার আর সুখ নাই।...কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব।...আমি অন্তর্গতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ ক'রয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।" তখন যদি সূর্যমুখীই নগেন্দ্রকে পরিত্যাগ করে যায়—তো সে যাওয়া অন্তরের দিকে থেকে নগেন্দ্রেরই চলে যাওয়া।

মহেন্দ্রের স্বীকারোক্তি অবশ্য সাক্ষাৎভাবে নয়—একটি চিঠির মাধ্যমে। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের অবৈধসম্পর্ক ও অসামাজিক প্রেম যখন আশা জানতে পারল তখন—"চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল—নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল।...এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ।"

আর সূর্যমুখী যখন নগেন্দ্রের কুন্দপ্রণয় জানতে পারল তখন সেও—"কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরময়ী মূর্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই তৃতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্যমুখী কাঁদিলেন কি?"

সূর্যমুখী অন্যাসক্ত স্বামীর সঙ্গ সহ্য করতে না পেরে গৃহত্যাগ করেছিল। আশাও স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল যদিও গৃহত্যাগ করেনি। অসংযত চিত্তের উদ্দাম বাসনার হাওয়ায় শুদ্ধসত্ত্বার ইচ্ছার বিষবীজ নগেন্দ্র ও মহেন্দ্র উভয়েই বপন করেছিলেন—উভয়েরই বিষবীজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল—উভয়েরই বৃক্ষে বিষফল ফলছিল। তবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি কে আশা করে! যুগ তো বদলে গেছে। ঈর্ষায় তীব্র ঈর্ষা ও সূর্যমুখীর আভিজাত্য নিয়ে বিনোদিনীর সৃষ্টি, কুন্দ আর আশা একটি সরলতার বৃন্তে দুটি নির্মল কুসুম—কিন্তু কুন্দ পূর্বোপভুক্তা আর আশা পূর্ববাহিতা। এ যুগের কারখানা ঘরে যে গল্প রবীন্দ্রনাথ বানিয়েছেন তার সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—"শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হ'ত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা।"

চোখের বালির বিনোদিনী বিধবা কিন্তু তার ভালবাসা পাবার ইচ্ছা প্রবল। আশার প্রতি তীব্র ঈর্ষা তার বিহারীর জন্য—কেননা মহেন্দ্রের মুখের কথাই সে শুনেছে বিহারী পরস্ত্রীকে ভুলতে পারেনি। এই আশা সংসারে অপটু—সংসার চালনার সর্বময়ী কর্তৃত্ব তাই এসে পড়ল বিনোদিনীর হাতে। স্বামী সন্তাবণে আশা অপটু—তাই আশার প্রেমপত্রে বিনোদিনীর শুধু হাত নয়, হৃদয়ও বিদ্ধিত। আর এই প্রেমপত্রগুলিই মহেন্দ্রের মনে কামনার বহ্নিশিখা জাগিয়ে তুলল—যাতে ইন্ধন যোগাল বিহারীর প্রতি তীব্র ঈর্ষা।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে বিহারীর প্রেয়সী করেছেন কিন্তু মিলন ঘটাতে পারেননি। বিধবা বিনোদিনী যেদিন বিহারীর কাছে আপনাকে অকপটে প্রকাশ করল—আকস্মিক ভাবে চরণ-চুম্বনে বিহারীর শুদ্ধভাব অনুভব করে সেদিন সে নিজেই দুই হাঁটুর উপর উন্নত হয়ে উঠে—

"চৌকীতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল—জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালবাসো।" বিনোদিনীর সেদিনকার উত্তপ্ত চুম্বনের রক্তিম আভায় বিহারীর পূর্ব পূর্ব কত মেঘের সন্ধ্যা ও পূর্ণিমার রাত্রি বিবর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জলস্থল আকাশের কেন্দ্রকুহর থেকে থেকে ওঠা বাঁশীর রাগিণীতে বিহারী বিবশ হয়ে উঠেছিল। দুই বাহুর বেষ্টনে বিনোদিনী বিহারীকে যে অপরূপ সৌন্দর্য-লোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল যে ব্যাকুল ঘননিশ্বাসে বিহারীর রক্তস্রোতকে তরঙ্গিত করে তুলেছিল, যে স্পর্শের সুকোমল উত্তাপে বিহারীর পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতন ফুটিয়ে তুলেছিল—সেই বিনোদিনী আপন বৈধব্য-সত্তাকে ভালবাসার সমুদ্রেও বিসর্জন দিতে পারেনি। বিহারী যখন বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চাইল তখন বিনোদিনী বিহারীকে ভর্ৎসনা করে বলল—"ছি ছি বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহ জীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।…পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এজন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে।…তুমি উচ্চে আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

হয়তো বিহারী বা বিনোদিনী একটি সঙ্কীর্ণতর ভবিষ্যৎ অনুতাপের যন্ত্রণা থেকে বেঁচে গেল—আধুনিক যুগে বলেই এটা সম্ভব হল—সেকালের নগেন্দ্র কিন্তু বাঁচতে পারেন নি। অনুতাপের যন্ত্রণায় তিনি বলেছেন—"কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি…কিন্তু এখন বুঝিতেছি সে কেবল চোখের ভালবাসা। …কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

কুন্দনন্দিনী তিনবছর অর্থাৎ তের থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে কাটিয়েছে। এই তিন বছর তার দেহে পঞ্চশর অসংখ্যবার রতি-রঙ্গ-লালসার পুষ্পবাণ নিক্ষেপ নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু কোথাও স্বামীসম্ভোগসুখের চিন্তা বা স্বামী-ঘটিত পূর্বস্মৃতি কুন্দনন্দিনীর নগেন্দ্রের প্রতি প্রেমে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগায় নি। আর চোখের বালির মতন মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসেও বিপিনের বৌ বিনোদিনীর, যার "বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল" স্বামীস্মৃতি মহেন্দ্রের প্রতি প্রেমাভিনয়ে বা বিহারীর প্রতি প্রেমাভিনয়ে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ের দোলা জাগায়নি বা সঙ্কোচের সৃষ্টি করেনি।

বিধবা বলেই পুনর্বিবাহের পরও কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করতে হল আর বিনোদিনীকে প্রেমের প্রতিদান পেয়েও, কাশীতে চিরনির্বাসন বরণ করে নিতে হলো।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই সাহিত্যরথীর কেউই সামাজিক শাসনের বন্ধনকে অমান্য করলেন না—তবে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বললেন—"ইহা প্রণয় নহে", রবীন্দ্রনাথ সেখানে বললেন—"পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায় তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না।"

কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিণীকে বঙ্কিমচন্দ্র কম শাস্তি দেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথ নষ্টনীড়ে চারুলতাকেও কম শাস্তি দেননি—তার পরকীয়া রতির জন্য। অবশ্য যে কঠিন শাস্তি তিনি চারুলতাকে দিয়েছিলেন তার জন্য পরে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন—বলেছিলেন —"নষ্টনীড় যা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পথারেই পড়বে।"

কলকাতার উইলে বিধবা রোহিনী হরলালের অনুরোধে উইল চুরি করতে রাজি হয়েছিল শুধুমাত্র প্রেমময় বিবাহিত সংসার জীবন যাপনের প্রলোভনে, যে প্রলোভনে রবীন্দ্রনাথের "ত্যাগ" গল্পের বিধবা কাদম্বরকন্যা কুসুম আপন বৈধব্য গোপন করে কেদারকে বিবাহ করেছিল। প্রেম হাওয়ায় ভাসা ফুল নয়—সেও চায় দৃঢ় বৃন্তের বন্ধন—পাখার আশ্রয়—কাণ্ডের স্থিরনিষ্ঠ মাটিতে শিকড় চারানো সুদৃঢ় প্রত্যয়। সমস্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান না হলে—বিশ্বসংসারের সম্পর্কবন্ধনগুলির সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য না ঘটলে জীবনে বিপর্যয় ঘটে। একটি ক্ষুদ্র বৃন্ত যেমন পুষ্পের সমস্ত পর্ণগুলিকে সাজিয়ে দিয়ে আকাশের আলোর দিকে মেলে ধরে তেমনি সমাজবন্ধন আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি গুলিকে সাজিয়ে নিয়ে রূপের প্রদীপে অরূপের আরতি করে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"যে ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এত নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালোবাসা, এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমন একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুঠা ধূলি হইয়া গেল।"

রোহিণী বিধবা। "তবে বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, কিনারাপেড়ে ধুতিপরা, আর কাঁধের উপরে চারু বিনিমিতা কালভুজঙ্গিনী-তুল্যা কুঞ্চনীকৃতা রোপার-মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী সুন্দরী সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময় বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।···রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

এই রোহিণীকে—এমন একটি সুন্দর চিত্রকে বঙ্কিম ঘুমঢ়ে মুচড়ে উপন্যাসের শেষ অংশে ফেলে দিয়েছেন। অনর্থক—যেন খানিকটা জোর করেই বিশাকরকে এনে রোহিণী বধীতে নিক্ষেপ করেছেন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও রোহিণীর শেষ চিন্তা "ইহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন?" রোহিণীকে কি সত্যই তেমন হেয় বলে মনে করার। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা রোহিণীর কুলত্যাগ ক্ষমা করেন নি। রোহিণীকে হত্যা করেছেন এবং লাস বেঁধে-ছেঁদে গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ এতখানি নিষ্ঠুর হননি। এই রূঢ়তা তাঁর কবিসত্তার প্রতিকূল ছিল। কিন্তু নিপুণ হত্যাকারীর মত তাকে ঘিরে আত্মহত্যা করিয়েছেন—কঙ্কাল গল্পে।

কঙ্কাল গল্পের বিধবা নায়িকা রূপবতী—লালিত্য ও লাবণ্যে যৌবনের কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতায় প্রতিক্ষণে প্রস্ফুট থেকে প্রস্ফুটতর। নায়িকা যখন চলত তখন যেমন একধও হীরে মড়াপে চারদিক থেকে আলো ঝকমক করে ওঠে তেমনি তারও গতির ভঙ্গিতে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক হিল্লোল চারদিকে ভেঙে পড়ত। শশিশেখর নামে যে ডাক্তারের সঙ্গে তার প্রণয় ছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে তার সঙ্গে মিলন ঘটাতে দেননি। সেই ডাক্তারের বিবাহের রাত্রে মনের গোলাপে নায়িকা বিষ মিশ্রিত করে নিজেও

বিবাহ করল। তার আগে বারাণসী শাড়ী পরে, গহনা গায়ে পরিয়ে সিঁথিতে বড় করে সিঁদুর দিয়ে বকুলতলায় মৃত্যুবাসর শয্যায় শায়িত হল—

"বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে। বাঁশির শব্দ যখন ক্রমশ দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব ও আকাশ এবং আজন্মকালের ঘরদুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম। ইচ্ছা ছিল……হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে।"

"ঘাটের কথা" গল্পেও তিনি নায়িকা কুসুমকে জলে ডুবে মরতে দেখেছেন—বাঁচাবার চেষ্টা করেননি যদিও সেই সন্ন্যাসী প্রকৃত পক্ষে তারই স্বামী ছিল; অবশ্য কুসুম জানত সে বিধবা। "মহামায়া" গল্পেও স্বামীর চিতাশয্যা থেকে উঠে আসা বিধবা মহামায়া অতি নিষ্ঠুরভাবে অবগুণ্ঠন টেনে রইল, প্রেমাস্পদকে তার অঙ্গস্পর্শ করতে দিলনা—কিন্তু যেদিন সেটা ঘটল সেদিন সে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের গিরিবালাও শুভ্র বসনের দুর্গ আশ্রয় করেই শত্রুদলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

যেখানে বিবাহরূপ সামাজিক বন্ধনের কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করেছেন—যেমন "বিচারক" গল্পে হেমশশীর প্রতি। প্রতিবেশিনী গল্পে কৃপাবর্ষণ অকৃপণ—অবশ্য সেখানে বিবাহ ঘটেছে।

পরোঢ়া-প্রীতির কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর গল্পের প্রতাপ-শৈবলিনী, রাজসিংহের মোবারক-জেবউন্নিসা, রজনীর অমরনাথ-লবঙ্গলতা। বঙ্কিমচন্দ্র কাউকেই ক্ষমা করেন নি। জেবউন্নিসার অনুতাপের যন্ত্রণা, অমরনাথের পিঠে "চোর" তপ্তলৌহশলাকাঙ্কিত এই ছাপ এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কঠিন শাস্তি ও প্রতাপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের সঙ্কল্প এগুলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "নষ্টনীড়" গল্পে চারুলতার মানস-বিশ্বাসন। "পয়লা-নম্বর" গল্পে অনিলার গৃহত্যাগ এবং "একরাত্রি" গল্পে সুরবালার নীরব উপস্থিতি ও প্রয়াণ, দুইবোন উপন্যাসে ঊর্মিলার আকস্মিক বিলাত গমন। শেষের কবিতায় অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের বিচ্ছেদ, নৌকাডুবিতে কমলার রমেশকে পরিত্যাগ (কারণ "রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল সেকি রমেশ বলিয়া না কি তাহার স্বামী বলিয়া")—ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের রায় কোনদিকে তা জানাতে দ্বিধা করেনা। ঘরে-বাইরের সন্দীপ-নিখিলেশী কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য্য নিষ্ঠার পটভূমি রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সতীধর্মের গৌরব এবং পতিব্রতার স্বধর্মনিষ্ঠার ওজস্বিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্পে ও উপন্যাসে বাখিয়েছেন।

"প্রতিহিংসা" গল্পে ইন্দ্রাণী-নায়ী "উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল" কবি স্মিতহাস্যে লক্ষ্য করেছেন। সতী-চরিত্রগুলিকে তিনি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তা অবিস্মরণীয়। যোগাযোগে কুমুর কথা—"বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করে তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছে। সাদা নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ অক্লান্ত সেবা।" ঘরে বাইরের বিমলাও বলেছে—"সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই

বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল—এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে—তা হবেই তো বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে। ·····

ভোরের বেলায় অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল ···পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে মিলিয়ে দিতে হবে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ভিক্ষার এই ক্ষুদ্র তেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্য তপস্যা না করতেন।"

সন্দীপ ভেবেছিলেন পতঙ্গিনী পাখা পুড়িয়েছে—কিন্তু তা নয়, সীতার মত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিমলা সতীত্বের ভাস্বর জ্যোতি নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ উর্দ্ধতোলা কালো খোঁপার কালো শিখা যেখানে উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে সেই সুঠাম সুন্দর গ্রীবাদেশে সন্দীপের চুম্বনচিহ্ন অঙ্কিত হতে বাধা পায়নি।

ঘরে বাইরের বিমলার সঙ্গে চতুরঙ্গের দামিনীকে একবার পাঁড় করিয়ে দেখতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। শচীশের প্রতি দামিনীর তীব্র সংরাগ শুধায় ভিতর যে রসের অবতারণা করেছে তা বীভৎস। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল রূপকে কী ঘৃণা দিয়েই না অঙ্কিত করেছেন—"মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রক্ত আরক্ত রস, তাহা নিঃশেষে জীর্ণ করে।

বুঝাইতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রৎ চৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না এ কেবল মূর্চ্ছারই সহে। ··

এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘননিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা।

তারপর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমটা ভাবিলাম কোনো একটা মুনো জন্তু। কিন্তু তাহার গায়েতো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনিনা। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ—কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটি কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নতুন বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।"

বিধবা দামিনীর প্রেমের ক্ষুধায় অন্ন পরে শ্রীবিলাস বিবাহের পাত্রে পরিবেশন করেছেন। বিশ্ববিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অতএব সুষমাহীন দেহাসক্তি পরকীয়া রতির প্রতি তীব্র ঘৃণাই এতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। এর সঙ্গে তুলনা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস—

"রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্য পথে উড়িতেছে। দেখিলেন কত কৃষ্ণমেঘের সমূহ কত বিদ্যুৎরশ্মিরাশি পার হইয়া তাহা কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।.....নক্ষত্রমণ্ডলীগণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলি দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—দেখ তপিনি, দেখ মনুষ্য কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে! কোনো তারা শিহরিয়া চক্ষু মুদিতেছে; কোনো তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোনো তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে.....যেখানে উষ্ণ, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কল কল ঘর ঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল.....নরকের কোলাহল .....পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল।.....অকস্মাৎ সঞ্জীবনুপ্তা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল—কোথায় তুমি স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবনসর্বস্ব, আরাধনার দেবতা, সর্বে সর্বময়! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র সহস্র সহস্র সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকট অপরাধ করিয়া আমি এই নরক কুণ্ডে পতিত হইতেছি · · এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব!"

বঙ্কিমচন্দ্র অতি কঠিন শাসক—তাঁর নীতির সরলরেখা সমাজের বহির্জীবনে বড় দৃঢ় ভিত্তি খনিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের নীতির সরলরেখা সমাজের অন্তর্জীবনে আসন শিকড় অনেক দূরে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুটি সরলরেখাই একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে · তা হচ্ছে কল্যাণ আদর্শে। পরকীয়া রতি যতক্ষণ হৃদয়সরসবিহারী ততক্ষণ তার সঙ্গে বহির্জগতের সংঘর্ষ নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বহির্জীবনের বাঁধা খানে কাটল ধরায় সেই মুহূর্তেই তা অকল্যাণকে—অমঙ্গলকে বরন করে আনে। রবীন্দ্রনাথ তাই নারীশক্তিতে মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করেছেন—"নারী-শক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি।.....বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।"

বঙ্কিমচন্দ্রও—"প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয় তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সন্তুষ্টতা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়। ...ইহা রূপে জন্মে না।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ডানলাপিলো

তোশক বালিশ কুশন

যে কোন

উৎসবের

দিনে

শোভন

উপহার

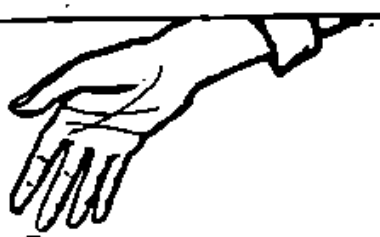

এই হাতই

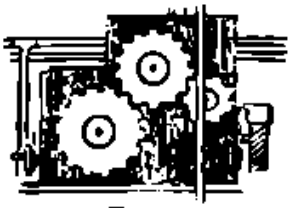

মেসিন চালায়

যা থেকে নানারকম দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়

কিন্তু এতে যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তা কোথেকে কি?
আপনার সঞ্চয়ই সেই মূলধন জোগায়।

আজই একটী *বেতন পঞ্জীভুক্ত সঞ্চয়কারী* দল গঠন করুন

যাঁরা প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ করেন তাঁদেরই বেতন পঞ্জীকৃত সঞ্চয়কারী দল বলা হয়। প্রত্যেক বেতনের দিনটিতে ঐ পরিমাণ টাকা তাঁদের মাইনে থেকে কেটে রাখা হয়। এটা একটা ঐচ্ছিক পরিকল্পনা।

এর সুবিধেগুলি হ'ল :

১। আপনার একটা নিয়মিত সঞ্চয় হয়।

২। সহজে আপনা আপনিই সঞ্চয় হয়।

৩। আপনার সঞ্চয় জমা দেওয়ার জন্য পোষ্ট অফিসে যেতে হয় না।

৪। আপনার হাত থেকে প্রথমেই সঞ্চয় হতে যায়—শেষে নয়।

নিজেকে সাহায্য করুন : নিজের দেশকে সাহায্য করুন
মনে রাখবেন..... .....

অল্প অল্প সঞ্চয়ই শেষে অনেক টাকায় পরিণত হয়।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA-65/[illegible]

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৮

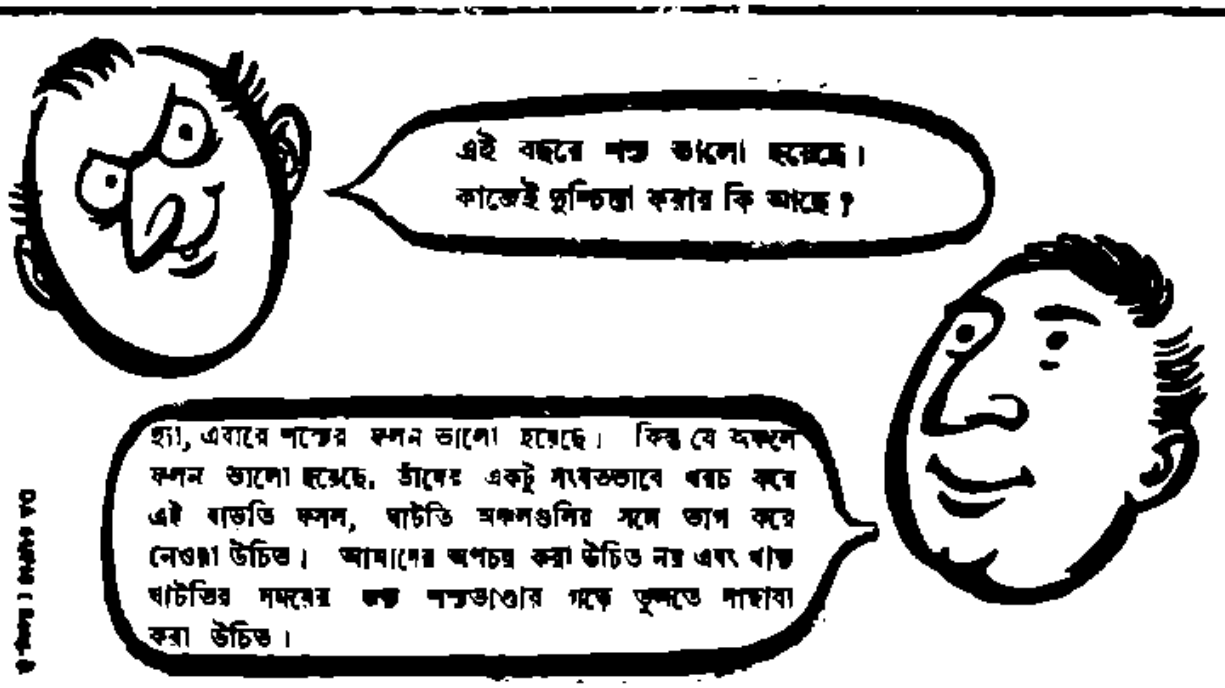

শ্রীআয়ুর্বেদমের

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত
মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা

কোন্‌টী থেকে ভুগছেন?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চয় সেরে যাবেন

যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন,

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন: ৫৫-৩২১৪

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

হাণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

Inchek Tyres Limited

NR.G/40

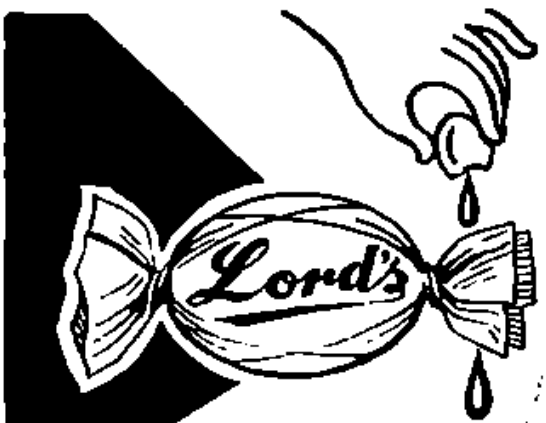

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

শ্রাবণ — ১৩৭২

AUGUST-1965

সম্পাদক :

কালিদাস নাগ

সহ: সম্পাদক :

কল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা।

Price Re. 1·00

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রা: লি:—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড একটি কার্যকরী ঔষধের নিয়ন্ত্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অস্বস্তি কমায় এবং অস্বস্তি দূর করে স্বস্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান – সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

2 শিশুর কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেন্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

BIL

আপনার

এক্সপ্রেস ডেলিভারী চিঠিগুলো

তাড়াতাড়ি পাঠান

এর জন্য নতুন বিশেষভাবে ডিজাইন করা গোলাপী রাঙের খাম পাওয়া যাচ্ছে। সব পোষ্ট অফিসেই এইগুলো ২৮ পয়সায় পাওয়া যাবে...

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে

তাড়াতাড়ি
বাছাই করতে
পাঠাতে
পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

DA 69.191 Bengali

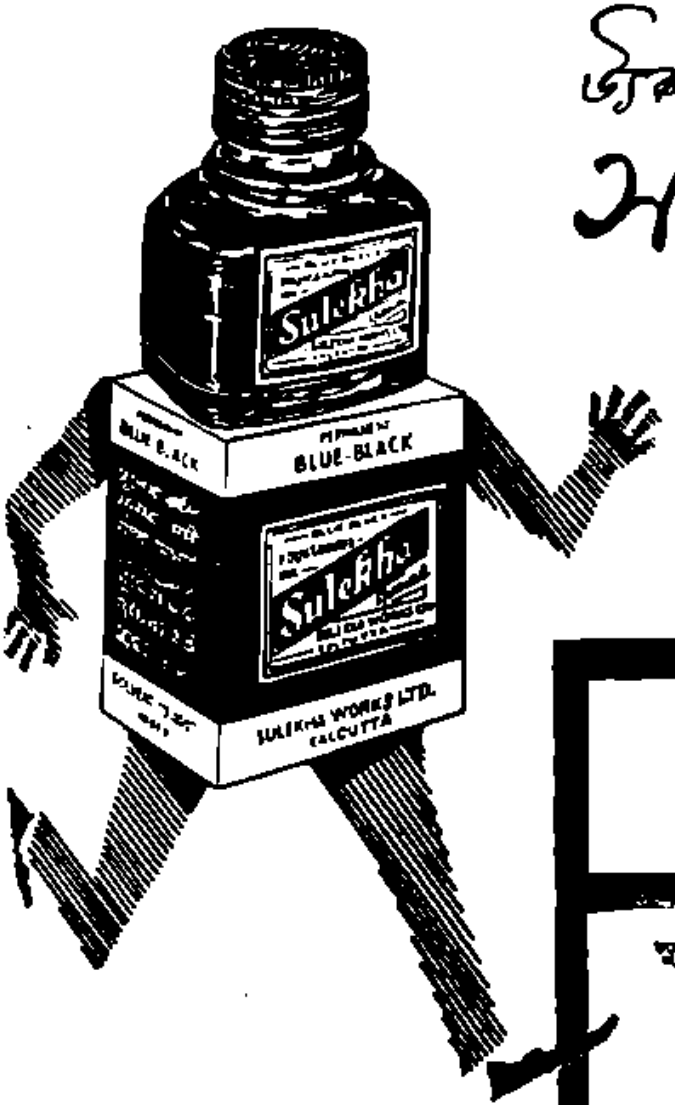

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপারে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম,
'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স,
'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০, ৫১২ এম.এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৬২
ভারত।

PRO/SW—11

★ মাছ, মাংস, পাকানো, টাটকা শাকসবজি ইত্যাদি সব রকম খাবার যথাযথ রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে।

★ আপনার ঘরের রঙের সঙ্গে টেবল-টপের রঙ মেলানো যাবে—দুটিকে যাতে একই রকম লাগে তা নির্ভর করে আপনার পছন্দের ওপর।

★ মেরামতের ঝামেলা নেই—যে কোন অনুমোদিত জিইসি ডিলার তার ভার নেবেন।

১১৫৲
টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

অনুমোদিত অতিরিক্ত সরঞ্জামের মধ্যে আছে
টেবল-টপ, ডালার ও কাঁচ।
পাঁচ বছরের গ্যারান্টি রয়েছে।
অনুমোদিত যে কোন জিইসি ডিলারের কাছে
পাওয়া যায়।

জি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

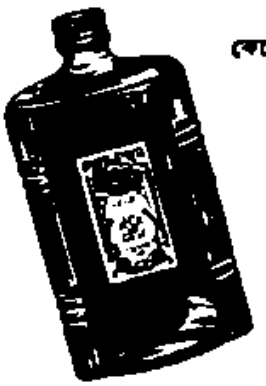

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও কমনীয়তা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

এই সংখ্যায়

কথা প্রসঙ্গে— ১১১

পাঠক-পাঠিকার কলম— ১২০

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ১২৫

চলতি দুনিয়া— ১২৭

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১২৯

উদাত্ত আহ্বান— ১৩৬

তালমুদ গল্প রত্নাবলী—আনন্দ ভট্টাচার্য ১৩৭

আন্তর্জাতিক নদী সমস্যা ও সমাধান—অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ১৪১

অভিনয়ের নেপথ্যে—প্রবোধকুমার মজুমদার ১৪৫

মেঘ-মুক্তি—বিভা সরকার ১৫৭

বিশ্বসাহিত্য—

ব্লুমস্‌বারি : একটি আধুনিক চেতনা—দীপক চক্রবর্তী ১৬২

মা—মূল : নাডালিয়া গিনস্‌বার্গ অনুবাদ—নীলিমা দে ১৬৭

পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

দেশভাগের ফলে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। ছোদ্দ বছরের পরিকল্পিত আর্থনীতিক উন্নয়নের মূলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক-উন্নয়ন, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ এবং সর্বোপরি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট।

॥ চালের উৎপাদন ॥

১৯৪৭—৪৮	১৯৬৩—৬৪
৩৫ লক্ষ ৫ হাজার টন	৫২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন

॥ শিক্ষা ॥

	১৯৪৭—৪৮	১৯৬২—৬৩
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—	১৫ লক্ষ ৬ হাজার	৩৭ লক্ষ ১০ হাজার
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—	১৫০০০	৩৫,৬৭৮
কলেজের সংখ্যা—	৫৫	১৩৬
কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—	৩৮,১৪০	১,৩৩,৫৯২
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা—	১	৭

॥ স্বাস্থ্য ॥

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্‌পেন্সারি, ক্লিনিক প্রভৃতি চিকিৎসা-সংস্থা—	১,২০১	২,০৮১
রোগীশয্যার সংখ্যা—	১৭,৫৪৯	৩২,৫১০

॥ সড়ক—উন্নয়ন ॥

১৯৪৭-৪৮ সালে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (জাতীয় সড়ক ও রাজ্য-সড়ক সহ)—	১,১২০ মাইল
১৯৬৬ সালের সম্ভাবিত দৈর্ঘ্য—	৩,৭৪০ মাইল

॥ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ ॥

প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ—	৩৪৬ মেগাওয়াট
১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদিত শক্তি—	৫৫৪ মেগাওয়াট

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ভারতের-ই অগ্রগতি

এই সংখ্যায়

এই প্রথম—

অপরাজেয়—সাধনা সেন ১৭২

গুপ্তচর কাহিনী—

কর্ণেল পিটোর অব্যর্থ জেরা—সুপর্ণ রায় ১৭৮

মেয়ে মজলিশ—

আপনাকে যা মানায়—আভা পাকড়াশী ১৮৪

খাদ্যে ভিটামিন—শ্রীরূপা রায় ১৮৬

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ১৮৮

স্মৃতি দোলায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৫

সম্রাটের নির্বাসন (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)—বহুরূপী ২০২

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

পরিকল্পনার জন্যই স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শুধু একমাত্র রাজনীতির লক্ষ্যই নয়, এর মানে হচ্ছে আমরা যেভাবে বাঁচতে চাই তার জন্য স্বাধীনতা, আমাদের দারিদ্রের উন্নতি সাধন করা এবং নিষ্ফলতাকে সফল করা।

দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্রে বহুমূল্য আদর্শ আছে। এরই অনুধাবন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লোকের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান প্রয়োগ করা ও সফল করতে সক্ষম করার সাহায্য করেছে।

শেষের তিনটি পরিকল্পনা আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে—খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে টাটকা সব্জীর ফলন বাড়িয়েছে, শিল্পের উৎপাদন তিন গুণ বর্দ্ধিত করেছে ; পাঁচ গুণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত পর্য্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি বর্দ্ধিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে (৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে) ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত তাদের হার ছিল শতকরা ৪০% এখন তা শতকরা ৮০% তে পৌঁছেছে। উন্নততর চিকিৎসা বিধান এবং রোগের বিরুদ্ধে আক্রমনের ফলে দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ কমেছে এবং মানুষের আয়ু ৩২ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি বেড়েছে।

পরিকল্পনা মানেই অগ্রগতি

এর জন্য কাজ করুন ও সফল করুন

DA 65/219 Bengali

এই সংখ্যায়

শুভবিবাহ (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১০২
কোম্পানী আমলের কাহিনী—অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১১৫
চিত্র বিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ ১১৭
এতটুকু আশা—শক্তিপদ রাজগুরু ১১৩
বিচিত্রা— ১৩০
আন্দমান-সেলুলার জেল—প্রতিভা গুপ্ত ১৩৩

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের
ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো
ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা ৬
ফোন : ৫৫-১৮৫১

শাখা
২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

৫,৬,হেয়ার ষ্ট্রীট.
ফোন ১৩-১৮৯১
১৪,হেয়ার ষ্ট্রীট
(মহিলা বিভাগ)

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৩ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

হলা পিয় সহি—

হলা পিয় সহি

তালতমালের তপোবনে নয়,

কুলশয্যার আদরে আহ্লাদে নয়

—গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ কলকাতার বরবর্ণিনী শকুন্তলা আজও

'হলা পিয় সহি।' 'হলা পিয় সহি।' বলে

সাঙ্গিনীদের কণ্ঠস্বরে সৌন্দর্যের বরণডালায়

আজ তার না হলেই নয়

বোরোলীন ক্রীম

সকল কাজে সবার সাথে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস,– কলিকাতা-৩

আপনার জন্য মাসিক একটা পেন্সন

ধরুন আগামী ১০ বছরের জন্য প্রত্যেক মাসে আপনি একটি করে ১০ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম প্রচলন) কিনলেন। তা হলে ১০ বছর পর প্রত্যেক মাসে আপনার একটি ক'রে সার্টিফিকেটের মেয়াদ পূর্ণ হবে এবং তাতে প্রত্যেক মাসে ১৮০ টাকা ক'রে পাবেন। আপনার বার্দ্ধক্যে এই মাসিক আয় আপনার কাছে একটা বর হয়ে দাঁড়াবে কারণ এতে আপনি নিয়মিতভাবে পেন্সনের মতো টাকা পাবেন।

আপনি যদি চান তাহলে সার্টিফিকেটগুলির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মুদ্দা রেখে দিয়ে আপনার আসল মূলধন ১০০ টাকা আবার জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে লগ্নি করতে পারেন। এতে ক'রে যে তারিখে আপনি আবার সার্টিফিকেট কিনলেন তখন থেকে দশ বছরের জন্য আপনার বা আপনার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য একটা সুনিশ্চিত আয় হয়ে থাকবে।

লগ্নি হিসেবেও এগুলি খুব ভালো। কারণ এতে বার্ষিক শতকরা ৮টাকা সুদ অথবা বার্ষিক শতকরা ৬.০৫ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ পাওয়া যায়, আপনি যদি আয়কর দেন তাহলেই শুধু আপনার কর দিতে হবে নচেৎ নয়।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA-65/146 Beng.

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex-Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে একপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

পাইওনীয়ার

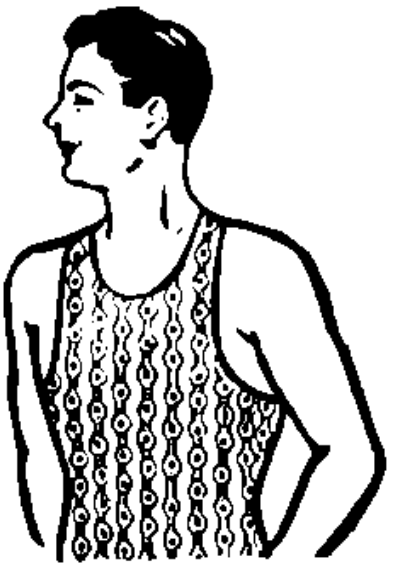

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী : গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেস সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে মেয়েদের—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম সংস্করণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেতুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রয়িৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বাণীমন্দির মিসিলেনি—গড়িয়াহাট অংশেন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশবন্ধু—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ডায়রাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ডায়রাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; জ্ঞানদাস ডায়রাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

ভজরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রাধাগোবিন্দ কুন্দমল; রাধালক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরধাবত্ত, গাঙ্গালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; জ্যানকাট হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল কাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ ধরারাম ঝেন্ত্রী; জয়রুক অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, পরশুরাম দে, তোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৪৬-২৯৮৩

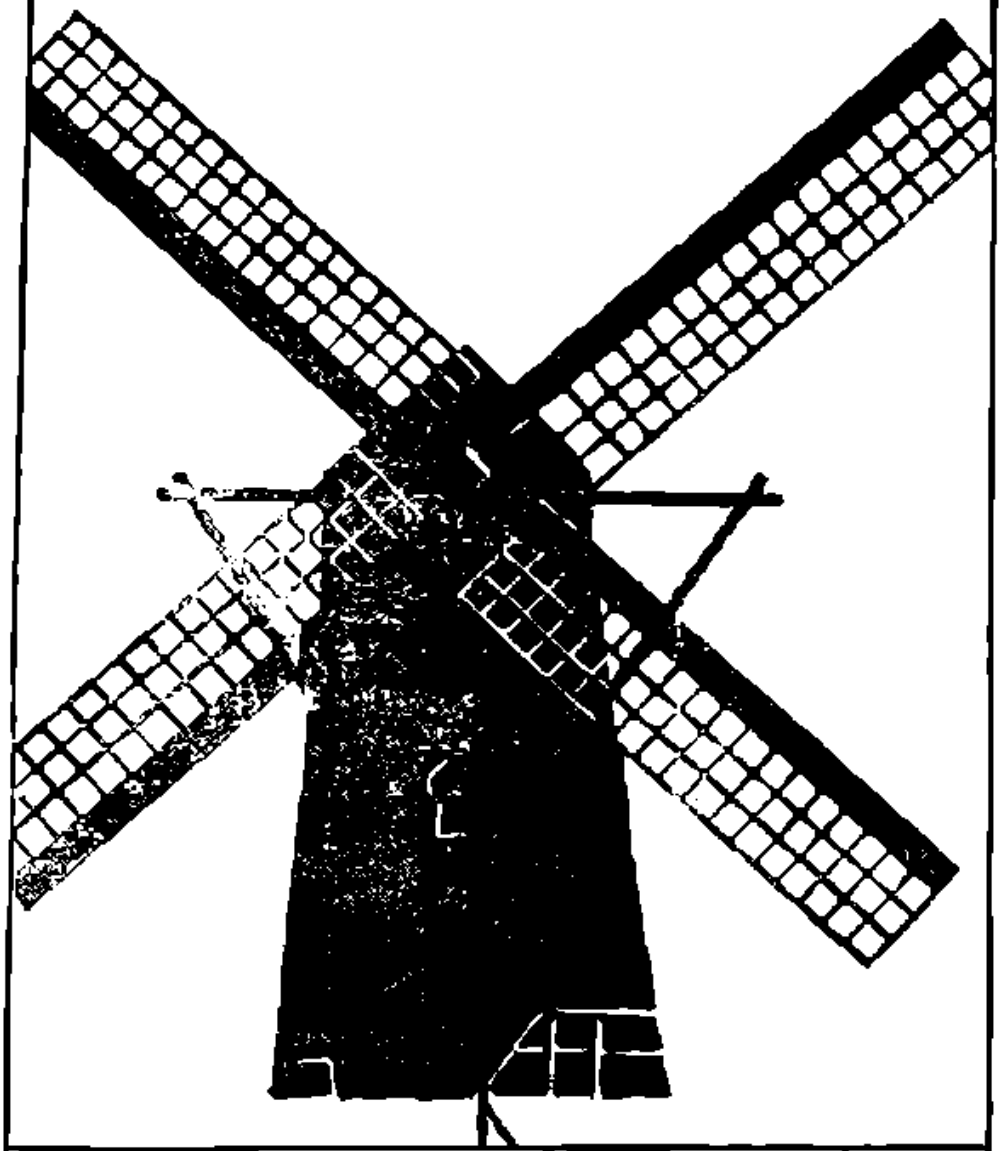

হল্যাণ্ড ১৯৬৪ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ১০৭,০০০ জোড়া
জুতো কিনেছেন
Bata

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

॥ কথা প্রসঙ্গে ॥

কোন পথে ?

স্বাধীনতার অষ্টাদশ বার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে কয়েকটি চিন্তা একান্তভাবে আমাদের সমাজ, জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আলোড়িত করে তুলেছে। উৎসবের মেকী ঢক্কা নিনাদের অন্তরালে জাতীয় জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনীয় চিন্তাধারা আজ আর কোন গুরুত্ব পাচ্ছে না। ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে—রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্যনীতি জীবনের সর্বদিকেই বিশৃঙ্খলা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এবং আমাদের সবরকম ভাবে বিব্রান্ত করে তুলেছে। ন্যায়ের বদলে অন্যায়, সত্যের বদলে অসত্য, আচারের বদলে অনাচার—এরাই আজ আমাদের চলমান জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করে তাই আমরা ফাঁকা আওয়াজের পেছনে ছুটছি। স্বাধীনতার আঠার বছর পরেও আমরা এই ফাঁকির—এই ফাঁকা আওয়াজের পথ থেকে সরে আসিনি। সবচেয়ে দুঃখের কথা আজকের দিনে, যে আত্মচিন্তা, যে আত্মসমীক্ষার একান্ত প্রয়োজন—সেই নিজেকে জানা "Know thyself" এর বদলে অন্যকে জানা—অন্যকে অন্ধ অনুসরণের ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন প্রাপ্তির ক্রমসাধনায়ই আমরা নিজেদের নিয়োজিত করছি।

আজ স্বার্থত্যাগের বদলে স্বার্থপোষণের—আত্মত্যাগের বদলে আত্মসংরক্ষণের বিভ্রান্তিকর অপচেষ্টাই আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে লজ্জার, সবচেয়ে ক্ষোভের কথা—এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নেই। বরং পরস্পরকে দোষারোপ করে আত্মঘোষ আলেনের ছেলেমানুষিতে আমরা মত্ত—আত্মসমীক্ষার বদলে আত্মতোষণই আজ আমাদের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শত শহীদের রক্তধারা ভারতবর্ষে তাই আজ আমরা বিশৃঙ্খলা অন্যায় ও অনাচারের অবাধ ক্রমবিকাশ দেখতে পাচ্ছি। জাতিকে বাঁচাবার দায়িত্বের বদলে নিজেকে, গোষ্ঠীকে বাঁচাবার কর্তব্যই আজ আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মরক্ষার পরিবর্তে তাই আত্মহননের পথেই আমরা সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে চলেছি। দেশের ও সমাজের সর্বত্র যে ক্লেদ, যে অন্যায়, যে বিভ্রান্তি তার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত মেরুদণ্ডও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। স্বাধীনতার আঠার বছর পরেও স্বাধীনতার যথার্থরূপ ও বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র চেতনা বা উপলব্ধি হয়নি। ইতিহাসের এক চরম দুর্দিনে আমরা পরম কর্তব্য থেকে, জাতীয় দায়িত্ব থেকে নিজেদের সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। এই এড়িয়ে চলবার, এই নিজেকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কিন্তু কোন কার্যকরী প্রতিরোধ নেই। দৈনন্দিন চায়ের আসরে, রকের মজলিশে, আমরা শুধু ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে চলেছি। দায়িত্বহীনতা আমাদের আজ প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেতৃত্বহীন জাতির মত আমরা পরিকল্পনার নামে পিছিয়ে চলেছি জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

জাতিগঠনের ও দেশপ্রেমের সাধনার পরিবর্তে অর্থ ও কৌলীন্য লাভের সাময়িক মোহে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে আমরা সর্বস্ব হারিয়ে বসেছি।

সংবাদপত্র যা নাকি দেশের চিন্তাধারার ধারক ও বাহক তা আজ গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থরক্ষক হিসাবে নির্লজ্জ ভাবে জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে চলেছে। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা আজ উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

নিজেকে মারবার ও দেশকে ডোবাবার সাধনায়ই আমরা নিমগ্ন। এই অভ্যাসের বিপদ সম্পর্কে আজ আমাদের অবহিত হতে হবে। এগিয়ে চলার যেকোন অভিযানকে রুদ্ধ করতে হবে। অন্যায়কে বাধা দিয়ে ন্যায়কে অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি এভাবে এগোতে না পারি তবে স্বাধীনতা উৎসবের সফল গ্রহণের কোন অধিকারই আমাদের নেই।

পাঠক পাঠিকার কলম

(মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন্)

সবিনয় নিবেদন,

গত কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ৪০তম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার মেয়র যখন তাঁর মূর্তিতে মালা পরাচ্ছিলেন তখন বোধ করি তাঁর সেই ধাতুমূর্তিও ক্ষোভে কাঁপছিল এবং সেই মূর্তির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। অদূরে তাঁর নামাঙ্কিত সরণীর প্রান্তে যে পৌরসভা ভবন তাঁরই পরিকল্পনায় একদা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তার ভিতরকার কাণ্ডকারখানা দেখে আজ বোধকরি তাঁর আত্মা ক্ষোভে, লজ্জায়, ধিক্কারে উদ্বেলিত হচ্ছে। শহরের সমাজকর্মী, লেখকর্মী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বলে যাঁদের মনে করেছি, তাঁদের ভোট দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পৌরসভায় পাঠিয়েছি। কিন্তু গত ৫ই আগষ্ট পৌরসভা ভবনে তাঁরা যে কীর্তি করেছেন তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ভদ্রসমাজের মানুষরা যে এরকম আচরণ করতে পারেন তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। ঐদিনকার সভায় পৌরপিতারা পরস্পরকে অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি করেছেন, ঘুষি মেরেছেন, নাকমুখ খিমচে দিয়েছেন এবং লাথি মেরেছেন। তাঁদের এই আচরণে একটি পত্রিকায় "শহরের পাপ" এই শিরোনামায় মন্তব্য করা হয়েছে—"বাহিরে যারা গটকা ছোড়ে, বোমা ফাটায়, ইট পাটকেল বৃষ্টি করে তাহারা না হয় সমাজ বিরোধী জীব, কিন্তু এইসব সমাজপতিরা তাহাদের সঙ্গে নিজেদের আকৃতি প্রকৃতির কোনো তফাৎ আছে বলিয়া মনে করিতে পারেন কি ?"

আর একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে—"গত বৃহস্পতিবার কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক বৈঠকে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের দুর্নামের রেকর্ডে আর একটা কালি লিপ্ত হলো।...উভয় পক্ষই গলার জোরে এবং গায়ের জোরে কাজ হাসিল করতে চায়। গালাগালি ও হাতাহাতি তো এঁদের অঙ্গভূত হয়ে গেছে। এতে সামাজিক উত্তেজনা ও বিরোধকেই আমিষে তোলা হচ্ছে। অগ্রজদের কাণ্ডকারখানা দেখে তরুণরা শিখছে।" একটি ইংরাজি দৈনিকে খবরটি এইভাবে ছাপা হয়েছে—Blows, kicks in civic meet. A councillor was seen kicking another. Fists were freely exchanged. Members were seen grappling with one another···বাংলা পত্রিকার পড়লাম তার সারমর্ম এইরকম—দুদলের মধ্যে গালাগালি আরম্ভ হয়ে গেল···ডেপুটি মেয়র অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করে বাইরে পা বাড়াতেই একজন বিরোধী সদস্য তাঁকে জাপ্টে ধরলেন, যাচ্ছেন কোথায় ? আমাদের বক্তব্য শুনে যান···ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল···একজন চেঁচালেন, আমাকে ঘুঁষি মারছেন··· অন্যজন চেঁচালেন ডেপুটি মেয়রকে মারতে আসছে ওরা···তারপরেই হুলস্থুল বেধে গেল···একজন বিরোধী পক্ষ চেঁচালেন, লাথি মারছে···লাথি মারলে ছুতো পেটা করব···ইত্যাদি। বাংলা সংবাদগুলো না হয় আমরা বাঙালীরা পড়ছি কিন্তু ইংরাজি কাগজগুলিতে কলাও করে এই জঘন্য

ইতরজনোচিত কাণ্ডের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা অন্ধ্রদেশের লোকেরা পড়বে, বিদেশীরাও পড়বে। এবং শুধু পড়বেই না, এই নিয়ে নানা রাজ্যের ও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় নানারকম বিরূপ এবং বিরূপ মন্তব্য ছাপা হবে। একেই তো কলকাতার প্রতি তথা বাঙালীর প্রতি অন্য রাজ্যের এবং বিদেশের মানুষরা খুশি নয়, তার ওপর এই ব্যাপার ঘটাতে কলকাতাকে এবং বাঙালীজাতকে আর একহাত নেবার সুযোগ তারা ছাড়বে না। পৌরসভ্যরা কলকাতার মুখে তথা বাঙালী জাতির মুখে চুণকালি লেপন করলেন। তাঁদের কীর্তি নতুন নয়। কিন্তু তাঁদের জন্যে আর কত কলঙ্ক আমরা মাথব। সহ্যের সীমা পার হয়েছে। অবিলম্বে এই কলঙ্কিত অবস্থার অবসান চাই। এ বিষয়ে রাজ্যসরকারকে অবহিত হতে অনুরোধ করছি। এই সম্পর্কে এখানকার একটি ইংরাজি দৈনিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এই পত্র শেষ করলাম। "What can not be mended should better be ended and this tragic farce of popular rule in Calcutta's civic body must now be terminated."

নমস্কারান্তে ইতি,— যমুনা মুখোপাধ্যায়

২৩৫, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৩৫

সবিনয় নিবেদন,

আজকাল সিনেমা নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক বাদানুবাদ অনেকদিন ধরেই চলছে। কিন্তু সিনেমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কি ছিল সেকথা কেউ বলতে পারে না। ১৯২৯ সালের ২৬শে নবেম্বর তারিখে লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে তিনি সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। আপনার পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করে দিলাম। চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ইতি— দেবজ্যোতি সরকার

৩৪, এলগিন রোড, কলিকাতা।

কল্যাণীয়েষু—

উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা কলা-বিদ্যার লক্ষ্য—নইলে তার আত্মমর্যাদার অভাবে আত্ম-প্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনও পর্য্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে। তার কারণ কোনও রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।

করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়। ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিষটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য সাঙ্গ করতে পারে তেমনি রূপের চলপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উদ্ভাসিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার অভাবে—এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়, তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ভোরে। ইতি— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ সম্বন্ধে কারও যদি কিছু বলবার থাকে আমাদের লিখে জানালে আমরা তা প্রকাশ করব।

—সম্পাদক

অবেক্ষণ

বর্ণ বিদ্বেষ

মার্কিণ সিনেটের দু'জন সদস্য। একজন আর একজনকে—"এবার এমন ভাবে ভোট দেব—যাতে ১০০ বছরের মধ্যেও নিগ্রোরা ভোটাধিকার না পায়।"

অবসরে

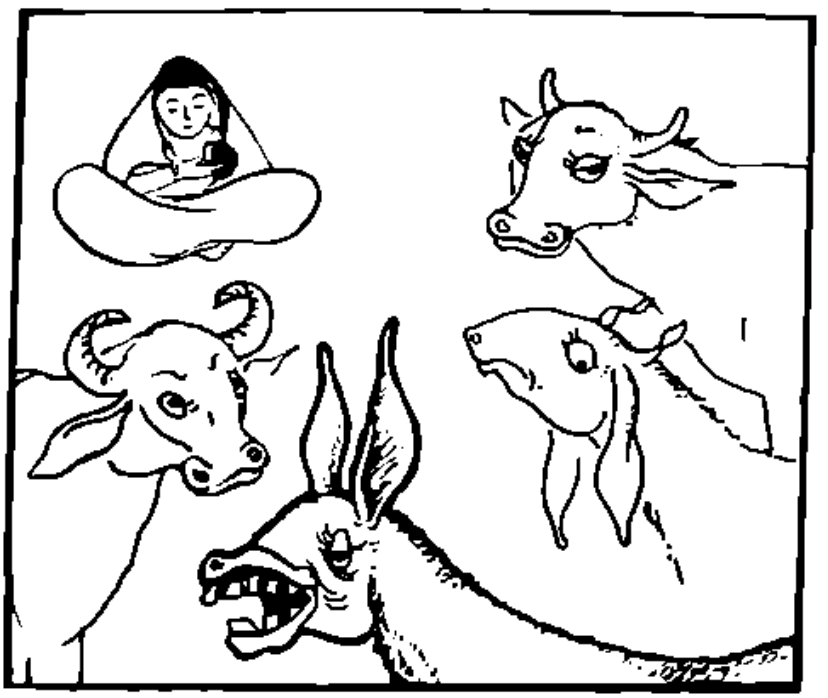

পশ্চিম বঙ্গে
দুধের ক্রমবিকাশ

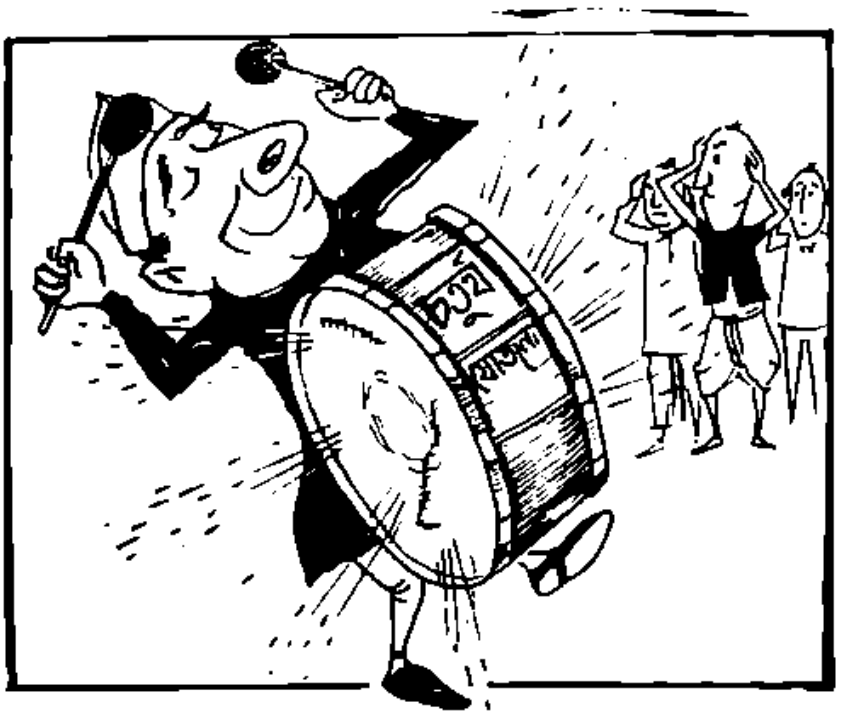

চতুর্থ পরিকল্পনার
বোধনবাদ্য

চলতি দুনিয়া

ইংরেজী সাহিত্য কয়েকটি কারণে প্যারিসের প্রকাশকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। অশ্লীল বিবেচনা ক'রে যে-সব বই ব্রিটেন আর আমেরিকা ছাপতে অস্বীকার করেছে, প্যারিস আগ্রহের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছে। এই বইগুলোর ভেতরে পড়ে: জেমস জয়েস-এর ইউলিসিস, ডি এইচ. লরেন্স-এর লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার, হেনরী মিলার-এর ট্রপিক্স এবং ভ্লাডিমির নবোকোভ-এর ললিতা। এমন কি হিন্দু কামশাস্ত্র আর সাদ-এর সোডোমির ১২০ দিন তারা তৎপরতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে। এখন কিন্তু হাওয়া বদলে গেছে। 'আপত্তিকর' বই-পত্র এখন আমেরিকার বন্দরেও পাওয়া যাচ্ছে, প্যারিস আজকাল একটু নীতিবাগীশ হ'য়ে পড়েছে।

• • •

আফ্রিকার সব চাইতে ভালো হোটেল না মেসেরেল। ওখানকার বাংলোতে ছুবেলা খাওয়া আর থাকার খরচ প্রতিদিন লাগে ৪০ শিলিং। মরক্কোর সব চাইতে বিখ্যাত হোটেল মেমুনিয়া। হোটেলের ভেতরে একটা সুইমিং পুল পর্যন্ত আছে। চার্চিল এই হোটেলে কিছুদিন কাটিয়েছেন, এঁকেছেন হোটেল-সংলগ্ন বাগানের ছবি। —লাইফ

লাবণ্যে ভারতীয় নারীদের জুড়ি নেই। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তারা ত্বকের উপযুক্ত যত্ন নেন না—বলেছেন মিসেস অজিত গার্কল। মিসেস গার্কল একটি বিউটি ক্লিনিক আর ইলেকট্রোলাইসিস সেন্টার খুলেছেন নিউ দিল্লীতে। তার আগে সৌন্দর্য কলার ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন বিলেত থেকে। আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার মেয়েদের কাছে বক্তৃতা করেছেন ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে। তাঁর দিল্লী ক্লিনিকে সৌন্দর্য-চর্চার আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। দেহের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর ক'রে কী করে সুন্দর হওয়া যায় এ-বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য নিতে প্রতিদিনই তাঁর ক্লিনিকে ভিড় করে বিপুল সংখ্যক মেয়েরা। ক্লিনিকের প্রতিটি বিভাগ নিজে দেখা-শুনো করেন মিসেস গার্কল।

মিসেস গার্কল নিজেও অসামান্যা সুন্দরী। মনে হয় কোনো ভাস্কর পাথর কুঁদে তার মুখখানা তৈরি করেছেন। চমৎকার গায়ের রং। রুচি আর লাবণ্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁকে মনে হয় স্বর্গ-কন্যার মতো।

—ইভস্ উইকলি

জীবনটাই নৃত্য আর নৃত্যই জীবন। আফ্রিকার অধিবাসীদের আত্মপ্রকাশ নৃত্যে। ভাষায় যা বলা যায় না তা-ও তারা প্রকাশ করে নাচের ছন্দে। পূজা করার সময়ও ওদের নাচতে হয় কারণ নাচই পূজা। সেইজন্য, আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে গাইতেও শেখে। সেই নাচের ছন্দ থেকে যায় সারাজীবন। সব কিছু চলে নৃত্যের তালে তালে। ধর্মাচরণ, প্রেম, ধ্যান-ধারণা—প্রতিটি বিষয়ে ছন্দ, নাচের ছন্দ। —ব্যালা

১৬ বছরের মেয়েটি নরহত্যার দায় থেকে মুক্তি পেলো। মৃতের একখানা চিঠি হঠাৎ পাওয়া গেল। সেই চিঠি থেকে জানা গেলো সে আত্মহত্যা করেছে। মারা যাওয়ার কয়েকঘণ্টা আগে লিখে রেখে যান তিরিশ বছর বয়স্ক শিক্ষক জন ডাউনি। তাঁকে হত্যা করেছে সন্দেহ করে স্কুলের মেয়ে লিওনে রিগসকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন পরে আবিষ্কৃত চিঠিটা পড়ছিলেন, আর মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

* * *

রূপসী অভিনেত্রী আগ্নেস লোভেলের বাড়ি লণ্ডনের নদী অঞ্চলে। পারলে সারাদিনই তিনি থাকতে চান টেমস্ নদীর ধারে। খোলামেলা নদীতীরের প্রতি তার এমনই আসক্তি। এর ফলে তাকে ঝামেলা কম পোয়াতে হয় না। তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে নাবিকেরা, আর পাগল পাগল দীর্ঘ প্রেমপত্র পাঠায়। —মিরর

এক হোটেলের বিত্তবান মালিকের ২৯ বছর বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রী হঠাৎ হাওয়া। তরুণী যাবার সময় স্বামী জোসেফকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। তাতে লিখেছেন, পাঁচ আর ছ বছরের ছেলে দুটির যত্ন নিতে। সেইসঙ্গে একজন স্টোর অ্যাসিসটেন্টকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

* * *

ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই পড়বো না

বিলাতে 'ক্রিস্টোফার হোয়াইট হেড' স্কুলের ছ'শো মেয়ে সমস্বরে জানিয়েছে, তারা ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই পড়তে রাজী নয়। তাদের স্কুলে সহশিক্ষা চালু করার প্রস্তাব এসেছিলো। মেয়েরা ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তারা জানিয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে একই শ্রেণী-কক্ষে পড়তে গেলে তাদের মন পড়াশুনোর চাইতে অন্যদিকেই বেশি ঝুঁকবে। ফলে স্কুলের সুনাম নষ্ট হবে। স্কুলের শিক্ষিকারাও মেয়েদের সমর্থন করেছেন। নৈতিক অবনতির আশংকা ওই স্কুলের মেয়েদের মনে এমন ভয়ংকর ভাবে দেখা দিয়েছে যে সহ-শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার জন্য মেয়েরা একটা প্রতিরোধ কমিটি পর্যন্ত গড়ে ফেলেছে। এবং প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়েছে স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকাও পরিচালক সমিতির সদস্যদের কাছে। —ডেইলী মিরর

বুড়ো তারা কিছুতেই হবেন না

রুমানিয়ার উত্তর অংশের এক অখ্যাত গ্রামে পেন্সন ভোগীদের আসর বসে প্রতিদিন। ওই আসরের বক্তব্যই হলো তাই। অবসর নেবার পরেও ওই সব পেন্সনভোগী বুড়োরা আশ্চর্য কর্মঠ, আনন্দদীপ্ত। ওই গ্রামে গড়ে উঠেছে অবসর-প্রাপ্ত মানুষদের নিজস্ব সংগঠন। তা ব'লে ওরা জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ নন। জীবনের অপরাহ্ণ বেলাতেও ওরা জয়গান করছেন প্রভাত আলোর। এককে ওদের দেখলে মনে হয় চির-হরিৎ বন। তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ, আশা ছোড়া কিছুরই অভাব ওদের নেই। আগে যিনি কাজ করতেন খনিতে, তিনি এখন বিচিত্র ফলের গাছ-পালায় রমণীয় ক'রে তুলেছেন তাঁর উদ্যান। সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে এই বৃদ্ধরা দিন রাত মহানন্দিতে কাটাচ্ছেন। —রুমানিয়া

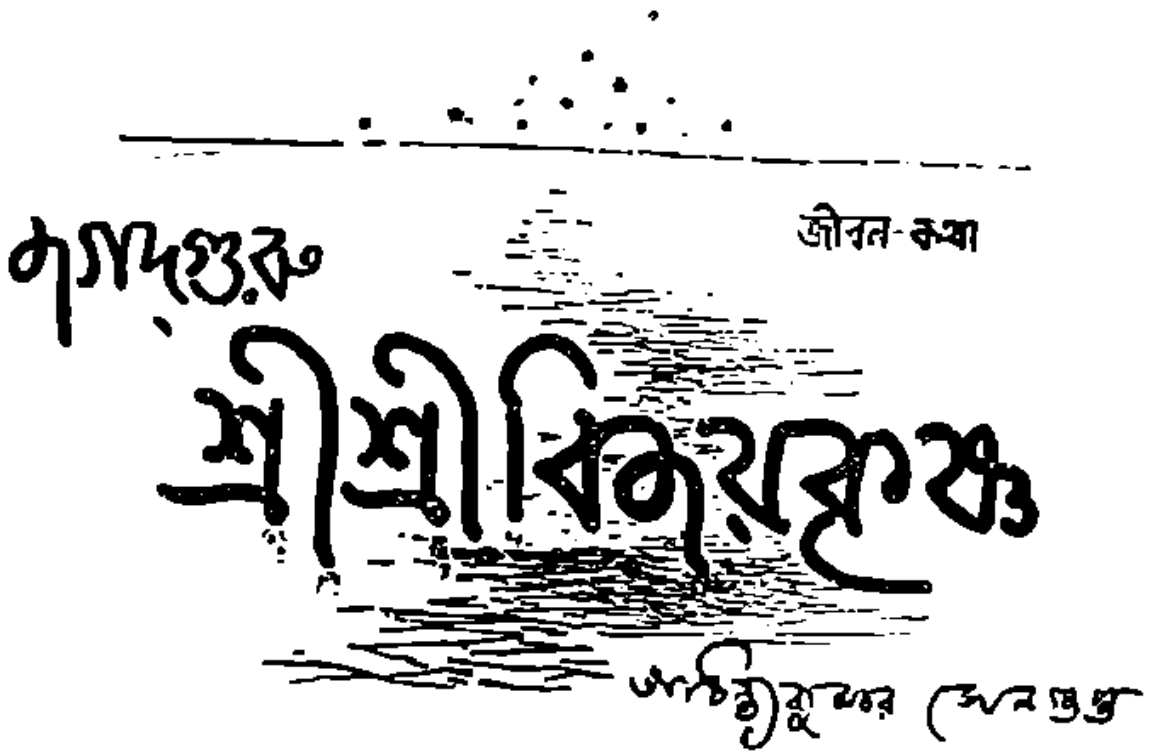

৩৩

গঙ্গাপথে নৌকো করে গোঁসাই প্রভু শান্তিপুরে এলেন। নিজগৃহে, শ্যামসুন্দরের আলয়ে এসে উঠলেন। যে শান্তিপুর একদিন নির্যাতনের একশেষ করেছিল, আজ বরণডালা সাজিয়ে আনল। মুক্তকণ্ঠে জয় দিল সকলে। সজ্জন সুহৃদ গোস্বামীদের সম্মান দিলেন, মাতব্বরীয়াদের পা ধুয়ে দিলেন স্বহস্তে।

শ্রীমূর্তিখানি দেখ! দেখলেই মন-প্রাণ ভক্তিতে ভরে ওঠে।

এই আমার শ্যামসুন্দর। প্রণাম করলেন গোঁসাই। বললেন, কত খেলাই খেলল আমার সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করছি, হঠাৎ চোখের সামনে এসে হাজির হত, বলত, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো তো। আমি বলতাম, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বিশ্বাস করি না। শ্যামসুন্দর ছাড়ত না, আবার আসত, আবার কৃষ্ণনাম শুরু করত। শেষে একদিন নরীহা হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তবে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনলে কেন? শ্যামসুন্দর বললে, আবার তোকে ভেঙে গড়ব বলে। ভেঙে গড়লেই জিনিস সুন্দরের চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

চৈত্রমাসের নগরকীর্তন করে গোঁসাই প্রভুকে নিয়ে গেল বাবলায়। শোনা গেল আবার সেই অপ্রাকৃত কীর্তন। গৌরহরি এখানে যে সপার্ষদ কীর্তন করেছিলেন তাই যেন প্রকৃতিতে রেকর্ড হয়ে আছে, গোঁসাইয়ের মত শক্তিশালী সাউন্ড-বক্স পাওয়া যেতেই ভক্তবৃন্দের একাগ্রতায় সিন-এ লেগে বেজে উঠেছে। কোনো শব্দই হারিয়ে যায়নি। কার্যকারণের যথার্থ সংযোগ হলেই শুনতে পাবে সে উজ্জীবিত হরিনাম।

অদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান কোথায়?

সকলে ইতস্তত খুঁজছেন, বিচার করে দেখছেন, কিন্তু একমত হতে পারছেন না। কোথাকার একটা কুকুর কখন থেকে সঙ্গ ধরেছে, কিছুতেই ফিরে যাচ্ছে না, সে হঠাৎ একটা অচিহ্নিত জায়গা আঁচড়াতে সুরু করল। এ কী আচরণ! জায়গাটা খোঁড়ো তো, গোঁসাইপ্রভু আদেশ করলেন। খুঁড়ে মাটির নিচে একখানা খড়ম, পঞ্চপাত্র ও একটি পেতলের হাঁড়ি পাওয়া গেল। এ সমস্তই অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবহৃত জিনিস। সুতরাং, সন্দেহ নেই, এ আঁচড়কাটা জায়গাই তাঁর ভজনস্থান।

কিন্তু কুক্কুরবেশে এ কে দেখা দিল?

গোঁসাইজি বললেন, 'পূর্বজন্মে সাধক ছিলেন, সাধনাভ্রষ্ট হয়ে কুকুর হয়ে জন্মেছেন কিন্তু ভয় নেই, শিগগিরই এ দেহ ছেড়ে দেবেন।'

পরদিন সকলে দেখল দেহের অর্ধাংশ গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে তীরে মরে পড়ে আছে কুকুর।

তারপর কলকাতায় এলেন গোঁসাই। উঠলেন সুকিয়া স্ট্রিটে রাখাল রায়ের বাড়িতে। প্রয়াগে পতিপুত্রে ছিল, বাবার সঙ্গে দেখা করতে চলে এল প্রেমসখী। এলেই ঘরে পড়ল। সে ঘর আর ছাড়ল না।

প্রেমসখীর মুক্তা আসর, পাশের ঘরে গোস্বামীপ্রভু যেমন রোজ করেন, তেমনি পাঠ করে চলেছেন। কান্নার রোল উঠেছে তবু অর্ধপথে পাঠ থামালেন না। পাঠ শেষ করে যখন কন্যার ঘরে এলেন, তখন সামান্য কটা নিশ্বাসই আর বাকি আছে। বললেন, কীর্তন সুরু করো। কীর্তন সুরু হতেই গৌরাই নাচতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে প্রেমসখীর মাথায় ডান পা রেখে দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। একটা পবিত্র বিভায় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

'তুমি কী নিষ্ঠুর!' প্রেমসখীর দিদিমা, গোঁসাইজীর শাশুড়ি কেঁদে উঠলেন: 'মেয়েটা মরে যাচ্ছে আর তুমি নাচছ? তুমি আনন্দ করার আর সময় পেলে না?'

গোস্বামীপ্রভু বললেন, 'আমি যে দেখছি কুকুর মা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহচরীরা, তাঁরা যে কুকুকে কোলে করে নিত্যধামে নিয়ে যাচ্ছেন—এ দেখে আমি কাঁদব, না, নৃত্য করব?'

সমস্ত শোক শান্ত হয়ে গেল। মা এসে নিয়ে গেলেন মেয়েকে রাধাগোবিন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিতে, এর পরে কার কী কথা?

রাখাল রায়ের খুব ইচ্ছে প্রভুর একখানা মূর্তি তৈরি করে রাখেন। সেই উদ্দেশে কৃষ্ণনগরের এক কুম্ভকারকে ডেকে এনেছেন। সরাসরি সামনে বসে গড়তে গেলে প্রভু বিরক্ত হবেন অনুমান করে কুম্ভকারকে বলেছেন গোপনে সম্পূর্ণ করতে। কী, পারবে তো? দক্ষ কুম্ভকার একবাক্যে স্বীকার গেল—পারব। প্রভুকে এক নজর দেখলেই মূর্তি মনের মধ্যে বসে যায় হাত কেটে। আপনি ভাববেন না, গোপনে থেকেই নির্মাণ করে দেবো আপনাকে।

প্রভুর কাছে গোপন কিছুই নেই। তিনি রাখালকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'মূর্তি কদ্দুর হয়েছে?'

রাখাল অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'প্রায় সম্পূর্ণ।'

'মূর্তি ভেঙে ফেল।'

রাখাল হয়তো ভাবল মূর্তি অবিকল হয়নি বা কারিগর কুশলী নয়, প্রভু তারই ইঙ্গিত

করছেন। তাই বললে, 'মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। একেবারে আপনার প্রতিরূপ। আপনি একবার দেখবেন আসুন।'

'না, আমি দেখব না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি মূর্তি ভেঙে ফেল।'

'ভেঙে ফেলব?' মর্মাহতের মত বললে রাখাল।

'হ্যাঁ, ভেঙে ফেলবে! এ নশ্বর দেহ কিসের গৌরব করে, কিসের অহঙ্কার? কীটের চেয়েও নীচ, ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন তাকে কে চায় পাথরে ধরে রাখতে? ওসব কপটতা ছাড়ো, মূর্তি গুঁড়ো করে দাও।'

দেহই যখন ধুলো হয়ে যাবে তখন মূর্তিও ধুলো হোক। কুম্ভকার মূর্তি ভেঙে ফেলল।

'অভিমান যাবে কিসে?' গোঁসাইজিকে শিষ্যভক্ত জিজ্ঞেস করলে।

'অভিমান যাওয়া কি সহজ কথা?' বললেন গোঁসাইজী, 'একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমানের মোচন নেই। তবু, অভিমান তাড়াবার জন্যে সাধন দরকার। সকলের চেয়ে নিজেকে হীন বলে জানতে হয়, জানতে হয় কাঙাল বলে। মুটে মজুর এমন কি অন্ত্যজ ইতর জনও আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই অকপট শ্রদ্ধাভক্তি রাখতে হয় মনের মধ্যে। সকলের কাছেই মাথা নত করে থাকতে হয়। তা হলেই যদি শাসন হয় অভিমানের।'

'বড় কঠিন শাসন।'

'নিশ্চয়। ধর্ম বিষয়ে অভিমান তো সব চেয়ে খারাপ। সামান্য ধর্ম-অভিমানে কত যোগী-ঋষির পতন হয়েছে।'

'আমাদের তাহলে কী হবে?'

'একটা সাধারণ সহজ উপায় বলে দি।'

'কী?' শিষ্যভক্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে পড়ে থাকো। আর নির্জনে চলে যাও। লোকালয়ে থাকলেই অভিমানের কারণ এসে দেখা দেয়। পাহাড়-পর্বতে থাকতে পারলেই শান্তি।'

'কিন্তু খাওয়া জুটবে কী করে?'

'আমি এই আহারের জন্যেই আবার লোকালয়ে ফিরতে হয়। এক আহার চিন্তাতেই সাধন নষ্ট। তাই সব প্রথমে আহার সংযম করতে হয়, পরে ধীরে ধীরে আহারত্যাগ। প্রথমে ডালভাত তরকারি, তারপরে শুধু ডালভাত বা তরকারি-ভাত, তারপরে সেদ্ধ ভাত। তারপরে জল ভাত। তারপরে নুন ত্যাগ। নুন ত্যাগ হলে জল ভাতের সঙ্গে ফল। শেষে ভাত ফেলে দিয়ে শুধু জল ফল। তারপরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে নিমপাতা ও বেলপাতা ধরবে। তারপরে শুধু জল আর পাতা। মিষ্টি কখাচ নয়। মিষ্টি বলতে শুধু ফলের মিষ্টি। আসল ব্রহ্ম কী জানো? আসল ব্রহ্ম হচ্ছে দীর্ঘধারণ। যার দীর্ঘ আছে তার অত্ত অভিমানে কী দরকার?'

সুকিয়া ষ্ট্রিট ছেড়ে গোঁসাইজি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এসে বাসা নিলেন।

'গৌর-নাচা বাবা এখানে আছে?'

আরে এ যে দেখি আমার খ্যাপাচাঁদ। গোস্বামীপ্রভু হাত বাড়িয়ে খ্যাপাচাঁদকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরলেন। তুমি কোত্থেকে এলে?'

সেই প্রয়াগে দেখা হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর থেকেই মনে আকাঙ্ক্ষা আবার সেই গৌর-নাচা বাবাকে দেখে। গোস্বামীপ্রভুর নাম ভুলে গিয়েছে, একমাত্র পরিচয় সংগ্রহ করে রেখেছে, গৌর-নাচা। অর্থাৎ যে গৌরনাম শুনলেই নাচতে সুরু করে। কিন্তু তার ঠিকানাও তো জানা নেই। কোথায় গেলে গৌর-নাচা বাবার সংবাদ পাব?' কিছু দক্ষিণ দিতে পারে ভেবে খ্যাপাচাঁদ পায়ে হেঁটে চলে এসেছে বাঙালাদেশে। গিয়েছে নবদ্বীপে, গিয়েছে শান্তিপুরে—গৌর-নাচাকেই লোকে নিদিষ্ট করতে পারে না, তারপর তার ঠিকানা দেবে!

শেষ পর্যন্ত খ্যাপাচাঁদ কলকাতায় চলে এল। কলকাতা তো আরো জটিল আরো কুটিল। তারা গৌরকেই চেনে না তো গৌর-নাচাকে চিনবে!

তবু, এমন প্রাণের টান, সন্ধান ছাড়ছে না খ্যাপাচাঁদ। যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে। আমার গৌর-নাচা বাবাজী কোথায় আছে বলতে পারো?'

শেষে একদিন রাস্তায় বাঁশীতোষ বাগচীর সঙ্গে দেখা। গোস্বামীপ্রভুর জামাই বাঁশীতোষ।

বুঝতে পারল কাকে চায়। বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

সটান নিয়ে এল কম্বুলিটোলার, গোঁসাইজীর কাছে। আরে এই তো আমার সেই গৌর-নাচা বাবা।

'গোঁসাইজী, হাম তুমহারা হো গিয়া।' খ্যাপাচাঁদ প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল।

'কী যে বলেন, আমিই আপনার হয়ে গিয়েছি।' প্রভু বললেন বিনীত হয়ে।

'নেহি। তু মেরা রামজী হো। তুলার দিয়ে হাম ত্রেতাযুগমে পড় রহা থায়। তিন যুগ হামার তলাস গিয়া। আবতো কৃপা করকে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া। আব হামকো কৃপা কর। হামাকো। তোহার কর লে।

গোস্বামীপ্রভু কাঁদতে লাগলেন।

'মেরা বাত শুন্। হাম তুমহারা মাফিক জটা রাখেছে, মালা-তিলক ধারণ করেছে, আউর সব ভেশমে এহা বাত হাফির করেছে কি, নবদ্বীপমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুয়ে থায়, উনকো ভজন করো।'

প্রেমাশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন প্রভু।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে গোঁসাইজির সঙ্গে রামনাম করতে সুরু করল খ্যাপাচাঁদ। সেদিন তো গলা মিলিয়ে কথা মিশিয়ে গান ধরল রীতিমত।

'চল ভাই তার বিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে তার, রাম বিনে তার কে বা লবে।
পাপে হয়েছি ভারী, আর তো তার সইতে নারি।
বিনা সেই তু-তারধারী, সে বিনে তার আর কে হবে।
দিয়ে তার নিয়ে শরণ, বলব দুটি ধরে চরণ।
এবার যেমন রইলেম তার এমন তার আর দিও না ভবে॥'

কারা ঠোঙায় করে গোঁসাইজির জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছে। বাড়ির বিয়ের হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বললে, প্রভুকে দিয়ে এস। বোলো এক ভক্তবন্ধু পাঠিয়েছে।

গঙ্গাস্নান করে ফিরেছেন, প্রভু ঠোঙা নিলেন হাতে করে। ভক্তবন্ধুর পাঠানো, নিঃসঙ্কোচে খেলেন একটা সন্দেশ। খেয়েই কী হল, প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

খ্যাপাচাঁদ বললে, সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়েছে।

তা হলে কী হবে? কে দিল সন্দেশ? কিনে ধরো। পুলিশ ডাকো।

'ও সব কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না। আমি যোগক্রিয়ায় সারিয়ে দিচ্ছি।' বললে খ্যাপাচাঁদ, খ্যাপাচাঁদের যোগপ্রভাবে বিষশক্তি খর্ব হল, প্রভু বিরাম হয়ে উঠলেন।

কম্বুলিটোলা ছেড়ে চলে এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে।

কিন্তু সেখানে আবার অন্য উপদ্রব। সামনে বাড়ির ভাড়াটের হরিবাসরে আপত্তি। রাত্রেও যদি ওরা হৈই-হই করে নাচে আর চেঁচায় তা হলে বেচারার মনের মেসাটা ঘর হয়ে জমতে পারেনা।

দু বাড়ির একই বাড়িওয়ালা। তাকে ডাকিয়ে সামনের ভাড়াটে বললে, ওদের চেঁচামেচি বন্ধ করে না দিলে তো প্রাণে বাঁচিনা। রাত্রেও যদি কেলেঙ্কারি চালায় তাহলে ঘুমুই কী করে? ওদের থাকতে বলুন, না থামে তো থামিয়ে দিন।

'কেলেঙ্কারি কী মশাই। কীর্তন হচ্ছে। আমার বাড়িঘর পরী শহর ধন্য হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্মীয় আচরণ বন্ধ করে দেব?'

'ধর্ম না ঘুঘু!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল; 'হরি হরি বলে না চেঁচালে ধর্ম হয় না? মনে মনে ইষ্ট নাম জপুক না যত খুশি। পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ করা কেন মশাই?'

'আপনার না পোষায় আপনি অন্য পাড়ায় উঠে যান। আমি কিছু করতে পারব না।' চলে গেল বাড়িওলা।

আচ্ছা, আমি একাই পারব। নিজের মেয়েকে শিখিয়ে দিল ফুলফুটো করে মুখের জল ওদের রান্না'ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে।

খুব ঘেঁষাঘেঁষি রান্নাঘর। জল ছিটিয়ে ফেলা কঠিন নয়। বাপের কথামত মেয়ে মুখের উচ্ছিষ্ট জল গোঁসাইদের রান্নাঘরে ছুঁড়ে দিল। পড়ল গিয়ে রান্নাকরা জিনিসের উপর। দিনের খাওয়াই নষ্ট হয়ে গেল।

এই মহৎ-লাঞ্ছনার প্রতিকার কী?

লোকটা তার মনিবের কাজে বাইরে বদলি হয়ে গেল। সেখানে একদিন ঠেসে মদ খেল। এত খেল যে হার্টফেল করে মারা গেল। শবদেহ বাক্সে পুরে কলকাতায় আনা হল। যে-সে বয়ন সেই বাক্স, কুলির মাথায় করে নিয়ে গেল শ্মশানে।

ভক্তকে দ্রোহ করলে ভক্ত ক্ষমা করতে পারে কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করেন না।

পার্বতীচরণ রায় গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আরো একবার এসেছিল সেওড়াফুলি। বলেছিল, 'গোঁসাই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই কিন্তু তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তুমি যদি বলো ভগবান আছেন তা হলেই মানব, নচেৎ মানব না।'

স্থির শান্ত সহজ স্বরে গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবান আছেন।'

'তাঁকে দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, দেখা যায়।'

'তুমি তাঁকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'আমাকে দেখাতে পারো?'

'পারি। কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না। বলবে ভেল্কিবাজি। তার চেয়ে নিজে সাধনভজন করে তাঁকে করবে আর তখনই তাঁকে মানবে দর্শন বলে।'

পার্বতীচরণ ব্রাহ্ম ছিল, ডেপুটিগিরি করত। রিটায়ার করে বিলেত গেল আর সেখানে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করল। কিসের ধর্মকর্ম! যতদিন আছি, ঘুরিফিরি আর স্ফূর্তি করি।

কিন্তু সহজে ত্রাণ পেল না পার্বতীচরণ।

একদিন রাতে শোবার ঘরে দেখতে পেল এক জ্যোতির্ময়ী হিন্দু দেবী ঘর আলো করে বসে আছে। কে দুর্গা না লক্ষ্মী না জগদ্ধাত্রী! এ আবার কেমনতরো দর্শন। ব্রাহ্ম অবস্থায় নিরাকার মানত, তারপর মেম বিয়ে করে নাস্তিক হয়েছে, তার কাছে কেন এক হিন্দু দেবীর আবির্ভাব। পার্বতীচরণ ভাবনায় পড়ল।

তারপর আরেকদিন দেখল তিনজন ভারতীয় সাধু তার ঘরে বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজন, কী আশ্চর্য, আমাদের গোঁসাইজি। তাঁরা বললেন, স্পষ্ট ইংরেজিতে বললেন, গো ব্যাক টু ইণ্ডিয়া। ভারতে ফিরে যাও।

মন চাইল না আদেশ উপেক্ষা করে। বিলেত থেকে চলে এল তাড়াতাড়ি, ধরল এসে গোঁসাইকে। জিজ্ঞেস করল, 'আর দুজন সাধু কে? কোথায় গেলে তাদের দেখা পাব?'

'হরিদ্বারে যাও। গঙ্গাতীরে দেখা পাবে।'

গোঁসাইকে বিশ্বাস করে পার্বতীচরণ তক্ষুনি হরিদ্বার যাত্রা করল। গঙ্গাতীরে দেখতে পেল সেই দুই বিলেত যাওয়া সাধু বসে আছেন।

তাঁদের কাছে উপদেশ চাইল পার্বতীচরণ। তাঁরা বললেন, 'গোঁসাইয়ের কাছে যাও।'

গোঁসাইয়ের কাছে ফিরে এল। বললে, 'তোমার কথাই ঠিক। বাকি দুই সাধুর দেখা পেলাম হরিদ্বারে। তাঁরা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলো আমি কী করব?'

'বিলেতেই ফিরে যাও।' বললেন গোঁসাই।

পার্বতীচরণের সমস্ত ভার নেমে গেল। বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমার মর্মের কথাটাই বলেছ, আমি ফিরে যাব। আমি বুঝতে পারছি আমার এই দেহে এই জন্মে সাধনভজন কিছুই হবে না। কত যে কদাচার করেছি অখাদ্য খেয়েছি পাপে কলুষে ডুবেছি তার শেষ নেই। শেষে বৃদ্ধ বয়সে বিধর্মী বিবাহ। তবু তোমার যেটুকু কৃপা পেয়েছি এ জীবনে সেই আমার পরম পাথেয়। একটা ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক এর বেশি আর কী আশা করতে পারে? গোঁসাই, আর যা হবার তা হোক, তুমি আমাকে ভুলো না।'

গোঁসাই কাউকে ভোলেন না। শুধু মন পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখবে। আর মনের মধ্যে সব সময়ে একটি প্রার্থনার ভাব জাগিয়ে রাখবে। সব সময়েই, লেখাপড়া করছ কি কথাবার্তা বলছ বা পথে ঘাটে চলছ, কতক্ষণ অন্তর-অন্তর একটু অবসর নিয়ে ভগবানকে একটু স্মরণ করে নেবে। তিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন, আমাকে কত ভালোবাসছেন, কত ভাবে রক্ষা করছেন এই ভেবে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করবে। যত বেশি প্রণাম করবে তত বেশি মঙ্গল।

ভরতের মনে হল, প্রভু বিনে আমার সুখ কী। কিসের আমার ভোগাবিলাস, রাজসিংহাসন! যদি আমার প্রভুকেই সংসারের রাজা করতে না পারলাম তাহলে আমার সংসারে কী হবে? যতদিন তাঁকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনা না যাবে ততদিন আমিও বনবাসী হয়ে থাকব। প্রভু ছাড়া আমার সংসার বন ছাড়া আর কিছু নয়। বলো আমার প্রভুকে কোন দিকে তাড়িয়ে দিলে? আমিও সেই দিকে যাব। আমার সংসারের রাজা সুখের রাজা চলে গেল আর আমি হরিহারা হয়ে পড়ে থাকব এ হতেই পারে না। আমার প্রাণারাম রামকে ফিরিয়ে আনো।

(ক্রমশঃ)

• • • •

মহাশিল্পী বার্ণার্ড শ'। শিল্পের জন্ত তিনি কঠোর সাধনা করেছেন সারাজীবন। শিল্পের নামে তিনি প্রবঞ্চনা সইতে পারতেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল চলচ্চিত্র প্রযোজকদের হাতে পড়ে তাঁর নাটকের শিল্পবস্তু যাবে হারিয়ে।

নাটকের ফিল্ম রাইট পাবার জন্তে একবার এক চিত্র প্রযোজক এসেছেন শ'এর কাছে। লোকটিকে ভাগাবার জন্তে শ' এক অসম্ভব মূল্য দাবী করে বসলেন।

তখন প্রযোজক শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন, থিয়েটারে কজন যেতে পারে, চিন্তা করে দেখুন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আপনার অমূল্য শিল্পসৃষ্টি অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছবে।

ওইখানেই তো তফাত আমাদের মধ্যে, মাথা নেড়ে বললেন শ', আপনি শিল্প ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করছেন না আর আমি টাকা ছাড়া অন্ত কিছুই দেখছি না।

উদাত্ত আহ্বান

"নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে এখনও তার শেষ হয়নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাবনা, কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায়না। মানবের যা সত্য বস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সবদিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেন না সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সঙ্কোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এতবড় সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাবনা। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্যরূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের, অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ তালমুদ গল্প রত্নাবলী ॥

আনন্দ ভট্টাচার্য

[মুখবন্ধ :—ইহুদী সম্প্রদায় এমন একটি স্বতন্ত্র জাতি, যাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রূপে বাইবেলকে মানলেও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী নন। এঁরা Old Testament মানেন এবং ভগবানে বিশ্বাসী হলেও এই Old Testament-এর মোসেস [Moses] কে প্রফেট বা ভগবদ্‌দূত বলে মান্য করেন—কিন্তু ভগবান বলে স্বীকার করেন না। অনুরূপ ভাবে New Testament এর যীশুখৃষ্টকেও প্রফেট বলে মনে করেন এই ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা—কিন্তু খৃষ্টানদের মত ভগবান জ্ঞানে খৃষ্টকে এঁরা দেখেন না। তাই খৃষ্টানদের সঙ্গে ইহুদীদের চিরকালের একটি বিরোধের তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই এঁদের ধর্ম বাইবেল মানলেও আলাদা—আমাদের যেমন ব্রাহ্ম সমাজ।

মাত্র হাজার বছর আগের কথা। এই নতুন সম্প্রদায়টি তদানীন্তন ব্যাবিলোনিয়া, জেরুসালেম, ইসরাইল প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্তি লাভ করে। পরে, কালক্রমে এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েন। জেরুসালেম এঁদের পবিত্র তীর্থভূমি। মুসলমানদের যেমন মক্কা—আমাদের যেমন বারাণসী। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মূল হ'ল ভগবান এক এবং তাদের লক্ষ্য হ'ল ভগবানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা ভয় জাগানো। সুতরাং, ধর্মপথে সৎভাবে জীবন যাপন করা। বস্তুতঃ পক্ষে, ধর্ম, ভগবান ইত্যাদি না মানলেও মানুষের জীবন যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে পড়ে সেই হেতু ধর্মমূলক, ভগবান কেন্দ্রিক বা ঈশ্বর আধারিত নানান সব নীতিমূলক গল্পের রচনা করেছেন সব দেশের সব কালের জ্ঞানীগুণী মনীষীরা। হতে পারে এগুলি নিছক গল্প—সত্যাশ্রিত বা রূপকধর্মী, মূলে কিন্তু একই উদ্দেশ্য—নীতিশিক্ষা, মানব সমাজকে সুসংবদ্ধ করা—সৎপথে চালনা করা।

তালমুদ (Talmud) হ'ল ইহুদীদের পুরাণ শাস্ত্র। এই পুরাণকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বহু সরস, শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক গল্প। এই গল্পগুলি তালমুদিক টেল্‌স্ নামে খ্যাত। পৃথিবীর যে কোন সৎ সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত এই গল্পাবলী তদানীন্তন সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিদ্বৎ ও বিদগ্ধ সমাজে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ এই পুরাণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধেই বিরোধিতা করেন এবং প্রতিবাদে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেন। 'তালমুদ' সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে কিনা তা নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হয়ে গেছে—কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। ইংরাজীতে কিছু গবেষণা হয়েছে তাও তালমুদ লিপি (Scripture) নিয়ে—তালমুদ সাহিত্য নিয়ে নয়। নীতিকথা হলেও কাহিনীর অভিনবত্বে তালমুদও সাহিত্যে স্থান পাবার দাবী রাখে।]

রাজা কাতজা ও তাঁর বিচার

বহুদিন আগের কথা।

ছোট একটি দেশ। কালো—নীলাভ পাহাড়ে ঘেরা। ফলে ফুলে ধন ধানে ভরা দেশ। চারিদিকে অখণ্ড শান্তি। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অপূর্ব বিশুদ্ধতা। এই দেশটির রাজা যিনি তাঁর নাম কাতজা। এমন প্রজাদের রাজা—যাদের দুঃখের লেশমাত্র নেই—সবাই সুখী।

মাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী রাজা আলেকজান্ডার একবার হঠাৎ এই দেশটিতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর এই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, অহেতুক অশান্তি পছন্দ করতেন না তিনি। বিশেষ করে রাজা কাতজা যখন আলেকজান্ডারকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর রাজকোষের প্রচুর সোনাদানা রূপো মাণিক্য প্রভৃতি উপহারস্বরূপ দান করলেন আলেকজান্ডারকে। তখন তাঁর আর বলার কিই বা থাকতে পারে। আলেকজান্ডার কাতজার এই আপ্যায়ন দেখে খুবই বিস্মিত হলেন এবং বললেন :

—তাই আমি এসব কিছুই চাই না। এমন কি আপনার দেশের প্রতিও বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

রাজা কাতজা ভয়োধিক অবাক হলেন এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন :

—হে মহামান্য অতিথি, কি হেতু তবে আপনার আগমন?

আলেকজান্ডার সহাস্যে বললেন :

—বন্ধু আমি আপনার দেশের রীতিনীতি দেখতে এসেছি। জানতে এসেছি কি করে আপনি রাজ্য শাসন করেন এবং কেমন করেই বা বিচার করেন।

—ওঃ তাই নাকি। কি সৌভাগ্য আমার। তবে আসুন আমার দরবারে।

রাজা কাতজা তখুনি মহামান্য অতিথি সম্রাট আলেকজান্ডারকে তাঁর রাজ দরবারে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে তখন সাধারণ দু একটি মোকদ্দমার বিচার বাকী ছিল। দুটি একটিই ছিল—কারণ আপনারা আগেই শুনেছেন যে এদেশের সব প্রাণীই অখণ্ড সুখ ও শান্তিতে বাস করত। কারুরই কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। কেউ নিজের পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার বা ঝগড়াঝাঁটি করত না। সুতরাং কোন মামলা মোকদ্দমাও বড় একটা হ'ত না।

রাজা কাতজা আলেকজান্ডারকে নিয়ে দরবার কক্ষে যেই প্রবেশ করেছেন দুজন লোক তখনই ঝগড়া করতে করতে সেখানে ঢুকল। তাদের দুজনকেই খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল এবং দরবারে এসেও তারা ভুলে গিয়েছিল যে তারা কোথায় এসেছে।

—আমি বলছি এটা তোমার। একটি লোক রেগে বলে উঠল।

—আমার? কখ্খনো না। অপরটি আরো রেগে জবাব দিল—আমার হতে যাবে কোন দুঃখে। এটা তোমারই আমি বলছি।

তারা ক্রমশঃই উত্তেজিত হতে থাকল এবং একে অপরকে দোষারোপ করতে করতে চেঁচামেচি করতে লাগল। রাজকর্মচারীর কয়েকজন এসে তাদের শান্ত করে রাজার কাছে নিয়ে এল। দুজনেই রাগে ফুঁসছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস উঠছে পড়ছে। যেন অতি কষ্টে তারা রাগ চেপে একে অপরের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইছে।

রাজা কাতজা তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—কি ব্যাপার! তোমরা ঝগড়া করছ কেন? বাদ্। লোকটি ভেঙ্গে পড়ল। বলল:

—হে রাজাধিরাজ। আমরা প্রতিবেশী। এবং আমাদের জমিজমা পূর্বপুরুষদের আমল থেকে পাশাপাশি রয়েছে। আমরা সব সময় বন্ধু—এবং ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। আমাদের সন্তানেরাও ঠিক তেমনি করে মানুষ হয়েছে। গতবছর আমার এই বন্ধুটি তার অংশের এক ঘট জমি আমায় বিক্রী করে এবং আমি তার দামও দিয়েছি। কিছুক্ষণ আগে আমি যখন জমি চাষ করছিলাম, তখন লাঙ্গলের ডগায় প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পেলাম। হে প্রভু, এখন তুমিই বল সোনার মোহরগুলি কি ওর নয়? আমি জমিটাই কিনেছি—সোনা তো নয়! জমির দামে সোনার দাম দিইনি হুজুর।

—না মহাপ্রাণ। আমি ওকে জমি এবং জমির মধ্যে যাবতীয় যা ছিল তাই ওকে বেচেছি। দাম যাই হোক না কেন, সোনার মোহরগুলি ওরই! ঠিক কিনা বলুন?

রাজা কিছু বলার আগেই আবার ওরা দুজনে খেয়োখেয়ি আরম্ভ করে দিল। রাজার দরবারে রাজোচিত নিয়ম শৃঙ্খলা সবই ভুলে বসল।

—হাঁ—হাঁ। আমি কেবল জমিই কিনেছি ওর মধ্যেকার ওগুলো নয়। বলছি, এগুলো তোমার। তা না ··প্রথম লোকটি আবার বলল।

—কখখনো না। আমি জমি এবং জমির মধ্যেকার যাবতীয় সব তোমায় বিক্রী করেছি। অতএব ও থেকে তুমি যাই পাও না কেন সব তোমারই।

এই দুই বন্ধু অতঃপর এমন তর্কাতর্কি আরম্ভ করল যে পরে তা মারামারি হাতাহাতি হবার উপক্রম। চেঁচামেচি, হৈ হট্টগোল···রাগে তো দুজনের মুখ দিয়ে থুথুই বেরিয়ে পড়েছে। দুজনেই হাতার আস্তিন গোটাচ্ছে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। শেষে আবার রাজকর্মচারীদের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

রাজা কাতজা এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে মুচকি মুচকি হাসছিলেন এবং সম্মানীয় অতিথি পরম কৌতূহল নিয়ে এদের শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাজা কাতজা ওদের প্রথম জনকে বললেন:

—তোমার ছেলে আছে?

—আছে আজ্ঞে।

অপর বাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—তোমার মেয়ে আছে?

—আছে।

—তাহলে এত ঝগড়াটে ও তর্কাতর্কি করছ কেন? এদের দুজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রাজা কাতজা। বললেন:

—শোন এদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দাও এবং ওগুলোটি ওদের বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিয়ে দাও। সব গণ্ডগোল চুকে যাবে এবং সব চেয়ে বড় কথা এটা তোমাদের কারুরই থাকবে না।

রাজার বিচিত্র কারদানা। রাজার এই চমৎকার বিচারে ওরা দুজনেই খুব খুশী হল। তারা আবার আগেকার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত খুশী মনে বাড়ী ফিরে গেল।

মাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দার যিনি এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রঙ্গ দেখছিলেন রাজার বিচিত্র বিচার পদ্ধতিতে ও কারসাজির উচ্চহাসিতে ফেটে পড়লেন। রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

—আপনি হাসছেন কেন? এতে হাসির কি দেখলেন? আমার সিদ্ধান্ত কি ঠিক হল না? আপনার দেশে এমন ঘটনা ঘটলে আপনি কি করতেন?

—কেন? সহাস্যে আলেকজান্দার জবাবে বললেন : দুজনকেই হত্যা করে সোনা রাজেয়াপ্ত করে নিতাম।

কাতজার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল এবং বিশেষ কোন মন্তব্য না করে বললেন :

—আপনি তাহলে সোনা এতই ভালবাসেন।

—নিশ্চয়ই।

সেইদিন সন্ধ্যায় গ্রীসের অতিথির সম্মানার্থে রাজা কাতজা এক রাজভোজের আয়োজন করলেন এবং ভোজ্য ও পানীয়ের পরিবর্তে সবই সোনার খাদ্য অর্থাৎ সোনার রুটি, সোনার মাছ, সোনার ঘুরসি কাটলেট, সোনার জল প্রভৃতি পরিবেশন করলেন।

খেতে এসে আলেকজান্দার চমকে উঠলেন। ঐসব অদ্ভুত ধরণের খাদ্যদ্রব্য দেখে বললেন : আমি সোনা খাই না।

—তাই নাকি! আপনি তো সোনা ভালবাসেন।

—ভালবাসি বলে খেতে হবে নাকি? কেউ তা করে? আলেকজান্দার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন।

কাতজা খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন :

—আপনার দেশে সূর্য উদয় হয়?

—হয় বৈকি! আলেকজান্দার জবাব দেন।

—বৃষ্টি পড়ে?

—নিশ্চয়ই পড়ে।

—ঘাস জন্মায়?

—জন্মায়।

—গরু ঘোড়া আছে আপনার দেশে?

—বাঃ আছে মানে! আলবৎ আছে। প্রচুর আছে! আলেকজান্দার জবাব দিলেন জোর গলায়। কিন্তু কিছুতেই বুঝলেন না যে কেনই বা কাতজার এসব উদ্ভট প্রশ্ন।

—আঃ! একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজা কাতজা ধীরস্বরে বললেন :

এতক্ষণ পর বুঝলাম কেন আপনার দেশে ওসব হয়! আর কেনই বা আপনি সোনা এত ভালবাসেন!

—মানে?

—মানে বৃষ্টি পড়ে, ঘাস জন্মায়, এসবই প্রচুর গরু ঘোড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জীবদের জন্য—মানুষদের জন্য তো নয়!

আন্তর্জাতিক নদী সমস্যা ও সমাধান

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গত দশ শতক বৎসরের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যে সংবাদ-পত্রের পাঠক, সাধারণ মানুষ, সর্বদা উত্তেজনা অনুভব করিয়াছে। এ সকলের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি লড়াই-এর ব্যাপার—প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বোমা ফাটাইয়া জীবজগৎ নিশ্চিহ্ন করিবার সাফল্য সম্বন্ধে পরীক্ষাতে মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছে। সুয়েজের যুদ্ধ, হাঙ্গেরীতে রাশিয়া, ব্যালিস্টিক মিসাইল, এশিয়া আফ্রিকাতে ছোট বড় অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব, আরব দেশসমূহে তৈলকেন্দ্রিক রাজনীতি ও বিপ্লব, কঙ্গোর করুণ কাহিনী, ক্রাশ ও স্পুটনিক, কিউবা উপলক্ষ্যে আমেরিকা রাশিয়ার দ্বন্দ্ব, চীনের তীব্রতর আক্রমণ, রুশ চীন মনান্তর, ইন্দোনেশিয়ার আস্ফালন, ইন্দোচীনের যুদ্ধ ও নিত্যকার বিপ্লব এবং এই সমস্ত গোলযোগের পটভূমি সৃষ্টিকারক প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনা কোরিয়ার যুদ্ধ, সমস্তই মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা আন্তর্জাতিক সমস্যা রূপে বিভিন্ন নদীর উৎস ও স্রোতধারার উপর দখলদারী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় বহু রাষ্ট্রও কম বিপন্ন হয় নাই। ঐ দখলদারী তাহাদের জীবন-মরণ সমস্যা। যুদ্ধ নিশ্চয়ই একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়। উহা মানুষ মারে। দেশ ও ধনের সম্পদ নষ্ট করে। কিন্তু নদী পরাধিকারে থাকিলে উহার জলপ্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া দেশ মরুভূমি করিয়া দিতে পারে। আবার কোন উষর ভূমিতে এমন কি মরুভূমিতেও ঐ জলস্রোত প্রবাহিত করাইতে পারিলে উহা প্রচুর শস্য ও অরণ্যসম্পদ সৃষ্টি করিয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া দেশ সম্পদশালী করিতে পারে। নাব্য নদীতে নৌ-চলাচল দ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ভূমির উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক সম্মান ও সুবিধা সৃষ্টি করে এজন্য সীমান্তের নদীস্রোতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে আগত নদীর জলপ্রবাহে কতটা অধিকার অর্জন করা যায় তাহা বহু রাষ্ট্রের পক্ষে জীবন মরণ সমস্যা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীন দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক সীমারেখার দৈর্ঘ্য পূর্বাপেক্ষা চারগুণ অধিক হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যৌথ দখলী নদীর দৈর্ঘ্যও বাড়িয়া গিয়াছে। এবং ইহাও পূর্বের তুলনায় চতুর্গুণ বেশী। এখন পৃথিবীতে এই শ্রেণীর প্রায় দেড়শত নদী আছে এবং দুইটি মেরুদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া বাদে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় অর্ধাংশ এই ধরণের আন্তর্জাতিক নদী বিধৌত অঞ্চল।

রাইন ও ড্যানিয়ুব নদী ইয়োরোপের অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসে রাইন নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কমিশনের সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন ইহাই প্রথম। পৃথিবীর অন্য যে কোন নদী অপেক্ষা এই নদীই বর্তমানে একক ভাবে সর্বাধিক বাণিজ্যদ্রব্য বহন করে। এই নদীর নাব্য অধিকার রক্ষার জন্য সৃষ্ট কমিশনের বর্তমান সদস্যরাষ্ট্র ফ্রান্স, কেন্দ্রীয় জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারলাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের

অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি ডানিয়ুব নদীর উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রবাহ এবং মোহনা অধিকারে রাখার জন্য আশেপাশের সকল রাজ্য দীর্ঘকাল নিষ্ঠুর যুদ্ধ করিয়াছে। এখন এই নদীর উপর রাশিয়ার প্রভাব সর্বাধিক। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, উক্রাইন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অষ্ট্রিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া এই কয়টি দেশের এক কমিশন ডানিয়ুব নদীর প্রবাহ ও নৌচলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। শেষের রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত অপর সকলে কমুনিষ্টপন্থী এবং এই ব্যাপারে রাশিয়ার নির্দেশে চলে। ডানিয়ুবের উৎস পশ্চিম জার্মানীতে কিন্তু রাশিয়ার বিরোধিতায় এই কমিশনে তাহার স্থান হয় নাই। পশ্চিম জার্মানী খাল কাটিয়া রাইন ও ডানিয়ুব নদীর মধ্যে যোগস্থাপন করিয়াছে। ফলে এখন উত্তর সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর অবধি ইউরোপের বৃহত্তাগের মধ্য দিয়া এক নৌপথের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার সীমান্ত প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহার প্রায় অর্ধেক তিনটি প্রকাণ্ড হ্রদ, সেণ্ট লরেন্স নদী এবং আরও ছোট বড় নদী দ্বারা নির্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বেড় হাজার মাইল দীর্ঘ সীমানার অর্ধেক রাইও গ্রাণ্ডি নদীরেখার দ্বারা চিহ্নিত। পশ্চিম দিকে কোলোরাডো এবং টিজুয়ানা নদী উভয় দেশের মধ্যে প্রবাহিত। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে ও দক্ষিণে নদীর প্রবাহ এবং জলের ব্যবহার এই দুই ব্যাপারেই কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে কলহ হইত। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কানাডার নিকটে শিকাগো ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানে নানা প্রকার শিল্পের প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জলের প্রয়োজন চাষের জন্য। চাষের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মেক্সিকোর সীমান্তে রাইও গ্রাণ্ডি নদীর জলও উভয় দেশ ব্যবহার করে। তাছাড়া এই নদীতে লবণ হয় খুব বেশী। এজন্য ইহার গতিপথ খুব পরিবর্তনশীল। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কোলোরাডো নদী উত্তর দক্ষিণে প্রবহমান। রাইও গ্রাণ্ডি এবং কোলোরাডো উভয় নদীতে দুই দেশেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ নির্মাণ করিতেছে। সুতরাং চাষের জল, জলবিদ্যুতের জন্য জল এবং নদীর গতিপথের পরিবর্তনে সীমানার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিত।

এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই সীমান্তে বিভিন্ন নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও বাঁটোয়ারার জন্য কমিশন নিযুক্তিতে সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যই সম্মত হইল। কানাডা যুক্তরাষ্ট্র কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে দীর্ঘকাল পূর্বে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে কমিশন নিয়োগ অল্পকাল পূর্বে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশের নদী সংক্রান্ত এ বিবাদে দেখা গেল নদীর প্রধান প্রবাহ এবং উৎস যে দেশে থাকে সুবিধা তার বেশী। যেমন কলম্বিয়া নদীর প্রধান প্রবাহ এবং উৎস কানাডাতে। চুক্তির সময় বেশী ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। সুতরাং চুক্তির সময় টাকা পয়সা সংক্রান্ত শর্ত তার মনোমত না হওয়া অবধি সীমান্তে টালবাহানা করিয়াছিল কানাডা। এই ধরণের গোলযোগ আলাস্কা কানাডার সীমান্তেও রহিয়াছে। মেক্সিকো সীমান্তেও এইরূপ ঘটনা ঘটে। কোলোরাডো এবং টিজুয়ানা নদীর জল যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক ব্যবহার করিলে মেক্সিকো যে জল পায় তাহা লোণা হইয়া পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে এই জল ব্যবহারকারীরা মেক্সিকোর অসুবিধার কথা দিতে রাজী ছিল না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মেক্সিকোর অসুবিধা যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে।

নদীর জলপ্রবাহ অবলম্বনে গোলযোগ এশিয়া মহাদেশেও খুব আছে। জর্ডন, সিন্ধু এবং নেকং নদী এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। জর্ডন ও ইস্রায়েল দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে জর্ডন নদীর জল

প্রবাহ লইয়া যে বিবাদ তাহা মাঝে মাঝে প্রায় যুদ্ধের কিনারায় যাইয়া উপস্থিত হয়। এই নদী উভয় রাষ্ট্রের প্রাণ-প্রবাহ। কিন্তু নদীর উৎস ও মূল ধারা ইস্রায়েল রাষ্ট্রে পড়াতে জর্ডন রাষ্ট্রের অসুবিধা। ইস্রায়েলে ইহুদিরা এই নদীতে বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতেছে। মরুভূমিতে খাল খনন করিয়া এই নদীর জলধারা প্রবাহিত করাইয়া উষর ভূমি শস্যশ্যামলা করিয়াছে। ফলে একদা যেখানে ধূ ধূ করা মরুভূমি ছিল সেখানে এখন সুরম্য শিল্পনগরী এবং প্রচুর শস্য ও ফল উৎপাদনের উর্বর মৃত্তিকা। ফলে জর্ডন রাষ্ট্রেও এই নদীর জল ব্যবহার করিয়া সেখানকার মরু অঞ্চলে পরিবর্তন ঘটানোর ইচ্ছা এবং কিছু চেষ্টা হইতেছে। এজন্য তাহারা অধিকতর জল চায়। ইস্রায়েল নিজের প্রয়োজন না মিটাইয়া জল ছাড়িতে রাজী নহে। মীমাংসার চেষ্টা যাহা হইয়াছে তাহাতে দুই পক্ষের অনড় মনোভাবের জন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নাই। ফলে সর্বদাই সেখানে জর্ডন নদী উপলক্ষ্যে একটা যুদ্ধের ভাব বর্তমান।

সিন্ধু নদীর জলপ্রবাহ এক বিরাট ভূখণ্ডকে উর্বরা রাখিয়াছে। অন্যূর্ধিক পাঁচ কোটি লোক এই জলপ্রবাহ সিঞ্চিত ভূখণ্ডের শস্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় এই পাঁচ কোটির মধ্যে চার কোটি লোক পাকিস্তানের এবং এক কোটি লোক ভারতবর্ষের ভাগে পড়ে। কিন্তু সিন্ধু এবং উহার পাঁচটি শাখার উৎস ভারতবর্ষে রহিয়া গেল। এই নদীগুলির জলপ্রবাহ ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় পাকিস্তান বিপন্ন বোধ করে। কাশ্মীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসা এই নদীগুলির উপর পূর্ণ অধিকার অর্জন করিতে না পারিলে পাকিস্তান কোনদিন নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। কাশ্মীর লইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে গোলযোগের অন্যতম মূল কারণ ইহাও। কাশ্মীর পশ্চিম পাকিস্তানে জীবনমরণ সমস্যা বলিয়া করাচী ও পিণ্ডিতে যে সকল উক্তি করা হয় তাহার তাৎপর্য এখানে। সেখানকার পৌনে পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় চার কোটি লোক যে জলপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল তাহার উৎস ও প্রবাহ ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকিলে শাসকবর্গের দুশ্চিন্তা কমিতে পারে না।

উভয় দেশের মধ্যে জল লইয়া বিবাদ প্রথম হইতেই দেখা দেয়। দেশ বিভাগের পূর্বের ব্যবস্থা অনুসারে পাকিস্তান বর্ষার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পাইত। কিন্তু অন্য ঋতুতে সে পূর্ণ পাওয়ার সরকারের ইচ্ছা ও দয়ার পাত্র। কেননা, সারা বৎসর তার প্রাপ্য জলের পরিমাণ হইতে বর্ষার অতিরিক্ত জলের অংশ বাদ দিলে অন্য ঋতুতে তার প্রাপ্য কিছুই প্রায় বাকী থাকিত না। কিন্তু পাকিস্তানের ইচ্ছা সারা বৎসর সমপরিমাণে জল সে নিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ তার চাষীদের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া পাকিস্তানকে সারা বৎসর জল যোগাইবে ইহাও সম্ভব নয়। এই সময় ভারতবর্ষ ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ তৈয়ার ও জল সেচের ব্যবস্থা করিতেছিল। এই ব্যাপারে যে গোলযোগ দেখা দেয় শেষ অবধি আমেরিকার টেনেসি ভ্যালীর চেয়ারম্যান ডেভিড লিলিয়েনথাল ও বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ইউজিন ব্ল্যাকের চেষ্টায় ১৯৬০ সালে দুই দেশের মধ্যে এই জলপ্রবাহ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয়। তাঁহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই নদীর যে জলরাশি আরব সাগরে পড়িয়া বৃথা নষ্ট হয় তাহার অধীভাগ নূতন খাল কাটিয়া বাঁধ দিয়া ভূমি কর্ষণের জন্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইল। শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতীর জল দশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ একাই ব্যবহার করিবে। এই দশ বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানকে এই তিনটি নদী হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিবে। এই দশ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তান সিন্ধু,

চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর বর্ষার জল সারা বৎসরে ব্যবহারের উপযোগী বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করিয়া লইবে। কিন্তু এই জলাধার নির্মাণের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার একাংশ ভারতবর্ষ বহন করিতে রাজী হইল। বাকী অংশ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্কও পাকিস্তানকে দিতেছে। এই সঙ্গে এই নদী উপত্যকার তদারকীর জন্য একটি সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

মেকং নদীর অববাহিকা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অববাহিকা অঞ্চল। দক্ষিণ চীনে এই নদীর উৎপত্তি। তারপর ব্রহ্ম, লাওস, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘপথ বাহিয়া ইহা সমুদ্রে পড়িতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং পরেও কয়েক বৎসর এই নদীর অধিকাংশে ফ্রান্স শাসিত ইন্দোচীনে ছিল। তখন ফ্রান্স ও থাইল্যাণ্ড এই নদীর ব্যবহার সম্বন্ধে বৎসামান্য জরীপ ও অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছু করে নাই। এখন এই নদীর জলপ্রবাহ বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য লাওস, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও থাইল্যাণ্ডের চারি সদস্য বিশিষ্ট এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার সদর দপ্তর থাইল্যাণ্ডে। এই সমিতির আর্থিক শক্তি খুব সীমিত। বিশেষতঃ কোন কোন অঞ্চলের সাময়িক গোলযোগ সমিতির কার্যের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিম জার্মানীর সাহায্যে থাইল্যাণ্ডের অংশে নাম পঙ্‌এ একটি বাঁধ নির্মিত হইতেছে। এটি বেশ বড় বাঁধ। আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাঁধ থাইল্যাণ্ডের নিজের অর্থে নাম পুঙ্‌এ আরম্ভ হইয়াছে। লাওস কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও অনুরূপ কাজের পরিকল্পনা এই সমিতি করিতেছে। কিন্তু এই সকলের সাফল্যের জন্য এই অঞ্চলে সাময়িক শান্তি প্রয়োজন।

নদী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিরোধের ন্যায় কোন কোন দেশে অন্তর্বিরোধও দেখা দেয়। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এরূপ বিরোধ আছে। ডার্লিং মারে নদীদ্বয়ের যুক্ত প্রবাহ নিয়া দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ভিক্টোরিয়া এবং নিউ সাউথ ওয়েলস-এর মধ্যে মনান্তর কখনও কখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে। অনুরূপ সমস্যা ভারতবর্ষেও আছে। দামোদর নদী নিয়া বাঙলা ও বিহার, কৃষ্ণা নদী নিয়া মহীশূর ও মহারাষ্ট্র বিবাদ করে। কখনও দিল্লীর দরবার কখনও সুপ্রীম কোর্ট এই বিবাদের মিমাংসা করিয়া দেয়।

আন্তর্জাতিক নদীর অববাহিকাতে সকল সংশ্লিষ্ট দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সকল আন্তর্জাতিক কমিশন বা সংঘ বা সমিতি স্থাপিত হইতেছে তাহাদের দ্বারা সকল দেশই উপকৃত হইতেছে এবং বহুক্ষেত্রে যুদ্ধের আশঙ্কাও হ্রাস পাইতেছে সন্দেহ নাই।

অভিনয়ের নেপথ্যে

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

আসুন···ভেতরে আসুন। ···কিন্তু আজকে আমাকে মাপ করতে হবে যে! আমি তো বলেই পাঠিয়েছিলাম যে বড্ড ব্যস্ত। ···আর একদিন এলে হতো না?···

কি? মোটে দশ মিনিট? ···হায়রে দশ মিনিট সময়ের দাম যে কত সে কি আমরা কোনদিন বুঝব? আচ্ছা···তাহলে বলে ফেলুন চটপট, কি দরকার।

ফিল্ম-সাংবাদিক?···তা বুঝেছি চেহারা দেখেই। হয় ফিল্ম-সাংবাদিক আর নয় ফিল্মে নামতে চাই এই দু'রকমের লোকই তো আসেন কিনা আমার কাছে। তাদের মধ্যে ফিল্মে-নামতে চাইদের চুলের কায়দা দেখলে আর ভুল হবার জো নেই।

তা, বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন? একাজে নতুন বোধ হচ্ছে। একটু পুরাণো হলেই শিখবেন যে ঘরে একবার ঢুকতে পারলে প্রথমেই চেপে বসতে হয়।

বেশ। ···এবার বলুন কি চাই। সাক্ষাৎকার? কোন্ কাগজ? ···সে কি? আমার চিত্র-চঞ্চলা! এই তো সেদিন পূজো-সংখ্যায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার বেরিয়ে গেছে—"চলচ্চিত্রের বিবর্তন"—পুরো ১৪ পৃষ্ঠা। আর আমার দেবার কিছু নেই। আচ্ছা আসুন তাহলে,···নমস্কার।···

কি, সেটা ছিল তথ্যসর্বস্ব? শুধু ঘটনার তালিকা? আর কি বললেন···'মানবিক আবেদন' ছিল না?···বুলিগুলো শিখে নিয়েছ দেখছি এরই মধ্যে···ওই দেখ, "তুমি" বলে ফেললাম···কিছু মনে করো না ···

বটে? আচ্ছা, তাহলে এখন থেকে "তুমিই" বলব। হাঁ, যা বলছিলাম দেখ, ওই 'মানবিক আবেদন', 'বিশ্ববোধের মূল্যায়ন' এই সব গালভরা কথাগুলো তোমার পাঠকদের জন্যেই থাক না। আসল কথা তোমার কাগজের পৃষ্ঠা ভরাবার জন্যে আরও কিছু চাই, এই তো? কিন্তু সেদিনের ১৪ পৃষ্ঠার পর আবার এত শীঘ্র···তোমার পাঠকদের ধৈর্যে সইবে তো?···

হাঁ হাঁ, হাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। সে দিন কি আর আছে? এখন শিল্পী শার্দুলই বল আর মক-মাতঙ্গই বল, বয়স যে গেছে—আর সেই সঙ্গে গেছে গ্ল্যামার। ···ছিল একদিন, যখন অভয় সুর ছিল ম্যাটিনি আইডল···তখন সিনেমা কাগজগুলোর এমন একটা সংখ্যাও বেরোত না, যাতে···যাকগে যাক, সেসব পুরণো দিনের কথা ঘেঁটে আর লাভ নেই। তার চাইতে.....

কি, সেই সব পুরণো দিনের কথাই শুনতে চাও? আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো তুমি।

কিন্তু···এখন যে আমার অনেক কাজ···

কি, কাজ কিছু নেই? ডিটেকটিভ নভেল পড়ছিলাম? ...ও হো, বইখানার নামটা দেখে ফেলেছ বুঝি? তা আসল কথাটা কি জান? ঐ নভেল পড়াটাই আমার এখন অত্যন্ত জরুরি কাজ।···

কেন, বুঝতে পারছ না? এটা আমার বাঁচবার তাগিদে। ...তিনটে স্টুডিওতে একসঙ্গে ছবি চলেছে, তাছাড়া সপ্তাহে দুদিন ষ্টেজ...বোঝ ব্যাপারটা। যতটুকু সময় পাই মনটাকে একটু রিলিফ দিয়ে নিই...নইলে পাগল হয়ে যাবার কথা।

না, আজকে ষ্টেজ নেই...কিন্তু আজকে আবার ৬॥০ টায় এক সম্বর্ধনা-সভা।

তা বটে। তোমার সঙ্গে কথা কইলেও একরকমের রিলিফ হবে। আচ্ছা, তবে তাই। প্রশ্ন কর, কোন্ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাও।

"চন্দ্রলোকে চলচ্চিত্রের চাহিদা" না "তারকা রাক্ষসীর কবলে বেকারী কিম্বা শিল্প"?

সে সব কিছু নয়? ...তবু ভাল! ...তবে কি শুনবে বল। ...আমার অভিনয়-শেখার কথা? সেটা আবার একটা বলবার মত কথা কি হল? তখনকার দিনে তো এতসব একাডেমি, নাট্যায়তন এ সব ছিল না আর শ্রীযুতী অমুক দেবী 'মেক-আপ-শ্রী' শ্রীমান তপন-রঞ্জন 'প্রম্পট্ বিশারদ' এই সব ডিগ্রি-ডিপ্লোমা-ধারীদেরও দর্শন পাওয়া যেত না। আমি যে পাঠশালায় অভিনয়ের প্রথম পাঠ নিয়েছি সে হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনের বারান্দা।

বৌদি'দের সাড়ি টাঙিয়ে ষ্টেজ তৈরী আর যাত্রা-থিয়েটারে শোনা বুলিগুলো মুখে মুখে সাজিয়ে অনর্গল বক্তৃতা, এ যে কত করেছি তার সীমা-সংখ্যা নেই। তার পরে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টাপে স্টাপে কয়েক বছর কাটিয়ে একেবারে অভিনয়ের ম্যাট্রিক পাশ আর কি! এই তো হয়ে গেল আমার অভিনয়-শিক্ষার ইতিহাস।...

তবে হাঁ, একজনের কথা মনে পড়ে যাঁর কাছে সত্যি অভিনয় কাকে বলে সে শিক্ষা পেয়েছিলাম। তাই এতদিন পরেও সে শিক্ষাটা মনের মধ্যে জলজ্বল করছে।

তখন আমার উঠতি বয়েস...পাবলিক ষ্টেজে ঘোরাফেরা করি। কিম্বেও দু চারটে ছোট ছোট পার্টে চান্স পেয়েছি। এখন হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু চেহারাটা ভালই ছিল। ঐ যে তোমার পেছনের দেওয়ালে সেই সময়কার ছবি।... এমন সময় অলকাপুরী ষ্টুডিয়ো থেকে একদিন আমার ডাক এল।

গিয়ে যা শুনলাম তাতে তো নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। কল্পনার আকাশ-কুসুম তৈরীরই বয়স—কিন্তু লাগাম ছাড়া কল্পনাতেও যে দুরাশা করতে পারি নি, তাই।

শুনলাম, শ্বাতী দেবীর নতুন ছবিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হবে।...

বল কি হে? শ্বাতী দেবীর নাম শোন নি? শ্বাতী সাহানা? শোন নি, সত্যিই শোন নি?...তাই বটে! এ লাইনের রকমই তাই। "দেহপট সনে নট সকলই হারায়" —তা, তিনি অবশ্যি দেহপট এখনও হারান নি। তবে অভিনয় জগৎ থেকে সরে গিয়ে উত্তরাঞ্চলের কোন্ এক আশ্রমে বাস করছেন শুনেছি।...কিন্তু মোটে তো দশ বছর। এরই মধ্যে লোকে তাঁর নামটাও ভুলতে বসেছে!

সে যাক—কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন তিনি ছিলেন বাংলার চিত্রগগণের সব চাইতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। "লক্ষ হিয়ার হৃৎস্পন্দন" যাকে বলে আর কি। তাঁরই মুখোমুখি অভিনয় করতে হবে আমাকে। আমার মনে হল? ...কি আর বলব...মনে হল যেন স্বর্গের নন্দন কানন অকস্মাৎ একটা সাড়ে চার কাঠার প্লট নেয়ে গেছি—পুব-দক্ষিণ খোলা। সেদিন বাড়িতে এলাম পুষ্পক রথে চড়ে অর্থাৎ বাসে ঝুলতে ঝুলতেই এলাম কিন্তু আমার সেই রকমই মনে হয়েছিল।

সে রাত্রে ঘুম তো হল না মোটেই—কিন্তু আনন্দের আতিশয্যটা কেটে গেলে পর হাজার রকমের ভয় এসে মনটা ঘুড়ে বসল।

জীবনে কত বড় একটা সুযোগ! কিন্তু যদি ঠিক মত না করতে পারি তাহলে যে দুর্নাম হবে সে কি কখনও কাটিয়ে উঠতে পারব? তার ওপরে আগে দেবীর খামখেয়ালিপনা সম্বন্ধে ষ্টুডিয়ো মহলে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। বুক দুরুদুরু করবার সে-ও একটা বড় কারণ।

যাই হোক, দিন কয়েক পরই শুটিং সুরু হবে, কাজেই প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে ডুবে যেতে হল। সে ছবির গল্পটির কথা এখন আর বিশেষ কিছু মনে নেই শুধু এইটুকু মনে আছে যে, আমাকে যে চরিত্রের অভিনয় করতে হবে সেটি ঠিক নায়ক নয়—পার্শ্বনায়ক বলা যেতে পারে।

তরুণ নায়ক—প্রথম প্রেম—এই ধরণের অভিনয়ে তখন আমার একটু নামডাক হয়েছিল। সে আবার আর এক কাহিনী। সে থাকগে থাক···

কি? সেটাও তোমায় শোনা চাই? আচ্ছা, বলি তবে।

নন্দন মিত্রের নাম শুনেছ? নির্বাক যুগের দ্বিতীয় ডিরেক্টার? হাঁ হাঁ শচীনন্দন। যদিও নামের প্রথম দু'অক্ষর লোকে ভুলেই গিয়েছিল।··· অমন চৌখস ডিরেক্টার খুব কম দেখেছি। সব দিকে তাঁর নাখা খেলত। ষ্টুডিয়োর পেছনে একফালি জমি খালি পড়ে ছিল—আর তার একপাশে একটা ডোবা। একদিন দেখি বাজার থেকে গোটাকত পদ্মফুল আর পাতা এনে সেই ডোবার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক আপত্তির পর নায়িকা সেই জলে নাবতে রাজি হলেন। ছবি উঠলে দেখা গেল নায়িকা পদ্মদীঘির কালো জলে অন্যমনে কলসী ভাসিয়ে দিয়ে গা ধুচ্ছেন আর ঢেউয়ের দোলা লেগে কলসীও নাচছে, পদ্মফুলও নাচছে; দৃশ্য দেখে দর্শকদের সে কি হাততালির ধুম! তখনকার দর্শকরাও ছিল অল্পে সন্তুষ্ট! কি দিনই গেছে!

আবার একদিন দেখি গাড়ি গাড়ি বালি আসছে। সেই জমিরই একপাশে দুটো রোগা ভাঙ্গা খেজুরগাছ ছিল—তার চারপাশে সেই বালি ছড়িয়ে দিয়ে দৃশ্য তৈরী হল। কি? না আরবদেশের দুস্তর মরুভূমি।

এ হেন ডিরেক্টার নন্দন মিত্র—তাঁরই ছবিতে আমি করছি অভিনয়। ছোট পার্ট—কিন্তু রস আছে।

সত্যি কথা বলতে কি বিশ্বের অভিনয়ে আমি তখন মোটেই আত্মবিশ্বাস করতাম না। ষ্টেজে অভিনয় তার আগে করেছি—কিন্তু সে অন্য জিনিস। সামনে দর্শক, পাশে সহ-অভিনেতা। অনেকদিনের মহলায় পার্ট তৈরী হয়েছে—কথাগুলো আউড়ে গেলে কীলিং আপনিই এসে পড়ে। কিন্তু ছবি হ'ল নির্বাক। কোথাও কিছু নেই—পরিচালক হুকুম করলেন আর চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ের ভাব ফোটাও। পরমুহূর্তে হয়তো ঠোঁট বাঁকিয়ে একটা চোখ আধ্ বোজা করে ঈর্ষ্যার ভাব দেখাও। আবার একটু পরে হয়তো গভীর বিষাদে, গাল বেয়ে টস টস করে চোখের জল পড়ছে। এ সব কেরামতি আমার কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না। যাই হোক, আর সব জায়গা কোন রকমে উৎরে এসে ঠেকলাম সেই চরম প্রেমের দৃশ্যটিতে—যেখানে আমার মুখের ক্লোজ-আপ নেওয়া হবে! সে মুখে খুশির বান ডেকেছে। বুক গদগদ···বিহ্বলতা যেন উপচে উপচে পড়ছে।

দৃশ্য প্রস্তুত, ক্যামেরা মুখের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। ডিনপাশ থেকে আলো জ্বলে

উঠল। পরিচালক হুকুম দিলেন—আমি মুখে যথাসাধ্য ভাব ফুটিয়ে তুললাম। কি ফুটল জানি না। ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি মেয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, তাদের মুখে রুমাল চাপা কিন্তু—রুমালের এপাশ ওপাশ দিয়ে হাসির রেখা উপচে বেরিয়ে আসছে।

পরিচালক হেঁকে উঠলেন, "কাট্।" ক্যামেরা বন্ধ হল—আলো নিভে গেল।

যথাসম্ভব বিরক্তি দমন করে নন্দন মিত্র মিষ্টি গলায় বললেন, "ওতো হল না অভয়বাবু। মুখের ভাব ওরকম বেচারা-বেচারা হলে চলবে কেন? উৎফুল্ল, বিহ্বল আবেগে টলমল এসব কই? মনের মধ্যে ফীলিংটা আনুন, তবে তো সেটা মুখে চোখে ফুটবে।···ট্রাই এগেন।"

আবার প্রাণপণ চেষ্টা। নন্দন মিত্র বলে চলেছেন, "এই যে আপনার সামনে নায়িকা সুরঙ্গমা, সুন্দরী, তরুণী হাজারলাভময়ী শতপ্রেমিকের প্রাণের কামনা—চেয়ে দেখুন, তিনি আজ আপনার সামনে···"

কোথায় নায়িকা? দেখি তিনি ফ্লোরের শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চে সঙ্গীদের সঙ্গে বসে আছেন। হাতে চায়ের কাপ···মুখখানা সোজা রেখে শুধু ঠোঁটের ভঙ্গীতে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মুচকি হাসি বিতরণ করছেন। পুরু করে রঙের প্রলেপ দেওয়া মুখ এখন ঘর্মাক্ত—প্রসাধনের আবার মেরামত দরকার। ওঁর দিকে চেয়ে কোনোরকম ফীলিং আসা দূরে থাক·····

এদিকে পরিচালক আমার মুড আনবার জন্যে গলদ্ঘর্ম হচ্ছেন। "সেই তিনি · আজ নিজে যেচে ধরা দিতে এসেছেন। আনন্দ, কি আনন্দ, আশাতীত ··অপূর্ব···অচিন্ত্যনীয়"

নাঃ, কিছুতেই কিছু নয়। একঘণ্টা সময় আর হাজার দুয়েক ফুট ফিল্ম নষ্ট হবার পর আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম।

কিন্তু ডিরেক্টার নন্দন মিত্র দমবার পাত্রই নন। তিনি বললেন, "ঠিক আছে···উই ট্রাই এগেন আফ্‌টার ফিফটিন মিনিটস্···পনেরো মিনিটপর আবার হবে।" বলেই তিনি ফ্লোর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যখন ফিরে এলেন, ওঁর মুখে চাপা হাসি আর ঈষৎ উত্তেজনা। আমি তখন নৈরাশ্যের ভারে নুয়ে পড়ি আর কি। আর চেষ্টা করবারও যেন শক্তি নেই।

তবু সেই ক্যামেরার সামনে আবার দাঁড়াতে হল। আলো জ্বলে উঠল। হঠাৎ দেখি, আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ষ্টুডিওর ভৃত্য বলরাম।···হাতে সুসজ্জিত ট্রে তার ওপরে একটা প্লেটে মাংসের কোরমা থেকে ধোঁয়া উঠছে। অন্য প্লেটে পরোটা, কাটলেট, আরও দু'এক রকম খাবার।

খেলাধুলোয় শরীর, খাইয়ে বলে নাম ছিল। সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল। এমন সময় ঐ সব সামগ্রী সামনে দেখে রসনা বেশ একটু রসসিক্ত হয়ে উঠল।

পরিচালকের গলা কানে এল, "হাঁ, অভয়বাবু, এসব আপনারই জন্যে ওরিয়েন্ট কেবিন··· ওদের রান্নার কেরামতি আপনি জানেন। দেখুন, চেয়ে দেখুন, এর প্রত্যেকটি জিনিসের স্বাদ আপনি যেন রসনায় অনুভব করছেন। এখনই বলে যাবেন আর কি—এই শটটা হয়ে গেলেই···ঠিক ঠিক··· সাবাস···ধরে থাকুন · আর একটু···কাট্।"

জয়ের গর্বে এগিয়ে এসে নন্দন মিত্র আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন, "চমৎকার! ওয়াণ্ডারফুল! খুব লাইভলি হয়েছে আপনার এক্সপ্রেশান।"

সেই ছবি বাজারে বেরুতেই আমার সুখ্যাতি রটে গেল। কিন্তু পত্রিকাগুলো একবাক্যে বলল, "তরুণ নায়কের মুখে তার অন্তরের কামনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আবেগ এবং বিহ্বলতায় এ রকম মরমী অভিব্যক্তি প্রেমের অভিনয়ে সচরাচর দেখা যায় না।"

বড় বড় সমালোচকরা যখন ঐ কথা বলছেন, আমি আবার একটা কে যে তার প্রতিবাদ করব।

তার অল্প দিন পরেই অলকাপুরীর ডাক এল।

শুনলাম যে প্রথমতঃ এই ভূমিকা যাঁকে দেওয়া হয়েছিল, স্বাতী দেবী তাঁর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি! তাছাড়া তাঁর বয়সটাও চরিত্রের পক্ষে ঠিক মানানসই নয়—আরও অনেকখানি কম বয়সের হওয়া চাই। তাই কর্তৃপক্ষ আমাকে খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু শেষ কথা স্বাতী দেবীর—তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ওপরেই আমার নিয়োগ নির্ভর করছে।

এর আগে রুপালী পর্দায় স্বাতী দেবীকে অনেকবার দেখেছি। তাঁর অগণিত বিমুগ্ধ ভক্তের মত আমার কাছেও তিনি ছিলেন সুদূরের আরাধ্যা। সশরীরে তাঁকে কখনও দেখবার সুযোগ হয়নি। কাজেই পরিচালক সুদর্শনবাবু যখন ডাকলেন, "আসুন অতনুবাবু, স্বাতী দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই" তখন বুকের ভিতরটা যে কি রকম ঢিপঢিপ করে উঠল, তা বুঝতেই পারছ।

ষ্টুডিয়ো থেকে আলাদা অফিস-বিল্ডিং, তারই একপ্রান্তে ছোট একটি কামরা। দরজার সামনে টুলে যে বসেছিল, সে গিয়ে খবর দিতেই অনুমতি এল। পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে স্বাতী দেবী বই পড়ছিলেন। আমরা ঢুকতেই সোজা হয়ে বসলেন ও বইখানা টেবিলের ওপর রেখে একটা খবরের কাগজ চাপা দিলেন। ওরই মধ্যে বইখানার নাম আমার নজরে পড়ে গেল—"বিশ্বধর্ম ও আস্তিক্যবাদ"।

সুদর্শনবাবু আমার পরিচয় দিলেন—স্বাতী দেবী কোন কথা না বলে শুধু চেয়ারের দিকে হাতের ইসারা করলেন। আমি বসে পড়ে মুখ তুলে চাইতেই দেখি আমার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর চোখ, সেই আশ্চর্য চোখ দুটি, রুপালি পর্দায় যে চোখের স্বপ্নময় ভাবাবেশ এক মুহূর্তে তীব্র দহন জ্বালায় রূপান্তরিত হতে দেখেছি।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। আমি অবশ্যি চোখ নামিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলা সঙ্গত হবে কি না তাই ভাবছিলাম। আমাকে নিরীক্ষণ করে তিনি কি বুঝলেন জানি না। পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এঁর সঙ্গে ক'টা শট আছে আজকে?"

হাতের একটা চার্ট দেখে পরিচালক বললেন, "৭, ২১, ১২৮ এর ক, খ, গ আর ২০৬"

"দৃশ্যগুলো সব বুঝে নিয়েছেন অতনুবাবু?"

"তা নিয়েছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে কতদূর কি হবে তা বুঝতে পারছি না।"

স্বাতী দেবীর ঠোঁটের কোণে একটুখানি রহস্যময় হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তিনি টেবিলের ওপর থেকে বইখানা নিতে হাত বাড়ালেন। ইঙ্গিত বুঝে সুদর্শনবাবু উঠে পড়লেন—আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

যথা সময়ে স্বাতী দেবী মেক-আপ নিয়ে ও সাজ-সজ্জা সমাধা করে সেটে এসে দর্শন দিলেন। আমি অবশ্যি অনেক আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলাম।

গল্পের নায়িকা একজন মহীয়সী মহিলা। পার্শ্বনায়কের, অর্থাৎ আমার চাইতে সামাজিক মর্যাদায় চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সব দিক দিয়ে উচ্চস্তরের। ওঁর প্রতি আমার যে মনোভাব পরিস্ফুট করতে হবে সে হচ্ছে বিস্ময় মিশ্রিত আকর্ষণ আর উচ্চস্তরের প্রেম বা পূজারই নামান্তর। নায়িকা এ সবের কিছুই জানেন না—তিনি এর প্রতি উদাসীন, নির্বিকার।

একটার পর একটা দৃশ্যাংশ অভিনয় করে যেতে লাগলাম। এর মধ্যে পরিচালক মশায় একবার "বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে" বলে পিঠ চাপড়েও দিলেন। স্বাতী দেবীও মনে হল খুসি হয়েছেন। সেদিনের মত শুটিং শেষ হল। সফলতার আনন্দে ভরা বুক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

তার পরদিন আবার যথাসময়ে শুটিং সুরু হল। এবারকার দৃশ্যটি হচ্ছে, স্বাতী দেবীর জন্মদিনে আমি ওঁর জন্যে একটা উপহার এনেছি—বহুমূল্য, অর্থাৎ আমার সাধ্যের অতিরিক্ত। উপহার দেবার সময় আমার মুখের কয়েকটি কথায় আমার মনোভাব স্বাতী দেবীর অজানা রইল না। স্বাতী দেবী একটু বিস্মিত বিরক্ত। ওঁর কাছে এটা স্পর্ধা, ভাচ্ছিল্যের যোগ্য। একটা শুষ্ক "ধন্যবাদ" দিয়ে, উপহারের মোড়কটি না খুলেই, টেবিলের এক পাশে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। সেই সময়ে ওঁর পিছনে পিছনে কয়েক পা যেতে যেতে ওঁর পিঠ লক্ষ্য করে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আমাকে কয়েকটি কথা বলতে হবে। অবশ্য নির্বাক ছবি—কথাটা বাহুল্য, মুখের ভাষাই সব।

গল্পের চরিত্র তখন উন্মাদের কাছাকাছি—সে নায়িকার মুখের ভাব দেখতে পায়নি। তাই অতগুলো কথা বলতে পেরেছিল। কিন্তু আমি তো দেখতে পেলাম।

আমার ঘরে ঢোকাটা ঠিকমতই হ'ল। সসম্ভ্রমে কাছে আসা এবং উপহারটি হাতে তুলে দেওয়াও মোটামুটি উৎরে গেল।

তারপর নায়িকা চলে যাবার আগে, মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন। সে কি কটাক্ষ! তার অর্ধেকটা আর্সেনিক আর অর্ধেকটা নাইট্রিক এসিড দিয়ে তৈরী। রূপকথায় সেই মায়াবিনীর কথা পড়েছ তো, যে তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে রাজপুত্রদের পাথর বানিয়ে ফেলত? আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে পাথর বানাবার বিদ্যায় স্বাতী দেবীর কাছে যেন কিছুদিন তালিম নিতে পারত সেই মায়াবিনী। সেই দৃষ্টির আঘাতে আমার বোধ হল যেন পায়ের তলা থেকে পাথর জমতে জমতে হৃৎপিণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে।

এর পরেই আমার ভূমিকায় ছিল, ওঁর একখানা হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে অর্ধস্ফুট ভাষায় অন্তরের ভাব নিবেদন। কোন রকমে কথা ক'টি যদি বা বলা হ'ল হাত ধরতেই ভুলে গেলাম।...."কাট"

আবার গোড়া থেকে।.....এবার এত জোরে হাত চেপে ধরলাম যে স্বাতী দেবী 'উঃ' বলে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। আবার "কাট"

একবার, দু'বার, তিনবার ক্যামেরা চালানো হল। আমার অভিনয় কিছুতেই ঠিকমত হচ্ছে না। ফ্লোরের আবহাওয়া থমথমে। ডিরেক্টার, সহকারী, ক্যামেরাম্যান আরও কেউ কেউ ফিসফিস গুজগুজ করছে, আমার হাতপায়ের টেম্পারেচার ক্রমশঃ হিমাঙ্কের নীচে চলে যাচ্ছে।

ডিরেক্টার পায় পায় এসে আমি যেখানে হাতে মাথা গুঁজে বসেছিলাম, সেইখানে এসে বললেন—"অতনুবাবু!"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কাল থেকে আর আসবার দরকার নেই, এই তো?" মুখ না তুলেই আমি বললাম।

"ক্যাপা আর কাকে বলে? আপনার অভিনয় তো বেশ চমৎকার হচ্ছে।…এখন একটু যা দরকার সে শুধু…'

বুঝলাম, একটা ভিটামিন বড়ি…চাঙ্গারনি টনিক আর কি। কিন্তু আমার যা অবস্থা তার থেকে চাঙ্গা করে তুলবার মত টনিক কি কোথাও আছে? আমি মুখ গুঁজে বসেই রইলাম।

"মিছামিছি ভাবছেন কেন অত? আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঐ আয়গাটা আমি একবার করছি, আপনি দেখুন।…ঐ যে স্বাতী দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন…আপনি এই দিক থেকে আসছেন কাছে এসে…এ কি, আপনি চলে যাচ্ছেন, স্বাতী দেবী?"

"হ্যাঁ, আজকে আর নয়।"

"সে কি, আজকের সিডিউলে যে আরও তিনটে শট বাকি।"

"তা হোক, আজকে আমার একটা জরুরী এন্‌গেজমেন্ট আছে। আজকের বাকি শটগুলোও কালকেই হবে…সেই ব্যবস্থা করুন।"

এর ওপরে আর কথা বলবার মত ক্ষমতা ষ্টুডিওতে কারও ছিল না। স্বাতী দেবী কোন দিকে না তাকিয়ে সাম্রাজ্ঞীর মত ধীর পদক্ষেপে সেট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ষ্টুডিও থেকে ট্রামের রাস্তা মিনিট দশেকের পথ। আমি মাথা নীচু করে কোন রকমে পা টেনে টেনে চলেছি। মানসিক অবস্থার কথা আর কি বলব! প্রতি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছে পায়ের নীচে একটা গহ্বর আমাকে গ্রাস করে ফেলবে।

কি বলে? তোমাদের পাড়ার রাস্তাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে? প্রতি পদক্ষেপেই…… হাঃ, হাঃ হাঃ, বেশ বলেছো……

হাঁ, তারপর আমি তো ঘাড় গুঁজে হেঁটে চলেছি।…পেছন থেকে হয়তো হর্ণ বাজিয়েছিল, আমি শুনি নি। একখানা মোটর গাড়ি একেবারে আমার গা ঘেঁসে একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে পড়ল। দেখি, পেছনের দরজা আধখানা খুলে, মুখ বাড়িয়ে স্বাতী দেবী। তার ওপরে…অবাক কাণ্ড! আমাকেই ডাকছেন…মুখখানা হাসি হাসি।

"এই যে অতনু বাবু, আপনি কোন দিকে যাবেন?"

"মির্জাপুর ষ্ট্রীট" আমি থতমত করে উত্তর দিলাম।

"তবে চলে আসুন, আমিও ঐ পথেই যাব।"

"আবার কেন আপনি কষ্ট করবেন?"

"কিছু কষ্ট নয়। আসুন।"

এ তো অনুরোধ নয়, হুকুম। আর কোন কথা না বলে আমি উঠে বসলাম।

দু'একটা শিষ্টালাপের পর আমি বললাম, "আজকে আমার জন্যে আপনাকে মিছামিছি অনেক কষ্ট পেতে হল।"

"তাতে তো আপনার কোন দোষ নেই অতনুবাবু" স্বাতী দেবী বললেন। সঙ্গে একটু হাসি—মিষ্টি হাসি—একটু আগে ক্যামেরার সামনে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি দেখেছি, সে রকমটা নয়।

"আসল দোষটা কোথায় জানেন, অতনুবাবু, সে হচ্ছে ঐ গল্পের। ঐ সিচুয়েশানে আপনার মনে যুদ্ধভাব আসাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাই আপনিও সেটা ফোটাতে পারেন নি।"

আহা—সারাদিনের ধকলের ওপরে যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ।…মনটা জুড়িয়ে গেল …যাক, উনি যে সেট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেটা তাহলে রাগ করে নয়।

এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই গল্পের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এসে গেল।

তুমি হয়তো জান না যে ফিল্ম-সংক্রান্ত প্রত্যেকটি লোক—পরিচালক, চিত্রনাট্যকার থেকে প্রোপ বয় পর্যন্ত এরা সবাই একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত—সে হল, ছবির যা কিছু গলদ হতে পারে তার জন্যে দায়ী হচ্ছে গল্পলেখক। কাজেই এ প্রসঙ্গে স্বাতী দেবীর সঙ্গে আলোচনায় আমি উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিলাম এবং খুব জোরের সঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লাগলাম। কিন্তু হায়, কথা না ফুরোতেই পথটুকু ফুরিয়ে গেল—দেখি গাড়ি মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ঢুকে পড়েছে।

"আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেবে বলুন"—স্বাতী দেবী জিজ্ঞেস করলেন।

আমার মুখ থেকে কস করে বেরিয়ে গেল, "আমাকে একটু ট্রামা পার্কের কাছে যেতে হবে। যদি আপনার অসুবিধে না হয়…"

"না না, অসুবিধে আর কি?" স্বাতী দেবী বললেন। দেখি ওঁর চোখ দুটো হাসছে, কিন্তু মুখখানা গম্ভীর। এমন অদ্ভুত হাসি আর কারও দেখি নি।…ড্রাইভারকে সেইমত নির্দেশ দিলেন। গাড়ি আবার ঘুরে এসে উত্তর মুখের রাস্তা ধরল।

সিনেমার গল্প থেকে…বাংলা সাহিত্য…রবীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিক রচনা…এইসব প্রসঙ্গে আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নামবার আগে উনি বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ হল অতনুবাবু, কিন্তু তৃপ্তি হল না। কালকে আবার একসঙ্গে বেরিয়ে একটু গঙ্গার ধারে বসা যাবে, কি বলেন?"

এর উত্তরে যে কথাটা আমার বলতে ইচ্ছে হল সেটা গান গেয়ে বললে তবেই ঠিক হত। তাতো আর সম্ভব নয়—কাজেই শুধু মাথা হেলিয়ে ওঁর কথায় সায় দিলাম।

বিদায় নেবার সময় আমার হাতের ওপরে একখানা হাত রেখে স্বাতী দেবী বললেন, "রাত্তিরটা ভাল করে ঘুমিয়ে নেবেন কিন্তু। কালকে অনেক ক'টা সিকোয়েন্স আপনি আছেন।"

ওঁর এই পরামর্শটা একেবারেই বাজে খরচ হয়েছিল, সেটা বেশ মনে আছে—কারণ সে রাত্রে একটুও ঘুমোই নি। সারারাত ধরে চলল সেই একটুকু কথা আর একটুকু হাসা নিয়ে ঘরে ঘরে আলো জ্বালা আর কি। সম্ভব অসম্ভব হাজার রকম কল্পনা বিলাসে গা-ছেড়ে ভেসে যাওয়া। একটার পর একটা দৃশ্য—অভিনয় · রোমাঞ্চকর…আর তার প্রত্যেকটিতে নায়িকা স্বাতী দেবী আর নায়ক অতনু সুর।

তুমি হাসছ?…হাঁ হেসেছ বই কি! আমি স্পষ্ট দেখেছি।…তা হাসবেই তো। সেই ক্যাপামির কথা মনে হলে এখনও আমারই হাসি পায়।

পরদিন শুটিং সুরু হল—আগের দিনের অসমাপ্ত দৃশ্যাংশ। আমার সামনে তখন কেউ নেই—ডিরেক্টার নেই, ক্যামেরাম্যান নেই, সহকারীরা নেই, এমন কি ষ্টুডিও-ও নেই—অর্থাৎ আছে সবই, কিন্তু আমার চোখে সে সবই অবাস্তব—মায়ালোকের জিনিস। আছে শুধু একমাত্র স্বাতী দেবী আর স্বাতী দেবী।

ক্যামেরা থামতে না থামতে ডিরেক্টার ছুটে এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

তার পরের দৃশ্য···তার পরের···তার পরের···এক এক করে সব ক'টা দৃশ্যের শুটিং তরতর করে বয়ে চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সেদিনের মত শুটিং শেষ হল।

আমি ফ্লোরের বাইরে বাগানের বেঞ্চিতে বসে···কখন স্বাতী দেবীর ঘর এসে ডাকবে তারই প্রতীক্ষায়। ফ্লোরের ওপরেই ফকি-চক্রে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ এসেছিল—কিন্তু আমি বসি নি। পাছে দেরী হয়ে যায়।

হঠাৎ দেখি স্বাতী দেবী মেক-আপ ধুয়ে, কাপড় বদলে নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলেছেন, একটু ঘুরে যেখানে বড় ঔদুম্বর গাছটার তলায় কয়েকখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে, সেই দিকে। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হল না।

আমি কিছু না ভেবে-চিন্তে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাঁর কাছাকাছি গিয়ে পেছন থেকে ডাকলাম, "স্বাতী দেবী।"

উনি থমকে থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখে কোন কথা নেই—চোখে শুধু মৃদু জিজ্ঞাসা।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"

মাথা নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ।"

আমার মনটা অনেকখানি দমে গিয়েছিল। তবু মুখ থেকে কথাটা ফসকে বেরিয়ে গেল।

"আজকে আমাদের গঙ্গার ধারে যাবার একটা কথা ছিল···"

এইবার তাঁর ভাবলেশহীন মুখে চোখে একটু ভাববৈচিত্র্য দেখা গেল, সেটা হচ্ছে ঈষৎ বিরক্তি।

"সে তো আমার সময় হবে না···বড্ড ব্যস্ত।"

বলেই আর দ্বিতীয় সম্ভাষণ না করে স্বাতী দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তরতর করে হেঁটে গিয়ে নিজের মোটরে উঠে টকাস্ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আরে আরে। একি। এ যে ছ'টা বাজছে।···সাড়ে ছ'টায় সম্বর্ধনা সভা। পালাও, পালাও, আমাকে এখনি উঠতে হবে।

···তাও কি হয়? কুশল মোমের সম্বর্ধনা, আমি না গেলে পাঁচরকম কথা হবে। জান না তো, ফিল্ম পলিটিক্সের ভেতরে কতরকমের প্যাঁচ।

কিছু মনে করো না।···তোমার ইন্টারভিউ আর একদিন হবে, কেমন?

আচ্ছা, নমস্কার।···

ওহে, দাঁড়াও, দাঁড়াও।·· একটা কথা।

দেখ, আজকে যে ব্যাপারগুলোর কথা শুনলে, সে সব নিতান্তই ব্যক্তিগত। এগুলো যেন আবার ছেপে টেপে দিও না, বুঝলে?

আচ্ছা, এস। নমস্কার।

মেঘমুক্তি

বিভা সরকার

একটি আলো জ্বলছিল দর অন্ধকার দূর করে। একটি বনস্পতি দাঁড়িয়েছিল শত পক্ষীর আশ্রয় নীড় রচনা করে, দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে, সকলকে অভয় আশ্রয় দিয়ে। সে আলো দমকা হাওয়ায় নিভে গেল। গাছটি ঝড়ের তাণ্ডবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কিন্তু দেবপ্রিয় মানুষ চির অপরাজিত। পরাশক্তি তাই অপরাশক্তিতে মিশে গেল—মানবাত্মা বিলীন হয়ে গেল পরমাত্মায়।

পাড়া কাঁদিয়ে বাড়ী অন্ধকার করে উদাসী মধ্যাহ্ন আরও উদাস করে চলে গেলেন আজ বিপত্নীক হরিপদ মজুমদার। চাপা কান্নার রোরা মূর্ছনায় বাড়ী থমথম করে উঠল। শোকাতুর দাসদাসীরা ঢুকরে কেঁদে উঠল, ভীড় জমে গেল মস্ত বাড়ীটার দেউড়ীতে, উঠানে, সদর রাস্তায়। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা কাক-পক্ষীর মুখেই যেন সারা পাড়ায়। কা-কা রবে ডাকাডাকি করতে লাগল অমঙ্গলের কাকেরা বাড়ীটার আনাচে কানাচে।

সদ্যমৃত পিতার সামনে জলভরা মেঘের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উপযুক্ত পুত্র ব্রতীন মজুমদার। পায়ের ওপর আছড়ে কেঁদে পড়লো একমাত্র আদরিণী কন্যা সুহাসিনী—"বাবা! আমাদের ক্ষমা করে যাও, বাবা! তুমি একবার চোখ চাও, বাবা! আমরা আর অবাধ্য হব না!"—সে কান্নায় যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না ব্রতীন, ছুটে বেরিয়ে গেলেন বুঝি কাকে খুঁজতে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে নত মুখে ফিরে এলেন তিনি। মানুষের জীবনে যা ঘটে যায়, যা চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না—যেমন আসে না নদীর জল একই ঘাটে দুবার।

পুরানো দিনের দাসী নিস্তার সোচ্চারে বলতে লাগল ইনিয়ে-বিনিয়ে, "আর এখন খুঁজলে কি হবে দাদাবাবু। তখন একটি বারের জন্য চৌকাঠ পেরতে দিলেনি মানুষটাকে; বাবু আমার ডাকতে ডাকতে প্রাণটা বিসর্জ্জন দিলেন। একবার শেষ ইচ্ছে পুরো হতে দিলেনি তোমরা ছেলেমেয়েরা আজ এই অসহায় অবস্থায়, একি ভাল করলে তোমরা। আর কি মানুষটা ফিরে আসবেন না আর তোমাদের কিছুর জন্য ব্যগ্রতা করবেন।"

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাইলেন ব্রতীন বুড়ীর বকুবকানি কিন্তু নিজের মনকে কি থামাতে পারলেন? কোথায় যেন কি এক মর্ম্মান্তিক আশা নিরুপায় উপন্যাসের মতই এসে বাজতে লাগল। মৃত পিতার শেষ কম্পিত কণ্ঠের আর্ত্তি এখনও যে কানে বাজছে—"সুধাময়ী তুমি এসো। এস সুধাময়ী, এস! আমার যে যাবার সময় হল ভাই।"

ওদিকে কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা যে নারী কম্পিত চরণে সব লাঞ্ছনা অপমান অঞ্জলি দিয়ে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন অতি দীনার মতই আপন চিত্ত দৌর্বল্যের অসহায়তায় তাঁকে তো তিনি চৌকাঠ পেরতে দেন নি। লৌহ যবনিকার মতই আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু কি তাই! ঐ নির্লজ্জা প্রৌঢ়ার আচরণে স্ত্রী পুত্রের কাছে দাসদাসী আত্মজনের কাছে অসম্মানে তাঁর মাথা যেন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এ দুঃসাহসিকার দুঃসাহসে!

গৌরব তাঁর গর্জে উঠে বাধা দিল এই মৃত্যুপথ যাত্রীর ইচ্ছা পূরণে, শেষ সময়ে তাঁকে শান্তি

দিতে পারলেন না তিনি! আজ অক্ষম পিতার শেষ ইচ্ছা কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। চৌকাঠের বাইরে থেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন সেই অবগুণ্ঠনবতী নির্লজ্জা প্রৌঢ়াকে যে তার লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে শুধু একটি বারের জন্য মৃত্যুপথযাত্রী পরম বান্ধবটিকে দেখতে এসেছিল।

সুধাময়ী! সুধাময়ী! উচ্চারিত হয়েছিল হরিপদবাবুর শেষ কণ্ঠস্বরে। পুত্রের দুহাত ধরে অনুনয় করেছিলেন একবার আসতে দেখার জন্য, পুত্র কিন্তু কিছুতেই পারেনি তার পরলোকগতা সাধ্বী জননীর কথা ভেবে। জননীর মৃত আত্মার এমন অসম্মান এমন অপমৃত্যু সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না। এ যে তাঁর সাধের শয়ন মন্দির। মৃত্যু মন্দিরও। এই পালঙ্কে এই ঘরেই যে সে সতীসাধ্বী তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আর আজ সেই ঘরেই পুত্রের দুখের পানে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁদের অনাথ করে চলে গেছেন হরিপদবাবু। ব্রতীনের নির্বাক দৃষ্টির সামনেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে অবহেলিতা অবলুণ্ঠিতা ঐ নারী লজ্জায় বেদনার আরও যেন মাটির সঙ্গে মিশে মূর্ত্তিমতী বেদনার মতই ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলেন। মনে তখন সে নারীর ঝড় উঠেছিল—ব্রতীনের জননীই না আর একদিন এমনি অনাদরেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের। ভুল বুঝেছিলেন তিনি, তাঁকে তিনি কুলশ্রীর মর্যাদা দিতে চাননি আর তাঁর স্বামীকে বড়লোকের ছেলের বেশী কিছু ভাবতেই পারেন নি তিনি। সঙ্কিত সঙ্কুচিত মনে আর পাঁচটা বড়লোকের বদখেয়ালি ছেলের সমপর্যায়ে ফেলতে বাধেনি তাঁর; অমন দেবতুল্য স্বামীকে ভুল বুঝেছিলেন তিনি আগাগোড়া—অভিমানে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন স্বামীকে মিথ্যা সন্দেহে। নিজে মর্মান্তিক ব্যথা পেয়েছেন, এমন মহৎ মানুষটাকেও শাস্তি তিনি কিছু কম দেননি—হাঁ একান্ত সহজ হতে পারত, তাকে তিনি কিছুতেই সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। দোষ তিনি তাঁকে দিতে চান না—কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না! অভিযোগ অভিমান এ জগতে আর তিনি কার কাছেই বা করবেন। যাঁরা শুনতেন, যাঁরা তাঁর মান রাখতেন তাঁরা তো একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বড় ব্যথা পেয়েছেন আজ তিনি—মন বুঝি তাঁর পাথর হয়ে গেছে এ ধাক্কায়। খোকা!—তাঁর পুত্রতুল্য স্নেহের খোকা! সে কিনা আজ দোরগোড়া থেকে চরম উপেক্ষায় অপমানে পথ-কুকুরের মতই তাড়িয়ে দিলে তাঁকে! উপযাচক হয়ে একবার শেষ বিদায় নিতে এসেছিলেন—একবার দেখতেও দিলে না!—অবাধ্য চোখের জলে বুকের বসন ভিজে গেল তাঁর। নিঃসঙ্গ ঘরে বেদনা-মূর্চ্ছিত মনে স্তব্ধ হয়ে বহুক্ষণ বসেছিলেন তিনি, কখন সন্ধ্যা উতরে রাত হয়ে গেছে জানতেও পারেন নি। চোখের ওপরে স্মৃতির একটি একটি পর্দা বিস্মৃতি যবনিকার অন্তরাল সরিয়ে সব যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। একান্ত গরীব ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি। পিতা কোন শৈশবে ছেড়ে গিয়েছেন সে কথা ভাল করে মনেও পড়ে না। আবছা শুধু মনে পড়ে তাদের ছোট ঘরে সেদিন যেন অনেক মানুষের ভীড় আর মায়ের আকুল কান্নার মধ্যে কারা সব বাঁশে বেঁধে বাবাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। আর তিনি ফিরে আসেন নি, বাবার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলে মা শুধু কাঁদতেন, শেষে তাঁর শিশু মনও বুঝেছিল বাবার কথা বলায় মা কষ্ট পান তাই আর সে কোনও কথা মুখে আনেনি। মা তাঁর বড় সুন্দরী ছিলেন, তার অল্প বয়স। হয়ত দুঃখে কষ্টে একবেলা চলে যেত কিন্তু তা সম্ভব

হয়নি। এ পৃথিবীতে অসহায়ের সহায় বড় কম। তাই আপন মান রক্ষায়, সম্মানটুকু বজায় রাখার জন্ত করে ফেলে আসা দূর গাঁয়ের শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁর।

দেশের বাড়ী চিরদিন কাকাই তোগ-দখল করে আসছিলেন। কাকা মানুষ মন্দ ছিলেন না —তবে বিধবা ভাজের বোঝাও নিতে চাননি প্রসন্ন মনে, আবার কুঁজের ওপর বিষফোঁড়ার মতই সকলা বিধবা ভ্রাতৃজায়ার বোঝা বড় একটা আনন্দের হয়নি।

আজও যেন সেই কোন দূর শৈশবের ওপার থেকে কানে ভেসে আসছে তাঁর কাকার গুরুনো সম্ভাষণ—"এলে বৌদি, সব শেষ করে কপাল পুড়িয়ে। তা থাক তুমি তাতে কিছু যায় আসে না, আমার যদি জোটে তোমারও দু'মুঠো জুটবে কিন্তু ঐ কাঁটার কি গতি করবে?"

ছা-পোষা সংসারে পেট-ভাতে একজন দাসী রমণীর প্রয়োজনও তো আছে—তা ছাড়া শ্বশুরের সুখ কুঁড়োয় বিধবা পুত্রবধূর দু'মুঠো অন্নের অধিকারও যে আছে এ তো মনে মনে অস্বীকার করতে পারেন না। রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে তাকে বুকে জড়িয়ে মা সেদিন বড় কান্নাই কেঁদেছিলেন।

তারপর যত তিনি বড় হয়েছেন, দেখেছেন মা যেন কিসের ভাবনায় অজানা আতঙ্কে সদাই কণ্টকিত হয়ে থাকতেন। দুঃখে ভাবনায় শরীরও ক্ষয় হতে লাগলো।

বহুদিনের পর আজ আবার আকুল হয়ে তাঁর স্নেহ মন এই প্রৌঢ় বয়সে সেই উষ্ণ স্নেহ-স্পর্শটুকুর জন্ত আকুল হয়ে উঠেছে!

কোন সময় নিঃশব্দে এসে বুড়ী ঝি বেবুর মা বা জানদা কোণের দেয়ালগিরিটা জেলে দিয়ে গেছে—তাঁকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে কিছু আর বলতে সাহস করেনি। সে যে তাঁর অনেক সুখ দুঃখের সাক্ষী, অনেক দিনের মানুষ। প্রথম যৌবনে যখন তাঁর স্বামী নিয়ে সুখের সংসার তখন যে সে এসেছিলো এ সংসারে। তারপর সুখে দুঃখে জীবনে দীর্ঘ দিনের সে সঙ্গিনী তাঁর আর তারপর আজ এই জীবন অপরাহ্নের এ চরম লাঞ্ছনারও নীরব সাক্ষী যে সে। মায়ের মমতা নিয়েই এক সময় এসে ভুলেছে সে তাঁকে—অনেক অনুনয় বিনয়েও জল একটু মুখে দেওয়াতে পারেনি। তার স্নেহকাতর অনুরোধের উত্তরে কাতরে বলেছেন তিনি—বেবুর মা! আজকের মত তুই আমায় রেহাই দে! বেঁচে যখন রইলুম সবই করব বেবুর মা! খাব না ত যাব কোথায়? তবে আজ আমায় কিছু বলিস নি জানদা! স্নেহটা যে তাঁর এখনও ছাই হয়ে যায়নি রে! দিক আমায় তাড়িয়ে খোকা—তবু খোকা জল না খেলে কি আমি মুখে জল দিতে পারি। তুই কি সব ভুলে গেলি জানদা! খোকা আমাদের কি! খোকা পাশ করলে সে কি আনন্দ তাঁর, ছুটে এলেন আমাদের খবর দিতে, কত আমোদ আহ্লাদ সেদিন আমাদের। উনি ছুটে গিয়ে মিষ্টির ঝুড়ি কিনে আনলেন—মনে নেই তোর? কেউ কি আমরা সেদিন ভাত খেয়েছিলুম, তোদের পর্যন্ত পেট-ভরা মিষ্টি খাইয়ে ছাড়লেন উনি। ওঁরা যে দুটিতে অতিম হৃদয় ছিলেন রে! স্নেহময় ভাই হয়, কর্তব্যপরায়ণ বাপ হন কিন্তু অমন বন্ধু আর হয় না রে।

এমনি ধারা বেবুর মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় বুকের বোঝা হাল্কা করে সে দুঃখের রাতও তাঁর কাটল।

ভোরে উঠে ছুটে গেলেন গঙ্গায় জানদাকে নিয়ে। বাবা শ্মশানেশ্বরের পায়ে প্রাণের প্রণাম

নিবেদন করতে ঢেলে দিতে জীবনের সমস্ত আতুরতা। বহুক্ষণ সন্ধ্যার ধারে বসে থাকার চরণামৃত পাণে মনকে শান্ত করে ফিরে এলেন শূন্য ঘরে। যে শূন্যতা হরিপদবাবু সৃষ্টি করে গেলেন এ আর পূর্ণ হবার নয়! যখন স্বামী হারিয়েছিলেন—সব ঝড় ঝাপটা আগলে সামনে এসে "আমি ত আছি" বলে পর্বতের আড়াল রচে পরম অভয় দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে আগলেই গেছেন, কোনও দিনও মুখ ফুটে কিছু চাননি। সারাবিশ্ব আজ তাই বোবা কান্না নিয়ে যেন জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে শিউরে উঠছেন তিনি। সেখানে যে শুধু শূন্যতার পর শূন্যতারই অনুবৃত্তি। জীবন ভরা শুধু স্মৃতির রোমন্থন!

• • • •

ব্রতীন ফিরে এলেন ঘরে সদ্য পিতৃশোকের অবসাদক্লান্তি নিয়ে? মনে তাঁর স্বস্তি ছিল না—কেবলই তাঁর অপরাধী মন, মনে মনে পিতৃচরণে ক্ষমা চাইছিল। আহার নিদ্রা স্বস্তি সব যেন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিসের এক অব্যক্ত বেদনার পীড়নে পীড়িত হয়ে ফিরছিলেন তিনি। কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না। কেবলই যেন মনে হচ্ছিল তাঁর মৃত পিতার আত্মা হাহাকার করে ফিরছে। কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা মস্ত মিথ্যা, মস্ত ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে নইলে অমন স্নেহময় দেবতুল্য পিতার একি আচরণ?—তারপর অসোচরের মধ্যেই একদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রৌঢ়ার দরজায় আত্মাবঞ্চিত তিনি। সম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে ছুটে গিয়েছিল দেওয়ান রাজাবাবুর আগমন সংবাদ দিতে।

আয়! আয় বাবা! এতদিনে তুই এলি বলে ছুটে এসেছিলেন সুধাময়ী। তাঁর ভাল করে চমক ভাঙার আগেই তাঁকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ওপরে সুধাময়ীর ঘরে। চমকে উঠেছিলেন ব্রতীন এঁর ঘরের এ নিরাভরণ সাজসজ্জা দেখে। এদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয় তার কিছুই ছিল না এ ঘরে। বার বার মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র মুদ্রিত ছবি তাঁর পিতার ও গৃহস্বামীর যুবক বয়সের। অতি যত্নে শ্রদ্ধায় কে যেন সেখানি টাঙিয়ে রেখেছে তথাকথিত ঠাকুর ঘরের মত স্থানে। তাকের ওপর নানা বইপত্র দেবদেবীর মূর্তি• পট, কোশাকুশি, পূজার সামগ্রী। একটিমাত্র আসন পাতা। আসনের সামনে পাথরের রেকাবিতে সদ্য তোলা কয়েকটি বেল ফুল। ঠাকুরকে নিবেদিত নৈবেদ্যর থালা। মুদ্রিত মূর্তির গলায় দুলছে একটি সযত্ন রচিত ফুলের মালা। কাল সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই পরান হয়েছিলো সে মালা—একটু মলিন হয়ে এসেছে। এর বেশী আর কিছু জানেন নি সেদিন, জানতে চাননি। তবে যে ক্ষোভ যে বেদনা এতদিন তাঁকে অহোরাত্র বিড়ম্বিত করছিল তার হাত থেকে তিনি যেন মুক্তি পেয়েছিলেন। বড় প্রশান্তি নিয়ে ফিরেছিলেন। মাতৃহারা স্নেহ বুভুক্ষা প্রাণে সুধাময়ীর স্নেহ, স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বহুক্ষণ নীরবে মুখোমুখী তাঁরা বসেছিলেন। গণ্ড বেয়ে তাঁদের অবাধ্য অশ্রুজল ঝরে পড়ছিল তাঁদের সে মিলিত অশ্রুধারায় হরিপদবাবুর, আত্মার জ্বালা বুঝি জুড়িয়ে গিয়েছিল। ব্রতীন উঠতে যাবেন—কাতরে অনুনয় করে বলেছিলেন সুধাময়ী—এলি যদি বাবা! এমনি শুধনো মুখে যাসনে—বলে তাড়াতাড়ি পাথরের গ্লাসের মিছরীর পানা চৌকি থেকে তুলে এনে ধরেছিলেন তাঁর সামনে। মন তাঁর আবার বিষাগ্রস্ত হয়েছিল, কুণ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি এই অশৌচাবস্থায় যত্ন তত্ন আহার গ্রহণে। আকুল হয়ে

কেঁদে ফেলেছিলেন সুধাময়ী—ওরে! তুই যা জানিস সব মিথ্যে। সব ভুল! এতবড় মিথ্যে জগতে আর কিছু নেই রে! তুই বিশ্বাস কর বাবা! আমাদের সম্বন্ধে কোনও কুসুম নেই, নেই কোনও গ্লানি। তা থাকলে কি আমি তোর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি, না তিনিই আমায় ডাকতে পারেন। দেবতার মত মানুষটা তোরা কেউ চিনলি না! আমার মত অভাগীর জন্য আজন্ম কত দুঃখ, কত না সাহনা, কত মিথ্যা কলঙ্কই না নিয়ে গেলেন। অসময়ে অকালে মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—সারা জীবন আড়াল দিয়ে রক্ষে করে গেলেন, গায়ে ধুলোটি লাগতে দেন নি। তিনি কি সাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁর কথা থাক বাবা! সকলে ভুল বোঝে বুঝুক, ঘৃণা করে করুক, তুই ভুল বুঝিসনি, এ যে আমি সইতে পারব না! বলে পরম স্নেহে তাঁর হাত ধরেছিলেন।

দ্বিধা করতে পারেননি ব্রতীন, বারবার এই মাতৃসমার কাছে অপরাধের ক্ষমা চাইতে মন চেয়েছিল—সঙ্কোচ এসে বাধা দেওয়ায় বাস্তবে কিছু বলে উঠতে পারেন নি। পান করেছিলেন মিছরীর পানা সেই মমতাময়ীর হাত থেকে নিয়ে। বারবার কপালে করস্পর্শ করে তিনি বলেছিলেন, প্রাণ থাকতে আমি কি তাঁর আত্মার অকল্যাণ করতে পারি—না তাঁর মত মহাশয়ের অকল্যাণ করা তোর আমার সাধ্য বাবা?

বড় শান্তি নিয়ে ফিরেছিলেন সেদিন ব্রতীন, কয়দিন অনিদ্রা দুশ্চিন্তার পর আজ যেন তিনি একটু আরামে ঘুমিয়েছেন। ঘুমের মধ্যে তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর পিতার মুখে বেদনাকাতর দুঃখের ছায়া মিলিয়ে প্রশান্ত জ্যোতি ঝলমল করছে। তিনি যেন প্রসন্ন অন্তরে তাঁদের আশীর্বাদ করছেন।

• • • •

কথায় কথায় কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে সুধাময়ীর খেয়াল ছিল না—ব্রতীনও চলে গেছেন বহুক্ষণ। তবুও সুধাময়ী আত্মগত, যেন স্মৃতির রোমন্থনই করে চলেছেন। কত দিনের কত ছোটখাট ঘটনা মনে জেগে তাঁকে আজ উদ্বেল করে তুলেছে।

সম্ভ্রমের আড়ালটুকু চিরদিনই পরম শ্রদ্ধা জাগিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। প্রতিদিন শুধু দিনান্তে একবার আসা। কিছুক্ষণ মুখোমুখী বসা। সামান্য কিছু জলযোগ, কখনও দুএকটি ভজন গান। কোনও দিন তাও না। কিন্তু এইটুকুর জন্যই যে পাগল হয়ে থাকতেন তাঁরা। এইটুকুর জন্য কত ঝড় উঠেছিলো, কত দুঃখ বেদনা। নীচের ভাড়াটেরা বিদায় দিয়ে চলে গেছে—গালাগালিতে কর্ণ বধির করে। আবড়োদের এ চলাচলি আর সহ্য করা যায় না! ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে মুখ কালো করে ফিরে এসে বলেছেন হরিপদবাবু—'কেন এমন হল সুধাময়ী। এখানে আমি তো নতুন নই! এ বাড়ী কিনে অবধি আমার কোনও দিনই বাধ বাধেনি এখানে আসা।' সে সত্য কিন্তু কি জবাব দেবেন সুধাময়ী। স্বামীসিমন্তিনী আর স্বামীহীনার যে বড় তফাৎ সমাজের চক্ষে। হরিপদবাবুর অর্থানুকূল্যেই কেনা এ বাড়ী, তিনি টাকা ধার না দিলে তাঁদের সাধ্য কোথায় কেনবার। কেরৎ কি নিতে চান, কিছুতেই নিতে চাননি—শেষে স্বামী যখন বলেছিলেন, তাই গরীব বলে কি সম্ভ্রমও রাখতে দিবিনি? শেষে কি ক'টা টাকার জন্য বন্ধুত্বটাই যাবে! এ বাড়ি আমি আজই বেচে দিতে পারি কিন্তু তোকে তো হারাতে পারি না ভাই।

আর কিছু বলেন নি হরিপদবাবু। মাস মাস ভাড়ার টাকার শোধ দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর টাকা। ভাড়ার টাকা তারপর ব্যাঙ্কেই জমা পড়েছে, সুধাময়ীর কোনও প্রয়োজনেই আসেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন ভাড়াটেরা ছিল তাইতেই চলে গেছে তাঁর উপরন্তু জমেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে ভাড়াটেরা উৎপাত আরম্ভ করলে, ভাড়া দেওয়া বন্ধ করলেন। একা মেয়ে মানুষ পেয়ে নানা ঝঞ্ঝাটে অশান্তিতে ভরে তুলে অতিষ্ট করে দিলে তাঁর জীবন। বাধ্য হলেন হরিপদবাবু দারোয়ান রাখতে—পুলিসের ভয় দেখিয়ে অতি কষ্টে, একরকম জোর করেই তুলে দিলেন তাঁদের।

সুধাময়ীর একান্ত অনুরোধেই কখনও কোনও অর্থ সাহায্য করেন নি তিনি। নিচের তলাটা খালিই পড়ে আছে সেই থেকে—এই দারোয়ানেরাই এখন সপরিবারে থাকে। সামান্য কিছু কিছু দেয়ও, মানুষগুলো বড় ভাল। সুধাময়ীকে মায়ের মতই স্নেহ শ্রদ্ধা করে। বলে ভাড়া নয় মা! এ আমাদের প্রণামী। সব বিপদে আপদে বুক দিয়ে দাঁড়ায়। সামান্য তাঁর প্রয়োজন স্বামী যা রেখে গেছেন তাইতেই মিটে যায়।

কখনও গাড়ী নিয়ে এ বাড়িতে আসতেন না হরিপদবাবু, হেঁটেই আসতেন—বলতেন একটু হাঁটা চলা ভাল, শরীরটা ভাল থাকে। সামান্য এই একখানি ঘরেই তাঁর স্বর্গরাজ্য পড়ে থাকতো। নিজের অতবড় প্রাসাদোপম বাড়ি তাঁকে বাঁধতে পারেনি, ছুটে আসতেন তিনি একটি মাত্র ঘরের একখানি রান্নাঘরে অমৃতের আস্বাদনে—কোনও দিন বা একটা পাটিসাপটা, কোনও দিন বা একটু সুজির মোহনভোগ, কোনও দিন দুখানা নিমকি দিয়ে একটু জলখাবার সাজিয়ে দিতেন সুধাময়ী পরম যত্নে পরম মমতায়। ঘরের রাজভোগ ফেলে কিসের লোভে তাঁর এ বিদুরের খুদে আকর্ষণ সে জানেন শুধু অন্তর্যামী আর টের পাননি কি সুধাময়ী? কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

সময়ের ফলটা, এটা ওটা প্রায়ই তিনি হাতে করে কিছু একটা নিয়ে আসতেন। অভিযোগ করলে সুধাময়ীকে বলতেন বেশ। রাগ কর যদি আর আনব না কিন্তু আমারও আর এ সব খাওয়া হবে না তাই। মনেও থাকে না আর দেবেই বা কে বল? অনুপমাও নেই যে জোর করবে। খোকাও নিজেদের মত থাকে—বড় হয়ে অবধি খোকাটা কেমন যেন আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতেন সুধাময়ী।

হরিপদ মানুষটা বড় আপন ভোলা, তাই দেখিয়ে না দিলে বড় একটা কিছু চোখে পড়ে না তাঁর। কোন কথা কোথায় গিয়ে কাকে বাজছে সে আর বুঝতেও পারতেন না। আপন মনেই বলে যেতেন। একধারে বসে সুধাময়ী ফল কাটতেন, পান তৈরী করতেন আর থালা সাজাতেন—এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে গেছে!

• • • •

অকূল সমুদ্রে পড়লেন যেন প্রবীর। এতবড় বাড়ীর তত্ত্বাবধান, এতগুলি লোক—বিরাট কারবার তাঁর জমা খরচ হিসাব নিকাশ—ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে গেল তাঁর। কোনও দিনই আজ পর্যন্ত কিছু ভাবতে হয়নি তাঁকে। সংসারের চাকা বেশ মসৃণ ভাবেই ঘুরে যাচ্ছিল—কোথাও কোনও অসুবিধা থাকতে পারে এ চিন্তাটুকুও কোনও দিন করেননি তিনি। নিঃশব্দে নীরবে যিনি এই চাকাটি ঘুরিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর অভাব যেন বড় গভীর হয়েই বাজছে।

ধনীর একমাত্র সন্তান ; কখনও কোনও অভিযোগ অনটনের কথা শোনেন নি। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে পিতাকেও জানাতে হয়নি। শুধু নিয়ে নেওয়া সরকার মশায়ের কাছ থেকে। আজ যেন সত্যই বড় অসহায় বোধ করছেন তিনি। থেকে থেকে অন্তমনস্ক মন তাঁরই কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাইছে, যাঁর কাছে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান করে নিতেন—কিন্তু আজ তিনি পাবেন কোথায় তাঁকে। তিনি যে তাদের সব মান অভিমান, চাওয়া পাওয়াই, সুখ দুঃখের বাইরে চলে গেছেন।

প্রান্ত ক্লান্ত মন নিয়ে প্রায়ই ছুটে যেতেন ব্রতীন সুধাময়ীর কাছে পরামর্শের জন্ত, একটু স্নেহ শান্তির জন্ত—একান্ত মাতৃ-স্নেহকাতর পুত্র সুধাময়ীর সান্নিধ্যে তাঁর সেই হারানো মাণিকের সন্ধান পেয়ে আকুল হয়ে ছুটে আসতেন। সেই আশৌচের বেশেই এসে বসতেন তিনি সুধাময়ীর কাছটিতে। পান করতেন নিজ-রচিত জলখাবার পাথরের গেলাসের পানা। চুপচাপ মুখোমুখী বসতেন দুজনে এ সময়টিতে, বারবার তাঁদের মাঝখানে যুঁই একটি বিদেহী আত্মা নেমে আসতেন। তানপুরায় সঙ্গতে, তন্ময় হয়ে যেতেন কোনও দিন বা সুধাময়ী। নয়ন বেয়ে তাঁর গড়িয়ে পড়ত ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুজল! বহুক্ষণ কেটে যেত এমনি করে। তারপর চমকে উঠে একদিন বলতেন তিনি—খোকা! বড় দেরী করে ফেলেছি বাবা! তাড়াতাড়ি যা বৌরাণী যে ভাবছেন তোর জন্তে, এতক্ষণে হয়ত বা অস্থির হয়ে ঘর বার করছেন তিনি। তুই আর এমন করে রোজ রোজ আসিসনি বাবা! আমি চিরকালই তোদের আলাতুম। অথচ পরের দিন ঠিক তেমনি নৈবেদ্য সাজিয়ে আকুল প্রাণে পথ চেয়ে বসে থাকতেন—কখনও বা ব্রতীনকে অনুরোধ করে বলতেন—একবার বৌরাণীকে আনতে পারিস বাবা!

দৈবাৎ অসুখ বিসুখ হলেও সংবাদ পাঠাতে তাঁকে ভুলতো না তাঁর খোকা। আজকাল তিনি দেবতার পায় শুধু একটি কথাই মাথা কুটে কুটে জানাতেন—প্রভু, তুলে নাও এইবার অভাগীকে—আর কত বাকি!

ওদিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিসের টানে এমন করে ছুটে আসেন ব্রতীন। বধূমাতা কেঁদে বলেন, বুহস্পিনী একেও-যাদু করেছে।

• • • •

একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় ব্রতীনের কাছে খুলে ধরেছিলেন আত্মপরিচয় জীবনের ইতিহাস সুধাময়ী। আশ্চর্য্য সুধাময়ী কাকার ঘরেই মানুষ। অনাথিনী মাকে দেখেছেন দাসীবৃত্তিতে জীবন বিলোতে। বাকার মধ্যে রূপ আর সুরেলা কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাঁর। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয়, সঙ্গীত-কলাবিদ মানুষ। কাকার ছেলের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। তাঁর রূপ আর কণ্ঠ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো—উপযাচক হয়ে তিনি তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কাকা আপন ভরার জন্ত তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রূপে না হয় অর্থকৌলিন্যে কুলিন, উপযুক্ত পিতা বর্তমানে তাকে ছেড়ে উনি আমায় গ্রহণ করলেন—আমার মা ছিলেন কপর্দকহীন। মা কাকার আক্রোশে পড়লেন, আমি তাঁর বিষ নজরে। যার জীবনে নতুন করে অশান্তির ঝড় উঠলো। জ্ঞাতিরা ছাড়া যার একটা আপন বলে ওরও কেউ ছিল না—গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাসা নিয়েছিলেন। তাঁকে আর তাঁর মাকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছিলেন। অনেক যত্নে, অনেক অধ্যবসায়ে গান শিখিয়েছিলেন তাঁকে। মা মারা গেলে বড় নিঃসহায় মনে হয়েছিলো দুজনার—শৈশবে মাতৃহারা তিনি আমার মায়ের মাতৃস্নেহে ধন্ত হয়েছিলেন—মাও তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন।

তোর বাবা আর ইনি ছিলেন সমপাঠী। আমার স্বামী ছিলেন একান্তই গৃহস্থ আর তোর বাবা ছিলেন মহাধনী, তবুও মনের অমিল হয়নি কোনওদিন—চিড় পড়েনি বন্ধুত্বে। প্রায়ই তিনি এসে বসতেন সান্ধ্য মজলিসে। আমার স্বামী গান করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন, আমিও মাঝে মাঝে গান করতুম—উনি ছিলেন নির্বাক শ্রোতা তবু আমরা নীরবে পরস্পরের মধ্যে যে প্রেমের ফল্গুধারা সখ্যতার বন্ধন বয়ে চলেছে তা অনুভব করে ধন্য হতুম, পূর্ণ হতুম, চরিতার্থ হতুম। অন্তরের ত্রিধারায় যেন ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল। আমরা তিনজনে যেন এক আত্মা হয়ে বিভোর হয়ে যেতুম। কতদিন তোর বাবা আমাদের এখানে আসা নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে যে কানাকানি হয় সে কথা বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়তেন। তোর মাও কোনও দিন এটা সহজ ভাবে নিতে পারেন নি। পাঁচজনের কানাকানিতে তাঁর মনকেও বিষাক্ত বিচলিত করেছিল। বিদ্বেষের ছায়াই পড়েছিল সেখানে। নিছক বন্ধুত্ব; গানের প্রেরণায় তাঁর এখানে আসা এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন নি। এ আসরে তাঁকে একদিনের জন্যও আনতে পারা যায় নি। দোষ তাঁকে দেওয়া যায় না। প্রত্যহ সবকিছু উপেক্ষা করে স্বামী যেখানে ছুটে যান সেখানে রয়েছে এক যুবতী নারী। আর পাঁচজন মেয়ের পক্ষে যে কথা তাবা স্বাভাবিক তিনিও তাই ভেবেছিলেন। বাবা! ধনীদের আশপাশের হাওয়া যে কত বিষ, কত কদর্য ছিল সে আর আমার চেয়ে বেশী কে জানে! মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁকে ডেকে আমার সব ভার দিয়েছিলেন; প্রাণপণ তিনি বন্ধুর কাছে সে সত্যের মর্যাদা রেখে গেছেন।

কত সময় মন ব্যাকুল হয়েছে, কেবলই আমার ধ্যানে স্বামীর মুখের পাশে ভেসে উঠেছে তাঁর মুখ। কখনও বা তাঁর মুখ স্বামীর মুখকেও আড়াল করেছে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কখনও কোন বেহুঁশ মুহূর্তেও এর ব্যতিক্রম হয়নি বাবা! কখনও এমন কিছু ঘটেনি যাতে তোর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে না পারি। তিনি যে আমার ইষ্টদেবের সঙ্গে এক হয়ে একাকার হয়ে গেছেন।

• • • •

শ্রাদ্ধের আর তিনটি দিন মাত্র বাকি; ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্রতীন কাল অনেক রাত্রে শুয়েছেন। চিরদিন যত্নে লালিত দেহ কমল শয্যায় যেন বিশ্রাম পায় না, ঘুম আসে না—বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ করেছেন। ভোরের দিকে স্বপ্নের ঘোরে মা! মা! বলে চিৎকার করে উঠলেন। তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে ছুটে এলেন বৌরাণী।

মাকে বুঝি স্বপ্ন দেখছিলে? শুধালেন তিনি। ক্ষণেক নির্বাক হয়ে বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইলেন ব্রতীন, তারপর উত্তর দিলেন—হ্যাঁ গো! মাকেই তো স্বপ্ন দেখছিলুম, আমার স্নেহময়ী মাকে যিনি আজও বেঁচে আছেন—সকাল সন্ধ্যায় আমাদের কল্যাণ কামনা করছেন! জন্মদাত্রীই কি শুধু মা? যিনি অহরহ কল্যাণকামী তিনিও কি মা নন?—শুদ্ধ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন বৌরাণী ব্রতীনের স্নেহকোমল ভক্তি-বিহ্বল মুখের দিকে। আস্তে আস্তে তাঁরও মন থেকে সন্দেহের কালো ছায়াটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল—মেঘমুক্তির পর আজ সার্থক সূর্যস্নান হল তাঁদের। চল না আজ তাঁকে আমরা প্রণাম করে আসি। হাসিমুখে আবার কহলেন বৌরাণী। নবীন উৎসাহে নবোদ্যমে উঠে দাঁড়ালেন ব্রতীন—বিহ্বল কণ্ঠে শুধালেন—সত্যই কি যাবে তুমি? কণ্ঠে তখনও সন্দেহ। যাব না ত কি মিথ্যে! হ্যাগো হ্যাঁ, যাবো। যাবো যাবো। এক মুহূর্তের মতই ঝলমলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা সেই ভোরেই কাউকে কিছু না বলে।

ব্লুম্‌সবারি ঃ একটি আধুনিক চেতনা

দীপক চক্রবর্তী

প্রত্যেক দেশে সাহিত্যের ইতিহাসে যে কোন আন্দোলনের সূত্রপাত বিরোধিতা থেকে। দীর্ঘদিন মানুষের মন কোন একটি বিশেষ মতবাদ বা একাধিক অচল বিশ্বাসের বন্ধনে অসাড় হয়ে এলে প্রয়োজন হয় পুনর্মূল্যায়নের এবং তার প্রকাশ স্বতঃই ভিন্ন। কখনও বা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ। আবার কখনও স্বেচ্ছাচারিতার তুমুল বিস্ফোরণ। ভিক্টোরিয় ইংলণ্ডের নির্বিচার, নিশ্চিন্ত মূল্যবোধের শান্ত রজনীগন্ধার বনে ঝড় তুলেছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ ১৮৯০ এর প্রচণ্ড শিল্পীরা। আর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নিত্যনূতন জিজ্ঞাসায় বুদ্ধি-বোধ রুচিঃ জগতে কালান্তর আনলেন লেখক-শিল্পী-দার্শনিক-বিজ্ঞানীর সার্থক সমাহার ব্লুম্‌সবারি গোষ্ঠী।

Blumsbury নামের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে শ্রীমতী ভেসনও ম্যাকার্থি ১৯১০ সাল নাগাদ একটি চিঠিতে প্রথম একজন বন্ধুকে 'the bloomsberries' নামে অভিহিত করেন। ক্লাইভ বেল যদিও এ-বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন। তিনি প্রথমে কেমব্রিজ গ্রুপ এবং গর্ডন স্কোয়ার ও ফিজরয় স্কোয়ারে সভার কথা উল্লেখ করেছেন। ও-ছাড়াও ১৯১৪ সালের পর যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের নাম সন্নিবেশ করেছেন।

ব্লুম্‌সবারির সদস্যরা আমাদের এই যুগে 'বর্বরতার লক্ষণ' দেখেছিলেন। তাঁরা নতুন বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে বুর্জোয়া সভ্যতার অবদান চেয়েছিলেন। ষ্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁর আত্মজীবনী 'ওয়ার্ল্ড উইদিন এ ওয়ার্ল্ড' পুস্তকে ভর্জিনিয়া উলফ্‌ এবং তাঁর বন্ধুদের কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন,

> তাঁদের রুচিসম্মত গ্রামের বাড়ি, লণ্ডন ফ্ল্যাটে তাঁরা সপ্তাহান্তে ছোট্ট পার্টি দিতেন। সেখানে ইতিহাস, চিত্রকলা, সাহিত্যালোচনা, গল্পগুজব হতো। তাঁরা যে-কটি সুন্দর গল্প সেই সময় লিখেছিলেন তার সঙ্গে বোক্কাচ্চিওর গল্পে বর্ণিত প্লেগের সময় ফ্লোরেন্স ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে বন্ধুদের গল্পে মশগুল থাকার মিল আছে। স্পেণ্ডার বলেছেন ত্রিশের দশকে বিবেকবশত আমরা গল্প-বলা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে পালিয়ে যেতে পারিনি। 'ষ্টর্ম ওভ ষ্ট্রাঙ্গ' এর সময় গোটের সমসাময়িকদের মত আমরাও ঘটনাবলীর সঙ্গে লিপ্ত ছিলাম এবং ঠিক তাঁদের মতই বেদনার্ত বোধ করেছি। গোড়ায় প্রবল উৎসাহে রুখে দাঁড়িয়েছি, পরে বহু কষ্টে ও ঘৃণায় বিরোধিতা করে গেছি।

নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পেণ্ডার খাঁটি কথা বললেও ব্লুম্‌সবারির সদস্যদের উপর তিনি অবিচার করেছেন। কেননা তাঁরা বাউণ্ডুলেদের মত বর্ষাবিদ্ধ সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়ানদের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তাঁদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষদের মতই তাঁরা সমাজের মধ্যে বাস করে বুদ্ধিজীবী হিসেবে আন্দোলন করেছেন। অন্য কারুর মুখের দিকে চাননি। লেডি ট্রেভি তাঁর পুত্রকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে রচনা তিনি পছন্দ

করেননি। কেননা তাঁর মতে ভিক্টোরিয়ার নির্মুক্তির পরিচয় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এমনকি যীশু তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার চেষ্টা করেছেন।

ব্লুমস্‌বারিকে অনেকে পারস্পরিক প্রশংসার গোষ্ঠী বলেছেন। বলা বাহুল্য, সদস্যরা প্রত্যেকে নিজেদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই যুগের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, বারট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। ফর্স্টার এবং ভর্জিনিয়া উল্‌ফের মধ্যে দুজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিককে ভেক্টিড গার্ণেটের মধ্যে একজন প্রতিভাবান fantasist-কে তাঁরা পেয়েছিলেন। ক্লেটি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার, ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি রবিবাসরীয় 'টাইম্‌সে'র একজন পরমা নম্বর সমালোচক। রজার ফ্রাই আর ক্লাইভ বেল সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ দুজন শিল্প সমালোচক। ডানকান গ্রাণ্ট এবং ভেনেসা বেল দুজন আলোকসামান্য চিত্রকর। ফলত ব্লুমস্‌বারির বন্ধুদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন মিল না থাকলেও তাঁরা বন্ধুসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন একই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রেরণায়।

ব্লুমস্‌বারির সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নন্দনতাত্ত্বিক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নীতিবাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাঁরা প্রেরণা নিয়েছেন নৈতিক দর্শনেরই একটি বই থেকে। জি. ই. মূরের 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে কাল্পনিক নীতিবাদের সূত্র ধরে লেখক যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সৌন্দর্যবোধকে পরম শুভ বলে নির্দেশ করেছেন ব্লুমস্‌বারির বুদ্ধিজীবীদের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের সূত্রপাত সেখান থেকে। প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব মতামত থাকলেও দলের মধ্যে একটি অন্তর্লীন ঐক্য ছিল। কেননা তাঁদের সকলের শিক্ষা এবং বিশ্বাস প্রায় একই রকমের জোরালো। তাঁরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বাসিন্দাভুক্ত। অধিকাংশ সভ্যই এসেছেন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শান্তিবাদী বা বিবেকবান যুদ্ধবিরোধী। তাঁরা গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। তাঁদের সকলের কাছে জীবননির্বাহে বন্ধুত্ব এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতার স্থান সর্বাগ্রে। তাঁরা সকলেই সংস্কৃতিবান, সহজ ব্যবহার, আত্মার আনন্দ এবং কঠিন উৎসর্গে বিশ্বাসী।

এইভাবে একটি সুসংস্কৃত বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডল গড়ে উঠল, যার একমাত্র লক্ষ্য নিরন্তর, নির্ভয় সমালোচনা। এতে ধার থাকলেও এগুলি ছিল পরিহাস রসমধুর। ব্লুমস্‌বারির বন্ধুরা এক মনে একটি 'বিশেষ মানসিক অবস্থায়' উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা প্রেম, সৌন্দর্য ও সত্যবস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্মিলন সহজসাধ্য হয়। ফলে তাঁরা পার্থিব মূল্যবোধ, সম্পদ, ক্ষমতা এবং সামাজিক পদের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। নিজেদের একটি বুদ্ধিজীবী অভিজাতশ্রেণী বলে ভাবতে তাঁরা পছন্দ করতেন। প্রসঙ্গত, ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি হেনরী জেমসের উপর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, অভিজ্ঞতা নির্ভর একটি নূতন মূল্যবোধ গড়ে তোলাই আমাদের সব আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই কাজের চেয়ে সোজাসুজি অনুভূতির উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সদস্যরা 'আদিপাপের' কথা অস্বীকার করলেন এবং মানুষের বিবেচনাবোধকে অগ্রাধিকার দিলেন। অতি প্রাকৃতবোধকে অস্বীকার করলেও মানুষের ধার্মিক স্বভাবকে মেনে নিলেন। এক কথায় বলা যেতে পারে, তাঁরা নীতিবোধ বিষয়ে কখনই উদাসীন ছিলেন না শুধু অর্বাচীনদের হাতে তা অস্ত্রে পরিণত না হয় সে দিকে তাঁদের দৃষ্টি সজাগ ছিল। ব্লুমস্‌বেরির বন্ধুরা সেদিন প্রথম যে আধুনিক চেতনাস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন আজ আমরা সেই বুদ্ধিজীবী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছি। তাঁরা যে সুস্থ সংস্কৃতিবোধের অনুপ্রেরণায় জীবনপণ করেছিলেন তা আমাদের কাছে সহজলভ্য বলেই তার মূল্য কম নয়।

মা

মূল : নাতালিয়া গিনসবার্গ

অনুবাদ : নীলিমা দে

[**লেখক পরিচয় :** আধুনিক ইতালির বিশিষ্ট লেখিকা নাতালিয়া গিনসবার্গের মা বাবা দু'জনেই ছিলেন ইহুদী। তাঁর জন্ম ১৯১৬ সালে। প্রথম বিবাহ সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার সিজো গিনসবার্গের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালে তত্রলোক মারা যান। সম্ভবত জার্মানরা বিষ খাইয়ে তাঁকে হত্যা করে। ১৯৫০ সালে নাতালিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ; বর্তমানে তিনি রোমে আছেন। তাঁর স্বামী গেব্রিয়েল রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।]

ওদের মা ছিলো বেঁটে আর রোগা। কাঁধ কিছুটা গোল। যে-পোশাক সে সব-সময়েই পরত তা হলো একটা নীল স্কার্ট আর একটা পশমী ব্লাউজ। খাটো চুল, কালো কোঁকড়ানো। চুলে যাতে জট না বাঁধে তার জন্য সে মাথায় তেল ব্যবহার করত। রোজ ভ্রু কামাতো, যাতে ভ্রু দুটিকে মনে হয় দু'টো কালো মাছের মতো, সাঁতরে চলেছে কপালের দিকে। মুখে মাখতো হলদে পাউডার। তার দেহের কানায় কানায় যৌবন। বয়েস যে কতো তা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারতো না। তবে স্কুলের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মায়েদের তুলনায় সে অনেক বেশি তরুণী ছিল। তাই সহপাঠীদের মাদের দেখে ওরা অবাক হ'য়ে যেতো। তারা কী বুড়ি আর মোটা! মা প্রায় সব সময়ই ধূমপান করতো। ফলে তার আঙুলের রং হলদে হ'য়ে গিয়েছিলো। এমন কি ঘুমোবার ঠিক আগেও সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট টানতো। বড় খাটটাতে হলুদ রঙের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোতো ওরা তিনজন। খাটের যে ধারটা একেবারে দরজার কাছে, সে ধারে ঘুমোতো মা। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প থাকতো ; লাল কাপড়ে ঢাকা। কারণ সে রাত্রিবেলা পড়াশুনো আর ধূমপান করতো। মাঝে মাঝে রাতে সে বেরি ক'রে বাড়ি ফিরতো। ছেলেদের চোখে ঘুম আসতো না। মা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করতো, এতক্ষণ সে কোথায় ছিল। মা উত্তরে বলতো 'সিনেমায় গিয়েছিলুম', কিংবা 'আমার এক বান্ধবীর কাছে ছিলুম'। ছেলেরা জানতো না এই বান্ধবীটি কে। মায়ের কোনো বান্ধবীকে কোনোদিন তারা এ বাড়িতে আসতে দেখেনি। জামা-কাপড় ছাড়বার সময় সে ছেলেদের অন্যদিকে মুখ ক'রে শুতে বলতো। তখন তারা শুনতে পেতো মায়ের পোশাকের ক্রত খসখস শব্দ। দেয়ালে নাচত ছায়া। দীর্ঘ দেহটি ঠাণ্ডা, পশমী রাত্রিবাসে জড়িয়ে মা এসে শুয়ে পড়তো ছেলেদের পাশে। মা'র কাছ থেকে ওরা একটু স'রে শুতো। কারণ মা প্রায়ই অভিযোগ করতো, ওরা নাকি বড্ড বেশি গায়ের ওপর এসে পড়ে, ঘুমের মধ্যে লাথি-গুঁতো মারে। মাঝে-মাঝে মা আলো নিবিয়ে দিতো যাতে ছেলেরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময়ে মা অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে ধূমপান করতো।

ওদের মায়ের তেমন গুরুত্ব ছিল না। দাদু, দিদিমা আর জিমেনটিনা পিসীমার গুরুত্ব ছিল। তারা থাকতেন গ্রামে। তবে তারা প্রায়ই আসতেন ছুটিতে দাদু আর বাবার কাছে। কি রোমাঞ্চকর

গুরুত্ব ছিল। বেতের চেয়ার যে তৈরি করতো সেই করবোপী কুলি গায়োতনিয়ও গুরুত্ব ছিল। ছেলে দুটির কাছে এরা সবাই কেউকেটা ছিল এই কারণে যে এরা সবাই ছিল সবল মানুষ, যাদের বিশ্বাস করা চলে। এরা যেমন ধারণ করতো তেমনি উৎসাহও দিতো। এরা যা করতো সবই করতো নিপুণভাবে। যেমন ছিল এদের জোর, তেমনি জ্ঞান। ঝড় আর চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা এদের ছিলো। কিন্তু বাড়িতে মা'য়ের কাছে থাকার সময় ছেলেদের ভয় করতো, যেন ওরা একলা রয়েছে। মা কোনো কাজ করতে বারণও করতো না, উৎসাহও দিতো না। কেবল মাঝে-মাঝে ক্লান্ত গলায় বলতো: "এ-রকম গোলমাল কোরোনা, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।" ছেলেরা যদি কোনো কিছুর অনুমতি চাইতো সঙ্গে-সঙ্গে সে জবাব দিতো: "দিদিমাকে গিয়ে জিগেস করো।" কিংবা প্রথমে হয়তো না বলতো, পরে হ্যাঁ, শেষে আবার না। ফলে, ছেলেরা কী করবে ভেবে পেতো না। মায়ের সঙ্গে যখন ওরা বাইরে বেরুতো তখন ওরা নিজেদের নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ মনে করতে পারতো না। কারণ মা সব সময়েই পথ ভুল করতো, পুলিশকে জিগেস ক'রে পথ জেনে নিতে হতো। দোকানে গিয়ে জিনিস কেনার ব্যাপারে মা ছিলো অদ্ভুত ভীরু। দোকানে গেলেই সে দস্তানা, ব্যাগ, স্কার্ফ একটা না একটা কিছু ভুলে ফেলে আসতো। আবার ফিরে যেতে হতো দোকানে। ছেলেদের লজ্জা করতো তখন।

মায়ের ইজের ময়লা থাকতো। নিজের জিনিস-পত্র সে এমন এলোমেলো ক'রে ছড়িয়ে রাখতো যে সকালে ঘর পরিষ্কার করার সময় মারোমিয়া খিটমিট করতো। মাঝে-মাঝে সে দিদিমাকে ডেকে এনে ঘরের অবস্থা দেখাতো, দুজনে মিলে মোজা কাপড় ইত্যাদি মেঝে থেকে তুলে গুছিয়ে রাখতো আর পরিষ্কার করতো সমস্ত মেঝের ওপর ছড়ানো সিগ্রেটের ছাই। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মা দোকানে চ'লে যেতো, ফিরে এসে রান্নাঘরের মার্বেল পাথরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিতো বাজারের ব্যাগ, তারপর যেখানে সে কাজ করতো সেই অফিসের দিকে বোঁ ক'রে ছুটতো সাইকেলে চেপে। মারোমিয়া ব্যাগের জিনিসগুলো দেখতো, কমলালেবু আর মাংস টিপে টিপে পরখ করতো, বিড় বিড় ক'রে বকতো, তারপর কী দরে কবে মার্কা মাংস কিনে আনা হয়েছে তা দেখাতো দিদিমাকে ডেকে এনে। বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর দুপুর দুটো নাগাদ মা বাড়িতে আসতো। চোখের কাছে খবরের কাগজখানা ঠেকিয়ে, তাড়াতাড়ি খেয়েই সাইকেলে চেপে আবার ছুট দিতো অফিসের দিকে। ছেলেরা কয়েক মিনিটের জন্য আবার তাকে দেখতে পেতো রাতের খাবারের সময়। কিন্তু খাবার খেয়েই কোথায় চ'লে যেতো সে।

শোবার ঘরে ব'সে ছেলেরা বাড়ির পড়াশুনো করতো। ওই ঘরে খাটের শিয়রে ঝোলানো ছিলো বাবার ছবি। কালো চৌকো দাড়ি। মাথায় টাক। চোখে কাছিমের খোলার ফ্রেমের চশমা। টেবিলের ওপর ছিল বাবার আরেকটা ছোট ছবি। ছেলেদের কোলে নিয়ে ব'সে আছেন। ওরা যখন খুব ছোট তখন বাবা মারা যান। তাই তাঁর সম্পর্কে কিছুই ওরা মনে করতে পারে না; কেবল বড়ো ছেলেটির মনে পড়ে অনেক আগেকার একটি অস্পষ্ট বিকেলের কথা। সিসীমা ক্রিমেটিনাদের গ্রামের বাড়ীতে। একটা সবুজ ঠেলা-গাড়িতে তাকে বসিয়ে একরাশ বাগানের ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। পরে ওই গাড়িটার একটা হাতল আর

একটা চাকা সে দেখেছিলো পিসীমাদের চিলে কোঠায়। নতুন কালে গাড়িটা ছিল চমৎকার। তার ভারি মজা লেগেছিলো। বাবা জোরে জোরে পা চালিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার দাড়ি উড়ছিলো হাওয়ায়। বাবার কথা তারা প্রায় কিছুই জানে না। তবে ওদের ধারণা ছিলো বাবা নিশ্চয়ই ছিলেন জ্ঞানী, শক্তিমান। তিনি জানতেন বারণ করতে, উৎসাহ দিতেও। যখনই দাদু কিংবা দারোমিরা মায়ের ওপর রেগে যেতো, দিদিমা ওদের বলতেন, মায়ের জন্ত দুঃখ বোধ করতে, কারণ মা সত্যি দুর্ভাগিনী। বলতেন, ছেলে দুটির বাবা ইউজেনিয়ো যদি বেঁচে থাকতো তবে মা সম্পূর্ণ আলাদা মেয়ে হতো। স্বামীকে হারিয়েছে সে কচি বয়সে। তিনি মারা যাওয়ার পরও ঠাকুরমা কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। নাতি দুটি তাকে কখনো দেখেনি। কারণ তিনি থাকতেন ফ্রান্সে। তবে তিনি মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, বড়োদিনের সময় উপহার পাঠাতেন। কিছুদিন পরেই অবশ্য তিনি মারা গিয়েছিলেন। খুবই বয়েস হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে।

চায়ের সঙ্গে ওরা খেতো বাদাম, ডিনিগার কিংবা তেলে ভেজানো রুটি। পড়া শেষ করতে পারলে ওরা খেলতে যেতে পেতো। খেলতো বাগানে কিংবা ধানাগারের ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে। বোমা প'ড়ে ধানাগারের ওই দুর্দশা হয়েছিলো।

দাদু আগে যাই স্কুলে গ্রীক আর ল্যাটিন ভাষা শেখাতেন। এখন তিনি পেন্সন পাচ্ছিলেন। লিখছিলেন একখানা গ্রীক ব্যাকরণ। তাঁর পুরোণো ছাত্ররা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। দারোমিরা তাদের জন্ত কফি বানাতো।

বাড়িতে দাদু, দিদিমা কিংবা দাদু আর দারোমিরার মধ্যে যেসব ছোটখাটো ঝগড়া-ঝাঁটি হতো তাতে ছেলেরা ভয় পেতো না। ওরা ভয় পেতো যখন ঝগড়াটা বাধতো দাদুর সঙ্গে ওদের মায়ের। মা যে রাতে অস্বাভাবিক দেরি ক'রে ফিরতো সেই সব রাতেই ঝগড়াটা লাগতো। পায়জামার ওপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে, খালি পায়ে দাদু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। চিৎকার ক'রে বলতেন: "আমি জানি কোথায় ছিলে, জানি কোথায় ছিলে, জানি তুই কী।" উত্তরে মা বলতো: "আমি তার জন্ত কেয়ার করি না।" তারপর বলতো: "ছেলে দুটোকে আগলান তো।" দাদু বলতেন: "থাক, থাক। ছেলে দুটোর কী হলো না হলো তা ভেবে তো তোমার ঘুম হচ্ছে না। বাজে বকবার চেষ্টা কোরো না, তোমার সব ব্যাপার আমি জানি। তুই তো একটা মাগী কুকুর। খ্যাপা মাগী কুকুর ব'লেই রাত্রিবেলা অমন ক'রে বেরিয়ে পড়িস।" দিদিমা আর দারোমিরা রাত্রিবাস-পরা অবস্থাতেই বেরিয়ে এসে দাদুকে জোর ক'রে ঘ'রে ঘরে নিয়ে যেতো। বলতো দাদুকে চুপ করতে। মা-ও এসে বিছানায় শুয়ে পড়তো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো বিছানার চাদরের তলায় মুখ লুকিয়ে। অন্ধকার ঘরে প্রতিধ্বনিত হতো তার চাপা কান্না। ছেলে-দুটি ভাবতো দাদু ঠিক কাজই করেছেন। রাত্রিবেলা সিনেমায় কিংবা বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়া মায়ের মোটেই উচিত হয়নি। ওদের ভয় করতো, নিজেদের জন্তকের অসুখী মনে হতো। চওড়া, গরম, নরম বিছানায় দুই ভাই জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে থাকতো। বড়ো ভাইটি, যে মাঝখানে শুতো, সরে আসতো মায়ের কাছ থেকে যাতে মায়ের শরীরের ছোঁয়া না লাগে। তেজা বালিশে মায়ের চোখের জল ওর দারুণ বিশ্রী লাগতো। দাদু আর মায়ের এই ঝগড়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে ওরা একটি কথাও বলতো না। সময়ে এড়িয়ে যেতো। তবে দুই ভাই পরস্পরকে অসম্ভব ভালোবাসতো। মা যখন

কাঁদতো, তখন ওরা জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে থাকতো। সকালবেলা উঠে অবশ্য একটু লজ্জাই লাগতো। ওরা দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে শুয়েছিলো যেন আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিলো। তবে রাত্রিবেলা যে অদৃষ্টি মনে হয়েছিল তা ওরা ভুলে যেতো। শুরু হয়েছে যে নতুন একটি দিন। ওরা যেতো স্কুলে, রাস্তায় দেখা হতো বন্ধুদের সঙ্গে, কিছুক্ষণ ওরা খেলা করতো স্কুলে ঢুকবার দরজায়।

ভোরের আলো অস্পষ্ট থাকতে থাকতেই মা ঘুম থেকে উঠে পড়তো। কোমরে জড়ানো থাকতো সায়া। বেসিনের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ঘাড়ে আর বাহুতে সাবান মাখাতো। সব সময়ে তার চেষ্টা থাকতো যাতে ছেলেরা তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু ছেলেরা আয়নায় দেখতে পেতো তার দীর্ঘ বাদামী ঘাড়, অনাবৃত দেহ। হাত তুলে সে বগলে পাউডার লাগাতো। জামা-কাপড় পরার পরে শুরু করতো ভ্রূ দুটি আঁকতে। তখন তার চোখ থাকতো আয়নার দিকে। শক্ত ক'রে কামড়ে ধরতো ঠোঁট। মুখে মাখতো ক্রিম। পাউডার পাফ বুলাতো সারা শরীরে। হলদে হ'য়ে উঠতো মুখ। মাঝে মাঝে সকালে তার খুশীর সীমা থাকতো না। একথা-সেকথা বলতো ছেলেদের সঙ্গে। জিগেস করতো তাদের স্কুল এবং স্কুলের বন্ধুদের কথা। নিজের স্কুল-জীবনের গল্পও বলতো ছেলেদের কাছে। তাদের সময়ে নাকি 'সিনথিয়া ডার্স' নামে একজন শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি বয়সে ছিলেন বুড়ি, তবু অল্পবয়সী সাজার চেষ্টা করতেন। এর পরই মা গায়ে কোট চাপিয়ে হাতে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে, নিচু হ'য়ে ছেলেদের চুমো খেয়ে বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। মাথায় জড়ানো থাকতো স্কার্ফ। হলদে পাউডারে রঞ্জিত আর সুবাসিত মুখ।

তার থেকেই ওদের উৎপত্তি ভাবতে ছেলে দুটির অদ্ভুত লাগতো। যে মিসিমা কিংবা হাঙ্গোমিরা বিশাল তপ্ত দেহ দিয়ে ওদের ভয় থেকে রক্ষা করছে, রক্ষা করছে ঝড়-ঝঞ্ঝা আর চোর-ডাকাতের হাত থেকে, তাদের একজন থেকে উৎপত্তি হ'লে ওদের অবাক হওয়ার কারণ ছিলো না। ওই তরুণী যে ওদের মা ভাবতে অবাক লাগতো। তার ছোট জঠরের মধ্যে ওরা কিছুকাল ছিলো একথা ভেবে। ওরা শুনেছিলো জন্মাবার আগে শিশু থাকে মায়ের পেটে। ওরাও এক সময়ে অমনি অবস্থায় ছিলো ভেবে ওদের একটু লজ্জাও লাগলো। এক সময়ে তার স্তনের দুধ ওরা খেয়েছে ভেবে আরো অবাক হলো। কিন্তু স্তন পান করবার কিংবা দোলনায় শুইয়ে দোল দেবার মতো ছোট ছেলে তো আর এখন ওরা নেই। প্রত্যেকদিন এখন ওরা দেখতে পায় বাইসিকেলে চেপে চলেছে সে ছুটে। স্বাধীন আনন্দে। সে সত্যি ওদের কেউ নয়। তার ওপর ওরা মোটেই নির্ভর করতে পারে না। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। অথচ পৃথিবীতে কতো মা রয়েছেন, স্কুলের বন্ধুদের মায়েরা আছেন, তাদের কত কিছু প্রশ্ন করা যায়। স্কুল ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা ছুটে যায় নিজের মায়ের কাছে, লক্ষ প্রশ্ন নিয়ে। তাদের মা নাক পরিষ্কার ক'রে যেন, এঁটে যেন ওভারকোটের বোতাম। বন্ধুরা যাকে দেখা দেখায়, দেখায় নানারকম কৌতুক। ওই সব মায়েরা বেশ বৃদ্ধা। তাদের মাথায় থাকে টুপি কিংবা ঘোমটা। তারা প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে এসে আলাপ করেন মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে। এরা মিসিমা কিংবা হাঙ্গোমিয়ার মতো লোক। স্কুল-ড্রেস এদের বিশেষ হয় না, কোনো জিনিস এরা হারান না, এদের ইজের ময়লা থাকে না, রাত ক'রে এরা বাড়ি ফেরে না। আর ওদের মা? বাজার ক'রেই সেই যে ছোটে। কেনাকাটাও সে ভালো ক'রে করতে পারে না। কসাই তাকে বহুদিন ঠকিয়েছে, যে পয়সা ফেরৎ দেবার কথা তা দেয়নি।

তার অফিস যে কী তা-ই বা কে জানে। সেই সম্পর্কে নিজেও সে কোনোদিন কিছু বলেনি। তাকে টাইপ করতে আর চিঠি লিখতে হতো ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায়। হয়তো ওই কাজে সে ওস্তাদই ছিলো।

হপ্তা খানেকের জন্য ওরা বেড়াতে গিয়েছিলো তরুণ সংঘের ডন ভিগলিয়ানি এবং অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে। ফিরে আসার পথে ওরা মা-কে দেখতে পেলো শহরতলীর একটা কাফেতে। কাফের ভেতরে সে বসেছিলো। ওরা তাকে দেখতে পেয়েছিলো জানালা দিয়ে। একজন লোক ব'সেছিলো পাশে। মা রঙিন ডোরা কাটা পশমী স্কার্ফ আর কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি পুরোনো হাত-ব্যাগটা রেখেছে টেবিলে। ওই দুটো জিনিসই ছেলে দুটোর ভালো রকম চেনা। লোকটার গায়ে চিলা হাল্কা রঙের ওভারকোট। বাদামী গোঁফ। হেসে হেসে কথা বলছিলো মায়ের সঙ্গে। মায়ের মুখও হাসি-খুশী। মায়ের ও-রকম হাসি মুখ ওরা বাড়িতে কোনোদিন দেখেনি। লোকটির মুখের দিকে সে তাকিয়েছিলো। ওরা হাত ধ'রে রেখেছিলো পরস্পরের। ছেলে দুটিকে মা একবারও দেখতে পায়নি। দুই ভাই হাঁটছিলো ডন ভিগলিয়ানির পাশে পাশে। সে ওদের তাড়াতাড়ি হাঁটতে বললো, না হলে ট্রামটা ধরা যাবে না। ট্রামে ওঠার পর ছোট ছেলেটি দাদাকে জিগেস করলো: "মা-কে দেখেছিলে তুমি?" দাদা বললো: "না, আমি দেখিনি।" ছোট ভাই হেসে বললো: "না, তুমি দেখেছো। মা ব'সেছিল, তার পাশে ছিল একজন লোক।" বড়ো ভাই অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নিলে। তার বয়েস এখন তেরো। ছোট ভাইয়ের কথায় সে বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য মন খারাপও লাগছে। নিজের মনটাও খারাপ লাগছিলো। কেন তা সে জানে না। যা দেখেছে তা নিয়ে সে আর ভাবতে চায় না। যেন কিছুই চোখে পড়েনি এমন ভাবই ফুটে উঠলো তার কথাবার্তায়।

দিদিমাকে ওরা একটি কথাও বললো না। সকালে মা যখন সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত তখন ছোট ছেলেটি বললো: "গতকাল যখন আমরা ডন ভিগলিয়ানির সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, আমরা তোমাকে দেখেছি, তোমার সঙ্গে একজন লোক ছিলো।" মা চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টি কেমন বিশ্রী হ'য়ে উঠলো। তার কপালে কালো মাছি দুটো কেঁপে কেঁপে মাঝে মাঝে একত্র হ'য়ে যাচ্ছিলো। বললো: "আমি সেখানে ছিলুম না। কী অদ্ভুত ধারণা তোমাদের। তোমরা তো জানোই সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে অফিসেই থাকতে হয়। তোমাদের ভুল হ'য়ে গেছে।" বড়ো ছেলেটি ক্লান্ত শান্ত গলায় বললো: "না, তুমি ছিলে না। তোমার মতো দেখতে কেউ ছিলো। দুই ভাইয়েরই মনে হলো ওই স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি লুপ্ত হয় তাই ভালো। দুজনেই জোরে নিঃশ্বাস ফেললো যেন এক্ষুনি সেই স্মৃতি তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

কিন্তু সেই হাল্কা রঙের ওভারকোট-পরা লোকটি একদিন তাদের বাড়িতে এলো। এখন অবশ্য তার পরণে ওভারকোট ছিলো না। কারণ সময়টা ছিলো গ্রীষ্মকাল। লোকটি প'রে এসেছিল হাল্কা রঙের লিনেনের স্যুট, চোখে ছিলো নীল চশমা। বাবু আর দিদিমা দুজনেই গিয়েছিলেন কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাচ্চোবিরা চ'লে গিয়েছিলো তাদের গ্রামে।

কাজেই ওরা দুই ভাই আর মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিলো না। এমনি দিনে লোকটি এলো। দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালোই হলো। সব খাবারই মা দোকান থেকে কিনে এনেছিলো। একটু নার্ভাস হ'লেও মা বেশ খুশিই হ'য়ে উঠেছিলো। লোকটির কথা বলবার জন্ত সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো। লোকটির নাম ম্যাক্স। বেশ কিছুকাল সে আফ্রিকায় কাটিয়েছে। আফ্রিকার বহু ফোটো তার সঙ্গে ছিলো। সেগুলি সে দুই ভাইকে দেখালো। ফোটোগুলির ভেতরে একটা ছিলো বানরের। ওই বানরটা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করলো দুই ভাই। লোকটি জানালো বানরটা ছিলো খুবই চালাক, দোষও মেনেছিলো বেশ। যখন মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হতো এমন বায়না করে চাইতো। বানরটা অসুখ হ'য়ে পড়ায় ওটাকে আফ্রিকাতে রেখেই চ'লে আসতে হলো। পথে স্টীমারেই মরে যেতে পারে এই ভয়েই তো বানরটাকে নিয়ে আসা হলো না।

ম্যাক্সের সঙ্গে ছেলেদের বেশ ভাব হয়ে গেলো। ম্যাক্স কথা দিলো একদিন ওদের সিনেমায় নিয়ে যাবে। ওরা তাকে দেখালো নিজেদের বই-পত্র। সেগুলি সংখ্যায় অবশ্য খুব বেশি ছিলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর মা ওদের বললো খেলার মাঠে নিয়ে খেলা করতে। ওরা কিন্তু ম্যাক্সকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলো না। প্রতিবাদও জানালো। কিন্তু মা, এবং এমন কি ম্যাক্সও ওদের চ'লে যেতে বললো। সন্ধ্যেবেলা যখন ওরা বাড়ি ফিরলো তখন ম্যাক্স চ'লে গেছে। মা তাড়াতাড়ি রাতের খাবার তৈরি করলো। দুধ দিয়ে কফি। তাছাড়া আলুর সালাড। ওরা সবাই বেশ খুশি। আফ্রিকা আর বানর সম্পর্কে ওরা অনেক কথা বলতে চাইলো। ওরা দারুণ খুশি হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছিলো না। ওদের মা-ও বেশ খুশি। সে-ও অনেক গল্প বললো। ছোট একটা অর্গানের বাজনায় তালে তালে একটা বানরকে নাকি একবার সে রাস্তায় নাচতে দেখেছিলো। এরপর সে ওদের বললো, শু'য়ে পড় তো। বললো, এক মিনিটের জন্ত সে একটু বাইরে যাচ্ছে। ওরা যেন ভয় না পায়। ভয় পাওয়ার কোনোই কারণ নেই। মিচু হয়ে সে ওদের চুমো খেলে আর বারণ করলে দাদু আর দিদিমাকে ম্যাক্স সম্পর্কে একটি কথাও না বলতে। বাড়ীতে কোনো অতিথি আসে এ তো তাঁরা চান না।

কেবল মায়ের সঙ্গে এইভাবে ওরা ক'য়েক দিন কাটালো। মা রান্না করতে চাইতেন না বলে ওই কদিন খেতে হলো অদ্ভুত সব খাবার। মাংসের দোকান থেকে কিনে আনা ভাজা খাবার, কফি ইত্যাদি। দাদু আর দিদিমা ফিরে আসতে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। খাবার ঘরের টেবিলে আবার উঠলো টেবিল ক্লথ, গ্লাস এবং খাবার অন্যান্য সরঞ্জাম।

ছেলেরা দিদিমাকে ম্যাক্স সম্পর্কে একটি কথাও বললো না। ম্যাক্স বলেছিলো ওদেরকে গল্পের বই দেবে, সিনেমায় নিয়ে যাবে, বানরের আরো অনেক ফোটো দেখাবে। সেই সবের জন্ত ওরা অপেক্ষা ক'রে রইলো। কেবল মা-কে দু একবার শুধালো ম্যাক্স ওদের কবে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছে। মা ক্ষুণ্ণ গলায় জানালো, ম্যাক্স এখান থেকে চলে গেছে। ছোট ছেলেটি জানতে চাইলো, সে আফ্রিকায় গেছে কি না। মা উত্তর দিলো না। ছেলেটি ভেবে নিলো ম্যাক্স বানরটাকে নিয়ে আসার জন্ত আফ্রিকাতেই গেছে। সে কল্পনা ক'রে নিলো একদিন না একদিন স্কুল থেকে সে তাদের নিয়ে আসবে। তার সঙ্গে থাকবে একজন নিগ্রো চাকর আর হাতে একটা বানর। স্কুল

খুললো। ফিমোটিনা পিসীমা এসে কিছুদিন ওদের সঙ্গে কাটালেন। তিনি প্রচুর আপেল আর পিয় নিয়ে এসেছিলেন। সে-গুলি সব রান্নাতেই ব্যবহার করা হতে লাগলো, এমন কি চিনির সঙ্গেও। মা'র মেজাজ তিরিক্ষি হ'য়ে উঠলো। দাদুর সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়া হতে লাগলো। বাড়ি ফিরতে লাগলো অনেক রাত ক'রে। তারপর বাকি রাতও হয়তো কাটিয়ে দিলো সিগ্রেট খেয়ে খেয়ে। সে আরো রোগা হ'য়ে গেলো। কিছুই প্রায় খেতো না। তার মুখ আরো ছোট আর হলদে হ'য়ে গেলো। আরো পুরু ক'রে পাউডার মাখতে লাগলো। দিদিমা চেষ্টা করতেন কমাল দিয়ে সেই পাউডার মুছে ফেলতে। কিন্তু মা মুখ ফিরিয়ে থাকতো। কথা বলতো খুবই কম। যখনও বলতো, মনে হতো অতি কষ্টে বলছে। গলার স্বর এমনিই দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলো। একদিন সে বাড়ি ফিরলো বিকেল ৪টায়। খুবই অবাক হওয়ার কথা। কারণ সাধারণত সে বেশ রাত ক'রেই বাড়ি ফিরতো। বাড়িতে ফিরে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে সে ভেতর থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিলো। ছোট ছেলেটা এসে অনেকবার দরজা ধাক্কালো। ওর একটা খাতার দরকার হ'য়ে পড়েছিলো। মা ভেতর থেকে বেগে জবাব দিলো, সে একটু ঘুমোতে চায়, তাকে যেন ওরা বিরক্ত না করে। ছেলেটি ভয়ে-ভয়ে জানালো, ওই ঘর থেকে ওর একটা খাতা নে'য়া দরকার। তখন মা এসে দরজা খুলে দিলো। তার মুখ ফোলা ফোলা, ভেজা। ছেলেটি বুঝতে পারলো মা কাঁদছে। দিদিমাকে গিয়ে বললো: "মা কাঁদছে।" দিদিমা আর পিসীমা শান্ত গলায় অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বললেন ওদের মায়ের সম্পর্কেই। কিন্তু তাদের সেই কথার অর্থ ওরা বুঝতে পারলে না।

একদিন ওদের মা আর বাড়ি ফিরলো না। খালি পায়ে, পায়জামার ওপর ওভারকোট চাপিয়ে দাদু ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যেতে লাগলেন। দিদিমাও। ছেলে দুটির চোখে আর ঘুম এলো না। দাদু কেবলই পায়চারি করছেন, খুলছেন আর বন্ধ করছেন জানালা। ছেলে দুটো ভয় পেয়ে গেলো। সকালে থানা থেকে ফোন এলো: একটা হোটেলে ওদের মাকে প্রাণহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে, সে বিষ খেয়েছে, একটা চিঠি লিখে গেছে। দাদু আর পিসীমা হোটেলের দিকে গেলেন। দিদিমা চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। ছেলে দুটিকে পাঠিয়ে দে'য়া হলো মিচতনায় এক বৃদ্ধ তত্ত্বমহিলার কাছে। তিনি বারবার বলতে লাগলেন: "কী নিষ্ঠুর। না হলে এরকম দুটো বাচ্চা ছেলেকে রেখে কেউ আত্মহত্যা করে!" মা'র মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। বিছানায় শুইয়ে দে'য়া হলো। তখন দেখতে গেলো ছেলেরা। ডাক্তারিরা তাকে পরিয়ে দিয়েছে চামড়ার জুতো, আর লাল সিল্কের পোষাক। খুবই ছোট দেখাচ্ছিল তাকে। একটা ছোট মরা পুতুলের মতো।

সেই চেনা-জানা ঘরে এখন ফুল আর মোমবাতি। অদ্ভুত লাগছিলো। ডাক্তারিরা, পিসীমা, আর দিদিমা হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মা ভুল ক'রে বিষ খেয়েছে। কারণ আত্মহত্যার ঘটনা জানলে পাদ্রী মশাই আত্মার সদ্গতি জানাতে আসতেন না। ডাক্তারিরা ছেলেদের বললো, মাকে চুমো খেতে। ওদের লজ্জা করছিলো। তবু ওরা চুমো খেলো মায়ের ঠাণ্ডা গালে। এর পরে হলো অন্ত্যেষ্টি কাজ। এক যুগ যেন লাগলো। ওরা মোটা শহর প্রদক্ষিণ ক'রে ছাত্র বোধ করলো। ছয় সংঘের ডন ভিগলিয়ানি আর অন্যান্য ছেলেরাও হাজির হয়েছিলো। কবরটা মনে হচ্ছিল ভীষণ ঠাণ্ডা। জোরে হাওয়া বইছিলো। বাড়ি ফিরে বাইসিকেলটা রেখে দিদিমা

আবার দুকরে কেঁদে উঠলেন। সত্যি ওটা দেখে মনে পড়ছিল মা কেমন করে ছুটতেন স্বাধীন আনন্দে, হাওয়ায় উড়তো তার স্কার্ট। তব ভিগমিগয়ানি জানালো মা নাকি এখন স্বর্গে। সে যে আত্মহত্যা করেছে তা জানতো না বলেই বোধহয় ও-কথা বলেছিলো। কিংবা জেনেও সে না জানার ভাণ করেছিলো। তবে ছেলে দুটি জানতো না সত্যি স্বর্গের অস্তিত্ব আছে কিনা। দাদু বলতেন নেই, দিদিমা বলতেন আছে। মা একদিন বলেছিলো, যেখানে ছোট ছোট দেবদূত আর আনন্দ সংগীত সেই স্বর্গ বলে কিছু নেই। বলেছিলো, মৃত্যুর পরে মানুষ যেখানে যায় সেখানে সে ভালোও থাকে না, মন্দও থাকে না। সেখানে থাবার কিছু নেই, সেখানে আছে শুধু বিশ্রাম, চিরশান্তি।

কিছুদিনের জন্য দুই ভাই গেলো গ্রামে, ক্রিমেটিনা পিসীমার বাড়িতে। সবাই ওদের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার, আদর করলো। ওদের কিন্তু লজ্জা লাগতো। মা কিংবা ম্যাক্সের কথা ওরা কক্ষনো বলতো না। তবে বড়ো ছেলেটির মাঝে মাঝে মনে পড়তো মায়ের কথা, মনে পড়তো সেই কাফেটার কথা, যেখানে মা আর ম্যাক্স হাত ধরাধরি ক'রে বসেছিলো, মার মুখখানা দেখাচ্ছিলো হাসিখুশী। সে ভাবতো ম্যাক্স চিরজীবনের মতো আফ্রিকাতে চ'লে গেছে বলেই বোধহয় মা বিষ খেয়েছিলো। পিসীর একটা চমৎকার কুকুর ছিলো। দুই ভাই তার সঙ্গে খেলা করতো। ওরা সাঁতার চড়তে শিখলো। আগে একদম পারতো না। ওরা নদীতে স্নান করতেও যেতো। ভালো লাগতো সন্ধ্যাবেলায় পিসীমার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাই মিলে ক্রশওয়ার্ড খেলতে। পিসীমার বাড়িতে ওদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটলো। দিদিমার বাড়িতে ফিরে গিয়েও আনন্দেই থাকলো। দিদিমা তখনো দোলনা-চেয়ারে বসতেন, চাইতেন চুলের কাঁটা দিয়ে নাতিদের কান পরিষ্কার ক'রে দিতে। রবিবারে ওরা গেলো সমাধিতে। হারোমিরাও গেলো। সঙ্গে কিনে নিয়ে গেলো ফুল। সমাধিতে পৌঁছাবার পর দিদিমা প্রার্থনা করলেন, চিৎকার ক'রে কাঁদলেন। কিন্তু যে কসাইয়ের কাছে ঠকতো, যে সাইকেলে চেপে ছুটতো, পথ ভুল করতো, আর রাতের অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো সেই মায়ের সঙ্গে এখানকার ক্রশ আর সারি সারি সমাধি সৌধগুলির কোন রকম যোগাযোগ আছে ব'লে ওদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না। রাত্রিবেলা ঘুমোবার সময় বিছানাটা ভীষণ বড়ো মনে হলো। ওদের দু ভাইই এখন একটা ক'রে বালিশ আলাদা পেয়েছে। তারা মায়ের কথা আর তেমন ভাবতো না। কারণ তাতে মন খারাপ লাগতো, লজ্জাও করতো। মা দেখতে কেমন ছিলো ওরা তা ভাববার চেষ্টা করতো অনেক সময়। প্রত্যেকেই একা একা চুপচাপ। ক্রমে মায়ের খাটো কোঁকড়ানো চুল, কালো মাছের মতো ভ্রু, ঠোঁট ইত্যাদি স্পষ্ট মনে আনা কঠিন হলো। সে যে প্রচুর হলুদ পাউডার মাখতো তা শুধু ভালো ক'রে মনে পড়তো। ক্রমশঃ সেই মুখ ওদের স্মৃতিতে একটি হলুদ বিন্দুতে পরিণত হলো। গাল আর মুখের রেখা তখন আর স্পষ্ট মনে পড়তো না। তাছাড়া এখন তারা বুঝতে পেরেছিলো যে মাকে ওরা তেমন ভালোবাসতো না। হয়তো মা-ও ওদের তেমন ভালোবাসতো না। যদি সত্যি ভালোবাসতো তবে অমন ক'রে বিষ খেতো না। হারোমিরা, কুলি, নিচতলার বৃদ্ধা মহিলা—অনেককেই ওরা এ-কথা বলতে শুনেছে। বছরের পর বছর কেটে গেলো। ছেলে দুটি বড়ো হলো। এত সব-ঘটনা ঘটলো যে মাকে তারা কখনো তেমন ভালোবাসেনি তার মুখ ওদের স্মৃতি থেকে মুছে গেলো চিরকালের মতো।

॥ এইপ্রথম ॥

অপরাজেয়

শ্রীসাধনা সেন

হঠাৎ ব্রেকটি ক্যাচ করে ড্রাইভার করে দিল কেন দেখতে গিয়ে অনুপমা বাইরে তাকিয়ে চমকে গেল। সর্বনাশ! একটি লোক চাপা পড়ল নাকি? গাড়ীর দোলানীর তন্দ্রাটুকু তার মুহূর্তের হৈ হৈ শব্দে ভেঙে গেল বুঝি বা! অনুপমা গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবার আগেই তাদের গাড়ীটা ঘেরাও হয়ে গেল পথচারীদের বিপুল জনতায়। আর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। ইঃ! লোকটা কি মরেই গেল? অনুপমা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় সামনে। বোধহয় লোকটি ম্যাপন নিয়ে চলেছিল। বেশভূষা দেখে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মনে হয়। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। অনুপমা গিয়ে লোকটিকে ফেরাতেই আরও চমকে উঠল যেন! ততক্ষণে নানা বিদ্রূপের মারমুখী জনতার বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ও। ড্রাইভার তো কয়েক ঘা চড় কিল খেয়েই ফেরে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বলে উঠল অনুপমা—"এখনও বেঁচে আছেন। অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। আপনারা সরুন। এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমায় সাহায্য করুন কেউ।"

"হ্যাঁ, গরীবের দুঃখ আপনারা কি বুঝবেন। লোকটা মতন হয়ে গেল আর উনি গাড়ী চড়ে হাওয়া খেয়ে লোকটাকে এখন করুণা দেখাতে এসেছেন।"

এসব কথায় কর্ণপাত করে না অনুপমা। নিজেই কোনমতে লোকটিকে গাড়ীতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। তারপর ড্রাইভারকে আদেশ দেয় গাড়ী ফেরাতে নীলরতন সরকার হাসপাতালের দিকে।

• • • •

শুধু এই একটুখানি ছবি। এক হতভাগ্য জীবনের এই একটু পরিণাম অনুপমাকে নিয়ে যায় অনেক দূরের পেছনে—যেখানে সে কিংশুক মিত্রকে চিনত অন্যভাবে। নীলরতন সরকার হাসপাতালে out door-এ বসে অনুপমা হারিয়ে গেল সেই অনেক দূরের ফেলে-আসা জীবনের মাঝে।

• • • •

কিংশুক মিত্র। নামটি ছটিশের তখনকার জীবনে এক অবিস্মরণীয় শিহরণ। মস্ত বড়লোকের ছেলে। সুন্দর কান্তিমান। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, বেপরোয়া, দাবলীল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এক মস্ত বড় স্বারক যেন সে। জীবনের কোন কিছুতেই যেন তার আকর্ষণ নেই। আবার বিকর্ষণও নেই কোন কিছুতে। সদাস্তরাল রেখার আবর্তে কিংশুক মিত্র যেন ঘূর্ণায়মান উল্কা। তেজদীপ্তিতে সে যেন মধ্যাহ্ন গগনের ভাস্কর। কি স্পোর্টসে, কি গল্পগুজবে, কি বন্ধু বান্ধবের মজলিসে—সর্বত্রই সে অবাধ

সন্দেহ নেই, এ ছেলে কিংশুক মিত্রের যে অনেক খাবার জুটবে তার আর সন্দেহ কি? আর এই সূত্রেই অনুপমার পরিচয় হয়েছিল কিংশুক মিত্রের সাথে।

আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা। বেচারা বোধহয় তার সমস্ত জীবনই দিয়ে দিতে পারত কিংশুকের জন্য। কিংশুক ওকে একদিন বোটানিক্সে বেড়াতে নিয়ে বলেছিল ওকে জীবনের সাথী করার আকাঙ্ক্ষার কথা। সেদিনের সুন্দর মুখের সলাজ বর্ণনা শুনতে অনুপমার বুকে যেন কেমন এক জ্বালা ধরে গিয়েছিল। আর সেদিন থেকেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল ও। সূত্রপাতের দিনগুলিতে এমন কথা কিংশুক আরও বলেছে—চায়েলিকে, অপর্ণাকে। আরও যে কাউকে বলে নি সে বিষয়ে অনুপমা নিঃসন্দেহ নয়। শুধু তার কাছেই কিংশুক এমন কথা কেন যে বলে নি তার অর্থ সে বুঝতে পারে না। অথচ অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে তাদের বাড়ীতে কিংশুক এসেছিল অনেকবার—অনেকদিন—অনেক ছলে।

মনে পড়ে যেদিন বিয়ের কথা উঠেছিল অনুপমার, কিংশুক সেদিন সেখানেই ছিল। মা-ই ওকে বলেছিলেন একটি পাত্র ঠিক করে দিতে। হেসে কিংশুক বলেছিল—"আপনার মেয়ে যে ভাতেও কাটে ধানেও কাটে! এমন মেয়ের পাত্র পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয় মাসীমা।" মা চুপ করে গিয়েছিলেন। অনুপমার বিশাল দেহ ও তার বিদ্যাবুদ্ধি দুটোই মায়ের ভয়ের কারণ ছিল। অনুপমায় লেখাপড়া কোনদিনই মা ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁর ধারণা ছিল লেখাপড়া জানা মেয়ের পাত্র পাওয়া কঠিন। আর অনুপমার বিশাল দেহের উপযোগী পাত্রও সচরাচর দেখা যায় না। মা মুখ কালো করে উঠে গেলেন। পাশের ঘরে অনুপমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপলকে কিংশুকের দিকে চেয়ে রইল। আর সেই দিকেও, মায়ের চলার দিকে চেয়ে চেয়ে কিংশুক মিটমিট করে হাসতে লাগল বেহায়ার মত। শুধু কিংশুক অনুপমাদের বাড়ী আসত।

এরপর একদিন অনুপমাকে বলেছিল,—"চলনা অনু, আজ একটু গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়িয়ে আসি।"—এ প্রস্তাব অনু অগ্রাহ্য করতে পারেনি। সেদিন অনুপমাকে কিংশুক তার লেখা একটি কবিতা পড়ে শোনাল শুধু। আকুল হয়ে অনুপমা বলেছিল—"কিন্তু কেন? আমি তো অসুন্দর! আমাকে এ উপহাস কেন?" কিংশুক ঠোঁট চেপে হেসে বলেছিল—"উপহাস করা আমার পেশা না হলেও নেশা বটে। চল রাত হয়ে যাচ্ছে।"

ওর উপর রাগ করতে চেষ্টা করেও পারে নি অনুপমা। বেশ রুষ্ট হয়েই একদিন বলেছিল, "বেরিয়ে যাও তুমি আমাদের এখান থেকে।" হেসে কিংশুক বলেছিল—"বেরিয়ে যাবার জন্য তো আসিনি অনু। তোমার ওসব কথায় আমার কিছু এসে যায় না। যখন মন হবে তখনই বেরিয়ে যাব আর তখন আমায় রুখবার সাধ্য কারো নেই তা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছ, তাই না? যাক্ এলেই যখন পড়েছি তখন ঘণ্টাখানেক এখানে বিশ্রাম করব। উঃ বড্ড খিদে পেয়েছে। এক পেয়ালা চা দাও তো লক্ষ্মীটি। সেই সকাল থেকে একরকম খাওয়াই হয়নি আজ।" তারপর একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে লম্বা হয়ে খাটে শুয়ে পড়ে। অনুপমা নিঃশব্দে শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও কি শুধুই পাথর দিয়ে তৈরী? যেখানে এতটুকু আঁচড় লাগাতেও বেশ কসরৎ করতে হয়! অথবা ওকি অমাট বাঁধা বরফ? কোন দিন কোন তাপেই কি ওর ঐ বরফ জমা মনটা গলতে পারে না? অনুপমা সেই মূর্তিটার দিকে বিস্ময় বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকে পলকহীন অন্যতায় নিমগ্ন।

• • • •

বেশ কিছুদিন পর কিংশুক মিত্র হঠাৎ সায়েন্স পড়া ছেড়ে দিল। অমন যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদলের একজন সে যে কেন সায়েন্স ছাড়ল তা জানা গেল না। অনুপমা একদিন বলেছিল—"সায়েন্স না পড়ে, আর্টস পড়ে কোন্ বড় বিষয় অনুশীলন করতে ছুটবে আবার।"

উত্তরে কিংশুক বলেছিল—"জগতে অনুশীলন আর অনুসরণ ছাড়াও আর একটা দিক আছে। সেটা হল অনুধাবন করা। এ জগতকে অনুধাবন করতে চাই আমি। তবে সেটাও আমার খেয়াল। যদি কিছুদূর এগিয়ে মন বিগড়ে যায় তবে ওটাও ছেড়ে দিতে পারি।" "ধরা আর ছাড়া—এ দু'য়ের মাঝে কি কোন ব্যতিক্রম নেই তোমার কাছে?"—সাগ্রহে অনুপম জিজ্ঞাসা করেছিল। "কিছুমাত্র নয়। দেখছ না বেন্না, চায়েল'কে কত সহজেই নিষ্কৃতি দিলাম।"

"নিষ্কৃতি দিলেই কি কেউ নিষ্কৃতি পায়?"

"সেটা তাদের মনের উপর নির্ভর করে। আমার তো মনে হয় একটু কণিক আনন্দ, একটু কণিক ভালবাসাই জীবনের মূলধন।"

কথা আর বাড়ায় নি অনুপমা। সে জানে কিংশুক হয়তো তাকে নিয়েও খেলা করছে। সকলে যাকে স্বীকার করে কিংশুক করে তাকে অস্বীকার। সকলে যাকে অস্বীকার করে কিংশুকের তাতে থাকে পূর্ণ সমর্থন। এমন লোকটিকে অগ্নিশিখার সাথেই তুলনা চলে—; যার আকর্ষণে শত শত পতঙ্গের পুড়ে মরাই আনন্দ। অনুপমাও কি ঐ পতঙ্গের দলে?

এই বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই সে চমকে গেল। আর তখনই প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, "আর নয়। কিংশুক মিত্র, তুমি আগুন হলেও আমি পতঙ্গ হতে পারব না। না—, না—। আর নয়। কিংশুক মিত্র অনুপমার জীবনের সাথে তোমার এখানেই ইতি পড়ল। এর পর অনুপমাও আর সায়েন্স না পড়েই দিল্লী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ছুটল।

ছোট বোন মারফৎ এরপরেও কিংশুকের খোঁজ খবর অনুপমা পেত। কিংশুক বি. এ-তে ফেল করেছিল। তখন অনুপমা সবেমাত্র মেডিকেলে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। অনুপমা জানত, কিংশুক মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাণ্ড করা ছেলে। নিশ্চয়ই এই আঘাতে সে ভেঙে পড়বে। কিন্তু কিংশুক মিত্রের বাড়ী পৌঁছেই তার এই ধারণা এক বিরাট ধাক্কা খেল। বাইরের ঘরে কিংশুক তার বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে। এমন অবস্থায় যে করুণ মূর্তি ও কল্পনা করে এসেছিল—তা যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। অনুপমাকে দেখে কিংশুকও উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে আহ্বান জানাতে গিয়ে চমকে গেল ওর চোখের দিকে চেয়ে। —"কি হয়েছে অনু।" কোনো উত্তর না দিয়েই ফিরে এসেছিল সেদিন ও। তারপর সেদিনই দিল্লীর গাড়ীতে চেপে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তারপর টুকরো টুকরো খবর। কিংশুক মিত্রের বাবা আর বেঁচে নেই। বিরাট সম্পত্তির মালিক সে এখন। কিংশুক কলকাটেকাতে বি. এ পাশ করেছে। ইকনমিক্সে এম. এ পড়ছে। অনু চিঠি না লিখে পারেনি। লিখেছিল—"তোমার পিতৃবিয়োগে সত্যিই দুঃখিত। তবু নিশ্চয়ই এই ধাক্কা খেয়ে তুমি এখন একটু সাধারণ হয়েছ—, এই ধারণা নিয়ে সান্ত্বনাও পাচ্ছি। শুনলাম তুমি এম. এ পড়ছ। আমার অকুণ্ঠিত শুভেচ্ছা রইল তোমার অগ্রগতির পেছনে। আমি তোমার কাছে এ মূল্যহীন, তবু না জানিয়েও পারলাম না।" কিংশুকের উত্তর পেতেও দেরী হয় নি ওর—,"অনু,

সান্ত্বনাটা অত্যন্ত আদিম। কেউ আমার সান্ত্বনা দেবে বা করুণা করবে—, এ আমি ভাবতে পারি না। বরুক বলতে পার দুঃখবোধ আমার নেই। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সম্পত্তি হাতে পেয়ে এতদিনে আমি মনোমত খরচ করছি—এই আনন্দ আমার কম নয়। তোমার 'গুডেচ্ছা'কে ধন্যবাদ জানালেও বলতে হচ্ছে ওটা আমার নিষ্প্রয়োজন। আমার জগতে আমি একক। সেখানে কারুর শুভ বা অশুভ ইচ্ছা কার্যকরী হতে চায় না। আচ্ছা, তুমি কবে আসবে কোলকাতায়? তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ইতি—" এখানেই শেষ করেছিল কিংশুক। আশ্চর্য! কিংশুকেরও ইচ্ছে আছে! নাকি এটাও ওর খেয়াল অথবা ভণ্ডামী?

অনুপমার চোখ যেন খুলে গেল। ওর মনে হল সত্যিই কিংশুক দুঃখী। এত প্রাচুর্যের মাঝেও একক। মানব প্রকৃতির যা একান্ত বিরোধী। কাউকেই ও চায় না। কারো সঙ্গও ও বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। সব পেয়েও যে সর্ব-হারার দলে। শোক, দুঃখ, আনন্দ, সুখের যে স্পর্শও গেল না জীবনে, সে যদি না রিক্ত নয় তবে রিক্ত কে? অনুপমার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

এর পরের বছরই অনুপমা মেডিকেল ডিগ্রী নিয়েই দিল্লীতেই প্রাক্টিস শুরু করে। ওদেরও সংসারে ওলট পালট হয়েছিল অনেক কিছু। মা মারা গিয়েছেন। বাবা আবার নতুন সংসার পেতেছেন। বোনেরও বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং অনুপমা মুক্ত। ডাক্তারী জীবনে অনেক মানুষের সংস্পর্শে সে এসেছে কিন্তু কিংশুককে ভুলতে পারল কই? নীড় আর তার বাঁধা হল না। একক বিহঙ্গের মত অনুপমা এই জীবনের আকাশ পথে নীড় বাঁধার স্বপ্ন চোখে নিয়ে উড়ে চলেছে; তবু আশ্রয় পাবার সন্ধান আজো যেন শেষ হয়নি। কিংশুককে মনে মনে কামনা করলেও তার কাছে যাবার মত মানসিকতা তার নেই। অনুপমা দিল্লী থেকে ছুটে চলে তাই বিদেশের দিকে।

পাঁচবছর পরে দেশের মাটিতে পা ছুঁয়েই কোলকাতার টানকে অমান্য করতে পারেনি। গিয়েছিল কিংশুক মিত্রেরই বাড়ীতে। কিন্তু বাড়ী তালাবন্ধ দেখে এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠতে হল। হঠাৎ পথে হেনার সাথে ওর দেখা একদিন নিউ মার্কেটে। সিন্দুরোজ্জ্বল মুখখানা দেখে হঠাৎ অনুর বুকের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গিয়েছিল। একটু সম্বিত ফিরে পেতেই হেনার সাদর আহ্বান কানে গেল। "আরে অনু না? উঃ কতদিন পরে দেখা বলত? তা খবর কিরে? বিদেশ থেকে তো বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরলি, কাগজে পড়লাম তা কিংশুকের খবর কি?" এবার সহজ হবার পালা অনুপমার। হেসে সে বলেছিল "বাঃ, তুই তো দেখি খবরী হয়ে বসেছিস্। তা ভাগ্যবানটি কে? কিংশুকের খবর তো তোদের কাছেই আশা করি।"

"তা যা বলেছিস্। আমার স্বামী মিঃ দত্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র। তা কিংশুক তো সাড়ী বাড়ী সব হেনার নামে বিক্রী করে দিয়ে কোথায় যেন প্রকেসারী নিয়ে চলে গেছে। ঐ দিল্লীর দিকেই তো! দেখ্, এবার যদি তোর স্বপ্ন সার্থক হয়।" হেনার ইঙ্গিত গায়ে মাখেনি অনুপমা। হেনা তার খুব উপকার করেছে। কিংশুক সম্বন্ধে এর বেশী খবর আর সে কোথায়ই বা পেত! অনুপমা দিল্লীতেই ফিরে এল আবার।

• • • •

সেবার এক শীতের দিনে অনুপমার মাসীমার মেয়ে দিল্লীতে গিয়েছিল বেড়াতে। রেবা আগ্রা যেতে চায়। অনুপমা রেবাকে নিয়ে আগ্রা গেল তাজমহল দেখতে। হঠাৎ মনে হল তাজমহলের গেটের সামনে কে এক ভদ্রলোক একটা ফটো তুলছেন একমনে এক পাঞ্জাবী মহিলার। ঠিক যেন কিংশুক মিত্র না! এগিয়ে যেতেই সন্দেহ নিরসন হল। কিংশুক মিত্রই বটে। রেবা সাথে আছে তবু সেদিকে লক্ষ্য না করেই অনুপমা ছুটেই যেন কিংশুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "নাঃ, অনু তোমার ছেলেমানুষী গেল না। মাপটাই খারাপ হয়ে গেল।" —অনুপমা চেয়ে দেখল, সেই দীপ্তিমান, কান্তিমান দেহ যেন তামাটে হয়ে গেছে। আগুন হয়তো এখনো আছে তবে তা যেন ছাই-চাপা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মেয়েটির দিকে। উচ্ছলতায় ভরপুর। নিজের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল অনুপমা। কি দিয়ে বাঁধবে কিংশুককে? ওর বিদ্যাবুদ্ধি আর আজ কোন কাজেই লাগবে না—; তাছাড়া দেহটা তো হয়েছে আরও বিশাল! সত্যিই অনুপমা যে ধারেও কাটে, ভারেও কাটে! ও দেখল—ধীরে ধীরে কিংশুক হেঁটে গেল মেয়েটির দিকে। মেয়েটির কি যেন প্রশ্নের একটা উত্তরও দিল ও। তারপর হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদনের ইঙ্গিত জানিয়ে ওরা চলে গেল ঘুরে। আর তাজমহলের মর্মর মৌধে বসে রেবার উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাসকে ও প্রাণপণে চেপে নিল।

তারপর আরও কয়েকটা শীতের সন্ধ্যা এসেছে, আবার ফিরেও গেছে। তারা-ভরা আকাশে হয়তো কত উল্কা আপন গতিবেগে ঘুরিবার পথনে শেষ হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। নতুন তারার নতুন সম্ভাবনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়তো সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু অনুপমার রক্ত-বিন্দুতে সৃষ্টির সুখ শিহরণ লাগল না। দিন ও রাত্রি পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে বেঁধে ঘুর্ণায়মান জগতে চলেছে কোন ঘূর্ণায়ন নির্দেশে কে জানে! তবু যাত্রাপথের শেষ থেকেই হয় আবার যাত্রা সুরু। আজ বুঝি অনুপমার জীবনের সেই বিশেষ দিনটির আবির্ভাব হল।

দীর্ঘ দশ বছর পরে অনুপমা এসেছে কোলকাতায় তার বোনের বাড়িতে কয়েকদিনের অবকাশ যাপনের জন্য। দিল্লী থেকে নিজের গাড়ী করেই এসেছে সে। আর সেই গাড়ী করেই আজ বেড়াতে বেরিয়েছিল। পথে এই বিপত্তি!

• • • •

"সিষ্টার সুচটা তৈরা হয়েছে?" কর্তব্যরত ডাক্তারের কথায় যেন অনুপমা জেগে ওঠে। নার্স ইনজেকশনের সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে আসে। ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে অনুপমার দিকে তাকিয়ে বলেন—"ঠিক আছে। আপনি আসুন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। পারেন তো ওঁর আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেবেন একটা। ওঁর বুক পকেটেই ঠিকানা পাওয়া গেছে। এই যে দেখুন। আচ্ছা, আপনি আসুন। নমস্কার।"

নিঃশব্দে অনুপমা ঠিকানাটা টুকে নেয়। তারপর গাড়ী ছোটাতে বলে ড্রাইভারকে।

উঃ, কি ঘিঞ্জি গলি! নাঃ, মোটরটা এই মোড়েই থামাতে হল। অনুপমা গাড়ী থেকে নেমে নম্বর মেলাতে এগিয়ে যায়। এ তো দেখছি বস্তি বাড়ি! অনুপমা দরজার কড়া ধরে নাড়া দেয়। দরজা খুলে যে মেয়েটি দাঁড়ালো, শরীরের হাড়গুলো ছাড়া আর কিছু কি তার অবশেষ আছে? আর ঐ যে ছেলেটি বসে বসে একটা রুটিকে মুখের লালায় ভিজিয়ে নেবার কি প্রয়াসই না করছে। অনুপমা শিউরে ওঠে। "আপনি কে?"—চাপা যেন একটু সংকোচে ওর বিগত যৌবনকেই ঢাকতে

ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওর নয় হাতি সাড়ীর আঁচল টেনে। সংক্ষেপে সব ঘটনা জানিয়ে অনুপমা ছেলেটিকে টেনে নেয় কাছে। চাপা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে।—"আমার তো আর কেউ নেই দিদি! ও যদি না থাকতো তবে নর্দমায় পাকে চলে যাওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। পাকিস্তানের শিকার হয়ে যখন শিয়ালদায় এসে পৌঁছালাম তখন ও না আশ্রয় দিলে আমি কোথায় ভেসে যেতাম তার ঠিক নেই।" অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে চাপা। মায়ের কান্না দেখে শিশুটিও কাঁদতে থাকে ভয় পেয়ে। অনুপমার চোখও কি শুকনো ছিল? তবুও ধমক দিয়ে বলে—"এখন কান্নার সময় নয়। চল তোমার স্বামীকে দেখবে চল।" কোনমতে কাপড় বদলে ছেলে কোলে করে চাপা গাড়ীতে এসে বসে। পথে যেতে যেতে শুনল চাপার কাহিনী। কেমন করে ও শেয়ালদায় আসে। আর তখন ভবঘুরে কিংশুকের সাথে ওর দেখা। নারী মাংসের দালালের হাত থেকে ওকে মুক্ত করে কিংশুক এখানেই তোলে ওকে। তারপর অনেক কষ্টের পাহাড় ডিঙিয়ে কিংশুক এই ছোট্ট রোজগারের পথটিই বেছে নেয়। চাপাকে নিয়ে এই জীবিকা ছাড়া কিংশুকও অন্য কিছু করতে অনিচ্ছুক। ওদের ছেলে এই বিশু মাত্র এক বছরের। ওরা মোটামুটি সুখী। কিন্তু ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর হবেন? চাপা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। ওদের গাড়ী হাসপাতালে এসে যায়। ওয়ার্ডে এসে শোনে কিংশুকের জ্ঞান ফিরেছে।

অনেক আশা নিয়ে অনুপমা চাপার হাত ধরে বেডের দিকে এগিয়ে যায়। একি? কিংশুক কি ওকে চিনতে পারছে না? "কিংশুক!"—অনুপমা ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিংশুক হেসে ফেলে। বলে—"অনু, আমাকে দেখে যদি দুঃখ পাও বা সান্ত্বনা দাও, তা কিন্তু নিরর্থক হবে। আমি কিন্তু পরাজয় মেনে নিতে রাজি নই।"

"আমার বলার তো কিছুই নেই কিংশুক। তবু তুমি যে সুখী হয়েছ, এতেই আমি খুশী।"

আবারও হেসে ওঠে কিংশুক। হাসির দমকে ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা আবার লাল হয়ে উঠল নাকি? অনুপমা সন্ত্রস্ত হয়—"তুমি হেস না কিংশুক।"

"নাঃ, হাসছি না। তবে সুখী হয়েছি একথাও ঠিক মিলছে না। শুধু দিন যায় আর আমি অখুশী নই। অনু, চাপা বড় ভাল মেয়ে। ওর একটা নির্ভরশীলতা আছে আমার উপর। তাছাড়া ও অসহায়। তাই তো ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। অন্যের করুণা সইতে পারি না কোনোদিন, তবে অন্যকে করুণা করতে সত্যিই মন চায়। আচ্ছা, তুমি এস। চাপা, বিশুকে একটু আমার কাছে বসিয়ে যাও। অনু, আমাকে করুণা করে অথবা ঈর্ষা করে নীচু করে দিও না।"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপমা ধীরে ধীরে বাইরে আসে। আস্তে আস্তে হাসপাতালের রাস্তা দিয়ে হেঁটে ও নিজের গাড়ীতে যে কখন উঠে বসেছে, খেয়াল নেই। ওর মনে হল সত্যিই কিংশুক অপরাজেয়। জীবনের সুখ দুঃখকে সমান্তরাল রেখায় যে বাঁধতে পেরেছে সেই তো সংসারে জয়ী। নিজের দিকে তাকিয়ে অনুপমার হাহাকার বেরিয়ে আসতে চাইল। সর্ব সমর্পনের রিক্ততায় ভারে ভার বিপুল দেহভার তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কর্ণেল পিন্টোর অব্যর্থ জেরা

স্বপর্ণ রায়

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কখন কী হয় তারই আশংকায় য়ুরোপের দেশগুলি অস্থির। গোপন আরেক যুদ্ধও চলেছিলো একই সঙ্গে : এক দেশের গুপ্তচরের সঙ্গে অন্য দেশের গুপ্তচরের বুদ্ধির লড়াই। তখন মিত্রপক্ষের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন কর্ণেল পিন্টো। তিনি নিজেও ছিলেন এক সময়ে একজন গুপ্তচর। জেরা ক'রে জার্মানীর একজন গুপ্তচরকে শেষ পর্যন্ত কেমন ক'রে তিনি ঘায়েল করলেন তারই কাহিনী। যুদ্ধের শেষে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কর্ণেল পিন্টো সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বলেছিলেন অতিযুক্ত গুপ্তচরদের মধ্যে অনেকগুলিকে ধরিয়ে দেবার কৃতিত্বে উজ্জ্বল এঁর জীবন।]

"মিষ্টার ওয়ার্ল্ড, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনি বেশ বিপদেই পড়েছেন। যে-সব ঘটনা জানা গেছে তার সবগুলিই আপনার বিরুদ্ধে। স্কটল্যাণ্ডে এসেছেন রবারের নৌকোয় চ'ড়ে। সঙ্গে এনেছেন একটা ওয়ারলেস সেট আর গুলিভরা পিস্তল। তাছাড়া, আপনার সঙ্গে ম্যাপ আর সাংকেতিক ভাষার লেখা নোটবইও পাওয়া গেছে। পুলিশ যখন আপনাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো তখন আপনি তাদের বাধা দিয়েছেন। আপনি যদি নির্দোষ হতেন, তাহলে এ-রকম কখনোই করতেন না। নিজের পক্ষে যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো বলুন, নইলে আমাকে বাধ্য হ'য়ে রিপোর্ট দিতে হবে যে আপনি শত্রুপক্ষ জার্মানীর গুপ্তচর", জার্মান ভাষায় বললেন কর্ণেল পিন্টো। তিনি মিত্রপক্ষের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রতিদিনই সন্দেহভাজন বহু নারী-পুরুষ এখানে ওখানে ধরা পড়ছে। তাদের মধ্যে কে সত্যি গুপ্তচর, আর কে নয়, জেরা ক'রে তা বের করাই কর্ণেল পিন্টোর কাজ। বিদেশী ওয়ার্ল্ডকে পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে হাজির করেছে তার সামনে। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখছেন ওয়ার্ল্ড জার্মান পক্ষের গুপ্তচর কি না।

তার কথার জবাবে ওয়ার্ল্ড বললো : "ও-রকম রিপোর্ট দিলে আপনি অত্যন্ত ভুল করবেন। আমি শত্রুর চর নই। আমি ব্রিটেনের বাসিন্দা।"

কর্ণেল পিন্টো মৃদু স্বরে বললেন : "কিন্তু যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন পুলিশকে বলেছিলেন আপনি সুইজারল্যাণ্ডের লোক।"

"ঠিকই বলেছি। আমার জন্ম সুইজারল্যাণ্ডে—জুরিক-এ। তবে আমার ব্রিটিশ রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে। কোনো জার্মান গুপ্তচরের এই কার্ড নিশ্চয়ই থাকে না, কি বলেন?"

কর্ণেল পিকো কথার উত্তর না দিয়ে ওয়াল্টির কাইলের কাগজপত্র উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। বললেন: "আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনার ব্রিটিশ রেজিস্ট্রেশন কার্ড রয়েছে। কার্ডের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, আপনি সাসেক্স গার্ডেনস-এ থাকেন। তা, ওখানে কেমন লাগছে?"

কর্ণেল পিকো।

সে হেসে বললো: "ভালোই লাগছে।"

"কিন্তু ট্রেনের হৈ-হল্লায় বিরক্তি লাগে না?"

ওয়াল্টি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। বললো: "কী বলছেন?"

কর্ণেল পিকো বললেন: "মিস্টার ওয়াল্টি, নাম শুনে মনে হ'লেও সাসেক্স গার্ডেনস খুব একটা গেঁয়ো রাস্তা নয়। ওই পথটা থেকে মাত্র কয়েক পা গজ ঘুরেই একটা বড় রেলস্টেশন। কিছু মনে করবেন না, বলুন তো স্টেশনটার নাম কি?"

লোকটা নিজের ঠোঁট কামড়ালো। বললো: "ব্রাইটন—। ওখানে খুব বেশি দিন আমার থাকা হয়নি। ইংরেজী ভাষাটাও এখনো তেমন আয়ত্তে আসেনি। রেলওয়ে স্টেশনটা সম্পর্কে কেউ আমাকে কিছু বলেও নি।"

"তা হলে শুনুন, স্টেশনটার নাম প্যাডিংটন। সাসেক্স গার্ডেনস বেশ লম্বা রাস্তা। রাস্তার দুই মুখ মিলেছে আরো দুটি পথের সঙ্গে। সাসেক্স গার্ডেনস-এ যেতে হ'লে ওই দু'টি রাস্তার একটি দিয়ে যেতেই হবে। বলতে পারেন ওই সমান্তরাল রাস্তা দুটোর নাম কি?"

সে মাথা নেড়ে জানালো: "বলতে পারছি না।"

"পুব দিকের রাস্তাটার নাম এডগার রোড আর পশ্চিমের রাস্তাটার নাম ওয়েষ্টবোর্ণ টেরেস। আপনি যে নির্দোষ তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারছেন না, মিস্টার ওয়াল্টি। আচ্ছা, আপনার রেজিস্ট্রেশন কার্ডটার দিকে ভালো ক'রে নজর দিয়ে দেখুন তো অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ে কি না?"

সে খানিকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে দেখে বললে: "না তো!"

"আমার চোখে কিন্তু পড়ছে। কার্ডটার রং কিংবা কাগজে কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু 'সাত' সংখ্যাটার তলায় একটা রেখা টানা রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে 'সাত' লিখতে গিয়ে এ-রকম রেখা নিচে কেউ দেয় না। বোঝা যাচ্ছে মূল য়ুরোপ ভূখণ্ডের কোনো কেরাণী না জেনে কিংবা অসাবধানে এ কাজ করেছে। আপনি যাই বলুন, মিস্টার ওয়াল্টি, কোনো ইংরেজ কেরাণী আপনার কার্ডের উপরকার লেখাগুলো লিখে দেন নি।"

সে কোনো উত্তর দিলো না। তার বাঁ দিকের কপালের রগটা ফুলে উঠে দপদপ করছিলো। কর্ণেল পিকৌ এতক্ষণ একটু রুঢ় গলায়ই কথাগুলি বলছিলেন। এবার কিন্তু লোকটির জন্য সহানুভূতি বোধ না ক'রে পারলেন না। লোকটা নিশ্চয়ই জার্মান গুপ্তচর। তবে সে খারাপ লোক নয়। বললেন: "দেখুন, মিস্টার ওয়ার্ল্ড, মূলতঃ অসৎ লোক আপনি নন। সেই জন্যেই মিথ্যে কথা বলতে আপনার আটকাচ্ছে। এই অবস্থায় সত্যি কথাই বলুন না। তাহলে অন্তত মানসিক শান্তি তো পাবেন।"

একটু সময় ভেবে নিয়ে সে বললে: "সত্যি কথা বললে আমার কী উপায় হবে? আমি কি বাঁচতে পারবো?"

"তা আমি বলতে পারি না। কী করা হবে তা স্থির হবে বিচারকের রায় এবং জুরীদের মত অনুসারে। তবে, একটা কথা বলতে পারি। খোলাখুলি সব কথা বললে আপনার অন্তত বাড়তি ক্ষতি হবে না। বরং উপকারও হতে পারে।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ অনেক। আপনার সুটকেসে পাওয়া গেছে জার্মানীতে তৈরী ওয়ারলেস, জার্মান ম্যাপ, সংকেতের বই। কাজেই, শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। তবে দোষ স্বীকার করলে শাস্তি খানিকটা লাঘব হতে পারে, এই যা।"

বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললো: "গুপ্তচরবৃত্তির সাজা কী?"

"মৃত্যু।"

"যদি সত্যি কথা বলি তবে বাঁচতে পারবো তো?

"হয়তো। এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কী শাস্তি দেওয়া হবে তা স্থির করবেন জুরী এবং বিচারক।"

ওয়ার্ল্ড দু'তিন মিনিট চুপ ক'রে রইলো। কী করবে তাই বোধ হয় ভাবছিলো। তারপর ব'লে উঠলো: "বেশ, তাহলে খুলেই বলছি। শুনে বুঝতে পারবেন সত্যি আমি ইংল্যাণ্ডের শত্রু নই। কেবল জটিল পরিস্থিতিতে প'ড়ে আমাকে এই পথে আসতে হয়েছে।"

ওয়ার্ল্ড বলতে লাগলো। কিন্তু প্রথমে সে এত তাড়াতাড়ি আর অসংলগ্নভাবে বলতে শুরু করলো যে কর্ণেল পিকৌর পক্ষে বুঝে ওঠা শক্ত হলো। যাই হোক, ওয়ার্ল্ড ব'লে চললো: সে ছিলো সুইজারল্যাণ্ডের একজন পশম ব্যবসায়ী। জার্মানরা সমগ্র বেলজিয়াম দখল করেছে। তবু নিরপেক্ষ দেশের লোক ব'লে বেলজিয়ামের সঙ্গে তার ব্যবসায় চালাতে কোনো অসুবিধাই হলো না। সেখানকার যে কারখানার সঙ্গে সে সব চেয়ে বেশি লেনদেন করতো, তার মালিক ছিলো দুজন ইহুদী। জার্মানরা যে-কোনো সময়ে মেরে ফেলতে পারে এই আতংকে অস্থির হ'য়ে তারা ওয়ার্ল্ডকে অনুরোধ করে ওদের পালিয়ে যাবার পথ ক'রে দিতে।

বিদেশী হিসেবে ওয়ার্ল্ডের চলাফেরা করার খানিকটা স্বাধীনতা ছিলো। সে কথা দিলো ওদের সে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং সেই রাতেই ওরা ফ্রান্সে চ'লে যাবে।

ওয়ার্ল্ড হোটেলে ফিরে নিজের ঘরের দরজা খুলতেই চমকে গেলো। দেখলো সেখানে দলের তিনজন লোক তার জন্য ভেতরে অপেক্ষা করছে। সে ঢুকতেই ওরা তাকে মাটিতে ফেলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো। ওদের অভিযোগ জার্মানীর শত্রু বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের সে পালিয়ে

যেতে সাহায্য করছে। শুনতে পেলো ইতিমধ্যেই তার ইহুদী বন্ধুদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারাই ওয়াল্টির নাম ব'লে দিয়েছে। গেষ্টাপো দলের লোকেরা ওয়াল্টির জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করলে। বলদে, বিচারের জন্ত ওকে জার্মানীতে পাঠিয়ে দে'য়া হবে। আর, তার ফল কী হবে তা তো স্পষ্ট। হয় তাকে গুলি ক'রে মারা হবে, নয়তো বহুবছরের জন্ত কয়েদ ক'রে রাখা হবে। তবে, ওয়াল্টি যদি স্বেচ্ছায় জার্মানদের সাহায্য করতে রাজী থাকে তবে ছেড়ে দে'য়া হবে তাকে।

জার্মান বাহিনী ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবে। ফ্রান্স কিংবা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মতো ইংল্যাণ্ডেরও ক্ষমতা হবে না জার্মান আক্রমণ রুখবার। তবু আগে ভাগে কিছু গুপ্তচর ইংল্যাণ্ডে পাঠানো দরকার। কাজটা খুবই সহজ। একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে ওয়াল্টি লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে হাজির হবে। সেখানে একজন লোক বিশেষ একটা কথা বলে নিজের পরিচয় দেবে। তার কপালের কাটা দাগ দেখেও ওয়াল্টি তাকে চিনতে পারবে। তখন তার হাতে স্যুটকেসটা দিয়ে দিতে হবে। এর পরেই ওয়াল্টি মুক্ত, আর তার কোনো দায়িত্ব নেই। ওই কাজের জন্ত তাকে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা প্রচুর দে'য়া হবে। তার দিনগুলি কাটবে সুখে-স্বচ্ছন্দে।

ওয়াল্টি সাহসী না হতে পারে, কিন্তু বোকা সে নয়। কাজটা যদি এতই সহজ তো ওরা নিজেদের লোক পাঠাচ্ছে না কেন? গেষ্টাপো নেতা জানালেন, তর্ক-বিতর্ক করার সময় ওদের নেই। ওয়াল্টির কাছ থেকে ওরা সাফ জবাব চায়।

বাধ্য হ'য়ে ওয়াল্টি ইংলণ্ডে যেতে রাজী হলো। তবে স্যুটকেসের ভিতরে কী থাকবে তা জানতে চাইলো। বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে ওর একটা আতঙ্ক ছিলো। গেষ্টাপো দলের লোকেরা বললো, সে-রকম কোনো জিনিস স্যুটকেসে থাকবে না। যা থাকবে তা ওয়াল্টি দিন কয়েক পরে নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

ওয়াল্টি ভেবেছিলো দু তিন দিনের মধ্যেই বোধ হয় ওকে পাঠানো হবে। কিন্তু দিন, সপ্তাহ, মাস চ'লে গেলো, তবু সে-রকম লক্ষণ দেখা গেলো না। আগামী কালই তাকে পাঠানো হবে, এ-কথা বলেও শেষ মুহূর্তে আর পাঠানো হলো না—বেশ কয়েকবার এ-রকম কাণ্ড হলো। ওয়াল্টি একটু অধীর হয়েই উঠলো।

শেষে একদিন একেবারে আচমকা তাকে বিমানে ক'রে নিয়ে যাওয়া হলো নরওয়েতে। সেখানে আরো দুজন 'ভলান্টিয়ার'-এর সঙ্গে দেখা হলো। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে ওয়াল্টিকে বলা হলো আর এক ঘণ্টার ভেতরেই ওকে রওনা হতে হবে।

বিমানটা বেশ বড়ো। সাঁ ক'রে আকাশে উঠতেই একজন জার্মান অফিসার বুঝিয়ে দিলে যে বিমানে রবারের দুটো ডিঙি নৌকো আছে। একটা একটু বড়ো, আরেকটা ছোট। বড়োটা কিছু আগে চেনা দু জন গুপ্তচরের জন্তে। ছোটটা ব্যবহার করবে ওয়াল্টি। সমুদ্র যদি শান্ত থাকে তবে বিমানটা স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের এক মাইল কি দু মাইলের ভেতরে গিয়ে ডিঙি দুটোকে জলের উপর নামিয়ে দেবে। ওয়াল্টির সঙ্গে কম্পাস থাকবে। ছোট বৈঠার সাহায্যে তাকে পৌঁছতে হবে তীরে। তবে তীরে পৌঁছে ডিঙির ভাওয়া ছেড়ে দিয়ে যেন সেটাকে সে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিতে ভুল না করে।

সেই ভুল ক'রেই ওয়াল্টি একজন পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও পরে সেই সূত্রে ধরা পড়েছে মনে পড়লো। কর্ণেল পিন্টো মনে মনে একটু হাসলেন। বিষয়ও বোধ করলেন।

ওয়াল্টি বললো: "আমি ভেবেছিলুম সুটকেসটা কারুর হাতে না দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলবো।"

"আচ্ছা আপনি এখন আসুন। আবার পরে আপনাকে আমার দরকার হবে।" ব'লে তাকে সাময়িকভাবে বিদায় দিলেন কর্ণেল পিন্টো।

পরের দিন সকালেই আবার ওয়াল্টিকে ডাকানো হলো। কর্ণেল পিন্টো বললেন: "দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে: গেষ্টাপোদের হাতে পড়ে আপনি বাধ্য হলেন জার্মানদের সাহায্য করতে। নিজেই বলেছেন সুটকেসের ভেতরকার জিনিস ক'দিন পরেই দেখার সুযোগ আপনার হলো। আর বলেছেন লণ্ডনে পৌঁছে সুটকেসটা নষ্ট করে ফেলবেন স্থির করেছিলেন। আমি ঠিক বলেছি তো?"

ওয়াল্টি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আচ্ছা, মিষ্টার ওয়াল্টি, তাই যদি আপনার ইচ্ছা ছিলো তবে তীরে নামবার পরেই কেন সমুদ্রের জলে সুটকেসটা ফেলে দিলেন না? কিংবা, কাছাকাছি কোন থানায় গিয়ে সেটা জমা দিয়ে দিলেন না? তা না ক'রে তারি সুটকেসটা কষ্ট ক'রে ব'য়ে নিয়ে গেলেন এডিনবার্গে, লাগেজ অফিসে জমা দিলেন। আবার রাত নটার সময় গেলেন সেটা ফিরিয়ে নিতে। এ থেকে আমার মনে হয় নির্দিষ্ট লোকটির হাতে সুটকেসটা পৌঁছে দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য ছিলো। অবশ্য যদি সেই লোকটির বাস্তব অস্তিত্ব থেকে থাকে। কিংবা সুটকেসের ভেতরকার ওয়ারলেস নিজেই আপনি ব্যবহার করবেন ব'লে এনেছিলেন।"

একটু ইতস্তত ক'রে ওয়াল্টি জবাব দিলো: "তা নয়। আমি ভয় করছিলুম গেষ্টাপোর লোকেরা হয়তো আমার উপরে নজর রেখেছে। সত্যি ক'রে বলছি, সত্যি আমি সুটকেসটা নষ্ট ক'রে ফেলতুম।"

"কিন্তু সুটকেসটা থানায় জমা দিলে তো আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। পুলিশই তখন আপনার নিরাপত্তার ভার নিতো। গেষ্টাপোর লোকেরা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারতো না।"

"এই কথাটা তখন আমার মাথায় আসেনি।"

"আরেকটা কথা। ব্রিটেনের জনসাধারণের প্রতি আপনার যদি বন্ধুত্বেরই মনোভাব, তবে সঙ্গে গুলি-ভরা পিস্তল রেখেছিলেন কেন?"

"আমি—আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে ওটা আমার সঙ্গে রয়েছে। বিমান থেকে নামিয়ে দেবার সময় ওরা আমার পকেটে পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। ওটা যে গুলি-ভরা জানতুম না।"

"বলেন কি! ভুলে গিয়েছিলেন? গুলি-ভরা একটা পিস্তলের ওজন প্রায় এক কিলো। সারাদিন সেটা আপনার ডান দিকের পকেটে রইলো—ক'য়েক মাইল পথ হাঁটলেন তবু ওটার অস্তিত্ব একবারও টের পেলেন না? একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে না কি, মিষ্টার ওয়াল্টি?"

"অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।" ওয়াল্টির স্বর এবার উদ্ধত।

"বেশ, মেনে নিচ্ছি আপনি ভুলে গিয়েছিলেন। তা, লণ্ডনের পুলিশ যখন আপনাকে লাগেজ অফিসের সামনে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলো তখন হঠাৎ আবার পিস্তলটার কথা মনে পড়লো কেন? ওটা ব্যবহার করবার চেষ্টাই বা করলেন কেন?"

প্রায় আধ মিনিট চুপ ক'রে থেকে সে বললে : "আমার জাতজ্ঞান তখন লোপ পেয়েছিলো।"

কর্ণেল পিটো মাথা নেড়ে বললেন : "আপনার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। যাক, বলছিলেন না আপনি ফ্রান্সিস-এ থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"বেলজিয়ামেও ছিলেন? সেখানেই তো দু'জন ইহুদী বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমার হাতে যে পাসপোর্টটা রয়েছে, সুইজারল্যাণ্ডের পাসপোর্ট—এটা তো আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তাহলে বলুন। বেলজিয়ামে ঢুকেছিলেন অথচ আপনার পাসপোর্টে সে-রকম স্ট্যাম্প মারা নেই কেন?"

ওয়ার্ণিট কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তবু সে নিজেকে নির্দোষ ব'লেই দাবী করতে লাগলো। সে কি সত্যি সুইজারল্যাণ্ডের লোক, না জার্মান তা-ও জানা গেলো না। কিন্তু বোঝা গেলো তার গল্পের অনেক অংশই বিশ্বাসের অযোগ্য। কর্ণেল পিটো তাকে বাঁচাতে পারলেন না। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হলো।

• • • •

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। ক্যানাডাতে বৃটিশ বাহিনীর সেনাপতি তখন জেনারেল স্যার এইচ. ক্লিনটন্। হাডসন নদীর ওপরে ওয়েস্ট পয়েণ্ট শহরে একটা দুর্গ ছিল। সেই দুর্গটা দখল করার জন্যে স্যার ক্লিনটনের সৈন্যদের সঙ্গে একদল আমেরিকানের যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ যুদ্ধের মাঝামাঝি স্যার ক্লিনটন একটা খবর পেলেন যে দুর্গের আমেরিকান সেনাধ্যক্ষ নাকি আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। সে-সম্পর্কে ঠিক ব্যাপার জানবার জন্য শত্রুর লাইনের মধ্যে একজন বিশ্বাসী লোককে পাঠানো দরকার। সেই সময় মেজর এণ্ড্রি বলে একজন সুইস স্যার ক্লিনটনের দেহরক্ষীরূপে কাজ করছিলেন। স্যার ক্লিনটন আসল ব্যাপার জানবার জন্য এণ্ড্রিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এণ্ড্রি রাজী হলেন। সাধারণ আমেরিকান নাগরিকের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এণ্ড্রি, জন এণ্ডারসন এই নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খবরটা মিথ্যা ছিল। এণ্ড্রি ধরা পড়লেন এবং গুপ্তচর বলে তৎক্ষণাৎ কোর্ট মার্শালের বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল।

আপনাকে যা মানায়

আন্তা পাকড়াশী

বেশী দাম দিয়ে সুন্দর একখানি শাড়ী কিনে আনলেন। আসর পার্টিতে পরেও গেলেন। শাড়ীর জন্য হয় তো কর্তার সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হল। আবার পার্টি থেকে ফিরেও এলেন কেমন যেন একটা অপ্রসন্ন ভার ভার মন নিয়ে। যতটা আশা করেছিলেন ততটা যেন উতল হলনা। কেন হলনা? ওই পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে একটু সাহায্য করতেই আজ গোটাকতক কথা বলছি। বেঁটে হলে—খুব একটি বেশী দামের দিকে নাইবা গেলেন। এই যে সেদিন অত দামী শাড়ীটি আপনি পরেছিলেন—কিন্তু বিশেষ কেউ চেয়ে দেখলনা। কেন জানেন? আসলে ঐ অতবড় পাড় যে আপনাকে মোটেই মানায় না। আপনি হলেন বেঁটে মানুষ। তাই একরঙা বা ভাটিক্যালি ডুরে শাড়ী পরুন। না হলে ছোট ছাপ বা একটু সরু পাড় বেছে নিন। শাড়ীর সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ পরুন। হাই হিল জুতো ব্যবহার করুন—চুলের সাজ নিয়ে যান উঁচুর দিকে। বেশ লম্বা দেখাবে। না, অত বড় ব্যাগ নেবেন না। মাঝারি সাইজের একটি ব্যাগ হাতে নিন। কানে ছোট মাকড়ী বা টাপ পরুন, গলায় ঝুলিয়ে দিন লম্বা হার। শাড়ীর কুঁচির প্লেট সমান করবেন না, একটু অসমান থাক। কাপড়টি ঝুলিয়ে পরুন। আঁচল একটু বড় হয়ে দুলতে থাকুক। গায়ের ব্লাউজটি পরুন বেশ ফিট করা। বড় হাতার বা ছোট গলার নয় কিন্তু। এবার হাঁটুন, বেশ ছোট ছোট করে পা ফেলে একটু নাচের ছন্দে হাঁটুন, দাঁড়াতে হলে কোমরটা সোজা করে পা ফাঁক করে দাঁড়াবেন না, বা কোমরে হাত রাখবেন না। ও ভঙ্গী ভুলে যান। একটু বাঁকা ভঙ্গীতে ভেঙে দাঁড়ান। একটি পায়ের সামনে অন্য পাটি রাখুন। মাথা সোজা রেখে হাত দুটি বেশ দুপাশে ছড়িয়ে দিন। বসতে হলে হাল্কা ভাবে বসুন। পা'দুটি যেন মাটিতে ছুঁয়ে থাকে আর এক পা থাকবে আর এক পায়ের সামনে একটু ছুঁয়ে, কেমন! বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসবেন আর কি। ছোটো হয়ে মোটো করে বসলে যে আরও বেঁটে লাগবে। আর একটি কথা। কিছুতেই মোটা হবেন না যেন। খাওয়ার দিকে একটু কষ্ট করবেন। আলু, চিনি, ময়দা, ভাত এগুলো বাদ দিতে পারলেই ভাল। "মিষ্টি তো খাইনা। শুধু চায়ে একটু চিনি খাই", এই কথা বলবেন তো। কিন্তু সেটাও কম হয় না। বেশ কয়েক চামচ চিনি চায়ের সঙ্গে আমরা খেয়ে নিই, বদলে স্যাকারিণ ব্যবহার করুন। কষ্টতো হবেই একটু, প্রথম প্রথম খারাপও লাগবে, ভাতের জন্য মন কেমনও করবে, কিন্তু বেশ ছোটখাট মিষ্টি মেয়েটি হয়ে যাবে। পায়ে লম্বুছন্দে ঘুরে বেড়াবে। এই সময় থাকলে সব কষ্টই হাসি

মুখে সয়ে নেবেন। অবশ্য বদলে শাকসব্জি, ফল, স্যালাড, এগুলো খাবেন। হাঁটা হাঁটায়, খেলাধুলো, সাইকেল চড়া, সাঁতার ; নিদেনপক্ষে একটু হেঁটে বেড়ানো, এতেই আপনার ফিগার সুন্দর থাকবে। মাঝে মাঝে ওজন নেবেন আর মনে মনে ভাববেন এইতো বেশ লম্বা লাগছি, রোগাও আছি, আর কি চাই? পার্টিতে গেলে সবাই চেয়ে থাকবে, আবার এর ওপর যদি বেশ ভাল করে পরিষ্কার উচ্চারণে কথাবার্তা বলতে পারেন তবে তো কথাই নেই।

লম্বা হলে—আমরা আর কতক্ষণ আয়নায় নিজেদের দেখি বরং অন্যেরাই বেশীক্ষণ আমাদের দেখে। কোথাও যেতে হলে রাজ্যের শাড়ী গয়না বার করে ভেবে হিমশিম খেয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে যা হোক একটা কিছু প'রে নিয়ে রওনা দিলেন। সেটা আপনাকে মানাল কিনা বা আপনার বয়সের সঙ্গে খাপ খেলো কিনা ভেবেও দেখলেন না। পরতে হয় প'রে নিলেন। কিন্তু আপনার মত লম্বা গড়নে ঐ রকম আঁট জামা আর পাড়হীন শাড়ী ভাল লাগছেনা যে! লোকে বলে—"আপনারুচি খানা আর পররুচি পরহনা।" দেখুনতো আমার রুচি মত সেজে কেমন মানায়।

বড় বড় উজ্জ্বল ছাপের কিম্বা বেশ চওড়া পাড়ের শাড়ী বাছুন। জামা বাছবার সময় রং মিলিয়ে অন্য রংএর জামা পরুন আর নরত লাইটার আর ডিপার সেড্ ব্যবহার করুন। মানে, যে রংএর শাড়ী তার চেয়ে গাঢ় রংএর জামা। জামা পরুন ঢিলে। একটু ছোট গলা, আর বড় হাতের। অবশ্য যদি আপনি বেশী রোগা হন তবেই। এবার বেশ ভাল করে শাড়ীটি পরুন। খুতির শাড়ী হলে একটু বাড় দেওয়া বা মুলো ধরণের শাড়ী ব্যবহার করবেন। শাড়ীটি পেঁচিয়ে ঘাড়ে আঁচল ফেলুন, আঁচল একটু ছোট করুন। এবার পেছন ফিরে দেখুন আপনার শরীরের নীচের দিকটা বড় মনে হচ্ছে কি? তাহলে কোমরের কাছের পাড়টা সেটি পিঠ ঘুরে উঠেছে, টেনে নীচে নামিয়ে বর্ডার লাইন ঠিক করুন। ইচ্ছে হলে কোমরে রুপোর বিছে ব্যবহার করতে পারেন। ব্লাউজটি বড় হাতের কিন্তু খাটো মুলের পরতে পারেন। পেছনে বোতাম করে তাতে চেন আর ঘুঙুর গাঁথা রুপোর বোতাম ব্যবহার করতে পারেন। যদি মনে করেন নীচের ভাগটি ছোট দেখাচ্ছে তবে পিঠের ওপর চওড়া পাড়টি টেনে নিন। কানে লম্বা ঝাড় পরুন আর গলায় দিন চওড়া ছোট হার। বেশ সেজে বসবে এইরকম। একটু ভরা চেহারা হলে হাতে চওড়া ব্যাণ্ডের ঘড়ি বা এক গোছা চুড়ী পরুন। রোগা হলে একটা চওড়া কোন গয়না বেছে নিন। এই চুর বা মাতাসা। কখনো হাই হিল করবেন না। বেশ বড় একটা ব্যাগ হাতে নিন। চুল উঁচু করবেন না। বরং মাথার সঙ্গে সেজে খোঁপা বাঁধুন। হাঁটার মধ্যে বেশ একটা ধীর আর দীর্ঘছন্দ আনুন। মাথা সোজা করে হাঁটুন। বসার সময় দুটি পা জুড়ে বসুন। হাত দুটি শরীরের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখুন —বেশ ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসুন। যাঁরা লম্বা তাঁদের তো এমনিতেই অনেক সুবিধা আছে। তাই বলছি বেশী খেয়ে অমন ধারাল চেহারাটি নষ্ট করবেন না। আবার অতিরিক্ত কম খেয়ে কাঠিসারও হবেন না। স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যই হল শরীরের আসল সৌন্দর্য, দীপ্তি আর লাবণ্য। লম্বা হওয়াতে আবার অনেকে কেমন যেন লজ্জিত হন—একটু ছোট হলে বেশ হত, এই রকম মনে হলে তাঁরা মাথা গুঁজে চলেন। ফলে কুঁজো দেখায়। তা না করে মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটবেন—বসবেন। লম্বা হওয়া তো আপনার গর্ব। আপনার পোষাকে, হাঁটায়, চলায় আর বলায় সুন্দর একটি গুরু ভাব আর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলুন। সবাই আপনার সুরুচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন।

খাদ্যে ভিটামিন

শ্রীরূপা রায়

আমরা কী খাই ও কেন খাই—এই অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলি আমরা আধুনিক মেয়েরা কতটুকু ভেবে দেখি। ভিটামিন কথাটা ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ যদি খাদ্যে না থাকে, তবে শুধু খাবার গলাধঃকরণ করে লাভ কী? মুখের স্বাদেই না হয় অনেক কিছু খেলাম, কিন্তু খাদ্য গ্রহণের যে মূল উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন তা ভিটামিনশূন্য বা খাদ্য-প্রাণরহিত খাবার খেয়ে কী করে হবে তা আমরা একবার ভেবে দেখছি কি?

আজকাল অনেক পরিবারেই যে ভাবে রান্না করা হয় তাতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চিন্তা করা হয় না।

আমরা যে প্রণালীতে রান্না করি তাতে শাক-সব্জী, মাছ-মাংসে ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে কিনা সেটা বিশেষ ভাববার বিষয়। এই সম্বন্ধে আমার এক প্রবীণ মাসীমার রান্নার প্রণালী থেকে যা শিখেছি তা-ই এখানে বলবো। তিনি যে শুধু রন্ধন বিদ্যায় পটু তা নয়, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে খাদ্যদ্রব্য রান্না করলে দেহের পুষ্টিসাধন যে সবদিক পরিমাণে হয় এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রান্নার ব্যাপারে তাঁর মতামত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে আমরা দেখেছি অল্প সময়ে অনেকগুলি রান্না করতে। অথচ তাঁর প্রতিটি রান্নাই হয় শুধু খেতে অপূর্ব নয়, গুণেও। তাঁর রান্নার যোগাড়-যন্ত্র করার ব্যাপারটাও দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। ঠিক যেন ছবির মতো। শাক-সব্জী, মাছ-মাংস পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে, পরিচ্ছন্ন পাত্রে রেখে দেন। কোনো জিনিস টাটকা বা তাজা না হলে তিনি রান্না ঘরে নেন না। তারপর রান্না করতে যে-সব জিনিস প্রয়োজন তেল-ঘি থেকে আরম্ভ ক'রে তেজপাতা, লঙ্কা, হলুদবাটা, পাঁচফোড়ন, এমনকি প্রয়োজন মতো আদাবাটা, গরম-মশলা প্রতিটি যোগাড় ক'রে তবে রান্না শুরু করেন। তরি-তরকারী প্রভৃতি অতি অল্প সময় ভাজেন। কেননা তিনি মনে করেন বেশি ভেজে ফেললে খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হ'য়ে যায়। তারপর মশলা বা অন্যান্য বাটনা দিয়ে সে-গুলিকে অল্পক্ষণ সাঁতলিয়ে নিয়ে জল ঢেলে দেন যতক্ষণ না সুসিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উনুনে চাকা দিয়ে রাখেন। তারপর উনুনে কড়াই চাপিয়ে দিয়ে—কড়াইয়ে তেল ঢেলে দেন। তেল ঠিকমত ভেতে উঠলে তাতে পাঁচফোড়ন, লঙ্কা, তেজপাতা প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে সম্বরা দেন। কিছুক্ষণ ভাজা হবার পর, নামাবার সময় প্রয়োজন মত আদাবাটা একটু ঘি প্রভৃতি দিয়ে নামিয়ে নেন। এইভাবে রান্না করলে, তিনি বলেন, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন পূর্ণমাত্রায় অটুট থাকে, এবং আহারের যা উদ্দেশ্য শক্তিসঞ্চয় তা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয়। তরি-তরকারী, মাছ-মাংস বহুক্ষণ ধরে ভাজা-ভাজি ক'রে নিলে অনেক পরিমাণে তেল-ঘি মশলা, বিশেষ করে গরম মশলা ও লঙ্কা-বাটা প্রভৃতি ব্যবহার করলে খাদ্যদ্রব্য—শুধু যে ভিটামিন রহিত হয় তা নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকরও হয়। অনেক ক'রে গরম মশলা বা লঙ্কাবাটা ব্যবহার করলে তা যে অম্লিকর হয় তা আমরা ডাক্তার

কবিরাজদের কাছ থেকে সব সময় শুনে থাকি। এ রকম রান্নার খাদ্য-দ্রব্য রসনাতৃপ্তিকর হয় বটে, কিন্তু দেহের পুষ্টিসাধন খুব কমই ক'রে থাকে।

ভিটামিনের কথা বলতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়লো। শাক-সব্জি তরি-তরকারী বেশী সময় ভাজলে ভিটামিন নষ্ট হয় তা ভিন্ন তরি-তরকারীর খোসা ফেলে দিয়ে রান্না করলে খোসার সঙ্গে অনেক পরিমাণে ভিটামিন বেরিয়ে যায়। যেমন আলু আমরা হামেশাই ব্যবহার করি, আলু ছাড়া কোনো রান্নাই যেন হয় না। আলুর খাদ্যপ্রাণ থাকে তার খোসার সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু আমরা অনেকেই আলুর খোসা ছাড়িয়ে রান্না করি। স্বাদের দিক থেকে ত্রুটি হয় না, কিন্তু ভিটামিনরহিত খাদ্যদ্রব্য আমরা খাই এতে দেহের কোনো পুষ্টিসাধন হয় না।

রান্না সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার আছে। বারান্তরে তা বলবো। রান্না নিয়ে সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর নানা প্রগতিশীল দেশে কতরকম আন্দোলন চলেছে। অথচ বাংলাদেশে, যে দেশে রান্না গৌরব করার মতো বিষয় ছিলো, সে দেশে আমরা দিন দিন সব ভুলে যাচ্ছি। হারিয়ে ফেলছি। এ কম দুঃখের কথা নয়। আমরা মেয়েরা আজকাল বি. এ, এম. এ, পাশ করছি। অনেকেরই অর্থের অনটনে চাকরী করতে হচ্ছে। এইসব করতে গিয়ে সংসারের সব চেয়ে যে বড় কর্তব্য অর্থাৎ পরিবারের প্রতিটি প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ, এই বিষয়ে ক্রমে ক্রমে উদাসীন ও পরাধীন হয়ে পড়ছি।

• • • •

পথের পাশে ছোট্ট সরাইয়ে তিন বন্ধুর মধ্যে প্রবল তর্ক উঠেছে,—কাউন্টলিও টলষ্টয়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রেরণা কোথায়?

মিটমিটে আলোয় অবশ্য শ্রোতাদের মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, তিন বন্ধু ছাড়াও সেখানে জনকতক লোক আছেন। তার মধ্যে দাড়িওলা বুড়ো একজন।

এক বন্ধু বল্লেন,—রাশার অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচার।

আর একজন বল্লেন,—রাশার জনসাধারণ দারিদ্রের সম্মুখীন হয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন করছে, শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, সেটাই তাঁর প্রেরণা।

অপরজন বল্লেন—না, না, ও সব ছাড়াও আর একটা বড় জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে কাউন্ট টলষ্টয়ের দুর্দান্ত ঝগড়াটে স্ত্রী।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে দাড়িওলা লোকটি এগিয়ে এসে বল্লেন,—তোমার আন্দাজই ঠিক,—আমিই সিও টলষ্টয়।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মাতাহারির নাম আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়। সেই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গুপ্তনায়িকা, যে নাকি তার লাস্যলীলায় সারা ইউরোপকে অভিভূত করেছিল আর মেয়ে-গুপ্তচররূপে স্মরণীয়তা হয়েছিল। তারপর শেষ পর্যন্ত সে ইংরাজদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়। সেই থেকে মাতাহারি নামটার সঙ্গে গুপ্তনায়িকা শব্দটা একাত্ম হয়েছে। অর্থাৎ মাতাহারি মানেই মেয়ে-গুপ্তচর!

অলক্ষ্যের এক খবরে প্রকাশ, পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তানি মাতাহারিরা তাদের খেল্ শুরু করেছে।

সুন্দরী দুটি মেয়ে। পরনে গ্রাম্যবালিকার বেশ। পাঞ্জাব-সীমান্তের একটি মাঠে তারা ঘাস কাটছে। মেঠো পথ দিয়ে গ্রামবাসীরা আসছে যাচ্ছে, তাদের হাবভাব আর হাসি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করছে। সেখানকার পুলিশ-চৌকির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কেমন যেন সন্দেহ হল। এরা তো ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে না? কোথা থেকে এলো এরা? অফিসার তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়ে দুটির মুখে কি মিষ্টি মধুর হাসি। হাবভাবে কত না আবেদন। অন্য কেউ হলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু এই অফিসারটি তাদের মোহে না ভুলে তাদের থানায় নিয়ে এলো। তারপর একটু চাপ দিতেই তাদের মুখ থেকে সবকথা ফাঁস হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, তাদের কোমর থেকে বেরুলো কার্তুজভরা আধুনিক রিভলভার। তারা রীতিমত শিক্ষিতা। গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে। জেরার চোটে তারা স্বীকার করলে যে, তারা পাকিস্তানের গুপ্তবিভাগের নিয়োজিত চর। সম্প্রতি তারা এই কাজে ভর্তি হয়েছে। তারা আরও বললে যে, তাদের মত আরও অনেক অল্পবয়সী সুন্দরী পাকিস্তানি মেয়ে এই কাজ নিয়ে পাঞ্জাবের অনেক গ্রামে ও শহরে ঢুকেছে। পাকিস্তান-সরকার এই রকম অনেকগুলি শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েদের এই কাজে লাগিয়েছে। রণনীতিতে পুরো তৈয়ার পাকিস্তান কোন পন্থাকেই অবলম্বন করতে বাকি রাখছে না!

• • • •

কলকাতায় নাকি সত্যি সত্যিই স্টেডিয়াম তৈরী হবে। ২৪ একর জমির উপর নির্মিত এই স্টেডিয়ামে ৭৫ হাজার লোক বসতে পারবে। সর্বসাকুল্যে খরচ হবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা!! তা তো হবেই! কত লোহা, কত সীমেন্ট, কত চুন! কত ঠিকাদার! কত লোক! কত মজুর! ঠিকাদার মহলে তো ইতিমধ্যেই সাজসাজ রব পড়ে গেছে! আর গল্লামাটির দর এর মধ্যেই চড়ে গেছে।

• • • •

উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে আমাদের সমাজে মাথাব্যথার শেষ নেই। রক্ষণশীল রোমীওদের নিয়ে অভিভাবক থেকে পুলিশমহল পর্যন্ত চিন্তিত। প্রায়ই এদের কথা কাগজে দেখা যায়। বুদ্ধরা বলেন, আমাদের কালে এরকম ব্যাপার কল্পনারও অতীত ছিল। কালে কালে দেশটা যাচ্ছে কোথায়?

এ ব্যাপার কিন্তু শুধু আমাদের দেশেই নয়। এ ব্যাপার চলছে সারা জগৎ জুড়ে। পৃথিবীর নানা দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই এমনি বেপরোয়া ভাব, এমনি উচ্ছৃঙ্খলতা, এমনি আইনভঙ্গের ঘাসট, এমনি বেলেল্লাপনা।

আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে তবু আছে হতাশার ক্ষোভ, কিছু না পাওয়ার তীব্র অনুভূতি, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকার ক্রুদ্ধ আক্ষেপ। আর তারই ফলে তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন যাচ্ছে বিগড়ে, আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে বিপথগামী বিদ্রোহের ঝাঁজ। কিন্তু সে সব দেশে তো তা নেই। সে সব দেশের ছেলেমেয়েদের তো কিছুর অভাব নেই। তারা রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মায়, আলাদিনের ঐশ্বর্য তাদের ঘরে, জীবনে তাদের সুখ-সুবিধা-সম্ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু তবুও তারা অমন যৌবন-ছেঁড়া উন্মার্গগামী হয় কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সে সব দেশের মনস্তত্ত্ববিদের দল। কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনা শুনুন ওদেশের :—

সুইডেনের এক শহরে একদল অর্ধশতাব্দী ছেলেমেয়ে ভোর চারটের সময় গিয়ে হাজির হল এক গির্জায়। যখন শুনল যে সেখানে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হতে ঘণ্টা দেড়েক বিলম্ব হবে তখন তারা রেগে অধৈর্য হয়ে গির্জার কাঁচ ভাংলো, বোমা ফাটালো, গির্জার কবরগুলো উবড়ে ফেললো।

ফ্রান্সে বিত্তবান ঘরের চারটি ষোলো বছরের মেয়ে ভাগ্যের খেলা খেললো। চারটি কাগজের টুকরোয় চার রকম লেখা হল : (১) আমি আত্মহত্যা করব। (২) আমি চুরি করব। (৩) আমি ভাল হয়ে থাকবো। (৪) আমি একজন প্রেমিক গ্রহণ করব। সেই কাগজগুলি মুড়ে একটা বাটির মধ্যে রেখে লটারি হল। চারজনে চারটি কাগজ টানল। তার পরের রবিবার ইসাবেলা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। মেরী একটি দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। জেনি ভাল হয়ে রইল। অ্যানি একটির বদলে পাঁচটি প্রেমিক নিয়ে উধাও হল।

ব্রেজিলে একটি সতেরো বছরের ছেলে তার মেয়ে-বন্ধুকে পাশে নিয়ে রাজরাস্তায় নক্সই মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হল। তার সঙ্গিনীও মারা পড়ল।

ইংলণ্ডে একদল ছাত্র (তারা একটা খুব নামকরা বড় ইস্কুলেরই ছাত্র) স্রেফ মজা করবার জন্যে রেল লাইনের সিগন্যালের তারগুলো কেটে ফেললো। রেল লাইনের ফীশার খুলে ফেলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে উল্টে দিল। তাছাড়া সমুদ্রের ধারে, হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায়, থিয়েটারে উঠতি বয়সের ছেলেদের মারামারি তো লেগেই আছে। আর তাতে মেয়েরাও রীতিমত যোগ দিচ্ছে।

এসব ছেলেমেয়েরা কেউই ছোটঘরের নয়, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে। অনেকে রীতিমতো অভিজাত শ্রেণীর।

একটি ছাত্রের পিতা যখন শুনলেন যে তাঁর ছেলে ব্রাইটনের দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হয়েছে তখন তিনি সেই কথাই বলেছিলেন যে-কথা প্রত্যেক স্নেহশীল উদার পিতা বলছেন: "সে তো এরকম ছিলনা। আমি আর তার মা' তো, সে যখন যা চেয়েছে, তাই তো দিয়েছি। তবু সে এমন হল কেন?"

ইটালি, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা—সবদেশের অভিভাবকদের মুখে আজ এই প্রশ্ন। সেখানকার সমাজনেতাদের কাছে আজ এই দুশ্চিন্তা। কেমন করে এই যৌবন-ক্ষেপা বেপরোয়াদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত করা যায়।

• • • •

কয়েক সংখ্যা আগে যৌনচেতনা উদ্দীপক নিকৃষ্ট শ্রেণীর বইএর অযথা বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। বইএর মধ্যে কী আছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে রসালো বিজ্ঞাপনে। উদ্দেশ্য: পাঠক পাঠিকাকে প্রলুব্ধ করা। বিশেষ করে অপরিণতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের যৌনচেতনা সম্বন্ধে উগ্র করে তোলা। এ কাজ যে কতখানি নিন্দনীয়, কতখানি সমাজবিরোধী তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। দেখে স্তম্ভিত হলাম যে বাংলা প্রকাশনা জগতে সর্বোচ্চ শ্রেণীর এক অভিজাত প্রকাশকও এই ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে যে বই সম্প্রতি বেরিয়েছে তার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এই ভাষায়:—

"একটি অবদমিতকাম পূর্ণযুবতী মেয়ের উদ্দাম প্রেমের ভয়ংকর সুন্দর কাহিনী।"

বইএর মধ্যে কী আছে জানি না। সম্ভবত নক্কারজনক যৌন-সম্ভোগের অনেক বর্ণনা আছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটির বাহার লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন বিশেষণগুলি। বাড়ির ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে এই বই ঘুরবে। এবং প্রকাশ্যে বাধা পেলে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে এই বই অবশ্যই পড়বে। এবং তারা অবশ্যই যাতে পড়ে, অর্থাৎ অবশ্যই যাতে বইটা খুব বেশি বিক্রি হয় সেই জন্যেই তো এই রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া! আরও ভাল হত প্রকাশক যদি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভাল রেখে ঐ ধরণের ছবিও বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জুড়ে দিতেন। তাহলে সোনায় সোহাগা হ'ত। ওঁদের পয়সার তো অভাব নেই। আশ্চর্য হয়ে ভাবছি—

"কে বা উচ্চ কে বা নীচ টাকার খেলায়
যত পারো লুটে নাও এ হট্ট মেলায়।"

• • • •

'ব্যাপার যা চলছে' লিখছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আবার বুঝি নতুন করে বর্ষা নামল। কাল বোধ করি আবার নৌকো চলবে কলকাতার রাস্তায়। দুমদাম শব্দ। সদর দরজা খুলে কে যেন ঢুকল। পরক্ষণেই জোর সাড়া তুলে ঘরে ঢুকলেন সাংবাদিক-বন্ধু। আমাকে রীতিমত চমকে দিয়ে বললেন, কাকে চাও এই মুহূর্তে?

কাকে চাই? তা তো মনে করতে পারছি না। বন্ধু বললেন না, বললেন, ভারতবর্ষের এখন কাকে সবচেয়ে বেশি দরকার? বলতে পারছো না তো? আমি বলছি, শোন। চাণক্যকে। বুদ্ধিতে আমরা দেউলে হয়ে গেছি তাই চাণক্যকেই আজ দরকার। তিনি থাকলে আজ আমাদের

এমন করে ঘরে-বাইরে লাথি-ঝাঁটা খেতে হ'ত না। পাকিস্তানের গুড়পানি দু'দিনেই বন্ধ হয়ে যেতো। খুনে-ব্যবসায়ীরা লাওয়ার মিলিয়ে যেতো। এতবড় ভীরুধী মানুষ ইতিহাসে দুটি নেই। বলি, অমন হাঁ করে চেয়ে আছ কেন? চাণক্যকে ভুলে গেছ নাকি?

বললাম, না ভুলবো কেন। ছেলেবেলায় তাঁর কত শ্লোক মুখস্থ করেছি। দু চারটে এখনো মনে আছে।

বন্ধু হুঙ্কার দিলেন, তাঁকে দেখেছো কখনো?

চমকে উঠলাম। বললাম, দেখিনি তো? পরক্ষণেই বললাম, না, না, দেখেছি বৈকি!

কোথায় দেখেছো?

কেন, থিয়েটারে, ঘাসীবাবু, শিশিরবাবু···

দুত্তোর ঘাসীবাবু, শিশিরবাবু! বলি, আসল মানুষটাকে দেখেছো?

না। আমার বাপ ঠাকুর্দাও দেখেনি।

বন্ধু বললেন, তাঁকে দেখা গেছে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাই নাকি। কোথায়?

বন্ধু বললেন, অম্বুতে। এই দেখ তাঁর ছবি! বলেই একখানা খবরের কাগজ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

দেখলাম, দিল্লীর একটি দৈনিকপত্র। তার সামনের পাতার এক পাশে একটি ছোট্ট ছবি। এক আর্য ব্রাহ্মণের দীর্ঘাকৃতি অবয়ব; মুণ্ডিত মস্তক, লম্বিত শিখা, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল দুই চোখ, প্রসন্ন মুখ, ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে কী যেন বলতে চাইছেন! ছবির নীচে পরিচয় লিপি: "এইটিই বোধ করি সারা ভারতে চাণক্যের প্রথম মর্মর মূর্তি। অম্বু নগরে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।"

সাংবাদিক-বন্ধু সগর্বে বললেন, আমি যে পত্রিকার সংবাদদাতা একমাত্র সেই কাগজেই এই ছবি বেরিয়েছে।

• • • •

কমলা বোর্ডিং-এর এক ঘুপচিঘরে বসে গবেষক তাঁর লেখায় মগ্ন। শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের দ্বারা তিনি কিছুদিন আগে নিযুক্ত হয়েছেন, নির্ধারিত মাসিক দক্ষিণায়।

গবেষক গভীর ধ্যানে মগ্ন। এমন সময় দাড়াশব্দ তুলে হোটেলের ম্যানেজার ঘরে এসে ঢুকল। কি ব্যাপার? মাস পেরিয়ে গেছে কয়েকদিন। গত মাসের হোটেলের বিলটা আজই শোধ করা চাই। পাহাড়ের চূড়ো থেকে গবেষক এক নিমেষে পপাত ধরণীতলে। হোটেলের বিল? টাকা? কিন্তু টাকা তো নেই। মাইনে? মাইনে তো তিনি পাননি। শুধু গতমাসে নয় তার আগের মাসেও পাননি। হোটেলওয়ালা বিস্মিত। সেকি মশায় মাইনে পাননা, আর রাতদিন ভাঁই ভাঁই কাগজ লিখছেন আর ঐ চোখতোলা বাড়ীটায় মাও বার করে রোজ ওঠানামা করছেন। কিন্তু সে যা হয় আপনি করুন, আমার টাকা না পেলে চলবে না। তিনদিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারেন পথ দেখুন। সত্যি পথ দেখতে হোল গবেষককে। অনেক বর্ণা দিয়েও তিনি তাঁর নিয়োগ-কর্তার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা পেলেন না। অতঃপর পথে দাঁড়ালেন এবং পথে দাঁড়িয়েই হয়ত তাঁর গবেষণা চালাতে লাগলেন।

শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে সব গবেষককে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত করেছেন অনেক লজ্জাজনক বাধ্য এবং আশ্বাস ঘোষণা করে, তাঁরা গত কয়েকমাস যাবৎ বেতন পাননি বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর তুল্য বিচিত্র ব্যাপার আর কোনো দেশে কোনোদিন ঘটেছে কি ?

এদিকে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়। ভারতের বৈজ্ঞানিক, ভারতের চিকিৎসক প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিরা দলে দলে বিদেশ চলে গিয়ে আর ভারতে ফিরছেন না, এরজন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি দেশনেতারাও অনেক কথা বলছেন, বলছেন যে, এভাবে তাঁদের মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে নিন্দার কথা, দেশের মধ্যে কোনোরকমে মাথা গুঁজে থেকে দেশের কল্যাণার্থে তাঁদের নিযুক্ত থাকা উচিত।

আরে মশায়, মাথা গুঁজে থাকতে তো তাঁরা নারাজ নন। কিন্তু তাঁদের থাকতে দিচ্ছেন কই ? কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে চকমিলান গগনস্পর্শী ইমারত তুললেন এই দুইটি গবেষণা সংস্থার জন্যে। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়। পারিশ্রমিক যা নির্ধারিত হল তা এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু তাই মেনে নিয়ে বহু প্রতিভাসম্পন্ন গবেষক বিদেশী সংস্থার লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেশের গবেষণা মন্দিরেই প্রবেশ করলেন। কিন্তু হায়! কোথায় যন্ত্রপাতি, কোথায় ক্রেস্কটোমিটার, কোথায় ইলেকট্রনিক্স্। কোনো ব্যবস্থাই যে নেই। তারপর মাসান্তে মাহিনা বা বৃত্তি বা পারিশ্রমিক, তাও তো সময়মত পাওয়া যায় না।

গবেষণাগারের নামে আকাশচেরা অট্টালিকা উঠছে, ঠিকাদারেরা লাল হচ্ছে আর এদিকে লালফিতার মাহাত্ম্যে গবেষককুল অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

যেখানে কর্তাদের মাথার ঠিক নেই, তাঁরা নিজেরাই বেসামাল, ধূর্ত স্বার্থপর আমলাতন্ত্রের উপর অসহায়ভাবে যে রাষ্ট্রকে নির্ভর করতে হয় তার যে এমন হাল হবে, তাতে আর বিচিত্র কি।

* * * *

এই সংখ্যার শুরুতে পাশ্চাত্য দেশের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অপরাধপ্রবণতার কথা লিখেছি। সাম্প্রতিক সংবাদে জানা গেল, ইংলণ্ডে বর্ণ-বিদ্বেষের হিটিরিয়া মহামারীর মত দেখা দিয়েছে। টাইমস পত্রিকায় প্রায়শই যেসব অপরাধ কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে তা একটি সভ্যজাতির পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক।

সম্প্রতি এক ট্রেন-ডাকাতির নায়ক রোনাল্ড বিগ্‌স্ যেভাবে কয়েদখানা থেকে পলায়ন করেছে তা শুধু বিস্ময়কর নয়, সেই জেলখানার পক্ষে লজ্জাজনকও বটে। এই জেলখানা লণ্ডন মহানগরীর একেবারে মাঝখানে। তার প্রহরার ব্যবস্থাও যৎপরোনাস্তি পর্যাপ্ত। তারি ভিতর বসে বিগ্‌স্ এবং তার তিনজন সাথী এক চাঞ্চল্যকর পলায়নের গোপন মহড়া দিয়েছিল ২০।২৪ দিন ধরে। অথচ জেল কর্তৃপক্ষ কিছুই জানতে পারেননি। জেল কর্তৃপক্ষ কল্পনাও করতে পারেননি যে—যে সময় প্রতিদিন বিগ্‌স্‌কে কয়েদ ঘর থেকে প্রাঙ্গণে এনে ব্যায়াম করবার জন্যে কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হত—ঠিক সেই সময় একটি তরুণী যে গেটের কাছে আসত তার কুকুরটিকে বেড়িয়ে নিয়ে যাবার ছলে, তা বিনা উদ্দেশ্যে নয়, বিগ্‌স্-এর সঙ্গে তার ঘড় ছিল। আঙুলের ইশারায় দুজনের মধ্যে প্ল্যান তৈরী করা চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি মোটর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েদখানার ধারে আর তার মোটরে

চেপেই বিগস্ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। এ পর্যন্ত বিগস্ বা তার সঙ্গিনী ফাকেরই সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এইভাবে খুনজখম, হাঙ্গামাবাজি বা বোমাবাজি না করে স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে বড় বড় অপরাধ ঘটছে লণ্ডনে, যথা—

গত কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক লুঠ, বড় বড় দোকান লুঠ প্রভৃতি লুঠতরাজে ৫০ মিলিয়ান পাউণ্ড নিয়ে ডাকাতরা অক্ষত দেহে অদৃশ্য হয়েছে।

সানডে টাইমস্-এর মতে প্রতি দশ মিনিট অন্তর একটি করে মোটর গাড়ী অদৃশ্য হয়। কতক উদ্ধার হয় কতক হয় না। বে-আইনী মাদক দ্রব্যের কারবারে বহু কোটী টাকা খাটছে এবং সে কারবারকে দমন করা যাচ্ছে না।

এইসব অপরাধ ছাড়া আর একটি অপরাধ—বর্ণবিদ্বেষ। কালা-আদমী যারা বিলাতে যাচ্ছে কাজকর্ম এবং বসবাস করবার জন্যে তাদের অনেকের প্রতি "মৃত্যুদণ্ড" ঘোষণা করা হয়েছে। একটা সাংঘাতিক জুজুসুদ্ধ বিলাতকে কালোর ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে এই নিধন ও বিতাড়ন যজ্ঞ শুরু করেছে। উইলসন্ সরকার শত চেষ্টাতেও বিলাতের এই দ্বিমুখী অপরাধ-প্রবণতাকে দমন করতে পাচ্ছেন না।

• • • •

একটা দুটো থালা-বাটি নয় পাঁচ হাজার জিনিষ চুরি হয়েছে একটা বাড়ী থেকে। এ সব জিনিষগুলি সাধারণ জিনিষ নয়, তাদের দাম নির্ণয় করতে পারে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ। খানিকটা পাথরের টুকরো, শিল-নোড়ার মত দেখতে পাথরের ফলক, রং-চটা তামার পাত্র, টোল-খাওয়া পেতলের থালা, শেওলাধরা মাটির কলসী—এমনি ধরণের পচাবসা পুরোনো জিনিষ, তার দাম সাধারণ চোরের কাছে কানাকড়িও নয়। কিন্তু ভারতীয় যাদুঘরে সংগৃহীত সেইসব জিনিষের দাম কয়েক ক্রোড় টাকা। হিসাব নিতে গিয়ে দেখা গেল, যাদুঘরের সংগ্রহশালা থেকে কমপক্ষে পাঁচ হাজার রকমের জিনিষ উধাও।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ কাজ সাধারণ চোরের কাজ নয়। এর পিছনে আছে শিল্প-সমঝদার ধনীলোক, (হয়ত বা পদস্থ ব্যক্তি তিনি) আর আছে এক সুপরিকল্পিত বড়যন্ত্র এবং সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার দ্বারায় অমন নিখুঁতভাবে জিনিষগুলিকে সরানো হয়েছে এবং মনে হয় তাদের বিদেশে পাচার করাও হয়েছে। যদি রীতিমত তদন্ত করা যায় তাহলে আমাদের বিশ্বাস অনেক নাম-করা দুই কাতলা সেই তদন্তের জালে ধরা পড়বে।

স্মরণ থাকতে পারে, জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত দু'একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুর্নীতি-মূলক কার্যকলাপের অভিযোগে ইতিপূর্বে, (যে সে নয়) বাংলার এক রাষ্ট্র-মন্ত্রী অভিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

আমাদের দেশে, যে রক্ষক সেই ভক্ষক, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

• • • •

বিজ্ঞাপন একটি বিশেষ আর্ট। তার শিল্পসম্মত প্রয়োগকর্ম যেমন ১০০ ভাগ ফল প্রদান করতে পারে তেমনি যদি তা কোনো চিন্তাহীন নির্বোধের মস্তিষ্কপ্রসূত হয় তা'হলে তা সে শুধু তার উদ্দেশ্য

সাধনে ব্যর্থ হয় তাই নয়, তার এই অক্ষমতার সাংঘাতিক কুফলও ফলতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে এবং এই সংখ্যাতেও বই-এর বিজ্ঞাপনে অসংযত ভাষা ব্যবহারের ফলে যে কি কুফলের সৃষ্টি হতে পারে তা আলোচনা করেছি। বই-এর মত তেমনি ওষুধ-বিষুধ এবং অন্যান্য বস্তুর বিজ্ঞাপনেও এই কথা খাটে। সম্প্রতি ভারত সরকারের একটি বিজ্ঞাপন-অভিযানে যে চূড়ান্ত অবিমৃশ্যকারিতার এবং নষ্ট-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে তার তুলনা ইতিহাসে নেই।

পরিবার পরিকল্পনা নিন্দনীয় নয় নিশ্চয়। আমাদের দেশে তার প্রয়োজন যে সর্বাধিক সে বিষয়েও তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে সেই একটি বিশেষ সতর্ক-ব্যবস্থাকে ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে বলে, তাকে উলঙ্গ করে দেখাতে হবে তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সরকারী প্রচার কর্তা ঠিক তাই করেছেন। সম্প্রতি "নুন"-বিজ্ঞাপনের কথা বলছি। কী অমর প্রচার কার্য! যিনি বা যাঁরা এই বিজ্ঞাপন তৈরী করেছেন তাঁরা একবারও কি ভেবে দেখলেন না যে বিজ্ঞাপনটা নানা-বয়সী ছেলেমেয়েদের চোখে পড়বে এবং তারা শুধু যে সেটা পড়বে তাই নয়, বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য নিয়ে মনে মনে নানা কথা চিন্তা করবে এবং তার ফলে হয়ত তাদের চিন্তা বিপথগামী হবে। কত বড় দূরদর্শিতার ব্যাপার, বুঝে দেখুন ভাল করে। আরও খুলে বলবার বোধ করি প্রয়োজন নেই। তাই ভাবছি এই বিজ্ঞাপন যারা তৈরী করেছে এবং এই অভিযান যারা চালিত করেছে তারা কোন্ শ্রেণীর মানুষ?

আরও ভাবছি, যাঁরা এই বিজ্ঞাপন ছাপলেন তাঁদের লক্ষাধিক বিক্রিত, অর্ধলক্ষাধিক বিক্রিত পত্রিকায়, তাঁরা কি একবারও এই বিজ্ঞাপনের সম্ভাব্য বিষময় প্রতিক্রিয়ার কথাটা চিন্তা করে দেখলেন না। হয়ত দেখেছিলেন। কিন্তু টাকার কাছে আবার বিবেক—তুচ্ছ! তুচ্ছ! ছেলেমেয়েরা গোল্লায় যায় যাক, সমাজ নষ্ট হয় হোক, আমরা তো বিজ্ঞাপনটা ছেপে মোটা টাকা পেলাম। ছি! ছি! ছি।

* * * *

সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীর কাছে এক গুপ্তচর ধরা পড়ল।

সম্রাটের কাছে তাকে নিয়ে আসতে তিনি প্রশ্ন করলেন—"মরবার আগে তুমি কাকে দেখতে চাও বা কার কাছে চিঠি লিখতে চাও?"

—আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—দেখা হলে কি বলবে?

—বলব, মা যেন সেই শিক্ষাই দেন যা'তে আমার অন্য ভাই বোনেরা আমার মতই দেশের জন্য মরবার সুযোগ পায়।

—যদি তোমাকে এবার মুক্তি দিই?

—তা হলে আবার ধরা পড়ব ও মরব।

নেপোলিয়ন গম্ভীরভাবে কি ভাবলেন তারপর বললেন,—"আচ্ছা, তোমাকে মুক্তি দিলাম। শুধু তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর মত মা এদেশে আর ক'জন আছেন?"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

টাঙ্গা থামিয়ে তা থেকে আমায় নামতে বলে ও নিজে নেমে পড়ে চম্পা টাঙ্গাওয়ালাকে যে নির্দেশ দিলে তাতে টাঙ্গাওয়ালাও নিশ্চয় আমার মতই তখন বিমূঢ়।

টাঙ্গাওয়াকে খানি টাঙ্গা নিয়ে পোল থেকে নেমে গিয়ে কিছুদূরের একটি খাদা রাস্তার মোড়ে চম্পা অপেক্ষা করতে বললে।

এ নির্দেশের মানে না বুঝতে পারলেও দূরে আর একটি টাঙ্গা বা ওই জাতীয় অশ্বযানের আওয়াজ আমি তখন পেয়েছি। চম্পার কান আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ বলেই বোধহয় আওয়াজটা আমার অনেক আগে সে পেয়েছে।

আমাদের টাঙ্গাওয়ালা বেশ একটু বিমূঢ় ভাবে তার টাঙ্গা হাঁকিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পা আমার হাতটা ধরে নিঃশব্দে পোলের ওদিকের গার্ডার-এর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। রেলের লাইন ও সাধারণ যানবাহনের রাস্তা সেইখান থেকেই আলাদা হয়ে গেছে। লোহা ও ইস্পাতের ডালপালা মেলা 'গার্ডার'-এর পেছনে বেশ ভালো ভাবেই লুকিয়ে থাকা যায়।

কিন্তু এরকমের লুকোচুরির হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন? দূরে একটা টাঙ্গার আওয়াজেই এমন কি ব্যাপার চম্পা অনুমান করে ফেললে যার জন্যে আত্মগোপন করা প্রয়োজন?

এটা হয়ত কিছুক সাবধানতাই হবে বলে নিজেকে বোঝালাম। এই গভীর রাত্রে যে উদ্দেশ্যে আমরা এই জনমানবহীন পোলের ওপর দিয়ে যাচ্ছি সেটা খুব স্বাভাবিক নয়। টাঙ্গা যখন ওদিক থেকে একটা আসছে তখন আরোহী তাতে যেই থাক তার কাছে আত্মপ্রকাশ না করাই ভালো বলে হয়ত চম্পা বুঝেছে।

কিন্তু যাই সে বুঝে থাক এ রকম ভাবে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ার মধ্যে তার মনের গোপন কোন আশঙ্কার আভাস খুব অস্পষ্ট নয়। যেখানে যে উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি তার মধ্যে কিছু বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে এ ধরণের সাবধান সে নিশ্চয় হ'তনা।

টাঙ্গাটা ততক্ষণে আমাদের কাছেই এসে পড়েছে। টাঙ্গার তলায় মিটমিটে একটা আলো দুলছে। ব্রীজের দুদিকের গার্ডারে গুলোর ছায়া নিতান্ত অস্পষ্টভাবে দুদিয়ে একটা ঝাপসা রহস্য সৃষ্টি করা ছাড়া সে আলোর আর কোন সার্থকতা নেই। তা দিয়ে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায়না। সামনে টাঙ্গাওয়ালা একলা বসে প্রায় যেন ঘুমোতে ঘুমোতেই ঘোড়াটাকে নিজের খুশিমত ঢিমে কদমে নিয়ে

ছেড়ে দিয়েছে। টাঙ্গাটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাবার পর পেছনে দুটি আরোহী মূর্তি চোখে পড়ল। তাদের চেহারা দেখে চেনবার কোন উপায় নেই। শীতের রাতে দুজনেরই গায়ে আলোয়ান জড়ানো। দুজনের মধ্যে একটি যে নারী মূর্তি বোঝা গেল শুধু এই টুকুই।

টাঙ্গাটা সমস্ত গোলটা পার হয়ে ওধারের চালু দিয়ে বেশ খানিকটা না নামা পর্যন্ত চম্পা নিঃশব্দে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সামনে পা বাড়িয়ে চাপা গলায় বললে,—আসুন তাড়াতাড়ি।

তার সঙ্গে গোলের চাল দিয়ে নামতে নামতে না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না—কিন্তু ব্যাপার কি চম্পা! টাঙ্গার শব্দ শুনেই অমন লুকিয়ে দাঁড়াবার মানে কি? টাঙ্গায় ছিল কে?

দেখতে পেলেন না—নিচু গলায় বললে চম্পা,—তবে আপনার পক্ষে ওভাবে ওইটুকু দেখে না চেনাই স্বাভাবিক।

তার মানে?'—হঠাৎ অনুমানটা হতেই উদ্বেগে উত্তেজনায় বললাম—তোমার চাচাজি ছিলেন বুঝি টাঙ্গায়! কিন্তু সঙ্গে কে? তাঁর স্ত্রী?

না।—বলে চম্পা তখনকার মত একেবারে চুপ করে গেল।

চাল শেষ করে তখন আমরা সমতলে নেমে এসেছি। দূরে যে একটা ক্ষীণ আলো রাস্তার ধারে দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদেরই টাঙ্গার বলে মনে হল।

সেদিকে যেতে যেতে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার চাচাজি ওই টাঙ্গাতেই আসছেন তুমি আগে থাকতে বুঝলে কি করে?

না ঠিক বুঝিনি।—চম্পা যেন অন্যমনস্কের মত বললে—তবে খানিকটা আন্দাজ করে আগে থাকতে সাবধান হয়েছি।

তোমার চাচাজিকে এত ভয় করবার কোন কারণ আছে?

একথার উত্তর না দিয়ে চম্পা শুধু বললে—উঁহুম।

টাঙ্গাটার কাছে তখন পৌঁছে গেছি। টাঙ্গাওয়ালা তার পেশাদারী স্বভাবে সোলমেলে সওয়ারী নিয়ে একটু গজগজ করতে ছাড়ল না।

চুপ রহো। ইনাম আচ্ছা মিলেগা।—বলে তাকে থামিয়ে আমার পাশে উঠে বসে চম্পা টাঙ্গাওয়ালাকে কিছু দূরের একটা ডানহাতি রাস্তায় যাবার নির্দেশ দিলে।

টাঙ্গা চলবার পর সে নিজে থেকেই বললে—আপনার সব প্রশ্নের জবাবই আশা করি এবার পাবেন। তবে একটু ধৈর্য ধরুন। সবার আগে আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করাই আসল কাজ।

বন্ধুকে উদ্ধার! তার মানে···বলতে গিয়ে চম্পার নিষেধ মনে করেই থেমে গেলাম। চম্পা তখন টাঙ্গাওয়ালাকে রাস্তার ধারে এক জায়গায় থামিয়েছে।

রাস্তা মানে সঙ্কীর্ণ একটা কাঁচা মাটির পথ। তার দুধারে বেশীর ভাগই গাছপালার জঙ্গল। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট অন্ধকারে এক আধটা ছোটখাট বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

যেখানে টাঙ্গা থেমেছে তার পাশেই ভালো করে ঠাহর করে একটা খাপরার চাল দেওয়া পাকা গাথুনির ছোট বাসা দেখতে পেলাম। বাইরের দেওয়ালটা সস্তা চুনকামকরা বলেই অন্ধকারে তার চেহারাটা খানিকটা বোঝা যাচ্ছে।

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অনেক প্রশ্নই তখন আসছে।

এই কি তাহলে চম্পার চাচাজির এখানকার সাময়িক আস্তানা? এ বাসা চম্পা চিনল কি করে? কাল সকালে টাকা নিয়ে হাজিপুর যাবার নামে সে কি তাহলে এখানেই এসেছিল? তাই যদি এসে থাকে তাহলে মন্দিরের কাছে দেখা হবার পর চাচাজির অমন চমকানো ভাব কেন? সে অভিনয়ে চম্পারও পরোক্ষ সায় ছিল না কি? চম্পা সেই সাক্ষাতের আগে পরে নিখিলের বিরুদ্ধে একটা সতীর চক্রান্তের ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে সচেতন করে দিয়েছে বটে, কিন্তু এ চক্রান্তে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার কোন ভূমিকা কি নেই! এই যদি চাচাজির আস্তানা হয় তাহলে এখান থেকে নিখিলকে উদ্ধার করতে আসার সঙ্গেও ত অনেক রহস্য জড়িত। নিখিল অসুস্থ অক্ষম অবস্থায় বাসা ছেড়ে এখানে এল কি করে? চাচাজির কি এই কারসাজি? চম্পা অনেক কিছু জানলেও তার চাচাজির এই চালই কি শুধু অনুমান করতে পারেনি? নিখিলকে এখানে আনার উদ্দেশ্য বা কি হতে পারে?

মনের মধ্যে যখন এই সব জিজ্ঞাসার আলোড়ন চলছে চম্পা তখন টাকা নেবে বাড়ির বাইরের নিচু একটি দরজায় সামনে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মৃদু করাঘাত তারপর সজোরে।

আশেপাশে কাছাকাছি আর কোন বাড়িঘর নেই। থাকলে মধ্যরাত্রে সচকিত উত্তাক্ত হয়ে অযাবদিহি চাইবার লোক জড় হয়ে যেত বোধহয়।

অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর ভেতর থেকে ঝিলীতে মিহি প্রায় মেয়েলী ঘুম জড়ানো গলায় শোনা গেল—কৌন হ তু? ইতনি রোতমে দরওজা তোড়ত বা?

খোল কেওয়াড়ি—চম্পা হুমকি দিলে—নাহ চম্পা বোল রহি।

এবার সশব্দে দরজার খিলটা খুলে গেল। টিমটিমে কালি পড়া একটা লণ্ঠন হাতে দেখা গেল ছোট কম্বল গায় জড়ানো দশ এগারো বছরের একটি ছেলেকে।

হাই! বহিনজি—প্রথম উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ জানিয়ে ফেলেই নিজেকে সামলে সংযত করে সে তারপর খবর দিল—বাবুজি ত বহার গই! ঘরমে কোই না হও।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমার ভেতরে ডেকে নিয়ে চম্পা প্রথমেই দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিলে আবার। তারপর ছেলেটার হাত থেকে লণ্ঠনটা কেড়ে নিয়ে কড়া গলায় চোখ রাঙিয়ে জানতে চাইলে—ঘরে কেউ নেই। ঠিক বলছিস্।

ছেলেটা তখন কেমন থতমত খেয়ে গেছে। কাঁচুমাচু গলায় জানালে। ঠিকই বলেছে সে। তবে বাবুজি তাকে মানা করে দিয়ে গেছে, কারুর ডাকে যেন দরজা না খোলে, আর কাউকে যেন কিছু না বলে।

চম্পা গলাটা এবার মোলায়েম করে বললে—কিন্তু মানা করেছে কি আমায় বেলাও?

এই মোলায়েম গলার প্রশ্নেই কাজ হল। ছেলেটার মাথায় একথাটা আসেনি নিশ্চয়। এই কথাতেই যেন তার সব ভাবনা কেটে গেল। হাসিমুখে বললে, না, আপনার জন্তে কেন হবে বহিন জি! আপনি আসবেন জানলে কি আর বাবুজি দরজা খুলতে মানা করতেন।

তাহলে আমায় ঝুটমুট বলবি না, কেমন সুখন!

না, বহিনজি। আপনাকে ঝুটমুট বলতে পারি! বলে দাঁতবার করে হেসে সুখন তার বিশ্বাসকোচের একটা কৈফিয়ৎও বার করে ফেলল,—আপনার সঙ্গে ওই নতুন বাবুকে দেখলাম কি না, তাই ঘাবড়ে গেছলাম।

ও নতুন বাবু হ'ল চাচাজির জোত।—অম্লানবদনে জানিয়ে চম্পা সোজাসুজি আসল প্রশ্নটাই এবার করলে—ছোট বাবু কোথায়? ঘুমোচ্ছে?

না, বহিনজি। ছোটবাবু ত এখানে নেই!—সুখন সরলভাবেই জানাল মনে হল।

চম্পা কিন্তু সন্দেহে ধমক দিয়ে উঠল—ফের ঝুট বলছিস।

না বহিনজি, ঝুট বলছি না। সুখন কাঁদো কাঁদো হয়ে জানালে—ছোটবাবু এখানে এসেছিল কিন্তু ভেতরে পর্যন্ত ঢোকেনি। বাবুজি তাকে টাঙ্গায় রেখে একলাই ভেতরে এসে আমায় হুকুম করছিল ছোটবাবুর সঙ্গে হাজিপুর ষ্টেশনে যেতে।

চম্পা এরপরের কিছু যে অনুমান করতে পারেনি তা তার বিমূঢ় স্তব্ধতাতেই বোঝা গেল। আমার চেয়েও সে তখন বেশী স্তম্ভিত। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিছু না বলে লণ্ঠনটা হাতে করে সরু চাকা বারান্দাটা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল নিজেই সুখনের বিবরণ যাচাই করতে।

চাকা বারান্দার সঙ্গে জোড়া পাশাপাশি দুটি ছোট ঘর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সত্যিই কোন ঘরে কেউ নেই। বাসাটা যে মাত্র কয়েকদিন আগে হঠাৎ নেওয়া হয়েছে আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যায়। ধর্মশালার ফাঁকা ঘরের মত চেহারা। দু-ঘরে দুটি দড়ির খাটিয়া দুটো টিনের তোরঙ ছাড়া আর কিছু নেই।

ঘর দুটো দেখে চম্পা লণ্ঠনটা নিয়ে পেছনের কুয়াতলাটা পর্যন্ত খুঁজে এল। তারপর সুখনকে জিজ্ঞাসা করলে। ছোটবাবুকে তুই তাহলে হাজিপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছিস।

হাঁ বহিনজি—সুখন ভয়ে ভয়ে জানাল, ছোটবাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে আমি সেই টাঙ্গাতেই বাড়ি ফিরে এলাম।

আর সেই টাঙ্গাতেই চাচাজি রেশমীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল?—এবার ঠিক প্রশ্ন নয় চম্পা যেন নিজের মনেরই সরব চিন্তা।

কথাটা শেষ করেই ফিরে দাঁড়িয়ে চম্পা বাইরের দরজার খিলটা খুলে ফেলে আমায় ডেকে বললে, আসুন।

সমস্ত ব্যাপারটা কিছুই যে বুঝি নি এমন নয়। চাচাজিই যে নিখিলকে যেভাবে হোক বাড়ি থেকে নিয়ে এসে শেষপর্যন্ত এ বাসায় না রেখে সোজা হাজিপুর ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটুকু ধরতে পেরেছি। কিন্তু নিখিলকে হাজিপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে সেই টাঙ্গাতেই রেশমী নামে কোন মহিলাকে নিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তখনই রওনা হবার মানে কি? রেশমীই বা কে? আমার মনে যে অস্ফুট সন্দেহ জাগছে তাই কি তাহলে সত্য?

মনের এই প্রশ্ন অধৈর্যতা নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এসে টাঙ্গায় উঠতে উঠতে চম্পাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবে এখন, হাজিপুরে?

না, সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই।—ক্লান্ত স্বরে বলে চম্পা যে পথে এসেছি তাইতেই টাঙ্গাওয়ালাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলে।

কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে আবার পাকা পথে না ওঠা পর্যন্ত চুপ করেই রইলাম। তারপর বললাম, একটা ব্যাপার সব চেয়ে অদ্ভুত লাগছে চম্পা। তাই না বলে পারছি না। তোমার চাচাজিই নিখিলকে নিয়ে এসে হাজিপুর ষ্টেশনে পাঠিয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ

নেই। কিন্তু নিখিল হঠাৎ এভাবে তোমাকেও কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে রাজী হ'ল কেন? তাকে যে ঘরে বেঁধে বা ব্লেহ্‌স করে আনা হয় নি তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে চম্পা আগের মতই ম্লান মনেও একটু তিক্তস্বরে ধীরে ধীরে বললে,—বাঁধা ধরা কি ব্লেহ্‌স করার কতরকম উপায়ই ত থাকতে পারে।

কথাটা একেবারে দুর্বোধ নয়। এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তখন কিন্তু আর তুললাম না।

ভেবেছিলাম টাঙ্গা নিয়ে চম্পা এবার চাটার্জির সন্ধানেই উল্টোদিকে যাচ্ছে। কিন্তু তাও নয়ই, মন্দিরের দিকেও সে গেল না। টাঙ্গাটা বাংলোবাড়ির সামনেই সে থামাল। তারপর আমার কাছ থেকেই টাকা চেয়ে নিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে মোটা বকশিস্ দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় করে আমার দিকে ফিরে বললে,—মন্দিরে গিয়ে পুজোর শেষটা দেখবার ইচ্ছে নিশ্চয় আপনার নেই। যেটুকু পারেন ঘুমিয়ে নিন বাকি রাতটুকু।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। গেটের মাথায় আংটোটা এখন লাগানই রয়েছে দেখলাম। সেটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি কি মন্দিরেই ফিরে যাচ্ছ?

না, আর মন্দিরে কি যেতে যাব!—একটু হতাশভাবে হেসে চম্পা বললে,—আমার যতটুকু পারি গোছগাছ করে নিতে হবে। কাল সকাল দশটায় একটা ট্রেন আছে। সেইটেতেই যাবো ভাবছি।

গেটটা খুলে ঢুকতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বললাম,—কাল সকালেই তুমি চলে যাচ্ছ এ বাড়ি ছেড়ে! তাহলে ত আমাকেও যেতে হয়।

না, সকালের ট্রেনটা কলকাতার নয়। বললে চম্পা,—বিকেল তিনটেতে একটা ট্রেন আছে কলকাতার। সেটাতে যেতে পারেন, কিংবা ইচ্ছে হ'লে এখানে থেকেও যেতে পারেন কয়েকদিন। দুখনরায় রইল। বাড়িটাও আরো পাঁচমাসের জন্যে নেওয়া আছে।

তোমরা চলে গেলে আদি সখ করে হাওয়া খেতে এ বাড়িতে বসে থাকব! মনের ঘরটা তিক্ত হয়ে উঠল আপনা থেকেই—তুমি যে চলে যাচ্ছ তার মানে নিখিল আর এখানে ফিরবে না বলেই ধরে নিয়েছ বুঝতে পারছি, কিন্তু আজ যা ঘটে গেল তা নিয়ে আর কিছু এখানে করবারও নেই তোমার!

শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!—যে হাতে গেটটা ধরেছিলাম তার ওপর নিজের হাতটা রেখে চম্পা শান্ত স্বরে বললে,—কি করবার আছে আপনিই বলুন না? তবে এখানে নয় ভেতরে চলুন।

গেটটা বন্ধ করে চম্পার কথাই মেনে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। নির্জন অন্ধকার বাড়িটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম শুরু মনে হ'ল। এতক্ষণ ধরে বাড়িটা একেবারে খালিই পড়েছিল। চোর ডাকাতে সন্ধান পেয়ে থাকলে হয়ত সব কিছুই নিয়ে গেছে। তাদের কেউ যে এখনো বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই তারই বা ঠিক কি! কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বারান্দায় ওঠার পর গাটা যে কেমন ছমছম করে উঠল তা ওই ধরণের ভয়ে নয়। রহস্যময় নারীমূর্তির আবির্ভাবের সময়ও যা তেমন অনুভব করিনি, এ যেন অশরীরী কোন উপস্থিতির সেই রকম তীব্র একটা অদ্ভুত অস্বস্তিবোধ। সব সময়েই প্রায় নেপথ্যচারী নিখিলের এ বাড়িতে থাকা না থাকা সমান ছিল। কিন্তু সে-ই আজ এখানে নেই বলে কি এই অদ্ভুত অনুভূতি এত তীব্র!

চম্পা সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বালবার পর অবশ্য অনেকখানি কেটে গেল।

নিজের মনের অন্ত আশঙ্কাটা এবার প্রকাশ করলাম, বাড়িত একদম খালি পড়েছিল। চুরিটুরি হয়ে যায় নি ত?

হয়ে থাকলে কি ক্ষতি আর হবে!

চম্পার গলায় বিষণ্ণ বিদ্রূপের সুরে একটু লজ্জাই পেলাম।

চুরি চামারি কিছু অবশ্য হয় নি দেখা গেল। বারান্দা থেকে দুজনেই প্রথমে নিখিলের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আলো জ্বালবার পর জানা গেল চলে যাবার সময় আলনায় টাঙানো একটি গরম ওভার কোট ছাড়া নিখিল আর কিছুই নেয়নি। চম্পা নিজের ঘরে গিয়ে মাঝখানের দরজাটাও এবার খুলে দিল। তার ঘরে ইতিপূর্বে কোনদিন যাই নি। সে যে অমন সন্ন্যাসিনীর মতন থাকে তা জানা ছিল না। বাংলো বাড়িরই নিজস্ব একটি বড় সেকেলে বাহারে কাঠ কার্ব করা পালঙ্ক আছে। কিন্তু তার ওপরে পাতা বিছানাটা একেবারে সাদাসিধে। মোটা ছোবড়ার গদির ওপর শুধু একটা চাদর পাতা। বালিশ ও গায়ে দেবার কম্বলটাও নেহাৎ সাধারণ। ঘরের আলনায় কয়েকটি মাত্র শাড়ি ও জামা টাঙানো। একটি ভারী স্ট্রীলের তোরঙ্গ ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাবপত্রও নেই।

চম্পা চাবি দিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল-আলমারী খোলবার সময় তার ঘরটা এইটুকু খুঁটিয়ে দেখবার সময় পেয়েছিলাম। চম্পা সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতূহলটা না থাকলেও সে ঘরের এই অপ্রত্যাশিত বিরল সাজ সরঞ্জাম লক্ষ্য না করে বোধ হয় পারতাম না।

দেওয়াল-আলমারী খুলে চম্পা তখন একটা ক্যাশ বাক্স বার করেছে। সেটা খুলে ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে সে কয়েকটা টাকা বার করে আমার হাতে দিয়ে বলে, এই নিন। টাকাওয়ালাকে যা দিয়েছিলেন।

টাকাটা বিনা প্রতিবাদেই নিলাম। তাতে আপত্তি করে নিরর্থক লৌকিকতা করবার মত মনের অবস্থা তখন নয়। আগের প্রসঙ্গটাই এবার তুলে বললাম,—তুমি তাহলে কাল সকালেই চলে যাচ্ছ! এখানে আর কিছুই করবার নেই?

কি করতে পারা যায় এবার আপনিই বলুন? চম্পা ক্লান্ত ভাবে আমার দিকে তাকাল।

কেন! পুলিশে খবর দেওয়া যায় না কি! তোমার চাচাজি যে নিখিলকে নিয়ে গেছেন এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই।

কিন্তু পুলিশের কাছে নালিশটা কি রকম আজগুবি শোনাবে তা ভেবে দেখেছেন কি! চম্পা বিষণ্ণ ভাবে হাসল, আপনার বন্ধু অবলা মেয়ে ছেলে কি নাবালক ছেলে মানুষ নয় যে তাঁকে ভুলে বলে চুরি করে নিয়ে যাবার কথা পুলিশ বিশ্বাস করবে! তা ছাড়া বিশ্বাসও যদি করে তার প্রমাণ কি! যে টাকায় করে চাচাজি আপনার বন্ধুকে নিয়ে গেছেন তাকে যদি খুঁজেও বের করতে পারেন তাহলেও সে জোর জুলুমের কোন সাক্ষ্য নিশ্চয় দিতে পারবে না।

এ যুক্তিগুলো আমার মাথাতেও যে আসে নি এমন নয়। শুধু চম্পার চাচাজির অন্তরালবর্তী নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তাকে মেনে নিতে মন বিদ্রোহ করছিল বলেই পুলিশকে জানাবার প্রস্তাবটা করেছিলাম।

চম্পার কথায় খানিক গুম হয়ে চুপ করে থেকে বললাম, নিখিলকে হাজিপুর থেকে তোমার চাচাজি কোথায় নিয়ে যাবেন তোমার মনে হয়।

কোথায় আর ? যেখান থেকে ওঁকে কলকাতার নার্সিং হোমে নিয়ে গেছলাম। ওঁর নিজের বাড়ি ঘর ব্যবসা যেখানে সেইখানেই।

তুমিও কি সেইখানেই ফিরে যাচ্ছ ?

আর কোথায় যাবো ! চম্পা এবার যেন অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে তার বিছানার ধারে গিয়ে বসল।

সেই মুহূর্তেই সঙ্কল্প স্থির করে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বললাম—আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি চম্পা। আশা করি তোমার আপত্তি নেই !

চম্পা আমার সঙ্কল্পের কথাটা শুনে সত্যিই একটু চমকে উঠেছিল প্রথমে। তারপর বিষণ্ণভাবে বললে—আমি আপত্তি করব কেন ? কিন্তু আপনি কি করবেন সেখানে গিয়ে ? কিছুই আর করবার নেই বোধ হয় !

সেই বলে যাবতে আমি রাজী নই। আর যদি নাই কিছু করবার থাকে তবু কেন তা নেই সেই কথাটাই আমি বুঝতে চাই। দৃঢ়স্বরে বললাম—নিখিলের বিরুদ্ধে একটা গভীর চক্রান্তের ইঙ্গিত তুমিই দিয়েছ ; সে চক্রান্তের আভাস আমি নিজেও পেয়েছি। কী সে চক্রান্ত আর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে জড়িত সব আমি জানতে চাই এবার। নিখিলের মুখ চেয়েই আশা করি আমার কাছে গোপন তুমি কিছু রাখবে না।

না রাখব না। শান্ত স্বরে বললে চম্পা।　　[ক্রমশঃ

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে প্যারীর পথে। কুয়াশার মত নীতের তুহিন-কণা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। একটি সুন্দরী তরুণী সহরের শেষ প্রান্তে এসে গাড়ী থেকে নামলেন এক পুরানো বাড়ীর সামনে।

দরজায় আঘাত করতেই এক বৃদ্ধা এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

—কি চাই তোমার ? কোথা থেকে আসছ ?

তরুণী উত্তর দিল—নেভি অফিস থেকে।

—কেন ?—উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধা।

—আপনার ছেলে লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ ছিলেন, তিনি হঠাৎ আজ তিনদিন হোল সমুদ্রবক্ষে মারা গেছেন।

অসম্ভব রকম আঁৎকে উঠে করুণ আর্তনাদ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন বৃদ্ধা।

তরুণী তাঁকে তুলে আবার চেয়ারে বসিয়ে বললেন—না মা, আপনার ছেলে ভালই আছেন। এই নিন তাঁর চিঠি। আমি সারা বার্নার্ড, অভিনেত্রী, কাল আমার এই ভূমিকাই আছে।

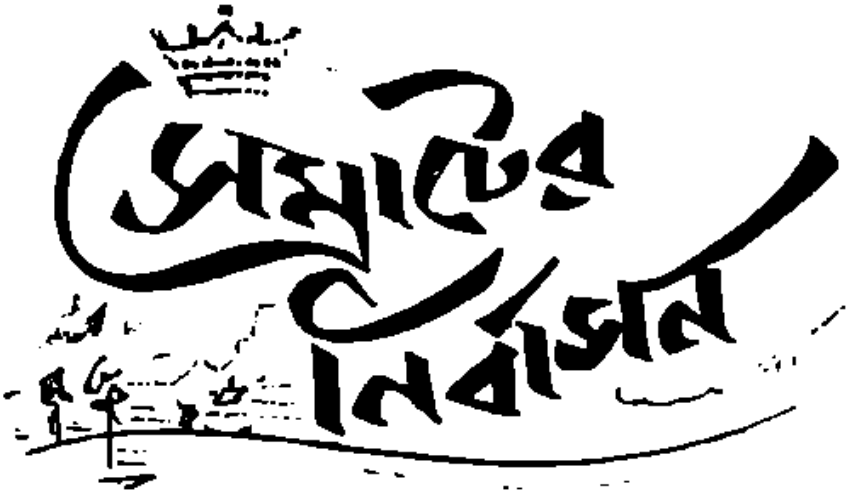

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন-রহস্য

বজ্রুচি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মানলা থেকে অব্যাহতি পাবার পর চার্লি 'মঁসিয়ে ভার্দু' ছবিটি সম্পূর্ণ করবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন।

দু'বছর ধরে ছবিটির প্রস্তুতি চলছিলো। দ্রুতগতিতে শুটিং শেষ হলো। ছবিটি তুলতে সর্বসমেত সময় লেগেছিলো মাত্র তিন মাস। চার্লির পক্ষে এত কম সময়ে ছবির শুটিং শেষ করা একটি রেকর্ড বলা যেতে পারে।

ছবি শেষ হবার পর প্রথা অনুযায়ী সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে তার কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠানো হলো।

মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন নামক সংস্থাটি লিখন অফ ডিসেন্সি নামে এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলচ্চিত্র-বিচারের ভার পেয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের গ্রীন অফিসে ছবির স্ক্রিপ্ট্ নিয়ম অনুযায়ী দাখিল করতে হয়।

চার্লি মনে করতেন যে, ছবির বিচার প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই বিচার বড় শক্ত ব্যাপার। তাঁর মতে ছবির বিষয়বস্তুটা ত বড় কথা নয়, যত বড় কথা, সেই বিষয়বস্তুটিকে কিভাবে ছবির পর্দায় উপস্থিত করা হয়েছে। যে ছবির মধ্যে মিথ্যা মতবাদ বা ব্যক্তিগত কুৎসা বা কোন কুসংস্কার আছে সেই ছবি যৌন-আবেদনমূলক ছবির মতই ক্ষতিকর। বার্নার্ড শ বলতেন, একটা চোরকে বা পাপিষ্ঠকে ধরে ঠ্যাঙালেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হবেনা। চার্লিও অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সেন্সর আপিস থেকে পত্র এল, ছবিটিকে তাঁরা প্রদর্শনের অযোগ্য বলে মনে করেছেন।

তাঁদের রায় বিচার করবার আগে ছবিটির একটি সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের জানানো আবশ্যক।

ছবির নায়ক ভার্দু ফুর্তিপ্রিয় মানুষ, যাকে সংসার চালাতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায় চাকরি থেকে সে ছাঁটাই হয়। তারপর সে এক সাংঘাতিক পরিকল্পনা নিয়ে নিজের জীবনকে চালিত করে। একের পর এক সদ্যযৌবনা বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলাদের সে বিবাহ করে, তারপর তাদের টাকাগুলো পাবার লোভে তাদের প্রত্যেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তার বিবাহিতা স্ত্রী আছে। সেই চিরকগ্না স্ত্রী থাকে তার দেশের বাড়ীতে একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এবং সে তার স্বামীর এই ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের কথা কিছুই জানেনা। এক-একটি হত্যাকাণ্ডের পর ভার্দু তার দেশের বাড়ীতে যায়। সেখানে সে একেবারে অন্য মানুষ। দয়ালু, ধর্মভীরু, কীটপতঙ্গের ওপরেও তার অসীম মমতা, স্বামী হিসাবে আদর্শ।

কাহিনীটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে অজস্র বিদ্রূপ, তীব্র শ্লেষ এবং সমাজবিধির কঠোর সমালোচনা।

ছবির বিরুদ্ধে মতামত সম্বলিত দীর্ঘপত্রের শেষে সেন্সর আপিল জানিয়েছেন যে তাঁরা চার্লির সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেলে সুখী হবেন। ছবিটির কিছু সংলাপ এবং দৃশ্য অদলবদল করে বাদসাদ দিয়ে যদি তাকে প্রদর্শনের যোগ্য করা যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ বিশেষ আনন্দিত হবেন।

চার্লি তাঁদের নির্দেশমত তাঁদের আপিসে গিয়ে হাজির হলেন।

একটি বড় টেবিলের একধারে তিনজন কর্তাব্যক্তি। অন্য ধারে তাঁদের মুখোমুখি বসলেন চার্লি।

কর্তাদের মধ্যে এক বদচেহারা অল্পবয়সী লোক প্রশ্ন আরম্ভ করলেন:

—"আপনি ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কেন?"

উত্তরে চার্লি বললেন,—"একথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ জানতে পারি কি?"

প্রশ্নকর্তা ছবির পাণ্ডুলিপিটি ড্রয়ার থেকে টেনে বার করে সশব্দে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর চিহ্ন দেওয়া একটি পৃষ্ঠা খুলে বললেন,—"এই যে, এই জেলের ঘর, তার মধ্যে দৃশ্যমণ্ডে দণ্ডিত ভার্দু আর তার সামনে দাঁড়িয়ে পুরোহিত।"

চার্লি ঘাড় নেড়ে বললেন,—"তাতো জানি।"

একপর্দা গলা চড়িয়ে প্রশ্নকর্তা বললেন, "ভার্দু পুরোহিতকে বলছে, 'ভদ্রমহোদয়, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি'।"

চার্লি হেসে বললেন,—"এর মধ্যে আপত্তির কিছু আছে নাকি? পুরোহিত কি ভদ্রলোক নয়?"

প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বর আর এক ধাপ উঁচুতে উঠল, —"এ অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক সম্বোধন।"

ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে চার্লি বললেন,—"আমি তা মনে করি না।"

তারপর তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কথাকাটাকাটি চলল তাকে রীতিমত বার্লাড শ-সুলভ সংলাপ বলা যেতে পারে।

—"পুরোহিতকে কেউ 'ভদ্রমহোদয়' বলে সম্বোধন করেনা। তাঁকে বলা হয়, 'পিতা'।"

চার্লি বললেন,—"বেশ আমরাও না হয় তাঁকে 'পিতা' বলব।"

প্রশ্নকর্তা টেবিল চাপড়ে বললেন,—"এই যে, এই কথাগুলো, পুরোহিত বলছেন, 'আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর,' আর তার উত্তরে ভার্দু

বলছে, 'ঈশ্বরের সঙ্গে আমার অশান্তি নেই, আমার বিরোধ মানুষের সঙ্গে'। এরকমের কথা অত্যন্ত গর্হিত।"

চালি জবাব দিলেন,—"আপনার যেমন নিজস্ব মত আছে, আমারও তেমনি নিজস্ব মত থাকার অধিকার আছে।"

প্রশ্নকর্তা সপ্তমে চড়লেন। পাণ্ডুলিপির একটা পৃষ্ঠায় লম্বা আঙুলটার চাপ দিয়ে বললেন,—"পুরোহিত বলছেন, 'তোমার পাপের জন্যে তুমি কি অনুতপ্ত নও?' আর তার জবাবে ভার্দু বলছে, 'পাপ যে কি এবং কোনটা, তা কে বলতে পারে, ভগবানেরই শাপগ্রস্ত দেবদূত পাপের আদি প্রবর্তক। এর দ্বারা যে কী রহস্যময় নিয়তি মানুষকে চালিত করছে তা কে জানে'। এসব অত্যন্ত গোলমেলে কথা, ঘোরতর আপত্তিকর।"

—"আমি মনে করি পাপ এবং পুণ্য উভয়েই সমান রহস্যময়।"

চালির এই জবাবে প্রশ্নকর্তা তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন,—"এ বুজরুকি কথা, লোক-ভোলানো মিথ্যা ভরকথা। তারপর এই যে ভার্দু পুরোহিতকে বলছে, 'পাপ যদি না থাকত তা হলে তো আপনারা বেকার হয়ে যেতেন'। পুরোহিতের প্রতি এ রকম শ্লেষবাক্য কোনোমতেই সহ্য করা যায়না।"

চালি বললেন,—"আমি স্বীকার করছি ভার্দুর ঐ কথাগুলো বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কথাগুলিকে বলা হয়েছে নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করবার জন্যে, পুরোহিতকে কোনোরকম অসম্মান দেখানোর কোনো উদ্দেশ্য তার মধ্যে নেই।"

—"কিন্তু আপনি যেন ভার্দুকে পুরোহিতের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় করে দেখাতে চেয়েছেন।"

চালি হেসে বললেন,—"তা তো করতেই হবে। ভার্দু যে নায়ক। পুরোহিতকে আমি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে দেখিয়েছি।"

এবারে রীতিমত চিৎকার,—"পুরোহিত বললেন, 'তোমার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক'। আর তার উত্তরে ভার্দু কি বললে?"

—"আপনিই বলুন।"

—"ভার্দু বললে, 'আমার আত্মার প্রতি তাঁর করুণা তো থাকবেই, কারণ এ আত্মা তো তাঁরই'।"

—"এর মধ্যে মন্দ কি আছে?"

—"মন্দ নেই? এমনি করে কি কেউ পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে?"

চালি জবাব দিলেন,—"ক্ষেত্র বিশেষে বলে। কথাটা যেভাবে ভার্দু বলেছে, ছবিটা না দেখলে তার তাৎপর্য এবং গভীরতা বুঝতে পারা যাবেনা।"

—"আপনি রাষ্ট্রকে এবং সমাজকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করেছেন।"

মাথা নেড়ে চালি বললেন,—"সমাজ এবং রাষ্ট্র কি দোষত্রুটির একেবারে ঊর্ধ্বে? এবং সেই সব দোষ ত্রুটির সমালোচনা করা কি প্রথাবিরুদ্ধ?"

চালির এই প্রশ্নের কোনো জবাব শোনা গেলনা। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির দুচার জায়গায় সামান্য কিছু অদলবদলের পর তাকে পাশ করা হোল।

• • • •

চার্লি ছবিখানি কাটছাঁট করে শেষে বাজারে ছাড়বার আয়োজন করছেন এমন সময় রাষ্ট্রের আইন দপ্তর থেকে তাঁর কাছে এক টেলিফোন এল। তাঁকে জানানো হল যে আমেরিকান-বিরোধী কার্যকলাপ-তদন্ত-কমিটি নামে যে সরকার-অনুমোদিত সংস্থা আছে সেই সংস্থার বিচারকদের সামনে চার্লিকে তাঁর কার্যকলাপের কৈফিয়ত দেবার জন্যে হাজির হতে হবে।

সর্বসমেত ১৯ জনকে এইরকম তলব দেওয়া হয়েছিল।

পরের দিন তাঁর কাছে এক সমন এল। তাতে জানানো হয়েছে যে ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে ওয়াশিংটনে হাজির হতে হবে।

চার্লি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এ কী অন্যায় অত্যাচার! এ কী জবরদস্তি। স্থির করলেন, তিনি কিছুতেই ওয়াশিংটন যাবেন না। দেখা যাক, কেমন করে তাঁকে ওরা জব্দ করতে পারে। এ কী মগের মুলুক নাকি।

দিনতিনেক পরেই আইন দপ্তর থেকে আবার এক পত্র এল। হাজির হবার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিন পরে আবার এক চিঠি। তারিখ আরও পিছিয়ে দেওয়া হল।

চার্লি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। এক কড়া চিঠি লিখে জানালেন যে, এইরকম ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে। তাঁর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে, ফলে তাঁর ব্যবসা মাটি হতে বসেছে। এভাবে একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সুবিচার নয়। যাই হোক তাঁদের অবগতির জন্যে তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি কমিউনিষ্ট নন, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই, তিনি শান্তিবাদী। এমতাবস্থায় তাঁকে যে কেন ওয়াশিংটনে তলব করা হয়েছে তা একটু বিশদভাবে জানতে পারলে তিনি বাধিত হতেন।

চার্লির এই চিঠির উত্তরে এক টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রামের বিনয়সূচক ভাষা এবং তার তাৎপর্য চার্লিকে বিস্মিত করে দিলে।

সুদীর্ঘ টেলিগ্রামে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে চার্লিকে জানানো হয়েছে যে, তাঁকে ওয়াশিংটনে যেতে হবে না! ব্যাপারটা চুকে গেছে বলে যেন বিবেচনা করেন চার্লি।

* * * *

নিউইয়র্কে 'মঁসিয়ে ভার্দু' মুক্তিলাভ করবে স্থির হলো। সেই সঙ্গে মফঃস্বলের তিনটি চিত্রগৃহে।

ছবির প্রযোজক ইউনাইটেড আর্টিস্টস্-এর অন্যতম কর্তা এবং চার্লি চ্যাপলিনের প্রতিনিধি আর্থার কেলির বিশ্বাস এই ছবি কয়েকমাসের মধ্যে ১২ লক্ষ ডলার উপার্জন করবে। তাঁর কথা শুনে চার্লি বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন।

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ কোম্পানীর আকস্মিক আর্থিক অবনতি ঘটেছিল। কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডাররা অনেকেই তাদের শেয়ার বেচে দিয়েছিল এবং কোম্পানী নিজেই সেগুলি কিনে নিয়েছিল।

ফলে কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকা তহবিল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কোম্পানীর অংশীদার মাত্র দুজন, চার্লি চ্যাপলিন এবং স্বনামধন্যা চিত্রাভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড। আর এদিকে দেনার অঙ্ক দশলক্ষ ডলার।

তাই আর্থার ডেলির কথা যদি ফলে, অর্থাৎ ম'সিয়ে চার্লি ছবি থেকে যদি ১২ লক্ষ ডলার পাওয়া যায় তাহলে খুব পরিশ্রম করেও দুলক্ষ ডলার তাঁদের দুজনের লাভের ঘরে থাকবে।

সেই আশায় বুক বেঁধে চার্লি ছবি নিয়ে নিউইয়র্কে উপস্থিত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো কামান দাগতে শুরু করল।

ডেলি নিউজ লিখল: "চার্লিন তাঁর ছবি খোলবার জন্যে এই মহানগরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তিনি অনেক খেলই দেখালেন। শেষ পর্যন্ত কমরেডদের সহযাত্রীরূপে নিজেকে আহির করতেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নি। তিনি যদি কোনো সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন তাহলে আমরা তাঁকে দু চারটি প্রশ্ন করব।"

ইউনাইটেড আর্টিস্টস-এর প্রচার বিভাগ চিন্তিত হলো।

এরকম প্রতিকূল অবস্থায় আমেরিকার সংবাদপত্র-মোগলের সামনে দাঁড়ানো চার্লির পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা তারা ভেবে ঠিক করতে পারল না।

তাদের আশঙ্কার কথা শুনে চার্লি অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন। তিনি আমেরিকান খবরওয়ালাদের ভয় করে চলবার পাত্র নন।

আগের দিন ইয়োরোপের অনেকগুলি পত্রিকার সংবাদ-প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। অতএব চার্লি স্থির করলেন আমেরিকান খবরওয়ালাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পিছপাও হলে চলবে না।

পরদিন সকালেই এক বড় হোটেলের অভ্যর্থনা-কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

প্রথমে সাংবাদিকদের ককটেল পরিবেশন করা হলো। তারপর চার্লি ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর জন্যে একটি ছোট টেবিল এবং একটি ছোট চেয়ার রাখা হয়েছিল। সকলকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তারপর হাসিমুখে নরম মোলায়েম সুরে বললেন—"মহিলারা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি খুব আনন্দবোধ করছি। আমার বর্তমান ছবি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আপনারা যা জানতে চান আমি সাধ্যমত এবং সানন্দে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।"

কারুর মুখে কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। হঠাৎ একজন মহিলা-সাংবাদিক খনখনে গলায় বলে উঠলেন,—"আপনি কি কমিউনিষ্ট?"

চার্লি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্লিজ।"

এবার থেকে একজন চশমাপরা রোগাটে লোকের লোক উঠে দাঁড়িয়ে খিঁচখিঁচ করে কি যেন বলতে লাগল।

চার্লি প্রথমে মনে করলেন ঐ বোধ হয় সেই ডেলি-নিউজএর প্রতিনিধি। সেক্রেটারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলেন ডেলি-নিউজএর কোনো প্রতিনিধি আসেননি।

চার্লি সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—"মাপ করবেন। আপনি হাতের কাগজখানি দেখে দেখে কি পড়লেন আমি তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না। আপনি দয়া করে একটু জোরে এবং স্পষ্টভাবে বলুন।"

লোকটি কেশে গলা ঝেড়ে বলতে শুরু করল,—"আমরা যুদ্ধ ফেরত অবসর-প্রাপ্ত ক্যাথলিক…"

চার্লি বাধা দিয়ে বললেন,—"কোনো ব্যাখ্যানিক দ্বন্দ্ব-কেরত অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ত এখানে আসিনি। এটা হচ্ছে সাংবাদিক সম্মেলন।"

একজনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আপনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি কেন?"

চার্লি জবাব দিলেন,—"তাতে বদলাবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনি কোনোদিন। আমি নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলে মনে করি।"

চারিদিকে মৃদুগুঞ্জন। তারপর একজনের হুঙ্কার শোনা গেল,—"কিন্তু আপনি তো এই দেশে বসেই অঢেল টাকা কামাচ্ছেন।"

হেসে জবাব দিলেন চার্লি,—"বেশ কথা। টাকা রোজগারের কথা যখন বললেন তখন স্পষ্ট করেই বলি, আমার ব্যবসা আন্তর্জাতিক। আমার উপার্জনের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু আমার উপার্জনের ১০০ ভাগের উপরেই কর আদায় করে যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং আপনারা স্বীকার করবেন যে আমি একজন ভাল পেয়িং গেষ্ট।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—"আপনি এল্‌সা মাইলারকে জানেন?"

—"জানি। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং একজন মস্ত বড় সঙ্গীতশিল্পী।"

—"আপনি কি জানেন তিনি একজন ঘোর কমিউনিষ্ট।"

—"তা জানবার আমার দরকার নেই। রাজনীতি আমার বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়।"

—"কমিউনিষ্টদের আপনি বিশেষ পছন্দ করেন, তাই না?"

—"পছন্দ অপছন্দ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।"

তারপর কারুর মুখে আর কোনো কথা নেই। ভিতরে ভিতরে অসহ্য উত্তাপে চার্লি অস্থির বোধ করছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম, এই সম্মেলনে আমার ছবি সম্বন্ধে আলোচনা হবে। কিন্তু দেখছি, এটা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কচকচিতে পরিণত হল। তাই আমি মনে করি এই সম্মেলন এইখানেই শেষ হোক। এভাবে এধরণের প্রশ্নোত্তরের কোন সার্থকতা নেই। গুড বাই।"

এই বলে সকলকে বিস্মিত হতচকিত করে চার্লি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

• • • •

'মসিয়ে ভার্দু' ছবির প্রদর্শনী শুরু হল।

প্রথম দিনের প্রথম শোতে উনা আর মেরি পিকফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে চার্লি ছবিঘরে উপস্থিত হলেন। সমবেত জনতা তাঁকে দেখে উল্লাসধ্বনি করল। চারিদিকে বিপুল উত্তেজনা।

চার্লির মনে হল, আজও তাঁর সম্রাটের সিংহাসন অটুট আছে।

ছবির অভিনয় এগিয়ে চলল। দৃশ্যের পর দৃশ্য। কিন্তু কোথায় দর্শকদের সেই উত্তেজনা? কোথায় তাদের সেই হাসি? কোথায় তাদের সেই বাহবাধ্বনি যা তাঁর প্রতিটি ছবিতে ইতিপূর্বে শোনা গেছে?

মাঝে মাঝে প্রেক্ষাগারে হাসির হুল্লোড় উঠছে বটে। কিন্তু তেমন যেন প্রাণখোলা হাসি নয়। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

চার্লির ছবিতে বিদ্রূপের ধ্বনি: এ যে তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত। অসহনীয়! চার্লি বলে

থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এলেন বাইরে। বিপর্যস্ত মনে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে হেঁটে এলেন কিছুদূর পর্যন্ত।

ছবি শেষ হবার মুখে আবার ফিরে বসলেন নিজের আসনে। উনা তাঁর একটি হাতের উপর তার হাতখানি রেখে যেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইল।

প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ।

ছবি শেষ হল।

দর্শকদের মুখে নানা রকমের মন্তব্য।

চার্লি বুঝলেন, এ ছবির পরমায়ু দীর্ঘ নয়।

পরদিন পত্রিকায় পত্রিকায় সমালোচনার তুফান। ছবিখানাকে তারা যেন কেটে কেটে টুকরো করে ছেড়েছে!

ডেলি-নিউজের পাতায় মস্ত বড় এক ছবি ছাপা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, নিউ জার্সির যে ছবিঘরে মসিয়ে ভার্দু একযোগে মুক্তিলাভ করেছে তার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিউ জার্সির ক্যাথলিক লিজনএর তাড়া করা লোকেরা ছবির বিরুদ্ধে পিকেটিং করছে। তাদের হাতে মস্ত মস্ত প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা:

'চ্যাপলিন কমিউনিস্টদের সহযাত্রী।'

'এই পরবাসীকে লাথি মেরে এদেশ থেকে দূর করে দেওয়া হোক।'

'অমন নিমকহারাম 'সেডিংগেট' আমরা চাই না।'

'ওকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।'

• • • •

নিউইয়র্কে বসেই চার্লি খবর পেতে লাগলেন, মফঃস্বলের বহু চিত্রগৃহে ভার্দুর যে বুকিং হয়েছিল, একের পর এক তারা খারিজ হয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকান লিজন এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী দলের কাছ থেকে ভয় দেখানো চিঠি পেয়ে চিত্রগৃহের মালিকরা 'মসিয়ে ভার্দুকে' তাদের ছবিঘরে দেখাবার ভরসা পাচ্ছে না। ফলে ক্ষতিপূরণ দিয়েও তারা ছবির প্রদর্শনী বাতিল করে দিচ্ছে।

চারিদিক থেকে জোট বেঁধে যেন চার্লিকে বিধ্বস্ত করবার প্রচণ্ড চেষ্টা!

আঘাতের পর আঘাত। বিপদের ওপর বিপদ।

ইউনাইটেড আর্টিস্টস কোম্পানী লাটে উঠল।

মেরি পিকফোর্ড বেঁকে বসলেন। এত দেনা মাথায় নিয়ে তিনি কোম্পানীতে থাকতে চান না।

শেষ পর্যন্ত আধা কড়িতে কোম্পানীকে এক থিয়েটার-প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হল।

চার্লির মনে হল তাঁর বিপুল বিত্তবৈভব সত্ত্বেও তিনি যেন নিঃস্ব সর্বহারা হয়ে পথে দাঁড়ালেন।

ভেঙে পড়লেন চার্লি। এই প্রথম তাঁর মনে রিক্ততার হাহাকার উঠল। তিনি বুঝি ফুরিয়ে গেছেন!

অতঃপর তিনি কী করবেন? ছবি করা ছাড়া, তাঁর জীবন যে শূন্য। অহর্নিশি সেই শূন্যতাকে বহন করে তিনি পথ চলবেন কেমন করে?

পরবর্তী শেষ অধ্যায়ে: আবার ছবি করলেন চার্লি। আমেরিকায় তাঁর শেষ ছবি। তারপর বিদায় আমেরিকা। শেষ অঙ্কে ইউরোপের দেশে দেশে তাঁর অভ্যর্থনা, রাজসম্মান। সুইজারল্যাণ্ডে নতুন জীবনের শুরু। নতুনতর আনন্দ শান্তি আর আত্মসমীক্ষা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ ৮ ॥

বরদাসুন্দরীর হাসি যেন আর থামে না!

এত হাসি মনে হয় যেন তিনি অনেকদিন হাসেননি।

হরেনবাবু দেখে খুব খুশী হলেন। কেন যে হাসছে—তখনও তিনি জানেন না, তবু মনে হলো—আহা, হাসুক্।

হাসি যখন একটু স্তিমিত হয়ে এলো তখন হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত হাসছিলে কেন?

বরদাসুন্দরী বললেন, 'সে যদি তুমি দেখতে, তুমিও না হেসে থাকতে পারতে না।'

হরেনবাবু বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্য। —ডেকে আমাকে দেখালে না কেন?'

'ডাকতে ডাকতে তখন আর দেখতে পেতে না। ছুটে তখন পালিয়েছে।'

ব্যাপারটা কী—জানতে চাইলেন হরেনবাবু।

বরদাসুন্দরী এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি বললেন, 'রবিকে যারপর করে দিয়েছিলাম তো ওর বৌদির সঙ্গে মিশতে, তাই বোধহয় রবির রাগ হয়েছিল, দু'জনে কথা কওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। এ এদিকে যায় তো ও ওদিকে যায়! কিন্তু দু'জনে খেলার সাথী, মন মানবে কেন? বৌমা ছোক্ ছোক্ করে বেড়াচ্ছিল কথা কইবার জন্যে। —রবি ক'দিন থেকেই বলছিল, মা, টাকা দাও, লাটাই কিনবো।'

বাধা দিয়ে হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাটাই মানে সেই ঘুড়ি ওড়াবার লাটাই?'

'হ্যাঁ, সেই ঘুড়ি ওড়াবার সুতোটা যাতে জড়ানো থাকে। বললে, 'দুটো লাটাই কিনতে হবে। একটা বাবার একটা আমার। বললাম, ঘুড়িও কিনবি তো? রবি বললে, না। ঘুড়ি আমি বাড়িতে তৈরি করবো।'

'তা হঠাৎ ঘুড়ি ওড়াবার শখ হলো কেন?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'পাড়ার ছেলেগুলো বোধহয় ওড়াচ্ছে। মিত্তিরবাড়ীর ছেলেগুলোর সঙ্গে রবির আকড়া-আকড়ি তো! বলে, মোনা মিত্তিরের ঘুড়ি আমি তো কাটা করে দেবো।'

'টাকা দিলে?' হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কি আর করব। দিলুম। লাটাই এলো, দিস্তা দিস্তা লাল নীল পাৎলা পাৎলা কাগজ এলো, ছুরি দিয়ে বাঁশের ব্যাকারি তৈরি করলে, আমার সেলাইএর কল থেকে দুটো কাঁচি নিয়ে দু'ভাইএ বসলো কাগজ কাটতে। আর আমাদের সুরবালাকে বললে, ময়দা দিয়ে এক গামলা আঠা তৈরি করে দাও।'

'এক গামলা আঠা ?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'এক গামলা কি বলছো ? এই আঠা দিয়েই তো হবে কেলেঙ্কারী ! এই এত বড় একটা মাটির মালসাতে করে সুরবালা তখন ময়দা গুলে উনোনে বসিয়েছে। এদিকে বৌমা দেখলে ঘুড়ি তৈরি করা বাটাছেলেদের কাজ, কিন্তু আঠা তৈরি করা কাজটা তো মেয়েদের। সুরবালাকে না বলে রবি তাকে বললেও তো পারতো ! মুখ তার করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সুযোগ একটা কিন্তু মিলে গেল তাড়াতাড়ি। আঠাটা উনোনে বসিয়ে সুরবালা নিজের কাজ করছিল। দূর থেকে কেমন যেন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পেয়ে ছুটে গেল। উনোনের কাছে গিয়ে দেখে আঠা তখন মাটির মালসার তলায় কামড়ে বসে গেছে। তাড়াতাড়ি সেই মালসাটাই নিয়ে গিয়ে সুরবালা নামিয়ে দিলে রবির হাতের কাছে।

রবি ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বললে, 'ওকনো আঠা দিয়ে কাজ হবে না।'

সুরবালা কাউকে রেহাই দেয় না। বললে, 'সংসারের কাজ ফেলে আমি পারবো না তোমার আঠা তৈরি করতে। ওই যা হয়েছে ওতেই কাজ চালিয়ে নাও।'

বৌমা ছিল কাছেই দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি গিয়ে মালসাটা তুলে নিয়ে বলেছে, 'আমাকে বললেই তো হতো !'

রবি কিছু বলেনি। চুপ করে কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটছিল তখন।

ওকনো আঠায় কাজ হবে না বলেছে রবি। বৌমা তখন বুদ্ধি করে সে আঠাটা ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার এক মালসা ময়দা গুলে উনোনে বসিয়েছে। তারপর খুব পাৎলা পাৎলা থাকতে মালসাটা নিয়ে গিয়ে রবির হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলেছে, 'এই নাও, ছাখো এবার ঠিক হয়েছে।'

রবি আঠায় হাত দিয়েই বলেছে, 'যোৎ, এটাকি আঠা হয়েছে নাকি ? যত সব অকম্মার ধাড়ি !'

দোষের মধ্যে দোষ—রবি কথাটা বলেছিল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। যেন কে কাকে বলছে ! এত কষ্ট করে আঠা তৈরি করে আনলে, পছন্দ না হয়—মুখের দিকে তাকিয়ে কথাও তো বলতে হয়।

বৌমার রাগ হয়ে গেছে তখন।

আঠার মালসাটা দুহাত দিয়ে তুলে নিয়ে হড় হড় করে সেই ময়দা গোলা গরম জলটা রবির মাথার ওপর ঢেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছে।'

এই বলে বরদাসুন্দরী আবার হাসতে লাগলেন।

'হে যদি তুমি দেখতে ! রবি ছুটে কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে চান করবার জন্যে। আর বৌমা হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে কলঘরের ভেতর থেকে রবি চেঁচাচ্ছে—'হাসি হচ্ছে ছাখো ! দাদা, হাসতে বারণ কর তোমার বৌকে। আবার যদি হাসে তো আমি কিছু বাকি রাখবো না বলে দিচ্ছি। বৌদি-ফৌদি মানবো না কিন্তু।'

হরেনবাবু বললেন, 'ওদের ঘুড়ি তৈরি করা হলো না তাহ'লে ?'

'তাই পারে ? মিছেমিছি পয়সা নষ্ট করে কাগজ কিনে কেটে কেটে ছই-ছত্রাকার করে রাখলে। সুরবালা সেগুলো পরিষ্কার করছে আর আপনমনেই গজগজ করছে ছাখোগে। আমার কাছ থেকে আবার পয়সা নিয়ে রবি গেছে ঘুড়ি কিনতে।'

ঘুড়ি এলো, লাটাই এলো, তারপর এলো ওড়াবার পালা।

ঘুড়ি ওড়াবার সখটা রবিরই বেশি।

ছবি জানেও না ওড়াতে। ইচ্ছেও ছিল না তেমন। রবিই তাকে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু খেলার নেশা যখন পেয়ে বসে তখন আর যেন ছাড়তে চায় না মনকে। প্রথম দিনটা কোনোরকমে কেটে গেল। খেলা শেষ করে ছাত থেকে নামতে নামতে রবি বলছে, এমন সময় ছবির ঘুড়িটা মিত্তিরবাড়ীর একটা ছেলে দিলে কেটে।

রোখ্ চেপে গেল ছবির। রবিকে বললে, 'খুব মাঞ্জা দেওয়া সুতো কিনতে পাওয়া যায় তো?'

রবি বললে, 'যায়। আমাদের লাটাইএর সুতোও তো ফার্ষ্ট ক্লাস সুতো।'

'ফার্ষ্ট ক্লাস তো কেটে গেল কেন?'

'ঘুড়ি তুমি ওড়াতে জানো না যে!' রবি বললে।

হাসির পথে তাকিয়ে দেখে, রোয়ের কাছে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে।

ঘুড়ি ওড়াতে ছবি জানেনা সত্যিই, কিন্তু কথাটা তার লক্ষ্মীর সামনে বলা রোয়ের উচিত হয়নি।

রবি বুঝতে পারেনি।

অন্যদিন হলে এই হাসির জন্যে রবি তার বৌদিকে দু'কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু সেদিন কিছু বললে না। কারণ তার হয়ে গেছে দু'জনের।

এই ঘুড়ি ওড়ানো ব্যাপার নিয়েই তার।

ঘুড়ি না হয় তারা ওড়াচ্ছে, কিন্তু দেখবে কে?

লক্ষ্মীই একমাত্র মানুষ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তাদের ঘুড়ি ওড়ানো। কখনও সে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কখনও-বা নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ঘুড়ি যখন অনেক ওপরে উঠে যায় তখন হাত তালি দেয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

বলে, 'আরও—আরও—অনেক ওপরে—ওই সাদা সাদা মেঘগুলো যেখানে আছে সেইখানে। যেখানে চাঁদ ওঠে সেইখানে পাঠিয়ে দিতে পারো না?'

রবি বলে, 'কাল পাঠাবো।'

পরের দিন ঘুড়িগুলো নিতে গিয়ে রবি দেখলে তার একটা ঘুড়ির গায়ে লেখা—'লক্ষ্মী'। মুখে কিছু বললে না, কিন্তু মনে মনে বুঝলো—কে লিখেছে।

সেই ঘুড়িটি হাতে নিয়েই রবি বললে, 'একেই আজ আমি চাঁদের দেশে পাঠাবো দেখে নিও।'

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার সোনা মিত্তির যদি কেটে দেয়?'

'কই কাটুক তো দেখি! পারবে না কাটতে।'

'কাটলে তো! তোমার দাদার ঘুড়ি দিলে তো কেটে।'

'দাদার ঘুড়ি কাটতে পারে, কিন্তু আমার ঘুড়ি কাটতে পারবে না।'

লক্ষ্মী বললে, 'আমাকে ঘুড়ি ওড়ানো শিখিয়ে দেবে ঠাকুরপো?'

'যেৎ!' মেয়েদের ঘুড়ি ওড়াতে নেই।'

'কেন, নেই কেন?'

'তা জানি না। কোনও মেয়েছেলেকে ঘুড়ি ওড়াতে আমি দেখিনি কখনও।'

'আমি ওড়াবো। আমার খুব ভাল লাগে। দূরে—দূরে, অনেক দূরের আকাশে ঘুড়িটা যখন চলে যায়, মনটাও তখন চলে যায় ওই ঘুড়ির সঙ্গে—এই পৃথিবী ছাড়িয়ে—কেমন সুন্দর ওই চাঁদ সুদ্ধির দেশে।'

'থাক্ আর চাঁদ-সুদ্ধির দেশে তোমায় গিয়ে কাজ নেই। তুমি নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাখো। আমরা আজ ঠাকুরবাড়ীর ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াবো।'

'ও মা, ও ছাতটা যে ফাঁকা ছাদ, তার ওপর উঠবে কেমন করে ?'

রবি বললে, 'পেছন দিকে কাঠের সিঁড়ি আছে তুমি জানো না ?'

'পেছন দিকটা তো অন্ধকার গলি। যত সব নোংরা বজ্জাত ছেলে ওইখানে। সুরবালা বলছিল—ওখানে নাকি একটা গোখরো সাপ আছে। ওরে বাবা, যেয়ো না ওদিকে।'

রবি বললে, 'সুরবালা বলেছিল—গোখরো সাপ আছে। সুরবালার মাথা আছে। যাও।'

কোনও কথাই শুনলে না রবি। কোনও নিষেধ বারণই মানলে না তারা। রবি ছবি দু'জনেই ঠাকুরবাড়ীর পেছন দিকের সেই নোংরা গলির ভেতর ঢুকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ফাঁকা ছাদে উঠে গেল ঘুড়ি ওড়াবার জন্যে।

অনেক চেষ্টা করলে লক্ষ্মী। শেষ পর্যন্ত ওপরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'মাকে বলে দিচ্ছি ঠাকুরপো, গলিতে গোখরো সাপ আছে।'

মাকে গিয়ে বললে বোধ করি ভালই করতো সে। কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। এই দুই দুঃসাহসী তরুণের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে লাগলো লক্ষ্মী

ভাগ্য যারা মানে তারা বলে—অদৃষ্ট এই নিয়তিই করছে প্রতিটি মানুষকে। তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই।

বিকেল চারটে বেজে গেছে। সূর্য্য দেখা যায় না, কিন্তু কলকাতার আকাশেও তখন আলোর সমারোহ। রৌদ্র এসে পড়েছে বড় বড় বাড়ীগুলোর গায়ে।

লক্ষ্মীর নজর ছিল লালরঙের সেই ঘুড়িটার দিকে—যার ওপর সে তার নিজের নাম লিখে দিয়েছে। ঘুড়িটা অনেক দূরে চলে গেছে। লক্ষ্মী মনে মনে তারিফ করছিল রবির।

ছবির ঘুড়িটা নীল রঙের। সেটাও তর তর করে উঠছে আকাশে। সাপের মত ফণা তুলে এঁকে বেঁকে উঠছে।

আরও চার পাঁচটা ঘুড়ি দেখা যাচ্ছে। সেগুলো অন্য লোকের। মিত্তিরদের বাড়ীটা দক্ষিণ দিকে। ছবি রবি যে ছোরা মিত্তিরের নাম বলে—তার ঘুড়ি কোনটা কিছুই বুঝবার উপায় নেই। হয়ে হয়ত তাদেরই ভেতর একটা।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ঘুড়ি এসে ছবির নীল রঙের ঘুড়িটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুতোয় সুতোয় বোধকরি প্যাঁচ্ লেগে গেছে। ছবি দু'হাত দিয়ে তার লাটাই ধরে টানছে তার ঘুড়িটাকে। টানতে টানতে ছাদের কিনারার দিকে এগিয়ে গেল। ফাঁকা ছাদের একেবারে শেষ প্রান্তে। নজর ছিল তার ওপরের দিকে। মনের ভুলে আর এক পা বাড়াতেই একটা ভয়াবহ আর্ত্তনাদ !

রবি ছিল ছাদের উত্তর দিকে। সেও চেঁচিয়ে উঠলো, 'দাদা !'

লক্ষ্মী ছুটে গেল। গিয়ে দেখে ছাদ থেকে ছবি পড়ে গেছে ঠাকুরবাড়ীর বাঁধানো সানের ওপর। দুহাতে ঘুড়ির লাটাইটা সে তখনও ধরে আছে। মাথার এক পাশ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে। লক্ষ্মী তার আঁচলটা দিয়ে সেই জায়গাটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঠাকুরপো !'

ঘুড়ি লাটাই ফেলে দিয়ে রবি ছাদ থেকে নেমে এলো।

'দাদা !'

চীৎকার শুনে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এলেন বরদাসুন্দরী। ছুটে এলেন হরেনবাবু।

(ক্রমশঃ)

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নদীপথে যাতায়াত

সে সময় নদীপথে কলকাতা থেকে নানা কারণায় যাওয়ার খুব রেওয়াজ ছিল। লাট-বেলাটরাও বড় বড় বজরায় চেপে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করতেন।

তখন না ছিল ষ্টীমার, না রেলগাড়ী। স্থলপথে পাল্কী আর জলপথে বজরা। এই ছিল যানবাহন।

তখনকার দিনের বজরা দেখবার মত জিনিষ ছিল। দেবী চৌধুরাণীর বজরার বর্ণনা আমরা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এক একটা বজরায় ছোট বড় কত রকমের ঘর আর তাদের সাজসজ্জার বাহারই বা কি।

এই রকম বজরায় চড়ে বাংলার লাট বাহাদুর বা ঐ ধরণের বড়কর্তারা সফরে বেরুতেন।

১৭৬০ সালের একটি সরকারী হিসাবপত্রের খাতায় সেই সময়কার কোম্পানীর বড় কর্ত্তার কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার একটি খরচের হিসাব পাওয়া যায়। এই যাত্রায় সময় লেগেছিল ১ মাস ৬ দিন। খরচের বহর এই রকম :-

তিনটি বজরা প্রতিদিন ৩৲ হিঃ = ২১৬৲

৬০ থেকে ৭০ জন মাঝি মাল্লা, চাকর বাকর, লোকলস্কর ইত্যাদি মিলিয়ে বজরা ভাড়া সমেত মোট খরচ ২৪১১৲।

নবাবের জন্য উপঢৌকন এবং তাঁর আমলা ও ভৃত্যদের বকশিস বাবদ মোট খরচ—১৯২৩৲।

নজরানা— ৬৭৪৲।
মুহুরীকে বস্ত্র— ২৫৭৲।

ভৃত্য, পিয়ন, বরকন্দাজ এবং সৈন্য সামন্তদের পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার বাবদ—৭২৪৲

কাশিমবাজার রাজবাড়ী থেকে ভাড়া করা বেহারাদের মাহিনা বাবদ—৮৩৫৲

ঐ ৩০ জন মশালচির মাহিনা বাবদ—১২০৲।

খাদ্য এবং মদ্য—৩৫০৲।
বস্ত্র— ২৪০৲।
বিবিধ— ২৩৮৲।

মোট খরচ— ১০২২০৲।

তখনকার দিনে বজরার ভাড়া কিরকম ছিল এবং নানাস্থানে যেতে কিরকম সময় লাগতো তার একটা নির্ঘণ্ট নীচে দেওয়া হল :—

৮ দাঁড়ির বজরা প্রতিদিন—২৲
১০ দাঁড়ির " " —২৷৷০

১২ হাঁড়ির " " —৶০
১৪ হাঁড়ির " " —৫৲
২০ হাঁড়ির " " —৭৲
২৪ হাঁড়ির " " —৮৲

বহরমপুর যেতে সময় লাগত ২০ দিন। মুর্শিদাবাদ যেতে ২৪ দিন। রাজমহল, ৩১ দিন। মুঙ্গের, ৪৪ দিন। পাটনা, ৬০ দিন। বেনারস, ৭২ দিন। কানপুর, ৯০ দিন। রংপুর, ৫২ দিন। ঢাকা, ৩৭ দিন। চট্টগ্রাম, ৬০ দিন। সোনামুখী, ৭৫ দিন।

কলিকাতা পুলিশ

যতদূর জানা গেছে কোম্পানীর পরিচালনায় লালপাগড়ী দেখা দেয় কলকাতার রাস্তায় ১৭৮৯ সালে।

এই সময় একটি পুলিশ নোটিশ বেরোয়। এইটি বোধকরি প্রথম পুলিশের নোটিশ আমি। তাতে বলা হয়েছিল :—"এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে এইমাসে ২০শে তারিখের পর চৌরোঙ্গীর ধারে এবং ঐ স্থানের বড় বড় রাস্তাগুলিতে ঘোড়াদের শিক্ষা দেওয়া বা ব্যায়াম করানো চলিবে না। ঘোড়ার মালিকগণ দয়া করিয়া তাঁহাদের ভৃত্যদিগকে এই নোটিশের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবেন।"

১৭৯১ সালের ৮ই ডিসেম্বর একটি পুলিশ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় :—"এখন হইতে কোন সরাবের দোকান বা মদ ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান সূর্যাস্তের পর আর খোলা রাখা চলিবে না।"

১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যক্তিবিশেষকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রথম পুলিশী অভিযানের কথা শোনা যায়।

এডওয়ার্ড হলাও বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। কিছুদিন তিনি মাদ্রাজের অস্থায়ী গভর্ণরের পদীতেও বসেছিলেন। জাল জুয়াচুরী বা ঐ ধরনের কোনো অপরাধে তিনি দোষে অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করবার আয়োজন করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজ থেকে তিনি জাহাজে চেপে কলকাতার বন্দরে এসে উপস্থিত হবা মাত্র এক পুলিশবাহিনী সেই জাহাজে উঠে গিয়ে তাঁকে পাকড়াও করে।

কলকাতায় তখন আগুন লাগতো খুব। ১৮০০ সালের ১৩ই মে তারিখের একটি পুলিশী বিজ্ঞপ্তি—"কলিকাতা মৌজার মধ্যে কেহ কোনো দোকান বা আবাস বা গুদাম বা কোনো ইমারত খড়, বিচালি, ঘাস, ছোবলা এবং ঐ জাতীয় দাহ্য পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারিবেন না।"

১৮০৬ সালে এপ্রিল মাসে ক্যালকাটা গেজেটে এই বিচিত্র বিজ্ঞাপনটি বার হয়—"যে বর্বর বন্য পাষণ্ড যুবক সম্প্রতি নির্মমভাবে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে প্রহার করিয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করে তাহাকে অবিলম্বে পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য বলা হইতেছে। সে যদি ২১ দিনের মধ্যেই তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ না করে তাহা হইলে উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও তাঁহার বন্ধুগণ উক্ত বর্বর যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আশা হয় উক্ত যুবক এই বিজ্ঞাপন দেখিবা মাত্রই লজ্জায় পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া যাইবে।"

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতার নামধাম ছিলনা।

১৭৯২ সালে ১লা সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রথম ব্যাপক পুলিশ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়—

"ফোর্ট উইলিয়াম, ৩১শে আগষ্ট ১৭৯২—গবর্ণর বাহাদুর সংবাদ পাইতেছেন যে, শহরে দুষ্ট লোকের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা আছে। তাহারা অনেকসময় পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী সাজিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অবৈধভাবে টাকা লইতেছে। শহরের শান্তি রক্ষার জন্য ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বিশেষ উদ্বিগ্ন। তাই তিনি নিম্নলিখিত রূপ আদেশ জারী করিতেছেন—নগর কতোয়াল (পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট) এতদ্বারা এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে, প্রত্যেক সন্দেহে তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে চালান দিতে পারিবেন ও তৎপরে নগর আদালতে ঐ ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাজির করিতে পারিবেন। ঐরূপ ধৃত ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া হইবেনা। নগর-কতোয়াল তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী ও সিপাহীদের লইয়া একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করিয়া বিশিষ্টভাবে কার্য করিবেন। ঐরূপ বাহিনী "কলিকাতা পুলিশ" বলিয়া খ্যাত হইবে।"

সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানীর আমলে বড়া সেনসরশিপ ছিল। দেশী বিদেশী কোনো পত্র পত্রিকাই এই নিয়ন্ত্রণের হাত এড়াতে পারতনা। ওয়ারেন হেস্টিংসএর কবলে পড়ে জিকি সাহেবের হায়রানির কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাঁর বেঙ্গল গেজেট পত্রিকায় যা নয় তাই বলে অনবরত গালমন্দ করতেন।

১৭৮৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সরকারী মুখপত্র ক্যালকাটা গেজেটে নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি বেরোয়—

"গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশক্রমে জানানো হইতেছে যে, যেহেতু অনেক পত্রিকায় সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে নানারূপ অযথা মিথ্যা কুৎসা প্রচারিত হইতেছে সেই হেতু এখন হইতে যে কোনো পত্রিকাকে তার সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশের পূর্বে সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগে তাহা দাখিল করিয়া তাহা অনুমোদন করাইয়া লইবার জন্য আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে।"

এই হইল সেনসরশিপের সূত্রপাত। এবং সব প্রথমেই এর কবলে পড়লেন ক্যালকাটা জার্নালের অকুতোভয় সম্পাদক বাকিংহাম। তিনি সারা ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করে তার বড় বড় কর্মচারীদের অনেক কুকীর্তির কথা ফাঁস করতে লাগলেন। কোম্পানী তাঁকে বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও তিনি নিবৃত্ত না হওয়ায় ১৮০৩ সালে ৯ই নভেম্বর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তাঁর পত্রিকার লাইসেন্স বাতিল করা হল এবং তাঁর নামে ওয়ারেন্ট জারী করা হল। শেষপর্যন্ত যখন তাঁকে কোনোক্রমে জব্দ করা গেলনা তখন বাকিংহামকে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল।

১৮৩৫ সালে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কএর কাছে এক আবেদন-পত্র পেশ করে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন তুলে দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি অচিরেই বিলাত চলে যান। তাঁর পরবর্তী শাসক স্যার চার্লস মেটকাফ এপ্রিল মাসে একটি নতুন আইন বলবৎ করে ভারতীয় সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কলকাতার আবেদকারীরা তাঁকে "Liberator of

the Indian Press" বলে অভিনন্দিত করেন। শুধু তাই নয় চাঁদা তুলে তাঁরা একটি লাইব্রেরী তখন তৈরী করেন, এবং তার নাম দেন "মেটকাফ হল।"

ইংরাজদের জীবন যাপন

১৭৭৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠি লিখেছেন এক ইংরাজ কেরানী তার এক বন্ধুকে লণ্ডনে। সেই চিঠির মধ্যে কোম্পানীর আমলের ইংরাজ কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এই রকম বর্ণনা আছে—"সকাল ৭টা নাগাদ তাঁর কোন এক ইংরাজ রাজকর্মচারীর দরোয়ান বাড়ীর গেট খুলে দিল। মস্ত চওড়া বারান্দায় একে একে হাজির হল তাঁর সরকার, পিয়ন, হরকরা, চোপদার, হুঁকোবরদার এবং সলামীর দল। সেইসঙ্গে কয়েকজন কেরানী এবং উকিল। খাস বেয়ারা এবং জমাদার দল ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সকাল ৮টা নাগাদ তাঁর শয়ন কক্ষে ঢুকল। শয়নকক্ষে যে মহিলাটি ছিলেন তিনি বেরিয়ে এসে পিছনকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। প্রভু বিছানার উপর উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকর দল এগিয়ে এসে তাঁকে তিনবার করে কুর্নীশ করলে। তারপর তাঁকে পোষাক পরানো হল। ৩।৪ জনে মিলে তাঁকে সার্ট, কোট, টাই, পেন্টালুন, মোজা, জুতো পরালো। তারপর এল নাপিত। দাড়ি কামানোর পর ছিলমচী ও আর এক ভৃত্য ছোট বাটিতে জল এবং তোয়ালে নিয়ে এল। তিনি সেই সুগন্ধি জল দিয়ে মুখ চোখ পরিষ্কার করলেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন প্রাতঃরাশ উদরস্থ করতে। প্রচুর রুটিটোষ্ট ডিম প্রভৃতি সহযোগে তিনি দু-তিন কাপ চা খেলেন। তারপর এল কেশসজ্জাকর। সে যখন প্রভুর মাথায় হাত চালাতে লাগল তখন আর একদিক দিয়ে হুঁকোবরদার গড়গড়ার নলটি প্রভুর হাতে এগিয়ে দিলে। প্রভু দুইচক্ষু মুদ্রিত করে তামাকু সেবন এবং মস্তক মর্দনের সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো তাঁর কেরানী। সঙ্গে উকিলও। উকিলকে বসবার জন্যে চেয়ার দেয়া হল। এইভাবে ১০টা পর্যন্ত তিনি বাড়ীতেই দরবার করলেন। তারপর তিনি কাজে বেরুলেন। সঙ্গে লাটা মস্ত পাল্কী, তার ৮ জন বাহক। পাল্কীর সামনে পিছনে হরকরা এবং পিয়নের দল। প্রভু নানাস্থানে নানাজনের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর বাড়ী ফিরে ছুটো নাগাদ ভোজসভায় বসলেন। প্রতিদিনই ভোজসভায় অন্তত ৩।৪ জন অতিথি থাকবেনই। ভোজ অনুষ্ঠান ৪টে পর্যন্ত চলল। তারপর প্রভু তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং জামাজুতো ছেড়ে রাত্রিবাস পরে শয্যায় শুলেন। এবং সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর নাক ডাকতে লাগল। রাত ৭টা ৮টা পর্যন্ত ঘুমলেন। তারপর ঠিক সকালের মত আবার সব অনুষ্ঠান হল। শুধু সন্ধ্যার পোষাকটা পরলেন আরও জমকালো। তারপর তিনি আবার বেরুলেন। নানা পুরুষ ও মহিলা বন্ধু সতীর্থের সঙ্গে দেখা করলেন। বাড়ী ফিরলেন রাত ১০টা নাগাদ বন্ধু-বান্ধবী সমভিব্যাহারে। নানা পদ-বিশিষ্ট নৈশাহার পরিবেশন করা হল। রাত্রি ১টা পর্যন্ত খানা-টেবিলে বসে গল্প, গুজব, হাসি, মস্করা চলল। তারপর অতিথিরা গড়াতে গড়াতে টলতে খেতে খেতে যে যার পাল্কীতে চড়ে বাড়ীমুখো হবার পর আমাদের প্রভুকে ৩।৪ জন বেয়ারা শয়নকক্ষে নিয়ে গেল এবং তাঁর বেশবাস বদলে দেওয়া হল। তারপর তিনি শয়নে পদ্মনাভ করলেন।"

এই রকম জীবন যাপন সত্ত্বেও প্রভু যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর পকেটে বেশ কয়েক লাখ টাকা। R I C H কথাটি তিনি সার্থক করলেন—Rob India Come Home.

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

কলম্বাস ঃ এযুগের আমেরিকায়

[কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন একথা সবাই জানেন। কল্পনা করা যাক, সেই সুদূর অতীত যুগে কলম্বাস সমুদ্রযাত্রা করে বহুকাল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে অবশেষে হালে আমলে আমেরিকায় পৌঁছেছেন। এই কল্পনা সত্যি হলে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হতো তারই কাহিনী নীচে বর্ণিত হল]

"তীরের কাছে এসে পড়েছি। হেই-ও।" মাস্তুলের উপর থেকে খালাসীর হাঁক শোনা গেল।

যাক্। তাহলে এতদিনে কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা সাঙ্গ হল, সার্থক হল। ব্যস্তপদে তিনি রেলিং-এর ধারে এগিয়ে গেলেন। হাতে দুরবীন।

"প্রকাণ্ড একটা পাহাড় দেখছি। কিন্তু আশ্চর্য, পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গবাক্ষ। গবাক্ষ-ওলা পাহাড় জীবনে এই প্রথম দেখলাম।"—বললেন তিনি।

একজন নাবিক চীৎকার করে উঠল—"নৌকোয় চড়ে নেটিভরা আসছে।"

—"আসুক।"

তাদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে কলম্বাস তাঁর টুপী খুললেন। ছোট-খাটো বিচিত্র আটসাঁট পোষাক পরা দু'জন সেই দেশীয় লোক নৌকো বেয়ে উঠে কলম্বাসের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে তাঁর হাতে একখানি লম্বা কাগজ দিল।

সবিস্ময়ে কলম্বাস বললেন—"আমি তোমাদের দেশ আবিষ্কার করতে চাই। স্পেনের সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার নামে আমি ঘোষণা করছি···" তাঁর কথা থামিয়ে একজন আগন্তুক হাই তুলে বললে—"ওতেই হবে! এখন আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই কাগজে লিখে দিন। আপনার পুরো নাম, কি জাত, আপনি বিবাহিত কিনা, কোন অসুখ আছে কিনা, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন কিনা এবং আপনি ইডিয়ট কিনা।"

ইডিয়ট! কলম্বাস চকিতে তাঁর কটিদেশে বিলম্বিত তরবারিতে হাত দিলেন। কিন্তু তিনি ইডিয়ট নন, তাই নিমেষে ঠাণ্ডা হলেন। পাশে যে সব অনুচর দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন—"আমরা এইসব নেটিভদের কথায় কিছু মনে করব না। এদের উত্যক্ত করবনা। এরা শিশুর মতো। আমি জানি, এদের মধ্যে অনেক রকম আদিম প্রথা চলিত আছে।"

একজন আগন্তুক প্রশ্ন করল—"আপনার কাছে ফিরে যাবার টিকিট এবং পাঁচশো ডলার আছে তো?"

বিমূঢ়ভাবে পর্যটক বললেন—"ডলার! ডলার কি জিনিষ?"

—"এইমাত্র প্রশ্নপত্রে আপনি উত্তর লিখেছেন যে, আপনি বোকা নন, অথচ বলছেন, ডলার কি জিনিষ? যাকগে। এখন বলুন আপনি এদেশে কি করতে চান?"

—"আমি আমেরিকা আবিষ্কার করতে চাই।"

—"সেকাজে আপনার প্রয়োজনীয় পাবলিসিটি দরকার। তার কি ব্যবস্থা করেছেন?"

—"পাবলিসিটি! প্রথম এই শব্দের নাম শুনছি। কথাটার মানে কি?"

আগন্তুকরা মহাবিস্ময়ে বার কয়েক কলম্বাসের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল!

তারপর একজন বললে—"পাবলিসিটি মানে প্রচারকার্য। আপনি জানেন না?"

—"না।"

—"অথচ আপনি আমেরিকা আবিষ্কার করতে চান! আমরা কেউ এ অবস্থায় আপনার জুতোয় পা গলাতাম না, মিঃ কলম্বাস।"

যাইহোক, অবশেষে কলম্বাস তীরে নামলেন!

তাঁর এক হাতে একটি কাটখের হুড়ির মোড়ক। ইচ্ছা আছে এগুলির বদলে তিনি সোনা আর হাতির দাঁত কিনবেন। অন্য হাতে প্রকাণ্ড ডাণ্ডাযুক্ত স্পেনীয় পতাকা। ইচ্ছা, আমেরিকার মাটিতে এই পতাকা গাড়বেন।

কিন্তু কোথায় মাটি? এখানে চারিদিকে শুধু পাথর, কংক্রিট আর ইস্পাত। বিস্ফারিত চোখে কলম্বাস চারিদিক দেখতে লাগলেন।

হাতে নোটবুক আর পেন্সিল, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা, একদল লোক হৈ-হৈ শব্দে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। পাশের জাহাজ থেকে নেমেছে এক বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। তাকেই ঘেরাও করেছে তারা। কলম্বাসের দিকে কেউ ফিরেও দেখছে না।

রং-করা মুখ দু'জন স্ত্রীলোক তাঁর দিকে এগিয়ে এলো।

একজন অপরকে বললে—"নিশ্চয় হাতে ভ্যাবাগংগারামটি কে বলতো?

—"স্পেনের কোন রোত্তোরার বিজ্ঞাপন হয়ত।"

তারাও ছুটে চলে গেল সেই মুষ্টিযোদ্ধার উদ্দেশ্যে।

আমেরিকার মাটিতে স্পেনের পতাকা প্রোথিত করবার চেষ্টায় কলম্বাস গলদঘর্ম হলেন। রাস্তা ছুটো করবার জন্যে রীতিমতো বন্দুকাদি চাই। তলোয়ার দিয়ে সে কাজ করতে গিয়ে সেখানা ভোঁতা হয়ে গেল। অতঃপর নিশান ঘাড়ে নিয়েই কলম্বাস অগ্রসর হলেন।

পথ চলতে চলতে কলম্বাস দেখলেন, আশেপাশে হাজার হাজার মোটর ছুটোছুটি করছে। কেউ মাটির তলায় নেমে যাচ্ছে, কেউ বা পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ চীৎকার করছে, কিন্তু হায়! তারা কেউই জানতে পারছে না যে, তারা আবিষ্কৃত হয়েছে, নাবিক-শিরোমণি কলম্বাস এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের দেশে।

হতাশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন তিনি—"এত পয়সা খরচ করে, সমুদ্রের ঝড়-তুফান সহ্য করে মরি বাঁচি করে এখানে এসে নামলাম, অথচ কেউ আমার দিকে এতটুকুও মনোযোগ দিচ্ছে না।"

একজন বয়স্ক লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে গিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে কলম্বাস বললেন—"আমি হচ্ছি ক্রিষ্টোফার কলম্বাস।"

—"কি নাম বললেন ?"

—"ক্রিষ্টোফার কলম্বাস।"

—"বানান করুন।"

কলম্বাস বানান করে বললেন।

মাথা নেড়ে লোকটি বললে—"নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে। গ্রামোফোনের সেলসম্যান ?'

ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় কলম্বাস বললেন—"আমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছি।"

—"নাকি ! কতদিন ?"

—"এইমাত্র। পাঁচ মিনিট আগে।"

—"মজার কথা ! তা এখন কি করতে চান আপনি ?"

নাবিক-শ্রেষ্ঠ বললেন—"সে কথা পরে। আগে বলুন, এই কাজের জন্যে কিছুটা খ্যাতি কি আমি দাবী করতে পারিনা ?"

—"খ্যাতি ? কিন্তু বন্দরে কেউ বা কোন দল কি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিছল ?"

—"কেউ না। নেটিভরা জানে না, যে আমি তাদের আবিষ্কার করতে এসেছি।"

—"ভুল করেছেন ! আপনার আসেভাগে যেতারে খবর পাঠানো উচিত ছিল। এভাবে কি কেউ আজকাল কোন কাজ করে ? যখন আপনি কোন নতুন দেশ আবিষ্কার করবার পরিকল্পনা করবেন তখন প্রথমে সেখানে পাঠাবেন এক লম্বা টেলিগ্রাম। তারপর সঙ্গে নেবেন গোটা দুই সরস বিবৃতি আর জনা দুই ফটোগ্রাফার। তবেই না খবর-কাগজওয়ালা আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে ! আপনার প্রধান প্রয়োজন পাবলিসিটির।"

"পাবলিসিটি ! দ্বিতীয়বার কথাটা শুনলাম।" বললেন কলম্বাস—"কথাটার যথার্থ মানে কি ? এটা কি কোন ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, না কোন দেশজ সংস্কার ?"

মাথা নেড়ে লোকটি বললে—"ছেলেমানুষের মত কথা বলবেন না মিঃ কলম্বাস। পাবলিসিটি মানে প্রচার। এছাড়া বর্তমান যুগে অন্য পথ নেই। আপনার জন্যে মায়া লাগছে। দেখি, আপনার জন্যে কি করতে পারি। বলি, টাকাকড়ি সঙ্গে আছে তো ?"

কলম্বাস কয়েকটি স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা বার করলেন। নিরীক্ষণ করে লোকটি বললে—"আপাততঃ ওতেই হবে। চলুন আমার সঙ্গে।"

লোকটি তাঁকে নিয়ে একটি হোটেলে উঠল।

বিরাট অট্টালিকার অতল তলায় নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে তাঁকে বসিয়ে লোকটি বললে—"আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আধঘন্টার মধ্যে আসছি।"

সত্যিই আধঘন্টার মধ্যে ফিরে এলো সেই ব্যক্তি। সঙ্গে আরও দু'জন। একজন অনবরত চকম্ চকম্ করে কি যেন চিবোচ্ছে। অন্যজন একটি তেপায়া যন্ত্র এনে তাঁর সামনে বসিয়ে বললে—"মশায়, এইবার একটু হাসুন তো। এই যে, এমনি করে, হা-হা হা-হা।" বলে তার দাঁতগুলো বার করল।

ব্যাপার দেখে কলম্বাসের মাথা ঘুলিয়ে গেছে। বোকার মত তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন।

ক্লিক ! এক ঝলক আলো। ফটোগ্রাফার ক্যামেরা বন্ধ করে বললে—"ধন্যবাদ।"

এইবার দ্বিতীয়জন এগিয়ে এলো। সিগনেট বন্ধ করে বললে—"নাম ?"

কলম্বাস নাম বললেন।

—"বেশ। কবে এদেশে আবিষ্কার করলেন ?"

—"আজ।"

—"উত্তম। এদেশকে কেমন লাগছে ?"

কলম্বাস উত্তর দিলেন—"সবে তো এলাম। এখনো ভাল করে……"

সাংবাদিক মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে—"ঠিক। আচ্ছা, নিউইয়র্কের কোন চারটে জিনিষ আপনার সব চেয়ে ভাল লেগেছে ?"

—"দেখুন, এই সবে মাত্র…"

—"ঠিক।" সাংবাদিক আবার চিন্তামগ্ন হল। এমন মুখচোরা আবিষ্কারককে নিয়ে সংবাদ রচনা করা কষ্টকর বৈকি! অবশেষে বললে—"যা হয় কিছু বলুন।"

খাতার উপর পেনসিল উদ্যত হল। কিন্তু কি বলবেন কলম্বাস ? তিনি যেন অগাধ জলে পড়েছেন।

—"আমেরিকান মেয়েদের কেমন লাগল আপনার ?"

কলম্বাস তথাপি নিশ্চুপ।

কিন্তু লোকটির আর দেরী করবার সময় নেই। সে তরতর করে আপন মনে লিখে চলল। লেখা শেষ করে বিদ্যুৎ আবিষ্কারকের পিঠে চাপড় মেরে বললে—"ও-কে! ধন্যবাদ।"

হনহন করে দু'জনে চলে গেল। তাঁর পাণ্ডা তখন বললে—"চলুন, এবার একটু ঘুরে আসা যাক।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে কলম্বাসকে নিয়ে তাঁর পাণ্ডা একটি সস্তাদরের নাচঘরে ঢুকলো।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, নাচঘর থেকে বেরিয়ে লজ্জায় আরক্ত বিহ্বল কলম্বাস রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, ছুটন্ত মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে কোনরকমে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে বিছানা নিলেন। যতক্ষণ না ঘুমুলেন ততক্ষণ বাইবেল আবৃত্তি করতে লাগলেন।

পরদিন সকালেই পাণ্ডাটি এসে হাজির।

তার মুখে হাসি, হাতে সেদিনের দৈনিক কাগজ। ভীত বিহ্বল কলম্বাস দেখলেন, সেই সংবাদপত্রের ৮০ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিতে কি ভয়ঙ্কর হাসি তাঁর মুখে! নীচে লেখা: "স্পেনীয় পর্যটক ক্রিস্ কলম্বাস। ইয়াঙ্কি মেয়েদের প্রশংসায় ইনি পঞ্চমুখ। হাইলে সেলাসির ইনি অন্তরঙ্গ বন্ধু। শীঘ্রই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।"

সংবাদ পড়ে কলম্বাস তো হতবাক। ইচ্ছা হল বলেন, এসব কথা তো স্বপ্নেও তিনি বলেননি।

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা!

ইতিমধ্যে কালকের সেই দুই ব্যক্তি এসে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিস্তারিতভাবে তাদের পরিকল্পনার আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। কলম্বাসকে তারা হলিউডে নিয়ে যাবে। সেখানে

একটি ঐতিহাসিক ছবিতে তাঁকে নায়কের ভূমিকা দেওয়া স্থির হয়েছে। পাবলিসিটির ম্যাজিকে চিত্র-জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। আসল ক্রিষ্টোফার কলম্বাস এক বোম্বেটের ভূমিকায়! বদনাম পড়ে যাবে। লোক পাগল হয়ে সেই ছবি দেখবার জন্যে ছুটবে। অবশ্য সংলাপগুলো সবই হবে আমেরিকান বিত্তির ভাষায়। মহাযুদ্ধের কাহিনী। তার মধ্যে আমেরিকা আবিষ্কারের পরিচ্ছেদ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

তাদের প্রস্তাব শুনে কলম্বাসের মাথা ঘুরতে লাগল। মনে মনে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হলিউডের দালালদের মুখে তখন খৈ ফুটছে—"জলদস্যুর ভূমিকায় আসল ক্রিষ্টোফার কলম্বাস! ভেবে দেখুন, কি লোমহর্ষক কাণ্ড! আপনার সঙ্গে স্পেনের রাণী প্রেমে পড়েছে। কিন্তু আপনি ভালবাসেন এক রুশ মেয়েকে। এদিকে বিপদ্নী ভাস্কোডিগামার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেভী হ্যামিলটনের সাহায্যে আপনাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের বুকে অন্য এক জলদস্যুর দল আপনাকে আক্রমণ করল। এ হল ষড়যন্ত্র। যাই হোক, আপনি জলহস্তীর মতো লড়াই করতে লাগলেন। এই দৃশ্যটি হবে তিনশো ফুট। অভিনয়ে আপনি অবশ্য তেমন পাকা নন, কিন্তু তাতে যায় আসে না।"

—"কিসে যায় আসে?" রুদ্ধশ্বাসে কলম্বাস প্রশ্ন করলেন।

"পাবলিসিটি। আপনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আপনি জল ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করছেন, ব্রেক এই দৃশ্য দেখতেই লাখে লাখে লোক জড়ো হবে। উপকরণ, দৃশ্যসজ্জা এবং অন্য সব সরঞ্জাম মজুত। শুধু এখন আপনাকে দাড়ি গোঁফ কামাতে হবে। নতুনভাবে মেকআপ দেওয়া হবে আপনাকে। স্বয়ং ম্যাক্সফ্যাক্টর হাত লাগাবেন আপনার মুখে। অতএব এখুনি চলুন সেলুনে, দাড়ি-গোঁফটা কামিয়ে ফেলুন। তারপর আপনাকে কনট্রাক্টে সই করবার জন্যে আমাদের আপিসে নিয়ে যাব।"

তাদের কথা শুনে কলম্বাস হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর অতিকষ্টে সেদিনকার মতো তাদের পরিকল্পনা স্থগিত রাখলেন।

সেই রাত্রে কলম্বাস স্পেনের রাণীকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখলেন—"আমি অনেক দেশ ঘুরেছি কিন্তু এরকম আজব দেশ আর তাজ্জব ব্যাপার অন্য কোথাও দেখিনি। এদেশের মানুষগুলো সত্যিই অদ্ভুত। এরা নীরবতা সহ্য করতে পারেনা। তাই এরা পথ উপভোগ করবার জন্যে বিশেষ বিশেষ রাস্তা তৈরী করেছে, সেইসব দীর্ঘ রাস্তা ইঁটু লোহার রেলিং-এর উপর বসানো এবং তার উপর দিয়ে অষ্ট-প্রহর প্রচণ্ড শব্দে লোহার গাড়ী যাতায়াত করছে……

"এরা অনবরত খায় আর অনবরত খাদ্যদ্রব্যগুলো চিবোয়। এরা এখনো সভ্য হয়নি। আধুনিক স্পেনীয় জীবনের তুলনায় এরা অতিশয় মন্থরগতি। পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতেও এরা নারাজ। তাই এরা এক প্রকার চলন্ত জিনিষ হাজারে হাজারে বাজারে চালু করেছে, তার নাম অটোমোবাইল……

"এদের থাকবার বাসাগুলো দেখলে মনে হয়, পাহাড়গুলোকে কেটে তার মধ্যে কোকর তৈরী করে এরা থাকবার ব্যবস্থা করেছে। এদের বাসার মাথাগুলো ঠিক পাহাড়ের মাথার মতো, যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে……

"ব্রডওয়ে নামক এক পল্লীতে প্রতি সন্ধ্যায় এদের একটি অনুষ্ঠান হয়। সে বড় তাজ্জব ব্যাপার। বহু সংখ্যক নেটিভ একটি প্রকাণ্ড ঘরে সমবেত হয়। সামনে একটি পর্দা-ঢাকা জায়গা দেখা যায়। লোকজন বসলে বাজনা বাজে। পরদা সরে যায়। কয়েকজন নেটিভ স্ত্রীলোক যেন উড়ে এসে পরদা সরানো স্টেজের উপর দাঁড়ায় এবং মাথা নুইয়ে সকলকে অভিবাদন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে আরও নানারকম অদ্ভুত ভীতিজনক বাজনা বাজতে থাকে। তারপর সেই স্ত্রীলোকগুলি বিবস্ত্র হতে শুরু করে। দর্শকের দল তখন বালকের মতো আনন্দে অধীর হয়ে হাততালি দিতে থাকে সেই দৃশ্য দেখে। স্ত্রীলোকগুলি যখন প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ আর দর্শকরা যখন অসহ্য উত্তেজনায় উদ্বেল তখন এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে দুর্বোধ্য ব্যাপার সংঘটিত হয়—হঠাৎ পর্দা পড়ে যায়, বাজনা বন্ধ হয়, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ঘোষণা শোনা যায়, আর দর্শকরাও সঙ্গে সঙ্গে যে যার কাজে প্রস্থান করে……

"আমি এই আজব দেশের আরও ভিতরে গিয়ে দেখবো, এদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার অনুধাবন করব। আমার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই। নেটিভরা খুব বিবেচক, দয়ালু আর ভদ্রতাপূর্ণ। এরা বিদেশীদের সমাদর করতে জানে।"

* * * *

নাটকটি লিখে নামকরণ নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছেন মরিস্ মেটারলিঙ্ক। অনেক নামই মনে আসছে, কিন্তু নাটকে উপাখ্যানের সঙ্গে ঠিক নাম মেলাতে পারছেন না তিনি। অনেক রাত্রে দুরন্ত শীতে রাস্তা চলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দরজা ওভারকোট ধরে কে যেন টানলে

চমকে উঠে ফিরে দেখেন একটি তরুণী, শীতে কাঁপছে, বোধ হয় কোন নাইট ক্লাব থেকে সবে ফিরছে।

—তোমার কি খুব শীত করছে?—মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলেন মেটারলিঙ্ক।

—হাঁ মহাশয়, বাইরে যে এত শীত তা' আমি ভাবতেই পারিনি।

—তবে নিঃসঙ্কোচে এসো আমার ওভারকোটের মধ্যে, এ কোটটা যথেষ্ট বড়। চল তোমার গন্তব্য স্থানে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার নামটি কি সুন্দরী?

চোখের নীল তারা নাচিয়ে তরুণী একটু হাসল। তারপর বল্লে—আসল নাম আমি নিজেই ভুলে গেছি। তবে লোকে আমাকে বলে "ব্লু বার্ড"।

মেটারলিঙ্কের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এতক্ষণে নাটকের নাম পেলেন তিনি।

এতটুকু আশা

শক্তিপদ রাজগুরু

অন্ধকার থম্‌থম্‌ করছে। বিষ্টুচরণ এসে লাইনের নিচেই দাঁড়াল অনেকদূর থেকেই দেখা যায় লাইনটাকে। সমভূমির উপর দীর্ঘ একটানা একটা সরলরেখার মত ওই উঁচু লাইনটা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে দিগন্তের ওপারে।

কালো উঁচু একটা ধ্বনিকা যেন দৃষ্টিটুকু আচ্ছন্ন করে রাখে। অন্ধকারে কোন দৈত্যের কাঠামের মত লোহার বিমগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারগুলোকে ধরে রেখেছে টানা দিয়ে।

নীচে সমভূমি জমা ক্ষেতের উপর দিয়ে চলে গেছে টেলিগ্রাফ লাইনটা। অনেকগুলো তারে বাতাস বেজে একটানা কেমন ঝিম ঝিম্‌ শব্দ ওঠে, যেন কোন ভাষার সংকেত চলেছে ওরই বুক দিয়ে।

তারই স্পন্দনে কাঁপে ওরা, ওই লোহার থামগুলোয় ছেলেবেলায় কান দিয়ে শুনতো বিষ্টুচরণ, একটানা শব্দ ওঠে।

পায়ে-চলা পথটা এসে লাইনের ধারে থেমে গেছে, নীচে আলপথেওড়া জলকচুর জঙ্গল, দু'একটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে ওদের হলুদ গোলগোল নরম ফুলগুলো ফুটে আছে। একটা মিষ্টি সৌরভ উঠছে বাতাসে।

বিষ্টুচরণ কতদিন এখানে এসেছে, জীবনের শৈশব কৈশোর যৌবনের কতদিন কত সন্ধ্যা কেটেছে এই লাইনের ধারে—ওপারের দিগন্ত প্রসারী মাঠে।

খালের ধারে ফুটতো কাশফুলগুলো। এদিক থেকে ওদিক অবধি তাদের সাদা ফুলগুলো বাতাসে মাথা নাড়তো—মেঘ জমা আকাশের নীচে।

তারের উপর কিঙেপাখীগুলো দোল খেত। একটি কিশোর বিস্মিত চাহনি মেলে সেদিন অতীতে দেখেছে এই দিগন্তকে, আলোভরা সুন্দর পৃথিবীকে।

পাখিডাকা আনন্দ উছল একটি জগৎ-মুগ্ধ বিস্ময়ে একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর উঠেছিল। দুএকখানা ট্রেন তখন বাঁশীর শব্দে এই নিস্তব্ধ দিগন্ত কাঁপিয়ে নীল আকাশে ধোঁয়ার কালো দাগে ভরে তুলে কোনদিকে হারিয়ে গেল।

সেই অতীতের একটি বিস্মিত মুহূর্তকে আজও যেন ভোলেনি ভাঙর বিষ্টুচরণ। দীর্ঘ কত বৎসর পার হয়ে গেছে।

আজ দিনগুলোর বুক থেকে সেই আলোটুকু মুছে গেছে। রাতের অন্ধকার শুধু রাতেই নয়, দিনের সব আলোটুকুকেও যেন গ্রাস করেছে।

পথটা আগাছায় ঢেকে গেছে।

এখন আর এপথে কেউ বড় একটা যায় না। ওপাশ দিয়ে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। লাইনের নীচে দিয়ে চলে গেছে। এই লাইনের পথটা তাই হারিয়ে গেছে মুছে গেছে এর গা থেকে অতীতের কত পদচিহ্ন।

এমনি করে অনেক কিছু হারিয়ে যায়, নিঃশেষে মুছে যায় জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে।

এইখানেই কতদিন বেড়াতে এসেছিল সেদিনের তরুণ বিষ্টুচরণ। খাতী আর সে।

কলেজ থেকে ফিরতো বিষ্টুচরণ। ট্রেনটা নেমে সংঘের ভিতরকার পথটা দিয়ে যেতো না, লাইনের উপর দিয়েই আসতো।

উঁচু একটা বাঁধ। সেখান থেকে সারা পৃথিবীকে অনেক আপন করে দেখা যেতো। নীল আকাশের বুকে ভেসে যেতো সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো। দূরে কোন নারকেল গাছ ঘেরা গ্রামখানার ওদিকে। পড়ন্ত সূর্যের কোন আলোয় সাদা মেঘ জাফরাণী রংএ ভরে উঠতো। পাখীগুলো কলরব করতো গাছের ডালে।

তুমি!

খাতীও যেন এই সময় আসতো। ওর ফেরার সময়।

বাড়ীর কাজকর্ম সেরে নিতো আগে থেকেই, বাবার ফেরার দেরী আছে। খাতী ছোট্ট বাড়ীটা থেকে বের হয়ে উঠে আসতো। ওদিককার মাঠ পার হয়ে এই লাইনের ধারে একটু খোলামেলায়।

জলার বুকে কচুরীপানার বেগুনী রং-এর ফুলগুলো ফুটে থাকতো। দু'একটা বক্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনি নিস্তব্ধ পরিবেশে একটি আলোকোজ্জ্বল বিকালে ওরা দুজনে অপেক্ষা করতো দুজনের জন্যে।

খাতীর চোখে পড়েছে দিনের ওই শেষ আলোর মিষ্টি আভাস। খাতী বলে উঠতো:

এত দেরী যে? বাঁধের উপর বসে পড়েছে বিষ্টুচরণ। দুচোখে আজ হাসির আভা।

বলে ওঠে বিষ্টু।

শাশ করে যা খুঁজছিলাম তাই পেয়ে গেছি!

খাতী কেরানীর মেয়ে। বাবার ব্যথা জ্ঞান কি তা ভাল করেই জানে। ঝড় জলবৃষ্টি হোক গাড়ী ঘোড়া বন্ধ থাকুক তবু বাবার অফিস যেতেই হবে। চাকরীই ওদের ধ্যান জ্ঞান।

একদিন কোনমতে সেই তীর্থে যেতে না পারলে ওরা মনে করে দিনটাই বৃথা গেল, কি যেন মস্তবড় অপরাধ করেছে সে।

ওই নিয়েই জীবনের সব ব্যর্থতার দুঃখ ভুলে আছে তারা। তবু খাতীও সুখী হয়। বলে ওঠে:

কি পেলে? চাকরী?

হাসে বিষ্টুচরণ। মাথা নাড়ে। আজ আনন্দউচ্ছ্বাস কণ্ঠে বলে ওঠে সে:

মাইনে বেহাৎ মন্দ নয়। তবে ভবিষ্যতে কর্তারা খুশী হলে ভালো গ্রেড মিলবে।

খাতী ওর কথাগুলো শুনছে। ওই একটি মাত্র জিনিষের উপর যেন তাদের সব ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেক আশা কল্পনা তার।

মনে মনে একটা রঙীন মুহূর্তকে আজ দেখতে পায় সে। বলে ওঠে, সত্যি।

আজ বিষ্টুচরণ খুশির আবেগে ওর হাতখানা টেনে নেয়। খাতী ওর নরম উষ্ণ স্পর্শে চমকে ওঠে। সারাদেহের অন্তরীতে সাড়া জাগে, বিচিত্র একটি সাড়া।

সারাদিন নীরস মানুষ আর খরদুপুরের তবে ওঠে। বিষ্টুচরণের মনে আজ পূর্ণতার সুর। ঘর বাঁধার স্বপ্ন। এতদিন ধরে তাদের এই পরিচয় আজ পরিণামে পরিণত হবে।

ছোট্ট একটি ঘর গড়বে তারা, গড়বে একটি স্বপ্ননীড়।

দিনান্ত পরিশ্রম করে ফিরবে এখানে, একটি মধুর মনের সাহচর্যে তার সব ক্লান্তি দূর হবে। বাঁচার আশ্বাস পাবে।

তারা দুজনে তাই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

খাতী।

অন্ধকারে ওই লাইনের উপর উঠতে গিয়ে কেমন যেন পা জড়িয়ে যায়, পিছল পথ।

ঘাসগুলো অবধি আজ কাঁটার মত শক্ত হয়ে পায়ে বেঁধে। সেদিনের মসৃণ পথ আজ হারিয়ে গেছে। দুপাশে গজিয়েছে কাঁটানটের গাছ, সর্বাঙ্গে ওদের কাঁটা।

বোবলুর পায়েই বিঁধেছে।

ক্লান্ত বিষ্টুচরণ তবু কাঁটাগুলোকে পা-হাতগা থেকে মুক্ত করে লাইনের উপরে উঠবার চেষ্টা করে।

অনেকখানি পথ কেমন স্বপ্নের ঘোরে পার হয়ে এসেছে সে একদমে। এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে লাইনে ওঠবার আগে।

পথটা হারিয়ে গেছে ও উঁচুতে ওঠার। সব পথের চিহ্ন ঢেকে গেছে কাদায় পথ হারিয়ে এই আশার জঙ্গলে তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিষ্টুচরণ। ভাবছিল অতীতের দিনগুলো। মনটা কখন তাবিয়ে ওঠে।

কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে।

মন থেকে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সে উপরে ওঠবার চেষ্টা করে। মনের ভিতর বীরত্ব সেই আলাটা আবার ঠেলে ওঠে।

তার সবকিছু আজ হারিয়ে গেছে। বদলেগেছে সব মানুষগুলো।

দিনই বদলে গেছে, নাহলে খাতীই বা কেন ওইসব কথা বলবে।

অনেক চেষ্টা করেছে বিষ্টুচরণ।

কিন্তু তবুও আগেকার সেই স্বাচ্ছন্দ্য আর স্ফূর্তির কোন স্বাদই আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

তারা দুজনে নীড় বেঁধেছিল, খাতী আর সে।

তাদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। ছোট বাড়ী একটা ভাড়া নিয়েছিল। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর ফিরতো বিষ্টুচরণ। ওই পরিবেশে এসে সে আবার নিজেকে ফিরে পেতো। অফিসের খাটুনি ক্রমশঃ বাড়ছে। কর্তৃপক্ষের মেজাজও বদলে গেছে। কাজ চাই, আরও কাজ চাই।

সেই কাজের পাল্লার সঙ্গে যোগাতে গিয়ে মনে হয় ফুরিয়ে যাবে বিষ্টুচরণ। দুজনের কাজই করতে হচ্ছে তবু মাইনে যা পায় তাতে তাদের আনতে বাঁধে ফুলোয় না।

সংসারের জীব সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে।

একটি নবাগতের আগমনে তারা দুজনেই খুশী হয়েছিল। তবু তাদের সুখঘর পূর্ণ হয়ে উঠবে ওই কলকণ্ঠের কলরব কাকলিতে।

ক্রমশঃ একটির পর আর একটি, তারপরও আবার, ক্রমশঃ তাদের ঘর ভরে উঠেছে মা ষষ্ঠীর প্রসাদে, মা লক্ষ্মী যেন ততই বিমুখ হয়ে সরে গেছে।

স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেই শান্ত মাধুর্যভরা অল্পবিলাসী নারী আজ কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। ওর কথায় আজ ফুটে ওঠে তীব্র গরল জ্বালা। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ হতাশা আর অভাবের জ্বালা তার মনের সব স্নিগ্ধতাটুকুকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে।

বাড়ী ফেরার পথে ক্লান্ত বিষ্টুচরণ বাইরে দাঁড়িয়েছে। কানে আসে স্ত্রীর সেই ঝনঝনে ফ্রায়ফোনের মত কর্কশ গলাটা।

মর মর, সবগুলো মাড়মাস জুড়োও। সব খেলি তোরা তবু, তোদের পেট ভরেনা। অজগর পেট।

ছোট ছোট দুটো ছেলে চারটি মুড়িকে কেন্দ্র করে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়েছে। বিষ্টুচরণ অপরাধীর মত ঢুকলো।

নিজেকে অপরাধীই মনে হয়। যাদের এসংসারে এনেছে তাদের ভরপেট খেতে দিতে পারেনা, পড়বার মত ব্যবস্থাও করতে পারেনি। অবহেলায় আর বিতৃষ্ণায় মাঝে কোন মনুষ্যেতর জীবের মত তারা মানুষ হচ্ছে।

কিন্তু তার সাধ্য কতটুকু।

দিনান্ত পরিশ্রম করে, তারপর বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারপয়সার ছোলা নাহয় একটু ছাতু মেখে রাস্তার কলের জলে খালিপেট ভরিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্যানিং ষ্ট্রীটের একটা দোকানে তাদের খাতা লিখতে বসে।

অঙ্কগুলোর দিকে মাঝে মাঝে চায়।

হাজার ছাড়িয়ে তারা উপরের দিকে উঠেছে। লাভ লোকসানের ব্যালেন্স সীট তৈরী করতে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জীবনের জমাখরচের কথা মনে পড়ে।

কেরাণী বিষ্টুচরণের সবই সেখানে শূন্য; জমার ঘরে কেবল শূন্যই পড়ে আছে, কোনদিকে কোন একটুও আবাদ নেই। নিঃস্ব ব্যর্থ একটি মানুষ।

এতদিন কথাগুলো ভাবেনি। অতীতের সেই প্রাচুর্য আর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যে শান্তি জড়িয়েছিল ভেবেছিল সেটাই তাদের দিনগুলো ভরে থাকবে। কিন্তু দিন যে এমনি করে আমূল বদলে যাবে তা ভাবেনি। সব হিসেব তার ভুল হয়ে গেছে।

আজ মনে হয় তারা ভুল করে যেখানে ঘর বেঁধেছে সেটা সত্যি মাটি নয় চোরাবালি। অতল স্রোতের আবর্তে তাই তাদের ঘর নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছে; সবকিছু ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মত।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটা কোনরকমে ঝুঁকতে ঝুঁকতে হেঁটে আসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে, ট্রামে উঠলেই বেশকিছু পয়সা বের হয়ে যাবে। কোন কোন দিন ওঠে ট্রামে।

উঠেই প্রথমে দেখে নেয় কন্ডাক্টার কোনখানে আছে। তার কাছাকাছি আসার পর্যন্ত যতটুকু পথ পারে ট্রামেই আসে, তারপরই ধরা পড়বার আগেই নেমে পড়ে। সেদিন তাড়াহুড়োয় নামতে গিয়ে বিষ্টুচরণ একটা লরির নীচেই পড়েছিল আর কি!

ড্রাইভারটা ব্রেক কষে কুৎসিত একটা খিস্তী করে বের হয়ে গেল।

বিষ্টুচরণ একটু চমকে গেছে, সামনে দিয়ে কালো একটা ঝড়ের মত মৃত্যু যেন বয় হয়ে গেল। মাত্র ছপয়সা—তার জীবনের আধুটুকুকে মাত্র ছপয়সার বিনিময়ে সে বিকিয়ে দিয়েছিল।

ট্রামভাড়ার এই ছপয়সা দিয়ে ছোট ছেলেটার জন্য একটু বালি কিনে এনে ঢুকছিল বাড়ীতে।

নিজেরই হাসি পেয়েছিল। সম্রাট বাবরের গল্প মনে পড়ে।

তিনি নাকি পুত্র হুমায়ুনের ব্যাধি নিজের জীবনে নিয়েছিলেন, বিনিময়ে নিয়েছিলেন তাহাতের বিনিময়ে হুমায়ুনকে তাঁর নিজের পরমায়ু।

আর বিষ্টুচরণ কেরানী নিজের আদু বয়স ছপয়সার জন্য হারাতে হারাতে রয়ে গেছে। সেই প্রাণের চেয়ে দামী ছপয়সা দিয়ে তার বংশধরের জন্য কিনে এনেছে একটুকু বাঁশি।

এ নিয়ে কোন ইতিহাস কোনকালেই রচিত হবেনা।

এতদুঃখেও হাসি এসেছিল সেদিন।

আজ বাড়ী ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

আধনেংটো দুটো ছেলে চাট্টি মুড়িকে কেন্দ্র করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে, মাতার কঙ্কালসার জীর্ণ করধৃত দেহটা আরও অন্ধকারে ছুটে ওঠে।

মুখ চোখ তার যেন পেত্নীর মত হয়ে উঠেছে। কর্কশস্বরে চীৎকার করছে—তবু মরিসনা তোরা? না খেয়েও বাঁচবি—বাঁচতে চাস কোন সুখে? আমারও মরণ হয়না!

বিষ্টুচরণ থমকে দাঁড়াল। বিজলী আলো নেই তার ঘরে, আলেই ইলেকট্রিক কোম্পানী বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে। একটা টেমি জ্বলছে ওঘরে। মেঝেতে ইতিমধ্যে দুএকটা ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘোমহর ঘুমিয়ে পড়েছে।

—এনেছো কিছু? না শুধু হাত নেড়েই ঘর ঢুকেছো?

মাতার ভিন্ন দিয়ে যেন গরল বের হচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্টুচরণ। আজ কাল থেকে রেশন আসেনি। ঘরেও কিছু নেই।

আজ বিষ্টুচরণ না খেয়েই আপিসে গেছে। সারা শরীর টানছে পা দুটো বার বার কেঁপেছে, পথ চলতে বার বার অনুভব করেছে পেটের ভিতর সেই জ্বালাটা। অন্যের পানে চেয়ে দেখেছে ওরা কেমন খেয়েদেয়ে পান চিবুতে চিবুতে চলেছে।

আপিসে গিয়েই দুএকজনের কাছে চেষ্টা করেছে যদি কিছু পাওয়া যায়। সুশীলবাবু বেশ শাঁসালো লোক। টিফিন করেন দুটো কাটলেট আর মর্তমানকলা দিয়ে, খবরদার ক্যাপষ্টন খান। তার ওই টিফিনের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিষ্টুচরণ। বলে ওঠে, সোটা পাঁচেক টাকা যদি দিতেন?

বিষ্টুচরণের ক্ষুধাতুর ছেলেমেয়েদের মুখমনে পড়ে। সুশীলবাবু কাটলেটে কামড় দিয়ে বলে ওঠে,

—টাকা, পাঁচটাকা! 'নাইবার এ ঘরোয়ার নয় এ দেওয়ার দি' কার কথা জানো তারা? মহাকবি সেক্সপীয়ারের কথা। টাকা দিতেও নেই নিতেও নেই।

দোকানের মালিকের কাছেও চেয়েছিল, বিষ্টুচরণ। যদি সোটাদশেক টাকা ধেন?

বাকী কথাটা বলতে পারেনি। বলতে পারেনি যে তার ছেলেমেয়েরা অনাহারে রয়েছে। ওই টাকা পেলে তবে একটু কিছু পেটে পড়বে তাদের।

কিন্তু মালিক শান্তারাম বাবু বেশ ঝোলায়েম করেই বলে:

রূপেয়াতো মাইনার পেয়ে ঠিক ঠিক মেলে বাবুজী, বিচ্‌রে দেবেকা কাহুন নেই হ্যায়! উ বাত মৎ বোলিয়ে!

কথা শেষ করে আবার মোটের তাড়া গুণতে থাকে শান্তারামজী।

বিষ্টুচরণ কোথাও দশটা কেন একটা টাকাও পায়নি। ঘরেও কিছু নেই যার বিনিময়ে কিছু সংগ্রহ করতে পারে। সামনে শুধু উদ্বাসের কালোহাঁয়াটা ঘনতর হয়ে তার দিকে যেন আকাশ-জোড়া মুখ মেলে করে ধেয়ে আসছে।

স্ত্রী কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে :

—চুপ করে সং-এর মত দাঁড়িয়ে থাকলে যে? এনেছো কিছু?

অসহায় কণ্ঠে বিষ্টুচরণ জবাব দেয়—না। পেলাম না।

—লজ্জা করেনা? দুদিন ঘরে উপোস দিয়ে আছে ছেলেরা? কি হবে?

স্ত্রীর চোখের কোটর থেকে একটা অঙ্গার আগুন বের হয়ে আসে। জ্বলে পুড়ে উঠেছে বিষ্টুচরণ। সেই জমাট অন্ধকার থেকে একটা কালো দৈত্য আকাশজোড়া মুখ মেলে করে তেড়ে আসে। সেও আজ যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। বলে ওঠে :

মরবে! ওরা সবাই মরবে। মরুক।

স্ত্রী বলে ওঠে :

—আর বেঁচে থাকবে একা তুমি—না? নিজে মরলেই পারো।

স্তব্ধ হয়ে গেছে বিষ্টুচরণ। কথাটা হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে।...এ জগতে তার আর করার কিছুই নেই, সব আশা আলো তার নিভে গেছে।

সব মন থেকে তার অন্ত এতটুকু ভালবাসার স্পর্শও মুছে গেছে। মানুষ কি সঞ্চয় নিয়ে বাঁচতে পারে জানেনা।

কাঁটার জঙ্গল ছাড়িয়ে উঠে এসেছে বিষ্টুচরণ লাইনের উপর। এখানটা একটু ফাঁকা। এই উঁচুতে উঠে এর আগেও অনেকবার এর চারিপাশ ওই দূর দিগন্তসীমা দেখেছিল।

এখন সব কেমন অন্ধকারে ডুবে গেছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। রাত্রির গভীরে ওরা ঘুমের অতলে হারিয়ে গেছে। সকলের অগোচরে এসেছে আজ বিষ্টুচরণ এইখানে।

সবকিছু সে শেষ করে যাবে; যেখানে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল সেইখানে এসেছে আজ জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে। দুরন্তাভাব ধিক্কার দিয়ে যাবে আজ এই পৃথিবীকে। কি নিদারুণ পরাজয় আর অভিমান নিয়ে সে হারিয়ে যাবে।

এভাবে বাঁচার কোন অর্থই নেই। সব ভালবাসা আশ্বাস আশা হারিয়ে গেছে দিকজোড়া অন্ধকারে।

লাইন ধরে হঠাৎ একটা শব্দ ওঠে; দূর দিগন্তে ট্রেণখানা দেখা দেয়। ওর হেডলাইটের আলোটা এগিয়ে আসছে। সুপ্ত মাটির অতল থেকে ওরং ওরং শব্দ ওঠে—ওই শব্দটা নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে বিষ্টুচরণের বুকে সাড়া তোলে।

তৈরীহয় সে।

কাল রাত্রে হারিয়ে যাবে একটি মানুষ—কেরাণী বিষ্টুচরণ। কাল কাগজে হয়তো উঠবে—অফিসের চেয়ারটায় কাল কেউ বসবেনা। আলোচনা করবে তারা। কাটলেট বিলাসী সুশীলবাবুর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে শান্তারামজীর কথা। ওরা আনন্দেই থাকুক।

খাতী !

একদিন এইখানেই তারা দুজনে দুজনকে পাবার স্বপ্ন দেখেছিল—এইখানেই বিষ্টুচরণের প্রাণহীন দেহটা পড়ে থাকবে। বিকৃত একটা মাংসপিণ্ড। চোখের সামনে তিলে তিলে প্রতিদিন এই অবস্থায় অপমৃত্যুকে প্রত্যহ করার চেয়ে একটি মুহূর্তের অসহ্য যন্ত্রণায় সে সবকিছু দেনা চুকিয়ে দিয়ে যাবে।

কালো আঁধার ফুঁড়ে সেই যন্ত্রণাদায়ক আসছে, আকাশ বাতাস মৃত্তিকায় সাড়া জেগেছে। চোখ বুজে ফেলেছে বিষ্টুচরণ।

চোখ ধাঁধানো আলোয় চাওয়া যায় না, ওর প্রচণ্ড গতিবেগের সামনেই লাফিয়ে পড়বে সে ; ধাতব পদার্থের কঠিন নিষ্পেষণে এই সামান্য দেহটা বিকৃত হয়ে যাবে।

একটা তীব্র আলোর ঝলক তার চোখ ঝলসে দেয় একটি মুহূর্তে! সর্বশক্তি একত্রিত করেছে দুদিনের মুমূর্ষু মানুষটা। পায়ের তলে মাটি কাঁপছে। ওই কঠিন লৌহ দানবের চাপে একবার দাবছে আবার উঠছে মাটিটা।

একটা প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দে বিষ্টুচরণের সব ইন্দ্রিয়গুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ তাকে কোন উধাও আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

একটি অখণ্ড মুহূর্ত। স্তব্ধতা নামে আবার রাত্রির অন্ধকারে। লাইনের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্টুচরণ। চোখের সামনে এক নিমিষের জন্যে এসেছিল মৃত্যুর সান্নিধ্যে কালো আর আলোতরা দুর্বার গতিবেগ আর ধ্বংসের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, তাকে নিষ্ক্রিয় করে নিতে পারেনি সে !

সরে এসেছিল। হ্যাঁ—বেঁচে আছে বিষ্টুচরণ।

মরতে পারেনি। জীবনে আশা হারায়নি —না জীবনকে ভালবাসে বলে এড়িয়ে গেছে মৃত্যুকে, না নিছক কাপুরুষের মতই ভয় পেয়েছিল ঠিক জানেনা।

রাতের হিম হাওয়া তার সারা দেহে একটা প্রশান্তি আনে, দু-একটা তারা জ্বলছে মেঘমুক্ত নীল আকাশে। শুকপাখ ঘরিণী ভালোলাগা একটি রাত্রি।

বিষ্টুচরণ দাঁড়াল, মনেহয় আবার বাঁচবে সে। যেভাবে হোক কিছু টাকা সে পাবেই। এ রাত্রির শেষে আবার দিনের আলো উঠবে, পাখি ডাকবে।

তখনও সে বেঁচে থাকবে। সত্যিই সে বাঁচতে চায়। দুপয়সা নয় দশটাকাও নয় জীবনের মূল্য অনেক—অমূল্য। মানুষ বেরাদ্দি বিষ্টুচরণও তাই এত দুঃখ বেদনার মাঝে বেঁচে আছে।

নব বৎসরে, করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।　　—রবীন্দ্রনাথ

বিচিত্রা

নিত্য নতুন ফ্যাশনের রাণী

নিত্য নতুন ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরে যারা বাজারে নেমেছে, তাদের বলা হয় ম্যানেকুইন। এদের চাহিদা প্রচুর, এদের পারিশ্রমিকও প্রচুর।

কয়েক বছর থেকে বিদেশের বাজারে কীর্তনীয়া, ছেলেদের মত ছিপছিপে অপূর্ব সুন্দরী পশ্চিম জার্মানীর বিকিনি মেয়েদের চাহিদা বেড়ে গেছে। ফ্রান্স, ইটালী, ইউনাইটেড স্টেটস্ থেকে পোশাক ব্যবসায়ীরা এইসব ম্যানেকুইনদের খোঁজে আসে পশ্চিম জার্মানীতে। এক্ষেত্রে মিউনিখের মেয়েদেরই সুখ্যাতি বেশি।

ম্যানেকুইন হয়ে দু'হাতে পয়সা রোজগার করতে হলে শুধু রেখাঙ্কিত দেহ ও পটলচেরা চোখ থাকলেই চলবেনা, আদবকায়দায় রপ্ত হওয়া চাই, ক্যামেরার সামনে সপ্রতিভ হওয়া চাই, লোকের সামনে বুক ফুলে হাঁটবার সাহস থাকা চাই। এইসব সুন্দরী তরুণীদের জন্যে মিউনিখে একটি পুরোদস্তুর এজেন্সি আছে। এখানে বয়স, মাপ, চোখ ও চুলের রঙ, বিশেষ জ্ঞান (যেমন ভাষা) ইত্যাদি অনুযায়ী ৮০০ পশারার ম্যানেকুইন রেজিস্টার্ড করা রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের কার্ডের সঙ্গে ফোটো আছে। বিদেশ থেকে যারা ম্যানেকুইন খুঁজতে আসে, তারা এই এজেন্সিতে এসে অনেক সময় মনের মত মডেল খুঁজে পায়। অনেকে আবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের চোখে দেখে শুনে মডেল পছন্দ করে নেয়।

এই এজেন্সিতে যারা নাম লেখায়, তাদের পেশা সম্বন্ধে সবরকম শিক্ষা দেওয়া হয় ও ভদ্রকাজের জন্যে পাঠানো হয়। এসব মেয়েদের কোনরকম বদনাম রটলে, সময়মত কাজে হাজিরা না দিলে, কাজে কুঁড়েমি করলে বা কাজের আইন ভাঙলে এজেন্সি থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়। এসব মেয়েরা যদি ঠিকানা বদলায়, চুলের রঙ পালটায়, টেলিফোন বদলায় কিম্বা সামান্য রোগা মোটা হয় তো সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সিকে জানাতে হয় যাতে তাদের কার্ডে সে সব সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা যায়।

মিউনিখের এই ৮০০ সুন্দরীরা সবাই সুশিক্ষিতা ও পেশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞা। বেশিরভাগ মেয়েদের ঘরসংসার দেখতে হয়; এরা মাসে তিনচার দিন মডেলের কাজে যায়। যেদিন তারা কাজে যায় সেদিন তারা ২৫০ মার্ক পারিশ্রমিক পায়। প্রত্যেক দিন খুব কম মেয়েই কাজে যায়। ম্যানেকুইনের কাজে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদেরই চাহিদা বেশি তবে ৫০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদেরও অনেক সময় দরকার পড়ে।

শীতের ফ্যাশন প্যারেড !!

"আন্তর্জাতিক বেদিন ফ্যাশন প্রদর্শনী" সম্প্রতি মহিলাদের "সাজ-সজ্জার দিকদর্শক। এরই ষষ্ঠতম প্রদর্শনী বেদিনে হয়ে গেল। এতে মোট ১০০ পোশাকশিল্পী যোগ দিয়েছিলেন যার মধ্যে ১৩০ জন বিদেশী। য়ুরোপ ও বিদেশ থেকে হাজারে হাজারে ক্রেতাও এসেছিলেন এই প্রদর্শনীতে।

সামনের শীতের পোষাকে নতুন কোন স্টাইল দেখা না গেলেও নানারকম কারিকুরির সমাবেশ দেখবার মত। কত ডিজাইন, কত বাহারী নক্সা! মহিলাদের প্রত্যেকটি কোটেকাবের ওড়াছড়ি—লাইনিংয়ে, কলারে, কব্জিতে, কিনারায়।

দেখা গেল মহিলাদের দুপুরে ও সাঁঝে পরার পোষাকের দিকে ডিজাইনারদের নজর খুব বেশি পড়েছে। শীতকালের প্রিয় কালো, গোলাপী, সাদা ও হাল্কা নানা রঙের সঙ্গে এবছর যোগ হয়েছে বাহারী রঙ। ভারি এমব্রয়ডারি করা পোষাক এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তার জায়গায় চল হয়েছে লেস, শিফন ও ব্রোকেডের।

মহিলাদের সান্ধ্য কোট খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। এতকাল নাচে, অপেরায় কিম্বা সান্ধ্যভোজে মহিলারা 'ছোট কালো' কোট' পরতেন কিন্তু এখন সুন্দর সিল্ক, ব্রোকেড, সিটরেন্স, ভেলভেট ও লেস দেওয়া হাঁটু কিম্বা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোষাক প্রায় আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এসব সান্ধ্যপোষাকের কারুকার্যও নানারকমের ও দেখার মত।

মধ্য য়ুরোপের ঠাণ্ডা কনকনে শীতে একটা কোট একান্ত দরকার। বেলিনের ডিজাইনাররা তাই এদিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন। সস্তা, দামী নানারকমের হাজার হাজার কোট এবারের প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন প্রদর্শনীতে বিক্রির কাটতি দেখে বেলিনের মহিলা পোষাকশিল্প খুবই সন্তুষ্ট। গত বসন্তের প্রদর্শনীর চেয়ে এবারে অনেক বেশি অর্ডার পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে এই চাহিদা যে আরও বেশি হবে সে বিষয়ে পশ্চিম জার্মানীর পোষাকশিল্প খুবই আশাবিত।

রূপের সঙ্গে শালীনতাও থাকবে

অশোভন বেশবাস করে ফানিভালে গিয়ে ছবি তোলার জন্যে পশ্চিম জার্মানীর মেন্জ শহরের টেলিভিশন স্টেশনের ঘোষিকা এডেলগার্ড হোইজেল চাকরি খোয়াল কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এডেলগার্ডের সেই ছবি তার ভক্তদের আনন্দ দিলেও অফিসের কর্তাদের পছন্দ হলনা। এডেলগার্ড এখন ছায়াছবিতে অভিনয় করার তালিম নিচ্ছে।

এদিকে এডেলগার্ডের খালি জায়গায় লোক নেবার জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ঘোষিকার কি কি গুণ থাকা দরকার তারও ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। একজন টেলিভিশন ঘোষিকা এমন হবে যার আবেদন সকলের কাছে সমান, চটুল না হলেও চলবে। মুখে একটি মিষ্টি হাসি লেগে থাকবে, একটু নারী সুলভ হবে (তবে বেশি নয়) এবং বেশবাস হবে রুচিসম্মত।

বর্তমানে মেন্জ টেলিভিশন স্টেশন সম্বন্ধে আরও যে তিনজন ঘোষিকা রয়েছে তাদের সকলেরই বয়স কুড়ির মধ্যে। তাদের সম্বন্ধে কোন নালিশ বা বদনাম নেই, তবে দু'চারটে প্রেমপত্র বা বিয়ের প্রস্তাব যে তাদের কাছে আসেনা এমন নয়। ঘোষিকাদের বেতন বেশ ভালোই, যে কোন ভালো অফিসের সেক্রেটারির সমান।

পেশা হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর তরুণীরা টেলিভিশন ঘোষিকার কাজকে খুব আদর্শ মনে করে। কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিলেও টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানগুলি তরুণীদের কাছ থেকে দিনে প্রায়

পঞ্চাশটি চাকরির আবেদন পেয়ে থাকে। এডেলগার্ডের পদে চাকরির জন্যে ইতিমধ্যে প্রায় কুড়ির তিনেক আবেদন এসে পৌঁছেছে।

মেয়েরা সহজে কাজ ছাড়ে না

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা তাদের অফিসের বেশি অনুরক্ত। নতুন কাজে মাইনে বেশি হলেও খুব কম মেয়েই তাদের পুরোনো অফিস ছেড়ে যায়। নতুন অফিসে নতুন পরিবেশে গিয়ে তারা যে কাজ করতে ভয় পায়, তা নয়, তবে একবার যে অফিসে তাদের 'মন পড়ে যায়' সেখানেই তারা থাকতে ভালোবাসে। এর জন্যে স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে।

পশ্চিম জার্মানীতে যে সাড়ে নয়লক্ষ চাকুরে মেয়ে আছে বিয়ের পরও তাদের অর্ধেক চাকরিতে লেগে থাকে। 'পয়সা' রোজগার করা ঠিক তাদের উদ্দেশ্য নয় বরং ঠিকভাবে বলতে হয় যে অফিসের প্রতি মমতাই তাদের চাকরিতে বেঁধে রাখে। দেখা গেছে, অনেক মেয়ে বিয়ের পর বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যায় বটে কিন্তু ছেলেপুলে বড় হয়ে গেলেই আবার তারা তাদের পুরোনো অফিসে ফিরে আসে। অফিসের কর্তাদের কাছেও মেয়ে কর্মচারীদের খুব সুনাম। ছোকরা সহকর্মীদের চেয়ে মেয়েদের দায়িত্বজ্ঞান, কাজ শেখার আগ্রহ ও বিবেচনা অনেক বেশি। তারা মনে প্রাণে অফিসের উন্নতি কামনা করে ও অফিসে তাদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে একটা সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

যদিও অবিবাহিতা মেয়েদের জীবনে প্রধান লক্ষ্য বিবাহ তবুও মনে হয় অফিসে আরও বেশি সংখ্যায় মেয়ে কর্মচারী নিলে অফিসের কাজকর্ম ভালো চলবে। আধুনিক জার্মান মেয়েরা বিয়ে করলেও স্রেফ ঘরণী হয়ে থাকতে চায়না ; তারা রোজগার করে স্বাধীন থাকতে চায়। এক অফিসে চাকরি করতে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে দু'চারজন মেয়ের যে বিয়ে হয় না তা নয়, তবে পুরুষদের পাকড়াও করার জন্যেই যে তারা চাকরি করতে আসে, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

মন দিয়ে কাজকর্ম করলেও কিন্তু অফিসের বড় বড় কাজে মেয়েরা খুব বেশি বহাল হচ্ছে না। মেয়েদের বড় বড় কাজ দিতে মালিকরা ভয় পাচ্ছেন। তাদের মতে মেয়েরা নাকি দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিখতে রাজি নয়। কথাটা খাঁটি নয় কারণ ১৯৬৩ ও ৬৪ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তাতে ৪৩০০০ আবেদনের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৩০০। আজকাল তরুণীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ জন যে কোন একটা পেশা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শেখে যেটা পাঁচবছর আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বলা চলে।

প্রতিভা গুপ্ত

বেশ কিছুদিন হল পোর্টব্লেয়ারে এসেছি কিন্তু এখানকার সব চেয়ে যা দ্রষ্টব্য আশৈশব যার কত গল্প শুনে এসেছি সেই সেলুলার জেলই এখন পর্যন্ত দেখা হল না। আজ দেখব, কাল দেখব করে দিন কেটে যাচ্ছে।

পনেরই আগষ্ট। জিমখানা গ্রাউণ্ডে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। একপাশে সমুদ্র আর তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা এই জিমখানা গ্রাউণ্ড। ছাব্বিশে জানুয়ারী আর পনেরই আগষ্ট জিমখানা গ্রাউণ্ডে যোগদর সমস্ত পোর্টব্লেয়ার ভিড়ে জড়ো হয়।

প্যারেড, চীফ কমিশনারের বক্তৃতা, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মিষ্টি বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আমরা রওনা দিলাম সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে।

জেলের সামনে বিরাট লম্বা একটী কাঠের দোতলা বাড়ী। তার মাঝখানে সেলুলার জেলের ফটক আর দুই পাশের ঘরগুলিতে বর্তমান হাসপাতাল। ব্রিটিশ আমলে এই সব ঘরে জেলের অফিস ছিল।

প্রথমে হাসপাতালের 'চিলড্রেন্স ওয়ার্ডে' চীফ কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী মহেশ্বরী শিশুদের মিষ্টি বিতরণ করলেন, ঘুরে ফিরে আমরা সকলে অসুস্থ শিশুদের সঙ্গে আলাপ করলাম তারপর চললাম কয়েদীদের দেখতে। সেলুলার জেলেরই একটা 'উইংগস্'-এ বর্তমান জেলখানা। পরিষ্কার জামাকাপড় পরে কয়েদীরা সব সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, সকলে মিলে ভজন গেয়ে শোনাল। চীফ কমিশনার মিঃ মহেশ্বরী কয়েদীদেরও মিষ্টি বিতরণ করলেন এবং ছোটখাট একটী বক্তৃতা দিলেন। আমরা মেয়েরা সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি জেলার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম কে কোন অপরাধে অপরাধী। কয়েদীদের মধ্যে খুনী ছিল প্রায় পাঁচ ছয়জন। জেল কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কয়েদীদের ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। রান্নাকরা জিনিষগুলি দেখলাম। পোলাউ, সম্বর (ডাল), তরকারী এবং বোঁদে।

দলের অনেকে চলে গেলে আমরা কয়েকজন জেলখানাটি দেখবার জন্য রয়ে গেলাম। অবাক হয়ে বিরাট অট্টালিকাটি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এক মহল থেকে আর এক মহল। ঠিক যেন মধ্যযুগের এক ইয়োরোপীয় দুর্গ। এই সেল কুখ্যাত সেলুলার জেল, যার প্রত্যেকটী সেলে শুমরে মরেছে কত নিপীড়িত আত্মা।

১৮৭৯ সনে জেনারেল কাডেল (General Cadell) যখন ঠিক করিলেন যে পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন, তখন এই কুখ্যাত সেলুলার জেলের ভিত্তিস্থাপন হয়। বর্মা থেকে ইটের বোঝা জাহাজে করে বয়ে এনে আন্দামানের একমাত্র পাকা ইমারত এই বিরাট জেলখানাটি তৈরী হয়।

তার আগে পর্যন্ত পোর্টব্লেয়ারের বাইরে একটী ছোট দ্বীপ 'ভাইপারে' কয়েদীদের জেলখানা ছিল। সেখানে একটী ফাঁসীর মঞ্চও ছিল। সাংঘাতিক রকমের অন্যন্ত চরিত্রের কয়েদীদের ভাইপারে রাখা হত।

আন্দামানে পেনাল সেটেলমেন্ট খোলবার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত কয়েদীদের সুমাত্রার বেনকুলেনে পাঠান হত। সে সময় সুমাত্রা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। পরে যখন সুমাত্রা হস্তান্তরিত হয়ে ডাচ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চলে যায়, তখন কয়েদীদের সিঙ্গাপুর এবং পেনাঙে পাঠান হত। এ ছাড়া ভারতীয় কয়েদীদের জন্য আরাকান, মালাক্কা ও টেনাসেরিমে দ্বীপান্তরের বন্দোবস্ত ছিল।

বেনকুলেন থেকে কয়েদীদের পেনাঙের সেটেলমেণ্টে যখন পাঠান হল, সুমাত্রার গভর্ণর সার ষ্ট্যামফোর্ড র্যাফ্‌লস্ (Sir Stamford Raffles) পেনাঙের জেল অথরিটিকে লিখে জানালেন তাঁরা কোন পদ্ধতিতে কয়েদী উপনিবেশ চালনা করতেন। যে কয়টী আইন সার ষ্ট্যামফোর্ড চালু করেছিলেন তা হল (১) কয়েদীদের কিছুদিন পর self supportee হতে সাহায্য করত, (২) কয়েদীদের মধ্য থেকেই তাদের দেখাশোনা করার লোক ঠিক করা, (৩) নির্দিষ্ট সময়ের পর কয়েদীদের বিবাহে অনুমতি দেওয়া, এবং (৪) কয়েদীদের দিয়ে পেনাঙ সেটেলমেণ্টে পাকাপাকিভাবে বসতি করা।

সার ষ্ট্যামফোর্ড র্যাফ্‌লস্-এর নিয়মের ওপর ভিত্তি করে পেনাঙে এবং সিঙ্গাপুরে কয়েদী উপনিবেশ খোলা হল।

আরও পরে পেনাঙ এবং সিঙ্গাপুরের কয়েদী উপনিবেশ সরিয়ে এনে যখন আন্দামানে পেনাঙ সেটেলমেণ্ট খোলা হল, তখন সেখানেও সেই আগের নিয়মাবলীই চালু করা হল।

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পর সারা ভারতবর্ষের হাজার হাজার বিদ্রোহীদের নিয়ে ইংরেজদের দারুণ সমস্যা উপস্থিত হল। এই বিদ্রোহীদের নিয়ে আশঙ্কা, যে কোন মুহূর্তে এরা আবার বিদ্রোহ করতে পারে, কাজেই দেশের জেলে রাখা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়; অথচ ষ্টেট সেটেলমেণ্ট এবং মেইনল্যাণ্ডের জেলখানাতেও বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। অগত্যা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নূতন জায়গার সন্ধান আরম্ভ করলেন এবং বিদ্রোহীদের উপযুক্ত জায়গা হিসাবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পছন্দ করলেন।

কয়েদী আসতে লাগল হাজারে হাজারে। সিপাহী বিদ্রোহের আসামী ছাড়া খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি গুরু অপরাধে দণ্ডিত আসামীরা দলে দলে আসতে লাগল।

কয়েদীভর্তি জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে এলে সিনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার এবং সেটেলমেণ্ট অফিসার কয়েদীদের ডাক্তারক করতে যেতেন। কয়েদীদের সঙ্গে প্রত্যেক কয়েদীর অপরাধ ও চরিত্রের বিবরণীসহ একটা তালিকা থাকত। সেই তালিকা দেখে এবং কয়েদীদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের নানাধরণের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হত এবং প্রত্যেক কয়েদীর গলায় কাঠের চাকতিতে নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হত। বিপজ্জনক কয়েদীর নম্বরের সঙ্গে লেখা থাকত 'ডি' অর্থাৎ ডেঞ্জারাস। এ ছাড়া আরও একটী অক্ষর লেখা থাকত হয় 'এ' নয়ত 'আর'। এ হল আটা ইটিং এবং আর হল রাইস ইটিং।

পোর্টব্লেয়ারে আসবার একমাস পরে কয়েদীদের পায়ের বেড়ি খুলে নেওয়া হত। কোন কয়েদীকে প্রথম ছয়মাস সেলুলার জেলের বাইরে যেতে দেওয়া হতনা।

সেন্ট্রাল ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকে সমুদ্র আর পাহাড়ের রূপ দেখে মন ভরে যায়। সাতটি উইংসের-এর মধ্যে এখন মাত্র তিনটি আছে। দুইটি জাপানীরা বোমা ফেলে ভেঙেছে। দুইটি সরকার থেকে ভাঙা হয়েছে এবং সেখানে নূতন হাসপাতাল তৈরী হয়েছে। একটিতে বর্তমান জেলখানা, একটিতে ব্যাচেলার্স মেস এবং একটি অফিসারদের থাকি পড়ে আছে। শেষ পর্যন্ত একটি উইংসস্ রেখে বাকী সব কয়টি ভেঙে হাসপাতালটি অনেক বড় করার পরিকল্পনা আছে।

সেলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। নিস্তব্ধ কুঠুরীগুলির পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় আমাদের জুতোর আওয়াজগুলি বড় বেশী জোরে কানে বাজছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি সেলের ভেতর থেকে কেউ হয়ত বলে উঠবে 'আস্তে, আস্তে, আমাদের বড় কষ্ট, চাবুক মেরে পিঠ কাটিয়ে দিয়েছে, দাঁড়া হাতকড়াতে ঝুলে শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে, আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও।' মনটা অনেক বছর পিছিয়ে গেল। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম কুঠুরীতে কুঠুরীতে কয়েদীরা কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, গালাগালি করছে, গল্প করছে। বারান্দা দিয়ে জমাদার যাবার সময় কাউকে ধমক দিচ্ছে। সজোরে চাবুক মারছে। ওপরে-নীচে চারদিকে খালি সোলমাল আর সোলমাল।

চলতে চলতে একটা সেলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কি ছোট্ট কুঠুরীগুলি, জানলা বলতে ছাদের কাছে একটি ঘুলঘুলি। সেলের দরজায় বিরাট বিরাট তালা লাগানো। তালা লাগাবার ব্যবস্থা ছিল অদ্ভুত। দরজার বাইরে প্রায় একফুট ঘুরে দেয়ালের গায়ে গর্ত করে সেখানে ফুলুপ এঁটে দিত। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কয়েদীদের হাত তালা পর্যন্ত না পৌঁছায়। আসবাবপত্র হিসাবে সাধারণ কয়েদীদের দেওয়া হত দুইখানা কম্বল, কলাইকরা একটি থালা এবং একটি মগ।

সে কালে সাতবছরের বেশী কারাদণ্ড হলেই আন্দামান পাঠিয়ে দিত।

কয়েদী ছিল দুই প্রকারের—'টারম্ কনভিক্ট' এবং 'লাইফ কনভিক্ট'। টারম্ কনভিক্ট হল যাদের নির্দিষ্ট বছরের মেয়াদ এবং লাইফ কনভিক্ট হল যাদের পঁচিশ বছরের বেশী মেয়াদ। লাইফ কনভিক্ট পঁচিশ বছর পরেও অনেক সময় ফিরে যেতে পারতনা।

প্রথম তিন মাস কয়েদীদের নিয়োগ করা হত তেলের ঘানিতে। বলদের বদলে ঘানি টানতে হত মানুষকে। ঘানি টানার পরিশ্রমে কয়েদীরা অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার তাদের জুড়ে দেওয়া হত ঘানিতে। প্রত্যেকের কোটা ছিল দৈনিক পনের সের সরষের তেল। কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেওয়া হতনা।

তিনমাস পর ঘানি থেকে সরিয়ে এনে দেওয়া হত ছোবড়া পিটানোর কাজ। এর নাম ছিল 'হিল্কা'। সারাদিন ধরে নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে কয়েদীদের হাত অসাড় হয়ে যেত এবং হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত।

হিল্কা—প্রত্যেক কয়েদীকে কুড়িটি নারকেলের ছোবড়া দেওয়া হত। একটুকরো কাঠের ওপর ছোবড়া রেখে একটি কাঠের মুগুর দিয়ে পিটাতে হত। পিটিয়ে পিটিয়ে ওপরের শক্ত ছাল তুলে ফেলে তারপর আবার জল দিয়ে পিটিয়ে নরম করে ভুষিগুলি বারিয়ে ফেলে ভেতরের তারগুলি বার করতে হত। এই তার রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে দৈনিক একসেরের একটি গোছা প্রস্তুত হত।

ছয়মাস পর প্রথম কয়েদীরা সেলুলার জেলের বাইরে আসার সুযোগ পেত। তবে স্বাধীন ভাবে নয় অন্য কয়েদীর কাছে। সেলুলার জেলের বাইরে যে 'এ্যাগ্রিকালচারেল' জেলখানা ছিল সেখানে কয়েদীদের পাঠানো হত। আঠার মাস সেখানে থাকবার পর ছাড়ো, ডিগলিপুর, জংলীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যারাকে পাঠানো হত। রাস্তা তৈরী করা, জঙ্গল কাটা, বাড়ী তৈরী করা, জলা জায়গা পরিষ্কার করা ইত্যাদি নানা কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যাবেলা কয়েদীরা ব্যারাকে ফিরে আসত। রাত্রি বেলা সকলকে তালা আটকে রেখে দিত, এমনকি দিনের বেলাতেও প্রহরীদের চোখের সামনে কাজ করতে হত।

কয়েদী উপনিবেশের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ জেমস্ প্যাটিসন ওয়াকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন কয়েদীদের সঙ্গে। তাঁর সবচেয়ে বেশী রাগ ছিল সিপাহী বিদ্রোহের আসামীদের ওপর। তিনি মনের মধ্যে সর্বক্ষণই একটা অস্বস্তি বোধ করতেন, প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতেন এই বুঝি কয়েদীরা তাঁকে আক্রমণ করল।

এই আতঙ্কের ফলে ডাঃ ওয়াকার নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া প্রবল বর্ষা, অসহ্য মশা, আদিবাসীদের আতঙ্ক, উপযুক্ত সাহায্যের অভাব, দুর্ধর্ষ কয়েদীদের ভয়, ডাঃ ওয়াকার ও তাঁর সহকর্মীদের জীবন বিষময় করে তুলেছিল। সভ্য জগতের সঙ্গে যোগসূত্র কালেভদ্রে মৌলমেন থেকে একটি জাহাজের বেশন নিয়ে আগমন। কাজেই সমস্ত অসুবিধাগুলির জন্যই তিনি দায়ী ভাবতেন সিপাহী বিদ্রোহের আসামীদের এবং গায়ের জ্বালা মিটাতে অসহ্য অত্যাচার করতেন।

উপনিবেশ পত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই অবিচার, অত্যাচার, নানারকম বিশৃঙ্খল বন্দোবস্ত, রোগপীড়া, ম্যালেরিয়া, অপুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে আন্দামান যেন একটা অভিশপ্ত দ্বীপে পরিণত হ'ল।

পরিত্রাণ পাবার আশায় কয়েদীরা পালাবার সুযোগ খুঁজেছে বরাবর। আঠারশ সাতান্ন সনে কয়েদী উপনিবেশের পত্তন থেকে শুরু করে কয়েদী উপনিবেশের শেষ পর্যন্ত কয়েদীরা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু পালাতে পারেনি কেউই। হয় সমুদ্রে ডুবে মরেছে, নয়ত আদিবাসীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। আর যারা ধরা পড়েছে তাদের হয়েছে প্রাণদণ্ড।

জলপথে ডিঙ্গি করে রাত্রিবেলা কয়েদী পালাবে প্রথমেই যে দ্বীপ থেকে পালিয়েছে সেই দ্বীপে একটি নীল আলো জ্বলে উঠত তাই দেখে যাতে কারুর অন্য দ্বীপগুলিতেও নীল আলো জ্বালিয়ে দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করে সহরশুদ্ধ লোককে জানিয়ে দেওয়া হত 'ভাগোড়া' কয়েদীর কথা। তারপরই বেরিয়ে পড়ত সশস্ত্র বাহিনী শুদ্ধ দুইটি মোটর লঞ্চ একটি উত্তরে একটি দক্ষিণে। পনের দিনের মধ্যে ভাগোড়া কয়েদী ধরা না পড়লে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহরে এমনকি বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরের বন্দরে বন্দরে কয়েদীদের নাম ধাম ও চেহারার প্রতিকৃতি শুদ্ধ হুলিয়া বার করতে অনুরোধ জানাতেন।

নানারকম রোগে, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ায় কয়েদীরা খুব বেশী রকম মারা যাচ্ছিল। চিকিৎসার সন্তোষজনক কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এত কয়েদী মারা যাবার কি কারণ জানবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কমাণ্ডার ইন চীফ লার্ড রবার্ট নেপিয়ারকে ১৮৬৩ সনে আন্দামানে পাঠালেন। রবার্ট নেপিয়ার সব দেখেশুনে গভর্ণমেণ্টকে জানালেন পোর্ট ব্লেয়ারের কনভিক্ট সেটলমেণ্টের তিন হাজার

কয়েদীর জন্য উপযুক্ত বাড়ী ঘরের একান্ত অভাব কাজেই পূর্তবিভাগের অধিনায়ক কিছু মিস্ত্রী মজুর নিয়ে সেখানে যাওয়া প্রয়োজন, চিকিৎসার জন্য ভাল হাসপাতালের প্রয়োজন। এ ছাড়া কয়েদীদের ভাল জামাকাপড় ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, এই সব অভাবগুলি পূরণ হলে মৃত্যুর হার অনেক কমে যাবে।

১৮৬৪ সনে আন্দামানের শাসন কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হল ব্রিটিশ চীফ কমিশনারের হাতে। এই সময় পোর্ট ব্লেয়ারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন কর্ণেল ফোর্ড। বছর তিন পরে বর্মার চীফ কমিশনারের সেক্রেটারী মেজর মেলসন আন্দামানের সেটলমেণ্ট পরিদর্শন করতে এলেন। ফিরে গিয়ে মেজর মেলসন যে রিপোর্ট পেশ করলেন তাতে তিনি প্রতি পদে জেল কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করলেন এবং নয় বছরের পুরাণ সেটলমেণ্ট যে বিন্দুমাত্রও উন্নতি লাভ করেনি তাঁর রিপোর্টে সেইটাই প্রমাণিত হল।

১৮৬৬ সনে ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সি. জে. লায়াল এবং ইনস্পেক্টার-জেনারেল-অফ-পুলিশ এ. এস. লেথব্রিজ আন্দামানে এলেন জেল তদারকের কাজে। এরা দুইজন আন্দামানে এসে জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বললেন, কয়েদীরা ভারতবর্ষের বন্দীশালা থেকে আন্দামান বেশী পছন্দ করে। কয়েদীরাও মুক্তি পেয়েও যাতে দ্বীপে পাশাপাশি ভাবে বসত করে সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

মাঝে মাঝে ইংরেজ পরিদর্শকরা এসে সেলুলার জেলের বিধি ব্যবস্থা দেখে যেতে লাগলেন এবং ফিরে গিয়ে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

সেলুলার জেলে ঘুরতে ঘুরতে অন্য একটি উইংসস্-এ গেলাম। তিন তলায়। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কোণের দিকে একটি কুঠুরীর সামনে দাঁড়ালাম। দরজার ওপর লেখা রয়েছে—এই সেলে বীর বিনায়ক সাভারকর আবদ্ধ ছিলেন। সেলের ভিতর সাভারকরের একটি ফটোও দেখলাম।

এই মহলে সাভারকর একেবারে একা থাকতেন। কথা বলার জন্য বারে কাছে কোন সেলে কয়েদী রাখা হতনা। এটা ছিল সাভারকরের শাস্তি—'সলিটারী কনফাইনমেণ্ট'। পাশের উইংসস্-এ বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎরাম এবং আরও অনেকে থাকতেন।

সবাই যে নরহত্যা, লুণ্ঠন, জালিয়াতি প্রভৃতি সমাজ বিরোধী কাজের জন্য দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হত তা নয়। কোন কারণে বিদেশী শাসকদের বিষ নজরে পড়লেই প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিনতর শাস্তি ছিল কালাপানির পারে নির্বাসন। ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে মাতৃভূমির দাসত্ব মুক্ষল মোচনের জন্য যে সব বিপ্লবীরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ সরকার তাঁদের বন্দী করে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নির্বাসন দিলেন আন্দামানে।

১৮৫৭ সনের স্বদেশপ্রেমিক সিপাহী থেকে সুরু করে গদর পার্টির অনমনীয় শিখ সর্দারা এবং সাভারকর, লোকনাথ বল, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ স্বদেশী বিপ্লবীদের সকলকেই এই দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে নানা গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। গোপনে গোপনে বৈঠক বসত, পরামর্শ হত

কেমন করে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আবার দেশকে স্বাধীন করা যায়। বাইরের কাগজে কাগজে তীব্র সমালোচনা করে, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে সকলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করতেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টায় অনেকে মরণ পণ করলেন। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উঠল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। একদল বিপ্লবী হল সশস্ত্র বিপ্লবে।

ইংরেজ বিপদ বুঝে এই সব লোকদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করে জেলে পুরলেন। কিন্তু বিপদ এতে বন্ধ হলনা। জেলের ভিতরেও রাজবন্দীরা বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং জেলের সাধারণ কয়েদীরা রাজবন্দীদের ভক্ত হয়ে পড়ল, তারাও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার রাজবন্দীদের সকলকে আন্দামানে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

বাংলাদেশ, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ থেকে প্রথম দল রাজবন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হল উনিশ শ' নয় সনে। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও পাঠানো হল (১) রাজবন্দীদের বিশেষ বিপজ্জনক আসামী বলে যেন গণ্য করা হয়। (২) বাঙ্গালী কয়েদীদের যেন রাজবন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া না হয় কারণ বাঙ্গালী বিপ্লবীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। সক্রিয় আন্দোলনে প্রথম অগ্রণী হয় বাঙ্গালী এবং বিপ্লবের চিন্তার কথাও প্রথম এসেছে বাঙ্গালীরই মনে। (৩) রাজবন্দীদের কেরাণী কাজ বা অন্য কোনরকম লেখাপড়ার কাজ দেওয়া যেন না হয়। (৪) সকলকে অত্যন্ত কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ যেন দেওয়া হয়, এবং (৫) পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা যাতে না হয়।

এই সব নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ কয়েদীদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হত রাজবন্দীদের ওপর। অমানুষ পরিশ্রমে, অনাহারে, ওয়ার্ডার ও জেলারের অস্ত্র ও উদ্ধত ব্যবহারে সকলের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠত। সভ্যদেশের অন্যান্য রাজবন্দীদের মত কোন সুবিধাই আন্দামানের রাজবন্দীদের দেওয়া হত না। সামান্য অপরাধে তাঁদের বেতের সাজা, কয়েকদিন, চটের কাপড় পরিধান এবং নির্জন কারাবাস নিত্য প্রাপ্য ছিল।

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর আন্দামানে এসেছিলেন ১৯১০ সনে পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে। সে সময় জেলার ছিল মিঃ ব্যারী। লোকটা ছিল নরকল্পী শয়তান। ব্যারী সাহেবকে বলা হত কালাপানির সম্রাট। কয়েদীরা তার যমের মত কিংবা তার থেকেও বেশী। প্রথম থেকেই মিঃ ব্যারী কয়েদীদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিত যে, ইহকালের পরকালের একমাত্র দেবতা সে নিজে। ভগবান পেট ফোঁড়ার ধারে কাছেও নেই, কাজেই যদি ব্যারী সাহেবের তুষ্টি বিধান কয়েদীরা করতে পারে তবে ভালই, নইলে কি হবে কেউ বলতে পারে না।

সাভারকরের সঙ্গে ব্যারী সাহেব ব্যবহার করত পশুর মত অথচ মনে মনে সমীহও করত। সাভারকরকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে একটী 'উইংসে'এ রাখা হয়েছিল। অযথা অপরাধে অপরাধী পাঠান ওয়ার্ডার তাঁর জন্য প্রহরী নিযুক্ত করেছিল। সে সময় মুসলমান প্রহরীদের অত্যাচারে হিন্দু কয়েদীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। মুসলমান প্রহরীরা সর্বক্ষণ চেষ্টায় চেষ্টায় থাকত তাদের রান্না খাইয়ে বা কলমা পড়িয়ে হিন্দুদের মুসলমান করার। জেল কর্তৃপক্ষও সজাগ ছিলেন যাতে হিন্দু মুসলমানের সম্ভাব না থাকে। তাই বেছে বেছে মুসলমান কয়েদীদের ওয়ার্ডার ও টিণ্ডেলের কাজ দেওয়া হত।

সাধারণ কয়েদী পাঁচ বছর জেল খাটবার পর উপরওয়ালাকে খুসী করতে পারলে ওয়ার্ডার,

সেটী অফিসার, টিণ্ডেল ও জমাদারের পদে প্রমোশন পেত। বলা বাহুল্য, বেশীর ভাগই এরা ছিল মুসলমান। জেলের ছোটখাট কর্তৃত্বের ভার ছিল এদেরই উপর।

একদিন কয়েদীদের প্যারেডের সময় সাভারকর দেখতে পেলেন তাঁর ভাই গণেশপন্থ সাভারকরও আন্দামানে নির্বাসনে এসেছেন। যতদিন তাঁরা ছিলেন, দুই ভাই পরস্পর কোনদিন কথা বলতে পারেন নি।

মাণিকতলা বোমা মামলার আসামী ইন্দুভূষণ রায় জেলখানার অপমানে অসহিষ্ণু হয়ে একদিন রাত্রিবেলা নিজের জামা ছিঁড়ে ঘুলঘুলিতে লাগিয়ে ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেটা ছিল ১৯১২ সন।

উল্লাসকর দত্তকে জেলের বাইরে ইঁট তৈরীর কাজে লাগানো হয়েছিল। শরীর অসুস্থ থাকায় মেডিক্যাল অফিসার বলেছিলেন, উল্লাসকর দত্তকে যেন রোদে কাজ করতে দেওয়া না হয়। ডাক্তারটি ছিলেন বাঙ্গালী তাই মিঃ ব্যারী তাঁর কথায় কান দিলেন না। উল্লাসকর কাজ করতে অস্বীকার করলে তাঁর জন্য সাতদিন দাঁড়া হাতকড়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু সাতদিন পূর্ণ হবার অনেক আগেই দেখা গেল প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে উল্লাসকর দত্ত হাতকড়াতে ঝুলছেন। এর পরই তিনি পাগল হয়ে যান। পরে তাঁকে মাজাজের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রামরাক্ষী নামে আর একজন রাজনৈতিক বন্দীর পৈতা কেড়ে নিলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

১৯১৩ সন। এই সময় নানারকম উড়ো খবর ভারতবর্ষে পৌঁছাতে লাগল। এবং জনমত আন্দামানের রাজবন্দীদের বিষয়ে একটা সঠিক খবর জানতে চাইল।

উত্তর প্রদেশের এক রাজবন্দী লাজপত রায় একটী চিঠিতে আন্দোপান্ত সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী লিখে এক কাস্টমারের হাত দিয়ে কেমন করে যেন কলকাতায় পাঠান। 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর হাতে সে চিঠি গিয়ে পৌঁছায় এবং তিনি সে চিঠির কথা তাঁর কাগজে প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গলী' কাগজে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা বার হল। সামান্য কারণে রাজবন্দীদের পায়ে বেড়ি, কুঠুরী বন্ধ, দাঁড়া হাতকড়া, রোগীর পথ্য দেবন এবং অসুস্থ শরীরে অমানুষিক পরিশ্রমের কথা সবিস্তারে ছাপান হল।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকাতেও আন্দামানের অত্যাচারের কাহিনী ছাপান হল। জনতা দাবী করল এক কমিশন পাঠানো হোক আন্দামানে, সেখানকার জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অবস্থা জানবার জন্য।

এরপর ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক (Sir Reginald Craddock) আন্দামানে এলেন। কয়েদীরা তাঁর কাছে নালিশ করলে তিনি তা বিশ্বাস করলেন না। উপরন্তু জেলার সাহেব যা বোঝালেন তাই বুঝলেন। ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ক্র্যাডক সাহেব বললেন, 'তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত।'

যাই হোক ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে অনেক কথা গোপন করলেও ক্র্যাডক সাহেব একথা স্বীকার করেছিলেন যে সেলুলার জেলের বিধি ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঘানি ঘুরানর পরিশ্রম, পানীয় জলের কষ্ট, জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, কথায় কথায় ডাণ্ডা

বেড়ী সব মিলিয়ে রাজবন্দীরা ফেলে উঠলেন। প্রতিবাদ করবার জন্য সকলে অনশন ধর্মঘট সুরু করলেন। দামোদর ও বরীন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ কাজে অগ্রণী। রাজবন্দীদের দাবীর মধ্যে ছিল ভাল খাওয়া পরা, পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধা।

কর্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ রায়, রামরাক্ষী এবং উল্লাসকর যন্ত্রের কথা দেশে গিয়ে পৌঁছাল।

ভারত গভর্ণমেণ্ট অবস্থাটা জানবার জন্য ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সারভিস সার পার্সি লুকাসকে আন্দামানে পাঠালেন। তিনি আসাতে রাজবন্দী এবং জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা রফা হল। এরপর রাজবন্দীদের পরিশ্রমের মাত্রা অনেক কমে গেল এবং অনেককে জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠান হল। তা ছাড়া কিছু কিছু বইও পড়তে অনুমতি দেওয়া হল।

কিছুদিন পর হঠাৎ গুজব শোনা গেল, মালিকতলার বোমা মামলার আসামীরা বোমা দিয়ে সমস্ত সেলুলার জেল উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। সেলুলার সাপোর্টার করেদীরা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার, কেরানী, জমাদার সকলে রাজবন্দীদের সংযোগিতা করছে। জেলসুপার ভয় পেয়ে রাজবন্দীদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং সকলকে আবার সেলের মধ্যে পুরলেন।

বছরে বছরে অসংখ্য রাজবন্দী আন্দামানে আসতে লাগল এবং জেলে স্থানাভাব হয়ে পড়ল।

১৯১৪ সনে এল গদর পার্টির শিখরা; রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী হয়ে।

পাঞ্জাবের একদল শিখ ভারতবর্ষের বাইরে বর্মা, হংকং, ফিলিপাইন হয়ে আমেরিকা যায় জীবিকার সন্ধানে। সেখানে গিয়ে সকলে দিনমজুরের কাজ নেয়। মজুরি ভাল, খাওয়া দাওয়া ভাল, হাতে পয়সাও জমে ভাল, কাজেই সকলেই মহাখুশী। স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় থাকতে থাকতে কিছুদিন পর এই শিখেদের মনে একটা পরিবর্তন এল। তারা ভাবল 'এ আমরা কি করছি? পরের দেশে এসে গোলামী? পয়সা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সম্মান কোথায়? তা ছাড়া সাদাচামড়ার মজুরদের চেয়ে কর্মঠ হয়েও মজুরি পাই ভিন্ন রকমের, ব্যবহারও পাই ভিন্ন রকমের। এর কারণ নিশ্চয়ই আমরা পরাধীন দেশের লোক বলে।'

এই সময় থেকেই ভারতীয় শিখ মজুরেরা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা বসল। এই সভায় প্রথম সৃষ্টি হল 'গদর পার্টির'। 'গদর' শব্দের অর্থ হল বিপ্লব। সকলে শপথ গ্রহণ করল ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব উৎখাত করার চেষ্টায় সকলে জীবনপণ করবে। ভারত এবং ভারতের বাইরে প্রচার করবার জন্য নূতন পত্রিকা বার হল 'গদর' সানফ্রানসিসকোর এক ছাপাখানা থেকে। 'গদর' পত্রিকা ছাপা হতে লাগল। টাকা আসতে লাগল চারিদিক থেকে হু হু করে। উদ্দীপনার বাণী ও কবিতায় ছাপা হতে লাগল। আমেরিকার সমস্ত ভারতীয় মজুর সাগ্রহে এই পত্রিকা পড়তে লাগল।

কানাডাতেও হাজার হাজার শিখ মজুরির কাজ নিয়েছিল, তারাও সকলে গদর দলের সভ্য হল এবং সেখানে বেশ বড় একটি দল সংগঠিত হল। 'গদর' পার্টির সভ্যদের সংখ্যাধিক্যে ও প্রতাপ দেখে কানাডা সরকার ভয় পেয়ে গেল এবং ভবিষ্যৎ গোলমালের আশঙ্কায় ভারতবর্ষ থেকে আর মজুর আনতে অস্বীকার করল। ওদের বেখানো হল জাহাজের অভাব। গদর পার্টির এক সভ্য ভগবত সিং তখন সিঙ্গাপুরে ঠিকাদারের কাজ করছিল। কানাডা সরকারের খাহানা শুনে ভগবত

সিং 'কোমাগাতামারু' নামে এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করে ভারতবর্ষ থেকে চারশ জন 'গদর' সভ্য নিয়ে কানাডা রওনা হল। কিন্তু কানাডা সরকার তাদের নামতে অনুমতি দিলনা। বাধ্য হয়ে সেবার তাদের ফিরে আসতে হল। ১৯১৪ সনে প্রায় একশ জন গদর সভ্য গোপনে আমেরিকা থেকে কোলকাতার জাহাজে চড়ে পালিয়ে এল ভারতবর্ষে। বজবজে এই যাত্রীরা ধরা পড়ল। * অনেকে সংঘর্ষে মারা পড়ল অনেকে বন্দী হল।

গদর পার্টির সভ্যরা পরে অনেকে লাহোর ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছিল। ধরা পড়ার বিচারে তাদের প্রথমে ফাঁসীর হুকুম হয় পরে ফাঁসী রদ হয়ে আঠার জন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের অনেক সময় আগ্নেয়াস্ত্র বাইরে থেকে এনে গদর পার্টির সভ্যরাই সরবরাহ করত।

অন্য রাজবন্দীদের থেকে গদর সভ্যরা ছিল ব্যতিক্রম। ছয় ফুট লম্বা, দুইশ পাউণ্ড ওজনের দৈত্যের মত মানুষগুলি সেলুলার জেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমাল সুরু করল। সামান্য ভাত, দুই টুকরা রুটি, জলের মত ডাল ও কতকগুলি লতাপাতা সিদ্ধ খেয়ে তাদের পেটের অর্ধেকও ভরেনা। তার উপর অমানুষিক পরিশ্রম তো আছেই।

ঘাণীর ভাই পরমানন্দ এবং কলকাতার আশুতোষ লাহিড়ী ব্যারী সাহেবের গালাগালি সহ্য করতে না পেরে তাকে তুলে আছাড়ে মারেন। ফলে দুইজনই দারুণভাবে প্রহৃত হল। 'গদর' দলের সকলে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মঘট করে বসে রইল। চীফ কমিশনার এসে তাদের কাজে যোগ দিতে বললে তারা স্বীকার না করায় প্রত্যেকের টিকিটে লিখে দেওয়া হল 'ছয়মাস নির্জন কারাবাস, ছয়মাস ডাণ্ডাবেড়ী, সাতদিন হাঁড়া হাতকড়া'।

গদর পার্টির সভ্যরা অনশনের পর অনশন, ধর্মঘটের পর ধর্মঘট করে জেল কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। জেলের অত্যাচারে গদর দলের আটজন পাঞ্জাবী মারা যায়।

১৯২১ সনে গদর দলের বাকী কয়জনকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৯২৬ সনে বাকী রাজবন্দীদেরও দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাজবন্দীদের আর দ্বীপান্তরে পাঠানো হবেনা সরকার থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল কিন্তু বছর কয়েক যেতে না যেতেই সরকারের মত বদলে গেল। ১৯৩২ সন থেকে আবার সুরু হল রাজবন্দীদের দ্বীপান্তরে নির্বাসন। প্রায় তিনশ রাজবন্দী অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে আন্দামানে এসে পড়লেন। এবার যাঁরা এলেন তাঁদের রাজনৈতিক বন্দী না বলে বলা হল বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী, টেরোরিষ্ট।

সেলুলার জেলের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা এই নূতন বিপ্লবীরা মানতে চাইলেন না, বিভিন্ন টেরোরিষ্ট পার্টির মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা (১৯৩০), কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৫) এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৮) সভ্যরাই ছিল সংখ্যাধিক।

সেলের দেয়ালগুলি অর্ধেক, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, কুঠরীগুলি অন্ধকার। শোবার জন্য খাট নেই, পড়বার জন্য বই নেই, খেলাধুলার কোন সুযোগ নেই। খাবার দেওয়া হয় অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। অল্পদিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা নানারকম রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

---

* বজবজ-এ সেই পবিত্র স্মৃতি বহনকারী এক স্মৃতিস্তম্ভ সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। সেই স্তম্ভগাত্রে সুন্দর ভাবে খোদিত হয়েছে সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অনেকগুলি চিত্র।

১৯৩৩ সনে শুরু হল অনশন ধর্মঘট। ভাতার ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা স্তোকবাক্য বলেও তাদের অনশন ভঙ্গ করা গেলনা। জোর করে নল দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে ঠাকুর মহাবীর সিং, মোহিতকুমার মৈত্র এবং মোহনকিশোর মারা যান।

বিপ্লবীদের মৃত্যুর খবর দেশে গিয়ে পৌঁছালে সেখানে তুমুল আন্দোলন শুরু হল।

জনমত আবার গভর্ণমেণ্টের কাছে এর প্রতিকারের জন্য দাবী জানাল। এবার এলেন কর্ণেল বার্কার, ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। তিনি এসে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক জোট হয়ে রাজবন্দীদের বিরুদ্ধেই মতামত দিলেন। তাঁর পরামর্শে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অনশনকারী বিপ্লবীদের জল খেতে দেওয়া হলনা। ফলে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তবুও কিছুতেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন না। অবশেষে কর্ণেল বার্কার একটা রফা করতে রাজী হলেন।

ছেচল্লিশ দিন পর অনশনকারীরা তাঁদের ব্রতভঙ্গ করলেন। বিপ্লবীদের দাবী এবার কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন। বিছানাপত্র, মশারী, খাট, টেবিল, চেয়ার রাজবন্দীদের দেওয়া হল। খাবার ব্যবস্থারও উন্নতি হল। বাঙ্গালীদের জন্য মাছ বরাদ্দ হল। খেলাধূলার বন্দোবস্ত হল এবং সরকারী খরচে কাগজ ও বইপত্র কিনে দেওয়া হল। একটি লাইব্রেরী খোলা হল। এবং এর পরের কয়েক বছর রাজবন্দীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হল। সকলে প্রচুর পড়াশোনা করতে লাগলেন। হাতে লিখে একটি ম্যাগাজিন বার করলেন "call".

প্রাক্তন জেলার ওয়েলকেয়ার অফিসার মিঃ এল. এইচ. ইয়ং প্রায় পয়ত্রিশ বছর যাবৎ আন্দামানে আছেন, তিনি একসময়ে সেলুলার জেলের জেলার ছিলেন। তিনি গল্প করেছেন, প্রথম দিকে যদিও রাজবন্দীদের ওপর খুবই অত্যাচার করা হয়েছে কিন্তু উনিশশ তিরিশের পর থেকে ব্যবস্থা অনেক বদলে যায়। তাদের জন্য নানা প্রকার খেলাধূলার বন্দোবস্ত ছিল। আমি নিজে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, ভেওয়ারী এবং আরও অনেকের সঙ্গে ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলেছি, তাদের সঙ্গে থিয়েটারে যোগ দিয়েছি, দুর্গাপূজা উপলক্ষে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছি। রিক্রিয়েশনের জন্যও অনেক রকম বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। মিঃ ইয়ং জাতে কিরিঙ্গী ছিলেন, জেলার সাহেব কাজেই তাঁর কথা কিছু অতিরঞ্জন হলেও অবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল সেটা ঠিকই।

সব ব্যাপারেই নিয়মকানুন এত বদলে গিয়েছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়। জেল কম্পাউণ্ডের মধ্যে রাজবন্দীরা ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারতেন, নানা উৎসব পালন করতেন। যে ভে পালন করতেন, দুর্গাপূজা করতেন, নাটক অভিনয় করতেন।

পরবর্তী যুগে জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের ভিন্ন ভিন্ন দল গঠিত হয়েছিল। অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর পার্টি, চিটাগং পার্টি, কমুনিষ্ট পার্টি, রিভোল্টিং (Revolting) পার্টি এবং শ্রীসংঘ পার্টি। তার উপর বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজবন্দীদের মধ্যেও কিছুটা প্রাদেশিকতা দেখা দিয়েছিল।

কিছুদিন পর আবার সুরু হল গোলমাল। ধীরে ধীরে আবার অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। যে সব সুবিধা রাজবন্দীরা পাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে তা কমে যেতে লাগল।

এই সময় দেশে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দাবী করল—'আন্দামান থেকে রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনা হোক।' ভারতের সমগ্র জনতা কংগ্রেসের সঙ্গে এক মত হল। কেন্দ্রীয় পরিষদে আন্দামানের বন্দীদের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হল। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট। হোম সেক্রেটারী সার

হেনরি ক্রেক পোর্টব্লেয়ারে এলেন। রাজবন্দীরা তাঁর কাছে কয়েকটি দাবী পেশ করল, সদয় ব্যবহার, লেখাপড়া শেখার সুবিধা দেবার সুযোগ, মাসিক পত্রিকা ও বই দেবার স্বাধীনতা, ভাল জামাকাপড় ও সামান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। সর্বশেষ সমস্ত রাজবন্দীদের দেশে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করা।

সার হেনরি ক্রেক সিমলাতে ফিরে গিয়ে প্রেস কনফারেন্সে বললেন, আন্দামান স্বর্গের মত সুন্দর, a paradise। তিনি আরও বললেন, আন্দামানের রাজবন্দীরা দেশের জেলের রাজবন্দীদের চেয়ে অনেক সুখে আছে, তা ছাড়া তাদের সেরকম কোন নালিশও নেই। রাজবন্দীরা হেনরি ক্রেকের কাছে যে দাবী করেছিল তিনি তার কোন উল্লেখ করলেন না।

হেনরি ক্রেকের এই রিপোর্ট শুনে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল ক্ষেপে উঠল মিথ্যা প্রচারের জন্য। কেন্দ্রীয় পরিষদের একজন সদস্য বিদ্রূপ করে বললেন, আন্দামান যখন এতই সুন্দর তখন রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হোক।

জনমতের দাবী অগ্রাহ্য করতে না পেরে গভর্নমেন্ট আবার এক ডেপুটেশন পাঠালেন আন্দামানে কংগ্রেসের মেহার রাধাদা হংসরাজ এবং মুসলীম লীগের মেহার ইয়াসিন খাঁ।

রাধাদার সঙ্গে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের আলাপ ছিল। তিনি পরিদর্শনে এসে সব দেখলেন এবং শুনলেন। সবশেষে তিনি বললেন, 'এবার আমি ফোন করবার মশায়কে কিছুদিন এই ভূ-স্বর্গে বাস করবার জন্য পাঠিয়ে দেবো।'

সর্বশেষ অনশন সুরু হয় ১৯৩৭ সনের পঠিশে জুলাই। দাবী—দেশে ফিরে যাওয়া। দুইশ বন্দীর মধ্যে দুইশ তিরিশ জনই অনশনে যোগ দিলেন।

আন্দামানের অনশন ধর্মঘটের খবর পেয়ে ভারতবর্ষে দেওলি, বহরমপুর এবং আলিপুর জেলেও রাজবন্দীরা অনশন সুরু করলেন। কংগ্রেস থেকে পিড়াপিড়ি সুরু হল আন্দামানের বন্দীদের ফিরিয়ে আনার জন্য।

ফজলুল হক, ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্তি আন্দামানে টেলিগ্রাম পাঠালেন অনশন বন্ধ করার জন্য। কোন কাজ হলনা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর তরফ থেকে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু টেলিগ্রাম পাঠালেন তাতেও কিছু হলনা। আটাশে আগষ্ট স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন অনশন বন্ধ করার জন্য। গান্ধীজী রাজবন্দীদের জানালেন—বিপ্লবের পথ ছেড়ে দিয়ে শান্তির পথে থেকে যুদ্ধ কর। হিংসার পথে না গিয়ে অহিংসার পথে যাও। সমগ্র দেশ এবং আমি তোমাদের দাবী মেনে নিয়েছি। তোমাদের সংগ্রাম বন্ধ কর।

গান্ধীজীর টেলিগ্রাম পেয়ে রাত্রিবেলা সেলুলার জেলে সভা বসল এবং সকলে জাতির জনকের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য অনশন ভঙ্গ করতে রাজী হলেন। রাজবন্দীরা গান্ধীজীকে জানালেন, আমরা যে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতাম সে বিশ্বাস আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি দেশোদ্ধারের জন্য এপথ ভুল পথ।

অনশন ভঙ্গের খবর পেয়ে ভারতবর্ষে সকলেই দারুণ খুসী হন। ১৯৩৭ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর প্রথমদল রাজবন্দী পোর্টব্লেয়ার থেকে মহারাজা জাহাজে করে দেশের উদ্দেশে রওনা দিল।

আন্দামানে কোন মেয়ে রাজনৈতিক বন্দী হয়ে দ্বীপান্তরে আসেনি। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস,

শান্তি চক্রবর্তী এবং আরও কয়েক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দামানে পাঠান হয়নি।

আন্দামানে সেলুলার জেলের অত্যাচারের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সময়কার প্যারিসের বাস্টিল দুর্গের অত্যাচারের তুলনা করা হয়। অনেকে আন্দামানকে বলতেন, আন্দামান ভারতবর্ষের বাস্টিল।

বাইরে এসে সেলুলার জেলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম এই ভগ্নপ্রায় কুঠরী গুলির মধ্যে আজ কোন চিহ্ন নেই কিন্তু এক সময় এর ভেতরে হাজার দোষী নির্দোষ মানুষ ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে পাগল হয়ে উঠেছে। তাদের বুকভাঙা আর্ত চীৎকার জেলের পাচিলের এ পাশে এসে পৌছাত না। মার খেয়েছে পড়ে পড়ে, অত্যাচার সয়েছে, কেঁদেছে. সে কান্নার সাক্ষী ছিলেন একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান।

আজ এতদিন পরে সেলুলার জেল আমাদের একটী ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের মত মনে হয়। সকলেই অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান বলে দেখতে আসেন ; কিন্তু এর পিছনের বিভীষিকার দিনগুলির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না।

সেলুলার জেলের দিকে তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে হাতজোড় করে স্বাধীনতার পূজারীদের উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। মনে মনে বললাম, 'ওগো বিস্মৃত অগ্নি সাধকের দল, আজ তোমরা কে কোথায় আছ জানিনা। তোমাদের উদ্দেশে আমার প্রণাম জানাই।'

আন্দামানের কয়েদী উপনিবেশে প্রতিটি গঠনমূলক কাজের পেছনে রয়েছে কয়েদীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফল। নির্যাতন ও নিপীড়নে তারা বাধ্য হয়েছে জীবন পণ করে জঙ্গল কেটে, জলা পরিষ্কার করে, রাস্তা তৈরী করে, বাড়ী ঘর তৈরী করে, সর্বরকমে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সুখের আয়োজন করতে। কয়েদীদের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় একটি অরণ্য সমাকীর্ণ দ্বীপ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে সুন্দর একটি লোকালয়ে।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের চেষ্টায় আন্দামানের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু যারা এই লোকালয়ের পত্তন করেছিল ; যাদের জীবনের বদলে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাদের দানের কথাও আমাদের মনে থাকবে চিরকাল।

'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল নির্জন কারাবাসে রেখে, আত্মীয়স্বজন থেকে বহুদূরে নির্বাসিত করে, নিয়মাধীনে রেখে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন করা। উদ্দেশ্য যা ছিল তা কোনদিনই সফল হয়নি। হয়নি জেলকর্তৃপক্ষের দোষে। আন্দামানে সেলুলার জেলের ভেতরে এসে কর্তারা আর মানুষ থাকতেন না। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধীরে ধীরে তাঁরা পশুর মত নির্মম হয়ে উঠতেন।

ইংল্যাণ্ডের অষ্ট্রেলিয়াতে নির্বাসন দণ্ড এবং রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দণ্ড একই রকমের বিভীষিকার চিত্র এঁকে রেখেছে। পৃথিবীর যেখানে যেখানে দ্বীপান্তরের বন্দোবস্ত ছিল সব জায়গাতেই প্রায় তা ব্যর্থ হয়েছে।

"There was much that was good and healthy in transportation, but the guilt and stain round the rocks of these dreadful prisons will hang and linger in the memory of mankind, till the ocean of time which is vaster than Pacific, engulfs them and sweeps them, and us, away. (Ives).

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ

কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

॥ এবারের শারদীয়ার নূতন বই ॥

শরদিন্দু ঘোষের নূতন উপন্যাস

কায়াহীনের কাহিনী ৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন উপন্যাস — **স্বপ্নতনু** ৪৷৷০

বিমল করের নূতন উপন্যাস — **পরবাস** ৪৷৷০

বাণী রায়ের নূতন উপন্যাস

সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের নূতন উপন্যাস

প্রথম তারার আলো ১০৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূপুরের মতো ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের — **শ্রাবণী** ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের — **তিন সঙ্গিনী** ৪৲

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গীতের আসরে ৭৷৷০

[ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-গায়কদের জীবনসাধনা]

স্বামী দিব্যজ্ঞানন্দের — **অবতার-সঙ্গিনী** ২৲ [মহামানবদের জীবন-সঙ্গিনীদের জীবনকথা]

কালীবর বেদান্তবাগীশের — **বেদান্ত-সংজ্ঞাবলী** ৩৲ [ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী সম্পাদিত]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এক অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

গন্নাবেগম ৮৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !!
সমস্যা নয় সমাধান !!!

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে। এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।

মূল্য : ৪'৭৫ নয়া পয়সা

প্রকাশক :
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :
৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫—৬৮২৭

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বিষ্ণু দে-র সর্বাধুনিক কাব্য-সঙ্কলন

একুশ বাইশ

কবি-জীবনের মধ্যপর্যায়ে রচিত পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ এবং কিছু নতুন কবিতার সংগ্রহ।

মূল্য : আট টাকা

মণীন্দ্র লাল বসু-র নতুন উপন্যাস

এষণা

একদা যে লেখক 'রমলা' লিখে বাঙালী হৃদয় জয় করেছিলেন, তাঁরই নতুন উপন্যাস 'এষণা' জনৈক মধ্যবয়সী ব্যক্তির সচেতন মনের আত্মনায় প্রতিফলিত একটি দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার অপরূপ আলেখ্য।

মূল্য : ৩'টাকা পঞ্চাশ পয়সা

সুলেখা গল্প সংকলন

সাম্প্রতিক কালের ছোট গল্পের ধারা নিরূপণে এই গ্রন্থটির মূল্য নিঃসন্দেহে অপরিসীম। **মূল্য : ছয় টাকা**

॥ কয়েকটি সাম্প্রতিক প্রকাশন ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্মৃতিচিত্রণ

কল্লোল যুগ

বাংলা সাহিত্যের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস।

৩য় সংস্করণ • মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর ভ্রমণ-কাহিনী

মন্দিরময় ভারত (৩য় ভাগ)

ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ, তাদের স্থাপত্য-রূপ, নির্মাণের তারিখ, অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ। **মূল্য : বারো টাকা**

দীপঙ্করের উপন্যাস

আঁধার অম্বরে

নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আকাশে ধারা পাড়ি জমান সেই সব পাইলটদের তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা আর পরম আনন্দময় যুগল-জীবনের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে পরিস্ফুট। **মূল্য : ছয় টাকা**

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ :: ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

অভিধান সিরিজ

SAMSAD
ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি-বাঙ্গালা অভিধান। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় শব্দের উচ্চারণ-সঙ্কেত ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। সর্ববৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উপযোগী শব্দকোষ। [টাঃ ১২-৫০]

SAMSAD LITTLE
ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত অহরহ ব্যবহারের উপযোগী একটি সহজ বহনীয় শব্দকোষ। বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস-কর্মীদের একান্ত উপযোগী। [টাঃ ৭-৫০]

সংসদ
বাঙ্গালা অভিধান

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত বাঙ্গালা অভিধান। শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। [টাঃ ৮-৫০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

॥ শারদীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন ॥

শারদীয়া

গল্প-ভারতী

এবারের বিশেষ আকর্ষণ ঃ

কথাসাহিত্যিক **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের** পূজোয় একমাত্র উপন্যাস

মৃগ-মদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবার গল্প-ভারতী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকায় উপন্যাস লেখেননি।

জীবনধর্মী সাহিত্যিক **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** একটি অভিনব উপন্যাস

পরিব্রাজক সাহিত্যিক **প্রবোধকুমার সান্যালের** একটি রস-মধুর ভ্রমণকাহিনী

মননশীল সাহিত্যিক **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের** একটি আশ্চর্য সুন্দর নাটক

জীবন-যন্ত্রণা

মহাশ্বেতা দেবীর একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস

এ ছাড়া বাংলার সেরা লেখকদের লেখা কয়েকটি বড় গল্প,

বহু ছোট গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি।

লিখছেন : বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, প্রমথ বিশী, আশাপূর্ণা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শক্তিপদ রাজগুরু, বাণী রায়, আশা দেবী, ডঃ আনন্দকিশোর মুন্সী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন মাইতি, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নীলিমা দাশগুপ্তা, প্রফুল্ল মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল কুমার ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত, প্রমথরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র পাল, গৌরীশঙ্কর দে ও আরও অনেকে।

॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সংযোজন ॥

বিশ্ব-চলচ্চিত্র

বিচিত্র তথ্যবহুল অজস্র ছবিতে ভরা

॥ এই বিরাট পত্রিকার দাম মাত্র ৪৲ টাকা, সডাক ৪·৭৫ ॥

এজেন্টগণ কার কত কপি প্রয়োজন জানিয়ে আজই টাকা পাঠিয়ে অর্ডার বুক করুন।

স্মরণ রাখবেন এইরূপ বিরাট গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব। গ্রাহকগণ সত্বর হ'ন। ভি:পিতে পাঠান সম্ভব নয়।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্প শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

গল্প-ভারতী ভাদ্র, ১৩৭২—ক

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres
Limited

NR/G/40

মাতৃ পূজায়
এ পরিহার্য....

রাঙ্গাজবা সিন্দুর
রাঙ্গাজবা কুমকুম
রাঙ্গাজবা আলতা
রাঙ্গাজবা অগুরু

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল ঃ কলিকাতা

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

ভাদ্র — ১৩৭২

SEPTEMBER-1965

সম্পাদক :

কালিদাস নাগ

সহ: সম্পাদক :

কল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

Price Re. 1·00

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

* ঘরে, মাংস, পাকসব্জি, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি সব রকম খাবার রাখবার প্রশস্ত জায়গা।
* আপনার ঘরের রঙের সঙ্গে ট্রেন্ড-টপের রঙ মেলানো যাবে—দুদিনে বদলে এমন সেরা মিশিন যে কোন আধুনিক পরিবারের পক্ষেই উপযুক্ত।
* মেরামতের জন্য ভাবনা নেই—জি ই সির যে কোন অনুমোদিত ডীলারই তার ভার নেবে।

১১৫৲
টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত সরঞ্জামের মধ্যে আছে ট্রেন্ড-টপ, ভালভাল ও স্ট্যান্ড।
পাঁচ বছর ইউনিটের গ্যারান্টি ও সহজ।
অনুমোদিত জি ই সি ডীলারদের কাছে পাওয়া যায়।

জি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

পাইওনীয়ার

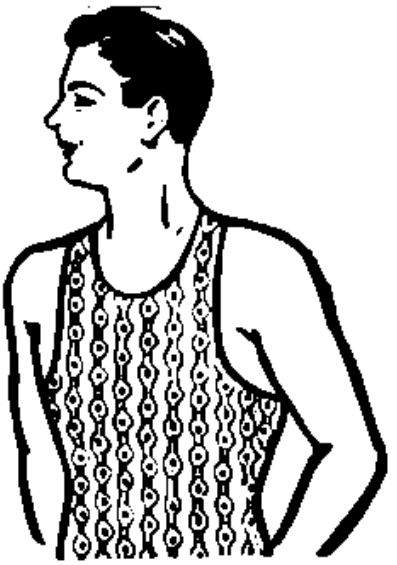

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-শার্ট, টেনিস-শার্ট,
চেম শার্ট, ড্রয়ার এবং স্লীপ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন- শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

আধুনিক পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম শ্রেণীর হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেতুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; বঙ্কিং স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, খোকনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট অংশল।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ যসীকদ্দিন—১৩৩, এস, এন, বানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৮, নিউ মার্কেট; দেশাই—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইষ্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইণ্ডিয়া স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; ম' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এস, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ নিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কনহৈয়ালাল আনন্দীলাল, আশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার, বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, গোপালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল জাবরমল; বাঁচিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম কেজী; অরুণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টীলাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৮-২৯৩৩

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৩টি কার্যকরী ঔষধের বিশেষ তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অবসাদ কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়া, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন। ক্ষতস্থানে সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

2তের কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

BIL

উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের

উজ্জ্বল কান্তি

যেমন মলাটের সঙ্গে গ্রন্থের, পাতার সঙ্গে বৃক্ষের —

তেমনি ত্বকের সঙ্গে সৌষ্ঠবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

বোরোলীন ক্রীম

নিত্য ব্যবহারে আপনার অন্তর্লীন লাবণ্য

চোখে মুখে সর্বাঙ্গে উদ্ভাসিত হবে।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

এই সংখ্যায়

কথা প্রসঙ্গে— ২৭৭

উদাত্ত আহ্বান— ২৫১

পাঠক-পাঠিকার কলম— ২৫২

অগ্নরীক্ষে (কার্টুন) ২৫৩

চলতি দুনিয়া— ২৫৫

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৫৭

সম্রাটের নির্বাসন (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)—বহরুচি ২৬৩

চিত্র বিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ ২৭১

শুভবিবাহ (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৭৭

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য
প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়।
সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের
ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায়
রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর
হিমসার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ
পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

হিমসার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

কোম্পানী আমলের কাহিনী—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮৬

রবীন্দ্র স্মরণ—ইলা পাল চৌধুরী ২৯৪

বিশ্বসাহিত্য—

যে সিঁড়ি নরকের দিকে নেমেছিলো—মূল—পারলাগেরকিস্ট

অনুবাদ :—শিশির মজুমদার ২৯৯

মাসের সেরা বই—অলন্ত প্যারিস

মূল—ল্যারী কলিনস ও ডেমিনিক ল্যাপিয়ের

অনুবাদ :—গৌরীশঙ্কর দে ৩০৫

স্মৃতি দোলায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩০৯

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

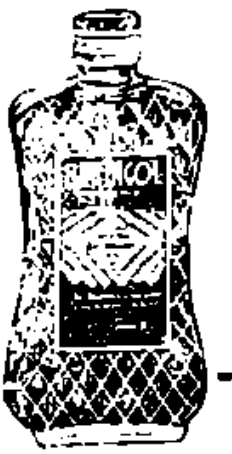

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

এই সংখ্যায়

গুপ্তচর কাহিনী—

গোয়েন্দা যখন অভিনেতা—সুপর্ণ রায় ৩১৭

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৩১৭

নন্দীভৃঙ্গীর তদন্ত—দিব্যেন্দুকিশোর গুহ ৩১৯

মেয়ে মজলিশ—

পূজার আগে যেমন সাজে—আভা পাকড়াশী ৩৩১

রূপ জাগানোর সোনার কাঠি—সুরঞ্জনা সেন ৩৩২

ভাববার কথা— ৩৩৬

খেলাধূলা— ৩৩৭

বিচিত্রা— ৩৪৩

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তো তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রামদুলালে সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

পাথা

২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

৫,৬,হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন ২৩-১৮২১

১৪,হেয়ার ষ্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

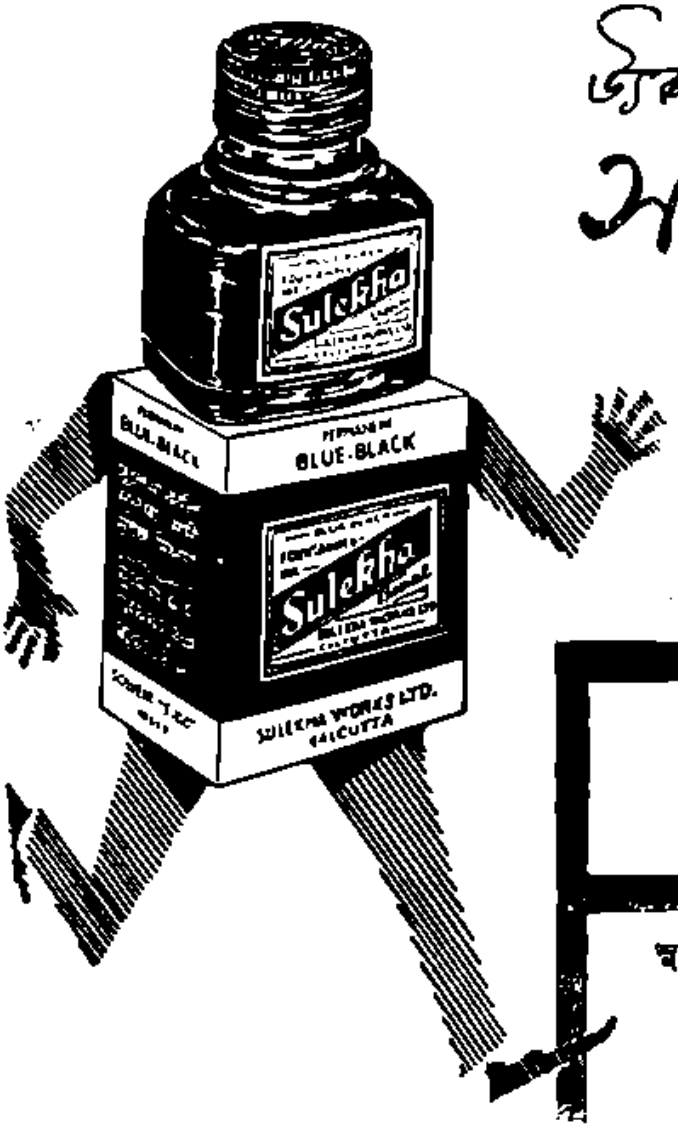

ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুয়রিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল

ফাউণ্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং

এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০, ৩১২০ এম-এস সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

গল্প-ভারতীর পূজা সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ

চার্লি চ্যাপলিনের আশ্চর্য আত্মজীবনীর মুখ্য কাহিনীগুলি তাঁর অনুরাগী বাঙালি-পাঠকদের কাছে বাংলায় রূপান্তরিত করে পরিবেশন করবার অভিপ্রায় জানিয়ে লেখক চার্লিকে পত্র দিয়েছিলেন। চার্লি তার জবাবে লিখেছেন—Thank you for your kind letter which has made me very happy.

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত

সুদীর্ঘ জীবনভিত্তিক রচনা

কান্নাহাসির দোলা

এক এবং অদ্বিতীয় চার্লি চ্যাপলিনের জীবন-রহস্য। বহু বিচিত্র নেপথ্যকাহিনী। বহু অনুদ্ঘাটিত বিস্ময়। বহু রোমাঞ্চকর সংঘাত। এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামী জীবনের বহু অপ্রকাশিত পূর্ব অধ্যায়।

॥ কৌতূহলোদ্দীপক চিত্তস্পর্শী রচনা ॥

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোস্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩১৯৪

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

॥ কথা প্রসঙ্গে ॥

অন্ধকারের পথে :

বৃটিশ আমলে দেশকে ভেটিয়া করার বিদেশী সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ভারতীয়দের দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করা হত। ৪৭এর ১৫ই আগষ্টের আঠার বছর পরেও স্বাধীন ভারতে যে দেশদ্রোহীর অভাব নেই সাম্প্রতিককালের ঘটনা পর্য্যায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে। এইসব নকল দেশপ্রেমিকদের মাধ্যমে সুজলা-সুফলা আমাদের বাংলা আজ সর্বহারার বাঙলায় পরিণত হতে চলেছে। সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাবে, খেয়াল খুশীর স্রোতে দারিদ্র্যজ্ঞানহীনের মত গা ভাসিয়ে দিয়ে দিব্বি আছি আমরা। জাতীয় জীবনের এই চরম সঙ্কটের, এই পরম সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টাই আমাদের নেই। আসল গলদকে খুঁজে বার করার বদলে জোড়াতালি দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করার এক মারাত্মক অপচেষ্টায় আমরা সবাই আজ মেতে উঠেছি। স্বাধীনতার আঠার বছর পরেও বাইরের চাকচিক্য আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছাড়া বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। সাধারণ মানুষের দিন যাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি ও ক্লেদ সমানে বেড়ে চলেছে। অন্ধের মত আমরা কেবল ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি আর নিজেদের আদর্শ, নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে পরাভূতকরণের এক সুন্দর অধ্যায় রচনা করে চলেছি। দেশপ্রেম আজ শুধু স্বপ্নবিলাসের কল্পনা—ক্ষুদিরাম—সুভাষচন্দ্রের দেশে তাই আজ শুধু চলছে সমানে ফাঁকি ; দেশকে ও নিজেকে ভরাডুবি করার চেষ্টা। দেশের যারা আসল প্রাণ সেই মানুষদের নৈতিক শিক্ষাদানের—তাদের চরিত্র গঠনের—প্রকৃত মানুষের মত তাদের গড়ে তোলাই হচ্ছে আজকের দিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। চরম দুঃখের কথা, সেই মানুষ গড়ার পরিকল্পনাকে সরকার সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন।

বৃটিশ আমলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় যে National Planning Commisson বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাতে দেশের প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির সম্পর্কে বিশেষভাবে জোর দেওয়ার কথা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের আমলেই সেই পরিকল্পনাকে সযত্নে ধামাচাপা দেওয়া হয়ে গেল। "Putting the cart before the horse" সবক্ষেত্রেই এইটাই যেন আজ সরকারের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি মানুষ আজ যেন জলের পুতুল—বাজারের খেলার সামগ্রী—কোন অবস্থাতেই

কোন রকমেই তাঁরা দেশের কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করতে পারেন না। আসল ব্যাপারটা যেন একেবারে সেই 'পরপৈগম্বরী' হয়ে দাঁড়িয়েছে—সবকে সব দায়িত্ব এড়িয়ে চলাই আজ আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সরকার ও দায়িত্বহীন জনপ্রতিনিধিদের নামে এই দায়িত্বকে এড়িয়ে চলার মনোভাব অপচেষ্টায় এক নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন। সরকারের চোরবাজারীর কিন্তু তারিফ করতে হয়—সরকার যেটাতেই হাত লাগাচ্ছেন সেটাই বাজার থেকে হাওয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রথমে সরষের তেল খোলা বাজার থেকে উধাও। মাঝখানে (এনামী সরকারী প্রচার পত্র)—সাবান সরষের পৃষ্ঠায় পালতরা আখাস পেলো সেল রেশন কার্ডের বদলে তেল—হায়রে-শেষে 'তেল' আর সরষে দুইই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। যেই বাঙালী সরষের তেল ব্যবসায়ীরা ঠিক করলেন অন্য জায়গা থেকে সরষের বীজ আনবেন—সঙ্গে সঙ্গে সরকার সরষের বীজের দাম নির্দিষ্ট করে দিলেন। ফলে না এল বীজ, না এল সরষে। দেখতে দেখতে একেবারে হরিঘোষের গোয়ালের অবস্থা।

একদিকে যখন গোবর অন্যদিকে জেরকাটন কৃপাপাত্রদের দলগত স্বার্থে বাড়ীর পুরস্কার বিতরণ দুইই সমানে চলছে। দেশের সত্যিকার অবস্থার দিকে তাকালে স্বভাবতই মনে হবে না যে, আমরা কোন জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করছি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কর্ণধাররা একদলের বহু স্মৃতিবিজড়িত কংগ্রেসের প্রাক্তন নায়ক। সেদিনের কংগ্রেসের সুমহান ঐতিহ্যকে যে এভাবে ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে—অতিবড় নৈরাত্মবাদীও বোধ হয় তা কখনও ভাবতে পারেন নি। জনসাধারণের অকুণ্ঠনীয় ত্যাগ ও বিরলস কর্ম সাধনায় পুষ্ট কংগ্রেস আজ সবার জনসাধারণকেই এড়িয়ে চলেছে। কংগ্রেসের পক্ষে এর চেয়ে চরম লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জনকল্যাণের চেষ্টা যে ব্যক্তি কল্যাণের নামান্তর তা সহজেই অনুমেয়। যে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ব্যক্তি কল্যাণের পরোক্ষ প্রচেষ্টা সবচেয়ে মারাত্মক—সবচেয়ে বিপদের কথা। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মদানে বাংলাদেশ একদিন যে বিপ্লবী ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, বিপ্লবী বাঙালীর সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাংলার যৌবন আজ বিভ্রান্ত—নেতৃত্বহীন। যে কলকাতার ছাত্রদের আত্মত্যাগে, দেশের আন্দোলনের পাদপীঠ, ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্যে প্রত্যাগত শ্রীমানিক বলেছেন, "ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়, তাদের সবরকম আন্দোলন পরিহার করা উচিত। শ্রীমানিক এমন এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন—যখন ঐতিহাসিক সেনেট হল ভগ্ন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-রবি ভিমিত। শ্রীমানিক বাংলাদেশকে চেনেন না—দেশবন্ধু, নেতাজীর বাংলাকে তিনি এখনও জানতে পারেন নি—জানলে তাঁর মনে পড়ত দেশবন্ধুর সেই অমর বাণী "Education can wait but Swaraj can not."

একথা সত্য যে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ঘটনার ও আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হচ্ছে। আজকের আন্দোলনের কর্ণধারও এই বাংলার ছাত্রসমাজ। প্রত্যেক দেশের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি এই বিপ্লবী ছাত্রসমাজ। আমেরিকার ৪ঠা জুলাই-এর আন্দোলন ফ্রান্সের ১৪ই জুলাই-এর আন্দোলন, সেদিনের রুশদেশিক আন্দোলন এই প্রতিটি আন্দোলনের পেছনের প্রাণবহ্নি এই ছাত্রসমাজ। ইতিহাসের বিপ্লবী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরাই রচনা করছে—ফাঁসীর

যজ্ঞে জীবনের অবসান যাঁরা দেয়েছেন তাঁদের সাধনা, তাঁদের অন্তরাত্মাকে প্রণামিত করতে এরাই এগিয়ে এসেছে সর্বদেশে—সর্বকালে—সর্বযুগে। ইতিহাসের এই চিরন্তন সত্যকে বিস্মৃত হয়েছেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য।

শিক্ষা যা কিনা ছাত্রকল্যাণের, জনকল্যাণের অন্যতম প্রধান বাহক, বিকৃত অপরিকল্পিত ব্যবস্থার ফলে আজ তা অশিক্ষারই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে নেতাজী বহুদিন আগেই বলেছিলেন, "Re orientation of the educational policy is the need of the hour—"এই re-orientation, এই আমূল পরিবর্তনের বদলে গতানুগতিক ধারার সেই আমলাতান্ত্রিক পরিবেশেই শিক্ষাব্যবস্থা সমানে এগিয়ে চলেছে। তাই জাতিগঠনের, তাই ভবিষ্যৎ দেশ-নায়কদের শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনার কোন চিহ্নই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে শিক্ষার সঙ্গে জাতিগঠনের কোন সত্যিকার পরিকল্পনা না থাকে, সে শিক্ষার যথার্থ কোন মূল্য আছে বলে মনে করা যায় না।

একান্ত লজ্জার কথা, প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের, সত্তিকারের সুস্থ সামাজিক পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা প্রণালী অনুসরণের কোন সক্রিয় পন্থা আমাদের জাতীয় সরকার আজও গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে শিক্ষার উন্নতির নামে কমিশনের পর কমিশনের প্লাবনে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইংরাজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল গলদ ছিল তার উপরেখায়, সে শিক্ষাব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের অপরাজেয় আত্মিক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করা। ইংরেজ বুঝতে পেরেছিল, ভারতবর্ষের এই অপরাজেয় আত্মিক সত্তাকে, লুপ্ত বা ক্ষুণ্ণ করতে না পারলে তাদের রাজনৈতিক জয় স্থায়ী ও সম্পূর্ণ হবে না। তাই রাজনৈতিক বিজয় পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ভারতবর্ষের আত্মিক পরাজয়ের দিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়। সেই মেকী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমরা ভারতীয়রা ক্রমশঃ আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সনাতন ধর্ম সবই ভুলে দিয়েছি। ইংরেজ আমাদের বুঝিয়েছিল যে, যা নিয়ে আমরা এতদিন বেঁচে ছিলাম—সেই ভারতের প্রাণধর্ম সেই ভারতের সনাতন ঐতিহ্য নাকি এ যুগে অচল, এ যুগে অকেজো, অবৈজ্ঞানিক এবং পরিত্যাজ্য। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্বনাশের মূল কারণ এইটাই হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার আসল লক্ষ্য চরিত্র গঠন—সেই চরিত্র গঠনের বদলে পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হয়ে, চাকরীর উমেদার হওয়াই আজকের তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চরম সঙ্কটের হাত থেকে দেশের সত্তাকে, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে রক্ষা করার মূল দায়িত্ব আমাদের সাহিত্যসেবীদের বুদ্ধিজীবীদের। আমরা কিন্তু এই দায়িত্বের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অর্থ ও কৌলিন্যের মোহে নিজেদের সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আমরা দেখছি দেশের সর্বত্র আজ অসন্তুষ্টি, শঠতা, হীনতা লোভ আর লাভের উন্মত্ত আত্মবিস্মৃত আস্ফালন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যে বাংলাদেশ ভারতের নবজাগরণের, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্রষ্টা আজ ভারত সমাজে তার স্থানই সবচেয়ে দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে, এ কম দুঃখের, কম পরিতাপের কথা নয়।

আজকের চিন্তাজগতের—সাহিত্য সমাজের এই চরম সঙ্কটের প্রতিরোধের মূল দায়িত্ব আমাদের সাহিত্যসেবীদের—সাংবাদিকদের এ কথা গল্প-ভারতী বহুবার বলেছে। অথচ আমরা সাহিত্যসেবীরা, সাহিত্য পত্রিকার পরিচালকরা এবং সাংবাদিকরা সেই চরম দায়িত্বকে উপেক্ষা করে চলেছি। নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে করে চলেছি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বাস্তবক্ষেত্রে এই বিরাট দায়িত্বপালনের কোন চেষ্টাই আমরা করিনি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় স্মৃতিবিজড়িত সংবাদপত্রগুলি আজ দলবিশেষের মুখপত্রে পরিণত হয়ে দলস্বার্থে জনকল্যাণকে চরমভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। আজকের সাময়িক পত্রিকা তাই জাতির সামগ্রিক আনন্দের খোরাক জুগিয়ে চলেছে। সাহিত্যসেবীরা আজ সাধনার পরিবর্তে অর্থপ্রাপ্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে। সাময়িক পত্রিকার পরিচালকরা কৌলিন্যলাভের মোহে নিজেদের ঐতিহ্য ও দায়িত্বকে একেবারে বিস্মৃত হয়ে এগিয়ে চলেছেন আত্মহননের পথে।

বিশ্বের ইতিহাসে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমনি এক চরম বিপর্যয়ের দিনে মহামনীষী, সাহিত্য-স্রষ্টা রোমা রোঁলা বিশ্বের সংস্কৃতিসেবী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "Intellectual workers of the world unite"। বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবানদের সেদিন তিনি ডাক দিয়েছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের চরম বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে। আজ ভারত-ইতিহাসের আর এক বিপর্যয়ের প্রতিরোধ, জাতিকে ও নিজেকে বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণে আমরা গল্প-ভারতীর সাহিত্য আসর থেকে সাহিত্যিক, সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিজীবীদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উদাত্ত আহ্বান

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্তা। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা। যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি সে স্বাধীনতা সর্ব্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি,—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের অবলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্খা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি, সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রাশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান যেকোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্ত্তি অসন্দ্য অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে, সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদের অঙ্গুলি-সংকেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে, সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন এটা যেমন সর্ব্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্দ্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পাঠক পাঠিকার কলম

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা এই মহানগরীর বুকে নেবুতলা অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তেরটি মেয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ে যায়, এই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন্দনায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি গান, 'সুজলাং সুফলাং'..... সুফলাং' এই বঙ্গভূমি স্বাধীনরাষ্ট্র হয়ে আজ দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হয়েছে। এই দেশে এত খাদ্যাভাব যে তেরটি বিদ্যার্থিনী অনাহারে ফুল গুকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। বর্তমান বাংলার এই নিদারুণ ছবিটি চোখের সামনে রেখে আজকের বঙ্গকবি দেশবন্দনার কী প্রশস্তি গাথা রচনা করবেন?

সাধারণ গৃহস্থ সংসারে আজ কী হাঁড়ির হাল হয়েছে! দু'বেলা দু'মুঠো ভাত—তা জোটানোও আজ আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্রের আওতার বাইরে।

তেলে-জলে বাঙালী, দুধে-ভাতে বাঙালী, মাছ-ভাতে বাঙালী—আজকে এ সব কথা উপকথার সামিল। অথচ উপরতলায় সমাজপতিদের লাফে-ঝিনার ঠিক ভাবেই চলছে। সিনেমার লাইন, খেলার মাঠের ভিড়, সংস্কৃতির রঙমঞ্চ দেশকল্যাণের গাল ভরা বুলি—এ-সবের মধ্যে যখন দেখি খাদ্যবস্তু অনিশ্চয়ের সূত্রে দুলছে, তখন ভাবি কত অসার আমাদের স্বাধীনতা। কত নিষ্প্রাণ আমাদের সমাজ চেতনা।

সারা ভারতবর্ষেই অভাব অনাটন কিন্তু বাংলাদেশ যেন সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

তেতো বাঙালীর ঘরে ভাত নেই, মেছো বাঙালীর পাতে মাছ নেই, তেলে-জলের শরীর বিশীর্ণ অপটু, চাকুরিজীবী বিত্ত পরিবার। কোলের শিশু দুধ পায় না,—ময়দা নেই, সুজি নেই, তরি-তরকারি দুর্মূল্য। ডাল আজ আছে, কাল নেই,—শেষ সম্বল ছানা সেটুকুও গেল। শুধু রইল রাষ্ট্রনায়কদের পরিকল্পনার সমারোহ। বড় বড় রাস্তা, বিজলী-বাতির সুউজ্জ্বল আলো, হর্ম্য-অট্টালিকা কিন্তু তা কাদের জন্যে?

কারা ভোগ করবে এই ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের রাষ্ট্রপরিকল্পনার সম্ভার? দেশের বৃহত্তর যে ভবিষ্যত সাধারণ বাঙালীর ঘরে যে মানব শিশুর দল,—তারা ওই তেরটি বিদ্যার্থিনী বালিকার প্রতিনিধি আজকের দিন যদি তাদের জীবনের অন্ধকারময় হয়, তাহ'লে কাদের কথা ভেবে আমাদের রাষ্ট্রপরিকল্পনা?

আপনারা তো সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক,—জাতির কথা সামগ্রিকভাবে আপনারাই ভেবে থাকেন এবং জাতিগঠনের মহান কাজ আপনারাই করে থাকেন। তেরটি অনাহারক্লিষ্টা বালিকার কথা সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে ভেবে দেখে—আপনারা কী আমাদের কোন আশার কথা বলতে পারেন?

নমস্কার

২৭৮, বি. টি. রোড। মায়া সরকার

অন্তরীক্ষ

লুপ লুকে নিন !
লুপ লুকে নিন !!

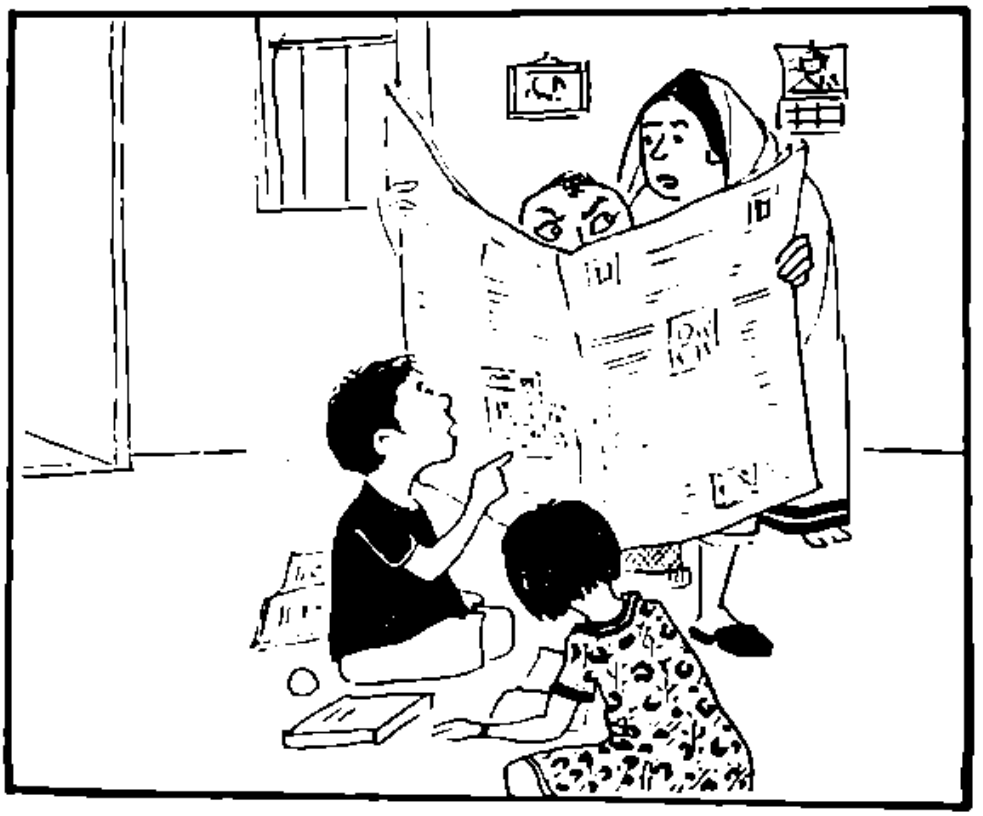

লু—উ—প
মানে কিরে দিদি

অবাক কাণ্ড

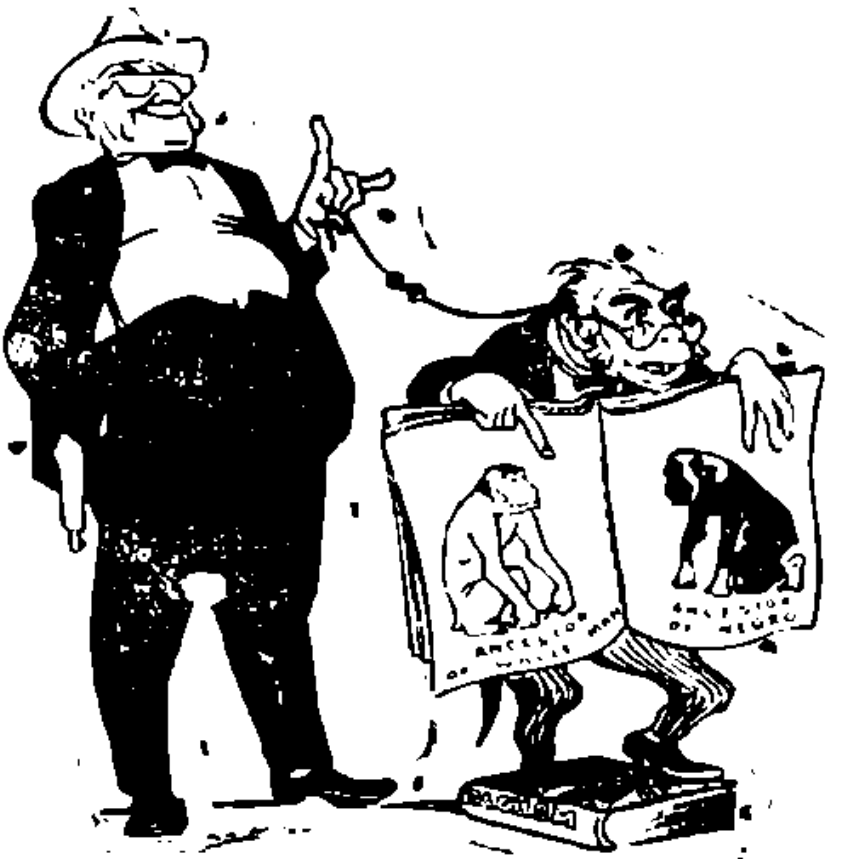

অভিনব আবিষ্কার

ফিলাডেলফিয়ার বৈজ্ঞানিক ডক্টর স্টিভেনশন কয় সম্প্রতি এক অভিনব আবিষ্কার করেছেন। স্টিভেনশনের মতে নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গদের উৎপত্তির মূলসূত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আদিম জন্তু থেকে।

চলতি দুনিয়া

একটি কুমারী মেয়ের আত্ম-সমীক্ষা

আমার বয়স চোদ্দ। আমি একটি স্কুলের ছাত্রী।

আমি এতদিন আমার সহপাঠিনী বন্ধুদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। কিন্তু এখন আর সে বন্ধুত্ব জমে না। কেননা,—দেহে নয়, মনের আকাঙ্ক্ষায় তারা আমার চেয়ে অনেক বাপ এগিয়ে গেছে। তারা সব সময়ে তাদের কিশোর বন্ধুদের নিয়ে প্রেম আলোচনায় মেতে থাকে। আমার তা ভালো লাগেনা; কেননা—যেসব ছেলেদের কথায় তারা মেতে থাকে,—তাদের কয়েকজনকে আমিও চিনি। আমি বেশি ছেলেদের চিনি না,—যাদের চিনি এবং জানি তারা আমার ভাই-এর মত—তাই তাদের পুরুষ-বন্ধু বলে আমি ভাবতেও পারিনে। আর এই মনোভাবের জন্যে আমি প্রকৃতই সুখী। আমার পক্ষে সেই সব ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করা বা তাদের নিয়ে মেতে থাকা সাজে না;—তাদের চুমু খাওয়ার কথা তো ভাবতেই পারি না। কিন্তু আমার বান্ধবীরা এ-বিষয়ে এতদূর এগিয়ে গেছে যে কুমারীত্বের কোন ধারই তারা ধারে না। আমি ভাবি এই চোদ্দ বছর বয়সেই যদি পর পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাই তবে চব্বিশ বছর বয়েস এলে করবো কী? আমার অভিভাবকদের মনেই বা কী ধারণা হবে? আমার মতন মেয়েদের চারদিকের পরিবেশ এমনিই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ কাল, যে এ-বিষয়ে অভিযোগ জানাবো কার কাছে? লজ্জায় এ-কথা মাকেও বলতে পারিনে।

বিলাতের সুবিখ্যাত পত্রিকা "উওম্যানস্-ওন-এ" প্রকাশিত একটি কুমারী মেয়ের চিঠি।

—উওম্যানস্‌ওন

কোন রং আপনাকে মানায়?

গায়ের-কাপড়ের রং গাঢ় হ'লেই যে কর্সা মানুষকে মানাবে এমন কোনো কথা নেই। লাল রঙের পোশাকে অনেক সৌখীন মেয়েদের বীভৎস দেখায় অথচ কালো মেয়েদের মানায়।

আবার বিস্কুট কিংবা হালকা নীল রঙের শাড়িতে অনেক কালো মেয়েকে বিশ্রি লাগে। শ্যামবর্ণা মেয়েদের সব চাইতে সুবিধা—লাল, কমলা, সোনালি, হলদে সব রঙের পোশাকেই যেন তাদের সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। পোষাকের রং ঠিক ঠিক করে বেছে নিতে পারলে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করে।

—'কেমিজা'

* * * *

মেয়েটির বয়েস মাত্র একুশ। তবু ডেনমার্কের রাজার মেয়ে বেনেডিক্ট ১৫৫,০০০ পাউণ্ডের অধিকারিণী। অবশ্য এই অর্থের অর্ধেকের মালিক তাঁর দিদি। দিদির বয়েস তেইশ। এই দুই বোনই রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাবেন। তবু দুই বোন কোপেনহেগেনের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে

চলে গেছেন নিজেদের বাড়িতে। ভবিষ্যতে যাতে সু-গৃহিণী হতে পারেন বেবেডিক্ট তারই পাঠ নিচ্ছেন আর তাঁর দিদি রন্ধন-বিদ্যার অনেকগুলি পাঠ ইতিমধ্যেই আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন।

• • • •

পশুদের ফরেন করার জন্য যাতু নির্মিত ফাঁদের ব্যবহার ব্রিটেনে নিষিদ্ধ, কারণ এই ফাঁদ ব্যবহার নিষ্ঠুরতার নামান্তর। তবে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হাজার হাজার এই ধরণের ফাঁদ প্রতি বছর বাইরের দেশগুলিতে রপ্তানী করা হয়। অবশ্য, ১৯৪৮ সালের পরে এই জিনিসটির ব্যবহার ইংল্যাণ্ড থেকে উঠেই গেছে। সম্প্রতি ওদেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা বলছে যদি ইংল্যাণ্ডে যাতব ফাঁদ ব্যবহার বে-আইনী হ'য়ে থাকে তবে ওই নিষ্ঠুর পদার্থটি তৈরি এবং রপ্তানী করাও অবৈধ ব'লে ঘোষণা করা হবে না কেন?

—ডেইলি মিরর

ইংল্যাণ্ডের একজন এম. পি. মন্তব্য করেছেন সমস্ত চোর ডাকাতকে নর-হত্যা করার পরও যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করা হয়, যদি দেশ থেকে মৃত্যু-দণ্ডই উঠে যায়, তবে আমিও এখান থেকে গ্রামের বাড়িতে থাকার সময় অস্ত্র হাতে না নিয়ে সদর দরজায় কখনো যাবো না। আর আমার সঙ্গে একটা পিস্তল সব-সময়ই থাকে, কাজেই বেশি রাতে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে খুন-খারাবিও ক'রে ফেলতে পারি।

—মিরর

বিভিন্ন দেশে ফৌজদারী অপরাধীদের সংখ্যা যেভাবে দিন দিন বেড়েই চলেছে তাতে আতংকিত না হ'য়ে উপায় নেই। জেলখানা তো এখন অপরাধীদের কাছে বিনা ব্যয়ে ছুটি কাটাবার আয়গা। জেলের ভয়ে আর তারা মোটেই ভীত নয়। তাই অপরাধ প্রতিরোধের এক অভিনব প্রস্তাব এনেছেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি করনেলিয়াস কমনওয়েলথ আইন সম্মেলনে। অস্ত্রোপচার ক'রে অপরাধীদের অঙ্গহানির প্রস্তাব। অবশ্য অন্যদেশের আইনজীবিরা এই ব্যবস্থাকে মানবতা বিরোধী ও বর্বর যুগের ব্যাপার ব'লে মনে করেন। তাঁরা বিচারপতি করনেলিয়াসের প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করছেন। বিলেতে নাকি একবার একদল ডাকাতকে জেলে না পাঠিয়ে তাদের পা কেটে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক পাকিস্তানের বিচারপতির প্রস্তাবটি ভেবে দেখার মতো।

—রয়টার

নেদারল্যাণ্ডসের রাণী জুলিয়ানা আদেশ দিয়েছেন এখন থেকে তাঁকে সম্বোধন ক'রে যে-সব চিঠি লেখা হবে তাতে যেন দাসত্ব সূচক কথা ব্যবহার না করা হয়। 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' কথাটা একবারের বেশি দুবার একই চিঠিতে ব্যবহার করা চলবে না। 'ইয়োর অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট' ইত্যাদি কথা এখন থেকে চিঠিতে একেবারেই বাদ দিতে হবে। অন্যত্র এই ধরণের ব্যবস্থা যে কবে থেকে হবে কে জানে!

• • • •

দিন দিন কতই না দেখবেন :

পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে বিলেতে কুমারী মেয়েদের মধ্যে এক নূতন খেয়াল দেখা দিয়েছে। তারা চুবি লকেটের মত করে কিছু দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে স্কুল, কলেজ এমনকি নাচের আসরেও যায়। আর মাঝে মাঝেই ওটা চোষে। তারা বলে এতে নাকি প্রচুর আমোদ ও আনন্দ পায় তারা।

—মিরর

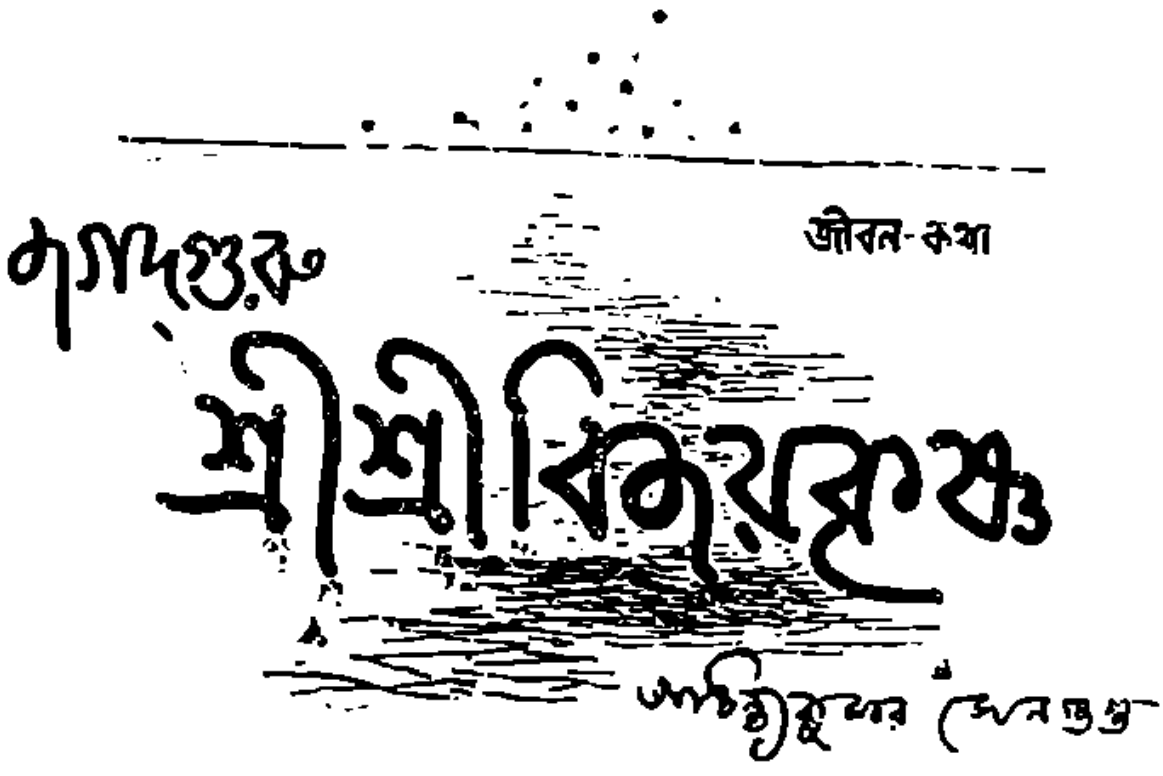

৩৪

দশরি পাড়ায় থাকে, বাড়ীগিরি করে, নাম ক্ষীরোদা সুন্দরী দাসী। গোঁসাই প্রভুর শিষ্য নিয়েছে। তার এ কী ভাব হল! দেখল, এ গোঁসাই কোথায়, এ যদুভূষ শ্রীগৌরাঙ্গ। দেখামাত্রই অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

তখন আবার তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সুরু করো নামকীর্তন।

ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্র হালদারের মা, ইনিও ব্রাহ্মিকা, গোঁসাইজির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে বসলেন। দীক্ষান্তে তাঁর মহাভাব উপস্থিত হল। তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারালেন।

প্রভু তাঁকে সুস্থ করে তুলতেই তিনি বলে উঠলেন 'আমি পেয়েছি, আমি দেখেছি—

'তাই তো আপনার দেহও চলে গিয়েছিল।' বললেন গোঁসাইজি।

'তবে আবার বাঁচালেন কেন?'

'এ শহর কলকাতা, না বাঁচালে যে পুলিশ এসে ধরত।' গোঁসাইজি হাসলেন: 'পাহাড় জঙ্গল হত দেহটা টেনে ফেলে দিতে বাধত না। তুমিও তখন মায়ামুক্ত হয়ে যেতে।'

বিশ্বাস কি কখনো দেখেশুনে হয়? অনেকে বলে অলৌকিক কিছু দেখলেই বিশ্বাস হবে। অলৌকিক কিছু দেখলেও অলৌকিকের সম্পর্কে তর্ক করবে। বিশ্বাস পেতে গেলেও, যাকে বিশ্বাস করব, সেই ভগবানের কৃপা দরকার।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে চান। বলে পাঠিয়েছেন, একটু নির্জনে বসে আলাপ করব।

গোঁসাইজি বললেন, 'এখানে নির্জনতা নেই। যে যখন চাইছে অমনি চলে আসছে। একজনের জন্যে আরেকজনকে ঠেকাব কী করে? এমনি চলে আসুন।

তাই এলেন কালীকৃষ্ণ।

ওঁর ঘরে এত ভোগ এত ঐশ্বর্য তবু ওঁর সুখ নেই। সত্য বলে মানেও ওঁর প্রাণের জ্বালার নিবারণ হচ্ছে না। কী করে শান্তি পাব বলুন।

প্রভু বললেন, 'ভগবান যাকে যা দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করলেই শান্তি।'

কালীকৃষ্ণ নিজের অন্তরের মধ্যে তাকালেন। আমাকে ভগবান কী দিয়েছেন?

'আপনাকে ভগবান অগাধ ধনৈশ্বর্য দেননি?'

'দিয়েছেন।' সবিনয়ে স্বীকার করলেন কালীকৃষ্ণ।

'তার সদ্ব্যবহার করুন।'

'কেন, আমি তো দান করি।'

'দান করেন, কিন্তু খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে। খবরের কাগজে নামটা ছাপা না হলে খুশি হন না। প্রভু বললেন স্নিগ্ধ স্বরে, 'প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করে সংগোপনে দিতে পারলেই শান্তি পাবেন।'

'মনি-অর্ডারে বা রেজেস্ট্রী করে পাঠাতে গেলেও তো নাম সই করতে হবে।'

'না, না, আপনি সরাসরি নামে পুরে পাঠিয়ে দিন।'

'যদি মারা যায়?'

'যাবে না, ভগবানের জন্যে দান করছেন, ভগবানই সে দান বহন করবেন।'

সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগই দান। কোনো সর্ত সংযুক্ত করে দিলে সে আর দান রইলনা। বস্তু নষ্ট হয়ে গেল। দত্ত দ্রব্য আগুনে দগ্ধ হলে হবে, জলে পড়লে পড়বে, পথে মারা গেলে যাবে, আমার শুধু দানেই পরিতৃপ্তি। দানেরও একটা পিপাসা থাকা দরকার। ভয় বা স্নেহ লজ্জা বা মান, বংশমর্যাদা বা প্রত্যুপকার —এরকম কোনো প্রয়োচনায় যে দান সেটা খাঁটি দান নয়। দান করে যদি অনুতাপ হয়, তাও নয়। যে দান ফলাভিসন্ধিহীন দানের পাত্রকে দেখলেই যা আপনি থেকে উৎসারিত হয়ে ওঠে তাই দানসদাচার।

প্রভু ঠিক করলেন আবার বৃন্দাবনে যাবেন।

'আপনি বৃন্দাবনে গেলে আমার কী উপায় হবে?' এক সাধু এসে কেঁদে পড়ল।

'কেন, আপনার অসুবিধে কী!'

'প্রতিদিন আপনি আমাকে খেতে দিতেন।' বললে সাধু, 'আপনার যাবার পর কেউ আমার দিকে মুখ তুলেও চাইবে না।'

'তা হলে কী করবেন?'

'আমি হরিদ্বারে চলে যাব।' সাধু দ্বিধা প্রস্তের মত বললে, 'কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য আমাকে ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করে দিন।'

প্রভু ধ্যানমগ্ন হলেন।

কতক্ষণ পরে ভোলাগিরির এক ভক্ত এসে উপস্থিত। এসে প্রভুর পায়ের কাছে পাঁচটি টাকা রাখল। প্রভু চোখ মেলে বললেন, এই যে আপনার প্রাপ্য টাকা ভগবান রেখে গেলেন।

সাধু টাকা নিয়ে চলে গেল।

প্রভু বললেন, 'যখন সাধু এসে টাকা চাইল মনে হল নিজের পথের সম্বল যা আছে তার থেকে সাধুকে দিয়ে দিই। গুরুদেব তখুনি ধ্যানে এসে নিষেধ করলেন, সাধুকে কিছু দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু আমার প্রাণ যে কিছু সাহায্য করবার জন্যে কাঁদছে। তখন ভগবান এই ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দয়া নিরন্তর, নিরবধি।'

বৃন্দাবনে, যাচ্ছেন, সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, বাড়ির মেথর এসে প্রণাম করলে প্রভুকে।

গোসাইজি সেই প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন করজোড়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।'

মেথর কাঁদতে লাগল। শিষ্যভক্তের দল অভিভূত হয়ে গেল।

এতে অভিভূত হবার কী আছে? গোস্বামী প্রভু বললেন, সমস্ত মানুষের চরণতলেই ভগবৎ প্রাপ্তির সরণি।

কেশীঘাটে কালাবাবুর কুঞ্জে এসে উঠলেন গোসাইজি। সেখানে কিছুদিন থেকে চলে এলেন তীর্থমণি কুঞ্জে। বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতধাম। এর এক একটি রজকণা এক একটি মহাবিষ্ণুতুল্য। এই ধামের তরুগুল্ম সাধারণ তরুগুল্ম নয়। সকলেই ছদ্মবেশী দেবতা। শুধু একটি সূক্ষ্ম যবনিকা এই দিব্যধামকে আবৃত করে আছে। একটু চোখের আড়াল ভাঙলেই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। থাকো, দেখ আর দেখতে শেখ। এখানে এলেই তো সমস্ত পাপ নাশ সমস্ত প্রারব্ধক্ষয়।

গোস্বামী শিষ্য বেনীমাধব গৌর লীলার গান ধরেছেন:

গৌর অনুগত না হলে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়
আমরা জেনে শুনে প্রাণ সঁপেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায়।
নয়নরঞ্জন চরণ আঁখি কত দুঃখী তাপীর দুঃখ পাসরা
নবদ্বীপের নবগোরা দেখবি যদি আয়।
দ্বিজ গোসাই চাঁদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম না নিলে
কি করবে তার বিদ্যা-কুলে, বৃথা জনম যায়।'

এক শিষ্য এসে গোসাইজিকে বললে, 'আপনার সাধন আপনি ফিরিয়ে নিন।'

'কেন, কী হল?' গোসাইজি শান্তনেত্রে তাকালেন।

'আমরা সংসারী লোক, আমরা কি এ সব সাধন করতে পারি?'

'কেন, বেশি কিছু তো নিয়ম নেই, শুধু মদ মাংস উচ্ছিষ্টমাত্র খেতে নিষেধ। মদ মাংস না খেয়ে পারো না?'

'কী করে পারব বলুন। চিরকাল ও দুটো খেয়ে এলাম, এখন কি আর ছাড়া যায়? ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে গেলেই ওসব খেতে হয়। আর উচ্ছিষ্ট? সমাজের মধ্যে বাস করি, দশ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হয়, তাতে উচ্ছিষ্ট বিচার চলে কী করে?'

গোস্বামীপ্রভু হতাশ হলেন না, সস্নেহে বললেন, 'আচ্ছা একটু চেষ্টা করো। তারপর না পারলে আর কী করবে।'

শিষ্য স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'ও সব চেষ্টা-টেষ্টায় ভরসা আমি করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কী, কোনো চেষ্টাই আসেনা মনের থেকে। আজ আপনাকে সত্য কথাটা বলে ফেলে পরিষ্কার হতে এসেছি।

'একটু অন্তত নাম তো করতে পারো।'

'নামেতে রুচি নেই। কখনো-কখনো নামও মনে আসে না। নাম যে করতে হবে সে-কথাটাও ভুলে যাই।'

'বেশ, আমাকে শুধু স্মরণ কোরো।' বললেন প্রভু, আরও তুমি জেনে রাখো যা তুমি অপরাধ করবে সমস্ত দণ্ড আমি ভোগ করব। কোনো অপরাধই তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি দণ্ডমুক্ত দায়মুক্ত হয়ে গেলে।'

এত দয়া, এত স্নেহ! শিশু প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল: 'আমার অপরাধের দণ্ড আপনি ভোগ করবেন! আর আমি নিরঙ্কুশ ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াব?'

অঝোরে কাঁদতে লাগল শিশু। আর বুঝি তার ভুল হবে না, ঘটবে না বিচ্যুতি।

ভগবানে চিত্ত সমর্পণ ও অচলা ভক্তি আসবে কিসে?

স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থপাঠে ও নামজপে, সৎসঙ্গে, বিচারে আর ধ্যানে। বিচার—কী বিচার? বিচার অর্থ সর্বদা আত্মনিরীক্ষণ। যদি বোঝো আত্মপ্রশংসা ভালো লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তা হলে মনে করবে ধর্মবিচ্যুতি ঘটল, নরকের দ্বার প্রশস্ত হল। আর দানের অর্থ দয়া, কাউকে প্রাণে কষ্ট না দেওয়া। শুধু মানুষকেই নয়, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গ কাউকেও কষ্ট দেবে না। সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অহঙ্কার। লোকের কাছ থেকে সম্মান নিতে নিতে শুধু নিজের কাপটাই বাড়ে, তাই লোকের সামনে যত হীন ও মলিন রূপে পরিচিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বৃন্দাবনে যমুনা তীরে কতগুলো প্রেত এসে গোসাইজীর কাছে উপস্থিত হল। বললে, 'আমাদের সদ্গতি করুন।'

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই জানিনা। আমার গুরুদেব জানেন।'

'ও সব কথায় কাজ নেই। আপনি যমুনার জলে নামুন।'

ঠাকুর নামলেন। উঠে এলে প্রেতগুলো তাঁর পা থেকে জল নিয়ে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে ওদের কালো মূর্তি জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল।

খবর পৌঁছুল ভক্ত মহেন্দ্র মিত্রের কাছে। বললে, 'প্রেত উদ্ধার হল, আমরাও যা চরণামৃত ছাড়ি কেন?'

জোর করে মহেন্দ্র নিল চরণামৃত। পিপাসু ভক্তদের বিতরণ করল। সবাই সেই অমৃতে আতরের গন্ধ পেল।

এই মহেন্দ্র মিত্রই গোসাইজিকে নিয়ে গান বাঁধল:

'ভালো ভালো জটে বুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন,
লং সাহেবের গির্জা দেখে বলে গিরি গোবর্ধন।
গরুর গাড়ির চাকা দেখে বলে চক্র সুদর্শন,
কেশব সেনের চশমা দেখে বলে কালীর বাঁকা নয়ন।'

শুনে গোসাইজির কী আনন্দ!

এবারে বৃন্দাবনে মণিমুকুট বাবাকে লাভ করলেন ঠাকুর।

বাবাজী ন-বছর বয়সে বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে চার-পাঁচ বছর ঘুরে বেড়াবার পরে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন। হিমালয়ে বহুবছর কঠোর সাধনা করে কৈলাসে চলে যান। সেখানে কৈলাসপতির দর্শন লাভ করেন। কিন্তু আপনা থেকেই অন্তরে বৃন্দাবনের মধুর লীলা স্ফূর্তি পেতে থাকে। আদেশ হয় বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করো। চলে এলেন বৃন্দাবন। কিন্তু কোথায় সেই সদ্গুরু যিনি তাঁকে ব্রজলীলা উপলব্ধি করাবেন। ঘুরতে

ঘুরতে রাধাকুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে রাধারাণী স্বপ্ন দিলেন, বললেন, কেশীঘাটে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলেই তোমার বাসনা চরিতার্থ হবে।

কেশীঘাটে এসে গোসাইজির দেখা পেলেন সাধু। শিবের কথা, রাধারাণীর কথা সব বললেন তাঁকে। প্রভু তার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন। তার ফলে সাধুর কৃষ্ণদর্শন হল।

তুমি যে হরি তা বুঝি কী করে? তখনই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ একটি মযূর হয়ে গেলেন আর কোলা ঝাড়া দিয়ে কতগুলো পালক ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বাবাজী পালকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা মুকুট তৈরি করে মাথায় পরলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল ময়ূর মুকুট বাবাজী।

পাতা গোবিন্দজীর প্রসাদ এনে দিয়েছে গোসাইকে। বাড়ীর আবর্জনা সাফ করে যে মেথরানি তাকে প্রভু কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি মার সমান। মার মতন তুমিই সন্তানের সেবা করছ, এই নাও তোমার জন্যে গোবিন্দজীর প্রসাদ রেখেছি।

দুই হাত একত্র করে মেথরানি প্রসাদ নিল। বললে, 'কেউ আমাদের এমন করে ডাকে না, বলে না—'

নামেই সব—বললেন গোস্বামীপ্রভু। শরীর থেকে অহংকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলই নাম। শরীর হতে আমি পৃথক এ উপলব্ধি করতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা খুব কঠিন কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি একবার ঠিকমত গেঁথে নিতে পারলেই আত্মদর্শন।

বৃন্দাবনে ছ সাত মাস থেকে প্রভু ফিরলেন কলকাতা, সেখান থেকে কয়েক দিন পরে ঢাকায় চলে এলেন। সেখানে মাঘমাসে, ধুলট হবে বলে জানালেন সকলকে।

হাজারে হাজারে লোক এসে জড়ো হল সেওরিয়ায়। উৎসবের আনন্দ-বাজার বসে গেল। স্থানাভাবের দরুন কত যে তাঁবু পড়ল তারও হিসেব নেই। কত যে কীর্তনের দল এসেছে তারই বা কে খোঁজ করে?

কীর্তন আর কীর্তন—চলেছে অন্তহীন অমৃত নির্ঝর। কীর্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রভু জয় শচীনন্দন বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন, কখনো বা নাচছেন উন্মত্ত হয়ে। ধুলটের শেষদিনে নগরকীর্তন বেরুল। আর গান উঠল ভুবনমাতানো :

'দয়াল নিতাই ডাকে আয়
প্রেমধন বিলায় গৌর রায়
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে)

সমস্ত ঢাকা শহর কীর্তনে উন্মাদ হয়ে উঠল। শরীর অসুস্থ বলে গোস্বামীপ্রভু ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন মিছিলের পিছনে, কিন্তু তিনি একাই সমস্ত অগ্রপশ্চাৎ জ্যোতির্ময় করে রেখেছেন। তাঁকে ঘিরেই একটা আনন্দ-অঘুধি উল্লসিত হয়ে উঠেছে। শ্রীধর নাচছে আর ঊর্ধ্বে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখ ক্ষীরোদ সাগর! ঐ দেখ শ্বেত দ্বীপ। যে যাকে দেখছে তারই পদধূলি নিচ্ছে ভক্ত—পদধূলিই জীবনের পরম সম্পদ—রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মাখছে। কীর্তন বেরিয়ে যাবার পর, যারা কীর্তনে যোগ দেয়নি, তারা রাস্তায় এসে মুঠো-মুঠো ধুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে, গায়ে মাথায় মেখে পবিত্র হচ্ছে। চলেছে এক পরমপাবনী উন্মাদনা।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক সৈন্যবাহিনী, তারা কীর্তনের জন্যে পথ করে দিল, কেউ কিছু বলে নি, কারো বন্দুক অবনত করল।

আশ্রমে ফিরে এল কীর্তনের দল। প্রভু বললেন, 'আজ যে চাইবে সেই সাধন পাবে।'

সকাল ন'টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত চলল সাধন বিতরণ। প্রায় পাঁচশো লোক পেয়ে গেল কৃপাময়।

আশ্রমের গাছগুলো মধুক্ষরণ করতে লাগল। গাছের সমস্ত পাতা ভিজে রয়েছে, মেঘের থেকে বর্ষণ নেই, তবে কেন এই আর্দ্রতা। গাছের গা কেটেও রস ঝরছে। সকলে আস্বাদ করে দেখছে, মধু। গাছের কীর্তনানন্দ।

ঢাকায় এই শেষ ধুলোট।

উৎসব শেষে প্রভু বললেন, কলকাতায় যাব।

কৃষ্ণ বুঝি মথুরায় চললেন? তাঁর লীলাস্থল গোকুলবিহার ছেড়ে কি আর ফিরবেন না? ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণের জন্যে কাতর তেমনি ঢাকাবাসীরা বিজয়কৃষ্ণের জন্যে কাতর হয়ে উঠল।

কোথায় প্রভুর কোন লীলা হবে তা কে বলবে?

হরিদাস বসু বোলপুরে ওকালতি করে। হিন্দুধর্ম আগোগোড়া কুসংস্কারে জড়িত এই জ্ঞানে সে ব্রাহ্ম হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মবিধি পালন করেও তার মনে সুখ নেই। পরব্রহ্ম শুধু একটা কথার কথা। পাপ পুণ্য শুধু সামাজিক সংস্কার। এই সব বিবেচনা করে ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সে পুরোদস্তুর বিষয়বিলাসে মত্ত হয়েছে। হায়, সেখানেই বা শান্তি কোথায়? ইন্দ্রিয় সেবায় শুধু স্বাস্থ্যের অপচয়।

বোলপুরে তার বন্ধুরা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করে, চক্র তৈরি করে বসে পরলোকবাসীদের আনায়, তাদের সঙ্গে আলাপ করে। বন্ধুর এক যুবতী স্ত্রী এ-চক্রের মধ্যমণি বা মিডিয়ম। তার মুখ দিয়েই কথা কয় আত্মারা।

হরিদাস বলে, যাব।

একদিন বৈঠকে দেখা গেল যুবতীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, সর্বাঙ্গে জ্যোতিচ্ছটা। এই গাম্ভীর্য লাবণ্য তো যুবতীর নিজস্ব নয়। তবে আজ কে এল?

যুবতীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল: 'আমি অঘোরনাথ। হরিদাসকে ডাকো।'

হরিদাসকে ডেকে আনা হল।

হরিদাস শুকর্ণে শুনল অঘোরনাথ বলছে, 'কলকাতায় যাও। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও।'

শুকর্ণে শুনেও হরিদাস যেতে চায় না। বলে ভূতের মুখের কথা শুনে যেতে প্রস্তুত নই।

কিন্তু না গিয়েও তো শান্তি পাচ্ছে না। ভূত কেবলই তাড়া দিয়ে ফিরছে। এ যে সে ভূত নয়। স্বয়ং অঘোরনাথ।

তারপর একদিন গেল হরিদাস। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করল। প্রভু বললেন, 'কাল এস।'

'কখন?'

সময় ঠিক করে দিলেন। কিন্তু হরিদাসের যেতে দেরি হয়ে গেল। দু'দশ মিনিটের ব্যবধানে কী আর এসে যায়?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, ধর্মের প্রথম কথাই হচ্ছে সময় নিষ্ঠা। যার সময়-নিষ্ঠা নেই তার তো ধর্মই নেই। হবে হচ্ছে এই গয়ং গচ্ছ ভাবে ওকালতি চলে কিন্তু কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার চলে না।

হরিদাস বোলপুরে ফিরে এল। [ক্রমশঃ]

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন-রহস্য

বররুচি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অপরাজেয় যাঁর আত্মপ্রত্যয়, অদম্য যাঁর প্রাণ শক্তি এবং অপ্রতিরোধ্য যাঁর গতি, তাঁকে ধ্বংস করা মানুষের সাধ্য নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই মনের সমস্ত হতাশা আর অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে চার্লি আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

শত ক্ষুব্ধতার মধ্যেও জীবনে তিনি দুঃখবাদের আদর্শকে আসন দেননি। আজও তাঁর বিশাল রাজনৈতিক প্রভাবে আমেরিকার জনসাধারণ সাময়িক ভাবে তাঁর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হলেও, চিরদিন তারা বিরূপ থাকবে না, আমেরিকার জনসাধারণের রসবোধ শুকিয়ে যায়নি এবং তাঁর ছবি দেখে আনন্দ পাবার ইচ্ছা তারা আজও পোষণ করে।

অতএব ছবি করতে হবে।

কি ছবি এবার?

এবার প্রেমের ছবি। হাজলিটের কথা মনে পড়ল চার্লির, বুদ্ধির চেয়ে আবেগের আবেদন অনেক বেশী এবং কোনো শিল্পকর্মের উৎকর্ষে আবেগের অবদান কম নয়।

তাছাড়া চার্লি মনে করলেন, হাঁসিয়ে তার্দুর প্রেম, অবিশ্বাস এবং পৃথিবীর প্রতি তীক্ত বিদ্বেষের পর একটি বাস্তবিক্রমপহীন সহজ সরল প্রেমের গল্প দর্শকদের আকৃষ্ট করবে অনেক বেশী।

ছবির নাম হল 'লাইমলাইট'। এর প্রস্তুতিপর্বে ১৮ মাস সময় লাগল! এর মধ্যে যে ব্যালে সঙ্গীত সংযোজিত করেছিলেন চার্লি, তা ছিল খুব দুরূহ ব্যাপার। সেই কাজে তিনি পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ ব্যালে শিল্পীকে আহ্বান করলেন এবং তাঁরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে হলিউডে এলেন। আস্ত্রে এগলেভস্কি এবং মেলিসা হেডেন। নর্তক এবং নর্তকী।

নায়িকার ভূমিকার অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী সংগ্রহ করা কঠিন হল। সেই ভূমিকার জন্যে চাই সৌন্দর্য, বুদ্ধি এবং আবেগ প্রকাশ করার অবাধ ক্ষমতা।

বহু সন্ধান এবং পরীক্ষার পর ক্লেয়ার বুথ নামে অভিনেত্রীটি সেই ভূমিকায় নির্বাচিত হলেন।

চার্লির চরিত্রে বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা কোনদিন বাসা বাঁধেনি। চার্লি বলেছেন মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এমন কিছু আছে যা তার মন থেকে ঘৃণা এবং তিক্ততাকে দূর করে দেয়। কিছুদিন আগেই যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন তিনি মানুষের ষড়যন্ত্রে, তার কোনো রেশ তাঁর মনে রইল না। মনের আনন্দে তিনি নতুন ছবির কাজে মেতে রইলেন। দাম্পত্য জীবনে পূর্ণিপূর্ণ সুখের আস্বাদ তিনি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে উনার চারটি সন্তান জন্মেছে—জেরালডাইন, মাইকেল, জোসী এবং ভিকি। আদর্শ সহধর্মিনী উনা। একাধারে গৃহিনী, সচিব এবং সখী।

বিভারলি হিলস্-এর বাড়ীতে যেন নিত্য উৎসব। অতিথি অভ্যাগতের নিত্য আগমন। নানা স্তরের এবং নানা ধরণের অনেক বন্ধু চার্লির।

দার্শনিক উইল ডুরাণ্ড, চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্, সমাজসেবী ক্লেয়ার বুথ লুস, লেখক অ্যালডুস হাক্সলী ও থিয়োডোর ড্রেজার আরো অনেক নামকরা শিল্পী, অভিনেতা, কবি এবং সাহিত্যিক ওঁর বাড়ীতে আসেন নিয়মিত।

• • • •

লাইম লাইট ছবির শুটিং শেষ হলো।

কয়েকজন বন্ধুদের ছবিখানি দেখালেন চার্লি। তাঁরা সকলেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলেন।

চার্লি স্থির করলেন ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে এই ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেজন্য তিনি সপরিবারে ইয়োরোপ যাবেন।

ইয়োরোপে যাবার জন্যে অন্য তাগিদও ছিল। হলিউডের সংস্পর্শ এবং প্রভাব এড়িয়ে ইয়োরোপের কোন বোর্ডিং-স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করে দেবার জন্যে উনা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

রীতি অনুযায়ী পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে দেশে পুনঃপ্রবেশের দরখাস্তটি তিনমাস আগেই দাখিল করে দিয়েছিলেন চার্লি। কিন্তু তার জবাব আর আসেনা। চার্লি পত্র দিয়ে তাদের স্মরণ করালেন। কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা।

অবশেষে অধৈর্য্য হয়ে তিনি ওয়াশিংটনে এক পত্র দিলেন। তাঁর ইয়োরোপ যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। পুনঃপ্রবেশের অনুমতিপত্র আসুক আর না আসুক তাঁকে ইয়োরোপ যেতেই হবে।

সপ্তাহ খানেক বাদে পররাষ্ট্র (ইমিগ্রেশন) দপ্তর থেকে তিনি এক টেলিফোন পেলেন। তাঁরা তাঁকে সামনা সামনি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চান। তাঁরা কি চার্লির বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন?

নিশ্চয় পারেন। চার্লি জানালেন।

তাঁরা এলেন। তিনজন পুরুষ একজন মহিলা। মহিলাটির হাতে একটি ছোট টাইপরাইটার। পুরুষ তিনজনের হাতে তিনটি টেপ রেকর্ডার। টেবিলের একধারে তাঁরা বসলেন। অন্যধারে চার্লি।

তাঁদের মুখপাত্র সোমত্থমুখো লোকটি একতাড়া কাগজপত্র সামনে রাখলেন। তারপর চার্লির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন আপনার আসল নাম?"

চার্লি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ"।

—"অনেকে বলে আপনার নাম—(এখানে তিনি একটি অদ্ভুত বিদেশী নাম বললেন)। এবং আপনাদের আদিনিবাস গ্যালিলিয়ায়।"

—"না। আমার নাম চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন। আমার বাবারও ঐ নাম ছিল। আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসী। আমার জন্ম লণ্ডনে।"

—"আপনি বলেছেন যে আপনি কমিউনিষ্ট নন?"

"—হ্যাঁ বলেছি। আমি আমার জীবনে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লেখাইনি।"

—"কিন্তু একটি বক্তৃতায় আপনি শ্রোতাদের কমরেড বলে সম্বোধন করেছিলেন। ঠিক কিনা?"

—"ঠিক।"

—"তার মানে কি?"

—"কমরেড শব্দের মানে যদি জানতে চান, অভিধান দেখুন। কমিউনিষ্টরা তো আর ঐ শব্দটির সৃষ্টি করেনি।"

প্রশ্নকর্তার মুখে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা সরল না। তারপর আবার শুরু হলো।

—"শত্রুরা যদি এই দেশ আক্রমণ করে, আপনি কি এই দেশের হয়ে লড়বেন?"

—"নিশ্চয় লড়বো। এদেশকে আমি ভালবাসি। এই দেশেই আমার ঘর। এদেশে আমি ৪০ বছর বাস করছি।'

—"কিন্তু আপনি এদেশের নাগরিক হননি।"

—"এসম্বন্ধে তো কোনো বিধিনিষেধ বা আইন নেই।"

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর চার্লি বললেন "আমার এই যে হয়রানি আর বিপদ কেন তা জানেন? আপনাদের সভর্ণমেণ্টের একটি অনুরোধ রেখেছিলাম। তাই।"

তাঁরা সবিস্ময়ে চার্লির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চার্লি বলতে লাগলেন—"আপনাদের রুশ রাষ্ট্রদূত মিঃ জোসেফ ডেভিসের সানফ্রানসিসকোর রুশ-যুদ্ধ-ত্রাণ সমিতির সভায় বক্তৃতা করবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন সরকারের এক মুখপাত্র তাঁর জায়গায় আমায় বক্তৃতা করতে বলেন। সেই বক্তৃতাই আমার কাল হল। তারপর থেকেই আপনাদের তাড়া খাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা চলে গেলেন। এবং তারপর দু'একদিনের মধ্যে চার্লির কাছে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতিপত্র এলো।

• • • •

স্থির হল বিতারিস হিলস-এর বাড়ি থেকে চার্লিরা যাবেন নিউইয়র্কে। সেখান থেকে জাহাজে করে প্যারি যাবেন।

যাত্রার আগে উনা যখন শেষবারের মতো সংসারের কাজের ভার ভৃত্যদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তখন চার্লি বাড়ির বাইরে বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এতদিনের সুখ দুঃখের নীড়। তাকে ছেড়ে যেতে হবে। মনের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতি। দুঃখ লাগছে বৈকি! তিটা ছেড়ে যাবার একটি বেদনা আছে যা বুঝি সকল মানুষকেই নাড়া দেয়। সেই বেদনা চার্লির মনেও।

তৃতীয় দল বিদায় জানাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াল। সকলেরই চোখে জল। চার্লি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর দুচোখের দৃষ্টিও ঝাপসা।

নিউইয়র্কে তাঁরা এক সপ্তাহ কাটালেন।

সেখান থেকে যাত্রার আগের দিন আবার এক বিপদ। চার্লির এটর্নি চার্লস লোয়াজ এসে জানালেন, ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর এক কর্মচারী কোম্পানীর নামে তার চাকরি যাবার জন্যে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছে এবং চার্লির নামে সমন বার করেছে। অবশ্য এ এক বড়যন্ত্র।

কিন্তু এই সমন যদি চার্লির হাতে দেওয়া যায় তাহলে তাঁকে যে কোন মুহূর্তে কোর্টে হাজির হবার নির্দেশ আসতে পারে। অর্থাৎ তাহলে তাঁর ইয়োরোপ যাত্রাটাই মাটি হয়ে যাবে।

চার্লি প্রমাদ গণলেন! এ আবার কী উড়ো ঝঞ্ঝাট! কী করা যায় তাহলে এখন?

এটর্নি উপদেশ দিলেন, এখন সরে থাকা! অর্থাৎ সমন যাতে তাঁর হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। তারপর একবার জাহাজে উঠে পড়তে পারলে আর জাহাজ ছেড়ে দিলে, আর কোন চিন্তা নেই।

তাই করতে হল। অর্থাৎ চার্লি নিজের ঘরে খিল লাগিয়ে বসে রইলেন। কী দুঃসহ অবস্থা।

উনা এবং ছেলেমেয়েরা নিউইয়র্কের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চার্লি তাদের সঙ্গে নেই। তিনি যেন নিউইয়র্কেই নেই।

জাহাজে চড়বার দিন চার্লি খুব ভোরবেলাই একা গিয়ে জাহাজে উঠলেন। উদ্দেশ্য সমন-ওয়ালাদের চোখচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া।

দশ বছর ধরে চার্লি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাতে বুঝলেন, বিপদ এড়াবার জন্যে তাঁর এটর্নির পরামর্শ মত চলাই ভাল। শেষ সময়ে আর বিপদ না বাড়ে।

উনারা যথা সময়ে জাহাজে এসে উঠল। চার্লি তাঁর কেবিনে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। উনা দরজায় ধাক্কা দিল।

—"আমি উনা। দোর খোল।"

দরজা খুললেন চার্লি!

—"তারা জাহাজে আসেনি তো?"

উনা হেসে বললে,—"না, তারা জেনেছে, তুমি নেমে যাচ্ছো। তাই তারা এরোড্রোমে গিয়ে ঘুরছে।"

—"বাঁচা গেল। তাহলেও সাবধানের মার নেই। জাহাজ যতক্ষণ না ছাড়ে ততক্ষণ কেবিনে বন্ধ থাকাই ভাল।'

অবশেষে যথাসময়ে 'কুইন এলিজাবেথ' নোঙর তুলল।

বাঁশী বাজল। জাহাজের ইঞ্জিনের গর্জন শুরু হল। ধীরে ধীরে 'কুইন এলিজাবেথ' অসীমের দিকে তার যাত্রা শুরু করল।

চার্লি কেবিনের উপর এসে দাঁড়ালেন। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। আর কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই। এবার তিনি মুক্ত স্বাধীন, সকল নিপীড়ন আর ষড়যন্ত্রের দুঃসহ গণ্ডির বাইরে অন্য পৃথিবীর যাত্রী।

সামনে যেন নতুন আকাশ। নতুন সূর্যোদয়।

আহারে আছেন কয়েকজন পরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয় মহিলা। তাঁদের সঙ্গে চার্লির সময় কাটতে লাগল হাসি আর আনন্দের মধ্যে।

পরদিন সাতের সময় চার্লির অন্যতম সেক্রেটারী হ্যারি ক্রকার তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর হাতে একটি তারবার্তা দিলেন। বললেন, "বেতারে তারা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনি দুমিনিটের জন্যে যদি কেবিনে আসেন তো ভাল হয়।"

চার্লি উঠে এলেন। কেবিনে গিয়ে পড়লেন সেই তারবার্তা। ইউনাইটেড প্রেস খবর দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র চার্লিকে আমেরিকায় ফিরে যাবার পাসপোর্ট বাতিল করেছে, অর্থাৎ তিনি আর আমেরিকায় ফিরতে পারবেন না। যদি তিনি ফিরতে চান তাহলে তাঁকে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুসন্ধান কমিটির কাছে দরখাস্ত করতে হবে এবং তাঁকে রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক অপরাধের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ইউনাইটেড প্রেস জানতে চায় এই সংবাদের উপর চার্লির কোনো মন্তব্য আছে কিনা।

চার্লির মাথাটা যেন আগুনের আলা ধরল। ইচ্ছা হলো বলেন যে, সকলকে জানিয়ে দাও যে আমেরিকার মত নির্বোধ, বিবেকশূন্য, বিদ্বেষপরায়ণ, অধম দেশে তিনি আর কোনদিন ফিরবেন না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হল, এই সব কথা বলায় বিপদ হয়ত বাড়বে। তাঁর যথাসর্বস্ব যে সেই দেশে রয়েছে। যদি তারা তাঁর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁর বিরাট সম্পত্তি টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করে নেয় তাহলে সে তাঁকে একেবারে ফকির হয়ে বৌ ছেলেমেয়ের হাত ধরে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে হবে।

চার্লি বিবৃতি দিলেন, বললেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে বিধিবদ্ধভাবে যে ছাড়পত্র দিয়েছেন তা বিনা কারণে বাতিল হয়ে যাবে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। যাই হোক আমেরিকায় ফিরে তিনি সরকারের নির্দেশমত কাজ করবেন।

* * * *

লণ্ডনে পৌঁছেই চার্লির প্রথম কাজ হলো উনাকে আমেরিকায় পাঠানো। সেখানকার সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করা এবং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আর তার সেফডিপোজিট ভল্ট থেকে দলিলপত্র এবং কোম্পানীর কাগজগুলি নিয়ে আসা।

আমেরিকা থেকে আসবার আগে চার্লি এটর্নীর পরামর্শমত উনার নামে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। বিভারলি হিলস্-এর বাড়ীখানা বিক্রী করবার ব্যবস্থাও পাকা করে এসেছিলেন। উনাকে গিয়ে এটর্নীর কাছে কাগজপত্রে সই দিয়ে আসতে হবে।

ধন্য মেয়ে উনা। বললে, "তুমি কিছু ভেবনা। আমি যাব আর আসব।" চার্লির দুর্ভাবনার শেষ নেই। উনা তো তাঁর সঙ্গ ছাড়া একা কোনোদিন কোথাও যায়নি। তাছাড়া বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা যে ধরণের কাজ, সে একা সামলাতে পারবে তো!

উনা হেসে বললে,—"তোমার স্ত্রী আমি, তোমার সঙ্গে এতদিন কাটালাম, এটুকু শিক্ষাও কি আমি পাইনি মনে কর।"

প্লেনে করে উনা চলে গেল। ঝাপসা চোখে চার্লি এরোড্রোমে দাঁড়িয়ে দ্রুত অপসৃয়মান সেই প্লেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দশদিন পরে উনা ফিরে এল অনেক গল্প করল। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কেমন করে তার সই

তাড়াতাড়ি করে মিলিয়ে দেখল তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে চক্ষু খুলে তার হাতে ছোট লিপুকটি দিয়ে দিল তা বলবার সময় উনার মুখে কৌতুকের ভঙ্গি ফুটে উঠল।

বিভারলি হিলসএর বাড়ীর পরিচারকবর্গের হাতে উনা যখন এক একটি মোটা টাকার চেক্ দিতে লাগল তখন তারা কেঁদে আকুল হয়েছিল, সেকথা বলতে বলতে উনা নিজেও কেঁদে ফেলল।

তারপর উনা জানাল যে প্রধান পরিচারক হেনরির মুখে উনা শিয়ে শুনল যে এর মধ্যেই দু'তিন দিন গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে ভৃত্যদের নানারকম প্রশ্ন করেছে। চার্লি চ্যাপলিন কি রকম লোক, দিনে রাতে কতখানি মদ খায়, কোন জাতের লোক, তার কতজন কমিউনিষ্ট বন্ধু আছে, রাত্রে তার বাড়ীতে নাচগানের অনুষ্ঠান হয় কিনা এবং সেইসব অনুষ্ঠানে কারা কারা আসে, এই ধরণের যতসব আজগুবি প্রশ্ন।

বলতে বলতে উনার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল, বললে—"সেই মুহূর্তে দেশের প্রতি যেটুকু মায়া ছিল তাও অন্তর্হিত হল। লজ্জায় ঘেন্নায় যেন মরে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল কতক্ষণে এই পাপ রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসব।"

চার্লিকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন করে তিনি আমেরিকার কাছে এতখানি বিষেষভাজন হলেন।

চার্লি মনে করেন মোটামুটি তিনটি "অপরাধের" জন্যে তাঁর এই শাস্তি।

প্রথমতঃ তিনি আমেরিকার বড় দলের খাতায় নাম লেখাননি। যদিও তিনি কমিউনিষ্ট নন তাহলেও তিনি তাদের প্রতি বিদ্বেষোদ্গার করার দলে ভিড়ে গলাবাজি করেননি। আমেরিকান নিজন তাঁর এই নিরপেক্ষ মনোভাব বরদাস্ত করেনি। তাঁদের মতে তিনি কমিউনিষ্ট পন্থী।

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান-বিরোধি-কার্যকলাপ-অনুসন্ধান সমিতি নামে যে সংস্থাটি ছিল তাকে চার্লি কোনোদিন সহ্য করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে এই সমিতির নামটা পর্যন্ত জঘন্য এবং অসৎ। এই ব্যাপক নামের আড়ালে তারা যে কোনো মানুষের নিজস্ব মতামতের গলা টিপে ধরে তার স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। এই সংস্থাকে তিনি দেশের কলঙ্ক বলে মনে করতেন।

তৃতীয় কারণ, তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করা। চার্লি আশ্চর্য হয়ে বলেছেন বিলাতে গিয়ে তো কত আমেরিকান টাকা রোজগার করে দেশে পাঠাচ্ছে, কৈ তারা তো কেউ ইংলণ্ডের নাগরিক হয়নি। এবং সেজন্যে ব্রিটিশ সরকারও তো কোনোদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেছেন, এক বড় মার্কিন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা ৩০ বছর যাবৎ লণ্ডনে আছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশের প্রজা বলে নাম লেখাননি এবং সেজন্য ইংরেজরা কোনোদিন বাধা দেয়নি।

পরিশেষে চার্লি বলেছেন একটি প্রতিপত্তি ও পরাক্রমশালী ষড়যন্ত্রীদল তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল, নানা মিথ্যা কৌশলের দ্বারা তারা দেশের লোককে বুঝিয়েছিল যে চার্লি যত বড় শিল্পী হলেও আমেরিকানদের সুহৃদ নয়, এদেশের লোককে ভুলিয়ে এই দেশের টাকা শুষে বার করে নেবার জন্যে চার্লি আমেরিকায় আছে; অতএব এমন দেশবিরোধী মানুষকে বর্জন করাই উচিত। আমেরিকানরা সরল মনে সেই মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পড়েছিলো।

* * * *

ওডিয়ন সিনেমায় লাইমলাইট মুক্তিলাভ করল। রাজকুমারী মার্গারেট উদ্বোধন করলেন। চতুর্দিক আবার চার্লির জয়গানে মুখর হলো।

যুক্তরাষ্ট্রে লাইমলাইটের প্রদর্শনী বন্ধ। কিন্তু তাহলেও ইয়োরোপের চতুর্দিকে এই ছবি চার্লির আগেকার সকল ছবির রেকর্ড ভঙ্গ করল।

লণ্ডনে চার্লি-দম্পতি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন। তাঁদের সম্মানার্থে লর্ড স্ট্রাথকনা হাউস-অফ লর্ডসএ বিরাট নৈশ-ভোজের আয়োজন করলেন।

বহু সভাসমিতি চার্লিকে মানপত্র দিলে। প্যারিসে চার্লি বিজয়ী বীরের সম্মানলাভ করলেন। প্রেসিডেন্ট অরিও তাঁর সম্মানে প্রকাণ্ড ভোজ দিলেন। ফরাসী সরকার তাঁকে অফিসার অফ দি লিজন অফ অনার পদবীতে ভূষিত করলেন।

ফরাসীর শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিষ্ঠান তাঁকে তাঁদের বিশেষ সভ্যরূপে মনোনীত করল। সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রোজার ফরডিনাত সেই উপলক্ষে চার্লিকে একটি চমৎকার পত্র লিখেছিলেন। তার সারাংশ এইরকম :—

"প্রিয় মিষ্টার চ্যাপলিন,

ফরাসীদেশে আপনাকে যে প্রাণখোলা অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে তাতে কেউ কেউ হয়তো বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু গত ৩০ বছর ধরে আপনি আমাদের যে আনন্দ দিয়েছেন, আমাদের হৃদয়ের অনুভূতিকে যেভাবে নাড়া দিয়েছেন, মানুষের দুঃখকে উপলব্ধি করবার যে চেতনা জাগিয়েছেন তা মনে করলে আমরা অভিভূত বোধ করি এবং তাঁদের বিস্ময়কে নিতান্ত অহেতুক বলে মনে করি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে আপনার স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অসীম দরদ দিয়ে আপনি মানুষকে চিত্রিত করেছেন আপনার বহু ছবিতে, সেই সব ছবি দেখে আমরা হেসেছি এবং কেঁদেছি আর সেই সঙ্গে মনের মধ্যে একটি প্রশান্ত নির্মলতা অনুভব করেছি।

আপনার জগৎব্যাপী খ্যাতির মূলে আছে আপনার শ্রান্তিহীন অধ্যবসায়, মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস এবং দুর্লভ নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের মানবিকতাকে উদ্‌ঘাটন করার সকল প্রয়াস।

সেই কারণে আপনার সৃষ্ট ছবিগুলি পৃথিবীর সকল মানুষের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছে। সেই কারণেই পৃথিবীর মানুষ এমন উন্মুক্ত অন্তরে আপনাকে ভালোবেসেছে।

পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে আমরা অর্থাৎ এই সংসার নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, গীতিকার এবং অন্যান্য শিল্পীরা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন আপনাকে জানাতে আনন্দ বোধ করছি।

আপনাকে ধন্যবাদ।"

* * * * *

প্যারিস, রোম এবং অন্যান্য দেশ ঘুরে চার্লি লণ্ডনে ফিরে এলেন।

এবার ঘর বাঁধতে হবে। স্থায়িভাবে কোথাও বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সে কোথায়?

এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে সবচেয়ে ভাল চার্লির পক্ষে। ওঁর স্বভাবের সঙ্গে সেই দেশ আর তার পরিবেশ নিখুঁতভাবে খাপ খাবে।

লণ্ডন ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

দুঃখসুখে ভরা ওঁর শৈশবের লণ্ডন, ওঁর জন্মস্থান লণ্ডন। এই লণ্ডনে বসেই ওঁর জীবনে

কান্না-হাসির মেলা দেখেছে। অসীম দুঃখের মধ্যেও এইখানেই তিনি শুনেছেন জীবনের জয়গান, পেয়েছেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র আর মহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণা!

কিন্তু উপায় নেই। ছেলেদের স্বাস্থ্য অওনে ভাল থাকছে না। তাছাড়া তাদের পড়াশোনার জন্যে বিলাতের চেয়ে সুইজারল্যাণ্ডে অধিকতর অনুকূল সুযোগ এবং পরিবেশ পাওয়া যাবে।

সপরিবারে চার্লি চলে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেইখানে উনার পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

সুইজারল্যাণ্ডে এক বিশাল সম্পত্তি ক্রয় করেছেন চার্লি।

নদীর ধারে ভেভির গ্রামে তাঁর বর্তমান বাসার নাম, ম্যানরের-অফ-বান। বাড়ির সংলগ্ন জমির পরিমাণ এক শ বিঘার উপর (৩৭ একর)। ফলের বাগান, ফুলের বাগান, পুষ্করিণী, শাকসব্জির ক্ষেত।

ভেভিয়ে গ্রামে মোট ১৩৫০ জন মানুষের বাস। চারিদিকে প্রাকৃতিক সমারোহ, আর আনন্দময় শান্তি!

বন্ধুরা আসেন দেখা করতে। চার্লিও মাঝে মাঝে সস্ত্রীক লণ্ডন, প্যারিস বেড়িয়ে আসেন। কোন খেদ নেই তাঁদের জীবনে। পরিপূর্ণ শান্তির সংসার। পরিপূর্ণ সুখের ঘরোয়া জীবন।

বন্ধুরা চার্লিকে জিগেস করেছেন, আমেরিকার সেই দ্রুতধাবমান প্রচণ্ড কর্মকোলাহলময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এভাবে নিরালায় বাস করবার সময় তাঁর কি পূর্ব জীবনে ফিরে যেতে কখনো কখনো ইচ্ছে হয় না?

মাথা নেড়ে চার্লি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, না, হয় না। সেইটেই মানুষের সত্যিকার জীবন নয়। সেই উন্মাদনার আবর্ত উত্তীর্ণ হয়ে চার্লি আজ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানবার অবকাশ পেয়েছেন, যথার্থ বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করেছেন। তিনি মনে করেন, এটাই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় লাভ, এমনি পরিপূর্ণ শান্তি আর আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকা। জীবনে দুঃখ পেয়েছেন, অবিচার পেয়েছেন, আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু সে সবের হয়ত প্রয়োজন ছিল। তাই তো তিনি আজ এমন একান্তজনে সৎচিদানন্দকে অনুভব করতে পারছেন। জীবন আজো তাঁর কাছে উত্তেজনাহীন বা কর্মহীন নয়। আজো তাঁর ছবি করবার পরিকল্পনা আছে। নিজে ভূমিকা নেবেন না। স্ক্রিপট লিখবেন, পরিচালনা করবেন। তিনি কোনদিন অবসর নেবেন না। কাজ করবেন শেষদিন পর্যন্ত। নাটক লিখবেন, অপেরা লিখবেন, যদি সময় ও সুযোগ পান। গত বিশ বছর ধরে যথার্থ সাংসারিক সুখ কাকে বলে তা তিনি পূর্ণ মাত্রায় জেনেছেন। ঘরে তাঁর আদর্শ গৃহিনী। আশ্চর্য মেয়ে এই উনা। তাকে বর্ণনা করতে পারেন এমন ক্ষমতা চার্লির নেই। জীবনের কানায় কানায় যে প্রেম উপচে পড়ছে তাকে প্রকাশ করা যায় না। তার কথা বলতে গেলেই চার্লির মন অভিভূত হয়, আর্দ্র হয়।

সূর্যাস্তের সময় এক একদিন চার্লি ছাদে বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন। পাশে বসে থাকে উনা। দু'জনেই বাক্যহীন। দু'জনের মনেই বোধ করি একই সুরের ঝঙ্কার, কী সুন্দর পৃথিবী তাঁদের সামনে, তাঁদের চারিদিকে।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

বাংলা নাট্যাভিনয়ের আদি কাণ্ড : নাটক রচনা

শতবর্ষ আগে

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী পুরাণো হলেও এত দিন পর্যন্ত তা একটা স্থায়ী কীর্তি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন ধনীর উৎসাহে যে কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। তাছাড়া সেই সব প্রচেষ্টা পরস্পরবিচ্ছিন্ন, প্রায় ব্যক্তিগত খেয়ালের ব্যাপার ছিল, একটির সঙ্গে আর একটির কোনও যোগও ছিল না। তাই পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় প্রদর্শন সত্ত্বেও বাংলা দেশে একটা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই নিষ্ফলতার একটি কারণ যে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত কারণ—বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ও নবীন বসু তাঁদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করিয়েছিলেন। লেবেডেফ ও নবীন বসু যে-কয়েকটি নাটক অভিনয় করান, সেগুলি খুব সম্ভব অভিনীত মাত্র হয়েছিল, ছাপা হয়নি। সুতরাং নাটক হিসেবে সেগুলি কোন্ শ্রেণীর রচনা, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হত, কিন্তু সেগুলির জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী শিক্ষাভিমানী বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তার রস গ্রহণ একটু আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝির কিছু দিন পর পর্যন্তও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। ১৮৫৭ সনে কলকাতায় একাধিক নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যিকার গোড়াপত্তন, এই সময় থেকেই হল বলা চলে।

বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ের এই নতুন ধারার পরিচয় দেবার পূর্বে বাংলা নাটকের ইতিহাস একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। লেবেডেফের অনুদিত নাট্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্যাসুন্দরে'র কথা ছেড়ে দিলে, যতদূর জানা গেছে গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্তৃক রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। ১৮৪৫ সনের আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১২৫২) এটি প্রকাশিত ও ১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি সিমলার আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত হয়। কিন্তু তার আগেও কয়েকটি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে মনে হয় না। অভিনীত হবার উপযুক্ত নাটকও এগুলি নয়। পয়ারে বা ত্রিপদীতে কথোপকথন

পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বক্তৃতা কখনই অভিনয়ের উপযুক্ত হতে পারে না। তবুও মাত্র নামের খাতিরে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এদের উল্লেখ রাখা আবশ্যক। এ-পর্যন্ত যতদূর জানতে পারা গেছে তা থেকে মনে হয়, ১৮২২ সনে প্রকাশিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ -'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'ই এই শ্রেণীর প্রথম বাংলা নাটক। 'হাস্যার্ণব' নামক একটি প্রহসনও এই বছরে প্রকাশিত হয়। 'হাস্যার্ণবের পর ১৮২৮ সনে দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। 'হাস্যার্ণব'কে দ্বিতীয় ধরণে এটি বাংলাদেশে প্রকাশিত তৃতীয় নাটক, এটি গোপীনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সংস্কৃত 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' অবলম্বনে হরিনাভি নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক রচিত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। কিন্তু এটি সংস্কৃতের যথাযথ অনুবাদ নয়। স্থানে স্থানে বাংলা গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ দেয়া আছে মাত্র। 'কৌতুক সর্ব্বস্বে'র কুড়ি বছর পরে আর একটি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়। এটি রামতারণ ভট্টাচার্য্য কৃত সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদ। পর বছর শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে নীলমণি পাল 'রত্নাবলী নাটিকা' প্রকাশ করেন। 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী', 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' প্রভৃতি নামে নাটক গুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ধাপ। ১৮২২ থেকে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই নাটক গুলি রচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপ বা দ্বিতীয় যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি সত্যকার নাটক হিসেবেই দেশী বা বিলিতী রীতি অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেনি। এদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ১৮৫২ সনে, তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ১৮৫২ সনে ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচিত) ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়। এর ঠিক পরেই ১৮৫৪ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব, এটি একটি ক্ষুদ্র-কলেবর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সে যাই হোক, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে, পৌরাণিক উপাখ্যান বা ইংরেজী নাটক অবলম্বন করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঙালী-জীবনের ঘটনা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে এইভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে ধারার সূত্রপাত হল, তা আর বাধা পেল না।

বাগবাজারের নাটুকে দল

সে-যুগে কলকাতায় চারিদিকে যখন নাট্যাভিনয় হচ্ছিল, তখন বাগবাজারের অনকয়েক যুবকের মনেও নাটকাভিনয়ের ইচ্ছে জাগে। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই পরবর্ত্তী কালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই দলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের যোগদানের কথা গিরিশচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন,—

"যখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী', থিয়েটার সম্প্রদায়ের আকড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে তিনি কয়লাঘাটায় 'কিছু কিছু

বুঝি' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ, অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম আমার পূর্ব্বপরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।"

বাগবাজারের সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করেন। ১৮৬৮ সনে সপ্তমীপূজার রাত্রিতে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে তাঁদের প্রথম অভিনয় হয়। সেদিন অভিনয় তেমন ভাল হয়নি, সেজন্য নতুন আয়োজনের পর পরবর্ত্তী কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে আর একটি অভিনয় হয়; এই অভিনয় দেখে সকলেই সন্তুষ্ট হন। ১৮৭০ সনে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়; সেদিন যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম :—

নিমচাঁদ	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
অটল	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনচন্দ্র	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
রামমাণিক্য	...	রাধামাধব কর
কাঞ্চন	...	নন্দলাল ঘোষ

দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—

"কৃতবিদ্য বন্ধুগণ বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে উক্ত অদ্বৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া প্রমন লিখিয়া দিব।"

সারদাচরণ মিত্র ছাত্রাবস্থায় এই অভিনয় দেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদের ভূমিকা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি পরবর্ত্তীকালে লিখে গেছেন :—

"১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশীর'র অভিনয় প্রথম দেখি। সেইদিন আমাদের এফ. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। ··নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বাঙলায় নব্য ধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা—সেদিন কবিবর 'গিরিশ' স্বয়ং নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' পূর্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, 'নিমচাঁদে'র অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব; ইংরাজি, বাঙলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় কোনদিন ভুলিবনা। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যহেতু গিরিশের উপরও বিশেষ শ্রদ্ধা হইল।"

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক 'সধবার একাদশী' ৭ম বা শেষবার অভিনীত হয়—১৮৭২ সনে দুর্গাপূজার সময় চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে। সেবার 'সধবার একাদশী'র শেষে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়েছিল।

লীলাবতীর প্রতিযোগিতা

'সধবার একাদশী' অভিনীত হবার পর বৎসরাধিককাল বাগবাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক আর কোন অভিনয় প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু অনেকদিন ধরে 'লীলাবতী'র মহলা চলছিল। অবশেষে চুঁচুড়ার 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্য দেখে লীলাবতী অভিনয় সম্বন্ধকে কলকাতাতেও কার্যে পরিণত করা হয়। ১৮৭২ সনের মার্চ মাসে চুঁচুড়ার 'লীলাবতী'র অভিনয় হয় ও অমৃতবাজার পত্রিকায় এর বিশেষ সুখ্যাতি বার হয়। এই দেখে বাগবাজারের দলের উদ্যোক্তারাও—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু, নগেন্দ্র, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি অভিনয় পারিপাট্যে ও কৌশলে চুঁচুড়ার দলকে হারাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

"সধবার একাদশী' শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আকড়ার খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আকড়া চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত ছিলনা, কিন্তু শেষে যাইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ার বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া 'লীলাবতী'র সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।...নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?" অর্দ্ধেন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা পারিবেনা।" অর্দ্ধেন্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল যে আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিলনা। নগেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দু, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি বহু কষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিতেন।—"

এই উদ্যোগ সমাপ্ত হলে তাঁদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯) এই অভিনয়ের সময়ে বাগবাজারের দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। যে-যে অভিনেতা যে-যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা নিচে দেয়া গেল :—

হরবিলাস ও দাসী	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
ক্ষীরোদবাসিনী	...	রাধামাধব কর
ললিতমোহন	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলাবতী	...	সুরেশচন্দ্র মিত্র

শ্রীনাথ	...	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঘু উড়িয়া	...	ভিখুল খাঁ
নদের চাঁদ	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শারদাসুন্দরী	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
ভোলানাথ	...	মহেন্দ্রলাল বসু
মেজ খুড়ো	...	মতিলাল সুর
রাজলক্ষ্মী	...	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
যোগজীবন	...	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত একখানি পত্রে এই অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়। পত্রখানি থেকে তখনকার দিনের নাট্য-সমালোচনার একটা ধারণা করা যায়, সেজন্য দীর্ঘ হলেও পত্রখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল :—

'...রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর ; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দৃশ্য 'ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ', 'সিন্ধেশ্বরের পুস্তকালয়' ও 'অনাথবন্ধুর মন্দির' এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ ভোলানাথ চৌধুরী নামক জমিদার মহাশয়ের তনয়দ্বয় নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের প্রবেশ দেখিলাম। উভয়েরই অভিনয় হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু গাত্র ঝাঁচড়ানি কিছু অধিক হইয়াছিল। হেমচাঁদের বক্তৃতা নদেরচাঁদের অপেক্ষা হাস্যজনক হইয়াছিল। হেমচাঁদের অভিনয় সকল সময়েই উত্তম হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী শারদাসুন্দরীর অভিনয় মনোহর বটে, কিন্তু বোধ হইল যেন তাহার তালরূপ শিক্ষা হয় নাই। অনেক স্থলে অপ্রীতিকর হইয়াছিল। কর্ত্তা হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ উথলিয়া উচ্চহাস্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, এই জমিদার মহাশয়েতে তাহার সমস্তই বিদ্যমান ছিল। কি অঙ্গভঙ্গি কি কথার পারিপাট্য, কি মধুর স্বর, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার অভিনয় সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। তাঁহার তালক শ্রীনাথ বাবুর অভিনয়ও অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে মধ্যে মুখের ও কথার ভঙ্গিমাগুলি উত্তম হইয়াছিল। কর্ত্তার বধূমাতা দুঃখিনী ক্ষিরোদবাসিনীর অভিনয় আদ্য-অন্ত কোন স্থানেই সদোষ বোধ হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাহার দুঃখ শ্রবণে অনেক শ্রোতাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কথাবার্ত্তা অনেকটা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছিল। কর্ত্তার ভবনে প্রতিপালিত ললিতমোহনের প্রেমালাপ অতি শ্রবণসুখকর বোধ হইয়াছিল। লীলাবতীর স্বপ্নবিবরণ অতি মনোহর হইয়াছিল, তাহার স্বর আরও একটু মধুর হইলে ভাল হইত, এবং তাহার অবয়বও কিছু দীর্ঘাকার বোধ হইয়াছিল। ভোলানাথ বাবুরও অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমোদ প্রমোদ কিছু বেশি হইয়াছিল। রঘুয়া ভৃত্যের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল তাহাতে উড়িয়ার সকল প্রকৃতিগুলিনই বজায় ছিল। ব্রহ্মচারিবেশের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের অভিনয় অতি উত্তম হইয়াছিল, কোন অংশেই প্রায় সদোষ বোধহয় নাই। সিদ্ধেশ্বর বাবুর অভিনয়ও প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় নাই। দর্শকবর্গ প্রায় কেহই তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পান নাই। হাসী পণ্ডিত এবং অন্যান্য অভিনয়কেরা শ্রোতৃবর্গের তালরূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন

নাই। কিন্তু বটক চূড়ামণির অভিনয় দর্শনে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন; তাঁহার কথোপকথন তাঁহার পদের ন্যায় যথার্থ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! সকলই প্রায় ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরচিত গীতগুলি তালরূপে গীত হয় নাই, এবং তাহার দুই একটি বোধহয় অশ্লীল বোধে বাদ দিলেও ভাল হইত।

আমার বোধহয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটী দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশেরও অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়। কস্যচিৎ দর্শক:। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ সাল কলিকাতা"।

'লীলাবতী'র অভিনয় অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় লিখেছেন,—"রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্র' দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। 'লীলাবতী'-তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না।

'লীলাবতী' অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না—আমি পত্র লিখিব —'দুয়ো বলিব।' সুপ্রসিদ্ধ ৺কানাই শাল যে, ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—'আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক সোনা।"

* * * *

রাশিয়ার জার নিকোলাস সাধারণ পোষাকে একাকী বেরিয়েছেন প্রাতর্ভ্রমণে। সহরের একটী রাস্তায় তাঁর চোখে পড়ল একজন বৃদ্ধা তার ঘাড়ে একটা বৃহৎ পোটলা নিয়ে অতিকষ্টে সেই দারুণ শীতে ধীরে ধীরে পথ চলছে।

চারদিকে দারুণ তুষারপাত। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই তুষারকণাগুলো কুয়াসার মতই ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্রাট্ এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন,—"আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?"

—এই পোটলাটা বড় ভারী। এটাকে যদি একটু বয়ে নিয়ে যাও, তবে কিছুক্ষণের জন্যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

—কোথায় যাবেন আপনি?

—আমার ছেলে একজন সৈনিক, শুনেছি সে যুদ্ধে আহত হয়ে সম্রাটের হাসপাতালে আছে। সেখানেই যাচ্ছি আমি।

—আপনি সৈনিকের মা? বেশ, চলুন, আমিই আপনার পোটলা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

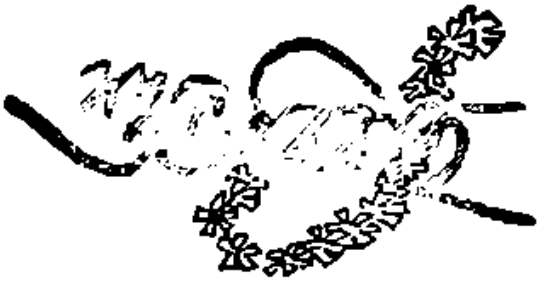

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৯ ॥

সাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বরেনবাবুর কাছে।

বরেনবাবু এলেন। কাঁদলেন, হা-হুতাশ করলেন, আর তার সঙ্গে এমন কতকগুলো কথা উচ্চারণ করলেন যেগুলো বরেনবাবুর বুকে গিয়ে বাজলো ঠিক শেলের মত।

বরেনবাবু বললেন, 'ওইটুকু মেয়ের বিয়ে আমি দিতে চাইনি। আপনার স্ত্রীই লক্ষ্মীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে পুতুল খেলার সখ মিটিয়েছেন। এখন এই বাল-বিধবাকে নিয়ে আমি সারাজীবন জলে পুড়ে মরি।'

মনের দুঃখে আরও অনেক কথাই বললেন।

ঝি বললে, 'থামো বাপু, তুমি চুপ কর। ওঁর অমন ছেলেই চলে গেল। তুমি আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।'

যে বরদাসুন্দরী লক্ষ্মীকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতেন না, তিনিই এখন বলতে লাগলেন —মেয়েটা অপয়া। ও লক্ষ্মীছাড়া বিধবা মেয়ের মুখের পানে আমি আর তাকাতে পারছি না।'

সাদা কাপড় পরিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মীকে।

সেই শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা বিষণ্ণ ম্লানমুখী কন্যাকে বরেনবাবু নিয়ে গেলেন এখান থেকে।

নিয়ে গেলেন চিরদিনের মত। বললেন, 'আমার মেয়ে, আমি তো তাকে ফেলতে পারবো না। আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলাম।'

কিন্তু যেদিন নিয়ে গেলেন সেইদিন তাঁর বাড়ীতেও হয়ে গেল এক সর্বনাশা কাণ্ড।

লক্ষ্মীর কন্যা মা তখন শয্যাশায়িনী। ছেলে গুণধর বসে ছিল তার শিয়রের কাছটিতে।

ঝি এসে খবর দিলে—লক্ষ্মী এসেছে।

লক্ষ্মীর মা ছিল দোতলায় একটা ঘরে। অতিকষ্টে সে উঠে দাঁড়ালো। গুণধর বারণ করলে, 'মা, যেয়ো না, তুমি কাঁপছো।'

গুণধর তাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ালো। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরলা দেবী দেয়াল ধরে টাল সামলে নিয়ে কোনোরকমে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো সিঁড়ির মাথায়।

ওদিকে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর বাবা তখন এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির নীচে।

সরলা দেবী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, 'লক্ষ্মী!'

চীৎকার করেই আর সামলাতে পারলে না। কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াতে গিয়ে একটা ধাপের জায়গায় আর একটা ধাপে পা হড়কে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে।

সবাই ছুটে গেল তার কাছে।

কিন্তু তখন সে হার্টফেল করেছে।

সংসারের চাকা ঘুরে গেল অন্যদিকে।

ধরেনবাবুর ছোট একখানি বাড়ী ছিল কাশীতে। বললেন, 'আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে কিছুদিন কাশীতে গিয়ে বাস করি।'

সেই ব্যবস্থাই হলো। গুণধরের পড়ার ক্ষতি হবে। তাই সে একাই থাকবে কলকাতার বাড়ীতে। পুরনো একজন ঝি ছিল—রামুনের মেয়ে। সে বললে, 'আমিই চারটি রান্না করে দেবো দাদাবাবুকে। তোমরা যাও।'

কাশী থেকে ধরেনবাবুর ইচ্ছা—লক্ষ্মীকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরবেন। তাঁর ধারণা বুঝি তীর্থস্থানে গেলে লক্ষ্মীর মনের জ্বালা জুড়োবে।

যাবার সব ঠিক, ধরেনবাবু গেছেন টিকিট কিনতে। বাড়ীতে গুণধর আর লক্ষ্মী। এমন সময় রবি এলো এদের বাড়ীতে। বৌদিকে সে কতদিন দেখেনি। অতি সন্তর্পণে সদর পেরিয়ে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ডাকলে, 'বৌদি!'

ডাকটা শুনতে পেলে গুণধর। ডাক শুনেই সে নীচে নেমে এলো।

রবি বললে, 'বৌদিকে একবার ডেকে দাও না!'

'কেন?' গুণধর বললে, 'বৌদির সঙ্গে তোমার কী দরকার?'

রবি বললে, 'একবার দেখা করবো। দাও না ডেকে!'

গুণধর বললে, 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমার বোন অপয়া বলে তোমরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। এখন আবার এসেছো কি জন্যে? যাও, দেখা হবে না।'

রবি মিনতি করতে লাগলো, 'ওইখানে একবার এসে দাঁড়াতে বল না! দেখা করেই আমি চলে যাব।'

গুণধর সেই এক জেদ ধরে রইলো।

'দেখা হবে না—হবে না—হবে না। যদি না যাও আমি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।

রবি তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

'এখনও দাঁড়িয়ে রইলে?'

তখন আর কোনও কথা বললে না রবি। ধীরে ধীরে চলে এলো সেখান থেকে।

গুণধর দোতলায় উঠে গিয়ে দেখে, লক্ষ্মী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দোরের আড়ালে একটা কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হলো যেন কাঁদছে।

'তুই কাঁদছিস? এই! লক্ষ্মী। ওকে তাড়িয়ে দিলুম তাই বুঝি কাঁদছিস? না না তুই জানিস না, ও গিয়ে বলুক যে আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

[১০]

এমনি করে পনেরোটি বছর পার হয়ে গেছে। কেউ কারও খবর রাখেনি।

হরেনবাবু মারা গেছেন। বি-এ. বি-এল পাশ করে শ্বশুর উকিল হয়েছে। বিয়ে করেনি। সংসারে তার একমাত্র বিধবা বোন—লক্ষ্মী।

ওদিকে লক্ষ্মীর শাশুড়ী বরদাসুন্দরী মারা গেছেন।

রবির বিয়ে দিয়েছিলেন। একটি ছেলে রেখে বৌটি মারা গেছে।

হরেনবাবু বাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ীতে পড়ে আছেন আজ তিনটি বছর।

এই তিনটি বছর ধরে রবিই দেখেছে সংসারের যা কিছু সব। তারই হাতে টাকা, তারই হাতে সংসার।

লোক অভাবে হরেনবাবুর বিরাট বাড়ী খাঁ খাঁ করছে।

নতুন একজন কি রাখা হয়েছে। রবির ছেলেটিকে সে-ই দেখাশোনা করে।

হরেনবাবু রবির বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর একবার। কিন্তু রবি বিয়ে করতে চায়নি। বলেছিল, 'তখন মা কান্নাকাটি করেছিলেন তাই আমি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর বিয়ে আমি করব না।'

রবিকে দেখা যায়—প্রতিদিন কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সেজে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়।

কি করছো জিজ্ঞাসা করলে কাউকে বলে, 'বিজ্‌নেস্' কাউকে বলে, 'শেয়ার মার্কেটে বেরুচ্ছি।'

বিজ্‌নেস্‌টা সত্য নয়। যাওয়া আসা করে শেয়ার মার্কেটেই। বাপের প্রচুর টাকা সে হাতে পেয়েছে। সুতরাং অনায়াসলভ্য সে টাকা খাটাবার শেয়ার মার্কেটের মত এমন সুন্দর জায়গা আর নেই।

তার এক বন্ধু শেয়ার মার্কেটের নেশায় মশগুল হয়ে তাকে একদিন বলেছিল খুব তাড়াতাড়ি যদি বড়লোক হতে চাস্ তো আয় আমার সঙ্গে।

সেও আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা।

হাতে তখন তার খুব বেশি টাকা ছিল না।

যা ছিল, শেয়ার মার্কেটের নেশা ধরবার পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর নেশা যখন বেশ জমেছে তখন তার বাবা পড়লেন অসুখে।

ছেলে তখন সাহেব সেজে অফিসে বেরুচ্ছে। উপযুক্ত ছেলে লায়েক হয়েছে। হরেনবাবু তাঁর যথাসর্বস্ব তুলে দিলেন ছেলের হাতে।

তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

হরেনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর এটর্নীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'উইল করুন।'

উইল করলেন।

সেই উইল রেজেষ্ট্রী হয়ে গেল।

রবি আজকাল তার বাবার ধারপাশও মাড়ায় না। একটু দূরে দূরে থাকে। কাজেই কি যে তিনি করলেন তা সে বুঝতেও পারলে না।

সময় যখন তাঁর আসন্ন, রবিকে একদিন কাছে ডাকলেন। বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি বাবা। ভেবো না—বাপ-মা কারও চিরদিন থাকে না। কিন্তু যে কথা বলবার জন্ত ডেকেছি শোনো। যে-কাজ একদিন তোমায় না আর আমি ভুল করে করেছিলাম, চলে যাবার আগে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম। আমার যা কিছু আছে—বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি, টাকাকড়ি যা কিছু সব—দুটি সমান ভাগে ভাগ করে দিলাম তোমাদের দু'জনের নামে। এক ভাগ তোমার আর এক ভাগ তোমার বৌদির। আমার বিধবা পুত্রবধূ লক্ষ্মীর।

কাঠ হয়ে বসে বসে শুনলে রবি। একটি কথাও বললে না।

হরেনবাবু খানিক থেকে আবার বললেন, 'বৌমাকে অনেকদিন দেখিনি। একটিবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

রবিরও কি কম দেখতে ইচ্ছে করে নাকি?

কিন্তু কোনোদিনই দেখতে পায় না। কতদিন চুপ করে বাড়ীর সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কতদিন ওদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু একটি দিনের জন্তও তার মুখখানি বাড়ীর জানলায় ফাঁকেও দেখা যায় না।

বাড়ীতে ঢুকতে ভয় করে গুণধরের জন্তে। যদি অপমান করে বসে?

রবি তবু তার বাবাকে বললে, বাবা? তুমি বলছো যেতে?

হরেনবাবু একটু ভেবে বললেন, 'না থাক্। যেরকম অভিমান করে সে গেছে হয়ত সে আর আসবে না! সে প্রত্যাখ্যানের বেদনা আর যাবার সময় নিয়ে যেতে চাই না। তার চেয়ে বেঁচে আছে ভাল আছে—এইটুকুই আমাকে জেনে যেতে দাও।'

রবি কিন্তু গেল। একদিন গেল তার বৌদির বাড়ী।

বাইরের ঘরে বসেছিল গুণধর।

গুণধর ব্যানার্জি—বি-এ, বি-এল। ছোট আদালতের উকিল।

রবিকে সে প্রথমে চিনতেই পারেনি। পরে অবশ্ত চিনেছিল।

রবি বললে, 'বাবা মৃত্যুশয্যায়।'

গুণধর বললে, 'মানুষকে একদিন না একদিন মরতে হয়। তারপর? কি জন্তে এসেছ?'

রবি বললে, 'বাবা একটিবার দেখতে চাচ্ছেন বৌদিকে।'

গুণধর বললেন, 'তবু ভাল যে দেখতে চেয়েছেন। তা এসময় দেখা হওয়া ভাল নয়। বেশ আছেন তিনি—পুরণো দিনের কথা ভুলে গেছেন। আবার কেন লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়ে সেই সব কথা মনে করিয়ে দেবে!'

রবি বললে, 'তবু যখন দেখতে চাচ্ছেন—'

গুণধর বললে, 'সেকথা সত্যি। আমাদের কর্তব্য করা উচিত।'

রবি বললে, 'তা'হলে গাড়ী নিয়ে আসি?'

গুণধর বললে, 'কেন?'

'নিয়ে যাই বৌদিকে।'

শুশুর বললে, 'সে এখানে থাকলে তো নিয়ে যাবে। লক্ষ্মী তো কাশীতে।'

'কবে আসবে?'

শুশুর বললে, 'এখন আসবে না।'

রবির মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুলো না। শুধু যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসি।'

'এসো।'

রবি ফিরে এলো।

বাবাকে কিন্তু কোনও কথাই সে জানালে না। জানাতে পারলে না। জানাবার অবসরও তখন ছিল না।

হরেনবাবুর চৈতন্য তখন প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রেই তিনি মারা গেলেন।

বৌদিকে জানানো দরকার। অশৌচ পালন করতে হবে তাকে। রবি নিজে গেল না, একজন লোক দিয়ে বাপের মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়ে দিলে শুশুরের কাছে। বললে, বৌদি কোথায় আছে তার ঠিকানা জানি না। তাই তোমাকেই জানালাম। যথাস্থানে খবরটা তুমি পৌঁছে দেবে আশা করি।'

॥ ১১ ॥

লক্ষ্মী কোথাও যায়নি, কলকাতাতেই আছে। শুশুর রবিকে যা বলেছিল সব মিথ্যা।

বাড়ীর দোতলায় লক্ষ্মীর জন্যে আলাদা একখানি ঘর। ঘরের দেয়ালে আলমারির ভেতর সাজানো কয়েকখানি বই। সেদিন বিকেলে বইএর সেই আলমারিতে সারিবন্দী বইএর পেছন থেকে একটি কাগজের বাক্স বের করলে লক্ষ্মী। তারপর সেই বাক্সটি নিয়ে গিয়ে সে বসলো তার খাটের ওপর।

লক্ষ্মী এখন পরমা সুন্দরী পূর্ণযৌবনা একটি মেয়ে।

কাগজের বাক্সটি সে তার আঁচলের কাপড় দিয়ে একবার মুছলে। এমন করে মুছলো মনে হলো কতই না অমূল্য সম্পদ আছে সেই বাক্সের ভেতরে।

বাক্সটি খুলতেই দেখা গেল এক গোছা পোষ্টকার্ডের চিঠি। চিঠিগুলি ডাকে এসেছে। প্রত্যেকটি চিঠিতে লেখা আছে সেই একই কথা।

'বৌদি,

আমার বিজয়ার প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার ঠাকুরপো

রবি।'

আসার পথ বন্ধ। শুশুর তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু পিওনের হাত দিয়ে চিঠিখানা ঠিকই আসে।

প্রতি বৎসর একখানি করে চিঠি। বৎসরান্তে বিজয়ার প্রণাম নিবেদন। রবির মা তাকে বলে গিয়েছিলেন এই কথা। পূজোর সময় সেই কথাই তার মনে পড়ে।

বাড়ীতে পূজো প্রতি বৎসরই হয়। প্রতিমা আসে, ঢাকঢোল বাজে, সাই হয়—কিন্তু সবই কেমন যেন প্রাণহীন। লক্ষ্মীকে অন্তত পূজোর সময় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে কতবার। কিন্তু লক্ষ্মী আসেনি।

লক্ষ্মীর কাছে তার শ্বশুরবাড়ীটা যেন মুছে গেছে তার জীবন থেকে। স্মৃতি শুধু মাত্র এই ক'খানি চিঠি। এই তার সম্পদ। এই তার একমাত্র সম্বল।

চিঠিগুলি বারবার উল্টে পাল্টে দেখলে লক্ষ্মী।

একাগ্রমনে পড়বার মত কিছু নেই। তবু তার একাগ্র দৃষ্টি বহুক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে রইলো নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সেই চিঠিগুলির দিকে। চোখদুটি তার জলে ভরে এলো। দু'ফোঁটা জল বুঝি গড়িয়েও পড়লো চিঠির ওপর।

ঘরে ঢুকলো শুশুর।

'লক্ষ্মী, আজ একটা ভারি মজা দেখে এলাম। শোন্।'

মজার কথা শোনবার মত মনের অবস্থা নয়, তবু সে শোনবার জন্ত প্রস্তুত হলো। চিঠিগুলি আবার সেই বাক্সের ভেতর রেখে দিয়ে বললে, 'বল।'

শুশুর বললে, 'আদালত থেকে আসছিলাম। ট্রাম থেকে নামতেই দেখি, পথের ধারে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। কি দেখবার জন্তে সেই এগিয়ে গেছি, দেখি কিনা একটা লোককে বেদম মারছে সবাই মিলে। ধরা হলো। ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে লজ্জায় মরে গেলাম। একটা মাতাল। আর সে মাতালটা তোর দেওর—রবি।'

লক্ষ্মী বলে উঠলো, 'সে কি দাদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও শোন্। ভেবেছিলাম রবি চিনতে পারবে না আমাকে? উঁহুঁ, ঠিক চিনেছে।'

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'মারছিল কেন?'

'তাকে নাকি অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল। মাতালের মুখ তো! দেখলাম মাথাটা ফাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে মারা গেল?' বললে, 'আমার বাবা।'

লক্ষ্মী চীৎকার করে উঠলো।—'আমার শ্বশুর মারা গেছেন?'

শুশুর বললে, 'হ্যাঁ, বুড়ো মরেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, বলি হাঁ হে, বাপ মলে', শ্রাদ্ধ শান্তি সবই তো চুকেছে দেখছি। তা তোমার বৌদিকে তো অশৌচ পালন করতে হয়, একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল না কি? তা কি বললে জানিস? বললে, খবর দেবো কেমন করে? বাবার নিষেধ ছিল। মাও মরবার আগে বলে গিয়েছিলেন,—ও অপয়া বৌ যেন আমার বাড়ীতে কোনোদিন না আসে।'

লক্ষ্মী খাট থেকে নামলো।

শুশুর বললে, 'কি হলো? উঠে দাঁড়ালি কেন?'

লক্ষ্মী বললে, 'একটা গাড়ী ডাকতে বলি। গঙ্গায় ঘাব স্নান করতে।'

শুশুর বললে, 'চান করবি কিরে? এই অবেলায়? তোর শ্বশুর মরে ভূত হয়ে গেছে, শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেছে। এখন আর চান করে না।'

'তা হোক্।' লক্ষ্মী জেদ ধরে বললো। সে যাবেই।

॥ ১২ ॥

এদিকে উইল নিয়ে বাধলো মহা গণ্ডগোল।

রবি তার এটর্ণীকে সব কথা খুলে বললে। 'বাড়ীঘরদোর ঠিকই আছে। বৌদি অর্ধেক নেবে, নিক্। কিন্তু নগদ পঁচিশ হাজার টাকা এখন পাই কোথায়? টাকা যা ছিল শেয়ার মার্কেটে সবই তো দিয়েছি শেষ করে।'

এটর্ণী বললেন, 'তুমি একবার যাও তোমার বৌদির কাছে। নিজে গিয়ে বল। বললেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রবি বললে, 'বৌদির দাদাটিকে আপনি চেনেন না তাই একথা বলছেন।'

এটর্ণী বললেন, 'তাহ'লে তোমার সেই বৌদির দাদাটিকে ডেকে আনো আমার কাছে। আমি সব বুঝিয়ে দেবো।'

তাই হলো। উইল এবং টাকার গন্ধ পেয়ে গুণধর এলো। এসে সবই জানলে এটর্ণীর কাছে থেকে।

জানলে, হরেনবাবু উইল করে গেছেন। লক্ষ্মীকে দিয়ে গেছেন তাঁর যাবতীয় যাকিছু আছে তার অর্ধেক।

অথচ রবি বলছে, বাড়ীঘরদোর স্থাবর সম্পত্তি বলতে যা কিছু সবই ঠিক আছে, কিন্তু নগদ টাকা বলতে কিছু নেই। পঞ্চাশ হাজার টাকা সে ছুঁকে দিয়েছে শেয়ার মার্কেটে। কাজেই লক্ষ্মীর ভাগের পঁচিশ হাজার টাকা সে দিতে পারবে না।

পঁচিশ হাজার টাকা! দু'একশ' টাকা নয়। পঁচিশ হাজার!

এতদিন পরে গুণধরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। একটা কঠের মত কাজ পেয়ে গেল সে।

তার শুধু লক্ষ্মীকে।

রবির সঙ্গে একবার যদি তার দেখা হয়ে যায়, একটিবার যদি মুখোমুখি কথা বলে তার সঙ্গে তাহ'লে হয়ত' বা সে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারে। হয়ত বা টাকার কথা সে তুলবেই না।

সে দুর্বলতার ব্যাপারটুকু গুণধর জানে।

কাজেই সেইদিন থেকে গুণধরের কাজ হলো—রবির বিরুদ্ধে লক্ষ্মীকে রীতিমত ভাতিয়ে তোলা।

রবি মদ খায়, রবি মাতাল, সেকথা তাকে তো সে বলেইছে. তারপর সেদিন সে আবার বললে, 'রবির সঙ্গে দেখা হলো রে!'

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বললে?'

গুণধর বললে, 'তোর শ্বশুরের অত বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তর দিয়েছে সব নষ্ট করে।'

'অমন সুন্দর বাড়ীখানা আছে তো?'

গুণধর বললে, 'ও বাড়ী থাকলো আর গেল—তোর কি?'

'কেন?'

'তোকে তো ও-বাড়ীতে ঢুকতে বারণ করে দিয়ে গেছে। পড়তো আমার পাল্লায় তো দেখিয়ে দিতাম বাড়ীর বড়বৌকে কেমন করে না ওই বাড়ীর হাড়্‌গোয়ার ছেড়ে দেয়!'

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার আইন কি বলে দাদা?'

গুণধর বললে, 'সেকথা জেনে তোর লাভ? তুই তো সে-পথে হাঁটবি না। নইলে ওর সাধ্য আছে তোকে আট্‌কাবার?'

লক্ষ্মী বললে, 'পারো তুমি ব্যবস্থা করতে?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'তাহলে কর তুমি সেই ব্যবস্থা। যেমন করে পার। আমি কিছু বলবো না।'

'শেষ পর্যন্ত বাধা দিবি না তো?'

'না।'

'বাধা দিলে আমি কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে যাব।'

'না না। আমি বলছি তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

গুণধর কতকগুলো সাদা ডামি বের করলে।

বললে, 'যে, এই সব জায়গায় সই করে দে। আরও সই করতে হবে। সেগুলো পরে হলেও চলবে।'

লক্ষ্মী অম্লান বদনে সই করে দিলে।

রবির নামে এলো একখানা উকিলের চিঠি।

লক্ষ্মীর হয়ে উকিল লিখছে—তার শ্বশুরের দিয়ে যাওয়া বাড়ী-ঘর এবং পঁচিশ হাজার টাকা সাত দিনের ভেতর সে যদি বুঝিয়ে না দিতে পারে তো আদালতে নালিশ রুজু হবে।

চিঠি পেয়ে রবি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

হাতে পুজো।

কি করবে বুঝতে না পেরে মনে মনে সে ঠিক করে ফেললে—যাবে সে তার বৌদির কাছে। হাতে পায়ে ধরে বললে নিশ্চয়ই সে তাকে ক্ষমা করবে।

গুণধর সেদিন বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে, এমন সময় রবির সঙ্গে দেখা।

রবি কিছু বলবার আগেই গুণধর বললে, 'পেয়েছ তো উকিলের চিঠি?'

রবি বললে, 'পেয়েছি।'

গুণধর বললে, 'আমার সহোদরা বোন হলে কি হবে, লক্ষ্মী আলাদা ধাতু দিয়ে গড়া। আমাকেই বলছিল চিঠিখানা লিখে দিতে। আমি বললাম—আমি পারবো না। তাই সে অন্য উকিল দিয়ে লেখালে।'

রবি বললে, 'আমি ভেবেছি নিজে গিয়ে একবার বলি তাকে।'

গুণধর বললে, 'ফল কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। তোমার ওপর রাগটা একটু পড়বার পর দেখা করলে ভাল হতো।'

'তাহ'লে কবে আসবো বল।'

গুণধর কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, 'তুমি এসো। ভাবতে পার আমি তার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে দিচ্ছি না। তার চেয়ে তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

দু'জনে ঢুকলো বাড়ীর ভেতর।

বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে রবিকে বললে, 'তুমি বোসো। এইখানে। আমি একবার চট্ করে দেখে আসি তার মেজাজটা কিরকম আছে।—আর হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। কাছে যেয়ো না। দূরে দূরে থেকে যা বলবে আজকের মত শুনে তুমি চলে যাও। তারপর দেখি আমি তোমার হয়ে কি করতে পারি।'

এই বলে শুণধর চলে গেল দোতলায়।

'লক্ষ্মী রয়েছিস?'

লক্ষ্মী বললে, 'কি বলছো?'

শুণধর চুপিচুপি বললে 'এসেছে। বাছাধন আসতে বাধ্য হয়েছে।'

লক্ষ্মী বসেছিল ঘরের ভেতর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

'কে এসেছে? ঠাকুরপো?'

'শুণধর বললে, হ্যাঁ।'

'আমি যাব।' বলেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল লক্ষ্মী।

শুণধর বললে, 'উঁহুঁ উঁহু, অমন কাজটি করিসনি। সব মাটি হয়ে যাবে। তার ওপর এসেছে মদ খেয়ে পুরোদস্তুর মাতাল হয়ে। সম্ভবতঃ চক্ষুলজ্জাটা কাটাবার জন্যে মদ খেয়ে এসেছে। যতদূর আছে বোধহয় তোকে অপমান করবার। তার আগে তুইই ওকে দুকথা শুনিয়ে দে, কাছে আসে না।'

লক্ষ্মী আর থাকতে না পেরে চীৎকার করে উঠেছিল, 'ঠাকুরপো!'

সেই বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর! সেই বৌদি। সেই তার বাল্যসঙ্গিনী লক্ষ্মী।

রবি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির নীচে থেকে ডাকলে, 'বৌদি!'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে যাচ্ছিল রবি।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী বললে, 'এসো না। ওইখানে দাঁড়াও।'

[ক্রমশঃ]

* * * *

একজন বন্ধুকে নিয়ে পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে বেরিয়েছেন রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক টুর্গেনিফ। সঙ্গী বন্ধুটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। নির্জন মাঠের মাঝখানে একটা ঘোড়া বিমর্ষভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুটি এমন সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গীহীন ঘোড়াটার মনের কষ্টের বর্ণনা দিতে লাগলেন যে মনে হল ঘোড়াটা তার প্রিয়জন, আত্মীয়। টুর্গেনিফ ব'লে উঠলেন: "তুমি ঘোড়াটাকে এমন শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ যেন ও তোমার আদিপুরুষ!" টুর্গেনিফের এই বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক কাউণ্ট লিও টলস্টয়। মানুষ আর পশু—সকলের প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি।

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[ইতিপূর্বে দুটি সংখ্যায় কোম্পানীর আমলে চুরি ডাকাতি কী ধরণের হত তার কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তার মধ্যে ঐ সময়কার পুলিশ কর্মচারী রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি কাহিনীও ছিল। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি পাঠক মহলের ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। একটি মাসিক পত্রিকায় ঐ রচনার বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে কিন্তু একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে কাহিনীগুলি তাঁর 'দারোগার দপ্তর' নামে বইতে ছাপা হয়েছিল। এ তথ্য ঠিক নয়। 'দারোগার দপ্তর'-এর লেখক—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় নন। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীগুলি তাঁর 'পুলিসী বাবরা' নামে একটি চটি বই থেকে নেওয়া। বইটির প্রকাশ কাল ১৮৮০ সাল। বইটি বোধ করি সখ করেই ছাপানো হয়েছিল। সাধারণের কাছে পৌঁছয়নি। তার একটিমাত্র কপি বর্তমানে কলকাতার একটিমাত্র লাইব্রেরীতে আছে নিতান্তই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। যাই হোক, বর্তমান সংখ্যায় পাঠকদের অনুরোধে তাঁর আর-একটি কাহিনী উপহার দেওয়া হল।]

গ্রামবাঙলায় ডাকাতের দল

শ্রীরামপুরের সনাতন রায় আপন বৈঠকখানার বিছানার উপরে একখানি মসলন্দ মাদুরে শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে পাখা হেলাইতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। আশ্বিন মাসের শেষ, বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। বাহিরে জনপ্রাণী ছিল না। এই সময়ে দীর্ঘাকার একটি পুরুষ আস্তে আস্তে বৈঠকখানার কপাটে অল্প মেলিয়া, "রাম রাম নায়েব বাবু" বলিয়া সনাতনকে সম্ভাষণ করিল।

"কি গোপাল খাঁড়া যে? ভাল ত সব? ছেলে পিলে ভাল?" বলিয়া সনাতন ঐ লোকটিকে বসিতে বলিল। গোপাল একটু বসিয়াই বাঁধা হুকা হইতে কলকেটা নামাইয়া দিতে বলিল এবং তামাক আনতেছি বলিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে কলকে টানিতে টানিতে তাহা সনাতনের সম্মুখে রাখিয়া বিছানার নিকটে বসিল এবং বলিল "রায় মহাশয়! অনেক দিন ত জমিদারের চাকরি করিলেন। বৎসরান্তে একবার বাড়ী আসা। তাই কোন্ বেলা দিন ঘরে থাকতে পান? আর কতকাল বা চাকরি করবেন? চলুন এবারে আমার সঙ্গে সরে চলুন। আমি ত সে সকল দেশ দেখে হাটঘাট জেনে এসেছি। এক বৎসর আপনার নিকটে থাকতে পেলে আপনার আর সে দেশে চাকরি করতে যেতে হবেনা পরে আমার চাটি চাটি খেতে দিবেন। সে দেশে বেশ কাজকর্মের সুবিধা আছে। মাঠাকুরাণীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তিনি অনুমতি করেছেন। এবারকার গহনাপাতি দেখেছেন কিনা? এবারে ভাল আয়ধানি করতে পারি নাই। এবারে আমাদের দুর্দশার কথা শুনে থাকবেন।

কয়েক মাস নদীর কিনারায় খড়িবনেই কাটাতে হয়েছিল। সত্য বলছি এ অঞ্চলে আর কাজকর্ম করবো না, সুবিধাও নাই। আপনার সঙ্গে যাবই যাব।"

সনাতন।—হুঁ, তোমাদিগকে লয়ে টানাটানির কথা কতক কতক শুনিয়াছি। নবীন বাপিত নাকি তোমায় মজাবার চেষ্টা করেছিল? যাক, সেটা গেছে, সেশের পাপ গেছে। গহনা দেখিছি। সব বাজে গহনা। দুই একখানি ভাল আছে। শাল জোড়াটি পুরাণ বটে কিন্তু আসল জিনিস।

গোপাল।—নবীনের কথা পরে বলছি। আর এক জোড়া ভাল শাল আপনার নিমিত্ত রেখেছিলাম। তা কাহারও ভোগে এলোনা। পুড়িয়ে ফেলতে হলো। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মৌলত-পুরের মুনসিদের বাড়ীর ডাকাইতিতে আমি ঐ শাল জোড়াটি পেয়ে নিয়েছিলাম। পরে কয়দিন বাদল হয়। সিধী ঠাকুরাণীর নিকটে পৌঁছিয়ে দিতে সময় পেলাম না। একদিন অকস্মাৎ শুনলাম বাড়ীর চারিদিকে পাহারা বসেছে, দারোগাও সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে পৌঁছিয়াছে। আমার ঘরে কখনও মাল পাওয়া যায় না এই বিশ্বাসে হউক, কি টিপ্ টিপ্ জল পড়তেছিল বলেই হউক দারোগা ঐ রাত্রিতে আমার ঘরে আসিল না। শাল জোড়াটি তক্ষাৎ বা নষ্ট করবার উপায় দেখলাম না। খড়-কুটা সব ভিজা। শেষে গোয়ালের দুয়ারে যে সরপাতার চাঁচ ছিল, তাই খুলে খুলে শাল জোড়াটি দুয়ারের এক পাশে গোড়ালাম। নিকটে এক বিছানা পেতে স্ত্রীকে শুয়ে বললাম। ঘরের দেওয়াল চেঁছে ধূলা মাটি লয়ে স্ত্রীর সব শরীরে ঘসে তার বর চেহারা করে তুললাম। গোবরজল দিয়ে ঐ আরসা সাফা করে পাশগুলা এক পাশে জমা রাখলাম। তার উপরে পচা দুর্গন্ধওয়ালা খোল মাখা চাটটি খড়কুটা ছড়াইয়ে দিলাম। প্রাতঃকালে দারোগা এসে ঘর দুয়ার তালাস করতে লাগল। আমার স্ত্রীর বিছানার নিকটে এসে—"কিসের গন্ধ? চাঁচগোড়া গন্ধ কেন? শাল সকল পুড়িয়ে ফেলিছিস নাকি?" বলতে বলতে দারোগা পাশগুলো উদারক করতে গেল। "আমার স্ত্রীর ওলাওঠা হয়েছে, বেতে নানা জিনিষপত্র দিয়ে সেঁকেছিলাম, তারই গন্ধ হবে। আমার কি আর হুঁস আছে মহাশয়!" বলতে লাগলাম। এই সময়ে আমার স্ত্রী সঙ্কেত বুঝে দারোগা যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকে মুখ করে "ওয়াক" "ওয়াক" শব্দ করে উঠল। পাশ গাদার উপরে ও নিকটে গন্ধওয়ালা খড়কুটা দেখে নাকে মুখে কাপড় দিয়ে, আবার পাছে আমার স্ত্রী গায়ে বমি করে দেয় এই ভয়ে দারোগা সরিয়া গেল। আর কিছু তদারক করিল না। খানিক পরে দারোগার বাসায় একটি খাসী ছাগল পাঠাইয়ে দিলাম।

সনাতন।—কেসায় ত কম নয়! শাল জোড়াটি তোমার না নিলেই ভাল ছিল। যাক, সে হাঙ্গামা চুকে তো গেছে। নবীন বাপিত তোমার কি করেছিল, যে তোমায় খড়িবনে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল?

গোপাল।—বলতে গেলে আমিই এবারে তার মন্দ চেষ্টা করেছিলাম; পরে সে আমাদের অনেককে টানাটানি করেছিল। নবীনের সকল কথা কি আপনি জানেন?

সনাতন।—নবীনের ত চটিতে এক দোকান ছিল, চুরি, ডাকাইতিও ছিল এই কথাই ত রাষ্ট্র। আর কি করিত জানিনা।

গোপাল।—নবীনের এখন আবার অন্য অত্যাচার বেড়েছিল। লোকজনকে মারা ও লুটতরাজ করার একটি কাজ খুলেছিল। ডাকাইতি কখন কখন করাইত। তবে নিজে হাতে কখন

কাহাকেও হত্যা করেছিল এমত জানিনা এবং নিজ দোকানে কাহাকেও বোধ হয় মারে নাই। নিজের দোকানে যাত্রীদিগকে আকর্ষণ করবার মতলবে বড় বড় কড়ায় খানিক দুধ ও জল দিয়ে নিজে সিদ্ধ করতে বসিত, আর কোন দোকানে এমন দুধ নাই পাবেন না বলে পথিকদিগকে বলিত। রাত্রিতে যে সকল পথিক দোকানে থাকিত, তাহাদের নিকট টাকাকড়ি আছে কিনা বুঝিবার নিমিত্ত এক কৌশল বাহির করেছিল। বেশী রাত্রি হলে, এক মঠন জেলে যাত্রীদিগকে জাগাইত, আর বলিত,—"আপনারা বেশ সাবধানে থাকবেন; এ বড় খারাপ চটী;—আজকাল বড় খারাপ সময়; আমি আপনার বাড়ীতে যেতে শুতে যেয়ে থাকি, এখন যাচ্ছি; যদি কাহার নিকট কিছু বেশী রকম থাকে, আর এ দোকানে থাকতে ভয় বোধ করেন, তবে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, আমার বাড়ীতে সুখে নিদ্রা যাবেন; আপনাদের সকলকে সাবধান করে যাওয়া উচিত, শেষে দোকানদারের কোন দোষ না দেন।" এইরূপ কথা শুনবার পরে যাহার নিকটে কিছু অর্থ সম্পত্তি থাকিত, সে ব্যক্তি রাত্রিতে আর দোকানে থাকিতে সাহস করিতনা। উহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইত। পথে এক পুকুরের পাড়ে পৌঁছিলে নবীনের লোকেরা ঐ পথিকদিগের মুখে অকস্মাৎ কাপড় দিয়ে বন্ধ করে ও লাঠি মেরে হত্যা করিত। এরূপে কতলোক যে মারা পড়েছে তার হিসাব নাই। শেষবারের কাজে, যাতে আমার সঙ্গে বড় চটাচটি হয় সেই কথাটা বলছি।

নবাবপুর গ্রামে ডাকাইতি হবে বলে কয়েকজনকে সমাচার দেয়। রাত্রি দুই ঘড়ি সময়ে আমিও আমার দলের আর দুইজন গিয়া পৌঁছে দেখি নবীন ও তার দলের লোকেরা অন্য এক কাজে মত্ত। ঐদিন চানকের সিপাই পল্টনের একজন হাওলদার নবীনের দোকানে উত্তরিয়া ছিল। তার সঙ্গে একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে অনেকদিন পরে ছুটি লয়ে দেশে যেতেছে প্রকাশ; লোকটার বয়স হয়েছিল। কিন্তু শরীরের গড়ন ও বাঁধন একটা পলওয়ানের মতন। বড় বড় আমলকীর মত মোটা মোটা কতকগুলা সোনার ডেলাওয়ালা একছড়া কণ্ঠী তার গলায় ছিল। উহার কোমরে অনেক মোহর আছে বলে একটা গুজোব উঠেছিল। ইহাতে নবীন ও তাহার দলের সকলেরই বড় লোভ জন্মেছিল। লোকটাকে মারিবার পরামর্শ শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি, নবীন ও তার দলের আর ছয়জন সর্দ্দারকে ডেকে গোপনে বললাম এমন কাজ করোনা। আমাদের গরা-গাঁথা সরকারী লোক, তামাসা নয়, আর যদি আজ রাত্রে অন্য কাজ না হয় তবে আমরা ফিরে যাচ্ছি, আমরা এমন কাজে কখন থাকবো না। নবীন আপনার লোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদিগকে আসতে দিলনা। দুপুর রাত্রে নিশ্চয় রওয়ানা হতে হবে বলে গেল। আমরা অন্য দোকানে থাকলাম। রাত বেশী হলে নবীন মঠন জেলে আপনার মামুলি চালাকির কথা হাওলদারের নিকটে বলিল, হাওলদার কহিল "ডাকাইত তার কাছে কি করবে? এই লোহার শিকের বাড়িতে সে ২৫।৩০ জন ডাকাইতকে মেরে ফেলতে পারবে।" এই কথা বলে হাওলদার আপনার বিছানার নীচে এক লম্বা লোহার শিক তুলে দেখাইল। সে তখন দোকান-দারের দাওয়ায় শুইয়াছিল। আর খানিক রাত হলে নবীনের একজন সর্দার এসে আমাকে বলিল—"চল, বাহী সেজে সকলে রওয়ানা হতে হবে—হাওলদারটা যদি সঙ্গে যায় ত ভাল, নচেত গ্রামে ডাকাইতি করে ফিরে আসতে হবে। খানিক পরে ঐ দলের কয়জন লোক বাজারের পূর্ব্ব ধারের সড়ক ধরে গোলমাল করতে করতে আসিল, কেহ কেহ দোকান সকলের দাওয়ায় বসিল, কেহ

আওনের সন্ধানে করতে লাগল, "আর রাত নাই, চল রাহাগীর সকল। উঠ—চল ঠাত'র ঠাওায় যাওয়া যাক, চল" বলে একটা গোলমাল করে তুলিল। এই সময়ে হাওলদারও উহাদিগকে পথিক বোধ করে উঠিল এবং আপনার ঘোড়ায় সাজসজ্জা দিয়ে উহাদের সঙ্গে রওয়ানা হলো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। হাওলদার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এবং লোহার শিকটা কোলের কাছে ধরে, যখন পথে চলতে থাকল, তখন উহার সম্মুখে কেহ যেতে সাহস করিল না। নবীন মুখে মাতায় কাপড় বাঁধিয়া সঙ্গে ছিল কিন্তু একটিও কথা কহিল না। পরে এক স্থানের বাঁধা ঘাটওয়ালা পুকুরের নিকটে এসে কয়েকজন রাহাগীর বলিল—"এইখানে সকলে ঝাড়া ঝাপটা দিয়ে লও—আগে আর ভাল পুকুর পাওয়া যাবেনা।" কেহ কেহ ঝাড়া বসিতে গেল, কেহ কেহ তামাক খেতে লাগল, কেহ বাঁধা ঘাটের পাশে গিয়ে বসিল। হাওলদার ঘোড়া রেখে ঝাড়া বসিল, কিন্তু লোহার শিক গাছটি ছাড়িলনা। নবীনের অগাধ বুদ্ধি! সে তখন কয়েকজনের সঙ্গে কি পরামর্শ করে এবং একজনের হাতে কি দিয়ে পুকুরের দক্ষিণপাড়ে চলে গেল। উত্তরে বাঁধাঘাট। যে লোকটার হাতে কি দিল, সে উত্তর ঘাটে জলের ধারে গিয়ে বসিল এবং হাওলদার ঘাটে আসতেছে দেখে জলে নেমে হাত ঘসিতে লাগিল। হাওলদার হেঁট হয়ে যেমন মুখ ধুতেছিল, এই সময়ে পাছ হতে নব কামার এক ঘা দিল। "কা্যা ছায়?" বলে হাওলদার যেমন ফিরে দাঁড়ালো অমনি যে লোকটা জলে দাঁড়াইয়ে ছিল, সে পাছু হতে গলায় ফাঁস দিল এবং দক্ষিণপাড় হইতে ঘড়িতে টান পড়লো। ঝপাং শব্দে হাওলদার চীৎ হয়ে জলে পড়লো। সকলে দক্ষিণ পাড়ে গেলি। আমরা যেতে না যেতে মৃত হাওলদারের গলার কণ্ঠা কেটে লয়েছিল এবং জলে পড়ে থাকা অবস্থাতেই কয়েকজনে তার কোমরের কাপড় টানাটানি করিতেছিল। যোহর পাইল কিনা, তখন কেহ বলিল না। উত্তর পাড়ে কয়েকজনে ঘোড়ার সাজ খুলে টানাটানি করিতেছিল। এই দেখে শুনে আমি হতবুদ্ধি হলাম এবং আমরা তিনজনে তাড়াতাড়ি ঘরে আসলাম। মনে বড় দুঃখ হলো। পরদিনে নবীনের বিরুদ্ধে একখানা উড়ো চিঠি থানায় পাঠিয়ে দিলাম। এই ঘটনার একদিন বাদে চানকের পল্টনদলের একজন সিপাই আপন দেশ হতে চানকে ফিরে আসতেছিল। সে রাস্তার ধারে হাওলদারের টাট্টুঘোড়ার মত একটি টাট্টু দেখিয়া যায়। সে চানকে পৌছিলে হাওলদারের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল কিনা এই বিষয়ে হাওলদারের ছেলে জিজ্ঞাসা করে। উহার ছেলে তখন ঐ পল্টনে এক সিপাই ছিল। খালি ঘোড়া দেখা ও হাওলদারের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কথা শুনে উহার ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এক এক আড্ডায় হাওলদার চিঠি পাঠাবে বলে কথা ছিল, তাহাও আসিল না। সে অপর সিপাইকে সঙ্গে লয়ে ঘোড়ার তল্লাসে বাহির হইল। তাহারা ঘটনাস্থানের নিকটে ঘোড়াটি দেখিতে পাইল। হাওলদারের পুত্র নাম ধরে ডাকিবামাত্রে ঘোড়াটি দৌড়িয়া আসিল এবং কথা কহিতে না পারিলেও হাওলদারের মৃত্যু সমাচার বলে দিল। ইহার পরে সিপাইদের কথা মতো হুগলীর ডাকাইতি কমিসনারি হতে তদারকের ধুমধাম লাগিল। ইহার আগে উড়ো চিঠি পেয়ে থানা পুলিস এসেছিল। নবীন নালিশ লোকের উপরে লোক পাঠিয়ে আমায় লইয়ে গেল। গিয়ে দেখি ত পুলিসের লোকে নবীনের ঘর দুয়ার ঘেরিয়াছে। নবীন লুকিয়ে আছে। তার সঙ্গে দেখা হলো না; নবীনের ছোট ভগিনী বড় চালাক চতুর মেয়ে। সে মৃত হাওলদারের কিছু জিনিষপত্র তল্লাসত করবার মতলবে আপনার কামাইবার পেতে চুবড়ী লয়ে বাহির হয়। একজন হিন্দু জমাদার উহার চুবড়ী তল্লাস করে দেখিল,

কোন চোরা জিনিষ পাইল না। কাপড় ঝাড়া দেওয়া, অঙ্গ তল্লাস করার হুকুম আছে বলে যেমন জমাদার বলিল, অমনি মেয়েটা চোখমুখ ঘুরিয়ে "তুমি ত আমাদের বাড়ীতে এখন থাকবে, হাতে কাপড় চোপড় খুলে সব দেখাব, এখন আর কেন?" বলতে বলতে চলে গেল। জমাদার অন্যভাব ভাবিল। নষ্ট মেয়ের চতুরালি বুঝিল না। মেয়েটা তাড়াতাড়ি গ্রামের ধনা কামারের বাড়ীতে ঢুকিল। ঐ সময়ে সে নন্দ কামারের নজরে পড়িল। নন্দ উহাকে ইসারা করে ডাকল, মেয়েটা দেখেও দেখিল না। নন্দ কামার নবীনের দলের লোক এবং এই ঘটনার সময়ে সে সঙ্গেও ছিল। আগে নন্দ কামারের কাছে এই মেয়েটার যাতায়াত ছিল। এখন ধনা কামারের সঙ্গে নতুন ভাব। ধনাই এখন নবীনের পক্ষে মালটাল চালাইয়ে থাকে ইহা গ্রামে রাষ্ট্র। ইহাতে নন্দ কামারের মনে বড় অভিমান হলো। নন্দ সতর্ক থাকিল এবং সন্ধ্যার পরে মেয়েটাও অপ্রস্তুত ছিল না। সে নেকড়ায় একটা সোনার কণ্ঠা ও কয়টা মোহর নন্দের হাতে দিল। হাতে পড়তেই কি জিনিষ তাহা বুঝতে পেরে নন্দ পুঁটুলিটি ঐ মেয়েটার চুবড়ীতে গুঁজিয়া দিল। অন্ধকারে মেয়েটা তাহা জানিতে পারিল না। বাকি কণ্ঠাগুলা কি হলো বলে নন্দ কামার বারবার জিজ্ঞাসিল, মেয়েটা সাফ করিয়া উত্তর দিল না, চলে গেল। নন্দ অভিমানে গরগরে হয়ে ঐ রাত্রিতেই পুলিসের নিকটে সমাচার দিল এবং ধনা কামারের ঘর ঘেরাইয়া সোনার কণ্ঠাগুলা তাহার হাপরের মধ্যে ধরাইয়া দিল।

নবীনের ঘর তল্লাসিতে তাহার ভগিনীর কামাইবার চুবড়ীতে সেই নেকড়া বাঁধা একটি সোনার কণ্ঠা ও দুইটি মোহর এবং হাওলদারের কণ্ঠ গাঁথিবার জরীজড়ানো খোপনাসহ রেশমগুলা পাওয়া গেল। সিপাইরা তাহা স্পষ্টরূপে চিনিল। ঐ নেকড়ার পুটলী নন্দকে দিয়াছিল মেয়েটা জানিত, তা, আবার উহার চুবড়ীতে কেমন করিয়া আসিল বুঝতে না পেরে নবীন ও তাহার ভগিনী নন্দ কামারের উপরেই সকল দোষ চাপাইল এবং সে ঐ সকল জিনিষ তাদের ঘরে ফেলিয়া দিয়াছে বলিতে লাগিল।

দুই মাস ধরে এই মোকদ্দমা হইল এবং এই সঙ্গে নবীনের অন্য অনেক অপরাধের বিষয়ে তদারক হইল। নন্দ কামারের এত বুদ্ধি নাই, আমি তাকে বুদ্ধি দিয়াছি ও শিখাইয়া দিয়াছি বলে নবীন আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিল। কাজেই পুলিস আমায় ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে লাগিল এবং আমার অনেক দিন বনবাসী হতে হয়েছিল। হাওলদারকে মারিবার ঘটনায় যে তেরজন লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে নন্দ কামার ছাড়া আর সকলেই এবং নবীনের অন্য অনেক ডাকাইতির সঙ্গী নয়জন লোক ধরা পড়েছিল। নবীন নাপিত, হলধর নেটো, ভোমন ডগরা প্রভৃতি ৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর চালানের হুকুম হয়। নন্দ কামার সাক্ষী হয় এবং নবীনের গুপ্তকথা সকল প্রকাশ করে। ডাকাতি হতে নবীনের ঘরে যাবার পথে বন পুকুরের জলে কত মড়ার মাথা ও হাড়গোড় পাওয়া যায় তার ঠিকানা ছিল না। নন্দ কামার সাক্ষী না হলে আসল কথা জানা পুলিসের সাধ্য ছিল না। নষ্ট মেয়েমানুষ সর্ব্বনাশের মূল। নবীনের দুইটা ভগিনীর অহঙ্কারে ও অত্যাচারে সে ছারখার হয়ে গেল।

* * * *

মাঘমাসের শেষ। একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়ে সনাতন রায় রতনপুরের ডিহির কাছারীর মেলায় তাকিয়ে হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। নিকটে নটবর ঘোষ ও গোপাল বসিয়া আছে। এখানে গোপাল বাগদি নহে, সদ্গোপ বলে পরিচিত। প্রজা পাঠক ক্রমে ক্রমে উঠিয়া

গেল। গোপাল বলিয়া উঠিল, "বড় জমিদারী! এমন প্রজা! এমন আদায় তহশীলের সুখ কোথায় দেখি নাই।"

সনাতন।—এখন কোন ঠেঁটা প্রজার পাল্লায় পড় নাই। একদিন টের পাবে।

গোপাল।—আপনি সদাই ভয়েই কাতর। আমি এখানকার লোকদিগের রকম বেশ বুঝে লইয়াছি। আপনি কেন চিন্তা করেন? এই ৪।৫ মাস মধ্যে "চুরি" শব্দটি শুনেছেন?

সনাতন।—শোনার কে? যে বাড়ীতে কোন দুষ্কর্ম ঘটনা হয়, সে বাড়ীর কর্ত্তা সকলের শেষ দুষ্কর্ম্মের কথাটি জানতে পারে।

নটবর।—আপনার কোন চিন্তা নাই, গোপালদাদার বুদ্ধি ও কর্ম্মী; আর আমার সন্ধান ও বল এক জায়গায় হয়েছে, এখন আর কি রক্ষা আছে! ঈশ্বর করেন আপনি কিছু কাল এখানে থাকেন। অন্য লোকের আনার কথা কি বলছেন, যার বাড়ীতে চুরি হতেছে তারাই এখন জেনেছে কিনা সন্দেহ। গোপালদাদার কাজ ত নূতন ধরণের! আপনি ত জানেন এদেশের সকলেরই ঘরে বাক্সওয়ালা তক্তাপোষ আছে। ঐ বাক্সের মধ্যে টাকাকড়ি ও দামি জিনিসপত্র রেখে চাবি দেয়। তার উপরে বিছানা পেতে রাত্রিতে শুয়ে থাকে। প্রায় সকলেরই বেড়ার ঘর। ঘরের কোণ ও দুয়ারের পাশের বেত বা খড়ির বাঁধন কাটার নিমিত্ত গোপালদাদার অনেক প্রকার অস্ত্র। উহার শরীর যেরকম পাতলা, তা সে অল্প স্থান দিয়ে ঢুকতে ও বেরুতে পারে তক্তাপোষের তলায় বসে, কখন বা শুয়ে পড়ে, সে গুলের সরাখানি বাক্সের তলায় ঘষে। ঐ সরাখানি একটি চেকাটার উপরে বসান। ঘষিতে কষ্ট হয় না। টাকা হতে যে গুল ও টিকা এনেছি, তাতে আগুন দিলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। বাক্সের তলা পুড়ে একটা গোলমত দাগ হয়। ভিজে চট বা ভিজে তুলি দিয়ে আগুন নিবান হয়। ঐ ছেঁদার ভিতর হাত দিয়ে জিনিষপত্র টাকাকড়ি বাহির করে গোপালদাদা তুলিতে ভরে। ওর তুলির ভিতরে একটি থলিতে জল থাকে, আর আর অনেক রকম জিনিষ আছে। তক্তা-পোষে যারা শুয়ে থাকে তারা এই সকল কিছু জানতে পারে না।

সনাতন।—ঘরের মধ্যে অবশ্য অন্ধকার থাকে। তক্তাপোষের কোন ধারে বাক্স আছে কেমন করে জানা যায়?

গোপাল।—যে দিকে বাক্স থাকে, সেইদিকে মাথা দিয়ে লোক শুয়ে থাকে। নিঃশ্বাস বুকে লাগার ঠিকানা হয়। কোন কোন তক্তাপোষে বাক্সের তলাটা কিছু খোলা থাকে, হাত দিয়া তা জানা যায়। ঘরে প্রদীপ থাকলে তুলি হ'তে ধোঁকা ছাড়তে হয়। ধোঁকা দীপে পড়ে নিবিয়ে যেত।

সনাতন।—বুঝলাম, তুমি তবে একলাই ঘরের মধ্যে যাও। নটু ও বিষ্টু বাহিরে থাকে। গৃহস্থ জাগলে ত বিপদ্!

গোপাল।—কেহ জাগলেই যে আমায় ধরতে পারবে সে ভয় করিনা। যদি কেহ হাওয়াকে ধরতে পারে, তবে আমাকেও ধরবে। আপনি কখন আমার জাকান দেখেন নাই। এই কয় মাসের মধ্যে একটিবার একবাড়ীতে আমায় একজন দেখতে পেয়েছিল। সে গোলমাল করতে করতে সদর দুয়ার খুলতে গেল। বাটীর মধ্যে শিমগাছে একটা লম্বা বাঁশ গাড়া ছিল। আমি ঐ বাঁশ ধরে সাঁ-সাঁ করে চালে উঠলাম। দেখলাম পূর্ব-দক্ষিণে দুইজনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি অমনি বল্লাম—"লোকটা কোন দিকে গেল? ঐ যায়, ঐ যায়, উত্তরে দৌড়, দৌড়, ধর ধর।" ইহা শুনে লোক দুইটা

অমনি উত্তরে ঘোড়িল। আমি দক্ষিণ পশ্চিমে এক সাকে ১২।১৩ হাতে তফায়তে পড়লাম। একটু পশ্চিমে আমাদের নৌকা ছিল। চোর ডাকাইত কাজে বেরুলে গানেওয়ালার সুর ও বাজনার মত তার মৎসর বাঁধা থাকে। মনে করলে মতলব মত কাজ করতে পারে। সেরূপ তখন অপ্রস্তুত। তার তেয়াচেকা লেগে যায়। চোর পালালে তার বুদ্ধি বাড়ে। কাজের সময়ে না যোগালে বুদ্ধি বিফল!"

এই সময়ে সারী জেলেনী মাছের পেতে কাঁকে করিয়া কাছারী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সারীর গোলাপ নিটুট শরীর—ভর্তি জোয়ান। নাকে মুখে চোখে কথা। চারিদিকে নজর। নায়েবের নিকটে তখন লোকজন নাই দেখে সারী নটবরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তুই এখানে বসে কেবল পা নাচাবি, আর নায়েববাবুর গুড়গুড়ীর টান শুনবি? শকের গোপালদাকে পেয়ে আপনার জাতবৃত্তি ছাড়বি নাকি? দুই একদিন সকলের সঙ্গে জাল নিয়ে না বেরুলে চলে কি? সবদিক বজায় রাখা চাই। এই আমি গাঙের ঘাটে গোলার মায়ের কাছে মাছ নেবার সময়ে তোর অসুখ হওয়ার কথা বলে এলাম, আর তুই এখানে এসে বসে গল্প মারছিস!" নায়েববাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনার ছেলেকে অনেকক্ষণ কাছে রাখবেন না আমার মারফতেই সব কথা হবে। দিনে রেতে যখন দরকার—আমায় পাবেন।"

সনাতন।—তোমায় পেলে আর তোমার নটুকে চাইনা। ওকে তুমি এখনি লয়ে যাওনা।

সারী একটু হাসিয়া বলিল—"না মহাশয়! আমি কাজের কথা বলছি। এবারে এরা সকলে অনেক দিন বাদে ফিরে এসেছে, আর মাল বেচেও খুব লাভ পেয়েছে। তার চেয়ে জিনিষ পালিয়ে বাট করে রাখাই ভাল। এখন বেচারই বা প্রয়োজন কি?"

গোপাল।—সেকথা ঠিক। এবারে চাকায় আমাদের বেশী বিলম্ব হয়েছে। মাল আর বিক্রী করা হবে না। আগেকার মত সারী ও উহার ভাই বিকুর মারফতে উহাদের বাপের গাঁয়ের কামারের নিকটে বাট করে আনা স্থির করে রেখেছি।

সারীর দিকে তাকাইয়া বলিল—"নটুদাদার ধরা খাঁইস-ওয়ালা মাছে তোর আর কাজ কি? এখনত তোর চুবড়ীতে সোনা রূপার মাছ পড়ছে, তোর গায়েও চড়ছে।"

সারী।—সে ত তোমার গুণে, তোমাদের ছেলের যত গুণ, তা আমাকে ছাপা নাই। আমি সন্ধান আনি, তবে ত সে তোমায় বলে। এপর্যন্ত আমি যে সব সন্ধান দিয়েছি, তার একটিও কি বেঠিক হয়েছিল?

* * * *

ভাদ্রমাসের একদিন বেলা ৮।৯টা সময়ে সারী জেলেনী ছোট বড় দুইটা মাছের পেতে ও একটা ডালা লয়ে গাঙের পশ্চিমে এক গাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছে। কখন কখন বসিতেছে, আবার দাঁড়াইতেছে। নটবরের নৌকার দেখা নাই। তাহার দক্ষিণে খানিক তফাতে জঙ্গলের আড়ালে সাদা পোষাক গায়ে কাল টুপি মাথায় একটি লোক দাঁড়াইয়া গাঙের ঘাট দেখিতেছে। নূতন মুখ। পূর্বদিকের বাড়ি গাঙ হইতে একখানি নৌকা বড় নদীতে প্রবেশ করিয়াই উত্তর মুখে রওয়ানা হইল, পাড়ি দিলনা। আপনাদের নৌকার মত নৌকা দেখিয়া সারী দাঁড়াইল কিন্তু নৌকাখানির গলুই উত্তর মুখে ফিরিবার পর সারীর মনে সন্দেহ জন্মিল। সারী জলের ধারে গিয়া সঙ্কেত করিবে মনে করিয়া অগ্রসর হইল। ডাইনে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং নৌকা না আসিবার কারণ বুঝিতে

পারিল। পোষাকওয়ালা লোকটিকে দেখিয়া সারী পাছে হাটিল না। যেমন বেগে চলিতেছিল, সেইরূপ বেগে জলের ধারে গিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আবার গাছতলায় আসিল। পোষাক ও টুপিওয়ালা লোকটি এক হেডকনেষ্টবল। সারী ঘাটে নামিবার সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে বুঝিলেন, রৌদ্র তাপেও তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর গোপনভাবে না থাকিয়া সারীর নিকটে আসিলেন, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন।" ইহার উত্তর দিতে না দিতে, তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন —"তোমার গায়ে এত গহনা কোথা হতে হলো ?"

সারী।—জেলের মেয়ের গহনা কোথা হতে হলো এর হিসাব পুলিসকে দিতে হবে নাকি ?

হেডকনেষ্টবল। —তোমার এসব কিসের পেতে ?

সারী।—এসব বাঁশের পেতে।

হেডকনেষ্টবল। —তা নয়, এতে কি থাকে ?

সারী। এতে মাছ থাকে, শাক থাকে, যা রাখ, তাই থাকে।

হেডকনেষ্টবল পেতে দুইটা তুলিয়া নাকের কাছে ধরিলেন এবং আঘ্রাণ লইলেন। বোধহয় মাছের গন্ধ পাইলেন। অপর কোন কথা বলা যোগাইল না। খানিকক্ষণ পা ঘসিয়া ঘসিয়া পেতে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন "বড় শক্ত লোক দেখছি—আচ্ছা !"

সারী অটল অনড়, গম্ভীরভাবে যেমন দাঁড়া ছিল, তেমনই রহিল। হেডকনেষ্টবল দক্ষিণে পুলিসের অতীত হইলে সারী পেতে ডালা লইয়া উত্তর মুখে গাঙের ধারে ধারে চলিল। অস্থানে পুলিসের প্রবল। পাত্র ভাঁকাই সার হইল।

* * * *

গন্ধী জাঁটা চেয়ারে ব'সে, টেবিলের ওপর কাগজ রেখে, রাত্রিবাস-পরা সুপুরুষ ভদ্রলোক সারারাত ধ'রে লিখেই চলেছেন। রাত্রিতে লেখাই তাঁর অভ্যাস। টেবিলের ওপর জ্বলছে মোমবাতি, আলছে ফ'রে ফ'রে। যেন রাত্রির পরমায়ুও শেষ হ'য়ে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে। টেবিলের ওপর আছে একটা কেৎলী আর এক পেয়ালা কফি। লিখতে লিখতে কফির পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে তিনি পারেন না।

এইভাবে সারারাত জেগে সাহিত্য রচনা করতেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ওনোরে দ বাল্‌জাক।

রবীন্দ্র স্মরণ

ইলা পাল চৌধুরী

শ্রাবণের ধারার সঙ্গে আজ সকলের মনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ও বাণী জেগে ওঠে। যাঁরা দেখেছেন, সেই উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান আজও তাঁদের কানে বাজে, সেই তরুণ সূর্যের মত কান্তি চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করতে গেলে, তাঁর বহুদিক নিয়েই আলোচনার অবকাশ আছে। আজ শুধু তাঁকে স্মরণ-এর দিন, তিনি দীর্ঘ জীবনে বাঙ্গলাকে, ভারতবর্ষকে, সারা পৃথিবীকে অজস্র ধারে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর প্রেরণা ও প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিত্ব ও কর্মধারা একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত। দেশপ্রেম উজ্জ্বল দীপশিখার মত প্রজ্বলিত।

পরাধীন ভারত মাতার বরপুত্র। বিশ্বের তিলক মাথায় নিয়ে ভারতের গৌরববৃদ্ধি করেছেন। পৃথিবী সেদিন বুঝেছে, ভারতবর্ষ পরাধীন হলেও তার কিছু দেবার আছে। দেবার আছে এমন সম্পদ যা পৃথিবীর হিংসা প্রদুষ্ট দর্শনের কাছে দুর্লভ। সেটি হল বিশ্বমৈত্রীর বাণী, সে বাণী সেদিন সারা জগত সম্ভ্রমের সঙ্গে শুনেছে।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবীড় চীন
শক হুন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

এই বাণী রূপ নিল শান্তিনিকেতনের আশ্রমে, বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কবিগুরুর ডাকে কত দেশ থেকে শ্রদ্ধাবান শিক্ষক ও ছাত্র এসেছেন। শিক্ষাদান করেছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

নাম করলে জপমালার মত মনে হয়, এমনই শুভ্রের সব মনীষী ও শিক্ষাবিদ এসেছেন।

ফরাসী দেশ থেকে Sylvan Levi, Mon Benoit, জার্মানীর Winternitz, ইতালীর তরমিকি ও তুচি, নরওয়ের স্টেন কোনে, চেকোশ্লোভাকিয়ার V. S. Lesny, অস্ট্রিয়ার ভেলা ক্রামরিশ, Holland থেকে Bake, মার্কিন দেশ থেকে Pratt, রাশিয়ার Bogdanov, ইংলণ্ডের collins, James Cousin, Elmhurst, Hungary-র গেরবান্স, চীনের লিন ও চিয়াং আর তান্ হুন সান্, পারশ্য থেকে ধাম্ব্ ও তিব্বতের সোবম রসতুল এবং সিংহল থেকে রাজগুরু ধর্মধার মহাস্থবীর।

এই রকম কত লোকের আনাগোনা রয়েছে। বিশ্বভারতীর শান্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর আত্মার ছায়াতলে, তাঁরা শিক্ষাদান করেছেন ভারতবর্ষের প্রাণের কথাটি সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন।

বহু ভারতীয় অধ্যাপকেরও অভাব ছিল না। মহাপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। আলাপচারি ক্ষিতিমোহন সেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আরও অনেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসে তাঁদের শিক্ষাদান ব্রত হিসাবে পালন করেছেন, অর্থের প্রশ্ন সেদিন ছিল না। বিশ্ব এক নীড়ে নিবদ্ধ হয়েছিল। পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সম্মান ও সর্বমত ও ধর্মের স্বীকৃতি ছিল। সেই আবহাওয়াতে মানুষ এমন সব লোকেদের যখন সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তখন সত্যিই দুঃখ হয়। কারণ এর চেয়ে রবীন্দ্রদর্শন বিরুদ্ধ আর কি হতে পারে!

কত দেশবরেণ্য নেতা সমাবর্তন উৎসবে এসেছেন, তাঁদের ভাষণ দিয়েছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জাতির জনক মহাত্মাজী তাঁর সহধর্মিনী কস্তুরবা গান্ধি, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও অকাতরে তাঁকে অর্পিত ছিলেন।

আম্রকুঞ্জে বা ছাতিম তলার ছায়াবীথিতে সভা বসেছে, রবীন্দ্রনাথ মাননীয় অতিথিদের কারুকার্যময় ধৌতবস্ত্র, মাল্য, চন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করেছেন, বিশ্বভারতীর প্রসাদ লাভ করতে ছাত্র ছাত্রীর দল উৎসুক হয়ে সমবেত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী উপস্থিত, শান্তিনিকেতন তীর্থধামে পরিণত হয়েছে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাটিতে শীতের রৌদ্রের আলপনা, বাতাসে পাতায় পাতায় মৃদু আন্দোলনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বার্থক উপলব্ধির বার্তা সকলের কানে কানে, প্রাণে প্রাণে পৌঁছে দিয়েছে—"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

নেতৃবৃন্দ এই পরিবেশে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন, তাদের আশীর্বাদ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে, সমস্ত কর্মের স্বর্ণসূত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজও তাঁর প্রভাব চলে যায়নি, কাজ চলেছে এমনই সার্থক সংগঠন তিনি করে গেছেন।

প্রথম যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ১৭।১৮ বৎসরের রবীন্দ্রনাথের কি গভীর দেশপ্রেম। পরাধীন ভারতে তাঁর মনের তীব্র অনুভূতি তিনি ব্যক্ত করেছেন।

"হেলায়ে মাথা, হাতের আগে মিষ্টি হাসি টানি,
কহিতে আমি পারিবনাত তব্যতায় বাণী।"

তাঁর মনে তখন তারুণ্যের প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাস। সমস্ত পুর সমাজকে সে উচ্ছ্বাস আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত স্পর্শ করেছিল।

"ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন,
আকাশ তলে বিশাল মরু দিগন্ত বিলীন—
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি, জীবন স্রোত আকাশে চালি,
চলেছি নিশিদিন।
শূন্য ব্যোম অপরিমান, মন্ত্র সম করিতে পান
* * *
রহিতে নারি শান্ত হয়ে, আত্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে, লুপ্ত হয়ে, গুপ্ত গৃহ বাসে।"

আরও কিছুদিন পর দেখা যায় তিনি স্বদেশী মেলার জন্য গান বাঁধছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানে সুর সংযোগ করছেন। সময়-এর স্রোত বয়ে চলে, ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের প্রদত্ত "Sir" উপাধি ছাড়লেন, জালিয়ানওয়ালা-বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁর Lord Chelmsfordকে লিখিত পত্র পড়লে আমরা সেদিনের আবহাওয়া অনুভব করা যায়।

"The accounts of insults and suffering undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India. Universal agony and indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, who are possibly congratulating themselves for imparting what they imagine to be a salutary lesson.

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in this incongrouous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation, not fit for human beings."

ইংরাজ সরকার রবীন্দ্রনাথের এ পত্র স্বীকার করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রদত্ত মর্যাদা "Sir" সেদিন থেকেই ত্যাগ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত, দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। আজও মনে পড়ে একদল যুবক তাদের রাজনৈতিক কারণে আন্দামানে বোধহয় পাঠান হচ্ছে। আমরা খুবই ছোট, বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিনা, তারা হাতের শৃঙ্খল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে :—

"যদি আলো না ধরে
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে, আপন বুকের
পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে
একলা চলরে।"

মনে পড়ে, আমার মায়ের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। আমাদের বুক, কেমন যেন তোলপাড় করছে, রবীন্দ্রনাথের গানের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার উপযুক্ত কিনা, ভারতবাসী স্বাধীনতা না স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করবে ইত্যাদি নিয়ে যখন বিতর্ক সভা, conference ইত্যাদি চলছে, রবীন্দ্রনাথ সে সব সভায় বিতর্কে বিশেষ যোগ দেন নি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য তাঁর গানেই বলেছেন ভারতবর্ষ উপযুক্ত কি না।

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জীবন মাগো তোমায় ভালবেসে।"

তরুণ তরুণীদের মুখে সে গান প্রচারিত হল। তাঁর কর্ম পদ্ধতিও এক সজীব সুরে বাঁধা ছিল। সুরুলে, শ্রীনিকেতনে, গ্রামকে সুন্দর করবার প্রচেষ্টা চলেছিল—গ্রাম যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়,

ছাপাখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, কুটীরশিল্প, কৃষিকার্য্য, সবের সুষ্ঠু বিন্যাস করে আদর্শ গ্রাম ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সমবায় পদ্ধতিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতির ও আবহাওয়ার সাহায্যে কি করে এই গরীব দেশে উন্নতি করা যায়, সেদিকে তাঁর নিরন্তর চিন্তা ছিল। একটি windmillও তিনি বসিয়েছিলেন। হাওয়ার সাহায্যে কল চালাবার জন্য। নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে জীবন গভীর ও সুন্দর করা, অভিনব ভাবে, পুরাতন ব্রত উৎসবের প্রাণ সঞ্চার করাও যে পল্লী মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করতেন।

চাঁদের দিনে কত ইমন, ঝুলনের রাগের অবতারণা করে সঙ্গীত রচনা হয়েছে, আশ্বিনের দিনে সদ্য বসন্তে কাফির সুরে গানের ঝঙ্কার উঠেছে। বর্ষার দিনে তাঁর কবি মন সেই পরম প্রিয়ার সন্ধানে অভিসারে বেরিয়েছে—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা, বন্ধু হে আমার।"

মেঘমল্লারএর গভীর মূর্চ্ছনা তাঁর গানে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামের সমস্ত কর্ম, শিল্প ও উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর প্রাণ মেতেছে। বর্ষার ঘন মেঘে, শরতের নীল আকাশে, বসন্তের পুষ্পসম্ভারে "কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপার মেশা" সৌন্দর্য্য দেখে তাঁর কবি মন গানে, কবিতায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। নৃত্যশিক্ষা দেবারও তিনি ব্যবস্থা করেছেন, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে নৃত্য কুশলী গুরুরা এসে নৃত্যশিক্ষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বহু নৃত্য-নাট্য রচনা করলেন। নৃত্যকলা তাঁর হাতে নানা ঘরোয়ানার সংমিশ্রনে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করল। শান্তিনিকেতনের নৃত্যের পরম্পরা সৃষ্টি হল। নৃত্য-নাট্য সর্বত্র সমাদর পেল।

নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে জীবনের ছবি। গোরা, ঘরে বাইরে, নষ্টনীড়, যোগাযোগ, চতুরঙ্গের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তাঁর ছোট গল্প এক একটি ফুলের মত পরিপূর্ণ—কোথাও অসম্পূর্ণতা নেই।

শুধু কি ভাবালুতা করেছেন, তা নয়, জীবনের বাস্তব কঠিন সত্যও তিনি উপলব্ধি করেছেন।

লোকসঙ্গীত তাঁকে মাতিয়েছে, রূপকথার অঞ্জন তাঁর চোখে লেগেছে।

"মেঘলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান,
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এল বান
মনে পড়ে সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো
চারিদিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো,
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্,
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ।"

আবার ডাকাতদের ঢাক, সোরগোল তাঁর মনে বাজছে, লিখছেন—

"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে—
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেন ডাকাত দলের মেলে।"

সাধারণ গরীব, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের কথা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন, তাই এত দরদ দিয়ে অসুস্থ মেয়েটির কথা, কত সহজে তাঁর লেখনি লিখতে পেরেছে—

"রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
জীবনটা সেই একই চাকায় বাঁধা।
আজ মনে হয় সেই চাকাটি থামল যেন!
তবে, আবার শুধু কেন?"

শাসন ব্যবস্থার নানা দুর্বলতাকে তিনি তাঁর হাসির কবিতার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন—হরুচন্দ্র রাজার পঙ্কুচন্দ্র মন্ত্রী অন্যের কাজ অম্লান বদনে নিজের বলে চালিয়ে বলছেন—

"একথা হবে মানিতে
আমারও ছিল মনে—
কেমনে সেটা—পেরেছে সেটা জানিতে।"

পরোপকারীর নিন্দা এবং পরচর্চ্চার সম্বন্ধেও তাঁর তীব্র কটাক্ষ আছে। বহু পরোপকারিনী রাণী "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "এত রাত হল, তবু কিসের কমিটি?" পরিচারিকা উত্তর দিচ্ছে, "সবাই তোমার রূপের কমিটি, বিচুতে ছিলেন, চহুতে ছিলেন, মই দিয়ে কবে ঘষতে ছিলেন, আমি তার মাঝে বীজ ছিটিয়ে চাষ করেছি আশা মিটিয়ে।"

অযোধ্য জিনিষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতার উক্তি "হিং টিং ছট" ত বাঙলার প্রবাদ বাক্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষের মনের প্রতিটি সূক্ষ্মতন্তুতে তাঁর লেখা অনুরণন তুলতে পারে। প্রেমিক তাঁর প্রেম আরও সুন্দর করে দেখবে। প্রকৃতির শোভা তাঁর সৌন্দর্য্য সম্ভার নিয়ে চোখে ধরা দেবে। সাধক তার সাধনার পথ নির্দ্দেশ পাবে। তাঁর কবিরূপে ও কর্ম্মিরূপে ভারত নবীন রূপে বিকশিত হয়েছে, তাঁর আশ্রম বৈদিক আশ্রম জীবনকে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর শান্তিনিকেতন গ্রন্থ বেদ বেদান্তকে আমাদের কাছে সরল, সরস করেছে। তাঁর সাধনার ভারতী, বিশ্বভারতী হয়েছে।

তাঁর পাঞ্চজন্যে কবি মানসের আহ্বান আজও আকাশে বাতাসে বাজছে:

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদি রথে
ওই যে তিনি ওই যে বাহির পথে
আয়রে ছুটে টানতে হবে রশি
ঘরের কোণে রইলি কোথা বসি।
* * *
রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ—
গাইছেনা মন মরণ জয়ী গান,
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মত,
ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যত?"

বিশ্ব-সাহিত্য

যে সিঁড়ি নরকের দিকে নেমেছিলো

মূল : পারলাগেরভিস্ট

অনুবাদ : শিশির মজুমদার

[পারলাগেরভিস্টের এই গল্পটি আধুনিক সভ্যতাকে চাবুক মারার স্পর্ধা রাখে। চুয়াত্তর বছরের এই সুইডিশ লেখক বিশ-ছোটগল্পে প্রকৃতি ও জগতের আড়ালে আত্মিক পরিবর্তনে এক দুঃসাহসী নায়িক। ১৯৫১ সনে তাঁর 'বারেব্বাস' উপন্যাস নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত করেছে। আমাদের দেশে তিনি বিশেষ পরিচিত নন তার কারণ জনরবের ভিড়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম উদ্ভাসিত নয়। জন্ম : ১৮৯১, ২৩শে মে। —অনুবাদক।]

ধাবমানী মহলে খ্যাতিমান পুরুষ মিঃ স্মিথ একদিন একটী বিখ্যাত হোটেলের লিফ্‌টের দরজা ঠেলে তার সুন্দরী তন্বী প্রণয়িনীর কোমর জড়িয়ে নরম গদি আঁটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই লিফ্‌ট নিচের দিকে নামতে শুরু করল। কোট ও পাউডার শোভিতা সুন্দরী মহিলাটি তার টস্‌টসে আঙুরের মতো ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে মিষ্টি মদের গন্ধ দিয়ে তার নোতুন প্রণয়ী মিঃ স্মিথকে অভ্যর্থনা করলো। তারা দুজনে একটু আগে হোটেলের ছাদে তারার ভরা আকাশের চাঁদোয়ার নীচে রাত্রের ভোজ সাঙ্গ করেছেন। এবার তারা চলেছেন যৌবন রঙের খেলায় রঙীন হতে।

'প্রিয় আমার, কী স্বর্গীয় অনুভূতিই আমরা পেয়েছি!' মহিলাটি আবেগে ফিস্ ফিস্ করে জানালো তার প্রণয়ীকে, 'আহা, তারার রাজ্য কি কারাময়! ওখানেই তো প্রেমের বিশিষ্ট রূপ জেগে ওঠে। আচ্ছা, তুমি তো আমাকে ভীষণ ভালোবাসো না?'

মিঃ স্মিথ তার উত্তরে তরীর ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন করলেন।

'তুমি ঠিক সময়ে আমার কাছে এসেছিলে; নইলে আমি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়তাম।' মিঃ স্মিথ গাঢ়-আবেগে তার প্রণয়িনীকে জানালেন।

'হুঁ' আর তাছাড়া তুমিও আমাকে বাঁচিয়েছ। আচ্ছা কল্পনা করতো সেই লোকটা কী ভয়ানক! যে মুহূর্তে আমি কোথাও যাবো বলেছি, সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্নে জানিয়ে মারত: আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, ইত্যাদি। আমিও সোজাসুজি বলতাম, 'আমি যেখানে খুশি যাবো, আমি তো আর কারো খাঁচার পাখি নই!' এরপর সে লোকটা গুম হয়ে বসে হাঁ ক'রে আমার পোষাক পাল্টান দেখত। 'আচ্ছা' আদুরে সুরে স্মিথ-সুন্দরী বলল, 'এই পোষাকটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলতো? কোন রঙ তোমার ভালো লাগে, সিল্কে?'

'তোমাকে সব তাতেই সুন্দর মানায় ডার্লিং, ব্যবসায়ীটি বলেন, তবে আজকের সন্ধ্যার মতো এত সুন্দর পোষাকে আমি তোমাকে কখনো দেখিনি।'

সুন্দরী তখন গর্বের হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে কোটটা গা-থেকে খুলে হাতে রাখলো। আর আবার খানিকক্ষণের জন্যে তারা ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে বসে রইলেন।

ওদিকে লিফ্‌ট নিচের দিকে নেমে চলল।

'জানো আমি যখন আজ বেরুতে যাচ্ছি—সেই লোকটা আমার ডান হাত এমনভাবে মড়িয়ে ধরল যে যন্ত্রণায় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, অথচ সে তার জন্যে আমাকে কিছুই বলল না। সে যে কী সাংঘাতিক জন্তু তা তোমার ধারণা নেই। আমি ওকে ভদ্রতা করে বললাম, 'আচ্ছা আসি তবে।' সে তার কোন উত্তরই দিলে না! ও আসলে একটা ভয়ানক গোঁয়ার। আমি ওকে মোটেই সহ্য করতে পারিনা।'

'এতো তবুও একটা সামান্য ব্যাপার।' মিঃ শিব বললেন।

'ঠিক এই জন্যেই আমি কোথাও একটু আমোদ-প্রমোদ করতে যেতে পারি না। এ ব্যাপারে সে কী এক বোধা—তুমি কখনোই তা ভাবতে পারবেনা। ওর কাছে আমার কোথাও বেরুনো যেন একটা জীবন-মরণ সমস্যা!'

'আহা, বেচারাকে কী ভাবে সহ্য কর!'

'আর বলোনা, আমি জ্বলে-পুড়ে মরছি। আমি যেভাবে কষ্ট পাচ্ছি এরকম বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ পায়না। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে ভালোবাসার অর্থটাই আমার অজানা থাকতো।'

'সোনা আমার!' শিব তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে আদর করতে সুরু করলেন। আর ওদিকে লিফ্‌ট নিচের দিকে নেমে চলেছে।

'আঃ!' আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে সখী বলল, তখন তোমার পাশে বসে খোলা আকাশে তারাগুলোর দিকে……ওঃ…… আমি তা কখনই ভুলতে পারব না। তুমি দেখো, ঐ আরভিংকে নিয়ে আমার আর চলবে না। ও একটা বর্ষ ঠাকুর। এক কণা কাব্য যদি ওর মধ্যে থাকতো—এর সেরকম কোন অনুভূতিই নেই।

'সত্যিই তো এ একদম অসহ্য!'

'তাহলে তুমিই বল, আর সহ্য করা যায় কিনা? কিন্তু—' মোমের মত সুন্দর হাত শিবের দিকে বাড়িয়ে সে বলল, আমরা আর ওসব ভাববনা। আমরা ফুর্তি করতে বেরিয়েছি—ফুর্তি করব। তুমি সত্যি সত্যি আমাকে ভালবাসো তো?

'নিশ্চয়ই, ব্যবসায়ী শিব সুন্দরীর কমনীয় কোমরের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আদর করতে লাগলেন। আর সুন্দরীর গালে লজ্জা-রঙীন আভা জাগল। আজকে আমাদের এই ভালোবাসার রাতটাকে স্মরণীয় করে তুলবো—কী বল?' শিব ভেজা-ভেজা গলায় প্রস্তাবটা পেশ করলেন। সুন্দরী তার জবাব দিল নিজের কোমল দেহটাকে শিবের দেহের সঙ্গে এক করে দিয়ে আবেশে তার চোখ বুজে এল।

লিফ্‌ট নিচের দিকে গড়িয়ে চলল।

এবার শিবের চমক ভাঙলো। গা-টা যেন মাটিতে ঠেকলো। তার মুখে রক্তের প্রবাহ এল।

'আচ্ছা, লিফ্‌টার কি হলো—এ.য় থামছেই না।' বিব্রত হয়ে তাকে বলতে হল। 'আমরা সেই কখন থেকে এখানে বসে কথা বলছি, তাই না?'

'আমারো তো তাই মনে হচ্ছে। সময় এত তাড়াতাড়ি যায়।'

'ওঃ ভগবান। আমরা যেন এখানে কয়েক যুগ ধরে বাস করছি।'—একথা বলে মিঃ স্মিথ একবার ছোট্ট হুহুঙ্কার দিয়ে তার দৃষ্টিটা বাইরে চালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাল ভাল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। আর সেই লিফ্‌ট আরো দ্রুত বেগে গভীর অতলের দিকে নেমে চলল।

'হে ঈশ্বর! আমরা যেন এক অসীম গর্তে নেমে চলেছি। আর কতদূর যাবো:। তারা সেই তলদেশের গভীরতা পরিমাপ করবার জন্যে আরেকবার সেই ফুৎকারীতে উঁকি দিলেন। আবার সেই ভাল ভাল অন্ধকার দেখা গেল। তারা যেন এই অন্ধকারের গভীরে ডুবে চলেছেন।

স্মিথ বললেন, 'আমার মনে হয় এটা নরকের দিকে ছুটছে।'

'অ্যাঁ, নরক।' বলে আর্তনাদ করে সুন্দরী তরুণী স্মিথের গলা জড়িয়ে ধরল।

'আমার খুব ভয় লাগছে। ব্রেক ট্রেক কষে টান দাওনা!'

স্মিথ ব্রেকটা তার প্রাণপণ শক্তি দিয়ে টানলেন। কিন্তু কোন ফলই হল না। লিফ্‌ট যেমন চলছিল তেমনি অন্ধকারের গহ্বরে নেমে চলল।

'ওঃ, কি ভয়ানক, আমরা কোথায় চলেছি!' চীৎকার করে উঠল স্মিথ-প্রণয়িনী!

'আমাদের উপর বোধহয় একটা দানো ভর করেছে—তাই আমরা এক ভীষণ ধ্বংসের পথে চলেছি।' মিঃ স্মিথের এই কথা শুনে সুন্দরী যুবতী হতাশায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন স্মিথ তাকে শুকনো কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগল 'ভেঙে পড়োনা লক্ষ্মীটি। আমরা কি একেবারেই জ্ঞান হারিয়েছি? যদিও আমাদের এখন কিছু করবার নেই, কিন্তু আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি বসে চুপচাপ অপেক্ষা তো করতে পারি! আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এটা কোথাও না কোথাও থামবেই। এবং দেখো, একজন প্রেত গোছের কেউ আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসবে।'

'তাহলে আমরা বেশ একটা মজা করতে চলেছি—এইরকম ঘটনার জন্য কিছু ভাবি—কি বল?' স্মিথ-সুন্দরী জানাল।

'নিশ্চয়ই—তাই।' জোরের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে স্মিথ সায় দিলেন।

'এবার আবার তবে বল তুমি আমায় ভালবাস?' সুন্দরী আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল। স্মিথ তার প্রেমিকার উত্তরে নিবিড় করে তার গলা জড়িয়ে নরম পুষ্ট উত্তপ্ত বুকে মুখ গুঁজল। আর ওদিকে লিফ্‌ট নেমে চলল—চলল—চলল।

অবশেষে হঠাৎ একজায়গায় লিফ্‌ট এসে থামল। সেখানকার ঝকঝকে আলোয় চোখ ঝলসে যায়। তারা নরকের দরজায় এসে পৌঁছল। একজন প্রেত দরজা খুলে সবিনয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। 'শুভ সন্ধ্যা' প্রেত মাথা নীচু ক'রে সম্ভাষণ জানাল যুগলকে। সে তার একগুচ্ছ চুলওয়ালা লেজ আর অপেরা বক্সগুলোকে খুব স্টাইলে নাড়িয়েছে।

স্মিথ এবং সেই মহিলাটি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, 'ভগবানের দোহাই, এ আমরা কোথায় এসেছি?' তারা ভীত-চোখে জিজ্ঞাসা করলেন।

'চারদিকে যেরকম শব্দ উঠছে—তা খুব ভয়ের ব্যাপার নয়। আপনারা নিশ্চয়ই একরাত আনন্দে কাটাতে চান? আমি কি সে ব্যবস্থা করব?' প্রেত তাদের জানাল।

এবার স্মিথ সব ভুলে গিয়ে বল্লেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—আপাততঃ এক রাতের ব্যাপার।'

যুবতী তার কম্পিত হাতখানি স্মিথের বলিষ্ঠ হাতের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। সেখানে আলো ছিল বড় কম, তাও ফ্যাকাসে সবুজ। যার ফলে, তারা দেখতে পাচ্ছিল খুব অস্পষ্টভাবে। চারদিক থেকে একটা গুমোট গন্ধ তারা পাচ্ছিল ধীরে ধীরে এই পরিবেশটা যখন তাদের অভ্যস্ত হল তখন তারা আবিষ্কার করল যে তারা একটা চৌকো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যার আলোহীন ঠাণ্ডা দরজাটা অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে। সেই দরজায় একটা পরদা ঝুলছে—সেই পরদার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে অনায়াসে তার ওপাশে একটা কী যেন পুড়ছে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রেত জিজ্ঞাসা করল, আপনারা তো দু'জন দুজনকে খুব ভালবাসেন না? মদির আঁখিদুটো দিয়ে প্রেতের প্রতি একটা মিষ্টি দৃষ্টি হেনে সুন্দরী জানাল, 'নিশ্চয়'?

'তবে এই রাস্তা—আপনারা দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন।'

তারপর প্রেতের পেছনে পেছনে অপরাধীর মতো নিস্তব্ধ একটা পচা দুর্গন্ধময় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন রাস্তার পাশে একটা জং ধরা তারা কালিমাখা হারিকেন ঝুলে আছে।

'এই সেই ঘর'—এই বলে সেই প্রেত দরজা খুলে দিয়ে খুব বিচক্ষণ লোকের মতো ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তারা ভিতরে ঢুকতেই একটা মোটা কুৎসিত প্রেতিনী এসে ঘরে ঢুকল। তার বুকটা বিচ্ছিরি রকমের স্ফীত আর থলথলে। সে ক্যাঁস-ক্যাঁসে হাসিতে ওদের সম্ভাষণ করল। খুদে খুদে পুঁতির মতো কুৎকুতে চোখে একবার ওদের দেখল। তার কপালের সিঁদুরটোর চারপাশ দিয়ে সরু সরু ঘাসের মতো একগুচ্ছ চুল নীল সিল্কের রিবণ দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

আপনাদের জন্যে আট নম্বর ঘর দেওয়া হয়েছে। এই বলে প্রেতিনী তাদের হাতে একটা বিরাট চাবি দিলো।

প্রেতিনীর কথা অনুসারে তারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পিচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন সিঁড়িগুলো চর্বিতে মাখা ছিল।

মিঃ স্মিথ নম্বর দেখে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুললেন। তারা উভয়েই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরটা বেশ বড় কিন্তু ভাঁত ভাঁতে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল ও একটা পুরানো টেবিল-ঢাকনি। বিছানা ঘিরে দেওয়ালটা একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাদের কাছে এসবই খুব সুন্দর মনে হল। তারা উভয়েই কোট খুলে একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আঁকলেন।

এই সময় যেন খুব অনিচ্ছাতরে একটি লোক অন্য দরজা দিয়ে ঢুকল। তার পদসঞ্চার খুব নিঃশব্দ ও নিজেরই অজ্ঞাতসারে একটি ঘন্ত্রের মতো। তার চেহারার মধ্যে একটি কঠোর কর্কশভাব। তার চোখের দৃষ্টি সোজা স্থির-মৃত্যু-বিবর্ণ। তার শরীরে একটা গুলির ক্ষত।

তারা তাকে বিশেষ আমল দিলো না। কিন্তু সে যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তখন স্মিথ বললেন 'আমাদের ভেটা পেয়েছে। আধবোতল 'মাডেরিয়া' এনো তো? লোকটা মাথা নিচু করে আদেশ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মিঃ স্মিথ তার পোষাক ছাড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তার সুন্দরী প্রণয়িনী ইতস্তত: করতে লাগল, 'সে এক্ষুনি ফিরে আসবে' তথী স্মিথকে বলল।

'আরে দূর! এমন জায়গায় ওসব কিছু মনে করতে নেই।'

'একবার ভাবতো প্রিয় স্মিথ।' সুন্দরী আবেগে ফিস্‌ফিস করে বলল! 'এখানে এক সঙ্গে বসে শুধু তুমি আর আমি—এই অদ্ভুত রোমান্টিক জায়গায়। সত্যিই কি সুন্দর···এ আমি কখনোই ভুলতে পারবো না!'

'প্রিয়া আমার!' স্মিথ প্রকাশ করলেন তার হৃদয়ের আকুতি। তারপর একটি সুদীর্ঘ চুম্বনে মগ্ন হলেন।

আবার সেই লোকটি এলো নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে ছায়ার মতো। সে গ্লাস দুটো টেবিলের উপর রেখে মদে পরিপূর্ণ করল। টেবল ল্যাম্পের আলো তার মুখের উপর এসে পড়ল। তার কপালের পাশে সেই গুলির ক্ষত আর মৃত্যু করুণ মুখ ছাড়া তার আর কোন বিশেষত্ব ছিল না।

যুবতী তাকে যেন আবিষ্কার করল। বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল।

'আরভিন্ তুমি? হে ঈশ্বর—সে মারা গেছে? আত্মহত্যা করেছে?'

এই কথাগুলো শুনেও লোকটা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৃষ্টি ছিল সুন্দরীর প্রতি। তার মুখে কোন যন্ত্রনার চিহ্ন ছিল না। সেখানে ছিল একটা কবরের মতো কঠোরতা।

'কিন্তু আরভিন—তুমি কি করলে? তুমি কী করে এমন সর্বনাশ করলে? যদি আমি ঘুনাক্ষরে একবারও জানতাম তবে—তবে কি আমি এভাবে বেরুতাম? নারা, কক্‌খোনোই না। তুমি তো কোন সময়ে আমায় এ সম্বন্ধে কিছুটি বলনি? তুমি যখন আমাকে বলনি, তখন আমি কী করে জানব? ও-হো-ভ-গ-বা-ন।'

সুন্দরী তথীর সমস্ত শরীর কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছিল। লোকটি তার দিকে যেন একজন অতিথির মতো তাকাচ্ছিল। তার দৃষ্টি ছিল ঠাণ্ডা, ধূসর। তার ঈষৎ পীতাভ মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ক্ষত স্থান থেকে কোন রক্তই বেরোয়নি—শুধু সেখানে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

সুন্দরী তথী তাড়াতাড়ি তার পোষাক, টুপি, কোট হাতে নিয়ে মিঃ স্মিথের হাত টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে হঠাৎ তথী বসে পড়ল আর তার পিছনে থুথু সিগারেটের ছাই ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। নীচের সিড়িতে সেই বলখলে বৃদ্ধ প্রেতিনী এক মুখ দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মৃদু মৃদু হাসিতে শিং দুটো নড়ছে। তার হাসিতে যেন ভাষা ছিল—'কেমন হ'ল কেমন হ'ল!'

রাস্তায় নেমে তারা একটু শান্ত হলেন। উভয়ে পোষাক পরে নিলেন। তারপর মিঃ স্মিথ তার এই প্রণয়িনীর কোমর বেষ্টন করে চুমু দিয়ে চোখের জল মোছালেন।

প্রেত-নেতা সেখান দিয়েই যাচ্ছিলো, সেখানে তাদের দেখে অবাক হয়ে বলল। 'আরে আপনারা যে খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন? যাই হোক, মেজাজ পেয়েছেন তো?'

'ওঃ সে কি ভয়ানক ব্যাপার!' স্মিথ-প্রণয়িনী জানাল।

'উহুঁ, ওটি বলবেন না। আর তা ভাববেন না। আপনি হয়তো পুরনো দিনের কথা বলছেন। তখন সত্যিই অন্যরকম ছিল কিন্তু এখন নরক সম্পর্কে কোন অভিযোগই নেই। আমরা

সবাইমিলে এখানে একটা চমৎকার প্রমোদ-স্থান তৈরী করেছি। এতো আমাদের সবার পছন্দেরই কারণ।

'তা সত্যি'—স্মিথ জানালেন।

প্রেত-নেতা জানালো, 'আমরা এ জায়গাকে সম্পূর্ণ আধুনিক করে নতুনভাবে সাজিয়েছি।'

'তা ঠিকই, সময়ের তালে তালে আমাদের জন্যে এটা বেশ মনোরম জায়গা হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, যে সব আত্মা আজকাল বড় কষ্ট পায় তাদের জন্যেই এ জায়গা।

'ঈশ্বরকে তার জন্যে ধন্যবাদ।' সুন্দরী জানাল।

প্রেত-নেতা তাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করল। তারপর লিফটের কাছে এসে বলল, 'শুভ-রাত্রি।' এরপর লিফটের দরজা বন্ধ করে দিল। আর লিফ্‌ট উপরের দিকে উঠতে শুরু করল।

'ওঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' তারা একে অন্যকে জড়িয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

'আমি এই আনন্দ তোমাকে ছাড়া আর কখনোই পাবনা।' মহিলাটি জানাল স্মিথকে। আর মিঃ স্মিথ তাকে কাছে টেনে একটি দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলেন।

'কী অদ্ভুত! আজ সে একাজ করেছে? অথচ আমি দেখেছি তার একটা অদ্ভুত ঝোঁক আছে। সে কখনোই কোন জিনিসকে সহজভাবে নিতে পারে না। যেন তা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

'ওঃ, অসম্ভব!' স্মিথ বললেন।

'সে আমাকে বলতে পারত—তবে আমি আজকের বদলে অন্য দিন বেরুতাম।'

'নিশ্চয়ই আমরা তা পারতাম।'

'কিন্তু এখন ওসব চিন্তা থাক।' স্মিথের গলা জড়িয়ে যুবতী বলল, 'এখন ওটা বাদ দেওয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ, এখন ওটা বাদ দেওয়াই ভাল।' স্মিথ আরো নিবিড় আলিঙ্গনে সুন্দরীর কণ্ঠ লগ্ন হলেন। আর ওদিকে লিফট ওপরে উঠতে লাগল।

* * * *

ক্লাজে লা ফন্টেইন নামে এক ভদ্রলোক তাঁর এক মৃত বন্ধুর শবানুগমন করেছিলেন এবং তাকে কবরস্থ হতে দেখেছিলেন।

কিছুদিন বাদে তিনি অন্যমনস্কভাবে সেই বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন। লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন লা ফন্টেইন। কিছুক্ষণ পরে খবর এল তার বন্ধু মারা গেছেন। এ সংবাদে তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন, একটু ভেবেই বললেন, তাই বলি আমি ডাকলেই যে ছুটে আসে, এখনো সে আসছে না কেন!

মানুষের মন বড় বিচিত্র। সময়ে সময়ে তার আশ্চর্য বিস্মরণ ঘটে।

মাসের সেরা বই

লেখক : ল্যারী কলিনস ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ের

সমালোচনা : গৌরীশংকর দে

কর্ন চোলতিৎস তাকিয়ে দেখলেন ঘরে আলাদা ব'লে কিছু নেই। ভেতরের অন্ধকার দূর হয়েছে বিদ্যুতের আলোতে। রহস্যময় কক্ষের শেষ প্রান্তে একটা ডেস্কের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হিটলার।

এর আগে মাত্র একবার চোলতিৎস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন। গত গ্রীষ্মে। তখন দু'টো জিনিস তাঁর খুব খারাপ লেগেছিলো। ফুরেরের ঠিক বিপরীত দিকেই তিনি বেশ কিছুক্ষণ ব'সেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলেন হিটলার কখনো হাসেন না; আর ডোমেসডায় টেবিলেও তাঁর আচরণ অনেক সময় সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তবে হিটলারের একটা গুণ আকৃষ্ট করেছিলো। অন্যের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস আর উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার ক্ষমতা হিটলারের অসাধারণ।

চোলতিৎস জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতার দিকে তাকালেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর চোখে আর সেই জ্যোতি নেই। ভাবলেন গতবছর যে হিটলারকে দেখেছিলেন ইনিই কি সেই! এ কি! এক বছরের মধ্যেই হিটলার বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন! মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। বাঁ হাতখানা কাঁপছে! সেই কাঁপুনি লুকোবার জন্য ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরেছেন!

সব চেয়ে মন খারাপ হলো হিটলারের কণ্ঠস্বর শুনে। যে তীক্ষ্ণ গমগমে গলার হুমকি রেডিয়োতে শুনে সকলে অভ্যস্ত, গতবছরও যে স্বর তাঁকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে সেই কণ্ঠস্বরে এখন আর সে শক্তি নেই। ফুরের এখন ফিসফাস ক'রে কথা বলছিলেন।

শুধু যে বর্তমান প্রসঙ্গে বললেন তা নয়, ফুরের অতীতের নানা ঘটনা ব'লে যেতে লাগলেন। এলোমেলো ভাবে ব'লে গেলেন কেমন ক'রে নাৎসী পার্টি স্থাপন ক'রেছিলেন, জার্মান জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন সেই পার্টিকে। জার্মান জাতির সামরিক উদ্দীপনা তো পথ-নির্দেশ পেয়েছে ওই পার্টিরই কাছ থেকে।

বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু গ্রামে উঠতে লাগলো। এবার যেন প্রকৃত হিটলারের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি চোলতিৎস শুনতে পেলেন। ফুরের বললেন নর্মাণ্ডীতে জার্মানীর যে বিপর্যয় হয়েছে তা নেহাৎই সাময়িক। নতুন অস্ত্রের সাহায্যে জার্মানরা ক'য়েকদিনের মধ্যেই আবার যুদ্ধের চেহারা পালটে দেবে।

হঠাৎ হিটলার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চ'লে গেলেন। একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে, চোলতিৎসের মুখের কাছে মুখ এনে বললেন: "জেনারেল, ২০শে জুলাইয়ের পর থেকে প্রায় ডজন খানেক সেনাপতিকে আমি ফাঁসির দড়িতে লটকিয়েছি, কারণ এরা আমার কাজে বাধা দিয়েছিলো।"

তাঁর ঠোঁটের কোণে ফেনার আকারে থুথু জমেছে। কপালে রেখা দিয়েছে ঘাম। চোলতিৎস দেখলেন ফুয়েরের শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। তবু হিটলার চিৎকার ক'রে বললেন, আর্মান জাতির চূড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি থামবেন না, কিছুতেই থামবেন না।

আর উত্তেজনা বুঝি তাঁর সইছে না। হঠাৎ চেয়ারে ব'সে পড়লেন। একটু সময় চুপ ক'রে রইলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন: "আপনাকে প্যারিসে যেতে হবে। ওই শহরের নাগরিকেরা কোনো রকম বিক্ষোভ দেখালে নির্মম হাতে তাদের দমন করবেন। প্যারিসকে আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে চাই। তার জন্য আপনি সব রকম সাহায্য আমার কাছ থেকে পাবেন।"

চোলতিৎস বুঝতে পারলেন সাক্ষাৎকার শেষ হ'য়ে গেছে। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময়ও হিটলারের চোখ তাঁকে অনুসরণ করছিলো।

প্রায় আধঘণ্টা মহাদেশ অতিক্রম ক'রে তিনি এসেছিলেন আর্মানদের অপরাজেয়তার আস্থা ফিরে পাবার আশায়। কিন্তু এ কী হলো। চোলতিৎসের মনটা বড়ো ঘমে গেলো। তিনি যাঁর দেখা পেলেন তিনি তো নেতা নন, একজন অসুস্থ মানুষ। তাই, উদ্দীপনার পরিবর্তে হতাশা নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন চোলতিৎস।

১৯৪৪সালের ২১শে আগষ্ট। রাজধানী প্যারিসের এখন—তখন অবস্থা। হিটলার ঢালাও আদেশ দিয়েছেন প্যারিস ধ্বংস ক'রে ফেলতে। কারণ মিত্রপক্ষীয় বাহিনী নীত্রই প্যারিসের কাছে এসে পড়েছে। প্যারিসকে বাঁচাবার ক্ষমতা বুঝি কারুর নেই। ধ্বংসস্তূপ বুকে পড়ে থাকবে ওয়ারস-এর মতো।

ঘরের ভেতরে অসহ্য গরম। জেনারেল চোলতিৎস একা অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। প্যারিসের আকাশ অন্ধকার। ভাবছিলেন ইতিমধ্যেই এই শহরের যা ক্ষতি হ'য়ে গেছে তাতে একে নতুন ক'রে তৈরি করতে কী বিপুল পরিমাণ অর্থেরই না প্রয়োজন হবে। দু'হপ্তা আগে, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর থেকেই, চোলতিৎস ভাবছিলেন যাঁর আদেশ অন্ধভাবে মানবেন ব'লে শপথ নিয়েছিলেন সেই হিটলার উন্মাদ নন তো? য়ুরোপের অন্যতম বিস্ময়, প্রমোদ নগরী প্যারিসকে মানচিত্র থেকে একেবারে পুঁছে ফেলে দে'য়া কি ঠিক হবে? প্যারিস—বিনাশক—ইতিহাসে এই দুর্নাম তাঁর চিরকাল থেকে যাবে। তার চাইতে কৌশলে অমান্য করা যাক হিটলারের আদেশ। তিনি কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। যদি এর মধ্যে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী এসে পড়ে তো প্যারিস রক্ষা পাবে।

চোলতিৎসের ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। মিত্রপক্ষের সেনা এসে প্রবেশ করলো প্যারিস শহরে। প্যারিসের জনসাধারণ মুক্তির আনন্দে উৎসব-মুখর হ'য়ে উঠলো। প্রিয়জনের সঙ্গে আবার প্রিয়জনের মিলন হলো। ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দের অশ্রু দেখা দিলো বৃদ্ধা মায়ের চোখে। মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিদের গাল লাল হ'য়ে উঠলো অসংখ্য ফরাসী তরুণীর চুম্বনে। যুদ্ধের এই ক'বছরে ওরা যেন আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে। যে-সব মেয়েরা আর্মান সৈন্যদের সঙ্গে শুয়েছিল তাদের একত্র করা হলো।

কটি দেশ পর্যন্ত উলঙ্গ ক'রে এবং বুকে ঝুলিয়ে-চিহ্ন এঁকে তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শহরের রাস্তা দিয়ে। চারবছর শুরু থাকার পর আনন্দের ধ্বনি ক'রে বেজে উঠলো প্যারিসের বড়ো বড়ো গির্জাগুলির ঘণ্টা। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মুখে একই ধ্বনি: "স্বাধীন প্যারিস!"

জেনারেল চোলতিৎস হোটেলের যে ঘরটিতে ছিলেন তার দরজা খুলে গেলো। একজন ফরাসী অফিসার সেলুট ক'রে জার্মান জেনারেলের সামনে অ্যাটেনশন হ'য়ে দাঁড়িয়ে জানালেন:

"আমি জেনারেল ডা গলের বাহিনীর লেফটেনান্ট—কার্টার।"

জার্মান সেনানায়ক শান্ত গলায় জবাব দিলেন: "আমি জেনারেল কন চোলতিৎস।"

কার্টার বললেন: "আপনি আমার বন্দী।"

"বেশ," উত্তর দিলেন চোলতিৎস।

পথ দিয়ে জার্মান সেনাপতিকে যখন নিয়ে যাওয়া হলো, প্যারিসের নাগরিকদের উত্তেজনার সীমা রইলো না। পুরুষেরা তাঁকে গালি-গালাজ আর মেয়েরা তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগলো। তারা যদি জানতো যে ওই জার্মান সেনাপতির হুকুমই প্যারিস শহর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে!!

জার্মানীতে ব'সে হিটলার জানতে চাইলেন: "প্যারিস কি জ্বলছে?"

ঘরে যারা ছিলো চুপ ক'রে রইলো।

আবার জিজ্ঞেস করলেন: "আমি জানতে চাই প্যারিস কি জ্বলছে?"

যখন উত্তর এলো "না," যখন শুনলেন মিত্রপক্ষের বাহিনী প্যারিসে ঢুকে পড়েছে তখন তাঁর ক্রোধের সীমা পরিসীমা রইলো না।

এমন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা গোটা পৃথিবীর ভিৎ কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, ঘোষণা করেছিলো সভ্যতার বিনাশ-বার্তা, তার কথাই বা মানুষ কতটুকু মনে রেখেছে! অতীতকে একেবারে যাতে ভুলে যেতে না হয় তার জন্য লেখা হয় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অতীতকে তার খাঁটি চেহারায় কতটুকুই বা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় শুধু অতীতের কংকাল। ইতিহাস রচনা করতে ব'সে ঐতিহাসিক প্রয়োজন বোধে ঘটনা নির্বাচন এবং বর্জন করেন। কালের বিশাল রথের দিকেই তাঁর দৃষ্টি, সে রথের যাঁড়ি যারা টানছে, কিংবা তার চাকার তলায় প'ড়ে যারা প্রাণ হারাচ্ছে, তাদের দিকে তাকাবার অবসর তাঁর নেই।

ব্যক্তি এবং সমষ্টি, বড়ো বড়ো ঘটনা এবং সাধারণ নর-নারীর জীবন যারা এই দু'য়ের মধ্যে মিলন সম্ভব একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে। শক্তিধর ঔপন্যাসিকের লেখনীতে সজীব হ'য়ে ওঠে অতীত। তার পরিচয় টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পিস', ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' এবং ভিক্টর হুগোর 'নাইন্টি থ্রি'। ল্যারি কলিনস এবং ডোমিনিক ল্যাপিয়ের রচিত "প্যারিস কি জ্বলছে" সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একখানি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। কয়েক হাজার দলিল-পত্র এবং অগনন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপরে ভিত্তি ক'রে দুজন শ্রেষ্ঠ লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অধ্যায়কে জীবন্ত করে রেখেছেন—এতটুকুও ম্লান হতে দেননি। অক্ষম লেখকের হাতে পড়লে ইতিহাসের যে অধ্যায় শুধু নীরস, বিচ্ছিন্ন মৃত রাজনৈতিক ঘটনার তালিকায় পর্যবসিত হতো, লেখক দুজনের পরিশ্রম, নিষ্ঠা, বলিষ্ঠ কল্পনা, গল্প বলার অসামান্য ক্ষমতা, সর্বোপরি যথোপযুক্ত ভাষার সংমিশ্রণে সেই অধ্যায় একটি শ্বাসরোধী কাহিনীর রূপ পেয়েছে। পড়তে-পড়তে পাঠক ভুলে যান যে তিনি বই পড়ছেন। চলচ্চিত্রের মতো তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সময়কার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের ধারাবাহিক চিত্র। পাঠক একাত্ম হয়ে ওঠেন গল্পের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে। মনে হয় তিনি নিজেই কাটাচ্ছেন যুদ্ধের দাবানলে ঘেরা প্যারিসে ক'য়েকটি অনিশ্চিত—মুহূর্ত। বড়ো বড়ো ঘটনার পাশে অতি তুচ্ছ ব্যক্তিগত ঘটনা স্থান পেয়েছে এবং প্রতিটি ঘটনাই সঙ্গীত ঝংকারের মতো দল দল করছে। "প্যারিস কি জ্বলছে?" একাধারে একখানি সার্থক ইতিহাস এবং উপন্যাস। তাই, ইতিহাসের ছাত্র এবং উপন্যাসের পাঠক, দুয়ের পক্ষেই সমান তৃপ্তিকর।

• • • •

হিটলারের জার্মানীতে ফিরে বললেন জার্মানীর অন্যতম রাষ্ট্রপ্রধান—ডাঃ বার্নিং। দুই প্রধানের মত কিছুতেই এক হ'ল না।

জার্মানীর কাগজে কাগজে ঘোষণা করা হল: ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফেরার পথে যখন তিনি জাহাজ থেকে নামবেন তখন তাঁকে গুলি করে মারা হবে।

যথাসময়ে জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। ডাঃ বার্নিং সমস্ত দেহরক্ষীদের সরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। না, আজ দেহরক্ষীদের আর কোন প্রয়োজন নেই।

রাস্তার দুধারে জনতার ভীত সন্ত্রস্ত মুখ। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। মাথা উঁচু করে জাহাজ থেকে নেমে সোজা হেঁটে চললেন তিনি।

তাঁকে লক্ষ্য করে দুবার গুলি করার চেষ্টা হলো—কিন্তু তা ব্যর্থ হলো।

শান্ত অথচ অনমনীয় চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হবার সাহস ডাঃ বার্নিংকে যথার্থ বীরের পর্যায়ে উন্নীত করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সৃষ্টি দোলায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সত্যিকথা বলতে গেলে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আমরা এক হিসেবে সেই চেনা জানা অভিজ্ঞতার একটু আধটু হেরফেরের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। দশজনে বিনা প্রতিবাদে যে অভিজ্ঞতা সত্যি বলে মেনে নেয় তার ধরা বাঁধা একটা ছকও আছে। সে ছকের সঙ্গে না মিললেই মুস্কিল। সাহিত্যকেও সেই ছকটা চৌহদ্দি পার হতে গেলে অস্বাভাবিকতার অপবাদের ঝুঁকি নিতে হয়।

সাবধানী সাহিত্য তাই বৈচিত্র্যের খাতিরে মাঝে মাঝে অদ্ভুত অজানা পরিবেশ আমদানি করলেও সাধারণভাবে জানা ও মানা অভিজ্ঞতার ধারাই অনুসরণ করে।

কিন্তু জীবন ত সব ছকের চেয়ে বড়। কখনো কখনো এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিদ্যুৎ চমক সে দেয় যা আমাদের ধরাবাঁধা ধারণাকে যেন উপহাস করে যায়।

বন্ধু নিখিল ঘরের কথা লিখতে বসে সত্যিই তাই আমি বেশ বিপদেই পড়েছিলাম। তার কাহিনী নিয়ে সাহিত্য করতে চাইনি, কিন্তু সে কাহিনীতে সত্যতার ছাপ রাখাই ছিল সমস্যা।

স্মৃতিমন্থনের ধরণেই তাই এ কাহিনী সুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিজের ধারাই খুঁজে নিয়েছে।

যতদূর পর্যন্ত এ কাহিনী বলেছি তাতে নিখিলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের রহস্যটা সামান্যমাত্র মনোযোগী পাঠকের কাছেও বোধহয় খুব অস্পষ্ট নেই। সে রহস্যটা মোটামুটি ভাবে সেই মামুলী ছকেই ফেলা। চাচাজি, চম্পা, নিখিল আর তার মৃতা স্ত্রী এক হিসেবে অতি সাধারণ সরলতা, কুটিলতা, মহত্ব, নীচতা, লোভ, হিংসা প্রেম নিয়ে সাধারণ জীবন নাট্যের পাত্র-পাত্রী মাত্র। মূল প্রেরণা এখানেও সেই হীন বৈষয়িক লোলুপতা, শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির পদ্ধতি একটু বিচিত্র। নিখিল আর পাঁচজনের মত সহজ স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ হলে পদ্ধতিটা অমন অদ্ভুত হবার সুযোগ বোধহয় থাকত না।

চম্পার সঙ্গে একই ট্রেনের কামরায় প্রায় বারো ঘণ্টা কাটিয়ে এই চক্রান্তের সমস্ত রহস্যই জানতে পেরেছি। তার নিজের ভূমিকা এ চক্রান্তের মধ্যে কি তাও চম্পা গোপন করেনি।

চক্রান্তের লক্ষ্যটা মামুলী হলেও তা সাধারণ কৌশলে ও প্রয়োগের নৈপুণ্যে বাহাদুরী আছে স্বীকার করতেই হয়।

এ চক্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ বিস্ময়কর বটে কিন্তু নিখিল ঘরের এ কাহিনীতে তা নিষ্প্রয়োজন আনুষঙ্গিক ট্রেনে যেতে যেতে চম্পার মুখে যা শুনেছি তার মধ্যে আমায় বিমূঢ় বিহ্বল করে দিয়েছে।

একটি মেয়ের পরিচয় ও প্রায় অবিশ্বাস্য আত্ম-কাহিনীর একটি অধ্যায়। বলা বাহুল্য সে মেয়ে আর কেউ নয়, চম্পা।

আমাদের জানা ও মানা অভিজাতার ছকের সঙ্গে চম্পার সে বৃত্তান্ত কিছুতেই মেলাবার নয়। সবচেয়ে সে কাহিনী নিবেদন করবার চেষ্টার আগে নিখিলকে একটু করে যে রহস্যটা গাঢ় হয়ে আছে সেটা স্বচ্ছ করে দেওয়া প্রয়োজন।

ট্রেনের কামরায় বসেই চম্পা সবিস্তারে সব কথা আমার জানাবার সুযোগ পেয়েছিল।

মিটার গেজের ছোট লাইন, তাতে সবংসচ্ছ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। অন্য সময় হলে বিরক্তির সীমা থাকত না। কিন্তু সেদিন ট্রেনের এ মন্থর গতি লক্ষ্য করবারই অবকাশ হয়নি।

ট্রেনে উঠেছিলাম সকাল সাড়ে দশটায়। তার আগে মালপত্র যথাসাধ্য গুছিয়ে নিয়ে বকুনিস সহেত দুখনরামের মাইনে চুকিয়ে বাড়ির মালিকদের কাছে বাড়ির চাবি দিয়ে আসতে হয়েছে। ছমাসের জন্য ভাড়া নেওয়া বাড়ি। তার একমাসও কাটেনি। হঠাৎ এরকমভাবে ছেড়ে যাওয়া নিয়ে অকারণে নানা অজুহাত তৈরী করতে হবে। মালিকদের অফিসে একেবারে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। যেন কিছুদিন বাদেই আবার ফেরা হবে এই রকম আশ্বাস দিয়ে চাবিগুলো তাদের কাছে গচ্ছিত রেখে দিয়ে আসা হয়েছে। ছ'মাসের ভাড়া অগ্রিম পেয়ে যাওয়ায় দরুণ সেখানে কেউ এ যাওয়া নিয়ে উচ্চবাচ্য অবশ্য করেনি।

সকালের এই সব অপরিহার্য্য অথচ বিরক্তিকর কাজগুলো বাধা হয়ে সারতে হওয়ায় ট্রেনে ওঠবার সময় মনটা বেশ একটু খিচড়েই ছিল। ছোট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ফার্ষ্ট ক্লাসে কামরা মাত্র দুটি। তার একটি আবার মেয়েদের। সে কামরাটি যেমন একেবারে খালি দ্বিতীয় কামরাটি তেমনি যাত্রীতে প্রায় ঠাসা দেখে মনটা আরো তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

ট্রেনের যাত্রাটা প্রায় বারো ঘণ্টার আগেই জেনেছি। এই দীর্ঘ অবসরে চম্পার কাছে তাদের ইতিহাস যতখানি সম্ভব শোনবার আশাই করেছিলাম। কামরার ভিড় দেখে সে আশা জলাঞ্জলি দিতে হ'ল।

চম্পাকে ফাঁকা মেয়েদের কামরাটাতেই তুলে দিলাম। মালপত্র সবে অবশ্য সামান্যই। কলকাতার বার্সিহোম থেকে চলে আসার সময় চম্পা ও নিখিল প্রায় শুধু হাতেই এসেছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়েছে এখানে এসে। আমি নিজেও একদিনের জন্যে বিশেষ কিছু লটবহর সঙ্গে আনিনি। মালপত্র তাই আমার কামরাতেই তুললাম।

চার যাত্রীর ছোট কামরা। আমাকে নিয়ে যাত্রী তাতে সাত জন। ফার্ষ্ট ক্লাসে এরকম ভীড় সত্যি আশা করিনি। কোন রকমে একটা বসবার জায়গা শুধু পেলাম। বারো ঘণ্টার যাত্রা এই ভাবেই কাটাতে হবে ভেবে মনটা শুধু তিক্ত নয় হতাশও হয়েগেছে তখন। কেনই বা অকারণে এ নিষ্ফল যাত্রায় যাচ্ছি নিজেকে সেই প্রশ্নই তখন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। নিখিলকে কোন সাহায্যই এ পর্যন্ত করতে পারিনি। এর পরেও যে পারব তার কোন সম্ভাবনাই সত্যি কথা বলতে গেলে নেই। কোথায় যাচ্ছি তাই ঠিকমত জানি না। অনিশ্চিৎ একটা লক্ষ্য নিয়ে শুধু আকস্মিক খেয়ালে চম্পার সঙ্গী হয়েছি। চম্পা নিজেই এখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গী হয়ে শুধু নিষ্ফলতার গ্লানি ভোগ করাই হয়ত আমার ভাগ্যে আছে।

গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। বিরস মনে বাইরে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠে দেখি চম্পা তার কামরা থেকে নেমে এই কামরার দিকেই আসছে।

ধরজা দিয়ে সে ভেতরে ওঠার পরই গাড়িটা ছেড়ে দিল। আমি তখন নিজের সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—হঠাৎ চলে এলে যে!

চম্পা ম্লান একটু হেসে বললে—একা একা ভয় করছিল।

একলা বলে ভয় পাবার মেয়ে চম্পা নয়। তবু তখন তার ওই অজুহাতই মেনে নিয়ে আমার খাসলাটায় তাকে বসতে দিলাম।

কামরার যাত্রীরা সবাই অবাঙালী। চম্পার কথা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক মহিলা দেখে নিজেরাই সরে বসে আমার জন্যেও একটু জায়গা চম্পার পাশে করে দিলে।

সেখানে বসে নিচু গলায় বললাম—তাঁরা কামরা ছেড়ে কেন এখানে দুঃখভোগ করতে এলে। পরের ষ্টেশনেই নেমে ও কামরায় ফিরে যেও।

না, আপনিই পরের ষ্টেশনে নেমে যাবেন। সেই কথা বলতেই এলাম। পরের ষ্টেশনটা অশেন। সেখান থেকে কলকাতার গাড়ি পেতে অসুবিধে হবে না আপনার।

চম্পার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে তার হঠাৎ এই মত বদলের কারণটা অনুমান করবার চেষ্টা করছিলাম। তার কথা শেষ হলে একটু বিদ্রূপের সুরেই বললাম, কোথা থেকে কলকাতা যাবার সুবিধে হয় তা কি আমার জানা নেই।

বিদ্রূপ করবেন না। চম্পার স্বর কাতর হল।—কাল রাত থেকেই এই কথা ভাবছি। একলা ও কামরায় বসে ভাবতে ভাবতে এখন মনে হ'ল আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া আমিও মাঝপথে নেমে যাচ্ছি।

মাঝপথে নেমে যাচ্ছ?—আমি সত্যিই বিমূঢ়,—কোথায়?

নাম বললে আপনি চিনবেন না। চম্পা শান্ত স্বরে বললে,—হারাঘাট বলে ছোট একটা ষ্টেশন।

তার মানে নিখিল সেখানে নেই মনে করছ, সেখানে তুমি যাবে না?

গলাটা আপনা থেকেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বোধ হয়। পাশের যাত্রীরা একটু কৌতূহলভরে চমকে তাকাতে নিজেকে সামলে যতদূর সম্ভব সহজ কণ্ঠে আবার বললাম,—নিখিলের মাথায় কি বিপদের খাঁড়া যে ঝুলছে, তা আমার চেয়ে তুমি ঢের ভালো জানো। তা জেনেও তুমি এখন সরে দাঁড়াচ্ছ।

হ্যাঁ সরে দাঁড়াচ্ছি। কিছুই করবার সাধ্য আর নেই তাই সরে দাঁড়াচ্ছি।

চম্পার গলাটা শেষকালে রুদ্ধ হয়ে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে বোধহয় তার চোখের জলই লুকোতে।

গাড়ি তখন পরের অশেন ষ্টেশনেই ঢুকেছে। যা কিছু স্থির করবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই করে না ফেললে নয়। চম্পার সঙ্গে ভালো করে একটু কথা বলবার অবসর পেলে শেষ বোঝাপড়াটা করে নিতে পারতাম। কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে তারও আশা নেই। নিরুপায় অক্ষমতায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছি তখন একটা সহজ ভাগ্যই টি টি আই-এর বেশে এসে মিটিয়ে দিলে।

অশেন ষ্টেশনে গাড়ি থামতে আপনা থেকেই দুজন যাত্রী নেমে গেল। বাকি দুজন যেরকম হাত পা ছড়িয়ে মৌরসী পাট্টা করে বসেছে তাতে মনে হ'ল সারা পথটাই আমাদের সমাধান করবে।

কিন্তু কয়েক মিনিট ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবার পরই কামরার দরজায় একজন টি টি আই দেখা দিতেই হৃৎপিণ্ড বাকি হয়ে গেল যেন। হঠাৎ পোর্টমা তোরঙ্গ গুটিয়ে দুজনেই দেখি দরজা দিয়ে নামতে ব্যস্ত। টিকিট চেকার এ লাইনের এ ধরণের ব্যাপারে বোধহয় অভ্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে নেমে প্ল্যাটফর্মেই তাদের ধরলেন দেখলাম। এরপর সারা রাস্তা কামরাটা ফাঁকাই পেয়েছি। তা না পেলে এ কাহিনী রহস্যের অন্ধকারে অসমাপ্তই থেকে যেত।

অশোন থেকে গাড়ি ছাড়বার পর কিছুক্ষণ চম্পাকে নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেই দিয়েছি। এই অশোন স্টেশনেই চম্পা আমায় নেমে যেতে বলেছিল। সে কথা আর যে সে তোলেনি তাতেই তার মনের ভেতরকার দ্বন্দ্বটা অনুমান করে অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বলেছি, এ স্টেশনে আমি নামতে পারলাম না চম্পা। তুমি যদি সত্যিই রাজপথে নেমে যাও তাহলে আমাকেও বাধ্য হয়েই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তাই যদি যেতে হয় তাহলে যেটুকু অবসর পেয়েছি তাতে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব শুধু তোমার কাছে পেতে চাই।

বলুন।—প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে চম্পা আমার দিকে ফিরেছে।

নিজেই এবার একটু দ্বিধায় পড়েছি। প্রশ্ন ত একটা নয় অনেক। তার কোনটা আগে করব স্থির করতে একটু দেরী হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত বাদে জিজ্ঞাসা করেছি—এই চাচাজির ভয়েই কি নিখিলকে নিয়ে তুমি কলকাতায় চলে গেছলে ও তারপর পালিয়ে এসেছিলে এই অজানা শহরে?

হ্যাঁ। স্বীকার করেছে চম্পা।

আমার অনুমান তাহলে ভুল নয়।—চম্পার চোখের দিকে চেয়ে বলেছি।

কি আপনার অনুমান? চম্পা একটু ঔৎসুক্য দেখিয়েছে এবার।

নিখিল কি ব্যবসা করে জানি না, কিন্তু তাতে সে যথেষ্ট ধনী হয়েছে আমায় জানিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে তোমার চাচাজির চক্রান্ত সেই সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই নিখিল কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। তার সেই মানসিক অসুস্থতারই সুযোগ নিয়ে চাচাজি তার বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করতে চান।

চক্রান্তের ছকটা ঠিকই ধরেছেন। চম্পা বিষণ্ণ গলায় বলেছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা আরো ভয়ঙ্কর আর তা সিদ্ধির ফিকির একেবারে শয়তানের মাথা থেকে বার করা।

ফিকিরটা ত একজনকে নিখিলের মৃতা স্ত্রী সাজিয়ে তার সঙ্গে দেখা করানো। নিখিল যাতে বাস্তব অবাস্তবের স্বাভাবিক বোধ হারিয়ে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়।

হ্যাঁ তা হতেও আর বেশী দেরী নেই।—চম্পা হতাশভাবে বলেছে, কিন্তু আপনার বন্ধুকে শুধু উন্মাদ করেই এ শয়তানী চক্রান্ত শেষ হবে না। তারপরও কিছু আছে।

কি আছে তারপর! উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করেছি,—নিখিলকে হত্যা?

হ্যাঁ তাই। কিন্তু কেউ তার কোন প্রমাণ পাবে না। যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলে গেছে চম্পা, —একদিন গভীর এক জঙ্গলে আপনার বন্ধুর মৃতদেহ হয়ত পাওয়া যাবে। তার আগেই তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন বলে রটনা হয়ে গেছে। আপনার বন্ধুর মাথার অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় ও অকলের লোক তা জানতে বাকি নেই। ওই জঙ্গলে আগেও তিনি হারিয়ে গেছেন আর একবার। সেবার শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসেছিলেন কারুর সাহায্যে। এবার সেরকম কোন সাহায্য যাতে তিনি না পান তার ব্যবস্থা অতি অবশ্যই থাকবে। গভীর অরণ্যে একটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষ পথ হারিয়ে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে তারপর?

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হয় নি। তারপর অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণতা নিয়ে বলেছি,—এ সব কি আজগুবি কথা বলছ চম্পা? আজকের যুগে এ ধরণের ব্যাপার সম্ভব?

কি সম্ভব তা আপনার ওই কলকাতা শহর দিয়ে বিচার করবেন না। চম্পা বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলেছে, আর সেখানেও কি হয় না হয় আপনি কতটুকু জানেন!

কিন্তু এ শয়তানীর কোন প্রতিকার নেই! কি এমন অবশ্য তোমাদের ওখানে আছে আমি না। কিন্তু নিখিল সেখানে যাবে কেন?

কেন যাবে এখনো বুঝতে পারেন নি। দুদিন বাদে হোক দুমাস বাদে হোক তাকে ভারোয়ার জঙ্গলে যেতেই হবে একদিন। আমাদের ও অঞ্চলের এ জঙ্গলের নাম হয়ত শোনেন নি। জঙ্গল কিন্তু ছোটখাট নয় তরাই পর্যন্ত এই জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। আপনার বন্ধু নিজের ইচ্ছায় সেখানে গেলে কে তাকে ঠেকাবে।

আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে এবার বলেছি,—তার মানে নিখিলের মৃতা স্ত্রীর আত্মাই যেন নিখিলকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবে বলছ! আসল শয়তানী কন্দি এই?

উত্তেজিত ভাবে এবার গতরাত্রে ছায়াময়ী নারীমূর্তি যা দেখেছি চম্পাকে তার বিবরণ দিয়ে বলেছি,—চাচাজির সঙ্গে টাঙ্গায় যে মেয়েটি ছিল, সুখনের কাছে রেশমী বলে তুমি যার নাম করেছিলে সেই তাহলে তোমার চাচাজির হাতের পুতুল হয়ে এই ছায়ামূর্তি সাজে!

চম্পা এ কথার উত্তর না দিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে।

আমি একটু লজ্জিতভাবে এবার বলেছি, তোমার কাছে এখন স্বীকার করছি চম্পা। প্রথমে প্রায় আমার হাতের মুঠো থেকে কয়ে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর তোমাকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। হাতে হাতে তোমায় ধরবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলাম মন্দিরে।

চম্পার চোখে তখনও সেই দুর্বোধ দৃষ্টি।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে চম্পা স্থির ঠাণ্ডা গলায় বলেছে,—আপনার সন্দেহ ঠিকই।

না, না, তা হ'তে পারে না।—আমি বিমূঢ় ব্যাকুলতায় প্রতিবাদ করেছি—আমি নিজের চোখে তোমায় মন্দিরের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছি। পূজারী মহারাজ যদি মিথ্যেও বলে থাকেন তবু চোঙবাজিতে ছাড়া ওইটুকু সময়ের মধ্যে মন্দিরে পৌঁছে পোষাক বদল করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

চম্পার মুখে এবার বিবর্ণ একটু হাসি। ধীরে ধীরে যেন কথাগুলো ভেতর থেকে নিংড়ে বার করে বলেছে—শুধু কালই রেশমী আমার জায়গা নিয়েছিল। তার আগে আমি ·····আমিই চাচাজির শয়তানীর সহায় হয়ে ওই ছলনা দিয়ে তিল তিল করে আপনার বন্ধুকে মনের চরম বিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছি। ভারোয়ার জঙ্গলে আমিই একদিন তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

চম্পা দু হাতে এবার মুখ ঢেকেছে। আমি বিভ্রান্ত বিহ্বল ভাবে বলেছি, কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না চম্পা! তুমি চাচাজির এ চক্রান্তের মধ্যে ছিলে বলছ অথচ তুমিই ত নিখিলকে নিয়ে কলকাতার নার্সিং হোমে গিয়েছিলে। সেখান থেকে তুমি এখানে পালিয়ে এসেছ তাকে নিয়ে! অনুতপ্ত হয়েই তুমি নিখিলকে পেয়ে এ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছ বুঝলাম কিন্তু পরে এমন অনুতাপে যে হঠ হয়েছে প্রথমে নিজের পরম আত্মীয়ের এত বড় সর্বনাশ করতে তার একটু দ্বিধা হ'ল না। নিখিল ত তোমার বোনের স্বামী।

না, উনি আমার কেউ নন। চম্পা আমাকে বিস্মিত করে বলেছে, চাচাজির সঙ্গেও আমার সত্যকার কোন সম্পর্ক নেই। [ক্রমশঃ]

গোয়েন্দা যখন অভিনেতা

সুপর্ণ রায়

নভেম্বরের বিকেল। ছা ইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন অ্যাভেন্যু আর ৮৬নং রাস্তার সংযোগ-স্থলে একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা-চওড়া চেহারার একজন লোক। গায়ে ঘন নীল রঙের ওভারকোট। মাথায় ধূসর বর্ণের টুপি। মেয়ে-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ বহু লোক আসছে যাচ্ছে। লোকটার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। লোকটা কিন্তু টুপির তলা থেকে তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি পথচারীকে দেখে নিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেলের জন্য সে অপেক্ষা করছে। বারবার তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। কিন্তু কর্ণেলের দেখা নেই।

ক'য়েকমাস আগের কথা। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট। পশ্চিম বার্লিন। আমেরিকান হেড কোয়ার্টার। কর্ণেল জন হেন্টির (প্রকৃত নাম গোপন করা হয়েছে) ঘরে ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বেজে উঠলো। কর্ণেল তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিয়ে জানলেন তাঁকে ফোন করছেন একজন উচ্চপদস্থ সোবিয়েত কর্মচারী। দু হপ্তা আগে এঁর সঙ্গে একত্রে ব'সে তিনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন। সোবিয়েত কর্মচারীটি তাঁকে আবার খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। পূর্ব বার্লিনে। কর্ণেল একটু মুচকি হাসলেন। তিনি টোপ ঠিকই ফেলেছেন।

নির্ধারিত দিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন কর্ণেল। খাবারের চমৎকার আয়োজন। গুপ্তকর্তা আশ্চর্য আন্তরিক। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন ঘরে কফি নেই। ছুটলেন কফি সংগ্রহ করতে। ঘরে শুধু কর্ণেল আর বেসামরিক পোশাকে এক রুশ ভদ্রলোক। আমেরিকান ভাষায় অনর্গল বলতে পারেন। ভদ্রলোক জানালেন এর পরেও তিনি কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। আর তাতে কর্ণেল বিশেষ আগ্রহান্বিত হবেন। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। হেন্টি তা বুঝতে পেরে পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হ'য়ে গেলেন।

রুশ ভদ্রলোক জানালেন: "যদি ছা ইয়র্কে যেতে পারি, তবে ১৫ই অক্টোবর আমাদের দেখা হতে পারে। যেখানে ম্যাডিসন অ্যাভেন্যু মিশেছে ৮৬নং রাস্তাটার সঙ্গে, সেখানে। বিকেল চারটায়। কোনো কারণে যদি ওই দিন না যেতে পারেন তো ২৫ তারিখে আসবেন।"

তা ছাড়া আরো দুটি তারিখের কথা রুশ ভদ্রলোক ব'লে রাখলেন। অনুরোধ করলেন হেন্টি যেন বে-সামরিক পোশাক প'রে একাই আসেন।

"আমি নিজে যদি না পারি তো, আমার হ'য়ে অন্য কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করবে,"

রুশ ভদ্রলোক জানালেন। বললেন: "ক'য়েক মিনিট দাঁড়াবার পর হাতঘড়ির দিকে তাকাবেন। তখন এক ভদ্রলোক এসে আপনাকে বলবেন, 'এর আগে কি বার্লিনে আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে?' আপনি বলবেন, 'হ্যাঁ, ১৯নং বাড়িতে আমি থাকি।' এর পরে আপনি নির্ভয়ে সব কথা বলতে পারেন। আপনার সব খরচ আমরা দেবো। যে-সব খবরাখবর আমাদের দেবেন তার জন্য আলাদা পারিশ্রমিক পাবেন।"

১৪ই নভেম্বর, মানে তৃতীয় তারিখটিতে দীর্ঘদেহী রুশটি ঘন-নীল ওভারকোট প'রে বিকেল ৩'৫৬ মিনিটে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়েছিলো। ঘন-ঘন তাকাচ্ছিলো ঘড়ির দিকে।

চারটে বেজে পাঁচ। হঠাৎ কাছে এসে একটা ট্যাক্সি থামতেই তার সমস্ত অস্থিরতা এক নিমেষে যেন উবে গেলো।

ট্যাক্সির দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন কর্ণেল হেস্টি। তিনিই তো? চেহারা এবং বেশভূষায় তাই তো মনে হয়। কর্ণেল একবার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, আবার ফিরে এলেন। রাশিয়ানটি কথা বলবে ব'লে ভেবেও থেমে গেলো। আরেকটু লক্ষ্য ক'রে দেখা যাক।

কর্ণেল হেস্টি মাত্র কয়েক পা ঘুরে এসে ২।৩ মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়ালেন। তারপর আরো কয়েক পা এগিয়ে তাকালেন হাত-ঘড়ির দিকে। কর্ণেলের হাতে একটা প্যাকেট। হয়তো ওর ভেতরেই রয়েছে দরকারী দলিল-পত্র। রাশিয়ানটি মরিয়া হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো: কর্ণেল, বার্লিনে না আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিলো?"

"হ্যাঁ, আমি ১৯ নং বাড়িতে থাকতুম।" দীর্ঘদেহী রুশ হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো: "চলুন আমরা খানিক সময় ঘোটরে বেড়িয়ে আসি।"

কর্ণেল আপত্তি জানালেন: "না, আমেরিকার গুপ্তচরেরা আমাদের সন্দেহ করতে পারে, কাছেই একটা পার্ক রয়েছে। চলুন আমরা সেখানেই যাই। নিরিবিলি বেশ কথা বলা যাবে।"

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ সম্পর্কে রাশিয়ানটি কত প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসা করলে তার ইয়ত্তা নেই। কর্ণেল উত্তর দিয়ে গেলেন। লোকটা তো খুব খুশী। তবু আরো তথ্য জানতে চায়। কর্ণেল প্রতিশ্রুতি দিলেন এর পরের বারের সাক্ষাতে তিনি সেই সব তথ্য জানাবেন।

"মোটা পারিশ্রমিক আপনার প্রাপ্য।" বলে তার হাতে পঁচিশখানা রুশ ডলারের নোট গুঁজে দিলে দীর্ঘদেহী রুশ। ঠিক হলো ১৫ই জানুয়ারী তারিখে একই জায়গায়, একই সময়ে তারা মিলিত হবে।

একটা ব্রিফকেস হাতে ক'রে কর্ণেল নির্ধারিত দিনে একই জায়গায় হাজির হলেন। এবারও রাশিয়ানটি রাজী হলো না। তার বদলে একটা হোটেল বার-এ ঢুকে ওরা বসলো। কোণের দিকে। কাছাকাছি টেবিলগুলোতে কোনো লোক নেই।

কর্ণেলকে ইঁশিয়ার ক'রে দিয়ে লোকটা বললো, "খুব আস্তে বলুন, যে খবরগুলো জানতে চেয়েছিলুম তা কি লিখে এনেছেন?"

"এই যে" ব'লে কর্ণেল ব্রিফকেসটার হাত রাখলেন।

"ওটা আমাকে দিন।"

কর্ণেল কিন্তু তক্ষুণি না দিয়ে একটু টাল-বাহানা শুরু করলেন। হোটেল বার-এ ধীরে ধীরে

আগন্তুকদের সংখ্যা বাড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে লোকটা বলে উঠলো: "আ, চলুন আমরা এখান থেকে উঠে পড়ি। আর এখানে ভালো লাগছে না।"

"তার আগে এটা আপনি নিন," বলে তার দিকে ব্রিফকেসটা এগিয়ে দিলেন কর্ণেল।

সঙ্গে সঙ্গে, বার-এর আগন্তুকদের ভেতর থেকে দু'জন সাধারণ পোশাক পরা পুলিশ এগিয়ে এসে রাশিয়ানটিকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে গ্রেপ্তার করলো।

• • • •

ম্যাডিসন অ্যাভেন্যু আর ৮৬ নং রাস্তার সংযোগস্থলে যখন রুশ গুপ্তচরটি অপেক্ষা করছিলো, তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক'য়েকজন গুপ্তচর তার দিকে কড়া নজর রেখেছিলো, তার প্রতিটি ভঙ্গির অসংখ্য ফোটো তুলে নিয়েছিলো দূর থেকে শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে। রাশিয়ানটি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

রাশিয়ানটির সঙ্গে পার্কে এবং হোটেল বার-এ যিনি দেখা করেছিলেন তিনি কিন্তু কর্ণেল হেন্টি নন, বার্লিনে থাকতে কর্ণেল যখন সোভিয়েত কর্মচারীর কাছ থেকে নির্দেশ পান, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা-বিভাগকে। ফ্রাঁইয়র্কে রুশ গুপ্তচরের সঙ্গে দেখা করতে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তর পাঠালো ফ্রেড লেক নামে এক যুবককে। ওজন, উচ্চতা, চুলের রং, চোখ, গায়ের রং, সবই তার কর্ণেল হেন্টির মতো। নাক নাকটা তার মতো লম্বা। অবশ্য কর্ণেল হেন্টির তুলনায় তার বয়েস কম। তার মতো তীক্ষ্ণ গোঁফও তার নয়। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হলোনা। মেক-আপ-এর গুণে, হেন্টির বয়েস আর গোঁফ দুই-ই পেলো লেক। হেন্টির পোশাকের মতো পোশাকও পরানো হলো। অনেকবার তালিম নিয়ে লেক আয়ত্ত করলো হেন্টির চলন, বলনের ভঙ্গি। ব্রিফকেসটা রাশিয়ানটির হাতে তুলে দিলেই পুলিশ এগিয়ে আসবে এরকম আগে থেকেই বলা ছিলো। সেই সংকেত অনুযায়ীই রুশ গুপ্তচরটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাশিয়ানটিকে সে যে খবর দিয়েছিলো সব ভুয়া। ফ্রেড লেক-এর অভিনয় হয়েছিলো একেবারে নিখুঁত। রুশ গুপ্তচরটি একবারও সন্দেহ করতে পারেনি, সে যার সঙ্গে কথা বলছে সে কর্ণেল হেন্টি নয়, সম্পূর্ণ আলাদা এক ব্যক্তি।

• • • •

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, ইংলণ্ডের একটি কবরস্থলে এসেছেন এক পণ্ডিত প্রৌঢ় ব্যক্তি, জীবনে তিনি অল্পই কাব্য রচনা করেছেন।

চতুর্দিকে বিষণ্ণ অন্ধকার, প্রকৃতির সবকিছু শান্ত, স্তব্ধ, কোথাও এতটুকু বায়ুকম্পন নেই। গাছের ছায়ার দিকে তাকালেন পণ্ডিতপ্রবর, ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন মাটির দিকে, একটি গভীর বিষাদে তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, মাটির গভীরে যে সব মৃত মানুষ এক একটি ছোট কুঠরীতে চিরকালের মত ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের কথা স্মরণ করে তাঁর চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

এই বেদনা রূপ নিল একটি শোকসাথায়। আজ জগতের প্রতিটি সাহিত্যরসিক সেদিনের সেই গভীর বেদনার অংশ গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের কাব্যসাহিত্যে টমাস গ্রে'র 'এলিজি রিটন্ ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড' অমর হয়ে আছে।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

বিশ্বমেলায় আন্তর্জাতিক মাইফেলের রেওয়াজ দিনদিনই বেড়ে উঠছে। এক দেশ আর এক দেশকে টেক্কা দেবার জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। কৃষি করলে আন্তর্জাতিক কবি-সম্মেলন এই দেখে আমি করলুম তার চেয়ে আর এক কাঠি বাড়া—আন্তর্জাতিক কবি-সম্মেলন। পৃথিবীর সবদেশ থেকে মানুষের আদি-পুরুষকে সসম্মানে নিয়ে এসে সবাইকে দেখালুম। প্রতিপক্ষ ভাবছে এর চেয়ে সেরা আর কি করা যায়? আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিদ, সমাজবিদ, কলমবিদ, বোকাবিদ, লম্ফবিদ প্রভৃতি নানা বিদের সম্মেলন ইয়োরোপের দেশে দেশে। আর সেইসব সম্মেলনে যাবার জন্যে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের ভিড় দিয়ে ঘন পড়ে মাসের পর মাস। মেলামেশা? আলাপ পরিচয়, কুঁচকিকণ্ঠা ঠেসে পান এবং আহার, নারীসঙ্গ, মাইফেল—এরকম সুযোগ কে ছাড়ে? ওসব দেশের সময় ভাল, ব্যবসা ভাল, আগে পিছে পাওনাদার খাসাচ্ছেনা, মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছেনা, ঘরশত্রুর আর বারশত্রুর প্রাণ খাঁচা ছাড়া করবার উপক্রম করছে না—ওদের ওসব সাজে। আমরা ওদের নেমন্তন্ন পাই, ওরা আমাদের সুড়সুড়ি দেয়, আর আমরা অমনি আমাদের ধ্রৌপদ এবং তার ওপর বিস্কোটক নিয়ে হেঁ হেঁ করতে করতে দেশের টাকার শ্রাদ্ধ করে তাদের মজলিশে গিয়ে যোগ দিই। আমাদের ঘরের ভিতরকার ছুঁচোর কেত্তন তো তাদের জানতে বাকি নেই, আমাদের তো আদুড় হেঁসেল, সদর খিড়কী দুই খোলা, আমাদের দেশের কোনো খবরই শত্রুমিত্র কারুর কাছেই অজানা থাকেনা—তাই বিদেশে আমাদের কোঁচার পত্তন দেখে ওরা মুখে হাত আড়াল দিয়ে হাসে।

সুযোগ্যো পুরুষের দল ক্রমবর্ধমান হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে। তাই দেখে মেয়েরা বোধ-করি আপসাচ্ছিলেন। ভগবান তাঁদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। মওকা এসে গেছে। আগষ্টমাসে বাদিনএ পুরো ১ মাস ধরে মেয়েদের গ্রাণ্ডশো। আন্তর্জাতিক। অতএব আমাদের দেশের নারীরাও নেমন্তন্ন পেয়েছেন। আর বলব কি, সঙ্গে সঙ্গে আসুবাসু বেঁধেই রওনা। এই প্রতিনিধিদলে আছেন শ্রীমতী মরীচিবওয়ালা। (পরবর্তীটার বানান পরে লক্ষ্য করুন), শ্রীমতী কোমি চলোয়ার খাঁ, পাতিয়ালার মহারাণী এবং বহুতনয়া শ্রীমতী আভা মাইতি। তাছাড়া পরিকল্পনা সংহার সম্পাদিকা

শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ। বার্লিন-এ জমজমাট ব্যাপার। বস্তুতরা ডুজন নাকি যাওয়ার আগে রুকস্যাক, পলকা, টুইষ্ট প্রভৃতি রীতিমত অনুশীলন করেছেন কয়েকদিন ধরে। এবং তার সঙ্গে নানারকম পানাহার ও সঙ্গাসঙ্গের অভ্যাস।

• • • •

ভগবানের রাজ্যে কুকুর সামান্য জীব নয়। কোনো মঙ্গলকর্মে দেবতার স্থানে বা কোনো শুভ কাজে কুকুরের উপস্থিতি কেউ ভাল চোখে দেখেনা। কিন্তু এই কুকুর শুধু যে প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার এক জীবন্ত প্রতীক, তাই নয়, এই কুকুর মানুষকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। সকলের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই, রাজা যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের শেষে স্বর্গে ওঠবার সিঁড়ির শেষধাপ পর্যন্ত এই কুকুরকে ত্যাগ করেননি এবং তারপর দেখা গেল স্বয়ং ভগবান এই কুকুরের রূপ ধারণ করে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন।

সম্প্রতি একটি দেবতক্ত কুকুরের সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে। কে জানে কাকে পরীক্ষা করতে বা ছলনা করতে দেবমন্দিরে এই কুকুরের আবির্ভাব। অথবা সবটাই স্রেফ ধোঁয়া। যাইহোক সংবাদটি হুবহু নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম।

নবদ্বীপের তৎকেন্দ্র পোড়ামাতলা। প্রতিদিন হাজার হাজার নরনারী মা পোড়ামার নির্মাল্য লাভ করে ধন্য হবার জন্য সমবেত হয়। কিন্তু একটা কুকুরের মধ্যেও যে থাকতে পারে ভগবদভক্তি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পোড়ামাতলায়। সম্প্রতি একদিন বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় একটা কুকুর পোড়ামার মন্দিরে উঠে আর কিছুতেই নামতে চায় না। কোলে করে তুলে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেও কুকুরটা পরক্ষণেই আবার মা পোড়ামার মন্দিরে প্রবেশ করেছে। কুকুরটাকে দেখবার জন্য প্রচুর লোক সমাগত হয়। বেশ কয়েকঘণ্টা মন্দিরের দুয়ারে গড়াগড়ি দেবার পরে কুকুর আপন মনেই এক সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে।

• • • •

রাজধানী দিল্লী থেকে একটা বিস্ময়কর খবর এসেছে। সেখানে নাকি জলকষ্ট এমন তীব্র এবং অসহনীয় রূপ নিয়েছে যে দিল্লীর লোকেরা দারবন্দী হয়ে যমুনার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যমুনায় ঝাঁপ দেবার জন্যে। খবরটি জানিয়েছেন আদিখ্যেতা সহকারে এক বাংলা সৈনিকপত্রের 'বাতিঘরখানেবালা' এক সংবাদ-প্রতিনিধি। রাজধানী দিল্লী। সেখানে জলকষ্ট? তাও কি সম্ভব। সরকার চলে পঞ্চাশখানা হেলিকোপ্টার কাশ্মীরের সেই বিখ্যাত জলাধার থেকে সেই অগাধ চিরযৌবনদায়ী জল নিয়ে আসবে দিল্লীতে প্রতিদিন, যেমন আনা হতো সম্রাট আকবরের সময়ে, সাজাহানের সময়ে। তবে সংবাদ প্রতিনিধির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে পরবর্তী সংবাদের অপেক্ষায় রইলাম, অর্থাৎ কতগুলি লোক যমুনায় ঝাঁপ দিল, তা জানতে পারলে সুখী হব। বলেন তো কিছু ঘড়ি আর কলসী পাঠিয়ে দি; সেখানকার অনেকগুলি নগরনায়ক ও রাজকর্মী ঐ ঘড়ি কলসি পাবার যোগ্য তাতে আর সন্দেহ নেই।

• • • •

হয়ে গেল। কাশোবাজারী বাপের কাশোটাকার সদ্গতিকরণ করতে চোঙা প্যান্ট পরে চাওয়াই জাহাজে চেপে বিমান-পরিচারিকাদের সঙ্গে চোখঠারাঠারি আর মস্করা করতে করতে ধনীর দুলালদের বিলাত ঘুরে আসা হয়ে গেল। ইরাবতীর বন্যার মত বহির্বাণিজ্যের স্রোত দেখে

ব্রিটেন তো রীতিমতো ভড়কে গিয়েছে। অনেকদিন থেকেই সেখানকার সরকার পাঁয়তাড়া কষছিল। এইবার রীতিমত বহিরাগত-নিয়ন্ত্রণ নিয়ম বলবৎ করবার ব্যবস্থা করেছে। এই নিয়মানুসারে বৃটেন ঠিক করেছে, কমনওয়েলথ থেকে প্রতি বছর ৮৫০০ জনের বেশী বহিরাগতকে বৃটেনে আসতে দেয়া হবেনা। এখন প্রতি বছর ২০৮০০ জন বহিরাগত বৃটেনে আসেন। এঁদের অধিকাংশ আসেন ভারত, পাকিস্তান এবং ওয়েষ্ট-ইনডিজ থেকে।

• • • •

সাময়িকপত্র বিশেষ করে মাসিকপত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে সকল যুগে, আমাদের এই বাংলাদেশেও তার নজিরের অভাব নেই। দেশের জনমনকে উদ্বুদ্ধ করতে, সংসাহিত্য প্রচারের মাধ্যমে তাদের মহত্তর জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করতে, জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারার দর্পণরূপে দেশ-বিদেশের কাছে আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করতে এইসব মাসিকপত্রিকাগুলি যে দেশহিতৈষণার স্বাক্ষর রেখেছে তা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে সেইসব মাসিক পত্রিকার দিক্‌পাল সম্পাদকদের কথা স্মরণ হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গদর্শন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বঙ্গদর্শন, বালক প্রভৃতি) প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্র) সরলাদেবী চৌধুরাণী (ভারতী), সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী)। মাত্র কয়েকজনের নাম করলাম। এঁদের অবদান সম্বন্ধে বোধকরি আজ আর কোনো বাকবিস্তারের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু দেখা গেছে, জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় এই ধরণের সাময়িকপত্রিকাগুলি কোনোদিনই রাজ্যসরকারের বা কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য বা কোনো বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি।

আজও আমাদের দেশে বহু সাময়িকপত্রের মধ্যে এমন কয়েকটি পত্রিকা আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে বহু আর্থিক ক্ষতি এবং নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাদের আদর্শ বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু সরকারের কাছে তাদের কদর হয় না। বরং দেখা গেছে, অনেক খেলো পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে দৈনিকপত্র চালোয়া সরকারী অনুগ্রহ লাভ করছে।

প্রচার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রের প্রাধান্য সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুধাবনযোগ্য।

এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সারা ভারতে মোট পত্রিকার সংখ্যা হচ্ছে ১৭৯০টি। তার মধ্যে ৫০৩টি দৈনিক সংবাদ-পত্র। বাকি ১২৮৭টি পত্র-পত্রিকাই সাময়িকী শ্রেণীভুক্ত। একমাত্র ১৯৬৩ সালে ৯১৩টি সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করেছে।

কেবলমাত্র সংখ্যার দিক থেকে নয়, প্রচারের দিক থেকেও সাময়িকপত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মোট প্রচারের দিক থেকে ভারতের দৈনিক সংবাদপত্রের হিসাব হচ্ছে শতকরা ৩.৫ অর্ধ-সাপ্তাহিক শতকরা ০.৬ ও সাময়িকী শতকরা ২২.১।

পশ্চিমবঙ্গে মোট পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১০১৪টি। তার মধ্যে দৈনিকের সংখ্যা ২৫টি। অবশিষ্ট সবই সাময়িকী শ্রেণীভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকা-সমূহের অর্ধাংশের অধিকই বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। ইংরাজি

ও হিন্দীর স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। নিম্নে কোন ভাষায় কতগুলি পত্র-পত্রিকা আছে এবং তাদের প্রচার সংখ্যা কত তা দেওয়া হলো।

বাংলা—৫১৫টি—প্রচার সংখ্যা ১১ লক্ষ ১০ হাজার, ইংরাজি—২৭৯টি—প্রচার সংখ্যা ৭ লক্ষ; হিন্দী—২৫টি—প্রচার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার। উর্দু—২৪টি—প্রচার সংখ্যা ৫৮ হাজার; ওড়িয়া—১২টি—প্রচার সংখ্যা ২৩ হাজার; অসমিয়া—৬টি—প্রচার সংখ্যা ১২ হাজার; গারোবী—৩টি—প্রচার সংখ্যা ৭ হাজার; তেলেগু—২টি—প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার।

তা ছাড়াও সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় ২টি করে এবং মালয়ালম ও মারাঠি ভাষায় একটি করে পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

• • • •

কয়েকদিন আগে সংবাদপত্র মারফৎ একটি প্রশ্ন শোনা গেছে: শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্মৃতি মন্দির স্থাপনে বিলম্ব কেন?

টাকা বরাদ্দ আছে। ভিত্তিপ্রস্তর অনেকদিন আগেই প্রোথিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বরাহনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ঘাটে যেখানে ঐ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে সেখানে আজ পর্যন্ত আর একটি ইঁটেরও গাঁথুনি হয়নি। শিশিরকুমার-স্মৃতিমন্দির বুঝি মাটির নীচে ঐ ভিত্তিপ্রস্তরের মধ্যেই চিরকালের মত লীন হয়ে থাকবে।

শিশিরকুমার পরলোকে গমন করেন ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন ঐ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং কলকাতা পৌরসভার বাজেটে স্মৃতিমন্দির নির্মাণ বাবদ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কোথায় গেল সেই টাকা আর কোথায় গেল সেই স্মৃতিমন্দির?

পৌরপিতারা এখন পরস্পরের পশ্চাৎদেশে লাথি হাঁকড়াচ্ছেন, একে আর একজনকে ধরে টানছেন, কাপড় খুলে দিচ্ছেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগে পৌরসভা ভবনে ডেপুটি মেয়রকে ঘিরে যে কাণ্ড হয়ে গেল তা দেখে বিশেষ বিশেষ পাড়ার দাদাবাজরাও লজ্জায় জিভ কেটেছে। কোন সভ্যদেশের পৌরসভ্যরা যে এমন আচরণ করতে পারেন তা ধারণার বাইরে ছিল এতদিন।

এইরকম হাল যে পৌরসভার তার দ্বারা কোন ভাল কাজ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব শিশির কুমার ভাদুড়ীর স্মৃতিমন্দির যদি নির্মাণ করতে হয়, কলকাতার বুকে তাঁর স্মৃতিকে যদি জাগিয়ে রাখতে হয় তাহলে অবিলম্বে শহর ও উত্তর-শহরতলীর নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং একটি জনপ্রতিনিধিমূলক কর্মপরিষদ গঠন করে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অবলম্বনের দ্বারা সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার জন্য উদ্যোগী হওয়া দরকার। আমাদের বিশ্বাস, যদি এই রকম একটি আহ্বায়ক কর্ম পরিষদ গঠন হয় তাহলে কাজ কোনোদিক থেকেই আটকে থাকবে না। এবং বাঙালী জাতির যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে তাহলে এই মহৎ প্রচেষ্টায় নাগরিকদের অগ্রণী হওয়া একান্ত কর্তব্য। আমরা জানি শিশিরকুমারের একমাত্র জীবিত অনুজ মুরারীমোহন এ বিষয়ে কিছুদিন আগে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েও নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়ে কাজে অগ্রসর হতে পারেন নি। আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশের নাট্য-সাংবাদিক এবং সেই সঙ্গে সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক, অভিনেত্রী সংঘ এবং অসংখ্য নাট্য-সংস্থার সভ্য ও নাট্যরসিক নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। দু'চারজন

সময় করে যদি একটি পরিকল্পনা স্থির করেন এবং তা জনসাধারণকে জানান আর সেই সঙ্গে একটি কর্ম পরিষদের তালিকা প্রণয়ন করেন তাহলে অতি সহজেই একটি সভা আহ্বান করে সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা শুরু হতে পারে। শিশিরকুমারের কাছে অপরিশোধ্য বাঙালীর ঋণ। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, নাট্যকার যেমন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যুগে যুগে, শিল্পীদের দানও তেমনি। সেইদিক থেকে শিশিরকুমার ছিলেন এমন এক অনন্যতন্ত্র প্রতিভাধর শিল্পী এবং সেই সঙ্গে এমন এক উদ্ভূত ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে তিনি সমগ্র জাতিকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; অভিনয়, ও জাতীয়-বৈশিষ্ট-সমৃদ্ধ প্রযোজনা নৈপুণ্যের মাধ্যমে একটা গোটা জাতকে তার জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে, তার সংস্কৃতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন করতে, তার নষ্ট গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে তাকে নতুন উজ্জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত করতে এবং তাকে এক নতুন প্রাণবন্তায় উদ্বেলিত করতে একজন মানুষের এমন ধারা অসাধ্য সাধন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শিশিরকুমার ছিলেন নিজেই একটি যুগ। তিনি শুধু যুগ প্রবর্তকই ছিলেন না। স্রষ্টা হিসাবে, আচার্য হিসাবে, অকুতোভয় ব্রহ্মচারী ব্যক্তি হিসাবেও তাঁর সমকক্ষ মানুষ সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন লোভ তাঁকে বশীভূত করতে পারেনি। কোন অন্যায় তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন নি। আপস করবার মনোবৃত্তি যদি তাঁর থাকতো, থাকতো যদি সরকারী প্রসাদ পাবার কণামাত্র ইচ্ছা, তাহলে তো সরকার বর্তে যেতো। তাঁকে রাজভক্তে বসিয়ে রাখতো আজীবন। তাঁর মোহময় ব্যক্তিত্ব আর অনুকরণীয় বাকবৈদগ্ধের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা বাংলা সরকারকুলে এক ডাঃ বিধান রায় ছাড়া আর কারুর ছিল না। এমন সময় গেছে যখন দেশবন্ধুর পরেই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা, এমন সময় গেছে যখন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল তাঁর করতলগত, কিন্তু ওই সব অপদার্থ মানুষদের কাছ থেকে সম্মান বা অনুগ্রহ নেব নৈব নৈবচ।

নিজের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত-বন্ধুদের মনীষাকে তিনি সকল সময়ে উন্মুক্ত হৃদয়ে স্বীকৃতি দিতেন, আর মানতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে। বলতেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঐ একটি মাত্র লোকই আছেন যিনি সব পাওয়ার পরেও সর্বস্ব ত্যাগ করতে পেরেছেন। এমন মানুষ পৃথিবীতে ২।৩ জনের বেশী জন্মাননি। আর সব তো নেপোর দল আর নাড়ুর দল। এক প্রকাণ্ড সভায় তিনি যখন এই কথা বলেছিলেন তখন শ্রোতারা চমকে উঠেছিল। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। তাই দেশ-শাসকদের প্রতি অন্য কেউ ঐভাবে বললে ঘোরতরি তাঁকে নিন্দায় পেতে হতোনা। সত্যিই এরকম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এক আশ্চর্য ঘটনার মতো যেন মনে হয়। যেখানে যখন গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন সেখানে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে। বহুদিন আগের এক বড় আইনজীবীর বাড়ীতে একটি নিমন্ত্রণ আসরের কথা মনে পড়ছে। সেই প্রাজ্ঞ বিবেকবান সাহিত্যশিল্পরসজ্ঞ আইনজ্ঞ মানুষটিকে শিশিরকুমার বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সাধারণতঃ তিনি সভাসমিতি বা নিমন্ত্রণ আসরে যেতেন না। কিন্তু এই নিমন্ত্রণটি উপেক্ষা করতে পারেননি। গৃহস্বামীর পুত্রের সংগীতশিক্ষণে আমরা সেই বৃহৎ ব্যাপারে উপস্থিত ছিলাম। সন্ধ্যার পর থেকেই গণ্যমান্য অতিথিরা আসতে লাগলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য বিচারপতি, বড় বড় ব্যারিষ্টার, বড় বড় কোম্পানীর বড় বড় সাহেব, কোটিপতি ব্যবসায়ী, অন্যান্য গণ্যমান্য প্রমুখ সহরের যাঁরা যাঁরা শ্রেষ্ঠ সব নাগরিক সেই আসর অলঙ্কার করছেন। মাঝে মাঝে

বেয়ারারা পানীয় নিয়ে আসছে। হাতে হাতে সেই সব গেলাস ঘুরছে। মার্জিত ভঙ্গীতে ইংরাজি বুকনি শোনা যাচ্ছে। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা কক্ষের সেই অপূর্ব দেখছি।

বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম তাঁর পিতা শিশিরকুমারকে আসবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন এবং শিশিরকুমার জানিয়েছিলেন যে, রবিবারের পর সোমবার দিনটায় তিনি কিছু অসুস্থ থাকেন কিন্তু মঙ্গলবারের এই নিমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করবেন। কিন্তু কোথায় তিনি? ঘরের মধ্যে কত হাসি, ইংরাজি ভাষায় কত না রসরসিকতা চলেছে। হঠাৎ বারদরজায় কিছু গোলমাল উঠল। তারপর, ও কার কণ্ঠস্বর? শিশিরকুমার এসেছেন। উদাত্ত কণ্ঠে গৃহস্বামীকে সম্ভাষণ করলেন কবিতা দিয়ে :

—"মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে।"

ব্যাস, ঐ এক কবিতার লাইন আওড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের আবহাওয়া গেল বদলে। সকলের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি, এতো আশা নয়, মনে হল, এ যেন এক আবির্ভাব। পরনে কালাপাড় ধুতি, কোঁচাটা কোন রকমে পকেটে গোঁজা, গায়ে লংক্লথের চিলে হাতা পাঞ্জাবী, পায়ে মাদরাজী চপ্পল। হাতের অঙ্গুলের ফাঁকে ধূমায়মান হাভানা সিগার। কোথায় গেল বিলাতি দামী স্যুটের বাহার আর সাঁজা অরীর কাজ করা চাপকান আর মুক্তোর মালার জেল্লা। সেই সভাস্থলে তখন একটি মাত্র লোক, একটি মাত্র সূর্য। ঘরের ভেতর পদক্ষেপ করে বললেন—"Ah! what a glittering assembly of great Personages! গৃহস্বামী সসম্ভ্রমে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। মিনিট দশেক ঘরের মধ্যে ছিলেন। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সেই দশমিনিট সেই ঘরের মধ্যে তিনি যেন একাই এক সহস্র।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। হাইকোর্ট। এক শান্তিপ্রার্থী-মনোভাব-বিশিষ্ট বিচারকের কাছে তাঁর বিচার হচ্ছে। বিচার কোন নৈতিক অপরাধের জন্য নয়। মেউলিয়া খাতায় তিনি সেই সময় নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এক পাওনাদার তাঁকে জব্দ করবার জন্যে সেই মেউলিয়া দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপীল করেছিলো। সেই আপীলের বিচার। বিচারপতি আর্টিন্ লর্ড উইলিয়ামস্। বিচারকক্ষে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বহু উকিল ব্যারিষ্টার এসে জমায়েত হয়েছেন। শিশিরকুমার নিজের পক্ষে কোন কৌঁসুলী নেননি। নিজের বক্তব্য তিনি নিজেই বলবেন।

যথাসময়ে আদালত বসল। সকলের চোখ সেই সুন্দরকান্তি উন্নতমাথা তেজোদৃপ্ত মানুষটির দিকে। বিচারকও মাঝে মাঝে তাঁকে দেখছেন। বলে রাখি, জাস্টিস লর্ড উইলিয়ামস্ নিজে একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয়ের কদর বুঝতেন।

শিশিরকুমার যথাসময়ে তাঁর বক্তব্য বলতে উঠলেন। বিচারকের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তারপর শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। সে এক আশ্চর্য ভাষণ! কী উচ্চারণ, কী ইডিয়ম, কী মনোহর ভঙ্গী! সারা আদালত গভীর বিস্ময়ে সেই ভাষণ শুনতে লাগল। শিশিরকুমার বললেন, তিনি অভিনয় কলালক্ষ্মীর চরণে ("Deity of the dramatic art") নিজের জীবন উৎসর্গ করে এতাবৎ রিক্ত নিঃস্ব হয়েই আছেন। "দেশের লোক আজ আর দুঃখ

নির্মল রঙ্গাভিনয়কে পছন্দ করেন না, ছবির পর্দায় তারা সুন্দরী মেয়েদের অঙ্গশোভা দেখবার জন্যে লালায়িত, চলচ্চিত্রের যৌনআবেদন আজ যেন সারা দেশকে আচ্ছন্ন করেছে, তাই আজ আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলির অত্যন্ত দুরবস্থা, তাই আজ আমি নিঃস্ব। রঙ্গালয়কে বাঁচাবার জন্যেই আমি ঋণ করেছি এবং সেই ঋণের জ্বালায় সাময়িকভাবে ইনসলভেন্সি নিয়েছি। ধর্মাবতার, আমি এই কথা বলে সম্পূর্ণভাবে আপনার হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম।"

শিশির কুমার ভাদুড়ী

বিচারপতির হয়ত মনে পড়ল, তাঁর দেশের সেই বিখ্যাত অভিনেতা হেনরি আরভিং-এর শেষ অভিনয়ের সেই শেষ উক্তি—"হে ঈশ্বর! আমি আজ আমার জীবনের শেষ দৃশ্যে তোমার হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম।"

এর পর আর অন্য কোন রায় দেওয়া বোধকরি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আপীলের আবেদন ডিসমিস্। শিশিরকুমার মামলা জিতে চলে এলেন।

এই মানুষ ছিলেন শিশিরকুমার। জীবন-সংগ্রামে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাঁকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। তাঁর আদর্শকে, তাঁর স্বপ্নকে রূপায়িত করতে পারিনি। তার কারণ, তিনি জাতীয় নাট্যশালার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাকে রূপ দিতে হলে সরকারের সহায়তার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু সে সহায়তা তিনি পাননি। সে দুরপণেয় কলঙ্ক আমাদের কোনদিন ঘুচবে না। যত দিন যাবে, ততই তাঁর স্মৃতি ম্লান হয়ে আসবে, ততই তিনি বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবেন। তাই আজ তাঁর গুণগ্রাহী দেশবাসীর প্রতি, সরকারের প্রতি আমাদের শেষ অনুরোধ, এখনো সময় আছে, এখনো তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করে আমরা কলঙ্ক মুক্ত হতে পারি! এগিয়ে কী আসবেন তাঁরা?

নন্দীভৃঙ্গীর তদন্ত

দিব্যেন্দুকিশোর গুহ

গল্প নয়, এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথাই বলব আপনাদের। বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, গতবছরে নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এই ঠিক পুজোর সময়টাতেই। আশোকরি দেবাদিদেব মহাদেবের এমন দুজন সর্বলোকখ্যাত শিষ্যের পরিচয় আর নতুন করে আপনাদের দিতে হবেনা। নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার দেখা এই কোলকাতারই বেচু খানসামা লেনে। কি পরিস্থিতির মধ্যে সেটাই বলছি :

বেচু খানসামা লেনের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সেবার আমিই ছিলাম কর্মকর্তা। নবমীর দিন মাঝরাতের দিকে, কি ক'রে কি অবস্থার মধ্যে যেন ভয়ানক পরিশ্রান্ত দেহটা নিয়ে রোয়াকের ওপরেই শুয়ে পড়েছিলাম। শুতে না শুতেই ঘুম !···· ঘুম ভাঙল হঠাৎ এক বাজখাঁই গলার বিকট চীৎকার শুনে।

"এই শ্যাংলা, পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস যে বড় !"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তাকিয়ে দেখি সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি লোক আমার শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে। দেখে মানুষের মত মনে হলেও, মহামানবের লক্ষণ সর্বাঙ্গে। বক্ষ-বিস্তৃত দাড়ি, স্কন্ধ-বিলম্বিত কেশপাশ, দুচোখে টর্চলাইটের মত এক জ্যোতি অনবরত করছে। বস্ত্রের পরিবর্তে শুধু লোমশাবৃত এক কম্বলে অঙ্গসজ্জা, আর পায়ে সস্তা কেনা বিস্তৃসোলের চটি। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতেই, আরেক ধমক !

"কিরে, বলি শুনে আছিস ।"

"আজ্ঞে আছি। কিন্তু আপনারা ?"

"চিনবি না। আমরা মর্ত্যবাসী নই !"

তবে ?

"আসছি, কৈলাসের দেবাদিদেবের আলয় থেকে। নন্দী আর ভৃঙ্গী আমাদের নাম !"

"আপনারাই নন্দী-ভৃঙ্গী ?"

"হাঁ, আমরাই ! কিন্তু এদিকে ব্যাপার কি ?"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে ? আকাশীর আর আস্কারা পাওনি ? বলি মহেশ্বরের পরিবারবর্গ গেলেন কোথায় ?"

"মহেশ্বরের পরিবার ? মানে দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ?"

"হাঁ, হাঁ, কোথায় তাঁরা ?"

"কেন কি হয়েছে বলুন তো ?

"সে খবর তোমার দরকার কি হে বাপু ? যা জিজ্ঞেস করছি তাই বল। কোথায় তাঁরা ?"

"কেন ? পূজামণ্ডপে। তিনদিন ধরে সেখানেইতো আছেন সকলে।"

"না নেই।"

"নেই ?"

"না, নেই। বিলকুল ফাঁকা পড়ে আছে পুষ্পাসন, দেখিসনি ?"

"বলেন কি ? তবে গেলেন কোথায় ?"

"সে কথাতো তোকেই জিজ্ঞেস করছি। কোথায় গেলেন ওঁরা।"

দৌড়ে গিয়ে মণ্ডপটা দেখে এলাম। সত্যি একেবারে ফাঁকা। সিংহের ওপরে মা দুর্গা নেই, পেঁচার ওপরে লক্ষ্মীও নেই, হাঁস, ইঁদুর আর ময়ূরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। বাহনদের ছেড়ে দেবতারা সব অন্তর্ধান করেছেন।

সর্বনাশ! ভালয় ভালয় মহেশ্বরের পরিবারবর্গকে যদি দশমীর দিনই কৈলাসে ফিরিয়ে না দেওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই আরেক মন্বন্তর বাধবে। মহেশ্বর নিঃসন্দেহে আরেক প্রলয় শুরু করে দেবেন। এখন উপায় ?

ভৃঙ্গী বললেন—"উপায়তো তোকেই জিজ্ঞেস করছি। মর্ত্যের পথঘাট আমাদের কিছুই জানা নেই। তোকেই আমাদের সাহায্য করতে হবে। নে চল্!"

ঘরে সেদিন সিদ্ধি তৈরী করা ছিল। নন্দী আর ভৃঙ্গীকে দুঘটি সিদ্ধি খাইয়ে রাত গভীরেই মহেশ্বরের পরিবারবর্গকে খুঁজতে কোলকাতার হাওয়ায় বেরিয়ে পড়লাম। নন্দী এক রিকসায়। আমি আর ভৃঙ্গীদা আরেক রিকসায়। সিদ্ধির মৌতাতে ততক্ষণে ভৃঙ্গী অনেক সহজ হয়ে এসেছেন। আমিও তাঁকে দাদা বলেই সম্বোধন করতে শুরু করেছি। ঠনঠনে কালীবাড়ীর সামনে এসে পৌঁছতেই ভৃঙ্গীদার কেমন ইমোশন এসে গেল। গোপন কথাটা আমাকে ফাঁস করে দিলেন।

"বুঝলি ? এই মর্ত্য থেকেই এক শাস্ত্রবাগীশ মহেশ্বরের কাছে গতকাল এক জরুরী আর্জি পেশ করে জানিয়েছে, মর্ত্যের বিষাক্ত পরিবেশে মহেশ্বরের পরিবারের সকলেই নাকি নিজেদের যাহাত্ম্য প্রকাশ করতে পারছেন না। মর্ত্যে আজ নাকি অধর্মেরই জয়। আর অধার্মিক পাষণ্ডরা নাকি কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এমনকি, জগজ্জননীকে পর্যন্ত যার যার সুবিধেমত কাজে লাগিয়ে ধর্মের শিখণ্ডি উড়িয়েছে! দেব-মহিমা নাকি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত!"

ভুরু কপালে তুলে বললাম—"বলেন কি ?"

ভৃঙ্গীদা ভুরু কুঁচকে বললেন—"তবে আর বলছি কি ? গুরুদেব সে চিঠি পেয়ে তো ক্ষেপে আগুন। আমাদের তক্ষুনি ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতে মর্ত্যেও পাঠিয়ে দিলেন!"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি, যা শুনেছিলাম ঠিক তাই। তোর এখানে এসে দেখলাম পুষ্পাসন ফাঁকা পড়ে আছে।"

ঠনঠনিয়ার রাস্তা ছেড়ে ঠনঠন করতে করতে রিকসা দুটো ততক্ষণে বড়বাজারের পথ ধরেছে। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হোল, এই রাতে গণেশকে পেতে হলে গণেশ এ্যাভেন্যুর দিকেই যেতে হবে। আর আমার অনুমানও মিথ্যা হোল না। গনেশ এ্যাভেন্যু আর বড়বাজারের চৌমাথায় এসে পৌঁছতেই বিরাট এক প্রাসাদোপম বাড়ীর ভেতর থেকে উৎকট ঘিয়ের গন্ধ পেলাম। বললাম—"নন্দীদা রিক্সা থামাও, নাবো গাড়ী থেকে।"

"কেনরে ? এখানে কি ?"

"আঃ বিয়ের গন্ধ পাচ্ছ না ?"

"তা বিয়ের সঙ্গে আমাদের গণেশের সম্পর্ক কি ?"

"আছে আছে। তোমাদের আধা-মানুষ আর আধা-দেবতার ভেতরে তা' ঢুকবে না। চলে এসো আমার সঙ্গে। সব দেখতে পাবে।"

ভৃঙ্গীদা বললেন, "দাঁড়া, তার আগে পাষণ্ডগুলো যাতে তোকে না দেখতে পায় তোর ওপর তাই মায়ার মন্ত্রটা পড়ে দিই।"

নন্দী আর ভৃঙ্গীদা তৎক্ষণে অশরীরি হয়ে গেছেন। মায়ার মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর্ধানও দেখলাম দেহাল থেকে অদৃশ্য হল। তিন অশরীরি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম বাড়ীর অন্দর মহলে। আর প্রবেশ করতেই দৃশ্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।...শেঠ বিঠলদাস তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তদারক করছেন। এক ছোকরা, টেস্ট-টিউব থেকে হলদে রঙের এক তরল পদার্থ ঢালছে বড় বড় গ্লাসগুলার টিনে, আর দেখতে দেখতে সেই হালকা চরিত্রের মিশ্রণে পরিণত হচ্ছে।

ভৃঙ্গীদা ফিসফিসিয়ে বললেন—"কিন্তু গণেশ কোথায় রে ?—আমিও গণেশকেই খুঁজছিলাম। হঠাৎ বিঠলদাসের তাকিয়ার দিকে নজর পড়তেই দেখলাম গণেশের পরিচিত শুঁড়টা বেরিয়ে আছে। সামনে বিরাট এক থালা। মণ্ডা মিঠাইয়ের এক রাজসিক ভোগ শেষ ক'রে গণেশ তাকিয়ার আড়ালে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে!

ভৃঙ্গীদার দাঁতে কড়মড়িয়ে উঠল। চাপা ক্রোধে বললেন—"কাণ্ডটা দেখেছ নন্দীদা ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

"ওকে ডাক তাহলে।"

"না, ডাকা চলবে না। মহেশ্বর আমাদের শুধু তদন্ত করতেই বলেছেন। কারো দেব-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোন অনুমতি আমাদের নেই।"

"তা' বলে গণেশ এই ভণ্ড ব্যবসাদারের গদি আলো করে থাকবে ?"

"হাঁ থাকবে, যদি গণেশের ইচ্ছা হয়, তাই থাকবে। আমাদের বাধা দেওয়া চলবে না। ভুই নোট কর ব্যাপারটা। শুধু এটুকুই আমাদের কাজ।"

ভৃঙ্গীদা বিষবৃক্ষের শুকনো পাতায় এরপর খসখস ক'রে যা লিখলেন তার ভাষা আর লিপি দুইই আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য!

গম্ভীর মুখে নন্দীদার কড়া আদেশে আমরা রাস্তায় নেমে এলাম। আবার রিক্সায় চাপলাম। শেষ রাতের নির্জন রাজপথ ধরে ঠনঠন্ ক'রে রিক্সা এগিয়ে চলল শ্যামবাজারের দিকে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে আসতেই নন্দীদা জিজ্ঞেস করলেন—"গণেশের দর্শনতো পাওয়া গেল, এবার কার্তিক বাবাজীর দর্শন কোথায় পাওয়া যাবে বল।"

আমার যেন কেমন মনে হচ্ছিল তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক, অপরিমেয় শক্তির জীবন্ত আলেখ্য কার্তিকের দর্শন অরুণ সমিতি বা যুবজীবন সঙ্ঘের ছোকরাদের আড্ডায় সেদিনই পাওয়া যাবে। তাই বিঠলদাসের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রিক্সা সেদিকেই চালাতে বলে দিয়েছিলাম। গলিতে ঢুকতেই অরুণ সমিতির ছোকরাদের গলায় আওয়াজ শোনা গেল। নন্দীদাকে বললাম—"নেমে পড় নন্দীদা, ঠিক আড্ডায় এসে গেছি।"

বিনাবাক্যে নন্দী আর ভৃঙ্গী আমাকে অনুসরণ করে চলেন।

অরুণ সমিতির তারুণ্য তখন রাতের অন্ধকারে রোয়াকের এক কোণে উল্লাসের আসরে উপচে পড়েছে। ট্রানজিসটার সেটে বিদেশী কোন স্টেশন থেকে বাজছে জাজ নৃত্যের উদ্দাম সুর, আর তারই তালে তালে কোমর জড়িয়ে অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচছে তরুণ সদস্যরা। রোয়াকের আরেক কোণে সোডার বোতল ভাঙার শব্দ পেলাম। আর দেখলাম, বিলীতি মদের বোতল থেকে ঢক ঢক করে গ্লাস ভর্তি করছেন স্বয়ং সম্পাদক। কিন্তু কার্তিক কোথায়? আমাদের তিনজোড়া চোখ একান্ত আগ্রহে তাঁকেই খুঁজছে। মারাত্মকভাবে অশরীরি হয়ে আরও একটু এগুতেই ভৃঙ্গীদা চিৎকার করে উঠলেন—"সর্বনাশ, দেখ দেখ নন্দীদা!"

"কোথায়?"

"ওই তো কার্তিক!"

দেখলাম অরুণ সমিতির সম্পাদকের আড়ালে কার্তিক লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আর তারই পাশে শূন্য একটা বোতল সানন্দে গড়াগড়ি যাচ্ছে!

হুঙ্কার দিতে যাচ্ছিলেন ভৃঙ্গীদা। কিন্তু নন্দীদা তার আগেই তাঁর মুখ চেপে ধরেছেন। বললেন—"চ্যাঁচাস না ভৃঙ্গী! নোট কর। ওকে ডাকবার দরকার নেই। ভুলে যাস না আমাদের শুধু তদন্ত করবারই ভার। দেহ-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই আমাদের।"

রুদ্ধশ্বাসে ভৃঙ্গীদা বললেন—"তাই বলে অরুণ সমাজের নেতৃত্ব করতে গিয়ে কার্তিক ওদের এমনি সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে?"

গম্ভীর স্বরে নন্দী বললেন—"কোনটা মন্দ কোনটা ভাল আমরা কি বুঝব? দেবতার খেয়ালের কথা আমরা কি জানি। নে চল। বেরিয়ে আয়।"

নন্দীদাই হচ্ছেন তদন্ত কমিটির প্রতিনিধিদলের নেতা। তাই তাঁর কথা অমান্য করার ক্ষমতা নেই ভৃঙ্গীর। বিনাবাক্যে তিনি ব্যাপারটা নোট করলেন। বিনাবাক্যে আমরা আবার এসে রিকশায় উঠলাম।

ততক্ষণে ভোর হয়ে আসছে। দশমীর বাজনা বাজছে পাড়ায় পাড়ায়। নন্দীভৃঙ্গীকে দেখে রাস্তায় লোক জমতে শুরু করেছে। নন্দীদাকে বললাম—"শিগ্‌গীর মায়ার মন্ত্র আউড়ে অশরীরি হও নন্দীদা, নইলে কলেজ স্ট্রীটের কৌতূহলী লোকের ভিড়ে পড়লে চ্যাপ্টা হতে সময় লাগবে না।"

নন্দীদা বললেন—"তার আগে আরেক বাটি করে সিদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারিস? গলাটা অনেকক্ষণ ভেজেনি।'

ভৃঙ্গীদারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে এই ভোরে সিদ্ধি পাব কোথায়! তাই বললাম—"এসো, সিদ্ধির বিকল্পে গরম গরম হালুয়া আর চা খাওয়া যাক। নতুন জায়গায় এসে নতুন জায়গায় জিনিষও খেতে হয়।"

রতনবাবুর ফাঁকা দোকানটায় অগত্যা ঢুকে পড়া গেল। চা-হালুয়া খেয়ে দোকান থেকেই অদৃশ্য হলাম আমরা। এবার হাঁটতে হাঁটতে সরস্বতীর অন্বেষণ শুরু হোল। সরস্বতীর কথা আগেই তুলেছিলেন নন্দীদা। মনে মনে ঠিকও করেছিলাম, সরস্বতীর নাগাল পেতে হলে ঠিক কোথায় যেতে হবে। অলি-গলি ঘুরে নামজাদা এক সাহিত্যিকের ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। ঢুকতেই চোখ চড়ক-গাছ।

দেখলাম, সাহিত্যিকপ্রবর খাটের তলায় ঢুকে দিব্য রিম-কাগজে পুজো স্পেশালের জন্যে প্রেমের উপন্যাস লিখছেন। আর তাঁর গিন্নী লাঠি হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছেন। সরস্বতীকে কিন্তু আশেপাশে কোথাও পাওয়া গেল না। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরস্বতীকে ইনিই পুজোর বাজারে পাকড়াও করেছেন। সময় নষ্ট করা চলবে না। সরস্বতী লোকটা তাহলে সাহিত্যিককেই জিজ্ঞেস করা চাই। তাই তাড়াতাড়ি আবার অশরীরি ধারণ করলেন নন্দীদা। তারপর সোজা সাহিত্যিকের খাটের তলায় ঢুকে তাঁর ঘাড়ে আচমকা এক চুলকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"ওহে বাণীপুত্র! সরস্বতী কোথায়?"

"কে আপনি?"

"চেঁচাবে না। আমি নন্দী, মহেশ্বরের শিষ্য। বল কোথায় রেখেছ সরস্বতীকে?"

"সরস্বতী কোথায় আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। গত একমাস ধরে কলম ধরেছি তাঁরই আরাধনায়, কিন্তু সরস্বতীর মুখ একবার কল্পনা করতে পারিনি। বারে বারেই গণেশের মুখ দেখছি মানস নেত্রে। তাই আমি গণেশের কৃপালাভেরই চেষ্টায় আছি। সরস্বতীর আরাধনা আপাততঃ বন্ধ আমার।"

ভৃঙ্গীদা বললেন—"হা, হতোস্মি! সাহিত্যিকের মুখে একি কথা!"

"কি করব বলুন! পুজো সংখ্যার মরশুমটায়—"

নন্দীদা বললেন—"থাক, বুঝতে পেরেছি।"

"আজ্ঞে কি বুঝলেন?"

"বুঝলাম, গোল্লায় গেছ। সরস্বতীর কৃপালাভ আর কোনদিনই তোমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না। যা করছ, চিরকাল তাই দেখবে! তা' গণেশের কৃপাই যদি পেতে চাও, তবে সৃষ্টির এই মহৎ কবিতা ছেড়ে বিঠলদাসের মত বিয়ের ব্যবসা করলেই তো পার।"

"আজ্ঞে, কথাটা মন্দ বলেন নি! ভাবছি এখন থেকে তাই করব। এতে আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না সম্ভব হয়ে উঠছে না!"

নন্দীদা বললেন—"বেশ তাই কর। কিন্তু এখন একটা আন্দাজ দাও দেখি সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত সরস্বতীকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

সাহিত্যিক গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—"আজ্ঞে শুনেছি, মা সরস্বতী এখন কলেজ ষ্ট্রীটেরই এক কারখানায় সদম্মানে বিরাজ করছেন!"

"কারখানায়?"

"আজ্ঞে হাঁ, মেডইজি আর নোটবই তৈরীর কারখানায়। সেখানে ছেলে-মেয়েদের মাথা-খাবার জন্যে যে-সব নোটবই ম্যাস্‌প্রোডাকশান হচ্ছে, শুনেছি সরস্বতী সেখানেই আছেন।"

"বল কিহে?"

"আজ্ঞে, বিশ্বাস না হয়, গিয়েই দেখুন।"

কলেজ রোড 'নিখিল বঙ্গ-নোটবই ম্যাস্‌প্রোডাকচারিং কোম্পানীর' কারখানাটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। আমরা অশরীরি হয়েই ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম শত শত আনাড়ী পণ্ডিত ঘসঘস করে মেড-ইজি আর নোটবই লিখে যাচ্ছে। আর বস্তাবন্দী হয়ে সে বই চালান যাচ্ছে দেশের আনাচে কানাচে।...

জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে এসে ঢুকতেই দুচোখ কপালে উঠল। দেখলাম, লক্ষ্মীদেবী আরাম কেদারায় উপবিষ্টা আছেন। আর তাঁরই পদপ্রান্তে নিমগ্নি, সিঙ্গাড়া আর অরেঞ্জ-স্কোয়াশের নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার।

ভৃঙ্গীদার আগের মতই দাঁত কড়মড়িয়ে উঠল। নন্দীরা আগের মতই তাঁকে শান্ত করলেন। আবার ঘথারীতি নোট করলেন ভৃঙ্গীদা। তারপর গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে এলেন 'নিখিল বঙ্গ নোটবই ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী' থেকে।

রাস্তায় নেমে আসতেই ভৃঙ্গীদা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। সে কান্নায় রাস্তায় জল জমে উঠল। পথঘাটে ট্রাম বাস বন্ধ হোল। গাড়ী ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ভিজে রাস্তা ধরেই হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসীর দিকে এগিয়ে চললাম। আমার দৃঢ় ধারণা লক্ষ্মীকে পেতে হলে এই জল-দুপুরে শেয়ার বাজারের দিকেই যেতে হবে।.....

নন্দী আর ভৃঙ্গীদাকে ঘথারীতি রেখে, আমি শেয়ারবাজারে ঢুকে গেলাম। অসংখ্য লোকের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সকলেই গলা কাটিয়ে চাও হাঁকছে মন্ত্রোচ্চারণের মত। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও লক্ষ্মীকে সেখানে পাওয়া গেল না। বিফল হয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময় এক উটট ছোকরার সঙ্গে দেখা। পরনে পাজামা। উসখো-খুসখো চুল, সারামুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। আমাকে দেখেই চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল—"এখানে কি মনে করে বাপধন?"

বললাম—"তোমার কি দরকার?"

সে বলে, "না, তোমার মত হা-ভাতে লোককে তো এখানে বড় একটা দেখিনা; তবে যাকে খুঁজতে এসেছ তিনি এখানে নেই। এখানে শুধু তার পুজোরই আয়োজন চলেছে।"

"তিনি কোথায়?"

তখন সেই ছোকরাই কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে দিল লক্ষ্মীর আসল ঠিকানা। নন্দী আর ভৃঙ্গীদাকে নিয়ে তক্ষুনি ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সি সোজা এসে পৌঁছল নিউ আলীপুরের বিরাট এক বাড়ীর সামনে।

মায়ার মন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম আমরা। এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে তিন মহলার শেষ ঘরে এসে পৌঁছতেই দেখলাম ঘরে তাল তাল সোনা সাজাচ্ছেন পদ্মভূষণ লক্ষ্মীনারায়ণ বজ্রীপ্রসাদ। এত সোনা এক সঙ্গে বাপের জন্মেও দেখিনি কোনদিন। কিন্তু অবাক হয়ে দাঁড়াবার সময় তখন নয়। লক্ষ্মীকে খুঁজে বার করতে হবে। পেতে হবে মহাদেবের পরিবারবর্গকে। হঠাৎ, সোনা সাজাতে সাজাতে কিসের একটা বোতাম টিপলেন বজ্রীপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সোনার দেয়ালটা ঝুঁকে হয়ে ছোট্ট একটা দরজা খুলে গেল। বজ্রীপ্রসাদ দরজা দিয়ে ঢুকতে যেতেই আমরাও হুড়মুড় করে এগিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির।

দেখলাম, সোনার পালঙ্কে জড়োয়া-গয়নায় সুসজ্জিতা লক্ষ্মী মনের আনন্দে পান চিবুচ্ছেন। তাঁর পাশেই সোনার পানের বাটা থেকে পান সাজিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং বজ্রীপ্রসাদের প্রথমা-স্ত্রী। বজ্রীপ্রসাদ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী তাঁকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন।

কোন কথা বলার উপায় নেই ভৃঙ্গীদার। এবারও নন্দীদার ইঙ্গিতে ব্যাপারটা তিনি নোট করলেন। এবারও নীরবে আমরা ঘৃতপট থেকে নেপথ্যে এসে দাঁড়ালাম।

বিষণ্ণতায় সারামুখ আচ্ছন্ন ভৃঙ্গীদার। দাঁত তখনও কড়মড় করছে। আমি লজ্জায় ঘাড় নীচু করে পথ হাঁটছি।

মিউ আলীপুর থেকে ট্যাক্সি করেই আমরা সোজা গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম গঙ্গার ঘাটে তখন বিসর্জনের ভীড় জমেনি। আউটরাম ঘাটের পাশ দিয়ে সড়ের মাঠের দিকে এগুতেই মনুমেন্টের তলায় বিরাট জনসমাবেশ নজরে পড়ল। দেখলাম, দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতারা সেখানে জড় হয়েছেন। দুটি রাজনৈতিক দলের সভা বসেছে পাশাপাশি দুই মঞ্চে। দুইদল দুইদলকে এদোপাথারি গালাগালি করছে। গালাগালি শেষ হতেই শুরু হয়েছে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে গলা-টেপাটেপি। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। দেশের আত্মিক আর শারীরিক শক্তির এক চরম সংঘর্ষ। দু'দলের ঘায়মুখো জনতা একে অপরের মাথা কাটাচ্ছে। আর সেই বিক্ষিপ্ত জনতার ভিড়েই পাওয়া গেল—জগজ্জননী দুর্গাকে। তিনি বিরাট এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকের সামনে এসে উন্মত্ত জনতাকে ঐক্য, সংহতি আর অখণ্ডতার আদর্শ বোঝাচ্ছেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনছেনা। কেউ তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপও করছেনা। বিসর্জিত ধারায় তাঁর দুচোখ বেয়ে শুধু অশ্রুর প্রবাহ বইছে।

নন্দী বললেন—"দুর্গা নোট কর। এই শেষ নোট। তারপর চল, খিদিরপুর গিয়ে কৈলাসে পৌঁছতে হবে। মহেশ্বরের কাছে তদন্তের রিপোর্টটা আধিলম্বে দাখিল করতে হবে।"

দুর্গাদার নোট করা শেষ হতেই, সকলের অলক্ষ্যে ইডেন গার্ডেনের ফাঁকা মাঠে এক পুষ্পক রথ এসে নামল। নন্দীভৃঙ্গী সভা থেকে সেই পুষ্পক রথে গিয়ে আরোহন করলেন। আমাকে অদৃশ্যে বন্ধুবাদ জানিয়ে ওরা রওনা হতে যাবেন এমন সময় আমি নন্দীদার পা জড়িয়ে ধরলাম। "বললাম—আমাকেও নিয়ে চলুন নন্দীদা!"

"সেকি, তুইতো মানুষ।"

"হাঁ, মানুষ বলেই তো বলছি। এই মর্ত্যের চেহারা তো নিজেরাই দেখে গেলেন। এখানে থাকবার আর একটুও বাসনা নেই। আমাকে দয়াকরে পুষ্পকরথে ঠাঁই দিন।"

দুর্গাদা বললেন—"আমরা নিতে পারি, কিন্তু মহারাজার অনুমতি না পেলে, আবার তোকে ফিরে আসতে হবে!"

"বেশ তাই আসব। অন্ততঃ কৈলাসের দর্শনটাতো হয়ে যাবে।"

নন্দীদা বললেন—"বেশ তবে উঠে আয়।"

উঠতেই বোঁ করে পুষ্পকরথ আকাশে উড়ল। পলকের মধ্যেই আমরা এসে কৈলাসে নামলাম। নন্দীভৃঙ্গী দ্রুত মহাদেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন। বাইরে থেকে দেখলাম সেই কক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্তি ধ্যান গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

রিপোর্ট দাখিল করলেন নন্দীদা।

তারপর শুরুহোল ত্রি-শক্তির নীরব সম্মেলন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগলাম। অপেক্ষা করতে করতে কখন যে সম্মেলন কক্ষের বাইরেই ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। খুব ভাঙল বাজখাঁই গলার বিকট এক চিৎকার শুনে—

"কিরে ভাবনা! পড়ে পড়ে এখনও ঘুমুচ্ছিস। এদিকে কত কাজ পড়ে আছে!"

চোখ তুলতেই দেখি, নন্দীভৃঙ্গী নয়, পাশে দাঁড়িয়ে আছে অমল আর ঝুনি।

মনে পড়ল একটু পরেই। কাল নবমীর রাতে একটু বেশী পরিমানেই সিদ্ধি খেয়ে ফেলেছিলাম।

[কাহিনীর সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক]

পূজার আগে যেমন সাজে

আভা পাকড়াশী

পুজো তো এসে গেল। এখন থেকেই কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে। দোকানে দোকানে আমাদের ভীড় সেকথাই বলছে। নানান বরণী শাড়ীর বাহারে দোকানগুলি সেজে উঠেছে। ওদের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিয়ে আমরা গায় জড়াবো আর বলব রূপং দেহি, ধনং দেহি। কিন্তু মা দুর্গাকেও তো কল্পনার রূপে আমরা সাজিয়েছি। তাঁরও সাজের উপকরণের তালিকা আমরা মন্ত্রের মধ্যেই পাই। চন্দন, কুঙ্কুম, সপ্তশৈল, নানাবর্ণা, সিঁদুর, পান, সুপারি, কর্পূর, পট্টবস্ত্র. এছাড়া দশভুজার দশটি হাতে দশ প্রহরণ।

এবার আসুন আমরাও মায়ের অনুকরণে সাজবনবার উদ্যোগে লেগে যাই।

কিন্তু শুধু সাজলেই তো হবে না, কেমন করে সাজবেন সেটা আগে থেকে ঠিক করে নিন। সেটা আপনাকে মানাবে আর আপনার প্রয়োজনও মেটাবে তেমন শাড়ীই বাছুন। বেশী দামী শাড়ীর দিকে প্রথমেই না গিয়ে বেশ টেকসই ভাল রংএর যা আপনি প্রায়ই ব্যবহার করতে পারবেন তেমন ধরণের শাড়ীই না হয় আপনি দুটি তিনটি কিনলেন। বেশ রকম-ফের হবে। এবার আসুন ত কমদাম-এর শাড়ীর খুঁতটুকু সেরে নিই। শাড়ীর সঙ্গে রং মিলিয়ে বাছুন ব্লাউজ। কেবা ব্লাউজ যদি নেন—বেশ ভাল করে তাকে ফিট করে নিন। একটু দামী কাপড়ের ব্লাউজ নিন কিংবা লেসের ব্লাউজ পরুন। সাদা লেসের ব্লাউজ প্রায় বেশীর ভাগ শাড়ীর সঙ্গেই খাপ খায়। হাত দুটিতে লাইনিং দেবেন না। যাঁদের স্বাস্থ্য ভাল তাঁরা একটু লম্বা হাতের গলা বড় লেসের ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ী পরুন। শাড়ী যদি পাতলা হয় তবে রং মিলিয়ে তার সঙ্গে পেটিকোট পরুন। হাতে বেশ জমকাল একটি ব্যাগ নিন। পায়ের চটিটিও একটু উজ্জ্বল রংএর জরীদার বেছে নিন। এবার গয়না। আজ কাল অনেক রকম গয়না উঠেছে—সোনার গয়নার চেয়েও তা ভাল মানাবে যদি মানিয়ে পরতে পারেন। কয়েক রকম রংএর কাঁচের চুড়ি কিনে নিন। শাড়ীর সঙ্গে রং মিলিয়ে পরুন। চুড়ির সাথনে সোনার বালাটি পরুন; সুন্দর মানাবে। এছাড়া কানে গলায় যা পরবেন তার একটি হবে বেশ জমকালো। যেমন গলার হারটি যদি বেশ চওড়া পরেন তবে কানে বেশী বড় কিছু পরবেন না আবার কানের দুলটি যদি ঝাড়ের মত বেশ সুন্দর ঝোলা দুল হয় তবে গলায় হাল্কা লম্বা ধরণের কিছু পরুন। রংবেরংএর গোছা করা পুঁতির মালা কিনতে পাওয়া যায় সেগুলি কিনে এনে তার সঙ্গে লকেট লাগিয়ে নিন। সোনার লকেট থাকে ভাল, না থাকে কাঁচের গয়না বা ব্রোচ দুতো

দিয়ে অনায়াসে আটকে নিয়ে সকেট পরতে পারেন। আপনার শাড়ীর সঙ্গে রং মিলিয়ে এগুলি বাছবেন। এবার লিপষ্টিক—কোন শেডএর লিপষ্টিক আপনি নেবেন সেও আপনার শাড়ী বলবে। পুজোর দিনে লোকে সাধারণতঃ একটু বেশীই সাজে সুতরাং এবার আপনি জামায় জুতোয়, ব্যাগে, ঝলমলে গয়নায় আপনার তাঁতের শাড়ীটিকে এমনই ভুলে ধরলেন যে সেখানে হয়ত কাঞ্জিরী সিল্ক বা তাকোয়ী লজ্জায় মুখ লুকোবে। শুধু বেছে দেখে একটু নতুন রংএর শাড়ী কিনুন। আর দেখুন সেটা আপনাকে মানায় কিনা।

ছোট ছেলেমেয়েদের বেলাতেও ঠিক এই কথাই বলি। তারাও ভুলে যায়, ধুলোর পোশাকই তারা বেশীর ভাগ সময় পরে। তাদের জন্য এমন সব জিনিসই কিনুন যেগুলি তাদের কাজে লাগবে কিন্তু পরাবার সময় এমন ভাবে পরান যাতে তারা তা টের না পায়। অথচ সেগুলি তাদের পরবার আগ্রহ বাড়ে। যেমন ধরুন আপনার ছেলের দার্জিটি কিনেছেন ইউনিফর্মের জন্য কিন্তু তার সঙ্গে তাকে একটি ফুলপ্যাণ্ট পরিয়ে দিলেন নয়তো অন্য একটি সাদা হাফপ্যাণ্ট—একটি শীতে অন্যটি যে কোন সময়ের জন্যই দরকারি। ছোট্ট মেয়ে তার জন্য অনেক দাম দিয়ে নাইবা একটা ফ্রক করালেন—সে জায়গায় তাকে দু'তিনটি খুব ভাল ডিজাইনের সুন্দো সুন্দো জামা করিয়ে দিন বা জমকালো ফুল ফুল দেওয়া লেডি মিটন দিয়ের সালোয়ার স্যাবিজ করিয়ে দিন। একটু বড়—এই বছর দশেকের মেয়েকে ঐ সঙ্গে একটি সুন্দর রং-মেলান শিফন বা নেটের দোপাট্টা কিনে দিন। কিম্বা তার সমপরই জামা কাপড়ই রকমফের করে শুছিয়ে দিন। কোনদিন কোনটা পরবেন আর পরাবেন—কখন কোন পোষাকটি বেশী মানানসই হবে সেটি আগে থেকেই ঠিক করে নেবেন।

দামী শাড়ী না কিনেও কি করে তাকে দামী করা যায়। আমাদের অনেকেরই তো পুরনো বেনারসী আছে। সেগুলো না পরার দরুনই হয়ত আর পরার উপযুক্ত নেই তাছাড়া ফ্যাসানও নেই—কিন্তু ওর জরি। অনেক দাম দিয়ে কাপড় কিনেও কি আজকাল আপনারা ঐ রকম চমক পান। আচ্ছা এবার আপনার শাড়ী বার করুন পুরনো শাড়ী তো। হয় ম্যাজেন্টা, নয় বেগুনে কিম্বা লাল, বড়-জোর সবুজ এই সব রংএর বেনারসী তো। আচ্ছা এবার ঠিক ওর সঙ্গে রং মিলিয়ে এক রংএর কাঞ্জিভরম সিল্কের থান কিনুন, শুদ্ধ আঁচলে আঁচল আর পায়ের কুঁচিতে ঐ বেনারসী কাপড় বসান—দেখুন কমপক্ষে শাড়ীটির তিনগুণ দাম বেড়ে যাবে। ঐ একই রংএর সিল্কের ব্লাউজ করুন পিঠে ঐ বেনারসীর একটি বড় ফুল কেটে টেকে দিন নয়তো একটুকরা জরী। রুপালী জরী ম্যাজেন্টা, সবুজ, নীল সবেতেই খুলবে এর সঙ্গে রুপোর গয়না সুন্দর মানাবে। আর সোনালী হলে কোন ঘোর রংএ রং মিশিয়ে লাগান। সঙ্গে কাঁচ পুঁথি সোনা মিলিয়ে একটু জমকালো গয়নায় সাজুন। যাঁদের রুপোর গয়না আছে—তাঁরা তাঁদের পায়ের, কোমরের সব রকম গয়নাই এই বেলা একটু বীঠের জল করে তাতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে সেগুলিকে ব্রাস দিয়ে বেশ করে ঘষে ঘষে পালিশ করে নিন। দেখুন কেমন ঝক্ ঝক্ করে। আর সোনার গয়না; যেগুলো সব সময় ব্যবহার করছেন সেগুলিও পুজোয় পরুন—তবে পরিষ্কার করে নিয়ে একটু কাঁচা হলুদ সামান্য সাবানের গুঁড়ো আর একটু তেঁতুল দিয়ে একটি অ্যালুমিনিয়মের বাসনে বেশ করে ফুটিয়ে নিন তারপর বীঠের জলে ব্রাস দিয়ে ঘষুন, দেখুন একেবারে নতুন গয়না হয়ে যাবে। ময়লা কিন্তু সব বেরিয়ে যাওয়া চাই। পাথর বসানো জিনিস কিন্তু খুব সাবধানে আলতো করে পরিষ্কার করবেন। গরমজলে স্পিরিট দিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে ঘষে ঘষে পুছে নিন। কিন্তু কোন গয়নাই

জল মুছে তুলবেন না তাহলেই আবার পালিশ চলে যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় লাল বা নীল রংএর পাতলা কাগজে মুড়ে রাখলে। পালিশ হবে স্থায়ী হয়। দামী ভাল শাড়ীও কিছু কেচে পরিষ্কার করে রাখুন।

আচ্ছা এবার আসুন একটু শরীর চর্চা করি। পুজোয় লাজতে হলে মুখে রস থাকলে বা খসখসে পায়ের চামড়ায় পাউডার ঘষলে মোটেই সুন্দর দেখাবেনা। এই ক'দিনে মোটা থেকে ইচ্ছে করলে একটু রোগাও হওয়া যায় কিম্বা রোগা থেকে মোটা না হন একটু ভরতে তো পারেন।

যাঁরা মোটা তাঁরা নিজেদের খাদ্য খাবার দিকে একটু নজর দিন। ভাত, মিষ্টি, তেল, ঘি, বেশ কম খান। নিজেদের খাবার পরিমাণও কিছুটা কমিয়ে দিন। মানে প্রথমটা খেতে বসে যেটা খেলেন সেটা তার বেশী আর বাড়তি কিছু নেবেন না। নিজের জন্যে একটু সময় বের করে অন্তত দশ পনের মিনিট একটু ব্যায়াম করুন। মুখের চামড়া তেলতেলে থাকলে দিনে অন্তত তিনবার সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। বাড়ীঘর গোছাতে পরিষ্কার করতে একটু বেশী পরিশ্রম করুন। যাঁরা রোগা, তাঁরা যতটা সময় পাবেন ঘুমিয়ে নেবেন। তেল, ঘি, চর্বি দেওয়া মাংস, কিম্বা ভাত বেশ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে খান। বেশ করে তেল মেখে চান করুন। বাদাম তেল হলেও ক্ষতি নেই। রংএ উজ্জ্বলতা আসবে। বরং সর্ষের তেল মেখে রোদ্দুরে রং কাল হয়। রাত্রে শোবার আগে কোন ক্লিনসিং ক্রিম দিয়ে মুখের সমস্ত মেকআপ তুলে ফেলে শুতে যান। চুলে তাপ্পু দিন। বোধগুলি বেশ সুন্দর ছাঁচে তৈরী করুন।

এবার আসুন ঘর গোছাই। সমস্ত বাড়ীটি ঝুল ঝেড়ে পরিষ্কার করুন। সবচেয়ে ভাল পর্দা বেড় করে কতাগুলি কাচিয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার যে ধরনে সব সাজানো থাকে তার থেকে একটু অদল বদল করুন। পারলে ঘর বদল করুন। যেমন শোবার ঘরটি যদি বড় হয় সেটিকে বসার ঘরে নিয়ে যান। বসার ঘরে বিছানা পাতুন। বেশ করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে হঠাৎ একটা নতুন ঘরে মন্দ লাগবে না। বসার ঘরে দামী দামী বড় বড় সোফা-সেট নাইবা রইল। যা আছে তাই দিয়ে একটা ধারে সাজান—বেশ ভাল একটি কাজকরা বা উজ্জ্বল রংএর টেবিল-ঢাকা মাঝের টেবিলটিতে দিন। তার উপরে হয় একটি ফুলদানিতে কিছু ফুল নয়তো টাটকা পাতার গোছা বা একটি ছুটি পুতুল দিয়ে সাজিয়ে দিন। তাক থাকলে রং মেলান পর্দা দিয়ে ঢাকা দিন, নয় তো সুন্দর করে গোছান। অন্তধারে মাটিতে সতরঞ্চি বা দড়ির ম্যাটেস পেতে তার ওপর পাতলা একটি তোষক পেতে ওপরে মাদুর দিয়ে ঢেকে দিন। দেয়ালের ধারেও মাদুর দাঁড় করিয়ে দিন—ঐ মাদুরে রংএরই কৌচের কভার টেবিল ক্লথ ব্যবহার করতে পারেন। ছোট ছোট জলচৌকি বা পিঁড়ি রাখুন। ইচ্ছে হলে সাদা রং কিনে আলনা দিয়ে নিতে পারেন। এতে করে সাজিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের জলখাবার দিতে পারেন ঐ মাদুরের ওপরে। অনেকেই একসঙ্গে এখানে বসতেও পারবেন। ইচ্ছে হলে একটি তাকের মধ্যে ছোট্ট একটি আলো দিয়ে পুতুল বা ফুল সাজাতে পারেন—বেশ একটা নতুনত্ব আসবে। অনেক মেয়েরা আবার রান্নাঘরেও হানা দেন সুতরাং সেখানেও হাত লাগান। পুরনো অভ্যেস টিন বা আমাজা বাসন রাখবেন না। তাকগুলিতে নতুন করে কাগজ দিন। রঙিন মোটা কাগজ পাতুন, দেখতেও ভাল হবে টেকসই তো হবেই। ছোড়ন মশলা শিশিতে সাজিয়ে রং মিলিয়ে একটি প্লাষ্টিকের থালায় রাখুন। ঘি, চাকরদেরও একটি পরিচ্ছন্নতার কসরৎ দেখান। মানে যেখানের জিনিস

সেখানেই যেন রাখে তারা। গুঁড়ো মশলা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা খোপকাটা মশলার রঙিন বাক্স কিনুন তার সঙ্গে একটি চামচে রাখুন। এতেই ছোটন মশলা সব ধরে যায়। সব হাতের কাছে থাকায় রাঁধতেও সুবিধে হয়। কয়েকটি তালপাতার সুন্দর আসন বা পিঁড়ে রাখুন। কেউ এলে কাছে বসাতে পারবেন। মনে মনে এখন থেকে একটা ছক আঁকুন যে পুজোর কটা দিন কিভাবে কাটাবেন। এখন থেকে সেইভাবে সব কিছু মাস মনটি সর্বদা তৈরী করুন।

রূপ জাগানোর সোনার কাঠি

সুরঞ্জনা সেন

রূপ সে তো এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। ঘুমিয়ে আছে সকলের ভেতরেই। সোনার কাঠির ছোঁয়া পাবার অপেক্ষায়। সে সোনার কাঠি আছে আপনারও হাতে। সে আর কিছুই নয়, রূপ-চর্চার কয়েকটি সহজ নিয়ম, প্রতিদিনের ক'রেকটি সাধারণ অভ্যাস।

রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, সিনেমা-থিয়েটারে, পার্কে, জনসভায় অনেক সুন্দরী মেয়ে আপনার চোখে পড়ে। একটু ভালো ক'রে তাকালেই দেখতে পাবেন তাদের অনেকেরই রূপ বিধাতার দান নয়, নিজেদেরই গড়া।

আপনি নিজেও তাদের মতো রূপবতী হতে পারেন। তবে এর জন্য আপনাকে প্রতিদিন অল্প কিছু সময় নিজের শরীরের দিকে খানিকটা মনোযোগ দিতে হবে। সৌন্দর্য অনেকখানিই প্রতিদিনকার অভ্যাসের ফল। সুন্দর হওয়ার সাধনা মনের পক্ষেও কী কম তৃপ্তিকর!

যে-সব মেয়েদের দিনরাত সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তারাও সৌন্দর্য চর্চার জন্য কিছু সময় রাখতে পারেন। এতে তারা লাভবানই হবেন। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা যেমন নিজের ও অন্যের তৃপ্তিকর কারণ, সৌন্দর্যও তাই।

নিয়মিত চুল বাঁধা, নখ পরিষ্কার রাখা সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্য দুয়ের পক্ষেই জরুরী। এই সব দরকারী অভ্যাসের প্রতি উদাসীন হ'লে ফল খুবই খারাপ হয়। নিজের অপরিচ্ছন্নতা এবং অগোছালো বেশভূষার জন্য নিজেকে অকারণে অন্যের চাইতে ছোট মনে হয়। গৃহিনীপনা শুধু সংসারের পক্ষেই দরকারী নয়, সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্য-চর্চার পক্ষেও। রূপ-চর্চার খাতে প্রতিদিন অন্তত ক'য়েক মিনিট সময় দিন।

প্রতিদিন ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কয়েকবার পা দুটো বুকের কাছে এনে আবার ছড়িয়ে দিন। সকালের খাবার খাওয়ার আগে রোজ লেবুর রস মেশানো এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা সামান্য গরম জল খেয়ে নেবেন। এতে শুধু যে পেট পরিষ্কার হবে তা নয়, রংও ফর্সা হবে।

স্নানের সময় পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে সমস্ত শরীর ভালো ক'রে রগড়ে নেবেন। এতে দেহে রক্ত সঞ্চালনের কাজ ভালো হবে।

অন্তত মিনিট চার পাঁচ ধ'রে চুল আঁচড়াবেন। এতে চুল শুধু পরিষ্কার হবে না, বাড়বেও। তারপর নিজের পছন্দ মতো কেশবিন্যাস করুন।

স্নানের পরে আলতো ক'রে মুখে একটু পাউডার আর ঠোঁটে লিপস্টিক দিন। দেখবেন যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়।

আপনি যদি চাকুরে মেয়ে হন তবে বাড়ি থেকে কাজে বেরুবার আগে আপনার হাত-ব্যাগে রুমাল ইত্যাদি জিনিস-পত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। সারাদিন বাইরে থাকার সময় যে টুকিটাকি জিনিস দরকার সেগুলি ঠিক আছে তো? এই সেলো সকালের ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা দিনে ব্যবহার করা জামাকাপড় ছেড়ে অন্য জামাকাপড় পরুন। পারলে বিকেলেও একবার স্নান করে নেবেন। অন্তত হাত-মুখ ধোয়া এবং ভেজা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফেলা তো একান্ত প্রয়োজন। সকালে মুখে যে পাউডার-স্নো মেখেছিলেন সন্ধ্যাবেলা তা ভেজা তোয়ালে দিয়ে রগড়ে তুলে ফেলুন। আপনার মুখ যদি স্বাভাবিক রুক্ষ হয় তবে একটু স্নো কিংবা ক্রিম লাগান। এবং হাতেও লাগান। বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ বন্ধ ক'রে অন্তত কুড়িবার বড়ো বড়ো ক'রে নিঃশ্বাস নিন। বিছানায় শুয়ে হাত-পা টান ক'রে ছড়িয়ে দিন, বেশ আয়েস মতো। ভালো ঘুম হবেই। আর ঘুম যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য কতখানি দরকার তা বলাই বাহুল্য।

সব সময়ে গাড়ীতে বা ট্রামে-বাসে না উঠে একটু হাঁটা-চলার অভ্যাস রাখুন। ফুর্তিলোর বাজার সন্দেহ নেই, তবু মাছ, ডিম, দুধ, ফল একেবারেই না খেলে শরীর ও সৌন্দর্য রক্ষা করা খুবই কঠিন।

রান্নাঘরে কিংবা স্নানের ঘরে একটা ক্রিম রেখে দেবেন। প্রতিবার হাত ধোবার পরে হাতে একটু ক্রিম লাগাবেন।

নিয়মগুলি খুবই সাধারণ। কিন্তু জেনে রাখুন এই নিয়মগুলিই হলো রূপ আগানোর সোনার কাঠি।

• • • •

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ···একটি বোটে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছেন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অধ্যাপক চার্লস লাটউইজ ডজসন, আর সেই বোটেই চলেছে ঐ কলেজের ডীন হেনরী জর্জ লিডেলের শিশুকন্যাগুলি।

ছোট মেয়েরা গল্প শুনতে চায়, নীরস অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক তাদের একটি গল্প বললেন। পরে সেই কাহিনী দুটি বইয়ে প্রকাশিত হোল, বিশ্বের সাহিত্যরসিক মহলে দারুণ আলোড়ন উত্তেজনা, কে এই লিউইস ক্যারল—আজব দেশে এ্যালিসের স্রষ্টা!

ডজসন অস্বীকার করলেন এ্যালিসের অপরূপ কাহিনীর স্রষ্টা বলে পরিচিত হতে, জানালেন লিউইস ক্যারলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তিনি গুরুগম্ভীর অঙ্কের বইগুলির লেখক বলে পরিচিত হতে চান।

মানুষ যে কী তা কি সে নিজেই কোনদিন জানতে পারে! এ্যালিস আজ বিশ্বের ঘরে ঘরে, কিন্তু সে অঙ্কের বইগুলি আজ কোথায়।

ভাববার কথা

গিরিশ ও বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্দ্ধসমাধিত অবস্থায় একদিন মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে বলেন—"জীবে দয়া ক'রবার আমাদের শক্তি কৈ? শিবজ্ঞানে জীব সেবাই ধর্ম্ম।"

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"আজ একটা নূতন আলোক পাইলাম। যদি কখনও দিন পাই, এই সত্য কার্য্যে পরিণত করিব।"

ইহাই নরেন্দ্রনাথের জীব সেবাধর্ম্মের বীজমন্ত্র স্বরূপ হয়। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে একদিন বসুপাড়ার বলরাম মন্দিরে কয়েকজন গৃহী এবং সন্ন্যাসী যুবকগণকে স্বামীজী বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন।

সেই সময় গিরিশচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলেন—"নরেন, বেদ-বেদান্ত নিয়ে কি বকাবকি ক'রছ, সংসারের দুঃখটা একবার ভেবে দেখেছ কি? বাপ ক্ষুধিত ছেলেকে অন্ন দিতে পারে না, অসুখে কত হতভাগ্য ঔষধ পথ্য পায় না, শীতে কাঁপে, গায়ের কাপড় জোটে না; সতীর ধর্ম্ম নষ্ট, শুণ্ডার অত্যাচার! এই সব দুঃখের প্রতিকার তোমার বেদে আছে কি?"

শুনিতে শুনিতে স্বামীজি সহসা উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন —"তাইত জি. সি. কি উপায় হয়? কি উপায় করি? এত দুঃখ, এত কষ্ট?"

বলিয়া স্বার্থশূন্য সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্র উপস্থিত যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই জন্যই তোদের স্বামীজিকে এত মানি, আদর্শ সন্ন্যাসী ব'লে নয়, অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, লেকচার দিতে পারে ব'লে নয়, পরের দুঃখ অন্তরে অন্তরে এমনি ক'রে বোধ করে বলে। দয়া ভিন্ন আবার ধর্ম্ম কোথায়?"

এই বিরাট প্রাণই ছিল স্বামীজির নরসেবার পশ্চাতে।

স্বামীজি পরে বলিলেন—"জি. সি. যদি জগতের দুঃখ দূর করতে হাজার জন্মও নিতে হয়, তাতে কারও যদি এতটুকু দুঃখও দূর হয়, তাও শ্রেয়ঃ। ব্যক্তিগত মুক্তি দিয়ে কি হবে?"

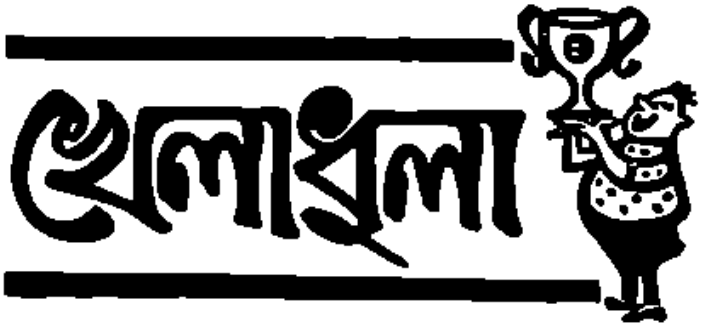

স্পোর্টস্ পরিষদের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি নিখিল ভারত স্পোর্টস পরিষদের সভায় আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারতীয় হকি টীমের ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য খরচ মঞ্জুর করা হয়।

ভারতীয় হকি টীমে ১৮ জন খেলোয়াড়, একজন কোচ ও একজন ম্যানেজার দলভুক্ত হবেন।

ভারতীয় হকি টীম বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইতালী এবং সংযুক্ত আরব রাজ্য ভ্রমণ করবে।

ভারতীয় হকি ফেডারেশনের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। স্পোর্টস পরিষদ তা মঞ্জুর করেছে এবং পাকিস্তান হকি টীমকে আমন্ত্রণ করার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছে।

আই. এফ. এ. শীল্ড,

এ বছর আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৭১টি ক্লাব যোগদান করবে। এই ৭১টি দলের মধ্যে বাইরে থেকে আসবে ১৮টি। তাদের মধ্যে আছে বোম্বাইয়ের দুটি দল মহিলাদ্ গ্রুপ অব মিলস্ এবং ইণ্ডিয়া নেভী; ওয়েলিংটনের মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার; কেরল ফুটবল এসোসিয়েশন; এলাহাবাদের ইয়ং টারস্ ক্লাব; বিহারের জামসেদপুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং বিহার মিলিটারী পুলিশ; দিল্লির ফুটবল এসোসিয়েশন একাদশ; মেরাদুনের ফুবিল্যাণ্ট জ্যোতি ক্লাব; মায়মানসিংহের কোর অব সিগন্যালস্ (সোয়া), বিকানীরের বর্ডার্স রেলওয়ে; মহীশূরের বাঙ্গালোর ডিস্ট্রীক্ট কমিটিজ; আসামের শিলং স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন; হায়দ্রাবাদের হায়দ্রাবাদ একাদশ, কটকের কটক সম্মিলিত দল এবং বিশাখাপট্টনমের সোলার স্টার এ. সি.

কলিকাতার ফুটবল খেলার সর্বাধিক গোলদাতার
(১৯২০ হইতে ১৯৬৫ ইং) গত ৪৫ বৎসরের তালিকা :—

সাল	খেলোয়াড়ের নাম	ক্লাবের নাম	গোলের সংখ্যা
১৯২০	গেলব্রেথ	কাস্টমস্	১৪
১৯২১	নাইট	কামেরন	১২
১৯২২	,,	,,	১৪
১৯২৩	জেফিল	সাউথ ওয়েলস্ বর্ডার্স	১২
১৯২৪	টেলর	কামেরন	১২
১৯২৫	বেল	ডালহৌসী	১৩

১৯২৬	ঈল	নর্থ স্টাফোর্ড	২২
১৯২৭	,,	,,	১৮
১৯২৮	এণ্ড্রুজ	ডি, সি, এল, আই	১৯
১৯২৯	,,	,,	১৫
১৯৩১	এভারটন	ডারহামস্	১২
১৯৩২	ওয়াইজিং	,,	২০
১৯৩৩	সিম্যান	কাস্টমস্	২০
১৯৩৪	ইয়ং	কে, আর, আর	১৭
১৯৩৫	রসিদ	মহমেডান	১৪
১৯৩৬	ক্যাম্প	এসেক্স রেজিমেণ্ট	১৪
১৯৩৭	মামুদ	ভবানীপুর	১৭
১৯৩৮	রহিম	মহমেডান	১৮
১৯৩৯	নিমু মজুমদার	ই, বি, আর	১৭
১৯৪০	লায়সডেন	রেঞ্জার্স	২৩
১৯৪১	লোমাস	ইষ্টবেঙ্গল	২৪
১৯৪২	,,	,,	২৬
১৯৪৩	বিমল কর	বি, এন, আর	২২
১৯৪৪	,,	,,	২০
১৯৪৫	পানস্‌লে	ইষ্টবেঙ্গল	২১
১৯৪৬	নায়ার	,,	৩৫
১৯৪৮	বচন	মহমেডান	২১
১৯৪৯	মেওয়ালাল	রেলওয়ে স্পোর্টস	৩২
১৯৫০	ধনরাজ	ইষ্টবেঙ্গল	১৮
১৯৫১	মেওয়ালাল, ডি, ঘোষ	বি, এন, আর	১৮
১৯৫২	কৃষ্ণপাল	ভবানীপুর	১৪
১৯৫৪	মেওয়ালাল	রেলওয়ে স্পোর্টস্	১৯
১৯৫৫	আহিদ	মহমেডান	১৩
১৯৫৬	,,	,,	২৪
১৯৫৭	রামোদরন	রাজস্থান	১৯
১৯৫৮	মেওয়ালাল	বি, এন্ আর	১৬
১৯৫৯	আয়ালারাজু	,,	২৪
১৯৬০	,,	,,	১৬
১৯৬১	বলরাম	ইষ্টবেঙ্গল	২৩
১৯৬২	মধল পুরকায়স্থ, চুনী গোস্বামী	মোহনবাগান	১৩
১৯৬৩	অসীম মৌলিক	ইষ্টবেঙ্গল	১৮
১৯৬৪	,,	,,	২১
১৯৬৫	অশোক চ্যাটার্জি	মোহনবাগান	১৫

বিশ্বক্রীড়া সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়া—

অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রীড়াবিদ ২১ বৎসর বয়স্ক কুমারী ভিক্টোরিয়ান তাঁর দেশের মোটর গাড়ী দুইবার উল্টাইবার পর মারা গিয়েছেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠিত প্রায় সবগুলি মোটর রেসে বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি এই মাসেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাবার আয়োজন করছিলেন।

মেক্সিকো—

মেক্সিকোর অলিম্পিক কমিটির সর্ব্বাধ্যক্ষ বিশাস্ রোরেস জানিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়ার নিয়মানুসারে যে খেলা ২৫টি দেশে অনুষ্ঠিত হয় না তা অলিম্পিক ক্রীড়ার পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই নিয়মানুসারে মেক্সিকোতে বেস বল খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

কেনাডা—

কেনাডার জাতীয় হকি লীগের সভাপতি ক্লেরেন্স ক্যাম্বেল জাতীয় হকির উন্নতির জন্য ক্লাবগুলিকে বিশেষ তৎপর হতে বলেছেন এবং প্রয়োজন হলে ইউরোপ থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করার পরামর্শও দিয়েছেন।

ডেভিস কাপ—

ডেনমার্কের মোয়ারগেন ও টরবেন উলরিক ভ্রাতৃদ্বয় ডেভিস কাপ টেনিস খেলায় একই পরিবার থেকে এসে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

সুইজারল্যাণ্ড—

গত সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত এরিক জোনাসকে প্রেসিডেন্ট এভারি ব্রুণ্ডেজ কার্য্যের অনুপযুক্ত বলে অপসারিত করেছেন।

চিলি—

আন্তর্জাতিক ফি কেডারেশন ১৯৬৬ সালে বরফের খেলা স্কির উপযুক্ত স্থান "পরটিলো"কে নির্বাচন করেছেন।

ফ্রান্স—

স্কুলের ছেলেদের খেলার উন্নতির জন্য ফরাসী মন্ত্রীসভা পাঁচ বছরের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে সাঁতার, এথলেটিকস ও ফুটবলের উন্নতির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ভারতবর্ষ—

ভারতের রেলমন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল রেলওয়ের খেলোয়াড় কর্মিবৃন্দ ২৩টি জাতীয় উপাধি লাভ করায় উল্লসিত হয়ে বলেছেন, "ভাল খেলোয়াড়রাই ভাল রেল কর্মী হয়।" টোকিওতে অলিম্পিক হকি খেলায় ভারত যে স্বর্ণ পদক পায় তাতে রেল কর্মিবৃন্দই ২০টি গোল দেন এবং অলিম্পিক দলের ভিতর ভারতের রেলওয়ে কর্মী ১১ জন ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হচ্ছি ডি'সুজা। তিনি জাতীয় ক্রীড়ায় তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্মানের অধিকারী এবং সরকার প্রদত্ত খেলার উচ্চতম সম্মান "অর্জ্জুন" পুরস্কারের অধিকারী।

বিচিত্রা

জীবনের সুখ কি বিবাহে ?

বিদেশে জীবনের নানা সমস্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। এসব প্রশ্নের উত্তর পেলে একটা জাতির মনোভাবের ছবি পাওয়া যায়। "সুখী জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে পুরুষের বিবাহ অবশ্য কর্তব্য এতে কি আপনি বিশ্বাস করেন ?"—এই প্রশ্নটি তুলে জার্মানীতে সম্প্রতি জনমত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই একই প্রশ্ন কয়েক বছর পূর্বেও করা হয়েছিল কিন্তু তখনকার জনমতের সঙ্গে এবারের জনমতের পার্থক্যে সকলেই বেশ বিস্মিত হয়েছেন। সেদিন বিবাহের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিল শতকরা ৫৫ জন পুরুষ কিন্তু আজ তার স্বপক্ষে সায় দিয়েছে মাত্র শতকরা ৪৯ জন।

মেয়েদের কাছ থেকেও বিবাহ সম্বন্ধে মতামত জানা হয়েছে। সাবালিকা কুমারী মেয়েদের শতকরা ৪৩ জন জানিয়েছে যে একমাত্র বিবাহ করাই যে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম একথা তারা মানে না। শতকরা ৪০ জন মেয়েদের মতে "বিবাহ" ও "সুখী জীবন" একসূত্রে জড়িত। শতকরা ১৬ জন মেয়েদের কাছ থেকে 'হাঁ' বা 'না' কোন জবাব পাওয়া যায়নি। হয়তো তারা এখনও তাদের "মনের মানুষের" খোঁজ পায়নি।

বিবাহ সম্বন্ধে পরিসংখ্যানবিদ্‌রা আরও অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। ঐসব তথ্য থেকে জানা যায় যে পশ্চিম জার্মানীতে সাবালক ও সাবালিকা জার্মানদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন বিবাহিত, শতকরা ২৫ জনের কম অবিবাহিত ও বাকিরা হয় স্বামী বা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। বছরে বছরে অল্প বয়সে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯১০ সালের হিসাবে ১০০ জনের মধ্যে ১৩ জন সারাজীবন বিবাহ না করে কাটিয়ে দিত আজ তার সংখ্যা মাত্র শতকরা সাড়ে তিনজন।

পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে অকৃতদার পুরুষের সংখ্যা প্রায় তিরিশ লক্ষ। বিবাহের বিপক্ষে এদের নানান যুক্তি যেমন অনেকের মতে ওঠাবসায় আপত্তি, আরেকজনের ঝুঁকি নেবার ভয়, কাজের চাপে, দারিদ্রের ভয়, পরাজয়ের মনোবৃত্তি। পশ্চিম জার্মানীর লক্ষাধিক অবিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা আরও করুণ। তাদের সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী দুই মহাযুদ্ধের বলি হিসেবে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। বিবাহ না করলে পুরুষদের কেউ কিছু বলেনা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নাম হয় "আইবুড়ি"।

• • • •

গাড়িচালকের কেরামতি

যে মোটরগাড়ির চালক পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডীকে পশ্চিম জার্মানীর সব শহর ঘুরিয়েছিল. চার চারজন রাণী যার হাতে তাঁদের জীবন সমর্পণ করেছেন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট চার্লস দ' গল যার একজন 'নিয়মিত যাত্রী' সে হ'ল সুবিখ্যাত ডেমলার বেঞ্জ মোটরগাড়ি কোম্পানীর 'মহামান্য অতিথিদের চালক' অটো লেনিকা। গত দশবছরে ঘনের বৈদেশিক দপ্তর থেকে যখনই ডাক এসেছে, দেশের কাছে সে তখনই আনন্দে এগিয়ে এসেছে।

সেকালে সম্রাট সম্রাজ্ঞী, রাজা মহারাজারা ছ'ঘোড়া আটঘোড়ার টানা গাড়ীতে ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু তার স্থান দখল করেছে বন্ধুরকে একখানা মোটরগাড়ী। রাষ্ট্র এলিজাবেথ তাঁর প্রথম পশ্চিম জার্মানী সফরে ব্যবহার করবেন একটা শক্তিশালী মেদেডিস ৬০০। এই গাড়ীর চালক অটো লেনিকা এর বাড়িনক্সর সং জ্ঞানে কারণে এর অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্য একে এক বিশেষ কায়দায় চালাতে হয়। এটি হবে তার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা; এবার নিয়ে সে পৃথিবীর পঞ্চাশজন মহামান্য অতিথিকে সারা পশ্চিম জার্মানী ঘুরিয়ে এনেছে কিন্তু কোথাও কখনও সামান্যতম দুর্ঘটনা ঘটেনি।

পশ্চিম জার্মানীতে অটো লেনিকা একমাত্র বেসরকারী মোটরচালক যাকে শহরের জনাকীর্ণ পথেও ঘণ্টায় ৮৪ মাইল বেগে গাড়ী চালাবার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একমাত্র পুলিশ, দমকল ও অগ্নিনির্বাপক বিভাগের এই অধিকার আছে।

অটো লেনিকা একজন সুদক্ষ চালক তো বটেই, তাছাড়া সময়ানুবর্তিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান তার অপরাপর গুণ। শুধু কি এই অটো লেনিকা একজন চৌকস ভাষাবিদ্, যাত্র অতিথিরা তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাইলে সে চোস্ত ফরাসী, ইংরাজী, ইতালীয় ও স্পেনিশ ভাষায় অনর্গল তাঁদের সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে।

বাপমায়ের ভাবনার অন্ত নেই

বীটল্‌সের স্টাইলে চুল ছাঁটা, কদ্দমলা সোয়েটার ও জলনলা নীল প্যাণ্টপরা বছর পনের বয়সের এক স্কুলের ছাত্র স্কুলের মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার হোয়েরমানকে একদিন বলে ফেলে যে বাড়িতে মা-বাপের বকুনির চোটে সে আর সেখানে টিকতে পারছে না। মনোবিজ্ঞানী বোঝেন যে বাড়ীর সেই অসুস্থ পরিবেশের কথা ছেলেটি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। ছেলেটির কাছ থেকে তার বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে মনোবিজ্ঞানী তার মা বাপকে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন। উদ্দেশ্য যে তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন যে প্রায় সাবালক ছেলেরা যারা এই ছেলেটির মতন স্পর্শকাতর, তারা জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে বাড়িতে স্নেহ মমতা চায়, চায় মা-বাপের মধ্যে প্রীতির মনোভাব।

ছাত্রাবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ যে উপকারী এটা এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছেন। মিউনিখের প্রত্যেক স্কুলে এখন তাই একজন শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ছয় থেকে সাতহাজার ছাত্রছাত্রী মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ পায়। মনোবিজ্ঞানীদের কাজও নানারকমের, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সাহায্য করা, অপরাধ প্রবণতার মূল খোঁজা ছেলেমেয়েদের মনোগত অভিপ্রায়, পটুতা, ঝোঁক ও বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে পেশা ঠিক, এরকম অনেক কাজ তাদের করতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের আচরণের প্রতি তাদের নজর রাখতে হয় ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রত্যেক ১৩ থেকে ১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা চিঠি লিখে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বলেন যাতে তারা তাদের সমস্যা নিয়ে মুখোমুখী আলোচনা করতে পারে। আশ্চর্যের কথা প্রচুর ছেলেমেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এতে সাড়া দেয়।

শুধু ছেলেমেয়েরা আসে না, তাদের মা-বাপেরাও আসেন কেউ পরামর্শ নিতে, কেউ অভিযোগ জানাতে, কেউ ছেলেমেয়েদের সঠিক পেশা স্থির করার সাহায্য নিতে। শেষেরটাই

প্রধান কারণ অনেক ছেলেমেয়ে মা-বাপের কথায় কোন বিষয় পড়তে এসে খুশিমনে করতে পারে না। তখন তারা মরীয়া হয়ে ওঠে, মা-বাপের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বদমায়েসদের দলে ভিড়ে যায়।

মেয়েদের নিয়েও মা-বাপের সমস্যার অন্ত নেই; কোন কুমারী মেয়ে সন্তানের মা হতে চলেছে, কোন মেয়ে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে, এমনি সব সমস্যা। মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত এসব ব্যাপারে উপদেশ দেন, পথের সন্ধান দেন। খোলাখুলি কথাবার্তায় আশ্চর্য কাজ হয়। এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক এবং সেটা আছে বলেই অগুন্তি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা প্রতি বছর মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিতে আসছে।

এই বিজ্ঞানের যুগে.....

শিশুদের কাছে সব ছাপিয়ে খেলনার আকর্ষণ তীব্র; খেলনা পেলে তারা আর কিছুই চায় না। আর সেগুলো যদি আসলের মত দেখতে হয়তো কথাই নেই। শিশুমনের এই মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ হামুর্গের একটি বিরাট খেলনার দোকান তাদের রকমারি খেলনাকে আরও আকর্ষণীয় ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে দোকানের সামনে খড় দিয়ে ভর্তি বড় বড় ঘোড়া, উট, হাতি প্রভৃতির মূর্তি সাজিয়ে রেখেছিল। বুঝতেই পারছেন আসলের মত সেইসব জানোয়ার দেখে শিশুদের কি মনের অবস্থা! শিশুমনের সেই আকুলতা পূরণের ব্যবস্থাও দোকান কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। একজন শিক্ষিতা নার্সের তত্ত্বাবধানে তারা ছেলেমেয়েদের সেইসব হাতি, ঘোড়া উটের পিঠে চড়ার ব্যবস্থাও অনুষ্ঠিত করেছিলেন। শিশুমহলে সেই খবরটা জাহির হয়ে গেল, অমনি দলে দলে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার সঙ্গে সেই দোকানে এসে হাজির। খেলনা তো তারা কিনলেই, সেই সঙ্গে কেউবা হাতি, কেউবা উট বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার সাধ মিটিয়ে নিল। দোকানেরও লাভ হ'ল যথেষ্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে খেলনার কাটতি আশাতীত বেড়ে গেছে।

"টকরাইটার" এর নাম কখনও শুনেছেন কি?

দুনিয়ায় কত তাজ্জব ব্যাপারই না ঘটছে। টাইপরাইটারে চাবি টিপে লেখা হয় কিন্তু কথা বললেন আর যন্ত্রে লেখা হয়ে গেল এমনি এক যন্ত্র বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীরা সম্প্রতি তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে "টকরাইটার"। তবে এখনও এই "বৈদ্যুতিক বাক্য লিখন" যন্ত্র পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি কারণ এটি এখন পর্যন্ত কেবল সংখ্যা বুঝতে পারে; কথা বুঝতে পারে না। কোন সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রে সেই আলোকিত সংখ্যা ফুটে ওঠে ও তার সঙ্গে সংযুক্ত টাইপরাইটার অথবা হিসাবযন্ত্রে ছাপা হয়ে যায়। যন্ত্রটি তৈরী করেছেন পশ্চিম জার্মানীর একটি বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

॥ এবারের শারদীয়ার নূতন বই ॥

নবেন্দু ঘোষের নূতন উপন্যাস

কায়াহীনের কাহিনী ৪৷৷০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন উপন্যাস

স্বপ্নতনু ৪৷৷০

বিমল করের নূতন উপন্যাস

পরবাস ৪৷৷০

বাণী রায়ের নূতন উপন্যাস

সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের নূতন উপন্যাস

প্রথম তারার আলো ১০৲

সৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস

নূপুরের মতো ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শ্রাবণী ৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিন সঙ্গিনী ৩৷৷০

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গীতের আসরে ৭৷৷০

[ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সাধকদের জীবনসাধনা]

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

অবতার-সঙ্গিনী ২৲

[মহামানবদের জীবন-সঙ্গিনীদের জীবনকথা]

কালীবর বেদান্তবাগীশের

বেদান্ত-সংস্কারবলী ৩৲

[ডাঃ রামেন্দ্র অধিকারী সম্পাদিত]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এক অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

গল্পাবেগম ৮৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !!

সমস্যা নয় সমাধান !!!

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে। এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।

মূল্য : ৪·৭৫ নয়া পয়সা

প্রকাশক :

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :

৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫—৬৮২৭

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

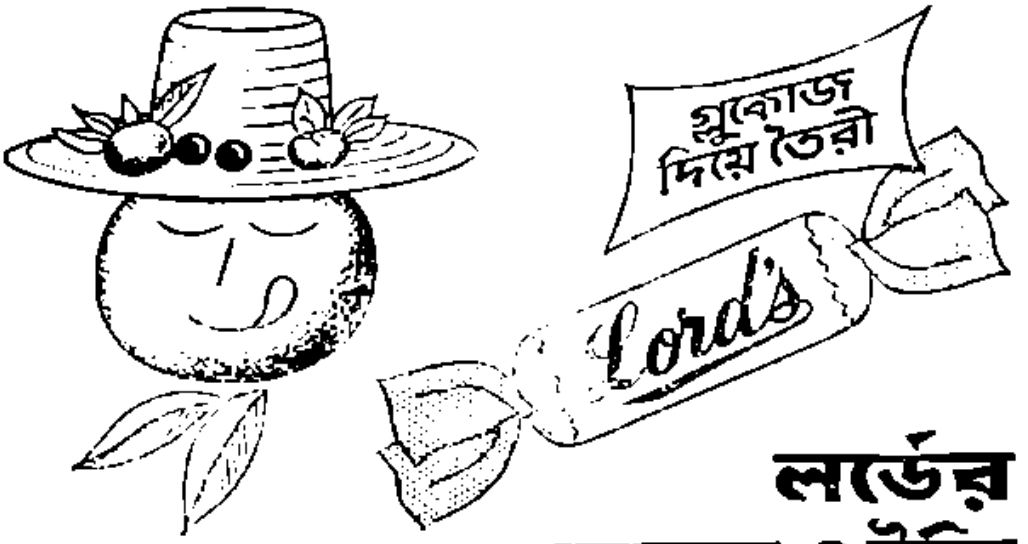

লর্ডের
লজেন্স ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

অভিধান সিরিজ

SAMSAD
ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি-বাঙ্গালা অভিধান। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় শব্দের উচ্চারণ-সঙ্কেত ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। সর্বস্তরবিধারী ব্যক্তিদের উপযোগী শব্দকোষ। [টাঃ ১২-৫০]

SAMSAD LITTLE
ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত অহরহ ব্যবহারের উপযোগী একটি সহজ বহনীয় শব্দকোষ। বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস-কর্মীদের একান্ত উপযোগী। [টাঃ ৭-৫০]

সংসদ
বাঙ্গালা অভিধান

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত বাঙ্গালা অভিধান। শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। [টাঃ ৮-৫০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মনে রাখবেন

ছোট পরিবার মানেই সুখী পরিবার

ছেলেমেয়েদের জন্য চাই শিক্ষা, উপযুক্ত আহার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেজন্য অভিজ্ঞ বাবা-মায়েরা তাঁদের নাগাল পাওয়ার মত ক্ষমতা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতে চান।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনেকটি উপায় আছে, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন ও উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে 'লুপ'—যা বছরের পর বছর ধরে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে ব্যবহার করা যায়। এ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

এই সম্পর্কে জানতে হলে আপনার নিকটতম **কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কেন্দ্রে** গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শারদীয়
গল্প-ভারতী

আশ্বিন, ১৩৭২

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :

শ্রীকালিদাস নাগ

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য চার টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

এই সংখ্যায়

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা	—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	৩
শারদীয়া মহাপূজা	—শ্রীবিজপদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী	৫
মা জয়ন্তীর যুগোচিত সাধনা	—শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য	৮
আগমনী	—ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য	১০
আগমনী (গান ও স্বরলিপি)	—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
আসল নকল	—শ্রীবিমল মিত্র	১৭
মৃগমদ (উপন্যাস)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৪
অমৃত-কথা	—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৮৯
বাসনা	—শ্রীসুবোধ বসু	৯৯
স্কচ	—শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়	১০৯
রূপকথার মতো	—শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত	১১৫
গ্রন্থি	—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১২৯
অশ্বত্থামা	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	১৪০
হারজিৎ	—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি	১৪৫
অচির বসন্ত	—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত	১৫১

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রাম দুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

শাখা

২৮; যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

৫, ৬ হেয়ার স্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯৯

১৪, হেয়ার স্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

এই সংখ্যায়

ছায়া পূর্বগামিনী	—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৭
কান্নাহাসির দোলা	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৯
(চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)		
সম্রাজ্ঞী	—শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত	১৭৫
খেলাঘর	—শ্রীমতী আশা দেবী	১৭৯
গোলাপের যুদ্ধ (উপন্যাস)	—শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী	১৮৫
কনে-বৌ (বড়গল্প)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	২২১
লোকাতীত সভ্যতা সন্ধানে	—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়	২৩৩
কান্না	—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	২৪১
বৌদি	—শ্রীআনন্দকিশোর মুন্সী	২৪৭
অনাত্মীয়	—শ্রীমানবেন্দ্র পাল	২৫৫
এক সম্রাট দুই সম্রাজ্ঞী	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	২৬৩
মাতাহারির মেয়ে (গুপ্তচর কাহিনী)	—শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	২৬৯
অংশুরীয়	—শ্রীরমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৭
জলের ঘরে	—শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	২৮৫
শরত তপনে প্রভাত স্বপনে	—শ্রীমতী বাণী রায়	২৯৫
আত্মশক্তির পথে	—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৩০১
নিরুপমার বিয়ে	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৩০৫
জীবন-যন্ত্রণা (নাটক)	—শ্রীশৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩১১
কৃষ্ণপক্ষ	—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	৩২৬
পূজোর দিনক'টি	—শ্রীমতী আভা পাকড়াশী	৩৩৫
পরাশর বর্মার আদিপর্ব (উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৩৯
পরিপূরক	—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৭৫
দামী মোটর	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮১
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৩৮৬

—বিশ্ব চলচ্চিত্র— (সচিত্র সংযোজন)

চলচ্চিত্র (ভূমিকা)		২
ভারতীয় চলচ্চিত্র	—সেবাব্রতী	৩
জার্মানীর চলচ্চিত্র	—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭
সোভিয়েট ছায়াছবি	—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	১১
হলিউডের সমস্যা	—শ্রীবিনয় ঘোষ	১৪
ওয়াল্ট ডিজ্‌নে	—শ্রীসুপর্ণ রায়	১৯
বৃটিশ চলচ্চিত্র	—শ্রীগোপাল ভৌমিক	২২
জাপানি চরিত্র ও চলচ্চিত্র	—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক	২৪
সোভিয়েট দেশের চলচ্চিত্র—(ইতালি)	—শ্রীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
ফরাসি চলচ্চিত্র	—শ্রীমতী উমা দেবী	২৮

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশতৈল

বর্ণ ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

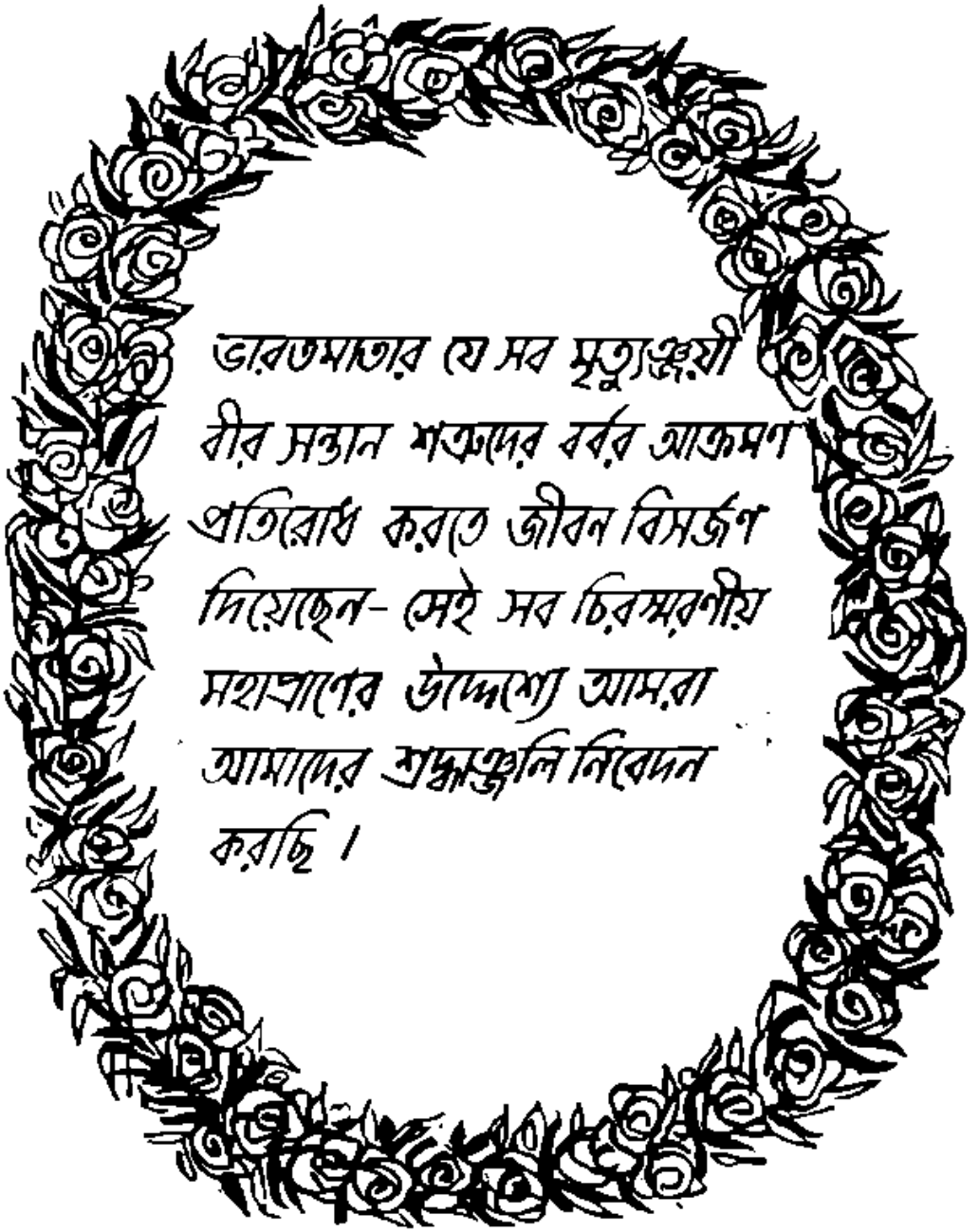
ভারতমাতার যে সব মৃত্যুঞ্জয়ী
বীর সন্তান শত্রুদের বর্বর আক্রমণ
প্রতিরোধ করতে জীবন বিসর্জন
দিয়েছেন- সেই সব চিরস্মরণীয়
মহাপ্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন
করছি।

আকাশে বাতাসে একি কলরব
একি জয়গান ভুবন ঘিরে

এই জয়গান শারদীয় উৎসবে—

আর ঘরে ঘরে এই উৎসবকে
মুখর করে তুলবে
আমাদের রেশমী সুতোর বর্ণোজ্জ্বল
শাড়ী—বিচিত্র, অভিনব, অনুপম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক করতে হলে

চাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্লক !

যেখানে সেখানে তা হয় না
ব্লক অনেকেই করেন
তবে তার চরম উৎকর্ষ
নির্ভর করে
অভিজ্ঞতা ও শিল্পচাতুর্যের
সমন্বয়ের উপর

আমাদের গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী

ক্যালকাটা ফটো এনগ্রেভিং কোং

সর্বপ্রকার হাফটোন ও লাইন ব্লক প্রস্তুতকারক

১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ফোন : ২৪-৫০১২

মিঠি
দীপক
অম্বা

গেঞ্জি দেখতেও সুন্দর
পরেও আরাম

*

প্রকাশ নিটিং এণ্ড হোসিয়ারী মিলস্

ফ্যাক্টরী :—৩৪ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অফিস :—২৪৯ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪—৩৭৭০

राक्षसावतारम्

[illegible] १९१२

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ়
মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব
গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।
এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য
সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ
শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥

--শ্রীশ্রীচণ্ডী

গল্প-ভারতী

দুর্গতিনাশিনী-দুর্গা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুবাদ

মা তুমি এস আজ এই দুর্গতির মধ্যে। তোমার শুভ আগমনে সকল দুর্গতির অবসান হউক। আজ অন্ন পর্য্যাপ্ত নহে, বস্ত্র দুর্মূল্য, মনুষ্যের সাধারণ্য বড় তাই আজ দুর্লভ। যে ভারতে একদিন দারিদ্র্যই ছিল গৌরবের বস্তু, ত্যাগ-সংযম ছিল জীবনের সাধনা, স্বেচ্ছায় ভোগবর্জ্জন ছিল একান্ত কাম্য, আজ দেখিতেছি—সমাজের চতুর্দ্দিকে ভোগবিলাসের জন্য মানুষ উন্মত্তপ্রায়, দারিদ্র্যের নামে মানবের চিত্ত হয় চঞ্চল, ত্যাগের কথায় সংযমের উপদেশে মানব বিরক্ত হয়। ভারতীয় আদর্শের প্রতি আজ আর কাহারও শ্রদ্ধা নাই।

উদাত্তস্বরে ঋষিকণ্ঠে একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল—যে শাশ্বত বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্—ত্যাগের সহিত ভোগ কর—পরধনে লোভ করিও না।" সেই শাশ্বত বাণীকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে—বিপরীত পথে ধাবিত হইয়াছে—তাহাদের শিক্ষার জন্য মা আমার দুর্গতির রূপ ধারণ করিয়া আসেন। আবার তিনিই দুর্গতিনাশিনী হইয়া আবির্ভূতা হন। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'সৈষা যাতুধানা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচযক্ষাঃ সিদ্ধাঃ। সৈষা সত্ত্বরজস্তমাংসি। সৈষা প্রজাপতীন্দ্রমনবঃ। তিনিই রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, যক্ষ, সিদ্ধ, আবার তিনিই প্রজাপতি, ইন্দ্র, মনু, তিনিই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণস্বরূপা। মায়ের এই লীলাবিগ্রহ জগতে নানারূপে খেলা করিতেছে। তিনিই কালরাত্রি আবার তিনিই মহালক্ষ্মী। যাহা কিছু ধ্বংসমুখে অগ্রসর হয়, তখন তাঁহার রজস্তমোময়ী মূর্ত্তির ক্রীড়া, আবার যাহা কিছু আনন্দ ও কল্যাণের নিদানরূপে প্রকটিত হয়, তাহা তখন বিশ্বমাতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

মা দুর্গার এই যে বিরুদ্ধ স্বরূপ, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি। একমাত্র ব্রহ্মই জগতে অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক। তিনি সাকার হইয়াও নিরাকার, তিনি মূর্ত্ত হইয়াও অমূর্ত্ত, তিনি শূন্য হইয়াও অশূন্য।

তাই দেবতারা যখন দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাসিত্বং মহাদেবি!'—কে তুমি মহাদেবি! 'সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী', তিনি বলিলেন—আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি আনন্দ, আমি নিরানন্দ, আমি বিজ্ঞান, আমি অজ্ঞান, আমিই প্রকৃতি আবার আমিই পুরুষ। আমি পঞ্চমহাভূত, আমি পঞ্চভূতেরও অতীত।

আমি বেদরূপিণী, আমি অবিদ্যারূপিণী, আমি ঊর্দ্ধে, আমি অধোদেশে, আমি তির্য্যক্, আমি রুদ্র, আমি বসু, আমি আদিত্য, আমি বিশ্বদেব।

'দুর্গাং সম্রায়তে যস্মাত্তস্মাদ্ দুর্গেতি কথ্যতে'—দুর্গতি হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা।

'তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্? নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্।'

সেই দুর্গাকে—দুরাচারদিগের বিনাশিনী যাঁহাকে বহু দুঃখে কষ্টে লাভ করা যায়—তাঁহাকে প্রণাম করি। আমি আজ সংসারের বিভীষিকা দর্শনে ভীত, ত্রস্ত, আর তুমি এই সংসারসমুদ্রের পারদায়িনী—মা! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া অসুর বিনাশ করিয়াছ—অসুরকে পদানত করিয়া—পশুশক্তিকে নিগৃহীত করিয়া তোমার দৈবীশক্তির উজ্জ্বল হাস্যে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিয়াছ। যে তোমার মহিমা জানে না—তাহার অজ্ঞতা বিদূরিত করিয়া—তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়াশক্তিবলে তাহাকেও তোমার ভক্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছ।

এই ভারতভূমি তোমারই মূর্ত্তি। তুমিই দেশমাতৃকা—তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবজগৎ মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া থাকে। তুমি আধারশক্তি হইয়া অনন্ত গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছ। তুমি যে বিশ্বরূপিণী—বিশ্বজীব তোমারই শক্তিতে প্রাণশক্তি লাভ করিয়া জীবিত আছে।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।

তোমার এই দেশমাতৃকার স্তন্যরূপে নদীসকল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জীবগণের প্রাণশক্তিকে আপ্যায়িত করিতেছে। 'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায়তে কৃৎস্নম্ অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে!' জলের মধ্যে তুমিই রসরূপিণী হইয়া জীবপ্রাণের রসসঞ্চার করিতেছ। তোমার শক্তি অলঙ্ঘনীয়। মা! আজ আমাদের অন্ন, জল, অগ্নি, বায়ু এমন কি আকাশ পর্য্যন্ত দুর্গতির দুঃসময়চ্ছায়ায় আচ্ছন্ন—তুমি দুর্গতিনাশিনী মূর্ত্তিতে এই শারদপ্রভাতে সমাগত হইয়া দুর্গতির সকল সঙ্কট পরিত্রাণ কর। যে আসুরী মায়াতে আজ দেশ বিভীষিকাগ্রস্ত—সেই আসুরী শক্তি তোমার দৈবীশক্তিপ্রভাবে নির্য্যাতিত—অভিভূত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শারদীয়া মহাপূজা

—শ্রীমতী পদ্মগোপাল ভারতী

শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা হয়। দেবী মাহাত্ম্য শ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে—সুরথ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া যে বনে গমন করেন, সমাধি নামক একজন বৈশ্যও আত্মীয় স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত, হৃত সর্বস্ব হইয়া সেই বনে গমন করেন। সেখানে সমব্যথার ব্যথী উভয়ের মিলন হয়। তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করেন—যাহাদের নিষ্ঠুরতায় আমরা গৃহত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছি তাহাদেরই কুশল চিন্তায় আমাদের অন্তর আকুল হয় কেন। এই বিষয় মীমাংসার জন্য তাঁহারা সেই বনে মেধস মুনির আশ্রমে গিয়া প্রণতি সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—কেন এমন হয়? উত্তরে মেধস মুনি বলেন—ইহা মহামায়ার প্রভাব.—

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতি কারিণঃ।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই মহামায়া কে? মেধস ঋষি বলিলেন—বিষ্ণুশক্তি সেই মহামায়া নিত্যা এবং জগতস্বরূপা। তথাপি দেবকার্য সাধনের জন্য বহুরূপে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তাহা বলিতেছি শোন—

১। মধুকৈটভ বধের নিমিত্ত—যোগনিদ্রারূপে
২। মহিষাসুর বধের নিমিত্ত—মহিষমর্দিনীরূপে
৩। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নিমিত্ত—কৌষিকীরূপে—

আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শারদীয়া পূজায় দেবীর এই মহিষমর্দিনী মূর্তি অর্চিত হয়। মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ধ্যানচক্ষে দেবীর ঐরূপ দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

ওঁ জটাজূট সমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং।

যিনি জটাজূট সমাযুক্তা, যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, যিনি ত্রিনয়না, পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ যাঁহার আনন।

অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণ ভূষিতাং।

অতসী পুষ্পের মত যাঁহার বর্ণ, যাঁহার সুন্দর গঠন, যিনি সুলোচনা, নবযৌবন সম্পন্না সর্ব আভরণে ভূষিতা।

সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানাং মহিষাসুর মর্দিনীং।

তাঁহার দশন যে প্রকার সুচারু তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরা, যিনি ত্রিভঙ্গভাবে অবস্থিতা হইয়া মহিষাসুরকে মর্দন করিতেছেন।

ত্রিশূলং দক্ষিণে ঘোরং খড়্গ চক্রং ক্রমাদধঃ।

যিনি মৃণালের মত সুকোমল আয়ত দশবাহুসমন্বিতা, যাঁহার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তার নিম্ন হস্তে খড়্গ ও চক্র।

ভীক্ষ্ণবানং তথাশক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণ চাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ॥
ঘণ্টাং বামপরিং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।

তীক্ষ্ণ বাণ এবং শক্তি দক্ষিণে সন্নিবেশিত, খেটক, পূর্ণ চাপ (ধনু) পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু, বামভুজ সমূহে সন্নিবেশিত।

অধস্তান্মহিষং তদ্বচ্ছিরস্তং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং বীক্ষ্যানবং খড়্গ পাণিনং।

অধোভাগে মস্তকহীন মহিষের দেহ হইতে খড়্গপাণি দানব মহিষাসুর-বিনির্গত।

হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতং।
রক্তারক্তি কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং॥

দেবী শূলের দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে তাহার দেহ রক্তারক্তি হইয়াছে, দেবীর নয়ন রক্ত বিস্ফুরিত।

বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটি ভীষণাননং।
সপাশ বাম হস্তেন ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া॥

দেবী মহিষাসুরকে নাগপাশে বেষ্টিত করিয়া বামহস্তে কেশের সহিত নাগের পুচ্ছ ধরিয়াছেন, দেবীর ভ্রুকুটিপূর্ণ ভীষণ বদন।

বমদ্রুধির বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণঃ পাদঃ সমং সিংহোপরিস্থিতং॥

রুধির বমনকারী দেবীর সিংহের উপরি দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত।

কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
পদ্ম ক্ষয়করীং দেবীং দৈত্য দানব দর্পহাং॥

দেবীর বামপদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মহিষাসুরের উপরে স্থাপিত। দেবী পদ্মক্ষয়করী দৈত্য দানবের দর্পহারিণী।

প্রসন্ন বদনাং ভদ্রাং সর্ব্বকামফলপ্রদাং।
স্তূয়মানস্তথা সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥

প্রসন্নবদনা সর্ব্বকামফলপ্রদা দেবী, অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতীচৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতি চণ্ডিকা।

অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততঃ পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাং॥

অষ্টশক্তি দ্বারা সতত পরিবেষ্টিতা, ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষপ্রদা জগতের ধাত্রী দেবীকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানে বর্ণিত দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। সেই দেবী এখন সার্বজনীন হইয়া খেলার পুতুল হইয়াছেন। শিল্পীগণ সার্বজনীন পূজার উদ্যোক্তা যুবকগণের প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূজার প্রতিমাকে আরাধ্যা দেবীকে খেলার পুতুলে পরিণত করিতেছে।

স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্রসম্মত ধ্যানে বর্ণিত দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজার ব্যবস্থা ছিল। ধ্যানে যেরূপ বর্ণিত আছে—দেবী নিজবাহন সিংহের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া বাম পদাঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের স্কন্ধে দিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া ছেদিত মস্তক মহিষ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত মহিষাসুরের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া রক্তারক্তি করিয়াছেন। বাম হস্তে মহিষাসুরের কেশের সঙ্গে নাগপাশ ধরিয়া ভ্রুকুটি ভীষণ রক্ত স্ফুরিত নয়নে ক্রোধভরে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন এইরূপ প্রতিমা গঠিত হইত।

প্রবাদ আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ মূর্তিত্রয়ের সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া দেবীর দক্ষিণে ও বামে স্থাপন করেন। পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন, সৌভাগ্যদায়িনী শত্রুনাশিনী মহামায়া মহিষমর্দিনী, তাঁহার দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি, ধনের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবী। দেবীর বামে দেব সেনাপতি কার্ত্তিক ও বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী দেবী। গণেশরূপে জ্ঞান, লক্ষ্মীরূপে ধন, কার্ত্তিকরূপে বাহুবল, সরস্বতীরূপে বিদ্যাসহ সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনী মহিষমর্দিনী দেবীর পূজা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত সপ্তমূর্ত্তি সমন্বিত অতি বৃহৎ প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বহুবিধ বস্ত্র অলঙ্কারে সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দেবীর নাসিকা পর্য্যন্ত দু-উচ্চ চিনির নৈবেদ্য দিয়া খুব ঘটা করিয়া পূজা করিতেন। তাহার মনে অভিমান হইয়াছিল, মায়ের পূজা আমার মত কেহ করিতে পারে না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন স্বপ্ন দেখিলেন চারিজন দিব্যরূপা রমণী সোনার কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা কৈলাশবাসিনী মা দুর্গার দাসী। শুনিয়া রাজা বলিলেন—মাকে জিজ্ঞাসা করিবেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি বৎসর শরৎকালে তাঁহার যে পূজা করেন তাহাতে মা কেমন আনন্দ পান? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিব, বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মহারাজা স্বপ্নে দেখিতেছেন কিছুদিন পরে আবার তাঁহারা আসিয়া মহারাজাকে বলিলেন—মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মা বলিলেন, কে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কোথায় কৃষ্ণনগর, কোথায় আমার পূজা হয় আমি ত তাহা জানিনা। তবে নবদ্বীপে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য নামে একজন আমার ভক্ত আনন্দময়ী পাড়াতে তাহার কুটিরে আমার পূজা করে, আমি সেখানে যাই, বড়ই আনন্দ পাই।

শুনিয়া মহারাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—হায় হায় আমি যে পূজা করি মা তাহা জানেনও না। এই মনে করিয়া সপ্তমী পূজার দিনে নবদ্বীপে দুর্গাদাসের কুটিরে গিয়া দেখিলেন, দুর্গাদাস অতি দরিদ্র, নিজ হাতে কোন প্রকারে প্রতিমা গঠন করিয়াছে, সামান্য আতপ তণ্ডুল, একটুখানি চিনি, আর বিল্বপত্র দিয়া দুই নয়নের জলে ভাসিয়া মা, মা, বলিয়া পূজা করিতেছেন, মা প্রত্যক্ষ হইয়া নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। মহারাজা পূজার শেষে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরণে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন—আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া তাহার বিনিময়ে তোমার দারিদ্র্য আমাকে দাও, আমি তোমার মত অভিমানশূন্য মনে প্রাণ ভরিয়া মায়ের পূজা করি।

মা দুর্গতির মুখোমুখি আমরা

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সেনগুপ্ত

বর্ষার নিবিড় কাল মেঘ প্রবল দৈত্যের মত নির্ঘৃণ আকাশের বুকে বসে বজ্রধ্বনিতে সকল জগবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে। মনে হয় এ দুর্দ্দিন বুঝি আর কাটিল না। অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণরত বারিধ সকল মেদিনী সিক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া মানুষের চরম দুর্গতির সহায়তা করে। জীর্ণ কুটীরে অবরুদ্ধ দরিদ্র প্রমিক মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়ে। এই দুর্য্যোগে কর্ম্ম সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। ঘরের আবরণের ব্যবস্থাও দুরাশা মাত্র। আহারের সম্বল নাই, উদরে আগুন জলিতেছে, মাথা বাঁচানোর চিন্তা ত পরের কথা। প্রতি দরিদ্র ঘরেই একই চিন্তা। এই দুর্য্যোগের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জগন্মাতার করুণা স্পর্শ। শস্য নবতেজে সতেজ হয়ে উঠে এই দুর্য্যোগের মধ্যেই। এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কাটাইয়া শরতের নির্ম্মল নীল আকাশ রৌদ্র হাসিরাশি বিকিরণ করিতে করিতে হাঁসের কলধ্বনিতে দেবীর আগমন বার্তা নিবেদন করিতেছে। প্রকৃতির বিপর্য্যয় পরাহত করিয়া দেবীর আরাধনার কালই নিত্য বিজয়িনীর অসীম শক্তির ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিতেছে। মা তুমি শক্তিরূপিণী। তোমার শক্তির বিকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রে—তোমার পূজার কালে, তোমার বাহনে, তোমার সাজ-সজ্জায় এবং তোমার ক্রিয়ায়। অপূর্ব্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তোমার চিত্তকে অচিন্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে। তোমার চিত্তে যেমন সমর নিষ্ঠুরতা তেমনই ধরাত্রাতা। তুমি বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। ধ্বংসেই তোমার কার্য্যের পরিসমাপ্তি নয় নবীন সুন্দরতর সৃষ্টিতেই তোমার সমরের তাৎপর্য্য। ধ্বংস নূতন অনবদ্য সৃষ্টির ভিত্তি। সৃষ্টির জন্যই তোমার ধ্বংস। অনন্ত শক্তির আধার, অপরিমেয় কল্যাণ চিন্তার উৎস ও অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তির মূর্ত্তি তুমি জগতের জননী।

মা এতদিন আমরা তোমার পূজার নামে উৎসব করেছি। আলোক সজ্জার আকর্ষণে, মূর্ত্তির বিচিত্র বেশের প্রলোভনে নব ধ্বনি বিতরণ যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের তুফানে শান্ত পরিবেশকে কোলাহল মুখর করে শক্তি স্বরূপিণীকে বিলাসিনী রূপে উপলব্ধি করেছি। এবার ঘটনা চক্রে আমাদের অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙিয়াছে। দেবীর বোধন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি সদা জাগ্রত। আমাদের বোধন হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি জাতির সম্মানের বাহন শৌর্য্য-বীর্য্য। বীরের ধর্ম্ম ক্ষমা, কাপুরুষের নয়। আমরা বুঝিয়াছি—শিষ্ট পালনের অন্তেষ্ঠ অংশ দুষ্ট দমন। বিশ্বজননী লোকশক্র বিনাশিনী। শুম্ভ দুষ্টের মত যাঁর করুণাধারা নিত্য বরিতেছে তিনিও দুষ্ট সন্তান নাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। তিনি অপরাধের শাস্তি দেন, শাস্তি ভঙ্গকারীকে শিক্ষা দেন ও শাসিতের কল্যাণেরও চিন্তা করেন। এই মহা সাধনাই ভারতের সাধনা। অস্ত্রদেশে যুদ্ধ হয় শান্তি দিবার জন্য। বক্ষদের পদানত করিয়া বিজেতার স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লক্ষ্য নিহিত থাকে। ভারতের আদর্শ নৈতিক শিক্ষা অপরের ভূখণ্ড অথবা সম্পদ গ্রাস করিয়া বিজিতকে নিজের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা নয়। সমাজ তখন বিপন্ন হয়, যখন কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক দেশের সকল সম্পদ

গ্রাস করে অথবা করিতে চায় ও জনসাধারণকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করে। যাহারা পরের দেশ গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহারাও নরক্রপে দৈত্য। আজ দৈত্য চিনিতে কাহারও বিলম্ব নাই।

দেবী সর্বভূতে বিরাজমানা। তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছেন। আমাদের মধ্যে সেই দৈব ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সেই ভাবের পূজা করিতে হইবে। আমাদের মধ্যেই দেবীর বিভূতি নিহিত রহিয়াছে। সেই বিভূতিকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। দেবী একাকিনী যুদ্ধ করেন না। তাঁর গণ চাই। তাঁর শক্তি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চণ্ডীর সেই যুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ করিতে হইবে। চণ্ডী নির্ভুলভাবে সমাহিত চিত্তে শুধু পাঠ করিলে আমাদের পূজা সমাপ্ত হইবে না। সমরের সময় পূজার স্মরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এ পূজা সাক্ষাৎ দেবীর পূজা। দেবীর পরাভব নাই। সমরে বিপর্যয় কখন কখন ঘটে। রক্তবীজের যুদ্ধে দৈবীশক্তির আংশিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র জনমনের যদি যুদ্ধ জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে চরম যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। রক্তবীজের বধ এই শিক্ষাই দেয়। যুদ্ধে সব সময়েই বিজয় একপক্ষের নিয়ত হয় না। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এক করিতে হইবে। বিভিন্ন মতাবলম্বী যত দল আছে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। কারণ জাতীয় সঙ্কট এ দলের বা ও দলের সঙ্কট নয়। একভাবে উদ্বুদ্ধ সমগ্র দেশের নর-নারীর সমষ্টিই দেবী। সেই দেশমাতৃকারূপিণী দেবীর যুদ্ধই দেবীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত। একটি দেশপ্রেম সূত্রে গাঁথা রক্তপুষ্পের মালা গলায় দিয়া শক্তি সিংহবাহনা দেবী লোকরক্ষার পবিত্র কার্যে দীক্ষিত হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলে পৃথিবীতে এমন কোন দৈত্যশক্তিই নাই যাহা দেবীর জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

নিখুঁত ব্লকের জন্য

সি গ নে ট

ফটোটাইপ

ডিজাইন
হাফটোন
লাইন ব্লক
টিরিও, ম্যাট এবং ভাল কাগজে ছাপার জন্য।

১২৩বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ফোন : ৫৫-৬৬১২

আগমনী

শ্রীদেব ভট্টাচার্য

ভারতীয় সাধনা বহুর মধ্যে একত্বকে খুঁজে পাবার সাধনা। তাই বহুর সমবায়ে গড়ে উঠত প্রাচীন ভারতের উৎসব। উৎসব সুরু হবার বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি চলত। দরকার হত অনেক লোকজন এবং উদ্যোগ-আয়োজনের। প্রাচীন ভারতে মূল উৎসব তত বড় ছিল না, যত বড় ছিল তার ভূমিকা। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন সোম-যাগের কথা। দেখবেন, প্রারম্ভিক প্রস্তুতিই সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করত। মূল উৎসবের ভূমিকা সেখানে গৌণ। ভারতীয় সাধনার এই বিশিষ্টতা কালক্রমে বাংলার উৎসবের মধ্যে সঞ্চারিত হল। পরবর্তী কালে তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির উপাসক হল বাঙালী। কিন্তু প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার বৈদিক যুগের বিশিষ্ট ধারাটি তার সমাজ জীবন থেকে অবলুপ্ত হল না। সেই বৈদিক ভারতবাসীর মতো তন্ত্রাচারী বাঙালীও উৎসবের প্রস্তুতি-পর্বটিকে দীর্ঘ ও উদ্দীপনাময় করে তুলল। বাংলা দেশে দুর্গোৎসব সুরু হল যখন তখন দেখা গেল, উৎসবের আবির্ভাব ক্ষণটির চেয়ে উৎসবের দিনের চরম পাওয়া নয়, পাওয়ার প্রতীক্ষাটুকুর মধ্যেই বাঙালী বেশি আনন্দ ও মাধুর্যের উপকরণ খুঁজে পাচ্ছে। তাই দেবী দুর্গার আগমনীকে কেন্দ্র করে সেকালের বাংলায় সাড়া জাগত। দুর্গোৎসবের বহু পূর্ব থেকে সমগ্র দেশ ঘুড়ে উৎসবের প্রস্তুতি সুরু হোত। সবাই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করত, মা আনন্দময়ী আসছেন। একটি বছর পরে আবার পিতৃগৃহে ফিরছেন উমা। তাঁকে বরণ করতে হবে। তাই আশার আনন্দে মেতে উঠত সবাই। ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী সবাই মাতত।

এসব কথা আজ নেহাৎ-ই ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের ছেঁড়া ঘটনাগুলোকে জোড়া দিলে সেকালের আস্ত একটা চিত্র খুঁজে পাই। দুর্গোৎসবের পূর্বেকার সেকালের বাঙলাকে কল্পনা করে নিতে এতটুকু কষ্ট হয় না। মনে হয়, সে যুগের সেই আনন্দমুখর দিনগুলোকে আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেন;—মনে হয়, উৎসবের প্রতীক্ষারত হর্ষোজ্জ্বল একটা দেশকে দেখছি। দেশ আশায়-আনন্দে ভরো ভরো; ঘরে-ঘরে সাজোসাজ। মা আসছেন। গৃহবাসীরা অনেক আগে থাকতেই মাতৃবন্দনার আয়োজনে ব্যস্ত। পরমাত্মীয়াকে বরণ করবে বলে অধীর আগ্রহে দিন গুণছে ওরা। আসলে মায়ের আসতে বিলম্ব আছে এখনও। এখন চলছে দেবীপক্ষের আগের শুক্লপক্ষ। এরপর কৃষ্ণপক্ষ আসবে, আসবে মহালয়া। তারপর আরও কয়েকটা দিন পেরোলে দেবী আসবেন। অথচ এরই মধ্যে চারিদিকের আবহাওয়া উৎসবের আনন্দে ভরপুর। এখন আকাশে-বাতাসে একটিই কথা শুধু,—মা আসছেন। মা আসছেন, তাই দেশ জুড়ে আনন্দের ঘনঘটা। সাজ সাজ রব। এই যে চিত্র, এ হল সেকালের। সেকালের বাঙলায় এমন করেই সারা দেশ মেতে উঠত।

সেকাল বলতে এখানে প্রধানতঃ আজ থেকে একশত বছর আগেকার দিনগুলোর কথাই বলছি। অবশ্য এদেশে দুর্গোৎসব চলছে তারও অনেক আগে থেকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, রাজা সুরথ দুর্গার মৃণ্ময় মূর্তির পূজা করেছিলেন। সুরথের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৯৮৪ থেকে ১২৬৮ অব্দের মধ্যে। অতএব মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিশ্বাস করলে বলতে হয়, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে দুর্গাপূজা সুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রথম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাই সে যুগের আগমনী-পরিবেশ কেমন ছিল, তা' নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রবাদ, আট, নয়শত বছর পূর্বে ভাদুরিয়ার জমিদার প্রথমে প্রতিমা গড়ে দুর্গোৎসব করেন। কিন্তু সে দুর্গোৎসবের আসল চেহারা কেমন ছিল তা' স্পষ্টভাবে জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে 'অম্বিকা পূজা'র কথা আছে। কিন্তু আধুনিক কালে যে প্রতিমার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই দশভুজার মূর্তি-অর্চনার কথা নেই। তবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উল্লিখিত অম্বিকা সে আজকের দুর্গাই পূর্বতন রূপ, একথা অনুমানসিদ্ধে বলা যায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন, সেকালে অম্বিকা পূজাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে আনন্দোৎসব দেখা যেত। চৈতন্যের জীবনীকাব্য থেকে জানা যায়, মহাপ্রভুর সময়েও দুর্গোৎসব হত। তবে সে দুর্গোৎসবকে ঘিরে দেশে কী ধরণের আশা-আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠত, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। আমরা পেয়েছি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তী সময়কার বিবরণ। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষীরা অনুমান করেছেন, মৃণ্ময় দুর্গা-প্রতিমা পূজার পদ্ধতি ২৫০ বছরের বেশি পুরাতন নয়। তাঁদের মতে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে আধুনিক পদ্ধতির দুর্গাপূজা চালু হয়েছে। সে যুগে উৎসব আরম্ভ হবার বহু পূর্ব থেকেই তোড়জোড় সুরু হোত। দেবী দুর্গার আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালী তখন শক্তি-সাধনার স্বপ্ন দেখত। পরবর্তী শতকের বাঙালী শক্তিমন্ত্রের স্থলে মধুর ভাবকে প্রাধান্য দিল। সকলের মুখে ফিরল,—গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।

উমার আগমনের আশায় সবচেয়ে দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী। উৎসবের শুভ মুহূর্তটির জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আশায়-আনন্দে দিন গুণেছে। ওদের কাছে আগমনীর দিনগুলি নতুন জীবনের বার্তা বয়ে আনত। আগমনীর যাদু-স্পর্শে সারা বছরের দুঃখ ও গ্লানিকে ভুলে যেত ওরা। সবাই একই ভাবে ভাবিত হয়ে উৎসবের পথ চেয়ে থাকত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগমনীর দিনগুলির বর্ণাঢ্য চিত্র তুলে ধরেছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন,

"কাহারও বা রথের দিন হইতে, কাহারও বা জন্মাষ্টমীর দিন হইতে দুর্গোৎসবের আড়ম্বর আরম্ভ হইত। যে দিন কাঠাম ধৌত করিয়া বাড়ীর কুলাঙ্গনাগণ শাঁখ বাজাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কাঠামতে 'সিন্দুর' লেপন করিতেন, এবং উদ্দেশে বলিতেন, 'এস মা, এবার ভাল মুখে, হাসিমুখে এস মা; তোমার কল্যাণে আমাদের বাছাদের কল্যাণ হউক'—সেইদিন হইতে মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতাম, সেইদিন হইতে বাড়ীতে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইত, সেইদিন হইতে আগমনীর বন্ধার কানে আসিয়া বাজিত। সমগ্র সমাজটাকে, সমগ্র দেশটাকে দুইমাসকাল এক ভাবে ভাবুক, এক রসে রসিক করিয়া রাখা হইত। গ্রামে গ্রামে

প্রায় কবিগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন আগমনী গান রচনা করিতেন। বাঙলা দেশে এমন লক্ষ লক্ষ আগমনী সঙ্গীত প্রতি বৎসরে রচিত হইত।"

[পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৯-১৭০]

এই গেল পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রের কথা। এছাড়া দুর্গোৎসবের পূর্বেকার ধর্মচেতনার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন দেশবরেণ্য বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর আত্মজীবনীতে পাই,

"দুর্গোৎসবের পূর্বের পক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় পিতৃপক্ষের কোন পরিচয় পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রায় সকল ভদ্র গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মন্ত্রে পল্লীর সমস্ত জলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে দৃশ্য ও সে মন্ত্রের ধ্বনি এখনও চোখে ভাসিতেছে ও কানে আসিতেছে। পিতৃপক্ষ আসিলেই আমরা বুঝিতাম, পূজার আর দেরী নাই।"

[সপ্তর বৎসর— আত্মজীবনী : পৃঃ ১২৬-১২৭]

তবে অধ্যাত্মচেতনা নয়, বহুজনের ঐকান্তিক কর্মোদ্যম, সদিচ্ছা ও প্রীতি-বন্ধনের মধ্য দিয়েই সেকালের আগমনীর দিনগুলি আনন্দ-মুখর হয়ে উঠত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,

"পূজার বিশ-পঁচিশ দিন পূর্ব হইতেই আয়োজন করিতে হইত।.....তৎকালে সভ্যতার আলোক গ্রামে প্রবেশ করে নাই। চা, বিড়ি, সিগারেট, কেহ এসব নামও শুনে নাই। কিন্তু তামাক অপর্য্যাপ্ত পুড়িত। হাট হইতে ভাল তামাক পাতা ও তামাকের মলা আনিয়া চিটাগুড়ের সহিত চেঁকিতে কুটিয়া তামাক তৈয়ার হইত। সে তামাক গুড়ের নাগায় (গুড়ের পুরু কলসী) পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। বিশ পঁচিশ দিনে সে তামাকের সুগন্ধ বাহির হইত। মাসলার আগুন থাকিত, আর, যে আসিত, যে কাজের জন্যই হউক, দুই-এক ছিলিম তামাক না পোড়াইয়া যাইত না। কেহ কেহ অপরের হুঁকায় তামাক খাইত না। তাহাদের জন্য হাট হইতে নূতন হুঁকা আনিয়া রাখিতে হইত।

গ্রামের কুমার মাটির যাবতীয় বাসন আনিয়া দিত।...ডোমনী নূতন ঝুড়ী, কুলা, চালনী, বইচালনা, চাঙারি, নানাপ্রকারের চুপড়ি ও অনেক তালাই (তালপাতার চাটাই) যোগাইত।...বাড়িনী খেজুর চাটাই বুনিয়া দিত, ৪ হাত×১॥ হাত।...মেদ তাত-মুড়ির, অনেক মুড়ি ও মুড়কি করাইতে হইত।...মুড়ি, মুড়কি ও নারকেল নাড়ু সকলের পক্ষেই উত্তম জলপান। কেহ লুচিলা খুঁজিত না।"

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সেকালের বাঙলায় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলত দীর্ঘকাল ধরে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আনাগোনায় উৎসব-বাড়ীতে পূজার বহু পূর্ব থেকেই সাড়া পড়ে যেত। উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজের একে অপরকে জানবার সুযোগ পেত। কিন্তু মনে যেন রাখি, এই সুযোগ শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হোত না। সেকালে জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনেরও ছিল ঢালাও ব্যবস্থা; এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে মিলনের গ্রন্থি রচিত হোত। পূজার দু'মাস আড়াই মাস পূর্ব থেকে নতুন নতুন যাত্রার দল গড়ে উঠত। ওই সব দলে কোনোপ্রকার শ্রেণী-বিদ্বেষ ছিল না।

সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ওখানে প্রবেশাধিকার পেত। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে যখন অজস্র যাত্রার দল গড়ে উঠত, তখন পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে দেখা যেত 'সই-সংবাদের' দল।

অর্থাৎ, সেকালের আগমনীর দিনগুলি ছিল যথার্থই আনন্দময়; কাজে-কর্মে, আমোদে-উল্লাসে, নাচে-গানে সত্যিকারের বর্ণাঢ্য। আজ আলো-ঝলমল প্রাসাদ পুরীতে বসে যখন দেখি, দুর্গোৎসবের জন্য অতিকায় সব প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে এবং চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে কর্মীরা ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন এক একবার মনে হয়, সেকালের দিনগুলিই ভাল ছিল। সেকালে চোখ-ঝলসানো বৈদ্যুতিক আলো ছিল না; কিন্তু প্রদীপের ক্ষীণ আলোক সকলের হৃদয়কে আনন্দে আলোকিত করত। সেকালে কর্ণ-বিদারী মাইক-মেচ্রিকারার ছিল না। কিন্তু ছিল সত্যিকারের আগমনী সঙ্গীত। এক জায়গায় অনেক জোরে গান হোত না তখন। সকল জায়গায় গান শোনা যেত। এক জায়গায় অনেক আলোক জ্বালিয়ে রোশনাই হোত না। আলোক ছড়িয়ে থাকত দেশ জুড়ে। অর্থাৎ, সেকালের আগমনীর দিনগুলো সকলের আনন্দে আনন্দময় হয়ে উঠত। অর্থ বা বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে সবাই অনুভব করত, মা আসছেন।

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

সংস্কৃতি সিরিজ

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির তথা বাঙলার মন্দির ভাস্কর্যের তথ্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। আর্ট প্লেটে ৬৭টি ছবি। [১৫·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫.০০]

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকবির জীবনবেদের সরল ব্যাখ্যা। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকাসহ। [২.১০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত বিষয়ের মর্মকথার প্রাঞ্জল পরিবেশন। [২·৫০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ সম্বলিত ও সম্পাদিত। পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। [২৫·০০]

তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলকাতা-৯

আগমনী

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণী—যৎ

নমামি মহিষাসুর মর্দ্দিনি
নমামি ত্রিলোক পালিনি।
মহিষ-মস্তক-নটন বেদবিনোদিনি
মোদিনি মালিনি মানিনি
প্রণত-জন-সৌভাগ্য জননি।
শঙ্খ চক্র শূলাঙ্কুশ পাণি
শক্তিসেন মধুর বাণি—
পঙ্কজ-নয়নি পন্নগ-বেণি
পালিত গুরু গুহ পুরাণি।
শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণি সমস্ত দৈবত রূপিণি
কঙ্কণালংকৃতে জননি কাত্যায়নি নারায়ণি॥

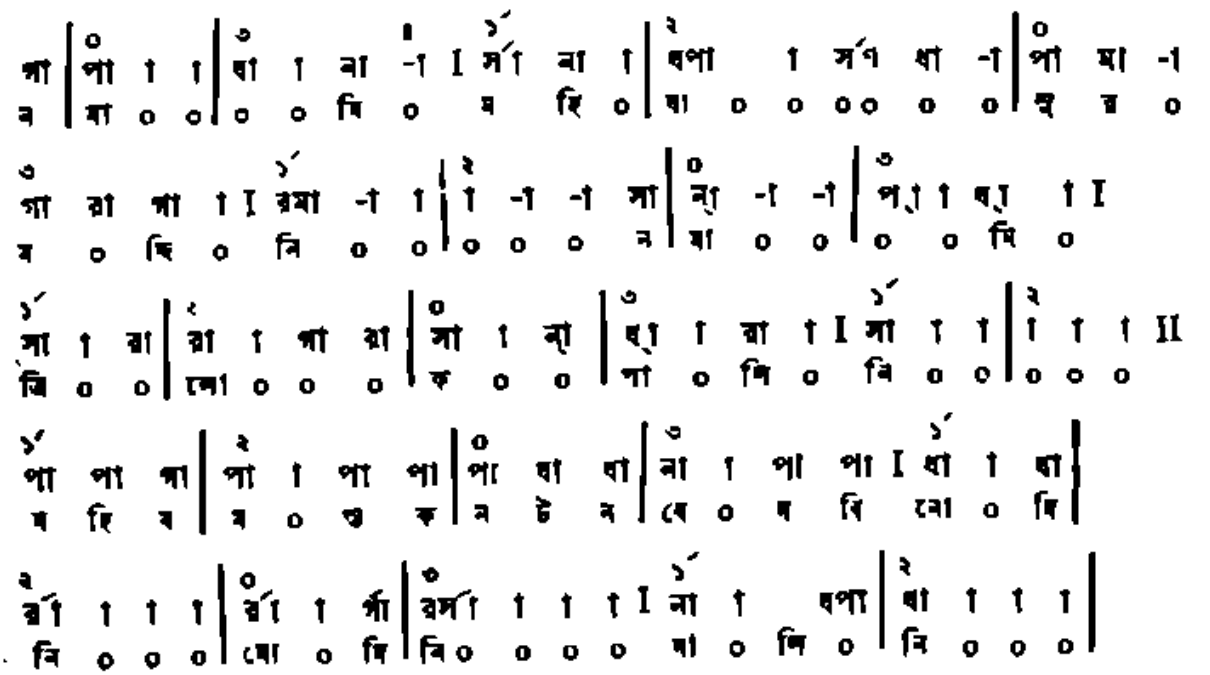

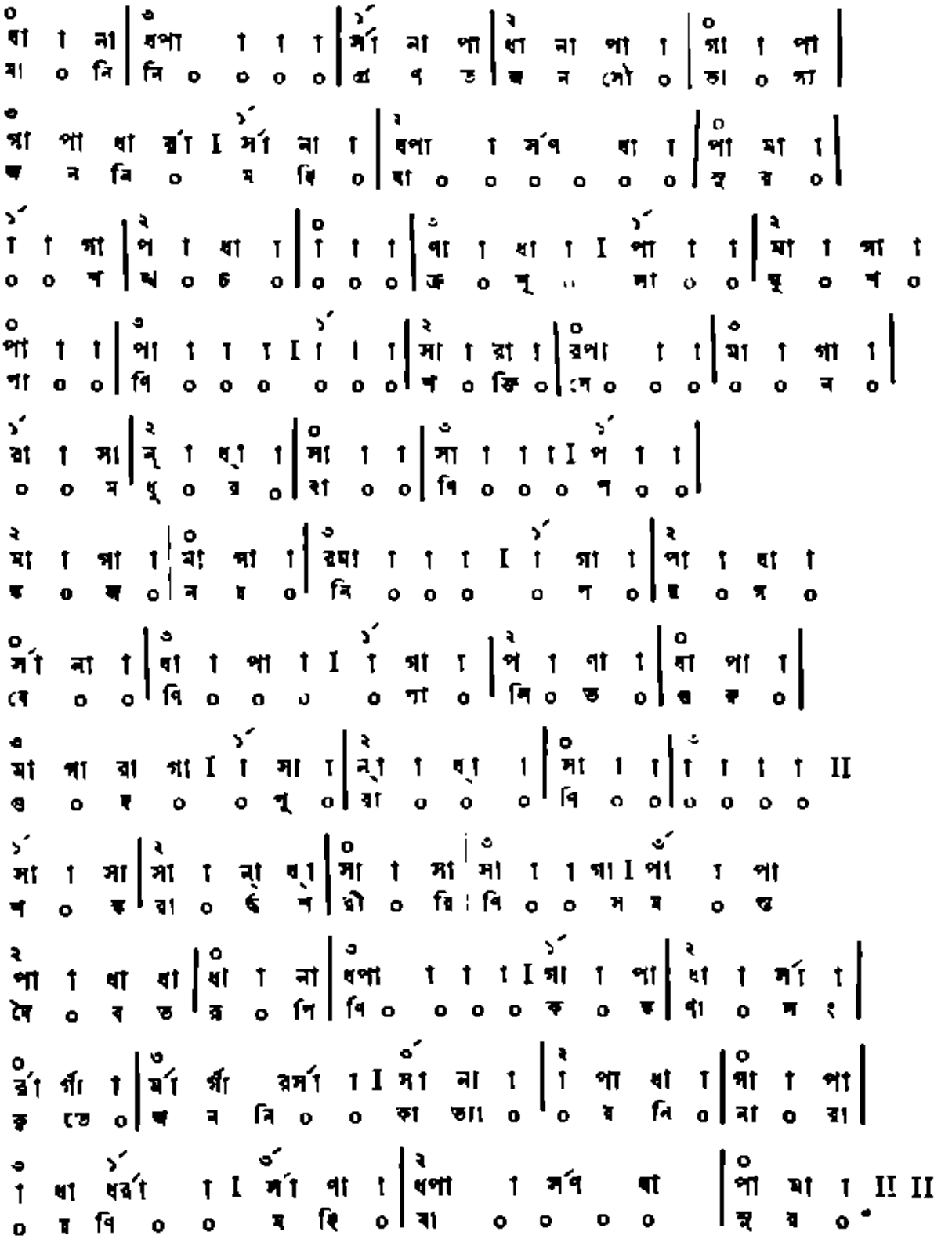
০ ধা । না | ৩ ধপা । । । | ১´ র্সা না পা | ২ ধা না পা । | ০ গা । পা |
মা ০ নি | নি ০ ০ ০ ০ | প্র ণ ত | ন ন সৌ ০ | তা ০ মা |
৩ গা পা ধা র্সা I ১´ র্সা না । | ২ ধপা । র্সণ ধা । | ০ পা মা । |
ন ন নি ০ ম নি ০ | ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ন্ ন ০ |
১´ । । গা | ২ প । ধা । | ০ । । । | ৩ গা । ধা । I ১´ পা । । | ২ মা । গা । |
০ ০ শ | ঋ ০ ত ০ | ০ ০ ০ | ক্ত ০ শু ... না ০ ০ | ন্ ০ শ ০ |
০ পা । । | ৩ পা । । । I । । । | ২ সা । রা । | ০ রপা । । | ৩ মা । গা । |
পা ০ ০ | নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ | শ ০ ক্তি ০ | সে ০ ০ ০ | ০ ০ ন ০ |
১´ রা । সা | ২ ন্ । ধ্ । | ০ সা । । | ৩ সা । । । I ১´ প । । |
০ ০ ম | ধু ০ র ০ | রা ০ ০ | নি ০ ০ ০ শ ০ ০ |
২ মা । গা । | ০ মা গা । | ৩ রমা । । । I । গা । | ২ পা । ধা । |
ন ০ ন ০ | ন ন ০ | নি ০ ০ ০ ০ শ ০ | ন ০ শ ০ |
০ র্সা না । | ৩ ধা । পা । I । গা । | ২ প । ণা । | ০ ধা পা । |
সে ০ ০ | নি ০ ০ ০ ০ পা ০ | নি ০ ভ ০ | ন্ ক ০ |
৩ মা গা রা গা I ১´ । সা । | ২ ন্ । ধ্ । | ০ সা । । | ৩ । । । । II |
ও ০ ন ০ ০ পু ০ | রা ০ ০ ০ | নি ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |
১´ সা । সা | ২ সা । ন্ ধ্ । | ০ সা । সা | ৩ সা । । গা I ৩´ পা । পা |
শ ০ ক | রা ০ ঙ শ | রী ০ য়ি | নি ০ ০ স ম ০ ন্ত |
২ পা । ধা ধা | ০ ধা । না | ৩ ধপা । । । I ১´ গা । পা | ২ ধা । র্সা । |
মৈ ০ ব ত | র ০ নি | নি ০ ০ ০ ০ ক ০ ভ | প্ ০ ন ং |
০ র্রা র্গা । | ৩ র্মা র্গা রর্সা । । I ৩´ সা না । | ২ । পা ধা । | ০ গা । পা |
ক তে ০ | ন ন নি ০ ০ কা তা ০ | ০ য় নি ০ | না ০ রা |
৩ । ধা ১´ ধর্রা । । I ৩´ র্সা পা । | ২ ধপা । র্সণ ধা | ০ পা মা । II II |
০ য় নি ০ ০ ম নি ০ | রা ০ ০ ০ ০ | ন্ ন ০ |

একটা বন্ধন

বিমল মিত্র

উদয়পুরের পাথরের কাজের নাম-ডাক আছে। মার্বেল-পাথর নয়। চীনে পান্না নীলা—এই সব পাথর। সেবারে এমনি একটা পাথরের দোকানে গিয়েছি একটা ভালো দেখে পান্না কিনবো বলে।

সেই দোকানেই ঘটনাটা ঘটলো।

সত্যিই, তাই ভাবি মাঝে মাঝে। ভারতবর্ষের যেখানে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি, প্রতি মুহূর্তে সেই একই অখণ্ড আত্মার বিভিন্ন রূপ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙলা দেশের এই প্রান্তিক সহরেও যা, সুদূর রাজস্থানের আর এক প্রান্তিক সহরেও তাই।

প্রতাপ সরকার আমার বন্ধু। সে বললে—পান্না কিনতে চাও তো আমার চেনা-শোনা দোকান আছে, আমি নিয়ে যেতে পারি।

আমি বলেছিলাম—বেশি বড়ো কোনও দোকানে যেতে চাই না, সেখানে গলাকাটা দাম নিয়ে নেবে তারা!

কিন্তু প্রতাপ সরকার জয়পুরের বহুদিনের বাসিন্দা। রাজস্থান সেক্রেটারিয়েটে বহুদিন চাকরি করে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। তারপর নাটক-থিয়েটারের সাতিক আছে। উচ্চ-নীচ এখানকার সবাই চেনে তাকে মিশুক লোক বলে। বলতে গেলে তার হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করা যায়।

আমার প্রয়োজনের কথা শুনেই সে গাড়ি চালিয়ে আমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলে তার ঠিকানা জানবার প্রয়োজন ছিল না আমার।

দেখলাম তেমন জাঁদরেল দোকান সেটা নয়।

একজন বুড়ো কারিগর তখন ঠুক-ঠুক করে কাজ করছে ভেতরের দিকে। দুপুর বেলা। দোকানের মালিক-টালিক কেউ নেই।

প্রতাপ একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

—কই গো, হরিবাবু, তোমাদের মালিক কোথায়? মিস্টার প্রেমলানি কোথায় গেল?

কাজ থামিয়ে হরিবাবু বাইরে এল। আপ্যায়ন করে বললে—বসুন বাবু, মালিক তো বাড়িতে খেতে গেছেন। কী দরকার, বলুন না—

—তুমি পারবে দেখাতে? আমার এই বন্ধুর একটা পান্নার দরকার ছিল। পাঁচ রতির পান্না হলেই চলবে।

বুড়ো হরিবাবু দোকানের কোণে রাখা একটা লোহার-সেফ্ খুলে পান্না বার করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে গাড়ির শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখি একটা বিরাট গাড়ি এসে থেমেছে দোকানের সামনে। দেখেই মনে হয় বড়লোকের গাড়ি। সামনে উর্দি পরা ড্রাইভার। আর পেছনের সিট থেকে একজন মহিলা নামছে।

বেশ ঝল্-মলে শাড়ি। ফরসা রং। গলায় মুক্তোর হার, কানে মুক্তোর দুল। দু'হাতে মুক্তোর বালা। গাড়ি থেকে নেমে তর-তর করে একেবারে দোকানের ওপরে উঠে এল।

এসে ঢুকেই বললে—মুক্তোর গয়নার সেট আছে আপনাদের দোকানে? ঝুটো মুক্তো?

হরিবাবু কথাটা শুনে বোধহয় একটু অবাক হয়ে গেল।

বললে—ঝুটো মুক্তো?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ—ঠিক এই আমারটার মত—

বলে নিজের গলার মুক্তোর হারটা খুলে কাউন্টারের ওপর ফেলে দিলে। হরিবাবু জিনিষটা নিয়ে চশমাটা ভালো করে এঁটে নিয়ে দেখতে গেল।

মহিলাটি বললে—এটা অবশ্য বিলকুল খাঁটি, খাঁটি মাল আমি চাই না। একটা বিয়ের ব্যাপারে আমি প্রেজেন্টেশন্ দিতে চাই—ঠিক যেন এই রকম হয়—

হরিবাবু তখন জিনিষটা নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করছে।

মহিলাটি বললে—আমি কিন্তু ঠিক এই ডিজাইনের হার চাই, অন্য ডিজাইন হলে চলবে না—

হরিবাবু অনেকক্ষণ জিনিষটা দেখে বললে—কিন্তু এটা তো আপনার আসল মুক্তো নয়—

—হোয়াট? আসল মুক্তো নয়? কী বলছো তুমি? কদ্দিন দোকানে কাজ করছো?

মহিলাটি বোধহয় আমাদের সামনে হরিবাবুর ওই কথায় একটু বে-ইজ্জৎ হয়ে গিয়েছিল। তাই হরিবাবুকে ধমকের সুরে কথা বলতে লাগলো।

—ঝুটো মানে? কী রকম লোক রেখেছে দোকানে যে মুক্তো চেনে না? জানো, আমি তোমার চাকরি খেয়ে দিতে পারি? তোমার দোকানের মালিক কোথায়?

হরিবাবু নিরীহ বৃদ্ধ কর্মচারী। তার গলা চড়ানো যানায় না।

বললে—আমি পঁয়ত্রিশ বছর এই কাজ করছি মা, আমি মুক্তো চিনবো না? আমি বলছি মা, এ আপনার আসল মুক্তো কিছুতেই নয়। দোকানদার নিশ্চয়ই আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছে—

মহিলাটি থর-থর করে যেন রাগে কাঁপতে লাগলো।

বললে—তোমার বাবু কোথায়?

হরিবাবু বললে—প্রেমলানি সাহেব খেতে গেছেন, তিনি পাঁচটার সময় দোকানে আসবেন।

—ঠিক আছে, তোমার বাবু আসুক, তখন তোমাকে দেখাবো।

বলে যেমন তড়িৎ বেগে এসেছিল, তেমনি তড়িৎ বেগে আবার চলে গেল। গিয়ে গাড়িতে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা সোঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটে গেল দু'তিন মিনিটের মধ্যে। আমি অবাক হয়ে তাকালাম প্রতাপের দিকে। প্রতাপ হরিবাবুকে বললে—কী গো, হরিবাবু, তোমার চাকরি যাবে নাকি?

হরিবাবু দার্শনিকের মত ভঙ্গি করে হাসলো একটু।

বললে—বাবু, এই দেখতে দেখতে জীবন কেটে গেল আমার, আমার আরো কত দেখবো—কিন্তু ঝুটো মুক্তোকে আমি আসল কী করে বলি, বলুন? আমার জিভ্ কেটে ফেললেও আমি তা বলতে পারবো না—

প্রতাপ আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের হরিবাবু অনেক দিনের লোক, কোথায় বাঙলা

মুদুক, আর কোথায় এই রাজস্থান, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এইখানে এসে এই পাথর-কাটার কাজে ঢুকেছে।

আমিও অবাক হয়ে গেলাম প্রতাপের কথা শুনে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ দোকানের মালিক মিস্টার প্রেমলানি এসে হাজির। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বড়লোক মানুষ। তাতে সিন্ধী। শুনলাম সারা ইণ্ডিয়ায় প্রেমলানি সাহেবের এই কারবার আছে।

প্রতাপ সরকারকে দেখে প্রেমলানি সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে।

বললে—কী খবর প্রতাপবাবু?

প্রতাপ বললে—একটা পান্না কিনতে এসেছি, বেশ নিখাদ পান্না চাই। কলকাতার লোক, বেশি দাম নেবেন না যেন—

প্রেমলানি সাহেব বললে—কেন, হরিবাবু আপনাদের পান্না দেখায় নি?

প্রতাপ বললে—পান্না তো দেখাচ্ছিল হরিবাবু, ইতিমধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

—কী কাণ্ড?

হরিবাবু বললে—সেই ঠাকুরসাহেবের বিবি এসেছিলেন। তিনি একটা বুটো মুক্তোর হার কিনতে চাইছিলেন—

তারপর সমস্ত ব্যাপারটা শুনে প্রেমলানি সাহেব বললে—তা তুমি কেন ও-কথা বলতে গেলে?

হরিবাবু বললে—বুটো মুক্তোকে আমি কেমন করে খাঁটি মুক্তো বলি, বলুন?

প্রেমলানি সাহেব বললে—তা তুমি ঠাকুরসাহেবের বিবিকে দেখেও তার সঙ্গে তর্ক করতে গেলে? জানো তুমি ঠাকুরসাহেবের বিবি ওই-রকম লোক……

প্রতাপ বললে—ঠাকুরসাহেবের বউ কী রকম লোক প্রেমলানি সাহেব?

প্রেমলানি সাহেব বললে—আরে তার কথা আর বলবেন না প্রতাপবাবু। ঠাকুরসাহেব তো এই সেদ বছরে ওকে বিয়ে করে এনেছে বোম্বাই থেকে। ওর মা সেকালের একজন ফেমাস সিনেমা-এ্যাক্ট্রেস ছিল। সেই বিয়ে করার পর থেকেই মাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। এইটে তো ঠাকুরসাহেবের থার্ড ওয়াইফ—

—তিনটে বিয়ে?

—হ্যাঁ, আগের দুটোর সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রথমটা ছিল ইংরেজ, সেকেণ্ডটা ইহুদী, আর এটার কী জাত কে জানে। এর বোধহয় বাপেরও ঠিক নেই—

প্রতাপ অবাক হয়ে গেল শুনে।

বললে—তাই নাকি? আমি তো এ-সব ব্যাপার জানতাম না—

আমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না কে ঠাকুরসাহেব, কার কথা এরা বলছে!

আমাকে প্রতাপ বুঝিয়ে দিলে—এখানকার রাজার মন্ত্রীর দল বংশধর। এখন তো স্টেট্-টেট্ সব গভর্মেণ্ট্ নিয়ে নিয়েছে, তাতে রাজাদের অবস্থাই সব খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর মন্ত্রী। তাদের ছেলে-নাতিরা সব লায়েক হয়েছে যে এক-একজন।

প্রেমলানি সাহেব বললে—ওদের ভেতরে আর এখন কিছু নেই, ওই বাইরেই যা ফুটানি—

বলতে বলতে হঠাৎ দোকানের সামনে আর একটা গাড়ি এসে হাজির।

প্রেমলানি সেদিকে দেখেই বললে—ওই ঠাকুরসাহেব এসে গেছে—

দেখলাম একজন দামী স্যুট পরা লোক গাড়ি থেকে নামলো। বেশ মাঝবয়েসী মোটা মোটা থলথলে মানুষ।

দোকানে এসেই গড়-গড় করে কথা বলতে শুরু করে দিল—আরে, কী সর্বনাশ করেছেন মিষ্টার প্রেমলানি। মিসেস আমার অফিসে গিয়ে মহা তম্বি করছে আপনার নামে! আপনার স্টাফ্ কে ছিল তখন?

প্রেমলানি সাহেব হাসতে লাগলো।

বললে—কেন, কী হয়েছে?

—আপনি শোনেন নি কিছু? আপনাকে আপনার স্টাফ্ বলেনি?

প্রেমলানি সাহেব বললে—হ্যাঁ, বলেছে—

—এদিকে বলেছিলাম ও-হাটটার দাম পঞ্চাশ টাকার টাকা। আর আপনার স্টাফ্ বলে দিলে কিনা ষাটো মুক্তো। এখন আমি আমার মিসেসের কাছে কী করে মুখ দেখাই বলুন তো? আমার মিসেস জেনে ফেলেছে যে আমি তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি!

প্রেমলানি সাহেব বললে—ওই আমার হরিদাবুরই দোষ, ও যে আমার মিথ্যে কথা বলতে পারে না—

quality products from G.E.C.

Quality is the essential raw material without which the GEC product wouldn't exist. That's because the manufacturing specifications are narrowed down to the most rigid, although the range is wide enough so that almost all your electrical requirements and components are available at one source. It also means you save time, effort and cost when you rely on GEC.

G.E.C. YOUR GUARANTEE
THE GENERAL ELECTRIC CO. OF INDIA PRIVATE LTD.
Calcutta · Kanpur · Delhi · Bombay · Madras

GEC/G/858

ঠাকুরসাহেব বললে—এখন তাহলে কী হবে? এবারেও দেখছি আবার আমাকে ডিভোর্স কেস্ করতে হবে।

প্রেমলানি বললে—তা আপনি মিসেসকে কী বললেন?

ঠাকুরসাহেব বললে—আমি বললাম—না, কখ্খনো হতে পারে না। ওরা মুক্তো চেনে না। আমি ওটা বোম্বাই থেকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে কিনেছি যে! আমি বলেছি অফিস থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে আমি সেই দোকানে গিয়ে প্রমাণ করে দেব! আমি যে এখন আপনার দোকানে এসেছি তা মিসেস জানে না—

—তা হলে তো ভালোই হয়েছে। আপনি বাড়ী গিয়ে মিসেসকে নিয়ে আসুন দোকানে। আমি সেটা দেখে বিচার করে বলে দেব যে ওটা আসল মুক্তো!

—ঠিক আছে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিসেসকে নিয়ে আসছি।

বলে ঠাকুরসাহেব চলে গেল।

জিনিষটা আমার কাছে খুব মজা লাগছিল।

প্রেমলানি সাহেব হরিবাবুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী মুশ্‌কিলে ফেললে বলো দিকিনি ওঁকে। এ-বউও যদি আবার ওকে ডিভোর্স করে দেয়, তখন কী হবে বলো দিকিনি?

হরিবাবুও তেমনি লোক। বললে—কিন্তু আমি নকল জিনিষটাকে আসল বলে চালাই কী করে তাই বলুন?

—তা বললে যদি ওর উপকার হয় তো বলতে তোমার দোষ কী? তুমি তো কারো ক্ষতি করছো না—

হরিবাবুর তখনও সেই এক কথা। বললে—আমার জিভ্ কেটে দিলেও আমি তা বলতে পারবো না বাবু। সে আমার দ্বারা হবে না—

—তাহলে ঠাকুরসাহেব যখন বিবি নিয়ে আসবে তখন যদি আমি তোমাকে বলি, তুমি চুপ করে থাকতে পারবে তো?

হরিবাবু কিছু বলবার আগেই ঠাকুর সাহেবের গাড়ি এসে হাজির হলো। ঠাকুরসাহেব আর তার বউ গাড়ি থেকে নামলো।

প্রেমলানি সাহেব এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন ঠাকুরসাহেব, অনেকদিন যে আপনাকে দেখতে পাইনি। কেমন আছেন?

দোকানের ওপর উঠে এসে ঠাকুরসাহেব বললে—আপনার কাছে একটা কম্‌প্লেন আছে প্রেমলানি সাহেব। এই আমার মিসেস আপনার দোকানে এসেছিলেন একটু আগে একটা ঝুটো মুক্তোর নেকলেস কিনতে। ঠিক এর গলায় যে-নেকলেসটা রয়েছে সেই ডিজাইনের। কিন্তু এ-রকম আসল মুক্তোর নয়, ঝুটো মুক্তোর। একটা থিয়েটারের প্রোডাক্টশনের জন্য। তা আপনার স্টাফ কে ছিল জানি না, সে নাকি বলেছে এটা ঝুটো মুক্তোর, আসল মুক্তোর নয়—

ঠাকুরসাহেবের বউ হরিবাবুর দিকে দেখিয়ে বললে—ওই যে, ওই লোকটা। ভাট্ ম্যান—

প্রেমলানি সাহেব হরিবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি? বলেছে ওটা ঝুটো মুক্তো?

তারপর মিসেস ঠাকুরসাহেবকে বললে—আপনার হারটা দেখি একটু, দিন তো আমায়—

হারটা খুলে দিতেই প্রেমলানি সেটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর মুঠোর মধ্যে পুরে সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো। তারপর কাউন্টারের ওপর সেটা ফেলে রেখে দিয়ে হরিবাবুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি বলেছ এটা ঝুটো? বলো, কথা বলো, উত্তর দাও—

হরিবাবু এক কোনে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল।

—কথা বলো! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কথার জবাব দাও? এতদিন কাজ করছো, এখনও মুক্তো চেনো না? বসে বসে মাইনে নিলেই আমার দোকানের কাজ চলবে? বলো, কথার জবাব দাও—

হরিবাবু সেখানে তেমনি করেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কথা বলো, জবাব দাও? এটা ঝুটো মুক্তো?

ঠাকুরসাহেব বললে—থাক্ থাক্, ওকে আর বকবেন না মিষ্টার প্রেমলানি। ভুল হয়ে গেছে ওর, কী আর করবে! ছেড়ে দিন—

প্রেমলানি সাহেব বললে—না, ছাড়বো কেন? এতদিন দোকানে কাজ করছে, আর এই সামান্য মুক্তো চিনতে পারবে না। খদ্দেরই যদি খুশী না হলো তো ওকে আমার মাইনে দিয়ে রেখে লাভ কী? বেরোও এখান থেকে, বেরোও—

ঠাকুরসাহেব অনুনয় বিনয় করতে লাগলো—না, না, গরীব লোক, চিনতে পারেনি ঠিক, ছেড়ে দিন ওকে—

মিসেস ঠাকুরসাহেব বললে—মিষ্টার প্রেমলানি তো ঠিকই করছে, তুমি আবার ছেড়ে দিতে বলছো ওকে? ওকে তো এখনি ডিস্‌চার্জ করে দেওয়া উচিত—

প্রেমলানি তখন ঠাকুরসাহেবের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? কত দিয়ে কিনেছিলেন নেকলেসটা?

ঠাকুরসাহেব বললে—পঞ্চাশ হাজার টাকা। কেন বলুন তো?

প্রেমলানি সাহেব বললে—আমি আপনাকে সত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি। ক্যাশ্ ডাউন, বেচবেন আমাকে?

ঠাকুরসাহেব বললে—কী যে বলেন—

বলে নেকলেসটা নিয়ে স্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিলে।

দেখে মনে হলো মিসেস ঠাকুরসাহেবের রাগ সন্দেহ সব কিছু ঘুচে আসলে তখন উহুল হয়ে গেছে। আরও কোনও অভিযোগ নেই।

শেষ পর্য্যন্ত শ' ছেড়েক টাকার একটা ঝুটো মুক্তোর নেকলেস নিয়ে ঠাকুরসাহেব আর তার বউ গাড়িতে উঠে চলে গেল।

উপন্যাস
মৃগমদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শারদীয় সংখ্যা

বেলারঙ্গন

কবিরাজ প্রেস, এম, এস এন্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-১

মুনমুন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১

ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

রাতের ট্রেন। সব স্টেশন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাবে। ধরে-ধরে, ধীরে-ধীরে। তাই নিচের ক্লাশে প্রচণ্ড ভিড়। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি গালাগালি মারামারি চলেছে। সিট নিয়ে, মালামাল নিয়ে, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—এ সব তো মামুলি—শেষ পর্যন্ত, বসতে হলে কতটা ছড়িয়ে বসা যায়, আর দাঁড়াতে হলে দরজা ঘেঁসে দাঁড়ানো যায় কিনা এ সব সূক্ষ্ম অধিকার নিয়ে তর্ক। তর্ক কি আর তর্কের পর্যায়ে থাকছে? কতক্ষণ পরেই রসনা ভেতো ছেড়ে ঝালে চলে আসছে, আর তার আস্ফালনটা তর্জনীতে এসেই মুহূর্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে অপ্রত্যাশিত নম্র সুর: একটুখানি জায়গা হবে? যাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হচ্ছে সেও কেমন অন্য সুরে বেজে উঠছে হঠাৎ: 'হ্যাঁ, বসুন চাপাচুপি করে, একটু কষ্ট হবে, তা কতক্ষণের জন্যেই বা এই একত্র বাস—এই ঘেঁসাঘেঁসি, তারপর স্টেশন এসে গেলেই কে কার বসুন, সব ফাঁকা, ফক্কিকার।

ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পরই বিরোধে বচসা শান্ত হয়ে এল। যারা এতক্ষণ হিংসায় কুটিল হয়ে ছিল, তারাই এখন কেমন মমতায় বদান্য হয়ে উঠেছে।

একটা মুক্তির মধ্যে এসে পড়লে মানুষ বুঝি এমনি উদার হয়। তার দৈনন্দিন দীনতা ও ক্ষুদ্রতার ব্যথাবেদনার উপর আরামের প্রলেপ পড়ে।

খোলা মাঠ আর খোলা হাওয়ার সংবাদ দিতে-দিতেই তো ট্রেনটা চলেছে। পরের স্টেশনটা কী তা সকলেই জানে, তবু একেকসময় মনে হয় সে যে স্টেশনে এসে থামবে সে ঠিক সেই পরের স্টেশনটাই নয়, সে আরেক স্টেশন। অজানা, হয়তো বা আরেক রকম।

দরজার পাশে জানলা ঘেঁসেই বসেছে রথীন। তার এ সৌভাগ্যের কারণ তার সঙ্গে ভারি কোনো বাক্সবিছানা নেই। শুধু একটা ছোট সুটকেশ—তাতে শুধু একবেলার কাপড়-চোপড় আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম—সেই কারণেই বাক্সটা হালকা। এক হাতে সুটকেশ আরেক হাতে ট্রেনের হাতল, এক চেষ্টায়েই উঠে পড়তে পেরেছিল, আর যে হালকা এসেছে সেইই তো আগে উঠবে,

আগে ছুটবে, আগে গিয়ে দখলিকার হবে। সঙ্গে তোমার টিকিট আছে কিনা, গুণের স্পর্শ আছে কিনা সে পরের কথা। হটপাট করে আগে দখল তো নাও, পরের কথা পরে শোনা যাবে। কিন্তু তুমি হটপাট কী করে করে যদি তুমি না হালকা থাকো! গুরুর মালপত্র সঙ্গে থাকলে আরাম করে এমন বাঙ্কিতম আয়গাটিতে বসতে হত না। হালকা ছিল বলেই তো তার এত ঐশ্বর্য। মুখের উপর এত হাওয়া, চোখের উপর এত মাঠ, মাঠের পর মাঠ।

তবুও সে যথেষ্ট হালকা হতে পেরেছে কই? একটা অন্তত সুটকেশ তো নিতে হয়েছে, আর সেটা বেঞ্চির নিচে বহাল তবিয়তে আছে কিনা বারে-বারে দেখতে হচ্ছে সচেতন হয়ে। কে কখন তার বিরাট লটবহরের সঙ্গে এই পুঁচকেটা সামিল করে নেয় বলা যায় না। তারপর প্যাসেঞ্জারে ট্রেন, যাত্রীর ওঠানামা চলবে অবিচ্ছেদে, কে কখন নামবার সময়—আহা, হলই বা না ভুল করে—টেনে নেবে, বিস্ময়ের কিছু নেই। জিনিস শুধু জীবনের জায়গাই মারে না, জীবনকে উদ্বেগে আগিয়ে রাখে, নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। যদি এই সুটকেশটাও সঙ্গে না থাকত, কী আরামের হত, চোখ বুজে দিব্যি খানিকটা ঘুমিয়ে নিত, ঘুমুবার অদম্য সাহস হত। এখন মাঝে মাঝে চুল এলেও সেটাকে ঘুমে নিটোল করে তুলতে পারছে না, সুটকেশটাই বারে-বারে খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিচ্ছে। আসলে, ঐ সুটকেশটার জন্যেই তো তার যাওয়া, কত বছর পর ট্রেনে চড়া।

আর, পায়ে যার মোজা আর ইংরিজি জুতো, সে ঘুমোয় কী করে? জুতোর ঐ ফিতেই তো ঘুমের গলায় দড়ি। পরণে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি অথচ পায়ে জুতো-মোজা—এমন বিচিত্র পোশাক কে দেখেছে! অথচ তাই বলে এখন জুতো-মোজা খুলে ফেলে খালি-পা হবারও উপায় নেই, কেউ চকচকে জুতো জোড়াটাই না তুলে নেয়। জুতো যদি গেল তো সব গেল। তখন পায়ের নিচে সত্যিসত্যিই মাটি—খাঁটি মাটি।

নিজের পোশাকের কথা ভেবে মনে-মনে নিজেই কম হাসেনি রথীন। পর মুহূর্তেই ভেবেছে মানুষ এমনি কাটাকুটি দিয়ে তৈরি, এমনি হ্যাঁ—না, উলটো-পালটায় ভরা। খানিকটা তার স্বদেশী ধুতি-পাঞ্জাবি, খানিকটা আবার সাহেবি সু আর স্টকিং। বৈপরীত্য তার জীবনের বৈচিত্র্য। নইলে এই লোকগুলোকেই দেখ না। যারা মুখ চোখ কুঁচ করে এতক্ষণ বিষ ঝাড়ছিল তারাই এখন সহাস্য পরিহাসে মুখ চোখ কেমন স্নিগ্ধ করে তুলেছে। কে জানত এরাও শিশুর সারল্যে হাসতে পারে, আবার এই সারল্যের নিচেই পুষতে পারে কালনাগ।

একই সমুদ্রের মাঝে পাশাপাশি মুক্তো আর হাঙরের দাঁত।

কিন্তু যাই বলো ঘুমের দফা রফা। পা দুটোও যদি তোলা যেত বেঞ্চিতে। তা হলেও বুঝি আসনটা ঘুমের কাছাকাছি নেওয়া যেত। এমনি পা টান করে শক্ত হয়ে বসে কে কবে ঘুমুতে পেরেছে? তা ছাড়া ঘুমুবার আশা করেই তো সে থার্ড ক্লাসে ওঠেনি। ঘুমুতে পারবে না এই নিশ্চয় করেই তো সে সস্তায় টিকিট কেটেছে। তবে এখন ঘুম-ঘুম করছে কেন? চাই না, লাগবে না, দরকার নেই—এ সব সংকল্প করলেও যা স্বভাবের জিনিস তাকে বুঝি ঘটিয়ে দেওয়া যায় না, চোখ বুজে বারে-বারেই বুঝি তাকে পেতে ইচ্ছে করে। ঘুমুব না ঘুমুব না করেও ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু, না, বিচার করেই সজাগ থাকা দরকার। ঘুমে শিথিল হয়ে পড়লে যদি সুটকেশটা কেউ হাতিয়ে নেয়! তবে তো সর্বনাশ! সুটকেশের জন্যেই তো যাওয়া। সুটকেশটা যদি গেল

তো সমস্তই গেল। যেখানেই টের পাবে সে ওটা গিয়েছে সেখান থেকেই ওকে ফিরতে হবে। আর এগুনো যাবে না।

একটা বিস্তুকে পাতালা দেবার জন্যে জেগে থাকাটা তো বুদ্ধিমানের কাজ।

মন্দ কী এমনি জেগে থাকা। জেগে থেকে অন্ধকার দেখা। অকূল অন্ধকার দেখা। এমনিতে জেগে থাকলে নিজেকে খুব অসহায় লাগত, অবসন্ন লাগত, কিন্তু এখন ছুটন্ত ট্রেনে বসে আছে বলে নিজেকে খুব বলবান বলে খুব নির্ভয় বলে অনুভব করছে।

ছুটন্ত ট্রেনটাই যেন একটা আশা। অক্লান্ত আশা। যেন কোন এক নতুনের ঘরে তাকে পৌঁছে দেবে, খুলে দেবে নতুনের কৌটো। সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে অভাবনীয়ের সঙ্গে।

রথীন মনে-মনে জানে হবে না, তবু আশার এমনি জাদু, যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ঠিক উৎসাহিত করে রাখে। আলোটা ম্লান হতে দেয় না। তারপরে আশাটি ভস্মসাৎ হয়ে যাবার পরেও, একটা অঙ্গারকণা কুড়িয়ে এনে আবার ফুঁ দেয়, আলো করবার চেষ্টা করে। শুকনো গাছে আবার একটা পল্লব জাগায়।

আশা বুকে নিয়ে এমনি রাত জাগাটাও তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সে যে কোনো একটা উপায়ে এমনি বেরিয়ে পড়তে পেরেছে, ট্রেনে চড়ে যেতে পারছে কোন এক সাফল্যের উদ্দেশে এটাই তো একটা বিরাট জাগরণ।

একেবারে চূড়ান্ত হয়ে যাবার আগে কে বলবে সাফল্যেই উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি না?

আর কী সুন্দর এই স্তব্ধতা! এমনটি কি আর কোনোদিন দেখেছে? শুনেছে? স্পর্শ করেছে?

ট্রেনের চলার শব্দটা যেন স্তব্ধতার নিশ্বাস।

সব কিছুই যেন স্তব্ধতার শরীর। লোকজন মালপত্র আলো অন্ধকার—সমস্ত।

তবু, স্বভাবের জিনিস, ঘুমকে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে?

নিজেরও অজান্তে একটুখানি ঘুমিয়েও পড়েছিল বুঝি। হৈ হল্লা শুনে জেগে উঠতে দেখল, স্টেশন। তাড়াতাড়ি বেঞ্চির নিচে পা পাঠিয়ে খবর নিয়ে দেখল সুটকেশটা নিটুট আছে। ট্রেনটা ছাড়তে, এবার মনে হল, কোথাও যদি উপুড় হয়ে সবটা চেলে শুয়ে পড়া যেত? স্বভাবের জিনিসের এমনি মজা, খেতে দিলেই খিদে বাড়ে। একটু ঘুমের আস্বাদ দিয়েছে কী, শরীর এখন অতল চাইছে! আর বলছে না ব্রহ্মচারী থাকি। বজ্রাসনে বসে তপস্বীর ভঙ্গিতে রাত জাগি।

এবার একটা স্টেশন আসতেই রথীন নেমে পড়ল। এখানে ট্রেনটা বুঝি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে। প্ল্যাটফর্মে একটু হাঁটাহাঁটি করতে লাগল, অন্য কামরাগুলির কী হাল। থার্ডক্লাশগুলিতে সমান ঠাসবুনন, হঠাৎ, কী আশ্চর্য, দেখতে পেল অদূরে একটা সেকেণ্ডক্লাশ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। আর কথা নেই, যা লাগে দেব গুনাগার, ছুটে সুটকেশটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে সোজা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় ঢুকে পড়ল।

মাঝে মাঝে এক-আধটা সিগারেট খায় রথীন। ভাবল এখনই একটা সিগারেট খাবার সময়।

গোড়াগুড়ি থেকে সেকেণ্ডক্লাশ কাটলেই তো পারত। না, থার্ডক্লাশে গিয়ে সেকেণ্ডক্লাশ চার্জ করলেই তো টি-এতে কিছু রাখা যায়, তাই থার্ডক্লাশটাই বরাবর অভ্যস্ত! কিন্তু এ যাত্রায় তো টি-এও নেই। তাই নিয়তম ছাড়া গতি কী। রথীনের পয়সা খোলামকুচি নয়।

কিন্তু তখন? উপায়ান্তর নেই। 'ডিফারেন্স' যা হয় দিয়ে দেব। যদি সুযোগ-সুবিধে হয় কিছু গুঁজে দিয়েও পার হয়ে যেতে পারি। হিসেবে একটা কিছু কারচুপি করে নিলেই হবে। নতুন জায়গায় বেমক্কা অনেক কিছু খরচ হয়ে যেতে পারে কে তার হদিস করবে? তাই বলে দীর্ঘরাত্রির সমস্তটাই জেগে কাটাতে হবে এমন কী কথা আছে! একটু ঘুমিয়ে না নিলেই বা সকালবেলায় কী রকম দেখাবে! মুখ অসম্ভব বোঝা, চোখের কোলে কালি, চলা-বলা আড়ষ্ট, ন্যাকাশে, সকাল-বেলায় আর তাকে দেখতে হবে না। এক দোর দিয়ে ঢুকবে আরেক দোর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করল। বেকির আধখানা পেলেই আরাম চলে যাবে।

'কদ্দুর যাবেন?'

'আসানসোল।'

'কখন পৌঁছুবে?'

'ভোর রাত্রে।'

'আমি রসুলপুরে নেমে যাচ্ছি। এই গোটা বেঞ্চিটাই আপনি পাবেন।'

রসুলপুর আসতে গোটা বেঞ্চিটাই রথীন পেয়ে গেল। সুটকেশটা মাথায় বালিশ করে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ঘুম ভাঙল একেবারে সেই রানিগঞ্জে।

চেকার আসেনি ইতিমধ্যে। ফেঁসে গিয়েছে। শীর্ণ মণিব্যাগটা শীর্ণতর হল না। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে রথীন তার আগের কামরায় উঠল।

জায়গাটা অন্যে দখল করে নিয়েছে। নিক গে। বাকি রাস্তাটুকু সে দাঁড়িয়েই যেতে পারবে। ঘুমও একটু হয়েছে, আর গচ্চা কিছু যায় নি সেইটেই সোয়াস্তি।

টাকা একটা বেমাইনে খরচ হয়ে গেলে হিসেব মেলাতে প্রাণান্ত।

২

আসানসোলে নামল রথীন। ভোর হয়-হয়, আকাশে কেমন একটা ঠাণ্ডা মমতা মাখানো। দেখলেই মনে হয় কার সঙ্গে যেন দেখা হয়ে যাবে।

মনে-মনে হাসল। দেখা আর দেখানোর জন্যেই তো তার আসা। এখন তার কাজ হচ্ছে গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শহরের কোনো একটা শস্তা হোটেলে আশ্রয় নেওয়া।

হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল।

কী ব্যাপার?

তেমন কিছু নয়। যা সর্বত্র সর্বদা হয়ে আসছে। একটা উইদাউট টিকিট যাত্রী ধরা পড়েছে। ব্যাপারটার মধ্যে এইটুকুই অভিনব যে যাত্রীটি মেয়ে।

হিন্দুস্থানী মেয়ে। মেয়ে না হয়ে বউ বললে ঠিক হবে। কেননা ঘোমটা-টোমটা টেনে খুব চাকাচুকি দিয়ে বসেছে। যেন একটি লজ্জার স্তূপ। ভিজে মাছটি উলটে খেতে জানে না। মেয়েদের

কামরায় না উঠে সাধারণ কামরায় উঠেছে। তাইখানা এই পুরুষযাত্রীদের মধ্যেই কেউ রয়েছে তার অভিভাবক। সে একাকিনী নয়। একাকিনী চলবার মত তার বয়স নয়।

কিন্তু সকলেই যে যার টিকিট দেখাল, এ মেয়েটির তার কেউ নিতে চাইল না। টিকিট চেকার জিজ্ঞেস করল, তোমার আদমি কই?

মেয়েটা ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলে, পরে বললে, দোসরা কামরায় আছে।

সেটা যেন ভেবেচিন্তে গবেষণা করে বলবার মত। যেন অন্য কামরায় আলাদা হয়ে উঠতে হলে মেয়েটাকে বলে যাবে না! পুরুষের কামরায় মেয়েটাকে তুলে দিয়ে সে বুঝি নিজে মেয়ে-কামরায় উঠতে যাবে? পুরুষের কামরায় মেয়ে নিয়ে ওঠার মানেই তো একসঙ্গে থাকার সুবিধে নেওয়া। কিন্তু এ যে দেখি অন্যরকম।

সঙ্গত কারণেই টিকিট চেকারের সন্দেহ হতে বাধ্য।

স্টেশনে মেয়েটা নামলে চেকার বললে, কোথায় তোমার আদমি?

মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থেকে শেষে কান্না জুড়ে দিল: ওকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ও অন্য ভেগে গিয়েছে। আমার তবে কী হবে? ওর কাছেই যে আমার টিকিট, আমার টাকাকড়ি, আমার গয়নাগাঁটি।

মেয়েটা বসে পড়ে পাশে হাত রেখে ঘাড় কাত করে তারস্বরে কাঁদতে লাগল।

প্যাসেঞ্জারের মধ্যে কেউ তার সাহায্যে এসে দাঁড়াল না, কেউ তার আদমির নাম-গন্ধের সঙ্গেও পরিচিত নয়। কেউ-কেউ শুধু হাসল। কেউ-কেউ স্পষ্ট করেই বলল, বদমাস। ঝুট-বলনেওয়ালী।

কিন্তু নাটকটা অন্যত্র।

মেয়ে-চোরের সঙ্গে টিকিট চেকারের কী করে কী কারবার হয় দেখবার জন্যে অনেকের সঙ্গে রথীনও একটু দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ শুনতে পেল ভিড়ের মধ্য থেকে কে বলে উঠল: এই যে লেডি—চেকার এসেছে।

মেয়ে-পুলিশ। আরেকজন কে মন্তব্য করল: এবার নির্ঘাত গারেন্তা হবে।

রথীন তাকিয়ে দেখল একটি ছিমছাম দীর্ঘাঙ্গী বাঙালি তরুণী। হাতে রসিদ-বই আর পেন্সিল।

মেয়েদের কত রকমের হস্তসজ্জা দেখেছে রথীন। খাতা-বই ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, এমনিতে কত রঙ-বেরঙের আকার-বিকারের ভ্যানিটি ব্যাগ বা ছুটুনির ডিবে—নয়তো কখনো কখনো বা গীটার বা সেতার। না, না, হাতে খাতা-পুস্তিও দেখেছে, দেখেছে ঝাঁটাগাছ। কিন্তু রসিদবই ও পেন্সিল হাতে এমনটি কখনো দেখেনি।

কী হয়েছে এক মুহূর্তে বুঝে নিল রেখা। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে চেকারকে বললে, এ কেস আমার।

কিন্তু একা ঐ মেয়ে এই চোরের সঙ্গে পারবে? কে জানে আশে-পাশে সাগরেদের দল অপেক্ষা করছে কিনা? চোরের সাগরেদ ওতা ছাড়া কে হবে? চোর যদি টিকিটের দাম বা জরিমানা না দেয়, তা হলে ও চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারবে? যদি বাধা দেয় ও পারবে ঘায়েল করতে? যদি বলা-কওয়া নেই, মারামারি বাধায় কে সাহায্য করবে ওকে? কে আড়াল করে দাঁড়াবে?

রেখা সরকারি কাজ করছে, সে জানে কখন কী ভাবে কী করতে হবে, তুমি পথচারী আগন্তুক, তোমাকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার মাথার কোনো মূল্য নেই। তুমি বরং তোমার হোটেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ো।

কিন্তু, না, অপ্রত্যাশিত ফল ফলল। লেডি-চেকার দেখেও তার বিশেষণ মেয়ে-পুলিশ শুনে হিন্দুস্থানী মেয়েটা বুঝি ঘাবড়ে গেল, আঁচলের খুঁট খুলে পয়সা বের করতে-করতে বললে, এই কালিপাহাড়ি থেকে উঠেছি। যা হয় কমসম করে একটা ঘরে দিন—

রেখা মিষ্টি করে হাসল। একে তো কাছাকাছি স্টেশনের নাম করেছে, তাও বলছে কমসম করে নিতে। আইন যে কত কঠিন তা হয়তো ওর জানা নেই। কিন্তু দোষ স্বীকার করতে বলেও অসহায় মানুষ মিথ্যে ঢালার মানুষের সেই আদিম স্বভাবের প্রতি একটি লকরুণ কৃপাই যেন সেই হাসিতে রেখায়িত।

কিছু একটা হিসেব করবে বলে হাতের পেন্সিলটাকে রেখা জীবন্ত করেছে অমনি পাশের থেকে পুরুষ চেকার বলে উঠল: 'এ কেস আমার। এ কেস আমি ধরেছি।'

'যা, এ যে স্ত্রীলোক!' রেখা হাসি-হাসি মুখ করল।

'তাতে কী।' দ্বিজেন কর্মকার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'তাতে কী মানে? স্ত্রীলোক ডবলিউ-টি লেডি চেকার ডিল করবে না?'

'এমন কোনো পাকাপাকি আইন নেই।' দ্বিজেন বললে, 'পুরুষও স্ত্রীলোক ধরতে পারে, স্ত্রীলোকও পুরুষ ধরতে পারে। যে যাকে যেমন পায়।'

'কিন্তু আমি পাই কই?' রেখার হাসিতে এবার বুঝি কান্নার ছোঁয়াচ লাগছে।

'আপনার এলাকা কিমেল কম্পার্টমেন্ট, সেখানে দেখুন।'

'দেখেছি। একটাও নেই। এ কেসটা আমাকে দিন।'

'এ আমি ধরেছি। এ আমি আপনাকে দেব কেন?' দ্বিজেন একটু বুঝি রুক্ষ হল: 'আপনি দেন?'

রেখার তবুও তাতে জ্বালা নেই, অভিমান নেই। বললে: 'এতদিন ধরে আমার একটাও কেস হচ্ছে না। আমার রসিদ-বই ব্লাঙ্ক যাচ্ছে।'

'তার আমি কী করব!'

'আপনার থেকে দু একটা কাজ আমাকে দিয়ে দিলে কী ক্ষতি হয়?'

'অনেক ক্ষতি।'

রেখা কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল। তবু শেষবারের মত বললে, 'কতদিন একটাও ধরতে পারছি না। সব লোক সাধু হয়ে গেছে এ কি উপরওয়ালা বিশ্বাস করবে? ভাববে আমিই ইনএফিসিয়েন্ট—'

তবু দ্বিজেনের একটুও মমতা নেই। মহর নেই। সে তবু একটু ফাঁক খুঁজছে কী করে হিন্দুস্থানী মেয়েটার সঙ্গে বকায় আসবে।

চোর যখন ধরা পড়েছে বা নিজের থেকেই ধরা দিয়েছে তখন ভিড়ের আর উৎসাহ রইল না। হিন্দুস্থানী মেয়েটা যদি অভিযোগ অস্বীকার করে বলতে পারত, টিকিটটা এই তো আপনি

নিয়ে নিলেন হাতের থেকে, তা হলে যে গল্পটা সুরু হত তাতে, স্ত্রীলোক কখনো অবিশ্বাস্য নয় এই শুভুহাতে হিন্দুস্থানী মেয়ের পক্ষ নিয়ে একলাত ঠেঙাতে পারত চেকারকে। কিন্তু নাটকটা সেই দিক দিয়েই গেল না, চোর নিজেই খুঁট খুলে পয়সা গুনতে বসল। ভিড় তাই নিমেষে পাতলা হয়ে গেল। চেকার আর চেকারণীর মধ্যে মান-অভিমানের যা খণ্ডযুদ্ধ ঘটছে তাতে জনতার কোনো অংশ নেবার নেই।

হতাশ মুখে চলে যাচ্ছে রেখা, রথীন হঠাৎ ডাকল : 'শুনুন—'

রেখা পিছন ফিরে তাকাল।

'আমাকে বলুন।'

'তার মানে?' বিরক্ত হবে কিনা রেখা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'আপনি বলছিলেন না কতদিন একটাও ধরতে পারেন নি।'

'সে তো চুরির কেস—'

'হ্যাঁ,-সেই কেসের কথাই বলছি।' শৈশবসাহচর্যের সুকোমল বুঝে রথীন বললে, 'আপনার ভায্য কেসটা ঐ চেকার কেমন নিয়ে নিল—'

রেখা সেদিক দিয়ে গেল না। জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, আপনার কী হয়েছে?'

'আমার থার্ডক্লাশের টিকিট, কিন্তু জানির খানিক অংশ আমি সেকেণ্ড ক্লাশে ট্র্যাভেল করেছি—ঘুমুবার জন্যে। সেই এক্সেস্‌টা আমি দিয়ে দিতে চাই।'

'রাত্তায় কেউ ধরেনি?'

'না।'

'যখন ঐ চেকার চেক করছিল তখন কোথায় ছিলেন?'

'তখন—তার আগেই তো আমার সাবেক থার্ডক্লাশে ফিরে এসেছি। তাই ধরতে-ছুতে পেল না, কোনো গোলমাল হল না।'

শ্রদ্ধার চোখে তাকাল রেখা। এমন অকপটে কেউ সত্য কথা বলে নাকি? চড়বার সময় থার্ডক্লাশ, নামবার সময় থার্ডক্লাশ, মাঝখানে খানিকটা পথ সেকেণ্ডক্লাশ—সেই মধ্যবর্তী সময়টাও ঘুমে নিশ্চিন্ত যাত্রাশেষে নিরাপদে অবতরণের পর অপ্রমাণিত অপরাধের জন্যে কেউ স্বেচ্ছায় জরিমানা দিতে এগিয়ে আসে—এ যেন রেখা ভাবতেই পারে না। আর এসেছে যে কতকটা তারই প্রতি সহৃদয়তায় এটাও তাকে একটা শিহরণ এনে দিল।

বললে, 'খানিকটা পথ যে হাওয়ার ক্লাশে এসেছেন তার কোনো এভিডেন্স নেই। তবে শুধু শুধু একসেস্ দিতে যাবেন কেন?' রেখার গলায় আপনা থেকেই আত্মীয়তার সুর বাজল।

'ও যেমন একটা ধরেছে তেমনি আপনিও একটা ধরতেন। আপনার একটা কেস হত।'

'ওর তো না ধরে উপায় ছিল না। প্যাসেঞ্জারের টিকিটই নেই। কিন্তু আপনার তো টিকিট আছে—'

'হ্যাঁ, এই যে।' হাতের মুঠ খুলে টিকিট দেখাল রথীন।

'তবে? কোথায় প্রমাণ যে মাঝখানে খানিকটা সেকেণ্ডক্লাশ ছিল? আপনি নিজেই হয়তো ভুল করছেন—মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলছেন না?' দিব্যি সমতলে এসে হাসল রেখা :

'হয়তো সেকেণ্ডক্লাসটাই আপনার বরাদ্দ। মিছিমিছি বেচে কেন দিতে যাবেন? কেউ আপনাকে ধরেছে।'

'না, আমি ধরা দিতে এসেছি।' রথীন যেন কী রকম করে কথাটা বললে।

রথীন যদি মায়া দেখাতে পারে, রেখাও পারে। বললে, 'যা দিন কাল, টাকা অত শস্তা নয়। শুধু-শুধু অত উদারতা দেখাবার দরকার নেই।'

টাকা যে শস্তা নয় রথীনের চেয়ে কে আর বেশি জানে! সাধ করে একদেস্ দিতে গেলে কত যে নির্যাতনের মত ভোগ করতে পারত তার হিসেব খুলে গিয়েছিল। যা চাইত তাই দিয়ে দিত। কী করা! কখনো-কখনো এমন একেকটা অবস্থা আসে যখন অপ্রতিবাদেই সব দিয়ে দিতে হয়। হাঁ-না করবারও সময় পাওয়া যায় না।

তবু বুঝি রথীন খানিক দ্বিধা করছিল, যেন বিবেকের দংশন অনুভব করছে বলেই তার এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব—রেখা নিজের থেকেই কের বললে, 'দরজায় টিকিট দিয়ে সোজা বেরিয়ে যান। আপনার কিসের ভাবনা!'

কিন্তু দ্বিজেন কর্মকার ঠিক শুনতে পেয়েছে। হিন্দুস্থানী মেয়েটার সঙ্গে কী একটা জরুরি ব্যবস্থা করে চলে এসেছে এদিকে। বাঘের গন্ধপাওয়া হুলো বেড়ালের মত।

'কী হয়েছে?' রেখার থেকে বেশ খানিকটা তখন সরে এসেছে রথীন, দ্বিজেন তাকে পাকড়াও করল।

কে জানে কেন রথীন রেখার দিকে তাকাল।

রেখা তার চোখের দৃষ্টি ঘন করে তাকে স্পষ্ট ইশারা করল, চলে যেতে। যেন না দাঁড়ায়। কথা না বলে।

'কী হয়েছে মশাই?' দ্বিজেন প্রায় ঘুষিয়ে এল।

রেখার ইশারার মান রাখল রথীন। কথা না বলে সোজা এগিয়ে গেল।

কিন্তু একবার পিছন ফিরে না তাকিয়ে কি থাকা যায়? যে এমন একটা অভাবনীয় ইশারা করল তাকে আরেকটিবার দেখবে না?

ওভারব্রিজের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল রথীন। দেখল দ্বিজেন রেখার কাছাকাছি হয়ে কী জিজ্ঞেস করছে আর রেখা রাগে একটা ঘুরনা দিয়ে শুদ্ধমুখে সটান বেরিয়ে এসেছে। ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকেই আসছে বুঝি এগিয়ে। কে জানে রথীনকেই বুঝি আরো কটা কথা বলার থেকে গেছে তার।

রথীন একটু থামল। রেখা তার পাশ দিয়ে সোজা উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর কী কথা বলবার থাকতে পারে? চরম উপদেশ তো তাকে দেওয়া হয়ে গিয়েছে—সোজা বেরিয়ে যান।

পাশ দিয়ে এমন ভাবে উঠে গেল যেন চেনে না। চেনেই না তো। যেন একটাও কথা বলে নি কখনো। আহা, সে এমন কী কথা! টিকিট চেকারি করতে গিয়ে এমন কত কথা কত প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বলতে হয়, তার এমন কী মূল্য! কে আবার তার ধের টানে!

কিন্তু ঐ ইশারা?

সে তো বিদেশের প্রতি অভিমানে। যাতে বিদেশ না কিছু সুবিধা করতে পারে!

কিন্তু কি জানি কী! অনন্তের যেন একটু অতিরিক্ত উঁকি মেরেছে সেই চাহনিতে। যেন কোন প্রচ্ছন্ন থেকে আর কেউ তাকিয়েছে!

'দেখুন।' উপরে চালা ব্রিজের মাঝামাঝি রথীন এগিয়ে এসে ধরল রেখাকে। বললে, 'মাপ করবেন। একটা হোটেলের খোঁজ দিতে পারেন?'

'হোটেল?' হাতের পেন্সিলটা রেখা ঠোঁটে এনে ঠেকাল।

'আমি এখানে নতুন এসেছি। পথঘাট কিছু জানিনা। আপনি এখানে হয়তো অনেক দিন আছেন তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। কাছাকাছি কোথাও সস্তা হোটেল আছে?'

ভদ্রলোক কী সরল! রেখা হাসল। সরল না হলে হোটেলের কথা তাকে জিজ্ঞেস করে? নেমে গেলেই তো হোটেলের কত দালালের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আমি জানিনা, হোটেলের কোনো প্রতীক্ষমান এজেন্টকে জিজ্ঞেস করুন, এমন একটা কঠিন কথা বলে সরে পড়তেও রেখার মায়া হল। সরল নিরীহ অসহায়দের প্রতি অজান্তেই বুঝি মায়া হয়! সরল নয় তো কী! নইলে কেউ যেচে টিকিটের একসেস্ দিতে চায়?

'হোটেল!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করল রেখা। এখন আর আহত বিস্ময় নয়, এখন যেন সন্দেহ প্রশ্ন। যেন চিন্তা করছে সাহায্য করতে পারে কিনা। যেন তাকে বিশ্বাসী বলে ঠাউরেছে তাই তারই কাছে নিতে চাচ্ছে খবর। যেন রেখা একটা বাজে খবর দিয়ে তাকে বিপন্ন করতে পারে না!

বললে, 'কাছাকাছি মহেন্দ্র নিবাস আছে, দেখতে পারেন।'

'সস্তা হবে তো?'

'তা কী করে বলি।' রেখা আবার হাসল: 'তবে নাম থেকে মনে হচ্ছে খুব বেশি দামী কিছু হবে না।'

'ঠিক বলেছেন। আমারই বোঝা উচিত ছিল। আমার অবশ্যি একবেলার থাকা। বিকেলেই ফিরে যাব। আচ্ছা বিকেলের কোন ট্রেনটা সুবিধের বলতে পারেন?'

এ নিতান্ত নিরর্থক। গম্ভীর হল রেখা। বললে, 'টিকিটের কাউন্টারের কাছে দেখবেন বোর্ডে ট্রেনের টাইমিং লেখা আছে, তাই থেকে নেবেন।'

'ও, ঠিকই তো।' অপরাধীর মত মুখ করল রথীন: 'তাছাড়া ইন্টারভিউ কখন শেষ হয় তা কে বলতে পারে। রেজাল্টটা আজই বলে দেয় কিনা তারই বা ঠিক কী।'

'ইন্টারভিউ!' না বলে পারল না রেখা: 'কোনো চাকরি?'

'হ্যাঁ, হবে না। শুধু একটা চেষ্টা। আচ্ছা, প্রীজ, দেখুন তো এ ঠিকানাটা কোথায়?' রথীন পকেটের থেকে একটা কাগজ বের করল।

রেখা দেখল কী একটা ঐকালো কোম্পানির নাম। এমনি কত শত কোম্পানি এই শিল্পাঞ্চলে। সে তার কী খবর রাখবে? বললে, 'বলতে পারব না।'

কাগজটা ফের পকেটে পুরে রাখতে-রাখতে রথীন বললে, 'তা, মহেন্দ্র নিবাসই বলে দিতে পারবে আশা করি।'

'হ্যাঁ, কেউ না কেউ পারবে মনে হয়।'

'আচ্ছা কী বলেন চাকরিটা পাব?'

কী ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন! রেখা না হেসে পারল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবল বড্ড বেশি গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চাচ্ছে। অথচ একেবারে যে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে তারও পাত্র নেই। বলা উচিত ছিল, পাবেন কি না তার আমি কী জানি! কিংবা, যদি কপালে থাকে পাবেন। ও সব কিছু কাট-কাট না বলে বললে, 'যদি সুনজরে পড়ে যান পেয়েও যেতে পারেন।'

রথীনের মনে হল রেখারও তো ইন্টারভিউ দিয়েই চাকরি—তা হলে সেও নিশ্চয় কারু সুনজরে পড়েছিল। অন্তত ও কথাটা বলবার সময় তার চোখে মুখে ভঙ্গিতে কী রকম একটা আলো ফোটাল যাতে মনে হয় ও বুঝি এখনো সুনজরে পড়বার মত।

'আমাদের কে ভালো চোখে দেখবে? একটা এপ্লিকেশন পাঠিয়েছিলাম, কোনোদিন আসে না, হঠাৎ দেখি ইন্টারভিউর কল এসে হাজির। বুঝতেই পাচ্ছেন দারুণার' রকমের ব্যাপার। অথচ আমাদের, কল দিতে আর বাধা কী! তারপর এই তো চেহারা—সারা রাত ঘুম নেই—'

আপনি কি জানেন?

মধ্য-ইওরোপের কেন্দ্রস্থলে একটি দেশ আছে

- আয়তনের বিচারে যে-দেশটির স্থান বিশ্বে ৯২তম
- জনসংখ্যার বিচারে যে-দেশটির স্থান বিশ্বে ২৯তম

কিন্তু

- শিল্পোন্নয়নের বিচারে যে-দেশটির স্থান

বিশ্বে প্রথম দশটির মধ্যে ও ইওরোপে প্রথম পাঁচটির মধ্যে

এই দেশটির নাম

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

আপনি যদি এই দেশটি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চান তাহলে পড়ুন

তথ্য পত্রিকা	সূচনা পত্রিকা	ইনফরমেশন বুলেটিন
সচিত্র বাংলা মাসিক	সচিত্র হিন্দী মাসিক	সচিত্র ইংরাজী মাসিক

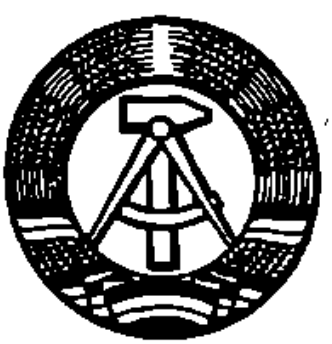

প্রতিটির বার্ষিক চাঁদা দু'টাকা

প্রকাশক :

বাণিজ্য প্রতিনিধি-সংস্থা, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

পি-১৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১৩

'সে কী! এই যে বললেন আপনার চোখে উঠে ঘুমোলেন?'

'আপনার চোখে উঠলেই কি আর ঘুম আসে? অপরাধীর মন তো, শান্তি পাওয়া যায় না। তা, আপনিও তো ঘুমুতে পান নি বলে মনে হচ্ছে।'

ক্লান্ত চোখে একটু হাসল রেখা। বললে, 'আমার তো রাত-আগারই চাকরি। যখন যে রকম ডিউটি পড়ে, যে ট্রেন যেমন ম্যাটেও করতে হয়। তবু তো এখন আমি বাড়ি গিয়ে স্নান করে ঘুমুতে পারব, আপনার তো তারও উপায় নেই। আপনাকে তো রেডি হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে, তাই না? ক'টায় ইন্টারভিউ?'

'সাড়ে দশটায়!'

'ভোরের ট্রেনটাতে এসেছেন দেখেই বুঝতে পারছি।'

'আচ্ছা রিকেলে কি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

'কী করে বলি!'

গেটে টিকিটটা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই রথীন দেখল রেখা কোথায় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কী করে বলি! এমন সুন্দর করে বলল।

কোথায় যাবেন?

মহেন্দ্র নিবাস।

লোকটা এমন ভাব দেখিয়ে সরে গেল যে ওটা একটা যাবার মতই জায়গা নয়।

রথীন একটা রিকশা নিল। মহেন্দ্র নিবাস? এই কাছেই।

ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে কিন্তু। যাতে রথীনের না বিশেষ অসুবিধে হয়। যাতে খুব একটা খরচের মধ্যে না পড়ে। ঐ যে লোকটা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সরে পড়ল সেটা একটা ট্যাক্সিওয়ালা। মহেন্দ্র নিবাসটা ট্যাক্সির বিষয়বস্তু নয়।

রিকশা করেও কেউ যায় না, যদি অবশ্যি অন্য বাধা না থাকে। রথীন যেমন হালকা, অনায়াসে পায়ে হেঁটেই চলে যেতে পারত।

এ সব কী?

রেলওয়ে কোয়ার্টার্স।

এ সবের কোনো একটা অংশে ঐ মেয়েটি থাকে কিনা তা কে বলবে। কোথায় থাকে তাই বা কে জানে। কোথায় থাকেন, আপনার ঠিকানা কী এ তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দিলেই বা ধরে কে!

সত্যিই কোথাও থাকে কিনা তারই বা ঠিক কী! মুগ্ধ মনে এও রথীন একবার কল্পনা করল। হয়তো স্বপ্নের দেশের মেয়ে, কিছুক্ষণের জন্যে মাটিতে নেমে এসেছিল। হয়তো বা এই ভোরবেলার নম্র অমল পবিত্রতা দিয়ে তৈরি। প্রথম কোটাফুলের সাবণ্য দিয়ে।

স্বপ্নের দেশের মেয়ে না আরো কিছু! হাতে রসিদ-বই আর পেন্সিল, রসিদ বইয়ের পাশ থেকে কার্বন-কাগজ উঁকি মারছে, শাড়ির পাড়ের নিচে সায়ার লেসের মত, পায়ে খুটখুটে জুতো, অমন একটা আওয়াজ না থাকলে কিছুতেই একটা কর্ত্রী-কর্ত্রী ভাব কোটে না, ঘুমো-ঘুমো দুটো চোখ, কোথাও বা বেশ একটা শ্রান্তি ও রুক্ষতারও আভাস আছে—সব মিলিয়ে আমাদোড়া বাস্তবতার চেহারা।

মনে-মনে হাসল রথীন। কেমন গেটের কাছে এসে টুক করে মিলিয়ে গেল। কেমন প্রয়োজনের বাইরে একটিও বেশি কথা কইল না। কেমন সদয় হয়েও নির্লিপ্ত রইল।

আশ্চর্য, নামটাও জেনে নেওয়া হয়নি। নাম কী, যেন জিজ্ঞেস করা যায়! আর, জিজ্ঞেস করলেই যেন সুমধুর উত্তর মেলে!

যখন আর দেখাই হবে না তখন নাম দিয়ে কী হবে? আজকের এই ভোরবেলাটির নাম কী?

কী নাম তার এই নতুন মনোভাবের?

কিংবা তার যে মন আজ নতুন জন্মাল সেই নবজাতকের সে কী নাম রাখবে?

মনে পড়লেই ভাববে, স্টেশনের মেয়ে। জীবনের কোনো এক স্টেশনে কুড়িয়ে পাওয়া একটি সাময়িক বিশ্রাম!

মানুষের অহেতুক মমতার মত চিত্তের বিশ্রাম আর কী আছে?

'কত?' মহেন্দ্র নিবাসের দোড়গোড়ায় নেমে রথীন রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল।

'আট আনা।'

আশ্চর্য, আট আনাই দিয়ে দিল রথীন। দরাদরি করলে কোন না দু'আনা কমাতে পারত! কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত কার্পণ্যের কোটর থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। উদার হাতে এমনি কত যেন সে খরচ করতে পারে। তাতে তার কোথাও যেন একটুকু বাধে না। রিকশাওয়ালা যে খুশি হল, সদা হাতে সেলাম ঠুকল, এই যেন একটা প্রকাণ্ড জিনিস।

শুধু একটু স্বচ্ছল হয়ে উদার হয়ে মানুষের সামান্য একটু উপকার করতে পারার মত আনন্দ আর কী আছে!

৩

একেবারে খাবেন, মশাই। বিকেলের ট্রেনেই ফিরে যাব। যেমন-তেমন একটা সিট হলেই চলে যাবে। থাকব আর কতক্ষণ।

তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নিল। খালায় করে যা এসে দিল তাই গপাগপ করলে। যাই কী, জিভকে জিজ্ঞেস করল না। পেট ভরল কিনা তাও আমল না দিলেবে।

তারপর সুটকেশ খুলে পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক পরল। ঘরের মধ্যে দেয়ালে আয়না ছিল তার দিকে তাকাল। শার্টে-টাইয়ে কোটে-প্যান্টে নিজের চোখে নিজেকেই কেমন সুন্দর লাগল। হতভাগা জুতোর দিকে তাকাল তারপর। ছাড়া কাপড়টা দিয়ে বেশ করে রগড়ে নিল। খালি কামড়ে ঝাঁকড়ে থাকতেই জানে, ঝকমক করতে জানে না। ওতেই হবে। পায়ের দিকে কে তাকায়! মুখের দিকে তাকিয়েই সব কিছু। এখন কেমন স্মার্ট, সজীব দেখাচ্ছে, নতুন যৌবনে ফিরে আসা সত্যিই সুন্দর। রথীনের হাতে যদি নির্বাচনের ভার থাকত, সন্দেহ কী, এই রথীন ঘোষালকেই সে দিয়ে দিত চাকরিটা। আর কারু না হোক সে নিজের গুনজরে পড়েছে।

মহেন্দ্র নিবাসই ইনটারভিয়ুর আয়গাটার পাত্তা দিয়ে দিল। বিকশা করে গেলে পনেরো কুড়ি মিনিট। ট্যাক্সি করে গেল—

না, না, ট্যাক্সি করেই যাব। সমস্ত পোশাকটাই তো ভ্রুতভার পোশাক। ঝিমে-তেতালা বিকশাতে করে কে যায়? অন্য কেউ না দেখলেও নিজের চোখেই যে বিশ্রী দেখাবে, নিজেই নিজেকে সে বাতিল করে দেবে।

নিজের কাছে যদি নিজে না মনোনীত হয় তাহলে ব্যক্তিত্বে আকর্ষণীয় হবে কী করে? আমি আছি এ যদি আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট না হয় অন্য লোক আমার অস্তিত্বকে মূল্য দেবে কেন?

যাত্রার আগে কালীঘাটের কালীর কথা স্মরণ করা উচিত ছিল কিন্তু, কে জানে কেন, খাতা-পেন্সিল হাতে চেকারদির মুখখানিই মনে পড়ে গেল।

সেই ভোর-ভোর হওয়া আকাশের মত হাসি-হাসি মুখটা।

ইনটারভিয়ুর শেষ অঙ্ক পর্যন্ত দেখে হোটেলে ফিরতে-ফিরতে প্রায় তিনটে। ম্যানেজার বললে, আধঘণ্টার মধ্যে ফেরবার ট্রেন আছে। যদি ইচ্ছে করেন—

না, না, এই ট্রেনেই ফিরব। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। না, চা খাবার দরকার নেই। যদি সম্ভব হয় স্টেশনেই খেয়ে নেব। আর, একবেলা চা না খেলেই বা কী। হ্যাঁ, বিলটা দিন, পেমেন্ট করে দি।

বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঙ্গিন। না, বেশি সময় নেই, বিকশা নেওয়াই ভালো। ট্রেন মিস করার কোনো বাহাদুরি নেই।

আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করে পৌঁছুলে স্টেশনে কি সেই খাতা-পেন্সিলের সঙ্গে দেখা হবে? এ বেলা ঠিক এ সময়টায় তার ডিউটি আছে কিনা কে বলবে? এবার তো প্র্যাকটিক্যাল বদলে যাবে, এবার তো সে ভাইবের যাত্রী। একবার দেখা হলে, আরো একবার দেখা হবে, আর ঠিক সেই আগের জায়গাতেই, এমনি আশা করা পাগলামি। আর দেখা হলেই বা কী! তার সঙ্গে তার আর কোনো ব্যাপারের অবকাশ নেই। সে টিকিট কাটবে আর ট্রেন এলে তাতে চেপে বসবে। যদি কোনো ব্যাপার ঘটে, সে হাওড়া স্টেশনে। তখন খাতা-পেন্সিল কোথায়?

না, দেখা না-ই বা হল। বরং দেখা না হওয়াই উচিত। আজকের ভোরবেলাটির মতই সে অম্লান হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে সেই অন্তরঙ্গ কটাক্ষটুকু! যেন একটা কিছুর অস্ফুট সূচনা হয়েছিল, একটি নির্মল আরম্ভ, পরে আর তা রোধে ধরে রাখা যায়নি, অন্ত হয়ে যায়নি সমাপ্তিতে।

কিন্তু, এ কী অভাবনীয়, রেল-কোয়ার্টার্সের যে হাতি প্রথম বাড়িটার গেটের সামনে প্রায় রাস্তার উপরেই রেখা দাঁড়িয়ে।

সহজেই বোঝা গেল নিজের বাড়ির কাছে বলেই মহেন্দ্র নিবাসটা বাছাই করেছে। না, অতটা রঙ্গিন ভাবতে যাবে কেন? বাড়ির কাছে বলে ঐ মহেন্দ্র নিবাসটাই তার চেনা, সন্ধানের আগে মনে এসেছে। তা হোটেলটা তো ভালোই। যা সে চেয়েছিল, পত্তাও বটে।

কিন্তু এ সময়ে ও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কেন?

সহজেই দুজনের চোখাচোখি হল।

'এ কী, আপনি?' প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি রেখার, চমকে উঠল।

'এই বিজাতীয় পোশাকটা পরে আছি বলে চিনতে পারেন নি বুঝি ?'

রেখার চোখে প্রশংসার আলো ফুটল। বললে, 'এইটে তো ঠিক-ঠিক পোশাক। বিজাতীয় পোশাক পরেছিলেন তো সকালবেলা—'

'হ্যাঁ, ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে মুখ আর স্টকিং—কিন্তু আপনি তা লক্ষ্য করেছেন ?'

দিব্যি তরল চোখে হাসল রেখা। বললে, 'অমন বিকট অমিল কে না লক্ষ্য করবে ? কিন্তু আসল কথাটা বলুন, ইন্টারভিউ কী রকম হল ?'

'সে অনেক কথা। অত সব বলবার সময় নেই। ট্রেন ধরতে হবে। ধরে রাখুন, শেষ পর্যন্ত হবে না।'

বাঁ হাতটা আবছায়া ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রেখা বললে, 'এ ট্রেনটা যাক না। ওর পরে আরো ট্রেন আছে। ট্রেনের অভাব কী। কেন ফেরবার কি কোনো তাড়া আছে ?'

'না, তাড়া কী!'

'তবে আসুন না আমার বাড়ি, একটু বসে যাবেন। এই নিচের ফ্ল্যাটটাতে আমি থাকি।'

'আপনার ডিউটি নেই ?'

'এটার পরের ট্রেনে আমার ডিউটি। আপনি ভাববেন না, আপনাকে ঠিক তুলে দেব ট্রেনে। আপনি চলুন আপনার ইন্টারভিউর গল্প বলবেন।'

রথীন ভাবতে লাগল এমন ব্যাপার সম্ভব হয় কী করে ?

যখন রথীন কাগজের টুকরোটা দেখিয়েছিল তখন এক নজর তাকিয়েই রেখা বুঝেছিল কার্ডটা নামজাদা। থার্ডক্লাশের প্যাসেঞ্জার, ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, কোন নিম্নশ্রেণীর চাকরির উমেদার তা কে বলবে। কিন্তু এখন রথীনের গায়ে দামী সুট দেখে নিঃসন্দেহ হল চাকরিটা উঁচুদরের। কী রকম যেন সন্দীহ করবার মত ভাব জাগল মনে। অবশ্যি এ ভাব জাগবার আগেই কিন্তু সে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছিল, তার ডিউটির এক ট্রেন আগে—যদি দৈবাৎ সে প্যাসেঞ্জারটির সঙ্গে দেখা হয়! বলেছিল বিকেলেই ফিরবে, তবে এই আগের ট্রেনটার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। লোকটা কী রকম ভালো, কী রকম সৎ! নিজের থেকে যেচে কেমন একসেস্ দিতে এসেছিল। আর কী রকম অসহায় সমর্পণের ভঙ্গিতে বলেছিল, আমাকে ধরুন! যতই মনে করে ততই যেন মন মেহে ও করুণায় ভরে ওঠে।

কিন্তু এখন তো যন্ত্রবৎ শ্রদ্ধার পাত্র। পোশাকে-আশাকে সম্ভ্রান্ততায় সমাসীন। প্রথম উৎসাহে বোঝেনি, এখন রেখা বিবেচনা করে দেখল একটা সামান্য 'চেকারনির গৃহে ক্ষণকালীন আশ্রয় নিতেও ভদ্রলোকের আপত্তি হতে পারে।

'আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে হয়তো।' রেখা মুহূর্তে আবার দ্বিধায় পড়ল : 'তাহলে থাক। এখনো ধরা যায় ট্রেনটা।'

'রাখুন। কতক্ষণ পরে তো ট্রেন আছেই বলছেন। খানিকক্ষণ বসে যেতে তার বাধা কোথায়!' রথীন গেট পেরিয়ে দিব্যি ভিতরে ঢুকল।

অচেনা কাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, একবার বিচার করতে চেষ্টা করল রেখা, পর মুহূর্তেই ভাবলে, ভয় কী, কত অচেনার সঙ্গেই প্রত্যহ তাকে

মোকাবিলা করতে হচ্ছে, আর এ তো একরকম ভদ্রলোক! কিংবা এত সব কিছু বিচার করবারও বোধহয় অবকাশ ছিল না, রেখা, ডাকল, চলে এল।

'হ্যাঁ, আপনার ইন্টারভিউতে কী হল বলুন!' রেখা বেতের একটা চেয়ার এগিয়ে দিল রথীনের দিকে: 'আমারও ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি—ইন্টারভিউর কথা মনে হলেই প্রাণটা শুকিয়ে যায়।'

'যাদের আশা-টাশা নেই তাদের ভয় করতে যাবে কেন?' রথীন বসল চেয়ারে।

'কেন। আপনাকে একেবারে 'না' করে দিল?'

'না, তা করেনি।'

'তবে বললে, এখন বাড়ি যান, পরে জানাব ফল কিনা!' অভিজ্ঞের মত বলল রেখা।

'অতটা অস্পষ্টও নয়।'

'তবে?'

'সকলের ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পর আমাকে আবার ডাকল। জিজ্ঞেস করল, চারশো টাকায় আমি রাজি আছি কিনা।'

'আপনি কী বললেন? রাজি নন, বললেন?'

'না। বললাম, স্টার্টিং পে ওরকম কোনোই তো দরখাস্ত করেছি।'

'তারপর ওরা কী বলল?' রেখা উৎসুক হয়ে তাকাল।

'বলল, তবে পঁচশ অব্দি করতে পারেন?'

'সত্যি?' উত্তেজিত হয়ে উঠল রেখা: 'বললেন না কেন এই মুহূর্তে পারি।'

'না। বললাম, দিন সাতেকের অরেনিং টাইম পেলে ভালো হয়।'

'ও আবার বলতে গেলেন কেন?' চোখে অনুতাপের ভাব ফোটাল রেখা: 'সুযোগ পাওয়া মাত্রই লুফে নেওয়া ভালো।'

'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে সময় না চাইলেই পারতাম। ওরা হয়তো ভাবল লোকটা অলস, দীর্ঘসূত্রী।'

'কী বলল তারপর?'

'বলল, যান, চিঠি যাবে।'

'তাহলে তো আপনার চাকরিটা হয়ে গেছে।' উল্লাসে উছলে উঠল রেখা।

'আপনি বলছেন হয়ে গেছে? কিন্তু কে জানে শেষ পর্যন্ত কী চিঠি যায়।'

'ঐ চিঠি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—'

'কে জানে কী! চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বিশ্বাস নেই।' বালকের মত সরল অসহায় মুখ করল রথীন: 'ভাবলাম এক চিঠি পাব, পেয়ে গেলাম অন্য চিঠি। চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতাম, বলতে পারতাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক একটু ফাঁক থেকে গেছে—'

'আমি যেমন ছন্নছাড়া হয়তো সেই ফাঁক দিয়েই সৌভাগ্যটা খসে পড়ল।'

'না, না, পড়বে না। আমি বলছি, আপনিই পেয়ে গেছেন চাকরিটা।'

'আপনি বলছেন!'

'হ্যাঁ, বলছি। কোনো সন্দেহ নেই।'

'যদি পাই,' কৃতজ্ঞতায় দৃষ্টি ভরে তুলল রথীন: 'আপনার জন্যে পাব।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনাকে দেখেছিলাম, তাই।'

'বা, আমাকে কোথায় দেখলেন?'

'সেই স্টেশনে। তখনই মনে হয়েছিল হয়তো সুফল মিলে যাবে। কী জানি সেই গানটা? দেখছ, দেখছ—কী যেন, কী মুখ চন্দ্রা—'

লজ্জায় রেখার মুখে নতুন লাবণ্য ফুটল। বললে, 'আহা, কী একখানা মুখ—'

'আপনি বলেছিলেন না যদি সুনজরে পড়ে যান তা হলেই হয়ে যাবে। আপনার দৃষ্টি আমার উপর পড়ে আমাকে সুন্দর করে তুলল আর তারই জন্যে আমি ওদের সকলের সুনজরে পড়ে গেলাম।'

আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রেখা। বললে, 'বসুন, একটু চা খান! একটা চারশো টাকার চাকরি পেয়ে যাওয়া চারটিখানি কথা?'

'কে চাকরি পেল?' পর্দা সরিয়ে পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন।

'আমার মা' রেখা পরিচয় করিয়ে দিল।

খানপরা প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। অনেক ঝড়ঝাপটা সয়েছে, অনেক জ্বালানি-পোড়ানি— এমন ছাপমারা চেহারা। কিন্তু মুখটা বেশ শান্ত। বিষাদই বুঝি এই শ্রী এনেছে। কিন্তু ঐ মুখে যে শ্রী তাতে বিষাদ ছাড়া আর যেন কিছু মানায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল রথীন।

একটুখানির জন্যে ভদ্রমহিলা, নাম সরযূবালা, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, যখন দেখলেন, আগন্তুক কালো-কোট-পরা চেকার-জাতীয় লোক নয়, একেবারে আলাদা জাতের আলাদা পঙক্তির মানুষ। ভেজালো চেহারা। পোশাক-আশাকে বেশ কিটফাট। বয়েস বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ। এমন লোক এ বাড়িতে এল কী করে? কোথায় একে কুড়িয়ে পেল রেখা?

'আপনার চাকরি হল বুঝি?' মুখে প্রসন্নতার ভাব আনলেন মহিলা: 'আরম্ভই চারশোতে?'

সশব্দে হেসে উঠল রথীন। বললে, 'না, না, একটু শুধু আশার রেখা দেখা যাচ্ছে—সেটা কিছু নয়, আসলে হয়তো শূন্য—'

না জেনে তার নামটা রথীনের মুখে এসে পড়েছে দেখে রেখার কেমন একটু মজা লাগছিল, কিন্তু আসলে কি সে কিছুই নয়, সে শূন্য? গম্ভীর মুখে বললে, 'মোটেই শূন্য নয়। যে ভাবে কথাবার্তাটা উঠেছে তাতে আমার খুব বিশ্বাস আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।'

'কেন কী ব্যাপার?' মেয়ের দিকে তাকালেন সরযূবালা।

রেখা অবস্থার পর্যালোচনা করে যথাসাধ্য ঘোরাল করে। সরযূবালা উৎসাহিত বোধ করলেন না। রথীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব ধোঁকা। মুখে অমন খুব আশার কথা বলে, কাজের বেলায় কিছু নয়।' যেন অনেক অভিজ্ঞতার সার কথাটাই ব্যক্ত করলেন, পরে ধীর পায়ে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

'ধোৎ বোকা! তবু চা-টা তো খান।' রেখা মায়ের কথাটা উড়িয়ে দিল।

'হাঁ, পথে যেতে-যেতে যেটুকু যখন খেলে তাই যথেষ্ট।' বললে রথীন।

'আমারও সেই মত।' চায়ের কাপে মন দিল রেখা, বললে, 'কার লেখায় সেদিন পড়ছিলাম —ভারি সুন্দর একটা কথা'— রেখা রথীনকে দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল।

'কী কথা?'

'পথের অন্তে কিছু নেই, পথের প্রান্তেই সমস্ত।' এবার আর রেখা পিছন ফিরে তাকাল না।

কিন্তু রথীন অনুভব করল তার শরীরের রক্তটা কেমন যেন হঠাৎ প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। সেই প্রগাঢ়তার দিকে তাকিয়ে রথীন তরলকণ্ঠে বললে, 'আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?'

'একটু-আধটু পড়ি। না পড়ে উপায় কী! সময় কাটাই কী করে?'

'বই পান কোথায়?'

'কেন, রেলের লাইব্রেরি আছে, সেখান থেকে আনি। কিন্তু জানেন একেকটা বই এমন ভালো না, যে রেখে দিতে ইচ্ছে করে। লাইব্রেরির বই তো রেখে দেওয়া যায় না আর কিনে যে রাখব তার পয়সা কোথায়?'

'আপনার মাইনে কত?' কথার পিঠে জিজ্ঞেস করে ফেলেই কেমন একটু থতমত রথীন: 'মাইনেটা জানতে চাইলাম কিছু মনে করবেন না। আপত্তি থাকলে—'

'আহা যা না মাইনে, তার আবার আপত্তি! শ দেড়েক পাই।'

উপরি-ও তো কিছু আছে, জিজ্ঞেস করতে হঠাৎ লোভ হয়েছিল রথীনের কিন্তু কী ভেবে সংবরণ করলে। হয়তো মায়া হল। উপরি যে নেয় না, চায় না, তার প্রমাণ তো তার নিজের হাতে। বেচে সেবে দিতে যাওয়া সত্ত্বেও সে নেয়নি, ফিরিয়ে দিয়েছে। কে জানে হয়তো বাঁচিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা গরিব বলেই হয়তো ভালো, সুস্থ, পবিত্র।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলো রথীন। সন্দেহ কী, গরিবিয়ানা দিয়ে সমস্ত ঘরবাড়ী লেপে দেওয়া। বিলাসিতার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক উনুন আর কটা বেতের চেয়ারের মাঝখানে লম্বা একটা সোফা।

'মাইনে যা পান, কোয়ার্টারে তো পেয়েছেন।'

'হাঁ, এটা একটা প্রকাণ্ড কিছু।' নিঃসংশয় সায়লো স্বীকার করল রেখা: 'আগে খাওয়া-পরা, পরে বাসা, তারপরে আর-সব—'

কী আর-সব জিজ্ঞেস করল না রথীন। কেননা কী আর সব তা কেউ জানে না। বলে শেষ করতে পারে না। তাই শুধু বললে, 'শুধু বাসা নয়, ইলেকট্রিসিটি—

'নিশ্চয়। তারপরে ধরুন এই উনুনটা, সময়ে-অসময়ে কখন কী ফুটিয়ে নিতে হয় কিছু ঠিক নেই। কাজেরও বাঁধাধরা কিছু নেই কিনা, তাই হাতের কাছে একটা উনুন থাকা খুব সুবিধে। আর কিছু না হোক যখন-তখন চা খাওয়া যায়। অসময়ে অতিথি এলে তাকে দেওয়া যায় এক কাপ।' চোখে চোখ এসে লাগতেই একটু হাসল রেখা: 'আচ্ছা, আপনি তো কোয়ার্টার পাবেন?'

'আমি—আমি পাব কেন?'

'মানে যদি চাকরিটা পান? ঐ কোম্পানি তো অফিসারদের কোয়ার্টার দেয় শুনেছি।'

'হাঁ, যেয়—কিন্তু আমাকে দেবে না।'

'চাকরি পেলেও দেবে না?'

'না। যারা ম্যারেড অর্থাৎ যারা বিবাহিত তারাই কোয়ার্টার পায় আর যারা আমার মত সিঙ্গল অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া তাদের স্থান অফিসার্স মেসে।'

রেখার শুষ্ক ও শুকনো শিঁথির নিচে রক্তের একটা মোটা রেখা ধরথর করে কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল সরযূবালার পাশের ঘরে পর্দাটা।

রথীনের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে রেখা বলল, 'আমি বলছি আপনি পাবেন, আর—' নিজেও এক পেয়ালা নিয়ে বসল মুখোমুখি: 'আর তখন কিন্তু আপনাকে ধরব।'

'ধরবেন?'

প্রশ্ন শুনে কী রকম অপ্রতিভ হয়ে গেল রেখা, হাসি-হাসি মুখটা নিমেষে কেমন কালো হয়ে উঠল, আবার পরমুহূর্তেই সরলতার জলে মুছে ফেলল কালিমা। বলল, 'ধরব মানে একসেস্-এর জন্যে ধরব। হঠাৎ কী রকম একটা ফর্টুন পেয়ে গেলেন—চারশো টাকার চাকরি। মানে খাওয়ার জন্যে ধরব।'

'ও! এইটুকু? আমি ভাবলাম না জানি কী।' মৃদু হাসল রথীন: 'কিন্তু কী খাবেন?'

'এই সব ব্যাপারে আত্মীয়-বন্ধু যা খায়—মিষ্টি—সন্দেশ।'

'রসিদ দেবেন তো? হস্তগত করা রসিদ?'

'রসিদ—রসিদ কিসের!' যেন ভয় পেল রেখা।

'বা, একসেস্ ধরছেন, রসিদ দেবেন না? রসিদ না দিলে যে ঘুষ হয়ে যাবে, উপরি হয়ে যাবে। আপনি কি তাতে রাজি হবেন?' নিজের মনে হেসে উঠল রথীন।

কী কথায় কী ইঙ্গিত কিছু বোঝবার চেষ্টা করল না রেখা। নীরবে চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

রথীন বলল, 'আসলে এটা কিন্তু একসেস্ই। কলকাতায় একটা মার্চেন্ট অফিসে মিচুয়ারের এক কেরানি হয়ে মাসে আড়াই শো টাকা রোজগার করছিলাম, হঠাৎ যদি চারশো টাকার মাইনের এক উঁচু ক্লাশের অফিসারের স্বার্থে এসে বসি, রোগাতার টিকিট না কেটে, তা হলে জীবনের ট্রেনে সেটা নিশ্চয়ই একটা একসেসের কেস। নিশ্চয়ই একটা ধরবার মত ব্যাপার। খাওয়ার মত। আপনি বলছিলেন যেহেতু আত্মীয়-বন্ধুরা এক্ষেত্রে সন্দেশ খায় আপনিও সন্দেশ খাবেন। কিন্তু আপনি কি আত্মীয়-বন্ধু?'

'বেশ তো, আমি না হয় চপ-কাটলেট খাব।'

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

এবার উঠতে হয়, পরের ট্রেনের সময় হয়ে এল। সরযূবালা মেয়েকে ডেকে কী সব বলে দিলেন। দুজনে, রেখা আর রথীন, পাশাপাশি পায়ে হেঁটে চলল স্টেশনের দিকে। এমন কোনো গাড়ি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি যে এটুকু পথ তারা একসঙ্গে চড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি হাঁটাটাও তত আনন্দের নয়, ভাগ্য কোথা থেকে হঠাৎ এ ষড়যন্ত্র রচনা করে বসল কে বলবে। একজন রেলযাত্রী আরেক জন মেয়ে টিকিট চেকার একজন ধরা দিতে প্রস্তুত, আরেকজন ছেড়ে দিতে উন্মুখ।

স্টেশন রোডে বেশ ভিড়, বিশেষ করে এটা যখন ট্রেনের সময়। কিরতি মুখেও লোক-চলাচল কম নয়। চলতে-চলতে হঠাৎ কতকগুলি লোক মাঝখানে পড়ে ওদের দুজনের মধ্যে ফাঁক

সৃষ্টি করে নেয়, ওরা দুজন দুদিকে এপাশে ওপাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—যেন কেউ কাউকে চেনে না, কোনোদিন দেখা হয়নি, কথা কয়নি—আবার কখন কোন অদৃশ্য ইশারায় ফাঁক ভরিয়ে দিয়ে দুজনে আবার পাশাপাশি চলে আসে—যেন কতদিনের চেনা, কত লক্ষ-লক্ষ দিনে একান্তে বসে আলাপকরা—যেন কতকাল ধরে এমনি হাঁটতেই তারা অভ্যস্ত।

হঠাৎ কী একটা উঁচু নরম পাথরের গায়ে জুতোর ঠোকর যেন লেগে। সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, রথীন ধরে ফেলল। ধরে ফেলাটা যেন আপনা থেকেই এসে গেল আর চলার বেগে এমন একটা অবস্থায় সে ছিল, রেখার পরিপূর্ণ বাহু না ধরে উপায়ান্তর ছিল না।

'কী, লাগল?'

'না।' লজ্জিত মুখে হাসল রেখা।

'দেখলেন তো শেষ পর্যন্ত আমিই আপনাকে ধরলাম।'

'ধরবার দরকার ছিল না।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রথীন। ধরাটা কি তা হলে একটু বেশি হয়ে গিয়েছে? একটু বেশি বাড়াবাড়ি? পড়া থেকে বেঁচে গিয়েছে কিনা, তাই ধরবার দরকার ছিল না বলা সহজ। আঁকড়ে না ধরলে ভারসাম্য বজায় থাকত কী করে? ছিটকে পড়ত একেবারে মুখ থুবড়ে। বিপদের সময় শরীরের অমন শুচিবাই মানতে নেই।

কয়েক পা হাঁটল নিঃশব্দে।

রথীন বললে, 'আপনি খুব আশাবাদী।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?' গলাকে রেখার চোখমুখ কণ্ঠস্বর ঠিক হয়ে গেছে।

'হোঁচট খাবার পরেও আশা করেন যে পড়বেন না।'

'সেটা আশা কোথায়, সেটা অহঙ্কার।'

'কিন্তু অহঙ্কার তো চূর্ণ হবার জন্যে।'

'আপনি তো তাই চূর্ণ করলেন। ধরে ফেললেন।'

'সে কী, আপনার ভীষণ লেগেছে নাকি। হাড় চুরমার হয়ে গিয়েছে? সত্যি?'

আঁচল সৃষ্ট বাহুটা ঢাকল রেখা। বললে, 'অত ঠুনকো নই।'

'এটাও তো অহঙ্কারবাদই হল। আশাবাদটা কোথায়?'

'আশাবাদ হচ্ছে আপনি চাকরিটা পাবেন, আর—'

'আর—কী আর?'

'আর এখানে আসবেন।'

রথীন হেসে উঠল: 'আপনারও আশা আর আমারও আশা!'

'দেখবেন আমার কথা ঠিক ফলবে।' হঠাৎ রেখার ভিতর থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল: 'চাকরিটা পেলেন কিনা বুঝব কী করে?'

'চাকরি পেলে তো সশরীরে এসেই উপস্থিত হব।'

'হবেন? আসবেন? দেখা করবেন? তখন তো বড় অফিসর, গরিব কেরানির কথা কি মনে থাকবে?'

'বা, আপনাকে চপ কাটলেট খাওয়াতে হবে না ?'

'চপ কাটলেট ? ও হ্যাঁ,' হাসল রেখা : 'ঠিকই তো।'

'আমি সব ঠিক বলি। ঠিক-ঠিক কথা রাখি।'

'কিন্তু যদি চাকরি না পান ?' রেখার বুক ঠেলে অস্ফুট একটা কান্নার ঢেউ উঠল।

'যদি না পাই, আসব না, আপনার চপ কাটলেট খেল।'

'বা, কিছুই জানতে পাব না ?'

'জেনে কী হবে ? চাকরি পেলাম না এটা জানাবার মত খবর নয়।'

'তবু—'

'যদি দেখেন সাত আট দশদিনের মধ্যে এলাম না বুঝে নেবেন চাকরিটা হয়নি।'

ঠিকই তো। চাকরি না হলে কেউ তার দুর্ভাগ্যের কথা ঘটা করে জানাতে যায় না। আর যদি চাকরিই না হল তা হলে পুরুষের কেরানিত্বে রথীনের যায় কী !

কিন্তু মন এমন বেয়াড়া, যুক্তির কথা সব সময়ে মানতে চায় না। অফিসার নাই বা হল সামান্য মানুষ হিসাবেই একজনের সঙ্গে আলাপ থাকতে বাধা কোথায় ?

'আপনি নাই বা এলেন কিন্তু আমি তো মাঝে-মাঝে কলকাতা যেতে পারি।'

'কে না যেতে পারে ? কিন্তু আপনার কলকাতায় আমি কোথায় ?

'আহা !' নিজের প্রতি ধৈর্য বা রথীনের প্রতি অভিমান বুঝি প্রকাশিত হল অলক্ষ্যে। পরে সংযত ভাবলেশ বললে, 'যদি ধরুন, হাতে সময় থাকে, আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপনার বাড়ি যাই ?

'আমার বাড়ি !' শিউরে ওঠার ভাব করল রথীন : 'ওরে বাবা ! সে একটা বিভীষিকা।'

'এই যে বললেন আপনি সিঙ্গল, আপনার কেউ নেই।'

'সিঙ্গল মানে অবিবাহিত, বিয়ে করিনি। তাই বলে কি আমার কেউই থাকতে নেই ? বাবা মা ভাই বোন, গুচ্ছের আত্মীয়স্বজন ? সিঙ্গল বলে কি আমি পাহাড়তলার সন্ন্যাসী ?'

'তাই বলুন।' যেন একটা গুমোটের মধ্যে থেকে বাইরে ঝিরঝিরে খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়াল রেখা। কথাটা অন্য পথে ফিরে যাবার চেষ্টায় বললে, 'বাবা মা ভাই বোন—এরাও তো পরিবারেরই অঙ্গ। তবে আপনি যদি চাকরি পান, আপনাকে কোয়ার্টার দেবে না কেন ?'

'আপনি কোথায় আছেন ?' রথীন প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে উঠল : 'এরা বিলিতি কোম্পানী, পরিবার বলতে এরা শুধু স্ত্রী আর ছেলেপিলে বোঝে। দেখুন গিয়ে অফিসার মেসে, অনেকেরই বাবা মা ভাই বোন বর্তমান। কোম্পানির কাছে একমাত্র স্ত্রী-পুত্রই আসল, আর সমস্ত অবান্তর।'

'তাই বলে আমাদের কাছে বাবা-মা ভাই বোন বিভীষিকা হতে পারে না।'

'আমি বুঝি বাবা-মা ভাই-বোনকে বিভীষিকা বলেছি ?' আমি বলেছি বাড়িটা বিভীষিকা। দু-তিনটে ঘরে যদি এক রাজ্যের লোক এসে ভিড় করে তাহলে তার বিশেষণ বিভীষিকার চেয়েও জোরালো হওয়া উচিত। আপনি বাঙলা বই-টই পড়েন আপনি ভালো বলতে পারবেন।'

মায়াভরা চোখে হাসতে লাগল রেখা।

'যদি আপনি যান,' রথীনই নিজের কথার জের টানল : 'একটা বসবার মতও ঘর পাবেন না কোথাও। রান্নাঘরেও বিছানা পড়ে।'

'তা পড়ুক। বলতে কে চায়?' সংকেত ধরবার মেয়ে নয় এমনি ভাব দেখিয়ে রেখা, বললে, 'আপনাকে বাড়ির থেকে বার করে এনে বাইরে খানিক ঘোরা। বসবার ঘর না থাকুক, বেড়াবার বাগান আছে তো?'

'বাগানে আপনি কতক্ষণ বেড়াবেন? খেয়ে ক্লান্ত হয়ে বসবার জন্যে সেই ঘরেরই ডাক পড়বে।' রথীন রেখার মুখের দিকে তাকাল দুঃখের মত: 'আপনার বসবার ঘরটি কী সুন্দর! কেমন নিরিবিলি!'

'বেশ তো আমার কোয়ার্টারেই চলে আসবেন।'

'মানে কলকাতা থেকে? চাকরি না পাওয়া অবধি? বিলেতে যেমন উইক এণ্ড কাটাতে লোকে মফঃস্বলে যায়। একটা আড়াই শো টাকার জেনারেল ক্লার্কির পর বিশ্রামের আশায় ঘন-ঘন আসানসোলে আসছে! লোকে পাগল বলে তো ভালো—আর কিছু না বলে!'

অপ্রতিভ হয়ে গেল রেখা। একটু না চটে সে বেশি বলেছে, কিন্তু তাই বলে আবেগের ঝোঁকে বলা কথাটা কেউ যুক্তি দিয়ে এমন বিশ্লেষণ করে না। তা ছাড়া উইক এণ্ডে ঘন-ঘন আসার কথা মোটেই সে বলেনি। কালে ভদ্রে আসা যায় না একেবারেই? লোকে তো বেড়েও আসে। বেড়ে আসাটা কি বিশ্রাম নয়?

'থার্ড ক্লাশ টিকিটটা কাটি।' ফার্স্ট ক্লাশের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল রথীন।

'ফার্স্ট ক্লাশ কী দরকার!' যেন খানিকটা বা শাসনের সুরেই বলে উঠল রেখা: 'ফার্স্ট ক্লাশ করলেও দাঁড়িয়ে যাবেন। থার্ড ক্লাশ করলেও দাঁড়িয়ে যাবেন। আর এখন তো ঘুমুবার প্রশ্ন নেই, এক্সপ্রেস ট্রেন, চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে—'

'তখন থার্ড ক্লাশে ঘুমুবার জন্যে কী রকম একটা পোশাক করেছিলাম।' নিজের মনেই হাসল রথীন: 'আবার এখন পোশাকের জন্যে, ঘুমুব না জেনেও ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কাটছি।'

'শুধু শুধু অপচয়!

'ঠিক বলেছেন। আপনি লক্ষ্মী। আপনার জন্যে আমার কটা টাকা বাঁচল।' একটা লেডিজ ক্লাশের টিকিট কাটল রথীন।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে এল দুজনে। তারপর কলকাতার ট্রেন ইন হতে দেখে রথীন উদাস সুরে বললে, 'এবার চলে যাব। আর কোনদিন দেখা হবে না।'

'কিন্তু যদি চাকরিটা পান্ তা হলে।'

'আমি তো আপনার মত আশাবাদী নই। তাই ভবিষ্যৎ সব সময়েই অন্ধকার দেখি।'

ট্রেনের কামরাটা ছেঁটে দিয়ে বলল রথীন। না, এখুনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়তে হবে না, ট্রেন কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়াবে আর তার দাঁড়িয়ে যাবার জায়গা যারা যাবার তার নেই।'

'শুনুন', পিছন থেকে ডাকল রেখা: 'গিয়ে চিঠি লিখবেন।'

'কী সর্বনাশ! চিঠি লিখব? তার মানেই তো চাকরিটা তাহলে হল না!'

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল রেখা। তাড়াতাড়ি ধাক্কাটা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আমি বুঝি সেই চিঠির কথা বলেছি। আমি বলছি গিয়ে একটা পৌঁছসংবাদ দেবেন—'

'আর কোথাও পৌঁছলাম না, শুধুমাত্র বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম—এ একটা সংবাদ? এ আবার বুঝি কেউ কাউকে জানায়?'

'তা কি আর জানায় !'

'জানেন, আমার চিঠি লেখার একদম অভ্যেস নেই।'

'বেশ, আপনার ঠিকানা দিন, আমি লিখব ?'

হৃদয়ের দ্বারখানে এসে লাগল কথাটা। এখন আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সে নিতান্তই একটা হেঁজেপেজি মানুষ অথচ তাকে চিঠি লিখবে বলে একটি তরুণী তার ঠিকানা চাইছে এ তার জীবনে অবিশ্বাস্য রকমের নতুন ঘটনা। পকেট থেকে কাগজ বের করল রথীন। 'দিন, আপনার পেন্সিলটা দিন।' নিজের পকেটে কলম থাকা সত্ত্বেও রেখার হাত থেকে তার পেন্সিলটা কেড়ে নিল রথীন। কাগজে লম্বা করে খুব খানিকটা কী লিখলে। 'এই নিন। চিঠি কত লিখবেন তো জানা আছে।'

ঠিকানার চেহারাটা এক নজরেই ঠাহর করতে পারল রেখা। বললে, 'এ তো আপনার অফিসের ঠিকানা দিলেন। আমি কি আপনাকে অফিসিয়াল চিঠি লিখব ? আপনার বাড়ির ঠিকানা দিন।'

'বাড়ির ঠিকানা।'

'আমরই বা হয় আপনার বাড়িতে যাবার অসুবিধে। চিঠিরতো অসুবিধে নেই। চিঠি তো আনলা দিয়েও ফেলে পারে।'

বাড়ির ঠিকানা ! হঠাৎ যেন বাড়ির ঠিকানাটা মনে করতে পারছে না রথীন এমনি ভাব করল। অফিসের ঠিকানা দিতে পারলে বাড়ির ঠিকানায় কী বাধা থাকতে পারে নিজেই কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না। কাগজের অন্য পিঠে তাই পেন্সিল ঠেকাতে হল। তবু একটু দ্বিধা করছিল কেন তারই কৈফিয়ত দিতে বললে, 'বাড়ির মতন বাড়ির ঠিকানাটাও বিভিকিচ্ছি।' লম্বা করে ঠিকানা লিখলে।

বিজয়িনীর মত হাসল রেখা। বললে, 'কেমন আপনার নামটা ভুলে দিলাম।'

ঠিকানা লিখতে গিয়ে কখন রবীন তার নিজের নামটাও লিখে ফেলেছে। নাম ছাড়া আবার ঠিকানা হয় নাকি? ব্যক্তি ছাড়া আবার বাড়ি কী! বোঝা যাচ্ছে, ঠিকানার চেয়ে নামে, বাড়ির চেয়ে ব্যক্তিতেই রেখার বেশি আগ্রহ। কিন্তু নামের জন্যে অত পরিশ্রমের দরকার কী ছিল? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেই হত। তা মেয়েরা কি কিছু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে পারে? সবই তাদের ঘুরিয়ে পেচিয়ে। কীরকম যেন একটু অপরাধী বোধ হল রবীনের। দু দুটো ঠিকানাই মেয়েটার হাতে গেল। আবার ভাবলে, গেল তো গেল, বয়ে গেল।

বিজয়িনী তখনো হাসছে। বললে, 'কিন্তু আমার নাম আপনি জানেন না।'

'আপনি তো আমার হাতের মধ্যে।'

'হাতের মধ্যে?'

'হাঁ, হাতের মধ্যে।' ডান হাতটা রেখার দিকে বাড়িয়ে ধরল রবীন।

সে কী হাত তো শূন্য। রেখা শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

'এ সব কী? রবীন বাঁহাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের তালুতে কটা লাইন টানল 'এগুলো কী? রেখা রেখা রেখা—'

ট্রেনের কামরায় চড়ে বসল রবীন।

৪

হাওড়া ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রবীন সোজা বন্ধু পশাঙ্কর বাড়ি গেল। রাত প্রায় নটা, পশাঙ্ক বাড়ি আছে, নিচে তার ঘরেই আছে—আলো দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল রবীন। 'শিগগির এক কাপ চা খাওয়া।'

'আসানসোল থেকে আসছিস?' পশাঙ্ক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল: 'কী হল?'

'বলছি। তুই আগে চায়ের জোগাড় কর।'

পশাঙ্ক ভিতরে গেল বলতে।

ইস্কুলে পড়া থেকে বন্ধু। কারু কাছে কোনো লুকোছাপা নেই, পরস্পর পরস্পরের দুর্বলতা সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। মত সলা-পরামর্শ, জীবন সংগ্রামের মত কূট কৌশলের আলোচনা তাও দু জনের মধ্যে।

অবশ্যি যখন দেখা হয় বা যখন কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে কারুর সঙ্গে দেখা করে। আর যখন দেখা হয় না তো হয়ই না। তাতে আসে যায় না কিছু।

যখন দেখা হয় না তখনো মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকে যে যখন দেখা হবে তখনই মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠবে, নিমেষে ফিরে পাবে সেই পুরোনো উষ্ণতা।

পশাঙ্ক ফিরে এসে দেখল রবীন লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরছে।

'কী হল ?'

'পুনর্মূষিক হচ্ছি। যে পোশাকে বেরিয়েছিলাম সেই পোশাকে ফিরছি।'

'একেবারে বাড়িতে গিয়েই চেঞ্জ করলে পারতিস।'

'ওরে বাবা, বাড়িতে সুট পরে ঢোকবার সাহস নেই। সুট পরে ঢুকলে মানেটা কী দাঁড়ায় ? মানেটা দাঁড়ায় আমি সুট পরেই ট্রেনে এসেছি, বাসে এসেছি। সেই রকম, অকারণে সুটটা ময়লা করেছি, যার জন্যে তাড়াতাড়ি ড্রাইং ক্লিনিংএ পাঠাতে হবে, তার মানেই দিনগুনতিতে বাড়তি খরচ। যুক্তি দেখানো হত, সুটটার পরিচ্ছন্নতার আয়ু আমি স্বচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টা বাড়িয়ে দিতে পারতাম।'

'কথাটা তো ঠিকই।' শশাঙ্ক ও প্রতিপক্ষের বলে গেল : 'যুক্তি অকাট্য। যা এমনিতে এক মাস পরে ময়লা হতে পারত তা যদি তুই একদিনেই ময়লা করে আনিস্ সাদোষ কষ্ট হতে পারে বৈকি।'

'কিন্তু এমন যদি হয় যে ইন্টারভিউ থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরবার আগে সময় ছিলনা চেঞ্জ করবার, তখন কী হবে ?'

হাসল শশাঙ্ক। বললে, 'তখন বলবে হাওড়া ষ্টেশনে কেন চেঞ্জ করলেনা ? মিছিমিছি কেন বাসে চড়ে পরিচ্ছন্নতার আয়ু কয়েক মিনিট কমিয়ে ফেললে ?'

'সেই ভয়েই তো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়ীহ সাজছি ! যখন সুটকেসটা খুলবে তখন সুটটা দেখে ভাববে ইন্টারভিউর পর থেকেই ওটা অমনি পাত হয়ে শুয়ে আছে। কোনো বাড়তি ময়লা তার গায়ে লাগেনি।'

ট্রেতে করে চা নিয়ে এল চাকর। সঙ্গে আরেক প্লেটে খাবার।

'সুটটার আসল রহস্য কী ?' শশাঙ্ক তাকাল বাঁকা করে।

'একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল।' চায়ের পেয়ালা মুখে তুলল রথীন।

'কেন, ধুতি পাঞ্জাবি পরে আলাপ হয় না ?'

'সে তো হয়েছে প্রথমে, ম্যাটকর্মে, শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, পায়ে আবার ছুতো মোজা—এখন যেমন দেখছিস। একটি মুহিমান বাঙাল। কিন্তু আমি যে স্যুট হতে পারি ঠিকঠাক ফিটফাট হতে পারি, আমি যে পরিপূর্ণ ক্যাবলা নই, তাই আবার মেয়েটাকে দেখাতে ইচ্ছে করল—সেই দুর্বলতায়—'

'তোর দুর্বলতা এখনো গেল না।' শশাঙ্ক টিপ্পনী কাটল।

'যেন তোরই গেছে !' খাবারের দিকে হাত বাড়াল রথীন : 'তুই কিছু নিবিনে ?'

'না, কিছুক্ষণ পরেই আমি ভাত খাব।'

'আমি বাপু খেয়ে নি। আমার অদৃষ্টে রাতে ভাত আছে কিনা ঠিক কী। খেতে লাগল রথীন।

'মেয়েটা কে ?'

'টিকিট চেকার।'

'টিকিট চেকার !' শশাঙ্ক পা হাত পা ছেড়ে দিল।

'এ তোর ভীষণ দোষ, প্রফেশন দিয়ে মেয়ের বিচার করা ! কেন ফিস-ম্যাকট্রেস ছাড়া আর মেয়ে হতে নেই ?'

হেসে উঠল শশাঙ্ক। বললে, 'যেন ফিস-ম্যাকটিংটাই হাইয়েস্ট প্রোফেশন !'

'প্রোফেশন দিয়ে কী হবে ! মেয়ে ইজ মেয়ে।'

'যা বলেছিস! যেমন টাকা ইজ টাকা। তবে বলছিলাম কী, মেয়েটা টিকিট পাঞ্চ করে বেড়ায় কিনা—'

'তাতে আমার কী?' একটু বুঝি বিরক্ত হল রঙ্গীন।

'কিছু নয়। তবে একটু সাবধানে থাকা ভালো। তোকে না পাঞ্চ করে দেয়!'

'দিলে দেবে। আমার কী এসে যায়। কিন্তু কথাটা তা নয়, যার জন্যে এসেছি বলি।'

'তার আগে বল মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'আচ্ছা এ একটা প্রশ্ন হল? মেয়ে আবার কেমন দেখতে? মেয়ে ইজ মেয়ে।'

'তবু অবজেক্টিভলি—'

'সব দেখাই সাবজেক্টিভ। একজনের কাছে যে পাঁচি আরেকজনের কাছে সে অপ্সরী। আবার একজনের কাছে যে তিলোত্তমা আরেকজনের কাছে সে অথান্তি—'

'কিন্তু কালো না কর্সা, মোটা না রোগা, লম্বা না বেঁটে তা বলবি তো?'

'অত শত দেখিনি—'

'কিন্তু কপালের উপরে সিঁথিটা দেখেছিস তো?'

'দেখেছি। সেইটে শাদা।'

'সেইটে কী ইণ্ডিকেট করে?' শশাঙ্ক বিজ্ঞের মত ভারিক্কি গলায় বলল, 'কুমারী? না বিধবা? না কি স্বামী-পরিত্যক্তা?'

'অতটা জানবার মত সুযোগ হয়নি। শোন যা বলতে এসেছি—'

'যদি বিধবা হয় তো, উত্তম, স্বামী পরিত্যক্ত হয় তো, মধ্যম আর যদি কুমারী হয়, অধমাধম—একেবারে দাঁড়িয়ে ফেল। নির্ঘাৎ ব্ল্যাকমেইল! আমি তাই শাদা সিঁথি দেখলে অনুকম্পা মেরিয়ে সরে পড়ি।'

'আর সিঁথি লাল দেখলে?'

'সব নিরাপদ মনে করি। জানিস তো লাল যেমন বিপদের সঙ্কেত, তেমনি আবার নিমন্ত্রণের হাতছানি।'

'জানি, জেলখানার নিমন্ত্রণ। শাদার বেলায় তবু বিয়ে করে ঢাকবার উপায় আছে—লালের বেলায় একেবারে শ্রীঘর।'

'শ্রীঘর অত শস্তা নয়। শাদাগুলো বোকা, বিপদ বাধায়, কিন্তু লালেরা ধুরন্ধর, তারি-তারি ডুকানও ঠিক সামলে নেয়।'

'আচ্ছা আমি কি রাত করে তোর সঙ্গে রঙ নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি?'

'হ্যাঁ, না, বল কী বলবি।'

'শোন, ও মেয়েটা আমাকে চিঠি লিখতে পারে।'

'চিঠি! এর মধ্যে এতটা গড়িয়েছে?'

'একটা চিঠি লিখতে গড়াতে লাগে নাকি? এমনি একটা মামুলি চিঠিও তো লেখা যায়।'

'তা যায়। কিন্তু লিখবে কেন? চিঠি লেখাটা ঠিক নয়।'

'আমি তো লিখছি না। ও যদি লেখে তো আমি কী করতে পারি?'

'তা যা বলেছিস। মেয়েরা কখন যে কী করে বসে তার ঠিক নেই। আর লিখতে বসে কখন যে কী লিখে ফেলবে তা লেখবার মুহূর্ত আগে মেয়েটাও জানে না। তা লিখুক না যা মন চায়—'

'লিখবেই এমন কিছু ঠিক নেই, তবে যদি লেখে—তোর ঠিকানাটা দিয়ে এসেছি।' অপরাধীর মত মুখ করল রথীন।

'জানে নায় তোর, ঠিকনা আমার! আমার প্রতি এত কৃপা?'

'কৃপা নয়, বিশ্বাস।'

'বুঝতে পাচ্ছি, শশাঙ্ক সহানুভূতিতে গাঢ় হয়ে উঠল: 'গিন্নির ভয়। সত্যি স্ত্রীগুলি অদ্ভুত।'

'যদি অনাত্মীয় কোনো মহিলা মামুলি একটা চিঠি লেখে, তাতেও জীবন দুর্বিষহ করে ছাড়বে।' রথীন পীড়িত মুখে বললে, 'এক চুল প্রমাণ নেই—'

'ওরে বাবা, চুলের প্রমাণ তো সাংঘাতিক।' শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে ওঠার ভাব করল: 'শার্ট কোট যে ভাঁজ করলি মেয়েটার চুল লেগে নেই তো।'

'অতদূর হলে তো বুঝতাম।' রথীন দুর্বল রেখায় হাসল: 'মেয়েটা হয়তো সরল ভাবে লিখল, ইন্টারভিউ দিয়ে গেলেন, তারপর আর খবর নেই, চাকরিটা পেলেন কিনা জানতে পারলাম না—'

'চাকরির কথা লিখলে তো সর্বনাশ।' শশাঙ্ক নিজেই সায় দিয়ে উঠল।

'চাকরির কথা না লিখে যদি এমনিও একটা পোস্টকার্ড লেখে, কেমন আছেন, সেই যে চলে গেলেন আর খবর নেই, চিঠি লিখবেন, নমস্কার নিন—তা হলেও কালনাগিনী ছোবল মারবে।'

'যদি খামে লেখে?'

'হাতে পড়লে তাও খুলবে।'

'এ তো ভীষণ অবস্থা।'

'পিওন যদি চিঠি আমার হাতেও দিয়ে যায়, তক্ষুনি এসে দেখবে কোনোটা আমি লুকোলাম কিনা বা কোনোটা পরে পড়ব বলে মেরি করছি কিনা। সব আদ্যোপান্ত হিসেব নিয়ে তবে ছাড়বে। আর যদি বোঝে যে একটা চিঠি আমি সরিয়েছি, ওকে দেখতে দিইনি, সে যদি অফিসের অবোধ্য চিঠিও হয়, ও তুমুল করে ছাড়বে, অজ্ঞাত খামটা তাকে দেখাও। জীবনে তেমন কোনো চিঠি নেই, যদি একটা আসেও—হয়তো আসবে না—তবু তার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না। তাই তোর ঠিকানাটা তাকে দিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছিস।' সহানুভূতিতে আর্দ্র হল শশাঙ্ক: 'চিঠি যদি আসে আমি রেখে দেব। তুই নিশ্চিন্ত থাক। কেউ পড়বে না।'

'এই বাড়িতে লোক কোথায় যে পড়বে?' রথীন হাসল।

'বেঁচে গেছি যে লোক নেই। কিন্তু আমি তো আছি। তোর নামে পোস্টকার্ড এলেও আমি তা পড়ে দেখব না।'

'আসবে তো কত!' রথীন উঠল।

'না আসাই মঙ্গল।' শশাঙ্কও উঠল: 'কিন্তু, হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো বলনিনা। ইন্টারভিউ কেমন হল?'

'যাচ্ছে।' এককথায় সেরে দিল রথীন।

'আশা নেই?'

'কুয়াশাও নেই।'

'আমি জানতাম হবে না। হবে না বলেই বুঝি শেষে এই চিঠি লিখেছিল?'

'জীবনে একেবারে কিছুই হবে না এ কেমন কথা?' সুটকেস হাতে রথীন বেরিয়ে গেল।

একটা রিকশা নিল। বাড়ির কিছুটা কাছাকাছি হতেই রিকশা ছেড়ে দিল। যদি অমলা বোঝে বাসস্টপ থেকে এটুকু রাস্তা রিকশা করে এসেছে তাহলেই সে খাওয়ার হয়ে উঠবে—পয়সা খরচ করতে বাধে না একটুও। শশাঙ্কর বাড়ি গিয়েছিল একথা শুনলে তো আরো খেপবে। স্টেশন থেকে কোথায় সটান বাড়ি চলে আসবে, তা নয়, বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা! ও আড্ডায় এমন কী মধু! কে কে আসে ওখানে? কেমনতরো সব কথাবার্তা?

মুখমণ্ডল নিষ্করুণ বিরীহ করে রথীন দরজায় কড়া নাড়ল।

অন্যরকম ভাবলেও ভাবতে পারত অমলা। মনে করতে পারত টেলিগ্রামের পিওন। কিংবা অন্য কোনো সংবাদদাতা—পুলিশ বা হাসপাতাল। পরিচিত ছন্দে কড়াটা নাড়েনি রথীন—বুঝি ইচ্ছে করেই। অমলা একটু ব্যস্ত হোক তার জন্যে, মুখে-চোখে একটু আতঙ্কের ভাব আসুক। তার বাড়ি ফিরে আসাটাকে একটু দাম দিক।

কিন্তু অমলার কাছে কোনো ছলনাই যেন টেঁকবার নয়। তার চোখে কিছুতেই ধুলো দেওয়া যাবে না। ধুলো দিতে গিয়েছ কি ধরা পড়ে গিয়েছ!

দড়াম করে দরজার খিল খুলেই অমলা কোনো ভূমিকা না করেই সবলে ঝাঁঝটা মারল: 'এই তোমার বিকেলের ট্রেনে আসা?'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল রথীন: 'বিকেলের ট্রেন!'

'বলে গিয়েছিলে না পাঁচটার মধ্যে ফিরবে।'

ও, হ্যাঁ, তাই বলে গিয়েছিল বটে—রথীনের মনে পড়ল। সামলে নিয়ে সহজেই বলতে পারত স্বচ্ছন্দমুখে, 'কী করব, কাজ শেষ হল না।'

'কাজ—কী এমন কাজ!' অমলা রোষা গলায় বলবে, 'সেই কাজের শেষ নেই!'

'অফিসের কাজ—'

এমনি করেই রথীন বলে গিয়েছিল, অফিসের কাজে একদিনের জন্যে আসানসোল যাচ্ছি, কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফিরে আসবে। কোনো একটা নতুন চাকরিতে ডাক পেয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে সেকথাটা চেপে গিয়েছে। সঙ্গে কী কাগজপত্র আছে একবার ভাবতে চেষ্টা করল রথীন। না, এমন কিছুই নেই যাতে ধরা পড়তে পারে। অফিসি খামে ইংরিজিতে ঠিকানা লেখা চিঠি দেখলে অমলা হাত দেয় না, তার ম্যাট্রিক-পাশ বিদ্যায় সে তার কিছুই কিনারা করতে পারবে না বলে। বিদ্যের বাইরে ওসব দিকে যাবার তার দরকারই বা কী! সে কথার পিঠেই ঝগড়া করতে পারবেনা।

'ওসব অফিসের কাজে তোমাকে পাঠায় কেন?'

শোনো এও একটা প্রশ্ন! পাঠায় কেন তা আমি কী করে বলব? উপরওয়ালার মর্জি, তার

বিলাতে কার কী বলবার থাকতে পারে? কিন্তু রথীনের কী বুদ্ধি হল, কথাটা ঘুরিয়ে বলতে গেল। এমনভাবে বলতে গেল যাতে তার মর্যাদা বাড়ে। বললে, 'দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাই আমাকে পাঠালে।'

'কটাকা মাইনে পাও?' প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় অমলার চোয়ালের হাড়টা শীর্ণতর দেখাল।

উঠতে-বসতে খেতে-শুতে সব সময়েই এই এক খোঁটা—ক টাকা মাইনে পাও? কিন্তু মন করে আজকাল আর খেপে ওঠে না রথীন, প্রাণপণে চেষ্টা করে ঠাণ্ডা থাকতে। তাই এখনও মেজাজকে তিরিক্ষি হতে দিল না। বললে, 'কাজের দায়িত্বের সঙ্গে মাইনের কী সম্পর্ক?'

'থাও থাও বাজে বোকো না। যার যত বেশি মাইনে তার তত কম দায়িত্ব! আফিসে তোমার চেয়ে বেশি মাইনের কেউ নেই কিনা, তাই যত দায়িত্বগুলা কাজের বোঝা তোমার ঘাড়ে!'

'তা কী করা যাবে! যার উপর যেমন আদেশ হবে তাই তাকে মানতে হবে।'

'আমিও তো তাই বলছি। তুমি সব চেয়ে ওঁচা বাজে মার্কা, তাই ওসব মফঃস্বলের বাজে কাজে তোমাকে পাঠিয়েছে। যারা সম্রান্ত, বেশি মাইনের অফিসর, তারা এরকম মফঃস্বল ছোটায় না—'

তা কী করা যাবে! কথাটা রথীন এবার মনে মনে বললে। সকলের চাকরির সৌভাগ্য সমান হতে পারে নাকি? তা হলে সংসারে নানা স্তরের নানা ধরণের এত বিচিত্র চাকরি কেন? অল্প মাইনের ছোট-ছোট চাকরি করবার জন্যেও তো লোক চাই। আর সেসব লোকেরও তো ইচ্ছে হতে পারে ঘর বাঁধি, সামান্য খড়কুটো দিয়েই নীড় নির্মাণ করি।

জুতোই বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তাই রথীন আগেই ওটা খুলতে বসল।

অমলা হাত বাড়াল। বললে, 'ব্যাগটা দাও, কত ওড়ালে?'

'আমাজুতো আগে ছাড়ি—'

'তা ছাড়ো না। ব্যাগটা দিতে দোষ কী? ঐ তো বুক পকেটে ঝুলছে। জামাটা খুলতে গেলেই পড়ে যাবে মাটিতে।' আরো ঘনা এগিয়ে এল অমলা: 'হিসেব না হয় পরে দিও, ব্যাগটা ছেড়ে দিতে আপত্তি কী! না কি ব্যাগের মধ্যে অন্য কিছু আছে?'

'অন্য কিছু আবার কী থাকবে!' রথীন অমলাকে ব্যাগটা পকেট থেকে তুলে নিতে দিল।

ব্যাগটা হাতে পেয়ে তক্ষুনি তার অভ্যন্তরে যাবে না এ অমলার কাছে আশা করা বৃথা। কিন্তু ব্যাগের কোটরগুলো দেখে সে অমন একটা আর্তনাদ করে উঠবে ভাবতে পারত না রথীন।

'মোটে এই কটা? ত্রিশ টাকা নিয়েছিলে, তার মধ্যে থেকে এই সামান্য কটা মোটে ফিরেছে? দাও হিসেব দাও।'

'সব লিখে দিচ্ছি তোমাকে পরে।'

'না লিখে নয়, মুখে মুখে বলো। পরে ভেবে চিন্তে যে গোঁজামিল দেবে তা হবে না। বলো।' স্কুলে যেন ছাত্র পড়াচ্ছে এমনি মাস্টারনির ভঙ্গি করল অমলা।

'বলছি, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

'ব্যস্ত হব না তো কী! কবির জ্বর হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে হতে পারে, টাকার জোগাড় রাখতে হবে তো।'

'জ্বর—কত জ্বর?' রথীন ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল পাশের ঘরে মশারির মধ্যে ঘুমুচ্ছে কবি।

'তা জেনে তোমার কী হবে? তুমি বাপ তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে?'

'আমি কী করব?'

'কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ এত দেরি করে ফেরে?'

'মেয়েটার জ্বর তা আমি জানব কী করে? তা ছাড়া, ট্রেনটা বেজায় লেট ছিল।'

'এই যে বললে আফিসের কাজ ছিল বলে বিকেলের ট্রেন ধরতে পারোনি।'

'সেতো বিকেলের ট্রেন।' চোখ পিটপিট রথীন: 'তাদের সঙ্কের ট্রেন যেটা ধরলাম সেটাই লেট করে বসল। নইলে, ঠিক সময় এসে—'

ট্রেন লেট করেছে সেটাও রথীনের অপরাধ। পৃথিবীতে যত কিছু অশান্তি সমস্ত রথীনের দোষে। অমলা তাই আবার ভেঙে পড়ল: 'বিকেলের ট্রেনটা না ধরতে পারার কোনো কারণই থাকতে পারেনা। আর কিছুতে তো পারে না, ফুঁচেমিতে ওস্তাদ। তারপর এমন একটা ট্রেন ধরল—'

'ট্রেন লেট করলে আমি কী করব?'

'নিজে লেটবাবু হলে ট্রেনও নিশ্চয়ই লেট করবে। সব বিষয়েই তো লেট। চাকরির উন্নতিতেও লেট।' ভবিষ্যতের গহ্বরের মধ্যে আবার তাকাল অমলা: 'তুমি কী বলে এতগুলি টাকা খরচ করে এলে? মেয়েটার জ্বর—এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই!'

মেয়েটার জ্বর তো এখানে এসে জানতে পারল আর টাকা খরচ হয়েছে তো আসানসোলে—দুটোর সঙ্গে কী সম্পর্ক তা কে বলবে? যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে গেলে তো তুমুলতরো হয়ে উঠবে। অনেক সাধনায় আজকাল চুপ করে থাকতে শিখেছে রথীন। তাও কি পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছে? হয়-হয়েও হয়নি। ফস করে দু একটা কথা নিজেরও অলক্ষ্যে হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কিন্তু এবার যে কথাটা এল, এল খানিকটা আষাঢ়ের মত। বাঁধকরের দিকে যাচ্ছে, একটু থামল রথীন, মুখে হাসি-হাসি ভাব এনে বললে, 'যা খরচ হয়েছে, তাতো ফিরে আসবে টি-এ হয়ে।'

'কী তুমি অফিসর, তার আবার টি-এ!' অমলা খেঁকিয়ে উঠল: 'পারে তো খাজ্ঞা ক্লাশের ভাড়া—কত তোমার বীরত্ব তা জানা আছে। কত অফিসর তো শুনি শুধু টি-এ করেই সংসার চালায়। তোমার তো টাকে টুয়ে ডুবে আনা—উপরি বলতে কিছু নেই—'

উপরি! উপরি বলতে রথীনের বুকে কীরকম যেন একটা চমক লাগল। কার মুখ মনে পড়তেই অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটাকে আড়াল করল প্রাণপণে। বললে, 'তাই বা মন্দ কী। খরচটা তো উঠে এল।'

'তোমার তো ভালোই। বিনাখরচে একটা নতুন জায়গা ঘুরে এলে। আর আমি? কত বছর ধরে আমি ট্রেনে চড়িনি। কত বছর ধরে আমি এক জায়গায় এই একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ—' অমলার নালিশ এবার অন্য লাইন ধরল।

'হবে, হবে, বাইনে কিছু বাড়বে বলে শুনছি। তখন নিয়ে যাব তোমাকে।' রথীন জানে নিয়ে যাবেনা, মাইনে বাড়লেও নিয়ে যাবে না, শুধু তার স্বামিত্বের ফুটুনি করা চাই। তা ছাড়া, একটু ফুটুনি করলেই বা অপরাধ কী? এখন অনিচ্ছা থাকলেও পরে কোনোদিন কখনো সচ্ছলতা হলে যে সে উদার হবে না তা কে বলতে পারে? কিন্তু তাই বলে এমনভাবে গালাগাল দেবার কোনো মানে হয় না।

মাইনে বাড়বে না হাতি! কত দিন কত বছর ধরেই তো বলে আসছে, নিশ্চই পাবে—সে সমস্তই কথার কথা, ফাঁকা আওয়াজ। তা, নিশ্চই হবে কেন? একটা বাজে রোখো ওয়ার্থলেস

অফিসারের কখনো উন্নতি হয়? দু-দুবার ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা দিল, দুবারই ফেল করল, ফেলকরা অফিসারকে কে পোঁছে, কেন তার উন্নতি হবে? যেমন বেয়ারা চাপরাশির বাইনে বাড়ে তেমনি দু-পাঁচটাকা করে বাড়ছে দু'বছর অন্তর। এটা একটা ভদ্রলোকের চেহারা?

'শুনতে পাচ্ছি বি-এও নাকি একবার ফেল করেছিলে—বাবা কেন যে তখন সেটা খোঁজ নেননি—আর নিলেই বা হত কী—বার ডাক-নামটাই রোখো—'

ডাক-নামটা নিয়ে আগে-আগে অনেক যৌবনতরল মুহূর্তে অমলা যখন পরিহাস করেছে তখন কেমন আদরের মত লেগেছে, এখন সেই কথাটাই কেমন একটা জলন্ত অপমানের মত লাগল। কিন্তু, আশ্চর্য, এবার আর গালটা কিছু শোনালনা রথীন। নইলে তারও বাকাবাণ ছিল। অমলার বাবা বি-এর পাশ-ফেলের কী বোঝে? সে তো এক মোক্তারের মুহুরি।

এখন মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন এসব নিয়ে কথাকাটাকাটি চলেনা।

আগে-আগে দু'বা মারতেও রথীন দেরিপাও হয় নি। কিন্তু ওসব যুদ্ধে সেই বারেবারে হেরেছে, ঠকেছে। অমলা গায়ের জোরে না পেরে জিনিসপত্রের লোকসান করে দিয়েছে, আর যা মেয়েদের শেষ অস্ত্র, সেই তারস্বর চিৎকার ছুঁড়েছে। শুধু ঘরের মধ্যে বসে নয়, ঘরের বাইরে এসে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কখনো বা রাস্তায় নেমে। এখন ও সব মামুলি রাজপথ ছেড়ে দিয়েছে রথীন। এখন সে এমন সব পথ ধরতে চাইছে যা শুধু স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি।

নিজে যে গলা টিপে খুন করবে এমন সাহস সেই কিন্তু কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে অমলাকে খুন করতে পারত, মুখে যতই কেননা অভিনয় করুক রথীনের মনের গভীর স্তরে একটি সন্তোষের সরোবর যে তৈরি হয়ে উঠত তাতে সন্দেহ নেই। ধরো, একরাত্রি একদিন যে যখন বাড়ি ছিলনা তখন যদি কোনো চোর বা ডাকাত বাড়িতে ঢুকত ও কোনো সংঘর্ষ হোক বা না হোক যদি অমলাকে খুন করে ফেলত, সেটা এমন কিছু অঘটন হত না। সংসারে বিরাট একটা বিশৃঙ্খলা ঘটত নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথাও বুঝি একটা আরামের স্পর্শ লেগে থাকত। তবে, প্রশ্ন এই, চোর বা ডাকাত ঢুকবে কেন কিসের প্রলোভনে? এমন কিছু বিত্ত সম্পত্তি নেই যে তাদের খাটুনি পোষাবে, আর অমলার শরীর? শেওড়াবনের বাসিন্দে ভেবে সেদায় ঢুকে চলে যেত ভবে-ভয়ে। ঠিক একটা কঙ্কালের উপর চামড়ার প্রলেপ। চেহারায় সব সময়েই একটা টাকা-টাকা হাহাকার। সর্ব সময়েই নালিশের উদ্গম আলানো। কতদিন যে ঐ দেহটাকে রথীন ছোঁয়নি হিসেবে আনতে পারে না—মা কালী রক্ষা করুন, চায়ও না আনতে।

বাথরুমে যাবার পথে রথীনের একবার ইচ্ছে হল মশারি তুলে মেয়েটার কপালে একবার হাত রাখে, দেখে জ্বর কতটা। কিন্তু দরকার নেই, নালিশ আবার অন্য দিকে বিস্তারিত হবে। মেয়ের উপর তার কী পর্বত পরিমাণ অবহেলা সেটা ব্যক্ত হবার পরেই ঘোষিত হবে বাপ হিসেবে তার অদ্ভুত-নিদ্ভুত অযোগ্যতার কথা—তারপর লাফিয়ে উঠে করুণাস করে বলবে, যাও, হাঁ, রাত্রেই ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস। না, দরকার নেই, হাতটা একটু ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই কবি চিনতে পারবে বাবাকে, জেগে উঠে শিরসির আর ঘুমিয়ে পড়তে চাইবে না। বাবার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কত না জানি সে ভেবেছে, তারপর চোখ আর মেলে রাখতে পারে নি, ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। না, ও ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, কত আর সে বাবা-মায়ের ঝগড়া দেখবে?

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রথীন। যেন শান্তির দেশে এসে বাঁচল। ভাবল অন্তরকমও তো হতে পারত আর সেটা কত সহজে।

ওড়া নাড়তেই ব্যাকুল হাতে দরজা খুলে দিত অমলা। উদ্বেগের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে বলত, 'কত কী ভাবছিলাম তোমার জন্যে? এতক্ষণ শুধু ঘর-বার করেছি আর তাকিয়েছি জানলা দিয়ে—'

উত্তরে রথীন বলত, 'কাজ শেষ হল না তাই বিকেলের ট্রেনটা ধরতে পারিনি—'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল—'

'সন্ধের ট্রেন ধরলাম কিন্তু সেটা আবার দু'ঘণ্টা লেট—'

'বাবাঃ, কী ভাবনা, কী ভাবনা! কোথায় কার কাছে গিয়ে যে খোঁজ করি পথ পাচ্ছিলাম না। তার উপর মেয়েটার জ্বর হয়েছে।'

'জ্বর? কত?'

'ও কিছু নয়। এতক্ষণ তোমার জন্যে খুব উতলা হয়েছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নাও, জামা জুতো ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা হও। ওখানে উঠেছিলে কোথায়?'

'একটা হোটেলে। খাওয়া দাওয়া ভালো নয়।'

'আমি জানি তোমার অসুবিধে হবে। নাও, হাতমুখ ধুয়ে এস—না কি স্নান করবে? অসময়ে স্নান করবার দরকার নেই। মেয়েটার আবার জ্বর। একেবারে খেতে যাবে চল। যাই আমি সব গরম করি গে।'

'জানো, টাকা যা নিয়ে গিয়েছিলাম, সবই প্রায় হয়ে গেছে, বিশেষ কিছু কেরেনি।'

'তা নতুন জায়গায় গেছ, খরচ তো হবেই। তা টি-এ পাবে তো?'

'তা পাব, কিন্তু আমার কেরানির গ্রেড তো, বেশি কিছু বাঁচবে না।'

'না, বাঁচুক। টায়েটুয়ে খরচ উঠে এলেই হল। নিরিবিলে যে ফিরে এসেছ এই বেশি।'

'আবার যদি যেতে হয় তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি হোটেলে থাকবে আমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে তোমাকে নিয়ে শহর দেখব। তারপর ফিরে আসব সন্ধের ট্রেনে। তোমার একটা আউটিং হবে। কতদিন তুমি বেরোওনি কলকাতা ছেড়ে।'

'দরকার নেই, যেখানে আছি বেশ আছি। তুমি আমাকে ভাবনায় ফেলো না, তা হলেই হল। একদিন একরাতের কারাক, মনে হচ্ছিল যেন কতদিন ধরে তুমি কাছে নেই।'

সেই বিরহান্তিক মিলনের কথা ভেবেই রঙিন একটা শাড়ি পরত, একটু-আধটু যা প্রসাধন করত সজ্ঞানে। আগে-আগে রথীনই অমলাকে ডাকত, আজ না হয় অমলা নিজের থেকেই চলে আসত রথীনের কাছে। বুকের কাছটিতে পেলবতার ঘন হয়ে শুয়ে পড়ত। একটি তন্দি একটু ছোঁয়া, একটি মুদ্রাতেই বিশ্ববিমোহন কাণ্ড ঘটে যেত। আসল আনন্দ দানে, হস্ত বস্তুতে নয়। একটি চকিত চাউনির স্ফুলিঙ্গেই শুষ্ককাঠে ফুলের আগুন লেগে যেতে পারত।

কিন্তু এমন কিছু আর হবার নয়। সেই স্বপ্নের জগৎ থেকে বহু যোজন দূরে তারা ছিটকে পড়েছে—কিন্তু কে জানে স্বপ্নজগৎ থেকে বিতাড়িত হলেও স্বপ্নের থেকে কারু নির্বাসন নেই। অমলার টাকার স্বপ্ন আর রথীনের স্বপ্ন প্রেমের।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রথীনের উপর ঝুঁকিয়ে উঠল অমলা : 'যাও, হিসেব দাও, বলো মুখে-মুখে।'

কাতর মুখ করে রথীন বললে, 'আগে খেতে দি।'

'দেরি করে এসেছ, দেরিতে খাবে। হ্যাঁ, বলো—'

কী করবে, রাজি হল রথীন। প্রতি পদে সংঘাত করতে গেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে, রাতে ভালো ঘুম হবে না। অন্তত ঘুমোবার আগে পাবে না একটুও চিন্তার বিশ্রাম। একটা কিছু ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ার শাস্তি।

বললে, 'নতুন জায়গা তো, পথঘাট ভালো চিনি না, ট্যাক্সিতে অনেক বেরিয়ে গিয়েছে—'

'ট্যাক্সি! আফিসের কাজে তোমার ট্যাক্সি চড়া কেন? আফিসের কাজ তো একটা রিকশা করে গেলেও চলে।'

অমলা ঠিক-ঠিক বুঝেছে—তাকে ঠকানো সহজ নয়। আপিসের কাজ তো 'আপসে চলা যাবে না।' সেখানে কে বাবুয়ানা করতে যায়? অনর্থক বাবুয়ানা করে কেউ দিব্যি টাকা ওড়াতে পারে আর এদিকে আরেকজনের বিবাহিত জীবনে তো রিকশার বেশি অন্য কোনো বিলাসিতার সংস্পর্শই হল না—অমলার চাউনিতে এমন একটা অগ্নিশিখাও ঘুরিত হল।

'ও সমস্ত তো টি-এর মধ্যে আসবে।'

এতবার একটা মিথ্যা বললে সেই বিষবৃক্ষ যে কত ডালপালা মেলতে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। এখন রথীন ভাবতে পারছে না, কিন্তু টি-এর টাকা কী করে ঘরে তুলবে? আবার সেই না শশাঙ্কর কাছেই হাত পাততে হয়? যাক, তার এখনো দেরি আছে, মাসান্তে মাইনের সময় সেই কথা উঠবে। এখুনি চিন্তিত হয়ে লাভ নেই।

'বেশ, ট্যাক্সি ভাড়া পরে দেখব, আগে বলো ট্রেনভাড়া কত?' ভুরু চোখে তাকাল অমলা : 'হাওড়া থেকে আসানসোল কত থার্ড ক্লাস?'

'খানিকটা রাস্তা সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়েছিলাম।' অপরাধীর মত মুখ করল রথীন : থার্ড ক্লাসটায় নিদারুণ ভিড় ছিল, বেঞ্চিতে বসা দূরে কথা, মাটিতে বসারও জায়গা ছিল না—'

'কটা স্টেশন দাঁড়িয়ে গেলেই পরে ঠিক জায়গা মিলত।' অমলা যেন পাষাণ এমনি ভাবে বললে।

'মিলল না বলেই তো সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলাম।'

'তারপর গার্ড এসে ধরল? অপমান করল?'

ধরল না, ছেড়ে দিল, বা প্রত্যাখ্যান করে দিল, বলতে পারল না রথীন। শুধু অপমানের কথাটা অস্বীকার করল। বললে, 'না, অপমান করবে কেন? যা বাড়তি ভাড়া হল দিয়ে দিলাম।'

জেরার তবু নিবৃত্ত হয় না অমলা : 'কত বাড়তি?'

'ঠিক মনে নেই। রসিদ আছে।'

'রসিদ কোথায়?'

'পকেটে।'

তবু কি ছাড়ে অমলা? তবু কি ভাত দেয়? ছাড়া জামার পকেটে হাত ঢোকাতে গেল।

এখনও উত্তর প্রস্তুত আছে রথীনের—বললে, জামার পকেটে নয়, কোটের পকেটে—আর কোটটা তো এখন সুটকেশ পোরা। তবু যদি অমলা সুটকেশ খুলে কোট ঘাঁটতে যায় তখন শেষ কথা বলে রেখে, রাস্তায় পকেট গেছে, হারিয়ে গেছে। আর ওসব গ্লানির মধ্যে রথীনের যেতে ইচ্ছে করল না, বলে বসল 'পাঁচ সাত টাকা যা আছে ব্যাগের মধ্যে তা তুমি নাও।'

'সত্যি?' সমস্ত কিসের নিকেশ ভুলে গেল অমলা, টাকা পয়সা যা ব্যাগের মধ্যে ছিল সমস্ত উথাড় করে ঢেলে নিল হাতের মধ্যে, সন্দিগ্ধ চোখে তবু তাকাল একবার, বললে, 'ঠিক বলছ?'

'হাঁা, ঠিক বলছি। নিয়ে নাও যা আছে।'

রথীন জানে নিজের বলে কটা টাকা পেলেই অমলা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে বিপদ, প্রতি মুহূর্তে ফেরার মত অস্বস্তি কই? যাক, অন্তত তখনকার মত তো শান্তি হোক।

'এ টাকা কিন্তু সংসারে খরচ হবে না, তোমাকে বলে রাখছি। শেষে যে বলবে—'

'না, না, এ তোমার নিজস্ব। এ দিয়ে তুমি সিনেমাই দেখ বা রেস্টুরেন্ট থেকে চপ-কাটলেট কিনে এনেই খাও—

'কত তুমি আমাকে চপ-কাটলেট খেতে দেখেছ! আর সিনেমা—সিনেমায় আমি কখনো একা যাই?' আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে চাইল অমলা।

'না, না, আমি বলতে চাচ্ছি, যা তোমার প্রাণ চায়, তাই কিনে নিও।'

'সব সময়েই কিনিনা, কিছু কিছু জমাই। বুদ্ধিমানের মত কাজ করি।' নিজেই বিগলিত হল অমলা: 'কখন বিপদ আসে কেউ বলতে পারে না। তখন আমাকে কে দেখে, মেয়েটা কী করে মানুষ হয়!'

কখন বিপদ আসে মানে কখন রথীন মারা যায়! আর মেয়েটার মানুষ হবার আগেই রথীনের মৃত্যু এমন কিন্তু অসম্ভব নয়। হিসেবে খুব চতুর অমলা।

খাটে বিছানায় শুয়ে রথীন ভাবছিল, খুন হয়ে আর কটা লোক মারা যায়? খুন না হোক, গাড়ি চাপা পড়েও তো শেষ হতে পারে অমলা। গাড়ি যাক, রাস্তায় বেরুনোর সুযোগ তার সংকীর্ণ, বেশ, স্বাভাবিক ভাবেই তো সে রোগে পড়তে পারে, আর সেটার সাংঘাতিক হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই। যাক, অসুখও বাদ দিই, তাতে অনেক ঝামেলা, অনেক অর্থব্যয়, এমনিতে বাড়ির মধ্যেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে অনায়াসে। দাড়িতে আগুন লাগতে পারে, বা মেজাজ—মাথার রগ ছিঁড়ে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে কলতলায়। নিয়েরে সব দিক খোলসা করে দিতে পারে। পলকা একটা সুতোয় তো প্রাণ ঝুলছে, আরো সস্তায় ও সংক্ষেপে তো ছিঁড়ে যেতে পারে—যেমন হড়বড় করে খায়, গলায় বিঁধে যেতে পারে মাছের কাঁটা, যেমন হড়বড় করে কথা বলে, খেতে-খেতেও বলে, খাবার টুকরো আটকে যেতে পারে শ্বাসনালীতে। এক পলকেই খতম। বলে কিনা, 'কখন বিপদ আসে কেউ বলতে পারেন।' কী কুচক্রী! যেন রথীনের মরে যাওয়াটাই একমাত্র বিপদ! উনি বিলক্ষণ অনন্ত আয়ু নিয়ে এসেছেন, ওর ধরনিকা কোনদিন পড়বে না। তাই উনি তিল-তিল করে স্বামীর আয়ু-ক্ষয়-করা আয়ের কণিকাগুলো জমাচ্ছেন, পরে চেটেপুটে উপভোগ করবেন বলে। রথীনের বলতে কী, ভবিষ্যতের কথা বিদেহের মধ্যে না রেখে এখুনি এই মুহূর্তে সে নিঃস্ব শূন্য সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারে, শুধু একবার অমলা চোখের পাতাদুটো একত্র করুক। অন্তত না ভেঙে পড়ে থাক

বিছানায়, পক্ষাঘাতে চোয়ালটা বাঁকা হয়ে যাক। মুখটা তাতে কদর্য কুৎসিত দেখাবে এই বলে যদি অমলার আপত্তি থাকে, তাহলে অন্তত তার কিতটা আছেই হোক।

মনে-মনে, অন্ধকারে হাসল রথীন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কোনো শক্তিই তার হাতে নেই। অনন্তর সব ইচ্ছাই সে দাখিল করতে পারে, কিন্তু পূরণ করে কে? তার হাতের রেখায় কী লেখা আছে তা কে জানে?

অন্ধকারেই খোলা চোখের কাছে ডান করতলটা সে মেলে ধরল। আবার মুঠ করল। সে হাতের মধ্যে কিছুই দেখা গেলনা, শুধু সেই মাংসল বাহুর নিটোল স্পর্শটা উদ্বেল হয়ে উঠল।

জীবন-যাত্রার কী বিচিত্র ব্যবস্থা! যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবার কথা নয়, আর দেখা হবেও না কোনোদিন, তাকেই কিনা সমস্ত বাড়তি ভাড়া দিয়ে দেওয়া!

৫

একদিন দুদিন তিনদিন গেল—আসানসোল থেকে কোনো চিঠি এল না। তার মানেই হল না কিছু। যেন হবে, হতে পারে—এমন আশাও ছিল তার মনের কোণে।

চাকরির চিঠি না আসুক, অন্য চিঠিও তো আসতে পারে। তা তো পথাস্তর ঠিকানায়। এখনো আশা? না, আশা নয়, শুধু অফিস ফেরতের পথে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খানিক আড্ডা দিয়ে আসা। একটু এদিক সেদিক কটা কথা বলে মন হাল্কা করা।

'দেখুন তো এটা কি আপনাদের বাড়ির চিঠি?' খাকির পোশাকপরা ডাক পিওন এসে দাঁড়াল।

চিঠি কার তা পরে বোঝা যাবে। চিঠির মধ্যে কী লেখা আছে সেটাও পরের কথা। কিন্তু প্রথম নজরে ডাক পিওনকে দেখে মনে হল স্বর্গের দেবদূত।

এমন লোক তার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে এ দিন-রাত্রির হিসেবের বাইরে।

'আমার চিঠি।' মুখ গম্ভীর করল রথীন: 'টাইপে ঠিকানাটায় একটু ভুল হয়েছে।'

পিওন চিঠি দিয়ে চলে গেল।

চিঠিটা খুলতে একটু বুঝি দেরি করছিল রথীন, রান্নাঘর থেকে আগুনের হল্কার মতই ছুটে এল অমলা: কার চিঠি?

'সেই যে অফিসের কাজে আসানসোলে গিয়েছিলাম, সেখানকার।'

অমলা দেখল, লম্বা খাম, ইংরিজিতে ঠিকানা টাইপ করা। আর ভিতর থেকে যে চিঠিটা রথীন বের করল দেখল সেটারও একই রকমের হরফ। নিঃসংশয় হল। ফিরে গেল রান্নাঘরে।

চিঠিটা একবার দুবার তিনবার পড়ল রথীন। যেন পরীক্ষার পড়া পড়ছে। মানে বুঝতে পারছে না বলে আবার পড়ছে। কিংবা মানেটা এমন সোজা যে ঐটেই মানে কিনা যাচাই করবার জন্যে আবার পড়ছে।

অসহ্য-ভীষণ কোনো উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ বুঝি কখনো-কখনো নিদারুণ শান্ত হয়ে যায়।

হ্যাঁ, তার সেই চাকরিটা হয়েছে। কী, তারই তো? নামটা আবার দেখল, চিঠির মধ্যে, খামের উপরে। ঠিকানার টাইপের একটু ভুল থাকলেও নামে কোনো ভুল নেই। হ্যাঁ, চাকরিটা হয়েছে। স্টাফিং দে চারশো। হ্যাঁ, চারশোই তো। চারের পর দুটো শূন্য। আরো বাড়বার, সোড়ায় বা মাঝখানে কোনো ফাঁক। হয়নি—বেমালুম আছে। আরো কত কী বাড়তি আছে, কে জানে।

নিরাসক্ত শুরু হয়ে বসে রইল রথীন।

যদিও লম্বা খামের ইংরিজি চিঠিতে আগ্রহ নেই অমলার, তবু আবার আসতে হল এক ফাঁকে। বাড়িতে ঢুকানো তো ঘর, আসতে হলে সেই রথীনের ঘরেই আসতে হবে, নচেৎ আর কোথায় গেলে তার রসনা তৃপ্তি পাবে? বলতেই বলে, আমাকে একটা রেডিও দিয়েছ না কি দিয়েছে গুচ্ছের পত্রিকা রেখে যে তাদের নিয়ে একলা হব? মেয়েটাকে পড়াও না। ওরে বাবাঃ, মেয়েটাও এককাটি সরেশ। বলে কিনা আমি ক্লাস ফোর-এর মেয়েকেও পড়াতে পারি না।

ঘরে অমলা আবার আসতেই রথীন বললে, 'খবর খুব খারাপ।'

'খারাপ! কী হয়েছে?' চট করে আঁতকে করে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হলনা অমলার: 'অফিসের কাজে কোনো ভুল করেছ বুঝি? নিশ্চয়ই হিসেবের ভুল। সব সময়েই বাইরের দিকে মন, নিশ্চয়ই?'

'না, ওসব কিছু নয়।'

'তবে?'

'আমাকে আসানসোলে বদলি করে দিয়েছে।' রথীন বোঝাবার চেষ্টায় বললে, 'ওখানে আমাদের যে ব্রাঞ্চ আছে সেইখানে।'

'কী সর্বনাশ! বদলি করে দিয়েছে? কী হবে?' এতে আবার বোঝাবার আছে কী, অমলা—

'কী আবার হবে! যাব।'

'অফিসে এত লোক থাকতে তোমাকে বদলি করে কেন?' অমলা প্রায় বজ্র ভুলল মাথার উপর: 'এটা বদলি নয়, শাস্তি। তুমি একটা বাজেমার্কা ওয়ার্থলেস কেরানি তাই তোমাকে ঘুষে ঠেলে দিচ্ছে। তুমি সব দিক থেকেই ওঁচা, তাই তোমাকে সাজা দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছে।'

গালাগালগুলোকে অপমান বলে গায়ে মাখল না রথীন। শান্ত স্বরে বললে, 'পঞ্চাশটাকা মাইনে বেড়েছে।'

'বলো কী, পঞ্চাশ টাকা!' বেশ খুশির ভাব দেখাল অমলা। কিন্তু কই কুকথাগুলো ফিরিয়ে নিল না তো। একটুও স্নেহ করে বললে না তো, না, তোমারও কিছু কৃতিত্ব আছে, এক লাফে একেবারে পঞ্চাশটাকা বৃদ্ধি আদায় করেছ। বরং, যেমন স্বভাব, উৎসাহ তিরিত করে আনল অমলা, আর যাহি যেমন আর-সব জায়গা ছেড়ে যায়েই বসে তেমনি অমলাও সমস্ত গুণের জায়গা ছেড়ে দোষ খুঁজে নিয়ে বসল, বললে, 'অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই একশো টাকা বাড়ত কিন্তু তুমি যেমন হাঁদারাম তোমাকে পঞ্চাশ দিয়েই সরাতে চেয়েছে। তুমি আরো বেশি দাবি করো—'

'দেখি।'

এতে আর দেখবার কী আছে! বিদেশ জায়গা, বাড়িঘরের হদিস নেই, অমলা যাবেনা মেয়েকে নিয়ে। নতুন নাচ-গানের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে রুবি, তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া চলবেনা। পড়াশোনারও

ব্যাঘাত হবে বিস্তর। তাছাড়া কলকাতায় কত আত্মীয়স্বজন, কত রং চং—এ আসল কি কেউ ছাড়ে?

'হ্যাঁ, বাড়িঘর না পাওয়া পর্যন্ত হট করে যাবেই বা কী করে? তা ছাড়া কদিনের জন্যে বরদি ভাই বা কে বলবে?'

'কে যেতে চাইছে?' অমলা ঘুরে দাঁড়াল, দাঁড়াল তার আসন চিন্তিতে 'কিন্তু মাস-মাস কত পাঠাবে শুনি?'

'এখানে যে মাইনেটা পেতাম—সমস্ত।'

'বলো কী!' অমলা যে অমলা সেও চোখ বড় করল 'তার অর্থ আড়াইশোর থেকে কাটাকুটি দিয়ে যে দুশো বিয়াল্লিশ টাকা সাড়ে সাত আনা বাড়িতে আনতে—সমস্তটাই?'

'সমস্তটাই।'

'তাহলে তোমার চলবে কিসে?' একটু বুঝি মায়া হল অমলার।

'যে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ল তাই দিয়ে চালিয়ে নেব। আমি একা মানুষ, আমার জন্যে ভাবনা কী। ভাবনা তোমাদের জন্যে। একা পড়ে যাবে।'

'না, না, ভাবতে হবে না। ঠিকে ঝি-টার মাইনে বাড়িয়ে দেব, বাড়িতে থাকবে। এখানকার পুরো মাইনেটা পেলে বেশ সুরাহা হবে চারদিকে।' অনেক টাকার চাকচিক্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল অমলা: 'কাছেই মামাতো ভাইদের বাড়ি, দরকার হলে কাউকে বলব রাত্রে এসে শুতে। তাছাড়া আশে পাশে কত পড়শী—'

'পশাককেও বলব মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে।'

'তাই তুমি কিছু ভেবোনা।' যে কথাটা মনের মধ্যে এতক্ষণ ঘচঘচ করছিল এবার সেটা বলে ফেলল অমলা: 'টি-এর টাকাটা কী হবে?'

ধাক্কা খেল রথীন। সে মিথ্যেটা আবার মেরামত করতে হবে। বাঘ তার আধখাওয়া শিকার ভুলে যেতে পারে কিন্তু অমলা টাকার কথা ভুলবেনা।

টি-এর বাবদ টাকাটা কোত্থেকে খাওয়াবে ভেবে কূল পেলনা রথীন। বললে, 'ওটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'না, না, আমাকে পাঠাতে হবেনা, ওটা তুমি নিও। আমি তো অনেক পাচ্ছি। তোমাকে প্রত্যেক শনিবার কলকাতা আসতে হবে, টি-এর টাকার থেকে যতদূর পারা যায় ঐ খরচটা চালিয়ে নাও—'

'সে আর কতবার সম্ভব হবে?' রথীন চিন্তাকুল মুখে বললে, 'কলকাতায় ঘন-ঘন আসতে হলে আরেক বিরাট খরচের নিচে পড়ে যাব। ইনক্রিমেন্ট পঞ্চাশ টাকা।'

'ঘন-ঘন না হোক মাঝে-মাঝে তো আসবে।' ধমক দিয়ে উঠল অমলা, বললে, 'তোমার পঞ্চাশ থেকে পাঠাতে হবে না, আমার দুশো বিয়াল্লিশ থেকে পাঠাব। কিংবা যদি রাজি হও তো, তুমি আড়াই আমি আড়াই।'

এবার বুঝি ধরার কথা, অনেকগুলো টাকা নিজের খরচে পাবে বলেই বুঝি একটু উদার হয়েছে—নালিশ মোকদ্দমা মুলতুবি রেখেছে কিছুক্ষণ। আবার যেই একটা কিছু সংসার খরচের ডাক দেবে রথীন, অমনি আবার কোঁস করে উঠবে। বলে বসবে এমন অবুঝ বা অপদার্থ লোক আর দেখিনি।

অফিস ফেরত শশাঙ্কর বাড়ি গেল রথীন। কিরে আমার কোনো চিঠি এসেছে?

'চিঠি আসেনি তবে স্বয়ং লেখিকা এসে একদিন উপস্থিত।'

পরিহাস বুঝতে দেরি হলনা রথীনের। বললে, 'চিঠি লিখল না অথচ লেখিকা হল সে কেমনতরো ব্যাকরণ?'

'ব্যাকরণ জানিনা কিন্তু লোক কদাকার। তোর চেষ্টাকে প্রশংসা করতে পারিনা।'

'একজনের কাছে কদাকার আরেকজনের কাছে অপরূপ।' রথীন একটু গম্ভীর হল অলক্ষ্যে, পরে হাসিমুখে বললে, 'এসে কী বললে?'

'রথীন ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তুই কী বললি?'

'বললাম রথীন ঘোষাল বাড়ি বদলেছে। বলে তোর বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম।'

'কী—সর্বনাশ!'

'বললে, এরই মধ্যে বাড়ি বদলাবার কারণ কী বলতে পারেন? বললাম, বলাকওয়া নেই চোখের পলকে বিয়ে করে ফেলল কিনা, তাই এ বাড়ি ছেড়ে বড় বাড়িতে শিফ্‌ট করেছে। তা গিয়েছিল ও বাড়িতে?'

'গিয়েছিল। বললে, শিগগির আসানসোলে চলুন, আপনার জন্যে আমি ওয়েট করছি। তাই, শোন,' বাস্তবভূমিতে নেমে এল রথীন: 'আমি আসানসোল যাচ্ছি।'

'যাচ্ছিস?' শশাঙ্ক যেন একটা ঘা খেল।

'হ্যাঁ, এই তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।' পকেট থেকে লম্বা খামের চিঠি বের করল রথীন।

সত্যি-সত্যিই চাকরি পেয়েছে। স্টার্টিং মাইনে। তার উপরে বোনাস। ভালো কাজ দেখাতে পারলে ইনক্রিমেন্ট। ইনক্রিমেন্টে কোনো বাঁধা-ধরা নেই।

'সত্যি পেয়ে গেলি চাকরিটা?' শশাঙ্কর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কিন্তু মুখের উচ্ছ্বাসি দিয়ে সে ঈর্ষার উপর সে মোটা আবরণ টানলে।

'জীবনে একেবারে কিছুই পাব না। এ কখনো হতে পারে? প্রত্যেক ম্যাচেই জিরো করব, একবার একটাতেও সেঞ্চুরি করব না, এতে তাপ্পাবিবাতারও অরুচি ধরে যাবে।'

'ম্যাচ মানে কিন্তু বিয়ে।'

'জানি। আর জীবনে সেই ম্যাচ মোটে একটা। ওদিকে আমার পথে চিরদিনের মত কাঁটা দেওয়া। তুই বিয়ে না করে যে কী বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিস—সব চিরন্তন খোলা।'

'কাঁটা নেই বটে কিন্তু ফুলও তো ফুটল না—'

'কিন্তু কুঁড়ি তো ফুটেছে, ফুটছে—'রথীন সরল অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, 'শোন, অনেক ছলনা করে যাচ্ছি, সর্বশেষ ছলনা—তুই সব যাচিয়ে নিবি, তোকেই লক্ষ্য রাখতে হবে চারদিকে।'

'কী কী ছলনা?'

'অনেক।'

'কয়েকটা তো আমি জানি! তা, এতে ঘাবড়াবার কী আছে?' শশাঙ্ক আশ্বাসের

তার হেয়াল : 'ছলনা ছাড়া বাঁচা যায় কী করে? ছলনাই তো জীবনের সুখ। হাঁা, বল, কোন কোন বিষয়ে গণ্ডি টেনে, নজর রাখব?'

'বলছি। একজনের কাছে সরল ও সত্যবাদী না হতে পারলে শান্তি নেই।'

রথীন তার ছলনার দিবিস্তি দিতে বসল।

প্রথম ছলনা, অমলাকে বলেছে এটা তার বহালি চাকরিতেই বদলি হওয়া, নতুন কোনো চাকরি পাওয়া নয়। আসলে নতুন চাকরিতে মাইনে চারশো। অমলা জানে পুরোনো আড়াইশোর উপরে বাড়তি আর পঞ্চাশ। এই ছলনার কারণে বাড়িতে আড়াইশো পাঠিয়ে বাকি দেড়শো টাকা রথীন তার নিজের কর্তৃত্বে রাখতে পারবে। মানে, নিজের টাকা নিজেই চুরি করতে পারবে বরাবর হাতে। এমন একটা টাকা তার থাকবে যার জন্যে কারু কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সেই মুক্তি উপভোগ করবার জন্যে কলকাতার বাইরে চাকরি নেওয়া। তাই ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় বলে নি, নতুন চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ, বুঝিয়েছে অফিসের কাজে একদিনের জন্যে বাইরে আসানসোল। ইন্টারভিউতে কোনো ফল হবে এ যাত্রার আগে তার বিশ্বাস ছিল না, ইন্টারভিউ নিষ্ফল হয়েছে জানলে অমলা আবার তার অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা নিয়ে নানা ঝালাপালা দিত, সহ্য করতে পারত না। তাই গোড়াগুড়ি থেকেই ইন্টারভিউর কথা চেপে গিয়েছে। তাই উঠেছে টি-এর কথা। নতুন চাকরিটা না পেলে টি-এর টাকাটা পকেটের থেকেই খরচ করতে হত। এখন চাকরি পাবার পর সেটা রথীন নিজেই ম্যানেজ করতে পারবে।

'শুধু কটা টাকার জন্যে এত ছলনা?' পলাশ সহানুভূতির সুরে বললে।

'টাকার জন্যে নয়। মুক্তির জন্যে।' রথীন বললে, দীপ্ত কণ্ঠে, 'কটা টাকা হিসেবের বাইরে খুশিমত খরচ করতে পারি, হাঁা, বল, উচ্ছৃঙ্খলের মত উড়িয়ে দিতে পারি, তাইতেই মুক্তির স্বাদ। মুক্তির অর্থ টাকা খরচ করার স্বাধীনতা। যার টাকা নেই কিংবা যার টাকা থেকেও খরচ করার স্বাধীনতা নেই, সে যেখানেই থাক আর যাই বলুক বা লিখুক, সে বদ্ধ, সে বন্দী। যার অবস্থা শুধু নয়, যার খরচ করার মত প্রবৃত্তি সজাগ সেই সত্যিকার স্বাধীন।'

'তোর বউ কিন্তু ভালো। সব মেনে নিয়েছে।'

'ভালো!' মন্তব্য করার মত উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেল না রথীন। বললে, 'যদি জানে, নতুন চাকরি, চারশো টাকা মাইনে, আমাকে কুচি-কুচি করে কেটে ফেলবে, তার মানে সব টাকাতেই খাবা বসাবে, আমাকে অপব্যয়ী হবার এতটুকুও ফুরসৎ দেবে না। পাখি-কাক কা কা করে আর এ মানুষ-কাক সারাক্ষণ কানের কাছে টাকা টাকা করছে। তার থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যেই এত ছোড়জোড়।'

'বউকে সঙ্গে নিবিনে?'

'তোকে এতক্ষণ বলছি কী! সঙ্গে নিলে তো বেফাঁস হয়ে যাবে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাব। তা হলে কোথায় মুক্তি, কোথাও উধাও হবার সুখ। তাছাড়া বাড়ি কোথায়? সে অসুবিধেটাও সহজেই বুঝেছে। আসলে ঐ চাকরিতে বিবাহিত অফিসর কোয়ার্টার পায়। সেটা অবশ্যি চেপে গেছি, কেননা এমনিতে অমলা কলকাতাই বেশি পছন্দ করে।'

'বলিস কী!'

'কেন পছন্দ করবে না? মুটভরা টাকা পাচ্ছে যে! আগের পুরো মাইনেটাই তো ওকে পাঠাব এখন থেকে—আমার জন্যে খরচ নেই, খরচ নিয়ে নিত্যি আমার সঙ্গে সংঘর্ষ নেই, খুশিমত ঐ টাকা—অতগুলো টাকা ও খরচ করতে পারবে—এত বড় একটা স্বাধীনতার রোমাঞ্চ ছাড়ে কে?

'তোর কী হবে?'

'ওঃ, আমার হাতে দেড়শো টাকা থাকবে।' রঙীন আনন্দ করে উঠল: 'বলতে পারিস, স্বাধীন দেড়শো টাকা। একটা মেস দেখে নেব—না, না, ওখানে অফিসার্স মেসে থাকব, খেতে-থাকতে পঞ্চাশ টাকার বেশি খরচ পড়বে না। আর বাকি টাকাটা এক রাত্তার টাকা। তা দিয়ে আমি যা কিছু কিনব, খাব, খাওয়াব, যেখানে খুশি বেড়াব—সিনেমা দেখব, থ্রেজেন্ট দেব—যা আমার খুশি। কোনো ভয় নেই মানা নেই, কেউ কৈফিয়ত তলব করতে আসবে না।'

'বুঝলাম!' পরিহাস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শশাঙ্ক, বললে, 'এসব তো ওদিকের ছবি, ওদিকের ছবি কী?'

'ওদিকের ছবি শুধু একটা।'

'কী?'

'আমি অবিবাহিত।'

'বলিস কী, নিজেকে অবিবাহিত বলেছিস?'

'তুই আমার সমবয়সী। তুই যদি অবিবাহিত থাকতে পারিস, আমার থাকতে বাধা কী?'

'তা কিছু নয়, তবে ঐ মিথ্যেটার কী দরকার ছিল?'

'দরকার ছিল না? আমি বিবাহিত বললে ও যৌতুক আমার কাছে?'

'অবিবাহিত জানার পর তা হলে যৌতুক?'

'এখনো ঠিক যৌতুক নয়, তবে যৌতুকের সম্ভাবনাটা ঘোল ছেড়ে আঠারো আনার দিকে ঠেকেছে। বিবাহিতের তো কোনো কিউচার নেই, তার কাছে যৌতুক কেন? এ একজন ব্যাচেলার অফিসার, স্টার্টিংএই চারশো, বোনাস আছে, বিয়ে করলে কোয়ার্টার—এমন লোকের কাছে মেয়েরা যৌতুক না? মেয়ে ছেড়ে মেয়ের মায়েরা যৌতুক।'

'কিন্তু বিয়ে তো করতে পারবিনে।'

'ওরে বাবাঃ,' যেন ভূত দেখল রঙীন, 'এক বউ থাকতে আরেকবার বিয়ে করলে জেল।'

'তবে—মিছিমিছি—'

'কেন, বিয়ে ছাড়া আর কিছু করা যায় না? প্রেম করা যায় না? খেলা করা যায় না?'

'শোন, কাণ্ড বাধিয়ে বসিস নে।'

'তোকে চিন্তিত হতে হবে না। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মেয়েরা ঢের বেশি হুঁশিয়ার।'

'কবে যাচ্ছিস?'

'আমার পুরোনো অফিস থেকে রিলিজটা পেয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়ব।'

'মাঝে মাঝে আসবি তো? এই শনি-রবিবার?

'সব সপ্তাহে আসা কি সম্ভব হবে? বেশি যাওয়া-আসা করতে গেলেই তো একগাদা

খরচা। আর আমি হত দূরে থাকি বাইরে থাকি তবুই ঝঞ্ঝার শান্তি—যদি অবশ্যি ওর হাতে টাকা থাকে। আর যদি কখনো টাকা না থাকে, তুই আছিস, তুই চালিয়ে নিবি—'

'তা না হয় নিলাম, কিন্তু—'

'আমি সব শোধ করে দেব। তোর আসল কাজ হবে, টাকা জোগানো নয়—কেননা টাকার হয়তো বিশেষ টানাটানি পড়বে না, তোর আসল কাজ হবে আমাকে বাঁচিয়ে যাওয়া। আর যদি পারিস একটু-আধটু প্রশংসা করা। অর্থাৎ আমাকে যাতে কখনওই সন্দেহ করতে না পারে!'

'সন্দেহ কিসের? যদি ও-মেয়েটার কথা তোর বউ আর কোণা থেকে জানতে পারে, তোর সাফাই হবে, মেয়েটা খারাপ, বরের লোভেই হজে হয়ে ফিরছে আর যেই শুনেছে তুই বিবাহিত, অমনি জুটে পড়েছে। সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করবার কোনো অসুবিধে হবে না। আর প্রশংসার কথা বলছিস? তোকে প্রশংসা করব না তো কাকে করব? শুধু ইন্টারভিয়ুর জোরে এতবড় একটা চাকরি পেয়ে গেলি এ কি চারটিখানি কথা?'

'না, ভালো-ভালো টেস্টিমোনিয়েলসও ছিল।'

'রাখ, টেস্টিমোনিয়েলস অনেকেই থাকে, শুধু ফার্স্ট ইমপ্রেশনের উপরেই অসাধ্য সাধন করে ফেললি—'

একবার ব্যবহার করুন।

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত
গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

'এখন সেটা শেষ পর্যন্ত টেঁকে তা হলেই হয়।'

'টেঁকার কথা কে ভাবে!' শশাঙ্ক হঠাৎ দার্শনিকের ভাব দেখাল: 'কিছুই টেঁকে না। যতক্ষণ আলো আছে খড় কেটে নে।'

চারদিকে আলো ছড়িয়ে বিজয়ীর মত চলে গেল রথীন। কী জানি কেন, অজানা কারণে শশাঙ্কর মন মুষড়ে পড়ল। হলই বা না রথীন তার বন্ধু, তবু রথীন কেন সফল হবে, উজ্জ্বল হবে? চিরকাল যার কান্নার সুরে কথা কইবার কথা সে কেন আনন্দের সংবাদ দেবে? বিলাপের তোল বদলে ফেলবে? এটা কেমন যেন অসহনীয় লাগছে। যেন বিশ্রী একটা ছন্দপতন। ভাগ্যের কুৎসিত পক্ষপাত।

একটা আড়াই শো টাকা মাইনের কেরানি, বাড়িতে কলহপ্রিয়া মুখরা স্ত্রী, যার সব সময়েই অসন্তোষ,—সব সময়ে শশাঙ্কর কাছে আসবে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে, তবু বিত্তের সৈন্য নয় চিত্তের সৈন্য সম্পর্কে নালিশ করবে, নিজেকে ভাগ্যাহত প্রপীড়িত বলে জাহির করবে, মাঝে-মাঝে হাত পাতবে, কখনো বা ধার শোধ করতে ভুলে যাবে, বা স্ত্রীর নাম করে অনুগ্রহ বলে টাকাটা আত্মসাৎ করবে—এমনি একটা চেহারাই বরদাস্ত করা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল শশাঙ্কর। যদিও নিজে সে অবিবাহিত, ন'শো টাকা মাইনের প্রকাণ্ড অফিসর, তবু ছেলেবেলার বন্ধু বলে রথীনকে সে কাছাকাছিই রেখেছিল তার অসহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে কৃতী বলে বদান্য বলে অনুভব করবে বলে। ও এসে খোসামোদ করবে, নিজেকে বহুগর্বে ভূষিত বলে প্রচার করবে, আর মাঝে মাঝে ওর কোনো উপকার করতে ডাকবে এটাই একটা উপভোগের ব্যাপার ছিল। শশাঙ্কই সজ্জন, উচ্ছৃঙ্খল হবার মত সজ্জন, ওর এই নিবিড় ঈর্ষাটাও কম উপাদেয় লাগত না।

বিয়ে করেনি শশাঙ্ক, অথচ বহু ঘোরাঘুরি করেও একটা প্রেমের সাক্ষাৎ পেল না। আর রথীন, আজ সাত-আট বছর বিবাহিত, সে কিনা প্রেমের অনুশোদয় দেখতে পাচ্ছে। কে জানে কোথাও একটা নিষেধ থাকলেই বুঝি ভালবাসা আকুল হবার শক্তি পায় আর আকুলতা না থাকলে ভালোবাসা কী! শশাঙ্কর মধ্যে যদি নিষেধ থাকত, দারিদ্র্য কি পঙ্গুতা, তবেই বোঝা যেত মেয়েটার টান সত্যিসত্যিই ভালোবাসার, শুধু পাত্রীসজ্জার নয়। তেমনি যদি কোনো মেয়ে পেত যে নিষেধ দিয়ে তৈরি, দরিদ্র কি পঙ্গু কি ছোটজাত বা অন্য কোনো খর্বতায় খণ্ডিত, অথচ তার দিকে তার মন চলেছে তা হলে শশাঙ্ক নিজের ভালোবাসাকে আবিষ্কার করতে পারত। এ যেন সর্বত্রই সুলভ আর সুসময়ের মেলা বসেছে। কোথাও একটা নিষেধের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না পারলে প্রেম কী, প্রেমের স্বাদ-গন্ধ কোথায়? রথীনের জীবনে কেমন সুন্দর এসে গিয়েছে সম্ভাবনা! সে বিবাহিত, স্ত্রীর অতিরিক্ত আর কোনো মেয়েতে আসক্ত হওয়া তার নিষেধ, সেই আসক্তি তার স্ত্রীর প্রতি অপমান, তবু এত সব বাধা পেরিয়েও যদি তার ব্যাকুলতা থাকে তবে সেটা প্রেম নিঃসন্দেহ। মনে হয় সেই ব্যাকুলতারই আভাস মেগেছে রথীনে। কিন্তু সেই চেকার মেয়েটার কী দশা! শেষ পর্যন্ত সে ঠেক করে নেবে নিশ্চয়ই, সহজেই ভাবতে পারবে রথীন শুধু বিবাহিত নয়, সন্তানের পিতা। জানা সত্ত্বেও যদি সে বোঝে রথীনকে ছাড়া যায় না তবে বুঝতে হবে মেয়েটা প্রেমেরই প্রতিশ্রুতি।

মনে-মনে নিজেকেই বুঝি হার মানল শশাঙ্ক। সে প্রেমের জানে কী, কোন অবস্থায় কী মুহূর্তটে কী বিষয় সংস্থানে সেটাকে প্রেম বলে। প্রেমই এমন বস্তু যার সম্পর্কে কোনো শাস্ত্র নেই, আইন নেই, কারুই কোনো শেষ কথা নেই। কখন আসবে, কী ভাবে দেখা দেবে তাও কেউ বলতে পারে না। নইলে দেখ না, কতটুকু রথীন, যার জীবনে বিচিত্র বলে কিছু নেই, অভাবনীয় বলেও কিছু নেই, সে জীবনের পথে হঠাৎ কী কুড়িয়ে পেয়ে চকল হয়ে উঠেছে। নইলে, ভাবো, সামান্য দেড়শো টাকায়, সংসার থেকে আড়াল করা সামান্য দেড়শো টাকায় সে নিজেকে এত সচ্ছল মনে করছে যা না শো টাকায়ও শশাঙ্ক কল্পনা করতে পারে না। কী কুড়িয়ে পেয়েছে রথীন? যা কিনা শশাঙ্ক পায়নি, যার নাম স্বপ্ন, যার নাম সুখ, যার নাম ঐশ্বর্য। এ যে টাকা দিয়ে কেনবার জিনিস নয়, পথে চলতে-চলতে হঠাৎ কুড়িয়ে পাবার জিনিস।

রথীনের প্রতি হিংসায় পুড়তে লাগল শশাঙ্ক।

৬

আসানসোল ষ্টেশনে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে কেউ বরতে আসে কিনা। এত লোক, তবু সমস্ত কেমন ফাঁকা মনে হল।

এবার হাতা আসেনি, সঙ্গে ট্রাঙ্ক-বিছানা নিয়ে এসেছে, দেখলেই বুঝতে পারত কী ব্যাপার! ভোরে উঠে কার মুখ দেখলে একটা পাতলা সুটকেস, ট্রাঙ্ক-বিছানা হয়ে ওঠে।

অমলাই বরং বলেছিল একেবারে দিনের দিন সকালে না পৌঁছে আগের দিন দুপুরের ট্রেনে যাওয়া ভালো। নইলে তুমি যা গবাইলবয়, ট্রেন বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে, তোমার ঘুমই ভাঙলনা। সঙ্গে তো আমি যাচ্ছিনা যে সঙ্গাগ রাখব। তাই একদিন আগে যাওয়াই ঠিক। যদি কিছু ঘুমটুস হয়ে যায় তার শোধরাবার সময় থাকে।

রথীনের বিশ্বাস সেই ভোরের ট্রেনটাতে এলেই সেই সোনাঝরানো মুখখানি দেখতে পান।

ভাবতে অবাক লাগে কী ভাবে ট্রেনে রাত কাটিয়েছে! এবার তো সে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, ঘুমের অঢেল ব্যবস্থা করে, কিন্তু যেখানে গা-ভরা ঘুমের পিপাসা, সেখানে পুরো বার্থে গা ছড়িয়ে দিয়েও তার ঘুম নেই। মাঝে-মাঝে একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে, ট্রেনের চাকার শব্দ মিলিয়ে যায়, আবার চমকে জেগে ওঠে। নেই-নেই কিছু-নেই-র সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ কী আছে কী যেন পেয়েছে-র পার খুঁজে পায়! অমলা কবির কথা মনে আসে না, শুধু মনে আসে কাকে আবার দেখবে তার রহস্যময়তার কথা। কী সে শক্তি যা সমস্ত পিছনটাকে মুছে দিয়ে শুধু সামনের আকাশটাই রঙিন করে রাখে।

কুলিকে বললে, একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও।

ওভারব্রিজ দেখে এসেছে, এবার নেমে এসে গেট পেরিয়ে টিকিটের কাউন্টারের দিকে তাকাল, কোথাও রেখাটিও নেই।

অফিস-ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়। ওখানে পাওয়া না গেলেও কোথায় আছে হদিস পাওয়া যাবে হয়তো। শেষে ভাবল, কী দরকার। ওর কোর্টটার তো আছেই, যাবার পথেই পড়বে, সেইখানে নেমে খোঁজ করে গেলেই তো হবে। প্রত্যহই তাদের দিকে ওর চিঠিটি পড়বে এমন কোনো কথা নেই।

চলো চলো জলদি। রেখার বাড়ির কথা মনে হতেই রথীন উতলা হয়ে উঠল।

ট্যাক্সিটাকে গোড়াতে তাড়া দিয়েছে, তাই সে দ্রুতবেগেই বেরিয়ে গেল। এই, একটু দাঁড়িয়ে, এ সামান্য কথাটা বলবারও সময় হল না। এখন থামিয়ে ব্যাক করে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। এ যেন নিয়তিরই নির্দেশ, সামনে এগিয়ে যাওয়া। যা আপনা আপনি হয়, আপনা আপনি আসে, তাই ভালো। নিজের ঔদ্ধত্যে উদ্যোগ করে কিছু করতে গেলেই হয়তো পা খেতে হবে। যে স্টেশনে এনে দিয়েছিল সে যদি ইচ্ছে করে সেই আবার গাড়িতে তুলে দেবে।

যাবার সময়রেখার বাড়ির দিকে একবার দ্রুত তাকিয়েছিল রথীন। সব যেন কী রকম ফাঁকা-ফাঁকা মনে হল, আগ্রহ নেই কৌতূহল নেই, সব যেন কী রকম স্তিমিত ও উদাসীন। তার মানে কী? তার মানে সম্প্রতি রেখা বাড়ি নেই, কিংবা হয়তো ঘুম থেকেই ওঠেনি। তার মানে কি এই রেখা তাকে ভুলে গেছে, দেখলেও চিনতে পারবে না, বা, বিরক্তিতে তার ভুরু কুঁচকোবে?

অত কিছু ভাববারই বা হেতু কী?

কেন, সেই তার কালো চোখের বিদ্যুৎচকিত ইশারা? সেই ইশারা কি এই বলে না, তুমি আমার লোক, আমাকে ছাড়া অন্য কারু কাছে ধরা দিও না! মোটেই না। ঐ ইশারা বরং বলছে, এখান থেকে পালাও, এখানে এলেই সর্বনাশ। মনে আবার জোর খুঁজল রথীন। কখনো কখনো পালাতে বলা মানেই কাছে ডাকা। না দিয়ে হাঁ-কে ফুটিয়ে করা। সর্বনাশ যদি কাছে আসে তেমনি আবার পালিয়ে যায়। পালানো তো কখনো-কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ারই প্রস্তাবনা।

কে জানে কী।

একবার ভাবলে, যাই ফিরে যাই। দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিই। ও ঘুমমাখা মুখে রুক্ষ চুল ও রেখাসঙ্কুল শাড়িতে বেরিয়ে আসুক। আজ নতুন কাজে প্রথম জয়েন করতে যাব, ওর মুখখানা দেখে যাই।

কে জানে দরজায় ধাক্কা দেওয়া মাত্রই বেরিয়ে আসবে কিনা। হয়তো বসিয়ে রাখবে। তারপর মুখটুখ ধুয়ে, চুলটুল ঠিক করে, জামা পরে শাড়ি বদলে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে আসবে। সেইটেই তো বাসিমুখ হবে। বিছানা থেকে উঠেই প্রথম যেখানো মুখটাই তো তাজা মুখ। বাসা মুখ চায় না রথীন, তাজা মুখ চায়। টিকিট চেকার মেয়ে, চেক না করে কিছু করবে না। তা হলে সেই প্রথমের রোয়াক থাকল কই?

দরকার নেই, যা সহজে আসে তাই নিয়ে খুশি থাকাই ভালো। স্বভাবে যেটুকু ফোটে সেটুকুই সুরভিত। জবরদস্তিতে ফল হলেও তাতে রস জমে না। আর যে ফলে রস নেই সে ফল কে আস্বাদ করে?

আগেই অফিসার্স মেসে উঠে কাগজপত্র রেখিয়ে ঠাঁই করে নিল রথীন। তারপর যথাসময়ে স্নানাহার সেরে সেজে-গুজে চলে গেল অফিসে।

কারখানা-সহ-অফিস, একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। অফিসের বাস আসে, নিয়ে যায় কর্মীদের। কেউ-কেউ সাইকেলেও যায়, কেউ-কেউ বা সরকারী বাসএ। ফেরবার সময় কেউ-কেউ পায়ে হেঁটেই ফেরে, বিকেলের বেড়ানোটা সেরে নেয়। রথীন অফিসের বাসএই আসা যাওয়া শেল, এখন ফেরবার সময় কী ভাবে ফেরে সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

নতুন কাজে জয়েন করেই রথীন অনুভব করল যেন দ্বিতীয় জীবন পেয়ে আরেক পৃথিবীতে চলে এসেছে। শরীরে তার নতুন স্বাস্থ্য, রক্তে নতুন কাঁজ, চোখে নতুন রঙ। চারদিকে অনেক আলো, অনেক আনন্দ, অনেক উন্মাদনা। এমনটি যেন সে আর কখনো দেখেনি, কখনো শোনেনি, কখনো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে স্পর্শ করেনি।

এমনও হয় তা হলে?

অলৌকিকের দিন চলে গিয়েছে এই তো চিরদিন শুনে এসেছে, নিজেও বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু এ অনুভূতিটা অলৌকিক ছাড়া আর কী।

সকলকে ভালো লাগছে, মুহূর্তে সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে যাচ্ছে, এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে চলে যাচ্ছে, কাজ বুঝে নিচ্ছে, বুঝতেও একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, ঠিকঠাক রিপোর্ট তৈরী করে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে এমনি কত শত পৃষ্ঠা সে এক বৈঠকে লিখে দিতে পারে, আর রচনায় এমন কিছু মৌলিকতা সে দেখাতে পারে যাতে তার উপরওয়ালারা পর্যন্ত তারিফ না করে পারবে না। এমন একটা সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে। অস্তিত্বের তলের নিচে কোথায় একটা মুমূর্ষু পুলিশ ছিল, সেই হঠাৎ নাড়া পেয়ে দাবানল সৃষ্টি করে বসেছে।

এ বিশাল বিস্ময়ের মূলে কী?

মনে-মনে হাসল রথীন। মূলে, ষেড়শো টাকা। মোটে ষেড়শো? হ্যাঁ, যে টাকাটা তার নিজস্ব। যে টাকা সে কাউকে না জানিয়ে কারু সঙ্গে পরামর্শ না করে খরচ করতে পারে, খরচটা ছোট কথা—ইচ্ছেমত উড়িয়ে দিতে পারে, পুড়িয়ে দিতে পারে, কাউকে দান করে দিতে পারে। টাকার অঙ্কটা বড় কথা নয়, ব্যয় করার স্বাধীনতাটাই বড় কথা। রোজগার করে কী হবে, যদি সমস্ত টাকাটাই স্ত্রীর শাসনে সংসারের হিসেবের মধ্যে বাঁধা পড়ে। যদি একান্ত নিজের বলে উপরি কিছু না থাকে, যা অর্জনে প্রচ্ছন্ন ব্যয়ে প্রচ্ছন্ন, তবে শুধু জীবন ধারণই করা হয়, বাঁচা হয় না। যে আর্থিক স্বাধীনতা মানুষের সুখের আকর সেটা রোজগারের স্বাধীনতা নয়, ব্যয়ের স্বাধীনতা।

বিস্ময়ের মূলে আরো একটা জিনিস আছে। তার নাম আশা।

কিসের আশা?

নিজের মনের কাছে লুকোবে না রথীন, হ্যাঁ, রেখার সঙ্গ পাবার আশা। বেপরোয়া মন আরো অনেক দূর যেতে চায় বটে, কিন্তু ততটা সে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে প্রায়ই এখানে রেখার সঙ্গে দেখা হবে, যোগাযোগ হবে, চাই কি কিছুটা কাছাকাছিও হওয়া যাবে। হ্যাঁ, কিছুটা, তার বেশি নয়। তার বেশি আইনে লেখে না।

আমি কী করব, মন এসব বলছে। জোরে বলছে হবে না, মনে বলছে হতে পারে। আশা করতে দোষ কী। সমস্ত জীবনই তো আমার পাশা খেলা।

সন্ধেয় অফিস থেকে বেরিয়ে এসে রথীন দেখল গেটের বাইরে একটি সুহাসিনী মেয়ে দাঁড়িয়ে।

হাতে খাতা-পেন্সিল নেই, শুধু সামান্য একটা ব্যাগ, পায়ে হাঁটবার জুতো নেই, সামান্য স্যাণ্ডেল। সমস্ত মিলিয়ে যেন বাঁশির টানা একটা সুর।

কে এ মেয়ে? আর কে? শীতের শুকতায় বসন্তের একটি রেখা।

'এ কী, আপনি এখানে?' রথীন এগিয়ে গেল: 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি সব জানি।'

কেমন যেন ভয় পাইয়ে দেবার মত কথা। রথীন একটু অবাক হবার ভাব করল: 'কী জানেন?'

নির্মল হাসিতে সমস্ত সংশয় মালিন্য মুছে দিতে চাইল রেখা, বললে, 'আমি এসে খোঁজ নিয়ে গেছি।'

এ সব খোঁজ নেওয়া ব্যাপারে বিরক্তিকর। তাই অস্বস্তি নিয়ে রথীন প্রশ্ন করল: 'কী খোঁজ নিয়েছেন?'

'যে আপনারই চাকরি হয়েছে।' এ যেন প্রায় রেখারই নিজের চাকরি হওয়া। পরে রথীনেরই পুরোনো কথার জের টানল রেখা: 'কার মুখ দেখে সেদিন ইনটারভিউতে গিয়েছিলেন ভুলে গেলেন?'

'জানেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পেতে দেরি হল। ভাবলাম বুঝি হল না। তারপর ভেবেছিলাম আপনার চিঠি আসবে। আপনিও একছত্র লিখলেন না—'

'বা, আমি লিখতে যাব কেন?' রেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'আমার তো দেখবার কথা যদি আপনার চাকরি না হয়? আমি তো নিজেই খোঁজ নিতে এসে জেনে গেলাম, আমার ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে আর আজই আপনি জয়েন করছেন।'

আবার খোঁজের কথা। রথীন বললে, 'কত মাইনে তার খোঁজ নেন নি?'

'তা জেন না নিয়েছি?'

'কত?'

'আপনি মাইনে কমিয়ে বলেছেন?'

'কমিয়ে বলেছি?'

'হ্যাঁ, কে বললে আপনার মাইনে সাড়ে পাঁচশো।'

'চারশো নয়, পাঁচশো নয়, একেবারে সাড়ে পাঁচশো। অদ্ভুত তো!'

'হ্যাঁ, সেড়শো টাকা বেশি।'

সেড়শো টাকা বেশি! এ খবর রেখা কী করে জানল? রথীনের মুখ প্রায় পাংশু হয়ে এল। এবার স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি নিয়ে বললে, কোয়ার্টার্স সম্বন্ধে খোঁজ নেন নি?'

'তাও নিয়েছি।'

'কী জেনেছেন?'

'জেনেছি আপনার ভবিষ্যৎ নেই।'

'ভবিষ্যৎ নেই?' রথীনের প্রাণ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। এ কোথাকার কুহকিনী?

'ভবিষ্যৎ নেই মানে, বর্তমানই আপনার ভবিষ্যৎ।' রেখা হাসল, কিন্তু এ বুঝি শুধু কৌতুকের হাসি নয়, এ বুঝি অন্তরের জ্যোৎস্না।

'বর্তমান তো অফিসার্স মেস।' যেন কিছু বুঝতে পারেনি এমনি মুখ করল রথীন।

'সে কে না জানে?'

সে কে না জানে! বেশ সহজ গলার সুরেই বললে রেখা। সন্দেহের এতটুকুও ছায়া নেই কোনোখানে।

তবে আর কথা কী! রথীনের বুকের থেকে পাষাণভার নেমে গেল। বললে, 'অফিসার্স মেসের ভবিষ্যৎ নেই?'

'কী ভবিষ্যৎ?'

'অফিসার্স মেসের ভবিষ্যৎ কোয়ার্টার্স।'

'সে কে না জানে?'

'তবে বর্তমানই ভবিষ্যৎ বলছিলেন কেন?'

রেখা হাসল। কেন বলছিল তা কে জানে। অফিসার্স মেসের বাস তৈরি হচ্ছে, তার দিকে ইশারা করে বললে, 'ঐ যে আপনার রথ তৈরি।'

'আপনি যাবেন কিসে?'

'আমার তো ভবিষ্যৎ নেই, আমি পায়ে হেঁটেই চলে যাব।' রেখার স্বরে যেন অভিমানের ছোঁয়া।

'ভবিষ্যৎ নেই মানে?'

'না, আমি চিরন্তন বর্তমান।'

সহসা রথীনের চোখের সামনে থেকে অন্ধ যবনিকাটা উঠে গেল। যেন আরেক জগৎ, অদেখা জগৎ উদ্ঘাটিত হল। যদি বর্তমানই রথীনের ভবিষ্যৎ হয় আর রেখা যদি বর্তমান হয়, তা হলে সহজ লক্ষিকে রেখা তার কী হয়? প্রগাঢ় চোখে তাকাল রথীন, দেখল রেখা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

অফিসের বাসকে রথীন বললে, তার জন্যে যেন অপেক্ষা না করে, সে অন্যভাবে যাবে। বলেই আবার চলে এল রেখার কাছে। জিজ্ঞেস করলে, 'ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?'

'রাস্তায় প্রাই করা ট্যাক্সি কম মেলে, পেতে হলে সেই স্টেশন।' রেখা কৌতূহলের সঙ্গে সাগ্রহ আগ্রহ মেশাল: 'কেন যাবেন কোথায়?'

'আপনিই বলুন।'

'বা, আমি বলব কী।'

'আপনি বলবেন না তো কে বলবে। আপনিই তো নিয়ে যাবার জন্যে আমার অফিসের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—'

'তার মানে তাই হল? আমি দেখতে এসেছিলাম কাজটা সত্যিই নিলেন কিনা। তা গেটের বাইরে এসে প্রথমে তো চিনতেই পারলেন না। এখন তো আর উমেদার নন এখন ডাঁটালো অফিসর—চিনতে না পারারই কথা।'

'কী আশ্চর্য, আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন তো?'

'সত্যি, যাবেন?' বালিকার মত আনন্দ করে উঠল রেখা। পরমুহূর্তেই আবার একটু

অভিমানের সুর মিশিয়ে বললে, 'আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। আপনি নিজের থেকে যেতে পারেন না?'

'তাই তো যাচ্ছি, চলুন—' এ সময়ে রেখার হাতটা রথীন অনায়াসেই ধরতে পারত, কিন্তু সেই মুহূর্তে পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল বলে আবহাওয়ার স্নিগ্ধতা তরল হয়ে গেল বটে সেটা সম্ভব হল না। বিমূঢ়ের মত বললে, 'চলুন, স্টেশনে গিয়েই ট্যাক্সি নি, আর আপনার বাড়িতে গিয়ে সেদিনের মত চা খাই।'

'স্টেশনে যেতে পারলে ট্যাক্সি নিয়ে কী হবে? স্টেশনের কাছেই তো আমার কোয়ার্টার।' মুচকে হাসল রেখা: 'সব ভুলে গেছেন বোধহয়।'

'সত্যিই তো। সব কী রকম গুলিয়ে গেছে। আসলকে পেয়ে খুঁটিনাটির কোনো খেয়াল থাকছে না।'

আসলকে পেয়ে! রেখা ঈষৎ গম্ভীর হল—পাওয়া মানে কী? পথের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া, না, আরো কিছু? সে পাওয়া কি এতই সোজা?

'বাসএ যাবেন?'

'ওরে বাবা, উঠতেই পারব না। তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভালো।'

'রিকশায় যাবেন?'

'রিকশায়?' রথীন ভাবতে পারত না এমন একটা প্রস্তাব রেখার দিক থেকে আসতে পারে। বোকার মত মুখ করে বললে, 'তা মন্দ কী!'

একটা চলন্ত খালি রিকশায় উদ্দেশে হাত তুলল রেখা।

রিকশাটা আসতেই রেখা রথীনকে বললে, 'উঠুন।'

রেখার ইচ্ছে, সুতরাং রথীনই আগে উঠল, আর একাগ্র হয়ে আশা করতে লাগল এই রেখা বুঝি স্পর্শের চেউ নিয়ে তার পাশে এসে বসে।

কিন্তু রেখা নিশ্চল।

'এ কী, উঠছেন না যে? উঠুন।' রথীন ডাকল।

'এই যে উঠছি।' আরেকটা চলতি রিকশা ধরে উঠে বসল রেখা। বললে, 'চলো স্টেশন রোড।'

দুজন যে দুটো আলাদা রিকশায় যেতে পারে এ সাধারণ বুদ্ধিটাই রথীনের মাথায় আসেনি। যেন গালের উপর ছোট্ট একটা চড় খেল।

এটাই তো মনঃপুত। রেখার শুধু উপস্থিত বুদ্ধিই নেই, আছে সপ্রতিভতার চেতনা। এমন কিছু বিপদে পড়েনি যে দুজনকে ঠাসাঠাসি করে একটা রিকশাতে উঠে পালাতে হবে। পথে যখন রিকশার ছড়াছড়ি তখন একটাকে মাত্র ডেকে তাতে রথীনকে চড়িয়ে তার পাশে এসে স্তূপীভূত হলে রেখাকে কখনোই মূল্যবান মনে হত না। মনে হত খেলো, সস্তা, গরিব। মূল্যবান মনে না হলে প্রাপ্তির মধ্যে গাঢ়তা আসে কী করে? এই যে এখন আলাদা রিকশায় যাচ্ছে রেখার এই নির্লিপ্ততা এই দূরত্বই তাকে দিচ্ছে একটি মূল্যের মর্যাদা।

বাড়িতে পৌঁছে রেখা জেদ ধরল দুটো রিকশার ভাড়াই সে দেবে, যেহেতু রিকশাটা তার

আইডিয়া। রবীন চাইছিল যেহেতু সে পুরুষ ভাড়াটা তারই দেওয়া উচিত, অন্তত ধার ধার তার ভার। বারো আনা বারো আনা—হেরফেরটাকা, এমন কিছু কম নয়।

'আমরা কি আলাদা আলাদা এসেছি যে ভাড়াও আলাদা আলাদা দেব?' রেখা বললে।

'সে কী, আলাদা আলাদা আসিনি?'

'মোটেই না, একসঙ্গে এসেছি। গাড়ি আলাদা হতে পারে কিন্তু যাত্রা এক।

'বেশ একসঙ্গেই এসেছি। কিন্তু সমস্ত আলোটাই আমার জন্যে। সুতরাং একশোর ভাড়াটা আমি দেব।'

'না, আমি দেব।'

'আপনি কত মাইনে পান?'

'ষাটসামান্য।'

'গুনিনা কত?'

একটুও ক্ষুণ্ণ হলনা রেখা। যেন এ জানবার অধিকার রবীনের আছে, থাকা উচিত। মুখভরা হাসি নিয়ে বললে, 'দেড় শো।'

'আচ্ছা দিন—আপনিই দিন।' পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিল রবীন। ভাবল জোর করে প্রাধান্য ফলাতে গেলে রেখা ভাবতে পারে যে দরিদ্র বলে তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। সেটা ঠিক হবে না। বরং এ ভাবটা সৃষ্টি হওয়াই ভালো যে কিছু তার দেখা বহন করলেই মনীচীন দেখাবে। হ্যাঁ, মন্দ কী, ও পক্ষ নিজের থেকেই একটু এগিয়ে আসুক না, নিজের থেকেই একটু উন্মুখ হোক—জীবনে এ আস্বাদ সে কোনোদিন পায়নি—নিজের থেকেই সে সুইচ-অন করে আলো করে দিক, নিজের থেকেই আবার সে সুইচ-অফ করে, করে দিক অন্ধকার। কিছুক্ষণের মত রবীন নিষ্ক্রিয় হোক, নিঃসাড় পুলিনের মত সমুদ্রকল্লোলের জন্যে প্রতীক্ষা করুক।

কী সুন্দর এই উদ্যোগ! নিজের থেকে তার জন্যে অফিসের গেটে গিয়ে দাঁড়ানো, নিজেই বিল্লা ভেঙে ভাড়া ঠিক করা, নিজেই আবার ব্যাগ খুলে ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া। সবার উপরে, গাড়িতে টেনে নিয়ে আসা। কী এই নতুন অভিজ্ঞতা আর কাকে মধুরতর ইঙ্গিতে চালিত হতে বাধিত হতে, একটু বা পীড়িত হতে। আমি শুধু হৃদয় পরিপূর্ণ করে রেখে অপেক্ষা করব আর তুমি তোমার যা খুশি তাই করবে আমাকে নিয়ে—এমন একটা রোমাঞ্চের দেখা পাওয়া কি কম কথা!

কে জানে আরো কত কী করবে রেখা, নিজের আনন্দে নিজের প্রেরণায়। কত আড়াল সরিয়ে দেবে, কত আবডাল ভেঙে ফেলবে, কত বাতায়ন উন্মোচন করবে। রবীনের শুধু আগুন হয়ে জ্বলবার কথা, সেই আগুন থেকে দীপ ধরিয়ে নিয়ে, একের পর এক অসংখ্য দীপ ধরিয়ে নিয়ে রেখা শুধু দীপান্বিতায় রাত হয়ে থাকবে।

রবীনকে পেয়ে সরযূবালা উল্লাস হয়ে উঠলেন।

'তুমি কাল আসবে ভেবে দুপুর বিকেল সবগুলি ট্রেন ল্যাটেও করেছে—বারে বারে মুখ চুন করে ফিরে আসছে—দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। আমি কিন্তু বলেছিলাম আজ ভোরের ট্রেনেই আসবে, শহরে ঢোকবার পথেই দেখা দিয়ে যাবে বেহিস। তাও যখন হলনা তখন নিজেই চলে গেল আফিসে। শেষে একেবারে ধরে নিয়ে এসেছে। খালি বলছিল, চাকরিটা বোধহয় নিলে না, আর কোথাও

বোধহয় অস্বীকার পেয়েছে। আমি বলছিলাম, এমন চাকরি কেউ পেয়ে ছেড়ে দেয়? আর এ তো শুধু চাকরি নয়, সেই সঙ্গে—' নিদারুণ মুখরক্ষা করতে চাইলেন সরযূবালা: 'সেই সঙ্গে আবার কোয়ার্টার। মেয়ের মুখ অন্ধকার হয়ে ছিল, এতক্ষণে হাসি ফুটেছে—'

'মোটেই আমি হাসছি না।' এক হাসি অস্বীকার করতে গিয়ে আর এক হাসি হাসল রেখা।

আজকের আতিথেয়তার আয়োজন সরযূবালা নিজে সমস্ত করেছেন, তাই কিছু আতিশয্য ঘটেছে। কিন্তু রথীন প্রায় বিভীষিকা দেখল। বললে, 'এত সব খাবে কে?'

'মোটেই এত সব নয়! সব খেতে হবে। সমস্ত রেখা নিজের হাতে করেছে।'

'সত্যি?' উৎসাহিত হয়ে হাত লাগাতে চাইল রথীন।

'রান্নার কথা ভুলে যান, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে খাওয়ার।' রেখা কোমল মীমাংসার সুরে বললে, 'আপনার যা ইচ্ছে যতটুকু ইচ্ছে তাই শুধু খান।'

'একী দেখছ? আরো কত কী রেখা রান্না করতে পারে!' মা-রা যেমন বেশি-বেশি বলে তেমনি করেই বললেন সরযূবালা।

রথীন পরিপূর্ণ চোখে তাকাল রেখার দিকে। তার সর্বত্র রেখা, মাথে, ঠোঁটে, চিবুকে, গলায়, কাঁধে, বাহুতে, বুকে, কোমরে সর্বত্র লাবণ্যের অঙ্কন, সব যেন ধারার মত শরীর বেয়ে নেমে পড়েছে দুটি পায়ের পাতায়, কিন্তু তার জীবনে-যৌবনে কোনো রেখাপাত হয় নি। সে শুধু এক অনাঘ্রাত পবিত্রতা। কাকে সৌন্দর্য বলে কে জানে। রথীনের মনে হল পবিত্রতার মত সৌন্দর্য আর হতে নেই।

আরো কত কী রেখা রান্না করতে পারে! কত কী হয়তো পরিবেশনও করতে পারে! তারপরে কী? তারপরে?

যদি তারপর বলে কিছু না থাকত! প্রতিপদেই তারপরের জিজ্ঞাসা। হয়তে বলেও তারপর!

না, পরকাল মানি না। তারপর মানি না। প্রাপ্তমাত্রই ভোগ করি। তারপর যদি কিছু থাকে তো হবে। সে কথা আগে থেকেই ভাবতে বলে কে? ভাবতে বসলেও তো তারপর!

আগে ফাঁসি তো হয়ে যাক, পরে না হয় বিচার হবে।

কিন্তু রেখা এ কথাটা কী বলল? যা ইচ্ছে, যতটুকু ইচ্ছে, ততটুকুই খাবে? জীবনের কি শুধু এইটুকু সত্য? শুধু অন্নে, অর্থেই সে রাজি?

'না, না, খাচ্ছি'— রথীন চেয়ারটা টেবিলের কাছে এগিয়ে নিল।

সরযূবালা তারপর মেয়ের গুণের পরিচয় দিতে বসলেন। কেমন সৎ, এক পয়সা ঘুষ খায় না। কেমন কর্মঠ পরিশ্রমী, কেমন হাতিবশীল, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী—

'মা, কী হচ্ছে?' রেখা মেহে ধমক দিয়ে উঠল।

রথীন জনান্তিকে বললে, 'আমি তো শুধু একগুণ জানি।'

'কী?' রেখাও তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনল।

'মার্জনা।'

কোনো নিবিড়তর কিছুই বুঝি আশা করছিল রেখা। বললে, 'সে আবার কী?' সে কী করে বুঝবে এই কথাটার তাৎপর্য কত গভীরে, কোন সুদূর ভবিষ্যতে?

'না, সেই যে বিনা টিকিটে আপনার ফার্স্ট ট্র্যাভেল করলাম, সেই একসেস্‌টা আপনি মার্জনা করলেন না?'

'আহা, সে আবার কী মার্জনা!'

'কী বলেন! মার্জনাই তো আপনার মহৎ গুণ! ট্রেণ থেকে নেমে সঙ্গেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, দেখা করা উচিত ছিল—অথচ আপনি সে ত্রুটি ক্ষমা করে নিজের থেকেই এলেন আমার অফিসে—'

'থাক।' রেখার কথায় একটু বুঝি অভিমানের কাঁপন লাগল। তার অর্থ, রথীন তার মাঝে আর কোনো গুণের আভাস দেখল না? রূপও তো মেয়েদের একটা গুণ। মেয়েদের রূপ কখন সবচেয়ে বেশি খোলে? যখন তাদের মধ্যে ভালোবাসা আসে। সেটা বাইরের রূপ হাড়-মাস-চামড়া নয়, সেটা অন্তরের বস্তু, আর সেটা তো তার চোখেই বেশি পড়বে যার জন্যে ভালোবাসা। সেই মহৎ রূপটাই চোখে পড়ল না? যে মেয়ে সেই রূপে উন্মোচিত তার মত সুখী আর কে আছে?

আচ্ছা, রেখা কী ছেলেমানুষ, তার সেই সুখের কথাটা কি সরমে রথীন ব্যক্ত করতে পারে নাকি? সে ঠিকই বুঝেছে, নইলে তার চোখে এ কিসের মদিরতা, কথার মধ্যে এ কিসের কোমলতা যা বলা শেষ হয়ে গেলেও মনের কোণে রেশ রেখে যায়।

সরযূবালা তখন অন্যান্য কথা পাড়লেন। কেমন অকালে স্বামী মারা গেলেন, মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না। বড় ছেলেকে মানুষ করে বড় চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন বটে কিন্তু সে ছেলে নিজে পছন্দ করে এমন এক বউ আনলে যে শাশুড়ি-ননদকে তাড়িয়ে দিয়ে আলাদা হয়ে বসল।

'পরের মেয়েকে দোষ দিচ্ছ কেন? তোমার ছেলে কী!' রেখা চঞ্চল হয়ে উঠল: 'পুরুষ মানুষ যদি ঠিক থাকে, তবে স্ত্রী কী করবে!' বলা শেষ হতেই রথীনের সঙ্গে চোখাচোখি হল আর চোখোচোখি হতেই হেসে ফেলল। যেন বলতে চাইল এটা আপনার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। আমি যদি ঠিক থাকি আপনি কী করতে পারেন?

রথীন চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলে: 'আপনার দাদা আছেন কোথায়?'

'জলপাইগুড়ি।'

'আপনাদের খোঁজ খবর করেন না?'

'চিঠি লিখেও না।'

যেন খবরটা শান্তির এমনি নড়েচড়ে বসল রথীন।

সেই থেকে মেয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়েছে, কত দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করে দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে। সরযূবালা আবার তাঁর সংসারকাহিনীতে ফিরে এলেন। একটা উদ্যত কান্না চাপা দিয়ে বললেন, 'মাথার উপরে কেউ নেই যে একটু দেখে—'

'তাতে কী?' রথীন এমন ভাব করল যেন সে আছে।

'আচ্ছা বাবা, তোমাদের দেশ কোথায়?'

রথীন ঠিকঠাক বললে।

'তোমার বাবার নাম কী ?'

এতেও কোনো ব্যতিক্রম হল না।

'তুমি এতদিন বিয়ে করনি কেন ?'

'যে কারণে রেখা করেনি।'

সরযূবালা হাসলেন। 'ওর বিয়ে হয়নি উজুগ করে সম্বন্ধ করবার মত কেউ ছিল না বলে।'

'আমারও সেই দশা।'

মা-মেয়ে দুজনেই হেসে উঠলেন।

রথীন আরো একটু বিপন্ন হল। বললে, 'এ ব্যাপারের আসল উদ্যোক্তা বাপ-মা-দাদা নয়—প্রজাপতি। কেউ বলতে পারে না কখন কার মাথায় এ প্রজাপতি বসে পড়ে।'

সবচেই সত্যের সুর লাগল। সরযূবালা দেখলেন, খাবার দুটো প্লেটই রথীন শেষ করেছে। যাই, আরো দুখানা লুচি আনি—সরযূবালা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

রেখা গাঢ়স্বরে বললে, 'সব খেলেন ?'

'আমি সমস্ত খাই। আমি সর্বভুক।' রথীন ভেবেছিল কথাটা বলেই হেসে উঠবে কিন্তু হেসে উঠল কথাটা তার সর্বাপ্তি পাবে না ভেবে স্তব্ধ হয়ে রইল।

গভীর নিশ্বাসে রেখার বুক দুলে উঠল।

সরযূবালা লুচি নিয়ে এসে দেখলেন, জল খেয়ে হাত মুছে ফেলেছে রথীন। 'আমাকে আর নয়, রেখাকে দিন।'

দিদি বার বলছে। খুব যেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে চাইছে রথীন। সরযূবালারও সেই ইচ্ছে। বললেন, 'যা না ওকে নিয়ে বার্ণপুর বেড়িয়ে আয়—'

'আমার আজ নাইট-ডিউটি আছে না ?' রেখা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'তা বার্ণপুর ঘুরে আসতে কতক্ষণ ?' সরযূবালা চাইলেন উপেক্ষা করতে।

'না, আগে ডিউটি, পরে আর সব।' রথীন বললে অভিভাবকের মত। ভাবখানা এমন কথা সে ছাড়া আর কে বলবে ? তাকাল সরযূবালার দিকে : 'আরেক দিন যাবখন। ব্যস্ত কী। এ অঞ্চলটায় কিছুই দেখা হয় নি।'

'রেখাই সমস্ত তোমাকে দেখাতে পারবে।' সরযূবালা যেন আর কারু হাতে রথীনের জিম্মাদারি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন।

'তা জানি।' রেখার দক্ষতায় রথীন যে খুব বিশ্বাসী এমনি সসম্মানে তাকাল রথীন।

'কাল আসছ তো ?'

'এ ছাড়া এখানে আর আমার আসা কোথায় ? তবে কখন ওর ডিউটি কখন ওর অফ সেটা হিসেব করে নিয়ে আসা-যাওয়া ঠিক করতে হবে।'

ডিউটির মতন অমন একটা অবান্তরীয় কথা এখুনি পাড়বার কী দরকার ছিল, মেয়ের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন সরযূবালা কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'তা তোমাদের ব্যাপার, তোমরা দিনক্ষণ ঠিক করে নিও।'

বাড়ির বাইরের আঙিনার নেমে এল রথীন, পাশেই বেখা। রথীন বললে, 'কী রকম যেন দেখাচ্ছে—খাওয়া শেষ করেই পালিয়ে যাচ্ছি।'

'আরেকটু বসবেন?'

'এখন আর বসা নয়, এখন একেবারে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।' কথাটা বলে ফেলেই তরল করতে চাইল রথীন: 'সেই কখন থেকে এই জামাকাপড়ে আটকা পড়ে আছি—ছেড়েছুড়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।' তরল আবার চকিতে গাঢ় হয়ে উঠল।

'কিসে যাবেন?'

'আচ্ছা আপনি আপনার মার মত কেন হতে পারেন না?' ঘুরে দাঁড়াল রথীন।

'মার মত?'

'আপনার মা কেমন সহজে আমাকে 'তুমি' বললেন, আর আপনি তাঁর মেয়ে হয়ে—'

খুকখুক করে হেসে উঠল রেখা। বললে, 'সেটা আপনি বলবেন না আমি বলব? বয়সে বড় কে?'

'বয়সে বড় বলে যদি আমি তুমি বলি তা হলে বয়সে বড় বলেই আমাকে তুমি আর তুমি বলতে পারো না। তাহলে হবে পাশাপাশি, সমান-সমান।'

'পরে দেখা যাবে।' সুন্দর পাশ কাটাল রেখা।

রথীন বিকল্প ভাবল। বললে, 'আধখানা নিয়ে যাচ্ছি।'

'আধখানা কেন?'

রেখা যেরকম ভেবেছিল রথীন সে রকম করে বলল না। বললে, 'দুধের অর্ধেক জল তো? প্রথম যাত্রায় দুখানা বিকল্প ছিল, এখন একখানা। এখন তাই আধখানা নিয়ে যাচ্ছি।'

দরকার ছিল না, তবু, আয়নাটা কোথায়, বিকল্পগুলোকে বুঝিয়ে দিল রেখা। রথীনকে বললে, 'সাবধানে যাবেন।'

সাবধান! বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল রথীন। পালটা বললে, 'তুমি সাবধানে থেকো, তোমার তো নাইটডিউটি।'

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রেখা। তার জীবনে এমনটি আর কবে হয়েছে? কবে আর এসেছে এমন আর্দ্র শুভ্র স্নিগ্ধ মুহূর্ত? বলো সে কি এ ছেড়ে দেবে? এ ছেড়ে দিলেই কি তার জীবন ধন্য হবে কৃতার্থ হবে? আর, এ ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়?

রাত্রে মেসে টিন-বেডের রোগ ঘরের খাটের উপর শুয়ে যখন ভাবছিল ভাগ্যের এই উপহারের কথা, ঘুম আসতে চাইলেও ঘুমকে বসতে দিতে মন চাইছিল না, যেহেতু রেখাকে এখন চিন্তা করতেই সুখ, আর এ সুখ তার জীবনে এই প্রথম—তখন হঠাৎ তার মনে পড়ল কী করে কোন হিসেবে তার মাইনে সাড়ে পাঁচশো হতে পারে। সাড়ে পাঁচশো। ইউরেকা। রেখা তার নিজের মাইনে ও রথীনের মাইনে এক সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তার মানে কী? তার মানে ফুল স্পষ্ট। রেখা তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

রথীনের ইচ্ছে হল, সে কী উদ্দাম ছেলেমানুষী ইচ্ছে, ছুটে চলে যায় রেখার কোয়ার্টারে, দরজায় কড়া নাড়ে। শুধু কানের উপর মুখ রেখে বলে আসে, আমি বুঝেছি তুমি কী চাও। সে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করছে না, আর প্রত্যাখ্যান করলেও দিচ্ছে না রেখা—তবু তার জীবনে এই যে প্রথম উন্মাদ ইচ্ছে এর নতুন শিহরণটা সে সম্ভোগ করবে না? সম্ভোগ না করলেই কি তার জীবন ধন্য হবে, ফলে ফুলে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠবে? সাধ্য কি তুমি অন্য চিন্তা মনে আরোপ করো?

যদি রথীন ঢুকতে পারত ঘরে, দেখত মা আর তার মেয়েও ঘুমুতে পারছে না। মার সার কথা হচ্ছে, লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ির ঘা মারো, অর্থাৎ যত শিগগির পারো, বড়শিতে গেঁথে নাও মাছটা। জাত ধর্মের মত বাধাকেও লঙ্ঘন করতে লেহপা নন সরযূবালা, কালস্রোতে ও সব আগাছা কবে থেকেই ভেসে গেছে। তুই একটা ট্রেনে-ঘোরা কিমেল টিকিট-চেকার, তোর নিশ্চয়ই ওসব বাই নেই। এখন ভাখ, তোর চেয়ে ভালো আর কেউ না কেড়ে নেয় ছোঁ মেরে। বিশ্রী জায়গা আসানসোল, মেয়ের মা'রা মেয়ে নিয়ে আফিসে-ক্যান্টিনে পাত্র খুঁজে বেড়ায়, কেউ খোঁজ পেয়ে শেষকালে না তোর বাড়া ভাতে ছাই দেয়। তাই বলি কী, তাড়াতাড়ি রেজেস্ট্রীটা করিয়ে নে।

'একটু খোঁজ খবর নেবে না?' রেখা মনে করিয়ে দিল।

কিসের খোঁজ খবর চাস? চরিত্র? কেন তোর মনে কিছু সন্দেহ হচ্ছে? না, না, রেখার মন পরিপূর্ণ স্বচ্ছ।

'তবে কিসের খবর? আগে একটা বিয়ে করেছে কিনা?'

'বা অফিস-রেকর্ডে লোকটা ব্যাচেলার, অফিসার্স মেসে থাকে, তার উপর আবার প্রমাণ কী চাই? তাছাড়া তুমি তো নিজের কানেই শুনলে, বিয়ে করেনি। আমি ওসব ভাবছি না। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কী কথা?'

'আমি ভাবছি বিয়ের পর যখন ও কোয়ার্টার্স পাবে তখন সেখানে ওর বাবা-মা এসে থাকবে কিনা।'

'সেইটে জেনে নিবি। আপত্তি করবি। শাশুড়ি বড় ঝঞ্ঝাট—'

'তোমার ছেলের বেলায় ঝঞ্ঝাট কে? শাশুড়ি না বউ?' খুকখুক করে হাসল রেখা।

'যদি বিবাহিত জীবন রঙীন এনজয় করতে চায় নিশ্চয়ই কোয়ার্টারে তার বাবা-মাকে ডেকাবে না। যার দৌলতে কোয়ার্টার তাকেই রাজ্যের রাণী করে রাখবে।'

'এ সব পরের কথা।'

'প্রথম কথা হচ্ছে রূপ করে বিয়েটা সেরে ফেলা। একদম দেরি না করা।'

এইখানেই রেখার আপত্তি। এত তাড়াহুড়ো করার দরকার কী? বাইরে ভালোবাসার খোলা রোদে বেশ একটু ঘুরে বেড়ানো মন্দ কী, বিয়ের রান্নাঘরে অনন্ত উনুনের পাশে বসা যাবে সময় মত।

'আমি বললেই সে তক্ষুনি-তক্ষুনি বিয়ে করতে রাজি হবে এমন নাও হতে পারে।'

'না, না, তুই বলবি, চাপ দিবি—'

'পুরুষ মানুষ কি সহজে বিয়ে করতে রাজি হয়? সে খালি হুইপ রাখে। রথীনবাবুকেই দেখ না এতদিন বিয়ে করবার হুরসৎই পাননি।'

'তুই সেই হুরসৎ তৈরি করে দিবি, হুইপ রাখতে দিবিনে।'

'তুমি তা হলে থাকবে কোথায়?'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোর দাদার কাছেই চলে যাব। দেখব কোথায় ক্যালে। নয়তো কাশীবাসী হব।

দু-তিন দিন পরে দিনক্ষণ ঠিক করে রথীন ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির। চলো বার্ণপুর। বড়পুরী।

পাশাপাশি বসেছে দুজনে, ট্যাক্সি ছুটে চলল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন সরযূবালা। এমন তৃপ্তিকর দৃশ্য তিনি আর কটা দেখেছেন?

আর এমন দৃশ্য রথীন তো রঙীনতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। যদি ছল করেও এমন একটা নির্দোষ আনন্দ জীবনকে উপহার দেওয়া যায় তা হলে সেই ছলও বরণীয়। অনেক কথা বলার পর দুজনেই কখিন নীরবতায় চলে এসেছে। এখন যেন দুই মুখ অন্য কথা বলতে চায়।

রথীন তাকিয়ে দেখল রেখার কোলের উপরে তার হাতখানি পড়ে আছে। অপূর্ব একটি নিষেধের খাপের মধ্যে পোরা একটি ধারালো ব্যাকুলতা। ইচ্ছে করলেই কি টেনে নেওয়া যায় না হাতের মধ্যে? যার হাত তার সজ্ঞানে আনুকূল্য দরকার নয় কি?

আশ্চর্য সুন্দর হাত। সক্রিয় সজীব। ধরামাত্রই আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে ফেলল রেখা। ভাবতেও পারল না অমলা এমনি কোনোদিন জড়িয়েছে। বড় জোর হাতের মধ্যে হাত ছেড়ে দিয়ে রয়েছে, একটা আঙুলও নাড়েনি। আর রেখা রথীনের হাতটাকে একটা খেলনা বানিয়েছে। নাড়ছে চাড়ছে কখনো বা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরছে। বোঝাতে চাচ্ছে রথীনের হাতটাই তার অবলম্বন, এমন অবলম্বন সে ছাড়বে না কিছুতে।

এত সব ভঙ্গি অমলা কোনদিন দেখাতে পেরেছে? রথীনের হাতটা কোনোদিন টেনে এনে রেখেছে বুকের উপর, রেখেছে কপালে, মুখে? বলো এই উত্তেজনা থেকে জীবনকে বঞ্চিত করে রাখবে রথীন? বঞ্চিত করে রাখলেই জীবনে এসে যাবে কৃতার্থতা।

রেখা বললে, 'তুমি বলেছিলে আমি তোমার হাতের মধ্যে? কই দেখি।'

চলমান গাড়ির খানিক-আলো খানিক-অন্ধকারের মধ্যে বসে হাতের রেখা দেখা যায় নাকি? ও আর কিছুই নয়, ও একটা আদরের সূত্র।

'তুমি আর আমার হাতের মধ্যে নও, তুমি এখন আমার বাহুর মধ্যে।' বলে দুই বাহু বাড়িয়ে রেখাকে রথীন বুকের মধ্যে চেপে ধরল, আর রেখাও উল্লাসে শেষবারের কাঁপিয়ে পড়ল অবশ হয়ে। তারপর পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করল।

অমলার মধ্যে এই প্রাচুর্য ছিলনা। রথীন যদি বা তাকে আলিঙ্গনে আমন্ত্রণ করেছে সে কণ্ঠেকষ্টে ধরা দিয়েছে মাত্র, কখনো এমন পরিস্ফুট ঔদার্যে ছড়িয়ে পড়েনি। এই বিলাস-উল্লাসের একবিন্দুও তাতে ছিল না। সে তো শুধু শুকনো কাঠ, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ মঞ্জরী কই, সতেজ তারুণ্য কই? কই সক্রিয় অনুরাগ? তাছাড়া অবলার বেলায় চুমু সে শুধু দিতেই পেরেছে, খেতে পারেনি। অমলা শুধু এক নিঃসাড় অস্তিত্বের স্তূপ। আর।

বলো ভাগ্যের এত বড় একটা ভোজ সে ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিলেই তার মাহাত্ম্য বাড়বে? রথীন তা বিশ্বাস করে না।

কিন্তু এটুকুতে তো কারু তৃপ্তি নেই। আরো নিগূঢ়ে আরো নিবিড়ে যাবার বাসনা জাগছে।

রথীন বললে, 'তোমাদের বাড়িতে এমন কোনো সময় খুঁজে পাওয়া যায় না যখন তোমার মা বাড়িতে নেই, কি চাকরও নেই, মানে যখন বাড়িটা একদম ফাঁকা—'

'কেন পাওয়া যাবে না?'

'এমনি একটা সময় ঠিক করো, আমি যাই।'

'এখন নয়।'

'এখন নয় তো, কখন?'

রেখা দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে বললে, 'আগে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর।'

কদিন পরে অমলার একটা চিঠি এল।

চিঠিতে কোনো পাঠ নেই। যে কোনো একটা গালাগাল বসিয়ে নিতে পারো: হতচ্ছাড়া, পাজী, ছোটলোক।

প্রথমেই একরকা নালিশ জানিয়েছে। সেই পোস্টকার্ডে একটা পৌঁছসংবাদ দেওয়া ছাড়া চিঠি লিখল না। এত বড় হৃদয়হীন মানুষ দেখা যায় না। দু দুটো শনি-রবিবার গেল একবারে এসে ঘুরে গেল না। তারপর যথারীতি পাঠিয়েছে অভাবের ফিরিস্তি। টাকা কই? মাইনে বাড়বার পরেও যদি ছোটখাট দু একটা বিলাসিতায় সখ না মেটে তা হলে বাড়লি হয়ে লাভ হল কী? পত্র পাঠ টাকার ব্যবস্থা করবে। রুবির জন্যে বাড়িতে একটা মাস্টার দরকার।

তারপর দু একটা ভালো খবর দিয়েছে। 'তোমার বন্ধু শশাঙ্কবাবু সেদিন তোমার টি-এর টাকা, ছাব্বিশো টাকা বারো আনা দিয়ে গিয়েছেন। বলছেন, তুমি নাকি ওঁকে বলেছ আপদে-বিপদে আমাদের দেখতে। সেই যা ভরসা।'

তারপরে নির্দেশ আরি করেছে। মাসকাবারের পর কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এক সঙ্গে তিন দিন ছুটি। শশাঙ্কবাবু বলে গিয়েছেন, এই তিন দিন রথীনদের ছুটি। এই ছুটিতে যেন সে আসে। মাইনে-টাইনে সব যেন সঙ্গে করেই আনে—তার আড়াই শো টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যায়। আর মাঝখানে যে একটা শনি-রবি আছে তার মধ্যে যেন ঠাট করে কলকাতায় বেড়াতে না আসে। অনর্থক যেন টাকা না ওড়ায়।

উলটে-পালটে দেখল চিঠিটা। কেমন আছে, খাওয়া-দাওয়া কেমন হচ্ছে, নতুন জায়গা কেমন লাগছে এতটুকু একটা জিজ্ঞাসা নেই। অমলার তো জানবার কথা নয় কোন অন্ধকার রথীন খোয়াকেরা করছে—তার তো উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

আর যুক্তি দেখ। একবার শনি-রবিবার যায়নি বলে গঞ্জনা আরেকবার শনি-রবিবার যেন যায়না বলে তর্জন। একবার অনর্থক ব্যয়ের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি, আরেকবার রুবির জন্যে মাস্টার। তারপর টি-এর টাকাটা যে কী করে আসে, এমনিই আসে, অত বড় চেহারায়, তারও জন্যে এতটুকু বিস্ময় ও সংশয় নেই। টাকা—শুধু টাকা হলেই হল। ভাবখানা, যেন টাকাটা শশাঙ্কই দিয়েছে, তার জন্যে কোনো কৃতিত্ব কোনো কারুকার্যই রথীনের প্রাপ্য নয়।

চিঠিতে ইতির আগে শুধু একটা কথা লিখেছে। সেটা বুঝি গালাগালের চেয়েও ভয়ঙ্কর। লিখেছে: প্রণাম নাও।

যদি কোনোদিন প্রণামও করে অমলা, তার মাথা দিয়ে রথীনের পা দুটো এমন জোরে ঠুকে দেবে যাতে

ঠুং ঠুং ঠুং—ঘন্টা নড়ে উঠল।

ছ সাত বছরের মেয়ে রুবি দরজাটা একটু ফাঁক করল। 'কী চাই?'

'তুমি রথীনের মেয়ে না?'

'হ্যাঁ।' এ একটা এমন কী আবিষ্কার, রবি মুখ কুঁচকালো।

'তুমি আমায় চেন না, আমি তোমার বাবার বন্ধু।'

'বাবা কলকাতায় নেই, আসানসোল গিয়েছে।'

'তা আমি জানি। তোমার মাকে বলো বাবার বন্ধু শশাঙ্ক দত্ত এসেছে।'

অমলা রান্নাঘরে, তার উদ্দেশে কয়েকটা ভিতরের দিকে এগুলো রবি। এগিয়েই আবার পিছু হটে দরজার ফাঁকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলে, 'কেন এসেছেন কী বলব?'

'বলবে তোমার বাবার টি-এর টাকাটা দিয়ে যেতে এসেছি।'

'টাকা?' দরজাটা এবার ফাঁক রেখেই ভিতর দিকে ছুটে গেল রবি।

ইচ্ছে করেই শশাঙ্ক দরজার থেকে সরে গেল। অমলাকে বুঝি একটু সময় ও স্থান দিল যাতে এরই মধ্যে সে একটু ঠিকঠাক হয়ে নিতে পারে।

শুনতে পেল অমলা রবিকে তিরস্কার করছে: 'তুই ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বসতে বলিস না কেন?'

রবি বলছে: 'আমাকে কি আগে বলেছে যে টাকা নিয়ে এসেছে!'

অমলা দরজায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, কোথায় শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক একটা দাঁড়ানো মোটর গাড়ির ও পাশ থেকে বেরিয়ে এল। বললে, 'এই যে আপনি এসেছেন —নমস্কার—আমি শশাঙ্ক। রথীনের টি-এর টাকাটা দিয়ে যেতে এসেছি।' বলে পকেট থেকে সে একটা খাম বের করল।

নমস্কার ফেরত দিতে পারলনা অমলা কিন্তু মুখে এমন একটি আপ্যায়ির হাসি ফুটিয়ে ত্রুটি সংশোধন করল যে হাসি রথীন কোনোদিন দেখেনি। বললে, 'তারি বিচ্ছিরি হয়ে আছি।' ডান হাতটা আঁচলে মুছে আবার পরিষ্কার করে খামের উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল।

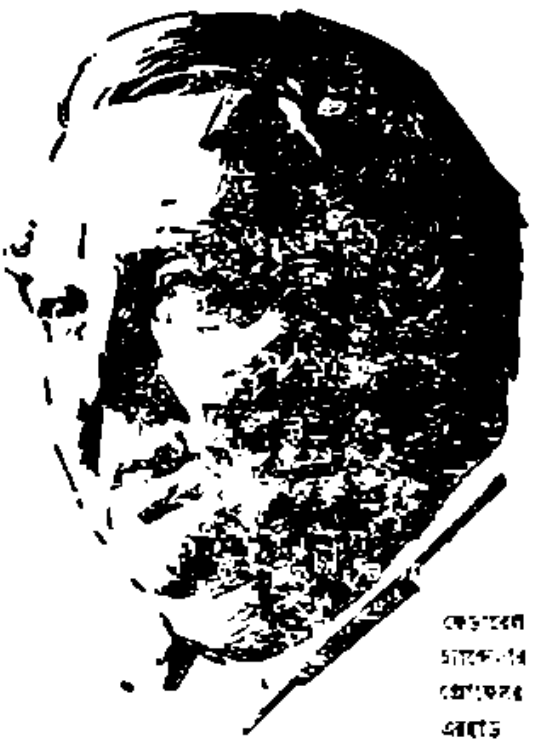

ফেডারেল চ্যান্সেলর প্রোফেসর এরহার্ড

সকলের জন্য সুখ ও শান্তি—

জার্মাণীর ফেডারেল রিপাবলিকের চ্যান্সেলরের প্রধান কামনাই এই:

জীবনযাত্রার উচ্চতর মান, সমৃদ্ধতর এবং শান্তিময় জগৎ — সপ্রশংসারিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উন্নততর অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা—সকলের জন্য এবং সব সময়ের জন্য এই সব জনহিতকর কার্যে সাফল্যলাভের একমাত্র উপায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মাণী একটি নির্ভরযোগ্য সহযোগী

খামটা তক্ষুণি ছাড়ল না শশাঙ্ক। বললে, 'এটা রান্নাঘরের সময়—অফিসটাইম—এখন তো সিস্টারের বিশ্রিরি হয়ে থাকাই সুন্দর হয়ে থাকা।'

'আমার আবার অফিসটাইম কোথায়?' আবার সেই নতুন হাসিটি হাসল অমলা।

'জানি আপনার অফিসটাইম আদ'নসোল। কিন্তু এটা আর সকলের তো অফিসটাইম। নিন্, টাকাটা রাখুন, ছাব্বিশো টাকা বারো আনা—'

প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে নিল, যেমন তত্রতার খাতিরে বলে তেমনি বললে, 'একটু বসবেন না?'

'এখন সময় কোথায়? এখন তো অফিস যাচ্ছি। আরেক সময় আসব—কেমন?'

আপনা থেকেই অমলার মাথাটা নরম হয়ে হেলে পড়ল।

'আচ্ছা নমস্কার।'

এবারও নমস্কার ফেরাতে পারলনা অমলা। শুধু সেই না-জানা হাসিটি দিয়ে সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুয়ে দিল।

গলি কাঁপিয়ে শশাঙ্ককে নিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

কবি জিজ্ঞেস করলে, 'মা, আমাদের গাড়ি হবে কবে?'

অমলা ধমক দিয়ে উঠল: 'আরেক জন্মে।'

কিন্তু এ কী? প্যাকেটে টাকা তো ছাব্বিশো টাকা বারো আনা নয়। আবার গুনল—আবার গুনল—ছেষট্টি টাকা বারো আনা। দশ টাকা বেশি। ভুলে বেশি দিয়ে গেছে শশাঙ্ক? না কি সত্যিকার বিলের টাকাটাই ছেষট্টি টাকা বারো আনা? বলতেই ভুল করেছে।

কদিন পর শশাঙ্ক ফের যখন এল—এবার সন্দেহের দিকে—লক্ষ্য করল অমলা টাকাটার কথা উল্লেখ করে কিনা।

করল না।

না করুক। নিক দশটা টাকা। রথীনের কাছে ছ'শোনো টাকা বারো আনাই লিখুক। ওর জীবনে তো কিছুই বাড়তি নেই। অনতর্ক ভাগ্য ওকে দিক কিছু বাড়তি।

আজকে অমলাকে একটু কিটফাট হবার সময় দিয়েছে। কড়া নাড়তেই কবি দরজা খুলে দিতেই বলেছে, আমি এক্ষুনি আসছি। তোমার জন্যে সন্দেশ আনতেই মনে নেই।

সন্দেশ নিয়ে ফিরে আসতে দশ মিনিট। এই দশ মিনিটে যা পারুক একটু সেজেগুজে নিক। বেশি না কোথায় কী মেরামত করে।

দেখল কিছুই করেনি। পরনে আধময়লা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি গায়ে আধময়লা শাদা ব্লাউজ, মুখে যে পাউডারেরও আভর চড়ায়নি, হাতের কাছে ভিজে গামছাটা ছিল তাই দিয়ে মুখটা যুঁই একটু ঘসেছে। শুধু একটা ব্যাপারে অভিনব আগ্রহ—চুল বাঁধছিল বোধহয়, খোলা চুলে মোটা গাঁতের চিরুনিটা আটকে আছে আর তারই উপর দিয়েছে ঘোমটা।

রথীনের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল, একজনের কাছে কদাকার, আরেকজনের কাছে অপরূপ। ভাবল, কচিকলাপাতা রঙের শাড়ি না পরে যদি ঘুনছায়া রঙের শাড়ি পরত, কেমন দেখাত? একই রকম দেখাত। যদি ঘুনছায়া রঙের না পরে পরত মধুরকলী তা হলেও রদবদল হত না।

যা পরত তাই ভালো লাগত। সর্বাবয়ব ভালো লাগবে জেনেই তো শশাঙ্ক প্রস্তুত হয়ে এসেছে। রঙীনটা মূর্খ, তাই খুঁড়ে-খুঁড়ে সে শুধু কদাকারকে বার করে এনেছে। ও জানে না এই কাদার নিচেই রয়েছে নির্মল শীতল জল, যাতে সমস্ত দাহের শান্তি। ও শুধু ভোগ করতেই চেয়েছে, ভালোবাসতে চায়নি। ভালোবাসাটাই যে অনন্তকালের ভোগ সেইটেই ওর জানা নেই।

হাঁ, নিশ্চয়, স্ত্রীকেও ভালোবাসা যায়। শুধু মাংস-মমতা-স্নেহ নয়, হাঁ, সত্যিকার ভালোবাসা, যে ভালোবাসা একটা আশ্চর্যের মত সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে থাকে। সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও যা ফুরোয় না সেই শাশ্বতী আকুতি। হয়তো শশাঙ্ক অনেক বেশি করে ভাবছে কিন্তু এমন জিনিস ছেড়ে একটা বাজে মেয়ের পিছনে ধাওয়া করার কোনো মানে হয় না। ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়োতে বনে যায়। যেন খাতা-পেন্সিলই ভালো, হাতা-খুন্তি ভালো নয়।

যেন সব সময়ে নতুনই ভালো, পুরোনো ভালো নয়। শশাঙ্ক ভাবল, নতুন যেমন পুরোনো হয় পুরোনোকেও নতুন করা যায়।

দরকার নেই তার মানে খুঁজে। যা যার মনে সেই তার মানে।

'কেমন আছেন?'

'আমাদের আবার থাকা!' সলজ্জ ভঙ্গিতে বিনম্র মুখে হাসল অমলা।

'আমাদের মানে?'

লজ্জার আরো একটি গভীর আভা ফোটাল অমলা। বললে, 'আমার।'

'কেন, আপনার থাকাটা থাকা নয়? চমৎকার থাকা। রঙীনের জীবনে আপনি একটা শক্তি, তার সমস্ত উন্নতির আপনি প্রেরণা, তার সৌভাগ্য—কী বলব, লক্ষ্মী? লক্ষ্মীটা ছোট কথা—তার সৌভাগ্য লক্ষ্মী।'

'আপনার জন্যে চা করে আনি।'

'আনুন, কিন্তু সঙ্গে আর কিছু নয়। কবির জন্যে যে সন্দেশের বাক্স এনেছি তারই থেকে নিজি দুটো।'

কবি সানন্দে সমস্ত বাক্সটাই শশাঙ্কের সামনে মেলে ধরল।

'মেয়েও লক্ষ্মী।' বাক্স থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিল শশাঙ্ক। বললে, 'লক্ষ্মীর মেয়ে নেই। তাই লক্ষ্মীর মেয়ে লক্ষ্মী হতে পারে না। রাণীর মেয়ে লক্ষ্মী।'

'যেমন হাসি হাসল অমলা তা রঙীন কোনোদিন দেখেনি।

'আপনার গাড়ি কই?'

গাড়ি? কারখানায়।' চায়ে চুমুক দিল শশাঙ্ক। মাথা তুলে বললে, 'কেন, কোথাও যাবেন?'

'না, না, আমি যাব কোথায়?' নত মুখে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'এমনি বেড়াতে, সখীর যাবে?'

ভঙ্গিটা নরম করল অমলা। বললে, 'আপনার বন্ধু আসুক, তারপর সবাই মিলে যাওয়া যাবে একদিন।'

আবার নিচু হয়ে শশাঙ্ক চায়ের পেয়ালায় মুখ রাখল। বললে, 'রঙীন তো এই সামনের ছুটিতে আসছে।'

'হ্যাঁ।'

'বিরহটা ভালো—কোনো দুঃখই থাকলে নয়। সুখের আর দাম কী। দুঃখের পর সুখই সুখ। মিলনের আর মানে কী! বিরহের পর মিলনই মিলন।'

'থাক। আপনি যেন এ সব কত জানেন।' বাঙ্গ মিশিয়ে কী মধুর করে যে অমলা বললে এ কথাটা রবীন তার সমস্ত অভিধানে উলটেও খুঁজে পাবে না।

তারপর সংসারের কথা উঠল। সুখ-সুবিধের কথা। কোনোরকম অভাব-অভিযোগ হলেই যেন শশাঙ্ক জানতে পারে। অমলা আর কী করে জানাবে! শশাঙ্কই যদি সময় করে মাঝে-মাঝে আসে। তা কদিনের মধ্যে রবীনই তো আসছে। এবার টাকা পয়সার একটা নিয়মিত ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি।

শশাঙ্ক উঠল। এবার যাই। রবীন এলে তো দেখা হবেই।

তবু বাড়তি দশ টাকার কথা অমলা কিন্তু ভাঙল না। সামান্য টাকা—তবু এক ফোঁটা কলঙ্ক। যে সুন্দর তার মধ্যে যদি একটু কলঙ্ক থাকে তা হলেই বুঝি সুন্দরতর হয়ে ওঠে।

আমার জীবনকথা (প্রথম ভাগ)

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ নিজে বাংলা ভাষায় তাঁহার যে আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের অনেক জীবনঘটনার উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ সুনিপুণভাবে এই আত্মজীবনীতে।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবন-ঘটনা প্রথম ভাগ-রূপে প্রকাশিত হইল। সরল সাবলীল ভাষা এবং বহু নূতন তথ্যের পরিবেশন হইয়াছে এই গ্রন্থে।

২৬ খানি আলোকচিত্র এবং ১০ খানি তাঁহার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আলোক-চিত্রের সমাবেশ।

ডিমাই ৮ পেজী, সুদৃশ্য বাঁধাইসহ মূল্য : আট টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত গ্রন্থাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ	...	০·৫০	ভারতীয় সংস্কৃতি	...	৫·০০
মরণের পারে	...	৬·০০	শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	...	৪·০০
স্তোত্র রত্নাকর	...	৩·০০	মনের বিচিত্র রূপ	...	৩·০০
আত্মজ্ঞান	...	২·০০	যোগশিক্ষা	...	২·৫০
আত্মবিকাশ	...	২·০০	পুনর্জন্মবাদ	...	৩·০০
কর্মবিজ্ঞান	...	২·০০	হিন্দুনারী	...	৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ফোন : ৫৫-১৮০৫

'আচ্ছা,' দরজার কাছে এসে শখাক ফিরে দাঁড়াল : 'আচ্ছা আপনার চোখ আর ভুরু যে এত সুন্দর রবীন তো কোনদিন বলেনি।'

'ও মা, একথা আবার কেউ বলে নাকি ?' অমলা খিল খিল করে হেসে উঠল : 'আপনি যখন বিয়ে করবেন তখন আপনি আপনার স্ত্রীর রূপের কথা বন্ধুদের বলে বেড়াবেন নাকি !'

'তা ভুরু আর চোখ তো ইনোসেন্ট।'

'তারপর স্ত্রীর কাছে খবর পৌঁছলে ইনোসেন্স বেরিয়ে যেত।'

'সব খবরই স্ত্রীর কাছে পৌঁছয় নাকি ?'

'তেমন স্ত্রী যদি হয় কিছুই তার কাছে লুকানো যায় না।'

ও দিকে আনন্দলোক হেথনে রবীনকে তুলে দিতে এসেছে রেখা। বলছে, 'তোমাকে ছাড়া তিন দিন যে কী করে থাকব ভাবতে পারছি না। জানো, আর কিছু নয়, শুধু চোখে একবার দেখতে পাওয়াটাই অসীম মনে হয়।'

'সেটা বুঝি আর আমার নয় ?' কিন্তু কী করব বলো', রবীন ব্যথার্ত মুখ করল : 'এসেছি পর থেকে এখনো একবার বাড়ি যাইনি। মা-বাবা এত করে লিখছেন—বুঝতেই পারছ—'

'হ্যাঁ, তাই তো বাধা দিচ্ছি না। ওঁদের থেকে বিয়ের অনুমতিটা এবার নিয়ে এস।'

'সেই জন্যেই তো বিশেষ করে যাওয়া। অনুমতি নিতে নয়, সম্মতি নিতে।' রবীন পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিল : 'অনুমতি চাইতে গেলে 'না' করতে পারে। সোজা বলতে হবে একটি মেয়েকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি, তা হলেই ঠিক সম্মতি দেয়ে যাবে।'

'ওঁরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন কী রকম মেয়ে।'

'বলব সাংঘাতিক মেয়ে—বিয়ের আগে সব দিয়েছে, শুধু একটা জিনিস ছাড়া—যার জন্যই বিয়ের দরকার।' রবীন বলল উদাসীনের মত : 'যদি ওটুকু সংস্কার না থাকত তা হলে কে যেত ঐ বিয়ের মধ্যে ?'

'সংস্কার ?' রবীনের কাঁধে ছোট্ট একটা চড় মারল রেখা।

'কিন্তু জানো মা-বাবা এ শুনতে পেলে তোমাকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করবেন। আমি যে অমানুষ আমার তোমার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে।'

'শোনো গিয়েই কিন্তু চিঠি দিও।'

'এক কাজ করি এস। কাল সকালে কলকাতা থেকে তোমাকে আমি চিঠি দিই, তুমি এখান থেকে কলকাতায় আমাকে চিঠি দাও। পরশুই দুজনেই দুজনের চিঠি পাই।'

'বেশ, তাই হবে।' রেখা খুশি হয়ে উঠল : 'বেশ যাবে কাকটা ভালো হল।'

'যা, তোমার সঙ্গে আমি পারব কেন ?' তুমি আমার চেয়ে ভালো বাঙলা জানো।'

পিঠের উপর আবার ছোট্ট একটা চড় খেল রবীন।

পর দিন সকালে রবীন রেখাকে একটা পোস্টকার্ড লিখল। লিখল, বাড়িতে খুব অসুখ। বড় চিঠি লিখতে পারলাম না। যেদিন চিঠি পাবে তার পরের দিনই তো দেখা হবে। এক কথায় জানিয়ে রাখি কল ওভ।

আর রেখা কেনিয়ে-কাঁপিয়ে বিরাট একটা প্রেমপত্র লিখে পাঠাল।

সেইটেরই খোঁজ করতে যথাসময়ে শশাঙ্কর কাছে হাজির হয়েছে রথীন।

'কি রে চিঠি এসেছে?'

'এই যে।' শশাঙ্ক একটা রঙিন খাম এগিয়ে দিল।

খুলে নিয়ে পড়ে ফেলল একনাসে। বললে, 'মেয়েগুলো ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথা যে লিখতে পারে। কিরে, পড়বি?'

'অশ্লীল কিছু আছে?'

'না, শুধু কান্না। শুধু সমবেদনা।'

'তা হলে ছাই কী পড়ব।' শশাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিল।

চিঠিটা খামে পুরে পকেটে রাখল রথীন।

শশাঙ্ক বললে, 'চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দে।'

'কেন?'

'কী দরকার অজানা পুরে?'

'না। থাকে। মেয়েমানুষ তো, কখন কী ব্ল্যাকমেইল করে ঠিক নেই। কিছু এভিডেন্স থাকা দরকার। তাই তো চিঠি লিখিয়ে নিয়েছি—'

চিঠিটা পকেটে নিয়ে গর্বভরে বাড়ি ফিরল রথীন।

বাড়িতে ঢোকামাত্রই উল্টে কিছু একটা ঘটবে এর জন্যে রথীন প্রস্তুত ছিল এমন কিছু হবে তা তার কল্পনার অতীত ছিল।

PHONE: 34-3770

For PROMPT SUPPLY OF QUALITY

● BLOCKS
● STEREOS
● MATS

CALCUTTA PRESS SERVICE
249, BEPIN BEHARI GANGULY ST., CALCUTTA-12

'তোমার পকেটে ওটা কী ?'

মূল পকেটে রাখেনি, সাইড পকেটেই রেখেছে। কিন্তু রুমালটা তলায় পড়ে যেতে চিঠির কোণটা উঁচু হয়ে রয়েছে। আর দেখা নেহাৎ ছেলেমানুষ, জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটা রঙিন কাগজে লিখেছে আর তার সঙ্গে ম্যাচ করাতে গিয়ে খামটাও রঙিন করেছে। শশাঙ্কর কথাটা তখন শুনলেই ভালো হত, এমন বাঘের মুখে পড়তে হত না।

'তোমার পকেটে ওটা কী ?' অমলা আবার গর্জে উঠল।

আর মিথ্যের মধ্যে গেল না রথীন। বললে, 'চিঠি। বাড়ি ফিরছিলাম দেখা হতেই দিলে।'

'দেখি।' হাত পাতল অমলা।

দেখ আজকালকার কীরকম সব মেয়ে! কীরকম নির্লজ্জ।' রথীন খামটা আর দেখতে দিলনা, চিঠিটা বার করেই অমলার হাতে দিল। খামের উপর আবার ঠিকানার যন্ত্রণা। মূল চিঠিটা পেতেই অমলা আর খামের দিকে তাকাল না। রথীন আরো একটু লেজুড় জুড়ল : 'কী অসভ্যের মত সম্বোধন করেছে দেখ না আমার রথীন, আমার রথের—ভাবতে পারো, প্রাণের উঠে গিয়ে রথের হয়েছে!'

রাগে মুখচোখ লাল করে আগাগোড়া পড়ল অমলা। ঘৃণায় চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'এরি মধ্যে ছুটিয়েছ ?'

'আজকাল আর জোটাতে হয় না, হাতে মেয়ে নিজের থেকে এসেই জোটে। গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাব করতে এলেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় না বলে অপমান করেছে। শাঁসালো লোক দেখলেই প্রেমপত্র ঝাড়ে। একেবারে হটআউট করে দেওয়া যায় না, ট্যাকল করতে হয়, আর শেষে বাগে পেয়ে জব্দ করে দিয়ে সরে পড়তে হয় একদিন—'

'না।' আর্তনাদ করে উঠল অমলা : 'তুমি ও মেয়েটার সঙ্গে মিশতে পারবেনা, না, কোনো সম্পর্কই রাখতে পারবেনা বলে দিচ্ছি।'

'বেশ তো তাই হবে। কিন্তু তোমার অত ভয় কিসের ?'

'ও তোমাকে ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে ফেলবে।'

'বিয়ে ?' হেসে উঠল রথীন : 'আজকালকার আইনে স্ত্রী থাকতে বিয়ে চলেনা। বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল, আর যে বেটা বিয়ে করবে তার জেল।'

'না, তবু না, তুমি ও নিরীহ সরল মেয়েটার সর্বনাশ করতে পারবেনা।' অমলা প্রায় কেঁদে উঠল।

'আহা, কত নিরীহ আর সরল! তোমার কাছে সার্টিফিকেট নিতে তার বাকি আছে।'

'নিশ্চয়ই নিরীহ আর সরল। তার চিঠির প্রতি লাইনে তা পরিষ্কার। তুমি লম্পট, পাষণ্ড, তুমি কিছুতেই তার সর্বনাশ করতে পারবেনা।'

'তার সর্বনাশের কিছু বাকি আছে ?'

'না, কিছুতেই না। আমি নিজে আসানসোল যাব। দেখা করব মেয়েটার সঙ্গে। তাকে সব বলব। বাধা দেব।'

তা হলে আর কথা কী!

খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছিল রবীন, উঠে দেখল অমলা বাড়ি নেই। কবিকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিস পেলনা। কিও নীরব।

তবে কি সত্যি অমলা আসামদোলে ছুটেছে? এত সাহস? এত স্পর্ধা?

আগে একবার শশাঙ্কর সঙ্গে শয়তানি করা ভালো। সেই ভেবে রবীন শশাঙ্কর বাড়ি গেল।

বাড়ি গিয়ে কী দেখল?

দেখল শশাঙ্কর বসবার ঘরে দুটো মুখোমুখি চেয়ারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে শশাঙ্ক—আর, অমলা।

অমলা উত্তেজিত হয়ে কী বলছে আর শশাঙ্ক তাকে বোঝাচ্ছে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রবীন। শশাঙ্ককে বলল, 'অমলাকে বলিস একটা নিরীহ সরল মেয়েকে বাঁচাবার আগে যেন নিজেকে বাঁচায়।' বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'কী হবে?' ভয়ে পাংশু হয়ে গেল অমলা।

শশাঙ্ক বললে, 'ভয় নেই আমি আছি।'

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-০১৯৪

অমৃত-ধারা

শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়

বৈঠকখানার সামনে খবরের কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেন মশায়। খুশির রঙে মুখচোখ উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গে তার চটক।

গণেশ দত্ত যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে, হাতে বাজারের থলে—দু'পাট পামছায় ঝোলা ঢাকা। বেলা দশটা বেজে গেছে—বৈশাখের সূর্য অনেক আগে থেকেই চোখ রাঙাতে সুরু করেছে।

হন্‌হন্ করে চলছিলেন দত্ত—খবরের কাগজ সমেত হাতখানা উঁচিয়ে ডাকলেন সেন মশায়, ওহে দত্ত, শোন—শোন। একটা জবর খবর শুনে যাও।

বেলা বাড়ছিল—বাজারের ঘরা ছিল দত্তর। শহরের বাজার নয় যে যখন খুশি গেলেই আনাজপাতি কিংবা মাছ মিলবে। মাছ না মিললে ডিম অথবা মাংস পাওয়া যাবে। এই মফঃস্বল শহরে মাত্র আড়াই তিন ঘণ্টা বাজারের পরমায়ু। এর মধ্যে রসাস্রয়ী রসনার পরিতৃপ্তির আয়োজন সেরে নিতে পারলে ভাল—না হলে শূন্য থলে হাতে ফিরতে হবে। এমনিতেই আজ বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেছে।

থলে শুদ্ধ হাত উঁচিয়ে গণেশ দত্ত বললেন, আসচি বাজার সেরে।

বলার সঙ্গে পায়ের গতি দ্রুত করলেন। কি জানি জবর খবরটা শোনাবার তাগিদে সেন আরও নাছোড়বান্দা হতেও তো পারেন।

সেন কিন্তু হতাশ হলেন না—এই সময়ে পঙ্কু মাস্টার কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। হাতে লাঠি, বগলদাবায় খানদুই বই। গতিটা দ্রুত নয়। নতুন চশমা নিয়েছেন মাস্টার—পথ চলেন সন্তর্পণে। চশমার ভিতর দিয়ে পথটাকে অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয়—পথও চলছে সঙ্গে সঙ্গে। এবার ওধার হেলছে একটু তেরছা মেরে, কখনো উপরে উঠছে কখনো নীচের মিলিয়ে যাচ্ছে। দেহের গতির সঙ্গে পথের গতির সমতা রাখতে চলনটাকে সংযত করতে হয়েছে মাস্টারের। লাঠি সেই সমতা রক্ষা করে।

সেন মশায় ডাকলেন, মাস্টার, শোন—শোন। একটা জবর খবর।

খবরের কাগজ পড়ার ঝোঁক আছে মাস্টারের। রীতিমত ঝোঁক, যাকে বলে বাতিক। কিন্তু ইস্কুলে যাবার সময় বাতিককে শাসন করতে না পারলে বিভ্রাট। অথচ ইস্কুলে গিয়ে বিশ্রামের কালটুকু যে আলোচনা দিয়ে জমিয়ে তুলবেন—তার উপকরণ রয়েছে সেন মশায়ের হাতে। প্রলোভন সামলাতে পারলেন না—দু'চার মিনিটে যেটুকু পারেন সংগ্রহ করবেন ভেবে এগিয়ে এলেন।

বল তোমার খবর। খাঁড়া ব্যাটারা কদ্দুর এখন?

সেন মশায় হাসলেন। ওদের হুড়ুম হুড়ুম শেষ হয়েছে—এখন স্যাজ আপ্‌সানিই সার। সে খবর নয়। এল ঘরের মধ্যে—

মাস্টার মাথা নাড়লেন, আমার আবার কার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস রয়েছে আজ—বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

আরে পাঁচ মিনিট তো বসবে? ওরই মধ্যে যা জানবার,—কথা শেষ করলেন না সেন মশায় —মাস্টারের হাত ধরে টেনে আনলেন ঘরের মধ্যে। চেয়ারে বসিয়ে কাগজখানা ওঁর কোলের উপর ফেলে দিলেন।

মাস্টার কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, আরে এ যে কালকের কাগজ! এতো কালই দেখেছি।

সেন বললেন, দেখেছ তো, পড়েছ কি সবটা?

তা এক রকম পড়েছি বই কি।

না পড়নি। এই প্রবন্ধটা পড়েছ! এই যে 'পাহাড়ের ডর'।

ওরে বাসরে—ওই জিওলজিক্যাল সার্ভেতে ধস্তাধস্তি করি সে সাধ্য আমার কোথায়! মাস্টার যেন আঁতকে উঠলেন।

আরে লাফাও কেন,—পড়ই না। লেখকের নামটা অন্তত পড়।

এম. সেন। এম. সেন কে বল দেখি? যেন চেনা চেনা নাম। ভ্রূ কুঁচকে মাস্টার মেঝের পানে চাইলেন, কড়িকাঠের পানে চাইলেন।

সেন হো হো করে হাস-কাটানো হাসি হেসে উঠলেন, হায় আমাদের মনাকে চিনতে পারলে না। তোমার ছাত্র মনা-মনোনীত—

মাস্টার অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তাই বল—তোমার মধ্যম পুত্র। তা সে আবার জিওলজিস্ট হল কবে? সে না তোমার আমদানির দোকানে বসছে?

বসলই বা। বলি জিওলজিস্ট না হলে বুঝি ও সম্বন্ধে কিছু লেখা যায় না। এই সম্প্রতি ও রাঁচী হাজারীবাগ ঘুরে এসেছে জান?

শুনেছি বটে। ফুলকপি কড়াইশুটির চাষটাও যেন—

আরে শুনেছ ঠিকই। ও শুধু ফুলকপিই আমদানি করেনি, ওর এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ক'টা দিন পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘোরাঘুরি করল—আর তারই ফল এই, বলে কাগজখানার বিশেষ জায়গায় হাত রাখলেন।

এবার আগ্রহভরে পড়লেন মাস্টার। পড়া শেষ হলে বললেন, বাঃ—চমৎকার গুছিয়ে লিখেছে তো! ছেলের তোমার পার্টস আছে। মানে এই লাইনে থাকলে নাম করতে পারতো।

তাহলে লেখাটা উৎরেছে! সেন মশায়ের মুখখানা চক্‌চক্ করে উঠল।

শুধু উৎরেছে—রীতিমত লিটারারি প্রেসার পাওয়া যাচ্ছে। ওকে ব্যবসার লাইন থেকে সরিয়ে এই লাইনে দাও হে। নাম করবে।

সেন মশায় বললেন, সে চিন্তাও কি করছি না হে, করছি। ছেলেরও উৎসাহ খুব। তবে বাপের বুদ্ধিটা ওর ভারি পাকা। বলে, বাবা, লাইনটা তো ভালই—নাম যশ যথেষ্ট, কিন্তু উপার্জনে সন্দেহ হয়। একটা শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি—পা তুলতে ভরসা হয় না।

মাস্টার উৎসাহ দিলেন, ওহে—সে আগেকার কাল আর নাই। কবির সেই আক্ষেপবাণী

—সেজন লেখিয়ে ও দু'টি চরণ সেই সে দরিদ্র হবে—এখন ঘটছে না। তুমি তো ব্যবসার ক্ষেত্রেও যেমন—ওখানেও তেমনি ট্যাকটিকুলি চলতে পারলে বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স—

সেন মশায় হো হো করে হেসে উঠলেন, দূর—দূর সে আর কতদিন! ওসব হল অলবিদ, দু'দিনেই অলেতে মিশাবে। কিন্তু লিখে একবার যদি নাম করতে পারে তাহলে তার আর মার নেই। তখন যুগ যুগান্ত ধরে—

ওঁর মুখের কথাটা লুফে নিয়ে মাস্টার বললেন, ঠিক বলেছ—কালিদাস—সেকস্‌পীয়র—রবীন্দ্রনাথ—

• • • •

মনে হল সেই চেষ্টাতেই অন্তঃসর মনোযোগ দিয়েছে মনোনীত সেন। প্রায় প্রতি রবিবারেই ওর লেখা বা'র হতে লাগল। বেশীর ভাগ লেখাই ভূগর্ভ সম্বন্ধে—ছোটনাগপুরের ঘন জঙ্গল পাহাড়ে আর ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাখনির মধ্যে যে এত রহস্য আর প্রস্রবণ লুকানো ছিল তা ইতিপূর্বে কে ভাবতে পেরেছে! এখন বোঝা যাচ্ছে, কঠিন পাথর নিয়েও সাহিত্য হয়—কয়লার কালো কায়াও রোমান্সে মাতাতে পারে মনকে। এমনি করে মনোনীত সেন সাহিত্যের একটি দিক উন্মোচন করলো। গ্রামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। এখন আর মাস্টারকে ডেকে তাগদ পড়াতে হয় না—রবিবারের সকালে মাস্টার গুটি গুটি এসে জমেন সেন মশায়ের বৈঠকখানায়।

প্রবন্ধ পড়ে বলেন, আর কেন হে—ছেলেকে এবার ব্যবসার লাইন থেকে টেনে নাও, এখন ফুল-ফ্লেজড্ রাইটার। ওর মার নেই।

সেন মশায় মুচকি মুচকি হাসেন। মাথা নেড়ে বলেন, হবে, হবে—ব্যস্ত কি! লেখার নেশা জমলে আপনিই আসবে—আমাকে বলতে হবে না।

প্রতি রবিবারে লেখা বা'র হচ্ছে—পাঠকদের চিঠি আসছে অসংখ্য। নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে চিঠি আসছে; সম্পাদকরা পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেন মশায়ের কাছে। সেন মশায় সেগুলি নিয়ে বিমর্ষিত থাকেন।

মাস্টার এসেই বলেন, পড়তো ভাই এই চিঠিখানা। দেখতো জবাবটা এই লাইনে দিলেই চলবে তো। বানান আর ব্যাকরণ কিছুতেই কায়দা করতে পারিনে—তুমি ভাই একবার চোখ বুলিয়ে দাও তো।

মাস্টার বলেন, এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন? যার কাজ তাকেই করতে দাও। নেশাটা ওর জমুক।

আর তাই ওর সময় কোথায়। ও সামলাচ্ছে দোকান, বাস্তবাদী ছেলে তো। বলে, বাবা, তোমার তো কাজকর্ম কিছু করতে হয় না—এদিকটা সামলে দাও। আমি মোটামুটি মেটিরিয়ালগুলো দিয়ে খালাস—বা গুছোবার হলস্টি করবার মানে পাঁচজনের পাতে দেয়ার মত করে সাজিয়ে দাও তুমি। আমার নাম হলে তোমার গৌরব কি বাড়বে না? মানে বংশের গৌরব। লোকে বলবে অমুক গ্রামের—অমুক বংশের—অমুকের ছেলে—

হা—হা করে হেসে ওঠেন সেন মশায়। জান ভায়া—ছেলেমানুষ হলে কি হয়—ট্যাকটিক্সটা রপ্ত করেছে মন্দ নয়। আর তাই—জমিটি কোবালা দিয়ে চৌরস করে দিই আগে—তখন আর ভাবতে

হবে না—এই ভোগে ভুগতে হবে না আমাকে। দেখ তো ফসিলের বাংলাটা কি হবে? জীবাশ্ম। উঃ—ভারি শক্ত বাংলা কিন্তু। সিনথেটিক কল্পনা কাকে বলে? যা পুরোপুরি কল্পনা নয়—অর্থাৎ সাধারণ কল্পনার থেকে এতে অন্ধকারের ভাগ কম। সাধারণ কল্পনার নাম রিটুমিনাস কল্পনা। আবার কল্পনার পূর্ণতম পরিণতি অ্যানথ্রাসাইট কল্পনার মধ্যে।

মাস্টার অবাক হয়ে যান। বলেন, এ কল্পনাতত্ত্ব তুমি জানলে কি করে?

আমাদের বাসবাদ অঞ্চলে খনি ছিল—শোননি কি! বাবা সেটা বিক্রী করে দেন। বাবার মুখে কল্পনার তত্ত্ব অনেকবার শুনেছি।

এখন পুত্র গৌরবে সেন মশায় সর্বক্ষণই উজ্জ্বল হয়ে থাকেন। কাগজ হাতে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন—যে দু'চার পথ দিয়ে তাকেই কাগজ নেড়ে আপ্যায়িত করেন—ওহে শোন শোন—খুব জরুর একটা খবর—

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় ব্যানারে যে খবরটা থাকে সেইটাই প্রধান সংবাদ নয়। সেটা টোপ। সেইটিকে সামনে মেলে ধরে একে ওকে তাকে বৈঠকখানায় টেনে আনেন। সেই খবর থেকে সুরু করে হঠাৎ রবিবারের প্রবন্ধ বিভাগে চলে যান। বলেন, শোন হে শোন—আমাদের মনোনীত এবার বেশ চমৎকার একটা লেখা দিয়েছে। এটা ঠিক প্রবন্ধ নয় গল্পও নয়, গল্পের মত করে লেখা প্রবন্ধ। শোন।

সবটা শুনিয়ে উজ্জ্বল মুখে বলেন, কেমন, ভাল লাগল না।

শ্রোতা ইতিমধ্যে এক কাপ চা খেয়েছে—একটা বিড়িও নিয়েছে হাতে। খুশির আমেজে ঘাড় নেড়ে বলে, চমৎকার।

এমনি করে সারা গ্রামখানি নূতন একটি প্রতিভার কথা জানতে পারল। এবং বাংলার সাহিত্য সমাজেও সেই বার্তা পৌঁছে গেল।

* * *

মাস্টার সেদিন তাড়াতাড়ি চলেছিলেন স্কুলে। পরিদর্শক আসবেন, ওঁরা শুধু বিদ্যা আর জ্ঞানের পরিধিই মাপবেন না, নিয়মানুবর্তিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলাবোধ সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। ওদের রিপোর্ট যাতে ত্রুটিশূন্য হয় এই বিষয়ে প্রত্যেক মাস্টার ছাত্র এবং কর্মচারীরা চেষ্টা করছেন।

সেন মশায় ডাকলেন, মাস্টার—

মাস্টার হাত তুলে বললেন, এখন নয়—ফিরতি বেলা। বলে একবারটি মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখলেন সেনের মুখখানি শুকনো চিন্তাচ্ছন্ন।

বিকেলে এসে শুনলেন সব। অনুমান তাঁর মিথ্যা নয়। সেন মশায়ের একটি পরীক্ষা অভ্যাসন্ন। একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র এসেছে—ওরা 'ভূস্তরের রহস্য' লেখককে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করছেন। কবে কোন সময়ে লেখক যেতে পারবেন জানালে ওরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। আর একান্তই যদি লেখক যেতে না পারেন ওরা সদল বলে এসে একটি সাহিত্য সভার মারফৎ এই সম্মান জানিয়ে যাবেন।

সেন মশায় বললেন, মাস্টার, এ আবার কি ফ্যাসাদ বল তো!

মাস্টার বললেন, ব্যাসাদ আবার কি—এতো আনন্দের কথা। মনোনীতকে পাঠিয়ে দাও।

আরে ভাই—ব্যাসাদ যে ওইখানেই—ও বলছে যেতে পারবে না। এই সময়ে নাকি চাল ডাল কেনার মরশুম—

মাস্টার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তবে ওরাই আসুক এখানে। চমৎকার হবে। গ্রামে একটা সাড়া পড়ে যাবে।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন সেন মশায়, তাতে ব্যাসাদ আরও বাড়বে। মনোনীত বলছে ওঁরা যদি এখানে আসেন তাহলেও এদেশেই থাকবে না।

বিস্মিত হলেন মাস্টার। বললেন, কেন বাড়ী বয়ে সম্মান দিতে আসছেন মান্যগণ্য লোকেরা তাতে ওর আপত্তি কেন? এ যে কত বড় গৌরব গ্রামের—

আরে ভাই সে তুমি বুঝলে—আমি বুঝলাম—ওরা যে আজকালকার ছেলে বুঝবে কেন। বলে সম্মান পেয়ে আমার কি আর দুটো হাত পা গজাবে। ওসব ঝামেলা যদি বাধাও মেসভ্যাগী হব। শোনা কথা।

মাস্টার বললেন, এই সবকে যদি ঝামেলা মনে করে তো লিখতে গেল কেন?

ওই বলে কে। যে একরোখা ছেলে—শুনবে না। এখন উপায়।

মাস্টার বললেন, তাহলে একখানা চিঠি লিখে ওর অসুস্থতার কথা জানিয়ে দাও।

ভাই দেখ। এই দেখ একটা মুসাবিদা করেছি তুমি ভাই একবার চোখ বুলিয়ে দাও। এ সত্ত্বেও যদি ওরা আসতে চান—তার পথও বন্ধ করে রাখছি। লিখছি হাওয়া বদল করতে শীঘ্রই বাইরে যাচ্ছি এখন অভিনন্দন নিতে অপারক।

তা দেখ। মাস্টার খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। কাজটা কিন্তু ভালো হবে না। এতবড় একটা সম্মান থেকে শুধু নিজেকেই বঞ্চিত করছে না মনোনীত—গ্রামকেও বঞ্চিত করছে।

• • • •

পঙ্কু মাস্টার সুস্থির হতে পারলেন না। ঠিক করলেন মনোনীতের সঙ্গে দেখা করে ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন। আপন মনে বললেন, আমাকে মাস্টার বলে মান্য করে—আমার কথা কি ঠেলতে পারবে? কালই যাব ওর কাছে।

মাস্টার জানেন খুব ভোরে উঠে মোটারকম জলযোগ করে দু'মাইল দূরের দোকানে গিয়ে বসে মনোনীত, ফেরে দুপুর বেলায়। আহারান্তে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ছোটে—ফিরতে রাত দশটা। মাস্টার ঠিক করলেন খুব ভোর বেলায় উঠে ওকে ধরবেন।

ধরলেনও। বললেন, বাবা, তোমার এমন মতিগতি কেন? যদি কেউ ভালবেসে কিছু দিতে চান তোমার যোগ্যতার পুরস্কার—সেটা কেন নেবে না?

মনোনীত বলল, মাস্টার মশায়, যোগ্য হলে পুরস্কার নিতে বাধবে কেন! আমি তো যোগ্য নই।

সেকি—তোমার এমন সুন্দর লেখা—

মনোনীত মুখ নামাল। বলল, মাস্টারমশায় আপনিও বিশ্বাস করেছেন—ওসব আমার লেখা?

কাগজে তোমার নাম দেখলাম—অবিশ্বাসের কি আছে।

মনোনীত বলল, আপনার বিশ্বাস সবটাই আমার লেখা। বাবার হাত ওর মধ্যে নেই?

মাস্টার বললেন, সে আর কতটুকু! দুটো বানান ঠিক করে দেওয়া—কি ব্যাকরণগুদ্ধি—বড় জোর একটা লাইন নতুন করে বসানো—এসব যদি হয়—তাহলে আমরা মাস্টাররা তো সব চেয়ে বড় লেখক। যেহেতু সব ছাত্রেরই খাতে খড়ি আমাদের কাছে।

মনোনীত প্রতিবাদ করল না—শুধু হাত জোড় করে বলল, আপনি যাই বলুন—এই সম্মান আমি নিতে পারব না। বাবা যদি এ নিয়ে জিদ ধরেন একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটবে।

• • • •

পঞ্চু মাস্টারের মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনে সেন মশায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, দেখলে তো মাস্টার আজকালকার ছেলেদের মতিগতি। বেশ—তুই সভায় উপস্থিত না থাকলি তো বয়ে গেল—সভার কাজ ঠিক চলে যাবে। এর ওষুধ আমি জানি।

মাস্টার বললেন, না না—হঠাৎ কিছু করে বসো না উত্তেজনার বশে—

সেন বললেন, না তেমন কিছু করছি না। যারা এই প্রস্তাব এনেছেন—ওঁদের সম্মান রাখতে হবে তো? আর তুমিও তো বলেছ—এই গৌরব থেকে দেশকে বঞ্চিত করার এক্তিয়ার নেই আমাদের। আমি ওঁদের জানিয়ে দিচ্ছি—

মাস্টার বললেন, তোমার ছেলেদের তুমি জান—বুঝে সুঝে কাজ করো।

এই কথায় সেন মশায় হেসে ফেললেন। বললেন, জানি বইকি ছেলেদের—ওরা কি চীজ! একটা ফাঁকও রেখেছি প্রথম থেকে। নামের সমস্যা যাতে জটিল না হয়—ভবিষ্যতে যাতে গোলযোগ না বাধে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি মাস্টার।

কি রকম? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মাস্টার।

আমার ছেলেদের নাম তো জান—বল দেখি?

মণিময়, মনোনীত, মনোহর, মনসিজ।

আর আমার নাম মন্মথ। ইংরেজিতে এম. সেন। ওরাও এম. সেন। তাহলে—লেখক, কারবারী, কেরাণী, বেকার সকলেই তো এম. সেন। এদের তফাৎটা কোথায়?

পঞ্চু মাস্টার বললেন, কিন্তু এত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তুমি তো ওদের নামকরণ করনি।

হেসে বললেন সেন মশায়, কে বললে, করিনি! একটা বংশকে কোন একটা নামের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনাটা কি নতুন? এভাবে নাম রাখা কি শুধু মিলের খাতিরে? এর মনস্তত্ত্বটা বুঝতে পারলে তো মাস্টার?

পঞ্চু মাস্টার বললেন, মনস্তত্ত্ব একটি বিশাল জাহাজ. আমরা হলাম আধার ব্যাপারী—অতশত বুঝি না। তবে হাঁসিয়ার থেকো ভাই, কালের গতি বড় খারাপ। নদীর স্রোত আর এখনকার ছেলেদের মন সোজা পথে চলে না।

সেন মশায় বললেন, কিন্তু ভাই আমার সংসারের চেয়ে আমার গ্রাম কি চের বেশী নয়? তাকে আমি বঞ্চিত করব কোন মুখে! আমি সেই প্রতিষ্ঠানটিকে নিমন্ত্রণ জানাব ঠিক করেছি। আমাদের এই গ্রামেই বসবে সাহিত্য-সভা।

• • • •

এখন প্রশ্ন উঠল সম্মেলনের আসর বসবে কোথায়? গ্রামে কোন বড় হল নাই—আবার গ্রামের মানুষের এমন সঙ্গতিও নাই যাতে করে অস্থায়ী একটি মণ্ডপ তৈরী করে কাজটি সুসম্পন্ন হবে। এর ওর তার বৈঠকখানা ঘরের কথা এই প্রসঙ্গে উঠল, কিন্তু মনঃপুত হল না কোনটি। কোনটাই এমন প্রশস্ত নয় যা এই রকম বৈঠকের অনুকূল হবে। অবশ্য এ যাবৎ অনেক সভাই হয়েছে এইসব ঘরে। সে সব ছিল নেহাৎ ঘরোয়া ব্যাপার। তাতে কৌতূহল উদ্দীপনার লেশমাত্র থাকত না—যত অপরিসর ঘর হোক ফাঁকা ফাঁকা লাগত। এখানে কলকাতার নামী লোকেরা আসবেন- গান বাজনা আবৃত্তির ব্যবস্থা বৈচিত্র্য থাকবে। নেহাৎ খেলো রঙ তামাসার ব্যাপারে না হলেও রঙের অনুভূতো থাকবেই। লোক আসবেই। আর এই রকম একটি সভায় গ্রামের লোককেই যদি জড়ো করতে না পারা গেল—তো গ্রামের লেখকের গৌরব বা নামান্তরে গ্রামেরই গৌরব উপভোগ করবে কে?

সেন মশায় প্রস্তাব দিলেন, আমাদের লাইব্রেরী ঘরে হলে মন্দ হবে না।

কিন্তু সেই ঘর তো বইয়ের আলমারিতে ঠাসা।

তা আলমারিগুলো সরিয়ে পাশের বারান্দায় রাখা যেতে পারে। সাহিত্য-সভায় উপযুক্ত জায়গাই তো পাঠাগার!

জিনিস সরানো বড়ানোর ঝামেলা আছে। টাকা পয়সা খরচের ব্যাপার—

আরে সে ভারটা না হয় আমিই নিচ্ছি।

আপনি তো মাননীয় অতিথিদের আহারাদির ভারও—

নেব না? উছলে উঠলেন সেন মশায়। গ্রামের কৃতবড় সন্তান—এটুকু ভার যদি বইতে না পারব গ্রামে রয়েছি কেন। আর সভা সাজাতে যা খরচ হবে সে ভারও আমি নিচ্ছি। কয়েকখানা পোস্টারও ছাপাতে হবে, নেমন্তন্নের চিঠিও। সে সব ভারও……

রীতিমত সাড়া পড়ে গেল গ্রামে।

• • • •

সভাঘরের সাজ-সজ্জা ও লোক সমাগম দেখে খুশি হলেন অতিথিরা। একজন পণ্ডিতকে দিয়ে স্বস্তি বাচন আওড়ানো হলো, উদ্বোধন সঙ্গীত করল মেলা শহর থেকে আসত রবীন্দ্র-গীত বিতানের দল। মুখবন্ধের বক্তৃতাও মন্দ জমলো না। কিন্তু বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সভায় গোলযোগের সূত্রপাত হ'ল।

সভাপতি সেই নামী লেখকের নাম ঘোষণা করে তাঁকে সামনে আসতে আহ্বান জানালেন। এইবার অভিনন্দন বাণী পড়া হবে, মালাদান করা হবে লেখককে।

কিন্তু কোথায় লেখক?

সেন মশায় উঠে বললেন, আমি জানি, একটা বিশেষ কাজে সে মেলা শহরে গেছে। কথা ছিল সময়মত আসবে। কিন্তু এইমাত্র খবর পাওয়া গেল—সে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনারা ক্ষমা করবেন। তাই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আমি—

সভাপতি বললেন, না—না, ব্যস্ত হবেন না আপনি। তিনি যদি একান্তই না আসতে পারেন—সভার কাজ আটকাবে না। আমরা অভিনন্দনপত্র পাঠ করে শ্রদ্ধা জানাব লেখককে। শুধু অনুরোধ করে

যাব তাঁকে সুবিধামত এক সময়ে আমাদের সাহিত্য সভায় উপস্থিত হবার জন্য। সেই প্রতিভাবান লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত না হতে পেরে আমরা অবশ্য দুঃখিত।

আরও অনেক প্রশংসার কথা বললেন তাঁরা। গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে শুনল। মুগ্ধ হল, আনন্দিত হল। অষ্টাঙ্গটি চমৎকার ভাবে উৎরে গেল।

• • • •

সভা শেষ হবার আগেই মাস্টার সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেন মশায় কৈফিয়ৎ স্বরূপ যা বললেন—সেটি যে আগাগোড়া বানানো এটি বুঝতে পেরে উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মনোনীত এই সভায় যোগ দেবে না এটা জানতেই জানতেন সেন মশায়। জেনে শুনেও মাস্টারকে বলেছিলেন, বোঝেন মাস্টার, ওসব ছেলেমানুষি। দেখো—বাইরের লোকেরা এলে ঠিক মুড় মুড় করে হাজির হবে।

মনোনীত এলো না—উনি নিবারে উপর নিবারে সাজিয়ে দিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করলেন মাস্টার।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন মাস্টার—সেন মশায়ের এই অন্যায় জিদ কেন? এতে ওর কি স্বার্থ আছে?

হঠাৎ পাশের ঝোপটা নড়ে উঠলো—চমকে উঠলেন মাস্টার।—কে?

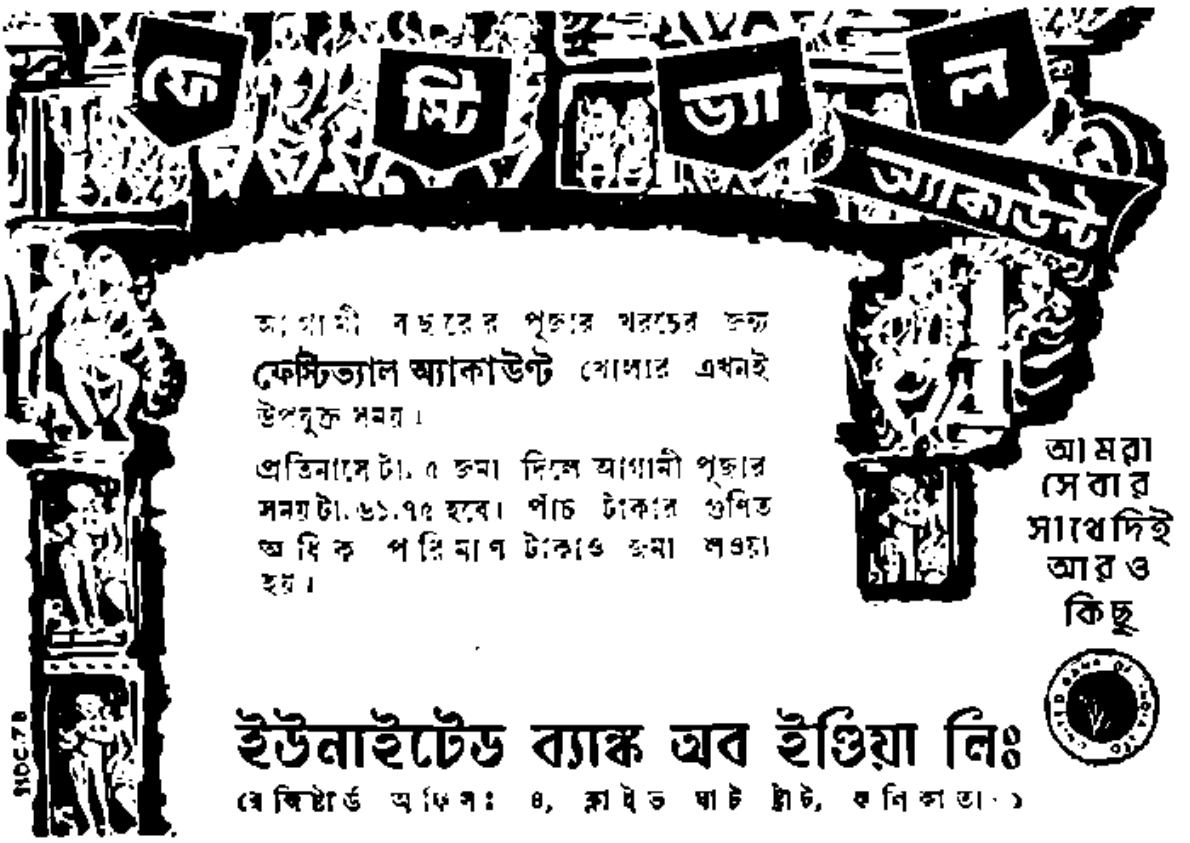

আমি মনোনীত।

অধিকতর বিস্মিত হয়ে মাস্টার বললেন, তুমি তাহলে জেলা শহরে যাওনি?

না।

অথচ তোমার বাবা সকলের সামনে বললেন—

মনোনীত বলল, শুনেছি। বাবার কথা বলবেন না—

কেন—তুমি সভায় উপস্থিত থাকলে ওকে কতকগুলো মিথ্যা বলতে হতো না। মাস্টারের কণ্ঠে বিরক্তির সুর ফুটলো।

মিথ্যা বলতেন না বাবা। হাসল মনোনীত। যিনি মিথ্যা বলবেনই তাঁকে মিথ্যা না বলাবে কে।

মাস্টার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ওসব হেঁয়ালি কথা রাখ। একঘর লোকের সামনে গ্রামের অখ্যাতি করাটা কি উচিত হয়েছে তোমার?

মনোনীত বলল, তাহলে শুনুন মাস্টার মশায় সব খুলে বলছি। একদিন কথায় কথায় বাবা বলেছিলেন আমাদের, বল দেখি বংশের নাম বজায় থাকবে এমন কীর্তি কি আছে পৃথিবীতে? আমরা বলেছিলাম—নাম বজায় রাখা যায় এমন অনেক জিনিসই তো আছে জগতে। ঠাকুরদাদা পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—শিবমন্দির তৈরী করিয়ে দেবসেবা করেছিলেন—

বাবা হেসে বলেছিলেন, ও সবের এখন কি দাম! পুকুর তো হেজে মজে যাচ্ছে—মন্দির ভেঙে পড়ছে—ঠাকুর দালান আছে, দুর্গোৎসব হচ্ছে না। ধর্মকর্ম নিয়ে মাতামাতির দিন আর নেই। ওসব ছিল রাজরাজড়া জমিদারদের কালে। এখন কাল পাল্টেছে। তারপর বলেছিলেন, একটা শ্লোক যা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, এখনকার কালে তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাঁটি—বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। এই বিদ্যাটি আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন। স্কুল কলেজে শিক্ষার মর্যাদা-কি সরকারী বড় চাকরির সন্ধান—ও যতদিন কর্মকাল—ততদিনই, তারপর কেউ পোঁছেও না। তবে এই বিদ্যার অন্য একটি ক্ষেত্র আছে—যা আজীবন কাল এমন কি মৃত্যুর পরেও সমান সমাদর এনে দেয়। সাহিত্য চর্চা। যদি এমন কোন বই লিখতে পার—রামায়ণ মহাভারতের মত—গীতার মত—এমন কোন পদাবলী বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের মত ··সেদিন বিশুর উদাহরণ দিয়েছিলেন বাবা। লিখে নাম করব—এই আশা বরাবর ছিল ওঁর মনে। নেশাও বলতে পারেন। উনি বিস্তর কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। নানা কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ছাপা হয়নি কোনটিই। শেষে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, ওরে এ যে দেখি বিষম কঠিন কাজ। সবাই চায় নতুন বিষয়বস্তু, নতুন স্টাইল, নতুন চিন্তা। আমরা তো সেকেলে মানুষ—নতুন জিনিস কোথায় পাই বল দেখি। এমনি করে বেশ কিছুদিন গেল। আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম রাঁচী হাজারীবাগ। বন্ধু ছিল জিওলজিষ্ট, সে এমন রসিয়ে রসিয়ে গল্প করত পাহাড়, মাটি, নদী, জঙ্গল নিয়ে যা গল্প উপন্যাসের চেয়েও ইন্টারেষ্টিং মনে হবে। বাবার কাছে এই সব গল্প করতেই উনি লাফিয়ে উঠেছিলেন, ওরে—এই একটা বিষয় আছে যা নতুন। শক্ত বলে কেউ হাত দেয়নি। তোর সেই বন্ধুর কাছে আবার চলে যা। ভাল করে শুনে নিবি ওই পাথর মাটির কথা। যা মনে থাকবে না নোট করে রাখবি। বার কয়েক গিয়েছিলাম সেখানে। অনেক গল্প শুনলাম। শোনালাম বাবাকে। বাবা আমার গল্পতো শুনলেনই—বইও যা পাওয়া গেল কিনলেন। লিখলেন কাগজে। লেখা বার হলো। বাবার লাগল নেশা। আমার নাম দিয়ে লিখেছিলেন কারণ ওঁর নামের এত লেখা ফেরৎ এসেছিল

যাতে করে ওঁর ধারণাই হয়েছিল ওই নামটি দেখলেই সম্পাদকরা লেখা ফেরৎ পাঠাবেন। আমায় বললেন, তোর নামটাই থাক, তোকে আমি দাঁড় করিয়ে যাব, বংশের গৌরব তোর মধ্য দিয়েই বজায় থাকবে। আমি আপত্তি করেছিলাম। শুনলেন না। বললেন, পুরো নামটা তো তোর দিইনি—তোর এত আপত্তি কেন। ইচ্ছে হলে না হয় দায়িত্ব নিবি না, ব্যস। নিলামও না—সরে দাঁড়ালাম যেন উনি বড়া বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলেন। বলুন তো মাস্টার মশায়—এই বিদেশের পণ্ডিত মানুষদের গ্রামে এনে সভাসমিতি সম্মান আদায় এসব আমাদের সইবে? ওঁরা যখন জিজ্ঞাসা করবেন···তাই সরে দাঁড়িয়েছি মাস্টার মশায়।

ওর দীর্ঘ ইতিহাস চুপ করে শুনলেন মাস্টার। ওঁর মনে হল সিটের পর সিট দিয়ে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়িয়েছে যা আর সহজ করা যাবে না। মাস্টার বললেন, তাইত বাবা, এই ভাবে কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে?

মনোনীত বলল, আর লুকোবার দরকার হবে না—বাবা তো আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছেন—এইবার মনে হচ্ছে ওটা নিজের কাঁধেই তুলে নেবেন। তাই নিন—আমরাও রক্ষা পাই।

• • • •

ছেলের মন্তব্য বাপের কানে পৌঁছল। ক্রোধে ওঁর সর্ব্বশরীরের বায়ু স্তম্ভিত হল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, মাস্টার—ছেলে নয়, শত্রু। তৈরী ফসল এমন করে যে নষ্ট করে সে শত্রু ছাড়া কি! এখন যেটুকু পেরেছি তাই নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপায় কি। আর দিতে পারব না এও বুঝছি।

মাস্টার বললেন, কেন—নামটাতে তো কোন গোলমাল নেই। এম. সেন। মনোনীত মন্মথর তফাৎ নেই।

মাথা নাড়লেন সেন মশায়, না, আর নয়। আর হবে না। মাস্টার, হাতের পুঁজি তো শেষ—নতুন বস্তু কোথায় পাব। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তো জানই—ওই গাছপালা লাগানো পর্য্যন্ত। মানী কখনো বিজ্ঞানী হয়। তবে মানপত্রখানা আমি ভাল করে বাঁধিয়ে গ্রামের পাঠাগারে দিয়ে দেব। নতুন যুগের ছেলেরা তবু জানবে তাদের গ্রাম নেহাৎ নিষ্ফলা নয়। ভূমিরা কি সিন্ধির মত একটি স্মৃতিসভা করবার সংস্থান তো রইল। আর সেই সঙ্গে সেনবংশের নামটাও ইতিহাসের পাতায় উঠবে। কি বল, উঠবে না?

মাস্টার অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

সেন মশায় হেসে বললেন, তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। ভাবছ মনোনীতের উপর আমি খুব রাগ করেছি। না—না। প্রথমটা রাগ হয়েছিল বটে—এখন ভেবে দেখছি এইটাই ভাল হবে। ও ব্যবসাই করুক—মনোযোগ দিয়ে ব্যবসা করুক। মা লক্ষ্মীর কৃপা হলে কীর্ত্তি বজায় রাখবেভাবনা। টাকা খরচ করলে মার্বেল পাথরের একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা কি এমন কঠিন ব্যাপার! যেমন দুনিয়ায় কীর্ত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে···

সেন মশায় অনর্গল বলে চললেন—পঙ্গু মাস্টার অবাক হয়ে ভাবলেন, এই আশ্চর্য্য কথা কি অনন্ত কাল ধরে সব মানুষই বলে আসছে না?

বাসনা

- সুদেষ্ণা বসু

রেজেষ্টারী চিঠিটা হাতে করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নার্স মালতী ঘোষী। খামের ওপর কলকাতার সলিসিটরের কার্ডের নাম পড়ে প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাজের অছিলায় অনেকক্ষণ খোলেনি চিঠিটা, ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে রেখে মেশিনের রুটিন করে গিয়েছে। অপারেশন থিয়েটারের কাজ শেষ করে হাসপাতালের দোতলার এক নির্জন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কাচের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের অন্তহীন তরঙ্গের পেছনে সাদা বরফের চূড়ো উঁকি মারছে। সেদিকে একবার উদাসদৃষ্টি বুলিয়ে খামটা খুলে ফেলল মালতী। বুকের স্পর্শে উষ্ণ চিঠি, কিন্তু পড়া সমাপ্ত করে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে উঠল মালতীর—যেন শিবালিক পর্বত তার সমস্ত ঠাণ্ডা হাওয়া পাঠিয়ে দিয়েছে তার ধমনীর মধ্যে।

মুশৌরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাড়ী এই মারীগোল্ড ভিলা। লাইব্রেরী বাজার থেকে পশ্চিমদিকে যে রাস্তা উপরের দিকে উঠে গেছে, রাস্তাটায় শ' দেড়েক ফুট চড়লে কাপুরতলা হাউসের অনতিদূরে মারীগোল্ড ভিলার বোগেনভিলা ছাওয়া প্রকাণ্ড ফটক নজরে পড়বে। সে এক প্রাসাদ! মাথাটা ঘুরে গেল মালতীর।

"এই বাড়ী চালাতে যাতে আপনার অসুবিধা না হয় সেজন্য স্বর্গীয় মিঃ মুস্তফি তাঁর উইলে আপনার জন্য নগদ প্রায় দশহাজার দুই লাখ টাকার মত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন"—প্রায় স্বগতোক্তির মত সভয়ে আবার পড়ে গেল মালতী। এসব কি ব্যাপার! রোগীকে অ্যানাথেটিক দেবার সময় তার নাকেই ক্লোরোফর্মের কিছুটা ঢুকে যায় নি তো? নিঃসন্দেহে মাথাটা আর তার কাজ করছে না। অবসন্ন হয়ে মালতী পাশের চেয়ারটায় তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। মুসৌরীস্থার এস্টেট, ইণ্ডস্টক স্কুল ও ল্যাণ্ডোরেঞ্জ স্কুলের বাড়ীগুলি পাহাড়ের চূড়ো থেকে যেন এ ওর গায়ে এলিয়ে পড়তে লাগল, লাল টিবার মাথা দুলতে লাগল বুড়োর দাবার মত। অতিকষ্টে নিজেকে মূর্চ্ছা থেকে বাঁচাল মালতী ঘোষী।

প্রায় দু'বছর আগের কথা। কলকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী অমরেন্দ্র মুস্তফী মুশৌরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর মত ব্যস্ত লোকের পক্ষে খুব একটা লম্বা ছুটি নিয়েই এসেছিলেন। অক্টোবর মাসটা মুশৌরীর সেরা সময়। এ সময় কলকাতায় পুজোর ছুটি উপলক্ষ্যে অনেকগুলি দিন কাজকর্ম বন্ধ থাকে। এক মাসের ওপর মুশৌরী কাটাবেন বলে এসেছিলেন। স্থির করে এসেছিলেন, বোর্ড মিটিং, স্ট্রাইক বা লক-আউট, বা অ্যাডভুটিকেশন কিছুই তাঁকে এক মাসের বিশ্রাম থেকে টলাতে পারবে না।

দিল্লীর অফিস থেকে মোটর নিয়ে সস্ত্রীক চলে এলেন মুশৌরী। সঙ্গে ড্রাইভার আর নিজস্ব বেয়ারা তার। মুস্তফী বিপত্নীক ও অপুত্রক। চাকর-বাকর ও দূর আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে

বাস করেন। সঙ্গে আমার উপযুক্ত কেউ নেই। লাইব্রেরী বাজার অতিক্রম করে মাল থেকে ঘোড়া নিয়ে গাড়ী উঠে এল স্যাণ্ডর হোটেলের দরজায়।

রৌদ্রে ভরে গিয়েছে মুশৌরী শহর, আকাশে মেঘের বাষ্পমাত্র নেই। উত্তর দিগন্তে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, নন্দাদেবীর বরফের চূড়োগুলি চকচক করে উঠেছে। ভিজিটরেরা ছুটছে কোম্পানী বাগ, ক্যামেল্‌স্ ব্যাক রোড, লাল টিব্বায়। হাসিতে মুখর আর মেয়েদের সাজ পোশাকে ঝলমল করে উঠেছে তকতকে রাস্তাগুলি। কুলীর দোকান-রেস্তরাঁ লোক ধরবার সব তাঁর পেতেছে পথের ও খানাপিনার সমারোহে। মুশৌরীর মত এমন আনন্দময় শহর ক'টা আছে ?

মুক্তকীও মুশৌরীর মজায় মেতে উঠেছেন। অকাতরে টাকা ব্যয় করছেন। বন্ধু ও বন্ধুনী জুটিয়ে ফেলেছেন একগাদা। পপ্ পপ্ শব্দে অনেক তরল পানীয়ের বোতল খুলছে। রোজই ডিনারের সঙ্গে নাচ চলছে—স্যাণ্ডরে, হ্যাকম্যানসে আর নানা কাফেতে। গাড়ী নিয়ে দলবলে যাচ্ছেন কেম্পটি প্রপাতে পিকনিক করতে, হাপীত্যাগী ক্লাবে টেনিস আর বিলিয়ার্ড খেলতে।

এমনি এক ডিনার-ডান্সের আসরে অকস্মাৎ একদিন অসহ্য ব্যথায় ছোড়াঙ হয়ে পড়িয়ে পড়লেন মুক্তকী। বাজনা বন্ধ হলো, নাচ থেমে গেল, মেয়েদের ভীত চিৎকারে ভরে গেল হলঘর। ধরাধরি ক'রে মুক্তকীকে সোফায় এনে শোওয়ানো হলো; টেলিফোন গেল ডাঃ বিবেদীর কাছে। পেটে হাত দিয়ে মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত করে কাতরাতে লাগলেন মুক্তকী।

শীগগিরই ডাক্তার হাজির হলেন। পরীক্ষা করে বললেন, অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের খুব পরিণত অবস্থা। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করতে হবে। নইলে বাঁচান যাবে না।

এই সূত্রেই মুক্তকীর সঙ্গে পরিচয় নার্স মালতী ঘোষীর। মুক্তকী স্পেশাল সেরিং ওয়ার্ডের রোগী আর মালতী তাঁর ক্যাবিনের এক বেলাকার নার্স।

বড় খুঁতখুঁতে রোগী মুক্তকী। এটা ভালো নয়, ওটা ভালো নয়, এ খাওয়া যাচ্ছে না, মাংসের স্যুপে কটু মাখনের গন্ধ, ছুরি কাঁটা চামচ যথেষ্ট নয়, বিছানার চাদর শুধু পরিষ্কার হলেই যথেষ্ট নয়, মোটা ও মসৃণ হতে হবে। মালতী শুনেছে মুক্তকী কলকাতার মস্ত ধনী লোক। হাসপাতালের ব্যবস্থা, তা সে যতই স্পেশাল হোক না কেন, ওঁকে খুশি করতে পারবে না মালতী তা বোঝে। তবু যথাসাধ্য তাঁর হাসপাতাল-বাসটা সে সুন্দর করতে চেষ্টা করেছে।

সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তার ডিউটী। কিন্তু রাতের নার্স মিসেস জোন্স আসতে প্রায়ই দেরি করেন। মিসেস জোন্স খিটখিটে বুড়ী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। মালতী তাঁকে না খাটাতেই চেষ্টা করে। সে রাত ন'টায় এসে পৌঁছলেও মালতী প্রতিবাদ করে না। রোগী এবং নতুন নার্স দুজনকেই গুড নাইট জানিয়ে নিজের কোয়ার্টারে চলে যায়।

সেদিন বিকেলে মালতী তার রোগীকে উত্তর দিকের জানালার ধারে ইজিচেয়ারে বসিয়ে ফলের রস এনে হাতে দিয়েছে। নিজে ধবধবে একটা কেস্ টাউয়েল নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে। রসপান শেষ হলে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেবে।

'থেংক মিস্ ঘোষী' মুক্তকী পর্বত রেখাঙ্কিত দিগন্তের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মালতীর দিকে চেয়ে সস্নেহকণ্ঠে বললেন, 'এই হাসপাতাল-বাসটা আমার কাছে দুঃসহ হতো যদি তুমি কাছে না থাকতে। এমন সেবা আমাকে আর কেউ করে নি। করবার কেউ নেইও। স্ত্রী নেই, মেয়ে

নেই, পুত্র-পুত্রবধূ নেই। আমার অনেক টাকা আছে, অনেক লোক খুশি করতে ছুটে আসে। কিন্তু অন্তরের স্পর্শ কোথাও নেই। শুধু টাকার সম্পর্ক…'

'আমিও টাকা নিয়ে সেবা করি। এতো আমার প্রফেশান। নিন, খেয়ে নিন ওষুধটুকু। নইলে ডিনারের সময় দিয়ে যেতে বলবেন।' মালতী অনুরোধের সুরে বললে।

'তোমার মা বাবা আছেন? কোথায় থাকেন তাঁরা। তুমি তো এখানে নার্সের কোয়ার্টারে থাক, তাই বলছিলে না?'

'কেউ নেই।' সংক্ষেপে মালতী জবাব দিলে। 'কিন্তু আর দেরি নয়। খেয়ে নিন।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মুস্তফী এবার সেলাম নিঃশেষ করে মালতীর হাতে ফিরিয়ে দিলেন। সাইডবোর্ডে সেটা রেখে মালতী হাতের তোয়ালে দিয়ে রোগীর মুখ মুছে দিলে।

'কত নম্বর তোয়ালে এটা? এখনও সব শেষ হয় নি? কাল আরও কতকগুলি কিনে নিয়ে এসো। তোমাদের হাসপাতালের বিছানার চাদর, কম্বল, তোয়ালে কিছু আমি ব্যবহার করতে চাইনে।' মুস্তফী ইঁশিয়ার করার মত করে বললেন।

'আর কিনতে হবে না। আগেরগুলো সব কাচা হয়ে গেছে।' মালতী বিছানার চাদর তুলে ময়লা কাপড়ের ঝুড়িতে ফেলে সাইডবোর্ডের ড্রয়ার থেকে ইস্ত্রিকরা নতুন চাদর বের করলে।

'হাসপাতালের ধোবার ধোয়া নিশ্চয়ই তো আমি ব্যবহার করব না।' মুস্তফী বেশ একটু মেজাজ করে বললেন। 'হাজার রোগীর কাপড়ের সঙ্গে একই সঙ্গে যা ভাটিতে যায়, একই সঙ্গে কাচা হয়…'

'এগুলো আমি নিজেই বাড়িতে কেচে দিয়েছি, নিজে আয়রণে ইস্ত্রি করেছি।'

তাড়াতাড়ি মালতীর মুখের দিকে তাকালেন মুস্তফী। প্রায় লজ্জিত বোধ করলেন মেজাজের জন্য। এতো তাড়া করা নার্সের লক্ষণ নয়। যেন বাড়ীর মেয়ে। বাপ মায়ের মর্জির সম্মান করছে, অপব্যয় বাঁচাবার চেষ্টা করছে। বস্তুত ব্যক্তিগত খরচের জন্য তিনি প্রত্যহ যত টাকা মালতীর হাতে তুলে দেন, তার সিকিও ব্যয় করে না। প্রতিটি লিখিত হিসাব মুস্তফীর অজ্ঞাতসারে তোষায়ার উপর চাপা দিয়ে রেখে যায়। অথচ যে উদ্দেশ্যে তাকে এই অতিরিক্ত টাকা দেওয়া তা প্রতি বর্ষে পালিত হচ্ছে।

'মালতী, এখানে এসে একটু বসো। কী অবর্ণনীয় সুন্দর হিমালয়ের এই অরণ্যহীন তরঙ্গ। তুমি বাংলা জানো না। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। হিন্দী বাংলায় তফাৎ কতটুকু। হিমালয়ের ওপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে। তার আরম্ভটা এই রকম—হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত, চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত সবিৎ, প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে, দুর্গম দুরূহপথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে—বুঝতে পারছ কিছু? আর যদি নাই বোঝ, রোগীর খামখেয়াল মনে করে সহ্য করতে হবে…'

'আপনি বলুন। না বুঝলে পরে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।' মালতী প্রশ্রয়ের সঙ্গে বললে।

মিসেস ঘোষ হাজির হলেন সময়ের আগেই। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার প্রায়ই ঘটে না।

'ওড্ ইভ্‌নিং। হা-ডু-ডু। আমি খুব দুঃখিত, আজ আসতে আমার দেরি হবে—ঘর, বাড়ী ধোয়াটা একটা। ক্লাবে তাস আছে। রাত সাড়ে নটায় শুরু হবে। তুমি বরঞ্চ, বাড়ী চলে যাও,

আমি মিঃ মুস্তফীকে আটেন্‌ড করছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে পৌনে আটটার মধ্যে ফিরে এসো। বাড়ী গিয়ে আমাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে। এবার মল্লী জাগো। আমিই আজ মিঃ মুস্তফীকে ডিনার এনে দেব ....'

'তার জন্য ভেবো না। আজ আটটার আগে আমি কিছুতেই ডিনার খাব না। আগেই মিস্ বোসীকে বলে দিয়েছি।' মুস্তফী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন। 'তোমাদের হাসপাতালের ডিনার টাইম, আর আমার পেটের ক্ষিদের টাইম সিন্ ক্রোনাইজ করছে না। এখন আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি। নিয়মের তড়াকড়ি না মানলে কোনও ক্ষতি হবে না।'

'তাও কখনও হ'তে পারে? হাসপাতালে যত দিন আছেন তার নিয়ম ভাঙা চলবে না।' মিসেস ঘোষ বিনে গলায় বললেন।

'সে নিয়েও তোমাকে ভাবতে হবে না।' মুস্তফী এবার দুষ্টুমিভরা চোখে মালতীর দিকে চেয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন। 'ডাঃ বিবেদীর কাছ থেকে অনুমতি আমি আগেই চেয়ে রেখেছি। কেমন চেয়ে রাখিনি?'

মালতীকে ঘাড় নাড়তেই হলো। ডাক্তার বিবেদীর অনুমতি চাওয়া বা আগে থেকেই রাত আটটার ডিনার খাওয়ার সংকল্প এ দুটোর কোনটাই সে জানত না। কিন্তু সে বুঝে নিয়েছে মিসেস্ ঘোষের ডিনার পরিবেশন করাটা রোগীর পছন্দ নয়। তার সাহায্যে আসতেই হলো।

'ঠিক আছে তবে। আমার কি।' বলে মিসেস্ ঘোষ্ ঘুস্ ঘাস করে' ঘরের আসবাবপত্র এটা এদিকে ওটা ওদিকে সরিয়ে কর্মতৎপরতার পরিচয় দেওয়া শুরু করলেন। মালতী তবু দাঁড়িয়ে ছিল। রোগীর অনুমতি পেয়ে সে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

'এখন ক'টা বেজেছে দেখতো মালতী। মানে মিসেস্ ঘোষের আসার সময় হয়ে গেছে কি?'

'এখন সাড়ে এগারো', নিজের ছোট হাতঘড়ি অনুজ্জ্বল সবুজ আলোর বাতির তলায় ধরে সময় দেখে মালতী বললে। 'এবার ঘুমের ওষুধটা দিয়ে দিই। এত কথা রোগীর পক্ষে ভালো নয়। অনেক কথা বলেছেন আজ বিকেল থেকে। এবার ঘুমিয়ে পড়তে হবে।'

'সেটা এক্ষুনি করতে চাই নে।' মুস্তফী বললেন। 'মিসেস্ ঘোষের ফিরে আসার মিনিট পনেরো আগে সিডেটিভ দিলেই চলবে! আজ আমাকে কথা বলতে দাও। বাইরের পৃথিবী আজ জ্যোৎস্নার উৎসবে মেতে উঠেছে। নিস্তব্ধ বিস্তৃত পৃথিবী এই কাচের জানালায় চাক্ষিব হয়েছে। বিরাট মুক্তির ইসারা করছে। কেন বন্ধনের মধ্যে আছ—স্নেহের বন্ধন, ঐশ্বর্যের বন্ধন, অহংকারের বন্ধন ছুড়ে ফেলে এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে মিলিয়ে যাও। মৃত্যুকে এবার খুব কাছাকাছি দেখেছি। আত্ম-সমর্পণের জন্য তৈরিও হয়েছিলাম। তোমরা আবার বাঁচিয়ে তুললে। বলতো এখন জীবনটা নিয়ে কি করি? যাবে তুমি আমার সঙ্গে, মালতী? কলকাতায় আমার বাড়ীতে?'

সভয়ে মালতী নিজের চেয়ারটা দু'হাত পিছনে ঠেলে নিল পা দিয়ে। এতক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত হয় নি। সিডেটিভ তার আগেই দেওয়া উচিত ছিল, রোগীর মাথা গরম হয়ে উঠেছে তার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে প্রলাপোক্তিতে।

মৃত্তকী বলে চললেন, 'আমি একজন একান্ত আপনার জন চাই। আমার অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি। যেদিন আমাকে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো, তখন যে ভয়টা আমার মনে প্রথম এলো সেটা এই—আমার বিষয়-সম্পত্তির কি হবে। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আছেন, কারুর সঙ্গেই আমার মনের আত্মীয়তা নেই। তাঁদের দু'দশ হাজার আমি দান করতে পারি, কিন্তু তারা আমার সর্বস্ব দখল করে' বসেছে এ আমার অসহ্য। আর অসহিতে হবে? অনেক দান করেছি জীবনে, অনেক দানের ব্যবস্থা করে' গেছি উইলে। কিন্তু এতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি আসে না। কেউ যদি একান্ত আপনার থাকত যাকে সব দিয়ে যেতে পারতাম, যে সুখে থাকতে পারবে মনে করে' সুখ পেতাম, স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী বলে মনে করতে পারতাম, তবে বড় ভালো হতো। শান্তি হতো। বড় মায়া নিজের সন্তানের ওপর। বড় কষ্টে, বড় যেহনতে তা অর্জন করেছি। যাকে তাকে দিয়ে যেতে পারব না! বিলির একটা সুব্যবস্থা না করে' যেতে পারলে মরেও যেন শান্তি পাব না। তাই আমি লোক খুঁজছি। এখানে ওখানে সর্বত্র। কোথাও খুঁজে পাই নি। হঠাৎ বিভূঁয়ে বিপদে তোমার সেবা পেলাম। হঠাৎ তোমাকে নিজের বলে' মনে হলো…'

'প্লিজ, আজকে আর বেশি কথা বলবেন না। কালও তো বলার সময় রয়েছে। এবার না ঘুমোলে আপনার ক্ষতি হবে।' বলে মালতী চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। সাইড্-বোর্ডের ওপর থেকে ঘুমের বড়ি ও কাচের গেলাসে জল নিয়ে এলো, কবোষ্ণ জল।

'আর একটা মিনিট। তারপর তোমার দেওয়া ট্যাবলেট বিনা আপত্তিতে খেয়ে নেব। মৃত্তকী বললেন। 'তোমার বাবা মা ভাইবোন কেউই জীবিত নেই বলেছিলে। যদি একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে করো না, কাউকে কি তুমি ভালোবাস, তোমার বয়সী কোনও ছেলেকে?'

'না', স্পষ্ট গলায় মালতী বললে।

'তবে বাবা কি? চলো না আমার সঙ্গে। আমার নিজের কেউ নেই। কত অসহায় যে মনে হয়, তুমি ভাবতে পারবে না…'

'যদি কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন', মালতী অতি ধীরে ধীরে থেমে থেমে বললে, 'যদি কখনও বিপদ বোধ করেন, আমাকে লিখবেন। আমি যাব। নিশ্চয় যাব। নিজের লোকের মত যাব। এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারি। নিন, হাঁ করুন। বড়িটা খেয়ে নিন…'

মৃত্তকী নীরবে এই আজ্ঞা পালন করলেন। আর কিছু বলতে চেষ্টা করলেন না। গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দিলে মালতী। গরম জলের ব্যাগ পায়ের কাছে সুবিন্যস্ত করে রাখলে। তারপর রোগীর শিয়রে বসে নখ দিয়ে তার মাথা আঁচড়াতে লাগল ঘুম পাড়াবার জন্য।

রোগীদের অনেক আবার রক্তার সঙ্গে কখনও কখনও এমন কি প্রেম নিবেদনও শুনতে হয়। এরা বিশেষ ওয়ার্ডের রোগী, নার্সের টাকা এরা নিজেরা দেন। জেনারেল ওয়ার্ডের রোগীদের চেয়ে এদিকেই এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সসম্মান ব্যবহার করতেই হবে। অনেক সময় এদের ছেলেমানুষি বিরক্ত করতে হয় ঔদাসীন্যে বা গাম্ভীর্যের ভান করে। কোনও কোনও নার্স বিরক্ত হয়, স্টাফ্-নার্সের কাছে নালিশ করে। কিন্তু মালতী জানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। রোগ যখন কাতর তখন সেবিকাকে বড় আপনার

মনে হয়; মন যখন দুর্বল, অনেক বেফাঁস কথা বেরিয়ে আসে সন্ত্রান্ত লোকের মুখ থেকেও। এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেই ভালো।

কিন্তু মুস্তফী'র প্রস্তাব হাসপাতাল ত্যাগের সঙ্গেই শেষ হলো না। পর পর দিনে তিনি দু'বার ফোন করেছেন। মালতীর জন্ম একদিন অনেক মিষ্টি বেয়ারা প্যাকের হাতে মালতীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শনিবার মালতীর ছুটির দিন। এদিন সন্ধ্যাবেলাটা কোনও ক্লেটিং রিঙ্কে গিয়ে সে স্কেটিং করে কাটায়। তখনও কোনও সহকর্মিনীকে জোগাড় করে' সঙ্গে নেয়। না পেলে একাই যায়। স্কেটিং রিঙ্কে বহু মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বন্ধুদের কেউ না কেউ থাকেই। আনন্দ, ব্যায়াম এবং সহজভাবে সন্ধ্যাটা ভরে ওঠে। আজ হাসপাতালের কাউকে সঙ্গী পাওয়া যায়নি। রাতে লোহার স্কেটিং ঝুলিয়ে মালতী একাই বের হয়ে পড়েছে। পরণে হাল-ফ্যাশনের খাটো সালোয়ার-কামিজ। নীলা ধারা, যমুনা বেহী, আশা ভোসলী প্রভৃতি বন্ধুরা সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই স্কেটিং রিঙ্কে হাজির হবে কথা আছে। ওরা সব প্লাটস্-এ অটাম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছে। মালতীকে ডেকেছিল, কিন্তু সে যেতে পারে নি।

'মিস্ ঘোষী, তুমি তো সুন্দর স্কেট করতে পার! আগে নাকি এখানে প্রায়ই আসতে তো কখনও দেখিনি। অবশ্য আমিও খুব কমই আসি।'

মালতীর বন্ধুরা এখনও কেউ এসে পৌঁছায় নি। কিন্তু স্কেটিংরের মসৃণ ফ্লোরে অল্প স্কেটিং-বিলাসীর অভাব নেই। তাদের মধ্যে একা এবং কখনও বা রিঙ্কের ওস্তাদ ট্রেনারের হাত ধরে বৈত বহু বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট অবিচ্ছিন্ন স্কেট করে এই মাত্র পাশের রেস্তরাঁর গদির চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছিল মালতী। গরম কফির অর্ডার দেবার জন্ম ওয়েটার খুঁজছিল দুই চোখ। এমন সময় পিছন থেকে একটি পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে সে পেছনে তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুস্তফী সাহেব তার পাশের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

'মুশোরী এসে যে সব ছেলেমানুষি করছি, স্কেটিং রিঙ্কে আসা তার মধ্যে একটা। কিন্তু তার আগে কি খাবে বলো?' মুস্তফী অদূরবর্তী ওয়েটারের উদ্দেশে কুড়ি মেরে বললেন। 'সত্ত কালই ভাবছিলাম, তোমাকে ফোন করি। তোমাদের মুশোরীর ওপর এমন মায়া জন্মেছে যে, বাড়ী কিনে ফেললাম। মারীগোল্ড ভিলা, সার্কুলার রোডে, কাপুরতলা হাউসের খুব কাছেই। পরশু বিকেলে এক পার্টি দিচ্ছি—মুশোরীর গণ্যমান্য প্রায় শ'দেড়েক লোকের নেমন্তন্ন হয়েছে। তোমার আসা চাই। ফোনে তোমাকে না-পাওয়া গেলে আমি নিজেই গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব ঠিক ছিল ...'

'কি জানি, তখন আবার আমার ডিউটি আছে কিনা।' মালতী সরাসরি নিমন্ত্রণ গ্রহণে দ্বিধা করে বলল। 'তা ছাড়া, এত সব গণ্যমান্যেরা আসছেন, সেখানে আমাকে কি মানাবে?...'

'আলবৎ মানাবে।' মুস্তফী টেবিলে চাপড় দিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন। 'মানাবে না কেন? তোমাকে না মানালে আর কাকে মানাবে। তুমি যে আমার নিজের লোক। আমি বলব, এ আমার মেয়ে মালতী, এই পার্টির গেস্টেস.....'

'আমি তা হলে আগে থাকতেই পালিয়ে যাব।' মালতী সভয়ে বলল।

'তা কখনও হ'তে পারে।' গম্ভীর মুখে বললেন মুস্তফী। 'এই বাড়ীটাই যে আমি তোমার জন্য কিনেছি। তোমার কেউ নেই। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই। কোনও অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে তুমি আমার মনকে স্পর্শ করেছ। আমার টাকা-পয়সা ক্ষমতা প্রতিপত্তি প্রচুর। কিন্তু তবু প্রকাণ্ড অভাব রয়ে গেছে। কাউকে একান্ত আপনার না বানাতে পারলে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আচ্ছাদন করতে না পারলে শান্তি নেই। কেমন যেন অসহায় বোধ হ'তে থাকে। তোমার মধ্যে সেই লোক দেখেছি। কিন্তু তুমি এক অচেনা লোকের সঙ্গে সুদূর কলকাতায় যেতে ভয় পাচ্ছ। এটা স্বাভাবিক। মুশৌরীতে নিশ্চয়ই অতটা ভয় পাবে না। এখানে থাকতে পারবে কি? এই বাড়ীটা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেব·····

'কি সম্পর্কে আমি এখানে থাকতে পারি আপনিই একবার ভেবে দেখুন?' মালতী দু'চোখ টেবিলের দিকে নত করে বলল। নিজে আপত্তি করার চেয়ে অন্যকে নিজের অযৌক্তিকতা দেখাতে পারলেই সব দিক বজায় থাকে। মুস্তফী মানুষ ভালই মনে হয়। মালতী তাঁকে আঘাত করতে চায় না। অথচ সহসা একজন অপরিচিত ব্যক্তির—তা তিনি যতই ধনী হোন না কেন—কথা বলে যেতেও তার ইচ্ছে নেই। 'কেন, আমার নিজের লোক, আত্মীয়া, আমার মেয়ে হিসেবে—ও এরই মধ্যে নিয়ে এসেছ। ভেরী গুড্!—নাও, মালতী বেশি করে ক্রীম ঢেলে সরম কফি বানিয়ে নাও··' মালতীর প্রশ্নের জবাব দান স্থগিত রেখে ওয়েটারের দিকে নজর দিলেন মুস্তফী।

কফি ও ক্রীমের পট্, মীট্ রোল ও পেস্ট্রির প্লেট প্রভৃতি একে একে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে পরিচারক বিদায় হবার পরও কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট নীরব হয়ে বসে রইল মালতী। এসব খেতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে, ভয় হচ্ছে। মুস্তফী এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন? কি তাঁর প্রকৃত মতলব? সে উঁচু সমাজের লোক। বড় বড় ঘরের স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে তার জানাশোনা। হঠাৎ মালতীর মত সামান্য সেবিকার প্রতি তাঁর এই দরদ কেন? ধনীদের নানা রকম খেয়াল হয়ে থাকে। এও নিশ্চয়ই একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল।

'না, না, ওগুলি ফেলো না। খেয়ে ফেল। ওই দেখ, প্রবেশ-দরজার কাছ থেকে কারা সব হাত তুলে তোমার দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করেছ—ছেলেমেয়েতে বেশ একদল! তোমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই। ভালোই হলো। এবার আমারও ওঠবার সময় হয়েছে। কিন্তু পরশুর পার্টির কথা ভুলো না। তখন তোমার প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব আশা করছি ·····'

মালতী তাড়াতাড়ি ফিরে তাকালে। দেখলে তার বন্ধুরা সব হাজির হয়েছে। হেসে, অকারণে উৎসব করে তার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশে নানা রকম ভঙ্গিতে হাতছানি দিচ্ছে।

'যাও। এবার ওদের সঙ্গে মিশে হৈটৈ শুরু কর। পার্টিতে নিশ্চয়ই যেও। এতে ভয়ের কিছু নেই।' বলে মুস্তফী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মালতী পার্টিতে যায়নি। কেন যাবে? মুস্তফীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার সন্দেহ। মুশৌরীতে বহু লোক তামাশা করতে আসে। মুস্তফীর আচরণ একটা প্রকাণ্ড রকম তামাশা বলেই বোধ হচ্ছে। কি সে চায় মালতীর কাছ থেকে? ভাড়াটে সেবিকার প্রতি এতটা দরদ খুব অস্বাভাবিক নয় কি?

একটা পুরো সপ্তাহ কেটেছে মুস্তফীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। আজ সন্ধ্যার মুখে সে যখন তার সাপ্তাহিক ছুটির দিনের সন্ধ্যা কাটাতে আবার ক্লেটিং ক্লাবে যায়, ভয় ছিল হয়তো সেখানে আবার মুস্তফীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সেদিন তো তার বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে মালতী

নাজেহাল হয়ে যায়। মুস্তফী অবশ্য হেসে তাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে দিয়েছিলেন—আই অ্যাম্ অ্যান্ ওল্ড্ আঙ্কেল ফ্রম্ ক্যালকাটা। কিন্তু কলকাতার এই বুড়ো সম্বন্ধে যে সব ফেরা হয় এবং যে সব সহান্ত টিপ্পনী শুনতে হয় মালতীকে তাতে দ্বিতীয় বার এখানে তাঁর দর্শন সে মোটেই কাম্য মনে করে না।

ফেটিং পেয়ে একাই বাড়ী ফিরছে মালতী। বন্ধুদের অনেকে এখনও রয়ে গিয়েছে। তাদের বয়-বেয়ারা তাদের খাদ্যপানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করছে। মালতী তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে। দু'একটি ছেলে তার প্রতিও বিশেষ খাতির দেখাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু মালতী মোটেই আমল দেয়নি। ওরা মজার খোঁজে এসেছে মুশৌরীতে, মজা করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

ম্যাল রোড ধরে পূব দিকে এগিয়ে চলেছে মালতী। জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে সুন্দর পাহাড় ও অরণ্য। পথের মসৃণ পিচের ওপর চকচক করছে। বাড়ির ছাদে, গাছের পাতায় রূপোলী রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে যেন। দক্ষিণে অনন্ত বিস্তৃত খাদ যেন জ্যোৎস্নার রহস্যময় সমুদ্র। তার মধ্যে দেরাদুন শহরের ক্ষীণ আলোর শিখাগুলি যেন জাহাজের জানালা থেকে বেরিয়ে আসা আলোর সারি। মুশৌরী শহর নিজের মায়ায় মালতীর মন বহুদিন হলো মুগ্ধ করেছে। এর আকর্ষণ ছাড়ানো কি সহজ কথা? আশ্চর্য রকম বুকে নেবার ক্ষমতা মিঃ মুস্তফী—সহসা বুকটা ধস্ ক'রে উঠল মালতীর। হ্যাক্-ম্যান্স্ হোটেল থেকে একটু এগিয়ে ম্যাল্ রোড থেকে কুলরী বাজার যাবার যে শর্ট কাটটা উপরের দিকে উঠে গেছে, সে রাস্তায় তার মাত্র গজ পাঁচেক দূরে একটা চেনামুখিকে এদিকে আসিয়ে আসতে দেখা গেল। সম্ভব হলে মালতী এ রাস্তায় না গিয়ে সোজা ম্যাল্ রোড ধ'রে হাঁটা দিত, তা হোক অংশটা জনবিরল। কিন্তু তার উপায় ছিল না। দু'তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই মুস্তফী খুব কাছাকাছি এসে গেলেন। পলকে চিনে নিয়ে বললেন, 'আরে মালতী নাকি?.....'

'হাঁ জী।...সেদিন আপনার পার্টিতে যেতে পারিনি। হঠাৎ জরুরি - মালতী তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলে।

'ঠিক আছে। ফেটিং থেকে ফিরছ! আমি ভাবছিলাম, একবার ওখানটায় চুঁ মেরে যাব। পরও চলে যাচ্ছি। ভাবছিলাম, একবার দেখা হলে মন্দ হয় না। তোমাকে নিয়ে একটা নিবিড় ইচ্ছা মনে উঠেছিল। সেদিক থেকেও তুমি খুব নিকট জন।...সরাসরি ম্যাল্ ধরেই যাচ্ছিলে মনে হলো। চলো, কুলরী বাজারের মোড় পর্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। আর কোনও দিন হয়তো দেখাই হবে না.....'

মালতী বলতে পারলে না যে, একটু রাত হলে সর্বদাই সে ম্যাল্-এর ঐ অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশটা এড়িয়ে চলে। মুস্তফীর পাশে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল।

'পুরুষের থেকে মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান অনেক বেশি থাকে।' মুস্তফী পুরুষদের নির্বুদ্ধিতায় যেন একটু আমোদ বোধ করে বললেন। 'তুমি সেদিন পার্টিতে যাও নি, ভালই করেছ। আমি তো ভেবে রেখেছিলাম, তোমাকে হোস্টেস বানিয়ে দেব। বলব, এ আমার মেয়ে বা ভাগ্নী। দু'একজনকে এই মেয়ে বা ভাগিনেয়ীর অস্তিত্ব এবং সহসা মুশৌরী আগমন সম্বন্ধে আভাসও দিয়েছিলাম। কিন্তু যা খেলা শুরু হলো, তার জবাব দিতে হিম্‌সিম্ খাবার উপক্রম। পরিচয়টা পরিচিতজনের মধ্যে ছড়াতে গেলে যে কি বিপদে পড়তে হবে, তা সহজেই অনুমান করা গেল। তাছাড়া তোমার আমার

উভয়ের চেনা লোক একেবারেই নেই তা তো নয়। এই ধর ডা. দ্বিবেদী আছেন, কালপাতালে যে দু'একজন বন্ধু দেখতে যেত তারা আছেন……'

একটু থামলেন মুস্তফী। একবার তাকালেন নীরব মালতীর মুখের দিকে, দেরাদুনের আলোক-মালার দিকে। তারপর গলা সাফ ক'রে বললেন, 'একটা সুন্দর স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলাম, কিন্তু রিয়ালিটিস-এর সঙ্গে তার সঙ্গতি করতে গিয়েই একটা তালগোল পাকিয়ে তুলেছি। অসুস্থ অবস্থায় দুর্বল শরীর ও মন হঠাৎ যেন এক নিজের জন আবিষ্কার ক'রে ফেলল। কিন্তু কে সে? কি আত্মীয়তা তার সঙ্গে? আমি ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তুমি তিরিশের বেশি নও। বয়সের দিক থেকে তুমি কন্যা হওয়ারই যোগ্য। সে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এটা একেবারেই স্বাভাবিক সম্বন্ধ হ'তো, একটা প্রকাণ্ড গোঁজামিল। রক্তের যেখানে সম্বন্ধ নেই, সেখানে এ ধরণের সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক হ'তে পারে না! যেটা স্বাভাবিক হ'তে পারত, সেটা মানতে বা দাবি করতে দ্বিধা করেছি। কত বয়সের তফাৎ তোমাতে আমাতে। তোমার বয়সী কোনও ছেলেকে তুমি ভালবাসবে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে এটাই শোভন ও সঙ্গত। যৌবন সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য! অনেক টাকা থাকলে অনেক আরাম হয়। কিন্তু প্রকৃত সুখের জন্য চাই অন্য জিনিস।……স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে এত সব ভাবতে পারিনি; স্বপ্নের ঘোরে মস্ত বড় বাড়ী কিনে ফেলেছি মুশৌরী পাহাড়ে, সে বাড়ীতে স্বপ্নের সংসার চালু করে দিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, পারিপার্শ্বিকের প্রতি সচেতন হয়ে উঠলাম…এই যে এসে পড়েছি। এই চড়াইটুকু আর ভাঙতে চাইনে, বুড়ো মানুষ, একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ি—আচ্ছা, গুড নাইট্, মালতী au revoir।…যদি কখনও টাকার বা অন্য সহায়তার দরকার হয় লিখো, আমার কলকাতার ঠিকানা জানই তো। আর মুশৌরীতেও আমার একটা বাড়ী রয়ে গেল। এখান থেকেও ঠিকানা সংগ্রহ হতে পারবে। আচ্ছা চলি…!' সহসা বিপরীত দিকে ফিরে অতিক্রান্ত পথ দিয়ে চলতে শুরু করলেন মুস্তফী। কতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল মালতী। কিছু বলবার চেষ্টা করল—'যদি কখনও সেবা করার লোক দরকার হয়। আমাকে ডেকে পাঠাবেন—এই ধরণের কিছু বলা সঙ্গত হবে কিনা স্থির করতে পারল না। ইতিমধ্যে গোনার বাইরে চলে গিয়েছেন মুস্তফী সাহেব। জ্যোৎস্নালিপ্ত রাস্তায় অনেকটা ঘুরে তাঁর মূর্তি ক্রমে আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে……'

এই সব কথাই মালতীর স্মৃতিতে ভিড় করে এলো। যাঁর উদ্বেগ সম্বন্ধে একদা সে বিশেষ সন্দিহান হয়ে উঠেছিল, যার আপনজন আবিষ্কারের কথাটাকে সে মূল্য দেয়নি। যার স্বপ্নাবেশ তার কাছে মিথ্যা সহানুভূতি ভিক্ষা করেছে, আজ তাঁর কাছে হঠাৎ যেন অপরাধী বোধ হলো নিজেকে। এখনও তার বিয়ে হয়নি, সে কাউকে ভালবাসেনা, কোনও পুরুষ তাকে ভালোবাসেনা। কি ক্ষতি হতো যদি সে এক আর্তমানুষের সুখের জন্য নিজেকে নিবেদন ক'রে দিত?

প্রকৃত ভদ্র মানুষ ছিলেন মুস্তফী সাহেব। নিজের চাওয়ার বিশ্বস্ততা তাঁকেই লজ্জা দিয়েছে। তাই জোর করে, এমন কি খুব স্পষ্ট করেও তিনি তাঁর দাবি জানাননি। আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে ছিলেন মাত্র। কোনও সাড়া না পেয়ে বিদায় হয়ে গিয়েছেন কোনও রকম অবরদস্তি না করে। কিন্তু তাঁর চাওয়াটা যে মেকী ছিল না, তা অতিশয় স্পষ্ট করে আজ প্রমাণিত করে গেলেন।

সহসা মালতীর দু'চোখ ফেটে দরদর ক'রে একরাশ মুক্তোর মত অশ্রু সামনে মেলা চিঠিটার ওপর ঝরে পড়ল। যেন কুটীতে ঝাপসা করিডর দিয়ে টলতে টলতে ছুটে পালাল মাস' মালতী বোস।

বোরোলীন

সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন ক্রীম

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

স্কচ

স্কচ। নামটি শুনে সুরসিক একটু ঠোঁটটা বাঁকিয়ে হাসবেন। আর সুরারসিক চুলুচুলু চোখে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু চেটে নেবেন। সুরসিকের কাছে স্কচ বলতেই স্কচম্যান আর স্কচম্যান মানেই এক তন্যুম মজাদার গল্প। সুরারসিকের কাছে স্কচ বলতেই এক গেলাস জলের সাথে একটি ছটাক হুইসকি।

ইংলণ্ডে গিয়ে আমার কোন স্কচের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আর সব দেশের লোক দেখেছি ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইতালিয়ান, নিগ্রো, সিলেটি, কিন্তু স্কচ একজনকেও দেখিনি। অথবা দেখেছি চিনতে পারেনি। কি করেই বা চিনব। স্কচরাও ইংরেজি বলে। কোট প্যান্ট পরে।

শেষে না পেরে ফারুকিকে গিয়ে ধরলাম। ফারুক সাহেব আমাকে একজন স্কচম্যান দেখিয়ে দিতে পার?

ফারুকি গম্ভীর হয়ে বলল: আমাকে যদি একজন হাড়কেপ্পন লোক দেখিয়ে দাও তাহলে তোমাকে একজন স্কচম্যান দেখিয়ে দোব।

আমি বললাম: এই তো একজন হাড়কেপ্পন তুমি আমার সামনে বসে আছ। তুমি শুধু স্টাওউইচ্ দিয়ে টিফিন সার, তাড়া বেশী বলে কখন বাসে চড় না, টিপ্‌স্ দেওয়ার ভয়েতে কখনও সেলফ সার্ভিস রেস্তোরাঁ ছাড়া কদাচ অন্য কোথাও ঢোক না।

ফারুকি কুপিত হয়ে বলল, আরে বেতমিজ, আমাকে যে কেপ্পন বলে সে কখনও কেপ্পন চোখে দেখেনি। আমি স্টাওউইচ্ দিয়ে লাঞ্চ সারি তার কারণ স্টাওউইচ্ খুব উপকারী। বাসে চড়ি না এই কারণে যে বাস আসতে আসতে পেট হাড়ি মজিয়ে যাবে। আর যে রেস্টুরেন্টে আপনা হাত জগন্নাথ নয়, সেখানে ওয়েটারের আশায় এক ঘুম বসে থাকতে হয়। মনে নেই, মহারাজা রেস্টুরেন্টে কি হয়েছিল?

আমি বললাম: চাচা, আমি তামাশা করছিলুম। তোমার মত দিলদার আদমি খোদ পাকিস্তানে আর ক'টি আছে?

ফারুকি খুব গ্লাড হয়ে বলল: তাহলে বলছ! শোন তুমি স্কচম্যান দেখতে চেয়েছিলে না। এক স্কচের গল্প শোন। এর আগের বার ইংলণ্ড এসে আলাপ হয়েছিল এক স্কচের সঙ্গে। ছোকরা বড় ভালোবের জর্নলিস্ট। আমার পিছনে আঠার মত লেগে থাকল। ইস্কাবদার মীরজা সাহেব সবে ইংলণ্ডে এসে উঠেছেন। পাকিস্তানে আমুবের নয়াজমানা। মিরজা সাহেবের সঙ্গে আমার এককালে খুব দহরম মহরম ছিল। ছোকরা এটা জানতে চায়, ওটা জানতে চায়। আমো মুখ খুলছি না। আমাকে বলেছিল, তোমার আচ্ছা স্কচ রান্না খাওয়াব। সেই আশায় আমিও ওর সঙ্গ ছাড়ছি না।

এদিকে দেখে ফিরে যাবার সময় এসে গেল। ছোকরা আর হাউদের নাম করে না। দু'চারটে খবরও ইতিমধ্যে বার করে নিয়েছে। যাবার দু'দিন আগে বলছে, মিঃ কাফকি কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি কি করছ?

আমি বললাম: তুমি তো জানই, টমসন সাহেব পার্টি দিয়েছেন। যেতে হবে।

পরশু।

পরশু বিকেলেই আমার প্লেন।

ছোকরা মুখের ভাবখানা এমন করল যেন কিছু বাধা ধরেছে। করুণ মুখে বলল: ওহ্ হোয়াট এ পিটি? পরশু যে তোমাকে আমার বাড়িতে লাউঞ্চ দেব ঠিক করেছিলাম।

কাফকের এই গল্পটা প্রফুল্লবাবুকে করেছিলাম। প্রফুল্লবাবু সব শুনে বললেন: ও আপনারে একটা জোক দিছে। স্কচদের গল্প শোনতে চান তো আমারে জিগান।

আমি বললাম: জিগাইলাম।

প্রফুল্লবাবু বললেন: তাহলে শুনুন, এক স্কচম্যান সেবার ইংলিশ চ্যানেলে ডুবে যাচ্ছিল। একেবারে মাঝ দরিয়ায় যাকে বলে হাবুডুবু খাওয়া। একটি লোক এই অবস্থায় তাকে দেখে উদ্ধার করল।

ভদ্রলোকের স্ত্রীকে খবর দেওয়া হল। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। সব শুনে বললেন: এই লোকটা তোমার জীবন বাঁচিয়েছে ডারলিং। একে এক পাউণ্ড বকশীস দিয়ে দাও। ভদ্রলোক স্কচ অমনি তেড়ে উঠলেন: প্রাণ বাঁচিয়েছেন মানে? আমাকে যখন জল থেকে তুলল তখন তো আমি হাফ ডেড মানে অর্ধমৃত। এক পাউণ্ড নয় দশ শিলিং দাও ওকে।

স্কচদের সম্পর্কে এমনধারা রটনা কারা রাষ্ট্র করেছে জানি না। যতদূর মনে হয় ইংরেজরা। ইংরেজরা একটু নাক উঁচু। ভাবখানা এই আমরাই কুলীন। ওরা তাই ওয়েলশ, স্কচ আর আইরিশদের একটু করুণার চোখেই দেখে।

ইংরেজের কাছে স্কচেরা হল কৃপণ আর আইরিশরা ঝগড়াটে মাতাল, ওয়েলশরা কুঁদুটে। এরাও ইংরেজদের পেছে একহাত নিতে ছাড়ে না। তোমরা ইংলিশম্যানরা তোমরাও কি এমন লাট সাহেব হে! তোমরা তো দোকানদারের জাত। ব্যবসাটা ভাল বোঝ।

আমি একবার এক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: দাদা, আপনার বয়স কত?

ত্রিশ।

বিয়ে সাদি করেছেন?

না।

সে কী, ত্রিশ বছরেও বিয়ে করেন নি। ইংরেজরা তো কুড়ি পেরুলেই আজকাল বিয়ে করছে।

আইরিশম্যান আমাকে বললেন: ওরা তো মোটা তিনেক বিয়ে করে। তাই সুরু করে একটু আগে থেকেই।

এই ভদ্রলোক আমাকে ইংরেজদের সম্পর্কে আর একটা গল্প বলেছিলেন। এক ইংরেজ হকার একটা বাড়ির সামনে গিয়ে চিৎকার করছে: কিছু লাগবে নাকি সিগারেট, পেনসিল, পেন, প্লেট, কুড়ি……।

গিন্নীমা ছোতলা থেকে বললেন : তুমি অমন করে চেঁচিও না বাপু। আমার কিছু লাগবে না।

হকার সেকথা না শুনেই চেঁচাতে লাগল : নিন না, সেনসিল, সেন, প্রেট ...।

তুমি না গেলে আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব।

ইংরেজ হকার এতে উৎসাহিত হয়ে বলল : তাহলে একটা ফাইলিল নিন, গিন্নীমা। মাত্র ছ' সেনি।

স্কটম্যানদের প্রথম দেখলাম স্কটল্যাণ্ডে এসে। মুখেরা বেশ হাসিখুশী। ইংরেজদের মত গোমড়ামুখ নয়। আর হবে নাই বা কেন! হাজার হলেও স্কচ হুইসকির দেশ। 'বিগ দেশ মে হুইসকি বহুত হ্যায়।'

স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে লোক স্কচ হুইসকির কারখানা দেখতে গেলে বর্তে যায়। দুনিয়ার মুয়ায়সিকদের কাছে স্কটল্যাণ্ড হল তীর্থক্ষেত্র।

আমরা যেতেই স্কচ হুইসকি অ্যাসোসিয়েশন আমাদের নেমন্তন্ন করে ফেলল। একবার পায়ের ধুলো দিন স্যর। এতদিন শুধু শুনেছেন এবার স্বচক্ষে দেখে যান।

কাকুকি বলল ; ভোবা ভোবা। ওসব আমার চলেনা। অ্যাসোসিয়েশনের পি. আর. ও, বললেন : যদি না চলে তাহলে আপনি নয় নেবুলাসিই খাবেন। কিন্তু আমাদের স্কটল্যাণ্ডে এসে হুইসকির কারখানা না দেখে চলে যাবেন, এতে আমাদেরই অপমান।

আর সবাইতো এক পায়ে খাড়া। এডিনবরা থেকে বেশ ঘুরে একটা গ্রামের মধ্যে যাওয়া গেল। পাহাড়ের গায়ে বারলির ক্ষেত। আর পাহাড়ের গা বেঁসে ঝরণা। ঝরিণের চোখের মত চকচকে জল। কিন্তু লোকেরা বলেন, এই জল খেলেই নাকি চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে।

বড় এক বোতল ধরতে ইচ্ছে যায়। এই জলই হল স্কচ হুইসকির সিক্রেট।

স্কটল্যাণ্ডের পুবে ডানডি থেকে পশ্চিমে গ্রীনক পর্যন্ত বহু ডিসটিলারি আছে। অনেক ডিসটিলারির নিজস্ব বারলি ক্ষেত আছে। এই বারলি থেকেই হুইসকি তৈরী হয়।

এসমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া। মদ নিয়ে আমার কারবার। মদাগমে ইনটারেষ্ট নেই। তবে ডিসটিলারির ম্যানেজার মিঃ ফেরারসন আমাকে বললেন : হুইসকির আসল তত্ত্ব হল ব্লেণ্ডিং। ল্যাবরেটরিতে অভিজ্ঞ ব্লেণ্ডাররা বসে বসে কাজ করছেন। এঁদের ওপরেই এক একটি কোম্পানীর নাম নির্ভর করছে। তবে ব্লেণ্ডারদের এক কোটা হুইসকি জিভে ঠেকানো গুণাহ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এঁরা এক একজন ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ বিশেষ রসে ঘ্রাণ গ্রহণ করেন। অবশ্য ঘ্রাণে যদি অর্ধভোজন হয় তাহলে আলাদা কথা।

তবে পুরনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, আমার তাবৎ কথা যেমন পুরনো হলেই খাঁটি হয় তেমনি হুইসকি পুরনো না হলে নাকি নেশা জমেনা। তিনবছরের আগে কোন বোতল খোলা বারণ। আট দশ বছর হলে খুবই ভাল। পঞ্চাশ বছরের পুরনো হুইসকি যদি যোগাড় করতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে মাল সবচেয়ে সরেশ হয়েছে।

দুনিয়ার লোক স্কচ বলতে পাগল। হবে নাইবা কেন। পাঁচশ বছরের শিক্ষা। আঠারো শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অবশ্য হুইসকি চোলাই করতে হলে লাইসেন্স লাগত না। লাইসেন্স হল

এই বছর আর ১৮২২ সালের ১৫ই আগষ্ট সম্রাট চতুর্থ জর্জ স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে এলেন। সে সময় স্যার ওয়ালটার স্কট বেঁচে।

এডিনবরাতে ব্যাগপাইপ বাজিয়ে সম্রাটকে স্কচেরা এক কথায় পানীয় খাওয়ান। গ্যালিক ভাষায় এর অর্থ হল জীবন পানীয়। সম্রাটকে বলা হল, উয়েস্ক একিবেন্সি, এই হল আমাদের জাতীয় পানীয়। নাম এর হুইস্কি।

সম্রাট চুক চুক করে খেলেন। তাঁর মনে হল, তিনি যেন দুনিয়ায় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেলমুতে এসে পৌঁছেছেন। দিলটা যেন ফুলের মত হাওয়ায় দুরদুর করে উড়ছে। উনি বলে উঠলেন: চোকা! স্যর ওয়ালটার স্কট বললেন: একসেলেন্ট! সম্রাট তাঁকে বললেন: এখন বোঝা যাচ্ছে তুমি অমন সুন্দর নভেল কি করে লেখ।

এবার তিন হুই হুইস্কির গৌরবের দিন। তারপর এমন ইজ্জৎ বাড়ল স্কচের যে একটা কোম্পানী নামই দিয়ে দিল—ফিং জর্জ ফোর।

আজও কি দারুণ বিক্রি। কি বছর ১ কোটি ১০ লক্ষ বোতল ফিং জর্জ ফোর বিক্রী হয়।

স্কচের রাজধানী এডিনবরা শহরটাও বড় চমৎকার। তবে গ্লাসগো আমার ভাল লাগেনি। বড় ঘিঞ্জি। দেখার মধ্যে একটি হল ট্রাম। যতদূর মনে পড়ছে বৃটেনে এখন একমাত্র গ্লাসগোতেই ট্রাম

আছে। তাও শিবপুরের মত ছোট ট্রাম। আর আছে ক্রাইড বলে শহরের মাঝখানে একটি ছোট নদী।

এর চেয়ে এডিনবরা শত গুণে ভাল। বেশ ছিমছাম শহর। চওড়া রাস্তা। বড় বড় পার্ক।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডের তুলনা হয় না। বিশেষ করে লখ কাটিন ও লখ লঙ-এর দৃশ্য অপূর্ব। পাহাড় আর হ্রদ একসাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুইজারল্যাণ্ডের লোকে অত গুণগান গায়। আমি তাঁদের বলি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড কোন অংশেই কম যায় না।

এই পাহাড়েই গ্যালিক ভাষায় একটি বড় মেয়েকে গান গাইতে আর ফসল কাটতে দেখে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওর্থ 'সলিটারি রিপেয়ার' লিখেছিলেন।

এমনিতে সুন্দর দেশ। সুন্দর লোকজন। স্পোর্টস্‌ম্যানের দেশ। লোকে বলে খেলাধুলোটা স্কচদের কাছে ধর্মের মত। জীবনের অঙ্গ। সাহিত্যে স্কচদের গর্ব করার মত একজন সুইফট না থাক একজন স্টিভেনসন আছে। একজন শেকস্‌পীয়র না থাক, একজন ওয়ালটার স্কট আছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্কচরা কোন দিকেই পিছিয়ে নেই।

কিন্তু তবু স্কচদের কৃপণ বদনাম ঘুচল না। স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কে একটি সরকারী বইতে লেখা হয়েছে, স্কচদের মন খুব সংকীর্ণ বলে বলা হয়। সম্ভবতঃ রাজা ষষ্ঠ জেমস যখন রাজা হন তখন খুব একটা প্রীতিজনক করেননি বলে মনে হয় তখন থেকে কথাটা উঠেছে। এ যুগে স্যর হ্যারিলডারও এই অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমরা বলতে পারি স্কচেরা মনের দিক থেকে বা সম্পদের দিক থেকে চিরকালই প্রতিভাশালী। ইতিহাস থেকে আমরা এর ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারি।

স্কটল্যাণ্ড থেকে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিলেন মিঃ ডোনালড বলে একজন ভদ্রলোক।

কাফকি আমায় প্লেনে উঠে চুপি চুপি বলল : ইয়ার একটা জিনিস লক্ষ্য করলে ?

আমি বললাম : কী ?

মিঃ ডোনালডের মুখে একমুখ দাড়ি ছিল।

বললাম : তাতে কি ? দাড়ি রাখা যে কোন মানুষেরই মৌলিক অধিকার। সিটার বি শেভ তো আর নেই।

কাফকি বলল : না, একটা গল্প মনে পড়ে গেল কি-না।

কী গল্প ?

দুই স্কচ বন্ধুর দেখা হয়েছে অনেকদিন পর। প্রায় বারো বছর পর। একজন দেখল আর এক বন্ধুর মুখে দাড়ির জঙ্গল।

বন্ধু বলল : সেকী, তুমি না দাড়ি অপছন্দ করতে—

বন্ধু বলল : কী করব, বারী তো তুমিই। তোমার বাড়িতে বছর বারো আগে আমার সেভিংসেটটা ফেলে গিয়েছি যে।

কাফকি বলল : স্কচের দাড়ি দেখলে গল্পটা মনে পড়ে যায়। বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

I CAME, I SAW, I EMBRACED

HINDALCO

EXTRUSIONS

... and why not ?
They stand out in quality, economy and versatility. For — bus-bodies, structural or decorative components in rail coaches, automobiles or aircraft... window-frames, modern shop fronts, tubular furniture, transmission towers, bus-bars, tubing... trim, frames and panels of refrigerators and air-conditioners...or for almost anything else — Hindalco Aluminium Extrusions can do a better job, with less metal, less bother, longer service life and cheaper (final) cost.

HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION LTD.

PRINCIPAL SALES & MARKETING OFFICE
P.O. Renukoot, Dt. Mirzapur, U.P.
Phone : PIPRI 78 Gram : HINDALCO

ZONAL SALES OFFICES :

CALCUTTA & EASTERN ZONE : 5, Clive Row, Calcutta-1 (Phones 22-8618/8, Gram : HINDALCORP).
BOMBAY & WESTERN ZONE : (Also Regd. Office) Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1 (Phones : 24-5181/3, Gram : HINDULCOR).
DELHI & NORTHERN ZONE : D-57, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-3 (Phone : 77270, Gram : ALMINDCORP).
MADRAS & SOUTHERN ZONE : 10, Second Main Road, C.I.T. Colony, Madras 4 (Phone : 74470, Gram : HINDALCORP).

রূপকথার মতো

নীলিমা ইব্রাহিম

সামান্য তফাৎ থেকে রঘু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, "দিদিমণি ঐ যে 'বোস-পার্ক'।" বোস-পার্ক, পার্ক নয়, লাগোয়া এভিনিউর সবচেয়ে নামকরা বাড়ি। ব্যারিষ্টার এ. বোসের বাড়ি। রঘু অবশ্য তার সাধ্যমতো রাজপ্রাসাদোপম বোস পার্কের বর্ণনা দিয়েছিলো এবং বিরক্ত করতে চেয়েছিলো দীপা দিদিমণিকে। বয়স লাগোয়ে দীপাদিদি রাজকন্যের মতো ছিলো, সে কথা আলাদা। অধ্যাপক চন্দ্রকে চিনতো না কে? তাঁর মেয়ের যদৃচ্ছ অবাধগতি ছিলো, কিন্তু এখন কী তা চলে?···দুবেলা পেটভরে আহার জোটে না। নগ্ন দারিদ্র্যের ছাপ চোখে মুখে, বেশে বাসে।

দীপা চোখ তুলে তাকালো। বনেদি আভিজাত্যের গরিমায় ঝলমল করছে বোস পার্ক।

দারোয়ান সেওনন্দন বাধা দিলো।

"এখন দেখা হবে না। সাহেব জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন—"

জরুরী কাজ মানে খেলা। খেলায় ব্যস্ত। টেনিস খেলা চলছে ভেতরের লনে।

দীপা কাতরস্বরে বললো, "পাঁচ মিনিটের জন্য বোস সাহেবকে খবর দাও, আমার কাজ আরো অনেক জরুরী—"

সেওনন্দনের সোল্লাকুচি চোখ আরো গোল হলো।—এমন পোষাকের কোনো মেয়ে এমন কাতরস্বরে আবেদন করতে পারে নাকি বোস-পার্কের দারোয়ানকে! তবে সেওনন্দনের বয়েস হয়েছে, মানুষ দেখে দেখে অভিজ্ঞতাও নেহাৎ কম হয়নি। বার তিনেক দীপার আপাদমস্তক দেখে শেষে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, "আসুন—"

বোস-পার্কে ড্রইংরুম তিনটে। একটি ড্রইংরুম অবশ্য আজকাল আর ব্যবহার হয় না। ব্যারিষ্টার বোসের মৃত্যুর পর ওটা প্রায় বন্ধই থাকে। এক ঝাড়পোছ করার জন্য মাঝে মাঝে খোলা হয়, আর দুটির একটি মিসেস বোসের, আর একটি জুনিয়র বোসের।

তাছাড়া সামনের গোল চাকা বারান্দায় আছে এক সেট বেতের সোফাসেটি। অকুলীন মানুষরা ওখানে বসে অপেক্ষা করে। সেওনন্দন জুনিয়র বোসের ড্রইংরুমে দীপাকে বসিয়ে, তখন পড়ন্তবেলা, সমগোত্রীয়া কেউ হলে ব্যস্ত হাতে লাইট জ্বালিয়ে, ফ্যান চালিয়ে ভেতরে ঢুকতো দারোয়ান। সে সবের প্রয়োজনই মনে করলো না। ভেতরে বেয়ারাকে সমাচার দিয়ে সেওনন্দন গেটে ফিরে গেলো।

এক সেট খেলা হবার পর কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে লন চেয়ারে বসেছে সবাই। নানারঙ্গে ঝকমকে আসর তখন। হাসি উচ্ছ্বাসের মাতামাতি। সরু সুর্মাটানা চোখের কটাক্ষ এপাশে ওপাশে। এর মধ্যে বেয়ারা বাহাদুর এসে অনিন্দ্যকে খবর দিলো,—পাঁচ মিনিটের জন্য কে একজন মহিলা দেখা করতে চাইছে, বলছে, জরুরী প্রয়োজন।

অনন্তোষের আঁচড় পড়লো মুখে।—আলোটন···কোন ছাড়া, কার্ড ছাড়া এমন সময় আবার কে এলো!···ঘরে একপাল বিরক্তির আগুন ছড়িয়ে অনিন্দ্য চেয়ার ঠেলে উঠলো।

দুইকদম পা দিয়ে সে বিরক্তি পুরু হলো আরো। নিরাভরণা, ম্যাটমেটে সুতীর শাড়ি পরা একটি মেয়ে সোফার সমস্ত শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে কেমন করে বসেছে আখো!···একে বারান্দায় না বসিয়ে ঘরে কেন বসানো হয়েছে!···দেখেই মালুম, সাহায্য চাইতে এসেছে। পুরুষ হলে দাবড়ানিই খেতো, মেয়ে—

"কী চাই?" ঠিক যেন ব্যারিষ্টার ঘোষের মেজাজ অনিন্দ্যের গলায় উঠে এলো। ঘরের একটা আলো জ্বালিয়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে ওলো।

"কিছু চাই না—" হাত জোড় করে নমস্কার জানালো দীপা, চিবুক তুলে সোজাসুজি অনিন্দ্যর দিকে তাকালো, "আপনি মিঃ ঘোষ? অনিন্দ্য ঘোষ?" মেয়েটির অটুট সহজতায় সবিস্ময় দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হতবাক হলো অনিন্দ্য। চোখ ফেরানো যায় না এমনি আশ্চর্য রূপ। অনিন্দ্য নমস্কার ফিরিয়ে দিতে তো ভুলে গেলোই, জবাব দিতেও।

—পারিপাট্যবিহীন মামুলি পোষাকে এ কোন অপ্সরার আজ আবির্ভাব হলো ঘোষ-পার্কে? যেন দুঃখ কমলিনী!··প্রসাধন ছাড়া যদি এমন, সাজলে এ মেয়েকে কেমন দেখাবে?·· ছাই রঙা শাড়ির ভেতর দিয়ে যেন শরীরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দরিদ্র যে সন্দেহ নেই তাতে। খুবই দরিদ্র। অভাবের আঁচড় সর্ব অবয়বে। বনপ্রান্তরে-হারানো আয়ত দুটি কাজল-আঁখির তলায় কালি ভেসে উঠেছে। মুখও শুকনো ক্যাকাসে। কিন্তু শরীরের বাঁকে, বলার ভঙ্গিমায়, দৃষ্টির নির্লিপ্ততায় যেন সম্রাজ্ঞীর সম্ভ্রান্ততা। অনিন্দ্য ঘোষকে দেখেও যখন উঠে দাঁড়ালো না, তখন ভিক্ষে চাইতে আসেনি তা ঠিক···।

ঘরের বাকী তিনটে আলো জ্বললো, ফ্যান চললো, ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস এনে, বিপরীত সোফায় বসে, অনিন্দ্য প্রশ্নময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো একটা, "হ্যাঁ, আমি অনিন্দ্য ঘোষ।"

দীপার বাঁ-হাতটা আঁচলের তলায় ছিলো। হাতে ধরা ছিলো মেরুণ রঙের একটি মোটা ডাইরি। ডাইরিখানা এগিয়ে ধরলো অনিন্দ্যর সামনে, "এটি আপনার নিশ্চয়ই?"

অনিন্দ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একমুহূর্ত ভাবলো।—বহু পুরোনো ডাইরিখানা মেয়েটির কাছে কেমন করে গেলো সেটা এখন প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে—ডাইরিখানা যে ওর সেটা অনিন্দ্য স্বীকার করবে কিনা·· অস্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে···ওটার মধ্যে কী লেখা আছে কে জানে···। বছর চার পাঁচ আগে, ডাইরি লেখা ওর একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিলো। বেশ কিছুকাল লিখেছিলো নিয়ম করে। ওর লেখা দশ বারোটা ডাইরি তো আছেই, তার বেশীও হতে পারে।

দিন দশেক আগে ঘোষ-পার্কের বাং ফেরানো হয়েছে। ওর ঘর ডিস্‌টেম্পার করার সময় ওর কম-বেয়ারাকে অনিন্দ্য আদেশ দিয়েছিলো,—যা কিছু কাগজপত্র এখন টেবিলের ওপরে রয়েছে, সব কুঁচিয়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই বেয়ারা ব্যাটা না পুড়িয়ে সে সব কাগজপত্তর বিক্রী করেছে···কাগজের সঙ্গে ওদ্ধের ম্যাগাজিন ছিলো—এই ডাইরিটা হয়তো সেই ম্যাগাজিনগুলির ভেতরেই ছিলো···কিন্তু মেয়েটির কাছে গেলো কেমন করে? যাক সে—

—এ ডাইরি আমার নয়—কথাটা অনিন্দ্যর ঠোঁটের প্রান্তে এসে ঝুলে রইলো। দীপা ঠিক

সেই মুহূর্তে বললো, "ভাগ্যিস ডাইরির প্রথমে ঠিকানাটা ছিলো, না হলে টাকাগুলি নিয়ে কী মুস্কিলেই যে—"

"টাকা!"

"হাঁা, পাঁচশো টাকা। ডাইরির পেছনের পকেটে কতগুলি কাগজের ভাঁজে একটা খামের ভেতরে ছিলো।" পাঁচশো একশো টাকার নোট সমেত একটা খরিদ্রাভ খাম দীপা তার ব্যাগের ভেতর থেকে বার করে অনিন্দ্যর হাতে দিলো। হাসিমুখে বললো, "যে-খেয়ালে রেখে ভুলে গেছেন আর কি, পরে যখন মনে পড়তো তখন খুঁজে পেতেন না—"

পরেও যে আর মনে পড়তো না, সে কথা অনিন্দ্য উচ্চারণ করলোনা। বাবার জীবিতকালে হাতখরচা বাবদ এত অঢেল টাকা পেতো অনিন্দ্য, সব টাকার হিসেব রাখা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

অনিন্দ্য আবিষ্ট, অনিন্দ্য হতবাক, অনিন্দ্য অভিভূত। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এতই অভাবিত, সাময়িক ভারসাম্য বুঝি হারিয়ে ফেললো অনিন্দ্য। না হলে সহজ শিষ্টাচারটুকুও ভুললো কী করে? ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেলো। ও কেবল ভাবছে, যে এত দরিদ্র, তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো এই পাঁচশো টাকা হাতে পেয়েও ফেরৎ দেওয়া! দুরন্ত অভাবেও অর্থকে এমন উপেক্ষা করার শক্তি পেল কোথায় এ মেয়ে! দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটনকে এভাবে হেলায় পরাজিত করলো কী করে!…

অনিন্দ্যর চট্‌কা ভাংলো দীপার উঠে দাঁড়ানোতে। "বসুন…বসুন…, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করবোনা…অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটা যদি—" দীপা হেসে ফেললো ঝর ঝর করে। বোধহয় বোস-পার্কের ভূমিয়র বোসের অবমনীয় ভঙ্গির রূপান্তর দেখে। বললো, "আমাদের ঠিকানা নেই। ঠিকানা কোথায় পাবো?…" অনিন্দ্যর কেমন একরকম দিশাহারা মুখের চেহারা দেখে দীপা আবার শব্দ করে হেসে ফেললো।

দীপার মনের অনাবৃত প্রকাশ দেখতে পেলো অনিন্দ্য সে হাসিতে। সুন্দর, স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় …যেন সহস্র ফুলের সৌরভ মাখানো দীপার হাসিটুকু। আর নতুন করে নজরে পড়লো দীপার চোখের দৃষ্টি, আত্মবিশ্বাসের তেজ নিয়ে চোখের দ্যুতি যেন হীরে হয়ে জ্বলছে।

এরপর অনিন্দ্য বোস একটা কাণ্ডই করলো। প্রায় পথরোধ করে দাঁড়ালো দীপার। যাচিত মিষ্টি স্বরে বললো, "একটু চা খেয়ে যান খুব খুশি হবো—"

দীপা বসলো।

বেল টিপে বেয়ারাকে না ডেকে, অনিন্দ্য নিজেই ভেতরে এলো। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট জল-খাবারের ফরমাস দিয়ে ফিরে এলো দুইংরুমে।

ঘর খালি। কেউ নেই।

বাক্যস্ফূর্তি হয় না অনিন্দ্যর। কয়েক মুহূর্ত শুধু বিস্ময়ে কাটে।…মেয়েটি অদ্ভুত আশ্চর্য এমন একটা কিছু হঠাৎ ঘটিয়ে গেলো, যার প্রবল প্রভাব কিছুতেই এড়াতে পারছেনা ব্যারিষ্টার আদিত্য বোসের একমাত্র আত্মজ অনিন্দ্য বোস। যেন বোস পার্কের আভিজাত্যের উত্তুঙ্গ মজবুত প্রাচীরে দারী একটা ফাটল ধরিয়ে গেলো মেয়েটি।

আকস্মিক এই চেতনায় কয়েক মুহূর্ত অনিন্দ্য যেন নিষ্ফল, অবচ। তারপরই বয়কে দিয়ে

কোটটা আনিয়ে গায়ে চড়িয়ে নিলো। বয়কে বললো, টেনিস আসরে ওর খোঁজ পড়লে যেন বলে দেয় যেন—হঠাৎ বিশেষ একটা প্রয়োজনে বেরিয়ে গেছে।

বেণ্ডনক্সনের চোখের মনিদুটো ঘুরে গেলো। মুখে কোনো কথা সরছেনা।—ছোটোসাহেবকে সেটের বাইরে পায়ে হাঁটতে কবে কে দেখেছে!

বাস-স্টপেজটা রোস-পার্কের খুব দূরে নয়। মেয়েটিকে স্টপেজে দাঁড়ানো দেখতে পেলো অনিন্দ্য। পাশে দাঁড়ানো তামাটে চেহারার একটি পাহাড়ী ভৃত্য গোছের লোকের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে।

ন'নম্বর বাসের চাপাচাপি ভিড়েই মেয়েটি ঠেলাঠেলি করে উঠলো। সেই পাহাড়ী লোকটিও উঠলো পুরুষের দরজা দিয়ে। আর তার ঠিক পেছনেই উঠলো অনিন্দ্য আচ্ছন্ন অনুভূতি নিয়ে। জীবনে এই প্রথম বাসে ওঠা। বাসসমেতের ট্রাফিজি দারা অঙ্গ নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে করতে, অনিন্দ্যর যেন সেই মুহূর্তে অসীম শক্তিধর মনে হলো নিজেকে। মনে হলো ইচ্ছে করলে কী না পারে অনিন্দ্য বোস।

কয়েক পা একটা গলির ভেতরে ছোট্ট একটা একতলা বাড়িতে ঢুকে গেলো মেয়েটি।

অনিন্দ্য বাড়ির নম্বরটা দেখে ফিরলো। ফিরলো বিচিত্র একটা মন নিয়ে। ট্যাক্সি নিলো, সিগারেট ধরিয়ে শরীরটা ছেড়ে দিলো গাড়ির সিটে। সবটা ভাল লাগছে। নিজেকে ভাল লাগছে।

একমাস পর। শনিবার। এখন অপরাহ্ণ।

সুশ্রুষ্য, সৌম্য, সহাস্য আনন অধ্যাপক দেবেশ্বর চন্দের সামনে বসে একটি ঝকঝকে সুদর্শন যুবক হাসিমুখে আলাপচারি করছে। যুবকের নম্র ভঙ্গিতে এবং মুখের ভাবে মনে হচ্ছে, ও যেন কোনো সাধকের সামনে বসা। এবং সত্যিই তাই। অধ্যাপক চন্দ শুধু দর্শনে সুপণ্ডিত নন, তিনি একজন সাধক মানুষ।

সমগ্র জীবন ধরে দেবেশ্বর খুঁজেছেন সত্য—যার মাঝে সত্য আছে। আত্মার-আত্মারকার সাধনা করেছেন সারা জীবন। এমন নিরুদ্বেগ একটি প্রশান্তি ওঁকে ঘিরে আছে, সহস্র অভাবেও তাই ওঁর কোনো অভিযোগ নেই, অশান্তি নেই।

অধ্যাপক চন্দের প্রিয়তম ছাত্র বারীন মিত্র যুবকটির মামা। দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে ফিলোজফি পড়ান। তাঁর সূত্র ধরেই পরিচয় হয়েছে যুবকটির সঙ্গে, অভিজিৎ বোসের সঙ্গে।

আজ অভিজিৎ এসেছে অধ্যাপক চন্দের লেখা দর্শনের একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিতে। যে প্রকাশক বইখানি প্রকাশ করছেন, তিনি দুহাজার টাকা এ্যাডভান্স দিয়েছেন।

"দেখো অভিজিৎ—" ধীর ভাবগম্ভীর স্বর দেবেশ্বরের। "আমি জানতাম, ঈশ্বরের করুণার আলো আবার ঝরবে আমাদের মাথার ওপরে এ আমি জানতাম···তিনি মহিমাময়···। দুঃখ-দৈন্য-বাধা সব কিছুই ভগবানের দান বলে নিলে আমাদের শান্তির অভাব কখোনো হয়না"—একটুকাল চুপ থেকে দেবনাথন গলায় বললেন, "আজকের বেশীর ভাগ মানুষের এত অসহায়তা, এমন নৈরাশ্য বোধ কেন জানো? তাদের মনের চেহারা গেছে একেবারে বদলে। তারা জীবনের কেন্দ্র থেকে ভগবানকে সরিয়ে, মানুষকে বসিয়েছে সেখানে, যুক্তিকে বসিয়েছে সেখানে··, জীবনবোধও হারিয়েছে, বিশ্বাসও হারিয়েছে। তাই এত সমৃদ্ধির মধ্যেও তারা এমন অসহায়, এত অশান্তি তাদের—"

রঘু একটা থালায় ওপরে দুপেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু নোনতা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ছোটো একটা বেতবাঁধন কাঠের টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা ও বিস্কুটের প্লেট নামিয়ে রেখে চলে গেলো।

স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে রঘুর দিকে এক পলক তাকিয়ে দেবেশ্বর বললেন, "এই যে দেখছো রঘু সিং—" অভিজিৎকে চা খেতে বলে দেবেশ্বর চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন, "…এ আমাদের মস্ত সম্পদ, ঈশ্বরই মিলিয়ে দিয়েছেন ওকে। ওর বাবা যখন মারা গেলো, তখন বছর সবে দুয়েকের; ওর মা মারা গেছে তার কিছু আগে। কোনো কুলে কেউ নেই। রঘুর বাবা ছিলো আমাদের কলেজের দারোয়ান। দু'বছরের রঘুকে নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে। বন্ধুবান্ধব সকলেই বললে—পরের ঝঞ্ঝাট ঝুড়িয়ে কেউ বাড়িতে ঢোকায়?…কাজটা ভাল করলেনা তো—! আমার স্ত্রী কিন্তু দ্বিরুক্তি অনুযোগও করেনি, মুখ ভারও করেননি। নিজেই রঘুর দেখাশোনার সব ভার নিলেন…।

তারপর দেখো একবার ধাপ্পাবাজখানা, আমাদের চরম দুর্দিনে এই রঘুই আমাদের দু'বেলার অন্ন যোগালো। বেদনায় বিদ্ধ হলো দেবেশ্বরের কণ্ঠস্বর, "সময় মতো আসিনি বলে, শেষে দুরন্ত সংকট মুহূর্তে একবস্ত্রে লাহোর ছাড়লাম। একটা টিনের সুটকেসে এসে মাথা গুঁজলাম বাদবপুরে। টিনের চালটা ফাঁকোর, দামান্য বৃষ্টিতেই ঘর ভেসে যৈ যৈ…প্রথম রাতটাই কাটাতে পারলেন না দীপার মা, বিমুনিয়ায় ভুগে—" পলাটা পরিষ্কার করলেন দেবেশ্বর, "বিপদ যখন আসে একলা আসেনা, আমার দুটো পা-ই পঙ্গু হয়ে গেলো…একটা সক্ষম মানুষ ছ'বছর ধরে পঙ্গু হয়ে আছি বিছানায়—" দেবেশ্বর একটা নিশ্বাস টানলেন, "সেই অসহ পরিস্থিতিতে রঘুসিং আমাদের অন্ন যোগালো ভিক্ষা চালিয়ে…। বছর দেড়েক আগে, এক গ্রীষ্মের দুপুরে ভিক্ষা টানতে টানতে রঘুও হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো পথের মাঝে। মাথায় চোট পেয়েছিলো খুব, তিনদিন জ্ঞান ফেরেনি।

পাড়ার একজনকে সঙ্গী করে দীপাই গেলো হাসপাতালে। রঘু ভাল না হওয়া পর্যন্ত রোজই যেতো। ঐ হাসপাতালেই তারপর ডাক্তার সমরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা। আমাদের লাহোরের ছেলে। দীপা চিনেছে ঠিক। সেইদিনই এলো সমরেন্দ্র। তখুনি আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে তুলবে…এভাবে আমাদের আত্মগোপন করে থাকার জন্য অনুযোগ দিলো খুব…। ছাত্র তো সন্তানতুল্য, কিছুদিন তার বাড়িতে গিয়ে থাকলে ক্ষতিটা কী, কিন্তু দীপা কিছুতেই রাজি হলো না। আঠারো বছরের মেয়ের জিদের কাছে হার মানতে হলো আমাকে। সমরেন্দ্র তারপর কসুবার এই বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে—পঁচিশ টাকায় এমন বাড়ি পাওয়া অসম্ভব, আমার অনুমান এর মধ্যে সমরেন্দ্রর কিছু কারসাজি আছে—"

নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা নিয়েছিলো অভিজিৎ, হেসে ফেললো। হাসলেন দেবেশ্বরও। আগের কথার খেই টেনে বললেন, "সমরেন্দ্র নানাভাবে ঋণ করে নি আমাদের জন্য, এমনকি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে একটা আকসে বেশ ভাল মাইনেতে দীপাকে কাজ ঠিক করে দিয়েছিলো—তা মেয়েটার কী যে মতি, দশদিনের বেশী কাজ করলো না অফিসে…অথচ মুখের রক্ত উঠিয়ে ট্যুশনি করছে পাঁচটা—"

"কেন, অফিসে কাজ করলেন না কেন?" অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো।

"কী জানি…বস্-এর আচরণ দীপার নাকি ভাল লাগলো না। আমি বুঝিয়েছিলাম দীপাকে,

ঝুমকি-টুমকি বসু যদি দিয়েই থাকে, কী চোখরাঙিয়ে থাকে কাজের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য, ওতে মন খারাপ করতে নেই, ওতে কাজ শেখা—"

অভিজিৎ হো-হো করে হেসে ফেললো।

—ভদ্রলোক আপন-ভোলা মানুষ, বসু-এর আচরণ ভাল নয়—বুঝতে বুঝেছেন শুধু চোখ রাঙানোর কথা—

"হুঃ—" দেবেশ্বর স্মিত হেসে বললেন, "মেয়েটার একগুঁয়েমির জন্য আমার মাঝে মাঝে বেশ রাগই হয়, বুঝলে অভিজিৎ—আড়াইশো টাকা মাইনের কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন একশো টাকার জন্য পাঁচটা টুশানি করছে···এদিকে অবয়বতি রফুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, রিক্‌শাটানা কিছুতেই আর চলবে না তার—"

অভিজিৎ কী যেন ভাবছিলো, ভাবতে ভাবতেই বললো, "রঘু দারোয়ানের কাজ পেলে করবে?"

"কেন করবে না···সে তো খুবই ভাল কাজ, বেচারা অসভ্যা এখন পুরোনো কাগজ কিনে বাড়িতে বসে বসে ঠোঙা বানায়—"

"ও—" একটু বুঝি বা আনমনা হয়ে পড়লো অভিজিৎ।

"কিন্তু রঘু বাড়িতে না থাকলে আপনার হয়তো খুব অসুবিধে হবে—"

"কিছুমাত্র না—" দেবেশ্বর শেল্‌ফের ও তক্তোপোষের দিকে হাত প্রসারিত করে চারপাশের স্তূপীকৃত বই দেখালেন, "এই তো আমার সহায় সব রয়েছে—তাছাড়া সমরেন্দ্রর সময় চিকিৎসার আমি এখন লাঠিতে ভর দিয়ে একটু চলাফেরাও করতে পারি···এবার পা অপারেশনও করিয়ে নেবো, হাজার টাকাতেই সমরেন্দ্র সব ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে।"···দেবেশ্বর প্রাণখুলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

—ডাক্তার সমরেন্দ্রর বয়েস সম্বন্ধে কৌতূহলী প্রশ্নটা অভিজিৎ জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো ঠোঁটের প্রান্ত থেকে। সামান্য উস্‌খুস করে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার মেয়ে পড়াশুনো কতদূর করেছেন?"

"কোথায় আর পড়াশুনো হলো দীপার, রুগ্ন বাপের পরিচর্যা করে করেই অমূল্য সময়গুলো কেটে যাচ্ছে দীপার, আমার মনের ইচ্ছে মনেই রইলো—" মিষ্টি স্বরকে আড়ালে রাখার জন্য একটুকাল চুপ রইলেন দেবেশ্বর।

"তবুও যে দীপা আই. এ.টা পাশ করেছে—এও ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ বৈকি···কোনো পরীক্ষাতেই ফেল করে নি···এ দুঃখ—"

ঘড়িতে চোখ ফেলেই ত্রস্ত চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো অভিজিৎ। বললো, "আজকে চলি, আবার আসবো—"

তার পাঁচমিনিট পরেই ফিরলো দীপা।

"ইশ্···আর একটু যদি আগে আসতিস মা—"

"তাহলে তোমার প্রিয় ছাত্রের ভাল ভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো এই তো"—আঁচল তুলে কপালের বিনবিনে ঘাম মুছতে মুছতে বাপের পায়ের কাছে হাসিমুখে ধপ্ করে বসে পড়লো দীপা।

"দুষ্টুমী হচ্ছে, আমার ছাত্রের ভারে কেমন ভাল লাগে···" বালিশের তলা থেকে নোটের বাণ্ডিলটি টেনে বার করে মেয়ের হাতে দিলেন।

"এত টাকা!" দীপার চোখ প্রায় কপালে।

"হাঁ—" সমস্ত মুখ খুশিতে ভরিয়ে দেবেশ্বর বললেন "দু হাজার টাকা। আমার বইয়ের পাবলিশার এ্যাডভান্স দিয়েছে।"

"দু হাজার টাকা!"···ছেলেমানুষি উল্লাসে দীপা উচ্ছ্বসিত, "বাবা, এবার তোমার পা অপারেশন হবে, তুমি ভাল হয়ে যাবে, বাবা, তুমি ভাল হয়ে যাবে—" দুহাত বাড়িয়ে বাপের গলা আঁকড়ে ধরে দীপা চীৎকার করে উঠলো, "রঘুদা, রঘুদা—, শিগগির এসো, শুনে যাও ব্যাপারটা—"

তার পাঁচদিন পরে, দীপা সকালের দুটো ট্রাশনি সেরে ফিরতেই, রঘু সিং ছুটে এসে আহ্লাদে একেবারে ডগমগ হয়ে তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখালো—এ. বি. কার্ড ষ্টোরের ডিসেবে রঘু সিংকে নিযুক্ত করেছে, মাইনে ছেড়শো টাকা, তাছাড়া বোনাস আছে—"

"কী আশ্চর্য তাও!" দীপা মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকালো। দেখলো, মুখ উজ্জ্বল করে বাবা তাঁর দর্শন বইএর প্রুফ দেখছেন। বাবার মুখের এমন চেহারা দীপা যেন একযুগ পরে দেখলো।

দীর্ঘ গ্রীবায় সুন্দর একটি ভঙ্গি করে দীপা হেসে উঠলো, "বাবা, আমি ঠিক করে ফেলেছি—"

দেবেশ্বর প্রুফ থেকে চোখ তুললেন, "কী ঠিক করে ফেললি?"

"অধ্যাপনার লাইনেই আমি যাবো···বি. এ. আর এম. এ.টা আমাকে পাশ করতেই হবে এবং ভাল ভাবে—তারপর তোমার মতো ছাত্র পাবো, মানে ছাত্রী···ছাত্রীর ভরসাবান চমৎকার ভাষ্যও মিলতে পারে—"

"আবার দুষ্টুমী হচ্ছে—"

"না বাবা, একটুও দুষ্টুমী নয়", এখন দীপা একেবারে তার মনের কথা বলছে—

রঘু সিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পিতাপুত্রীর কথা শুনছিলো। এইবার একমুখ হেসে বললো, "দিদিমণি, আমিও মনে মনে তাই এঁচে রেখেছি, এবার তুমি কলেজে ভর্তি হবে।"

"ও, তুই এঁচে রেখে তো আমাকে একেবারে কৃতার্থ করে দিলি—তুই কী ভেবেছিস তোর টাকা খরচ করে আমি কলেজে পড়বো, তাই না?"

রঘু চুপসে গেলো। মিনমিনে গলায় বললো, "আমার টাকা খরচ করবে কেন, ধার নাও—"

"দাঁড়া, সবুর কর, তোর দু'বছরের টাকাগুলো দিয়ে নি আগে, তারপর আবার ধারের কথা ভাবা যাবে—"

আর আশ্চর্য! কত আশ্চর্য ঘটনাই যে ঘটে পৃথিবীতে—সেইদিনই দুপুরের কাঁ-কাঁ রোদ্দুরে দীপাদের বাড়িতে তুফা মেটাতে এলেন কিনা রাণী ভবানী কলেজের অধ্যক্ষা মিস মুখার্জি। গম্ভীর মুখ, গম্ভীর চোখ। অথচ চেহারায় এমন কিছু আছে, দেখা মাত্র মনে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। কোনো প্রয়োজনে অধ্যক্ষা এদিকে এসেছিলেন, হঠাৎ গাড়ির কল বিগড়েছে, ড্রাইভার আর উনি বসে থেকে থেকে শেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে এসেছেন দীপাদের বাড়িতে।

শুধু জল নয়, দীপার পীড়াপীড়িতে এক গেলাস ঘোলের সরবতও খেতে হলো মিস মুখার্জিকে।

অধ্যাপক চক্রের সঙ্গে এই গম্ভীর মানুষটির কিন্তু আলাপ করার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেলো। তথায় তথায় আলাপ ঘন হলো।

অধ্যক্ষা মুখার্জি দীপার পড়ার ব্যাপারে মস্ত একটা ভরসা দিলেন। বললেন, "আপনার মেয়েকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় ভাল করলে দীপার বি. এ. পড়তে কোন খরচই লাগবে না—পড়ারও না, থাকারও না। আমাদের কলেজটা রেসিডেন্সিয়াল। ছাত্রীদের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হয়··। আমরা একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এ কলেজ স্থাপন করেছি। দীপার দিকে চেয়ে মিস মুখার্জি সস্নেহে বললেন, "ভাল করে ভেবে ছাখো, বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো তুমি?"

দীপা তখন অন্তরের উদ্দাম দখিনা-বাতাসের ঝলক সামলাতে ব্যস্ত। হেসে হেসে বিদ্যাগ্রন্থের সঙ্গে বললো, "আগে পরীক্ষায় ভালভাবে উৎরাতে পারি তবে তো—"

আরেক মৌসুম। বহুলগন্ধী বিকেল।

ইতিমধ্যে দীপাদের ছোট্ট সংসারে অনেক কিছু অদল বদল হয়েছে।

দীপার বাবা পা অপারেশন করিয়ে ভাল হয়েছেন। অধ্যাপনার কাজে দেবেশের লাগবেন দিন পনেরোর মধ্যেই।

দীপা রাণী ভবানী কলেজ থেকে এই বছরেই বি. এ. দিচ্ছে। এখন দীপার পরীক্ষা চলছে। সিলেকশন টেস্ট পরীক্ষাটা দীপা খুবই ভাল দিয়েছিলো। গভর্নিং বডি বুঝেছিলেন, এ মেয়ের বি. এ.র বিষয়গুলি—ফিলোজফি ও বাংলা, বেশ ভাল ভাবেই পড়া আছে। কাজেই দীপা ভর্তি হয়েছিলো কোর্থ ইয়ারে।

গোল পার্কের কাছে, গড়িয়াহাটা—সি. আই. টি. রোডে নতুন মাঝারি একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িতে এখন দেবেশের চক্ষু আছেন। অভিজিৎ ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বাড়িটি নাকি অভিজিতের মেসোর বাড়ি। মেসো কাজ করেন সিমলায়। রিটায়ার করবেন আর বছর দুই বাদে। তারপর এসে বাস করবেন এ বাড়িতে।

বাড়ি শেষ হবার পর এক দুর্ভাবনায় মেসোর নাকি ঘুমই হচ্ছিলো না। কলকাতা শহরে, বাড়ি খালি থাকলে আর বলতে হবেনা, বেলিন, কমোড তো নেবেই চোরেরা, চাই কী জানলা কপাটও খুলে নিতে পারে; আর ভাড়া যদি দেন, তাহলেও বলতে হবে না—ভাড়াটেকে ওঠানো যাবে না কোনোমতেই। কাজেই দেবেশের চক্ষু যদি অনুগ্রহ করে বছর দুই এখানে থাকেন, তাহলে অভিজিতের মস্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়। মেসো অভিজিতের ওপরেই এই ভারটা দিয়েছেন কিনা—

দেবেশের কথা শেষ হবার পর, রবিবারের ছুটিতে দীপা এসে আপত্তি করেছিলো খুব। "না, বাবা, এ হয় না—। অভিজিৎবাবুর পরিচিত আর কেউ থাকবেন বলে ও বাড়িতে। বাবা, তুমি বুঝছো না, অভিজিৎবাবুর এত ঋণ আমরা শোধ করবো কী করে? কোনো কালেও তাহলে ঋণমুক্ত—"

মেয়ের কথা থামিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন দেবেশর, "তুই এক আচ্ছা পাগলি, অভিজিতের ঋণ কী এ জীবনে শুধতে পারবো নাকি আমরা···" এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, "তাছাড়া

বুঝে স্থাপ, অভিজিৎ এ পর্যন্ত আমাকে কোনো একটি অনুরোধও করেনি, অনুরোধ আদিয়ে যারে যারে বললো, এতে ওর মস্ত উপকার করা হবে—"

দীপা তারপর আর কিছু বলেনি।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলো। অনেকক্ষণ··· অনেকক্ষণ।

মেয়ের ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে স্নেহময় হেসে ফেলেছিলেন, "আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তুই ভাবিস কী অত?" বাবার কথার সচমকে চোখ নামিয়ে আনলো দীপা। নিরুত্তরে হাসলো একটু।

আজকাল মাঝে মাঝেই একটা উত্তরহীন জিজ্ঞাসা দীপার পড়াশুনোয় মন মনকে খুব জোরে নাড়া দিয়ে ওর মনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। তখন দীপা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনটা তখন কোনো একটা রহস্যের উৎস-সন্ধানে গভীরভাবে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু মজা এই, যেন উৎসমুখের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দীপা ফিরিয়ে আনে মনটাকে। ও টের পায়, রহস্যের উৎসমুখ অনেক কুয়াশার পর্দায় ঢাকা। সে কুয়াশার পর্দা ছিন্ন করার চেষ্টা করে না আর। সেই মুহূর্তে হুদয়াবেগের প্রাবল্যে দীপার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে আসতে চায় কেন জানো। স্বপ্ন আর কল্পনায় রাঙানো সে আবেগ। বুকের ভেতর তখন এমন আলোড়ন ওঠে, তাতে নিঃশ্বাস ভারি শক্ত হয়ে পড়ে ওর। সে সময় নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হয়। আর তখন, প্রায় নিজেরও অগোচরে যারে যারে দীপা থমকিয়ে রেখে নিজেকে।·····

"তোমার পরীক্ষা কি শেষ হয়ে গেলো নাকি দিদিমণি?" রঘুর গলায় উল্লাস।

"নারে, আর একটা বাকী। মাঝখানে চারদিন ছুটি, তাই দেখতে এলাম বাবাকে ···তোকে—"

"ভাল হয়েছে দিদিমণি, খুব ভালে হয়েছে। আজ তুমি আমার সাহেবকে দেখতে পাবে—"

দীপার বুকের ভেতর চিপ্ করে উঠলো। "তোর সাহেব মানে অভিজিৎবাবু?"···নিজের বুকে দীপা বুঝি হাতুড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

"হ্যাঁ দিদিমণি, এই তো এলেন·· আমি মিষ্টি কিনতে যাচ্ছি, গাজুরাণের হালুয়ার পায়েস খেতে খুব ভালবাসেন আমার সাহেব—"

"ধ্যুস্···খুব যা হোক এক সাহেব পেয়েছিস তুই, কেবল দিনরাত আমার সাহেব·····আমার সাহেব—"

যেতে যেতে রঘু সিং দাঁড়িয়ে গেলো, "তোমাকে কী বলবো দিদিমণি—" অফুট কৃতজ্ঞতায় রঘুর স্বর বিগলিত।

"আমার সাহেব এক আশ্চর্য মানুষ, এখানে কর্তাবাবার সামনে এসে যখন, কথা বলেন যখন, তখন যেন একেবারে সাধারণ মানুষ, সেই মানুষ অফিসে যে কী দুর্ধর্ষ সাহেব, সাহেবের ভয়ে অফিস শুদ্ধ লোক তটস্থ, কাজকর্মের এক চুল এদিক ওদিক হয় না—ওরে বাবা, দেরী হয়ে গেলো—গলায় একরাশ ব্যস্ততার ঢেউ তুলে লম্বা পা চালালো রঘু।

আবছা হাসলো দীপা। নিচু হয়ে একটি একটি করে ফুটি ধরা বকুল তুললো। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকলো একটু। তারপর বাড়িতে ঢুকলো পেছনের দরজা দিয়ে। ওর ঘরে, ছুটি ছাটাতে এলে যে ঘরে থাকে দীপা, সে ঘরে এসে বসলো।

বাইরের পোষাক সমেত অনেকক্ষণ একেবারে চুপ করে বসে রইলো দীপা। না নড়ে, না চড়ে একভাবে দীপা বসে আছে। বাইরে চুপ কিন্তু ভেতরে চুপ নয়। দীপা নিজেই ভেবে পেলো না, বুকের ভেতরে এত তোলপাড় কেন?···মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো।—রঘু আসার আগেই মানুষটিকে দীপা দেখে নেবে একপলক।

দেবেশ্বরের ঘরের পুবদিকের দরজার কাছে দীপা এসে দাঁড়ালো। যেন নিশ্বাসকেও সামলে দাঁড়িয়ে রইলো। পর্দাটা সামান্য সরাতে দিয়ে থেমে গেলো। —যদি এই দিকেই মুখ করে বসে থাকেন ভদ্রলোক···।

"না, না, অভিজিৎ, তুমি ব্যস্ত হয়োনা। মোটর চেপে হাওয়া খাওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই—" স্মিত আননে এক ঝলক হাসলেন দেবেশ্বর।

"তুমি তো চেনোনা আমার মেয়েটিকে, প্রতি ব্যাপারে আমাকে সে অনুযোগ দেয়···, বলে,—তুমি বুঝছো না বাবা, অভিজিৎবাবুর এত ঋণ আমরা শুধবো কী করে···, তার ওপর আবার যদি—"

অভিজিৎ হো হো করে হেসে উঠলো।

"আপনার মেয়েকে বলবেন, আমি পাই পয়সা পর্যন্ত নোট করে রেখেছি, সময় মতো সব উসুল করে নেবো—" কথা শেষ করে আরেক প্রস্থ হাসলো অভিজিৎ, "আমি বলছিলাম কী পনেরো দিন পরে তো কাজে জয়েন করছেন, এ ক'দিন বিকেলে খোলামেলা জায়গায় ঘণ্টাখানেক বেড়ালে আপনার শরীর আরেকটু সারতো—"

"না, আমি ঠিক আছি অভিজিৎ, পারফেক্টলি অলরাইট—"

সেইদিকে পায়ের শব্দ পেলো দীপা। —রঘু এর মধ্যেই এসে গেলো। মৃদু উত্তেজনায় দীপা ক্ষিপ্র হাতে পর্দাটা দু আঙুল দিয়ে সামান্য সরালো। তারপরই বুক দুলে ওঠা কাঁপুনি সামলে যেন আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলো নিজের ঘরে।···

"এ কী দিদিমণি—" উজ্জ্বল খুশি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলো রঘু, "এ ভাবে শুয়ে যে, শরীর খারাপ করছে নাকি?···তোমার চা-জলখাবার এ ঘরেই তাহলে দিয়ে যাই—"

দীপা দুহাত দিয়ে চোখ কচলে উঠে বসলো, যেন হাল্কা তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলো ও, "না, আমি ঠিক আছি, বিশ্রাম করছিলাম একটু। বাবা ওদের চা খাবার দিয়ে এসেছিল নাকি?"

"না, এইবার দেবো। তোমারটাও ওখানে দেবো না এখানে—, তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।

"আচ্ছা, চল্ দেখি—" দীপা উঠলো।

ট্রে সাজানো হয়ে গেছে রঘুর। সন্দেশ আর ছানার পায়েস। টি পটে ভিজিয়ে দিয়েছে চা। দীপা এক মুহূর্ত ভাবলো, "তোর নিয়ে যেতে হবে না আজ, আমিই নিয়ে যাচ্ছি—"

রঘু মহা খুশি। "তাই ভাল।"

ট্রে হাতে করে দুই নম্বর ঘরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলো দীপা। রক্তের ভেতরে যেন একটা তাণ্ডবের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। সেটাকে শান্ত হবার জন্য একটু সময় দেয়া দরকার।···

এবার দীপাকে নিয়ে কী যেন কথা হচ্ছে। দীপা কান খুব করলো।

"না, যেমন আমি বলি কী, এম. এ. পড়ার আর দরকার নেই তার—ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলা

হয়ে যাতায়াত করলে দুদিনেই শরীর ভাংবে···বাড়িতে বসেই না হয় এম. এ-র পড়া পড়বেন, দরখাস্ত দেবার দরকার নেই—"

"শুনবে না, শুনবে না—" মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন দেবেশ্বর, "তুমি আমার মেয়েকে জানোনা—"

"আসলে আপনি কিছু মনে করবেন না—"অভিজিৎ মুখ টিপে হাসলো, "আপনার মেয়েকে আপনি খুব ভয় করেন—"

"আমাকে সবাই—ই ভয় করে—" কাঁধ দিয়ে পর্দা সরিয়ে দুহাত দিয়ে ট্রে ধরে সটান ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলো দীপা।

ঘরের ভেতরের দুজন মানুষই যেন প্রায় লাফিয়ে ওঠার মতো। "কী কাণ্ড! দীপু, তুই কখন এলি! আমি তো একটুও টের·····এই যে অভিজিৎ···অভিজিৎ বোস, তোর সঙ্গে তো পরিচয়ই হয়নি—"

"হ্যাঁ। তোমার অতি প্রিয় ছাত্রের অতি ভাল ভাগ্নে—" ট্রেটা দেবেশ্বর ও অভিজিতের মাঝখানের টিপয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে দীপা বললো।

দেবেশ্বর রীতিমতো লজ্জিত হলেন মেয়ের কথায়। "এ কেমন ধরণের কথা মা, অভিজিৎকে—"

অভিজিৎ ইতিমধ্যে সামলেছে পুরোপুরি। মুখের চেহারা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে করে প্রসন্নদীপ্ত গলায় বললো, "ওতে আমি কিছু মনে করিনি, আমি জানি আপনার মেয়ের বেশ খাঁই আছে।"

দেবেশ্বর শুধু হতবাক নন, বিমূঢ়। কিছুটা শঙ্কিতও। অভিজিতের মন্তব্যে বল্, করে আবার আবল তাবল কিছু না বলে বসে দীপা। ত্রস্তে-ব্যস্তে বললেন, "চা-টা দে মা, বেশ অনেকক্ষণ ধরে চায়ের পিপাসা বোধ করছি—"

বাবার আতঙ্কে দীপা মুখ নামিয়ে হাসি লুকোলো। চা বানিয়ে ওরা পেয়ালা ও খাবারের প্লেট অভিজিৎকে ও বাবাকে দিয়ে, দীপা এক পেয়ালা চা নিয়ে চেয়ারে বসলো। চেয়ারটা ছিলো অভিজিতের প্রায় মুখোমুখি। দীপার চোখ চায়ের পিরিচে। নিঃশব্দে মিনিট গেলো। সহজ হতে চাইলো দীপা।

চোখ তুলতেই অভিজিতের চোখের ভেতরে চোখ আটকালো। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে অভিজিৎ। দীপা চোখ নামিয়ে চুমুকে চুমুকে চা শেষ করতে লাগলো।

দেবেশ্বর কিছুটা স্বাভাবিক খেয়ে গেছেন যেন। নীরবেই খাবার খেলেন এবং চায়ের পেয়ালা শেষ করলেন। তারপর ওঁর কী যেন মনে হলো। একটু হেসে নিয়ে বললেন, "দীপা, এমন কথা তুই কেন বললি মা তোকে সবাই ভয় করে, অভিজিৎ ভাবলো, হয়তো সত্যিই তুই একজন ভীষণ বেজাজি মেয়ে—"

"হো-হো·····" অভিজিতের উঁচু গলার হাসি ঘরের চার দেয়ালে আছড়ে পড়লো। দীপা ঠোঁট ফাঁক করার মুহূর্তে ছোট একটুখানি চোখাচোখি অভিজিতের সঙ্গে। অভিজিৎ খুব আস্তে মাথা নাড়লো। অর্থাৎ—না, এখন কিছু বলো না—।

দেবেশ্বর ওদের ছোট্ট দৃষ্টি বিনিময়টুকু দেখে ফেললেন। আরো স্বাভাবিক খেলেন দেবেশ্বর। আরো হতভম্ব। ওঁর সহজ হিসেবগুলো যেন সব গোলমাল হয়ে গেলো। মাথার পেছনে হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়িয়ে চটিতে পা গলালেন। বললেন, "অভিজিৎ বসো, আসছি—"

উৎসবে উষা সেলাই কলাই শ্রেষ্ঠ উপহার

উৎসব উপলক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। উপহার হিসেবে উষা সেলাই কলের একটা বিশেষ স্থান আছে। উষার ৩টি মডেলের প্রতিটি কারুকার্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। আধুনিক উষাকলে সেলাই করে আপনার অবসর আনন্দে ভরপুর করে তুলুন।

শ্রেষ্ঠ মেশিনে সেলাই করুন—

উষা

একটি JAY সামগ্রী কলে সেলাই করুন

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

JESM/G/459

সঙ্গে সঙ্গে দীপা আড়ষ্ট। নতুন ধরণের একটা অস্বস্তিতে অসহজ। আর সেটাকে চাপা দেবার জন্যই বড় অবান্তর কথার অবতারণা, "রঘু বলে, অফিস শুদ্ধ লোক আমার সাহেবের ভয়ে তটস্থ, আমার সাহেব ভয়ংকর কড়া সাহেব···, আমি বাবাকে বলতে চাইছিলাম, সেই ভয়ংকর সাহেবটি কিন্তু তোমার মেয়ের ভয়ে একেবারে কাঁটা। ভয়ে ভয়ে শুধু যে নিজের নামটাই তিনি পাল্টেছেন তা নয়, সুদীর্ঘ একবছর ধরে সযত্নে নিজেকে তোমার মেয়ের দৃষ্টির আওতার বাইরে রেখেছেন।"

ঠোঁট টিপে অভিজিৎ দুষ্টুমীভরা হাসি হাসলো। "আপনার দেয়া অভিযোগ কবুল করতে আমার কোনো আপত্তি নেই—মেয়েটির ভয়ে আমি একবারে কাঁটা, না হলে কতবার কত ছুতো করে মেয়েটির কাছে আমি আসতাম ··না হলে কবেই বুক টান করে মেয়েটিকে আমি বলতাম—" কথা শেষ না করে অভিজিৎ হাসতে লাগলো। দৃষ্টিটাকে ধরে রাখলো দীপার মুখের ওপর,—"সেই সঙ্গে রঘুর মনিব-কন্যের কাছে আর একটি কথাও সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই—একটা উত্তাল অনাস্বাদিত রোমাঞ্চিকতাও ছিলো অনিন্দ্য বোসের ইচ্ছের পেছনে—।"

দীপা বেশ উত্তেজনা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছিলো। উত্তেজনা এখন ঠাণ্ডা। তার বদলে রাজ্যের লজ্জা আচমকা যেন ওর ঘাড়ে এসে চেপেছে। তার ওপর বাবাও সামনে নেই। দীপার চোখ নামানো। মুখ লাল। ঠোঁট বন্ধ। কোনো কথা দীপা কুড়িয়ে পাচ্ছেনা। অবশেষে পড়ার প্রসঙ্গটা তুলে নিলো, "আপনি আমার এম. এ. পড়ার বাধা সাধছেন কেন?"

নিঃশব্দে হাসছে অনিন্দ্য। দীপার তাব ভঙ্গি বেশ বেশ তারিয়ে উপভোগ করছে সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে কণ্ঠস্বর ভারি করলো, "এম. এ. পড়ার আপনি সময় পাচ্ছেন কোথায়?"··· ফস্ করে একটা সিগারেটে টান দিয়ে অনিন্দ্য ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো, "এদিকে আমার ধরতে আপনার হিসেব মতো চক্রবৃদ্ধি সুদকেও ছাড়িয়ে গেছে—এক জন্মে পারবেন কী শুধতে আপনি?··· যথেষ্ট সন্দেহ আছে ··কাজেই আর সময় দিতে পারছেন না অনিন্দ্য বোস—" হো-হো করে গলা খুলে হেসে পরিবেশ সহজ করে তুললো অনিন্দ্য। আবার এক পলকের চোখাচোখি দুজনের।···

উৎসমুখের কুয়াসার পর্দা ছিন্ন হয়ে গেছে। পর্দার ভাঁজে ভাঁজে যা ছিলো আবৃত, যেন দীপার স্মৃতিকোটায় হুড়মুড়িয়ে সব ছড়িয়ে পড়লো।···বাবার বই ছাপানো, আগেই আগাম টাকা দেয়া, রঘুকে চাকরী, দীপাকে বি. এ. পড়তে সুযোগ দেবার জন্য বাহানা করে মিস মুখার্জিকে পাঠানো, বাবার অপারেশনের নিখুঁত বন্দোবস্ত করা, মেসোর বাড়ির ছুতো করে ভাল পাড়ায়, বিনাভাড়ায় ভাল বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করা—সবকিছুর মূলে তাহলে দীপা ··সব কিছুর পেছনে তাহলে এই—অথচ অনিন্দ্য বোস, যে কিনা বাংলা-ধরেধা খ্যাতিমান আদিত্য বোসের ছেলে, আভিজাত্যের গরিমায়, ধনের জলুসে, স্ট্যাটাসে—লাখোপতি কটিপতিদের সঙ্গে যার অবাধিত আনাগোনা, যার মেশাবেশি, সামাজিক আদান প্রদান যার, সে এমন একটা আজগুবি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো কি করে!···ঐতিহ্যের শিকড় উপড়ে ফেলে, প্রায় আত্মাকুড় থেকে বাছাই করলো তার সঙ্গিনী!·····

'বোস' পরিবারের পক্ষে এটা কী দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারা সম্ভব?

"কী ভাবছো দীপা, মুখখানা অমন গোল করে—"সিগারেটে লম্বা টান দিলো অনিন্দ্য, "এ জন্মে শুধ শুধতে চাওনা?"

দীপা হাসলো। হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত হলোনা। চোখের চিন্তা ফুটে উঠলো। অনিন্দ্য পড়ে ফেললো দীপার চিন্তার ভাষা।...বোস-পার্কে ভয়, বোস-পার্কের সমাজকে ভয়...

"ভয় পাচ্ছো?..." অনিন্দ্যর কণ্ঠস্বর গাঢ়, গভীর। সে স্বর যুক্তি অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলো দীপার।

"...ভয় কী দীপা, আমি তো আছি -"যেন ধাপখোলা তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ শাণিত অনিন্দ্যর।

চোখ ভ'রে জল আসতে চাইছে দীপার। দীপা বলতে চাইলো—দুরতিক্রম্য অসংখ্য বাধা যে আমাদের মধ্যে...বোস পার্কের গর্বোদ্ধত ঐতিহ্য লক্ষ বাধার দেয়াল তুলবে যে—সে সমস্ত বাধা কী জানা আছে তোমার?...ভাল করে নিজের মনকে যাচাই করে দেখেছো তো তুমি....কিন্তু দীপা বলতে পারলোনা। ওর অনুভব বাধা দিলো। আর সেই মুহূর্তে যেন অচেনা আবেগের বান ডাকলো দীপার প্রাণে।

আবেগে দীপার সমস্ত শরীর থর থর। নিজের এই বিহ্বলতায় নিজেই দীপা লজ্জায় লাল। অনিন্দ্য স্থির চোখে দেখছে। সযত্নে ধরানো সিগারেট ফেলে দিলো এ্যাসট্রেতে, "কী ভাবছো অত?"

"ভাবছি—" দীপা মুখ তুলে লাজুক হাসলো,

"ভাবছি যে রসকথার দিনগুলো চলে যায়নি তাহলে—"

চোখের মণি ঝক্‌মক্ করে উঠলো অনিন্দ্যর।

"না—, নিশ্চয়ই যায়নি—" ঝুঁকে দীপার লীলায়িত দুখানি হাতখানি নিজের সবল মুঠিতে তুলে নিলো অনিন্দ্য।

দীপার সমস্ত অশান্তি আর উদ্বেগের পালা শেষ হলো অনিন্দ্যর হাতের উষ্ণস্পর্শে। তবু দীপা মনটাকে মুঠিতে পুরে মনের দিগ্‌বলয় নিয়ে খুব শান্তভাবে আরেকবার ভাবতে চাইলো। কিন্তু মনটাও মুঠিতে রইলো না আর ভাবনাটাও কেই হারালো...। দিশাহারা মুগ্ধ কমলিনীর সর্বাঙ্গে তখন লাবণ্যের চল নেমেছে।

দুই দুই চোখে ব্রীড়ানম্রীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো অনিন্দ্য।

পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট...পনেরো মিনিট.....বাতাসের দোলা লেগে বকুলের ডালাপালা দুলছে। ঘোরহর মাদকতাময় বকুলের গন্ধ ওদের আচ্ছন্ন করে রাখলো।

একেবারে চুপ দুজন। ঘরে সুগভীর নিস্তব্ধতা। এক সময় দীপার খেয়াল হলো।

"বাবা এখনো আসছেন না কেন...দেখিতো—" হাত টেনে দীপা ওঠবার চেষ্টা করতেই অনিন্দ্যও উঠলো, দীপার হাতখানি মুঠিতে ধরা রয়েছে তেমনি—

"হ্যাঁ, চলো। দুজনে একসঙ্গে গিয়ে প্রণাম করি ওঁকে, তাহলে আমাদের মুখে আর কিছু বলতে হবে না।"

"চলো—" দৃষ্টি বিনিময় করে দু'জনে সুন্দর হাসি হাসলো।

দীপার চোখে মুখে বিদ্যুতের আলো। ভাবনার মেঘগুলো সব গেছে উড়ে।

॥ প্রস্তুতি ॥

॥ ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা ॥

পথে পা দিয়েই শ্রাবণীর খেয়াল হ'ল। এ পথ শহরের জনপথ নয়, প্রায় উপপথ। তবু লোক চলাচলের বিরতি থাকে না। সব সময়েই লোকের যাতায়াত।

কিন্তু আজ পথ একেবারে জনবিরল।

বেহেশের দিকে ফিরে শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করল, কটা বেজেছে বেহুন তো? স্বরে উৎকণ্ঠা আর ভীতির মিশেল।

বেহেশ এগিয়ে যেতে যেতে হাত ঘড়িটার দিকে অবহেলায় একবার নজর বুলিয়ে বলল, এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

সর্বনাশ।

এবার শ্রাবণীর কণ্ঠ রীতিমত কেঁপে উঠল।

বেহেশের নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত উত্তর।

ফুল রিহার্সালের পক্ষে এ আর এমন কি রাত? শেষ সিনটা তো আমার এখনও পছন্দ নয়। আরো বার দুয়েক করতে পারলে ভাল হ'ত।

শ্রাবণী আর কথা বলল না। বলেও লাভ নেই। তার সর্বনাশের মাত্রাটা এরা কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না।

এদের কাছে শ্রাবণী সংসার থেকে ধার করে আনা কোন গৃহবধূ নয়, ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের একটা চরিত্র।

তা ছাড়া এক মুঠো অর্থ দিয়ে শ্রাবণীকে এরা কিনে এনেছে। শ্রাবণীর ক্ষয়ক্ষতির দিকটা এদের ভাববার কথা নয়।

ঘোটরে উঠতে উঠতে একটা মানুষের রুক্ষ, কঠিন, বেখাপ্পা মুখটা বার বার শ্রাবণীর মানসপটে ভেসে উঠল।

এতদিন যে মুখে মেঘের সম্ভার ছিল, আজ ঝড়ের সঙ্কেত দেখা দেবে।

রমীশের খুব দোষও দেওয়া যায় না। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে ক্লান্ত, নির্মীব একটা সত্তা আশ্রয় খোঁজে। শান্তির নিলয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বিরাম উপভোগ করতে চায়।

আহার ঠিক সময়েই আসে কিন্তু আহার্যটাই শেষ কথা নয়। আহার্যের সঙ্গে যত্ন, সেবা, এদের মূল্য অনেক বেশী।

প্রথম দিকে প্রয়োজন ছিল, মুখ বুজে রমীশ সব কিছু সহ্য করেছে। উনমনে সংসারের পানসী শুধু একটা ঘাটে দুদণ্ড জলধি পার হবার সাধ্য রাখে নি, তাই রমীশ রোজগারের আর

একজন অংশীদার খুঁজেছিল। একজন দাঁড় বাইবে, আর একজন ধরবে হাল। তবে পানসী ধীর গতিতে অস্বচ্ছলতার নদী পার হতে পারবে।

স্বল্প মাইনের মনীশ শ্রাবণীকে কোন বাধা দেয় নি।

অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রাবণী বাইরে যেতে চায় নি। আপত্তি করেছে। কুমারী অবস্থায় যা শোভা পেয়েছে, এখন একজনের সংসারের দায়িত্ব নিয়ে, জীবনের শরিক হয়ে এভাবে চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেতে ভাল লাগে নি।

কিন্তু মনীশ তখন অন্য কথা বলেছে।

খবর দিয়ে নিজে পাড়ার ছেলেদের ডেকেছে।

এটা আর অন্যায় কি? আজকাল তো বহু মেয়ে এভাবে জীবিকা অর্জন করছে। তাছাড়া তোমার মধ্যে যখন এমন একটা গুণ রয়েছে, অব্যবহারে সেটাকে নষ্ট করে লাভ কি।

নিজের কথা শ্রাবণী তোলে নি। ছেলের কথা বলেছে।

কিন্তু বাবুলকে কে দেখবে?

কেন অনুবিধাটা কোথায়?

আমার ওপর ছাইয়ের বিন্দু যেমন মানুষ টুসকি দিয়ে স্বাভাবিক করে, তেমনই শ্রাবণীর প্রশ্নটা মনীশ আমলই দেয় নি। সরিয়ে দিয়েছে এক পাশে। একান্ত অবহেলায়।

তুমি তো বাইরে বের হবে সন্ধ্যার সময়, তার আগেই আমি অফিস থেকে ফিরে আসছি। বাবুল আমার কাছে থাকবে। আমার তো কোন নেশা নেই। সিনেমা, ক্লাব কিছুরই বালাই নেই। আমি দেখব বাবুলকে।

কথাটা অবশ্য সত্য।

অফিস আর বাড়ী, বাড়ী আর অফিস। মনীশের জীবনের মানচিত্র এই দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে সীমিত। বন্ধুবান্ধব দু'একজন হয়তো আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গ কেউ নয়। আসল কথা, প্রাণ খুলে মনীশ মিশতে পারে না।

অবশ্য প্রত্যেক দিনই যে শ্রাবণীকে বাইরে যেতে হবে এমন নয়। মাঝে মাঝে বাড়ীতেও থাকবে।

শখের থিয়েটারে শ্রাবণীর নাম ছিল। দু'একটা ভূমিকা যা করেছে মনে রাখবার মতন। খবরের কাগজে কাগজে প্রশংসাও বেরিয়েছিল। ক্লাবের মুরুব্বিরা দিনের পর দিন বর্ণা দিয়েছিল।

শ্রাবণীর বিয়ে হয়ে যেতে অনেক শখের ক্লাব প্রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল। এমন একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতি। মাথার ঘোমটা টেনে এভাবে একটা মধ্যবিত্ত সংসারে শ্রাবণী নিজেকে মিশিয়ে দেবে, সেটা তারা ভাবতেও পারে নি।

পাড়ার ছেলেদের কল্যাণে দু একটা ভূমিকায় শ্রাবণী নামতেই আশপাশের অনেক ক্লাব বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল।

এসেই কিন্তু হতাশ হ'ল।

তন্বী, শ্যামাঙ্গী, আয়তলোচনা যে মেয়েটি নায়িকা কিংবা উপনায়িকার ভূমিকায় আসর মাত করে দিত, তাকে তারা কোথাও খুঁজে পেল না। পরিবর্তে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তার শরীরে

বেশ একটু মেদের সঞ্চয় হয়েছে, পদক্ষেপে সেই ক্ষিপ্রতা তিরোহিত, কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ ভারি। কিন্তু কটাক্ষের বিদ্যুৎ এখনও নিষ্প্রভ হয়নি। ঠিক এ ভোরার উপযুক্ত ভূমিকাও খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়।

দু একটা বইতেই শ্রাবণী নিজের শক্তির প্রমাণ দিল।

মিত্তালী সমিতিতে জমা, এক অফিসের সাজাহান বইতে আলোনারা। সংবাদপত্রগুলো আবার শ্রাবণীর স্তুতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। দর্শকরা উচ্ছ্বসিত।

মনীশ হাসল।

বলল, আর দেরী নয়, রেট বাড়িয়ে দাও। নিজেকে দুর্মূল্য করে তোল, তবেই কদর বাড়বে।

প্রথম প্রথম মনীশ অভিনয়ে যেতে চাইত। বলত, কি আর হবে। বাড়ীতে কি তো রয়েছে। আমি বাবুলকে নিয়ে ঘরে বসে থাকি।

শ্রাবণী ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শরীরে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করেছে।

না।

না কেন? এত লোক দেখছে, আর আমরা দেখলেই দোষ?

কখনও বাবুলকে নিয়ে যাবে না। আমি এভাবে অর্থ উপার্জন করি, মুখে রং মেখে নটী সাজি, এ যেন বাবুল কোনদিন জানতে না পারে। তা'হলে আমার আর লজ্জা রাখার ঠাঁই থাকবে না।

কিন্তু বাবুল যখন বড় হবে?

বাবুল বড় হবার আগে, বাবুল বোঝবার আগে এ পথ আমি ছেড়ে দেব। তার মধ্যে অফিসেও তোমার উন্নতি হবে। তখন আর এভাবে বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন হবে না।

তাই হল। বছর তিন চারেকের মধ্যে মনীশের উন্নতি হ'ল। ওপরওয়ালা মাদ্রাজী মেয়ে বিয়ে এক ঘাঙানী এল। একেবারে ছোকরা। মনীশকে তার ভাল লেগে গেল। ফলে, উন্নতির যে পথটা এতদিন পাথরচাপা ছিল সে পাথর সরে গিয়ে পথ প্রশস্ততর হ'ল।

রোজগার মন্দ বাড়ল না।

কিন্তু আশ্চর্য; বাড়তি উপার্জনের পথটা বন্ধ করার কথা কারুরই মনে হ'ল না। না মনীশের, না শ্রাবণীর।

ততদিনে শ্রাবণীর জীবন আর জীবিকা মিশে এক হয়ে গেছে। একটার গতিরোধ হলে,' আর একটারও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। সংসারের তুলসীমঞ্চের প্রদীপের শিখা শয়নপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় বিলীন।

স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখ মনীশের রক্ত কণিকায় বিলাসিতার আমেজ এনেছে। বাড়তি অর্থের ইতি মানে বাড়তি আরামেরও অবসান। এই কৃচ্ছতা সহ্য করতে মনীশ নারাজ।

কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল।

মাতালি মাইনের কেরানীর আসন থেকে মনীশ একেবারে মগডালে উঠে পড়ল। পদবী হ'ল জুনিয়র অফিসর।

ধুতির বদলে প্যাণ্ট ধরল মনীশ, পাঞ্জাবির বদলে সার্ট। বিশেষ বিশেষ দিনে গলায় টাইয়ের মালা দোলাল। অফিসের পরে এক ক্লাবের খাতায় নাম লেখাল। নিরামিষ ক্লাব। একমাত্র উত্তেজনা তাস আর রাজনীতিকে কেন্দ্র করে।

প্রথমে মনীশের কিছু মনে হয় নি, কিন্তু সতীর্থরাই ইঙ্গিত করল। মিসেস পাল কি এখনও অভিনয় করেন নাকি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ করেন। এই সেদিনও কোন এক কাগজে ছবি বেরুছিলায়।

মিস্টার পাল আমাদের অফিসের অভিনয়ে নামিয়ে দিন একবার। আমরা দেখি।

মনীশ একটিও কথা বলল না। হাতে ধরা ফরতনের দিকে চেয়ে নিজের বাড়ীর বিধির কথা ভোলবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কাঁটাটা বুকে বিঁধে রইল মোক্ষমভাবে।

পরের দিন সকলেই মনীশ শ্রাবণীকে বলল, খুব হয়েছে। এবার বন্ধ কর। তোমার জন্য বন্ধুদের কাছে মুখ দেখান দুষ্কর।

বিছানায় বসে শ্রাবণী পাটটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল, মনীশের কথায় মুখ তুলল।

মুখ তুলল বটে কিন্তু কথাগুলো যে ঠিক বুঝতে পারে নি, অর্থহীন দৃষ্টিতেই তা প্রমাণিত হ'ল।

মনীশ কথাগুলো আবার বলল। এবার কণ্ঠস্বরে আরো তিক্ততা মিশিয়ে।

শ্রাবণী হাতের কাগজটা সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসল।

তোমার বন্ধু কারা আমার জানা নেই, আর আমার জন্য তাদের কাছে তোমার মুখ দেখাবার কি অসুবিধা হচ্ছে জানতে পারি কি ?

মনীশ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তোমায় নাচগিরি ছাড়তে হবে। এসব আমার মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর।

এক সময়ে এভাবে উপার্জন না করলে তোমার আজকের এ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবার সুযোগই হ'ত না।

শ্রাবণী যেন খুব্ব করা সংলাপ বলছে। পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে।

কলহের স্ফুলিঙ্গ হয় তো দাবানলে রূপান্তরিত হ'ত, কিন্তু ঝি ঘরে ঢুকতেই দুজনে থেমে গেল।

আবার কয়েকদিন বেশ চুপচাপ। এ প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হ'ল না।

বিকালে বাবুল ঝিয়ের কাছেই থাকে। কোন দিন মনীশ আগে ফেরে, কোন দিন শ্রাবণী।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হ'ল। একেবারে আচমকা।

সেদিন এক সেকশন লোকের সামনেই সেন কথাটা মনীশকে বলল, পাল, কাল তোমার বৌয়ের অভিনয় দেখে এলাম হে। সম্রাজ্ঞী রিজিয়া। তুমি খুব ভাগ্যবান তা স্বীকার করতেই হবে। আমরা ওভাবে ঘরের বৌকে নাচবার জন্য ছেড়ে দিতে পারতাম না ভাই।

মনীশ বুঝতে পারল তার সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমা হয়েছে। শরীরটা নিজের বশে নেই। স্নায়ুর প্রান্তগুলো কাঁপছে। আস্তে আস্তে কে যেন পায়ের নীচে থেকে দাঁড়াবার মাটিটুকু সরিয়ে নিচ্ছে।

একটি কথাও না বলে, কোন উত্তর দেবার চেষ্টা না করে মনীশ নিজের চেয়ারে ফিরে এল। দুটো হাতে মাথাটা টিপে ধরে চুপচাপ বসে রইল।

মনে মনে সংকল্প করল, এই হীন অবমাননার শেষ করতেই হবে। শ্রাবণী যদি একটা মানুষের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়, একটা সংসারের পবিত্রতা নষ্ট করতে চায়, মনীশও

করতে চায় একটা পরিবারের শুচিতা, তাহ'লে তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে, তার এ সর্বনাশা খেয়ালের প্রশ্রয় মনীশ দেবে না।

সে রাতে শ্রাবণী বাড়ী ফিরে দেখল, মনীশ বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে রয়েছে।

এটা একটু অস্বাভাবিক। শ্রাবণী যখন ফেরে তখন মনীশ শয্যায়। কোন দিন ঘুমে অচেতন, কোনদিন নিদ্রার সাধনা করছে।

শ্রাবণী বিচলিত হ'ল।

কি ব্যাপার, এখানে বসে? বাবুল কেমন আছে?

ভাল। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভিতরে যাবার জন্য শ্রাবণী পা বাড়িয়েছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল। বার তিনেক মূর্ছা-যুদ্ধের মহলা দিয়ে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোন রকমে খেয়ে নিয়ে, শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

তাই ভ্রূ দুটো তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তোমার এই অভিনয় ছাড়তে হবে। তোমার জন্য ভদ্রসমাজে আমার মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে।

নিরীক্ষণ করে শ্রাবণী দেখল। সেই একই মানুষ, যে এক সময়ে মিষ্টি সুরে, ইনিয়ে বিনিয়ে শ্রাবণীকে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, অভিনয় করার শক্তি সকলের থাকে না। ঈশ্বর যখন সে শক্তি তোমাকে দিয়েছেন, তখন তাকে এ ভাবে অবহেলা করা উচিত নয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। কাজেই, এভাবে অভিনয় করা অন্যায় নয়, পাপ নয়।

তখন মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ তখন সংসারে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন ছিল।

এই স্বার্থপর মানুষটার নির্মোক খসে পড়েছে। লোকটাকে চিনতে শ্রাবণীর কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আঁচল দিয়ে শ্রাবণী কপালের ঘামের বিন্দুগুলো মুছে ফেলল। চাপা অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এতক্ষণ ধরে একটা অভিনয়ের মহলা দিয়ে এলাম, এই মুহূর্তে আর একটা অভিনয়ের মহলা দেবার মতন মেজাজ নেই। তোমার কথা কাল শুনব।

শ্রাবণী ক্ষিপ্র পায়ে নিজের ঘরে চলে এল। আগে একটাই শোবার ঘর ছিল। ইদানীং রাত জেগে মাঝে মাঝে শ্রাবণী নিজের সংলাপ কণ্ঠস্থ করে, তাই মনীশ বাবুলকে নিয়ে পাশের ঘরে শোয়।

চৌকাঠে পা দিয়েই শ্রাবণী বুঝতে পারল মনীশ পিছন পিছন আসছে।

একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমি কিন্তু স্পষ্ট তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, এ বাড়ীতে থেকে এসব চলবে না।

ঠিক আছে।

শ্রাবণী আর কথা বাড়াল না। আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল।

আবার মাস খানেক চুপচাপ।

এরই মধ্যে শ্রাবণী একটু সাবধান হয়ে গেল। নতুন চুক্তি করল না। মফঃস্বল থেকে মোটা টাকার প্রলোভন এসেছিল, শ্রাবণী প্রত্যাখ্যান করেছে।

বাড়ীর লোকটার সে রাতের চেহারাটা শ্রাবণীর ভাল লাগেনি। তা ছাড়া ছেলে বড় হচ্ছে, তার সামনে এ ধরণের কুৎসিত কলহ করতেও লজ্জা হয়।

মোটরে ফিরতে ফিরতে শ্রাবণী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাড়ী পৌঁছতে বারটা বেজে যাবে।

চীৎকারে মনীশ বাড়ী মাত করে ফেলবে। ঘুমন্ত ছেলেটা চমকে উঠবে সেই আওয়াজে।

অনেকবার নিজের মনে শ্রাবণী দৃঢ় সংকল্প করেছে, এ পথে আর নয়। অর্থের জন্য এভাবে মুখে রং মাখার আর প্রয়োজন নেই। মনীশের উপার্জনে এখন সংসারের ক্ষুধা মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেটা শ্রাবণীর অজানা নয়। কিন্তু অভিনয়ের এই নেশা শ্রাবণীর অলক্ষ্যে তার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা শ্রাবণীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফুলের মালা, হাততালি, প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছুড়ে দেওয়া প্রশংসার টুকরো, পাদ-প্রদীপের উজ্জ্বল আলো, এ সবের মোহ পার হতে শ্রাবণী পারবে না।

মনকে শ্রাবণী শক্ত করল।

মনীশের যদি ক্লাব থাকতে পারে, তাহলে শ্রাবণীরও মঞ্চ থাকবে। মঞ্চকে বাদ দিয়ে তার জীবন অর্থহীন, দুর্বিষহ।

রোজকার মতন দরজা বন্ধ।

তবে অন্য রাতে বার তিন চার টুকটুক করলেই ঝি এসে খুলে দেয়, এ রাতে অনেক করাঘাতের পরও দরজা বন্ধই রইল।

নিঝুম রাত। আশপাশের দু'একটা বাড়ীর জানলায় আলো জ্বলে উঠল। দু'একটা কৌতূহলী মুখও ভেসে উঠল এবার ওধার।

শ্রাবণী চিন্তিত হ'ল। বাড়ীতে বিপদ আপদ কিছু হ'ল না তো? এবার শুধু দরজায় ধাক্কাই নয়, শ্রাবণী একটু গলাও চড়াল, বাবুল, বাবুল।

তাতে কাজ হ'ল। দরজা খুলে গেল।

কিন্তু শ্রাবণী ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল।

মনীশ পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

এ বাড়ীতে ঢুকিবা হবে না। যেখানে ছিলে সেখানেই যাও।

মনীশের কণ্ঠস্বর মোটেই মৃদু নয়। পাশের দু'একটা বাড়ী থেকে সেশ শোনা গেল।

আরো গোটা কয়েক জানলা খুলে গেল। এধারে ওধারে আরো কয়েকটা পরীদের কাঠামো।

শ্রাবণী নিজেকে সংযত করল। মনীশ ধৈর্য হারিয়েছে বলে, শ্রাবণীও চেঁচামেচি করে পাড়া সচকিত করে তুলবে, এটা মোটেই সমীচীন নয়।

তাই খুব কোমল স্বরে শ্রাবণী বলল, সর, আমাকে ভিতরে যেতে দাও আগে। আমার কথা শোন, তারপর বিচার কর।

মনীশ একটি পাও সরল না।

কেবল গলার স্বর একটু নামাল। কিন্তু স্বরে তিক্ততার রেশ একটুও কমাল না।

তোমার কথা অনেক শুনেছি। শুধু কৈফিয়ৎ শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি। এবার তুমি আমার কথা শোন। শেষ কথা।

একটু কেশে মনীশ গলাটা ঠিক করে নিল। ক্রোধের স্পর্শে কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। তুমি অন্য কোথাও আশ্রয় খুঁজে নাও।

এতটার জন্য শ্রাবণী প্রস্তুত ছিল না। মুখ তুলে মনীশকে নিরীক্ষণ করল। বোধ হয় যাচাই করার অভিপ্রায়ে, কথাগুলো কতটা সত্যি, মিথ্যা কতটা।

সারা বিকালের পরিশ্রমের পরে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি শ্রাবণীর ভাল লাগছে না। বিশেষ করে এত রাতে পাড়া জানিয়ে।

একটু জোর করেই মনীশের পাশ কাটিয়ে শ্রাবণী ভিতরে ঢুকে পড়ল।

যেতে যেতে বলল, যা বলবার আস্তে আস্তে বলো। আমি খুব কাছেই রয়েছি। চেঁচাবার দরকার নেই।

শ্রাবণী এগোতে গিয়েই থেমে গেল। মনীশ আবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াও।

কি বল?

বোঝা গেল তোমার পক্ষে থিয়েটারের মেশা ছাড়া সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও বউ নিয়ে ঘর করা সম্ভব হবে না।

বউ? অনেক সংযম সত্ত্বেও শ্রাবণীর গলা কেঁপে কেঁপে উঠল।

হ্যাঁ, তোমাকে আমি তার বেশী মনে করি না। তার চেয়ে মর্যাদা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রাবণী অনেক কষ্টে দেয়াল ধরে টাল সামলাল। চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। সেই ঘুপ্‌সি অন্ধকারের মধ্যে কঠিন ক্রুর একটা মুখের রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

শ্রাবণী ঘর নিল। ঘুসঘুস করে একঘুঠো বাতাস। তারপর নিমজ্জমান মানুষের শেষ চেষ্টার মতন অস্ফুট কণ্ঠে বলল, বেশ আজ রাতটুকু এখানে থাকতে দাও। এত রাতে কোথায় যাব। কাল খুব ভোরে এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যাব। তুমি আর আমার মুখও দেখতে পাবে না।

মনীশ কোন উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

সেই অবসরে নিজের ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে শ্রাবণী কোনরকমে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

শাড়ী, ব্লাউজ কিছু ছাড়ল না। যে ভাবে, যে বেশে বাইরে থেকে এসেছিল, সেই ভাবেই বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। শুধু হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা টিপয়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বালিশে মুখ ঢেকে শ্রাবণী অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

ছোটখাটো কলহ যদি শোকটার সঙ্গে আগেও হয়েছে, কিন্তু তার পরমায়ু বড় জোর দু'তিন দিন।

তারপর সন্ধি হয়েছে। কোন কোন বার শ্রাবণীই এগিয়ে এসেছে ভাব করতে। বেশী ভাগ সেতুবন্ধন করেছে মনীশ।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনীশের মুখচোখের চেহারা কোনবার এ রকম হয় নি। তার মুখের ভাঁজে ভাঁজে দৃঢ় সংকল্পের রেখা ফুটে উঠেছে। এক আচ্ছাদনের তলায় শ্রাবণীর সঙ্গে বাস করতে আর সে রাজী নয়।

অথচ।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে শ্রাবণী ভাবতে লাগল।

এই মানুষটার সঙ্গে প্রথম আলাপ এক অভিনয়ের আসরে। অভিনয় শেষ করে উদ্যোক্তাদের তাড়া করা ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে শ্রাবণী বাধা পেল।

এক ভদ্রলোক পিছনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছে।

শ্রাবণী ঘুরে দাঁড়াল। তখন তার দু চোখে কাজলের টান, গালে, ঠোঁটে রংয়ের ছোপ।

মনীশ দাঁড়িয়ে আছে। বিগলিত চিত্ত। দু চোখে প্রশংসার দীপ।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনীশ একটানা বলে গিয়েছিল। বেশ বোঝা গেল শ্রাবণীর অভিনয় মনীশকে অভিভূত করেছে।

উত্তরে শ্রাবণী শুধু হেসেছিল।

তারপর মনীশ তার বাড়ীর ঠিকানা চেয়েছিল।

এতেও শ্রাবণী আশ্চর্য হয় নি। যোগাযোগ রাখার জন্য অনেকেই বাড়ীর আস্তানার খোঁজ করেছে। শখের দলে অভিনয়ে ডাকবার জন্য। এক অভিনয় থেকে আর এক অভিনয়ের সুযোগ এসেছে।

দিন দুয়েক পরেই মনীশ গিয়ে হাজির হয়েছিল।

এবার কিন্তু মনীশ আশ্চর্য হয়েছিল।

তার ধারণা ছিল এসব মেয়েরা প্রসাধন-নির্ভর। তাদের রূপ যৌবন আহরিত হয় প্রীমরুম থেকে।

কিন্তু শ্রাবণীকে দেখে তার ধারণা বদলাল। মঞ্চের বাইরেও মেয়েটি সুন্দরী।

শ্রাবণী বাইরে বের হচ্ছিল। মনীশকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কি ব্যাপার, আপনার কোন ক্লাস?

মনীশ ঘাড় নেড়েছিল, না আমার কোন ক্লাস নয়। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।

উত্তরটা শ্রাবণীর কানে নতুন ঠেকেছিল। তাদের যারা দেখে, পাদ-প্রদীপের আলোর সামনেই দেখে। আলাদা করে কেউ দেখার কৌতূহল প্রকাশ করে না। মহলার ফাঁকে ফাঁকে দু' একজন লোভের হাত বাড়ায়, সহজলভ্য ভেবে, কিন্তু মনীশকে সে জাতের বলে মনে হ'ল না।

আজ তো কথা বলতে পারব না। আমার রিহার্সাল আছে।

মনীশ একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে ভাবটা কাটিয়ে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

শুধু বাস স্টপ পর্যন্ত নয়, সেদিন মনীশ শ্রাবণীকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। তার রিহার্সালের জায়গা অবধি।

সেই শুরু। তারপর মনীশ প্রায়ই আসত। শ্রাবণীর অবসর থাকলে বসে বসে গল্প করত, আর তা না হলে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। ট্রামে বাসে পাশে বসে এগিয়ে দিত তাকে।

দুজনের সংসারের পরিচয়ও দুজনে জেনেছিল।

শ্রাবণীর সংসারে শুধু বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত বাপ। রোগে শোকে জরাজীর্ণ দেহ। তাঁকে ভরণ-পোষণ

করার জন্যই শ্রাবণী এ জীবিকা গ্রহণ করেছিল। স্বল্পবিত্ত শ্রাবণীর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবও ছিল না।

মনীশের সংসারে কেউ নেই। নিজের সামান্য একটি চাকরি সম্বল। কিন্তু এই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সদা হাস্যময় চেহারার যুবকটিকে শ্রাবণীর খুব ভাল লেগেছিল। তাই মনীশ বিয়ের প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাবণী রাজী হয়ে গিয়েছিল। তার নিজেরও শ্লান্তি এসেছিল। শ্লান্তি আর অবসাদ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না। বিশ্রাম নেওয়া মানেই তো বোজগারের ইতি।

বিয়ের পর শ্রাবণীর সঙ্গে বাবাও মনীশের বাড়ীতে এসে উঠলেন। কিন্তু বুদ্ধের অদৃষ্ট। যে শরীর টিনের বস্তিতে কিছুটা অযত্নেরায় ঠিক টিঁকে ছিল, সেই শরীরের পাকা বাড়ীতে মেয়ের সদা সর্বদা তত্ত্বাবধানে অধঃপতি হ'ল। মাস ছয়েকের মধ্যেই বাবা দেহরক্ষা করলেন।

অনেক দূরে পেটা ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজার শব্দ হ'ল।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনের এ অবস্থায় ঘুম আসাও সম্ভব নয়। শ্রাবণী পাশ ফিরে শুল। দুটো চোখ বন্ধ করে।

কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই যদি সামনের সব কিছু মুছে ফেলা যেত। ভয়, অস্বস্তি, যত দুর্ভাবনা।

শুধু একটা রাত। এত আদর, আপ্যায়ন করে শ্রাবণীকে এ বাড়ীতে এনে এত দ্রুত বিসর্জন দিয়ে দেবে!

বিয়ের পর প্রথম একটা বছর যেন স্বপ্নের রাতের মতন কেটেছিল। এক সঙ্গে আহার, বিহার, আলাপন। অফিস যাওয়ার বিচ্ছেদটুকুও মনীশের অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

তারপর সমস্যা শুরু হ'ল বাবুল হবার পর।

মাসান্তে যে মাইনা মনীশ হাতে পেত, তাতে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরকমে চলে যেত। মাসের শেষে ধারও হ'ত মাঝে মাঝে। এক বিবর খুঁড়ে আর এক বিবর ভরাট করার সেই সনাতন প্রয়াস।

কিন্তু বাবুলকে ভাল করে মানুষ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রস্তুতির ব্যবস্থা এখন থেকেই করা দরকার।

বিপন্ন মনীশই প্রথম কথাটা পাড়ল। শ্রাবণী আবার নিজের জীবিকায় ফিরে যাক। বেশী নয়, কয়েকটা বছর কিছু সঞ্চয় করতে পারলেই আর প্রয়োজন হবে না। ততদিনে মনীশেরও অফিসে কিছু উন্নতি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু দুজনেই বুঝি হিসাবে ভুল করেছিল।

এ আকর্ষণ আলোর প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণের সামিল। আর্থিক প্রশ্নটা উহ্য হয়ে পড়ে, অন্তরের তাগিদে বার বার পাখা-প্রদীপের আলোর সামনে ফিরে আসতে হয়।

তাই প্রয়োজন মিটলেও শ্রাবণী মনের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি।

আজ চরম প্রশ্নটা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। সংসার আর মনের মধ্যে একটা শ্রাবণীকে বেছে নিতে হবে।

কিন্তু সে বাছাবাছির সময়ও বোধ হয় আর নেই। সংসার ছাড়ার নির্দেশ এসে গেছে।

এ আশ্রয় ছেড়ে যেতে হবে। মনীশ সম্ভবত বুঝতে পেরেছে, অভিনেত্রীর জীবন থেকে শ্রাবণী সরে আসতে পারবে না।

ঠিক আছে। সংসারের মানুষটার যদি এই মনোভাব হয়, তবে সংসারেও শ্রাবণীর কোন আকর্ষণ নেই। শরৎ-প্রদীপের জীবনই সে বেছে নেবে।

শ্রাবণী আঙুল গুণে গুণে একবার হিসাব করল।

নিজে যা উপার্জন করে, একলার পক্ষে যথেষ্ট। যদি প্রয়োজন হয়, মফঃস্বলেও যেতে শুরু করবে। আরো বেশী কাজ হাতে নেবে।

খাওয়ার অসুবিধা হবে না।

বিমলা রয়েছে একটা ঘর নিয়ে। এ লাইনের বিমলাদি। প্রৌঢ়ার ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী। অভিনয় করেই একটা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে। ছেলে অবশ্য বিয়ে করে আলাদা থাকে। মার খোঁজও নেয় না।

শ্রাবণী অনায়াসেই বিমলার কাছে থাকতে পারে।

মনকে উত্তেজনামুক্ত করে শ্রাবণী ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বুকের মাঝখানে একটা কাঁটা ফুটে রইল। নড়াচড়া করতে গেলেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা।

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক
সাইকেল কারখানায়
সেন-র‍্যালের তৈরী

যখন শ্রাবণীর ঘুম ভাঙল তখন কাঁচের সার্সি দিয়ে ঘরে রোদ এসে পড়েছে।

শ্রাবণী তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ভেবেছিল ভোরের আলো ফোটবার আগে পাড়া ঘুমন্ত থাকতে থাকতে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়বে। নিজের সামান্য জিনিষপত্র গোছগাছ করে নিয়ে। ঝিকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু এত আলোয় বের হতে গেলেই লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বাড়ীর লোকটার কাছে আর কোন সমস্যা নেই। সে নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।

পাড়ার লোক। তারা হাজার প্রশ্ন, অশেষ কৌতূহল নিয়ে দাঁড়াবে।

পরণের শাড়ীটা বদলিয়ে নিয়ে খাট থেকে নামতে গিয়েই শ্রাবণী থেমে গেল।

একি! চুপি চুপি মাঝরাতে বাবুল কখন পাশে এসে শুয়েছে। কুঁকড়ে একেবারে মার বুকের কাছটিতে।

বাবুল বাপের কাছেই শোয়। আবদার সব কিছুই তার বাপের কাছে।

একটা হাত দিয়ে বাবুলের মাথার চুলগুলো শ্রাবণী ঠিক করে দিল। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা।

বিশ্রী একটা পরিস্থিতি এড়াবার জন্য মনীশ হয়তো ভোরবেলা বাড়ী ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। যাতে নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে শ্রাবণীর চলে যেতে কোন অসুবিধা না হয়।

একলা শুতে বাবুলের ভয় করেছে, তাই পায়ে পায়ে সে এঘরে চলে এসেছে।

কাল রাত্রের কুৎসিত কলহটা বাবুলের কানে যায় নি। বাবুল যারে কাছে কোথাও ছিল না। অত রাত্রে তার জেগে থাকবারও কথা নয়।

নীচু হয়ে বাবুলের কপালে চুমু খেতে গিয়েই শ্রাবণী সাবধান হয়ে গেল। না, থাক, বাবুল যদি জেগে ওঠে? সেও হয়তো প্রশ্ন করবে। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শ্রাবণী পারবে না।

শ্রাবণীর চলে যাওয়ার মধ্যেই বাবুল তার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।

খুব ধীরে, বাবুলকে না জাগিয়ে, নামতে গিয়েই শ্রাবণী চমকে উঠল। কিছুতেই নামতে পারল না। নামা সম্ভব নয়।

বাবুলের জামার সঙ্গে শ্রাবণীর শাড়ীর গিঁট বাঁধা। গিঁটটা যে শক্ত হাতের বাঁধন নয়, সেটা এক নজরেই বোঝা যায়।

কিন্তু শ্রাবণী চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ।

দুটি চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল।

বৃহৎ গ্রন্থিছেদের কথাটাই সারা রাত মনে করেছিল। মনীশের সঙ্গে সকল সম্পর্কের ইতি।

কিন্তু এই ছোট আরো অন্তরঙ্গ গ্রন্থির কথা স্মরণেই আসে নি। সেটাই বুঝি বাবুল এইভাবে মনে করিয়ে দিল।

॥ এক ॥

কথাটা উঠেছিল আজকাল ছেলেদের বুদ্ধি আর মেধার সম্বন্ধে।

সেকেণ্ড মাষ্টার-হরিপদবাবু বলেন,

—আরে বাবা, সেদিন আর নেই যে ইস্কুলের মধ্যে দশটা ছেলে সেটার পাবে, সোটা পনেরো ফার্ষ্ট ডিভিশনে যাবে, এখন সারা ডিভিশনে দশটা ফার্ষ্ট ডিভিশনে যায় কিনা দেখ। কই রে বাবা, মড়িরাম, আন, মুড়িটুড়ি আন।

ইস্কুলের বেয়ারা মড়িরাম বাবুদের টিফিন আনতে গিয়েছিল।

হরিপদবাবুর সামনে এইটু একটা ঠোঙ্গায় মুড়ি আর ক'টা বিড়ি টেবিলে রেখেছিল। হরিপদবাবু চোখ কপালে তুলে বলেন,

—এই মস্ত পয়সায় মুড়ি? এ যে সপনা করা যায় বাবা।

সংস্কৃত টিচার তিনকড়ি দেবশর্মা এককোণে বসে কিমুচ্ছে? বুড়ো হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছে। এইব'র সরকারী আইনে তাকে অবসর নিতে হবে, অর্থাৎ আর কাজ করেও কোনমতে বেঁচে থাকবার অধিকারও হারাতে হবে। এই বয়সে পরিশ্রম করাও যায় না। তিনকড়ি পণ্ডিত চোখ খুলে বলে ওঠে,

—মুড়ি ভাতও আজকাল মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠেছে হরিপদ।

হরিপদ মাষ্টার ওই চাট্টি মুড়ি মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বলে,

—তাই দেখছি।

একটা পিরিয়ড তাদের ক্লাশ নেই।

বাইরের মাঠে দুপুরে খর রোদ লুটিয়ে পড়েছে, দু একটা পুরোনো বট অশত্থগাছ এখনও টিকে আছে কোনমতে, তারই একপাশে তাদা পাঁচীলের সামনে ছেলেরা ভিড় করেছে, বোধ হয় আলুকাবলী না হয় চিনেবাদাম ওয়ালার। কেউ এসেছে।

বৈদ্যদশার ইস্কুল।

এককালে অনেক খোলামেলাই ছিল এর চারিদিকে, ছিল সবুজের ছোঁয়া। এখন এর চারিপাশে বিরাট বিরাট বাড়ী উঠেছে। ইস্কুলের শ্রীবৃদ্ধি করার কথা কেউ ভাবেনি। নোতুন মানুষ নোতুন বসত গড়েছে; সেইসঙ্গে নিদারুণ অবহেলা আর অবজ্ঞায় ইস্কুলের বাড়ীটার চুন পলেস্তারা খসে পড়েছে, মাঠে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল যেন ভূতের বাড়ীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর পরিবেশ।

চারিদিকের ওই প্রাচুর্য আর আধুনিকত্বের মাঝখানে টিকে আছে ওই ইস্কুলটা আর এই মাষ্টার ক'জন। তখন জমিদার ভক্তবাবুদের সাহায্যে এই ইস্কুল গড়ে উঠেছিল। ওঁরাই ওঁদের বাগান একটা ছেড়ে দিয়েছিলেন বাড়ী সমেত, আরও নোতুন বাড়ী তৈরী করিয়ে দেন।

এখন বাবুরাও প্রায় কৌত হয়ে গেছেন, ইস্কুল পরিচালনা তার চলে গেছে সাধারণের হাতে।

ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, বানে ভাসা খড়কুটোর মত এসে জুটেছে হাজারো মানুষ। ছেলেদের সম্বন্ধে তাদের করণীয় একমাত্র কর্তব্য ওই ইস্কুলে পাঠানো তার জন্যেই এসে ধর্না দেয় এই ইস্কুলে।

ওদের জন্যে কোন ভালো ইস্কুলে প্রবেশাধিকার নেই। অথচ বাবা মায়ের সামাজিক কর্তব্য একটু আছে, তাই মৃতপ্রায় আধমরা অনেক ছেলের ছায়া এখানে ভিড় করে।

হরিপদ মাষ্টার মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলে,

—মতিরাম, যা না; এক আনার ঘুগনি কিনে নিয়ে আয়।

ভূগোলের টিচার বসন্তবাবু সবে নোকুন এসেছে স্কুলে, কলেজের গন্ধ এখনও যায় নি। বলে ওঠে,

—রাস্তার ওই ঘুগনি খাবেন?

হরিপদবাবুর ক্লাশ করা ছাড়াও অন্য একটা কাজ আছে।

মাঝে মাঝে বিরক্তি বোধ করেন। কোনকালে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে ছিলেন; তারপর চাকরি নিয়ে ছমাস ট্রেনিং পিরিয়ড কাটাতে হয়েছে, সেই সুবাদে শেষ টিচারির পদটাও পেয়ে গেছেন।

তবু দুপুরের টিকরে পড়া ঠা ঠা রোদ্দুরে আবার একপাল জীর্ণ ছেলেদের লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে ড্রিল করাতে হয়।

—লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, আইজ ফুট!

গলা দিয়ে স্বর বের হতে চায় না, নিজেও বোধে যেমন অস্থির হয়ে পড়ে তেমনি কাহিল হয়ে যায় বেচারা ছেলেগুলো। তবু ড্রিলের ক্লাশ করাতেই হবে।

ভূগোলের টিচারের মুখে স্বাস্থ্যরক্ষার কথা শুনে বলে ওঠেন হরিপদবাবু।

—মাঠে গিয়ে পা ঠুকতে হবে তারা, ও ছোলা মটর সব হজম হয়ে যাবে। তাছাড়া ছেলেরাও তো খাচ্ছে ওই ছোলা।

বৃদ্ধ তিনকড়ি শর্মা চুপ করে শুনছিল ওদের কথা।

বুড়ো অনেক কালের মানুষ, অনেক প্রাচুর্য দেখেছে। সেদিনকার কথাগুলো এমনি দুঃখ হতাশার মাঝে তাই বার বার মনে পড়ে।

বসুবাবুরা সেদিন ছেলেদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন, মাষ্টাররাও পেতেন। চারখানা করে ঘিয়ে ভাজা লুচি, আর আলুর দম।

পেটে তবু তা পড়তো। এখন!

বুড়ো মনে মনে হাসে। কিছুদিন এরা চেষ্টা করে ছেলেদের দুধ দেবার ব্যবস্থা করেছিল, মাঝে মাঝে এখনও যদি কিছু আসে সাহায্য কয়েকদিন দুধ দেবার চেষ্টা করে মাত্র।

ছেলেদের লাইন পড়ে যায়। ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট আর জামা পরা ছেলেরা রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, মুখেচোখের শীর্ণতা ভেদ করে একটু ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে, দুধ পাবে তবু একটু।

মাষ্টার মশায়রাও পান এককাপ করে, কেবল খান না এই বৃদ্ধ তিনকড়ি শর্মা। বলেন,

—ওতে প্রয়োজন নেই বাবা।

হরিপদ মাষ্টার ওর গেলাসটার দুধও নিজের গ্লাসে ঢেলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,

—কেন? খাবেন না কেন?

রেডক্রশের প্যাকেটের দিন, তাই গরম জলে গুলে দুধ হয়।

তিনকড়ি শর্মা বলে,

—অশ্বত্থামার কথা জানো হরিপদ? দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামা!

এর সঙ্গে হঠাৎ অশ্বত্থামার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পারেন না হরিপদবাবু, তিনি পরম তৃপ্তিভরে দুধে চুমুক দিচ্ছেন। তবু দিনান্তে এইটুকু পরমান্ন মেলে, সারাদিনে যা খাটুনি যায়! সকালে দুটো টুইশানি, আবার ইস্কুল থেকে বের হয়ে সন্ধ্যায় পরপর তিন জায়গায় টিউশনি সেরে তবে বাড়ী ঢোকেন। খাবারই বা কি পান! মাছ তো সপ্তাহে একদিন জোটে, তবু এই দুধটুকুই যেন তাঁর মনে দেহে একটু শক্তি সামর্থ্য আনে।

নীচে ছেলেদের কোলাহল চলেছে।

রোদে দাঁড়িয়ে খেলে বেচারারা দুধের লাইন দিয়েছে। কে পাবে, কে পাবে না-তার ঠিক নেই।

বুড়ো তিনকড়ি শর্মা বলে ওঠে,

—সেই অশ্বত্থামা একদিন দুধ খেতে চেয়েছিল, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শিক্ষাব্রতী; দুবেলা দুমুঠো জোটে কি জোটে না। তাঁর পক্ষে দুধ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, ছেলেরও বায়না থামে না। অনেকেই দুধ খায় শুনেছে, সেই বা কেন পাবে না! শেষকালে কিছু আতপ চাল বেঁটে জলে গুলে শ্বেতবর্ণের জলবৎ তরল পদার্থ টাকেই দুধ বলে ধরে দিলেন ছেলের সামনে। অশ্বত্থামাও পরম তৃপ্তিভরে সেই দুধ পান করেছিলেন।

একটু থেমে বলে বৃদ্ধ পণ্ডিত,

—দ্রোণাচার্যের সেই বংশধর আজও চলে আসছে হরিপদ। কি পেরেছি সন্তানদের দিতে? তাদের কি আশা দায় মেটাতে পেরেছি বলতে পারো। তোমরা বল শিক্ষার মান—ছাত্রের মেধা সবই অনেক নীচে নেমে গেছে। কথাটা শুনছিলাম।

হরিপদবাবুর গলায় যেন দুধটুকু আটকে আসে।

নীচে কলরব শোনা যায় দুধ ফুরিয়ে গেছে। আর যোগান দেওয়া হবে না। ছেলেরা রোদে তেতে ঝুঁকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সরে গেছে অনেকেই বিবর্ণ মুখে।

জানলা থেকে সরে এল হরিপদবাবু, নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়। তিনি নিজেই দু' একজনের প্রাপ্যটুকু আত্মসাৎ করেছেন।

—দুধ।

বৃদ্ধ তিনকড়িবাবু বলে চলেছে!

—তবু অশ্বত্থামা বেঁচেছিল, মহারথী হয়ে উঠেছিল হরিপদ, এইটুকুই সান্ত্বনা। ওরা পিটুলি গোলা খেয়েই খুশী হয়, বেঁচে থাকে। অশ্বত্থামা নাকি চারিযুগে অমর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এমন কি কলিযুগেও। অপরের দয়ার দানটুকুর জন্য আজও আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা অন্ধ পাতালে অপেক্ষা করে। নখক্ষত তৈলকণা তিনবার ভূতলে নিক্ষেপ করি আমরা তেল মাখবার আগে সেইটুকুই অশ্বত্থামার প্রাপ্য, তাই নিয়ে আজও সে বেঁচে আছে। ওরা ওইটুকু নিয়েই বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে বৃদ্ধ। কোটরাগত চোখ দুটোয় বেদনার একটু আভাস।

অনেক সুখের দিন দেখেছে বৃদ্ধ। আজ জীবনের শেষ দিনগুলো এমনি হতাশা আর বেদনায় ভরে উঠবে কল্পনাই করতে পারেনি।

বেশন আনার উপায়ও সব সময় হয় না। দুবেলা দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন নি। নিজের ছেলেও স্কুলে পড়ে। ছেলেকে কি ভাবে রেখেছে তা ভাবলেও বৃদ্ধ শিক্ষকের মন বেদনায় ভরে ওঠে। নিজের ছেলেদের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য ছেলেদের কথা মনে পড়ে। ওদের মলিন বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে মুখের কর্কশ তিরস্কারের ভাষা রুদ্ধ হয়ে যায়।

কালই ক্লাশে টাকা দিয়েছিলেন, দু জনজন টাকা করে আনে নি। ঐকাকার একটা ছেলেকে চুলের মুঠি ধরে মারতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

—খাস্ নি?

ছেলেটা জবাব দিল না। নীরব রুদ্ধ দুচোখ থেকে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। ছেড়ে দিল বৃদ্ধ মাষ্টার। ওর উদ্যত হাতই থেমে গেছে। নিজের সংসারেও আজ রেশন আনা হয় নি।

নিজে একবেলাই খায় এখন, ছেলেগুলোর জন্যে কচু শাক আর চাল যা ছিল তাই দিয়েই কোনরকমে পেট ভরিয়েছে। নিজের চোখে সেই বৃদ্ধ দেখতে পায়ে নি তিনকড়ি শর্মা, ঘরে এসেছিল।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। তাই মনে হয় এসব নিছক প্রহসন, বাঁচার পরে আসে শিক্ষার প্রশ্ন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কাদের শিক্ষা দেবে তারা। সে শিক্ষা কতটুকু ফলবতী হবে!

ঘন্টা বাজছে। অলস মধ্যাহ্নের শেষ প্রহরে কেঁপে কেঁপে ওঠে শব্দটা। অলস উদাস সুরে কোন গাছের ডালে ঘুঘু ডাকছে।

আবার কলরব থেমে যায়, ছেলেরা যে যার ক্লাশে গিয়ে ঢুকেছে। টিচার্স রুম ফাঁকা হয়ে যায়। মাষ্টারমশাও ক্লাশে গেছেন।

একাই বসে থাকে তিনকড়ি শর্মা।

এখন তার ক্লাশ নেই। দুপুর রোদে বের হতে পারে না। কিছু টাকার দরকার। নবীন মুদির ওখানেই একবার যাবে, তার ছেলেকে পড়াবার কথা বলছিল; অনেক পয়সা নবীনের। ক'বছরেই ফেঁপে উঠেছে। ওর ওখানেই দেখবে শেষ চেষ্টা করে।

চুলছে বসে বসে। ছেলে দুটো যদি বড় হয়ে উঠতো, পাশে দাঁড়াতো। তাও হ'ল না। তন্দ্রার ঘোরে হরিপদ পণ্ডিতের ড্রিল করানোর হুকুমগুলো কানে আসে।

— ফল ইন্! ষ্ট্যাণ্ড এ্যাট্ ইজ।

রোদে ঝুঁকছে ছেলেগুলো। লাইনবন্দী দাঁড়িয়েছে তারা।

ঐ ছেলেগুলো যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, টলছে। পেটের মধ্যে একটা শূন্যতার জ্বালা অনুভব করে অনেকেই।

রোদের তাপ আর উদরের শূন্যতা দিয়ে তারা শুধু কষ্ট বাড়াতে থাকে। হরিপদ মাষ্টার গর্জে ওঠে।

—এ্যাই মটে-গোবরা? লাইন দিয়ে কর। বেতালা পা পড়লে চাবকে পায়ের ছাল তুলে দোব। রাইট্ লেফট্! রাইট্।

এ্যাই!

গর্জে ওঠেন হরিপদ মাষ্টার।

রোষের তাপে আর খিদের জ্বালায় ওর পা দুটো কেমন অবশ হয়ে আসে।

ছেলেটার চোখের সামনে সাদাকালো অসংখ্য ফুটকি নড়ে বেড়াচ্ছে। বুকের কাছে একটা বেদনা ঠেলে উঠে। দুচোখ বুজে আসে ছেলেটার।

অসাড় দেহটা লুটিয়ে পড়ে রৌদ্রতপ্ত মাটির উপর।

—মন্টে!

হরিপদ মাষ্টার ডাকছে তাকে। কোন সাড়া নেই।

ছেলেটা মেতিয়ে পড়েছে। অন্য ছেলেগুলো ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়—ঘিরে ধরে ওর অচেতন দেহটাকে।

ভিড় হটিয়ে রোদ থেকে গাছতলায় ঘাসের উপর এনে শুইয়েছে তাকে। চোখেমুখে জল দিতে থাকে।

বৃদ্ধ তিনকড়ি শর্মা ঝিমুচ্ছে। কি যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

আগেকার সেই দিনগুলোর কথা ভাবছে। স্বাচ্ছন্দ্যের দিন। ঘরে সেদিন খাবার ছিল, লোকের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে গিয়ে পৌরোহিত্য করেছেন, পেয়েছেন সম্মান প্রণাম এবং প্রণামী।

আজ ছেলেদের মুখে দুধ তো দুধের কথা ওরপেট ভাতও দিতে পারেনি।

—পণ্ডিতমশাই! পণ্ডিতমশাই!

তিনকড়ি পণ্ডিতমশাই চোখ খুলে চাইলো—কি রে?

ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

—মন্টে ড্রিল করতে গিয়ে ফিট হয়ে পড়ে গেছে, সেকেণ্ড স্যার আপনাকে একবার শীগ্‌গীর যেতে বললেন।

তার ছেলে মন্টুই আজ অচেতন হয়ে পড়েছে। দোষ কি!

বৃদ্ধ তবু কম্পিত পদক্ষেপে নেমে চলেছে, হাজার হোক পিতা। পিতৃহৃদয় তবু দুঃখ বেদনা আজও ভোলেনি।

মন্টে তৎক্ষণে উঠে বসেছে। শীর্ণ চোখ দুটো মেলে চেয়ে থাকে।

ড্রিলমাষ্টার জিজ্ঞাসা করে,

—ভাল আছিস মন্টে?

জবাব দেয় বৃদ্ধ তিনকড়ি শর্মা। কম্পিত হতাশা ভরা কণ্ঠস্বর,

—ওরা তবু বাঁচবে হরিপদ। পিটুনি সোলা খেয়েও ওরা বাঁচবে। ওরা অশ্বত্থামার জাত—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চার যুগে ওরা অমর।

বৈকালের রোদ বৃদ্ধ আচার্যের শীর্ণ মুখ কপিকের জন্য উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

স্কুলের ঘন্টা বাজছে চং চং চং।

জীর্ণ পুরাতন বিদ্যায়তনের মন্দে শীর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠের কলরব, প্রাণ চাঞ্চল্য জাগে।

হারজিৎ

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বলো, বলো উমাশশী, কি করে আমার এতবড় ভুল হোল। তুমি ছাড়া আজ আর কেউ দিতে পারবে না এর জবাব, কেউ না।

কথাগুলো বলতে বলতে সার্কাস জগতের সব্যসাচী অর্জুন পাল বুক ফাটা একটা হাহাকার করে স্টেজের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে প্রোপ্রাইটর কালাচাঁদ সরখেল ভীড় করে আসা দর্শকদের সরিয়ে দিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। গেট বন্ধ করে বৃষ্টি বাদলের জন্য তৈরী করা পুরোপো সাইনবোর্ডখানা ঝুলিয়ে দিলে।

'অনিবার্য কারণ বশতঃ আজ খেলা বন্ধ থাকিল।'

এতক্ষণে সরখেল এসে দাঁড়াল উমাশশীর কাছে। ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছেন। সরখেল একবার করুণ চোখে তাকাল তাঁর দিকে। ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পার হয়ে গেছে। তাছাড়া ছোরাখানা একেবারে গিয়ে হৃৎপিণ্ডে বিঁধে গেছে।

যেতে যেতে বললেন, রুগী আর বেঁচে নেই, মিঃ সরখেল, কাকে নিয়ে যাব হাসপাতালে।

তাঁবুর বাইরে ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক জয়প্রকাশ আগরওয়ালা ততক্ষণে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে। পাশে বসে হাঁকাতে হাঁকাতে ইণ্ডিয়ান সার্কাসের হিরোইন বলে চলেছে, একটা খুনে, উঃ কি ভীষণ। ওই লোকটাকে আমাদের সার্কাসে আনতে চেয়েছিলে তুমি। তাহলে হয়েছিল আর কি। ভগবান ঐ খুনেটার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। উঃ কি ভীষণ!

মনে হল এইমাত্র ইণ্ডিয়ান সার্কাসের হিরোইন চম্পাবতীর বুকে একখানা ছুরি যেন আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল।

কালাচাঁদ সরখেল এক সময় নামের সার্কাস পার্টি খুলেছিল। পৈতৃক জমিজমা বিক্রি করে যখন সে সার্কাস খুলে বসল তখন আত্মীয় বন্ধুরা তার অবিবেচনার কটাক্ষপাত করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কালাচাঁদের সার্কাস জমে উঠল। দু'পয়সা আসতে লাগল তা থেকে। প্রথম প্রথম কালাচাঁদ নিজে খেলা দেখাতো। সার্কাসের মোটামুটি সব কটি খেলাই তার আয়ত্বে ছিল। সরখেল দু'চারটি ভাল খেলোয়াড়ও ইতিমধ্যে জোগাড় করে ফেলল। ধীরে ধীরে আসরও জমে উঠল।

কিন্তু যখন থেকে কালাচাঁদ, উমাশশী আর অর্জুন পালকে পর পর দলে নিয়ে এলো, তখন থেকেই সরখেল-সার্কাসের 'গোল্ডেন জুবিলি' শুরু হল।

অর্জুন পালের লক্ষ্যভেদ এক অসাধারণ কৃতিত্ব। ঘূর্ণায়মান চক্রের ভেতর দিয়ে সে যথার্থই বাঘের চোখ বিঁধে দর্শককে অবাক করে দিতে পারত।

আর উমাশশী চলতে পারত তারের ওপর দিয়ে অবলীলায়।

তারের ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে উমাশশীকে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হত, ব্যক্তিগত জীবনেও সেই ভারসাম্য রেখে চলতে হত তাকে। দরিদ্রের ঘরের স্বাস্থ্যবতী, সুদর্শনা মেয়েটিকে দেখে এক দৃষ্টিতেই পছন্দ হয়ে যায় সরখেলের। সার্কাসের হিরোইন করবার ইচ্ছে সেই মুহূর্তেই কালাচাঁদের মনে দানা বাঁধে। কিন্তু দরিদ্র হলেও উমাশশীর বাপ মা কালাচাঁদের প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হতে চায়নি। দু'দশটা টাকার চেয়ে মেয়ের ইজ্জৎ অনেক বড় বলে মনে হয়েছিল তাদের কাছে। কালাচাঁদ সরখেল তখন উমাশশীকে সার্কাসে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। শেষে মাঝবয়সে উমাশশীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে বসল সে। মেঘ কেটে গেল। উমাশশীর বাপমায়ের মুখে হাসি ফুটল। কিছু টাকা নিয়ে মেয়েকে তারা পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে তুলে দিলে কালাচাঁদের হাতে। সেই থেকে উমাশশী কালাচাঁদের 'কৌমার-হর'। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে উমাশশী রক্ষা পেল ঠিক, তবে মনের জ্বালা থেকে সে রেহাই পেল না। উমাশশী সুন্দরী, আর সে তুলনায় কালাচাঁদ একটা বক-রাক্ষস। দেহে জোর আছে অসুরের, কিন্তু শ্রী নেই এক রত্তি। তবু মন ধরে ছিল সে। তারপর যেদিন সাক্ষাৎ অর্জুনের মত লক্ষ্যবিদ অর্জুন পালের আবির্ভাব ঘটল, সেদিন উমাশশীর চিত্ত সত্যিই চঞ্চল হল। কালাচাঁদ, অর্জুন পালকে সার্কাসে নিয়ে এসে উমাশশীকে বলল, এখন থেকে তোমার কপাল ফিরল শশী। একে যদি সার্কাসে ধরে রাখতে পার, তাহলে সারাজীবন টাকার জন্যে আর ভাবতে হবে না।

প্রথম দর্শনেই অর্জুন পালেরও উমাশশীকে ভাল লেগেছিল। উমাশশীর দেহ-সৌরভ ছিল ঠিক, তার চেয়েও চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা তাকে আরও বেশী আকর্ষণ করেছিল। মনে হয়েছিল, সে দৃষ্টি, তার হাতের তীরের চেয়েও তীক্ষ্ণ আর অব্যর্থ লক্ষ্য।

অন্যদিকে উমাশশীর সামনে যখন অর্জুন পাল প্রথম লক্ষ্যভেদের খেলা দেখাল তখন উমাশশীর মনে হল, তীরটা মাছের চোখে বিদ্ধ না হয়ে তার হৃৎপিণ্ডে বিঁধে গেল।

সেদিন থেকে অনেক চেষ্টা করেও উমাশশী অর্জুনের প্রথম দিনের ছোঁড়া বাণটাকে কিছুতেই বুকের ভেতর থেকে তুলে ফেলে দিতে পারল না। এরপর এলো আর এক পরীক্ষার দিন। সার্কাসে নতুন খেলা দেখাতে হবে। একটা লম্বা বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াবে কেউ। তাকে লক্ষ্য করে কিছু দূরের থেকে ভারী, ধারাল ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হবে। সে ছোরাগুলো এমন কৌশলে ছোঁড়া হবে, যাতে ঐ দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির গায়ে একবিন্দু আঁচড়ও না লাগে। অথচ ছোরাগুলো তার দেহকে বেষ্টন করে গাঁথা হতে থাকবে। বোর্ডের গায়ে দাঁড়ান লোকটি বেরিয়ে এলে মনে হবে, ছোরা দিয়ে একটি মানুষ আঁকা হয়ে গেছে।

অর্জুন তার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও রক্তমাংসের কোন মানুষ ঐ বোর্ডের সামনে দাঁড়াতে সাহসী হল না।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে একদিন সার্কাস পার্টির কলাকুশলীরা দেখল, উমাশশী নির্ভীকভাবে অর্জুনের শিকার হতে লম্বা কালো বোর্ডখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেঁপে উঠেছিল সেদিন কালাচাঁদ সরখেলের হৃদয়। কিন্তু নেচে উঠেছিল উমাশশীর বুকখানা আনন্দে। যাকে সে ভালবাসে মনে মনে, তার হাতে মরণ, সে তো 'প্রণয়েরই মরণ'।

উমাশশী, অর্জুন পালের হাতের এক একখানা ছোরাকে যেন পুষ্পস্তবক তুলবার মত তুলে নিচ্ছিল আপনার করে।

প্রথম ছোরাখানা ছুঁড়তে গিয়ে কেঁপে উঠেছিল অর্জুনের হাত। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কিছু দূরে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল সেখানা। কিন্তু তারপর যথার্থ লক্ষ্যবিন্দু ভেদে উঠল অর্জুনের চোখে। হাত একটুও কাঁপল না। অর্জুন পালের চোখের সামনে থেকে তার প্রেমিকা উমাশশী রক্তমাংসের দেহ নিয়ে বিদায় নিল। একখানা সাধারণ খড়ের তৈরী মূর্তিকে ঘিরে যেন তার অভ্যাসের খেলা চলতে লাগল।

শেষ হল খেলা। সবার বিস্ময় দৃষ্টির সামনে থেকে বেরিয়ে এল উমাশশী। কিন্তু প্রবেশ করল যেখানে, সেখানে অর্জুন পাল তার জন্যে প্রেমের আসন পেতে রেখেছে।

এই নতুন খেলা দেখতে গ্রাম-গ্রামান্তের দর্শকেরা ভেঙে পড়ল। কালাচাঁদ, উমাশশীকে হারিয়ে লাভ করল বিপুল সম্মান আর ততোধিক সম্পদ।

জানাশোনা হয়ে গেছে অর্জুন পাল আর উমাশশীর ভেতর। কেউ কাউকে ছেড়ে যে থাকতে পারবে না, তেমনি এক অলিখিত বন্ধন গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। সার্কাসে নতুন প্রাণের ঢেউ উঠেছে। দর্শকেরা কালাচাঁদ সরখেলের সার্কাস দেখতে আসে, জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরে যায় অর্জুন আর উমাশশীর। সরখেলের মনে প্রথম প্রথম তার প্রতি দর্শকদের এই উপেক্ষা বড় বেশী করে বাজত। কিন্তু আজকাল ওটা গা সওয়া হয়ে গেছে।

একদিন অবশ্য কালাচাঁদের কেন জানিনা আত্মহত্যা করতে দারুণ ইচ্ছে জেগেছিল। সেদিন উমাশশীর অর্জুন পালের প্রতি কোন একটা ইসারা তাকে চকল করে তুলেছিল। হয়তো চোখের ভুল, হয়তো বা ঠিক। এই দোটানায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় সে দুলছিল। তারপর তার মনের ভেতর কেমন যেন একটা আত্মহত্যার ভাব জাগল। আর ভাবা মাত্রেই চিন্তাটা যেন তাকে পেয়ে বসল।

তখন পুরোদমে খেলা চলেছে স্টেজের ওপর। এবার, তার বিখ্যাত খেলাটি দেখাবে সরখেল। বিরাট বড় বড় লোহার তিনটি সুঁচোলো রড। তিনটি রড তিন দিকে বেঁকে আছে, আর মাথাগুলো আটকা রয়েছে এক ঠাঁই। ঐ তিনটি রডকে একটি সরু লোহার দণ্ড দিকের ওপর রেখে ওপর দিকে তোলা হবে। তারপর হাতে ধরে থাকা লিকখানাকে কালাচাঁদ ছুঁড়ে নেবে কপালে। এবার ব্যালেন্সের খেলা। কিছুক্ষণ পরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রোপ্রাইটার কালাচাঁদ সরখেল মুহূর্তে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে মাটিতে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোহার সেই আবদ্ধন ভারী সূচিমুখ তিনটি ফলা শায়িত কালাচাঁদের বুকের দু'পাশ আর দুটো পায়ের মাঝখানে আঙুল বিঁধে যাবে মাটিতে।

একটু মাপের ভুল বা ভাবনা এলোমেলো হলেই রক্ষে নেই। ভারী ফলা তিনখানাকে এ ফোঁড়, ও ফোঁড় করে দেবে।

এই খেলাতে অবশ্য একবার করে হাততালি পায় সরখেল। আজ প্রায় পনেরো কুড়ি বছর ধরে সে এই খেলাটা দেখিয়ে আসছে।

সেদিন সরখেলের মন বিচলিত। যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে এবার টেনে নিয়ে গেল দর্শকদের সামনে। গলায় ঝুলছে একরাশ মেডেল। করতালি দিল আজ দর্শকেরা। প্রথম অভিনন্দন।

কালাচাঁদের হাত কাঁপছে থর থর করে। মন বলছে, আজ তার শেষ খেলা। ঐ ত্রিফলার একটা এসে আজ তার বুকে আমূল বিঁধে যাবে। সে তুলে নিল বাঁয়ের সেই তিনটি ফলা লোহার সিকের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে তাকে তুলে নিল কপালের ওপর। করতালি শুরু হয়েছে। কালাচাঁদ হাতও ছেড়ে দিয়েছে। এখনও সে একাগ্রলক্ষ্য। চোখের দৃষ্টি তারা এক হয়ে তাকিয়ে আছে সোনার ফলার দিকে। শুয়ে পড়েছে কালাচাঁদ, আর তীরের মত ফলা তিনটে এসে বিঁধে গেছে কালাচাঁদের তিনদিকে। না, মরা হল না কালাচাঁদের। তার ভেতরকার খেলোয়াড়টা কখন তার মনের ওপর জিতে গেছে।

মরা হোল না ঠিক কালাচাঁদের, কিন্তু সেদিন থেকে সে কেমন মনমরা হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু কেমন গা সওয়া হয়ে গেল।

এখন সরখেলের ভাঙা ঝড়ঝড়ে গাড়িখানা চালিয়ে অর্জুন পাল উমাশশীকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। কালাচাঁদ কোনরকম আপত্তি করে না।

ওরা কখনো বা নদীর ধারে গিয়ে বসে। নিজেরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে নতুন কোন সার্কাস গড়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু একটা সার্কাস পার্টি গড়ে তোলা তো কম কথা নয়। এত টাকা তাদের আসবেই বা কোথা থেকে। মনের কল্পনা মনেই থেকে যায়, ওরা শুধু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

দু'জনে দুজনকার সান্নিধ্যে এসে মনে যে উত্তেজনা লাভ করে খেলার আসরে তার ফল পাওয়া যায়। প্রতিদিনই যেন সরখেলের সার্কাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দর্শকদের চোখের ওপর।

ছোরার খেলাই সরখেল সার্কাসের শেষ খেলা। এই খেলাটুকু দেখার জন্যেই রুদ্ধশ্বাসে দর্শকেরা অপেক্ষা করে থাকে।

সম্প্রতি এই ছোরার খেলায় এক আশ্চর্য যাদু লাগিয়েছে অর্জুন পাল। চোখ বাঁধা অবস্থায় শুধু শব্দ শুনে অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করে দিতে পারে লক্ষ্য। খেলার নাম হয়েছে শব্দভেদী বাণ। বিরাট বোর্ডখানার পেছনে উমাশশীর আকারের চেয়ে কিছু বড় একটি অবয়ব চক দিয়ে আঁকা থাকে। পেছন থেকে ঠিক সেই রেখায় রেখায় একজন আওয়াজ করে যায় আর সেই আওয়াজ শুনে সামনে থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় আগুন জ্বলা ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে অর্জুন পাল। নিভীক সহাস্য দৃষ্টি মেলে অর্জুনের প্রেমের শিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উমাশশী।

এই খেলা দেখতে কাতারে কাতারে লোক লাইন দিয়ে কালাচাঁদ সরখেলের সার্কাসের টিকিট কাটে। কত লোক টিকিট না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

অর্জুন, উমাশশীকে সোহাগে ডাকে দ্রৌপদী বলে।

উমাশশী বলে, মাছের চোখ বিঁধেই তুমি আমাকে জয় করেছ। তোমার ওপর সব থেকে বেশী ভালবাসার অপরাধে আমাকে দ্রৌপদীর মতই স্বর্গের প্রথম সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে।

অর্জুন বলে, দেখো, তোমাকে আমার কাছ থেকে মরণ কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। মরি যদি একই সঙ্গে মরব।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু একদিন কোথায় ভেসে গেল। আর অর্জুনের এই ভালোবাসার ডাঙন ধরাল ইণ্ডিয়ান সার্কাসের হিরোইন চম্পাবতী।

বম্বে থেকে সার্কাস এসেছে। ক'দিন ধরে মফঃস্বল টাউনের পথে পথে বাদ্য সহযোগে সে কি বিপুল জয় ঘোষণা। কত বড় বোর্ডের পোষ্টার পড়ল দিকে দিকে। হাটে বাজারে লোকের মুখে মুখে কত বিস্ময়কর উক্তি।

হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ তো আছেই, তাছাড়া আছে এক ডজনেরও ওপর মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত মেয়ে।

উজান দিল গ্রাম গ্রামান্তের জনস্রোত ইণ্ডিয়ান সার্কাসের দিকে। মনে হল কালাচাঁদ সরখেলের সার্কাস সূর্যের আলোর কাছে মাটির প্রদীপের মত টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

কিন্তু ওপীলোক প্রোপ্রাইটার জয়প্রসাদ আসরওয়ালা।

সরখেল সার্কাসের অর্জুন পালের দুর্দিনের খবর পেয়েই সে লোক লাগিয়েছিল। জাল ফেলা তার ব্যর্থ হয়নি। ইতিমধ্যে অর্জুন পাল কয়েকবার উমাশশীকে কিছু না বলেই ইণ্ডিয়ান সার্কাসে ঘুরে এসেছে। জয়প্রসাদের ইঙ্গিতে হিরোইন চম্পাবতী, অর্জুন পালের জন্য প্রেমের ফাঁদও পেতেছে। ধরা পড়েছে অর্জুন পাল। বোম্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী চম্পাবতীর কাছে এত বড় খেলোয়াড় অর্জুন পাল হেরে একেবারে ভূত হয়ে গেছে।

সুযোগ বুঝে জয়প্রসাদ ডাক দিয়েছে অর্জুনকে। রাজী হয়েছে অর্জুন পাল। দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাবে সে। তার ছোরার সামনে বুক পেতে দেবে এই মোহময়ী চম্পাবতী, সে যেন এক আলাদা উন্মাদনা।

সব কথাই প্রায় এ'কদিনে পাকাপাকি হয়ে গেছে। খবরটা অত্যন্ত গোপনে রাখা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের বোধহয় একটা তৃতীয় নয়ন বলে বস্তু আছে। উমাশশী সেই চোখ দিয়ে তার এত দিনের ভালবাসার প্রাসাদটাতে ফাটলের চিহ্ন দেখতে পেল। অর্জুন পালের অগোচরেই সে চর লাগাল সরখেল সার্কাসের একটি ছেলেকে দিয়ে। এই কিশোরটি ছিল উমাশশীর পরম ভক্ত। অর্জুন পাল আর উমাশশীর ভালবাসার খবর রাখত সে। যখন শব্দভেদী বাণের খেলা চলত তখন সে-ই বোর্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে চকে আঁকা উমাশশীর চেহারায় হাতুড়ীর ঘা দিত।

ছেলেটি ইণ্ডিয়ান সার্কাস থেকে কৌশলে অর্জুন পালের খবরগুলো বের করে আনল। অর্জুন পালের গোপন যাত্রার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর আজই নাকি ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক জয়প্রসাদ হিরোইন চম্পাবতীকে নিয়ে আসছেন সরখেল সার্কাসে অর্জুনের শব্দভেদী বাণের খেলা দেখাবার জন্য। চম্পাবতীর ভয় ভাঙান দরকার। খেলাটা নিজের চোখে দেখলে নিশ্চয়ই সাহস পাবে চম্পাবতী।

সারা বিকেল বসে বসে উমাশশী মাপ জোক করে বোর্ডের পেছনে চক দিয়ে আঁকল নিজের চেহারার রেখাচিত্র। এ কাজটুকু উমাশশী নিজের হাতেই করত। একচুল এদিক ওদিক হলেই বোর্ডের ওপারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই বড় সাবধানে রেখা দিয়ে যেতে হয় উমাশশীকে।

আজ সে রেখা দিয়ে, যা দেবার জায়গাগুলোতে এক একটা করে বিন্দু এঁকে দিল। একটা বিশেষ জায়গায় যত্ন করে আর একটা নতুন বিন্দু বসিয়ে কতক্ষণ আপন মনে হাসল উমাশশী।

খেলা শুরু হল। প্রায় দর্শকহীন গ্যালারীতে বসে দেখতে লাগল জয়প্রসাদ, চম্পাবতীকে পাশে নিয়ে।

আজ উমাশশী পরেছে রক্তরাঙা একখানা ঘাঘরা। জরীর কাজ করা তার পাড়ে। উমাশশী ইচ্ছে করেই আজ রক্তকরবীর ফুল গুঁজেছে চূড়া করে বাঁধা খোঁপায়।

এবার শেষের খেলার বাজনা বেজে উঠল। উমাশশী দৃপ্ত চরণে এসে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে। একবার আড়চোখে তাকাল ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মোহময়ী তারকা চম্পাবতীর দিকে। চোখ বেঁধে তৈরী হয়ে আছে অর্জুন পাল খেলা দেখাবার জন্যে।

হাতে তার অগ্নিশিখা একখানা ছোরা ধরিয়ে দিলে সাহায্যকারী। রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে আছে চম্পাবতী। সে তাকিয়ে দেখছে উমাশশীকে। কত নির্ভয়ে উমাশশী লক্ষ্যবিন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার কেমন যেন রহস্যময় হাসির ছোঁয়া।

বোর্ডের পেছনে শব্দ উঠল। অলন্ত ছোরাখানা অর্জুন পালের হাত থেকে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গিয়ে উমাশশীর মাথার ঠিক ওপরে গেঁথে গেল। মনে হল সেই আলোয় উমাশশীর মুখখানা আরও জ্বলজ্বল করে উঠল। এবার একে একে আওয়াজ হতে লাগল। ছোরাগুলো উমাশশীর দেহ ঘিরে যেন আলিঙ্গন করতে লাগল। এক একটা বিষধর সাপ যেন লক্ষ্যকে আগুনের কথা ভুলে সুন্দরী উমাশশীকে আজ ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে।

আবার একটা আওয়াজ ভেসে এল। ছোরাটা ছুটলো অর্জুন পালের হাত থেকে।

একি হোল! উমাশশীর বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে সেই তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা। তার লাল অঙ্গবাসে আগুন ধরে গেছে ততক্ষণে। যেন বুকের আগুনে পুড়ে মরছে উমাশশী।

চারদিকে হৈ হৈ। ভীত মানুষের আর্তনাদ। সব মিলে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা।

আগুন নিভল, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের রক্ত বুকের ওপর চাপ বেঁধে জমাট হয়ে উঠেছে।

দৌড়ে এল অর্জুন পাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে উমাশশীর বুকের ওপর। তখনও বিদ্রূপের একটা হাসির রেখা ফুটে আছে উমাশশীর মুখে।

সে যেন ব্যঙ্গ করে বলছে, যাবে যাও, তোমাকে ত আমি আর ধরে রাখছি না। এতবড় খেলোয়াড়ের খেলা স্বচক্ষে দেখে ইণ্ডিয়ান সার্কাসের হিরোইন চম্পাবতী কি তোমাকে না নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। যাও, যাও, দেরী করোনা, একটুও না।

আঁচির বসন্ত

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সুষমার এক অদ্ভুত নেশা। শাড়ির নেশা। প্রয়োজন থাক আর না থাক চোখে ধরলেই কিনতে হবে। বেনারসী, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদ, জর্জেট আর কাশ্মীরী সিল্কের একটি ছোটখাট প্রদর্শনী রং আর ডিজাইনের বিচিত্র সমারোহ।

কেনে বটে কিন্তু পরে না। কোথাও যেতে হলেও বড়জোর একখানা ভাল টাঙ্গাইল কিংবা শান্তিপুরী। অথচ যাবার দুদিন আগে থেকে স্বামীকে না ডেকে দশবার জিজ্ঞেস করবে, বল না কোন শাড়িটা পরবো।

প্রথম প্রথম মলয় তার মতামত দিয়েছে। এমনকি কোন রংটা তাকে ভাল মানাবে সে কথাও বলেছে। আজকাল চুপ করে থাকে। তার মতামত চাওয়া হ'লেও তার মর্য্যাদা দেয় না সুষমা। কিন্তু সেদিন আপিস যাবার পূর্বে তারিখটি স্মরণ করিয়ে দিল। তার আপিসের একজন পদস্থ কর্মীর মেয়ের বিয়ে সেদিন। তাকে সস্ত্রীক যেতে হবে। আর এখানে সম্মানের প্রশ্ন—মর্য্যাদার প্রশ্ন।

সুষমা জানে কি বলতে চাইছেন স্বামী। মান মর্য্যাদা বলতে তিনি শাড়ি আর গহনার কথাই বলছেন। সে হেসে বলল, আচ্ছা গো আচ্ছা তোমার কথা আমি ভুলব না।

মলয় আরও কিছু বলতে উদ্যত হ'তেই তাকে বাধা দিয়ে সুষমা বলল, আমায় শেষ কথাত তোমাকে বলেই দিলাম। আবার কেন?

মলয় আপিসের পথে পা বাড়াল। সুষমা আস্তে আস্তে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালার কাছে দাঁড়াল। এটা তার রোজকার অভ্যাস। স্বামী গাড়ীতে ওঠা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ী চলে যেতে আবার নিজের কাজে মন দেয়। আজও ব্যতিক্রম ঘটল না।

সংসারের খুঁটিনাটি কাজ শেষ হ'তে রোজই তার একটা বেজে যায়। আজ একটু সকাল সকালই হ'ল। তাই বলে বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। সন্ধ্যার প্রস্তুতি এখন থেকেই সুরু হবে।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুষমা আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। তালা খুলে উপর থেকে নিচু পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর এক এক ক'রে ভিতরের সমস্ত কাপড় নামিয়ে ফেলল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোন ক্রেতাকে কাপড় দেখাতে বসেছে সুষমা। চতুর্দিকে থাক থাক কাপড় মাঝখানে বসে আছে সে।

সর্বপ্রথমেই সুষমার দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল একখানি যেরুন রং-এর জর্জেটের উপর। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা নরম মোলায়েম ভাব ফুটে উঠল। এই রংএর জর্জেটের উপর এক সময় তার কি আকর্ষণই না ছিল। তখন কত আর তার বয়স হবে। বছর সতের কি আঠারো। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে।

সোনার গহনার উপর কোনদিনই তার লোভ ছিল না। হ'লেও হয়, না হ'লেও কোন ক্ষোভ

নেই কিন্তু শাড়ির ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। সাদা মাঠার কোনদিনই মন ভরতো না। অথচ বাবার কাছে আবদার করেও নিজের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে পারেনি। তাঁর সামর্থ্যের প্রতি সতর্ক আর সজাগ দৃষ্টি ছিল বলেই পারেনি। অক্ষমতার জন্য যদি তিনি মনে ব্যথা পান এই ভয়টাও নিতান্ত কম ছিল না সুমনার।

আরম্ভ হল বিয়ের কথাবার্ত্তা। সুমনা তার কল্পনার সঙ্গে রং মিলিয়ে সুরু করল ছবি আঁকতে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক সম্ভাবনাময় ছবি। সে ছবিতে কত না রং-এর বাহার, রূপের মাধুর্য্য, রসের জোয়ার। কিন্তু এই স্বপ্নের আবেশ কতদিন স্থায়ী হ'ল। ফুলশয্যা রাতের ফুলের মালা শুকাতে না শুকাতেই সংসার তার দাবী জানাতে সুরু করল। এটা না করলে কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে—ওটা ক'রলে নিন্দে শুনতে হবে।

ঘরের বড় বৌ সুমনা। তার অনেক দায়—অনেক দায়িত্ব। সকলকে দিয়ে থুয়ে তাদের সুখ সুবিধের কথা চিন্তা করবার পর যদি সময় পাও নিজের কথা ভাব আর সে ভাবনাটাও যেন একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নইলে তুফান বেধে যাবে। ভয় পেয়ে যায় সুমনা। মনের বন্ধ দুয়ার তার বন্ধই থেকে যায়। স্বামীর কাছেও সে দুয়ার খুলতে পারে না। কি জানি যদি সেখান থেকেও আর এক প্রস্থ ফরমান জারি হয়। আত্মমর্য্যাদা বোধটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান গুমরে গুমরে কাঁদে।

সেদিন এই যেরকম রং-এর জর্জেটখানা কিনে এনে স্বামী তাকে উপহার দিলেন! সুমনা তন্ময় হয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় শাড়িখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাঁজ ভেঙে পরম যত্নের সঙ্গে পরল। তারপর পায় পায় এগিয়ে গিয়ে মানুষ-প্রমাণ আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াল। সর্বপ্রথমে সুমনার দৃষ্টি পায়ের দিকে নিবদ্ধ হ'ল। একটু একটু ক'রে তার মুগ্ধ দৃষ্টি উপরের দিকে উঠতে লাগল। উজ্জ্বল যেরকম রং-এর শাড়িখানি তাঁর দেহকে বেষ্টন ক'রে যেন আরও অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। পা থেকে নিতম্ব, তারপরে কোমর, তারপরে বক্ষদেশ, সেখান থেকে কাঁধের উপর উঠে এসেছে। শাড়ির এক প্রান্ত। তারপর···হ্যাঁ তারপর সুমনার দৃষ্টি গিয়ে স্থির হ'য়ে থমকে দাঁড়াল মুখের উপর। চমকে উঠল—অতীতের সেই সুমনা আজ কোথায়? মুখের নরম ভাব আর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যে হারিয়ে গেছে। দেহের সুগঠিত খাঁজগুলিও আজ চিলে ঢালা—আর মনের রং গেছে ফিকে হয়ে। কাপড়ের রং তাই মনকে রাঙিয়ে তুলছে না। বেমানান লাগছে। বড্ড বেমানান লাগছে সুমনাকে তার অতি প্রিয় যেরকম রং-এর জর্জেটে।

একটি নিঃশ্বাস তার বুক ঠেলে বার হ'য়ে এল। দ্রুত হাতে সে কাপড়খানি খুলে রাখল। যেরকম রং-এর দিন তার ফুরিয়ে গেছে।

সুমনা পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে এল। নতুন করে টেনে নিল আর একখানি শাড়ি। আগুন রং-এর একখানি মূল্যবান বেনারসী। অনেকক্ষণ অপলক চেয়ে থাকে সুমনা। এ রংটির উপরও তার আকর্ষণ কম ছিল না। কিন্তু আজ আর এ শাড়িখানিও তার মনে কিছুমাত্র তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ল না। বরং আক্ষেপের বরফ শীতল একটি ধারা তার বক্ষকেন্দ্র থেকে উত্থিত হ'য়ে উপলব্ধির সুপ্ত কোষ-গুলিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। যখন ছিল না তখন না থাকার চাপা অসন্তোষের আগুন তার মনে ধিকিধিকি জ্বলেছে।

যার করে দশ মেটানোর কিংবা মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াসকে বরাবরই ঘৃণা করত সুমনা। তাই প্রয়োজনেও কোনদিন সে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অথবা নিজের বোনের কাছেও হাত পাততে পারেনি। কিন্তু তার মনের এই দিকটার পানে এমনকি তার স্বামীও চোখ মেলে তাকাননি। সুমনাও মুখ ফুটে কোন কথা বলেনি। তিনি অন্ততঃ সুমনার মনের চেহারাটা দেখতে পাবেন এমনি একটা বিশ্বাস সে মনে মনে পোষণ করতো। কিন্তু তার সে বিশ্বাস একদিন আবার ভেঙেও গেল।

ক্ষোভ তার ছিল কিন্তু সেই ক্ষোভটাই তাকে পেয়ে বসতে পারেনি। স্বামীকে সে ভালবেসে ফেলেছিল। তাই কোনদিনই তাকে আঘাত করে ব্যথা দেবার কথা ভাবতে পারেনি। মাঝে মাঝে সুমনা যুক্তি বিচার দিয়ে নিজের মনকেই বিশ্লেষণ করতে বসতো। মনে হতো যে তার ক্ষোভটুকুও হয়ত ন্যায়সঙ্গত নয়। উপায় নেই বলেই সম্ভবত স্বামীর এই দার্শনিক নির্লিপ্ততা। পারিবারিক মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যই হয়ত বা নিজেও একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছেন।

কিন্তু এত হিসেব ক'রে চলেও মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ক'রতে উদ্যত হয়েছে সুমনার। যত নির্লিপ্ততা কি শুধু তার বেলায়? অপরের ক্ষেত্রে ত রীতিমত উদার। কোনদিন হিসেবে ভুল করেন না! একবারও কেন তিনি ভেবে দেখেন না যে, তাঁর উদাসীন্য আর একজনের মনের উপর কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রতে পারে—তার মনের একটা সুকুমার দিক্ একটু একটু ক'রে মরে যেতে বসেছে। তবুও নিজেকে সে প্রকাশ করেনি। বলতে পারেনি—আমার দিকে একটু তাকাও। তোমার জন্য আর আমার নিজের জন্যও এর প্রয়োজন আছে।

নিমন্ত্রণ ছিল স্বামীর তরফের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। খুবই সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল সুমনা। সঙ্কট মোচনে এগিয়ে এল মেজ ননদ—বড়লোকের স্ত্রী। বাপের বাড়ীতেই ছিল তখন। বলল, যেখানে যাবে বৌদি—ওদের বড় নাক উঁচু। শাড়ি আর গয়না দেখে আদর যত্ন করে।

হাসিমুখে সুমনা বলে, তাই বুঝি মেজদি? ভারী আশ্চর্য্য ত!

মেজ ননদ বলে, আসল রংটা তোমার খুব পছন্দ আমি জানি। আর তোমাকে মানায়েও ভাল। এই বেনারসীটা আর গহনাগুলো রাখো।

মুখের উপর ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি সুমনার। কিন্তু নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছিল তার এ মধুরপুচ্ছ লাগিয়ে আদর যত্ন পেতে সে চায় না, তাই শরীর খারাপের ওজুহাতে যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছিল সে। আসল কারণটা আর কেউ না জানলেও মলয় আন্দাজ করে নিয়েছিল এবং নিজেকে খানিকটা প্রকাশ করেও ফেলেছিল।

সুমনাকে একান্তে ডেকে আদর করে বলল, তুমি যে যাওনি কেন তা আমি বুঝেছি সুমি! আমি খুব খুশী হ'য়েছি।

অবাক হ'য়ে চেয়েছিল সুমনা।

মলয় একটু যেন আবেগের সঙ্গে বলেছিল, তুমি অবাক হবে জানি কিন্তু আমি কিছুটা নিরুপায়। আমার হাত পা শক্ত করে বাঁধা।

সুমনার সেদিনে কি হয়েছিল কে জানে। সে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, তুমি ত পুরুষ মানুষ। শক্তি নেই তোমার?

জবাব না দিয়ে মলয় সুমনাকে আরও নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে ধরল। একজন ভুলে গেল উত্তর দিতে আর একজন ভুলে গেল আদায় ক'রে নিতে……

আবার হাতের দিকে দৃষ্টি ফিরে এল সুমনার। তখনও তার হাতে রয়েছে আগুন রং-এর বেনারসী খানা। তাঁজ খুলে একবার গায় জড়িয়ে মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলল—এটাও অচল…একেবারেই অচল। যেমন না আগুন রংও নয়। কিংকে একেবারে কিংকে।

পুনরায় আর একখানা তুলে নিল সুমনা। বেগুনী…কি ক'রে এই রং পছন্দ করল সে! টেনে নিল আর একখানা…লাল, তারপরে কমলালেবু, কাশ, শেওলা সবুজ, সবুজ, সোনালী নীল, আকাশ নীল, ধানী, আপেল সবুজ, কেনেরী হলুদ, ছাই—হাতে তুলছে আর অতি দ্রুত সরিয়ে রাখছে। এর একটাও সে পছন্দ ক'রতে পারছে না। অথচ এর প্রত্যেকখানিই সুমনা পছন্দ করে কিনেছিল।

আবার হাত বাড়াতে গেছে সুমনা এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে—হ্যালো, মিসেস সেন স্পিকিং…ও তুমি? হঠাৎ টেলিফোন কেন? তোমার বেরুতে দেরী হবে তাই ওখান থেকেই সোজা চলে যাবে? কি বললে? আমাকে একলাই যেতে হবে? গাড়ী পাঠাচ্ছ সাতটায়? না এখনও কিছু ঠিক ক'রতে পারিনি। এখনও অনেক সময় আছে। কি বলছো? পাঁচটা বেজে গেছে? দু'ঘণ্টা সময় কি খুব কম মনে ক'রছ তুমি? হ্যাঁ কথা দিচ্ছি। না না, তা বলতে পারব না। আপত্তি আর পরপ্রতির উপর দিয়ে যাচ্ছ হবে না। তুমি ত জান আমার নিজের পছন্দর উপর খুব বিশ্বাস। বড্ড ছেলেমানুষী ক'রছ কিন্তু। ছেড়ে দিচ্ছি। রিসিভার নামিয়ে রাখল সুমনা।

আবার তাকে দেখা গেল শাড়ির অরণ্যের মধ্যে। মনের রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে তাকে নির্বাচন করতে হবে। আর সেই সঙ্গে গহনা আর প্রসাধন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে সুমনার। ছেলে বি, এ পড়ছে। এদের বাদ দিয়ে সুমনার নিজের বলতে আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে। সুমনার এতক্ষণের অস্থির ভাব হঠাৎ শান্তরূপ ধারণ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুমনাকে স্নান ঘরে দেখা গেল। প্রচুর জল ঢেলে স্নান সেরে আবার ফিরে এল সে, ঘড়িতে তখন ছটা। গাড়ী আসবে সাতটায়। সহর কলকাতার রাস্তা ঘাটের যা অবস্থা তাতে দেরী হ'লেও হ'তে পারে। প্রচুর সময় হাতে আছে। এক কাপ চা খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। চাকরকে একবেলার ছুটি দিয়েছে সুমনা। ভাইয়ের সঙ্গে নাকি দেখা ক'রতে যাবে।

সুমনা নিজে হাতে এক কাপ চা বানিয়ে নিল। চা পান শেষ ক'রে প্রসাধনে মন দিল। চুলটা খুব হাল্কা ভাবে বেঁধে এলো হাতে খোঁপা ক'রেছে সে। তারপরে ওরিয়ন্ট পাড় শান্তিপুরী একখানা তুলে নিলে—আর চিকনের একটি ব্লাউস। পরিপাটি করে কাপড়খানি পরল সুমনা। আয়নার সম্মুখে আবার গিয়ে দাঁড়াল। সুন্দর মানিয়েছে। অরবিন্দর মা ব'লে চিনতে কেউ ভুল ক'রবে না।

কপালে সিন্দুরের টিপটিও সুনিপুণ হাতে এঁকে দিয়েছে। সিঁথির সিন্দুরের রেখাটিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চুলের অরণ্যের মাঝে হারিয়ে যায়নি। ভালই লাগছে নিজেকে দেখতে।

পুনরায় সুমনার দৃষ্টি রঙিন শাড়িগুলির পানে নিবদ্ধ হল। যখন ছিল না তখন কি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল আর আজ……

যাইনি—

গাড়ী নিয়ে এসেছে ড্রাইভার। বাইরে থেকে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল। গাড়ী সময় মত এলেও সুমনা ইচ্ছে ক'রেই একটু দেরী করে বার হল। বেশী বৈ হট্টগোল তার ভাল লাগে না। দেরী ক'রে বার হ'য়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলেই সে সুখী হবে।

বেশ খানিকটা দেরী ক'রেই বার হ'লো সুমনা। গাড়ী নিয়ে বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই কর্মকর্তা থেকে সুরু করে আরও অনেকেই ছুটে এল। সকলের মুখেই এক অভিযোগ, অনেক দেরী করেছেন। কর্মকর্তা সেই সঙ্গে আরও একটু যোগ করেন, সেন সাহেব কিন্তু বহুক্ষণ এসেছেন।

হাসিমুখে অভিযোগটা মেনে নিয়ে সুমনা বলল, সেন সাহেব যে সাহেব তাই ওঁর সময়ের হিসেব আছে। আমি আবার একেবারেই ঢিলেঢালা বাঙালী।

মেয়ে মহলে আসতে কনের মার মুখেও একই অভিযোগ শোনা গেল। এখানেও ত্রুটী স্বীকার ক'রে নিয়ে তাকে ঠাণ্ডা দিয়ে দিল সে। কিন্তু চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে একটা তীব্র অস্বস্তিতে সুমনা খানিকক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে রইল। অবিনাশ বাবুর স্ত্রী, সুরথ বাবু আর নটবর বাবুর স্ত্রী তাকে ঘিরে ধরল। বলল, চিনতে পেরেছেন আমাদের?

দুঃখের উপর কেমন করেই বা সুমনা বলে যে, তাদের চিনতে ওর সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। তবুও একটুখানি হেসে বলে, না চিনবার কোন কারণ আছে কি?

অবিনাশ বাবুর বয়স্কা স্ত্রীর শাড়ির চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল রং, পিঠ উদ্‌লো হাতাহীন, পেট কাটা ব্লাউস আর মুখের এনামেল পেষ্টে সুমনাকে রীতিমত লজ্জা দিল। শুধুই কি অবিনাশবাবুর স্ত্রী। সুরথবাবুর স্ত্রীও কম কি? কি তার শাড়ি পরবার শ্রী··· দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে সাপের মত আঁটসাঁট করে বেষ্টন করে কাঁধের উপর থেকে একটি প্রান্ত এমন অদ্ভুত ভাবে পিঠের উপর ঝুলে রয়েছে যে তার কাপড় পরার কেরামতিতে মুগ্ধ হ'তে হয়, কিন্তু রুচিকে প্রশংসা করা যায় না। সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে নটবর গৃহিণী। সবুজ শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, সবুজ নখের পালিশ, সবুজ টিপ এমন কি ঠোঁটের রংটি পর্যন্ত ম্যাচ করে ব্যবহার করা হ'য়েছে। এই মহিলা যখন তার যুবক পুত্রের হাত ধরে সুমনার কাছে এসে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—সম্ভব হলে সে ছুটে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা ক'রত। কিন্তু পারেনি। ছেলেটির জন্যই পারেনি।

নত হ'য়ে ছেলেটি সুমনার পায় হাত দিতেই সুমনা আস্তে হ'ল। ওর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে আশীর্বাদ জানাল, অনেক বড় হও তুমি। খুশি হলাম তোমাকে দেখে।

নটবর গৃহিণী চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ে তেড়ে পড়ে, তুই ত মাকেও কোনদিন প্রণাম করিস নে সুদীপ!

সুদীপ একবার মার একবার সুমনার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে আর কাল বিলম্ব না ক'রে সুমনা ফিরে যাবার তাগিদ দিল মলয়কে।

গাড়ীতে বসে স্বামী স্ত্রী কারুর মধ্যে একটিও কথা হল না। সুমনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। যুদ্ধান্তে ক্লান্তির মত।

অনেক রাত হয়েছে। রাস্তা ঘাট প্রায় ফাঁকা। টালিগঞ্জ রেলওয়ে পুল পার হ'তেই গাড়ীর গতি বৃদ্ধি পেল। রেড রোডে পড়ে আরও বৃদ্ধি পেল। গাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে

হাওয়া ঢুকছে। ভাল লাগছে সুষমার। অন্য কোন দিন হ'লে সুষমা চীৎকার করে চাকরকে বাধা দিত। আজ সে নির্বিকার। কিছুক্ষণ পূর্বের অতিজ্ঞতা আর স্মৃতিকে যত শিগ্র পিছনে ফেলে আসা যায়।

বাড়ীতে ফিরে এসে সুষমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে হঠাৎ স্বামীর মুখের উপর চোখ তুলে মিষ্টি করে একটু হাসল। বলল, দেখেছো?

দেখেছি—

দেখাইত স্বাভাবিক।

অমন করে করে দেখাতে চাইলে—

বাধা দিল সুষমা, থাক আর ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না। কিন্তু মর্যাদা রক্ষা হ'য়েছে ত?

তুমি আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা ক'রছ না তো সুমি?

সুষমা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল, না—তাছাড়া লজ্জা আমাদেরই পাওয়া উচিত। আমি শুধু তোমার মনের কথাটা জানতে চাইছি।

আমি সব বোধ করেছি। কিন্তু একটা জিনিষ আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না সুষমা।

কি?

দিনের পর দিন এত যে নানা রংএর দামী দামী শাড়ি কিনলে তা কার জন্য, আর কিসের জন্য? কোন দিন ত ব্যবহার ক'রলে না!

সুষমা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর?

সুষমা বলল, যদি বলি আমার অরবিন্দর বৌর জন্য কিনে রাখছি?

এই অসম্ভব কথা আমাকে তুমি বিশ্বাস ক'রতে ব'লছ?

সুষমা শান্ত হেসে জবাব দিল, সত্যিই তাই। অরবিন্দর বৌ এলে ওর হাত দিয়ে দিনের পর দিন উপহার পাবে। বৌরা সেই শাড়ি পরে খুশীতে উপচে পড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আমি দুচোখ ভরে দেখব আর প্রাণ ভরে উপভোগ ক'রব।…

চমকে ওঠে মলয়। সুষমা আজ আর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। তাকে বুঝতে মোটেই কষ্ট হ'চ্ছে না তার। কিন্তু…

খানিক চুপ ক'রে থেকে গভীর আবেগের সঙ্গে ডাকল, সুষমা—

সুষমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি—চোখে ভালবাসার অভিব্যক্তি। আস্তে আস্তে বলে, আজ আর কথা নয়—

মলয় নীরবে চেয়ে থাকে।

ছায়া পূর্বগামিনী—

শ্রীসুধীন্দু গোস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায়—

অলৌকিক বলতে কি বোঝায়, তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমার জানা নেই। মনের কোন ডাইমেনশনে তা প্রকাশ পায় বা দৃষ্টিগোচর হয় সে বিষয়েও আমার বিশেষ জ্ঞানের অভাব, তবু আপাতঃদৃষ্টিতে এমন সব ঘটনা ঘটে যা সাধারণ বিচার বুদ্ধি বিবেচনার ধরা দেয় না, অঙ্কশাস্ত্রের ফর্মুলা দিয়ে বা তর্কশাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে যাপে যাপে বিশ্লেষণ করেও পাওয়া যায় না, বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটরীতেও তার যাপজোক চলে না। হয়তো সকলেরই জীবনে এমন দুএকটা ঘটনা ঘটে যার সারমর্ম বুদ্ধি গ্রাহ্য হয়নি।

বক্ষিমী ভাষায় বলি, আমার পিত্রালয় বালীতে, গঙ্গার কাছে। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়ি—গরমের ছুটী, ক্লাস বন্ধ। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়াই—নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় জীবন—আর আম কলকার দিকে লোভ। বহু যুগের ওপার থেকে আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে একটি নিদাঘতপ্ত সন্ধ্যার কথা। আমরা সবাই বাইরে বসে গল্পগুজব করছি, কারিনি রিক্রিয়েশন বললেই হয়—রবিবারের বিকেল, এমন সময় সম্পর্কে আমার এক পিসতুতো ভাই এসে বললো। তার নাম ছিল পঞ্চানন, তারা আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতো, আমারই সহপাঠী ছিল—তবে ম্যাট্রিকের পরেই বাপের সঙ্গে পোর্ট কমিশনরের আফিসে ঢুকেছিল এবং মা মারা যাওয়ায় তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। বাবা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন—কীরে, তোর শরীরটা শুকনো কেন? অসুখ টুখ করেনি তো? দেখি তোর নাড়ীটা—

আমার বাবা হাইকোর্টের উকীল হলে কি হয় মক্কেলের ফ্রিকের সঙ্গে রোগীর নাড়ী পরীক্ষাও মাঝে মাঝে করতেন—ভৃগুসংহিতা আর জ্যোতিষচর্চাও চলতো। তিনি বালী থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেই কোর্টে আসতেন—ষ্টীমারে অর্থাৎ পোর্টকমিশনরদের কেরী জাহাজে। তখনকার দিনে রসিক কর্তৃপক্ষদের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেতো জাহাজগুলির নামকরণে—মালবিকা, মহুলিকা না হলেও কারো নামটি মোহিনী, কেউ ছিলেন ললিতা। তাঁরা সবাই ছিলেন গজেন্দ্রগামিনী—এডিগ্রাদহ থেকে বড়বাজার পর্যন্ত জাহাজ চলতো—প্রায় ঘন্টাখানেক লাগতো বালী থেকে। সুবিধে হতো কলকাতার অভিজাত মেকার বাবুদের, তাঁরা ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী হয়ে সকালে বিকালে গঙ্গাবক্ষে হাওয়া খেতেন, বাত ব্লাডপ্রেসার ডায়েবিটিসের প্রতিষেধক রূপে আর সঙ্গে থাকতো গড়গড়া, চাওয়ালি ভরতি সন্দেশ, কুঁজো ভরতি সুপের জল, মিঠে পানের খিলি ইত্যাদি। গঙ্গাবারিনি কল্যাণকারিনি।

সেকথা থাক—নাড়ী দেখে বাবা বললেন—ওরে পঞ্চা, তোর নাড়ীতে জ্বর রয়েছে, রসন্থ, তুই আজ রাতে কিছু খাসনি, লঙ্ঘন দিস, আর শুয়ে থাকগে যা।

পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার আমরা আর কোন খোঁজ খবর করিনি—কিন্তু ঐদিন রাত্রে আমাদের আর এক বিশিষ্ট বন্ধু ও সহাধ্যায়ী, নাম—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এখন হাওড়া বারের একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল—এই সেদিন পর্যন্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন—তিনি হঠাৎ এক স্বপ্ন দেখে বললেন—আগামী শুক্রবার বিকালে আমি (অর্থাৎ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁদের বাড়ীর সামনে

দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে চেঁচিয়ে বলছি—এইমাত্র চারটে বাজল পক্কা মারা গেল, চলো শ্মশানে যেতে হবে। তিনি উপরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আমি নীচে গলিতে।

মঙ্গলবার ভোরে উঠে এই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর দিদিমা ও মামাকে (ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক পরলোকগত শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়) বলেন—তাঁরা তাকে বললেন—এসব অলুক্ষুনে কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিসনি, আর ওদের কানে যেন না আসে, বাপের ঐ একটি ছেলে বেঁচে, সবই ত ঘরে বেঁচে গেছে, মা নেই—ছেলের বিয়ে সবে দিয়েছে, চাকরীবাকরী করছে, জোয়ান ছেলে অসুখ বিসুখও শুনিনি। মামা বিজ্ঞানী মানুষ, বললেন—স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। মঙ্গলবার শুধু জ্যোৎস্নাবাবু একবার খবর নিতে এলেন, তিনি প্রায়ই আসেন, যান খবর নেন, বছরখানেক আগে স্ত্রী মারা গেছেন, পক্কার খবরও নিলেন। আমি বললুম—তার একটু জ্বর হয়েছে, শরীরটা খারাপ। তিনি একটু গম্ভীর হলেন, কিছু বললেন না, আমরাও কিছু বুঝলাম না, শুধু জিজ্ঞেস করলেন —কে দেখছে। আমি জবাব দিলাম—পাঁচুবাবু ডাক্তার।

সেইদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রেই জ্বর বাড়লো—বুধবারও একরকম, বৃহস্পতিবার রোগী অত্যন্ত চঞ্চল ও বিকারগ্রস্ত হলো—ডিলিরিয়মে ঘরে রাখা দায়—সারারাত আমাদের কাটলো রোগীর বাড়ী—অন্য ডাক্তারেরাও এলেন। সকালে হাওড়ার সিভিল সার্জেন কর্ণেল ওয়াটারস্ পর্যন্ত—তাঁরা নাম দিলেন ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। শুক্রবার দিন দুপুরবেলায় একটু ছাড়া পেয়ে এবং নার্সিংএর জন্য রাত্রি আসতে হতে পারে বলে, ওরেহি নিজেদের বাড়ীতে এলে। আগের রাত্রি জাগরণের ফলে শরীর ক্লান্ত ছিল—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আজও স্পষ্ট মনে আছে, হঠাৎ একটা চীৎকারে ও মার ডাকাডাকিতে ও চাপা কান্নায় ঘুম ভেঙে গেলো ও লাফিয়ে উঠলুম—আমাদের পিতামহদের আমলের একটা বড় দেওয়াল ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে চারটে বাজছে।

আমার উচিত ছিল তখনি ওদের বাড়ীর দিকে ছুটে যাওয়া, অবচেতনে সেই ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু রাস্তায় নেমে কে যেন জোর করে আমার গতিনির্দেশ করে দিলে অন্যদিকে—আমি বহুবাজারের মত চলে গেলাম—জ্যোৎস্নাবাবুদের বাড়ীর দিকে—বেশীদূর অবশ্য নয় এবং ভাবলাম—ওর বাবা, অসহায়, বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনরা অনুপস্থিত—কলকাতার সহরতলীতে এই সময়ে সবল সমর্থ পুরুষরা কেউ থাকে না,—ওদের বাড়ীতে শুধু ওর বাপ ছাড়া (তিনি সেদিন আফিস যাননি) এক বৃদ্ধা ঠাকুমা আর এক বালিকা ভগিনী। অতএব লোকজন জোগাড় করা যাক—শ্মশানের ব্যবস্থা ত সব করতে হবে। হয়তো অবচেতনে আরো ছিল—একা এই সব সামলানোর ভীতি।

আমি গিয়ে ডাক দিতেই জ্যোৎস্নাবাবু উপরের বারান্দা থেকে বললেন—আসছি, পক্কা মারা গেলো নাকি? আমি বললাম—তুমি ওর মধ্যেই জানলে কি করে? ওঁর মাতুল ও মাতাবহীও বেরিয়ে এলেন—চোখের জলে ভিজিয়ে সেই গল্পও শুনলাম—একথাও বললেন যে আমি যেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকবো ও খবর দেবো, সেটাও আগে থাকতে জ্যোৎস্নাবাবুর দেখা ছিল। আজও মনে মনে বিশ্লেষণ করে এর সাধারণ যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি। কাকতালীয় কিনা তাও জানিনা, হয়তো কবির ভাষায় বলা যেতে পারে "Coming events cast their shadows before" কিম্বা এটা শুধু একটা premonition. কিন্তু এই ঘটনা চক্রের অদৃশ্য সূত্রে আমিও বাঁধা রয়ে গেলুম স্বপ্নদর্শকের সঙ্গে এবং সেটাও মিলে গেলো কেন এইটাই ভাবি। "আমিও বাঁধা তুমিও বাঁধা যুক্তি কোথাও নাই।"

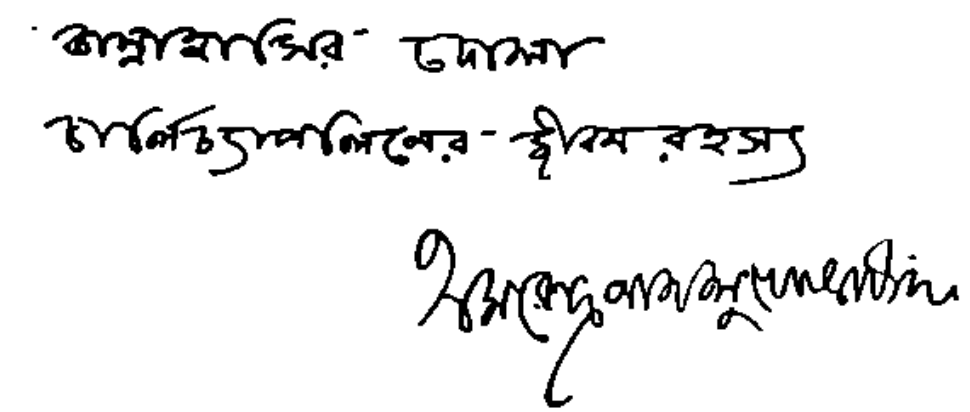

চার্লি চ্যাপলিন। একটি মানুষ। একটি নাম। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সেই একটি নাম সারা পৃথিবীতে যে মোহ বিস্তার করেছে, যে প্রীতি আকর্ষণ করেছে, তার আর বোধ করি তুলনা নেই। তাঁর নানা ছবির মধ্যে যেমন অনেক আশ্চর্য উদ্ঘাটন, মানুষের মনের অনেক অবচেতন অনুভূতির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখে দর্শক বিহ্বল হয়েছেন, তেমনি পাঠকবর্গ বিহ্বল হবেন তাঁর বিরাট আত্মজীবনী পড়ে। তাঁর ছবির মতই সেই আত্মজীবনী, অকপট, উদার, মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর প্রীতিতে পরিপূর্ণ! সেই বহুশত পৃষ্ঠার আত্মচরিতে কোথাও তিনি নিজের অহমকে প্রকট করেননি, গোপন করেননি তাঁর জীবনের দুর্বল মুহূর্তের অগণ্য গভীর ত্রুটি। এই অনন্যতম জীবনবেদের কাহিনী বাংলায় লেখবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে চার্লি চ্যাপলিনকে এক পত্র দিয়েছিলাম তাঁর গত জন্মদিনে। সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি লিখেছেন—

CHRLES CHAPLIN April 21st, 1965

Dear Mr. Mookerji
Thank you very much for your kind letter which made me very happy.
Your sincerely
Charles Chaplin

ছেলেবেলার কান্নাকরা দিন

অনাহার, অর্ধাহার, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, বিবান্ধব নিরাশ্রয়—শৈশবের সেই অসহ্য স্মৃতি অকপটে ব্যক্ত করেছেন চার্লি তাঁর জীবনচরিতে।

একটি দিনের স্মৃতি যা আজও তাঁর মনের গভীরে জেগে আছে, তাই দিয়েই তিনি তাঁর জীবনগাথা শুরু করেছেন।

বছর ১২ তখন বয়স।

তখনকার লণ্ডন, সে ছিল এক অন্য লণ্ডন। শান্ত, সুখ, উদ্বেগ সমস্যা হীন, নিশ্চয়ন্ত এক আধঘুমন্ত জনপদ।

রবিবার সকাল। চার্লিদের বাসা যে রাস্তায় সেই কেনিংটন রোডের ওপর দিয়ে টুংটাং শব্দে চাটুঘোড়ার গাড়ী চলেছে, সেই গাড়ীতে বসে আছেন ঘড়ি, ঘড়ির-চেন আঁটা আঁটসাঁট পোষাক পরা

কোনো রইস নাগরিক। অদূরে যে সরাইখানা আছে সেইখানে গিয়ে ওঁরই মতন আর কয়েকজন পাহাড়ীর ভাইবেরাদার-এর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন। খোলপত্র আর মজুরান চলবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

চার্লি পথে দাঁড়িয়ে বিস্ময় এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে সেই সব মহামানুষের আনাগোনা লক্ষ্য করতেন। এক একজন কেমন টাল খেতে খেতে রাস্তা পার হতেন, এক একজন কেমন সুরে বেসুরে গান করতে করতে কাঁদতে শুরু করতেন, এক একজন কেমন ভাবের আবেগে অভিনয়ের ভঙ্গীতে প্রস্থান করতেন, সেইসব মজার দৃশ্য দেখতেন চার্লি আর মনে মনে তাদের ছক তুলে নিতেন।

সেই রবিবারেও সকাল বেলা খানিকক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে চার্লি তাঁদের সেই আলো-বাতাসহীন নিরানন্দময় ৩ নম্বর পাইনাপল টেরাস-এর ঘুপ্সিঘরে ফিরলেন।

সেদিন সেই ঘরটি চার্লির কাছে যেন আরো নোংরা আরও অন্ধকার বলে মনে হল।

অন্যদিন তাঁর মা সকালে উঠেই ঘরদোর পরিষ্কার ছিমছাম করে রাখেন।

আজ তিনি সকাল থেকে সেই যে তাঁর জানলার ধারে বসে আছেন তো বসেই আছেন।

বিছানা ওলচাল, হাতলভাঙা চায়ের কাপ আর একটা কলাইকরা প্লেট মেঝের গড়াগড়ি যাচ্ছে। কালকের কাচা জিনে জামাগুলো পর্যন্ত শুকোতে দেয়া হয়নি।

অন্যান্য রবিবারে চার্লি দেখেছেন তাঁর মা ঘরদোর কি সুন্দর ভাবে গোছগাছ করেন। দুইতারের জামা প্যাকেট ছেঁড়া জায়গাগুলি রিপু করে তাদের কেচে পরিষ্কার করে রাখেন। তোর না হতেই চা আর টোষ্ট তৈরী করে ছেলেদের ডেকে তোলেন। তাই দুঃখ মিষ্টি পরিবেশে দিনটি আরম্ভ হয়। কিছুদিন আগে চার্লির বড় ভাই সিডনি জাহাজে চাকরি নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। ২ মাস তাঁর কোনো খবর নেই। মা বোধকরি সেজন্য খুব চিন্তিত হয়েছেন। চার্লি লক্ষ্য করেছেন গত তিনদিন তাঁর মা এই ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে জানলার ধারে বসে আছেন। তাঁর মা সেলাই ফোঁড়াই এর কাজ খুব ভাল জানতেন। একটি সেলাই কল ভাড়া করে এনে পড়শীদের ফ্রক প্যান্ট তৈরী করে কিছু টাকা রোজগার করছিলেন এবং সেই সামান্য উপার্জন দিয়ে কোনোরকমে দুবেলা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ভাড়া বাকি পড়ায় সেলাই কলওয়ালারা সেলাই কলটি নিয়ে চলে গেছে।

মা এতদিন মঞ্চে গান গেয়ে ভালই রোজগার করছিলেন কিন্তু গলার অসুখে স্বরভঙ্গ হওয়ায় সেখানেও যেতে পারছে।

চার্লি বুঝতেন সব। সেই বয়সেই রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে নেচে ভিক্ষা করে কিছু কিছু রোজগার করে আনতেন প্রায় প্রত্যহ।

সেদিনও সেই বাড়িখানার সামনে অনেকক্ষণ ধরে চমৎকার নাচ এবং গান করেছিলেন। কিন্তু নিষ্করুণ ভাগ্য সেদিন তাঁর প্রতি একেবারেই বিমুখ হয়ে রইল। একটি পয়সাও পকেটে এলনা।

বাড়ী ফেরবার পথে একবার ভাবলেন, পড়শী ম্যাকাবিদের বাড়ী গিয়ে সেই বাড়ীর ছেলে, তাঁর বন্ধু, ওয়ালির সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করেন। ওয়ালিরা সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ। ওয়ালির মায়ের সঙ্গে চার্লির মার বেশ ভাব ছিল। চার্লিকেও তাঁরা ভালোবাসতেন। তাঁদের বাড়ীতে গেলে জলখাবারটা ভালই জুটত।

কিন্তু সেদিন চার্লির যেখানে যেতে ইচ্ছে করল না। সোজা বাড়ী এসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁদের সেই মাঠকোঠার ঘরে ঢুকলেন।

চার্লির মা তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর দু'চোখে গভীর অবসাদ আর বিরক্তি। তাঁর সেই রুক্ষ বিবর্ণ যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ঠেলে কান্না উঠল। তাড়াতাড়ি হাসিমুখে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মা বললেন—"এখনই চলে এলে কেন? যাও, ম্যাকাথিদের বাড়ী গিয়ে সেখানে ওয়ালির সঙ্গে খেলা করগে।"

চার্লি বললেন—"না মা। আমি আজ তোমার কাছেই থাকব।"

ক্লান্ত দু'চোখ মেলে মা বললেন—"আমার কাছে আজ কিছু নেই। ঘরে একখানা খাবার নেই। তুমি ম্যাকাথিদের বাড়ী যাও। খাবার সময় তারা নিশ্চয় তোমাকে খেতে ডাকবে।"

চার্লি বললেন—"আজ আমার খেতে ইচ্ছে করছেনা।"

মা বললেন—"না খেলে যে সারাদিন উপোস করে থাকতে হবে বাবা।"

কিছুক্ষণ মায়ের কোল ঘেঁসে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন চার্লি। তারপর অত্যন্ত কাতর চিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ম্যাকাথিদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন।

• • • •

১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল রাত ৮টার সময় যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন চার্লি সে সময় আকাশে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ছিল বুঝি বিচিত্র। জন্মস্থান লণ্ডনের ইষ্ট সেন্ড। আত্মচরিতে চার্লি লিখেছেন যে, জ্ঞানের উন্মেষ হবার পর ছোট বেলাকার স্মৃতি তাঁর মধুর।

দুই ভাই। সিডনি তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়। নানারকম ম্যাজিক আর কসরৎ দেখাতে বড়ভাই ছিলেন তাঁর ওস্তাদ। হাঁ করে পয়সা খেয়ে ফেলতেন তারপর মাথায় চাঁটি মেরে মাথার ভেতর থেকে সেই পয়সা বার করতেন। তখন চার্লির বয়স সাড়ে তিন, সিডনির সাড়ে সাত। চার্লিও দাদার মত ম্যাজিক করতে গেলেন এবং একটি সেন্সি গিলতে গিয়ে গলায় বাধিয়ে বিষম কাণ্ড করে তুললেন। শেষপর্যন্ত ডাক্তার এসে সাঁড়াসি দিয়ে গলা থেকে সেই পয়সা বার করলেন।

চার্লিদের অবস্থা তখন বেশ স্বচ্ছল।

তাঁর মা ছিলেন একটি ছোট পাঁচমিশেলী রঙ্গালয়ের গায়িকা। বিচিত্রাভিনয়ে তাঁর গানের অংশ থাকতো। দুটি ছেলে নিয়ে ছোট্ট বাসায় সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তিনি সংসার করতেন। চার্লি জন্মাবার পরেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল।

চার্লির বাবাও ছিলেন মকাভিনেতা। এবং তিনিও ছিলেন গায়ক। অতিরিক্ত মদ্যপ ছিলেন বলেই চার্লির মার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি।

তখনকার দিনে এই রকম বেশী মাত্রায় মদ খাওয়ার ফলে অনেক ভাল ভাল শিল্পী অকালে মারা পড়েছেন বলে চার্লি তাঁর আত্মচরিতে ক্ষোভ আর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চার্লির বাবাও সেই কুফলের দৃষ্টান্ত। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। ছেলের কাছে বাপের কথা যখন বলতেন মা, তখন তাঁর চোখে মুখে কারুণ্য, মমতা এবং বিষাদের যে ছবি ফুটে উঠত, চার্লি তা চিরকাল মনে রেখেছেন।

চার্লির দাদামশাই চার্লস হিল ছিলেন একজন আইরিশ চর্মকার। তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে চার্লির মা ছিলেন বড়। তাঁর আসল নাম ছিল লিলি হারলে।

১৮ বছর বয়সে লিলি একটি আধাবয়সী ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পালিয়ে আফ্রিকায় চলে যায়। সেখানে কিছুদিন বনেদীয়ত এবং বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসেন। লিডনি আফ্রিকায় জন্মেছিলেন।

চার্লির বাবার সঙ্গে তাঁর মায়ের অনেক আগে থেকেই পরিচয় এবং ভালোবাসা ছিল। তাঁরা একসঙ্গে দু'তিনটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

চার্লির বাবা পলাতকা প্রিয়াকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না। তাঁদের বিয়ে হল। তিন বছর পরে চার্লি জন্মালেন।

চার্লির যখন এক বছর বয়েস তখন তাঁর বাবা মার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। মার রোজগার তখন ভালই। অতএব তিনি খোরপোষের দাবী করলেন না। মাতাল স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে তিনি নিজের মনের মতো বাস করতে লাগলেন। ছেলে দুটিকে নিয়ে শান্তি এবং আনন্দের মধ্যে।

কিন্তু বিনা মেঘে যেন বাজ পড়ল চার্লির সংসারে।

একদিন ষ্টেজে দাঁড়িয়ে গান করতে করতে চার্লির মা কাসতে লাগলেন, তাঁর গলা ভেঙে গেল, সুরেলা কণ্ঠস্বর বিকৃত হল, তিনি আর গাইতে পারলেন না।

সে কণ্ঠস্বর তিনি আর ফিরে পাননি। ফলে তাঁর কাজ গেল।

চার্লির বয়স তখন ৫ বছর। প্রায় প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে যেতেন এবং উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর গান শুনতেন। শুনে শুনে মায়ের গাওয়া গানগুলি তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন মায়ের বদলে চার্লি থিয়েটারে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর মা আসতে পারবেন না, তার বদলে তিনি এসেছেন।

—"তুমি এসে আর কি হবে হে ছোকরা?"

—"আমি গান করব। মায়ের গানগুলো আমার মুখস্থ আছে।" বললেন চার্লি।

তাঁর কথা শুনে ম্যানেজার তো হেসেই খুন। বলে কি বাচ্চাটা। যার গলা টিপলে দুধ বেরোয় সে গাইবে গান ষ্টেজে দাঁড়িয়ে।

চার্লি অনুনয় করলেন, ম্যানেজার একবারটি পরীক্ষা করে দেখুন না। অবিশ্যি তিনি অন্য ঢংয়ে গানগুলি গাইবেন। লোক হাসাবেন গান গেয়ে। লোকেরা হাসতে পারলেই তো সবচেয়ে খুশি। ৫ বছর বয়েসেই চার্লি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের সার কথাটি বুঝে নিয়েছিলেন—লোকে হাসতে পারলেই সবচেয়ে খুশি।

শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার চার্লিকে হাত ধরে ষ্টেজে নিয়ে গিয়ে খাড়া করালেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "লিলি হারলে অসুস্থতার জন্যে আজ আসতে পারেন নি। তাঁর বদলে তাঁর এই ছেলে এসেছে। সে তার মায়ের গাওয়া গানগুলি আপনাদের গেয়ে শোনাবে।"

ঐটুকু একটা বাচ্চা ছেলে। কিন্তু কি রকম ভেঁপো ভেঁপো লাগছে তাকে দেখতে। সে আবার গান করবে! আচ্ছা দেখি শোনাই যাক।

চার্লি তখন হেলে দুলে বাজনার তালে তালে গান করতে লাগলেন।

শ্রোতাদের সে কি আনন্দ। চটাপট হাততালি। হুঁচোর শব্দে ষ্টেজের ওপর পয়সা পড়তে

লাগল। দর্শকরা আনন্দে পয়সা ছুঁড়ে দিতে লাগল। সে সময় এ রকম পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া রীতি চালু ছিল।

• • • •

কারাগার দিন। দ্বার আর বন্ধ। চার্লিকে দু'তিন দিন পরেই ম্যানেজার আলাদা করে দিয়েছিলেন। বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে আর কতদিন চলবে। দর্শক এবং শ্রোতারা নায়িকার গান শুনতে চায়। বড় ভাই সিডনি জাহাজী কাজে তখনও সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরছেন। চার্লি কাজ খুঁজছেন। যে কোনো কাজ। কিছুদিন খবরের কাগজ বিক্রী করলেন। তারপর কিছুদিন জুতো বুরুশের কাজ।

সিডনি ফিরে এলেন। তাঁরও কোনো কাজ নেই।

অবশেষে পাড়াপড়শীর পরামর্শে দুই ছেলের হাত ধরে চার্লির মা এক অনাথ আশ্রমে ঢুকলেন। দুই ভাই থাকতেন আর কাজ করতেন অনাথ আশ্রমের বিভাগে। খাটতে খাটতে আর মার খেতে খেতে এক একদিন তাঁরা আধমরা হতেন।

তাঁদের মা থাকতেন মেয়েদের মহলে।

একদিন একজন নার্স এসে চার্লিকে জানালো যে তাঁর মায়ের মাথা বিগড়ে গিয়েছে এবং তাঁকে পাগলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় স্থানীয় আদালত চার্লির বাবাকে তলব করে জানালেন যে অতঃপর ছেলে দুটির ভার তাঁকেই নিতে হবে।

• • • •

চার্লি এবং সিডনি কিছুদিন তাঁদের বাবার কাছে ছিলেন। সেই বাড়ীতে চার্লির একটি সৎমাও থাকতেন। যেমন তাঁর রুক্ষ মেজাজ তেমনি তাঁর কটু কথা। "কোত্থেকে ঐ আপদ দুটো আবার জুটলো।" দুই ভাইকে তিনি সর্বদা দাঁতে পিষতে লাগলেন।

বাবার সঙ্গে ছেলেদের দেখাশোনা কদাচিৎ হয়। ভোরেই তিনি বেরিয়ে যান, কোন রাত-দুপুরে, তাও স্বাভাবিক অবস্থায় নয়।

একদিন গভীর রাত্রে তিনি বাড়ীর দরজায় এসে দেখলেন, আধো অন্ধকারে একটি ছেলে বন্ধ দরজার সামনে ফুটপাতের ওপর বসে আছে।

কে ছেলেটা। এতরাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে এভাবে রাস্তার ওপরে বসে আছে?

কে তুমি? কোথায় থাক?

চার্লি উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে দেখে কেঁদে ফেললেন।

—"একি তুই। বাচ্চু। এখানে এভাবে বসে কেন বাবা?"

কাঁদতে কাঁদতে চার্লি বললেন,—"সিম্মিরা তাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের। বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন। দাদা কি জানি কোথায় চলে গেছে। আমি তো পথঘাট চিনিনা, তাই এখানে বসে আছি।"

ছেলের কথা শুনে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। ছেলের হাত ধরে বললেন, "আয় আমার সঙ্গে।"

দরজার গিয়ে দমাদম্ ধাক্কা দিলেন। গিন্নি এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে ছেলেকে দেখে মুখ ভেংচে কি একটা কটূক্তি করে উঠলেন।

চার্লির বাবা ছেলেকে নিয়ে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে গৃহিণীও এলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চার্লির বাবা বললেন—"তুমি এদের বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছো কেন।"

মুখঝামটা দিয়ে মহিলাটি বললেন—"বেশ করেছি। আমার খুশি। যত সব আপদ। দূর হোক ওরা। ওদের সঙ্গে তুমিও দূর হও।"

"বটে।" হঠাৎ চার্লির বাবা যেন ক্ষেপে গেলেন। হাতের কাছে ছিল একটা মোটা হাতলওলা ঘরঝাড়া বুরুশ। সেইটা তুলে নিয়ে সজোরে মারলেন গিন্নির মাথায়। হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত লেগে মহিলাটি মাটীতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ব্যাপার দেখে চার্লি শিউরে উঠলেন, হতভম্ব হলেন। বাবার আচরণে তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জাগল তাঁর মনে।

কিন্তু তিনি সত্যি এরকম চণ্ডাল স্বভাবের মানুষ ছিলেন না।

স্মৃতি মন্থন করে চার্লি বলেছেন যে, সকালবেলা সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর বাবা এবং সৎমা দুজনে বসে কত হাসি ঠাট্টা করতেন। তাঁর বাবা যে তাঁর এই সৎমাকে খুবই ভালোবাসতেন সে বিষয়ে চার্লির মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

দুটীর দিনে দুই ছেলেকে নিয়ে চার্লির বাবা তাঁর সৎমার ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা গল্প করতেন।

আর সেই সময় বা সেইসব দিনে ঐ মহিলাটিরও মেজাজের কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না হোত। চোখ পাকিয়ে কটু কথা নেই, দাঁতে পেষা নেই, ছেলেদুটিকে খেতে দিচ্ছেন, আদর করছেন, চুমু খাচ্ছেন —যেন এক নতুন মানুষ!

মাসখানেক বাদে খবর এল চার্লির মা সুস্থ হয়েছেন। এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

চার্লি এবং সিডনি ফিরে গেলেন তাঁদের মায়ের কাছে।

• • • •

বিখ্যাত লেখক জোসেফ কনরাড তাঁর বন্ধুকে একবা লিখেছিলেন যে, একটি কানা ইঁদুর ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আর অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছে কখন তার মাথায় লাঠির বাড়ি এসে পড়বে। সেই কানা ইঁদুরটি কে জান? আমি।

চার্লি মনে করতেন নিষ্করুণ ভাগ্যের হাতে তাঁর জীবনেও জোসেফ কনরাডের ঐ উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু তা হলেও তিনি আশা ছাড়েন নি। খবরের কাগজ হেরী করেছেন, ছাপাখানায় জমাদারের সহকারীর কাজ করেছেন। খেলনা আর ঝুঁকো সিগি তৈরী করেছেন। ডাক্তারখানায় ঘরের কাজ করেছেন, কাঠুরেদের সঙ্গে কাঠ কেটেছেন, গৃহভৃত্যের কাজ পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু এইসব ছোট কাজের মধ্যেও তাঁর মনের আকাশে আশার বিহঙ্গ তার পাখা বন্ধ করেনি। তাঁকে অভিনেতা হতে হবে। তাঁর রক্তের মধ্যে অভিনয়ের বীজ উপ্ত আছে। তাকেই ফলে ফুলে সার্থক করতে হবে।

কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে নিজের একমাত্র পোষাকী সাজটি পরে তিনি বেডফোর্ড ষ্ট্রীটে

থিয়েটার এজেন্সীর অফিসে উপস্থিত হতেন। সেদিনও যথারীতি অফিস ঘরে যে কেরাণীটি খাতা লিখছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চ্যাপলি।

লোকটি মুখ তুলে চাইল। বলল, "কি চাও?"

—"আপনাদের নাটকে কোনো ছোট ছেলের পার্ট আছে স্যার?"

কেরাণী ধমক দিয়ে বলল—"যাও যাও ফিরে কোরোনা।"

সেদিন হঠাৎ অফিসের কর্তা ব্ল্যাকমুরের নজরে পড়লেন চ্যাপলি।

ব্ল্যাকমুর তাঁর হাবভাব এবং কথাবার্তা শুনে হাসলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তাঁকে এক চিঠি লিখে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এক থিয়েটার-মালিকের কাছে।

সেই থিয়েটারের মালিক হ্যামিলটন তো খুদে অভিনেতাকে দেখে রীতিমত বিস্মিত। এই এতটুকু ছেলে, আগে রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়িয়েছে। সেকি পারবে স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে। কত বয়স তোমার? চৌদ্দ (চ্যাপলি বয়েস দেড় বছর বাড়িয়ে বলেছিলেন)।

হ্যামিলটনের 'শার্লক হোমস' নামে নাটকটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে 'বিলি' নামে একটি ছোকরা চাকরের পার্ট ছিল।

সেই ভূমিকায় যে অভিনয় করত সে চলে গিয়েছে। তাই হ্যামিলটন নতুন লোক খুঁজছিলেন।

চ্যাপলি ঘাড় উঁচিয়ে বললেন—"আমি পারব।" মাইনে যার্থ ছেলে সপ্তাহে—২ পাউণ্ড ১০ শিলিং। মাইনের অঙ্ক শুনে চ্যাপলির মাথা ঘুরে গেল। প্রতি সপ্তাহে এত টাকা। এ যে কল্পনাতীত। মুখে কিন্তু সে তার প্রকাশ করলেন না। বললেন—"আচ্ছা আমার মাকে জিজ্ঞেস করে মতামত জানাব।"

হ্যামিলটন হাসছেন। যতই ছেলেটিকে তিনি দেখছেন ততই মজা লাগছে তাঁর। অফিসের অন্যান্যদের ডাকলেন। বললেন—"দেখে যাও তোমরা। আমরা এক নতুন বিলি পেয়েছি।"

অনেকে সেই ঘরে এসে জড় হোল। সকলেই খুশি হল চ্যাপলিকে দেখে।

বেশ ছেলেটি। বেশ স্মার্ট দেখতে তো। ভাল ছেলে। এর উন্নতি হবে।

চ্যাপলি ভাবছেন, হঠাৎ এ কি হল! পৃথিবীর চেহারা কেমন করে এক মুহূর্তে এমন বদলে গেল। যে ধরিত্রী তাঁকে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেই আবার তাঁকে এখন কোলে তুলে নিয়েছে। চাকরিতে বহাল হবার পর হ্যামিলটন বললেন, "এবারে তুমি আমাদের প্রধান অভিনেতা 'শার্লক হোমস্' নাটকের নায়ক সেন্টস ফ্রেয়ার সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমাকে তোমার পার্ট বুঝিয়ে দেবেন।"

অফিসের একজন লোক চ্যাপলিকে সেন্টস ফ্রেয়ার কাছে নিয়ে গেল। সেখানেও তাঁদের সেই উৎসাহ।

অভিভূত বিহ্বল চিত্তে বাড়ী ফিরলেন চ্যাপলি। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ উপলব্ধিটুকু মনের মধ্যে জাগছে। তাহলে প্রতি সপ্তাহে ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং। সে তো অনেক টাকা। তাহলে আর হোটেলের সামনে গিয়ে ফেলে যাওয়া পাউরুটির খোসা কুড়িয়ে খেতে হবে না। উপোস ক'রে দিন কাটাতে হবে না!

• • • •

কিন্তু দুর্বিপাকের তখনও বুঝি শেষ নেই।

ইতিমধ্যে বাবা মারা গেছেন। মা আবার পাগল হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন।

সিডনি ছোটখাট একটি কাজ জুটিয়েছেন, এই যা একটু সুখের কথা।

এমনি সময়ে চার্লি তাঁর বহুদিনের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার সুযোগ পেলেন। তাঁর মায়ের বহুদিনের সাধ ছিল চার্লি অভিনেতা হবেন, কারণ তিনি মনে করতেন তাঁর ছেলের মধ্যে বাপ এবং মায়ের অভিনয়কুশলতার ধারা প্রবাহিত আছে।

আমাদের দেশের যাত্রা পার্টির মত হ্যামিলটনের দল মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ায়। সেই দলে ভর্তি হয়ে চার্লি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দ্বিতীয়বার ট্যুরে যাওয়ার আগে চার্লি দাদাকেও তাঁদের দলে ভর্তি করিয়ে নিলেন। মাহিনা প্রতি সপ্তাহে ৩৫ শিলিং।

কয়েক দিন পরে দুই ভাই যখন গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার দলের অভিনেতা রূপে নানা মফঃস্বল শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময় তাঁরা খবর পেলেন যে তাদের মা সুস্থ হয়েছেন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

খবর শুনে চার্লির আনন্দের অবধি রইল না। রোজগার করছিলেন, দুবেলা পেট ভরে খাচ্ছিলেন, নতুন নতুন পোষাক পরছিলেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তেমন আনন্দ পাচ্ছিলেন না। মা ভাল হয়েছেন, আবার তিনি মায়ের কাছে থাকতে পারবেন, মায়ের হাতের রান্না খাবেন, মাকে নতুন পোষাক কিনে দিতে পারবেন এই আনন্দ যেন চার্লিকে পূর্ণ সার্থকতা দান করল। সেই সফর শেষ করে দুই ভাই মাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতলেন।

কিছুদিন পরেই আবার তাঁদের সফর শুরু হল। চার্লি দলের সঙ্গে সফরে বেরিয়েছেন এমন সময় একটা খবর এসে তাঁকে যেন এক মুহূর্তে বাজপড়া গাছের মত বিবর্ণ বিশীর্ণ করে দিলে।

তাঁর মা আবার মাথার রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন এবং তাঁকে রীতিমত ঘরে বেঁধে উন্মাদ আশ্রমে পাঠাতে হয়েছে।

তাঁর স্মৃতিকথায় চার্লি বলেছেন, দুঃখের দেবতা মানুষকে যে কতভাবে আঘাত করেন তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তাঁর মনেও করুণা জাগে। তাঁর মাও শেষকালে সেই করুণা পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ সাত বছর তিনি পরম আরামে যাপন করেছিলেন। তাঁর চারদিকে ঘিরেছিল ফুলের সমারোহ আর হর্ষের আলো। ছোটছেলের অসংকোচ নাম, কল্পনাতীত অর্থপ্রাচুর্য। বড় ছেলেও কৃতী, তার উপার্জনও কম নয়। শেষ সাত বছর তিনি চার্লির কাছে ছিলেন। সেই সাতটি বছরের স্মৃতি চার্লির কাছে আজও বড় মধুর লাগে।

• • • •

একদল থেকে আর এক দল। উন্নতির এক সোপান থেকে আর এক সোপান। কাল্পনিকরা দিন বুঝি শেষ হয়েছে চার্লির জীবনে।

ফ্রেডকারনো ছিলেন তখনকার দিনের এক নামকরা থিয়েটারওয়ালা। সিডনির একাধিক অভিনয় দেখে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে সাপ্তাহিক ৪ পাউণ্ড মাহিনায় নিজের দলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। চার্লি ভর্তি হলেন কে. সির সার্কাসের দলে। কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর ফ্রেডকারনো তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সেই সময় ক'রনোর একটি বিশেষ সাফল্যপূর্ণ নাটকের অভিনয় চলছিলো। তার নাম 'ফুটবল ম্যাচ'। সেই নাটকের নায়ক ছিলেন হ্যারি ওয়েল্ডন নামে এক

খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা। কারনো বললেন, "ওয়েলডনের সঙ্গে তোমার প্লে করতে হবে। পারবে?" চার্লি গম্ভীরভাবে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "সুযোগ চাই। নিশ্চয় পারবো।" কারনো মৃদু হাসলেন।—"তোমার বয়েস বড় কম। মোটে ১৭। চেহারা দেখলে আরো কম বলে মনে হয়।"

দুই ভ্রূ ঈষৎ কুঁচকিয়ে চার্লি উত্তর দিলেন, "মেকআপ করে ঠিক করে নেওয়া যাবে।"

কারনো আবার হাসলেন।—"আচ্ছা দেখা যাক।"

দু'সপ্তাহের জন্যে পরীক্ষামূলক নিয়োগপত্র পেলেন চার্লি সাপ্তাহিক ৩ পাউণ্ড মাহিনায়। যদি তাঁর কাজ পছন্দসই হয় তাহলে এক বছরের জন্যে কনট্রাক্ট হবে।

প্রথম রাত্রিতেই আসর মাৎ করে দিলেন চার্লি।

ইতিপূর্বে এক ওয়েলডনই দর্শকদের হাসাতেন। সেদিন রাতে দর্শকরা এক নতুন অভিনেতার কাছ থেকে নতুন নতুন হাসির খোরাক পেতে লাগল। তোবার তলিয়ে গেলেন ওয়েলডন।

এ ছোকরা কোথায় ছিল এতদিন? স্টেজের ওপর যেন চমকী বাজি দেখাচ্ছে। লম্ফ ঝম্ফ, ভিগবাজি, নষ্টামি মিনিটে মিনিটে বিভিন্ন মুখভঙ্গী আর ভাবপ্রকাশ—এক কথায় চার্লি দর্শকদের খুশিতে হাসিতে একেবারে মাৎ করে তাসিয়ে নিয়ে গেলেন। এক বছরের কনট্রাক্ট হয়ে গেল সাপ্তাহিক ৪ পাউণ্ড মাহিনায়। লণ্ডনে ১৪ সপ্তাহ চলবার পর সেই নাটক নিয়ে কারনো কোম্পানীর সফর শুরু হল।

প্রত্যেক স্থানেই চার্লির জয়জয়কার। এক এক শহরে দু'তিনটি নাট্যশালায় একই দিনে বিভিন্ন সময়ে চার্লির দল অভিনয় করত। পাঁচটায় এক রঙ্গালয়ে, আটটায় আর এক ঘরে, দশটায় অন্য কোনো নাট্যশালায়। বাস রিজার্ভ করা থাকত। উত্তর শহরতলীতে অভিনয় শেষ করেই সাজ-পোষাক পরা অবস্থাতেই তাঁরা যেতেন হয় দক্ষিণ বা মধ্য শহরতলীতে।

চার্লির যখন বয়েস ১৯, সেই সময় তিনি অন্য একটি থিয়েটার-পার্টির একটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তার নাম হেটিকেলী। চার্লির প্রথম প্রেম। স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

১৯০৯ সালে কারনো কোম্পানীর দলের সঙ্গে চার্লি সেই প্রথম দেশের বাইরে গেলেন। প্যারিস।

চার্লির মনে উত্তেজনার অন্ত নেই। প্যারিস। যা শুধু স্বপ্নেই ছিল, এতদিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবে? এ যে তাঁর কাছে এক অভাবিত সৌভাগ্য।

মানুষ যেমন তারিয়ে তারিয়ে মদ খায়, চার্লি তেমনি করে প্যারিসকে উপভোগ করতে লাগলেন সেখানে পৌঁছে। রবিবার তাঁদের ছুটি। সেই ছুটীর দিনে চার্লি কোসী বার্জারে অভিনয় দেখতেন। অভিনয়ের পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফরাসী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে শরাবখানায় ঢুকে আকণ্ঠ মদ্য পান করে হয়ত বা রাস্তার ওপরেই নাচগান শুরু করে দিতেন।

ছ' সপ্তাহ পরে ইংলণ্ডে ফিরে আবার গ্রামে গ্রামে তাঁর দল ঘুরতে লাগল এবং সেই সঙ্গে তিনিও। সিডনি অন্য একদলে কাজ করছেন। দুই ভায়ের মধ্যে নিয়মিত পত্র ব্যবহার আছে। সিডনি মায়ের খবর রাখেন বেশী। চার্লি দাদার কাছ থেকে মায়ের খবর পান।

এমন সময় কার্নোর মাঞ্চিন শাখার ম্যানেজার সেখান থেকে জানালেন যে আমেরিকার

ইংলণ্ডের কোনো কৃতী কৌতুকাভিনেতাকে পাঠাতে পারলে খুব ভাল হয়। এই রকম অভিনেতার চাহিদা আমেরিকায় কম নয়।

খবর শুনে চার্লি উৎফুল্ল হলেন।

ইংলণ্ডে তাঁর যতটা ঐতিহ্য সম্ভাবনা ছিল তা হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু হবে না। কারণ তাঁর লেখাপড়ার দৌড় অতিশয় কম। কোনো বড় নাটকে বা বড় দলে অভিনয় করবার মত তাঁর ক্ষমতার পরিচয়-পত্র নেই। অতএব এখানে সং সেজে এই ধরণের খেলো রং তামাশা পর্যন্তই সার।

চার্লি আমেরিকায় যাবার জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্থির করলেন যদি সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে তিনি সেখানেই বাকি জীবন কাটাবেন।

যাত্রার আগের দিন দেশ ছেড়ে যাবার পূর্বক্ষণে মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চার্লি রাত্রিবেলা অনেকক্ষণ অবধি লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালেন।

• • • •

১৯১০ সালের ৩রা অক্টোবর নিউইয়র্কের কলোনিয়াল থিয়েটারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। নাটকের নাম 'আউআউস'। প্রধান ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করল। পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর ছবি এবং প্রশস্তি।

আমেরিকান দর্শকদের মন জয় করলেন তিনি। প্রথম দিন নিউইয়র্ক শহর আর সেই শহরের মানুষদের দেখে চার্লি কিন্তু অত্যন্ত সন্ত্রস্ত বোধ করেছিলেন। এখানকার মানুষগুলো সকল সময়ই যেন ছুটছে। কেউ কারো নয়। স্ব স্ব প্রধান। চারিদিকে বিষম কোলাহল আর বিপুল কর্মব্যস্ততা। সবই যেন বিরাট ব্যাপার। মানুষগুলো যেন যন্ত্র। এদের মন বলে কিছু আছে তা যেন মনেই হয় না। এদের মনোরঞ্জন করা বুঝি চার্লির কর্ম নয়।

দ্রুত ধাবমান জীবন। সেই জীবনের সঙ্গে তাল খাওয়ানো সহজ কথা নয়। কিন্তু চার্লির স্বভাবের মধ্যে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল সেই প্রত্যয় দিয়ে তিনি সকল বাধাকে অতিক্রম করবেন, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করলেন।

সপ্তাহখানেক বাদে কারনো সম্প্রদায় নিউইয়র্ক থেকে ক্রুকলিনএ গেলেন। সেখানকার পত্রিকায় লেখা হল—"এ সপ্তাহে অরফিউম থিয়েটারে কারনো সম্প্রদায়ের অভিনয় হচ্ছে। দলের প্রধান রঙ্গাভিনেতার নাম চার্লস চ্যাপলিন। ব্রুকলিনের ব্রিটিশ সমাজ তাঁর সম্মানার্থে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন।"

জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তাঁর। যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই দর্শক তাঁর অভিনয় দেখবার জন্যে দলে দলে ছুটে আসছে।

বহু মফঃস্বল নগরে অভিনয় করে কারনো সম্প্রদায় নিউইয়র্কে ফিরে আসবার পর হঠাৎ একদিন কীস্টোন পিকচার কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা এ্যাডাম কেসেল-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল।

চার্লির সেদিনকার অভিনয় তিনি দেখলেন। তারপর অনুষ্ঠানের শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দুচার কথার পর কেসেল বললেন—"চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চাও?"

একটু ভেবে ঘাড় নেড়ে চার্লি বললেন, "না।" কেসেল বললেন—"টাকাই যদি রোজগার করতে হয় তো কোন বড় সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।" কারনোর কাছে চার্লি যা মাইনে পাচ্ছেন তার ডবল মাইনে তাঁরা তাঁকে দেবেন।

মনে মনে চমকে উঠলেন চার্লি। অনেক আবেদনের পর তাঁর মাইনে তখন সপ্তাহে ৮ পাউণ্ডে এসে ঠেকেছে। তা-ও একটা মাস আমেরিকায় আছেন শুধু সেই কটা মাসের জন্যে। লণ্ডনে ফিরে গেলেই তাঁর মাইনে আবার কমে যাবে।

আর এই লোকটা বিনা এক কথায় তাঁকে সপ্তাহে ১৬ পাউণ্ড মাইনে দিতে রাজি হয়ে গেল। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবুও এক কথায় চার্লি রাজি হতে পারলেন না। বললেন, "ভেবে দেখি, পরে আপনাকে বলব।"

সেদিন কেসেলকে ফিরিয়ে দেবার পর চার্লি অনেকক্ষণ ভাবলেন। আমেরিকায় এসে এখানকার চলচ্চিত্র তিনি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর ভাল লাগেনি। লোকে অবশ্য আজকাল ফিল্ম দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, কিন্তু শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের তখন নিতান্তই শিশু অবস্থা। নানা রকম শব্দ সৃষ্টি করে ছবির অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তোলবার যে সব আয়োজন চার্লি দেখলেন তা তাঁর কাছে হাস্যকর বলে মনে হল। ছবির পর্দায় কেউ যখন দৌড়চ্ছে তখন বাজনা বাজছে খুব দ্রুতলয়ে, ঘনঘন ছুটছে, আড়াল থেকে ঘনঘনের ঘণ্টা বাজছে—এসব যেন নিতান্তই ছেলেমানুষি বলে মনে হয়েছিল চার্লির।

• • • •

আমেরিকা সফর শেষ করে কারনো সম্প্রদায়ের লণ্ডনে ফিরে যাবার সময় এলো।

সেই সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে চার্লি বিপুল যশ অর্জন করলেন।

সানফ্রানসিস্কোর অভিনয় শেষ হবার পরদিন লণ্ডনে ফেরবার তোড়জোড় চলছে।

চার্লি শহরের বাজার দেখতে বেরিয়েছেন। চলতে চলতে একটি দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর দরজায় সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে, "আপনার হাত দেখে ভাগ্য গণনা করে দেব—এক ডলার।"

হঠাৎ কি ভেবে চার্লি ভিতরে ঢুকলেন।

এক মোটাসোটা স্ত্রীলোক, বয়েস হবে বছর ৪০, পর্দা সরিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

—"হাত দেখাবেন?"

চার্লি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

—"বসুন ঐ চেয়ারে।"

চার্লি একটি ছোট টেবিলের সামনে বসলেন।

স্ত্রীলোকটি এক বাণ্ডিল তাস তাঁর সামনে রেখে বললেন—"তাসগুলিকে ভাঁজুন। তারপর তিন ভাগ করুন।"

চার্লি নির্দেশমত তাসগুলি ভেঁজে তিন ভাগ করে রাখলেন।

স্ত্রীলোকটি এক একভাগ তাস তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাসগুলি দেখলেন। তারপর বললেন, "দেখি, ডানহাত বাড়িয়ে দিন।"

চার্লি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

স্ত্রীলোকটি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর হাতের রেখাগুলি পরীক্ষা করলেন। তারপর তাঁর সেই হাতের ওপরেই চোখ রেখে বলতে লাগলেন—"দেখা যাচ্ছে শিগগীরই আপনাকে অনেক দূরে যেতে হবে, অর্থাৎ আপনি আমেরিকা ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেবেন। কিন্তু আপনাকে আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে। এবং আপনি কোনো নতুন কাজে নামবেন—এখন যা করছেন তা থেকে সে কাজ আলাদা ধরণের।"

একটু থেমে যেন কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি আবার বললেন—"প্রায় একই ধরণের কাজ। কিন্তু তবুও যেন তার রকমটা এক নয়। এই নতুন কাজে আপনি বিরাট সাফল্য অর্জন করবেন। এক অসামান্য কর্মজীবন আপনার সামনে। কিন্তু সে কর্ম জীবন যে কোন্ ধরণের তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হাত থেকে মুখ তুলে তিনি চার্লির মুখের পানে তাকালেন, তারপর বললেন—"হাঁ, আপনার পর পর তিনবার বিবাহ হবে। প্রথম দুটি বিবাহ সুখের হবে না। কিন্তু শেষ বিবাহ খুব সুখের। পরিপূর্ণ দাম্পত্য সুখের মধ্যে তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার শেষ জীবন কাটবে। আপনি কোটী কোটী টাকার মালিক হবেন। ৮২ বছর বয়েসে লিটমোনিয়ায় আপনি মারা যাবেন।"

সেদিন চার্লি সেই মধ্যবয়স্কা মহিলার ভবিষ্যৎবাণী শুনে খুব হেসেছিলেন।

• • • •

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে আবার আমেরিকায় এলেন চার্লি।

কীস্টোন কোম্পানীর সঙ্গে আবার তাঁর যোগাযোগ ঘটল। তাঁরা তাঁকে সপ্তাহে ২৫ পাউণ্ড মাহিনা দিতে চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত চার্লি চ্যাপলিন চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে কীস্টোন কোম্পানীর সঙ্গে ১ বছরের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

কারনো কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই দলেই রইলেন। তারপর লস এঞ্জেলস্-এ গিয়ে কীস্টোন কোম্পানীর কর্তা ম্যাক্ সেনেটের সামনে হাজির হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে হলিউডের সেই সময়কার পরিবেশ এবং আবহাওয়া দেখে তিনি বিষম মুষড়ে পড়লেন।

হলিউড তখন আধা গ্রাম আধা শহর। রাস্তাঘাট পাকা নয়। চারিদিকে লম্বা লম্বা গাছ, পুকুর, ঝোপ ঝাড়। বাদাড়, পাকা বাড়ী নেই বললেই হয়। ষ্টুডিও বলতে কোনো টিনের ছাউনি দেওয়া গুদাম ঘর বা খাটাল। তারই মধ্যে এখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে ক্যামেরা আলোর যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রপাতি সাজান। টুকরো টুকরো ছোট ছোট ছবি। ঘোড়া দৌড়চ্ছে। মানুষ ছুটছে। মাতাল মদ খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টলছে। এই ধরণের চলচ্চিত্র। দেখে শুনে চার্লি যেন চুপসে গেলেন। একি অদ্ভুত অজানা পরিবেশ। এই অপরিচিত নিরানন্দ এবং নির্বান্ধব জগতে তাঁকে অন্ন সংস্থান করতে হবে। ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হলেন চার্লি।

এর চেয়ে কারনোর দলের সেই মধুর ক্ষুদ্র পরিবেশ যে অনেক ভাল ছিল। লণ্ডনের সেই পরিচিত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডল ছেড়ে এ কোথায় এলেন তিনি। ছ' হাজার মাইল দূরে এসে এ নির্বাসন কেন তিনি বরণ করলেন? আশে পাশে আত্মীয় তো একজনও নেই। জার্মান, চেক, রাশিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান—পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ ভাগ্যের অন্বেষণে এখানে এসে ভীড় করেছে।

সেই ভীড়ের মধ্যে তিনি একা। ভাবতে ভাবতে কান্না পেল চার্লির। বাড়ীর কথা, মায়ের কথা, দাদার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

• • • •

চার্লিকে দেখে তাঁকে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করে ম্যাক সেনেট বোধ করি হতাশ হলেন। শান্তশিষ্ট চাপা স্বভাবের এই ধীর স্থিরমতি অভিনেতাকে দিয়ে তো তাঁর কাজ চলবে না। হাসির ছবিতে অভিনয় করতে হলে জোয়ান হওয়া দরকার, ডুড্রিলাকে পটু হওয়া দরকার। এই ন্যাংপেতে ছোকরার কাজ নয়।

সেনেট জানতেন না শারীরিক কসরৎ-এ চার্লি ছিলেন দারুণ ওস্তাদ, দৌড় ঝাঁপে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। কথায় কথায় লড়াই করে আছাড় খেয়ে পড়ায় কৌশলেও তিনি ছিলেন অসম্ভব রপ্ত। ম্যাক্ সেনেটের পাশে বসেছিলেন তাঁর প্রধানা অভিনেত্রী রূপসী ম্যাবেল নরম্যাণ্ড। বছর ২০ তাঁর বয়েস। ভারি সুন্দর দেখতে। চার্লি অনেকক্ষণ হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ম্যাবেল তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। চার্লির মনে হল যেন তিনি স্বর্গে পৌঁছে গেছেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত চার্লিকে ছবিতে নামান হল। বয়েস বাড়িয়ে দেখাবার জন্যে তাঁর মুখের ওপর একজোড়া লম্বা গোঁফ লাগিয়ে দেওয়া হল। ছবিতে চার্লি অনেক কসরৎ দেখালেন কিন্তু কাটাকুটি করে ছবিখানা যখন পর্দায় দেখান হল তখন দেখা গেল চার্লির অনেক কসরৎই ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ম্যাক সেনেটকে চার্লি সেকথা জানালেন। বললেন যে, নিজের পছন্দ মত মেকআপ না পেলে এবং স্বাধীনভাবে তাঁকে অভিনয় করতে না দিলে তিনি কেমন করে ভাল কাজ দেখাবেন। মন দিয়ে শুনলেন ম্যাক সেনেট। পরের ছবিতে সেটে এসে ম্যাক সেনেট চার্লিকে বললেন, এখন যে ছবিটি হচ্ছে তাতে কিছু হাসির দৃশ্য চাই। তুমি নেমে যাও এই ছবিতে। নিজের ইচ্ছেমত মেকআপ করে নাও। মোট কথা দর্শকদের হাসাতে হবে।

এক সাংবাদিকের ভূমিকা। কি রকম সাজ করবেন চার্লি প্রথমটা ভেবে পেলেন না। তারপর তাঁর মাথায় একটা দারুণ পরিকল্পনা এল। পোষাক এবং মেকআপ-এর মধ্যে সবকিছুতেই একটা বিপরীত ভাব ফুটে উঠুক, সিদ্ধান্ত করলেন চার্লি। প্যাণ্টালুনটা হোক ঢলঢলে। জুতো দুটো হোক পায়ের চেয়ে বড়। কোটটা খুব টাইট হোক আর মাথার চেয়ে টুপিটা হোক ছোট। গোঁফটাও হোক বাটারফ্লাই। তাতে বয়েসও বেশী দেখাবে আর ভাব প্রকাশেরও অসুবিধে হবে না।

তাঁর পাশের ঘরেই থাকতেন প্রকাণ্ড জোয়ান পুলকায় অভিনেতা ফ্যাটি আর্বাকল। ফ্যাটির কাছ থেকে তাঁর মস্ত বড় ট্রাউজারটা চেয়ে নিলেন চার্লি। একটা আঁটসাঁট জ্যাকেট জোগাড় করলেন। আগে ছিল টপ হ্যাট। বদলে সেটাকে করে নিলেন বাউলার হ্যাট। গলায় বাঁধলেন লম্বা টাই। এক লম্বা চওড়া অভিনেতার বিরাট জুতো জোড়া চেয়ে নিলেন। বাঁ পাটি উঠল ডান পায়ে, ডান পাটি বাঁয়ে। মুখে লাগালেন এক জোড়া বেঁটে গোঁফ। হাতে নিলেন ছোট একটি ছড়ি।

চরিত্রটি যে কেমন সে সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সাজ পোষাক পরে অভিনয়ের আসরে আসা মাত্র তাঁর সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটল। তাঁর মনে হল

তিনি যেন এক নবজন্ম লাভ করেছেন। মহলা দিতে লাগলেন। ছুটছেন লাফাচ্ছেন, ডিগবাজি খাচ্ছেন, ছড়ি ঘুরিয়ে এমন সব কাণ্ড করছেন যা দেখে ম্যাক সেনেট আর ম্যাবেল নরমেণ্ড আর অন্য সকলে হেসে কুটিপাটি।

মুহূর্তের জন্যে চার্লি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে ব্যাখ্যা করে বললেন—"আপনাদের সামনে এই যে ঘাউড়ুসে লোকটাকে দেখছেন এ হচ্ছে এক অনন্ত পথযাত্রী মুসাফির, সারা জীবন ধরে সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। কিন্তু সে শুধুই এক ছন্নছাড়া অথর্বুদে নয়, তার মধ্যে অনেক গুণও আছে। সে কবি, সে ভদ্রলোক, সে এক নিঃসঙ্গ স্বপ্নবিলাসী মানুষ, জীবন সম্বন্ধে সে আশাবাদী, জীবনে রোমান্স ঘটবার প্রত্যাশায় সে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ, পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তার ভালবাসা।"

তাঁর আত্মজীবনীতে চার্লির উল্লিখিত স্মরণীয় উক্তিটি পড়ে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি, সেদিনকার তাঁর সেই বিচিত্র মেকআপ দেখে কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, সেই ঝুলো, সেই টুপি, সেই গোঁফ আর সেই ছড়িটি একদিন চার্লি-চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠবে?

সারা বিশ্বের পরম প্রীতির পাত্র, চলচ্চিত্র জগতের অবিসম্বাদী সম্রাটের জন্ম হল সেইদিন। তারপরের ইতিহাস একটানা সাফল্যের এক পরমাশ্চর্য্য কাহিনী।

ছবির পর ছবি। সাফল্যের পর সাফল্য। বিশ্বজয় একটি মাত্র নামের সে কি সম্মোহিনী শক্তি। চার্লি চ্যাপলিন।

আর সেই সঙ্গে জগৎ জোড়া সে কি সম্মান, আর প্রীতির উচ্ছ্বাস।

পুরানের যুগে রাজারা যেমন দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে সারা পৃথিবীতে তাঁদের বিজয়চিহ্ন রেখে আসতেন তেমনি চার্লি চ্যাপলিন তাঁর ছবির মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জয় করলেন।

ছেলেবেলার কান্নাভরা দিন শেষ হয়ে জীবনে এল নতুন প্রভাত, নতুন সূর্যোদয়।

চার্লি চ্যাপলিনের ছবির তালিকা :—

১৯১৪ সাল। কীস্টোন কোম্পানী :—

মেকিং এ-লিভিং (একরীল), অটোমেসেস (আধরীল), ম্যাবেলস স্ট্রেঞ্জ প্রেডী কায়েন্ট (একরীল), বিটুইন শাওয়ার্স (একরীল), কিস্মেট (একরীল), ট্যাংগো ট্যাংগলস (একরীল), হিস ফেভরিট স্যাসটাইম (একরীল), জুয়েল লাভ (একরীল), হার বোর্ডার (একরীল), ম্যাবেল এট দি হুইল (দু'রীল), টোয়েনটি মিনিটস অফ লাভ (একরীল), কট ইন এ ক্যাবারে (দু'রীল), কট ইন দি রেইন (একরীল), বিচি ডে (আধরীল), কেটাল ম্যাবেট (একরীল), হার ফ্রেণ্ড দি ব্যাণ্ড ইট (একরীল), নক-আউট (দু'রীল), ম্যাবেলস বিচি ডে (একরীল), ম্যাবেলস ম্যারেড লাইফ (একরীল), লাফিং গ্যাস (একরীল), প্রপারটি ম্যান (দু'রীল), কেস অন দি বাবরুম ফ্লোর (একরীল), রিক্রিয়েশন (আধরীল), ম্যাসকুরেডার (একরীল), হিজ নিউ প্রফেসন (একরীল), দি রাউণ্ডারস (একরীল), বিউটি-স্পটস (একরীল), দাভ প্যাংকস (একরীল), ডাক ম্যাণ্ড ডিমাণ্ডাইট (দু'রীল), কেস্টলম্যান

অফ নার্ভ (একরীল), হিজ মিউজিক্যাল কেরিয়ার (একরীল), হিজ ট্রাইলটিং প্রেস (দু'রীল), টিপিক্স পাংচোর্ড রোমান্স (দু'রীল), সেটিং এ্যাকওয়েনটেড (একরীল), হিজ প্রি-হিষ্টরিক পাষ্ট (দু'রীল),

১৯১৫ সাল। এসেমে ফিল্মস :—

হিজ নিউ জব (দু'রীল), এ নাইট আউট (দু'রীল), দি চ্যামপিয়ন (দু'রীল), ইন দি পার্ক (একরীল), দি ফেটলি ইংলোপমেণ্ট (দু'রীল), দি ট্রাম্প (দু'রীল), বাই দি সী (একরীল), ওয়ার্ক (দু'রীল), এ উওম্যান (দু'রীল), দি ব্যাঙ্ক (দু'রীল), সাংহাইড (দু'রীল), এ নাইট ইন দি শো (দু'রীল) ১৯১৬। কারমেন (চার রীল), পুলিশ (দু'রীল), ১৯১৮। ট্রিপল ট্রাবল (দু'রীল)।

১৯১৬ সাল। মিউচুয়াল ফিল্মস :—

দি ফোর ওয়াকার (দু'রীল), কায়রম্যান (দু'রীল), ভ্যাগাবণ্ড (দু'রীল), ওয়ান এ, এম (দু'রীল), কউনট (দু'রীল), পনশপ (দু'রীল), বিহাইণ্ড দি স্ক্রীন (দু'রীল), রিংক (দু'রীল)। ১৯১৭। ইজি ষ্ট্রীট (দু'রীল), দি কিওর (দু'রীল), দি ইমিগ্রাণ্ট (দু'রীল), দি এ্যাডভেঞ্চারার (দু'রীল)।

১৯১৮। ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল ফিল্মস :—

এ ডগস লাইফ (৩ রীল), দি বণ্ড (আধরীল), সোলডার আর্মস (৩ রীল) ১৯১৯। সানি সাইড (৩ রীল), ডেজ প্রেগার (২ রীল), ১৯২০। দি কিড (৬ রীল), দি আইডল ক্লাস (২ রীল)। ১৯২২ পে ডে (২ রীল)। ১৯২৩। দি পিলগ্রিম (৪ রীল)।

১৯২৩। ইউনাইটেড আর্টিষ্টস :—(পূর্বলেখা) ১৯২০ এ ওম্যান অফ প্যারিস। ১৯২৪। দি গোল্ড রাশ। ১৯২৮। দি সার্কাস। ১৯৩১। সিটি লাইটস। ১৯৩৬। মডার্ণ টাইমস। ১৯৪০। দি গ্রেট ডিকটেটর। ১৯৪৭। মঁসিয়ে ভার্দু। ১৯৫৩। লাইম লাইট। ১৯৫৭। দি কিং ইন নিউইয়র্ক।

———

সুনীতা,

তোমার হাতে যখন এ চিঠি পড়বে তখন উপরকার ঠিকানার লেখা দেখেই তুমি বুঝবে এ চিঠি কার। শুধু বুঝবে না কেন আমি তোমায় এতদিন বাদে চিঠি লিখতে বসেছি—যতক্ষণ না চিঠি পড়বে।

আমি জানি আমার চিঠি তোমায় কী পর্যন্ত আশ্চর্য করবে। কী অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঠেকবে ঘটনাটা তোমার কাছে। হয়তো আরো আগে চিঠি দিলে এমনটা হতো না। হয়তো আশাও করেছিলে। কিন্তু আজ সে আশাও তোমার মরে গেছে।

আমি জানি আমার চিঠি কী বার্তা বয়ে এনেছে জানবার জন্য তুমি চঞ্চলতা বোধ করবে—কিন্তু তবু তুমি ঝপ করে চিঠি খুলে পড়তে পারবে না। এনভেলাপটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে অনেক—অনেকক্ষণ। হয়তো আমার লেখা ঠিকানার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে তোমার জঠর মথিত করে। হয়ত ভাববে, মানুষ বদলায়, হাতের লেখাটা কিন্তু বদলায় না।

কিন্তু সত্যি কি মানুষ বদলায়?

যদিও কিছুদিন আগে আমিও এ মতেই বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু এখন আমার মত পাল্টে গেছে সুনীতা। বিভিন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মানুষের বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে ঘটে কিন্তু সেটা ঠিক ঐ বস্তুর রূপান্তরের মতো। যত রূপান্তরই ঘটুক লোহা যেমন লোহাই থাকে, সোনা থাকে সোনা, তেমনি জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে যত তাড়াতাড়াই চলুক মানুষের মূল চরিত্র সত্যও একই থাকে। অর্থাৎ—বিবর্তন ঘটে পরিবর্তন ঘটে না। লোটা মানুষটার মূল চরিত্র বদলে যায় না। তুমি যদি আমার মধ্যে 'সত্যকে' কোন দিন দেখে থাকো তবে জানবে সে আজও আছে।

হ্যাঁ এরপরও আছে।

এত-র পরও আছে।

আর তা রয়েছে বলেই তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি। নইলে পারতাম না।

আজ তোমার সঙ্গে আমার কত দিন হতে চলল দেখা নেই। চিঠি দেওয়া নেই। খোঁজ নেওয়া নেই। আমি জানি না তুমি কেমন আছ। তোমার ছেলেমেয়ে দু'টি (আমার ছেলেমেয়ে বলার অধিকার আজ আর আমি রাখিনে।) কেমন আছে। তারা কত বড় হয়েছে। তাদের সংবাদ জানতে চাওয়ার মুখ আমার নেই। তোমার খবর জানতে চাওয়ার মত দুইও আমি নই—

তবে কী আজ এতকাল বাদে আমার সংবাদ দিতে এসেছি তোমার কাছে?

না তাও নয়।

তবে ?

কাক কাছে বসে একটু পুরোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। তোমার মতো কান পেতে তো সে কথা আর কেউ শুনবে না তাই তোমার কাছে এলাম।

কলেজে পড়ার দিনগুলি মনে পড়ে ?

এক সঙ্গে পড়তে পড়তে এক সঙ্গে অনেক ঘুরলাম। অনেক বেড়ালাম। অনেক চা কফি খেলাম রেষ্টুরেণ্টে বসে। তারপর এক সন্ধ্যায় নির্জন মাঠে বসে গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম শুনছ সুনীতা ?

তুমি ধরতে পারলে না আমার কথা। সহজ গলায় বললে, কই না তো !

শুনছ না ?

আমার আবার জিজ্ঞাসার ধাতাসে কান পেতে বললে, কই মোটেই শুনছি নে ? কী কাণ্ড। তুমি শুনছ বুঝি ? অনেক দূর থেকে আসছে ?

আমি বললাম, অনেক দূর থেকে নয়, অনেক গভীর থেকে আসছে।

এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি বুঝতে পারলে আমি কী বলতে চাইছি। চোখ মাঠের দিকে নত হল তোমার। টেনে টেনে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে লাগলে তুমি। আমি তোমার হাতটা চাইলাম। দিলে না। টেনে নিলাম। আপত্তি করলে না। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে আমাদের দুজনকে ঢেকে ফেলল।

সে অন্ধকারের ভেতর ছিল কত আলো।

আর আজ সূর্যের আলোর ভেতর পর্যন্ত কী অন্ধকার।...

আমাদের দাম্পত্য জীবন রাগ অনুরাগ ভাব অভাব—অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মের মধ্য দিয়ে বেশ তো স্বাভাবিক ভাবে সিভিলড হয়ে এসেছিল সুনীতা। হঠাৎ কেন এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার জীবনে দেখা দিল বলত ?

না, তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করার কোন মানে হয় না। তুমি এ কথার কী জবাব দেবে।

জবাব যদি দিতে হয় আমাকেই দিতে হবে।

কিন্তু সে চেষ্টা আমি করব না। নিজের শূন্য তবিলে অহমিকার ঐটুকু অবশিষ্ট থাক। তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাদে দুটো কথা বলতে এসেছি তাই বলে চলে যাবো।

তুমি হয়তো ভাবছ, তোমার হাত যে দিন প্রথম ধরেছিলাম সে দিনের কথাই কী কেবল মনে আছে আমার ? সে হাত যে দিন নিষ্ঠুর ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলাম সে দিনের কথা কী মনে নেই ?

আছে।

কত বিহ্বল মুহূর্তে তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে সেই প্রথম প্রেম নিবেদনের রমণীয় সন্ধ্যাটির কথা বলেছি, কিন্তু ছেড়ে আসার দিনটির কথা বলার সুযোগ এ পর্যন্ত আসেনি—আজ বলব। বিশদ ব্যাখ্যায় যা বিবরণে যাবো না। সংক্ষেপেই বলব।

আমার বন্ধু বিমলেন্দু যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার বিধবা স্ত্রী কমলাকে আর তার মেয়েকে দেখাশোনা করার দায় যে নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছিলাম, তার ভেতর মৃত বন্ধুর প্রতি কর্তব্য করার বেশী কিছু যে এতটুকুও অন্য মনোভাব ছিল না, একথা তুমিও বিশ্বাস কর। কিন্তু বন্ধুর সাইক ইন্সিওরেন্স,

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি নানা বৈষয়িক ব্যবস্থা সাঙ্গ করে দেবার পরও যখন আমার ও বাড়ীর ভিত থেকে পা নড়তে চাইল না, তখন থেকেই তুমি মনে মনে প্রমাদ গুণতে আরম্ভ করেছিলে আমি জানি। তোমার আগের বিশ্বাসও ভুল নয়, পরের অবিশ্বাসও মিথ্যে নয়। কমলার রূপ, কমলার কামনা, কমলার লাস্য তখন আমাকে যে জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সে জগতে সমাজ সংসার—সব মিথ্যে হয়ে যায়।

আমি যে দিনরাত আমার নিজের সঙ্গে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছি তা আমার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেউ জানে না সুনীতা—তুমিও জান না। যদি জানতে তবে বোধ হয় আমাকে বোঝা আজ তোমার পক্ষে সহজ হতো। হয়ত ক্ষমা করা অসম্ভব ঠেকত না। কিন্তু পাপের সঙ্গে লড়াই-এ বিবেক কবে জিতেছে? নরেন্দ্রনাথের বিবেক কী জিতেছিল? সূর্যমুখীর মুখ চেয়ে কুন্দনন্দিনীকে ছাড়তে পেরেছিল সে?

গোবিন্দলালের বিবেক কী জিতেছিল? ভ্রমরের মুখ চেয়ে ছাড়তে পেরেছিল গোবিন্দলাল রোহিনীকে?

অশোকই বা কোন মহাপুরুষ যে সে জিতে বেরিয়ে আসবে।

আমার জীবনের আর এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। তবে সেটা মাঠে নয়। নিজের শোবার ঘরে। ছেলে মেয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে। তুমি শোবার ঘরে বসে যেন কী গোছগাছ করছ—আমি এসে ঘরে ঢুকলাম। তুমি হাতের কাজ থেকে চোখ তুলে আমায় দেখে একটু হাসলে। কিন্তু আমাকে দেখে তখন তোমার হাসবার কথা নয়। আমি বড়দিনের ছুটির ক'টা দিন বাড়ীঘর ফেলে প্রায় নির্লজ্জের মতই কমলার বাড়ী পড়ে থাকছিলাম।

তোমার ঐ হাসিটা কী বস্তু ছিল আজও আমি জানি না। হয়ত ওটা আসলে হাসিই ছিল না। হয়ত কয়েকটা হাসির রেখা ছিল মাত্র। হয়ত সেটা অভ্যাসের। হয়ত সেটা ভদ্রতাবোধের। কিংবা হয়ত সেটা ছিল কান্নার রূপান্তর মাত্র। নইলে তোমার মুখের সেই হাসি মনে পড়ে আজ আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে কেন অসহ্য যন্ত্রনায়। কিন্তু সেদিন হলো উল্টো। যখন উল্টো চলা আরম্ভ হয় তখন এমনি করেই সব উল্টো ঘটনা ঘটতে থাকে। তোমার হাসি আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দিল।

আমি প্রায় নাচানাচি লাফালাফি শুরু করে দিলাম। আমায় দেখে হাসবার মানে কী? আমি সং নাকি? এই দিয়ে আরম্ভ করে ভালোমন্দ কথা ছুঁড়তে লাগলাম। তুমি দুটি হাত কোলের উপর রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলে।

আসল কথা হলো, আমার অবচেতন মন তখন রেগে উঠবার সুযোগ অনুসন্ধানে ছিল। প্রচণ্ড ঝগড়া রাগারাগির ভেতর দিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে তবু সে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু মানুষের চেহারা থাকবে সেটুকুর দিকেই কাঙালের মতো তাকিয়েছিল আমার মনের সস্তা মানুষটা।

আর তা ছাড়াও আমি চণ্ডীগড় কলেজে কাজ নিয়েছি। কমলাকে নিয়ে সেখানে চলে যাচ্ছি—এ কথাগুলি রাগের সঙ্গে বলবার জন্যও আমার একটা রাগের দরকার ছিল।

চাকরের সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরল বাচ্চা দুটো। ওদের উপরে উঠবার হাসি আনন্দের শব্দ পেয়ে তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে। তারপর আবার এসে বসলে খাটের উপর তেমনি স্তব্ধ হয়ে। বুঝলাম, তুমি ওদের কের কোথাও বেড়াতে পাঠিয়ে এলে। বাবার এই বর্বর চেহারা তুমি ওদের দেখতে দেবে না।

তুমি সেদিন মাত্র গোটা ক'য় কথাই বলেছিলে। একবার বলেছিলে, এতটা অবনতি তোমার হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি অশোক। কমলা বিধবা। বুঝলাম তোমার স্ত্রীর মতো তার ঘরে স্বামী থাকার হাঙ্গামাটা নেই। কিন্তু তার মেয়ে?

দিদিমার কাছে যাবে—

ভগবান তোমাদের দুজনার প্রবৃত্তিকে ক্ষমা করুন—বলে তুমি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য এই পৃথিবী। আশ্চর্য এই পৃথিবীর মানুষ। আশ্চর্য এই পৃথিবীর মানুষের মন। যাকে আর ভালোবাসিনে বলে ত্যাগ করে এলাম, এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে বসে বসে কেবল তাকেই আরো গভীরভাবে ভালোবাসলাম! শিখলাম, যাকে শ্রদ্ধা করা যায় না, তাকে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসা পেলেও শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসা টেকে না। তুমি হয়তো ভাবছ, এ মেয়েও পুরোনো হয়ে গেছে আমার কাছে। না তা নয়। নতুনের অভাব কী। তুমি তো আরো পুরোনো। অন্তরমন ছুটোছুটি করে কেবল তোমাকেই তবে খুঁজে মরছে কেন?

না ভয় পেও না। তুমি না ডাকলে আমি তোমার সংসারে প্রবেশ করতে পারি না—প্রবেশ করবও না। কিন্তু তুমি কী আমাকে ডাকতে পারো সুনীতা? পারো কী? ইতি—

অশোক

চিঠিটা কোলের উপর রেখে চোখ বন্ধ করল সুনীতা।

পারে কী সে অশোককে ডাকতে?

পারে কী?

ওর জীবনের আর একটা স্মরণীয় সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকল। ছেলে মেয়ে বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যার বাতাসে পর্দাগুলি দুলছে। সাংসারিক কাজের টুকিটাকি শব্দ উঠছে এ ঘরে ও ঘরে। কী ভাবছিল চোখবন্ধ করে বসে সুনীতা বলতে পারবে না। কারণ সে কিছু ভাবছিল না। অশোক আর ওর জীবনের নানা ছবি উল্টোপাল্টা-চোখের উপর ভেসে উঠছিল আর মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন মাথার ভেতর ক্লিক করে আলোর সুইচ জ্বলে উঠল সুনীতার। ঝটপট্ উঠে লেখবার টেবিলের কাছে গিয়ে রাইটিং প্যাড খুলে একটানে লিখে চলল:

অশোক,

মনে আছে কী, একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, যদি তোমার কোন বন্ধু বা ঘরো আর কারু সঙ্গে পালিয়ে যাই, তারপর আবার ফিরে এসে তোমার কাছে দাঁড়াই—তুমি নেবে আমাকে?

দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলে, নিশ্চয়। আরো বেশী আবেগের সঙ্গে নেবো! আমার কাছেই আবার ফিরে এসে আমাকে সম্রাট করে দিলে যে।

জানিনা অশোক, নিয়তিই আমাকে দিয়ে সে দিন এ প্রশ্ন করিয়ে ছিলেন কিনা। তোমার ঐ উত্তর জানা না থাকলে তোমার জিজ্ঞাসার সহজ উত্তর এত সহজে খুঁজে পেতাম না। আজ তোমার ঐ উত্তরই আমার উত্তর।

সুনীতা।

———

খেলাঘর

সাহানা দেবী

বিনোদ রায়ের ছোট মেয়ে মিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরলো। সমস্ত গায়ে নতুন গয়না আর নতুন সাড়ীর বাহার—অপূর্ব সুন্দর লাগছিল আজ তাকে।

মেজো মেয়ে রিণা এতক্ষণ জানালার গরাদ ধরে সবই দেখলো। নতুন বর নামলো। মিনি নামলো। নতুন বাক্স বিছানাও নামলো সেই সঙ্গে। তাকে লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে বাবা। কলকাতায় যাবার সময় তাকে বিনোদ রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মিনিকে তিনি কলেজে ভর্তি করতে যাচ্ছেন।

এ মিথ্যাটুকুর আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায় ছিল না বিনোদ রায়ের। রিণা মস্তিষ্কহীন—হাবা। তার কিছুতেই বিয়ে হবে না। অথচ রিণা সব বিষয়ে নির্বোধ নয়। সে জানে দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। এবার তারও হবে। কথাটা তার মত করে সে বোঝে এবং এ সম্পর্কে একটা রঙিন স্বপ্নের যে জাল সে বুনে চলে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে সে বিনোদবাবুকে জিজ্ঞেস করে: বাবা, দিদির মতো আমার বিয়ে দেবে না?

দেব।—বলেই গম্ভীর হয়ে যান বিনোদবাবু। কিন্তু এই ছোট্ট উত্তরটুকু পেয়ে গেলেই রিণা এক ছুটে বাড়ী থেকে পাশের বাড়ীতে চলে গিয়ে সগর্বে ঘোষণা করে এবার তার বিবাহ সমাগত। সমবয়সী সঙ্গিনীরা কলহাসিতে অভিনন্দন জানায় আর এ ওর চোখের দিকে চেয়ে বিদ্রূপাত্মক হাসিতে ভেঙে পড়ে। আর তাই দেখে হাততালি দিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে রিণা। ভারি খুশী হয়েছে সে।

আজ যখন দেখলো মিনির বিয়ে হয়ে গেছে তখন সে খানিকক্ষণ জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। নববধূ মিনি স্বামীর সঙ্গে নামলো, বাড়ীর ভেতর ঢুকলো। তার নতুন চকচকে হোল্ডঅল বিছানা বাক্স সবই গেলো বাড়ীর মধ্যে। রিণা শুধু চোখ মেলে দেখলো। তারপর ছুটে পাশের মীরাদের বাড়ী চলে গিয়ে ওদের বারান্দায় গুম হয়ে বসে রইলো।

মীরার মেজোবৌদি নিচু বারান্দায় বসে বসে কুটনো কাটছিলেন; জিজ্ঞেস করলেন: তোর আবার আজ কী হলো রে?

রিণা কোনো জবাব দিলো না শুধু অব্যক্ত একটা শব্দ তুললো গলা দিয়ে। বিনোদবাবুর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে এ বাড়ীতে ওদের অবাধ যাওয়া আসা। এরা ওদের অভিভাবকের মত আপনে রাখে, আবার প্রয়োজন হলে শাসনও করে। বিনোদবাবু ডাক্তার সব সময় তো বাড়ীতে থাকতে পারেন না তাই এঁদেরই রিণাকে দেখাশুনো করতে হয়। একে মেয়ে—তায় হাবা, অথচ বেশ বয়স হয়েছে। সব দিকেই তার অভিভাবক প্রয়োজন।

মেজবৌদি বললেন: এই রিণা, আলুগুলো ছড়াচ্ছিস কেন?

ছড়াবই তো—। রিণা আরো একটা ছুঁড়ে দিলো উঠোনে।

মারবো কিন্তু। বলে মেজবৌ আলুগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে আবার বঁটিতে বসলো : কে এলো রে তোদের বাড়ী? কুলির মাথায় নতুন বাক্স টাক্স দেখলাম।

মিনি এলো। তার বিয়ে হয়ে গেছে। রিণা বললে।

লুকিয়ে হলো বুঝি? তোকে ফাঁকি দিয়ে?

হ্যাঁ—। রিণা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলো।

আমরা তোর বিয়ে বিকাশের সঙ্গে দেব।—তুই কিছু ভাবিস না—বলেই মেজোবৌদি একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

বিকাশ রিণাদের সামনের বাড়ীর ছেলে। ভারি সুদর্শন ছেলেটি।—বড়লোকের ছেলে—ডাক্তারী পড়ে।

বিকাশকে রিণা ছোটবেলা থেকেই দেখেছে কিন্তু এমন কথা তার কখনও মনে উদয় হয়নি। নিজের জানালা থেকে কতদিন দেখেছে বিকাশ তার ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান গাইছে। চুল আঁচড়াচ্ছে। আজ যেন তার স্বপ্ন-জাগর মনে কেমন একটা ঘোলাটে ঘোলাটে স্বপ্নের ছবি এঁকে দিলো এই কথাগুলো। হয়তো রিণার অর্ধচেতন মনে এমন একটা অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—এইভাবে একটা ছায়া পড়লো।

রিণা উঠে দাঁড়ালো।

কিরে যাচ্ছিস যে—বোস! মেজবৌদি বললে।

না—।

না কি! ওই দেখ। তোকে দেখে দেখে বিকাশ কেমন হাসছে জানলায় দাঁড়িয়ে। সত্যিই বিকাশ তখন জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। তবে হাসছিল কিনা বোঝা গেল না।

কিন্তু রিণা এক দৌড় দিয়ে পালাল বাড়ীর দিকে। কি বুঝলো ও-ওই জানে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই দাঁড়িয়ে গেল রিণা। মিনি আর মিনির স্বামী শঙ্কর চা খাচ্ছে আর গল্প করছে। উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ছে মিনি। সুন্দর মুখখানা ওর হাসিতে আনন্দে যেন ঝলমল করছে। রিণা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো নির্নিমেষ নয়নে। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

শীতের বেলা। রোদ থাকতে থাকতে যেন চুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। ঘরের ভেতর কালো কালো ছায়াগুলো ঘুরতে লাগলো যেন। ঘুলঘুলিতে রাতের অতিথি চড়ুইটা কখন ফিরে এসেছে। সামনের নীমগাছটার ওপর দিয়ে হিমের বাতাস বামাল ছেলের মত মুঠো মুঠো নিমের পাতা ছড়াচ্ছে রিণাদের উঠোনের ওপর। যে পায়রাগুলো এতক্ষণ বসে বসে গা খুটছিল এখন তারা ঘরের ভেতরের ঘুলঘুলিতে গিয়ে বসেছে। রিণা শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরে মিনি আর তার স্বামী কথা বলছে আর হাসছে। হাসছে আর কী বলছে। এদের কথা আর গল্প আর ফুরোচ্ছে না যেন।

রিণা মনে মনে ভাবে। নিজের মত করেই ভাবছে চেষ্টা করে তার অর্ধচেতন চিন্তার পরিধির মধ্যে। কেন—সেও তো বিয়ে করতে পারে বিকাশকে! এমনি করেই গল্প করতে পারে সারাদিন গুণ গুণ করে। এমনি করে হাসতে পারে। এমনি করে সুখী হতে পারে। হয়তো একটু অস্বাভাবিক বলেই এমন কথা নিয়ে সে তার মনকে রঙিন করে তুলতে পারলো। কোন স্বাভাবিক চেতনায় মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না।

বাড়ীর সবাই তখন যে যার কাজে ব্যস্ত। বাবা বাড়ী নেই। মিনি নিজের জগতে তন্ময় শঙ্করের সঙ্গে। একা একা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রিণা।

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেছে সরু গলির পথ। তারই ওপারে প্রাচীর ঘেরা বিরাট বাড়ী, তারই দোতালায় পড়ে বিকাশ। এক তলার বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে এসে বসে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। সামনে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান। মালে মাঝে তারই পরিচর্যা করে নিজে হাতে বিকাশ। তার ভারি ফুলের সখ।

তাদের সদর দরজাটা অনেক দূরে। বিকাশের বাড়ীর সামনের দরজা তাদের পেছনের দরজা। যখন বিকাশের অনেক বন্ধু-বান্ধব আসে তখন এ দরজাটা খুলে দেওয়া হয় নইলে বিকাশ যখন বাগানে কাজ করে তখন সে এটা খুলে দেয়। বাগানের আবর্জনা বাইরে ফেলে দিতে ওর এই পথেই সুবিধা হয়।

নতুন লাগানো গাছগুলোতে কুঁড়ি ধরেছে। বিকাশ গায়ে একখানা সাদা চাদর জড়িয়ে ঘুরে ঘুরে তাই দেখছিল। হঠাৎ তার চাদরে একটা টান পড়লো।

পেছন ফিরে তাকিয়েই অবাক। পাশের বাড়ীর কাঁধা মেয়েটা হাতে কয়েকটা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কি বিশ্রী আর অর্থহীন বোধহলো সে হাসি। বিকাশের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো যেন।

যা, চলে যা—বাড়ী খালি। এখানে এসেছিস কেন? যা শিগ্‌গীর।

না, যাব না—রিণা বললে। যাব কেন?

দাঁড়া, ঝিকে ডাকছি—তোকে বাড়ীতে দিয়ে আসবে। বলেই বিকাশ ডাকতে লাগলো: মোক্ষদা, মিনির কাঁধা বোনটাকে দিয়ে আয় তো—কী যে পাগলামি করছে।

তুই আমাকে বিয়ে করবি না? রিণা পাগলের মত শূন্যদৃষ্টি মেলে দিলো।

কী বিপদ!—মোক্ষদা, ওকে নিয়ে যা না। ও মোক্ষদা, ঘর ঝাঁট দেওয়া রাখ্‌তো এখন। ওকে আগে দিয়ে আয়।

ও বাড়ীর মেজবৌদি বলেছে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—রিণা আবার বললে।

চল রিণা, চল। তোর বাড়ী দিয়ে আসি।

না, ওকে আমি বিয়ে করবো। রিণা জোর করেই দাঁড়িয়ে রইলো।

আচ্ছা হবে এখন। এখন তো বাড়ী যা। বিকাশ বিরক্ত স্বরে বললো: যত সব পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।

কিন্তু রিণা বুঝলো অন্য রকম। সে বুঝলো বিকাশ ওর কথায় সম্মতি দিয়েছে সুতরাং সে ছুটে চলে গেল মেজবৌদির কাছে। পুজোর ঘরে সন্ধ্যা দিয়ে ওপরের ঠাকুর ঘর থেকে নামছিলো মেজবৌ। রিণা তাকে গিয়ে ধরলো: বৌদি-বিকাশ আমাকে বিয়ে করবে বলছে।

বাঃ, খুব ভালো খবর তো।

রিণা দু'ধারে ঘাড় নেড়ে বললে: হ্যাঁ।

সে শুভকর্মটি কবে হচ্ছে? মুখের বাঁকা হাসি খেলে গেলো মেজবৌ-এর। ছোটবৌ বসে কুটনো কাটছিলো, বললো: কি একটা পাগল নিয়ে কাজলামি করছিস মেজদি! ওর কোন বোধ নেই—ভাবছে সবই বুঝি সত্যি। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না। আর ওর বাড়ীতে জানলেও তোদের ওপর রাগ করবে।

আমি কি বলেছি নাকি? ওই তো বিয়ের জন্ত পাগল। আর বাড়ীতে নতুন মেয়ে জামাই এসেছে। সব সময় ওর সামনেই হি-হি হা-হা চলছে। ও একেই হাবা তার ওপর বয়স হয়েছে। বিয়ের জন্তে কেপবেই তো।

বাবাকে জিজ্ঞেস করবো কবে বিয়ে? রিণা বললো।

যা—তাই কর গিয়ে। তোর বকবকানির হাত থেকে আমরা বাঁচি।

রিণা বাড়ী এলো। বাবা তখনও ফেরেনি। মিনি বিছানা পাতছিল তখন, ছুটে রিণা ঘরে ঢুকলো।

কোথায় গিয়েছিলি রে? বালিশগুলো গোছাতে গোছাতে মিনি জিজ্ঞেস করলো: সব সময় এত টো-টো করিস কেন? বাড়ী থাকবি। এতো বাইরে যাওয়া ভালো নয়।

বাইরে যাইনি। মেজবৌদির বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

একটা ছোট বিছানা ঝাড়বার ঝাঁটা দিয়ে বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে মিনি বললে: ও!

রিণা নতুন ঘসারি, ঝকঝকে বেড কাভার, পাশাপাশি নতুন বালিশ পাশের কাছে সযত্নে রাখা নতুন ফুলকাটা সেপ—সব কিছুর ওপর একবার মুগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে: মেজবৌদি বলেছে আমারও বিয়ে হবে।

চুপ কর। যত সব বাজে কথা। ওদের বাড়ী যেতে বাবা বারণ করেন না? ওবাড়ী যাবি না।

যাব। রিণা বললে, বিকাশ আমার বর হবে বলেছে।

মিনি চমকে তাকালো রিণার দিকে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে লাল বেরুচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। সব বোঝে না, কিন্তু অর্ধেক বোঝার যন্ত্রণায় বিকল রিণার সঙ্গে এ সাংঘাতিক কৌতুক কেন ওরা করে? এ যে সর্বনাশা খেলা। এ তো নিষ্ঠুরতা। একটা অর্ধ উন্মাদ মেয়ের মনে কেন এমন মৃত্যু-যন্ত্রণা জাগিয়ে ওরা তামাশা দেখে। রিণার অর্থহীন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কষ্ট কষ্ট করে কেঁদে ফেললো মিনি।

ঠিক সেই সময় বাড়ীতে ঢুকলেন বাবা। ধীর আর ক্লান্ত পা—বড় ম্লান দেখাচ্ছে আজ তাঁকে। অনেক পথ হেঁটে এসেছেন বলে মনে হলো। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে দেখবার মত আর কেউ নেই। বড় নিঃসঙ্গ, বড় ক্লান্ত তিনি। যে বয়েসে মানুষ ঘরের মত চায় বিশ্রাম আর শান্তি চায়, সে বয়েসে তাঁকে মুখে লাগাম নিয়ে ছুটতে হচ্ছে। আর যেন পারছেন না তিনি।

মিনি ছুটে গিয়ে ছাতাটা হাতে থেকে নিয়ে নিলো: বোসো বাবা, বোসো, তোমার শরীর কি খারাপ লাগছে?

একটু জল দে মা—অনেক দূর থেকে আজ হেঁটে আসছি।

মিনি এক গ্লাস জল বাবার হাতে দিতেই রিণা ছুটে এলো: বাবা, বিকাশের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—মেজবৌদি বললো।

হঠাৎ যেন কে একটা তপ্ত শলাকা বুকের ওপর চেপে ধরলো। তাঁর হাত থেকে জলের গ্লাসটা খসে পড়লো। চোখের কোণে চকচক করে উঠলো দুটি বিন্দু জলের ফোঁটা।

কিন্তু এতটা ভালো নয়। বড় বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে রিণাকে। যখন তখন ও যেখানে সেখানে যায়। পাড়ার মেয়ে সবাই চেনে আর হাবা বলে ভালোও বাসে। যা-হারা এই দুর্ভাগিনীর অদৃষ্টের কথা ভেবে সবাই সহানুভূতি করে। কিন্তু তার যে ভেতরে একটা যৌবন দিনের পর দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সে তো তাকে বিপদে ফেলবে।

মিনির ওপর এবার থেকে কড়া আদেশ এলো বাবার। রিণার ওপর যেন সে চোখ রাখে। কোথাও যেন তাকে তারা বেরুতে না দেয়।

বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। আমের মুকুলগুলো যেন গাছের মাথায় মাথায় সম্রাটের মর্যাদা এনে দিয়েছে। চারদিকে পাখীর ডাক আর পাগল হাওয়ার মাতামাতি সুরু হয়েছে। সামনের খোলা জানালায় মাথা রেখে বই পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মিনি। আর সেই ফাঁকে বিকাশের বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে রিণা গিয়ে ঢুকলো বিকাশের ঘরে।

ঠিক যেমন করে মিনি নিজের ঘরের বিছানা পাতে তেমনি করে বিছানা পাততে গিয়ে হাত থেকে বিছানার ছড়ানো একটা মোটা বই দুম করে পড়ে গেল।

আর সেই সময়েই ঘরে এসে ঢুকলো বিকাশ। —কী করছিলি?

বলতে বলতেই ছুটে পালিয়ে গেল রিণা। বিকাশ সারা ঘর আতি পাতি করে খুঁজতে লাগলো মেয়েটা কিছু চুরি করে পালালো না তো?

বাড়ীর ভেতরে তখন প্রচণ্ড চিৎকার করছে মিনি: আসুক আজকে বাবা তোর মজা দেখাচ্ছি। আমার ঘরের ফুলদানির ফুলগুলো কোথায় নিয়ে গেলি!—তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। আর তোকে বেরুতে দেওয়া হবে না। তালা বন্ধ করে রাখা হবে।

সত্যি আজ ছ-মাস রিণাকে চোখে চোখে রাখে মিনি। কিন্তু সব সময়ই সে লক্ষ্য করেছে ওর মনের কোথায় যেন কি একটা বিপ্লব চলছে। কিছু খায় না ভালো করে, শুধু খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিয়ে রাখে পথের ওপর। ওই পথেই বিকাশ আসা যাওয়া করে। ওকে দেখলেই হাততালি দিয়ে ছেলেমানুষের মত নাচতে থাকে। কখনও জানালা দিয়ে নিজের বিকেলের খাবারটা বাড়িয়ে দেয়।

বিকাশ যেমন যায় তেমনি ভাবেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যায়। ও বুঝতেও পারলো না যে ওর জন্য অর্ঘ্য সাজিয়ে আর একটি প্রাণী অপেক্ষা করছে।

ছ'মাস পর দেখা গেল একদিন বিকাশদের বাড়ীতে বাজনা বাজছে। প্রথম ছেলের বিয়ে—তার বড়লোকের বাড়ী, আয়োজনের আর সীমা নেই। পাড়ার সব বাড়ীতেই নেমন্তন্ন হয়েছে। মিনি শ্বশুর বাড়ী, তাই রিণার কাছে কোনো খবরই পৌঁছোয়নি।

পরের দিন বিকেলে ঝিরঝির করে বৃষ্টি এলো। বরযাত্রীগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে। কাকের দলের গা খোঁটা এখন শেষ হয়ে গেছে, ওরা বাড়ী ফেরবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। চড়ুইয়ের দল রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছে রিণাদের উঠোনে।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে উঠোনে নেমে পড়লো। গৃহস্থ বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাকে স্বাগত জানালো।

আর সেই সঙ্গে সানাই বেজে উঠলো বিকাশদের বাড়ীতে। পাড়ার মেয়েরা বৌ ছুটেছে নতুন বৌ দেখতে। বাড়ীতে কেউ নেই, রিণাও ওদের দলের সঙ্গে দৌড়েছে বৌ দেখতে।

গাড়ী থেকে গাঁটছড়া বাঁধা বিকাশ নববধূর সঙ্গে নামলো। আর সেই মুহূর্তে পাগলের মত বিকাশের পায়ের ওপর বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লো রিণা।

সবাই চিৎকার করে উঠল: হাবাটাকে সরা—পথে বাধা পড়ছে। শুধু পথের কাঁঠাল গাছটার গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রিণার বাবা। মনে হচ্ছে একটা পাথরের মূর্তি।

চমকে দাঁড়ালো বিকাশ। অনাদৃত চিঠির মতো মনের দুয়ারে পড়ে থাকা একখানা নীল খামের চিঠি কে যেন তার সামনে তুলে ধরলো। পায়ে পড়ে থাকা রিণা চোখের জল যেন মনের নিমেষে প্রস্ফুটিত ভক্তি পড়ে মুক্তো হয়ে যাচ্ছে। না—তাকাবার সময় নেই এখন। খাঁচলে টান পড়েছে। নববধূর গাঁটছড়া সেটা মনে করিয়ে দিলো বিকাশকে। এগিয়ে তাকে যেতেই হবে।

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী মেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেম সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এল, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; অয়েব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিষ্ণুদত্ত, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ভাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম মেঞ্জী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

গোলাপের মূল্য

[illegible]

পশ্চিম দিগন্তে যখন সৌরাষ্ট্রের সূর্য অস্তাচলে গেল তখন লক্ষ্মাবতী লাইব্রেরীর পল্টুবাবু ছাত্রদের সঙ্গে মারামারি করছিলেন। ছেলেদের চাঁদা দেওয়া পয়সাতেই যদিও চেয়ার টেবিল কেনা, অথবা একেবারে সত্যি কথা বলতে গেলে, চাঁদার পয়সাও লাইব্রেরীকে বড় করেছে, শুধু সভাপতির দানই নয়, এবং অন্য সময়ে পল্টুবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে চেয়ার টেবিল ঝেড়ে আদর দেখান। মারামারির সময়ে দেখা গেল সে কথা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন।

ভুলে গিয়েছেন একদম, কিছুই মনে নেই। যাদের সঙ্গে মারামারি করছেন, তিনি অকৃতজ্ঞ না হলে তাদের বয়সী সন্তান তাঁরও থাকতে পারত সে কথা ভুলে যেতে তাঁর এক মিনিটও লাগল না।

কিন্তু তাঁর মাথা খারাপ হলেও দুনিয়া শুদ্ধ লোক পাগল নয়। পাড়ার সবাই এসে মারামারি থামাল। ছেলেরাও থামতে রাজী হয়না, তিনিও গর্জন থামান না 'সব ক'টার রক্তদর্শন করব। নইলে ছাড়ব না।'

ছাড়বেন না কাউকে, 'অমল, বিনয়, সুরজিৎ, দীপঙ্কর। ওদের আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। আগে পূর্ণবাবুর বাড়ী চল, ফয়সালা করতে হবে।'

পূর্ণবাবু এ লাইব্রেরীর চিরস্থায়ী সভাপতি।

বড় শহর থেকে এত দূরে, মফঃস্বল জেলাশহর থেকেও দূরে। এ জায়গাটা যখনই বড় হতে সুরু করল, পূর্ণবাবু তখনই বুঝেছিলেন পালটে যাবে সব। সেইজন্যে মা-র নামে স্কুল, লাইব্রেরী, ছোট হাসপাতাল, সর্বত্র প্রচুর চাঁদা দিয়ে তিনি সভাপতি, সভানেত্রীর চেয়ারম্যান, সবগুলোর জন্মস্বত্ব কিনে ফেললেন। কিনতে যা খরচ করলেন তা তাঁর খুব একটা গায়ে লাগেনি। তাঁর গ্লাস অ্যাণ্ড সিলিকেট ফ্যাকটরীই ও এখানকার সব। জন্মস্বত্ব কিনে ফেলে পূর্ণবাবু আবার একটি করে আপেল খেয়ে সকালে কারখানা, এবং বিকেলে গোলাপ বাগানের পরিচর্যায় ফিরে গেলেন।

এখন বিকেল। তাই পূর্ণবাবু বাড়ীতে ছিলেন। পাশেই বাড়ী তাঁর। মারামারির প্রথম থেকে শেষ, দীপঙ্করের 'পল্টু সার,' বলে ডাকা এবং পল্টুবাবুর 'তোর সাতকেলে সার' বলে হুঙ্কার দিয়ে ঘরে প্রবেশ, সবই তিনি দেখেছেন। অপেরাগ্লাসটি বিকেলে তাঁর হাতেই থাকে। মফঃস্বলের আধাশহরে অপেরা গ্লাসের বিচিত্র উপকারিতা পূর্ণবাবু আগেই বুঝে ফেলেছিলেন। নাটক দেখতে হলে থিয়েটারে ছোটতে হবে এ-কথা পূর্ণবাবু কখনোই বিশ্বাস করেন নি।

এখন তিনি ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে লাগলেন সব। হাতে কাঁচি এবং গোলাপফুল।

'আগে পল্টুবাবু বলুন, ওঁর বয়স বেশী। দু'পক্ষের কথাই আমি শুনব।'

পল্টুবাবুর কথাবার্তা অতি সংক্ষিপ্ত। এখন লাইব্রেরীর সঙ্গে স্কুল, মেয়েদের এবং ছেলেদের, সবই একই বিলডিংয়ে এদিকে ওদিকে চলেছে তা সত্যি। কিন্তু আদিতে শুধু লাইব্রেরী ছিল এবং পল্টুবাবু ছিলেন। তিনি এখনকার চিরস্থায়ী প্রয়োগাধিক, এবং লাইব্রেরীর হলটি ছেলেদের সাড়েবত্রিশ রকম প্রয়োজনে দিতে নারাজ।

'কন্‌স্টিটিউশন্!' তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

যখন লাইব্রেরী মানে একটি খাঁ খাঁ হলঘর, এবং ছোট ঘরে একটি আলমারীতে গুটিকয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স ছাড়া কিছুই ছিল না, তখনই পল্টুবাবু, (এ শহরে হয়ত ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারাই আসেন) বিরাট এক কন্‌স্টিটিউশন ফেঁদে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। যা করবেন তিনিই করবেন এবং তাঁর বিনানুমতিতে হলঘর ব্যবহার করা চলবে না।

কিন্তু এখন ছেলেদের উপায় নেই। তারা ও হলটা ব্যবহার করে, পল্টুবাবু ক্ষেপে গেলেও চুপ করে থাকেন কেননা পূর্ণবাবুর অনুরোধ ঠেলতে পারেন না। এদিকে ভেতরে ভেতরে তাঁর ভয়ানক রাগ জমে যাচ্ছে। কেননা পল্টুবাবুর কাছে এ লাইব্রেরী লাইব্রেরী নয়। এটা তাঁর ক্লাব। এখানে তিনি সর্বাধিনায়ক। ভগবান তাঁকে যতটুকু ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছেন, তাই মূলধন নিয়েই তিনি ক্ষমতা, হল, ইত্যাদি করে কেলতে চান।

ছেলেরা তাঁর খিটিমিটি অনেক সহ্য করেছে। পল্টুবাবুর হাতে যতটুকু আছে তিনি তাই করেছেন। সভা হতে না হতে বেঞ্চি সেড়ে নিয়েছেন, আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। টেবিলের ওপর জলের দাগ দেখলে 'কে করলে? জানো না? আমাকে জানো না?' বলে পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে নেপোলিয়নের মত শূন্য হলঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়িয়েছেন। তিনি নেপোলিয়নের চেয়ে কম নন, কেননা একই উচ্চাশার কীট হৃৎপিণ্ডে তিনি আজ এ লাইব্রেরীর সম্রাট হতে চান।

'এবার তোমরা বল।'

পূর্ণবাবুর হাতে গোলাপ এবং কাঁচি। গায়ে চটি, গায়ে বুশশার্ট। ছেলেদের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তিনি, সর্বদাই বলেন। তাঁর বরাবরই ইচ্ছে ছেলে এবং বুড়ো তাঁর কাছে আসুক, গায়ে হাত রেখে কথা বলুক। আরো কিছুদূরে যে কলিয়ারী, যার অন্যতম মালিক তিনিও, সেখানে তিনি একসময়ে কুলীদের রসদ যেপে দিতেন। সংগ্রামই উন্নতির সোপান এ কথা মুখেও বলেন, হয়ত বিশ্বাসও করেন, আর সেজন্যেই সকলের গায়ে গায়ে মিশে প্রমাণ দিয়ে চলেন আজও তিনি ঘুষে সরে যাননি।

পল্টুবাবু যেমন নিজের পয়েন্ট এতটুকু ছাড়তে রাজী নন, ছেলেরাও তাই।

সুপ্রভাত ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে অস্থির, চঞ্চল, যাকে বলে খারাপ ছেলে তাই। সে চুলে আঙুল চালিয়ে বলল 'ওঁর একটা অব্‌সেশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভদ্র ব্যবহার করলেই চটে যান। এবার সার বলে ডাকতেই উনি বেরিয়ে এসে বললেন, তোদের সাতকেলে সার?'

'ভদ্র ব্যবহার?' পল্টুবাবু এমনভাবে হাসতে লাগলেন যেন তাঁকে কেউ রসিকতা দিচ্ছে।

'হ্যাঁ। ভদ্র ব্যবহার আপনার সয় না। রাজাদা' ঠিকই করেছিল।'

সুপ্রভাতের রাসভূত দাদা রাজা এ শহরে অনেকদিন কাটিয়ে গিয়েছে। সে খুব ভাল ছেলে ছিল, না ভীষণ খারাপ, তা নিয়ে এখনো ভয়ানক মতভেদ আছে এখানে। ছেলেরা তাকে পছন্দ করত, বুড়োরা নয়।

রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক ছিল। প্রথম হল, সে ছেলেদের বখায়।

পল্টুবাবুকে সে বলেছিল 'সার?'

'কে রা্যা? হার হারে করছিস?' পল্টুবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলেন।

'আমি রে আমি।'

রাজা সামনে এসে দু'হাত কোমরে রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে বলেছিল 'ওবেলা হলঘরে হাজা হবে। আমরা ডিবেট করব। তোর অসুবিধে হ'লে লাইব্রেরী বন্ধ ক'রে চলে যাস।

পল্টুবাবুই পূর্ণবাবুকে জানিয়েছিলেন রাজা মুস্তিয়ানা উদ্ধতা, অসভ্যতা, ইত্যাদি।

তখন গোলাপের যৌবন নয়। পূর্ণবাবু বড় বড় ইস্টার লিলি বুকের কাছে চেপে ধরে দু'পক্ষের কথা শুনেছিলেন।

'হ্যাঁ, আমি ওর সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, তা ছেলেদেরও বলতে বলব বই কি! উনি তাই চান্। সেইজন্যেই প্রতিটি কথায় এমন অসভ্যের মত জবাব দেন। দেখতে পাচ্ছি উনি যা চান তা দিতে যখন আমার পরসা খরচ হচ্ছে না তখন আর ওঁকে কষ্ট দিই কেন?'

পল্টুবাবুকে বলেছিল 'ছেলেদের মনে যা আছে, তা দুই তোকারি হয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। রাগ জমলে কেস খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

এখন সুপ্রভাতও তাই-ই বলল।

'তা আর বলবে না? রাজা চাটুজ্জের ভাই যে!'

সুপ্রভাত পূর্ণবাবুর দিকে চেয়ে বলল 'আপনার কথা ছাড়া কখনো আমরা যাই না। আপনিও জানেন এ স্কুলে, মেয়েদের স্কুলে, কোথাও ফল নেই। লাইব্রেরীর ফল নিতে গেলেই পল্টুবাবু এক একটা সীন করবেন।'

'কন্ফিডেন্স!' পল্টুবাবু কাঁকে কাঁকে ছররা ছুঁড়ে মারলেন এমনই উচ্চারণ।

'গোকের আমি না আমার গোক যানায়?' সুপ্রভাত বলল, 'যদি কোন নিয়ম করেই থাকেন একসময়ে, নিয়ম রাখবার জন্যেই অসভ্যতা করে চলবেন। তখন দরকার ছিল না, এখন হল দরকার। অতএব নিয়ম পাল্টে নিন। নইলে……'

'নইলে?'

'জীবন কাও হয়ে যাবে। আন্দোলন যাকে বলে। আমরা এখন অনেক কিছু চাইব। আপনাকে সরাতে হবে। এ ফলটাকে সকলের জন্যে খুলে দিতে হবে, এসময়ে কতটা বইইয়া সামলাতে পারবেন? বেশান নিয়ে তছ্নছ্ কাণ্ড হচ্ছে, মিড্‌লেসনে ট্যাক্স বেড়ে গেছে তা মনে আছে আপাকরি?'

পূর্ণবাবুর দিকে চেয়ে সুপ্রভাত বলল, আপনি কিছু বলুন?'

'বলব বই কি!'

পূর্ণবাবু একটু হেসে বললেন, 'এখন শুনলাম। পরে বলব। আপাততঃ শুধু এই বলব পল্টুবাবু, ছেলেদের ওপর নয়, ওরা যাঁর ইন্ধানিয়ে এসেছিল, তাঁর ওপরেই আপনি অবিচার করেছেন।'

'বাবাবতীনের ওপর আমি অবিচার করেছি?'

পল্টুবাবু আবার লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। পূর্ণবাবু হাত তুলে 'বললেন 'যদিও এখন আপনাদের হাসপাতালে যাওয়া দরকার। কেন না সকলেরই দেখছি প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে।'

জেলা শহরে বড় হাসপাতাল আছে। সেখানে পূর্ণবাবুর কয়েকটা বেড নেওয়াই থাকে। এখানকার হাসপাতালকে আর. এস, অর্থাৎ রেসিডেন্সিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন উন্মাদ আশ্রম।

'কই, আমাদের উন্মাদ আশ্রম দেখবেন না?' একবার একজন নিরীহ গোছের ভদ্রলোককে পূর্ণবাবুর বাগানে বসে থাকতে দেখে বলেছিলেন।

'উন্মাদ আশ্রম?'

'উন্মাদ আশ্রম নয়? আমরা খাতায় লিখি চারশো। হাতে পাই পঞ্চাশ টাকা কম। ওষুধ-পত্র যা আসে তা কোথায় যায় জানতেও পারি না। এই উনিশশো পঞ্চান্ন সালে টিটেনাস হয়ে সাতাত্তি মরে, আমরা যে স্যালস পাই তা রুগীদের জন্যে খরচ করতে গেলে পুলিশ এসে আমাদের শাসিয়ে বলে ব্যবসা করছ। রোগীর রেশন কর্তাদের বাড়ি যায়, মর্গ নেই বলে মড়া কুকুরে টেনে নিয়ে যায়। এরপরেও যদি বলেন এটা উন্মাদ আশ্রম নয়, তা'হলে আপনাকে মারতে ইচ্ছে হয় কি না হয় বলুন?'

'কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ হাঁ করেই থাকেন। আর, এস, 'যাবেন কিন্তু' বলে উঠে আসেন। সঙ্গে তার ছায়ারূপিণী, অনুগত সঙ্গী রজত ছিল।

'কেমন বলেছি?'

তাকেই জিগ্যেস করেন আর, এস, কমল রায়। শিগগিরই মন্ত্রী আসবেন। ইন্‌স্পেকশন হবে। হাসপাতালের উন্নতি হবে তখনো তাঁর সেই আশা আছে।

'কেমন বলেছি রজত?' তিনি আবার জিগ্যেস করেন।

'ভালই বলেছেন। কাকে বলেছেন তা জানেন ত?'

'কাকে?'

'মন্ত্রীকে।'

'অ্যাঁ? ঐ লোকটাই মন্ত্রী নাকি?'

কমল রায় তারী ভ্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। তাঁর সম্বন্ধে মন্ত্রী যা যা বলেছিলেন তা শুনলে হয়ত আরো ভ্রিয়মাণ হতেন। তারপর থেকে এখানে অনেক কিছুই পাল্টে গেল, বদলে গেল, কিন্তু হাসপাতালটা প্রায় তেমনি রয়ে গেল।

কমল রায় এখন যখনই টাকার কথা তোলেন, পূর্ণবাবু তখনই বলেন 'আর মশায়, মন্ত্রীকে যা চটিয়ে দিলেন!'

রজত যখন এতকিছুই যুক্তিতর্ক, তখন বলেছিল, 'আপনি আছেন বলেই যদি এদের গ্রান্ট পেতে অসুবিধে হয় তাহলে আপনি সরে যান না কেন?'

কমল রায় বলেছিলেন 'এর উত্তরে আমি অনেক কথাই বলতে পারতাম। তবে সে সব কিছুই বলব না। শুধু এটুকু জেনে রাখ পূর্ণকে যা মনে কর ও তা নয়। ও আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

রজতের দিকে চেয়ে বলেছিলেন 'আর, ও আমাকে অফিসিয়ালি কোন সাহায্যই করে না, অথচ হেল্‌স্ মী ইনডিভিডুয়ালি?'

'যেমন!'

'সেক্রেটরী!'

বলতে বলতে হঠাৎ ভীষণ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন কমল রায়। যেন ভয় পেয়ে বলে উঠেছিলেন 'কোন কথায় কান দিওনা রজত। যেদিন নিজের কাজটা শেষ হবে সেদিন আমাকেও ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে যেও।'

'সে কি?'

'বাধা আমি তোমায় দেব রজত। বীরিং আপ ওল্ড ফুল, ভীষণ বাধা দেব। কিন্তু তুমি একটা কথাও শুন না।'

সেই যে বলেছিলেন, আর কোনদিন কমলবাবু এ প্রসঙ্গে একটা কথাও বলেননি।

এখন তাঁরই কাছে চলল সবাই। ছেলের দল, পল্টুবাবু, মেয়েদের ইস্কুলের বাণীদি। বাণীদি'র চেহারাটা যত মিষ্টিই হোক স্বভাবটা ভারী ক্যাপাটে।

পল্টুবাবুকে তিনি ছাড়া আর কেউই ধমক দিতে পারে না। বাণীদি শুধু পল্টু বাবুকে কেন, সবাইকে ধমক দেন।

এমন কি বাঁকা গুণ্ডাকেও।

বাঁকা কলিয়ারীর কর্মী। এ সংসারে চোখ মেলবার পর থেকেই সে জেনে এসেছে পৃথিবীটা ঠিক দুটো ভাগে ভাগ করা। একদলের কাজ ইচ্ছে পরিশ্রম করা, আর একদলের কাজ হচ্ছে সে পরিশ্রমের ফল ভোগ করা।

এ কথা বুঝেছে বলেই বাঁকা আর কাউকে ভয় পায় না। ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। সবাই ওকে খাতির ক'রে চলে। জেলে যেতে, মারামারি করতে, এমন কি খুন করতেও বাঁকা ভয় পায় না। বছর সাতেক আগে মাস ফাটীরীর মাঠে সহদেব ঘোষালকে ও খুন ক'রে ফেলেছিল। খুন করেই বলেছিল 'তোরা থানায় খবর দে। আমি তাস খেলতে যাচ্ছি।'

তাস খেলতে ও দারোগার বাড়ীতেই গিয়েছিল। দারোগার সঙ্গে মুখোমুখি তাস নিয়ে বসে বসেই সহদেবের খুনের খবরটা শুনেছিল। তারপর দাঁড়িয়ে বলেছিল 'স্যার, আপনি আমার প্রথম অ্যারিবাই। আরো কয়েকটা ঠিক করতে হবে।'

সেবার ওর মোটে আড়াই বছর জেল হয়। জেল থেকে ফিরে এসে বাঁকার তেজ আরো বেড়ে যায়।

সেই বাঁকাকে পর্যন্ত বাণীদি ধমক দেন।

এই ত সেদিন দিনে দুপুরে বাঁকা নেশায় টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বাণীদির ইস্কুলের সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। বাঁকা নাকি এরকম খারাপ হয়ে যেত না, নষ্ট হত না কিছুতে। যখন বাণীদির বাবার ইস্কুল ছাড়া আর দ্বিতীয় স্কুল ছিল না, তখন তাঁরা বাঁকাকে পড়তে দেননি।

'আপনাদের দোষ আছে, ভীষণ দোষ,' বাঁকা চেঁচিয়ে বলছিল। সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয় পেতে পেতে মজা দেখছিল, কাছে আসেনি।

বাণীদি স্কুল থেকে হন হন করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ সাদা, চোখ উজ্জ্বল।

কাছে গিয়ে তিনি বাঁকাকে কি ভীষণ ধমক দিলেন। বললেন নির্লজ্জ, খুনে, পশু। একটু দূরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের বললেন অপদার্থ। তারপর কারো দিকে না চেয়েই বললেন 'আমার

বাবা কোনদিন তোমাকে হেয় মনে করেননি। তা যদি করতেন, তাহলে তুমি যখন টাকা চুরি করেছিলে তখন আর নিজে গিয়ে জামিন দিয়ে তোমায় ছাড়িয়ে আনতেন না।'

বাকা কেঁদে কেটে ক্ষমা চেয়ে চলে গিয়েছিল।

বাণীদি যা পারেন, অন্যরা তা পারে না। তার কারণ বাণীদির বাবা এ শহরের সবচেয়ে পুরণো লোক। সবার আগে তিনিই স্কুল করেছিলেন। তাঁর জমিজমাই কিনে নিয়ে পূর্ণবাবু কারখানা তৈরী করেন।

বাণীদি তাঁরই মেয়ে। এখনো বাবার তৈরী সেই ছোট্ট ইস্কুল নিয়েই পড়ে আছেন। চেহারা দেখলে কে বলবে তাঁর যৌবন অনেক—অনেকদিন হল চলে গিয়েছে। পূর্ণবাবুর সঙ্গে তাঁর এক সময়ে একটা মন বোঝাবুঝির ব্যাপার হতে চলেছিল এ কথা যারা বিশ্বাস করে না, তারাও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে পূর্ণবাবু মেয়েদের স্কুলের প্রাইমারীটা করলেন না কেন।

বাণীদির প্রাইমারীতে পড়ে সবাই নিখুঁত হাতের লেখা আর চমৎকার ঝাঁকঝকা শেখে। তারপর পূর্ণবাবুর ইস্কুলে আসে।

আজ ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে, পল্টুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাণীদিও হাসপাতালে এলেন।

ঠিক হাসপাতালে নয়। ডক্টর রায়ের কোয়ার্টারে।

ডক্টর রায় এত ভীড় দেখে ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করলেন 'কি হয়েছে? এসে গিয়েছে?'

এসে গিয়েছে মানে কোন বিশেষ সংবাদ পৌঁছে যাওয়া নয়, কোন প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাও নয়। ডক্টর রায়ের কথা হল আমরা সবাই ভয়ানক এমার্জেন্সীতে বাস করছি, সর্বদা। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিপদ ঘটতে পারে। সে কথা আমরা মেনেও আনি না। বা জানতে চাই না।

ডক্টর রায় বলেন 'সেই জন্যেই আমি নেশা করি। আমি হচ্ছি এমার্জেন্সীর ডাক্তার। সর্বদা এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে বসে থাকতে থাকতে নার্ভের ত' কিছু থাকে না তাই আমি নেশা করি।'

ডক্টর রায়কে বাইরে যতই কম দিন, আসলে খরচের টাকাটা পূর্ণবাবুই জুগিয়ে যান। এতাবে টাকা দেন, লেবরেটরী, সবকিছুকে বলেন ডক্টর রায় নাকি এ শহরের নামকে অমর করবেন।

এখন ডক্টর রায়ের প্রশ্ন শুনে রজত বলল 'হ্যাঁ। কয়েকটা সেলাই দিতে হবে। কার্ট এইড।'

'কি হয়েছিল কি?'

ডক্টর রায় হঠাৎ তাঁর চশমা, একটু নামচে চোখ দুটি বাণীদির মুখের ওপর তুললেন।

'পল্টুবাবু অতি জঘন্য, অভদ্র এবং লজ্জাকর ব্যবহার করেছেন।'

বাণীদির গলায় কান্নার শিরাটা ধুকধুক করতে লাগল।

'ছেলেদেরও কিছুই বলবার নেই। ওরাও দশজন মিলে একজনকে মারছিল।'

ডক্টর রায় একটু হাসলেন। বললেন 'সেই পাওয়ার পলিটিক্সের ব্যাপার ত?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা কি জান, এখন দেশে যুদ্ধ চলছে?'

ডক্টর রায় বাচ্চাদের জিগ্যেস করলেন।

'জানি।'

সুপ্রভাত সোজ হয়ে বলল 'রাজারা আর্মিতে আছে।'

'আদিতে ? কোথায় ?'

'জাই, ওআন অফ দেম,' রজত আস্তে বলল।

'বাঃ !'

ডক্টর রায় হঠাৎ হাসলেন। বললেন 'আমি ওকে সাটিফাই করেছিলাম। মনে আছে রজত ? আমি জানতাম ও একটা কিছু করবে, আমি জানতাম।'

তারপর বাণীদির দিকে চেয়ে বললেন 'কথাটা সবাইকে ডেকে গর্ব করে বলবার মত। ওদিকে যখন যুদ্ধ চলছে, এদিকে তখন এরা মারামারি করছিল। কারা মারামারি করছিল ! দুটো রিপ্রেজেন্টেটিভ কম্যুনিটি। একজন লাইব্রেরীআন্, যিনি বইয়ের মধ্যেই থাকেন, আর একজন ছাত্র। বাঃ, চমৎকার !'

রজত ওদের ড্রেস করতে লাগল।

একটু ওপাশে গিয়ে বাণীদি জিগ্যেস করলেন 'পাশের ঘরে পুলিশ কেন ? মানে সুধীরকে দেখলাম ? সে কি এমনি এসেছে ?

'ও নো। কেন জান না ? আমাদের মেইন্ গেট, আমাদের পূর্ণবাবু সুধীরকে পাঠিয়েছেন। আমি এবং রজত এখন দিনরাত পাহারায় আছি।'

'কিন্তু কেন ?'

'ভকত মারা গিয়েছে বলে।'

'ভকত মারা গিয়েছে বলে ?'

'হ্যাঁ। তুমি ত' জান বাণী, যখন আমরা রিসার্চ সুরু করি তখন থেকেই ভকত আমাদের পেসেন্ট।'

মুখটা ফিরিয়ে একটু কঠিন গলায় ডাক্তার বললেন 'রজতের অ্যাটিটাকিসনে ভকত মারা যায়নি বাণী, আমার অপারেশনেও নয়। কিন্তু পূর্ণবাবু ওআর্কস ইট আউট ওয়ে। তা ছাড়া ভকতের ভাইপো বাঁকাকে ত' তুমি জান। এতদিন পরে তার মনে হয়েছে কাকার কথা। হি ইজ বেস্ট্ অন্ মারিং আন্প্লেজেন্ট। পূর্ণবাবু একটা কোর্স, বাঁকা আরেকটা। আমি কি করতে পারি বল ? কি করবার ক্ষমতা আছে আমার ?'

'কিন্তু সে যে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে না ?'

'জানি না। আমি সদরে ভকতের লাশ আটাপ্সিতে পাঠিয়েছি।'

'সদরে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'এখানে করলে ত' আমরাই করব, তা ওরা বিশ্বাস করবে না।'

'সদরেও ত' শুনতে পাই···'

'না না। রমেন এসেছে চার্জ নিয়ে, রমেন বোস। ও আমার সহপাঠি, চেনা। ওকে বিশেষ করে জানিয়েছি। দেখনা কি হয় ?'

'যদি অন্য কিছু হয় ?'

'হ'লে হবে। কি আর কথা যাবে বল? কিন্তু রজতকে নিয়ে আমি ভয়ানক মুস্কিলে পড়েছি। ওকে নিয়ে কি করি বল ত?'

'কি করেছে রজত?'

'কি করেছে? ছেলেটা ভেঙে পড়েছে, দি ইজ ডাগিং হার, গাট নার্স। ও, তুমিই গিয়েছিলাম নার্স আবার তোমারি ভাইকি। কিন্তু রজত কেন ওর প্রেমে পড়তে গেল বল দেখি?'

'সত্যি, তোমার কথা শুনলে……'

'তুমি কি ওদের সঙ্গেই এসেছিলে?'

'তাই এসেছি বটে, কিন্তু রজতকে দেখতেই এসেছি।'

বাণীদি ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরের বারান্দায় বীকা বসেছিল, 'বঙ্কিম যে!' মৃদুস্বরে বললেন, উঠতে লাগলেন।

'আপনি এখানে?'

'কাজ আছে।'

'আমি বসে আছি নিজেরই গরজে। কাকার খবরটা এসে শুনে তবে যাব।'

'রজতের ভাগ্য ভাল যে মরবার পর ভাইপো এত খোঁজখবর নিচ্ছে। বেঁচে থাকতে ত' বেচারাকে ডাক্তারবাবু আর রজত ছাড়া কেউ দেখবারও ছিল না। তোমরা তখনও ছিলে, এই শহরেই ছিলে বলে শুনতে পাই।'

'বেঁচে থাকতে খবর নিইনি বলে মরে গেলেও খবর নেব না এ কেমন কথা? সুপ্রভাতের বাপও ত' শুনতে পাই রাজাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল।'

'না না, ও কি কথা বঙ্কিম। হরিবাবু চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। তাঁর সাধ্যমত করেছিলেন বই কি। মুঙ্গেই কি আর যেতে দিতেন? আসিতে ও একরকম জোর করেই গেল। হরিবাবু ত' সেদিন আমার কাছে কত দুঃখ করে সে কথা বললেন।'

'বললেন?'

বীকা যেন ভারী উৎসুক হয়ে উঠল জানতে।

'বললেন বই কি। বললেন আমি বললাম সবাই বলবে আমি তোকে লেখাপড়া করালাম না, আসিতে দিলাম। ও বলল আমাকে যেতে দিতেই হবে মেসোমশায়, নইলে হয়ত আমি খুব খারাপ একটা কিছু করে বসব। আমাদের মত ছেলেরা খুব খারাপ হয়ে যায় মেসোমশায়। এখানে থাকলে আমি যা হব, তার চেয়ে আসিতে যাওয়া ত' অনেক ভাল কাজ।'

বীকা এখন বলল 'রাজাকে নিশ্চয় চমৎকার দেখাবে ইউনিফর্মে, তাই না?'

বাণীদি খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। এই ছোট্ট জায়গাটায় বছর দশবারো কাটিয়ে অনেকের ভালোবাসা নিয়ে কিছুদিন হল রাজা ফ্রন্টে গিয়েছে। লেখাপড়া স্কুল ফাইনালের পর থেকে গোল্লায় গিয়েছিল। অত ভাল খেলতে, আবৃত্তি করতে, থিয়েটার করতে, কলিয়ারীর কুলিধাঙ্গিতে কলেরা হলে ভলান্টিয়ার-নার্স করতে যদি না এগিয়ে যেত, তাহ'লে হয়ত কেউ ওকে দয়া করত না।

চেহারাটা চমৎকার ছিল, রোদেপোড়া তামাটে বর্ণ রঙ, চওড়া বুক, ঘন নীল শার্টের বুক খোলা, সাইকেল চড়ে বেল বাজিয়ে চলে গেলে মেয়েরা ফিরে ফিরে তাকাত, আর তা রাজারও অজানা ছিল না।

'লতুকে কেন যে পূর্ণদা বিয়ে দিয়ে দিলেন!' বীকা হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলল।

'আমি ওপরে যাচ্ছি বঙ্কিম।'

বাণীদি ওর শেষের কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না। শুধু মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন 'লখন থেকে রিপোর্ট এলে কি করবে?'

'রিপোর্ট যদি ভাল হয় তাহলে কিছুই করব না। যদি খারাপ হয় তাহলে···'

'গুণ্ডামি করবে এই ত?'

বঙ্কিম চুপ।

'তা করবে না বললেই আশ্চর্য হতাম বেশী।'

'কেন? আমি গুণ্ডা বলে?'

অন্য যে কোন আড্ডা হলে হয়ত অন্তরা বীকা আর বাণীদির কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে যেত। বীকা হাজার হলেও জেলখাটা গুণ্ডা আর বাণীদি সবচেয়ে পুরণো বাড়ীর, একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের মেয়ে। বাণীদির মামাবাড়ীতে খুব সায়েস্তাখানা ছিল। সবাই ভাবত বাণীদি আর রাণীদির খুব ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। আগে ত' শহরে সায়েবসুবো এলেই ওঁদের দু'বোনকে নিয়ে বাবা যেতেন উৎসবে অনুষ্ঠানে।

রাণীদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওঁদের বাবা মারা গিয়েছেন। বাণীদির না হয় বয়স বেড়ে গিয়েছে, বিয়েও হয়নি। তবু তাঁর মর্যাদাটা ত' কমে যায়নি। তিনি যা ছিলেন তাই-ই আছেন।

তবু তাঁর সঙ্গে বঙ্কিম কথা বলে। এ শহরে তাই-ই স্বাভাবিক। এখানকার যারা ভাল, যারা মন্দ, যারা ধনী, যারা গরীব, তারা সবাই সবাইকে এতদিন ধরে দেখছে, যে পুরণো পরিচিতদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা না হওয়াই অস্বাভাবিক।

'তুমি গুণ্ডা কি না আমি জানিনা বঙ্কিম। তবে তোমার স্বভাবের আরো অনেক দোষের কথা জানি। আর এ-ও জানি, যে ডাক্তার বারবার না বাঁচালে তুমি বাঁচতে না। তবে গুণ্ডামি করলেই সেটা মানাবে ভাল। এ শহরের পক্ষে মানানসই কাজ হবে।'

বঙ্কিমের চেহারায়, পোষাকে, কোথাও কোন অভদ্রভাব নেই। শুধু আছে একটা রুক্ষ চোয়াড়ে ভাব, আর চোখে খানিকটা বিষন্ন। অন্যায় করে দুষ্টুদের লোক আর সয়ে যায় বহু, এই দু'দলের মধ্যে পৃথিবীটা ভাগ করে নেওয়ার পরও শান্তি নেই। সবসময়ে, যেখানে সেখানে চেনা লোকদের মধ্যেই এমন সব জিনিস দেখতে পায় বঙ্কিম, যে তখনই তাদের মনে হয় অচেনা, বঙ্কিমের মনের যে দুটো কামরা আছে, তার একটাতেও তাদের রাখা যায় না। এই সব সময়ে বঙ্কিমের বিষন্ন হয়। এখন যেমন হ'ল।

সে যে কথা বলল সেটা অবশ্য আবার খাপছাড়াই শোনাল।

'শহর! তুমি ছাড়া কেউ এ জায়গাটাকে এমন ভালবেসে শহর বলে না বাণীদি! শহর! মাঝে মাঝে কলিয়ারী থেকে এখানে ফিরতে ঘেন্না করে আমার। রাতবিরেতে কাদার বিশ্বাসের সাবের গীর্জে আর ক্রীশ্চান স্কুলটাকে দেখেছ? কি জঘন্য ঘেরাও, পাঁজরা বের করা, হাড় জিরজিরে চেহারা। বাজার দিয়ে আসতে পারি না। যেমন শুড় আর তামাকের গন্ধ, তেমনি পথে ইঁদুর আরশলার ছুটোছুটি। ভিখিরীগুলো তারই মধ্যে শুয়ে আছে, দেখলে আমার মনে হয়—!'

কি মনে হয় তা আর বলতে সময় পেল না বঙ্কিম। কেননা বাঈদি ওপরে উঠে গেলেন। এখন রজতও পেছনে পেছনে ওপরে উঠতে লাগল।

বঙ্কিম আবার চেয়ারে ঢুকে পা এলিয়ে দিল।

ডাক্তারের গলা শোনা গেল 'আছে, টেবিল আছে বই কি। কই বঙ্কিম, টেবিলটা এগিয়ে দাও না। আমি আর সুধীরবাবু তাস খেলব।'

বঙ্কিম উঠে গিয়ে টেবিলটা দিয়ে এল।

সুধীরবাবু বঙ্কিমের দিকে হাসিমুখে তাকালেন। বললেন 'চেনা মুখ!'

'বঙ্কিমের কথা বলছেন? ও, তাও ত' বটে!' ডাক্তার তাঁর গলার ঘাম মুছতে মুছতে হা হা করে হাসলেন। বললেন 'পুলিশ এবং আসামী! ভুলেই গেছলাম। আপনাদের ত' যাকে বলে···'

'ও এখানে কেন?' সুধীরবাবু হঠাৎ গলাটা নামালেন।

'কি মশায়, ফিস ফিস করেন কেন?'

'ওর কথা বলছি। বঙ্কিম! বঙ্কিম এখানে কেন?'

'সে ত' আপনিই জানবেন।'

'আমি জানব মানে?'

'আপনিও যে জন্যে এসেছেন, ও-ও সে জন্যেই এসেছে। রমেশের রিপোর্ট যদি খারাপ হয় তাহলে আপনি আমার জেলে পুরবেন, বঙ্কিম আমাদের সেক্রেটারী ভেঙে দেবে।'

'না না, ওসব লোককে···কি জানেন মশায়, পুলিশে কাজ করলে কি হবে। ভেতরে ভেতরে আমি···'

'একটি কবি, এই ত?'

'কি করে জানলেন?'

'আহা, ওর মধ্যে আর জানবার আছেটা কি! এ জায়গায় ডাক্তার বদ্ধ উন্মাদ, পুলিশ কবিতা লিখবে, এ ছাড়া আর হবেই বা কি?'

'ও লোকটা থাকলে আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

'কেন?'

ডাক্তার সত্যিই অবাক হলেন। বললেন 'মশায়, সহ্য করতে শিখুন। আপনাতে আমাতে মতে মিলবে না তবু পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করতে হবে বই কি। আপনার ওকে যতটা খারাপ লাগছে আমার হয়ত আপনাকে তার চেয়ে অনেক অনেক খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি কিছুই বলছি না।'

যেন ক্লাসরুমে বক্তৃতা দিচ্ছেন এই ভাবে বললেন 'দিস ইজ ওয়ান সাইড অফ দ্য পিকচার। আর একটা দিক হচ্ছে, ওর ত' তবু আমার আর রজতের মাথা ভেঙে দেবার একটা যুক্তি আছে। অবশ্য যদি রিপোর্ট খারাপ হয়। আমরা খুনে-বদমাস প্রতিপন্ন হই, তবেই।'

'না। কেউই কোন অবস্থাতেই, আইন নিজের হাতে নিতে পারে না। পারে কি?'

'আরে মশায়, আইনের নিকুচি করেছে। আমি বলছি আপনারা যদি আমার মাথা ভেঙে দেন, তাহলে ওর পক্ষে তবু যুক্তি থাকবে। ওর কাকা, সে যত অপদার্থই হোকনা কেন, কাকা মরেছে অতএব ও রেগে গিয়েছে। আপনার কি বলবার থাকবে মশায়? পূর্ণবাবু যেই টিপে দিল অমনি এসে উপস্থিত হয়েছেন?'

হরীরবাবু রাগ করলেন না। বললেন 'আপনি যেদিন এমনিই কোন কারণ ছাড়িয়ে পূর্ববাবুর সম্পর্কে আমায় টিপে দেবেন, সেদিন ওঃকেও হবে।'

'স্ট্রাট্‌স অ স্পিরিট। আই মীন রং স্পিরিট। আই মীন প্রয়োজন হবে না আপনার। চুলোয় যাওগে, নিন্, তাস দিন।'

তাস দিতে দিতে বললেন 'আজকের দিনটা যেন দস হিসেবের বাইরে। রিপোর্ট যদি ও. কে. না হয় তাহলে রজতকে নিয়ে যে কি করব।'

॥ ২ ॥

'তোমায় নিয়ে যে আমি মহাভাবনায় পড়লাম রজত।'

বাণীদি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন।

দোতলার রজতদের লেবরেটরী। তারই এক পাশে রজতের শোবার খাট, চেয়ার, টেবিল।

'কেন বল ত?'

'ডাক্তারও চিন্তিত।'

'জানি।'

'তোমার সামনে ত' একটা ভবিষ্যৎ আছে ভাই।'

'এখন মনে হচ্ছে কিছুই নেই। আমার গত চার বছরের অতীতই আমার ভবিষ্যৎকে গ্রাস করে নিয়েছে বাণীদি। আমি ভাবতে পারিনি আলো শেষ অবধি……আলোকে আমি রাখতে পারব না……আজ কেবল ওর কথা মনে হচ্ছে। তুমি ত' জান ও না থাকলে কিছুই করতে পারতাম না আমি। কিছুতেই কাজটা শেষ করতে পারতাম না।'

'জানি।'

কথা বলতে বাণীদির কষ্ট হল। মানুষ বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়। রজতের এ-কথাটুকু মনে নেই আলো তাইই ভাইবি। আলোর জন্যে তাঁর কষ্ট হয়, অনেক সময়েই কষ্ট হয়। নিজের ভাইবি নয়, জ্যাঠতুত ভাইয়ের মেয়ে। তাঁদের পরিবারে এতে-তাতে ঘনিষ্ঠতা বড় কম। তাই আলোর বাবা মা-কে জানতেন, আলোর অস্তিত্ব জানতেন না।

'জান রজত, আলো যখন এসে আমাকে বলল আপনার নাম বাণী, আপনি আমার পিসী হন। আমার নাম আলো। আমি আপনার জ্যাঠতুত দাদা বনবিহারীর মেয়ে। আমি নার্সিং পাশ করেছি, এখানে কাজ করব। ওর কথা শুনে আমি যেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তেমনি আনন্দ হয়েছিল।'

'তবে বড্ড রোগা মনে হয়েছিল, তাই না?

'হ্যাঁ। আমি ত অবাক হয়ে বলেছিলাম তোমাকে কে নার্স করে তার ঠিক নেই, তুমি আবার নার্স করবে কাকে?'

আলো তেমনি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিয়েছিল 'সেইজন্যেই ত' ভয় করে বাপীপিসী।'

বাপীদি বলেছিলেন 'বড়দা তোমায় নার্সিং পড়তে দিলেন?'

'ইচ্ছে করে কি আর! বাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমিও দেখছিলাম আমাকে বি. এস-সি. পড়াতে ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই একদিন, বি. এস. সির ফল বেরুতে না বেরুতে নাম লিখিয়ে এলাম। শুনে বাবা খুব দুঃখ পেলেন। মা শুধু বললেন ভালই করেছিস। লেখাপড়া জানলে আমিও কিছু করতাম।'

'বউদি চিরদিনই বুদ্ধিমতী। ভাল কথাই বলেছিলেন।'

'টাকার জন্যেই যদি, তবে অন্য কিছু করলে না কেন?'

'নার্সিং যে আমার ভাল লাগে।'

'স্পেশাল নার্সিং করলে নাকি অনেক বেশী টাকা পাওয়া যায়?'

'যায়।'

'তাতে গেলে না কেন?'

'নার্সিং পড়তে পড়তে অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি, অনেক ভেবে দেখেছি। নার্সিংয়ের চেয়ে প্রাইভেট টিউটিতে পয়সা বেশী, অনেক বেশী। কিন্তু নার্সিংয়ের অন্য একটা দিক আছে। বক্ষঃস্থলে নার্সিং করলে কাজ শেখা যায়। অনেক রকম কেস আসে। ডাক্তার কম থাকে, নার্সদের দায়িত্ব নিতে হয় বেশী। কাজ ভাল করে শিখে নার্সিং করা, তারপর, বেশী বয়সে প্রাইভেট বা স্পেশাল নার্সিং করা, এই আমার পছন্দ।'

বাপীদি তখনো আলোর রোগা, কর্কশ, লম্বাটে মুখ, স্কুলের মেয়ের মত অপরিণত ছিপছিপে শরীর। দুটো বেণীর ডগায় রিবন, পায়ের জুতো দেখছিলেন। তাঁর কপালে প্রশ্ন কুঁচকে ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল কি করে এত রোগা মেয়ে বিদেশে কেমন করে চাকরী করবে।

আলো কৌতূহলী হয়ে তার বাপীপিসীর মুখ চোখ দেখছিল। কেবল মনে হচ্ছিল যেন ভয়ানক ঢাকাঢোপা জীবন কাটিয়েছেন পিসীমা, এই ঘুপ ঘুপ আবাসগৃহে, আলো যেন অন্য গ্রহ, অন্য পৃথিবী থেকে এসেছে তাই তাকে ঢুকতে দিতে তিনি ভয় পাচ্ছেন।

'এত রোগা! তোমার কোন অসুখ নেই ত' আলো?'

'শুনেছি ছোটবেলা হাম হয়েছিল। কিন্তু এমনি হাজারটা প্রশ্ন না করে কি আপনি কাউকে ঢুকতে দেন না বাড়ীতে?'

বাপীদি তখন লজ্জায় কি করবেন ভেবে পাননি। সত্যি, তখনো আলোর জিনিষপত্তর সাইকেল রিক্সায়, আলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

'এস, এস', বলে তিনি তাকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

'আমি ত' হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকব, এখানে মাঝে মাঝে আসব। আপনার অসুবিধে হবে?' আলো জিগ্যেস করেছিল।

'কি অসুবিধে হবে আলো? কিছুই না। তুমি এখানে থাকলেও অসুবিধে হবে না।'

'আমাকে ত' হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকতে হবে। নইলে হঠাৎ দরকার হলে কি হবে?'

আলো, এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে এলে কেন? এখানকার হাসপাতালে ত' বড্ড বেশী কাজ বলে নার্সরা থাকতেই চায় না।'

'এর আগে এখানে যে দু'টি নার্স এসেছিল, তাদের দুজনকেই আমি চিনি। ওরা কোনমতে ফিরে গিয়ে বেঁচেছিল। বলেছিল বড্ড বেশী কাজ। ডাক্তারকে পাগল বললেই হয়। আরো কত কি।'

'তা শুনেও এলে? কথাগুলো ত' মিথ্যে নয়।'

'মিথ্যে নয় বলেই এলাম।'

এখন আলোর সেই কথা বলবার বিশেষ সুর, মুখটা একটু তুলে তাকাবার বিশেষ ভঙ্গীটি মনে পড়ল বাণীদির।

'জান রজত, আলো বলেছিল এ জায়গাটার নাম করলেই ওরা চিনে ফেলে। নার্স তাড়াবার এমন জায়গা না কি কমই আছে। নতুন নার্সরা বলে ওখানে কে যাবে বল, সার্ভিস করব বলে ত' শিখেছি, সার্ভিস করব। তা বলে ওখানে?'

'তবু ও এসেছিল।'

'তবু ও এসেছিল।'

'শুধু আসেনি বাণীদি। বিরাট বিরাট সব বাধা ছিল ওর সামনে। প্রত্যেকটি প্রতিকূল অবস্থাকে ও জয় করেছিল। আমিও ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, কেন এলেন এখানে, কেন এলেন এই স্বাস্থ্য নিয়ে?'

রজতেরও সব মনে আছে।

কমল ডাক্তার বলেছিলেন 'রজত, আমাদের নতুন সিষ্টার বেজায় বদ মেজাজী।'

'তাতে আমার কি?'

সেবরেটরীতে বড় ডাক্তার আর ছোট ডাক্তারের মধ্যে এইভাবেই কথা চলত।

'তোমার কি! দাঁড়াও বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ডায়াগ্রাম এঁকে কমল ডাক্তার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দুটো ইঞ্জিন যদি একই লাইন ধরে মুখোমুখি এগোতে থাকে, তাহ'লে তাদের ধাক্কা লাগবে।

রজত ভাচ্ছিল্য সূচক শব্দ করেছিল।

'আপনি ওকে ভয় পান।'

'কি বললে?' কমল ডাক্তার খ্যাক করে উঠেছিলেন।

'সিষ্টারকে ভয় পান।'

বলে রজত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তারপর বলেছিল 'অস্বিজেন সিলিণ্ডার। আপনি নিশ্চয়ই ওকে দেখাতে গিয়েছিলেন হাউ টু অপারেট ইট।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'মনে হচ্ছে। আপনার ত' সোজা ব্লাকদের ইম্প্রেস করবার আর কিছু জানা নেই?'

কমল ডাক্তার কেন যেন চেঁচিয়ে ওঠেননি, বদমেজাজ দেখাননি। তিনি বলেছিলেন 'আমার ভুল হয়েছিল। তুমি যেন ভুল করতে যেওনা।'

'না। ও আপনার চেয়ে অক্সিজেন ভাল দেয়, ব্লাড ভাল দেয় ও. টি. তে অসাধারণ দক্ষতার অ্যাম্বেস্থেশিয়া দেয়, এমার্জেন্সী সামলায় তা ত' দেখেই নিয়েছি। আমি ওকে খাটাতে যাব কেন?'

'তবে দেখ রজত, নী হ্যাজ রি-অর্গানাইজড দ্য ডিস্‌পেন্সারী, পূর্বর ঘেড়ে শেয়াল, ঐ বুড়ো কম্পাউণ্ডারটাকে ভাল জায়গা চিনিয়ে দিয়েছে, সিষ্টার একটা অ্যাসেট, বুঝলে? ওকে চটিও না। আমার মনেহয় অন্য সিষ্টাররা চলে যায়, ওদের বোধহয় তুমি কোন না কোন ভাবে বিরক্ত কর।'

'না।'

'তবে তারা চলে যায় কেন?'

'আমার জন্যে যায়না, আপনার জন্যে যায় না। যায় এখানকার অযথা সার্ভিস কনডিশানের জন্যে। টাক নেই, অযথা পরিশ্রম, পূর্ববাবুর কলনাড়া আর কাটিনাড়া চলেছে ত' চলেছেই। আই লাইক রেম। চলে যায় বেশ করে।'

নিউট্রনের আকর্ষণীয় মডেল

মিলানো টি. এন. টি. ৮৫৪
৯ ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস্, ৩ ব্যাণ্ড, ৪ পুশ বাটন, টেবিল মডেল। অল ওয়েভ। মূল্য ৩০৮৲ (উৎপাদন কর সহ)। অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

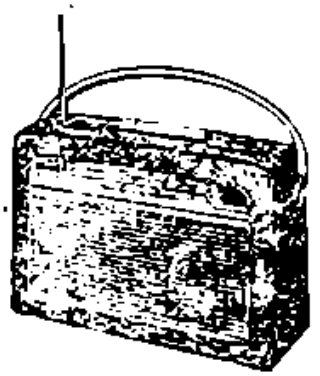

জিপসী পোর্টেবল টি.এন.পি ৮৫৬
৯ ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস্, ৩ ব্যাণ্ড, ৫ পুশ বাটন। ৪টি টর্চের ব্যাটারী, মূল্য ৩১৮৲ (উৎপাদন কর সহ) অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

এপোলো টি. এন. টি ৮৫৩
ডিলাক্স টেবিল মডেল, ৯ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস, ৩ ব্যাণ্ড, ৫ পুশ বাটন, অলওয়েভ। মূল্য ৩৫০৲ (উৎপাদন কর সহ) অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

সুপার জনতা
মডেল ৪১৩ এন. ইউ (এসি/ডিসি) ৩ ব্যাণ্ড, ৪ ভাল্‌ব, অলওয়েভ ৬"×৪" লাউড স্পীকার। মূল্য ১৩৫৲ অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

ভেনাস ৫৫৭
এন.এ—এসি, এন.ইউ—এসি/ডিসি ৪ ভাল্‌ব, অলওয়েভ, ৩ ব্যাণ্ড, ২টি লাউড স্পীকার। মূল্য ৩১৫৲ (উৎপাদন কর সহ) অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

নেপচুন —টি. এন. আই ৮৩১: ৯ ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস, ৩ ব্যাণ্ড, সুমধুর স্বর। অত্যন্ত কম খরচে চলে। মূল্য ৩১০৲ (উৎপাদন কর সহ) অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।

"জুপিটার" —টি. এন. ই—৬২৯: ৭ ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস, ২ ব্যাণ্ড। মূল্য—১৬৫৲ বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন।

পরিবেশক ঃ

Neutron

নান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১

'বা, আমরা পড়ে আছি কেন ?'

'আমি নেই !'

রজত সিনিসিজমকে ইঞ্জেকশান দিয়ে সুস্থ ছ'চিয়ে বলেছিল 'আমি নেই। আমাদের ওষুধটা বেরুবার হয়ে যাক, রিসার্চের কাগজ কলকাতায় পাঠিয়েই আমি চলে যাব।'

'কোথায় ?'

'প্রথমে কলকাতায়, তারপর যেখানে খুশী সেখানে। ওষুধ পেটেন্ট হলে তখন আমার লাখলাখ টাকা হয়ে যাবে। সবচেয়ে আগে একটা গাড়ী কিনব। তারপর অন্য কথা।'

কমল ডাক্তার যা বলেছিলেন তা আর শোনবার মত নয়।

রজতের সঙ্গে আলোর সেদিনই ঝগড়া বেধেছিল। রুগীর পথ্য বদলে দেওয়া নিয়ে।

চার্ট দেখে রজত বেজায় চটে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বলেছিল 'বারোনম্বরকে পাঁউরুটি দিতে কে বলেছে।'

'আমি বলেছি।'

'কেন ? আমি কাল ঠিক ক'রে দিয়ে যাইনি ?

'কাল সকালের পর আঠারো ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। রুগীর অবস্থা বদলালে ডায়েট বদলাবে না ?

'আমাকে কেন বলেননি ?'

'আপনি ছিলেন না। রাত্রার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।'

আলোর গলার শিরাটা ধুকধুক করছিল, চোখটা আর একটু বড় দেখিয়েছিল, আর একটু কালো। এ ছাড়া আর কোথাও উত্তেজনার চিহ্নমাত্র ছিল না।

'কেন, কেন আপনি আমার প্রত্যেকটা কাজে নাক গলাতে এসেছেন বলতে পারেন ? কেন এসেছেন আপনি ?'

'রজতবাবু, এখানে আমি এবং আপনি দু'জনেই রুগীদের দেখব বলে এসেছি। এটা কি আমাদের ড্রয়িংরুম যে আমরা ঝগড়া করছি ?'

'আমি কমল ডাক্তারের কাছে শিশি-বোতল ধুতাম, সেবেল সাঁটতাম। সেই অবস্থা থেকে আমি ডাক্তার হয়েছি। ড্রয়িংরুমের কথা আমার তেমন জানা নেই।'

'আরো অনেক কিছুই জানা নেই আপনার।'

'যেমন ?'

রজতের ইচ্ছে করছিল, ওর বেণী টেনে ধ'রে ঠাস ঠাস ক'রে চড় মারে।'

'যেমন, নিচু অবস্থা থেকে উপরে ওঠাটা ভাল, কিন্তু সেই গর্বে এ কথা মনে করা উচিত নয় আপনার সে সংগ্রামের অধ্যায়টা আপনাকে বিশেষ কোন ছাড়পত্র দিয়েছে যার জোরে আপনি নিজেকে স্বভাবের, স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম মনে করবেন।'

রজত অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। সদ্য নার্সিং পাশ করা একটি মেয়ের মুখে সে এরকম কথা শুনবে বলে আশা করেনি। নার্স কেন, মেয়েদের বিষয়েই তার তখন প্রবল বিতৃষ্ণা।

আলো আস্তে বলেছিল, 'আমার ভাবলে খুব অবাক লাগে, আপনি আর ডাক্তার রায় দু'জনেই ভুলে যান একটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আপনাদের ওপর।'

'দেখুন, ডাক্তার রায় সম্পর্কে.....'

'জোস্ করে উঠবেন না রজতবাবু। স্বীকার করছি কণী এলে আপনারা প্রাণ দিয়ে তাদের জন্যে করেন, আর মেডিকাল মানের এদিকের সেটাই হয়ত' শেষ কথা। কিন্তু অর্ধেক সময় আপনাদের মাথায় তেল নেই, স্নান-খাওয়া নেই, জামাকাপড় অপরিষ্কার, এত হিরো হিরো ভাব কেন, এত রোমান্টিক কেন, আপনারা ত' কোন ভূমিকায় অভিনয় করছেন না, যে সবসময়ে নিজের সম্পর্কে উদাসীন, ওরকম ডেডিকেটেড ভাব করে থাকতে হবে?'

রজত আর কথা খুঁজে পায়নি।

'হাসপাতালের একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের দিক আছে। সেদিকে ডিসিপ্লিন চাই, চাই শৃঙ্খলা, একটা কাজের ভার।'

আলোর প্রতিটি কথা সত্যি জেনেও রজত বলেছিল 'আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন এ জায়গাটা ক্রিমিয়া যুদ্ধের ফ্রন্টারি আর আপনি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এসেছেন।'

'যদি সে-রকম কোন ভাব আপনার মনে হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি সবই অনুভব করব। কিন্তু একটা কথা জানেন? আমি এখানে আসবার আগে সবাই বলেছিল, স্টার্টস এ বট্টন প্লেস। তখনই আমার মনে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব আসে। আমি স্থিরই করেছিলাম এখানে লাভিস করব।'

রজতের দিকে মুখ না তুলেই আলো বলেছিল 'করব, শেষ অবধি দেখে তবে যাব। আর একটা কথা, ওআর্ডে আপনি যখন ইচ্ছে আসতে পারেন, তবে পায়ের জুতোয় কাদা রাখবেন না। আস্তে কথা বলবেন, নইলে আমি ওআর্ডে এদের বোঝাব কি করে, যে এইসব ছোট ডিসিপ্লিনেরও প্রয়োজন আছে?'

রজত বলল 'বাণীদি, ও বলেছিল এখানে কাজকরা ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।'

'আমাকেও তাই-ই বলেছিল।'

'কিন্তু তুমি কেন এলে বাণীদি?'

বাণীদি চোখ তুললেন। বললেন, 'আলোকে আমি খুব ভালবেসেছি রজত। ও যদিও চলে যাবার সময়ে বলে গেল আমায় তাড়াতাড়ি ভুলে যেও বাণী দিদী, নইলে তোমার কষ্ট হবে।'

রজত চুপ।

'আমি জানতে এসেছিলাম তুমি ওর কোন চিঠি পেয়েছ কিনা।'

'না। ও বলেছিল ক্যান্সার যদি না হয়, যদি এমন কোন অসুখ হয় যা কিওরেবল, তাহ'লে চিঠি লিখব, তাহলে ফিরে আসব। যদি তা না হয়—'

'তাহ'লে? তাহ'লে কি হবে আমাকে বল রজত, আমার মন বড় অস্থির হয়ে গিয়েছে।'

'বলেছিল তাহ'লে আর ও লিখবে না। বলেছিল যেদিন তা জানব, সেদিন থেকেই তোমার চিঠি না পড়ে ফেরৎ দেব। আর, যেদিন দেখবে খামটা না খুলেই ফেরৎ দিয়েছি, সেদিন থেকেই তুমি আমায় ভুলতে শুরু কোর।'

'ভুলতে বলেছিল?'

'তাই ত' বলল। বলল আমি তোমায় জানি রজত। আমাকে তোমার মনের যতটুকু দিয়েছ, তা তুলে নিয়ে তোমার কাজে দিতে হয়ত তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু তুমি তা পারবে। ঠিকই পারবে।'

'এই কথা বলেছিল ?'

'হাঁ। এ-কথা বলবার অবস্থা হয়ত' আমিই তৈরী করে দিয়েছিলাম। আমি যে সময়ে বলতাম কোন কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় নয়। ছোটবেলা, যখন ডাক্তারবাবুকে পাইনি, তখন রোজ ভাত না খেয়েও দিব্যি কাটিয়ে দিতাম। জানতাম ওটা আমার পাওনার মধ্যে পড়ে না। আলোকে বলতাম, একদিন হয়ত' আলোর ভালবাসা ছাড়াই বাঁচতে চেষ্টা করতে হবে। কেন যেন আমার মনে হয় ওটা আমার পাওনার বাইরে। ওটা বাদ দিয়েই আমার চলতে চেষ্টা করা উচিত।'

'বলে তুমি ভাল করনি রঞ্জত।'

'ভাল করিনি কি বলছ বাণীদি, ভয়ানক ভুল করেছি। ওকে বাদ দিয়ে সারাজীবন চলতে হতে পারে, এ-কথাটা অবধি ভাবতে পারছি না।'

'আমি জানি না রঞ্জত, তোমাদের ভালবাসার রকম বুঝি না। এখানে ত' যখন দেখেছি তখনই তোমরা ঝগড়া করছ। নয়ত' তর্ক। তোমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে সঠিকই জানিনা। তবে একটা খবর দিই। এই প্রথম……দেখ !'

একখানা না, খোলা চিঠি দিলেন রঞ্জতের হাতে। আস্তে বললেন, 'এই প্রথম কেরৎ এল। তোমার সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল, আমার সঙ্গে ত সে কথা হয়নি। তবে আমার চিঠি কেন কেরৎ এল রঞ্জত ?'

রঞ্জত পকেট থেকে একখানা খাম বের করে দিল। বলল 'আমার চিঠিও কেরৎ এসেছে বাণীদি।'

দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে। মুখে কথা নেই। দু'জনের মাঝখানে আলোর কথা, হাসি, উজ্জ্বল দৃষ্টি, সব কিছু বাতাসে বুদ্বুদের মত ভেঙে বেড়াচ্ছে। রঞ্জত আস্তে বলল 'এ আমি আগেই জানি। আমার মন বলছিল।'

'রঞ্জত, তুমি জানতে, তবু……'

'বাণীদি, শুনলে হয়ত তোমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু আজকের দিনটা এমন, যে মানসিক থেকে নানা ঘটনাকে, জীবনকে, এ দিনটা ক্রাইসিসের দিকে নিয়ে চলেছে।'

বাণীদি চোখ তুললেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন।

'বলতে পার যুদ্ধের গতি একটা চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

'যুদ্ধ ?'

'হাঁ। রুটের যুদ্ধ নয় বাণীদি। ও যুদ্ধ ত' একটা ভাল জিনিষ, এমন একটা জিনিস, যে মানুষকে এই নিরাশার মধ্যেও প্রেরণা দেয়, মানুষের বেটারমেন্টকে বের করে আনে।'

'সত্যিই তাই।'

'ভেবে দেখলে তোমার অবাক লাগবে, এমনিতে আমাদের মধ্যে ডিসেন্টরের শেষ নেই। দিস ওআর হ্যাজ ইউনিফায়েড, আস্। আমরা সবাই আজ শান্তীজীর পেছনে। এক রাজাকে আমরা রুটে পাঠিয়েছি। কিন্তু দরকার হলে আমরা সবাই যাব। তবে কি বাণীদি, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে বারবার আমাদের সীমান্তের মাটিকে বিদেশ হতে হবে ? কখনো উত্তরে, কখনো পুবে, কখনো পশ্চিমে ? শান্তিতে আমরা কবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারব বাণীদি ? আমি কেউ নই।

একটা তৃতীয় শ্রেণীর হাসপাতালে, একটা তৃতীয় শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থায়, আণ্ডার ট্রেইড্, একজন ডাক্তার। তবু এ প্রশ্ন আমার মনকে আজ পীড়িত করেছে। তাই এ প্রশ্ন আমি তোমার কাছে রাখলাম।'

'তুমি এ যুদ্ধের কথা বলছিলে না ভাই!'

'না। আমি অনেক, অনেকদিন ধরে, যে সব আণুক্ষয়কারী ভীষণ যুদ্ধের কথা বলছিলাম। ভীষণ যুদ্ধ বাণীদি, মানুষকে তা সবচেয়ে ভয়ানক বোমার চেয়েও মেরে ফেলে, শেষ করে, এ যুদ্ধ সূর্যকে বাধা দেয়, বাতাসকে আড়াল ক'রে রাখে।'

'রজত, আমি কি না বুঝিয়ে বললে এত কথা বুঝতে পারব?'

'বুঝিয়ে বলছি বাণীদি। আজকের দিনটার কথা ভেবে দেখ। হিউমিডিটি আর ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম টেম্পারেচার নর্মাল। সূর্য ডুবছে পাঁচটা চল্লিশে, উঠছে পাঁচটা উনচল্লিশে। সেপ্টেম্বরের একটি সাধারণ দিন। অতি সাধারণ।'

'বুঝলাম।'

'একটা যুদ্ধের নজীর তুমি একটু আগেই দেখলে। যখন সমস্ত দেশে এমার্জেন্সী ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে, তখন পল্টুবাবু, একজন শিক্ষিত লোক, ছাত্রদের সঙ্গে চেয়ার ছুঁড়ে মারামারি করছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে ওঁর এ যুদ্ধ আজকের নয়। যেদিন থেকে ওঁকে লাইব্রেরীর হলের মনোপলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে। ঐ হলটাই ওঁর কাছে একটা ফ্রন্ট, আর ওঁর ফ্রন্টে উনি মনোপলি রাখবেনই রাখবেন।'

'কিন্তু রজত.....'

'কি বলবে বল?'

'ওঁর, অর্থাৎ আমাদের সমসাময়িক অবস্থাটা ভেবে দেখ। চারদিকে দুর্নীতি, বোমাবাজি, অন্যায়.....'

'বাণীদি, তোমার চারদিকে যখন সবাই ভাল, তখন ভাল হওয়াটা স্বাভাবিক। যখন চারদিকে এত প্রতিকূল অবস্থা তখনই ওঁর পক্ষে, ওঁর সামান্য জায়গাটুকুতে একটা তন্ত্রতার আদর্শ স্থাপন করা উচিত ছিল। তাই নয় কি?'

'বেশ, বুঝলাম।'

'বুঝলে হবে না, স্বীকার কর কি না।'

'স্বীকার করছি।'

'ছেলেদেরও দোষ আছে। এ যুগের অসহিষ্ণুতা, অধৈর্য, ওদের রক্তে। ওরা মনে করে সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করে চলতে কৃতিত্ব আছে। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, ওরা ত' সামনে তেমন কিছু দেখেনি বাণীদি।'

'না দেখুক রজত, পল্টুবাবুর চেলা আমরা বলব, চারদিকে যখন নীতি নেই, তখন নীতি রেখে চলাতেই তুমি কি বাতুলে তৈরী তার পরখ হয়ে যাবে, ছেলেদের বেলা তা বলব না কেন? এক একজনের বেলা এক একরকম মাপকাঠি বের করে বিচার করব এখানেই ত' সব নীতিটিতি জলাঞ্জলি চলে গেল রজত!'

'হ্যাঁ, ছেলেরাও দোষী। আর ওদের এইসব ব্যক্তিদের বিরোধ, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার

সংগ্রাম, এটা বাড়তে বাড়তে চলেছে ত' চলেইছে, জানি না, মনে হয় আজকের দিনটা এর একটা মীমাংসা করবে। তোমার বাবা আমাদের ইস্কুলে ইতিহাস পড়াতেন বাণীদি, জান।'

'জানি। ওঁর প্রিয় বিষয় ছিল……'

'ওআর অফ. রোজেস্। গোলাপের যুদ্ধ। গোলাপের যুদ্ধ এখানেও চলেছে। তারপর কি আসবে তা ঠিক হয়ে যাবে এবার। যুদ্ধ, না শান্তি।'

'আরো যুদ্ধের কথা বল।'

'তারপর দেখ, এই হাসপাতাল। কমল ডাক্তার, পূর্ববাবু, এ নিয়ে একটা দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ চলেছে। কমল ডাক্তার বদ্ধমোজাজী, রুঢ়ভাষী, স্বার্থতার প্রতিভূ। কিন্তু তুমি ত' জান, আমি ওঁর কাছে কি ভীষণ ঋণী। ঋণী বললে কিছু বলা হয় না, আজকের আমি ওঁর হাতে তৈরী। আমার কি মনে হয় জান?'

'কি?'

'আমি ওঁর ইচ্ছাপূরণ। উনি যা হতে পারেননি, আমাকে তাই হওয়াতে চেয়েছেন। না হ'লে, ওঁর মত ঋণী লোকের এখানকার হাসপাতালে পূর্ববাবুর মিষ্টি কথা আর বিষাক্ত ব্যবহারের অসহায় শিকার হয়ে পড়ে মরবার কি মানে হয় বল?'

'সে কথা ত' আমরাও বলে থাকি।'

'পূর্ববাবুর কলিয়ারীতে কুলীদের এখানকার গ্লাস ও সিলিকোসিস ফ্যাক্টরীর মজুরদের অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্সের ডাক্তার উনি। ওঁকে দিয়ে পূর্ববাবু অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন বাণীদি, এখনও নেন, যে সব কাজকে ডাক্তারবাবু নিজেই বলেন নীতিবোধের ওপর বলাৎকার। তবু উনি তা করেন।'

'কেন করেন তা জান?'

'তুমি জান বাণীদি?'

'হয়তো কিছু জানি।'

'আমি যা জানি তা কি তুমি জান?'

'কি জান বল।'

'ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন লোআ ইনিকাল স্কুলের রিসার্চ শেষ করে।'

'তখন ওঁর বয়স কম ছিল রজত। আশ্চর্য সুন্দর কথা বলবার ভঙ্গী, হাঁটাচলার কায়দা কি। চেহারা দেখলে সব মেয়েরই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে। হেঁটে গেলে মনে হত রাজা হেঁটে যাচ্ছে।'

'কার কথা হচ্ছে আমতে পারি কি?'

কমল ডাক্তার ধপধপিয়ে উঠে এলেন। ওঁর আধময়লা জামাকাপড়, মোটা ঘাড়, চোখের চারদিকে পুরু কালি, হাতের নখে ময়লা।

'আপনার কথা।'

'আমার কথা মানে? কি কথা? পেনসিলটা কোথায়? রজতটা একটা অপদার্থ। তাদের ফোর্স লিখব, ফিয়ালি'—কমল ডাক্তার দেরাজ টেনে পেনসিল বের করলেন।

বাণীদি আর রজত দু'জনেই কমল ডাক্তারের মধ্যে সেদিনের কমল রায়কে খুঁজে ফিরতে ব্যস্ত! ডাক্তার একটু আশ্চর্য হয়ে ওদের দিকে তাকালেন।

'বঙ্কিম কোথায় ?'

'ওকে চা করতে বললাম।'

'করছে ?'

'নিশ্চয়! ওতো বলে কি হবে, সবরকম কাজে ওর নিপুণতা খুব। চমৎকার চা করে।'

কমল ডাক্তার ঘণঘণ শব্দ করে নেমে গেলেন।

'তারপর···' রজত বাণীদির চোখে বেদনা দেখল, প্রশ্ন।

'বল রজত।'

'তারপর এখানে এসে উনি অন্ধকারে একটা কেসে জড়িয়ে যান। একটি মেয়ের অপারেশনের ব্যাপার···যাহোক পূর্ণবাবু সেই ওঁর ওপর একটা হোল্ড পেয়ে গেলেন। ওঁকে আটকে রাখবার, পূর্ণবাবুর দিক থেকে একটা বিশেষ স্বার্থ ছিল। উনি ভুগছিলেন মোংরা অসুখে, ডাক্তারবাবু লুকিয়ে ওঁকে চিকিৎসা করতেন। ডাক্তারবাবু চলে গেলে ওঁকে চিকিৎসা করবে কে, তাই সেফ ব্ল্যাকমেইল করেই ওঁকে রেখে দিলেন।'

'এটাও আমার অজানা নয়।' বাণীদির মুখ বেশ ফাঁকা দেখাল। কার জন্যে কে জানে। পূর্ণবাবুর দুশ্চরিত্রতার গোপন ইতিহাস, না ডাক্তারবাবুর দুর্বলতার কাপুরুষতার কথা, কোনটা ওঁকে আঘাত করল রজত তা বুঝল না।

'সব সত্ত্বে উনি থেকে গেলেন। এত সত্ত্বেও পূর্ণবাবু ওঁকে রাখতে পারতেন না হয়ত, ঐ লেবরেটরীটি হল ওঁর রিকিউজ! তারপর একদিন আমি এলাম, কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।'

'এরমধ্যে বুদ্ধটা কোথায় রজত ?'

'দেখতে পেলেনা বুঝি ? পূর্ণবাবু ডাক্তারবাবুকে সোজাসুজি এক্সপ্লয়েট করেছেন। দেখ, ডাক্তারবাবু ওঁর বিরুদ্ধে মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ, ভীষণ ক্রুদ্ধ, তা আমি জানি। পূর্ণবাবুও জানেন, কিন্তু এতদিন ওঁর খুব একটা কিছু এসে যায়নি। লেবরেটরীকেও উনি খুব সিরিয়াসলি নেননি বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু উনি ঠিকই আঁচ করেছিলেন এখানকার লেবরেটরী থেকে যদি আমরা অ্যান্টিটক্সিন একটা কিছু বের করতে পারি, তবে সেটাকে পেটেন্ট করতে পারলে উনি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারেন।'

'আশ্চর্য!' বাণীদি বিব্রত হয়ে বললেন 'শেষ অবধি উনি এত নীচে নেমেছিলেন তা আমি জানতাম না রজত।'

'পেটেন্ট করবার কথা বললে ডাক্তারবাবু ক্ষেপে যাবেন তা উনি জানেন। ডাক্তারবাবুও ওঁকে চেনেন ত, সেপারেটা আগেই জার্মানে ছাপতে দিয়েছেন। কলকাতার ওষুধের স্পেসিমেন ট্রপিকাল স্কুলে পাঠিয়েছেন। ওরা পরীক্ষা করে খুব খুশী হয়েছে।'

'সত্যি রজত ?'

'সত্যি। এখন আমি আর ওঁর, অর্থাৎ পূর্ণবাবুর হাতের মধ্যে নেই। কেননা, আমি ডাক্তার-বাবুকে কথা দিয়েছি এখান থেকে চলে যাব, আরো রিসার্চ করব এবং আই মীন ভোনেট ও ছাগ ট্রাই ও নেশান। পূর্ণবাবু তাই চেষ্টা করেছেন আড়ালে আড়ালে, কি করে আমাদের হাতে আনতে পারেন।'

'তারপর ?'

'এই অধ্যায়ে ডকতের প্রবেশ। আমাদের ওষুধটার অস্তিত্বে হল, এ অসুখটা শুধু মানুষের শরীর ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। রিসিপিশ বা বাঁদরের ওপর রিসার্চ করা সম্ভব নয়, আর মানুষকে ধরে ধরে ত' আমরা ড্রাগ রিসার্চ করতে পারিনা। ডকত যখন এল, ব্রাণ্ডটাইসন আর নার্ভ প্যারালিসিস নিয়ে, কি ওআজ এ গডসেক।'

'এতক্ষণে আঁচ করতে পারছি।'

'ডকতের রিপোর্টে যদি আমাদের দোষ সাব্যস্ত হয়, ওষুধটা সাকসেস হওয়া সত্ত্বেও, বুঝতে পারলে? ড্রাগ ইজ এ সাকসেস, তবু ওকে তখন ইজেকশান দেওয়া ঠিক হয়নি, তখন আমরা পুলিশ কেসে পড়ব। ডকতকে যে আমরা মারছি, ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করে, তা নিয়ে পূর্ণবাবু অনেকদিন ধরে সুধীরবাবুকে, বাঁকাকে তাতিয়ে আসছেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধটা চলেছে, যাকে আদর্শের যুদ্ধ বলবে কি না জানি না, সে যুদ্ধটাও ত' শেষ হয়ে এল।'

বাইরের দিকে চেয়ে রজত বলল, 'উনি চেয়েছেন আমাদের প্রয়টাকে কিনতে। নিজের পক্ষে লাভজনক হয়, এইভাবে ব্যবহার করতে। আমরা তা চাইনি। আজ ডকতের রিপোর্ট যদি অন্য রকম হয় তা হ'লে উনি আমাদের হুড়হুড়াড়ি করে সার্ভিস থেকে বের করে দিতে পারেন এ অবস্থা করে রেখেছেন।'

'ছি—ছি—'

'রেখেছেন, উনিই ত্রাতা হিসেবে এসে দাঁড়াবেন বলে। উনি আমাদের রিসার্চটা পেটেন্ট করে নেবেন। তলিয়ারীর মত, ব্রাণ্ডওয়ার্কসের মত কারেলার জিনিষে হয়ত' আর থাকবেন না। আমাদের সামনে রেখে, আরো আরো কেমিষ্ট, ড্রাগকেমিষ্ট এসে ওষুধের ব্যবসা শুরু করবেন। এ-ও বলতে পার, সোসাসের যুদ্ধের আর একদিক।'

'রজত, পূর্ণবাবু কিন্তু খুব খারাপ লোক নন।'

'জানি। মানুষ নিছক ভাল। নিছক খারাপ কি হয় কখনো? অনেক গুণ আছে ওঁর, সহৃদয়তার শেষ নেই, আবার এদিকে এগুলোও আছে।'

'তোমার আজকের দিনটা বড় খারাপ যাচ্ছে রজত।'

'না না। আলোর কথা থেকে কথা উঠল তাই বলছি, আজ আমি আলোর কথাও তেমন করে ভাবতে পারছি না। এতগুলো ব্যাপার পাশাপাশি ঘনিয়ে উঠল।'

'তার ওপর এমার্জেন্সী।'

'তার ওপর এমার্জেন্সী! এখন যদি রিপোর্ট আমাদের ফেভারেও আসে তা হলে কি যেতে পারব মনে কর? এই ত' আয়না। এখন অবধি শহরের শিতাঠাকুর, পূর্ণবাবু ঘুমোচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে। অথচ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল আয়না, রায়ট-এর সম্ভাবনা থাকা উচিত। দেশের যাঁরা যাঁরা, তাঁরা ত' মফঃস্বলে কারার ব্রিগেড, ব্রাণ্ডব্যাঙ, কিছুরই প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।'

'অথচ...'

'প্রয়োজন এসব আয়গায় কিছুমাত্র কম নয়। ওঁদের অযোগ্যতার জন্যে মফঃস্বলগুলো এমনি ন্যাড়াবোঁচা, যত চাপ কলকাতার ওপর। সেই জন্যেই কলকাতা শ্বাসরোধ হয়ে মরছে।'

'এখন কি করবে?'

'প্রচুর, প্রচুর কাজ। ডে অ্যাণ্ড নাইট এমার্জেন্সী রান করাতে হবে, কার্স্ট এইড সেন্টার যতগুলো পারি খুলতে হবে, সেজন্যে এখানেই কার্স্ট এইড সেকচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্লাডব্যাঙ্ক খুলে ফেলতে হবে। এখন কর্মী চাই, সামনে অনেক কাজ। অন্ততঃ একজন ডাক্তার আর কয়েকটি নার্স আমাদের চাই-ই চাই, সদরে জানিয়েছি। কলকাতাতেও জানিয়ে রেখে আছি। আলোর জন্যে দুঃখ করি এমন সময় আমার একটুও নেই। যদিও ওর জন্যে আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, অস্বীকার করব না।'

'রজত!'

'বল।'

'আমি কিন্তু সেজন্যেই এসেছিলাম।'

'কি জন্যে?'

'আমার ত' জান বাচ্চাদের স্কুল। কার্ট এইড আমার দুটি টীচারের পাশকরা আছে। ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে দেখি, কি করে আরো মেয়েদের শিখিয়ে নেওয়া যায়।'

'সত্যি বলতে কি দরকার জান?'

'একটা মিটিং।'

'মিটিংয়ের জায়গা?'

'পল্টুবাবুর হল।'

'অসম্ভব। ডেডলক্।'

'জানি। আর এ-ও জানি সুপ্রভাতরা এদিকে, পল্টুবাবু ওদিকে হল পাকাতে গেলেন।'

'ঠিকই বলেছ। কি চাই?'

প্রশ্নটা বাঁকাকে। বাঁকা নিঃশব্দে উঠে এসেছে।

'চা।'

'রেখে যাও।'

বাঁকা মূর্তিমান ঔদ্ধত্যের মত দাঁড়িয়ে রইল। বলল 'এই ঘরেই সেই ওষুধ বানিয়েছেন মা কি? সেই মানুষ মারা ইঞ্জেকশান?'

'বঙ্কিম!'

বাণীদি হঠাৎ ধমক দিলেন। বললেন 'নিচে যাও। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।'

বাঁকা নিচে চলে গেল।

'ও এরকম ছিল না, বুঝলে রজত?' বাণীদি অনেক চেষ্টা করলেন বাঁকার সম্পর্কে কোন ভাল কথা মনে পড়ে কি না। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন 'সরস্বতী পূজোয় ভারী সুন্দর ক'রে ফুল সাজাত।'

'এখন গুণ্ডামি করে, ছোরা চালায়, মাথা ভাঙে।'

রজত আর একটা খাম নিয়ে এল। বলল 'একটা জিনিস দেখাই। আলোকে লেখা চিঠি, রাজা লিখেছে। অন্যমনস্ক ভাবে খুলে ফেলেছিলাম বাণীদি। পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। ভারী সুন্দর চিঠি, পড়ে দেখ।'

রাজা লেখাপড়া করেনি ঠিকই, কিন্তু হাতের লেখাটি পরিচ্ছন্ন।

আলোদি, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই লিখছি।

'আলোকে ও দিদি বলত না কি রজত ?'

'কি করে জানব বল। এখন দেখছি আলোকে সকলেই ভালবেসেছিল। জেসার, অমাদার. খোপা. আয়া, কুক, দারোয়ান, অফিস ক্লার্ক।'

তুমি আমায় যা হয় একটা কিছু করতে বলেছিলে, তাই, হঠাৎ মনে লিখিয়েছিলাম। মনে দিয়ে অবশ্য দুঃখ হয়নি, বেশ ভালই লাগছে। কোথা থেকে লিখছি তা জানতে পারবে না, জানাতে মানা আছে।

'মাদেও লেখা নেই বুঝি ?'

'না, ওদের চিঠি ত' অন্য জায়গা থেকে ডেস্‌প্যাচ হয়।'

আমাদের মত ছেলেদের এই ভাল হয়েছে আলোদি। বাড়ীতে চিঠি আর কাকে লিখব, তুমি অন্ত (সুপ্রভাত) কে খবর দিয়ে দিও। মেসোমশায় হয়ত' এখনো মনস্তাপ পান, কিন্তু আমাকে দিয়ে লেখাপড়া হত না। এরা আমাদের খুব ভাল খেতে দেয়। আমি ভাল আছি। তুমি ওখানকার সবাদের খবর দিয়ে চিঠি লিখ। লতুর খবরও দিও। ও কি এখন ওখানে ? তোমাদের রাজদুলাল চৌধুরী।

'জান বাণীদি, একদিন হাত কেটে এমার্জেন্সী আউটডোরে এসেছিল, আলো সেলাই করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। সেই থেকেই আলাপ।'

'লতু কিন্তু এখন এখানেই।'

'এসেছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'লতুর বরকে দেখেছ ?'

'চমৎকার হয়েছে। লতুর শ্বশুর, লতুর বাবা পূর্ণবাবুর চেয়ে অনেক বেশী বড়লোক।'

'এই হল ভালবাসা। লতুর বিয়েতে খাটাখাটুনী করে দিয়ে, পিঁড়ে ঘুরিয়ে দিয়ে, হই হই করে হঠাৎ মুছে চলে গেল।'

'আমি নিচে যাই। তোমার বোধ হয় কাজ আছে।'

'আর একঘণ্টা। তারপর আমিও নামব। যদিও এখন হাসপাতালে যাই না, আজ একবার যাব। আসলে, আমাদের অফিসবাবুর সঙ্গে স্টক্‌টেকিং-এ বসতে হবে।'

'অফিসবাবু তোমাদের ক্লার্ক-ও ঘটেন আবার ওঁর নামও ওই, তা জানত ?'

'তা আর জানিনা ? আমি একসময়ে ওঁদের বাড়ী কাগজও দিলি করেছি।'

বাণীদি দেখলেন রজতের চোখের নিচে কালি, অতি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা।

'তুমি বিশ্রাম কর রজত।' বাণীদি নিচে নেমে গেলেন। যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে বললেন 'অনেক কথা জান আবার জাননা এমন কোন কোন কথাও আছে রজত।'

'যেমন ?'

'কমল ডাক্তার যে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি পূর্ণবাবুরই বোন। ঐ ঘটনাটা নিয়েই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, নইলে আমার আর পূর্ণবাবুর অন্য সম্পর্ক হতে পারত রজত।'

বাণীদি নিচে নেমে গেলেন।

রজত ইজিচেয়ারে হেলান দিল। সত্যিই কি আজই সব শেষ হয়ে যাবে? কমল ডাক্তারের ' জন্যে বই হল তার, ভয়ানক কষ্ট।

॥ ৩ ॥

বাণীদি কমল ডাক্তারের যৌবনের চেহারা মনে করতে পারেন, রজত পারে না।

সে যেদিন থেকে তাঁকে দেখেছে তখন তাঁর রূপান্তর সম্পূর্ণ। কোটের হাতায় মুখ মোছেন, পূর্ণবাবুর সঙ্গে তাস খেলতে যান। রোগী এসে অনেক সময়ই ডাক্তারকে না পেয়ে ফিরে যায়। হাসপাতাল বা ডাক্তার কারোই সুনাম নেই, ডাক্তার সে-কথা জানলেও ভ্রূক্ষেপ করেন না।

রজতের তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। কলেজে ঢোকবার বয়স। অথচ স্কুলের পড়াশুনা শেষ হয়নি। রিলে-রেসের পতাকার মত, মা-বাপকে হারাবার পর থেকে আত্মীয় থেকে আত্মীয়ের বাড়ীতে ঘুরতে ঘুরতে একদিন রজত আবিষ্কার করল সে আছে এবং পথ আছে, আর কিছু নেই। খেলার শেষে সবাই কাগজের ফ্ল্যাগটা ফেলে দেয়। তার আত্মীয়রা তাকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার খেলা খেলতে খেলতে যেই দেখল সে বড় হয়ে গিয়েছে অমনি খেলা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল।

অথচ, বাজি ধরবার পক্ষে রজত খুব মন্দ ঘোড়া ছিল না। স্কুলে পড়বার যেটুকু সুযোগ মাঝে মাঝে পেয়েছিল তাতে সে ভালই করেছিল। অবশেষে এখানে এসে বাণীদির বাবার হাতে পায়ে ধরে স্কুলে ভর্তি হল। বাণীদির বাবাই এখানে তাকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। বললেন 'এখানে থাকলে কম্পাউণ্ডার ট্রেনারের কাজটা শিখতে পারবে। স্কুলের মাইনে বই খাতাটা আমি দেব। এখানে খাওয়া থাকাটা চালিয়ে নাও।'

স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে শিশি বোতল ধুত রজত, আর রাত জেগে জেগে ডাক্তারবাবুর যে বইগুলোর গুলো পড়ছিল সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখত। সেইসঙ্গে পড়ার বই-ও পড়ত। বয়স আর সময়ের যে ক্ষতিটা হয়েছিল তা পুরিয়ে নিতে চেষ্টা করত।

'অত রাত অবধি পড় কেন?' ডাক্তারবাবু একদিন খ্যাক করে জিগ্যেস করলেন।

'স্কলারশিপ পেতে চেষ্টা করছি।' রজত সমান তেড়িয়া হয়ে জবাব দিল।

'পেলে কি হবে? কার সঙ্গে বাতি দেবে?'

'তাহ'লে ডাক্তারী পড়তে পারব।'

'ঘটে!' কমল ডাক্তার আর কোন কথা বলেননি।

আর কোন কথা বলেননি, জানতে চাননি রজত কিরকম লেখাপড়া করছে। শুধু স্কুল পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কুলে পড়বার সময়েও যেমন, ওখানে গিয়েও তেমন, কোনদিন জানতে অবধি চাননি রজত কি করছে, পড়ছে কিনা। যথাসময়ে হাউসসার্জনশিপ শেষ করে রজত যখন সার্ভিস নিতে চাইল, আর এখানেই আসতে চাইল, তখন শুধু বলেছিলেন 'যেদিন চলে যেতে বলব সেদিনই চলে যেও।'

রজতকে এতদিনে সবাই কমল ডাক্তারের পুষ্যি ছেলে মনে করতে সুরু করেছে। এ ধরণের কথা শুনলেই অবশ্য কমল ডাক্তার চটে যেতেন। পল্টুবাবু একবার 'আপনি ওর বাবার মত,' একথা বলাতে ডাক্তারবাবু পল্টুবাবুকে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি অকৃতদার সেহেতু বাবার মত বললে কি বোঝায় তা তিনি জানেন না। তাছাড়া, বাবা হলেই যে কর্তব্যপরায়ণ হয়, এ ধারণা তাঁর মোটেই নেই। এ শহরেই তাঁর জানা কয়েকজন বাবা আছেন, যাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেন না।

'যেমন আপনি। আপনার ছেলে সাত্যকিকে জেলে পুরে রাখা উচিত, তা আপনি রাখেন না,' বলে কমল ডাক্তার গটগট করে চলে গিয়েছিলেন।

রজতকে বলেছিলেন 'কেন তুমি আসতে চেয়েছ এখানে তা আমি জানিনা। এখানে থাকতে হবে আমার সাবঅর্ডিনেটের মত। সাধার মত খাটতে হবে।'

একদিন তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ছাতে। বলেছিলেন 'দেখ, ঐ দিকে দেখ।'

'দেখেছি। ধাঙড় বস্তি।'

'কি-রকম ঐ বস্তিতে কলেরা লাগে।'

'জানি।'

'তোমার বোম্বাবাজ বন্ধুবান্ধব আছে?'

'না।'

'থাকলে ভাল হত।'

'কি হত?'

'তাহ'লে বোমা মেরে ঐ স্যুয়ার পাইপটা উড়িয়ে দিতে বলতাম। ওখানে, ধাঙড় বস্তি জল নেয় যেখান থেকে, সে কলের জলপাইপ, ঐ স্যুয়ার-এর পাইপ সব কাছাকাছিতে বাস করছে আজ বহুদিন হল। দুটো পাইপই ভাঙবো। জল মিলেমিশে যায় আর কলেরা লাগে। ওখানকার পাইপ উড়িয়ে দিলেই একটা অন্ ত স্পট এংকোয়ারী করিয়ে নতুন পাইপ বসিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ মহাজনদের বলতে পারি।'

'এতদিন ঐভাবেই পাইপগুলো আছে?'

'হ্যাঁ। কেন আছে তা জান? কুলীদের হনুমানজী মন্দিরের ভিতের পাথর নড়ে যাবে বলে নতুন পাইপ বসানো সম্ভব হয়নি।'

রজত সেদিনই অনেকদিন বাদে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। রাজার সঙ্গে তার কি কি কথা হয়েছিল কেউ জানে না।

শুধু দু'দিন বাদে, দেওয়ালীর রাতে, ভয়ানক শব্দ হয়েছিল একটা। সকালবেলা দেখা গিয়েছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে গহ্বর, আর পাইপ ফেটে জল বেরিয়ে যাচ্ছে।

আর সকলের সঙ্গে কমল ডাক্তারও দেখতে এসেছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, তারপর রজতকে নিয়ে কি ভাবতে ভাবতে হাসপাতালে ফিরে এসেছিলেন।

সেদিনই তাকে নিয়ে গিয়ে ওপরের ঘরটা খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'জলগুলো কন্‌ট্যামিনেটেড। আমিও তাই। এখানে সকলেই তাই। সবাই সংক্রামক অসুখে ভুগছি, জানিনা তাই মরে যাই না। আমার ইচ্ছে, ট্রু অ্যাডমেড কন্‌ট্যামিনেশন্, তুমি এখানে কাজ কর।'

বাঁকা, অর্থাৎ বঙ্কিমই গোলমালের উদ্যোক্তা। সেই যে ও একসময়ে পৃথিবীটাকে নিজের বোঝবার সুবিধের জন্যে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল তাই থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি।

এখন রজতের সব মনে পড়ছে। এ শহর ছেড়ে যেতে হবে বলেই কি মনে পড়ছে সব? এ শহর ত তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি? অল্প বয়সে পথে বের করে দিয়েছে দরজা থেকে দরজায় ঘুরিয়েছে একমুঠো ভাতের জন্যে। তবু মনের নিচে কোথায় টনটন করে কেন?

আলো বলত তুমি নিজেই নিজেকে চেন না।

বাঁকা তাকে ভীষণ বাধা দিয়েছিল।

রজত আসবার আগে ডাক্তার রায় যতটা উদাসীন ছিলেন পরে আর ততটা থাকতে পারেননি।

অন্ততঃ কলিয়ারীর কুলীদের ছেলেমেয়েদের বি, সি, জি দেয়ার সময়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তেমনই উদ্যোগী হয়েছিলেন কলেরা বসন্তর টিকে দেবার সময়ে।

এক বাঁকার কথায় ওরা সবাই বেঁকে বসেছিল।

পূর্ণবাবু ওদের একটা গাড়ী দিয়েছিলেন। বাঁকা ত' বলেছিল 'ওরা জোর করলে গাড়ী আদিয়ে দিবি।'

হাসপাতালে একটি কলিয়ারী বা প্লান্ট ক্যান্টীনের লোক এলেই রজতের সে কি খুশিয়া।

এই বুঝি বাঁকা আসে, এই বুঝি হাঙ্গামা বাধায়। এক সময়ে সে ডাক্তার বাবুকে বলেছিল 'ওর জীবনে যা যা ঝঞ্ঝা, আঘাত, যন্ত্রণা পেয়েছে, সব যেন আমরাই ঘটিয়েছি।'

কমল ডাক্তার স্বভাবমত অবাক হয়ে বলেছিলেন 'আমরা? তুমি তা করলেও করতে পার বটে, কিন্তু আমি আমার কখন ওকে আঘাত দিতে গেলুম?'

আজ বাঁকা নিচে বসে আছে, রজতের পোষ্টমার্টম রিপোর্ট ও. কে, না হলে রজতদের মারবে। আজ এখানে এসেই বলল 'ভাল করেই বুঝলাম ঐ পূর্ণবাবু আমার বন্ধু, আমার ভাল চান। আপনারা আমার ওপর ভীষণ অন্যায় করেছেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন 'তুমি শুধাই নও, অকৃতজ্ঞও বট। অবশ্য এখানে জন্ম থেকে বড় হলে এর চেয়ে আর ভাল কি হবে।'

'তা যা বলেছেন।' বাঁকা আকাশের দিকে চোখ তুলে বলেছিল 'আমাদের এ শহরটার কি যে আছে, কাউকেই ভাল থাকতে দেয়না।'

'পূর্ণবাবু! পূর্ণবাবু তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, না ঐ রজত, অ্যাঁ?'

আপনি যে কি বলেন! বাইরে থেকে ভাল ভাল ডাক্তারগুলো এসে এখানে পা দিতে না দিতে পূর্ণবাবুর মায়ায় পড়ে গিয়ে যা তা সার্টিফিকেট ছাড়তে থাকে। আমি ত' একটা শুণ্ডা, বদমাস, শয়তান। আমি কেমন করে ওঁর আত্ম এড়াই বলুন? লেখাপড়া শেখাটা হল রক্ষাকবচ, আমি ত আবার তা-ও শিখিনি।'

অথচ ঐ বাঁকাই একদিন, তাদের অসুবিধে যেমন ঘটিয়েছিল, যতখানি উৎসাহে, ঠিক ততখানি উদ্যমের সঙ্গেই তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারা যাতে নিরুপদ্রবে কাজ করতে পারে সে অবস্থা তৈরী করে দিয়েছিল।

সেই বি. সি. জি. দেওয়া নিয়ে গোলমাল বেধেছিল, তাই নিয়েই শেষ হ'ল।

ডাক্তারবাবু। শহরের ডাক্তারবাবু বাচ্চু, তার ছেলে, বউ সবাই টি. বি.তে মারা গিয়েছিল। পাঁচ বছরের নাতি আর তিন বছরের নাতনীটাকে এনে বাচ্চুর বউ মরমর আঁচলে চোখ মুছে বলেছিল 'ডাক্তারবাবু, আমার এ দুটো বাঁচবে ত?'

'না বুড়ীমা।'

বাচ্চু পেছনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল আর অস্বস্তিতে উসখুস করে বলেছিল 'সবই হরিদাসীর লীলা। তিনি যা করবেন তাই হবে।'

'না বাচ্চু। ওদের টিকে দিলে বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না।'

রজত জানত বাচ্চুর নাতি-নাতনীকে টিকে দিতে পারলে একটা বড় বাধা পেরোন গেল বলে মনে করতে বাধা নেই। বাচ্চু ভয়ানক নেশা করে, রুক্ষ স্বভাব, কিন্তু ওর যথেষ্ট দাপট আছে। ওকে সবাই মানে।

কিন্তু বাচ্চু শেষ অবধি আসেনি। বাঁকা ওদের বস্তিতে গিয়ে বলেছিল 'ডাক্তার তোকে কথা দিতে পারে, যে টিকে দিলে তোর নাতি-নাতনী বাঁচবে?'

'পরমায়ুর কথা কি কেউ দিতে পারে বাঁকা? ডাক্তার বলেছে এ টিকে দিলে বাচ্চা দুটো খাঁস রোগে মরবে না।'

'ও সব কথা আমি বুঝি না। আমরা দেখেছি ওদের কাছে চিকিৎসা করাতে গেলেই আমরা মরে যাই। আমাদের ছেলেরা বাঁচে না। ওরা শুধু তোর নাতি-নাতনী নয়, আমাদের বুড়নের ছেলেমেয়ে। ওদের আমরা টিকে নিতে দেব না।'

সেইখানেই হয়ত' ব্যাপারটা শেষ থাকত। হয়ত' বছর বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক নরনারী টি. বি. তেই মরত। কলকাতার কাগজে কচিৎ কখনো তা নিয়ে একটা ছোট্ট খবর দেখা যেত। আগা বরাবর থেকে এরকোয়ারী আসত। তাতে যা যেমন চলছিল তাই-ই চলত, কিছুমাত্র পরিবর্তন হত না।

কিন্তু একদিন, সে রাতে রজত কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর ডাক্তারের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে সেখানেই রাত কাটাচ্ছে, একটা এমার্জেন্সী 'কল' এল।

খাদের নিচে লাগাম্ত খাস, সেখানে বাঁকার হাত আটকা পড়েছে। ওকে বাঁচাবার অন্য উপায় নেই।

রজত গিয়েছিল কলিয়ারীর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ডাক্তারটি বলেছিলেন 'এমন এমার্জেন্সীতে সার্জারী করা আমার অভ্যাস নেই।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ মশায়, ছোটখাট কেস আপনাদের ওখানে পাঠাই, বাকিগুলো যায় সদরে। আপনাদের ওটাও ত' আমাদেরই হাসপাতাল মশায়, দেড়শো-টা বেড নইলে রেখেছে কেন?'

খুব ছোট একটা জায়গায়, মাথা তুলে প্রায় দাঁড়ানো যায় না যেখানে, প্রায়ান্ধকার চারদিক, সেখানে বাঁকা রজতকে দেখেছিল, আর রজত বাঁকাকে।

'রক্ত বেজ্ ইন করছে', ফিসফিস করে কে বলেছিল।

রজত বলেছিল 'বাঁকা, বুঝতে পারছ! তোমার বাঁ-হাতটা কব্জী থেকে না কাটলে উপায় নেই।'

'বুঝতে পারছি।'

'আমি তোমার অ্যাসেস্‌মেণ্টিয়া দিতে পারছি না বাঁকা।'

বাঁকার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে একটা কথাও আর বলেনি।

তারপর প্রতিটি মিনিট কেটেছিল অসীম যন্ত্রণায়। বাঁকার যন্ত্রণা তারই শরীরে, হাতের কব্জার বিন্দু বিন্দু জল, বাঁকার মুখ ক্রমে সাদা হচ্ছিল, রজত কিন্তু ওকে একটা কথাও বলতে শোনেনি।

তারপর কেমন করে যে ওরা উঠে এল, আর উঠে আসতে আসতে নিচে ক্রুদ্ধ, চাপা একটা গর্জন শুনল চাউড় খসে পড়ার, তাও মনে আছে রজতের।

সেদিন বাঁকাকে তাদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল রজত, আর পরদিন পাঠিয়েছিল সদরে।

মাসখানেক পর চেহারা টকটকে লাল ক'রে, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে, বাঁ-হাতটা পকেটে পুরে বাঁকা ফিরে এল, স্বভাবে আরো খানিকটা রুক্ষ এবং তয়ার হয়ে।

কিন্তু কুলী ধাঙড় বস্তির সকলকে প্রায় ঠেঙিয়ে বি. সি. জি. দিতে নিয়ে এল। কলেরা বসন্তর টিকের সময়ে রজতদের সাহায্য করল। মুখে যদিও কোনদিন একটা ভাল কথা বলেনি, তবু ওইভাবেই ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল।

এখন রজতের মনে হ'ল বাঁকা বোধহয় ভাবে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবারও একটা বাঁধা সময় আছে। ওর ধারণা অনুযায়ী সে সময় পেরিয়ে গিয়েছে, তাই এখন আবার অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার জন্যে বাঁকা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বেশীদিন ভাল হয়ে থাকতে বোধ হয় ওর ভাল লাগে না। সেই যে সদর থেকে এসে যখন দেখা করে তখন ডাক্তারবাবু বলেছিলেন 'কি, ভাল? সদর ত' দেখছি তোমার খুব ঘর করেছে।'

'ভাল লাগেনি।'

'কেন?'

'বড় বেশী পরিষ্কার সব, বিছানাগুলো বড় বেশী কর্সা। আমার ভারী অস্বস্তি হত। ইচ্ছে করত বেশ ময়লা করে নিই সব।'

আজও তাই, সব ময়লা করে দিতে এসেছে বাঁকা। কোন কিছুই পরিষ্কার, সুন্দর, ভাল থাকলে বাঁকার ভাল লাগে না।

তারপর একদিন আলো এল।

আলোর সেহন সেহন এল সুষমা, কাজের ওপর ভালবাসা, সফল হবার চেষ্টা।

আলো যে বলত 'কবে সংগ্রাম করেছ, আর কি করে জয়ী হয়েছ, তা নিয়ে হিরোয়িক হওয়া ছাড় দেখি। তোমার একটা অ্যালটেড ডিউটি আছে, তুমি তাই করছ। হোআই ইমপ্যুট গ্লামা, রোমান্স অ্যাণ্ড হিরোয়েইজম টু ইট?'

রজত আঘাত পেত।

আলো বলত' যতদিন না আমরা কাজটাকে কাজ বলেই ভালবাসতে পারছি ততদিন আমাদের কিছু হবে না।'

এক একসময়ে রজত রেগে যেত।

'ইউ আর ও হার্ডেস্ট পসিবল ওম্যান, দয়ামায়া কিছু নেই তোমার। একটা রোবট বললেই হয়। তোমাকে ভালবেসে আমি ভুল করেছি।'

'কেন, আমি তোমায় গদগদ হয়ে অ্যাডমায়ার করছি না বলে ?'

'কে চায় তোমার অ্যাডমিরেশন ?'

'আমি ত' ভেবেছিলাম তুমি চাও। না বলত, তোমার আর ডাক্তারবাবুর এ ছেলেমানুষী ছাড়তে হবে। দু'জনের রাতদিনের চেহারা দেখলে মনে হয় দুটি ট্রাজিক হিরো। কেন ?'

'তুমি ত' জাননা আলো···'

'জানি, সব জানি। কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? তোমরা যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অন্যরকম। তাই ওসব ট্রাজেডীর অ্যাটিচুডের বর্মের পেছনে নিজেদের আড়াল করবার কোন প্রয়োজনই নেই।'

'কি করব, কি করলে তুমি খুশী হবে তা বলতে পার ?'

'আপাতত দাড়ি কামাও। তারপর, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওয়ার্ডে আসতে হবে, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি। ও. টি. তৈরী।'

রঞ্জত তখন বলেছিল 'তুমি নাটুকেপনাটুকু এত অপছন্দ কর আলো। কিন্তু এদিকে ব্যাপারটা নিজেই নাটুকে করে ফেললে। খুব ওল্ড একটা প্যাটার্ন ফলো করলে।'

'কি ?'

'ডকটর মীট্স নার্স। সেই বোকা বোকা গল্প।'

'তা যা বলেছ।'

'রূপা'র বই

গল্প-সংগ্রহ

বহ্নিবলিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০
অনেক বসন্ত দুটি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩·৫০
নীল চন্দ্রমল্লিকা—কাবেরী চাপেক ৪·০০
অনু: মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও
মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়
শহরতলির শয়তান—বারট্রাণ্ড রাসেল ৪·৫০
অনু: অজিতকৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.]
স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (দুই খণ্ড)
অনু : দীপক চৌধুরী প্রতি খণ্ড ৫·০০
চীনা মাটি— ৬·০০
অনু: মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকার জন্য লিখুন

রূপা ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলকাতা-১২

উৎসবের দিনে

উৎসবের দিনগুলি সার্থক হয়ে ওঠে যখন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়-জনদের হাতে তাদের পছন্দমত বস্ত্রসম্ভার পরিবেশিত হয়। স্বদেশী যুগে বিলাতী সৌখীন বস্ত্র ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মহান ব্রত বাঙালী গ্রহণ করেছিল আর সেই ব্রত সার্থক করে তুলতে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্ম হয়েছিল। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে আর তার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দেশের সেবায় ৫৭ বৎসর

বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

'এই জন্যেই বলি, কোনো কিছুই গহন করি না, দেখতে পারি না, এসব বলা উচিত নয়। বললে ভগবান তাকে ঠিক সেই অপছন্দের জিনিষটিই পাইয়ে দেন।'

'তাই ত' দেখছি। তোমায় যখন থেকে দেখেছি, ভীষণ রাগ হত, খারাপ লাগত।'

'বোধ হয় খুব ভাল লাগত। তুমি বুঝতে পারতে না।'

রিসার্চের জন্যে রজত আর ডাক্তারবাবুর সময় দরকার হত, তাই আলো ওদের সময় করে দিল, অবসর। হাসপাতালটা আগে সরকারী হওয়ায় এই সুবিধে ছিল, একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিল।

পরিবেশটা হয়ত' আলোই তৈরী করে নিয়েছিল। হাসপাতালের অনেকগুলো দায়িত্বই ওর ওপরে চলে গিয়েছিল কিনা। সকলের কাছেই ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

'এত ভাল কাজ কোথায় শিখলে আলো? নতুন ডাক্তারদের অনেক, অনেক ভাল।' ডাক্তারবাবু বলতেন।

'আমি ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলাম যে। এক বছরের বেশী পড়তে পারিনি।'

'কেন?'

'বাবার পয়সা ছিল না। আমার স্বাস্থ্যও পারমিট করল না।'

এখন অবশ্য ডাক্তারবাবু বলেন, 'বুঝতে পারি আলো কিসের জোরে চলাফেরা করত। শুধু মনের জোরে।'

রাজা বলেছিল 'সী হ্যাজ নাথিং, বাট উইল, ওনলি এ গ্রেট বিগ হার্ট।'

শুধু রজতই অনেকদিন অবধি বিশ্বাস করেনি আলো অসুস্থ। আলোর চেহারা ক্রমেই ক্ষয়ে, রোগা হয়ে, আরো ছেলেমানুষের মত হয়ে যাচ্ছিল। গুটো বেণী বড্ড বেশী ভারী হয়ে উঠেছিল, বেণীর ভারে ঘাড়টা পেছন দিকে ঝুঁকে থাকত। একদিন আলো বলেছিল 'চুলগুলো সব কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে, মেমসায়েবদের মত।'

একদিন কমল ডাক্তার বলেছিলেন 'আচ্ছা রজত, তুমি যদি আমাদের সিস্টারকে বিয়ে করতে ঠিক করে থাক, তাহ'লে দেরী করছ কেন? নার্সদের একটা বিশেষ সময় অবধি বিয়ে করতে মানা আছে অবশ্য। কিন্তু ও ত' সে সময়টা কবে কাটিয়ে এসেছে।'

রজত বলেছিল 'ওকে বলব।'

আলো নার্সদের কোয়ার্টারেই থাকত। আলো আর মিস রাঙ্গাম্মা। রাঙ্গাম্মার বয়স হয়ে গিয়েছিল, খুব একটা রঙতা আর ছিল না। কিন্তু ওরা ছাড়া এসব জায়গায় আসতেও চায় না কেউ। যেমন মাইনে, তেমনি খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে, আর গাছপালা দেখে যে চোখ জুড়োবে তারও উপায় নেই। এখানকার মাটিতে মোটেই গাছ হতে চায় না। যেমন চুণ, তেমনিই পাথর।

পূর্ণবাবু পারেন, ক্ষমতা আছে, আর গাছপালা, বিশেষ করে গোলাপ সত্যিই ভালবাসেন। গাছপালা ভালবাসেন বলেই মিউনিসিপ্যালিটিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গাছপালা অনেকবার লাগিয়েছেন। তারপর আবার গাছগুলো জল না পেয়ে ঠিক মরেও গিয়েছে নিয়মমত।

টেকবার মধ্যে টিকেছে শুধু আকাশমণি, মহানিম, ঘোড়ানিম আর মনসা। মনসা গাছ অবশ্য লাগাতে হয় না। এমনি এমনিই হয়। আর হয় ক্যাক্টাস। ধবধবে পদ্ম কুঁড়ির মত আশ্চর্য সুন্দর ফুল

সন্ধ্যেবেলা ফুটে ওঠে। কিন্তু মিস রায়ানা বলে স্যাস্টার্গা ভারী অপয়া ফুল। ও ফুল ঘরে রাখলে বিপদ আসবেই।

হাসপাতালের সামনে একটিমাত্র গাছ আছে, শিরীষ গাছ। গাছটা নাকি পূর্ণবাবুর বাবার লাগান। গাছটায় বেশ ঠাণ্ডা ছায়া আছে। আউটডোরে যারা আসে, তারা ঘরে গরম লাগলে ওখানে গিয়ে বসে।

ওখানে দাঁড়িয়েই একদিন সন্ধ্যার সময়ে আলোকে রজত বলেছিল 'আলো, এত দেরী করা বোধহয় আমাদের উচিত হচ্ছে না।'

রজত তখন নিজের রিসার্চ নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত ছিল। তাই আলোর চোখের নিচের কালি, প্রায়োৎপন্নার মত ক্ষীণ হয়ে যাওয়া শরীর তার চোখে পড়েনি। তারপর যখন ডাক্তারবাবু সন্দেহ করলেন ক্যান্সার, যখন সে কলকাতায় চলে গেল, তখন রজত কতবার ভেবেছে আলো যে তাকে কত ভালবাসে তা রজত এখন বোঝে, আর এই কথাটাই কোনদিন আলোকে জানাবে সেদিন না।

আলো বলেছিল 'তোমার রিসার্চ পেপার ছাপাবে, ওষুধের ফরমুলা ডোনেট করবে, এগুলো হয়ে যাক?'

তারপর মুখ নিচু করে বলেছিল 'আমি একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে চাই।'

পরে ডাক্তার রায়ের ডায়াগনোসিস্ জেনে ডাক্তারবাবু আর রজত দুজনেই ভেঙে পড়েছিলেন। আলো বলেছিল 'কলকাতায় গেলে সঠিক জানা যাবে তাই না?'

'হ্যাঁ আলো,' রজতের গলা আটকে যাচ্ছিল।

'জান্' আলো আস্তে আস্তে বলেছিল, 'নাটক নভেল নিয়ে হাসতাম, কিন্তু বরাবরই আমার মনে হত আমার জীবনের শেষ অধ্যায়টা আমি জানি, লেখক অনেক সময়ে যেমন উপন্যাস লিখতে সুরু করেই উপসংহারটা ভেবে নেয়, আমিও তেমনি করেই ভেবে নিয়েছি। আমার কেবল মনে হত এত সুখ বোধ হয় আমার পাওনা নয়। তাছাড়া, আমার আয়ু যে সবল নয় তা ত' আমি জানতাম। এতটা আশা করা আমার উচিতও হয়নি।'

'এত ভাবছ কেন? ডাক্তারবাবুর ভুলও হতে পারে।'

'হতে পারে নিশ্চয়ই। তবে কি জান, খারাপ খবর খুব একটা ভুল হয়না।'

'তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

'এখন তুমি যেতে পারনা। তোমার কাজ আছে।'

আজ, আলোর কথা ভাবতে ভাবতে রজতের হঠাৎ মনে হল, হয়ত' তার আর আলোর মধ্যেও কোথাও একটা যুদ্ধ ছিল, আদর্শের যুদ্ধ।

'যুদ্ধ কখনো ফুরিয়ে যায় না। সংগ্রাম শেষ হয়না,' আলো বলত, 'যারা মনে করে এবার শান্তি, এখন নিশ্চিন্ত, তারাই ভুল করে।'

রজতের আজ কেন মনে হচ্ছে, আর একটা যুদ্ধের শেষ ফলাফলও জানা যাবে?

চুল আঁচড়ে পোষাক বদলে সে নিচে নেমে এল। সে শেষ সিঁড়িতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই জোরে বেল বাজল।

॥ চার ॥

ডাক্তারবাবু বললেন 'দরজা খুলে দাও।'

রজত দরজা খুলে দিল, সরে দাঁড়াল। অনেক লোক, এত লোক কেন, সে-কথা স্বভাবতই মনে হল রজতের। কিন্তু যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই গণ্যমান্য লোক। পূর্ণবাবুর গাড়ীতেই এসেছেন।

'সদর থেকে জীপ আসছে খবর পেয়েই আমি চলে এলাম।'

পূর্ণবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বললেন 'কি খবর আগে জানি না। তা নিয়ে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা হয়, কোন সিচুয়েশন্ তা আমরা চাইনা।'

'কেন?' কমলডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন 'কেন চান না? গত পনেরোদিন ধরে আপনার আর কোন চিন্তা আছে বলেত আমার মনে হয়নি।' তাঁর গলা গম্ভীর, 'দেখি এদিকে দিন।' সদরের ডাক্তারের লোক তাঁকে একটা বড় খাম দিল।

পূর্ণবাবু এতটুকু বিচলিত হলেন না। রজতের মনে হল সময়মত যে হার স্বীকার করতে পারে সে লোক অতি শক্ত।

'এখন আমরা অনেক, অনেক বড় এমার্জেন্সীর মধ্যে বাস করছি ডক্টর।

'রিস্ক্যাদি? আপনাদের খবরটা দিল কে?'

'আপনি চটে যাচ্ছেন, চটে যাওয়া স্বাভাবিক.....'

এমার্জেন্সীর লালচোখের সামনে আমি অনেকদিন ধরেই বাস করছি, আপনারাও। কিন্তু ইউ নেভার সীম টু নো দ্যাট। সেজন্যে সত্যি সত্যি একটা লড়াই লাগাবার প্রয়োজন হল।'

তারপর ডাক্তারবাবু খামটা খুলতে খুলতে বললেন 'দাঁড়ান, এখনই সবগুলো তালকথা বলে ফেলবেন না। রিপোর্টটা দেখা যাক।'

কয়েকটি উৎসুক মুহূর্ত গেল।

ডাক্তারবাবু টেবিলে রিপোর্টটা ফেলে দিলেন, 'আওআর হ্যাণ্ডস্ আর ক্লীন। রজতের মৃত্যুর জন্যে আমরা দায়ী নই। ওর হার্ট খারাপ ছিল, তাই মারা গিয়েছে।'

'কংগ্র্যাচুলেশন্স।' পূর্ণবাবু মুখে হাসি রেখেই বললেন।

'রজতের ওয়ুধ সাক্সেসফুল। রমেন পার্সনাল চিঠিতে লিখছে। ওকে কলকাতা থেকে আনিয়েছে।'

'তাহ'লে রজতবাবু.....'

'উইল ডোনেট ইট টু ও মেমান। নইলে আই শ্যাল কিক হিম আউট।'

ডাক্তারবাবু এবার সকলের দিকে তাকালেন। বললেন 'মুখীরবাবুকে আপনি গ্র্যাণ্ট করে রেখেছিলেন, যাঁকাকে অবধি, আপনি জানেন, আপনাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে অপদস্থ করা যায়?'

'আমি আপনাদের মারব বলে আসিনি স্যার। অন্যরা কেউ মারলে তাদের মারব বলে এসেছিলাম', যাঁকা বলল।

'এখন, এ অবস্থায়..' পূর্ণবাবু একটু হাসলেন।

'হ্যাঁ। এখন ডাক্তার চাই, নার্স, ফার্স্ট এইড সেন্টার, আমার অনেক কাজ আছে।'

'একটা সিটিজেনদের মিটিং.....'

'ডাকুন না গিয়ে। আমাদের দিয়ে কি দরকার, আপনারা যান, আমরা আছি।'

'মিটিং একটা ডাকতেই হবে রজতদা।'

ছেলেরা উঠে এল দরজা দিয়ে। অনেক ছেলে। এরাই আজ পল্টুবাবুর সঙ্গে মারামারি করেছে।

'আমরা মিটিং ডাকতে চাই। রাজাদা মারা গিয়েছে স্কটে। টেলিগ্রাম এসেছে।'

'মারা গিয়েছে, রাজা?' রজত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।' সুপ্রভাতের চোখে জল। ভুরু কুঁচকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'ও ইয়েস। এই ইস্যুতেই আমরা মিটিং করতে পারি, পূর্ববাবু বললেন, পল্টুবাবুকে খবর দাও। আমরা আলো চাই। বেক আছে নিশ্চয়···ডাক্তার রায়, আপনারাও আসুন।'

সবাই বেরিয়ে গেলেন। যেমন ভীড় করে এসেছিলেন তেমনই হই-হই করে। বাঁকাও বেরিয়ে গেল। যাবার আগে একবার রজতের দিকে চাইল। তার ঠোঁটে মৃদুহাসি। বলল 'শহরের মধ্যে ঐ ছেলেটা ভাল ছিল সার, বুদ্ধটা তাহ'লে আমাদের মাথখানে এসে পড়ল।'

রজতের ইচ্ছে হল ডাক্তারবাবুর সব সময়ে অকরী অবস্থা থাকবার কথাটা বাঁকাকে বলে। বাঁকা অবশ্য দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু বললেন 'টেলিগ্রাম পিওনটা এখানেও আসছে। রজত, দেখ ত?'

সন্ধের শেষ আলোটা পশ্চিম থেকে চলে যাচ্ছে। তার আভায় রজত কথাগুলো একবার মাত্র পড়তে পারল, তারপরই সিঁড়িতে বসে পড়ল।

মাথায় টুপী পরে বেরিয়ে এসে ডাক্তার রায় বললেন 'কি হল?'

'পড়ে দেখুন।'

ডাক্তারবাবু আলো জ্বাললেন, টেলিগ্রামটা পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি মিটিং-এ যাচ্ছি! তুমি ষ্টেশন থেকে আলোকে নিয়ে মিটিং-এ একবার যেও। ও রাজাকে ভালবাসত।'

আকাশের দিকে চেয়ে বললেন 'আমার ডায়গনোসিস ভুল? আমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি?'

ডাক্তারবাবু হাতে ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কনে-বৌ

শৈলেশকুমার সান্যাল

জ্যোতিবাবু বিয়ে করেছেন শুনে সবাই যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। আমার মামা যেন মৃত্যুসংবাদের মতো এই খবরটি এনে বাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। আমরা সবাই যেন শোকের ছায়া দেখতে পেলুম।

মামা বললেন, হ্যাঁ, একটা তন্ধরলোক ছিল বটে! কী দিলদরিয়া মেজাজ, আর তেমনি উঁচু নজর! ঘুঘুডাঙার ওর বাগানবাড়িতে গিয়ে কেউ কখনো শাদা জল খায়নি!

আমরা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে শাদা জলের প্রকৃত তাৎপর্যটি অনুধাবন করার চেষ্টা পেলুম। কিন্তু মামা তাঁর শোকার্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন, ওই জ্যোতিই ত' প্রথম আমাদের দেখিয়েছিল ছোট্ট কাঠের কল্‌কে সোনার পাতে বাঁধানো,—আর তসর-পরদের টুকরো ছাড়া কখনো সাঁপি ধরেনি! তা ছাড়া কত বলব? অমন পচিশটে সোনা বাঁধানো বেলো হুঁকোর পাইপ! ঝলমল করছে রূপোর গড়গড়া অমন গণ্ডা পাঁচেক। আর যেদিন বাইজির গানের মজলিশ বসত জ্যোতিষের বড় বৈঠকখানায়, সেদিন ঘরে ঘরে সাজানো হ'ত সব—যার যত খুশি খাও! বেনারসি খুতি জর্দা, লক্ষ্ণৌই জিমাম আর তামাক, হাওড়া জেলার মিঠে পান,—এদের সঙ্গেই থাকত আফিঙ, চরস, গাঁজা, সিদ্ধি,—যার যেমন ইচ্ছে! আর মদের কথা যদি বলো, সাপুরজির দোকান খালি হয়ে যেতো একরাত্রে!

মামার এই বিবৃতির সবটুকুই যে আমাদের পক্ষে বোধগম্য হ'ত তা নয়, কিন্তু জ্যোতিবাবুর এই প্রস্তাবিত বিবাহ সংবাদ শুনে মামার বিক্ষুব্ধ বেদনার ভিতর দিয়ে জ্যোতিবাবুর বন্ধুসমাজেরও খবর পেলুম। এ সংবাদে সকলেই মর্মাহত।

জ্যোতিবাবু মামার সমবয়স্ক বন্ধু, অর্থাৎ পঞ্চাশের সামান্য কিছু বাকি। আমাদের পাড়ার যাত্রা থিয়েটার কীর্তন পাঁচালি কথকতা পুতুলনাচ বহুরূপী সঙের মিছিল বারোয়ারি খানের দল—এ সমস্তর পেছনে জ্যোতিবাবু। যা কিছু সৌখিন, অর্থাৎ আতর গোলাপ চুয়া চন্দন বেল জুঁই আনন্দ উৎসব—সবই জ্যোতিবাবুকে কেন্দ্র ক'রে হ'ত। তিনি কীর্তন গাড়িতে যেতেন যে রাস্তা দিয়ে, তা'র দুপাশে লোকের বাড়ির ঘরজা জানলা খুলে যেতো। তিনি ছিলেন বিশেষ রূপবান ও সুশ্রী। তাঁর হাসি পরিহাস বদান্যতা দানশীলতা ও পরোপকার—এগুলি সকলেই জানত।

এ হেন ব্যক্তি বিবাহ করতে চলেছেন এবং ঘর-গৃহস্থালীতে মনোনিবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন—সুতরাং সকলেই শোকতাপে মুহ্যমান। তিনি তাঁর নিজ ঐতিহ্যের বিরোধিতা করছেন বলেই আশেপাশে সকলেই বেদনায় বিক্ষুব্ধ। তাঁকে সবাই দেখতে চায় তাঁর প্রকৃত চেহারায়। তিনি স্বামী হয়ে সেবা দেবেন, সন্তানের পিতা হবেন, ঘরকন্না নিয়ে থাকবেন, সংসার প্রতিপালন করবেন,—এটির জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। বরং তিনি পাঁচজনের জন্য হুজুর হবেন, দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হবেন, আমোদ

প্রমোদের জন্ত বিষয় সম্পত্তি বেচবেন, কীটন্ গাড়ির উপরে চামড়ার পর্দা টাকা দিয়ে কা'কে-কা'কে নিয়ে যাবেন ফুলবাগান থেকে ঘুরতাজায়,—এই সবের জন্তই সকলের মনে প্রত্যাশা আছে।

এ খবরে আমি নিজেও খানিকটা প্রভাবিত। আমি তাঁকে জ্যোতিমামাই ব'লে এসেছি এতকাল, কারণ তিনি মামার বন্ধু। দুপুরবেলায় একফালে আমি জ্যোতিমামার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতুম, তার বকশিস পেতুম তাঁর বাগানের কাঁচা পেয়ারা। যেদিন তাঁর মাথা থেকে প্রথম কয়েকটা পাকা চুল খুঁজে বার করে দিয়েছিলুম, সেদিন তিনি আমাকে ঘুড়ি-লাটাই ও চার কাঠির সুতো উপহার দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বই এনে দিতুম লাইব্রেরি থেকে এবং তিনি যখন তাঁর মহনা-মহুয়া আর কাকাতুয়াকে নিজের হাতে খাবার দিতে বসতেন, আমি তাঁকে সাহায্য করতুম। আমার কপালে জুটত ভাল ভাল ইংরেজি ছবির বই।

কিন্তু এখন আর এসব পুরনো কথা তুলে কোনও লাভ নেই। বলা বাহুল্য, পাড়া-প্রতিবেশির চাপা প্রতিবাদ সত্ত্বেও একদিন খুব ধুমধামের সঙ্গে জ্যোতিবাবু কনে-বৌ ঘরে নিয়ে এলেন। আমি 'নিৎবর' হয়েছিলুম, এবং চতুর্দোলার সঙ্গীরা আমাকেও চামর দিয়ে ব্যজন করেছিল। আমিও নিজের পাঞ্জাবি চড়িয়ে কপালে বরচন্দন-সজ্জা করেছিলুম।

এর ফলে সুবিধে হয়েছিল আমার প্রচুর। কনে-বৌ যিনি ঘরে এলেন, তিনি প্রায় আমার সমবয়সী। পরম্পরায় শুনলুম, জ্যোতিমামার চেয়ে তাঁর এই নব পরিণীতা বধূ নাকি তেত্রিশ বছরের ছোট। কচি মেয়ে শুনে সবাই উৎসাহিত এবং বৌ দেখে সকলেই খুশী। বিয়ের দিন জ্যোতিমামা তাঁর চুলে কলপ দিয়েছিলেন সামান্তই। অনেকেই বলল, চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু দুজনকে। মেয়ের জীবনে আর কী চাই! হীরে-জহরোয় মণিমুক্তোয় আপাদমস্তক মোড়া, অগাধ বিষয়-সম্পত্তি, মাথার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ি নেই,—আছে শুধু ওই বুড়িপিসি। কনে-বৌ প্রথম দিন থেকেই বাড়ির গিন্নি! স্বামী একেবারে দেবতুল্য।

কনে-বৌয়ের নাম শোভা। বছর ষোল হয়ত বয়স হবে। কিন্তু খুব সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। বিয়ে-বৌভাতের হজুগের মধ্যেই কনে-বৌ সম্ভবত এটি লক্ষ্য ক'রে থাকবে, বাড়ির ঝি-চাকরের দল, বুড়িপিসি এবং আত্মীয় কুটুম সত্ত্বেও আমি ছিলুম জ্যোতিমামার সকল কাজেই অগ্রণী। সকল সময় আমাকেই তিনি ডাকেন এবং আমাকেই সবপ্রকার নির্দেশ দেন। তাঁর দেরাজ-বাক্সর চাবি রয় আমার হাতে, আর নয়ত কনে-বৌর হাতে। এ বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে কনে-বৌকে পরিচিত করার ব্যাপারে সব দায়িত্ব যেন আমার ওপরেই পড়েছিল। এমন কি বুড়িপিসি কবিরাজের ওষুধ কখন খাবেন, আমাকেই ব'লে দিতে হ'ত।

বৌভাতের দিন কনে-বৌকে সবাই দেখেছে, কিন্তু তারপর থেকেই নিয়মমতো অন্দর মহলের পর্দা প'ড়ে গেল। জ্যোতিবাবু নিজে মেয়ে পছন্দ করেছিলেন। কনে-বৌয়ের বাবা হলেন প্রসিদ্ধ গায়ক তিনকড়ি পাঠক। তিনি তাঁর একটিই মাত্র কন্যাকে বহু যত্নে গান শিখিয়েছিলেন। এ খবরটি আমার মামাই কেবল জানতেন যে, কনে-বৌর কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীত শুনেই জ্যোতিমামা মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিছু পাছে নিন্দা বা কানাকানি রটে, সেই কারণে কনে-বৌয়ের এই গুণপনাটিকে চেপে রাখা হয়েছিল।

কবে কখন্ এবং কেমন ক'রে জানিনে, আমি যেন অনেকটা বেসরকারীভাবে জ্যোতিমামার বাড়ির একজন কর্তা হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু আমার বয়স অতিশয় কম এবং বোধহয় কনে-বৌয়ের

চেয়েও, সেই কারণে এ বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর সবাই আমাকে ছোটবাবু না বলে ছুটিবাবু ব'লে ডাকত। আমি যে বাইরের লোক, এ পাড়ার একজন সাধারণ ছেলে, এবং আমার নিজের পড়াশুনো, ইস্কুল যাওয়া, বাড়ির কাই-ফরমাস খাটা, মামার তামাক সেজে দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ আমাকে সারতে হয়—এগুলি এরা ভুলে যেতো। আমি সকালের একটা সময়ে গিয়ে না দাঁড়ালে জ্যোতিমামা অসহায় বোধ করতেন। তিনি ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতেন বেট্ খেলতে, সেজন্য তাঁর কাছে দুপুরবেলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাকে ঘোড়ার গল্প এবং তাদের ইতিবৃত্ত শুনতে হ'ত। সবাই জানে, সন্ধ্যার দিক থেকে জ্যোতিমামা একটু টলটলে অথবা একটু বেহেঁস হতেন। আমি সেই সময় তাঁর বৈঠকখানার জন্য ছোট ছোট টপাদের এবং নুন-আলুভুক্ত খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করতুম। বলা বাহুল্য, বৈঠকখানার সকলেই আমার পক্ষে মাতুলগোষ্ঠি এবং সকলেই এপাড়া ওপাড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তাঁরা মাঝে মাঝে যেদিন মাদক ধূমপান বা সিদ্ধির শরবৎ পান করতেন আমি সেদিন মহন ময়রার দোকান থেকে শ্রেষ্ঠ মালাই মাখড়ি, রাজভোগ অথবা গোলাপগন্ধী কাঁচাগোল্লা আনিয়ে দিতুম। কনে-বৌ সুন্দর পানে সেজে রূপোর থালায় পাঠিয়ে দিতেন। বলা বাহুল্য, আমি সন্ধ্যাকালেই এক সময় বাড়ি ফিরে গিয়ে যথারীতি পড়াশুনো নিয়ে বসে যেতুম।

একদিন কনে-বৌ হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, আমিও কি তোমাকে ছুটিবাবু ব'লে ডাকব?

আমি খুব হাসলুম,—আপনার যা ইচ্ছে।

আমার ইচ্ছে তোমাকে ঠাকুরপো বলি।

মুখের হাসি আমার হঠাৎ থেমে গেল। আমি তাঁর দিকে তাকালুম। যাঁর স্বামী আমার মামা হন্ তিনি আমাকে ঠাকুরপো বলবেন, এ কেমন ক'রে হয়? কিন্তু আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে কনে-বৌ পুনরায় বললেন, আচ্ছা, ওতে যদি তোমার আপত্তি হয় তাহলে তোমাকে ডাকব ছুটি, আর তুমি আমাকে ডাকবে বৌউ, কেমন? আমরা ত' প্রায় এক বয়সী!

বয়স-বিচারে সম্পর্ক-বিচার হয় না—এটি বোঝাবার মতো বয়স তখন আমার হয়নি। কেন জানিনে, সেদিন আমি বড়ই আঘাত পেলুম। শুধু তাই নয়, কনে-বৌয়ের চোখে সেদিন যে দীপ্তি এবং উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করলুম, সেটি যেন আমার মনে কেমন একটা আধানা ভয় সঞ্চার করল।

মুখে শুধু বললুম, না, তা পারব না। সে হয় না।

সেদিন আমি বাড়িতে ফিরবার পর মামা বললেন, বুঝেছি! সোঁদা সোঁদা গন্ধ! হুঁ। এক-বয়সের যেনি বেড়াল, অন্য বয়সের তিনে বেড়াল! কেমন?

মামার তামাসা অনেক সময় আমার বোধগম্য হয় না। আমি মুখের হাসি লুকিয়ে অন্যত্র চ'লে গেলুম।

আমার পক্ষে বিস্তারিতভাবে কিছু আলোচনা করা সেদিন সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার মনে কি যেন একটা দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, যেটি ঘষে-ঘষে তুলে ফেলার জন্য সময় নিয়ে আমি জ্যোতি মামাদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করলুম। তা ছাড়াও আর একটা কারণ ছিল। আমরা গরীব গৃহস্থ। ওবাড়ির মার্বেল পাথরের দালানে চলাফেরা, ধনীর শয়নকক্ষে অবাধ প্রবেশ, যখন তখন তাঁদের দেরাজ বাক্স খোলা, লোভনীয় খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো, গাড়িঘোড়া

বিলাস-বৈভবের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা,—এগুলি কোথায় যেন আমাকে খাটো ক'রে দিচ্ছিল। আমি এবার স'রে আসতে চাই।

কিন্তু তিন দিন কাটল না। জ্যোতিমামা নিজেই এসে হাজির হলেন। আমার মামাকে ধমকিয়ে বললেন, ছোঁড়াটাকে তোরা ঠেলে রাখলি কেন? আমার ওখানে একটু লেখাপোনা করে, সে বুঝি তোদের সহ্য হল না?

কি যে বলিস—মামা জবাব দিলেন, ও যে যাচ্ছে তোদের ওখানে তা কে জানে? যাক্ না এখনি?

জ্যোতিমামা সেদিন আমাকে নিজেই ধ'রে নিয়ে যাবার সময় বললেন, অনেকদিন কানমলা খাসনি, কেমন? ব'সে ব'সে করছিলি কি?

একটু থতিয়ে বললুম, সামনে একজামিন্ আসছে তাই পড়াশুনো করছিলুম।

ও, পড়াশুনো! মামা কোথাকার!—জ্যোতিমামা বললেন, আমার ওদিকে চলছে না, আর তোর একজামিনই বড় হ'ল। চল্—

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে কনে-বৌ। তিনি হাসিমুখে বললেন, বাবে, এই বুঝি তোমার সঙ্গে কথা ছিল? তোমার জন্যে তাস কিনেছি, ক্যারম্ বোর্ড আনিয়েছি, লুডো খেলব তোমার সঙ্গে,—সব বুঝি ভুলে গেলে? একটু একটু যা লেখাপড়া শিখেছ, তাতেই হবে।

জ্যোতিমামা বললেন, লেখাপড়া শিখে বুঝি দরজায়-দরজায় ঘুরতে চাস? সায়েব বাড়ির চাকরি করলে জীবনটাই মাটি, তা জানিস? তুমি একটু ওকে চোখে-চোখে রেখো ত?

কনে-বৌকে আমার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে জ্যোতিমামা যখন চলে যাচ্ছিলেন, কনে-বৌ তখন বললেন, তুমি না নিজে-বর হয়ে গিয়েছিলে আমাদের বিয়েতে? কা'র জন্যে বর সেজেছিলে সেদিন? সন্ধ্যা কা'র গায়ে বেশি বাতাস দিয়েছিল? এমন সুন্দর মামার বাড়ি ছেড়ে একজামিন্? কী হবে লেখাপড়ায়?

স্বামী-স্ত্রীর এবম্বিধ ব্যবহারে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। আমার যেন মনে হচ্ছিল, ওঁদের এই বৃহৎ পুরীর নিঃসঙ্গ অবকাশকে কিছু পরিমাণ জীবন্ত রাখার পক্ষে আমাকে এখানে আনা হয়েছে।

যাই হোক, কনে-বৌয়ের কথা শুনে আমি খুব হাসছিলুম। বুঝতে পারা গেল, জ্যোতিমামা আমাকে আবার এখানে মোতায়েন ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর নিজের কাজে মন দিলেন। তিনি পুরনো জমিদার। কোথায় যেন তাঁর কাছারিও আছে। ওঁদের বাইরের ঘরে মাঝে মাঝে নায়েব-গোমস্তারা আসে।

আমি কিন্তু এখান থেকে আর ছাড়া পেলুম না। সে যাই হোক, মাস তিনেক পর থেকে লক্ষ্য করলুম, আমি নিজেই কনে-বৌকে নাম ধ'রে ডাকছি, এবং সহজেই তুমি ব'লে সম্ভাষণ করছি। আমার চেয়ে শোভা এক বছরের কিছু বড়। তার নিষ্কর্ম কয়মাস আমাকে দিয়ে না খাটালে তা'র চলে না। যেমন, তার এস্রাজের তার ছিঁড়লে আমাকে এনে দিতে হবে বকুল তার। সেতার বাজাবার রেজিন হারিয়েছে, সুতরাং আমাকে সেটি জোগাড় করতে হবে। আমাকে দিয়ে চানাচুর বা 'সাহে-বজিশ ভাজা' না আনালে তা'র চলে না। তার জন্য রাজ্যের ছবির বই যোগাড় করতেই

আমার প্রাপ্য। যে-পাখিগুলোকে জ্যোতিমামা এতকাল ধ'রে খাবার দিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে এখন থেকে আমি খাবার দেবো—এই হ'ল কনে-বৌয়ের হুকুম! রোজ সকালে গিয়ে আমাকে পায়রার দল ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে—তা'র জন্য আমার পড়াশুনো হোক বা না হোক।

কিন্তু সকালের দিকে আমার এ বাড়িতেই আসতে ভালই লাগত! কনে-বৌ স্নান সেরে নিত ভোর বেলায়। তারপর বুড়ি-ঝিকে ঔষধ-পথ্য দিয়েই তা'র ছুটি। জ্যোতিমামা ঘুম থেকে ওঠেন বেলা প্রায় দশটা। আমি ততক্ষণে বাড়ি ফিরে ইস্কুলের দিকে রওনা হচ্ছি। সে যাই হোক, সকালের দিকে কনে-বৌকে দেখে আমি খুশী হতুম। সে তার মাথার রাশি-রাশি চুলে এমন একটা সুগন্ধী তেল মাখত, যার আশ্চর্য মধুর গন্ধ অন্য কোথাও পেতুম না! সিঁথিতে সিঁদুর কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, চওড়া রাঙাপাড় শাড়ি, পায়ে আলতা, হাতের সোনার চুড়ির সঙ্গে রাঙা চুলি, গায়ে লাল রেশমি জামা,—এইগুলি ছিল কনে-বৌয়ের সকালের সজ্জা। সে যেন এই বাড়ির মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মী! প্রত্যেকদিন ধোপদস্ত পরিচ্ছন্ন, একদিনও তা'র ব্যতিক্রম নেই। ওই পোষাকেই ছিল ওর পরিচয়। কিন্তু আমি যখন ওরই নানা কাজে কাছাকাছি আসতুম, আমার চোখে মুখে কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেতো না। বাইরের দশজনে কনে-বৌয়ের এই সুন্দর চেহারাটি যেমনে হয়ত খুবই তারিফ করত, কিন্তু আমি এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতুম। এটি আমি কোথায় যেন শিখেছিলুম, সুবেশা বা সুসজ্জিতা মেয়েছেলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে নেই! যাই হোক, আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মুশকিল ছিল এই, সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে একবাটি গরম দুধ না খেলে কনে-বৌয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটত। ওদের বাড়ির খিড়কির দিকে মস্ত গোয়াল ছিল।

ছুটির দিনে ক্যারম্ বা লুডো খেলা নিয়ে বসে যেতুম। কিন্তু জ্যোতিমামা যদি কখনও হীটন্ চ'ড়ে বেরিয়ে যেতেন, কনে-বৌ আমাকে নিয়ে যেতো তা'র ঘরে—যে-ঘরের বাদামী রংয়ের দেওয়ালে নানা চিত্রণ দেখতুম। তা ছাড়া বড় বড় তৈলচিত্র সেখানে টাঙানো,—সে-ছবিগুলির দিকে চোখ পড়ামাত্রই আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতুম! ছবিগুলি অসভ্য।

কনে-বৌয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার যে সম্পর্কটা দাঁড়াল সেটা বন্ধুত্বের। বিস্ময়ের কথা ছিল এই, এই মেয়েটা আমাকে সর্বপ্রকার উঁচুনীচু সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়ে যেখানে এনে দাঁড় করালো, সেখানে জ্যোতিমামার লেশমাত্র সংস্পর্শও রইল না। সেখানে শুধু রইল শোভা আর তার বন্ধু ছুটু!

সন্ধ্যার পর শোভাদের বাড়ি যাওয়া ইদানীং আমার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছিল নানাকারণে। জ্যোতিমামা বলতে গেলে প্রায় কোনও দিনই সুস্থ অবস্থায় থাকতেন না। আমার নিজ মাতুল সম্বেত তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরাও কি যেন একটু বাড়াবাড়ি করতেন, সেটি আমি স্পষ্ট বুঝতুম না। সে যাই হোক, সন্ধ্যার পরে আমি আর ওদিকে পা বাড়াতুমনা।

কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল।—

আমি যে সময়টায় পাসের পড়াছিলুম একান্ত মনোযোগের সঙ্গে, সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যা-রাত্রের দিকে শোভার নিজস্ব পরিচারিকা আমার এখানে এসে খবর দিল, অ ছেলে, তোমাকে যে বৌরাণী এখুনি ডাকছে একবার?

আমি ইতিহাস মুখস্থ করছিলুম। মুখ তুলে বললুম, কেন? আমি যে পড়ছি এখন?

তা কি করব বাছা—তোমার ডাক পড়েছে এখুনি—

বই বন্ধ করে আমাকে যেতেই হ'ল। পাঁচ ছ'খানা বাড়ি পেরিয়ে এলে জ্যোতিষ্মানদের বাড়ি। আজ একটু অবাক হলুম। নীচের তলায় মজলীশ বসেনি। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছেনা। চাকরদের দিকটা নিস্তব্ধ। কি আমার আগে আগে ঢুকে নীচের তলার কোন্ মহলের দিকে চলে গেল। আমি আস্তে আস্তে মার্বল দালানটা পেরিয়ে বাঁয়ের মহলের সিঁড়ি ধ'রে উপরে উঠলুম। বাড়িটা প্রায় নিস্তব্ধ: শুধু কাঠের কুটুরির ভিতর থেকে এক একটা পায়রার চাপা বকবকম্ শোনা যাচ্ছিল।

শোভাদের শয়ন কক্ষের পূর্বদিকের দালান থেকে হঠাৎ ভিতরে চোখ পড়তেই দেখি, ঘরের মধ্যে জ্যোতিষ্মানা নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো অসুস্থ কিনা জানিনে। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু সহসা ঘুঙুরের শব্দ শুনেই থমকিয়ে গেলুম। ফিরে দেখি, শোভা বেরিয়ে আসছে অন্য ঘর থেকে। এক ঝলক জ্যোৎস্না পড়েছে তার গায়ে। তার পায়ে ঘুঙুরের শব্দ শুনে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই লক্ষ্য করলুম, তার পরণে রক্ত-নীল বর্ণের ঘাগরা এবং তাতে সোনালি জরির পাড় বসানো! গায়ে জ্যাকেট। গলায় কয়েকগাছা সাদা মুক্তোর মালা। দুই কানে বোধ হয় হীরের কুণ্ডই হবে। সে যেন ঝলমল করছিল মলিন জ্যোৎস্নার আলোয়। তার পরণে শাড়ি নেই, এ আমার পক্ষে মস্ত বিস্ময়। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম।

শোভা কাছে এল। একটু চাপা কণ্ঠে বলল, তুই আমার গান শুনেছিস অনেকবার। আজ আমার নাচ দেখবি তাই ডেকেছি!

আমি যে পড়া করছিলুম?—এবার একটু অনুযোগ জানালুম।

তবে এলি কেন? তবে কেন বললিনে যে, যাবনা?—হঠাৎ ঝুঁকিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বার মহলের সিঁড়ির দিকে শোভা ছুটে গেল! আমার অনুযোগে তার কোথায় যেন একটি পরম প্রত্যাশা মার খেয়ে গিয়েছিল। আমার একটু আঘাতও সে সইতে পারেনা। কিন্তু আজকের ব্যাপারটি যেন নতুন। সুতরাং আমি আগাগোড়া কিছু বুঝতে না পেরে তার পিছনে পিছনে এলুম। সমগ্র দোতলার এদিকে তখন কেউ কোথাও নেই।

কেন জানিনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সকালবেলাকার সেই দেবীমূর্তি সন্ধ্যারাত্রে নর্তকীতে পরিণত হয়, এ আমার পক্ষে অভাবনীয়। পিছনে পিছনে এসে আমি যেন আজ এই ঘোলাটে চাঁদের আলোয় প্রথম দেখলুম শোভাকে। কাছে দাঁড়িয়ে বললুম, আ, কি হচ্ছে? কাঁদছ কেন?

শোভা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু খামোকা এই কান্নায় আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, বেশ ত নাচছিলে ঘরে? আমি বুঝি তোমার কান্না দেখতে এলুম?

শোভা এবার ফিরল। মুখ তুলে বলল, আর কতদিন ধরে এই অপমান সহ্য করব বলত? তুইত আমাকে অপমান করতে এলি?

আমি থতিয়ে গেলুম। মনে হ'ল আগাগোড়া সামনে কি যেন একটা ধোঁয়া! কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু বললুম, অপমান? কিসের?

বিয়ে কি জন্যে হয়? কি ভেবে এসেছি স্বামীর ঘরে?—শোভা একটু গলা তুলল,—আমি কি চেয়েছিলুম? কেন দুঃখ দিচ্ছে আমাকে? কি জন্যে আমাকে এমন নড সাজাচ্ছে বলতে পারিস? রোজ রোজ আমাকে কী নোংরায় ডুবিয়ে দিচ্ছে বলত?

তা আমি কি করব ?

শোভা দু'হাতে আমার একখানা হাত চেপে ধরল। বলল, তোরা নাকি এপাড়া ছেড়ে কোন্ দিকে চ'লে যাচ্ছিস ?

বললুম, হাঁ, আমাদের বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

শোভা তখনও কাঁদছিল। এবার একান্ত মিনতি জানিয়ে বলল, যাবার আগে তুই একবার আমার বাবাকে খবর দিতে পারিস, ভাই ? আমি বড্ড কষ্ট পাচ্ছি, বলতে পারবি ত ? আমার মা নেই, ভাই নেই—কেউ নেই রে ! তুইও চলে যাচ্ছিস,—কিন্তু আমাকে মনে থাকবে ত ? সেই বাড়িতে গিয়ে ভাববি, আমরা এক সঙ্গে পাখিকে খাওয়াতুম, তোকে দুধ খাওয়াবার জন্যে কাড়া করতুম,—তোর মনে থাকবে সব ?

থাকবে !—জবাব দিয়ে বললুম।

আর মনে থাকবে আজকের দিন ?—শোভা আবার ডুকরিয়ে উঠল সেই অন্ধকার অলিন্দের পাশে দাঁড়িয়ে—মনে থাকবে যে, বাবার জন্যে কেঁদেছিলুম তোর কাছে ? তুই যে এতদিন পরে আমাকে ঠকিয়ে গেলি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলি, এও তোর-মনে থাকবে ?

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। উভয়েই চুপ। তারপর আমার সামনে দিয়ে রাত্রির এই সালঙ্কারা নর্তকী শ্রীমতী শোভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চলে গেল মার্বেল দালান পেরিয়ে। তার দুই পায়ের মধুর ঝুমুরের আওয়াজ শয়ন কক্ষের দিকে এক সময় মিলিয়ে গেল।

আর কোনওদিন ও বাড়িতে আমি যাইনি।

মহাকাল সব ভুলিয়ে দিয়েছিল পরবর্তী সতেরো আঠারো বছরে। কিন্তু একটি বালিকার কোনও এক রাত্রের আর্তকণ্ঠ মনে পড়ে গেল একদিন মধ্যাহ্নকালে শিয়ালদা ষ্টেশনের সামনে ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে—যখন দেখলুম আমার ঠিক পাশেই মহাসঙ্কট উলটপালট বৃদ্ধ জ্যোতিষমামাকে ! কদাকার, জরাজীর্ণ, ছিন্নবস্ত্র—যাঁকে দেখলে ভিখারী ছাড়া আর কিছু মনে হয়না। তিনি যেন অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। আমি চট করে তাঁর সাহায্যে এলুম। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমিও অচেনা থাকতে চাইলুম। মাথার উপরে রৌদ্র টা টা করছিল।

এরূপ অবস্থায় পরিচয়াদির কোনও কথাই ওঠেনা। আমি তাঁকে সামলিয়ে নিয়ে একখানা রিক্সায় তুললুম। জ্যোতিষমামা কাৎ হয়ে পড়ে শুধু জড়িত কণ্ঠে বললেন, সব বুঝতে পারছি, শুধু শরীরটা কথা শুনছেনা !

আপনি কোথায় যাবেন চলুন পৌঁছে দিই ?

ওই যে কাছেই—ভান বাড়ি গলিতে তিন নম্বর হোটেলে—

রিক্সা সেখানেই আসল। সেটি পাইস-হোটেল। আমি ধরাধরি করে জ্যোতিষমামাকে নামিয়ে সেই পাইস-হোটেলের সিঁড়ির তলায় এনে বসালুম। তারপর রিক্সার পয়সা চুকিয়ে দিলুম। অতঃপর কাছে এসে বললুম, আপনি থাকেন কোথায় ?

জ্যোতিষমামা মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, ঠিকানা জানতে চাও কেন ? কে তুমি।

বললুম, আজ্ঞে না, এমনি বলছি। আমি রাস্তার লোক। আপনি বুড়ো মানুষ··· যদি আমার দ্বারায় কিছু সাহায্য হয় তাই বলছি—

হোটেলের একজন রাঁধুনি বামুন এবার বলল, ওঁকে ঘাঁটাবেন না মশাই, ভারি রগচটা লোক! বরং সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ নেবেন। উনি এখন ঘুমোবেন ওইখানে প'ড়ে।

জ্যোতিমামা তক্তপোশে মুখ থুবড়ে পড়েছেন সেই সিঁড়ির তলায়। হোটেলের কি একটা কাঁট ছিটছিল সেখানে, তার নোংরা জলের ছিটে লাগছিল জ্যোতিমামার গায়ে।

আমি রাস্তায় বেরিয়ে গেলুম। জ্যোতিমামার কোনও বন্ধু এখন আর বেঁচে নেই, আমার মামারও মৃত্যু ঘটেছে কয়েক বছর আগে। ওঁদের কেউ জীবিত থাকলে এখনই ছুটে গিয়ে বলতুম, জ্যোতিমামার এই শোচনীয় অধোগতির জন্য কারা দায়ি বলতে পারো তোমরা? আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির এই চরম দুর্গতি আর অপমান—এর মধ্যে তোমাদের কি হাত ছিল না?

কিন্তু ধানবাদের আকীর্ণ সেই রাজপথের প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দেবার মতো কেউ নেই তখন।

স্থির করেছিলুম আর আমি আসব না। কিন্তু জ্যোতিমামার প্রাচীন স্নেহই আবার আমাকে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে এল সেই নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পাইস-হোটেলের দরজায়। তখন হোটেলে খদ্দেরের ভিড় আরম্ভ হয়েছে। আমাকে দেখেই জ্যোতিমামা বললেন, তুমি এমন অযাচিত উপকার কেন করছ, বাবা? কে তুমি? কি নাম?

আমার প্রকৃত নাম চেপে গেলুম। সবিনয়ে মিথ্যা বললুম, আমার নাম শৈলেন।

বেশ, বেশ—তোমার জন্যেই বসেছিলুম। এখন আমি সুস্থ।—জ্যোতিমামা বললেন, আমা কাপড় দুটো এখনও ভিজে! এই ছোঁড়ারা আমার ঘুমের ঘোরে এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছিল গায়ে। কি-মাগিগুলোও বেয়াড়া—

আপনি বাড়ি যাবেন না?

বাড়ি! চুপ ক'রে গেলেন জ্যোতিমামা। পরে বললেন, হ্যাঁ, তা যাবো···যেতে হবে। কি জানো বাবা···মেশা ভাঙ করলে শরীরে আর সয়না বটে, তবে মন টনটনে হয়ে ওঠে! তখন সব পথঘাট চিনতে পারি! কিন্তু সুস্থ থাকলে ভয় নাই। ভাবি এই বুঝি গাড়ি চাপা গেলুম!

বললুম, না ভয় পাবেন না—চলুন, আমি আপনাকে রেখে আসছি। আপনার বাড়ি ঠিক কোন্ দিকে ব'লে দিন?

জ্যোতিমামা সিঁড়ির দেওয়াল ধ'রে উঠে দাঁড়ালেন। পরে বললেন, গোটা দুই টাকা দিতে পার, শৈলেন?

পারি বৈ কি।—এই ব'লে আমি টাকা বা'র করলুম।

হোটেলের ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠল,—এ কেমন ধারা আকেল আপনার, বড়বাবু? পৌনে পাঁচটাকার মধ্যে দু'টাকা!

এই—চুপ করো!—আমি প্রতিবাদ জানালুম, শান্ত হয়ে মিষ্টিগলায় কথা বলো!

আপনি কে মশাই? আপনি চটেন কেন!—চেঁচিয়ে উঠল দুটো লোক মারমুখী হয়ে!

চুপ,—চুপ করো বলছি!—এই বলে আমি পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বা'র ক'রে দিয়ে বললুম, এর থেকে নিয়ে নাও! বাকি চার আনা তোমাদের বকশিস।

জ্যোতিষামাকে নিয়ে আমি বাইরে এসে প্রশ্ন করলুম, আপনার বাড়ি কোন্‌দিকে বলুন?

তিনি মুন্সীপাড়ার এমন এক ঠিকানা বললেন, যার সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন বাসস্থান মেলে না। তবু আমি তাঁকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে তুললুম। ওদিকের আশপাশের সব রাস্তাই আমার জানা। সুতরাং মিনিট দশেকের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে এলুম তাঁর ঠিকানায়। গাড়ি থামল সঙ্কীর্ণ এক গলির মোড়ে। তিনি নামবার আগে বললেন, তোমার টাকা হয়ত আমি শোধ করতে পারব না, বৈলেন —কিন্তু যে ক'দিন বাঁচি তোমার এই উপকার আমি ভুলব না! জীবনে সব যায় না, কিছু কিছুও আসে।

তিনি গাড়ি থেকে নেমে সরু গলিতে ঢুকলেন। কিন্তু আমি যখন ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে দেবার জন্য মনিব্যাগ খুলছিলুম, তখন এক সময় ডাক শুনলুম, এই ট্যাক্সি—!

এ কাহিনী এই জন্যেই টেনেছিলুম! ওই গলি থেকেই তিনি ট্যাক্সিকে ডাক দিয়ে ছমছমে অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, আঠারো বছর পরেও তাঁকে অনায়াসে চিনলুম! তিনি শোভা, আমার কিশোর বয়সের সেই পাড়ার কনে-বৌ! তিনি এখা বেরোচ্ছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে,—গলির মোড়ে ট্যাক্সি পেয়ে তাঁর সুবিধা হয়ে গেল।

আমি কোনও মতে ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে মুখ লুকিয়ে পালাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শোভা গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল, কে? ছুটি না?

বললুম, হ্যাঁ, আমি, কনে-বৌ!

কনে-বৌ কাছে এসে দাঁড়িয়ে উচ্ছলিত হাসি হেসে উঠল। বলল, কোথা ছিলি এতকাল, ছুটি? পোড়ারমুখো, এখনো আমি কনে-বৌ? তুই মুখ আজও তেমনি অজ্ঞান, তেমনি বোকা? তারপর? এখানে যে? এ পাড়ায়?

শোভার ঝলমলে সজ্জা, রাত্রির প্রসাধন এবং বহুমূল্যবান পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে আমি থতিয়ে গিয়েছিলুম। শুষ্ককণ্ঠে বললুম, জ্যোতিষামাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম!

হঠাৎ শোভা গম্ভীর হয়ে বলল, তবে ত' মস্ত উপকার করলি! কোন্ দিকে যাবি তুমি? নে, গাড়িতে ওঠ—। আ, কতদিন পরে দেখা, না?

ট্যাক্সিতে উঠে পাশাপাশি বসলুম। বিষণ্ণকণ্ঠে শোভা এবার বলল, বুড়োকে তাড়িয়ে ছিলুম বাড়ি থেকে, তুই আবার এনে ঢোকালি! ঘাটের মড়াটা দুঃখ দিচ্ছে চিরকাল!

কী বলছ তুমি, শোভা? উনি তোমার স্বামী না?

ট্যাক্সির মধ্যে উচ্চকণ্ঠে কলকলিয়ে হেসে উঠল শোভা। পরে উজ্জ্বল সকৌতুক চক্ষে বলল, স্বামী! কবে ছিল রে? শাঁখ বাজলেই বিয়ে হয়?—সর্দারজি, বরমহলা চলিয়ে!

শোভা ট্যাক্সিকে নির্দেশ দিল। সমস্ত গাড়ির ভিতরটা শোভার পোষাকের ও প্রসাধনের সুগন্ধে ভ'রে উঠেছিল। আমি কনে-বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছা করে, এতকাল পরের এই পরমাসুন্দরী রমণীকে দেখতে আমার বাকি ছিল! ভরা যৌবনের দীপ্তির সঙ্গে মিলে গিয়েছে তার দেহলাবণ্য,—আশ্চর্য তার অঙ্গসৌষ্ঠব।

বিয়ে করেছিস, ছুটি?

না।—অবাধ বিপুল।

করবার ইচ্ছে আছে?

তোমাকে দেখে সে-ইচ্ছে আর নেই!

উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে শোভা আমার গলা জড়িয়ে একবার আদর জানিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস! না, তুই বিয়ে করিসনে, দুষ্টু।

এবার প্রশ্ন করলুম, তোমার ছেলেপুলে হয়নি, শোভা?

শোভা বলল, মরা জন্ম একটা পেটে এসেছিল বহুকাল আগে। ওই অ্যাবোর্শনটাই সেটাকে নষ্ট ক'রে দেয়!

ট্যাক্সি অনেকদূর চ'লে এসেছিল। এবার আমি বললুম, শোভা, তুমি কি এখন অসংযত জীবন যাপন করছ?

শোভা হাসিমুখে বলল, কই না! ছোটবেলায় সবচেয়ে অসংযত জীবন দেখে এসেছি রে! আর আমার কোনও ভয় নেই। তবে কি জানিস, ওদের কালে ওরা তোপ ক'রে নিয়েছে, এবার আমার কালের পাওনা আমি বুঝে পড়ে নেবো!

এখন যাচ্ছ কোথায়? এই রাত্তিরে?

শোভা অনুকম্পার হাসি হাসল। বলল, নাঃ তুই একেবারে নাবালক! সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছিস! সন্ধে ন'টায় কি রাত্তির নাকি? রাত দুটোর পর থেকে ঘড়ি দেখতে হয়! যাচ্ছি কোথায়? কোন্ আড্ডাটা জানিস তুই? চৌরঙ্গী চিনিস?

উৎসবে আনন্দে

বাংলার রেশম

পশ্চিমবঙ্গ

রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

॥ বিক্রয়কেন্দ্র ॥

১। ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
২। কুটীর শিল্প বিপনী
১১এ, এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
৩। ১৪৯/১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
৫। ১৪৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
৬। ৪৫, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৪৩
৭। নাচন রোড, বেনচিতি, দুর্গাপুর-৪
৮। কলোনী রোড, বারাসাত, ২৪ পরগণা

সেখানে কেন ?

আবার সেই প্রশ্ন!—শোভা বলল, এইজন্যেই তোর মামা তোকে বলত, ছোটবেলাকার মেমি বেড়াল বড় হ'লে ভিজে বেড়াল! কিন্তু ভাবিসনে, ছুটি—আমি ঠিক আছি! নাচ, গান, বাজনা,—জানিনে কোন্‌টা? আরও একটা জানি, সেটা শিখিয়েছিল ওই আনোয়ারটা,—যাকে তুই বলিস জোস্তিমামা!

তোমাদের বিয়ে সম্পত্তি কি হ'ল?—প্রশ্ন করলুম।

সব গেছে রেস কোর্সের মাঠে আর দাপুরভির দোকানে!—শোভা বলল, কিন্তু সেজন্যে আমার কিছু অসুবিধে হয়নি, ছুটি!

চৌরঙ্গীর ভিতর দিয়ে অনেক দূরে একদলে এসে শোভা ট্যাক্সি থামিয়ে আমাকে নিয়ে নামল। সামনের প্রখর আলোয় নিজের দিকে চেয়ে সে বলল, কেমন মানিয়েছে আমাকে বল্‌? ভাল ক'রে দেখে তবে বল্‌!

বললুম, চমৎকার। তা এখানে যাচ্ছ কোথায়?

মধুর হাসি হেসে শোভা বলল, লিফ্‌টে উঠব পাঁচতলায়! আমরা ক'জনে মিলে এখানে একটা 'নাইট্‌-ক্লাব' চালাই। আয় না কেন আমার সঙ্গে?

কী হয় ওখানে?

যা কোথাও হয় না তাই হয়! আর শুনতে চাস?

আমি যখন চুপ ক'রে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, শোভা তখন হাসিমুখে বলল, বেনারসী পরা কনে-বৌ দেখেছিলি, রাজা শাড়িপরা বৌরাণী দেখেছিলি, বাগরা পরা বাইজির চেহারাও দেখেছিস, এবারে আয় আমার সঙ্গে,—এবারে দেখে শিউরে উঠবি, প্রলাপের জড়তা আসবে তোর গলায়,—সে-গলা শ্যাম্‌পেইন ছাড়া আর কিছুতে ভিজবে না! আয়—এই ব'লে শোভা আমার হাত ধ'রে টানল।

বললুম, না, আমি যাব না! তোমার সেই মৃত্যু আমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে বলো না!

শান্ত হয়ে আমার হাত ধ'রে একবার দাঁড়াল শোভা। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই তার কণ্ঠে। বলল, মৃত্যু নয় রে বোকা, ওটাও জীবন! একটি-একটি ক'রে সব সংস্কার ত্যাগ করব, দাঁড়িয়ে দেখবি শ্যাম্‌পেইনের পাত্র হাতে নিয়ে! অভ্যাসটি ছেড়ে দেবো, ভয়টি ঘুচিয়ে দেবো, চক্ষুলজ্জা ধ'রে যাবে, পুরনো বিশ্বাস ধ'সে পড়বে! দেখবি তখন, সৃষ্টির প্রথম কল্পের মেয়ে আমি! শূন্য, রিক্ত, নির্বিকল্প—আমি শুধু মেয়ে। রঙীন আলোয় দেখবি ক্লিওপেট্রার মহাপুঙ্কের থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি নগ্নদেহে! মৃত্যু কেন বলছিস রে? সেই মুহূর্তে দেখবি তোরই সামনে থেকে উঠবে সেতার-এস্রাজ-বেহালা-ম্যাণ্ডোলিনের ঝঙ্কার-ঝঙ্কনা! আয়, চলে আয়, ছুটি—তোর মতন বন্ধু একদিন আমার আর কেউ ছিল না! আয়, কথা শোন্‌, আজ প্রথম আমাকে দেখে যা! আজ তোরই রাত, এরাত আজ তোকে নিয়েই কাটবে, ছুটি! আয়—

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, না, আজ থাক্‌, শোভা। তোমাকে দেখা আমার হয়ে গেছে!

বললুম যে, শেষ রাত থেকে দু'জনে গলা জড়িয়ে শুধু কাঁদব? শুনদিনে?

না, ভাই—আজ থাক্‌। আরেকদিন হবে।—এই ব'লে আমি বিদায় নিয়ে চ'লে গেলুম। বুঝতে পারলুম, শোভার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছে!

লোকাতীত সভ্যতা সন্ধানে

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

লোকাতীত সভ্যতার অস্তিত্বের সন্দেহাতীত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি ; কিন্তু পর লোকে—অন্য কোন সৌরজগতে, কিংবা আমাদের ছায়াপথ ছাড়িয়ে অন্য কোন ছায়াপথে, অন্য ভুবনে—প্রাণ এবং প্রাণীর অস্তিত্ব ; এমনকি, আমাদের এই গ্রহের মানুষের চেয়ে বেশী কিংবা ঢের বেশী এবং কিছু কম কিংবা সমান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং তদনুযায়ী সভ্যতার অস্তিত্বের সম্ভাবনাটাকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না বললেই হয়, অন্তত উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

লোকাতীত সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যাবলী নিয়ে ইতিমধ্যে ১৯৬৪ সালের ২০শে-২২শে মে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি এবং তার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনেও অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। গত তিন-চার বছরে এই বিষয়ে শতাধিক গবেষণামূলক রচনা ("পেপার") হয়েছে। এই বিষয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তের্নবের্গ জ্যোতিষ বিদ্যামন্দিরে পরিচালিত পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার যে-ফলাফল গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হল, তা নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানজগতে এবং সর্বসাধারণের মধ্যেও প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং বিষয়টি নিয়ে সমস্ত মহলেই আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক রচনার গণ্ডি পেরিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত রূপে বিষয়টি সর্বসাধারণের সামনে এল এই প্রথম।

মহাশূন্যদেশে পৃথিবী থেকে সুদূর কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত কিংবা প্রেরিত বেতারসংকেত আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ড: অ্যালান ভাওাজ। তাই নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে কোন কোন সোভিয়েত বিজ্ঞানী সেই বেতারসংকেতের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কোন নতুন উপাদান লক্ষ্য করে মনে করছেন যে, ঐ সংকেতের উৎস কৃত্রিম হতেও পারে। এই সংকেতের উৎসের নাম দেওয়া হয়েছে এস. টি. এ-১০২ এবং এস. টি. এ.-২১। স্তের্নবের্গ জ্যোতিষ বিদ্যামন্দিরে সেনেদি শলোমিৎস্কি'র পরিচালনাধীন গবেষণায় দেখা গেছে যে, এস. টি. এ.-২১ থেকে সংকেত নিঃসরণের ঘনত্ব পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল এবং কালপর্যায় নিয়মিত ভাবেই ১০৪ দিনের মতো। সংকেতের উৎস যে কৃত্রিম হতে পারে, সে-ধারণা ঐ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই সৃষ্টি হয়েছে। আর একজন সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক নিকোলাই কারদাশেভ বলেছেন, ঐ নিঃসরণের উৎস যদি কৃত্রিম হয় তাহলে সেটা কোন লোকাতীত সভ্যসমাজের অস্তিত্বেরই নিদর্শন হতে পারে।

স্তের্নবের্গ জ্যোতিষ বিদ্যামন্দিরের রেডিও-জ্যোতিষ বিভাগের কর্তা ইঅসিফ শক্লভস্কি এবং অন্যান্য দেশেরও কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, শলোমিৎস্কি যে-তথ্যগুলি হাজির করেছেন সেগুলি আগ্রহোদ্দীপক, কিন্তু ঐ সংকেতের উৎস কৃত্রিম কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে অন্যান্য স্বাধীন পর্যবেক্ষণ দিয়েও ঐ নিঃসরণের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীলতার নির্ভুলতা প্রতিপন্ন হওয়া চাই, ঐ উৎস সম্বন্ধে অন্যান্য রেডিও-জ্যোতিষ পর্যবেক্ষণও করা চাই, ইত্যাদি।

বিকাশ সংক্রান্ত রহস্যের একটা অংশ উদ্ঘাটিত করতে পেরেছে। এইসব বিজ্ঞানক্ষেত্রে সর্বসাম্প্রতিক সাফল্যগুলিও এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ঐ প্রগতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

৩। রেডিও-পদার্থবিদ্যাক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে গেছে। কয়েক কুড়ি আলোক-বর্ষ দূর অবধি রেডিও যোগাযোগ এখনই স্থাপন করা সম্ভব। কয়েক শ' তারা রয়েছে এই শ'য়ের মধ্যে। বছর দশেকের মধ্যে এই সীমা হবে শ'খানেক আলোক-বর্ষ; তার মধ্যে তারা আছে কয়েক হাজার।

৪। লোকাতীত সভ্যতার সন্ধানকার্যে স্বয়ংক্রিয়বিদ্যার প্রগতিও একটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান।

৫। মহাকাশে মানুষের অভিযানও আলোচ্য ক্ষেত্রে সহায়ক। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীর সুযোগ-সম্ভাবনার পরিধি যে কতো বিস্তৃত হতে পারে তারই আভাস এতে পাওয়া যাচ্ছে। মহাকাশে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিযানের বছর পাঁচেকের মধ্যেই মানুষের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়ে গেছে কয়েক হাজার গুণ। সমগ্র সূর্য-নিকটবর্তী যেখে মানুষের রূপান্তরসাধন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হবে, সেটা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের সর্বাধিক নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে কিংবা তার কোনটিতে প্রাণের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নটিও বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বছর পাঁচেকের মধ্যেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে বলে মনে করবার কারণ আছে। মঙ্গলের মতো কঠোর-অবস্থাসম্পন্ন গ্রহে অতি আদি রূপের প্রাণের অস্তিত্বও আবিষ্কৃত হলে, "পদার্থের অস্তিত্বের উচ্চতম রূপ হিসাবে প্রাণের উদ্ভব হয় নিহিত নিয়মানুসারেই" এই কথার নির্ভুলতা প্রতিপন্ন হয়ে যাবেই। আমাদের ছায়াপথে শত শত কোটি গ্রহের অনেকগুলিতেই প্রাণ উদ্ভবের অবস্থা মঙ্গলগ্রহের চেয়ে ঢের বেশী অনুকূলই হতে পারে।

প্রশ্ন ওঠে: লোকান্তরে কোথায়ও পদার্থের নিহিত নিয়মানুসারে প্রাণের উদ্ভব ঘটলে এবং তার দীর্ঘ জটিল বিকাশ ঘটলে কোন এক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীর উদ্ভবও ঘটবেই, এমন কোন অবশ্যম্ভাবিতা আছে কি? অধ্যাপক শক্লভস্কি এবং আরও কোন কোন সোভিয়েত বিজ্ঞানীর মতে এমন কোন অবশ্যম্ভাবিতা নেই। তাঁরা অনুমান করেন যে, সে সম্ভাবনা বরং কমই। তাঁদের মতে, এমনও হতে পারে যে, আমাদের ছায়াপথে সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র এই পৃথিবী গ্রহেই—যদিও মহাবিশ্বের অন্যত্র তা হয়ে থাকতে পারে। এঁরা মনে করেন যে, সভ্যতা সৃষ্টির দিক থেকে মানুষ যদি একক অনন্যসাধারণ না হয় তাহলে তো আন্তর্লৌকিক যোগাযোগের প্রশ্ন, অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রশ্ন আসেই।

এই যোগাযোগের পদ্ধতি হতে পারে—বিভিন্ন সৌরজগতের মধ্যে যাতায়াত কিংবা তড়িচ্ছুম্বক সংকেত আদান প্রদান।

বিভিন্ন সৌরজগতের মধ্যে যাতায়াতের উপযোগী রকেটের গতিবেগ হওয়া চাই আলোকের গতিবেগের প্রায় সমান। একমাত্র তবেই আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রিয়াবলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বিভিন্ন সৌরজগতের মধ্যে, এমনকি, ছায়াপথের মধ্যেও যাতায়াত সম্ভব হতে পারে। কিন্তু রকেটবিদ্যার সম্ভাবনাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে কয় হর্ন্ন দেখিয়েছেন যে, যেমন রকেটের মাধ্যমে নতুন "আলানি" নেওয়াও সম্ভব নয়, তেমনি, প্রয়োজনীয় "আলানি" (পারমাণবিক) বহন করে নেওয়াও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে, আসে "ফোটন রকেটের" কথা। কিন্তু "ফোটন রকেট" যদি আদৌ নির্মিত

হয়, তার গতিবেগও আলোকসদৃশ হতে পারে না। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে রকেটবিজ্ঞার বিশেষজ্ঞেরা এখনও তাই মনে করছেন।

তবে, গ্রহান্তরযাত্রার জন্যে রকেট ইনজিনিয়ারিং-এর সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তর। আমাদের সৌরজগতের ভিতরে আবিষ্কার-অভিযানে এবং এই পরিসরে মহাশূন্যযান ব্যবহার করবার জন্যে রকেট ক্রমাগত আরও বেশী উপযোগী হবে। এক সৌরজগত থেকে অন্য সৌরজগতে সভ্যতার প্রসারের জন্যেও শক্তিশালী উপকরণ হতে পারবে রকেট। তবে, সেসব রকেটের গতিবেগ আপেক্ষিকতানুযায়ী হবে না। কাজেই, মহাশূন্যযানের যে-সুদূর এলাকায় লোকাতীত সভ্যতা থাকতে পারে, তার সঙ্গে যোগা-যোগের উপকরণ হিসাবে চাই অন্য কিছু।

তড়িচ্চুম্বক-পথে যোগাযোগ স্থাপনের কথা প্রথম তোলেন কক্‌কোনি এবং মরিসন ১৯৬০ সালে। সেটাই এক্ষেত্রে পরবর্তী যাবতীয় গবেষণার প্রেরণাস্থল।

কক্‌কোনি-মরিসনের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুসারে কিছু কাজ করেছিলেন ড্রেক্। কিন্তু, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, নিকটতম তারাগুলির কাছাকাছিই লোকাতীত সভ্যতার হদিস পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সে-সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। ড্রেক্ আরও ধরে নিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন লোকাতীত সভ্য সমাজে ব্যবহৃত প্রেরক এবং গ্রাহক-যন্ত্রের ক্ষমতা মোটামুটি আমাদের মতোই; কিন্তু এটা ধরে নেবারও কোন কারণ নেই। কোন সভ্যসমাজে প্রযুক্তিগত বিকাশের কাল-মাত্রা দুশই। মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকাতীত সভ্যতা থাকলে তাদের বিকাশের মাত্রা নিশ্চয়ই খুবই বিভিন্ন। তার প্রায় সবগুলিতেই প্রযুক্তিগত বিকাশের মাত্রা আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশীই হবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-ক্ষেত্রে ইহলোক তো এখনও শিশুই। ন্যাপলিয়ন বলবিজ্ঞার ভিত্তি দেবার পর থেকেই আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিজ্ঞার আরম্ভ এবং সেটা মাত্র সাড়ে-তিনশ' বছর আগেকার কথা। কিন্তু এই প্রযুক্তিবিজ্ঞাই ইতিমধ্যে মহাজাগতিক-গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হয়ে উঠেছে। এর দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিকিরণের তাপমাত্রা প্রায় ১০৮ ডিগ্রি। এটা আমাদের সৌরজগতে সূর্যের পর সবচেয়ে বেশী এবং শুধু আর মঙ্গলের বিদ্যুত শুধু।

২। ঊর্ধ্বাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর বিকিরণ-বলয় বিকৃত হয়ে গেছে মোটামুটি স্থায়ীভাবেই।

পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ এবং তার ক্রমাগত প্রচণ্ড বৃদ্ধির ঘটনাটাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মানুষ এখন উৎপাদন করছে মোটামুটি ৩×১০১৯ আর্গ/সেকেণ্ড; আগামী দুশ' বছরের মধ্যে, হয়ত তার আগেই, সেটা দাঁড়াবে—৩×১০২২ আর্গ/সেকেণ্ড; অর্থাৎ কিনা, পৃথিবীতে সৌরশক্তির যে-প্রবাহ মোটামুটি তার শতকরা ১ ভাগের সমান।

তারও উপর শক্তি উৎপাদন বাড়তে থাকলে পৃথিবীর তাপ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তার আগেই সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যাবে, কিন্তু সৌরশক্তির শতকরা ১০ ভাগের বেশী মোটামুটি ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কেউ কেউ মনে করেন, সে-অবস্থায় পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদনবৃদ্ধি নিষিদ্ধ করবার প্রয়োজন দেখা দেবে। কিন্তু, ততদিনে, এবং অন্যান্য কারণে হয়ত তার অনেক আগেই, বড় বড় শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হবে মহাকাশে। বেশ কিছুকাল আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের

নিকোলাই কার্দাশেভ এবং ডি. ব্লিশ চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহে রেডিও ইন্টারফেরোমিটার স্থাপনের একটি বলিষ্ঠ কিন্তু বাস্তবতা সম্মত পরিকল্পনা দেন।

মানুষ এক সময়ে সৌরজগতটাকে "পুনরুদ্ধার" ক'রে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করবে। এইভাবে শক্তি এবং বিভিন্ন পদার্থের যোগান যা বেড়ে যাবে তা প্রকাশ করবার মতো কোন তুলনা জানা নেই। গ্রহগুলির বস্তুর কোন কোন অংশকেই তাপ-নিউক্লিয়সীয় সংশ্লেষণের "জ্বালানি" হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। তখন শক্তির পরিমাণ ১০৩৩ আর্গাসেকেরেও সীমাবদ্ধ থাকবে না।

পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বয়স এবং এই বয়সেই তার সাফল্য আর বিপুল আশু সম্ভাবনার এই চিত্র দেখেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, লোকান্তরে সভ্যতা গড়ে উঠে থাকলে তার প্রায় সবগুলিতে না হলেও অন্ততঃ অনেকগুলিতে প্রযুক্তি-বিদ্যার বিকাশ যা ঘটেছে তাতে উৎপন্ন শক্তির মাত্র ১০৩৩ আর্গাসেকেও পৌঁছে গেছে এবং তাদের সৌরজগতে "পুনরুদ্ধার" করে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন সত্তার বিকাশ এবং প্রসার কি নির্দিষ্ট সৌরজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য? কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এমন কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সম্ভাবনা যতদূর অনুমান করা যায় তাতে এমনও হতে পারে যে, লোকাতীত কোন সভ্য সমাজ তাদের নিজেদের সৌরজগতটিকে "পুনরুদ্ধার" ক'রে নিকটবর্তী বিভিন্ন তারার দিকে "পুনরুদ্ধারকার্য" সম্প্রসারিত করেছে। এসব তারার নিজ নিজ গ্রহ-উপগ্রহমণ্ডলী থাকা চাইই এমন কোন কথা নেই। কৃত্রিম বাসোপযোগীয় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সেই সমাজের করায়ত্ত হবে। কোন নিকটবর্তী তারার আশপাশ রূপান্তরিত করতে কয়েক হাজার বছর লাগতে পারে: সেখানে বাসযোগ্য নিয়ে আসা করতে লাগতে পারে কয়েক শ' বছর। এইভাবে "পুনরুদ্ধার" করা হলে সংশ্লিষ্ট সেই প্রতিবেশী তারাটি হয় আরও সম্প্রসারণের একটি নতুন ঘাঁটি। এইভাবে একটি সমগ্র পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে কয়েক কোটি বছরের মধ্যে আমাদের গোটা ছায়াপথটাকে "পুনরুদ্ধার" করে ফেলা যেতে পারে।

শক্তি উৎপাদনের মাত্রা ঐভাবে ১০৪৩ আর্গাসেকেরেও ছাড়িয়ে উঠতে পারে। লোকান্তরে সভ্যতা থাকলে তার কোনটি তেমন মাত্রায় পৌঁছয় নি, এমনটি ধরে নিতে পারবার কোন কারণ নেই।

লোকাতীত যে কোন সভ্যতাই ঠিক এইভাবেই বিকশিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। উন্নয়নশীল সভ্যসমাজে বিভিন্ন সংকট দেখা দিতে পারে। তার কোন কোন সংকট সেই সমগ্র সভ্যতারই পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

এই রকমের কয়েকটি সম্ভাব্য সংকট এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। (১) তাপ-নিউক্লিয়সীয় বিপর্যয়ের ফলে, কিংবা কোন আবিষ্কারের আগে-না-জানা এবং আয়ত্তের বহির্ভূত ক্রিয়ার আত্মবিলুপ্তি। (২) বংশগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপদ। (৩) তথ্যাদির অত্যুদয়। (৪) ব্যক্তি-মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, যার ফলে অতিমাত্রায় বিশেষীকরণের সঙ্গে অবসাদনের সূচনা। (৫) বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কৃত্রিম সত্তার অভ্যুদয়জনিত সংকট।

এগুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু-সংকটও দেখা দিতে পারে, সেগুলির প্রকৃতি এখন অনুমান করাও সম্ভব নয়।

এর উপর, সমাজ হয়ত "পরিমার্জনগত প্রসারের" পথ বর্জন ক'রে বলতে পারে। তারা শক্তি উৎপাদনের মাত্রা সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে, মহাকাশে অভিযান নিষিদ্ধ ক'রে "গুণগত আত্মোন্নয়নের" পথ ধ'রে সম্পূর্ণ নতুন নতুন আদর্শ অনুসারে চলতে পারে। এই পরিস্থিতি অবশ্যি অবশ্যম্ভাবীরই সামিল। তবে, এমন অবস্থা কোথাও সৃষ্টি হলেও সেটাই বিকাশের একমাত্র ধারা হতে পারে না।

লোকাতীত কোন সভ্যতার শক্তি-মাত্রা ১০৩০ কিংবা ১০৪০ আর্গ'সেকেণ্ড হলে সেটা তড়িচ্ছুম্বক যোগাযোগের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান।

গত এপ্রিল মাসের আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই নিকোলাই কার্দাশেভ অনুমান করে আসছেন যে, যেসব মহাজাগতিক তরঙ্গ নিঃসরণ পৃথিবীতে ধরা পড়ে তার কোন কোনটির উদ্ভব কৃত্রিম হতে পারে এবং সেই উৎস হতে পারে কোন লোকাতীত সভ্যতা, যার শক্তি-মাত্রা ১০৩০ আর্গ-সেকেণ্ড পর্যন্তের, কিংবা আরও বিকশিত কোন সভ্যসমাজ যারা তাদের তারকা জগতের রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলেছে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, কোন তারকাজগতে লোকাতীত সভ্যতার শক্তি-মাত্র "মাত্র" ১০৩০ আর্গ'সেকেণ্ড হলেও পৃথিবীর আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে তাদের দ্বারা প্রেরিত সংকেত ধরা যেতে পারে। লোকাতীত সভ্যতা ঐ পরবর্তী (১০৪০ আর্গ'সেকেণ্ড) শক্তি-মাত্রার হলে তারা মহাবিশ্বের দূরতম বস্তু থেকে দূরবর্তী হলেও তাদের দ্বারা প্রেরিত সংকেত পৃথিবীর এখনকার সরঞ্জামে ধরা পড়তে পারে।

মহাজাগতিক বিকিরণের কোন উৎস কৃত্রিম কিনা, তা প্রমাণ করা যায় কেমন করে? কার্বাণেডের নতুন আবিষ্কারের পরে এবং তার আগে থেকেও সে-সম্বন্ধে বিশেষত সোভিয়েত জ্যোতিঃ মহলগুলিতে আলোচনাদি চলে আসছে। কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া দরকার, কি কি রকমের অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে অনুমানের নির্ভুলতা প্রতিপন্ন করা যায়, তেমন অনেক প্রস্তাবাদি উঠেছে এবং সেইভাবে কাজও চলেছে। এস টি এ.-১০২ থেকে বিকিরণের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীলতা অন্যান্য স্বাধীন সূত্রের পর্যবেক্ষণ দিয়েও যাচাই হওয়া চাই। আমেরিকান জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা এস. টি. এ.-১০২এর অবস্থানে ১৭তম মানের একটি ক্ষীণ তারা হালে আবিষ্কার করেছেন; ঐ তারার বর্ণালী পেলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এস. টি. এ.-১০২'এর বৃহত্ত আরও অধিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন, এটাও বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। মোটের উপর, এস টি. এ.-১০২'এর বিকিরণের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীলতা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সেটা হবে রেডিও-জ্যোতিষের বৃহত্তম আবিষ্কারগুলিরই একটি।

পৃথিবীতে প্রাপ্ত কোন কোন সংকেতের উৎস যদি হয় কোন লোকাতীত সভ্যসমাজ, সেক্ষেত্রে সেই সংকেত সংগ্রহ এবং তার অর্থোদ্ধার করবার কাজও মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি নতুন বিরাট ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

লোকাতীত কোন সভ্যসমাজও নিশ্চয়ই লোকান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহান্বিত হতে পারে। ইহলোকের সঙ্গে, অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটির সঙ্গে এখনও যদি না ধরে থাকে, লোকাতীত কোন সভ্যতা অন্য কোন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেও। আমাদের সমাজ এবং প্রাথমিক স্তরে বিকশিত অন্যান্য সভ্যসমাজ বহু উচ্চ মাত্রায় উন্নীত কোন লোকাতীত সমাজের পক্ষে খুবই আগ্রহজনক নিশ্চয়ই—ঠিক আমরা যেমন বিভিন্ন আদিম সমাজ, এমনকি, পিঁপড়ে এবং মৌমাছির সমাজ সম্বন্ধেও আগ্রহশীল।

রেডিও-যোগাযোগ ব্যবস্থার আরম্ভই হয়েছে হালে। বহিঃপ্রকৃতি এবং তার প্রধান প্রধান নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানধারণ নির্ভুল হলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আগামী দিনে চূড়ান্ত গুরুত্বই ধারণ করবে। রেডিও যোগাযোগ যে অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগের চেয়ে সর্বতোভাবেই সুবিধাজনক সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য।

বহু উর্ধ্ব স্তরে উন্নীত লোকাতীত সভ্যতার অস্তিত্ব মানুষের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়বেই—তার কারণ, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বস্তু সম্ভবত জড় সম্বন্ধে মানুষ যেসব নিয়মাবলীতে অভ্যস্ত তার সঙ্গে মিলবে না এবং তাদের বিভিন্ন গুণাগুণ মানুষের কাছে বিস্ময়কর, এমনকি, "অতিপ্রাকৃতিক" বলেই মনে হবে। এইভাবে আসছে "মহাজাগতিক অলৌকিকতার" সমস্যা, অর্থাৎ "মহাজাগতিক মিরাক্‌ল্" এর সমস্যা। এইসব "মহাজাগতিক মিরাক্‌ল্" হল মহাজাগতিক হিসাবের বিপুল বৃহত্বে অবস্থিত বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন সত্তার সমাজের কোন কোন কোন কর্মকাণ্ডের নিদর্শন, যা মানুষের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়তে পারে।

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ

নিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম. এ. ডি. লিট্ বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (কলি.) ডি. লিট্ (লণ্ডন) বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদম কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

চ্যবনপ্রাশ :—সর্দ্দি, কাশি, শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ, দুরারোগ্য দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রের ন্যায় কার্য করে। শক্তিহীন, ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃত তুল্য রসায়ন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সকলের পক্ষে, সকল ঋতুতে সমান উপযোগী। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

কান্না

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাসের জন্য অপেক্ষা করে হাঁফিয়ে উঠেছি। এদিকে তাড়াও জমে উঠছে একটু একটু করে। শীতকালের কলকাতায় যদি ঝির-ঝিরে বৃষ্টি হয় তাহলে সবই কেমন যেন মিইয়ে পড়ে! এই শীতের সন্ধ্যা তাই কেমন খমথমে।

গোড়া থেকেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করছি আমি। তার কারণ, ওর আকৃতিতে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, ঠিক সাধারণ ভিখারিণী নয়। মুখখানা এমনই মাধুরী মাখানো যে সবাই একটু করে তার মুখখানা দেখে নিচ্ছে। যেন সেকালের বনেদি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মাথায় তেল নেই, মুখে প্রসাধনের প্রলেপ নেই। তবু তার একটা আকর্ষণ আছে।

ভিক্ষাও সবার কাছে চাইছে না। লোক বুঝে তার কাছে গিয়ে আবেদন জানাচ্ছে। তার ঐ বড় বড় চোখ দুটোর জন্যই হয়ত কিছু কিছু সাহায্য মিলছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মেয়েটির গায়ে একটা লাল ওভারকোট ছিল। এককালে সেটা দামী পশমী কাপড়ে নিশ্চয়ই তৈরী হয়েছিল। আজ তা শতচ্ছিন্ন এবং মলিন। মেয়েটির দৈহিক গঠন সুন্দর তাই বেশভূষার এই দৈন্য তার ব্যক্তিত্বকে মুছে দিতে পারেনি।

লোক বুঝে সাহায্য প্রার্থনা করছে। মেয়েদের কাছে একেবারেই ঘেঁষছে না। পানের দোকানের পাশটিতে যে হিন্দুস্থানী হকার নানা রকমের সাময়িক পত্র সাজিয়ে বসে থাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এটা-ওটা দেখছি বটে কিন্তু চোখ আছে আমার এই মেয়েটির ওপর। একটা অকারণ কৌতূহলও বলা যায়।

কলকাতার নিয়ত পরিবর্তনশীল মূর্তি দেখছি। দুঃস্বপ্ন নগরী বলে কলকাতাকে রাজনৈতিক নেতারা যতই চালাকি করার চেষ্টা করুন না কেন, কলকাতা সেই কলকাতা, এই প্রাচীনা নগরীর সব কিছুই তাই বিচিত্র। ভিক্ষা করার এই আধুনিক টেক্‌নিকটা আমাকে বিস্মিত করেছে। এমনিতেই যা দেখি তাতেই বিস্মিত হই। আমার বিস্ময়ের ঘোর লাগার বয়স, তার ওপর অনেক বছর পরে কলকাতায় ফিরেছি।

আমি বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শীতটাও যেন ক্রমশঃ বাড়ছে। শন্‌শনে উত্তুরে হাওয়া হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য এই কলকাতা, শীত এবং অকাল বৃষ্টি তার মেজাজটা বিগড়িয়ে দেয়নি।

এমন সময় মেয়েটি পিছন থেকে এসে করুণ গলায় কিছু সাহায্য চাইল। খাসা ইংরেজী, পরিষ্কার এবং নির্ভুল। আমার আকৃতিতে হয়ত অবাঙালী মনে হয়েছে। অনুমানে বুঝলাম হয়ত এর মাথার ঠিক নেই, নয়ত নিশ্চয়ই অন্য কোনোরকম মতলব আছে। তাই ওর আকুলতায় আমার

মনে এতটুকু সহানুভূতি আসেনি, তা ছাড়া ওভাবে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মেজাজটাও ঠিক ছিল না, মেয়েটির আবেদনটাও সেই পুরাতন পদ্ধতির। কিছু বাওয়া হয়নি। বিরক্ত চিত্তে ভাবি কলকাতা শহরটা শেষ পর্যন্ত কি ভিখারীদের শহর হয়ে উঠল।

সরোষে বললাম—উঁহুঁ দেখো—ভালো আলা—

কথাগুলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মুখের দিকে আর একবার তাকালাম, চোখ দুটো যেন টর্চের মত জ্বলছে। এই দৃষ্টির জন্যই অন্ততঃ দু'চার আনা তার প্রাপ্য হতে পারে। মনে পড়ল, হাফিজ তাঁর বিখ্যাত সেই কবিতায় লিখেছিলেন—লাল গালের কালো তিলের বিনিময়ে সমরখন্দ আর বোখারাও দিয়ে দিতে পারি। তাই দুর্বল চিত্তে পকেটে হাত দিয়ে ভাবি, দেব কি দেব না! তারপর স্থির করলাম না, কিছুতেই নয়। মনকে শক্ত রাখা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ না করলে মানুষ হওয়া যায় না।

ওকে এড়ানোর উদ্দেশ্যেই একটু ঘুরে যে ভীড় জমেছিল সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে পৌঁছে দেখি, তেমন কিছু নয়, কলকাতা শহরের প্রাত্যহিক ঘটনা। একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সাইকেল আরোহীকে ট্যাক্সি পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। আহত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করার দিকে কারো উৎসাহ নেই, কোন পক্ষ দোষী তাই নিয়ে দু'দলে বচসা হচ্ছে। কনষ্টেবল বারবার সবিনয়ে নিবেদন করছে, ভীড়টা একটু ছাড়ুন, একটু হাওয়া আসতে দিন—

পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমরা কি তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে পারছি! আমরা কি অনেক পিছিয়ে পড়িনি। সখেদে একটা সিগারেট ধরালাম।

এমনিতেই চৌরঙ্গীর পথে রথ-দোলের ভীড় সব সময়, তার ওপর এই বিচিত্র আকর্ষণ। ভীড় ঠেলে কোনো রকমে বেরিয়ে আসি। পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে ভীড় সরাতে গিয়ে।

অতিকষ্টে সেই ব্যূহভেদ করে বাইরে এসে সর্বপ্রথম যে বস্তুটির জন্য আকুল হলাম সে আমার মনিব্যাগ। সবিস্ময়ে দেখি, কোন ফাঁকে সেই মনিব্যাগটা উধাও হয়েছে। তারিফ করতে হয়, হাতের কারসাজি বলিহারি বটে, একটুও টের পাইনি, কখন নিঃশব্দে কাজ সেরে নিয়েছে। কি নির্বোধ আমি, নিঃশব্দ মৃত্যুর মতো কখন যে পকেটমার এসে তার কর্তব্যপালন করে গেল কিছুই টের পেলাম না।

পুলিশে একবার জানান দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু চৌরঙ্গী অঞ্চল কোন থানার এলাকাভুক্ত কে জানে। লালবাজার গেলে কেমন হয়?

এই ইতস্ততঃ ভাবটুকু কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল ওদিকের ফুটপাথে সেই লাল ওভারকোট পরা, অতি দ্রুতপায়ে চলেছে। তার পদক্ষেপ দ্রুত হলেও শঙ্কিত। এই সেই বিচিত্র ভিখারিণী।

আমিও সেদিকে এগিয়ে গেলাম। সেদিকে কেন যে এভাবে ধাওয়া করলাম তা বলা কঠিন। তবে আমার মনে হয়েছিল যে এই মনিব্যাগ হারানোর সঙ্গে ওর একটা যোগ আছে।

কেমন দ্রুত সরে যাচ্ছে, পার্ক করা গাড়ির পাশ কাটিয়ে, ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে। চলন্ত বাস ও ট্যাক্সির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কুশলী ফুটবল খেলোয়াড়ের মত ঠিক বেরিয়ে আসছে।

এইভাবে একটু এগিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলের পাশের রাস্তাটি ধরে কর্পোরেশন অফিসের দিকে

চলেছে মেয়েটি, তারপর কি আশ্চর্য, সিনেমাটা পার হয়েই একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আমি নিরুপায় হয়ে পড়েছি। ট্যাক্সির নম্বরটুকু নজরে পড়ল বটে, কিন্তু আর ট্যাক্সি কই, যে ওর পিছু নেব! কলকাতা শহরে বাঘের দুধও হয়ত পয়সা খরচ করলে পাওয়া যায়। কিন্তু ট্যাক্সি!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু পাওয়া গেল, সিনেমাযাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সি খালি হল, তখনও ঐ ট্যাক্সিটা মোড়ের মাথায় ট্রাফিক জ্যামহেতু দাঁড়িয়ে, আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সেদিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম।

আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে। আমি নিজেই এখন সার্লক হোমস। এই রহস্যের সমাধান করতেই হবে। আগের ট্যাক্সিটা চোখে চোখে রাখছি, এতটুকু বিশ্রাম হলে চলবে না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা চতুর। ও আমার মতলব বুঝেছে, কোনো প্রশ্ন না করেই ও চুপ চাপ অনুসরণ করছে আগের গাড়িটাকে।

মনে মনে ভাবছি আজ রহস্যপুরী কলকাতার আসল আকৃতি দেখতে পাব। হয়ত গুণ্ডার আড্ডায় পড়ব। কিন্তু যাই হোক, আমি আজ মরিয়া হয়ে উঠেছি। এই রহস্যভেদ করবই। নিচু-তলার সমাজের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে হারানো মনিব্যাগটাও আবার আমার পকেটেই ফিরে আসবে।

অনেক কষ্টের টাকা, সেই টাকা যে এভাবে নষ্ট হবে এ আমার সইবে না। অনেক গাতা লিখে, অনেক হাঁটাহাঁটি করে, অনেকদিন ভাঙা দেয়ালার প্রকাশক প্রদত্ত চা পান করে এ কয়টি টাকা আদায় হয়েছিল। সেই টাকা।

টাকা—পরম পবিত্র টাকা। ওর প্রতিটি নোট আমার মুখস্ত।

ট্যাক্সিটার গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এল। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পার হয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছে ট্যাক্সিটা একটি ফ্যাশন দুরস্ত পোষাক পরিচ্ছদের দোকানের সামনে থামল। অতি দ্রুত পায়ে সেই লাল ওভারকোট মেয়ে গেল—

আমার ট্যাক্সিওলাও ঠিক জায়গায় থামল।

মনে মনে ভাবলাম—গোয়েন্দা 'গল্পের পাখি এইবার ধরা পড়িল'। ট্যাক্সিওলাকে খোলাখুলি-ভাবে বললাম—আমি এই দিকটায় লক্ষ্য রাখছি। তুমি সামনের গেটটায় নজর রাখো।

অনেক পরে মেয়েটি বেরিয়ে এল।

অনেক মেয়ের ভেতর আর একটি মেয়ে। সেই মুখ, সেই চোখ, কিন্তু গায়ে সেই ওভার কোট নেই। দেখাচ্ছেও অন্য রকম।

ভাবলাম—পোষাক পালটিয়েছে। ওঃ কি শয়তান!

এ যে সেই রমণী—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। শুধু পোষাকটা বদলিয়েছে।

—ইয়ে আল্লা! আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলে ওঠে।

কিন্তু কিছু না বলে মেয়েটির পিছু পিছু চলে—পাশাপাশি দুটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। মেয়েটি

নিঃশব্দে তার গাড়িটায় উঠে বসল। বেশ বোঝা গেল আমি যে তার ওপর নজর রেখেছি তা বুঝতে পারেনি।

মনে মনে ভাবি, আর কত আমাকে ঘোরাবে। এইবার তোমার খেলা শেষ—ঘড়িটায় দেখি প্রায় আটটা বাজে। ট্যাক্সি এইবার গিয়ে দাঁড়ায় নিউ মার্কেটের পুবদিককার ঘড়িটার কাছে। মেয়েটি নামল।

আমি দূর থেকে পিছনে চললাম। ফুলের দোকান থেকে কিছু ফুল কিনে নিয়ে আবার ফিরে এসে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে এমন সময় আমি পিছন থেকে এগিয়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরলাম। মুখ ফিরিয়ে আগুনভরা চোখে মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। সে আমাকে দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছে।

আমার এই আক্রমণে সে যদি বিস্মিত, সচকিত, বিভ্রান্ত হয়ে উঠত, যদি চীৎকার করে উঠত, যদি অনুনয় বিনয় করত, যা হয় কিছু বলত তাহলে তাই স্বাভাবিক হত, কিন্তু সে যেন বিস্মিত হওয়ার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছে।

বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

আমি বরং একটু হেসে প্রশ্ন করি—কি সব টাকাটাই খরচ হয়েছে?

আমার এই হাসির পিছনে ছিল একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। নিদারুণ রুক্ষতা।

মেয়েটি মোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটাও সে হারিয়েছে। মুখোমুখি

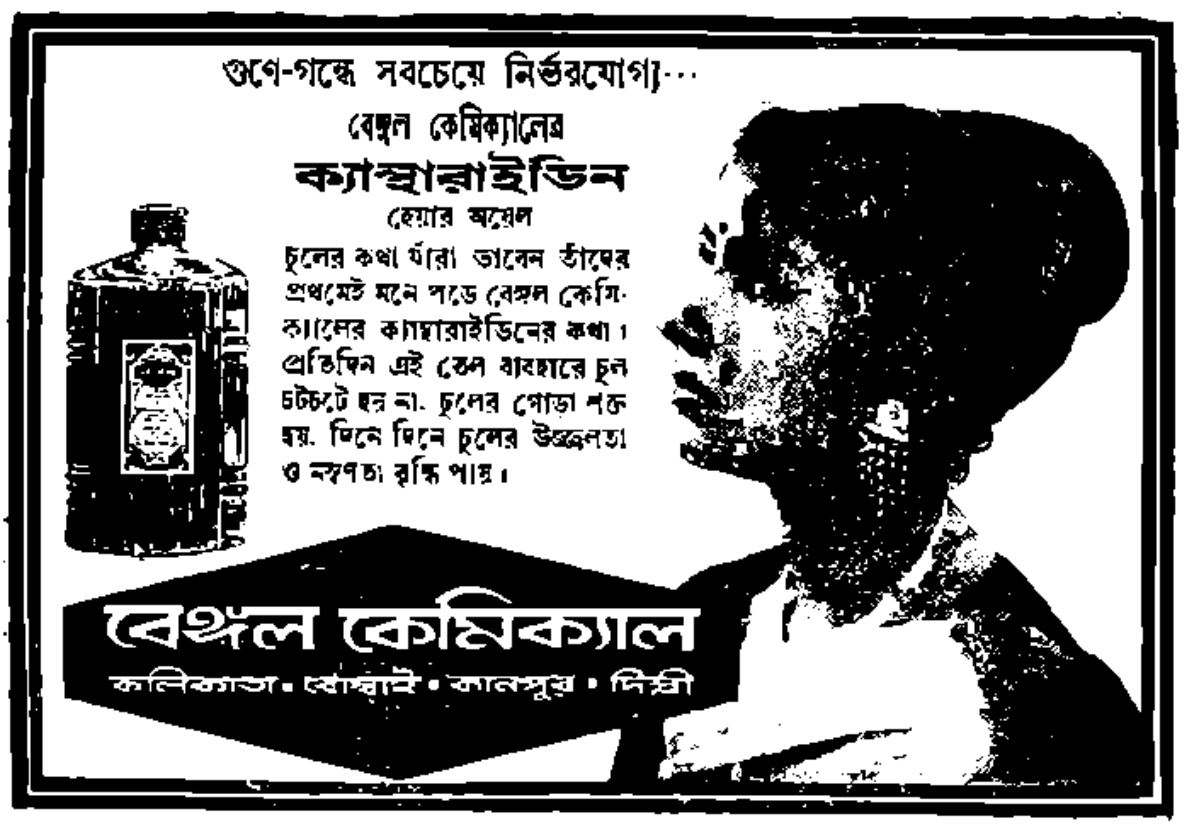

দাঁড়িয়ে আমার ভালো করে দেখলাম, সেই চোখ, কি উজ্জ্বলতার দীপ্তি। আর মাথায় সেই গুখ্‌নো চুলের ভেতর কয়েকগাছি রুপালি চুলের চাকচিক্য।

অনাহারের সুস্পষ্ট চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। আমি কিন্তু কঠোর, ওর ওপর আমার এতটুকু মমতা নেই।

আবার প্রশ্ন করি—কই আমার কথার জবাব দাও!

ট্যাক্সিওলাও দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

আমি ওর ট্যাক্সিটাতেই ওকে টেনে তুললাম, বললাম, চলো আগে যাই তালতলায়, থানায় —সেইটাই ত' কাছাকাছি।

মেয়েটি তবু নির্বাক। ভয়ডর ও মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই কোনো কিছুই বলছে না।

বললাম—তোমার কিছু বলার আছে? কিছু কি বলতে চাও? আমার টাকা ফেরৎ দাও, তোমাকে ছেড়ে দেব।

মেয়েটি এতক্ষণে পরিষ্কার বাংলায় বলল—বলছি, সব কথাই বলছি।

কথাগুলি প্রায় শুকনোর ভঙ্গীতেই যেন বলল।

ভাবলাম মন্দ কি, কানে কানে কতই না দেখব। প্রশ্ন করলাম—আমি তোমার ওপর অনেকক্ষণ নজর রেখেছি। ব্যাগটা কখন নিয়েছ? যখন ভীড়ের ভেতর ছিলাম?

মেয়েটি ম্লান গলায় বলল—হয়ত আপনার সব শুনে হাসি পাবে, কিন্তু আপনি কিছু না দিলেও, আমি আপনার পিছু ছাড়িনি। আপনার সঙ্গে টাকা আছে আমি বুঝেছিলাম।

—আমাকে সাঁসালো লোক মনে হয়েছিল?

—তা নয়, মনে হয়েছিল আপনি এ শহরে হয়ত নতুন এসেছেন!

—তা হয়ত নতুন, কিন্তু তাই বলে?

—আমি পিছু নিয়েছিলাম কিছু পাবার আশায়। হয়ত আপনি দেবেন এই আশায়, আপনি দিলেন না। ভীড়ের ভেতর এগিয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়—

তা হাতটা ত' বেশ পাকিয়েছ। দলে ক'জন আছে?

—না, কেউ আর নেই। আমি আজ প্রথম এ কাজ করেছি। নিতে হয়েছে।

—তার মানে? নিতে হয় মানে?

মেয়েটি আমাকে বলল—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি এখন একটিবারের জন্য এক জায়গায় যেতে চাই, তারপর, আপনি আমাকে যেখানে পাঠাবেন সেইখানে যাব। চুরি আমি করেছি, কিন্তু সে আমাকে করতে হয়েছে—

—অর্থাৎ! চুরি করতে হয়েছে, বাধ্য হয়ে চুরি করতে হয়—তার মানে?

মেয়েটি ধীর গলায় বলল—এখন আমাকে সেওড়ার হাটে যেতে হবে। সেখানে আমার মেয়ে আছে, তাকে আমি আজ চার বছর দেখিনি। দেখার অনুমতি পাইনি। সেই অনুমতি এতদিন পরে পাওয়া গেছে, তাই তাকে একবার দেখতে চাই, তারপর আপনি আমাকে পুলিশের হাতে দিতে পারেন, আপনিও আমার সঙ্গেই থাকুন, আমি পালাবো না—

ক্রমে সব জানা গেল, কি একটা কারণে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, স্বামী কঠোর প্রকৃতির, বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে দেন নি এতদিন। আজ সেই অনুমতি এসেছে।

সেখানে যেতে গেলে ভদ্র পোষাক চাই, মেয়ের জন্য চাই কিছু উপহার। আজ আবার তার জন্মদিন।

গল্পটা জমেছে বেশ। সবই বিচিত্র। তবু ভাবি, বেশ শেষ পর্যন্তই দেখা যাক।

গাড়ি থামল, দেওদার ষ্ট্রীটের সেই বাড়িটার সামনে। অন্ধকারে বাড়িটার একটি ছায়া বড় রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে মাত্র। গেট পার হয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। সামনে বাগান, আরো অন্ধকার।

বারান্দায় গিয়ে মেয়েটি পরিচিত ভঙ্গীতে কলিং বেলের বোতাম টিপল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে দরজা খুলল।

একটু ফাঁক করে কে একজন ভালো করে আমাদের দেখে নিলেন। ভদ্রলোকের মুখ অত্যন্ত কঠিন, চোখে পুরু কাচের চশমা; মোটা কালো ফ্রেম, গায়ের রঙ পরিষ্কার, মাথা ঝোড়া টাক। তিনি বললেন—একলা আসোনি দেখছি! ইনি কে?

—আমার বন্ধু! কিন্তু খুকী কোথায়? তাকে দেখেই আমরা চলে যাব!

—খুকী! খুকীকে দেখার জন্য ত' তৈরী হয়েই এসেছ দেখছি—আচ্ছা ওপরে চলে এসো!

ভদ্রলোককে অনুসরণ করে আমরা ওপরে উঠলাম। পুরানো ধরণের বাড়ি, সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, সব নিঝুম, নিস্তব্ধ!

আমরা ওপরে উঠে বারান্দায় দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন—যাও, খুকী ঐ ঘরে—

দরজাটা ভেজানো ছিল, মেয়েটি উৎসাহের আধিক্যে এক রকম ছুটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলেই থমকে দাঁড়াল—তার সারা দেহ কাঁপছে, আমি না ধরলে হয়ত পড়ে যেত—

আমিও দেখলাম, ঘরের মেঝেতে একটি এগারো-বারো বছরের মেয়ে শোয়ানো রয়েছে, তার সারা অঙ্গে একটি চাদর ঢাকা। মুখটি দেখা যাচ্ছে, ফর্সা, শাদা মুখ।

মেয়েটি পিছনের সেই ভদ্রলোককে বলল—ওঃ তাই! তুমি এত নিষ্ঠুর! এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল!

ভদ্রলোক বললেন—ভাবলাম, এইবার তুমি দেখে যেতে পারো। তাই খবর পাঠিয়ে ছিলাম!

মেয়েটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লোকটির মুখের পানে তাকিয়ে রইল। আমি এই অবস্থা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই।

মেয়েটিকে একরকম টেনে নামিয়ে নিয়ে এলাম।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। মেয়েটি তখনো গলায় বলল—এইবার চলুন! তালতলা থানা না কোথায় যেতে হবে বলে দিন ট্যাক্সিওলাকে!

আমার আর কথা বলার শক্তি নেই।

আমি ধীর গলায় বললাম—শাস্তি তুমি পেয়ে গেছ, এবার প্রয়োজন শান্তির।

মেয়েটি এতক্ষণে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বুকফাটা কান্নায় আকুল হয়ে সে ভেঙে পড়ল।

বৌদি

আমরা যখন ডাক্তারী পড়ি তখন কলকাতায় দুটি মাত্র মেডিক্যাল কলেজ ছিল। একটি পটলডাঙায় (কলেজ ষ্ট্রীটে) আর একটি উত্তর কলকাতায় খালের ধারে বেলগাছিয়ায়।

আমি বেলগাছিয়া কলেজেরই ছাত্র। তখন ঐ কলেজ এবং হাসপাতাল আজকের মত এত বড় হয় নি। এত বড় ছাত্রাবাসও তৈরী হয়নি, কলেজের সংলগ্ন বিরাট ঐ জমিতে। কাজেই আমাদের তখন থাকতে হয়েছে যারে কাছে কোনো প্রাইভেট মেসে।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডটা ছিল মেইন গেট দিয়ে ঢুকতেই ডানদিকের দালানটার একতলায়। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচে। দোতলায় থাকতেন সুপারিনটেনডেন্ট।

তখন আমার থার্ড ইয়ার। সবে মাত্র আনাটমি এবং ফিজিওলজি (শারীরতত্ত্ব) পাশ করেছি। রোগীর চিকিৎসা কিছুই জানিনা তখন। শুধু আমাদের ডিউটি দিতে হত কলেরা বা ডিসেন্ট্রিয়া ওয়ার্ডে, মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যালে; আর এমারজেন্সিতে।

সঙ্গে অবশ্য আমাদের এক বছরের সিনিয়র একজন ছাত্র থাকত। আর থাকতেন সিনিয়র একজন ডাক্তার, যাকে বলা হত, ও. ডি; অর্থাৎ অফিসার অন ডিউটি। আমরা বলতাম, মাষ্টার মশাই।

একদিন আমার ডে-ডিউটি পড়ল। বেলা ২টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। সেদিন বিকেলে হঠাৎ এমন একটি রোগী এল যার কথা এই বুড়ো বয়েসেও ভুলতে পারিনি আমি। সেই কথাই আজ বলব বলে কলম ধরেছি।

তখন বিকেল বেলা। সবে আমরা চা খেয়েছি। এমনি সময়ে আমাদের হাসপাতালের গেট দিয়ে একটা ঘোড়ায় টানা ছ্যাকরা গাড়ি ঢুকল। তখনকার দিনে আজকালকার মত ট্যাক্সি চড়া এত সুলভ ছিল না। ট্যাক্সির জন্য এখনার মত অত ছুটোছুটি হুটোপুটি বা কাড়াকাড়ি কিছুই করতে হত না কাউকে। শুধু ডান হাতখানা তুললেই চলন্ত ট্যাক্সি থেমে যেত। বলতে হত না, কোথায় যেতে হবে। এই থেকেই নিশ্চয় বোঝা যাবে যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ট্যাক্সি চড়ত কালে ভদ্রে। বিপদে পড়ে এবং সেই বিপদে ট্যাক্সি পেতে তাদের অসুবিধে হত না কখনও।

সেদিন ঐ ঘোড়ার গাড়ি যখন এসে আমাদের এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনে থামল, তখন সবে মাত্র চা খেয়ে আড্ডার যে মৌজটি বেশ জমে উঠেছিল আমাদের তা হঠাৎ যেন কেটে গেল, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আমরা সবাই হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেলাম। ক্যাল্‌ক্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম ঐ ঘোড়ায় টানা ছ্যাকরা গাড়িটার দিকে।

কারণ এমারজেন্সিতে কখন যে কি রকম রোগী আসবে তা কেউ বলতে পারে না আগে থেকে। হাড় ভাঙা, আগুনে পোড়া, বিষ খাওয়া, জলে বা অন্য কারণে অচৈতন্য হয়ে যাওয়া বা দাঁত হয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় রোগে যে কোনো সময়ে হাজির হতে পারে এই এমারজেন্সি ওয়ার্ডে।

আমাদের মত নতুন শিক্ষার্থীদের এই সব রোগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাই যদিও শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য, তবু সত্য কথা বলতে কি, এসব কঠিন কঠিন রোগী না এলেই আমরা খুশি হতাম তখন। কারণ এসব রোগী এলে তার ছাপা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হত আমাদের। তাই সর্বদা চাইতাম, যেন এসব কামেলা না পোয়াতে হয় নিজেদের ডিউটির সময়। নিজেদের ডিউটি যখন প্রায় শেষ হবে, এমনি সময় যদি এসব কেস আসত, তাহলেই সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। ভাবতাম যা ভোগবার তা ভুগুকগে ঐ পরের ব্যাচের ছাত্ররা। আমরা তো বেঁচে গেলাম।

সেদিন ঐ ঘোড়ার গাড়ির অনাহূত এই আগন্তুককে সাদরে ও চিকিৎসক সুলভ সহানুভূতিতে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা ওকে দেখেই আমাদের মনটা গেল বিঁচড়ে। মনে যা হল, তাকে সহজ ভাষায় বলা চলে—কি আপদ! ঘিল ব্যাটা শ্রাবণ সন্ধ্যার জমাটি এই আড্ডাটি মাটি করে।

গাড়ি থেকে সুদর্শন এক যুবক নামলেন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন—আপনাদের স্ট্রেচার আছে? নিয়ে আসুন তাহলে। শিগ্‌গির!

স্ট্রেচার দরকার হয় সেই সব রোগীর যারা বসে থাকতে পারে না। আঘাত বা রোগের প্রকোপে এত বেশী দুর্বল থাকে যে, তাদের উঠে বসতে দেওয়া হয় না কখনও। তাদেরই সাধারণতঃ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় অ্যাম্বুলেন্সে। কেউ কেউ অবশ্য নিজেদের গাড়ি বা ট্যাক্সি করেও এই সব রোগী শুইয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু দেখলাম এই ভদ্রলোক এসেছেন ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে। রোগিনীকে পাশে বসিয়ে। অথচ ভদ্রলোক চাইছেন স্ট্রেচার। কাজেই আমাদের মনে বেশ একটু কৌতুক বোধ হল। তবু আমরা সবাই গম্ভীর মুখেই বসে রইলাম। কিন্তু চোখে ঐ কৌতুক পরিস্ফুট হয়ে উঠল সবারই। আমাদের ও. ডি.র গোঁফের নিচে ঠোঁটটি একটু যেন বেঁকে গেল। চোখে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। আমাদের পাশে খালি একটা চেয়ার দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন —বসুন আপনি। বলুন কি হয়েছে?

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—রোগিনীকে আগে স্ট্রেচারে করে নাবিয়ে নিন গাড়ি থেকে। বরাবর থেকে আসছি আমরা। উনি আর বসে থাকতে পারছেন না। সারাটা পথ আমার কাঁধে মাথা রেখে এসেছেন।

ও. ডি. বললেন—হাসপাতালে যখন পৌঁছে গেছেন তখন আর ভয় কি? এবারে যা করবার তা আমরা করব। আপনি বসুন শান্ত হয়ে।

যে সব রোগী বসে থাকতে পারে অথচ পারে না হাঁটতে, তাদের আনা হয় চেয়ারে করে। যারা বসতেও পারে না তাদেরই শুধু স্ট্রেচার দেওয়া হয় হাসপাতালে।

তাই আমরা বেয়ারাকে বললাম, চেয়ারে করে রোগিনীকে নিয়ে আসতে।

ভদ্রলোক কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলেন। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন—আপনাদের স্ট্রেচার নেই? এ কি রকম হাসপাতাল?

ও. ডি. এবার একটু মৃদু হাস্য করলেন। বললেন—কোন রোগীকে কি ভাবে নিয়ে যেতে হয় তা এরা যত ভাল বোঝে অতটা খুব কম লোকই বুঝবে। কাজেই আপনি ব্যস্ত হবেন না। দেখুন না, কি ভাবে ওরা নিয়ে আসে রোগিনীকে। দরকার হলে স্ট্রেচারেই আনবে বৈকি। আপনি বরং বসুন একটু এই চেয়ারে। বলুন, কি হয়েছে? কি কষ্ট?

ভদ্রলোক কিন্তু বসলেন না। যেন একটু বিরক্ত হয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন বেয়ারাদের সঙ্গে সঙ্গে।

খানিক পরেই বেয়ারারা রোগিনীকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এল। ভদ্রলোক এলেন পিছু পিছু। দেখলাম রোগিনী যুবতী। গৌরবর্ণা। দীর্ঘাঙ্গী। স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী। মাথার চুল রুক্ষ। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। পরনে সরু কাল পাড়ের তাঁতের ধুতি। গায়ে সাদা ব্লাউজ। গলায় সরু সোনার চেন এবং হাতে একখানি করে সোনার সরু চুড়ি। চেহারা দেখেই সন্দেহ হল, রোগিনী বোধ হয় বিধবা।

বেয়ারারা রোগিনীর চেয়ার নামিয়ে রাখলে, ও. ডি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কষ্ট কি? কি হয়েছে?

রোগিনী কোন জবাব দিলেন না। যেমন মুখ বন্ধ করে ছিলেন, তেমনি বন্ধ করেই বসে রইলেন। শুধু ঘাড় ফিরিয়ে নাথোখানা একটু উঁচু করে ভুরু কুঁচকে তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক বললেন—এঁর দাঁতে দাঁতে আটকে গেছে আজ সাতদিন। মুখ খুলতেই পাচ্ছেন না। কাজেই না পারছেন খেতে, না পারছেন কথা বলতে।

ও. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন—এই সাতদিন উনি খান নি কিছু?

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে না। এক ফোঁটা জলও খাওয়াতে পারি নি আমরা এই সাতদিন, নানা ভাবে নানা চেষ্টা করে। অবশেষে নিয়ে এসেছি এখানে।

শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। সাতদিন নিরম্বু উপবাসে দেহে এত লাবণ্য থাকে এই প্রথম দেখে চোখ আমাদের কপালে উঠে গেল।

ও. ডি. বললেন, রোগিনীকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে শোয়াতে।

বেয়ারারা রোগিনীকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

ও. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ভদ্রলোককে—ইনি আপনার কে হন?

ভদ্রলোক বললেন—বৌদি।

একটু ইতস্তত: করে ও. ডি. বললেন—আপনার দাদা?

ভদ্রলোক বললেন—ওঁর মৃত্যু হয়েছে দু'বছর হল।

ও. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন—ওঁর সন্তান কটি?

ভদ্রলোক বললেন—ছেলেপুলে ওঁর হয় নি।

ও. ডি. বললেন—এরকম দাঁতে দাঁত আটকে যাওয়া এর আগে কখনও হয়েছিল নাকি?

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে না। উনি তো বরাবরই আছেন আমাদের বাড়িতে। এমন তো দেখিনি কখনও আগে।

ও. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন—যেদিন এটা হয় সেদিন কোনো ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছে কি বাড়িতে?

ভদ্রলোক বেশ একটু কষ্ট হয়েই বললেন—আজ্ঞে না। ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হবে কি করে? সবাই ওঁকে খুব ভালবাসে। উনিও খুবই ভালবাসেন আমাদের।

ও. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে শুরু হল এটা। খেতে খেতে? নাকি কথা বলতে বলতে?

ভদ্রলোক বললেন—আপিস থেকে সেদিন ফিরতে আমার একটু দেরী হয়েছিল। সাধারণত আমি সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই বাড়ি ফিরি। তারপর হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খাই। বৌদি নিজেই চা করে দেন আমাকে। চা খেয়ে বৌদিকে নিয়ে আমরা দুই ভাইবোন তাসটাস খেলি। গল্পগুজব করি। আড্ডা দিই। শেষে মা যখন খাবার জন্য তাড়া দেন তখন সবাই মিলে একসঙ্গে খাই। সেদিন আপিস থেকে বিকেলে বেরোবার মুখেই সাহেব একটা কাজ দিলেন। সেটা শেষ করে শিয়ালদহে এসে ট্রেনই ফেল করলাম। কাজেই বাড়ি ফিরতে আমার রাত দশটা বেজে গেল।

এসে শুনি সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। আর আমার ভাত ঢাকা রয়েছে আমার শোবার ঘরে। আমি তো হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েও পড়লাম তখনি। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই শুনি বৌদির দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। না পারছেন খেতে, না পারছেন কথা বলতে। ওখানকার ডাক্তার, বদ্যি সব দেখানো হল, কিন্তু কিছুতেই দাঁত ফাঁক করে কিছু খাওয়ানো গেল না ওঁকে। তাই আমি আজ নিয়ে এসেছি এখানে।

রোগিনীর এই কষ্টের কাহিনী ও. ডি. যেমন গভীর মুখে আগ্রহভরে শুনলেন, আমরাও তেমনি শুনলাম গভীর উৎকণ্ঠায়। কিছুতেই ভেবে পেলাম না কী কঠিন এ রোগ; আর এমন স্বাস্থ্যবতী এই যুবতী হঠাৎ এতে আক্রান্ত হলেনই বা কি করে।

ভদ্রলোককে বসতে বলে ও. ডি. উঠলেন। আমাদের বললেন—চল এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখি রোগিনীকে।

পাশের ঘরের টেবিলে রোগিনী তখন শুয়ে। আমরা ঘরে ঢুকতেই একবার তিনি তাঁর কাজল-কালো চোখের মণি দুটি ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে দেখে নিলেন। তারপর চোখের পাতা বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলেন।

মাষ্টার মশাই অর্থাৎ ও. ডি. রোগিনীর নাড়ি দেখলেন, চোখের পাতা টেনে নেত্রগোলক দুটির নড়া-চড়া লক্ষ্য করলেন, টর্চের আলো ফেলে চোখের ঐ কাজল-কালো মণি দুটির প্রতিক্রিয়া দেখে নিলেন। তারপর স্টেথোস্কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করলেন রোগিনীর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের অবস্থা। বাহুতে যন্ত্র বসিয়ে ব্লাডপ্রেসার দেখলেন। পেট টিপে লিভার কিডনি ও অন্ত্রের অবস্থা সব বুঝে নিলেন। সর্বশেষে পরীক্ষা করলেন রোগিনীর নার্ভতন্ত্রের অবস্থা। এই সব কাজ শেষ হলে তিনি চেষ্টা করলেন রোগিনীর মুখ খুলতে, চোয়ালে চাপ দিয়ে। এতক্ষণ রোগিনী মুখ বুজে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। চোয়ালে চাপ লাগতেই চোখ খুলে নাক দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন। শুরু করলেন হাত পা ছুঁড়তে। মাষ্টার মশাই রোগিনীর চোয়াল থেকে নিজের হাত তুলে নিলেন।

বললেন, ঐ ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এস তো!

আমাদের কাছে মাষ্টার মশাইর এ আদেশও মনে হল বিতান্ত অভিনব। কারণ রোগী অথবা রোগিনীকে যে ঘরে পরীক্ষা করা হয় সেখানে তার আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকদের ঢুকতে দেওয়া

হয় না। তাদের সঙ্গে যখন কথা বলার দরকার হয় তখন মাষ্টার মশাই যান বসবার ঘরে। সেখানে বসেই তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

এই কেসটাতেই দেখলাম সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। মাষ্টার মশাই হঠাৎ কেন জানিনা হুকুম দিলেন রোগিনীর আত্মীয়কে এই ঘরে ডেকে আনতে।

আমরা গিয়ে ভদ্রলোককে বললাম সে কথা। মুখখানা কাঁচুমাচু করে তিনি এলেন এই ঘরে।

বেসিনে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মাষ্টার মশাই বললেন—দেখুন এই রোগটা সত্যি ভারী কঠিন। এদেশে কায়দায় একটাও হয় কিনা তাও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। যে ভাবে ওঁর দাঁতে দাঁত আটকে গেছে তা খুলতে যে যন্ত্র ঐ দাঁতের ফাঁকে ঢোকাতে হয়, তা দিতে গেলে ওঁর অনেক দাঁত ভেঙে যাবে। কাজেই তা করা যাবে না। অন্য উপায় হল, দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে ছুরি চালিয়ে গালটি কেটে ও ফাঁক করে দাঁতের ফাঁকে ঐ যন্ত্র ঢুকিয়ে মুখটি খুলে দেওয়া। তার ফলে হবে এই যে, রোগিনীর গালে চিরকালের জন্য একটা বড় রকমের কাটা দাগ থেকে যাবে। এখন বলুন কি করব আমরা। এ অপারেশন করতে হলে অভিভাবক এবং রোগিনীর সম্মতি চাই। তাই আপনাকে ডেকেছি। রোগিনী যখন কথা বলতে পারল না তখন আপনাকেই একটা সই দিতে হবে অপারেশনের সম্মতি পত্রে। যদি না দেন তাহলে আমরা কিছুই করতে পারব না। এঁকে তাহলে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

একথা শুনে ভদ্রলোক কেমন যেন ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। একবার মাষ্টার মশাই আর একবার রোগিনীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখে ব্যাকুল হয়ে হাত জোড় করে বললেন—এই অপারেশন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই?

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ও. ডি. বললেন—না আর কোনো উপায় আছে কিনা তা জানা নেই আমাদের। এখন আপনি ভেবে দেখুন, এই সম্মতি পত্রে আপনি সই করবেন কিনা।

রোগিনী এবার হাত পা নেড়ে ভয়ানক আপত্তি শুরু করলেন। নাক দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন।

মাষ্টার মশাই বললেন—আমরা সবাই বাইরে যাচ্ছি। আপনি দেখুন রোগিনী রাজী হন কি না।

তারপর আমরা সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলাম। মাষ্টার মশাই একটা সিগারেট ধরালেন। কোনো কথা বললেন না।

খানিক পরে ভদ্রলোক এ ঘরে এসে বললেন—দিন আপনাদের কর্ম। আমি সই করে দিচ্ছি। কিন্তু রোগিনী দেখছি রাজী হচ্ছেন না কিছুতেই। তবু সব দায়িত্ব আমি নিজেই নিচ্ছি।

মাষ্টার মশাই হুকুম দিলেন—ছুরি কাঁচি ফরসেপ সব স্টেরিলাইজ কর। আর রেডি কর একটা মাউথ গ্যাগ।

রোগিনীর ঘরে গিয়ে আলমারী থেকে এই সব যন্ত্রপাতি একা ট্রেতে বার করে আমরা স্পিরিট দিয়ে পুড়িয়ে নিলাম। তখনই মাষ্টার মশাই এ ঘরে এসে হঠাৎ আমাদের লক্ষ্য করে বললেন—দেখ জার্মানী থেকে এই সব রোগের জন্য নতুন এক ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে। বলছে, এই ইন্‌জেকশন দিলে নাকি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ চোয়াল খুলে যায়। আমার কাছে একটি মাত্র ঐ ইন্‌জেকশন

আছে। ভাবছি এই কেসে ওটা একবার পরীক্ষা করে দেখি। যদি আর ঘণ্টার মধ্যে ঘাম খুলে যায়, তা হলে তো ভালই। আর যদি না খোলে তাহলে পায়টা কেটে স্যাপ দিয়ে খুলে দেব। কি বল তোমরা?

আমরা আর কি বলব? সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম।

ডাক্তার মশাই ট্রে থেকে সিরিঞ্জ নিয়ে নিজের ঐ ওষুধটি ভরে রোগিনীর কাছে গিয়ে বললেন—দেখুন, এই ওষুধ শুধু একটি মাত্রই আমার কাছে আছে। বাজারে কোথাও কিনতে পাওয়া যাবে না এটা। কারণ জার্মানী থেকে এ ওষুধ এখনও ছাড়া হয় নি বাজারে। এতে যদি কাজ হয়, আর ঘণ্টার মধ্যেই হবে। যদি না হয় তাহলে আপনার পায় কেটে অপারেশন করে দেব।

এই বলে তিনি রোগিনীর বাহুতে ঐ ইনজেকশন ফুঁড়ে দিলেন। ঘড়ি দেখে বললেন, এখন বেলা সাড়ে চারটা। ঠিক পাঁচটায় আমি অপারেশন করব।

এই বলে তিনি বাইরের ঘরে এসে বসলেন। আমরাও এলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। মিনিট পনের পরে তিনি বললেন—যাও দেখ এস রোগিনীর অবস্থা।

আমি ভেতরে গিয়ে দেখে এলাম অবস্থা সেই একই রকম আছে। রোগিনী চোখবুজে শুয়ে আছেন টেবিলের ওপর।

বললাম এসে ও. ডিকে সে কথা।

উনি বললেন—আরও দশমিনিট দেখব। তারপর তৈরী হব অপারেশানের জন্য।

সারাদিন সজীব রাখে

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

সর্বাঙ্গে পুলক ছড়িয়ে পড়ে হিমানী গ্লিসারিন সাবান ব্যবহারে, সজীবতা সঞ্চিত থাকে সারাদিন। পরিচ্ছন্নতায় ও মিষ্টি গন্ধে প্রাণ জুড়ানো তৃপ্তি পাওয়া যায়। রুক্ষতার প্রভাব থেকে এই সাবান দেহের সৌন্দর্যকে রক্ষা করে।

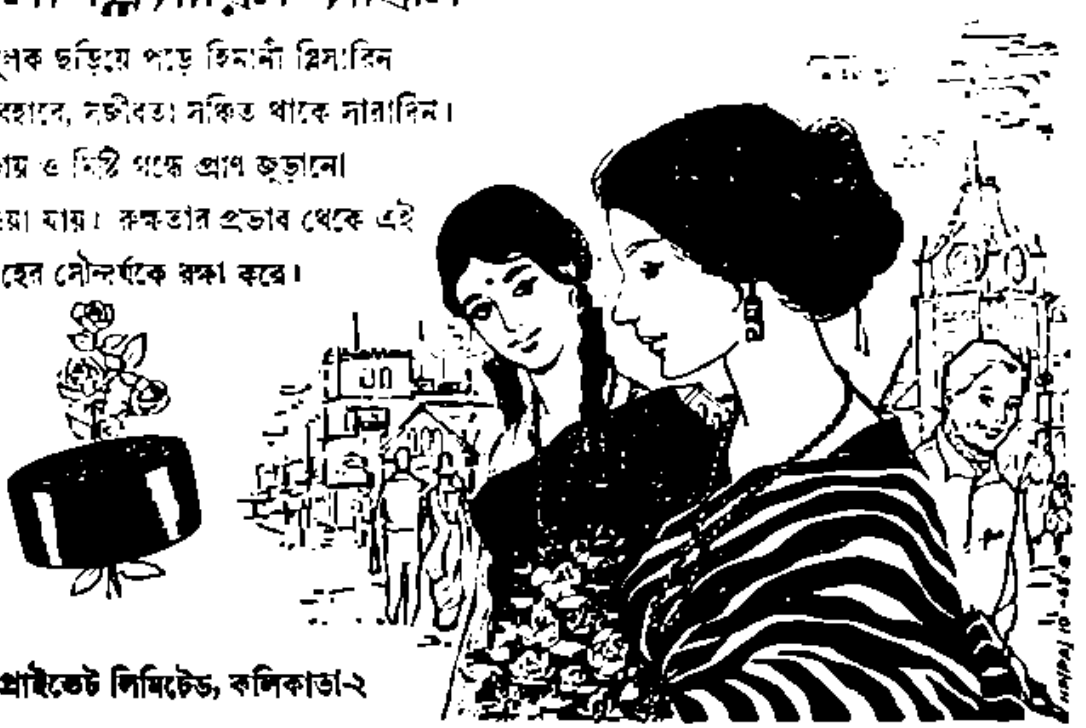

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২

আমাদের বসবার ঘর ও রোগী পরীক্ষা করার ঘরের মধ্যে ছিল একটি ভারী পার্টিশান। অর্থাৎ এ ঘরে কোনো কথা হলে ওঘরে তা শোনা যেত অনায়াসে। ওঘরে রোগী কোনো শব্দ করলে আমরাও তা শুনতে পেতাম এ ঘরে বসে।

দেখতে দেখতে দশমিনিট কেটে গেল। মাষ্টার মশাই বললেন—চল এবার অপারেশনের জন্য তৈরী হই।

এই বলে তিনি সার্টের আস্তিন গুটিয়ে কল খুলে সাবান দিয়ে হাত ধুতে শুরু করলেন।

এমনি সময়ে পাশের ঘর থেকে রোগিনীর আর্তকণ্ঠ শোনা গেল—জল।

আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম রোগিনীর মুখ খুলে গেছে। একটু জল খাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে একগ্লাস জল খাওয়ানো হল।

মাষ্টার মশাই বললেন—এখন এক গ্লাস জল খেয়েছেন। এইবারে একটা ডাব খান।

ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে একটা ডাব নিয়ে এলেন। রোগিনী নিমেষে তা খেয়ে নিলে চক্ চক্ করে।

মাষ্টার মশাই বললেন—এবার ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান। ৭ দিন উপবাসে আছেন, কাজেই আজকে আর শক্ত কিছু খেতে দেবেন না। সংবৎ দুধ এসবই দেবেন শুধু।

ভদ্রলোক খুশিতে কৃতজ্ঞতায় ও বিনয়ে গদ গদ হয়ে বললেন—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। জীবনে কোনো দিন আমরা ভুলব না আপনার এই অশেষ উপকারের কথা। এইবার দয়া করে যদি ঐ ওষুধের নামটা একটু লিখে দেন একটা কাগজে।

মাষ্টার মশাই বললেন—নাম লিখে আর কি হবে? ও তো আর কিনতে পাওয়া যাবে না কোনো দোকানে। শুধু একটাই আমার কাছে ছিল। তাও শেষ হয়ে গেল আজকে।

ভদ্রলোক একটু ভীত হয়ে বললেন—আবার যদি এরকম হয় তাহলে কি হবে?

মাষ্টার মশাই বললেন—তা হলে অপারেশনই করতে হবে তখন। ইতিমধ্যে ওষুধ যদি এসে যায় এদেশে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

খুশি হয়ে আমার বুক বেঁধে ভদ্রলোক তাঁর বৌদিকে নিয়ে বেরোলেন। একটা ট্যাক্সি হাসপাতালে রোগী নামিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক তাতেই উঠে বসলেন।

এবার আমরা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম মাষ্টার মশাইকে—ওষুধটার নাম কি তার?

মুচকি হেসে মাষ্টার মশাই বললেন—ওটার নাম অ্যাকোয়া সিটিসিডিয়ো অর্থাৎ সিজর ডিস্টিলড্ ওয়াটার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অমলা দাশ

সমরেশ মজুমদার

এ বাড়িতে আনন্দ হৈ হৈ লেগেই আছে। অবশ্য এটা যে খুব অবস্থাপন্ন তা নয়। বপোরের বাড়ি ছিল—নিজেদের বাড়ি। আর ছিল কিছু জমি। বেশ দিন কেটে যেত। পার্টিশানের পর সদানন্দবাবু ছেলেমেয়ে নিয়ে বনগাঁয়ে চলে আসেন সর্বস্ব খুইয়ে। শুধু বাড়ি-বদলটা করতে পেরেছিলেন এইটেই যা সুবিধে হয়েছে। তাও তখনকার বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়। যাক তবু তো পেয়েছেন কিছু।

তারপর বেশ ক' বছর কেটে গেছে। সদানন্দবাবু ভালো করে গোছাতে পারেন নি কিছুই। গোছাবার যোগ্যতাও ওঁর নেই। ঢিলেঢালা সহজ সরল আনন্দপ্রিয় মানুষ। এইসব মানুষদের দ্বারা সংসারে বিশেষ কিছু কাজ হয় না। তবু তিনি যা হোক একটা কাজ যোগাড় করে নিলেন—মুহুরিগিরি। হাতের লেখাটি ভালো। কাজেই উকিলের মুনসরে পড়লেন।

এ বাজারে একটা মুহুরির আয় কতই বা হতে পারে। মফস্বলের উকিলের আয় অনুমান করলেই তা বোঝা যাবে। কিন্তু তবু তিনি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখালেন—বিশেষ করে শেখালেন গান। প্রাইভেট টিউটার জোটে না, পয়সা দিয়ে গানের মাস্টার রাখার ক্ষমতা নেই। তখন—

মিত্রা একদিন একটি ছেলেকে ঘরে নিয়ে এল। বললে, বাবা, অরুণদা কী অদ্ভুত গাইতে পারে। কাল রবীন্দ্র জন্মোৎসবে এমন একখানা গাইলে—আঃ, তুমি যদি শুনতে! বলেই অরুণের হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, ঐ গানটা বাবাকে একবার শুনিয়ে দাওনা।

সদানন্দ গান না শুনেই খুশি হলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ডেমি-ওকালতনামা ফেলে রেখে গানের আসরে এসে বসলেন। ছোটো মেয়েকে ডেকে বললেন, যা তো মিলি, তোর মাকে চা করতে বল। চা নিয়ে তোর মাও যেন এখানে আসে।

অরুণ গান শোনাতে আরম্ভ করল। সে গান একদিনেই শেষ হয়ে গেল না। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতে লাগল গানের আসর।

কিন্তু শুধু হারমোনিয়মে সে গানের আসর জমে না। একজন তবলচি না হলেই নয়। মিত্রার মুখ শুকিয়ে গেল—তবলচি পাওয়া যাবে কোথায়?

অরুণ বললে, ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমারই এক বন্ধু আছে—অলক, তাকেই নিয়ে আসব।

অলকও আসতে দেরি করল না। একটি গায়ক, একটি গায়িকা, একটি তবলচি এবং জন-চারেক মুগ্ধ শ্রোতা, এই নিয়ে গানের আসর রোজ জমে উঠল। শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে মিত্রার মাকে রান্নাঘরের তাগিদে অনুপস্থিত থাকতে হয়, সদানন্দকেও নিতান্ত অনিচ্ছায় আজি লিখতে

বলতে হয়, কিন্তু তবু গানের জোয়ারে ভাটা পড়ে না। সবচেয়ে উৎসাহ মোটনের। দিদি গান থামালেই 'এনকোর'—'এনকোর' করে ওঠে।

মেজো মেয়ে চিত্রাও চুপ করে বসে ছিল না। সে গান-বাজনার শিল্পী নয়। সে আছে পড়াশোনা নিয়ে। কোনো বার পাস করে কোনো বার করে না। সম্প্রতি তার ক্লাসফ্রেণ্ড অঞ্জলির দাদা বাংলায় এম. এ পাস করেছে। সে তো একদিন এসে সকলের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বললে, মাতৃভাষা বলে আমরা বাংলার চর্চা করি না। তাই দেখতে পাওয়া যায় ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি ফেল করে বাংলাতেই। এ আমাদের জাতীয় লজ্জা!

চিত্রা বরাবর বাংলাতে উইক, গতবার বাংলাতেই ফেল করেছিল। ও কিন্তু সুজিতের কথায় লজ্জা পেল না, বরঞ্চ একটু ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠল, থাক্ থাক্, অত বক্তৃতা দিতে হবে না। দরকারের সময়ে তো একটু সাহায্য পাবার উপায় নেই। একটা essay লিখেছি, দেখে দেবেন তো।

সুজিত পুলকিত হয়ে বললে, কই নিয়ে এসো, এক্ষুণি দেখে দিচ্ছি।

চিত্রার মা সুজিতকে যত্ন করে চা-টা খাইয়ে যাবার সময়ে ফিস ফিস করে বললেন, তুমি তো বাবা ঘরের ছেলে। তোমায় আর কী বলব। যখন একটু সুবিধে পাবে চিত্রাকে বাংলাটা একটু দেখিয়ে দিও। বুঝতেই তো পারছ, টাকা ঢাললে ঢের টিউটার পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার মতো আন্তরিকতা পাব কোথায়?

সুজিত সে আদেশ শিরোধার্য করে নিয়মিত আসতে শুরু করেছে।

মেজো মেয়েটির বয়েস চোদ্দ-পনেরো হবে। গান-বাজনা বা পড়াশোনা কোনোটার প্রতি আভিনিবেশ নেই। তার একটি মাত্র 'হবি' আছে—সিনেমা পত্রিকা পড়া। এ বাড়িতে সিনেমা পত্রিকা আসে না। তার কারণ, এ নয় যে, বাপ মা পছন্দ করেন না। আসল কারণ কাগজ রাখবার মতো বাড়তি পয়সা নেই। এমনিতেই তো এত বড় সংসার চলে কী করে—

যাক সে কথা। শিপ্রা কিন্তু সিনেমা পত্রিকা ইদানীং যোগাড় করতে পারছে। তাকে অবশ্য যোগাড় করতে হয় না, যোগাড় করে দিয়ে যায় সামনের বাড়ির পল্টুদা। শুধু দিয়েই যায় না, নিরিবিলি পেলে শিপ্রার সঙ্গে সিনেমার ছবি নিয়ে গভীর গবেষণা করে। বলা বাহুল্য, শিপ্রার তাতে উৎসাহের অভাব দেখা যায় না। শুধু মোটন মাঝে মাঝে ওদের গোপন আলাপের মধ্যে ঝড়ের মতো এসে পড়ে। দিদির হাত থেকে সিনেমার বইখানা কেড়ে নিয়ে কথা নেই বার্তা নেই কোনো নায়িকার মুখের ওপর এক কালি গোঁফ এঁকে দিয়ে পালায়।

দিন বেশ কেটে যায়। সকাল-সন্ধ্যে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈ হাসি গান বাজনা। ছুটির দিনে তো কথাই নেই। বাড়ির সামনে দিয়ে যে যাবে তাকেই একবার বাড়িটার দিকে তাকাতে হবে। দরজায় পর্দা—আর তারই ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে তরুণীকণ্ঠের কাকলি—তরুণকণ্ঠের উচ্চহাসি।

কিন্তু মাসের একটা সময়ে দেখা যায় সন্তানবাবু আর তাঁর স্ত্রী যেন কিছু চিন্তিত। মা বাবাকে চিন্তিত দেখলে ছেলেমেয়েদেরও মুড নষ্ট হয়ে যায়। তারা জানে এই চিন্তার কারণ। আর এও জানে এ চিন্তা মাসে প্রতিবারই একবার করে হয়, তারপর সিওন যেদিন এসে 'মণি-অর্ডার' বলে হাঁক দিয়ে দরজার কড়া নাড়ে, সেদিনই অন্তত সে মাসের জন্যে চিন্তার অবসান হয়।

হ্যাঁ, এই মণি-অর্ডারটিই এ বাড়ির যত হাসিখুশির, যত আনন্দ-আহ্লাদের মূল উৎস। এই টাকাটিরই ওপর এ বাড়ির সব কিছু নির্ভর করে আছে। সে খবর এ বাড়ির ছোটো ছেলেটি পর্যন্ত জানে। এই মণি-অর্ডারটি এসে পৌঁছলেই আবার বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বয়। সন্তানন্দবাবু ওকালতনামা ফেলে রেখে স্নানের আসরে এসে বসেন, সন্তানন্দবাবুর স্ত্রী হাসি মুখে অনে অনে চা বিতরণ করেন।

যিনি টাকা পাঠান তাঁর সঙ্গে কিন্তু এ পরিবারের যোগাযোগ কম। বছরে দু'তিনবার মাত্র আসেন। সে সময়ে এ বাড়িতে আবার উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

এ সংসারে এমন এক-একটি মানুষ আছে যারা একান্ত সাধারণ হয়েও সাধারণের ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটুকু আছে বলেই আজও মানুষ মানুষের ওপর আকর্ষণ অনুভব করে। সব মানুষ এক রকম হলে মানুষের সব চেয়ে বড়ো চেষ্টা হত মানুষের কাছ থেকে তফাতে থাকা।

বগলাবাবু এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু তাঁর এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র সন্তানন্দবাবুর পরিবার ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।

বগলাবাবুর বাড়ি যশোর জেলায়। সেখানেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। এবং সেখানেই তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। অনেক ঝাঁঝাবিপত্তি, অনেক ঝড়ঝাপটা, অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব গিয়েছে কিন্তু দেশ ছেড়ে তিনি চলে আসেন নি—কেউ তাঁকে সেখান থেকে নড়াতে পারেনি। কিন্তু কিছুকাল হল চলে এসেছেন গঙ্গাতীরে ত্রিবেণীতে।

বগলাবাবু একা মানুষ। বিয়ে-থাওয়া করেন নি। সংসারে তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। এক স্টেটে ম্যানেজারি কাজ করতেন। পয়সা করেছিলেন যথেষ্ট। এঁরই বাড়ির কাছে থাকতেন সন্তানন্দবাবুর বাবা। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। বন্ধু আজও পথে-ঘাটে, বাড়ির রকে, লোকাল ট্রেণে, সিনেমার লাইনে প্রচুর মেলে, কিন্তু যোলকরি সেকালের মানুষদের সঙ্গে সেকালের বন্ধুরাও চলে গিয়েছে। বন্ধুত্ব এমনি হয় না—বন্ধুত্ব কিছু ত্যাগ—ইংরিজিতে যাকে বলে sacrifice, দাবি করে।

সন্তানন্দবাবুর বাবার অবস্থা ভালো ছিল না, সেই দুদিনে বগলাবাবুই ছিলেন তাঁর একমাত্র ভরসা। তারপর সন্তানন্দবাবুর বাবা মারা গেলেন—তখন সন্তানন্দবাবু ঘোর সংসারী। বগলাবাবুর অনুগ্রহে এই স্টেটে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন। দিন কাটছিল একরকমভাবে। এমনি সময়ে হল পার্টিশান। বগলাবাবু অবস্থা ভালো বুঝলেন না। তিনি সন্তানন্দবাবুদের পাঠিয়ে দিলেন বনগাঁয়ে। বাড়ি এস্টেটের প্রভৃতি কাজ তিনিই করে দিয়েছিলেন। বনগাঁয়ে আসার পরও তিনি মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠান। সেই টাকাটাই এ পরিবারের ভরসা।

বুড়ো হয়ে গেছেন বগলাবাবু, তাই নিয়মিত তিনি বনগাঁয়ে আসতে পারেন না। তবু আসেন বছরে দু'তিনবার। পুজোর সময় তিনি প্রতিবার আসবেনই। চিঠি দিয়ে আসেন। বাড়ির সকলে সেই দিনটির জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। ঠিক পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যেবেলায় রিক্সা এসে দাঁড়ায়। অমনি ছেলে-মেয়েরা 'দাদু এসেছে' 'দাদু এসেছে' বলে ছুটে যায়। এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি আর এক হাতে মস্ত একটা পুঁটুলি নিয়ে বগলাবাবু রিক্সা থেকে নামেন। সন্তানন্দবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পোটলাটা ধরেন, মিষ্টির হাঁড়িটা নেয় বাড়তিদের কেউ। বগলাবাবু স্মিতমুখে সকলের প্রণাম নিতে নিতে ঘরে ঢোকেন।

মিষ্টির হাঁড়ি দেখে কার না আনন্দ হয়। কিন্তু পুজোর সময়ে ঐ পোটলাটি আরও আকর্ষণের। সকলেই ঐ পোটলাটির দিকে তাকিয়ে আছে। বগলাবাবু নিজে হাতে আস্তে আস্তে পোটলা খোলেন। পুজোর কাপড় জামা। মিত্রা চিত্রার শাড়ি, শিপ্রা মিলির ফ্রক, ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, সদানন্দবাবুর ধুতি, আর এই বৌমার শাড়ি। এক মুহূর্তে সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এত দিন পর আজই যেন পুজো পুজো মনে হচ্ছে। পাড়ার সকলের পুজোর কাপড় কেনা হয়ে গেছে শুধু এদেরই বাকি ছিল। কাল সকাল থেকে এদের কাপড় দেখানোর পালা।

বগলাবাবু পুজোর চারটে দিন থাকেন, একাদশীর দিন ফেরেন। তবু তো পুজোর সময় বলে চারটে দিন থাকেন, কিন্তু অন্য সময়ে দু'দিনের বেশি নয়। সকলেই আরও কিছুদিন থাকতে বলে, কিন্তু বগলাবাবুর মতের আর পরিবর্তন হয় না। সকলেই জানে, বগলাবাবু অত্যন্ত একরোখা আর জেদী মানুষ। একবার যা ঠিক করবেন আর তার নড়চড় হবে না।

কথাটা যে মিথ্যে তা নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুতেই যে বেশি দিন থাকতে পারেন না তার অন্য কারণ আছে। প্রথমত বাড়িতে জায়গা খুব কম। দু'খানি মাত্র ঘর। রাত্রে শোবার সময়ে একই ঘরে ঠেসাঠেসি। তাঁর চিরদিন একা একা শোওয়া অভ্যেস। হৈ-চৈ গণ্ডগোল, ভিড় এসব সহ্য হয় না। যদিও এরা অতি মাত্রায় তাঁর যত্ন করে তবু রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, দিনেও বিশ্রাম হয় না। কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল। এ বাড়িতে রোজ ঐ যে একদল বাইরের ছেলেরা এসে গান-বাজনা হৈ-হল্লা করে, এটা তিনি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। অথচ মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে পারতেন না। বলতে পারতেন না সে কি ভদ্রতায় বাধত? তা নয়। সকলেই জানেন, বৃদ্ধেরা অনেক সময়েই এসব বিষয়ে চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন না। তাঁদের চোখে যেটা দৃষ্টিকটু ঠেকে সেইটেই প্রকাশ করে ফেলেন। বগলাবাবুও কতদিন ভেবেছেন ওদের আসতে বারণ করে দেবেন। কিন্তু বলতে পারেন নি। তাঁর যেন কেমন মনে হয়েছে সেকথা বলার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছে সত্যিই কি তাঁর এ বাড়িতে কোনো অধিকার নেই?

একদিন তিনি স্থির করলেন এ বিষয়ে সদানন্দকে সাবধান করে দেবেন। স্থির করলেন বটে কিন্তু কিছুতেই আর সদানন্দকে ডেকে এই অপ্রিয় কথাটা বলতে পারেন না। তাঁর যেন কেবলই মনে হয়, এটা তাঁর অনধিকারচর্চা। এ বাড়ির তিনি কেউ নন।

তবু তিনি অনেক চেষ্টা করে সদানন্দকে ব্যাপারটা বললেন। যে ভাবে বলতে চেয়েছিলেন, যে সব সম্ভাব্য বিপদের ওপর তিনি জোর দেবেন ভেবেছিলেন, তার কিছুই বলতে পারলেন না। আমতা-আমতা করে শুধু কোনো রকমে বললেন, ছেলেগুলো যে রোজ আসে, তা মেয়েরা—

কথা লুফে নিয়ে উৎসাহিত হয়ে সদানন্দ বলে উঠলেন—খুব পছন্দ করে। আর না করবেই বা কেন। অমন সব ছেলে—হীরের টুকরো যেন।

বগলাবাবুর মুখ থেকে আর কথা সরল না। তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। মনে মনে ঘা খেলেন খুব। ভাবলেন, দূর ছাই! পরের ব্যাপারে মাথা না গলাতে গেলেই হত।

সেবারে তিনি একটু বিষণ্ণভাবে ত্রিবেণী ফিরে গেলেন। কিন্তু এর পর যখন এলেন সে সময়ে একদিন ব্যাপারটা ঘটল।

কিসের একটা ছুটি ছিল দিন-তিনেকের। বগলাবাবু এলেন বনগাঁ। ছুটির সঙ্গে তাঁর নিজের

কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ছুটির দিন হলে এই একটা সুবিধে যে সকলকে পাওয়া যায়। সন্তানরাও কোর্টে যায় না, ছেলেমেয়েরাও কেউ স্কুল কলেজে যায় না।

সকালে এলেন। সারা দিন বেশ ভালোই কাটল। বিকেলে বাইরের ঘরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন। একটু পরেই প্রথমে এল অরুণ, তারপর অলক—তবলচি। আর ঠিক সন্ধ্যের মুখে এল সুজিত খানকতক বই হাতে করে।

ঘরের ভেতরে হাসি-উচ্ছ্বাসের বান ডাকল। একটু পরেই হারমোনিয়মের আওয়াজ আর সেই সঙ্গে তবলার চাঁটি। বগলাবাবু মনে মনে গর্জাতে লাগলেন। সকাল থেকে এদের টিকি দেখতে পান নি। ভেবেছিলেন, বোধ হয় আপদ সব দূর হয়েছে। এখন সেই সব রোমিওদের সান্ধ্য অভিসারে দেখে চটে উঠলেন। একবার ভাবলেন, এখনি গিয়ে ছোঁড়াগুলোকে গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু পারলেন না। সেই এক দুর্বলতা—এ বাড়িতে তাঁর সে অধিকার কী আছে? সন্তানরাও ওপর চটলেন, বৌমার ওপরও। যে বাড়িতে বাপ-মা এই সব আড্ডার প্রশ্রয় দেয় সে বাড়ির কোনো দিন ভালো হয় না।

এমনি সময়ে ছোট্ট মেয়ে শিপ্রা এসে বললে, দাদু, অরুণদা গাইবে শুনবে তো ভেতরে এসো।

তখনকার মতন একটা বহুনি দিতে গিয়েও বগলাবাবু নিজেকে সামলে নিলেন।

শিপ্রা অধৈর্য হয়ে বললে, তুমি আসবে না তো দাদু?

বগলাবাবুর স্বর ক্রোধে রুদ্ধ। তিনি কোনো রকমে মাথা নেড়ে জানালেন, না।

তিনি গেলেন না, কিন্তু গান-বাজনা দিব্যি চলতে লাগল। বগলাবাবুর হঠাৎ যেন কেমন মনে হল, এটা তাঁকে অপমান করা। তিনি গেলেন না বলেই ছেলেমেয়েগুলো যেন আজ দ্বিগুণ উৎসাহে হুল্লোড় আরম্ভ করেছে। বাইরে যে একজন প্রবীণ গুরুজন বসে আছেন সে জ্ঞানটুকু পর্যন্ত যেন ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন রাত সাড়ে নটার সময়। মেয়েরা বার বার হাত নেড়ে বলতে লাগল, আবার পরশুদিন রবিবার। সেদিন এসো। নিশ্চয় এসো।

বগলাবাবু বুঝলেন মেয়েগুলোর অধঃপাতে যেতে আর কিছুমাত্র যদি বাকি থাকে তাহলে তাঁর কর্তব্য এই মেলামেশা এখনই বন্ধ করা। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সেই রাত্তিরেই সন্তানদ্বয়কে ডেকে বললেন, ঐ ছেলেরা এইভাবে এসে মেয়েদের সঙ্গে মেশে এ আমি পছন্দ করি না।

সন্তানদ্বয় যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ওদের আপনি দেখতে পারেন না কেন তা তো বুঝতে পারিনা। ওরা তো হীরের টুকরো ছেলে।

—হীরের টুকরো! বগলাবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তুমি বোকা তাই ওদের চিনতে পার না। আমি বলছি তুমি কাল থেকে ওদের এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দাও।

সন্তানদ্বয় অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে কী ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বিনাদোষে ওদের কী করে এমন অপমান করতে পারি! তাহলে মেয়েরাও যে আমাকে আর কোনো দিন শ্রদ্ধা করবে না।

বগলাবাবু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, যা খুশি করো। তোমার সংসার—আমার সেখানে নাক গলাতে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। এই বলে তিনি আবার সেই অন্ধকার ঘরে গিয়ে বসলেন।

সেবার তিনি রবিবার পর্যন্ত থাকলেন না। পরের দিনই চলে গেলেন কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেই।

বাড়ি ফিরে এলেন বগলাবাবু। কিন্তু এ যেন আর এক মানুষ। গম্ভীর—ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ। রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারেন না। কেবলই মনে হয় সদানন্দ তাকে অপমান করেছে। আশ্চর্য, এতকাল ধরে এদের তিনি দেখে আসছেন, ঐ সদানন্দকে তিনি বুকেপিঠে করে সন্তানসুখ অনুভব করেছেন—কত বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করেছেন—শুধু কর্তব্যবোধে নয়, অন্তরের টানে। অথচ এতকাল পর অতি সামান্য বিষয় নিয়ে মনের ভিতরে তাঁর এ কী যন্ত্রণা। বহুকাল তিনি একা একাই সংসারে কাটিয়ে এসেছেন—কর্মক্ষেত্রে রাগ প্রকাশ করতে হয়তো হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু অভিমান? জীবনে অভিমান করার সুযোগ কখনো পাননি। তাই কি এতকাল পর এই প্রথম অভিমান দিনে দিনে রাগে দুঃখে বেদনায় একাকার হয়ে এমন ভয়ানক হয়ে দাঁড়ালো। বগলাবাবু ভাবলেন, সদানন্দ অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞের শাস্তি দিতে হবে। স্থির করলেন, সামনের মাসে তিনি টাকা পাঠাবেন না।

তাই হল। পরের মাসের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল, বগলাবাবু টাকা পাঠালেন না। তারপর থেকে একটা একটা করে দিন কেটেছে বগলাবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকপিওনের পথ চেয়ে থেকেছেন। তিনি রোজই আশা করছেন—আজ বুঝি সদানন্দর কাছ থেকে চিঠি এল—দুশ্চিন্তা-ব্যাকুল চিঠি—টাকা পাঠান!

With the Compliments of

the makers of

BRITANNIA BISCUITS

●

THE BRITANNIA BISCUIT COMPANY LTD.

BOMBAY ● CALCUTTA ● DELHI

NOW INTERNATIONALLY FAMOUS

কিন্তু একটা একটা করে পনেরো দিন কেটে গেল বর্ধমান থেকে কোন চিঠি এল না। তখন বঙ্গলাবাবু মনে করলেন, সদানন্দ বোধহয় নিজেই ছুটে আসবে। কিন্তু আরও পনেরো দিনের মধ্যে তেমন কাউকে আসতে দেখা গেল না। বঙ্গলাবাবু মনে মনে ফুঁসে উঠলেন, বড়ো অহংকার! এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করলেন, এ মাসেও টাকা পাঠাবেন না। দেখা যাক সদানন্দর অহংকার ভাঙে কিনা।

তিনমাস পর বঙ্গলাবাবু নিজেই আর থাকতে পারলেন না। একদিন হঠাৎ চলে এলেন বর্ধমান।

সন্ধ্যের সময়ে রিক্সা থেকে নামলেন। এ তিন মাসে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে।

না, ভেতরে কোনো গান-বাজনা বা হাসি-হল্লা শোনা যাচ্ছে না। জানলা দরজার পর্দাগুলো সব বিবর্ণ। বঙ্গলাবাবুর কেমন যেন ভয় হল। তিনি অতি সংকোচে দরজায় কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে দিলেন সদানন্দবাবুর স্ত্রী। বঙ্গলাবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করলেন।

একে একে মিতা, চিত্রা, শিপ্রা সকলেই এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো। বঙ্গলাবাবু ত্রস্ত চোখে তাকাচ্ছেন। এই তিন মাসে সমস্ত সংসারের ওপর কী ভয়াবহ দারিদ্র্যের করাল ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু আপাতত তিনি সে সব কিছু দেখতে চাইছেন না। তিনি যেন সবাইকে খুঁজছেন। সবাই আছে তো? এরা সবাই এতো বিমর্ষ কেন?

না, দু'জনকে শুধু দেখা যাচ্ছে না। একজন সদানন্দ, আর একজন নোটন—শিপ্রার ঠিক পরের ভাইটি।

বঙ্গলাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের দেখছি না যে?

এ কথার উত্তর চট্ করে কেউ দিতে পারল না। সদানন্দর স্ত্রী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েরা রইল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

শিপ্রাই বললে, নোটন একটা কাজে লেগেছে। মিলিরা কেউ কাজ পেলে না। শেষে নোটনকেই লাগানো হয়েছে একটা কাপড়ের দোকানে। বাজারের কাছে হলে লজ্জা পাবে তাই ঘুরে স্টেশনের কাছে একটা দোকানে—

বলতে বলতে শিপ্রার গলাটাও ভারী হয়ে এল।—আর বাবা—সন্ধ্যে থেকে সেখানে গিয়ে রাস্তার ধারে বসে থাকে। ছুটি হলে সঙ্গে করে নিয়ে আসে—ছেলেমানুষ তো!

শুনতে শুনতে বঙ্গলাবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুখ থেকে কোনো কথা সরল না। ঘরের মধ্যে অটুট স্তব্ধতা। সেই সঙ্গে ক্রমশ সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। দশা উড়ছে। দূরে কোন্ বাড়ি থেকে হারমোনিয়মের সুর ভেসে আসছে। কোনো মেয়ে বোধহয় সংগীতচর্চা করছে।

বঙ্গলাবাবু হঠাৎ গলার স্বর পরিষ্কার করে বললেন, বৌমা, বড্ড অন্ধকার। আলোটা জ্বালো।

বয়সটাই সব নয়...

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঃ

দি ইন্ডিয়ান স্টিলস অ্যান্ড ওয়্যার কোম্পানি লিমিটেড ঃ ১৮৬৪ সালে এক সামান্য তার উৎপাদন দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ এই কোম্পানি ভারতের অন্যতম বৃহৎ তার ও তারজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক। ১৯৬৭ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান স্টিলস অ্যান্ড ওয়্যার কোম্পানি লিমিটেড করা হয়েছে। এই কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করে নতুন কারখানটি আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

দি ইন্ডিয়ান স্টিলস্ ট্রাকটার্স অ্যান্ড ওয়্যার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড ঃ ১৯৬৪ সালে এই কোম্পানির পত্তন হয়। ইহার কারখানাটি হুগলি জেলায় অবস্থিত। ইহার কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে ও বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট ধরনের ট্রাকটার ট্রেলার প্রস্তুত করা হয়।

বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া ঃ ১৯৩৭ সালে ইহার পত্তন হয়। ইহার কারখানায় বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত ও লোহার ঢালাই, ফোরজিং, ইস্পাত ও লোহার কাঠামো, ইস্পাত ও লোহার পাত,

এক প্রদীপে দুই সম্রাজ্ঞী

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করারই সিদ্ধান্ত করে ফেলেন সম্রাট। একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত। আগেরবার মত বদলালেও, এবার যা মনস্থ করেছেন তা' আর নড়চড় হবার নয়—নিজের মনকে তেমনি ভাবেই সম্রাট এবার তৈরী করে চলেছেন।

উত্তরাধিকারী তাঁর চাই-ই। তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর সিংহাসন—তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না, সে কি হতে পারে কখনো?

সম্রাট তাঁর নিজের অক্ষমতার জন্যেই উত্তরাধিকারীহীন—সম্রাজ্ঞীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ভগ্নী কারোলিনের পরিচারিকা কুমারী এলেঅনর দেনুয়েল প্রথমে এবং তারপরে রাতবাবিগ্রস্থ পঙ্গু পোলিশ কাউন্টের পত্নী মারিয়া ওয়ালেস্কা তাঁকে পর পর দু'টি পুত্র সন্তান উপহার দিয়ে তা' প্রমাণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ দু'টি সন্তানের একজনও যে আইনত সম্রাটের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। কারণ তারা সম্রাটের বৈধ সন্তান নয়—তাঁর বিবাহিতা পত্নীর সন্তান নয়। বৈধ উত্তরাধিকারী পাবার জন্যে সম্রাটকে আবার নতুন করে বিয়ে করতে হবে। সে জন্যেই এবার স্ত্রীকে ত্যাগ করার পাকা সিদ্ধান্ত।

তিয়েনা সফর শেষ করে সম্রাট ফিরে এলেন রাজধানী প্যারিসে।

তখনো তাঁর মনের কথা কেউ কিছু জানে না। ১৮০৯-এর এক নভেম্বর সন্ধ্যার শান্ত মুহূর্তে তিনি সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা।

এমনি এক বিয়োগান্ত নাটকের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না জোসেফাইন। তাই সঙ্গে সঙ্গেই এক করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে গেল।

নির্বাক নিস্পন্দ জোসেফাইন। দু'চোখ বেয়ে বিগলিত ধারায় তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আর তা' দেখে অদ্ভুত এক মন্তব্য করে বসলেন সম্রাট। কিছু না ভেবেই বোধহয় হঠাৎ বলে ফেলেন, 'জানো, এই বিচ্ছেদ আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করবে।'

জোসেফাইন আরো যেন ভেঙে পড়লেন সম্রাটের এই কথায়। আর দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছরের প্রণয়িনীর সেই অবস্থায় নেপোলিয়ানের কঠোর স্বরও কীভাবে যেন কোমল হয়ে গেল।

আইন মাফিক ডিভোর্স সম্পন্ন হলো বটে এবং পৃথক প্রাসাদেও জোসেফাইনকে চলে যেতে হলো বটে, কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেন নতুন করে আবার জোসেফাইনের প্রেমে পড়লেন!

নেপোলিয়ানের এ প্রেম বোধহয় তাঁর অতীত-স্মৃতি সঞ্জাত করুণা-মিশ্রিত প্রেম। জোসেফাইনের

প্রত্যেকটি বিশ্বাসঘাতকতার কথাই তাঁর জানা। তা' সত্ত্বেও সম্রাজ্ঞীর যুগ্ম সম্মান তিনি দিয়েছিলেন তাঁকে। সেতো তাঁর প্রতি তাঁর গভীর প্রেমেরই স্বীকৃতি!

ভিভোর্সের পরেও এই যে আকর্ষণ বোধ এও সেই প্রেমেরই পরিচয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবু জোসেফাইনের প্রাসাদে সম্রাট নেপোলিয়ানের আনাগোনা মাসের পর মাস ধরে চলেছে। শুধু কি তাই? প্রাক্তন সম্রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কত কি করে চলেছেন নেপোলিয়ান। অহরহ মণিমুক্তো ইত্যাদি মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে, মিষ্টি মিষ্টি প্রেমপত্র লিখে জোসেফাইনকে খুশী রাখবার অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন সম্রাট। তিনি বলতে চাইছেন, বিপাকে পড়েই তাঁকে আবার বিয়ে করতে হবে, তা' নইলে জোসেফাইনই ছিলেন তাঁর একমাত্র জীবনসঙ্গিনী!

কিন্তু এসবই কি কথার কথা নয়?

ওয়াগ্রামের পিয়ে একটি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ান। পোলিশ কাউন্টেস মারিয়া ওয়ালেস্কা সেই রত্ন। সে রত্ন তখন তাঁর মাথার মণি। ওয়ারশ থেকে প্যারিসে এলেন তিনি সম্রাটের সঙ্গিনী হয়ে। তারপরে ভিয়েনা সফরে মারিয়া তাঁর অনুগামিনী হলেন এবং সেখানেই তাঁকে একটি পুত্র উপহার দিলেন।

আস্বাদ পেয়ে আত্মবিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেল নেপোলিয়ানের। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়েই তিনি নতুন বিয়ের সঙ্কল্প নিলেন।

হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী তাঁর চাই-ই।

কিন্তু কাকে বিয়ে করবেন সম্রাট নেপোলিয়ান? অষ্ট্রিয়া সম্রাটের কন্যা মেরী লুই-এর চেয়ে সুপাত্রী আর কে হতে পারে?

মেরী লুইকে নেপোলিয়ান দেখেছেন। ভালোভাবেই দেখেছেন। মারিয়াকে নিয়ে তিনি যখন ভিয়েনা সফরে গিয়েছিলেন সে সময়ে তাঁর সান্নিধ্যেও তিনি এসেছিলেন। অনেক কথাও হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। নেপোলিয়ান তখনই বুঝেছিলেন, একটু বুদ্ধিবৃদ্ধি হলেও উনিশ বছরের এই অনুভূতিপ্রবণ তরুণীটির সব বিষয়েই মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি। তাই কদিকার মানুষ-খেকো দৈত্য নেপোলিয়ানকে দেখে মোটেই তিনি ভয় পাননি, বরং তাঁর পরোক্ষ বিবাহ-প্রস্তাবকে তিনি গ্রহণই করেছেন—তাঁকে ফিরিয়ে দেন নি।

সমস্ত ব্যবস্থাদি পাকা হয়ে গেছে গত কয়েকমাসের মধ্যে। নেপোলিয়ানের চিরসহচর মার্শাল বার্থার ভিয়েনায় এসেছেন মেরী লুইকে তাঁর ভাবী স্বামীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

পুরনো সব মোহ থেকে এতদিনে বোধহয় মুক্ত হতে পেরেছেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। হ্যাঁ, ঠিকই এবার তিনি ভুলতে পেরেছেন তাঁর এতদিনের জীবনসঙ্গিনী জোসেফাইনকে, এমন কি ভুলে গেছেন তাঁর হালের প্রিয়বান্ধবী কাউন্টেস মারিয়া ওয়ালেস্কা এবং আর সব কামনাময়ীদের যাদের সান্নিধ্যে এসে তিনি দিনের পর দিন তৃষ্ণা দূর করেছেন। শুধু তাই নয়, উত্তরাধিকারী লাভের তাড়ায় অধৈর্য ও উদ্বেগে সম্রাট তাঁর দুই অবৈধ পুত্রের অস্তিত্বের কথাও যেন ভুলে গেছেন। পৌরুষ-হীনতার জন্যে আত্মধিক্কারে নিজেকে জর্জরিত করে চলেছেন তিনি এই সময়ে। ব্যক্তিগত চিকিৎসককে এমন সব প্রশ্ন তিনি তখন করছেন যেগুলি বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

মানুষ কত বয়েস অবধি পিতা হতে পারে ? ষাট বছর অবধি ?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা' সম্ভব হতেও পারে।

সত্তুর বছরে ?—ডাক্তারের উত্তরে আরো বেশী কৌতূহলী হয়ে কের প্রশ্ন করলেন নেপোলিয়ন। এ প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেন ডাক্তার এবং এমন ইঙ্গিতপূর্ণ এক উত্তর দিলেন যার পর এ নিয়ে আর কোনো কথাই ওঠেনা সে আলোচনায়।

ডাক্তার জবাবে বলেন, 'সত্তুরে কেন, বাপ হওয়া যায় সব বয়েসেই !'

এর পর আর কিছু বলার না থাকলেও ডাক্তারের কথায় অনেকটা যেন আশ্বস্ত হলেন সম্রাট নেপোলিয়ন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র চল্লিশ। পিতা হবার ঢের বয়েস রয়েছে তাঁর, এই ভেবে উল্লাসের সীমা নেই সম্রাটের। আনন্দে নতুন করে নাচের তালিম তিনি দিয়ে চলেছেন। নতুন জীবনসঙ্গিনী আসছে যে তাঁর, নতুন করে তাঁকে নাচতে হবে না !

সে এক অভূতপূর্ব দিন নেপোলিয়নের জীবনে। সাতাশে মার্চ, আঠারশো দশ। অস্ট্রিয়ার সম্রাট-কন্যা মেরী লুই সদলবলে সেদিন ফ্রান্সে এসে পৌঁছুবেন। নেপোলিয়ন নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না, প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠেই তিনি গাড়ী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবেই রওনা হয়ে গেলেন।

পথেই রাজকুমারীর গাড়ী থামিয়ে দিলেন নেপোলিয়ন এবং নিজের গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে তাঁর গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

অতর্কিত ঠাণ্ডায় তখন কাবু হয়ে পড়েছেন মেরী লুই। তাঁর নাক লাল হয়ে উঠেছে, চোখে জল এবং গলার স্বর কর্কশ। তবে তাঁর কড়া জার্মাণ উচ্চারণের সঙ্গে সেই স্বর যেন বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই পর্দা-ঢাকা গাড়ীতে বসে গল্প করতে করতে নেপোলিয়ন মেরী লুইকে নিয়ে কম্পেনে এসে নামলেন। সহধর্মিণী পূর্ব অতি সংকেপে সেরে ফেলে নির্দিষ্ট প্রাসাদকক্ষে রাজকুমারীকে নিয়ে গেলেন সম্রাট এবং সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে সে রাতটি তিনি তাঁর সঙ্গেই কাটালেন।

পরদিন সকালে নেপোলিয়নের বোধহয় সেজন্যে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধও হয়েছিল। বিশ্রাম করতে করতে হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর একজন পরিচারককে তাই সে সময় জিজ্ঞেসই করে বসলেন, আগের দিন নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে এবং নিয়মকানুনে যে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে দরবারের কেউ তা' তেমনভাবে লক্ষ্য করেননি তো !

সেই সময়েই একজন তরুণ অফিসার এসে উপস্থিত হলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মৃদু হেসে সম্রাট বলেন, 'বৎস বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আমি বলবো জার্মাণ মেয়েই বিয়ে করা উচিত। ওরা পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা, মিষ্টি, সরল আর গোলাপ ফুলের মতো টাটকা।'

একদিনের অভিজ্ঞতায়ই এতটা মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন নেপোলিয়ন। পরের দিনটিও পুরো তিনি মেরী লুই-এর সঙ্গেই কাটালেন। মেরীও তাঁকে ছেড়ে তাঁর কক্ষের বাইরে বড়ো একটা আসেননি এবং অল্প সময়ের মধ্যে সবার মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, করাসী সম্রাটের আদিম আকাঙ্খার তীব্রতায় অস্ট্রিয়ার সম্রাট-দুহিতা বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছেন।

সে ধারণা যে ভুল নয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুই দেশের সর্বত্র তা' জানাজানি হয়ে গেল।

রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের বীরত্ব তুলনাহীন। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে সেই মহাবীর ফরাসী সম্রাট হয়েও সংসার সমরাঙ্গনে প্রতিপক্ষের একেবারে দাসানুদাস? এমন আত্মসমর্পণ বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য।

কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হলেও এ একদম পুরোপুরি সত্যি। সবাই আশ্চর্য হয়ে যান দেখে যে, সম্রাট হলে তাঁর পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসে, এমন কি ক্যাবিনেট মিটিং থেকেও মাঝে মাঝে অন্দরে চলে যান নব-পরিণীতা মেরী লুই-এর সঙ্গে মিলিত হবার তাগিদে।

তাঁর কন্যা যে অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্ধর্ষ ফরাসী সম্রাটকে সম্পূর্ণভাবে বশ করে ফেলেছেন, অস্ট্রিয়ার সম্রাটও তেমনি খবরই পেয়ে আসছেন।

ক্ষণে ক্ষণে হীরে-মণি-মাণিক্য ও নানা রত্নরাজি উপহার পেয়ে পেয়ে নতুন সম্রাজ্ঞী মেরী লুই ক্লান্ত। তাঁর ইচ্ছেই এখন নেপোলিয়নের ইচ্ছে এবং সে ইচ্ছে পূরণে কোনো চেষ্টাই করতে হয় না তাঁকে। তাই খুব জাঁক করেই মেরী একদিন বলেই বসলেন, 'এ পর্যন্ত ফরাসী সম্রাটের জীবনে যত নারীর আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে আমাকেই সম্রাট সব চেয়ে সুখে রেখেছেন।'

কিন্তু সেই সুখ যে এত অল্পস্থায়ী হবে তা' কখনো ভাবতে পারেন নি মেরী লুই। স্বামীর এত প্রেম, এত আকর্ষণে কোনোদিন যে ভাটা পড়বে, তেমন আশঙ্কা কোনো দিনই তাঁর মনে আসেনি।

উত্তরাধিকারী পাওয়াই কি ছিল মেরী লুইকে করায়ত্ত করার, তাঁকে বিয়ে করার একমাত্র লক্ষ্য সম্রাট নেপোলিয়নের?

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর একমাত্র সচিত্র পাক্ষিক

"সোভিয়েত দেশ"

॥ সোভিয়েত দেশ ॥ পত্রিকার প্রকাশনী বিভাগ থেকে অধুনা প্রকাশিত কয়েকটি অবশ্যপাঠ্য মূল্যবান পুস্তিকা:

১।	শৌর্য ও গৌরবের পথ—ভি. রিয়াবোক	মূল্য	০·৭৫ পয়সা
২।	মিলিত কার্যব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জরুরী দাবী (প্রাভদা সম্পাদকীয়)	মূল্য	০·১০ পয়সা
৩।	সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি সমবায়—এ. কুরাভলেফ	মূল্য	০·১৫ পয়সা
৪।	লেনিন (সংক্ষিপ্ত জীবনী)	মূল্য	১·০০ পয়সা

আমাদের প্রকাশিত পুস্তিকাবলী বিক্রয়ার্থে লোভনীয় শর্তে উচ্চ কমিশনে এজেন্ট চাই।

কমিশনের হার ২৫ হইতে ৬০ পর্যন্ত। সত্বর আবেদন করুন।

টাকা পয়সা পাঠান অথবা নীচের ঠিকানায় পত্রালাপ করুন:

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী বিভাগ

১।১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

হয়তো তাই। তা' না হলে এমন হবে কেন? নতুন ছেলে পেয়ে খুশীর আনন্দে মেরীকে তোষায় আরো বেশী করে ভালোবাসবেন সম্রাট, কিন্তু তার পরিবর্তে ফল ধরা উল্টোই দেখতে পেলো। ক্রমশই তিনি যেন উদাসীন হয়ে উঠছেন নতুন সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

উত্তরাধিকারী পেয়ে মেতে উঠেছেন নেপোলিয়ান। নবজাতককে নিয়ে নতুন নতুন স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছেন তিনি।

তিনি ফ্রান্সের তথা ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট, প্রায় সারা ইয়োরোপের অধীশ্বর। ইয়োরোপের প্রায় সব দেশই নেপোলিয়ানের নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু তাদের রাশিয়া এখনো বাকী।

সেই রাশিয়ার ওপরেই এবার নজর পড়লো নেপোলিয়ানের। রাশিয়াকে বশতা স্বীকার করাতে পারলেই গোটা ইয়োরোপের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই ইয়োরোপকেই তিনি তুলে দিয়ে যাবেন তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে, সে আনন্দেই নেপোলিয়ান বিভোর।

যুদ্ধের ক্ষুধা কী অসীম নেপোলিয়ানের? প্রেমের ক্ষুধাকেও তা' ছাড়িয়ে যায় সময় সময়।

আঠারোশো বারো খৃষ্টাব্দ। বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্রাট নেপোলিয়ান রওনা হলেন তাঁর রাশিয়া বিজয় অভিযানে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে, খাদ্যাভাবে এবং অন্যান্য নানা প্রতিকূলতায় তাঁকে বিপর্যস্ত সৈন্যদল নিয়ে ফিরে আসতে হলো মস্কো থেকে।

মেরী লুই-এর মনও ততদিনে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এদিকে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন সেই সুযোগে। তাঁরা সম্মিলিত হয়ে ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ শুরু করলে স্বামীর সিংহাসন টলে উঠতে দেখে অবলীলাক্রমেই প্যারিস ছেড়ে চলে গেলেন মেরী লুই।

অল্পদিন পরে সম্রাট নিজেও সিংহাসন ছেড়ে আত্মনির্বাসনে চলে গেলেন এলবা দ্বীপে। স্বজনবর্জিত সেই নির্জন দ্বীপবাসে বিশ্বস্ত পোলিশ বান্ধবী একমাত্র মারিয়া ওয়ালেস্কাই সঙ্গ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে নেপোলিয়ানকে সঞ্জীবীত রেখেছেন।

কিন্তু প্রেমের তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে কমে এলেও যুদ্ধের নেশা নেপোলিয়ানের তখনো কাটেনি। এক বছর যেতেই তিনি আবার ফিরে এলেন প্যারিসে এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

আবার ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো মহাবীর নেপোলিয়ানকে। জার্মান বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে এবার ঘোরতর লড়াইয়ে মেতে উঠলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যদেবী এবার সম্পূর্ণভাবেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন নেপোলিয়ানের দিক থেকে।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে সাঁ। এলেনার জীবনের বাকী ছ'টি বছর বন্দী অবস্থায় বহু যন্ত্রণা ও বহু বেদনায় কাটাতে হয়েছে মহাবীর বোনাপার্টকে।

পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে কেবলি স্মৃতি রোমন্থন। জীবনের শেষ বছরে সাঁ। এলেনা দ্বীপে তাই যেন একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্দী সম্রাট নেপোলিয়ানের। সেখানেও বহু নারীবেষ্টিত হয়েই থাকতেন সম্রাট এবং যে সব নারী তাঁর জীবনে এসেছে তাদের কথা বলে তিনি আনন্দ পেতেন—বিশেষ করে বলতেন তাঁর দুই সম্রাজ্ঞীর কথা; সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন এবং সম্রাজ্ঞী মেরী লুইএর কথা।

এক সম্রাট ও দুই সম্রাজ্ঞীর এই পরিণতি!

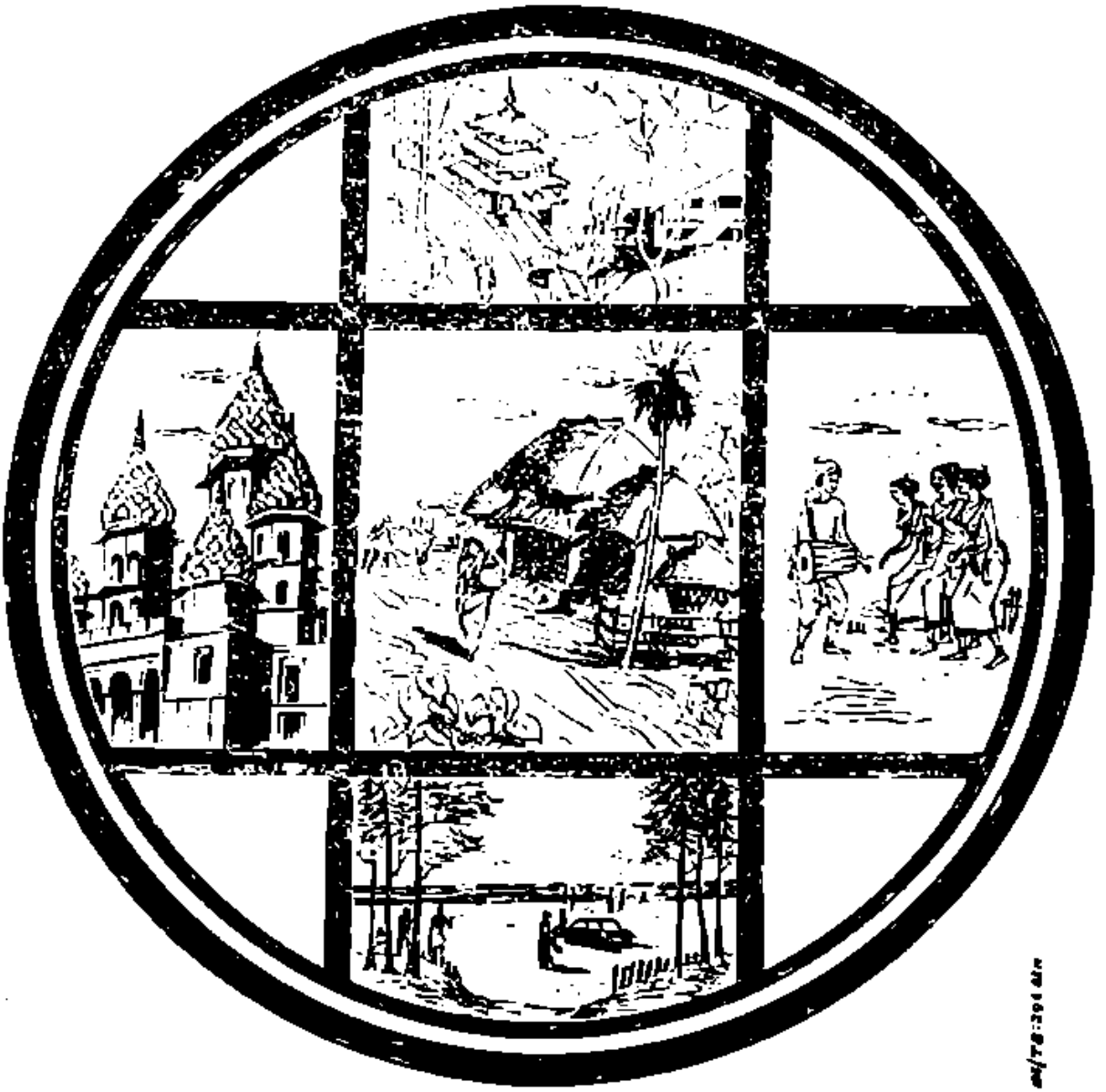

শারদীয় আনন্দের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে চিনুন

পশ্চিম বাংলার বহু দর্শনীয় স্থান দেখার আদর্শ সময় আশ্বিনের বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশ। তখন প্রকৃতি আনন্দের অজস্রতায় সরস সবুজের সোনা গলানো রৌদ্রে ঝলমল করে ওঠে। প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষও আনন্দময় হয়ে ওঠে, প্রতিটি গৃহ হয় উৎসবে মুখর।

প্রকৃতি ও মানুষের সব—ভোলা আনন্দের মধ্যে বেরিয়ে পড়ুন, দেখুন দুর্গাপূজায় দেশ জোড়া সমারোহ···ঝাউবীথি-মণ্ডিত দীঘার সমুদ্র সৈকত,···দার্জিলিঙে তুষারমৌলি হিমালয়ের ধ্যানগাম্ভীর্য···

ট্যুরিষ্ট ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩২, ডালহৌসি স্কোয়ার (ইষ্ট), কলিকাতা-১ টেলিফোন : ২৩-৮২৭১

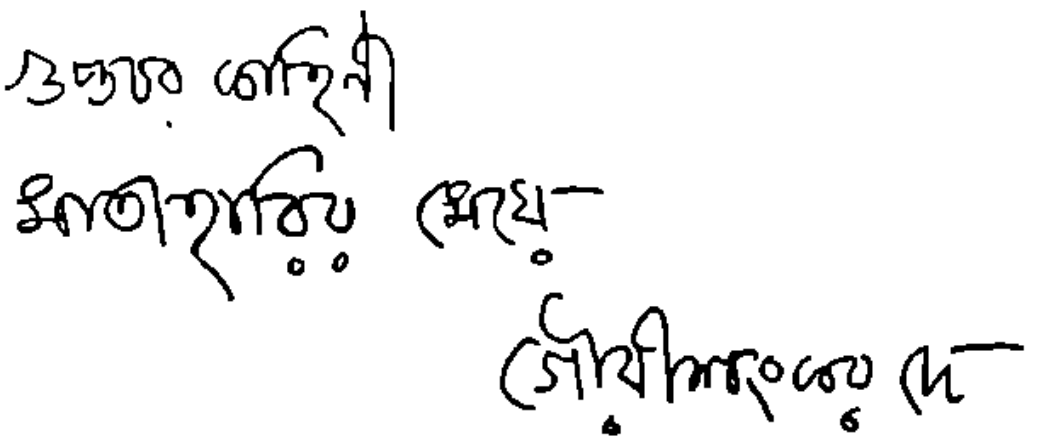

যুদ্ধক্ষেত্রের বিশ হাজার সৈনিকের চাইতে সঠিক স্থানে নিযুক্ত একজন জেনারেল অনেক বেশি কাজের।

—নেপোলিয়ন

দরজার গায়ে ঠুক ঠুক শব্দ হলো। কে?

দরজা খুলে বাতা দেখলো শিয়ন। তার হাত থেকে ও চিঠিখানা নিলো। হাতের লেখাটা ওর মায়ের। তিনি লিখেছেন:

আমার প্রিয় খুকু,

কত কথাই তো তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, তবু বলতে পারছি কই! আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। এখন ভোর চারটে। আর এক ঘণ্টা পরেই আমার স্থান হবে মৃতদের দলে। তোমাকে দেখবো সে সুযোগ আর আমার হলো না। তোমাকে ছেড়ে যখন আসি তখন তুমি শিশু। বিশ্বাস করো অন্যায় আমি করিনি। কিন্তু তা ব'লে আর কী হবে! যুদ্ধের আইন-কানুনই পাশবিক। করুণা ক'রে কেউ আমাকে বাঁচাবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমাকে সাহায্য করার সাধ্য আমার রাজনৈতিক বন্ধুদেরও নেই।

আমি সৎ এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপন করেছি। হয়তো সুখী ছিলুম না। আমরা দুজন দুজনকে কত কমই না জানি। তবে তোমার কাকিমা রোথ-এর কাছ থেকে তোমার খবর নিয়মিত পেতুম। তুমি কী চমৎকার আর সুন্দরী তরুণী হ'য়ে উঠছো তা তিনি প্রতি চিঠিতেই জানাতেন। তোমার ছবি আমার কাছে আছে।

যখন বার্লী এবং জাতাতে যাই তখন আমি নিতান্তই বালিকা। কিছু বুঝবার মতো বয়েস তখনো হয়নি। তোমার বাবার প্রেমে পড়লুম। ঘোড়ার দিকে তিনি বেশ ভালই ছিলেন। কিন্তু ট্রপিক অঞ্চলের আবহাওয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান আর তার সঙ্গে তোমার ভায়ের মৃত্যু তাকে অমানুষ ক'রে তুললো। একদিন তো আমাকে প্রায় খুন ক'রেই ফেলছিলেন।

তখন আমি বাধ্য হ'য়ে তাকে ছেড়ে চ'লে গেলুম। আর এখন আমাকে অন্য লোকেরা খুন করবে। আমি তোমাকে ফেলে রেখে আসা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আমি পৃথিবীতে থাকবো না বলেই হয়তো তোমার সামনের দিনগুলি হবে সুন্দর থেকে আরো সুন্দর। তোমার কথা ভেবে আমি নির্ভয়ে বরণ ক'রে নেবো মৃত্যু। অর্থ ইত্যাদি জীবনের সব কিছু নয়। আমার জন্য কি ঈশ্বরের কাছে একটু প্রার্থনা করবে? তাদের পথে চলতে চেয়েছিলো এমনি এক নারী হিসেবে মনে রেখো আমাকে। জীবন এবং ঘটনাপ্রবাহ আমার চাইতে অনেক বেশি প্রবল ছিলো, তাই আমাকে পরাজয় মানতে হলো।

খুকু, বিদায় দাও আমাকে। সুখে-শান্তিতে কেটে যাক তোমার জীবন। আর আমাকে যেন ঘৃণা কোরো না।

তোমার মা

মার্গারিডা গার্ট্রুড জিলি—ম্যাকলিয়োড

মৃত্যু-পথ-যাত্রী মায়ের চিঠি পেয়েও বাতার চোখে দেখা দিলো না জল, কেঁপে উঠলো না দেহ। কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়লো। তারপর গেলো গির্জার দিকে। যে মা রক্তের অক্ষরে বিশ্ব-ইতিহাসে লিখে গেছেন, ডিসাইপ্লাস পা'রেই নারী-গুপ্তচর রূপে সব চাইতে খ্যাত হয়েছেন, তার হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে।

মনে যতটা আঘাত পাওয়ার কথা, মায়ের মৃত্যুর খবরে ততটা আঘাত বাতা পেলো না। ওর বয়েস এখন সতেরো। সবে ওর যৌবন—শতদল রক্তিম পাপড়ি মেলে পুরুষের রক্তে দোলা দিতে শুরু করেছে। এই সতেরো বছরের জীবনে মাকে সে দেখেনি বললেই চলে। আর বাবা? বাবাকে তো সে প্রায় চেনেই না। বাতা বড়ো হয়েছে বাটাভিয়াতে। ওকে লালন-পালন করেছে আত্মীয়-স্বজনেরা।

কাকিমার কাছ থেকে বাতা শুনেছে ওর বাবা ছিলেন একেবারে অপদার্থ। মদে চুর হ'য়ে থাকতেন। যতক্ষণ হাতে পয়সা থাকতো কাটাতেন জুয়ার আড্ডায়। কারণে অকারণে স্ত্রীকে মারধোর করতেন। তার দুর্ব্যবহার সইতে না পেরে বাতার মা বাধ্য হন স্বামীকে ছেড়ে হল্যাণ্ডে চ'লে যেতে।

কাকিমার কাছেই বাতা শুনেছে ওর মা একজন নামকরা নর্তকী। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আসছেন বাতাকে দেখতে। কাকিমার মুখ থেকে এমনি সব গল্প শুনে মনে-মনে মায়ের একটা কাল্পনিক মূর্তি গ'ড়ে তুলেছিলো বাতা। কবে মা আসবেন তার জন্য ও দিন গুণছিলো।

কিন্তু মা এলেন না। এলো ওই চিঠি। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। ওখানাই বাতার কাছে লেখা মায়ের শেষ চিঠি। লিখেছেন তার বন্যভূমি ফ্রান্স থেকে।

মায়ের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কারো সঙ্গে একটি কথাও সে বললো না। এমন কি কাকিমার সঙ্গেও নয়।

সেই রাতেই সে পালিয়ে গেলো বাড়ি ছেড়ে। উঠলো ওলন্দাজ সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়িতে। তিনি হলেন একাধারে ওর পিতা, প্রেমিক এবং শিক্ষক। বাতাব সঙ্গে চল্লিশ বছরের বয়সের ব্যবধানে তার। ভদ্রলোকের বয়েস সাতাশ। তবু তাকেই ভালোবাসলো বাতা। সারা জীবন প্রেমহীন অবস্থায় কাটাবার চাইতে তার সঙ্গে কয়েক বছর সুখে কাটানো অনেক ভালো। এ কথাই তাকে ও জানালো।

এ-রকম অসমবয়সী দু'জন নর-নারীর প্রেম! সত্যি আশ্চর্য। একজনের জীবনে যৌবনের স্বর্ণালী মধ্যাহ্ন, আরেকজনের জীবনে ম্লান অপরাহ্ণ। তবু মীনকেতু তাদের দু'টি হৃদয়ের মাঝখানেই বেঁধে দিলেন প্রণয়ের সেতু। যুবক-জোড়া প্রেমের ফাঁদে এমনি ক'রেই বুঝি ধরা পড়ে অন্ধ নর-নারী। ওদের দুজনের প্রেম ছিলো আন্তরিক। তবু বিয়ে হলো না। সম্পর্কটা স্থায়ী করার প্রস্তাব অবশ্য বাতা অনেকবারই দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই ভদ্রলোক তা নাকচ ক'রে দিয়ে বলেছেন: "আমার যখন সত্তর বছর বয়েস হবে এবং নিতান্তরোগী হ'য়ে পড়বো, তখন আমাকে সেবা করতে করতে তোমার জীবন-যৌবন কেটে যাবে এ আমি চাইনা।"

ভদ্রলোক বাতাকে কিছুদিনের জন্য পাঠালেন একটা কলেজে। সেখানে কয়েক বছর সেবা-পড়া ক'রে ও সুশিক্ষিত হলো। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে ও নিজেই একটা স্কুল খুললো। ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাতে লাগলো। ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের অজ্ঞতা দেখে ও শিউরে উঠেছিলো। সেই তমসা সাধ্যমতো দূর করবে এই তখন ওর প্রতিজ্ঞা, জীবনের তপস্যা। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তরতর ক'রে ব'য়ে যেতে লাগলো ওর জীবন, সমতলের বুকে প্রবাহিত স্রোত-রেখার মতো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ মারা গেলেন ওর সখী ভদ্রলোক। ১৯০৫ সালে।

বাতার বয়েস তখন পঁয়ত্রিশ। রূপ-লাবণ্যে সে তখন প্রস্ফুটিত পদ্মিনী। চোখের ঈষৎ ইসারাতে মুহূর্তের মধ্যে আকর্ষণ করতে পারে সঙ্গী। তবু তা না ক'রে সে আগের মতোই ব্যস্ত রইলো শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। কচি-কচি মুখ আর টানা-টানা নিষ্পাপ চোখের চাউনি রইলো ওর জন্য ছুড়ে। বাটাভিয়ার সমাজে বাতার জনপ্রিয়তা প্রায় অসীমকে স্পর্শ করলো।

নিজের বাড়িতে ও মাঝে মাঝে পার্টি দেয়, চায়ের আসর বসায়। শিল্পী সাহিত্যিকরা সেখানে আসেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরি সেখানে অবারিত দ্বার। বাতার বয়েস এখন চল্লিশ, তবু ওর অঙ্গে-অঙ্গে এখনো বেজে চলেছে যৌবনের বাঁশি। টাকা-পয়সার অভাবও ওর নেই। ভদ্রলোক প্রচুর ঐশ্বর্য ওকে দিয়ে গিয়েছেন।

যেন এক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আরো ক'য়েক বছর কেটে গেলো বাতার। কিন্তু সেই রঙিন আবরণ ছিন্ন হলো ১৯০৯ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো।

তখনো অবশ্য জাভা সেই সর্বনাশা প্রলয়কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে নি। বাতার বাড়িতে ঠিক আগের মতোই সন্ধ্যায় নিয়মিত বসছে চায়ের আসর। আর সেখানে হাজির হচ্ছেন কূটনীতিবিদ, গুপ্তচর, আর সংবাদিকেরা। যদি কোনো গোপন খবর উদ্ধার করা যায় এই আশায়।

পার্ল হারবারের উপর জাপান অপ্রত্যাশিত আক্রমণ চালালো। সূর্যাস্ত হয়না ব'লে যার গর্ব

ছিলো সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা দাঁড়ালো তাসের ঘরের মতো। মাৎসী বাহিনী হল্যাণ্ড দখল ক'রে নিলো। য়ুরোপের দেশগুলি যখন জার্মানীর আক্রমণে বিপর্যস্ত, সেই সুযোগে জাপান একের পর এক দখল ক'রে নিতে লাগলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি। ইন্দোনেশিয়াতেও জাপানী সৈন্য অবতরণ করলো। জাপানীরা ওখানকার বাসিন্দাদের কত লোভই না দেখালো। টাকা-পয়সা, খাদ্য যার স্বরাজ সবই ওরা পাবে। তাদের অধিবাসীরা জাপানীদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করলো।

১৯৪২ সালে বাবার মনে পড়লো তার মা কেমন ক'রে রাজনীতির জালে জড়িয়ে প'ড়েছিলেন, গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তবে, এই ঝড় কেটে যাবে, স্বৈরাচারী শাসকেরা আসবে যাবে কিন্তু জনসাধারণ চিরকাল টিকে থাকবে এই ছিলো ওর বিশ্বাস। যুদ্ধের দাবানলে যখন ইন্দোনেশিয়াও দগ্ধ হচ্ছে তখনও সে ছেলেমেয়েদের পড়াতে গিয়ে প্রায়ই বলতো: "দুনিয়াটা হলো বড়ো একটা চাকার মতো। সবসময়ই ঘুরছে। আজ একদল মানুষ উপরে উঠে হাতে ক্ষমতা পেয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে, আরেকদল লোক নিচে প'ড়ে অসহায়ভাবে মার খাচ্ছে, মুখ বুজে নিপীড়ন সইছে। কালই দেখবে চাকা ঘুরে গেছে। অত্যাচারীর দল প'ড়ে গেছে নিচে, যারা ছিলো দাস তারা উঠে পড়েছে উপরে।"

জাপানীরা কিন্তু বাবার এই শিক্ষার ধারা সুনজরে দেখতে পারলো না। এই ধরণের কথাবার্তা বলতে ওরা বারণ করলো।

আর, এই সময়েই বাবার খোঁজ নিতে এলেন ওর এক কাকা। তিনিও ওলন্দাজ। কিন্তু এখন তাঁর পরনে জাপানী সৈনিকের্দ। তাছাড়া যুদ্ধের আগে থেকেই প্রায় বছর দশেক ধ'রে তিনি জাপানী

Telegram : WOOLTOP Telephones : 23-6776 (3 Lines)

Puja Greetings to all

BHARAT WOOLLEN MILLS LTD.

WORSTED SPINNERS AND MANUFACTURERS.

11, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1.

Proprietors of J. J. R. INDUSTRIES, Dulhipur-Moghalsarai.

নৌ-বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে কাকা ক'রে আসছেন। যে অল্প ক'য়েকজন লোক বাবার মায়ের কথা জানতো, এই কাকা ছিলেন তাদের একজন। দশবছরের মধ্যে একবারও তো তিনি বাবার খোঁজ-খবর নেননি। তাহলে এখন হঠাৎ দেখা করতে আসার কারণ? ওর ভয় করতে লাগলো।

বাবা জানতো জাপানী উপর মহলে তার ওই কাকাটির দারুণ প্রভাব-প্রতিপত্তি। কাকা হয়তো বাবাকেও বলবেন জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে।

বাবার আশংকাই সত্য হলো। কাকা তা-ই বললেন। তবে প্রস্তাবটা অনুরোধ হিসেবে এলো না, এলো আদেশের আকারে। তিনি ওকে ভয় পর্যন্ত দেখালেন। ওর মা যে গত বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত নারীগুপ্তচর মাতাহারি এ-কথা জাপানীদের কানে একবার পৌঁছে দিলে ওর রক্ষা থাকবে না, একথা তিনি বাবাকে বেশ ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিলেন। বাবা যদি নিজের সেই সর্বনাশ ডেকে আনতে না চায় তবে যেন সে আবার নিজের বাড়িতে আগেকার মতো আসর বসায়, সেখানে চা-পান আর সংস্কৃতি চর্চা দুইই চলবে। মাঝে-মাঝে ওকে ককটেল পার্টিও দিতে হবে। সেখানে নিমন্ত্রণ করতে হবে বাবার নিজের পরিচিত নর-নারী আর জাপানী শাসকদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের।

তাই হলো। একই আসরে হাজির হতে লাগলো ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী আর জাপানীরা। যারা নিরপেক্ষ তারাও—সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল আর সুইডেনের জন ক'য়েক লোক। বাবা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলো তার নিজের বাড়িতে লোকগুলিকে কী ভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে।

তার পার্টিতে এখন থেকে আলোচিত হতে লাগলো: প্লেটো, সোপেনহাওয়ারের দর্শন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। নিজের স্বাধীন জীবন বলে আর কিছুই রইলো না বাবার। কোথায় মিলিয়ে গেলো গৃহ-নীড়ের নীরব শান্তি। বাটাভিয়ার তার বাড়িটা হ'য়ে উঠলো রেলওয়ে জংশনের মতো, দিন-রাতই সেখানে বহিরাগন্তুকের ভিড়। চাকর-বাকরদের এক মিনিটও চুপ ক'রে বসার সুযোগ নেই। ফরমাস খাটতে-খাটতে তাদের নাভিশ্বাস।

সব রকমের লোক আসছে বাবার বাড়িতে: জাপানী অফিসার, জাপানীদের যারা বিশ্বাস করে এবং মনে করে জাপান তাদের স্বাধীনতা দেবে সেইসব ইন্দোনেশীয় ভদ্রলোক এবং বৈদেশিক কূটনীতিবিদেরা। ক'য়েকমাস ধ'রে এ-রকম চললো। জাপানীরা তো বাবার উপরে খুব খুশি। সত্যি সে সহযোগিতা করছে তাদের সঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী আর জাপানীদের মাঝখানে সেতুর কাজ করছে বাবা।

ইন্দোনেশীয় যুবকদের নিয়ে একটা হোমগার্ড দল তৈরি করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো জাপানীরা কিন্তু এমন লোককেই এ দলে নিতে হবে যারা কখনোই ঔদীয়মান সূর্যের সন্তানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সেই লোক-বাছাইয়ের কাজও হতে লাগলো বাবারই বাড়িতে।

শুরু হলো বাবার জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

বাবা আবার জীবনে প্রেমের প্রয়োজন অনুভব করলো। দেহ-মন আবার ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলো রাত্রিশেষের পদ্মকুড়ির মতো। একদিন পার্টিতে এমন এক পুরুষের দেখা সে পেলো যার কাছে নিজেকে সঁপে দিলে জীবন ধন্য হবে ব'লে মনে হলো। হোমগার্ড সংগঠনে জাপানীদের এই যুবকও সাহায্য করছিলো। তাদের সঙ্গে সে বল খেলতো। কিন্তু আসলে সে ছিলো ইন্দোনেশিয়ার গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার একজন বড়ো নেতা। জাপানীরা যে হোমগার্ড তৈরি করছে তাকেই

কাজে সে তখন নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। গোপনে সে যোগাযোগ করছে ভারতের দুই মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে। বিশ্বশান্তি হোক এবং ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করুক এই ছিলো তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আর এই কাজে বাতাকে সে পেলো প্রধান গুপ্তচর রূপে। গুপ্তচরবৃত্তিতে মা-কে ছাড়িয়ে গেলো মেয়ে। জাপানীরা কোথায় সৈন্য-সমাবেশ করেছে, তাদের বিমান-বহরে কতগুলি বিমান, জাপানী নৌ-বাহিনীর গতিবিধি, সবই বাতার নখ-দর্পণে। জাপানীরা কোথায় যুদ্ধ করতে যাচ্ছে সে খবর পর্যন্ত তার জানা। এই সব খবর আবদুলকে তো সে জানাতোই, তাছাড়া বিপ্লবী সংস্থার হাতে সময় মতো তার অস্ত্রও তুলে দিতো। ইন্দোনেশিয়ার এক যুবককে ভালোবেসে সে দেশের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেও ও যেন রইলো অক্লান্ত।

গ্রেট-ব্রিটেন আর আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ একেবারেই জানতো না যে বাতা মাতাহারির মেয়ে। তারা শুধু জানতো আবদুল ওলন্দাজদের যে সব গোপন-তথ্য সরবরাহ করছে তা খুবই বিশ্বস্ত আর তা সে পাচ্ছে বাতা নামে একজন নারী গুপ্তচরের কাছ থেকে।

জাপানের পতন আসন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত জাপানীরা একবারও বাতাকে সন্দেহ করেনি। তারা আবদুলকে বরং সন্দেহ করেছে; তবু সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে পারে এই ভয়ে সেই সন্দেহ তারা প্রকাশ করেনি। আবদুলকে হাতে রাখার চেষ্টাই করেছে।

শেষ পর্যন্ত জাপানীরাও ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে পা দিলো ব্রিটিশ সৈন্য। কিন্তু ওখানকার বাসিন্দারা কোনো বিদেশী শাসনই আর বরদাস্ত করতে রাজী নয়, না ব্রিটিশ, না ওলন্দাজ, না জাপানী। ওরা বিদ্রোহ করলো। হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় যুবক যুবতী বেরিয়ে এলো পথে। দখল করলো বেতার স্টেশন। বেতার-কেন্দ্র থেকে ওরা সংযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলো।

ওলন্দাজ সরকার সেই দাবী মেনে নিতে রাজী হলো না। সে চাইল ইন্দোনেশিয়ার উপর আবার ঔপনিবেশিক অধিকার। সুতরাং শুরু হলো ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে ওলন্দাজদের রক্তাক্ত সংঘর্ষ।

বাতার বাড়িতে আগের মতোই কক্‌টেল পার্টি আর চায়ের আসর বসছে। প্রেমের সময় কোথায়! সপ্তাহের পর সপ্তাহ হয়তো চলে যাচ্ছে তবু আবদুলের দেখা নেই। ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া দখলের জন্য কী পরিকল্পনা করছে আবদুলকে তা জানিয়ে দিতে হচ্ছে গোপনে লোক মারফৎ। একজন উচ্চপদস্থ ওলন্দাজ অফিসার প্রায়ই আসেন বাতার কক্‌টেল পার্টিতে। তার কাছ থেকে ওলন্দাজদের সব রকম গতিবিধিই সে জানতে পারে। ফলে বাতা যে-সব খবর সরবরাহ ক'রে তা একেবারে অভ্রান্ত।

এমনি সময়ে একদিন আবদুল এসে বাতাকে জানালো, সে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। মেয়েটি আবদুলের সঙ্গে বিপ্লবী সংস্থায় অনেকদিন ধরে কাজ করছে। তার বয়েস কুড়ি।

বাতার বয়েস তখন প্রায় পঞ্চাশ। আবার তার জীবনের স্রোত অন্যদিকে ঘুরে গেলো। আমেরিকাতে যাবে সে। ও মাতাহারির মেয়ে একথা কখনোই ভুলতে পারছে না। যদি সে দেশে গিয়ে মায়ের অপরাধ নিজের সৎ কাজ দিয়ে ঘুছে ফেলা যায়।

আমেরিকাতে গিয়েও ও যেন জনপ্রিয়তা অর্জন করলে। ওর নির্ভুল ইংরেজী ভাষণ আর

অসামান্য রূপ সবাইকেই মুগ্ধ করলো। ইন্দোনেশিয়ার স্বপক্ষে সে বক্তৃতা করে রেডিয়োতে ভাষণ দেয়। নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। এবার আবদুলের একটা পরিকল্পনাকে সে রূপায়িত করার চেষ্টা করলো। ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রী সরকারের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। ও একজন উদার মার্কিন কোটিপতিকে রাজী করালো আর্থিক সাহায্য দিতে। পুরোনো বিমান কিনে পাঠানো হলো ইন্দোনেশিয়ায়। চালকেরা আমেরিকান। নিজের কাজ সুসম্পূর্ণ ক'রে বাণ্ডা ফিরে গেলো বাটাভিয়াতে। বাটাভিয়ার তখন নতুন নামকরণ হয়েছে জাকার্তা।

এবার শুরু হলো বাণ্ডার জীবন-নাট্যের পঞ্চম অঙ্ক। মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ আমেরিকাতে বাণ্ডার কাজের ধারা লক্ষ্য করেছে। জেনে ফেলেছে ওর পিতা-মাতার পরিচয়। ওর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে মার্কিন সরকার বাণ্ডাকে পাঠালো চীনে।

চীনা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কাজ ক'রে ও অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করলো। বাণ্ডা যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো চিয়াং কাইশেকের জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিছু দিনের মধ্যেই তাকে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে; সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে সাহায্য করছে।

মাও সে তুং-এর শিবিরেও ও কিছুদিন ছিলো। সেখান থেকে খবর দিলো রাশিয়া এবং চীনের সাহায্য নিয়ে উত্তর কোরিয়া শীঘ্রই দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। খবরগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। বাণ্ডার হুঁশিয়ারীকে ওরা পাত্তাই দিলে না। কয়েক মাস পরেই কিন্তু কোরিয়াতে যুদ্ধ লাগলো।

এর কিছুদিনের পরই বাণ্ডা ধরা প'ড়ে গেলো। ধরিয়ে দিলো পূর্বেকার বাটাভিয়ার ওলন্দাজ সরকারের একজন কর্মচারী, মাটো। অথচ ওই লোকটিই একদিন বাণ্ডার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলো। কিন্তু তার ভোল বদলে গেছে। সে এখন ডাচ ফৌজের একজন কর্তা। কোরিয়াতে এসে একবার দেখেই সে বাণ্ডাকে চিনে ফেলে এবং তার পরিচয় প্রকাশ করে দেয়।

বিচার তো দূরের কথা, বিচারের প্রহসন পর্যন্ত হলো না।

পৃথিবীর গাছপালা আগের মতোই সবুজ, আকাশ তেমনি নীল। তবু সব কেমন ম্লান দেখাচ্ছে দিনান্তের আলোতে।

বাণ্ডাকে দাঁড় করানো হলো দেয়ালের গায়ে। সামনে উদ্যত রাইফেল।

বাণ্ডার মনে পড়লো মায়ের চিঠির কথা। তিনি ওকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বলেছিলেন ওর জীবন ভ'রে উঠবে সুখে-শান্তিতে। আর সুখী হওয়ার মতো সবই তো ওর ছিলো: রূপ, ঐশ্বর্য, শিক্ষা। অন্য পাঁচটি মেয়ের মতো সে-ও স্বামী-পুত্র নিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলো শান্তির নীড়। কিন্তু ওর সাধ মিটলো না।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ হতেই গুলির শব্দ বধ্য ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হলো। বাণ্ডার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

ওর মা মাতাহারিকেও ঠিক এই একই সময় (সন্ধ্যে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট) হত্যা করা হয়েছিলো। কয়েক বছর পূর্বের এক মর্মান্তিক দৃশ্যের পুনরাভিনয় হলো।

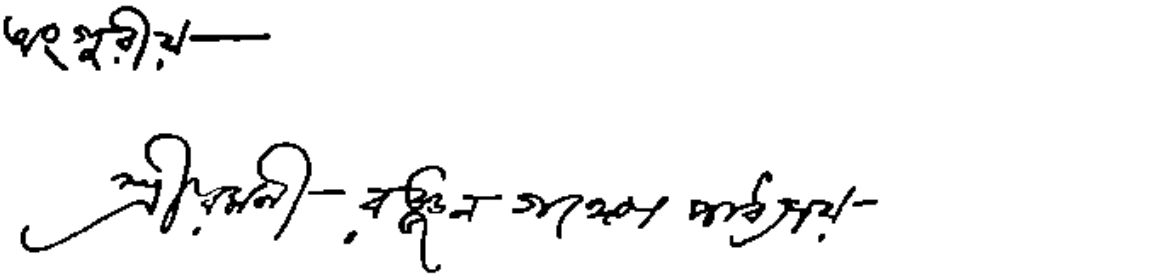

ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ইস্—২রা সেপ্টেম্বর! ত্রিশে আগষ্টের মধ্যেই ভদ্রলোককে লেখা দেব বলে কথা দিয়েছিলেম। তা আর হয়ে উঠল না। ভদ্রলোক বলেছিলেন, এ মাসের মাঝামাঝি পূজা সংখ্যা বের করতে হবে। সমস্যায় পড়লাম। কথা যখন দিয়েছি—গল্প একটা লিখতেই হবে। কিন্তু হট্ করে তো আর গল্প লেখা চলে না। ভাবছিলাম কি লিখব।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। মুখ তুলতেই দেখি বড় ছেলে বাজার হাতে। ছোট ছেলে মলয় এসে দরজা খুলে দিল। আমার কিন্তু বুকটা দুরদুর করতে থাকে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। বাড়ির ভেতর থেকে গিন্নির জেরা কানে ভেসে আসে। এটা এনেছিস। ওটা আনিস নি কেন? যা ভেবেছিলাম তাই। গিন্নির গলা শোনা গেল—তোকে ওই পচা মাছ কে আনতে বলেছে শুনি?

ছেলে কৈফিয়ৎ দিচ্ছিল। পুলিস পাহারায় অত তেঁতুলে লাইন দিয়ে মাছ কিনলাম, আর তুমি বলছ মাছ পচা!

আর যায় কোথায়। গিন্নির গলা উচ্চগ্রামে ধাওয়া করে। তোর বেলাটা প্রায় রোজই এমনি ভারী হয়ে উঠে। আমার গল্প লেখাও শেষ হল। কাগজ কলম একদিকে সরিয়ে রাখলাম।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ। বেশ জোরে জোরে।

চেয়ে দেখি রবীন। কাচের ভেতর দিয়ে চেয়েছিল। দরজা খুলে দিতেই রবীন বড় গলা করে ডাকে—ও বৌদি, এক কাপ চা যেন পাই। তবুও গিন্নির চাপা কণ্ঠস্বর দু'একবার কানে আসে। বুঝতে পারলাম রবীনের আবার গিন্নির কানে পৌঁছে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। যাক্ বাঁচা গেল।

রবীনকে দেখলে ভাল লাগে। একবার কারো কথা শুনলেই হল, পরক্ষণেই রবীন সে লোকটির হাবভাব, এমন কি কথাবার্তা পর্যন্ত নকল শুরু করে দেয়। একেবারে হুবহু নকল। ধরবার যো-টি নেই।

বাপরে বাপ। সে কি ঝামেলা! বলতে বলতে রবীন বসে পড়ে।

কি হল আবার?

হবে আবার কি? কাল সারা দিনরাত সে কি ঝামেলা। বাসায় বসে ভাবছি এমন সময় বড়বাবু ডাকলেন। ওর ঘরে গিয়ে দেখি এক সাহেব উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে কি যেন বলছিল। জবরদস্ত সাহেব। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বেশ ফিটফাট। মুখে পাইপ রেখেই কথা কইছিল।

এই যে রবীন। সাহেবকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। সাহেবও ইংগিত পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। তুমিই বল দাদা, এমন ভাবে ফাঁসান কি বড়বাবুর উচিত?

পুলিসে কাজ করবে,—অথচ হুকুম করবে না এ-কেমন কথা?

আমি কি আর সে-কথা অস্বীকার করছি? কিন্তু তখন যে আমার ডিউটিই ছিল না। ডিউটিতে ছিল দত্তবাবু।

তাতে হল কি? রাত জেগেছ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আজকালকার অফিসারদের ঐ এক কথা। ঘন্টা ধরে কি আর পুলিসের কাজ চলে?

আমার কথা শুনে শুধ হয়ে গেল রবীন।

এমন সময় চা এল। সংগে মিষ্টি।

নাও ঠাকুরপো, চা-টা খেয়ে নাও।

লক্ষ্য করলাম মিষ্টির অনুরোধে রবীনের চোখ মুখ সহজ সরল হয়ে উঠেছে। রবীন চা তুলে নিল।

ওটা কি দাদা? অঃ গল্প লিখছিলে বুঝি?

আর বলো কোথায়! যা-ও ভদ্রলোককে কথা দিলাম, তা আর হয়ে উঠল না। সত্যিই মনটাও ভাল ছিল না। অনামী লেখকের এত বড় অবহেলা, নিজেই যেন বরদাস্ত করতে পারছিলাম না।

তোমার দাদা গল্পের নায়ক নায়িকা খুঁজছেন।

রবীন একটু চিন্তা করে। হাত থেকে চা নামিয়ে বলে, কেন কালকের গল্পটাই লিখে যাও না— চমৎকার হবে।

জানি রবীন ভাল গল্প বলে। একটু উৎসাহও পেলাম। বললাম—গল্পটা কি তা বলবি তো?

বা-রে—! বলব বলেই তো বললাম। চা-টা একটু আরাম করে খেয়ে নি। কি বল বৌদি?

তোরবেলা অত সময় আমার নেই। বলবে তো বল।

আহা-হা। বলইনা। চমৎকার গল্প। মিষ্টিকে বসতে অনুরোধ করে রবীন বলতে সুরু করে দেয়।

সাহেবকে তো আমার ঘরে নিয়ে এলাম। অনুরোধ করতেই মুখ থেকে পাইপ টেনে নিয়ে বলে,—ভ'টস্ অল্ রাইট্।

আমার নাম মিঃ ডর্ক। দেশ লণ্ডনে। তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি। থাকি গ্র্যাণ্ড হোটেলে। রুম নম্বর একশো এক। এখানেই পরিচয় হয় মিঃ ডোনাল্ডের সংগে। ভদ্রলোক পার্ক ষ্ট্রীটে নিজের ফ্ল্যাটে থাকেন। স্বচ্ছল অবস্থা। আসে বেরিকান। কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ে। আমার আংটিটা বিক্রী করতে চাইলাম। মিঃ ডোনাল্ডকে বলতেই তিনি আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। আংটি ওকে দিয়ে দিলাম। দু'দিন পর ভদ্রলোক আমার রুমে এসে আংটি ফেরত দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, না— হলো না। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করেছেন, কিনলেন না। ও-সময় আমার ঘরে মিঃ ডেভিস্ এবং মিঃ উইলকিন্সন্ ছিলেন।

তিন চারদিন পরের কথা বলছি। মিঃ ডোনাল্ড আবার এলেন। হাসতে হাসতে আমার

পাশের সিটে বসে বললেন, ঐ ভদ্রলোক নাকি আংটিটি কিনবেন বলে মত দিয়েছেন। ওর অনেক অনুরোধেই এটা সম্ভবপর হয়েছে বলে একটু হাসলেনও।

টাকার দরকার ছিল। আংটি ওর হাতে তুলে দিলাম।

তারপরেই বুঝি মিঃ ডোনাল্ড হাওয়ায় মিশে গেলেন?

এগ্‌জ্যাক্টলি স্যার। তবে তিনি বরাত ভবিষ্যতে রোজই গ্র্যাণ্ডে আসেন। তবে আংটির কথা বে-মালুম চেপে গেছেন।

কি বলেন তিনি?

বলেন—হাউ স্ট্রেঞ্জ্। (কি—আশ্চর্য!) সে দিন না মিঃ ডেভিস এবং মিঃ উইলকিন্‌সনের সামনে আংটিটা দিয়ে দিলাম!!!

নাউ আই আনডারষ্টাণ্ড হি ইজ এ ক্লাস চীট। (আমি এখন বুঝতে পেরেছি মিঃ ডোনাল্ড একজন পাকা জুচ্চোর।)

বেশ বোঝা গেল মিঃ অর্জ খুব চটে গেছেন। উত্তেজনায় ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছল। মনে হল উত্তেজনা চেপে রাখতে গিয়ে আবার পাইপ ধরালেন। আস্তে আস্তে পাইপ টানেন।

আংটির দাম তো বললে না?

বুঝতে পারলাম সিন্থির চোখ ও কান পূর্ণ সজাগ।

বলতো বৌদি কত টাকা হতে পারে?

কি করে বলব বল? নিশ্চয়ই দামী আংটি হবে। তা হাজার খানেক।

—একুশ হাজার।

অবিচলিত কণ্ঠে জবাব রবীন। ওর বৌদির মুখের দিকে একবার চায়। আবার বলে, ও কথা পুলিসের ডায়রীতেই লেখা আছে বৌদি। প্ল্যাটিনামের ওপর হীরের কাজ করা।

মিঃ অর্জকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, অসুবিধে নেই। গ্র্যাণ্ডে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে মিঃ ডোনাল্ড কে।

বেলা বারটায় ডিউটি হবার কথা। আরম্ভ হল ভোর থেকেই। একবার যখন ঘাড়ে চেপেছে তদন্ত শেষ করতেই হবে। উপায় নেই।

মিঃ অর্জকে নিয়ে গ্র্যাণ্ডে এলাম। ওর কথাই ঠিক। মিঃ ডোনাল্ডকে সবাই জানে। রোজই সন্ধ্যায় আসে। হল রুমের এক কোণে বসে। বান্ধব এবং বান্ধবীও আসে। আহার এবং পান দু'টোই পূর্ণোদ্যমে চলে। বেয়ারাদের মধ্যে তাড়াহুড়া সুরু হয়। কে কার আগে মিঃ ডোনাল্ডকে সার্ভ করবে। নোটের ভাগোনী মিঃ ডোনাল্ড নাকি ফিরে চায় না? যদিও বা বিল নিয়ে বেয়ারা প্লেট এগিয়ে দেয়, মিঃ ডোনাল্ড কম্পিত কণ্ঠে ধমকে উঠে। বলে—সেট্ আউট ইউ বাষ্টার্ড। বেয়ারা খুশী হয়। কথাটা বেফাঁস হ'লেও ডোনাল্ডের মুখের হাসি ওদের উৎসাহিত করে। প্লেট থেকে টাকা তুলে নিয়ে বেয়ারা নবাবী কায়দায় সেলাম জানায়।

রিসিপসানিষ্ট থেকে অনেকেই ওর ঠিকানা পর্যন্ত বলে দিল। গ্র্যাড্‌ষ্টোন ম্যানসন্—পার্ক ষ্ট্রীট।

যেতে হল। চারতলায় লিফ্‌টে করে উঠে গেলাম। রাস্তায় রইলেন মিঃ অর্জ।

বেয়ারা মুখ বাঁড়িয়ে বললে, সাহাব কুঠি পর নেহি হ্যায়।

নামতে নামতে লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করতেই খ খেয়ে গেলাম। আমার সাথেই নাকি মিঃ ডোনাল্ড এই লিফ্‌টে করে উপরে উঠে গেছে। বোকা বনে লিফ্‌ট থেকে নেমে এলাম।

ভাবছিলাম মিঃ ডোনাল্ডের কথা।

মাঝে মাঝে রবীন কিন্তু এক একটা চমকপ্রদ কাজ করে বসে। সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। এবারও ছেলে ও নয়। চুপ করেই ওর কথা শুনছিলাম।

আবার সে আরম্ভ করে।

আবার গ্রাণ্ডে এলাম। রহমান বেয়ারাকে পটিপাটি দিয়ে ঠিক করে নিলাম। চোগা-চাপকান পরে রহমান গাড়িতে গিয়ে উঠল। পুলিস গাড়ি খানিকটা দূরে রেখে ম্যাকেঞ্জীন ম্যান্‌সানে এলাম। লিফ্‌টে করে রহমান উপরে চলে গেল।

নীচে প্রতীক্ষায় ছিলাম। একটু দূরে গাছের আড়ালে মিঃ জর্জ আমার দিকে চোখ রেখে পাইপ টানছিলেন।

মিঃ ডোনাল্ড লিফ্‌টে করে নেমে এল। সাথে রহমান।

মিঃ ডোনাল্ড এদিক ওদিক চেয়ে ডাকলে - র-বীন্।

সেট্ মি হ্যাভ্ দি রিং প্লিজ। (আংটিটি দাও তো)

রিং !!! হোয়াট্ ডু ইউ মিন্? (আংটি !!! তুমি কি বলতে চাইছ?)

আই মিন্—দি রিং অব্ মিঃ জর্জ। (আমি বলতে চাইছি মিঃ জর্জের আংটির কথা।)

বাট্ হোয়েয়ার ইজ দি এভিডেন্স মিঃ পুলিস অফিসর? (কিন্তু মিঃ পুলিস অফিসর, প্রমাণ কোথায়?)

বুঝলে দাদা, বেটার কথা শুনে লাফিয়ে উঠলাম। গম্ভীরভাবে বললাম, তোমার কৈফিয়ৎ-ই হল আমার সব চাইতে বড় প্রমাণ।

রবীনের কথায় একটু নড়েচড়ে বসলাম।

সাহেবকে ধরে নিয়ে আসলাম থানায়। বেলা তখন সাড়ে এগারো।

গ্রেপ্তার করলে তো?

তা—নয়তো কি? তবে তখনও লক্-আপ-এ দেই নি। কড়াভাবে জিজ্ঞেস করলাম। ঐ এক কথা,—আমি জানি না। তোমাদের যা খুশী করতে পার।' তিনি নাকি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ঠাকুরপো, দোহাই তোমার। এক মিনিট। দেখি ভাতটা ফুটল কিনা। গিন্নি রান্নাঘরে গেলেন। রবীন আমার দিকে চেয়ে একটু সমঝদারি হাসল।

বল—তারপর?—গিন্নি এসে ঝাঁকিয়ে বসলেন।

মিঃ ডোনাল্ডকে থানায় রেখে আবার ম্যাক্‌ড্রোন্ ম্যানসানে এলাম। ওর বেয়ারার সাথে কথাবার্তা বলে একটি খবর পাওয়া গেল। গত রাত্রিতে মিঃ ডোনাল্ড ঘরে ছিল না। খুব ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে ঘরে আসে। হল্ মার্কেটের পেছনে একটা নাইট ক্লাবে সারা রাত কাটিয়েছে। ছুটলাম সে নাইট ক্লাবে। খবর পেলাম মেরিয়ানার সাথে মিঃ ডোনাল্ড ওখানে সারারাত ছিল। থানায় ফিরে এলাম।

প্রশ্ন করতেই মিঃ ডোনাল্ড চমকে উঠল। অনুরোধ করে মেরিয়ানাকে যেন এর ভেতর টেনে না আনি। বড় ভাল মেয়ে মেরিয়ানা। খুব ভদ্র। এদব মোংরামীর ভেতর মেরিয়ানার মত মেয়ে থাকতে পারে না। মেরিয়ানার কথা বলতে বলতে মিঃ ডোনাল্ডের গলা ভারী হয়ে আসে। বার বার অনুরোধ করে, লিভ্ হার আলোন। (ওকে রেহাই দাও।)

আ—হা—। গল্প তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি?

গিন্নির কথায় অনুকরণপ্রিয় রবীন বলে উঠে—যাবে এক কাপ চা ঠাকুরপো? গল্প শোনার সংগে সংগে ও কথাটা তো একবার বলতে না?

সরল কণ্ঠে গিন্নি হাসেন। হুকুম করেন—রাজেন, চা কর তো। তিন কাপ। বুঝলি? আমার জন্যে হাফ্ কাপ।

আচ্ছা মা।

পুরাতন ভৃত্য রাজেন মার কথায় সমর্থন জানায়।

খুশী মনে রবীন আবার বলতে শুরু করে।

সাহেবকে সান্ত্বনা দিলাম। বেশতো তোমার ব্যাপারে বশধনকে ডেকে এনে আমারই বা লাভ কি। মেরিয়ানার ঠিকানাটা একবার বলনা শুনি।

আমার কথা শুনে কি যেন চিন্তা করে সাহেব। তারপর বলে···কোংপানীতে টাইপিষ্ট।

এ কথার নামডাকা বিলিতি কোম্পানী।

বড় চিন্তায় পড়ে গেলাম যাদু। কি করি ভাবছিলাম। মিঃ জর্জও আমার পাশে বসে-ছিলেন। মুখে পাইপ। মাঝে মাঝে মিঃ ডোনাল্ডের দিকে চান। উত্তেজিত চোখ মুখ।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল।

মিঃ জর্জকে বললাম, সাহেব আপনি বড়বাবুর ঘরে গিয়ে টেলিফোন করুন। অফিস ঘর থেকে আমি আপনার সংগে কথা কইব। আপনি হলেন মিস্ মেরিয়ানা, আর আমি হলেম মিঃ ডোনাল্ড। বুঝলেন তো?

আমার কথা শুনে মিঃ জর্জ মুখ থেকে পাইপ টেনে নিয়ে ফুটফুট করে হাসতে থাকেন। হাবলার মতো মিঃ ডোনাল্ড আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

মিঃ ডোনাল্ডের কথার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। কথা বলতে বলতে মাঝপথে অ-পর-নারীর মত দু'তিনবার থেমে থেমে কথা কয়।

পরীক্ষা আরম্ভ হল। অফিস ঘর এবং বড়বাবুর ঘরের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তা চলতে থাকে।

কতক্ষণ পর হাসতে হাসতে মিঃ জর্জ বড়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার হাত ধরে দু'তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন,—অ্যাচলেমেন্ট। ইউ আর এ গুড্ হিউম্যারিষ্ট। (তুমি একজন সুরসিক)

বুঝলে যাদু, পরীক্ষায় পাশ করে গেলাম। অমনি অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেম। টেলিফোন তুলেই ভায়েল ঘুরাতে থাকি ডবল টু থ্রী ফোর···।

মিস্ মেরিয়ানা প্রিজ।

মেরিয়ানা কথা বললে, মেরিয়ানা—।

ডারলিং ডোনাল্ড হিয়ার।

আবার মেরিয়ানা বলে, ইয়েস্ ডারলিং?

মিস কাম্—কাম্—কাম্ উইথ দি রিং এ্যাট···ওয়ান্স্।

হাউ কুড আই কাম্? আই এ্যাম্ অন ডিউটি নাউ।

মেরিয়ানার অমতি আমাকে খুশী করে তোলে।

অঃ—থ্যাংক ইউ মেরিয়ানা। আই—আই—আই শ্যাল সি ইউ এ-গেইন। (ধন্যবাদ মেরিয়ানা। আবার দেখা হবে।)

টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

মিঃ ডোনাল্ডের চোখ দুটো রীতিমত তীক্ষ্ণ। নাকের ডগা থেকে থেকে ফুলে উঠছিল।

মিঃ ডোনাল্ড, এবার উঠুন। মেরিয়ানার কাছে এখনই আমাদের যেতে হবে।

হোয়া-ই? (কেন?)

চড়াস্বরে প্রশ্ন করে মিঃ ডোনাল্ড।

মেরিয়ানাকে আমি গ্রেপ্তার করব। এ-কথা কি তুমি এখনও বুঝতে পারনি? আংটি মেরিয়ানার কাছেই আছে—বলে সে আমাকে বললে।

আমার প্রশ্ন শুনে মিঃ ডোনাল্ড একেবারে ভেঙে পড়ল।

দু'হাত ধরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। মেরিয়ানার মত এমন মেয়ে হয় না। আমাদের বিয়ের দিন তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। ওকে এর ভেতর এনো না বলছি। অফিস ছুটির পর ওর বাড়ি থেকে আমিই আংটি নিয়ে আসব। অফিসে এত লোকের মধ্যে ওকে এভাবে অপমান করলে, ও আমাকে কখনই বিয়ে করবে না। আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, আংটি আমি তোমাকে এনে দেবই। ওর হাতেই আংটি আছে।

উৎসবে ও অনুষ্ঠানে

ডালিমা

বিস্কুট অপরিহার্য্য

পাতিয়ালা বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিঃ

রাজপুরা, পাঞ্জাব

কলিকাতা অফিস: ১০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন: ২৩-২০১৩

সত্যি বৌদি, মিঃ ডোনাল্ড দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

না—। তোমার গল্পটা তো বেশ।

পূজা সংখ্যায় লিখে যাও না। গল্প গল্প করে তো বা বলছিলে।

সিন্ধির উৎসাহে রবীন আবার আরম্ভ করে।

মুস্কিল হল ছ'টার পর থেকে মেরিয়ানাকে আর পাওয়া গেল না। কোথাও না।

আমাদের চাইতে মিঃ ডোনাল্ডই চিন্তিত হয়ে পড়ল বেশী। বার বার সে জিজ্ঞেস করেছিল গড্, সেইক মেরিয়ানকে কিছু বলোনি তো।

বুঝতে পারলাম মিঃ ডোনাল্ড আমার কথা বিশ্বাস করল না। সারাক্ষণ টেলিফোনের উপর পড়ে রইল।

রাত প্রায় দশটার সময়—মিঃ ডোনাল্ডকে উত্তেজিত ভাবে টেলিফোনে কথা বলতে দেখলাম। পাগলের মত সে চিৎকার করে বলছিল, মেরিয়ানা, ডোন্ট্ কিল্ মি। আই শ্যাল ডাই দেন। (আমাকে মেরে ফেল না। আমি তবে মরে যাব)

চোখের জল মুছে নিয়ে মিঃ ডোনাল্ড ভিজে গলায় বললে, সে মেরিয়ানাকে পেয়েছে।

• • • •

আমাদের গাড়ি এসে থামল। হেইংস-এ একটা বাড়ির কাছে আমরা দাঁড়ালাম। মিঃ ডোনাল্ড অনুরোধ করে—আপনারা এখানেই থাকুন। আমি আংটি নিয়ে এলাম বলে।

বাধা দিই নি। মিঃ ডোনাল্ডের কথায় ব্যস্ততা দেখে ওকে একাই ছেড়ে দিলাম। তবে সমস্ত বাড়িটাতে নজর রেখেছিলাম।

—মিঃ ডোনাল্ড ফিরে চল। হাসিমুখে ছোট একটি কৌটো এগিয়ে দেয়। খুলে ফেলতেই মিঃ জর্জ বলেন, থ্যাংক্স্ গড। এই তো আমার আংটি।

থানায় এলাম।

মিঃ জর্জ অনুরোধ করেন। বার বার বলেন, মিঃ, আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিচ্ছি। আপনি ওকে ছেড়ে দিন।

ডি. সির কথায় মিঃ ডোনাল্ডকে ছেড়ে দিতে গিয়ে একটি করুণ দৃশ্য আমার মনে পড়ে গেল।

মিঃ জর্জের হাত ধরে সুন্দরী মেরিয়ানার কান্না তখনও আমি ভুলতে পারি নি। বার বার মিঃ ডোনাল্ডের হয়ে মিঃ জর্জের কাছে ক্ষমা চাইছিল।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আসুন এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৩, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

ডাঃ এস. কে. সেনগুপ্ত, এম.বি., এফ-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন), এফ.সি.এস. (আমেরিকা), হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ।

ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি., বি.এস., আয়ুর্বেদাচার্য্য।

জলের দরে—

আশাপূর্ণা দেবী

'বাড়িটা জলের দরে পেয়ে গেলাম,' উথলে উঠে বলেছিলেন কটিকদা, কতদিন যেন আগে। সাল তারিখ মনে নেই, তবে 'বাড়িভাড়া আইন' তখন চালু হয়ে পুরনো হয়ে গেছে।

সেই আইনের কাটা খালেই জলের দরে বাড়ি পেয়ে যাওয়া কটিকদার। দুর্ধর্ষ দুর্মতি ভাড়াটের আমার শান্তিপ্রিয় বাড়িওলা ভদ্রলোক ভাড়াটে সমেত বাড়িটা বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ওই মওকা।

যার নাম দাঁও।

নইলে বাড়ির দরে বাড়ি কেনবার দরের লোক নয় কটিকদা। বরাবর সামনেটুকু কোঠা, আর পিছনটা টিনের চাল, এমনি একটা ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন কটিকদা, লবণ আনতে পান্তা ফুরতো। ওই 'জলের দরের' লোভ সামলাতে পারেননি বাবে বল ছেঁচেছেন!

তবে মানুষটা বড় 'সদাহাস্য প্রকৃতি', তাই অভাব অনটনের মধ্যেও কোনোদিন বেজার দেখিনি। তখন আমার অবসর ছিল। মাঝে মাঝেই বেড়াতে যেতাম কটিকদার বাড়ি, ভারী ভাল লাগতো। কটিকদার আতিথ্যের মধ্যে আয়োজন ছিল যৎসামান্য। আহ্বান ছিল প্রচুর।

বাড়িটা কিনে ফেলার দিন উল্লাস ভরে বলেছিলেন, 'আজ তোর বৌদির হাতে খেয়ে যেতে হবে।'

বৌদি বলেছিলেন, 'আহা কী একেবারে ঘটা আমার রান্নাঘরে!'

কটিকদা বললেন, 'ঘটা তোমার রান্নাঘরে নাই থাকুক, ওর দাদার মনের মধ্যে আছে, কী বলিস রে?'

'বাড়িটা কিন্তু খুব পুরনো—' বলেছিলাম আমি।

কটিকদা বলে উঠেছিলেন, 'আরে বাবা পুরনো না হলে রাস্তার ধারে অতবড় দোতলা বাড়ি তেরো হাজার টাকায় দেয়? ভাড়াটেরা পাজী বলে বাড়িওলা বাড়ি সারায়নি কত বছর তার ঠিক নেই। তাও কিছুতে কি তেরো হাজারে নামতে চায়? শেষ পর্যন্ত দিল ওই একটু গোলমেলে বলেই।'

অতঃপর ওই গোলমালের পিছনে লেগে পড়েছিলেন কটিকদা সর্বশক্তি সংহত করে।

ছন পাতোর দলটা সাতপুরুষে। দাত জন্মে কোথাও একমুঠো মাটি নেই, কোর্টকাছারি উকিল মুহুরি এসব কখনো চক্ষে দেখেন নি, তবু মামলা লড়তে নামলেন কটিকদা। আর লড়তে লড়তেই শিখতে লাগলেন।

তখন আমার অবসর কমেছে, বেলাতেই মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম ফটিকদার বাড়ি। দেখতাম ফটিকদা আর আগের মত নিস্তব্ধ সন্ধ্যার মনোরম অবকাশে বৌদির আঁচল তলায় বসে ছেলেকে নিয়ে 'পড়ানো পড়ানো' খেলা করছেন না।

হয় বাড়িতে নেই, নয় বাইরের দিকের ঘরটায় বসে একটা রোগা সিড়িঙে লোকের সঙ্গে গুজগুজ করছেন।

ভিতরে গিয়ে বলতাম, 'কি বৌদি, দাদা অন্তঃপুরের কুঞ্জন গহন ছেড়ে ওই কাকতাড়ুয়া মার্কা লোকটার সঙ্গে কি এত প্রেম গুজন নিয়ে পড়েছেন?'

বৌদি বলতেন, 'আর বোলো না ভাই, কী যে এক হতচ্ছাড়া বাড়ি কিনলেন, ইহকাল পরকাল গেল! লোকে গাল দিয়ে বলে, 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক!' আর উনি কি না সেধে সেই মামলা বুকে করলেন! তার থেকে ওই টাকাটা দিয়ে যদি এরকম টিনের চালাও তুলতেন একখানা অনেক শান্তির ছিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা সব ঘুচিয়ে কী কাজই করলেন!

যতক্ষণ থাকতাম, বৌদি আক্ষেপ করতেন, 'সময়ে নাওয়া খাওয়া নেই মানুষটার, চাকরী তো প্রায় শিকেয় উঠছে, ছেলেটার পড়া শোনা গেল! কথার মধ্যে কথা শুধু মামলার কচকচি, আর ভাড়াটেকে গাল মন্দ!'

কোনো কোনোদিন কাকতাড়ুয়া বিদেয় হয়ে গেলে ফটিকদা ভিতরে এসে বলতেন। তবে তখন আর মামলার কচকচি করতেন না অবশ্য আগের মতই উদাত্ত গলায় বলতেন, 'কী? আমার নিন্দে চলছে তো? তোদের বৌদির কাছে আমার আর নিন্দে ছাড়া প্রশংসা হল না কখনো?'

বৌদি রেগে বলতেন, 'তারী প্রশংসার কাজ করেছ যে? একটা লোক মনের ঘেন্নায় যে অজ্ঞাল জলের ঘরে ত্যাগ করে গেল, তুমি সেই অজ্ঞাল সোধ ঘরে তুলে—'

'আরে বাবা, দেখো দেখো কিছুদিন পরে দেখো। যখন ভাড়াটে তুলে দিয়ে তিনতলায় ঘর তুলে তোমায় সেই চূড়োর ওপর প্রতিষ্ঠা করবো, তখন দেখবে!'

তিনতলায় ঘর তোলার কথা শুনে বৌদি চটে উঠতেন। বলতেন, 'তা সেটা হবে কোথা থেকে? লটারির টাকা পাবে বুঝি? ওই বাড়ির ধারের ওপর মামলায় খরচা হেগেছে. দিন অচল হয়ে উঠছে, এই বাজারেই ভাড়া জোটাতে পারা যাচ্ছে না। আর উনি তিনতলার স্বপ্ন দেখছেন! ওই বাড়ি বেচেই বাড়ির ধার শোধ করতে হবে তোমায়, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

ফটিকদা কিন্তু চটতেন না।

বলতেন, 'তোমার তো চিরদিনই দিব্যদৃষ্টি। তা' এতই যদি দৃষ্টিশক্তি এই হতভাগ্যের গলায় বরমাল্যটা দিতে গিয়েছিলে কেন বল দিকি?'

বৌদি বলতেন, 'মতিভ্রম! নইলে আজ রাজার রাণী হয়ে বসতাম কোন্ না!'

বলতেন, কিন্তু মুখের ভাবে রাজার রাণীর সোহাগী ভাবটি ফোটাতেন।

ফটিকদা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসতেন। তারপর চোখ ফিরিয়ে আমাকে বোঝাতে বসতেন, 'শুধু একতলা দোতলা ভাড়া দিয়েই কীভাবে সেই বিপুল পরিমাণ টাকার 'জলের'

যায়, এবং মামলার ধার শোধ করেও তিনতলা তুলবেন।··· মুখে মুখে হিসেব করে বুঝিয়ে দিতেন ক'বছরে ধার শোধ হয়ে উদ্বৃত্ত থাকতে সুরু হবে।

বলতে বলতে কটিকদার চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠতো। যেন আকাশে উপলব্ধি করে নিজেকে নিজে শোনাতেন, 'তাড়া ওই দোতলা, একতলা, ব্যস! তিনতলাটা সবটা নিজের রাখবো বুঝলি? সামনে একটু বারান্দা থাকবে—তাতে টবের বাগান হবে। তোর বৌদি তো আবার একটু 'কবি কবি' আছে? ফুলগাছের তারী শখ! আবার বলে—শুদ্ধ টব কুলিয়ে বারান্দা দাজাবে! শখের প্রাণ গড়ের মাঠ আর কি।'

হা হা করে হেসে উঠে বলেন কটিকদা, 'আমিও বলেছি, বেশ বাবা, ওই বারান্দায় তুমি ফুলস্ত বাগান ফুলস্ত বাগান যা ইচ্ছে কোরো। ওটা সম্পূর্ণ তোমার। চিরটা কাল তো এই টিনের ঘরে গেল!'

কটিকদার ক্লাস 'ওয়ানে' পড়া ছেলেটা হাতের বই রেখে হাঁ করে বাবার হিসেব পত্র অঙ্ক কথা শুনতো, স্বপ্ন কথাও শুনতো। কখনো কখনো বলতো, 'তিনতলার ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে কী মজা। এখানে ছাত নেই কিছু না!'

কটিকদা বলতেন, 'উঠিস বাবা ছাতে। মামলাটা একবার মিটতে দে। দেখবো কত ঘুড়ি ওড়াতে পারিস।'

চলতে লাগলো সেই মামলা।

কটিকদার ছেলেটা ক্লাস ওয়ান থেকে টু, থ্রী, ফোর, ফাইভে উঠলো বগড়ে বগড়ে, তার বাবার আর 'ভাড়াটে উচ্ছেদ' মামলা সাঙ্গ হয় না।

ইয়ানীং অবশ্য ওখানে বেড়াতে যাওয়া অনেক কমে গিয়েছিল আমার সময়ের অভাবে, হয়তো বা আকর্ষণের অভাবে।

ক্রমশঃই যেন পরিস্থিতিটা কুশ্রী কুৎসিত হয়ে উঠছিল কটিকদার বাড়ির। সেই উদাত্ত স্বর ঘুচে গিয়েছিল কটিকদার, ঘুচে গিয়েছিল হাসি। গিয়ে বসলেই সুরু করতেন মামলার প্যাঁচের কুটকচালে কথা, আর 'হারামজাদা' ভাড়াটের প্রতি ইতর গালিগালাজ আর শাপশাপান্ত!

কটিকদার মুখ থেকে যে ওই নোংরা কথাগুলো বেরোনো সম্ভব, বছর কয়েক আগেও কি কেউ ভাবতে পারতো?

কিন্তু শুধুই কি কটিকদা?

বৌদির মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তন আসছিল। হয়তো অবিরত দৈন্য আর দুর্দশায় নির্লজ্জ থাকার থাকায় ভেঙে পড়ছিল সভ্যতা সুষমা সৌন্দর্য সৌকুমার্য। ভেঙে পড়ছিল নীতি সত্যবোধ। বৌদির মুখেই তাই শুনেছিলাম, 'তা তাড়া না দিয়ে যদি পাঁচ দশ বছর চালানো যায়, তুমিই বা তোমার এ বাসার তাড়া ছেড়ে মরবে কেন? দেবেনা তাড়া, গাঁট হয়ে বসে থাকবে! মামলা তোলে, তুলুক! একটা লড়ছে না হয় দুটো লড়বে। অপমান করতে আসে, আমারও ঝাঁটা আছে।'

বৌদির মুখেই শুনেছিলাম, 'এত লোকের সাড়ী চাপায় মরণ হয়, ওই পাজী চামার বাদর ছোটলোকটার হয় না ?' কোর্ট থেকে ফেরার পথে আর না বাড়ি ফিরতে হয়। ট্রামের লুট দিই তা'হলে।'

বৌদির চুলগুলো হয়তো ছেলের অভাবেই রুক্ষ, ধূসর দেখাতো, বৌদির শাড়ীটা অসংখ্য সেলাইয়ের নিদুর বাঁধ নিয়ে যেন হাঁফ খিঁচিয়ে থাকতো, আর বৌদির হাড় উঁচু হয়ে যাওয়া গালের উপর চোখ দুটো আগুনের ভেলার মত জ্বলতো!

দুল গাছের শখ আছে বৌদির, কিন্তু তখন ভাঁড়ে কলাইকরা সেলাসে চা করে দিতেন আমাকে, আর বলতেন, 'এত দামও হয়েছে কাপ প্লেটের! রাখ করে আর কিনিনা! থাক আমার এনামেলই ভাল।'

ফটিকদার ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলেটা কোড়ন কেটে উঠতো, 'ওই নচ্ছার ভাড়াটেরা যতদিন না বিদেয় হবে, ততদিন আর কিছু হবে না। এরপর মাটির ভাঁড়ে চা খেতে হবে।'

যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন ফটিকদা নিজেই হাজির! বোধ হয় বছর দুই যাইনি, মনে হল যেন দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে ফটিকদার!

কিন্তু শুধুই কি বয়েস বাড়া?

বয়েস বাড়লেই কি এমন হতশ্রী চেহারা হয় মানুষের? ফটিকদার নামটা যে তাঁর ফটফটে ফর্সা রং থেকেই উদয় এখন একথা বললে সেই বক্তাকেই কি গায়ে থুলো দেবে না লোকে?

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা নাপিত আসতো, আমার মা তাকে বলতেন 'বাঘড়া আমসি!' ফটিকদার চেহারাটা দেখে হঠাৎ সেই নাপিতটাকে মনে পড়ে গেল।

তবু মনে হল এতদিন বোধ হয় মামলার শেষ হয়েছে ফটিকদার, সেই সুখবরটা দিতে এসেছেন। নইলে কেন আর—

কিন্তু না, সুখবর নয়, অন্য কথা।

ফটিকদা বললেন, 'তোর সঙ্গে তো অনেকের চেনা জানা আছে, বলে কয়ে ছেলেটার একটা ফ্রী শিপের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস না?' একটু টাইট্ যাচ্ছে তো?'

তাড়াতাড়ি কোনও উত্তর দিতে না পেরে বললাম, 'কোন ক্লাস হল?'

'এই তো ক্লাস এইটে উঠবে। দু'মাস বুঝি ঠিক সময়ে মাইনে দেওয়া হয় নি, তাই হাজেলরা প্রমোশন আটকেছে। এই আমাদের দেশ; বুঝলি? অথচ অন্য অন্য দেশে—'

আস্তে বলি, 'ফটিকদা, তোমার সেই বাড়ির কি হল?'

ফটিকদা একটু মড়েচড়ে বসলেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে অকারণ স্বর নামিয়ে বললেন, 'একটু সুরাহা দেখা যাচ্ছে! বেটা কিঞ্চিৎ নরম হয়েছে মনে হচ্ছে। জেরবার হয়ে উঠেছে তো!'

ফটিকদা তাঁর প্রতিপক্ষের 'জেরবার' হওয়ার উল্লেখ করে উল্লসিত হন। তারপর বলেন, 'অনেকদিন তো যাসনি। তোর বৌদি বলছিল—।

অপ্রতিভ হয়ে সময়ের অভাব, শরীরের অজুহাত ইত্যাদির কথা তুলে বৌদি কেমন আছেন প্রশ্ন করি।

ফটিকদা কিঞ্চিৎ বিপ্রত হন।

বলেন, শরীরটা ওর তেমন ভাল যাচ্ছে না! এদিকে যায় কর্তা, ওদিকে মামলা, একটা যে লোক টোক রাখবো তাও তো সুবিধে করতে পারছি না। বাড়িটা হাতে না আসা পর্যন্ত— রয় তো দিন দিন চড়ছে। সবাই বলছে ওই রাস্তার ওপর বাড়ি, কমসে কম পাঁচ ছ' শো টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে। ভাবছি এমনিই একটু কলি ফিরিয়ে, ওইটাই এখন ভাড়া দিয়ে একটু সামলে নেব। তিনতলা তখন পরে দেখা যাবে!'

'একদিন যাস্—' বলে উঠে পড়লেন ফটিকদা এবং যাবার মুখে একটু ইতস্তত: করে বলে উঠলেন, 'লোটা কতক টাকা হবে? ছোড়ার বাকি মাইনেটা নিয়ে গিয়ে হারামজাদাদের মাকের ওপর ছুঁড়ে দিতে পারলে রাগ যেত।'

তাড়াতাড়ি টাকাটা এনে দিলাম।

কিন্তু ফটিকদার মুখে লজ্জার ছাপ দেখলাম না, দেখলাম রাগের ছাপ!

এটা কি চেষ্টাকৃত? লজ্জা ঢাকবার আবরণ? না, নিজেকে ফটিকদার গরীব মনে হয় না, পাঁচ ছশো টাকা ভাড়ার বাড়ির মালিক বলেই মনে হয় নিজেকে?

গেলাম একদিন।

দেখলাম বৌদির চেহারায় বার্ধক্য যেন প্রখর থাবা বসিয়েছে। রোগ শোক অভাব, এইখানেই তো বার্ধক্যের ঘাঁটি।

সামনের দুটো দাঁত পড়ে গিয়েছিল বৌদির, তবু হাসলেন। বললেন, 'পথ ভুলে না কি?'

আমিও হাসলাম। কৈফিয়তের ছলনা দিলাম আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। পলতারা খসা দেয়ালগুলোয় এ যাবৎ যে আর কোনোদিন চুন ঠেকেনি, তার চিহ্ন দেদীপ্যমান! সংসারের সমস্ত পলতারাই যে খসে পড়েছে, ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় সেটা।

অনেক দিনের এটা ওটা খবর নিতে নিতে হঠাৎ যে কখন বৌদি মামলার কথায় চলে এসেছিলেন খেয়াল করিনি, খেয়াল হল বৌদির মুখে কয়েকটা অপরিচিত শব্দ শুনে। বেশ অবলীলায় কোর্ট কাছারির চলতি কথাগুলো উচ্চারণ করে যাচ্ছেন বৌদি, যাহু দালাল বা উকিল মুহুরির মত।

না বলে পারলাম না, 'বাবার মামলার দৌলতে, তুমি তো বেশ অনেক কথা শিখে ফেলেছ বৌদি!'

ফটিকদা দীর্ঘ দীর্ঘ দেশী দেশী মুখে বলে উঠলেন, 'তা যদি বলসি, জিতি তো তোর বৌদির বুদ্ধির জোরেই জিতবো। সাতটা উকিলের কান কাটতে পারে ও। আবার বলে, পারবো না কেন? লোকে পাঁচ বছর ন' পড়ে উকিল হয়, আমি এই আট বছর ন' পড়ছি।'

আট বছর ন' পড়া বৌদির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প চালাই, তারপর উঠি। বাড়ির কথা আর তুলিনা। বৌদি নিজেই হঠাৎ বলেন, 'বদমাইস পাজীদের আবার বাসনাকা শুনেছ? বলে কিনা

উঠে যেতে রাজী আছে কিছু সেলামী দিতে হবে। আমিও বলেছি, 'সেলামী দেব তোকে আমি? ঘাড় ধাক্কাতে লক্ষ্মীছাড়া, তুইই আরেক সেলামী দিয়ে যাবি তবে আমার বাসা!'

ছোঁদ নেই, সন্ধ্যার আকাশ—

তবু কান দুটো হঠাৎ কি রকম গরম গরম লাগলো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরের হাওয়া লাগাতে।

ফটিকদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরোলেন। বললেন, 'একটু চাও খেলি না?'

চায়ের 'অফার' করেননি ফটিকদা, কিন্তু সে কথা কে কবে বলতে পারে। ব্যস্ত হয়ে তাই বৌদির অসুস্থতার কথাই তুললাম।··· মুখে আসছিল বলি, 'একেবারে তোমার পুরপ্রবেশেই যাবো!' কিন্তু মুখে আসছিল, মুখ থেকে বেরোলনা।

তারপর অনেক দিন গেছে, জীবন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। জীবনের প্রারম্ভে যাদের নিয়ে সুরু করেছিলাম, তারা ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে, আসছে নতুন আত্মীয়, নতুন বন্ধু, নতুন মুখ। সত্যি বলতে ফটিকদার কথা প্রায় ভুলেই গেছলাম।···

হঠাৎ একদিন ফটিকদার ছেলে ছোট্ট একটা কৌটোয় খান কয়েক বাতাসা, গোটা কয়েক এলাচদানা, আর দুটো মুড়ি সন্দেশ নিয়ে এসে হাজির।

সত্যনারায়ণের শিন্নী দেওয়া হয়েছে, তার প্রসাদ।

'মামলা তাহলে শেষ হয়েছে?' বিগলিত আবেগে বলে উঠি, 'তোমরা জিতেছ?'

ছেলেটা মুখ নেড়ে খিটিমিটি হেসে বলে, 'জিতবোনা মানে? ভূতের কাছে মামলোবাজী কতক্ষণ চলবে? হকের ধন, মদনমোহন! 'বাপ বাপ' বলে ছেড়ে দিয়ে যেতে পথ পেল না। কালই তো কনট্রাকটারকে কল দেওয়া হয়েছে। উকিলবাবুই দিইয়েছেন। ওঁর চেনা কনট্রাকটার। খুব ভালো। একেবারে ছেড়ে সারিয়ে দিনতলা তুলবে।'

তিনতলা! যার বারান্দায় বৌদির বাগান হবে?

এবার অবাক না হয়ে পারলাম না।

ফটিকদার ভাড়াটে কি মেরে দিয়ে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেছে? সেই প্রশ্নই করে বসি। না করে পারি না।

ছেলেটা বিজ্ঞের মত বলে, 'হুঁঃ! ক্ষতিপূরণ! তা' হলে তো পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত! এ অন্য ব্যাপার! ব্যাপার হচ্ছে—বাড়িখানা এখন ওই কনট্রাকটারকেই মর্টগেজ দেওয়া হচ্ছে, ও সারাবে। ভাল ভাড়াটে এনে বসাবে। সেই টাকা থেকেই—মানে, মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি।'

ভেবে দেখলাম 'ন' একা বৌদিই পড়েন নি, এই ছেলেটাও জানাবধি পড়ছে। অতএব মাছের তেলে মাছ ভাজবার কৌশলটা ওর মাথায় সহজে প্রবেশ করেছে।

প্রসাদটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার এখন কোন ক্লাস হলো?'

ও একটু 'কিন্তু' দিয়ে বললো, 'ক্লাস ইলেভেন হতো এবার। এই মামলার ঝঞ্ঝাটে পড়া টড়াতো হয়ই না। আরগাই বা কই বাড়িতে?'

তাড়াতাড়ি চলে গেল।

অর্থাৎ 'ক্লাসে উঠতে পারিনি', এই কথাটা এড়িয়ে গেল।

যাক তবু মামলাটা মিটেছে।

একটু উৎসাহ এল।

'যাই যাই' করে ক'দিন পরে গেলাম একদিন ওদিকে। গেলাম সত্যিই ফটিকদার সেই বাড়ি সংস্কার হচ্ছে। জরাজীর্ণ বুদ্ধকে যেন টেনে তোলা হচ্ছে।

ইদানীং এক আধদিন ফটিকদাও আসেন।

বলেন, 'মামলাটা নেই, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। চলে এলাম।' মিস্ত্রীর মুখে খেটে পিটে আর রোদে পুড়ে, চেহারাটা আরো পাকসিটে হয়ে গেছে ফটিকদার। রংটা কালো কুল। তবু উৎসাহের প্রাবল্যে একটু যেন ভাল দেখায়।

এসেই হাজার হাজার টাকার গল্প ফাঁদেন ফটিকদা। গল্প ফাঁদেন কীভাবে ব্লাকে 'টন্ টন্' সিমেন্ট জোগাড় করছেন ফটিকদা। গল্প করেন, জানলার শিকগুলো ভেঙে ফেলে কত নম্বর লোহার গ্রীল বসাতে হবে। ঘোড়েইকের ফোন নম্বরটা আমাদের বৌদির পছন্দ।

'বাথরুমে মার্বেল পাথর বসাবো বুঝলি?' ফটিকদা মহোৎসাহে বলেন, 'শাদা কালোর শতরঞ্চ প্যাটার্ন নক্সা। ওরা বলছে, এখন নাকি আর মার্বেলের মেজের ক্যাসান নেই।..... কিন্তু আমার তাই চিরকালের শখ! হোকগে ওল্ড ক্যাসান। দেখতে ভাল লাগে না?'

শুনে শুনে অদ্ভুত লাগে।

ফটিকদার চিরকালের শখ মার্বেলের মেজের বাথরুম!

ফটিকদার বাসার সেই খোলা উঠোন আর চৌবাচ্চাটা মনে পড়ে যায়। পুরু শ্যাওলার বেটনী ঘেরা—চৌবাচ্চার ধারে কাছে যাওয়া শক্ত। পিছিলে গায়ের মত পিছল।

মার্বেল মোড়া বাথরুমের স্বপ্নে ওই শ্যাওলাগুলো সাফ্ করতে ভুলে যাবেন ফটিকদা, না দরকার বোধ করেন না?

'দুদিন বাদে উঠে যাবো' এই মনোভাব নিয়েই সংসার করে চলেছেন কি না!

কবে সেই উঠে যাওয়ার দিন আসবে ফটিকদার?

অবশেষে সত্যিই একদিন ফটিকদার বাড়ি শেষ হয়। বড় রাস্তার উপর বিরাট তিনতলা বাড়ি। তিনটে তলায় ছটি ফ্ল্যাট।

এক একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া ছশো আড়াইশো তো হবেই।

চেনা মহলে এবার ফটিকদার 'ভাগ্যে'র আলোচনায় যেন একটা সাড়া পড়ে যায়। বাস্তবিক কী জোর বরাত!...অন্যের ঘরে একখানা পুরনো বাড়ি কিনে, এখন কিনা তেরো চোদ্দশো টাকা মাসিক আয় হবে তা' থেকে।

'শুধু কপাল নয় বাবা, বুদ্ধিও।' বলল সবাই। ফটিকদাও 'অ'প্রসাদের হাসি হাসেন, 'কপাল টপাল নয় বাবা, স্রেফ্ বুদ্ধির খেলা!'

একদিন কথায় কথায় বলে ফেললাম, 'সব ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দেবে? একবার ভাড়াটে ঢুকলে, তার কী পরিবার তাতো হাড়ে হাড়ে টের পেলে? একটায় অন্ততঃ নিজে থাকো? তোমার সাহেব মার্কেল পাথরের বাথরুম—'

ফটিকদা বলেন, 'ইচ্ছে ছিল বুঝলি? তোদের বৌদিও খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানিস? মর্টগেজ রয়েছে তো? ওটা না ছাড়ানো পর্যন্ত বাড়িতো ওদের। এখন আমার থাকা মানে রীতিমত ভাড়া দিয়ে থাকা। তা, অত ভাড়া কোথা থেকে দেব বল? তা' হিসেব করে দেখছি বছর আষ্টেকের মধ্যেই ধার দেনা প্রায় সব শোধ হয়ে যাবে। আর ছেলেটাও তো বড় হয়ে উঠল ক্রমশঃ!'

'ছেলে বড় হয়ে ওঠা' একটা আশার কথা। পুলকিত হই। জিজ্ঞেস করি। 'কী করছে ও আজকাল?'

ফটিকদা নিয়তির অমোঘ বাণীর সুরে বলেন, 'করবে আর বিশেষ কি। হায়ার সেকেণ্ডারিতে তো দু'দুবার ঠোকর খেলো। দিয়েছি একটা রেশন শপে ঢুকিয়ে। পাশ না করলে নেয় না। জানাশোনার 'গু' দিয়ে কোনো রকমে ঢুকিয়ে দিয়েছি।···ওর মা একটু ইয়ে করছিল রেশন শপের

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !! সমস্যা নয় সমাধান !!!

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর
জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে। এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।
বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।
মূল্য : ৪'৭৫ নয়া পয়সা
প্রকাশক : শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান : ৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫—৬৮২৭
সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

চাকরী শুনে, সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালাম ; ও চাকরী ক'দিন করবে ? এই যে কটা বছর একটু টাইটে আছি।...এরপর তো ব্যাটা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে, বাড়িভাড়ার টাকায় খাবে।'

বললাম, 'কতদিনে তোমার বাড়ি তোমার হাতে আসবে ?'

কটিকদা বললেন, 'ওই যে বললাম। বছর আষ্টেক। বেটাকে বলি এই ক'টা দিন 'কাকায় গুণ ফেলে' বসে থাক্ বাবা ? তারপর তো আসছে দিন ! আত্মীয় স্বজন হিংসে করছে খুব, বুঝলি ? বলে একেই বলে 'পাতা চাপা কপাল !' ফ্রেক অলের ঘরে কেনা মাল। এখন সোনার ঘরে পৌঁছেছে।'

তবে কটিকদার সেই 'সোনার জীবনে' পৌঁছতে এখনো বছর আষ্টেক। ওই আট বছরের মধ্যে কটিকদার খোঁজ নেবার দরকার নেই বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। হঠাৎ একদিন কার মুখে যেন শুনলাম, কটিকদা কলতলায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে 'শয্যাশায়ী পঙ্গু' হাসপাতালে রয়েছেন।

শুনে এতদিন খোঁজ না নেওয়ার অপরাধে লজ্জাবোধ করে। কম নম্বর বেড নম্বর সব জেনে নিয়ে দেখতে গেলাম কটিকদাকে। অথবা তাঁর ভাঙা কোমরকে ! যুড়ো হাড়—সারতে সময় লেগে।

আমাকে দেখে ভারী খুশি হলেন কটিকদা। 'বোস বোস' করলেন। তারপর—ঠিক কোন 'এ্যাঙ্গেলে' কী 'পজিশনে' আছাড়টা খেয়েছিলেন। তার বিশদ বিবরণ শোনা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনো তাহলে সেই পুরনো বাড়িতেই আছো ?'

যদিও মনে হলো জিগ্যেস করাটা বাহুল্যই হলো।

কলতলায় পিছলে পড়ে কোমরের হাড় ভাঙবার জন্যে অমন আইডিয়াল জায়গা আর কোথায় পাবেন ? নিশ্চয়ই ও বাসা ছেড়ে দেবেন ভেবে—চৌরাস্তার ধারের সেই ভাওলাগুলো আর পরিষ্কার করাননি কটিকদা।

আমার প্রশ্নে কটিকদা প্রাঞ্জল হন। 'কি বলনি ? পুরনো বাসাতেই আছি কি না ? তা' তো থাকতেই হয়েছে। বাসা আর পাচ্ছি কোথায় ? বলবো কি বাড়িওলাটা দিন দিন যেন চামার হয়ে উঠেছে। কি কথায় বলে, 'অট্টালিকা তো হাঁকিয়েছেন। গরীবের আস্তাবলে আর পড়ে থাকেন কেন ?' তোর বৌদি একদিন রাগ করে শুনিয়ে দিয়েছিল কিনা—'আপনার বাড়িখানি তো আস্তাবলের অধম !' তার শোধ নেব আর কি !...বেটার মুখের ওপর দিয়ে মসমসিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতাম—তা' ওদের মর্টগেজের মেয়াদ ফুরোতে তো এখনো তিনটে বছর বাকি।...তারপর অবিশ্যি বাড়ি আমার হাতে আসবে। আমি যাকে ইচ্ছে ভাড়া দিতে পারি। কিন্তু কলকাতাটায় একটা অফিস স্টাফকে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। চুক্তির মেয়াদ ফুরোলেও, তাদের দাবি সর্বাগ্রে। কাজেই ফ্ল্যাট সব ভর্তিই থাকবে। সবাই বলছে চারতলায় টিনেকোঠার পাশে একখানা ঘর তুলে, নিজের জন্যে ছোট একটা ফ্ল্যাট বানিয়ে নিতে। জলের অসুবিধে তো হবে না, পাম্প বসিয়েছি।...কিন্তু—' কটিকদা একটা হাই তুললেন। কোমরটা নড়াতে না পেরে মুখটা একটু কোঁচকালেন, তারপর বললেন, 'ভাবছি মিথ্যে খরচে আর দরকার কি ? চারতলার ঘর নিয়ে কী করবো ? এই তো কোমর ভাঙলাম ! তোর বৌদিরও তো বাতের ব্যথায় হাঁটুর অবস্থা তথৈবচ।'

শরৎতলায় প্রণত সুলগ্নে

কবীরুল

আকাশে শরৎ!
বাতাসে শরৎ।
মাটীতে শরৎ!

সুকান্ত চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখল। চায়ের টেবলের পাশ দিয়ে লম্বা কাঁচের জানালাটা, বাগানে বার হয়ে গেছে। সেখানে মালী গাছকাটা কাঁচি হাতে একটা একটা করে পল্লব বেছে বেছে শুকনোগুলো কেটে ফেলে দিচ্ছে। বারনেদে শিউলীগাছে স্তবকে স্তবকে ফুলগুলো নীচের সবুজ ঘাসে। শরতের বাতাস বারন্দ ছেঁয়া ঝরিয়ে দিয়েছে গা থেকে; হাল্কা-শুকনো বাতাস মাটী থেকে শিউলী কুড়িয়ে নিচ্ছে, ইতস্তত ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘাসের সবুজ কাজে চুমকি যেন বসানো হচ্ছে।

সুকান্ত লাল-ডেলমেট ঘোড়া চেয়ারখানা ছেড়ে উঠল। এবার কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হবে সে। ব্যারিষ্টারী প্র্যাকটিস্ প্রচুর তার।

নিত্য নূতন আনন্দের আহ্বানদিকে জীবন ভরা। তবু কখনও বা বেসুর বাজে।

কর্কশ গলায় মহিলা কোনও বলেন, "এত দেরী হচ্ছে কেন? যাবার পথে বনমালী মামার বাড়ী হয়ে যেতে হবে না?"

এই কণ্ঠের নির্দেশ শুনতে অভ্যস্ত সুকান্ত মিত্র। অভ্যস্তভাবে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে পা বাড়াল অন্দরে।

খাবার টেবলে মুখোমুখি স্বামী-স্ত্রী। মোটা-মোটা আড়ুলে শেষপাতের ক্ষীরটুকু চেটে খেতে খেতে স্ত্রী বল্লেন, "আমি ওখানে থাকব। সোজা বাড়ী ফেরার পথে তুলে নেবে আমাকে।"

সুকান্ত মাথা নেড়ে রুপোর থালা সরিয়ে উঠল। নরম তোয়ালে, সুগন্ধি সাবান সহযোগে হাতমুখ ধুয়ে চলে এল। গাড়ী অপেক্ষায় আছে, এখনি বা'র হয়ে যেতে হবে।

জামা-কাপড় ছাড়ার ঘরের পাশে ড্রেসিংরোমে একটা সোল টেবলে রাখা আছে একগোছা হলুদ ডালিয়া ও সূর্য্যমুখী। হঠাৎ সেদিকে চেয়ে মনে পড়ে গেল।

হলুদ শাড়ী পরেছিল সে, হাতকাটা সবুজ জামা। সেই বনভোজনের দিনে। মনে হয়েছিল যেন সূর্য্যমুখী ফুলই একটি।

হাত ভরে ভরে মালা ঝুনোফুল তুলেছিল তারা। গাছভরা ফুল চতুর্দিকে—সেদিনও শরৎ ছিল কি না।

সর্ব্বদা হাসত সে, সূর্য্যের মত উজ্জ্বল মুখে হাসি লেগে থাকত। চুলে ছিল পাকা ধানের ঘ্রাণ, রং ছিল মেঘবরণ চুলের।

গাড়ীতে বসল তারা। দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে চলল গাড়ী। গলাটি পাশ থেকে ক্রমাগত নিষ্কণ্ণ শরবর্ষণে রত।

"তোমার পিসতুতো বোনের বিয়েতে এবারও কি টাকা দিতে হবে?"

অতিকষ্টে পূর্ব্বদিনের স্মৃতি থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে সুকান্ত বলল, "কি বলছ?"

"বলছি? কী আশ্চর্য্য, পাশে বসে কথা বললে ভদ্রতায় লেশটুকুও তোমার থাকে না? বলছি, মেনার বিয়েতে অনেকগুলো টাকা চালতে হবে না কি?"

"ওদের অবস্থা ভালো নয়। আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য আশা করা—"

সমস্ত কথার উদ্দেশ ডুবে গেল, মাথা ডুবে গেল। আশা! খট্‌খটে শুকনো রোদে রাঙা দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ফুটে উঠল হলদে ফুলের সারি। রোদ ঝিমিয়ে এল অশেষ প্রত্যাশার ভারে।

"আশা অনেকই তো করে অনেকে। অনেক কিছুই আশা করেছে, অনেক কিছু পেয়েছে। কিন্তু তোমার রোজগারে সংসার চালানোই দায়। আমার টাকা ভেঙে ভেঙে আমি দান-খয়রাত করতে পারব না আর। নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে আমাকে। একটা ছেলে-মেয়ে নেই পর্যন্ত।"

কণ্ঠে অভিযোগের সুর প্রবল। যেন স্বামী ইচ্ছা করে পত্নীকে পুত্রবতী করে নি, মাতৃত্বলাভ থেকে বঞ্চিত করেছে। চিরদিনরাত্রি সুকান্তের আচ্ছন্ন এই কথায় রাগে। তৃপ্তির পরিপূর্ণ পত্নীর, যখন-তখন তীব্র নিক্ষেপ অভ্যাস।

মনে পড়ে গেল একটি গল্প—ইংরেজি গল্প। আপাত মোহে ধাত্রীর লাভের আশায় নায়ক বেছে নিয়েছিল ধনবতীকে। সমস্ত কিছু উপাদানে গ্রথিত আছে সুকান্তের নিজের গল্প। নিরাসক্ত চিত্তে সময় কাটাবার জন্য গল্পটি পড়েছিল সে, ভেবে দেখেনি। এখন মনে পড়ে যাওয়াতে হতবাক হয়ে সামুদ্র দেখছে।

অনিবার্য্য গতিতে কণ্ঠ বলে চলেছে, "বিয়ের পর থেকে এই দেখছি। বাবা আমাকে যা দিয়ে গেছেন অন্তকে বিলিয়ে দিলে আমার চলবে কেন?"

প্রান্তরে সেদিন শরৎ ফুল ফুটিয়েছিল। একটা শিউলি গাছ আলো-করা ফুলের বাহার। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শিউলির বনে, মনে, আকাশে-বাতাসে। অপরূপ উদ্যাপনার দেশে এসেছিল শরৎ। আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের গালিচায়—এমনি ঘাস—ওই যে দূরে অক্টারলোনির পাদদেশ ঘিরে আছে,—বসেছিল তারা দুজনে।

আস্তে আস্তে গান ধরেছিল সে, অস্ফুট গুঞ্জনে:—"মধুর, তোমার শেষ যে না পাই,

প্রহর হল শেষ"—

একটু দূরে একটা জলা, এই যে চিক্‌চৌবিয়া স্মৃতিসৌধ ছেড়ে চলেছে গাড়ী চৌরঙ্গী ধরে উদীপ্ত বেগে একটা টলমলে ছোট বাঁধা জলাশয়ের ধার ধরে,—এমনি একটা জলের ছায়ায় দুধ দিয়েছিল সেদিনকার নীল-পাদা আকাশখানি।

সূর্য্যের আলো লেগে তার সূর্য্যের মত মুখে রাঙাদুর রংয়ের খেলা। চুল উড়ছে, না-জানি কোন তেল মাখে চুলে সে! যেন শরতের পাকা ধানের ক্ষেতের আকুল-করা গন্ধ সেখানে। হাসিমুখে চেয়ে দেখছে কেমন করে ছুরি দিয়ে সুকান্ত লাল টুকটুকে একটা আপেল কাটছে।

"বাঃ, ভারী কাজের লোক আপনি, দেখা যাচ্ছে। তরকারী কুটতে পারেন?"

তখনি মুখে এল, দুজনে যদি সংসার করি, ভয় নেই, আমি দরকার হলে তরকারী কুটতেও পারব।

কিন্তু থাক, থাক। এখনই কেন? আরও একটুক্ষণ ভেবে দেখা যাক। সত্যি, বিয়ের দায়িত্ব নেবার মত অর্থনৈতিক অবস্থা আছে আমার? ঘোড়দৌড় করতে পারব কতটা? সবে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছি। গাড়ী চেপার কোনটাই এখনও রপ্ত করে উঠতে পারিনি। অতিকষ্টে সিনিয়ারের পেছনে পেছনে ঘুরে একটা কেস যদি পাই। ব্রিফ্‌লেশ ব্যারিষ্টার। বিয়ের দায়িত্ব নেওয়া সোজা নয়। কত ত্যাগ আছে। এখন একা যদি বা চলে যাচ্ছি তখন চলব কেমন ভাবে? ছোটখাটো স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হবে। এখনই বলব না। আর একটু ভেবে দেখি।

সংশয়ের কীট ভালবাসার ফুলটি কুরে কুরে খেতে লাগল।

পাশের গলা বলে চলছে, "সমস্ত সময় চুপ করে থেকে কথা এড়ানো তোমার অভ্যাস। কিন্তু বনমালী মামার বাড়ী যেয়ে দয়া করে মামীমার সঙ্গে দুটো কথা বলে আমাকে কৃতার্থ কোর। মামীমা তোমার ভাবগতিক দেখে অবাক হয়ে যান। কথা বলছ না কেন?"

ফিরে গেছে সুকান্ত প্রান্তরের দিনে। খোলা দিগন্তে দিনরাত ফুল ফুরাচ্ছে শরৎ।

মহানন্দে ওই যে কুলন্ত গাছ। বেঁকে সরে এল চলন্ত গাড়ী নিয়ন-আলোর আঙিনায়। দুপুরে নির্ঝাপিত, যেন শ্রীহীন কঙ্কালের মত কুশ্রী যান্ত্রিক কলকব্জা। বিজ্ঞাপনের ছবি ও অক্ষর রাত্রে জ্বলে ওঠে পরীর দেশের আলো লেগে। দিনে তারা সোহার কল-দেওয়া কলকারখানার ভগ্নাংশ।

প্রান্তর কিন্তু অজস্র ফুল নিয়ে ফুটে উঠেছে প্রথম শরতের ছোঁয়া লেগে। এমনি একটি প্রান্তরে শরৎকে প্রত্যক্ষ করেছিল সে মূর্তিমতী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মধ্যে।

প্রতিবেশী বন্ধুর দিদির ননদ। দিদি এসেছিলেন, পিত্রালয়ে মধ্যপ্রদেশ থেকে কিছুদিনের জন্য। পাশের বাড়ীতেই ছিলেন। সেখানেই দেখা।

বোতলার বারান্দায় ঝুঁকে রাস্তা দেখছিল একপিঠ কালো চুল মেলা।

বাসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখল সুকান্ত সেদিন।

পরের দিন আলাপ হল। একই বাস-স্টপে উঠতে হয় দুই বাড়ীর।

"রজনী বেরিয়ে গেছে অফিসে, না?" গায়ে-পড়ে সুকান্ত বলল। বন্ধুর আত্মীয়া সুতরাং তার সঙ্গে আলাপ অবশ্যই উচিত কর্ম।

"না তো। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন উনি। আজ তথাগতের টনসিল কাটা হবে। নার্সিং হোমে গেছে। আমিও যাচ্ছি সেখানে।"

রজনীর বাল্যবিবাহের ফলে দুইটি সন্তান। তথাগত বড় ছেলে।

"তাই নাকি? কিন্তু এখন কি বাসে উঠতে পারবেন?"

"উঠে যাবই একরকম করে।"

ইতস্তত: ভাবে সুকান্ত বলল, "আমারও তো যাওয়া দরকার। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।"

ব্রিফ্‌লেস ব্যারিষ্টার সেদিন বেপরোয়া ট্যাক্সি চালিয়ে নার্সিং হোম, আদালত একাকার করেছিল।

তারপরেই আলাপ গাঢ়। নিবিড় অনুভূতিমণ্ডিত সেই সকল দিন ভেসে আসে সূর্যের রশ্মিপথ ধরে। কলকাতার দর্শনীয় দেখাতে হয় আশাকে। রজনীর সময় নেই। সারা কলকাতা স্মৃতি দিয়ে মুড়ে রেখে গেছে আশা।

সেই সোনার গাত্র উঠে গেছে যে সব স্থানে সেখানটায় শীর্ণমোড়া কালো বিকৃতি। নীরন-আলোয় আলোবিহীন মৃত অক্ষরের মত। সেই শীর্ণধরা দিন আজ সুকান্তের জীবন।

বেলুড় মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল শরৎকালে আশাকে। শীঘ্রই চলে যাবে আশা। দিন নেই আর। আজ বলতে হবে।

কী? তোমাকে চাই। আমার দিনরাত্রির পরিধি ঘোরে ব্যাকুল আবেষণ—হাত বাড়িয়ে আছে আমার দিন তোমারি দিকে।

সকালে উঠে মনে পড়ে, প্রাতঃভ্রমণের ছলে সেকে দেখা? সকালের শিশির ঝরানো ঘাসের শিশির তোমার বাদামী চটীর ডগায়, শিশির তোমার এলোমেলো ভেঙে-পড়া চুলের খোঁপায়। আস্তে আস্তে একত্রে পাদচারণ। কখন যে সূর্য ওঠে, সকালের চা-পেয়ালা আহ্বান জানায়, খেয়াল থাকে না। মনে পড়ে সন্ধ্যার আদর? কত ছলনা নিয়ে কাছাকাছি বসা? হাতে হাত ঠেকে, পায়ে পা ঠেকে বিচিত্র মধুর রসে দেহমন আপ্লুত। মনে পড়ে তোর রাত্রে সিনিপুলে সেদিনের সাক্ষাৎ? তীব্র চুম্বন? সেদিন আমাকে 'তুমি' বলে ডেকেছিলে তুমি।

আশা! আশা! আহা, কত সুন্দর নাম তোমার। আশায় ভরে থাকবে আমার দিনরাত্রি। তোমার সঙ্গে দারিদ্র্য হবে ঐশ্বর্য। কারণ, তুমি পিতৃহীনা, যৌতুক নিয়ে আসবে না। আমার অভিপ্রায় ছিল ধনীকন্যা বিবাহ। আমিও দরিদ্র। অতিকষ্টে নানা ফন্দীফিকিরে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছি। দেনায় ডুবে আছি। রূপ ও ডিগ্রীর জোরে ধনী শ্বশুর আমার লভ্য ছিল। কিন্তু আশা, তুমি সমস্ত ওলটপালট করে দিলে।

ভালবাসি। কত ভালবাসি! আর সময় নেই, চলে যাচ্ছ তুমি দূরে।

বেলুড় মঠ দেখে পথে গঙ্গার ধারের প্রান্তর। হাতব্যাগ একটায় কিছু খাদ্য ছিল।

ঝুলে-ঝুলে ছাওয়া গাছের তলায় সুখাসন। বাতাসে কেবল প্রেমের শাসন।

পাশের গলা বলে উঠল, "পাড়ীর দোকানগুলোয় এখনি পুজোর বাজার লেগে গেছে। এবারে পাহাড়ে যেতে হবে পুজোয়, গরম কাপড় জামা করাব।"

"পাহাড়?"

"হ্যাঁ। নয়তো কি তোমার মামার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে পুজো দেখতে যেয়ে ঘ্যাঙের ডাক শুনব? না কি, তোমার বন্ধুদের ভাঙা হারমোনিয়ামের সঙ্গে বেসুরো গানের আসরে বসব?"

"তুমি—তুমি কি কখনও বসেছ?"

"না"; নিষ্করুণ স্বর বলে চলল, "ওসব শুনে আমার হাসি পায়।"

সেদিনকার প্রান্তরে ফিরে গেল আবার সুকান্ত।

"একটা গান গাও না। আমিই তো গেয়ে চলেছি।"

"তোমার মত গাইতে পারি কি, আশা?"

"আহোক, গান একটা। আমি জানি আপনার গানের আসর বসানো একটা সখ।"

গান গাইতে হয়েছিল সেদিন। সুকান্ত ধরেছিল প্রথমে—

"আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়—"

"না, না। আজ ওটা নয়।" মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠল আশা—

"আজি কোন উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়—"

এ গানে বিরহ আছে। এটা নয়।"

"ও, তুমি বিরহ চাওনা? নিজেই তো গেয়ে নিলে।"

এবার বলি, আশা, এবার বলি? এবার আমাকে চিরমিলনের সূত্রে বেঁধে রাখো। কিন্তু বলব কি, বলব? তুমি আমাকে ভালবাসো, জানি। তুমি আছো প্রতীক্ষায়, জানি। কিন্তু বড় কষ্ট, পরাধীন হওয়া যে বড় কষ্ট। এত তাড়াতাড়ি বলে লাভ কি? চলে গেলেও তোমার সন্ধান থাকবে। লিখে জানাতেও পারব। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না জানি। কিন্তু তুমি আছ, আমি আছি। এত ত্রস্ত কেন?

একবিন্দু সংশয় থেকে সেদিন এক কালো শয়তান জন্ম নিল। ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলল প্রথমে।

বলার কথা না বলে সুকান্ত গান ধরে দিল—

"ওগো শেফালিবনের মনে কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আজ মিলায়ে পবনে পবনে।০ ০ ০
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।০ ০ ০
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ কাঁদনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।"

ব্রেকের শব্দ, হর্ণের শব্দ।

আঃ, কান যেন জুড়ে গেল।

পাশের ঘর বলছে, "একুনি চাপা পড়ত মেয়েটা। মস্ত হয়ে চলছেন রাস্তায়। দেখনা রঙ্গ। পথঘাট দেখে চলে না।"

এই ব্রেক, এই হর্ণ সেদিনও পুষ্পিত প্রান্তরে এমনি কর্কশ হয়ে বেজে উঠেছিল।

একখানা প্রকাণ্ড গাড়ী থেমেছিল হঠাৎ ওদের সম্মুখে বড় রাস্তায়। আশেপাশের টুকরো থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখেছিল ওরা।

সুকান্তের সিনিয়র বনেদী ব্যারিষ্টারের একমাত্র আহ্লাদী কন্যা। দামী রেশমের আঁচল বাতাসে উড়ছে, কানের হীরা জ্বলছে।

"এখানে আপনি? পিকনিকে এসেছেন বুঝি? আমি উত্তরপাড়া থেকে ফিরছি। বাসীমা

আছেন ওখানে। উত্তরপাড়ার রাজবাড়ী। কী মজা! যোগ দিতে পারি? তারপরে একসঙ্গে ফেরা যাবে আমার গাড়ীতে।"

সেই স্বর সামান্য ভুলের জন্য এই স্বর হয়ে সারা জীবন কানে বাজছে।

সেদিনের শরৎ হঠাৎ মলিন হয়ে গিয়েছিল। মলিন হয়ে গিয়েছিল আশা। বিপ্রদাস গুপ্তের কন্যা মঞ্জরী সেদিন নিঃশব্দে প্রাধান্য পেয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই প্রাধান্য বিস্তৃত হয়ে গেল সুকান্তের জীবনে। মূর্তিমতী শরৎ প্রান্তর থেকেই বিদায় নিল, জীবনে পদক্ষেপ হল না।

কিন্তু কেন বিস্মৃতির সুযোগ দিল সুকান্ত? দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার শয়তান লোভের পশরা মেলে ধরল।

আজ এই শরৎ কেন আর ডেকে আনে বিগত শরৎকে? জীবনে একমাত্র ভালবাসা সুকান্তের শরতেই জন্ম পেয়ে শরতেই মৃত্যু বরণ করে নিল।

আর হাস্যকর এই যে, শ্বশুরের টাকার চেয়ে বেশী অর্থ সে উপার্জন করছে আজ। অথচ সাহসের অভাবে সুখকে বিক্রয় করে দিয়েছে সে।

মঞ্জরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে স্বামীর দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে বলল, "গাড়ীতে ওঠা পর্যন্ত একটা কথাও তুমি বলনি, জানো? বনমালীবাবার বাড়ী এল বলে। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিও কিন্তু।"

মাথা হেলিয়ে চিরাভ্যস্ত সম্মতি জানাল সুকান্ত। নিরুপায় ও নিঃসহায় সম্মতি সারা-জীবন ব্যাপি।

কোর্টের এলাকায় কখন গাড়ী ঢুকেছে; কখন বনমালী স্বামীর সঙ্গে মামলার কথা সেরে চলে এসেছে সুকান্ত, খেয়াল নেই। একপাশে হলুদ ফুল একটা ছোট ঝোপ-ঝোপ গাছে। পা ফেলে নিজেকে টেনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সুকান্ত।

সমগ্র শরৎ মৌন প্রতীক্ষায়। পায়ের তালে তা'লে সুকান্তের মৃত্যু শুধু। বিরস দিবারাত্রির পরিধি পূর্ণ করে নৈরাশ্যদলিত ব্যাকুল আহ্বান বাজছে। সমস্ত জীবন দিয়ে তাকে ফেরানো যাবে না।

আশা! আশা!

আত্মশক্তির পথে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লিখিত

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

এতদিন কেবল গান গেয়ে দেশমাতৃকার বন্দনা করেছি। এখন (১৯৬২ অক্টোবরে চীনের আক্রমণ থেকে ১৯৬৫ সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের আক্রমণ পর্যন্ত) বাস্তবে এই দেশপ্রেমের পরীক্ষা দেবার ডাক এসে পৌঁচেছে। আমাদের সাধ্য কি সেই আহ্বানে সাড়া না দিই!

কোন্ দেশের জন্য আমরা প্রাণপাত করছি? তাকে আমরা কী ভাবে পেয়েছি? অনন্তিত মাতৃস্নেহের মতো দেশমাতাকে পেয়েছি,—তা কি সত্যিকারের পাওয়া?

এইসব প্রশ্ন আজ আমাদের চিত্তদেশ মথিত করছে।

"যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র, সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এসব কথা শোনবার যোগ্য নয়।.....আমরা কন্‌গ্রেস করেছি। তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে মণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যে দিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্তই আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।" ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

আমাদের আত্মপ্রতারণার যে নির্মম বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ তিরিশ বছর পূর্বে করেছিলেন, তা আজো এদেশে অতীত হয়ে যায় নি।

বস্তুতপক্ষে বর্তমান শতকের সপ্তম দশকে ভারতবর্ষের জীবনে আত্মকর্তৃত্বলাভের ও আত্মপরিচয় আবিষ্কারের এক মহান সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আজকের পঞ্চাশ কোটি ভারতীয়ের উপর সেই গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। এশিয়া মহাদেশে একমাত্র সার্বক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্বদানের দায়িত্ব আজ আমাদেরই।

এই দায়িত্বের কথা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন জাতীয় চিন্তানায়কেরা। 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র 'বর্তমান ভারতে' স্বামী বিবেকানন্দ, 'আত্মশক্তি' 'সমূহ'

'সমাজ' 'রাজাপ্রজা' ও 'কালান্তরে' রবীন্দ্রনাথ এই বাণীর পালন করেছেন। আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথে এঁরা আমাদের আহ্বান করেছেন।

নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা ও সঠিকভাবে চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। এই পথে আজ আমাদের চিত্তকে চালনা করতে হবে।

আজ ভারতবর্ষের সীমান্ত আক্রান্ত। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য কী, তার আলোচনাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাই।

"আমি যদি সুপ্ত অহরিকে ডাকিয়া বলি 'ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সামলাও' তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ রচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে। তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুশি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে আমাতে তর্কতো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ মুছ দিয়া ধৌত করো, তোমার হীরামুক্তার পসরা সামলাও—বন্যার সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড় অচেতন হইয়া ঘার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।" [১৩১১ আশ্বিন, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, 'আত্মশক্তি']

একষট্টি বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে পথনির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, আজ তা আমাদের বিপদের মাঝে পথ দেখাচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিদেশী আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে একথাটাই আমাদের বারবার উচ্চারণ করা দরকার—আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমাদের চাই। আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্বলতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে আমাদের হৃদয়ে। যুক্তির নির্বাসন, দেশের চিত্তশক্তির অবরোধ, গুরুপদে আত্মসমর্পণ, গুরুবাক্য ওরফে দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপন, কঠিন কর্তব্যকে পরিহার, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা, আত্মবিচারে অনীহা, পারম্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য—এইগুলিই আমাদের দুর্বলতা। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ এইসব দুর্বলতা পরিহারের কথাই বারবার বলেছেন।

আমাদের দুর্বলতা সতেরো বৎসরে যাবার নয়। এ-কথা মানি, কিন্তু এ-দুর্বলতা পরিহারেই আমাদের মুক্তি,—এ-কথাও মানি।

"আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে-কথা চাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিটু মিটু করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই, এ কাহারও কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই।……ভারতের অন্তরাত্মাবিহীন আজ ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত। অমৃতলোকে যাহার অবাধ অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো।" [কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ; কালান্তর]

আমাদের বিপদের দিনে আত্মকর্তৃত্বের উদ্বোধনে আমাদের মুক্তি। এ'কথা আমাদের আর একটি বক্তব্যে নিয়ে যায়। আত্মকর্তৃত্বের উদ্বোধন কোন্ পথে? শক্তির পথে, না, সত্যের পথে?

শক্তির আহ্বান, না, সত্যের আহ্বান—এই প্রশ্ন ছেচল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল, 'কালান্তর' গ্রন্থে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

আমাদের দেশে শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রিক ধারণা অপেক্ষা লৌকিক ধারণাই প্রবল। এ-দেশে শক্তির লৌকিকরূপ আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। "সংসারে যারা পীড়িত, যারা লাঞ্ছিত, অথচ এই পীড়া ও পরাভবের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্ধ ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা, শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।" [শক্তিপূজা : কালান্তর]

তার ফলে ধর্মবুদ্ধিতে ও কর্মবুদ্ধিতে আমরা নিজেদের বিচারহীন মূঢ়তার দাসানুদাস করে রেখেছি। এখানে আমরা নিজেদের অত্যন্ত ছোটো ও অপমানিত করেছি, দুর্বল করেছি। একদিকে মূঢ়তার ভারে অন্যদিকে ভয়ের শাসনে আমরা নিজেদের অভিভূত করেছি। শক্তির সাধনা আমাদের কাছে মূঢ়তার সেবা ও ভয়ের দাসত্বের পরিণত হয়েছে। লৌকিক শক্তির পূজায় আমাদের মুক্তি নেই, মুক্তি আছে আত্মশক্তির উদ্বোধনে। লৌকিক পূজা থেকে সত্যের আহ্বান অনেক ভালো এই কারণে যে তা আমাদের মনকে মূঢ়তা ও ভয় থেকে মুক্তি দেয়। সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্ম-কর্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের যাচাইয়ে যাবার সাধনাই সত্যের সাধনা। তাই আমাদের ব্রতপথ।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' লিখেছিলেন, স্বদেশী যুগের কথা সেদিন ওঁর স্মরণে ছিল। আজ রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের জাতীয় জীবনের সংকট লগ্নে আরো বেশি করে মনে পড়ে।

"আমার দেশ আছে, এই অভিজ্ঞতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তর প্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এইকথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি—এইজন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।" ['সত্যের আহ্বান' কালান্তর]

ভারতবর্ষের জীবনে আজ এই সত্যের আহ্বান সার্থক হোক।

॥ নূতন বই ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

স্বপ্নতনু ৪৷৷০

বিমল করের উপন্যাস

পরবাস ৪৷০

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস

কায়াহীনের কাহিনী ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শ্রাবণী ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিন সঙ্গিনী ৩৷৷০

বাণী রায়ের উপন্যাস

সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

প্রথম তারার আলো ১০৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূপুরের মতো ৮৲

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গীতের আসরে ৭৷৷০

[বিখ্যাত সঙ্গীতনায়কদের জীবনী ও সাধনা]

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

অবতার-সঙ্গিনী ২৲

কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত

বেদান্ত-সংজ্ঞাবলী ৩৲

[ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী সম্পাদিত]

সুরেশচন্দ্র সাহার

চেরিফুলের দেশে ৪৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

দোলগোবিন্দর কড়চা ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

দহন ও দীপ্তি ৬৲

মনোজ বসুর

সাজবদল ৫৷৷০

প্রশান্ত চৌধুরীর

কান পেতে শুনি ৫৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

পরমাত্মীয়া ৫৷৷০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঢেউ ওঠে পড়ে ৬৲

ধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের

ছায়ামিছিল ৬৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

বায়স্কোপের বাক্স ৬৲

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলোর অরণ্য ৬৷৷০

পরিতোষ মজুমদারের

সানপাউলির মেয়ে ৩৷৷০

জরাসন্ধর সেই অবিস্মরণীয় উপন্যাস

লৌহকপাট (নূতন চতুর্থ পর্ব) ৭৲

ছবি (নূতন মুদ্রণ) ৪৲ **ছায়াতীর** ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

শিলাপটে লেখা ৭৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৷ ৩৪-৮৭৯১

বিচিত্রার চিঠি

শ্রীসুমিত্রা দেবী

অনেক বছর বাদে অতুল গাঁয়ে গিয়েছিল। ফিরে এলে সকলে ঘিরে ধরলো অতুলদা, গাঁয়ের খবর বলো অতুলের পাড়ার অনেকেই তার গাঁয়ের লোক, কাজেই আগ্রহ স্বাভাবিক।

অতুল বলল, গাঁয়ের আবার খবর কী। খবর তো তৈরি হয় শহরে। সেখানেও আজও যেমন চলছে মান্ধাতার আমলেও তেমনি ছিল।

সে কি একটা কথা। দশ বছর গাঁ ছাড়া, কত লোক মরলো, কত লোক জন্মালো।

অতুল বলে, যারা মরলো তাদের সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে আর যারা জন্মালো তাদের দেখোনি, কাজেই তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ থাকবার কথা নয় তোমাদের।

এক সঙ্গে অনেকে বলে উঠল, কথা দিয়ে কথা চাপা দিতে তুমি চিরকাল ওস্তাদ। যা'রা দশবছর আগেও ছিল, এখনো আছে তাদের খবরটাই না হয় দাও।

কী খবর দেবে ভাবে অতুল। রোজ সকালে উঠে সংবাদ-পত্র খোলে রাজা উজীর মরবার খবরে যাদের অরুচি ধরে গিয়েছে তাদের কাছে গাঁয়ের কোন্ খবর রুচিকর হবে ভেবে পায় না অতুল। কিন্তু শ্রোতারা নাছোড়, গাঁয়ের খবরের জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত নাই। হঠাৎ তার মুখের মাংসপেশী আলগা হ'য়ে গিয়ে একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। দুর্যোগের অবসানে ভোরের আলোর আভাস পেলে পাখীরা যেমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তেমনি উৎসাহে শ্রোতার দল বলে উঠল, হাসলে কেন অতুলদা, নিশ্চয় কিছু মজার খবর মনে পড়েছে।

খবর বটে তবে মজার কিনে জানি নে।

সে বিচার আমরা করবো, তুমি বলো।

অতুল আরম্ভ করে, রায় পাড়ার গোবিন্দ রায়কে মনে আছে নিশ্চয়।

কোন্ গোবিন্দ রায়?

ঐ যার মাথা ভরা টাক।

দশবছর আগে টাক ছিল না।

দশবছর সময়ে টাক, টাকা কত কি পরিবর্তন হতে পারে।

আমি চিনতে পেরেছি, তখনই জানতাম টাক পড়বে, সুগন্ধি তেল মাখতো কি না।

অন্য একজন বলল, আমার বেশ মনে আছে, পুকুর পাড়ে বাড়ী, অবস্থা খারাপ।

এইবারে ঠিক চিনেছ। গত দশবছরে অবস্থা আরও খারাপ হ'য়েছে।

আহা বেচারী। বছর দুই আগে উপযুক্ত ছেলেটা মারা গেল। তখন কিছু সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল।

অন্য একজন বলে, আমার কাছে গত বছর মেয়ের বিয়ের সাহায্য বাবদ চিঠি লিখে পঞ্চাশ টাকা আদায় করেছে। মেয়েটার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তো।

ছাই হয়েছে, সে টাকা কবে খেয়ে ফেলেছে।

বলো কি, মেয়ের বয়স যে এতদিনে বছর পঁচিশেক হ'ল।

হ'লই তো।

বাপ কি করছে?

নৈষ্কর্ম্য যোগ গ্রহণ করেছে।

তার মানে?

মেয়ের বয়স আর গৃহিনীর চোপা তাকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেছে।

বলো কি, গৃহত্যাগ করেছে।

তা না হলে আর সন্ন্যাসী হবে কেমন ক'রে?

বুড়ী গিন্নি আর বয়স্থা মেয়েকে ছেড়ে পালালো। coward!

এখন তাদের চলছে কি ভাবে?

চলছে না।

মেয়ের বিয়ে?

এই সেদিন হ'য়ে গেল।

অতুলদা, রহস্য রাখো, যাদের দিন চলে না, বাবা পলাতক, তাদের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল —এই বিশ্বাস করতে বলো।

যা ঘটেছে তাই বলছি, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সকলে সমস্বরে বলে ওঠে।

মন্তব্য বন্ধ ক'রে শুনে যাও, গল্প শুনতে চেয়েছিলে, একটা গল্পের মতো গল্প।

গল্প না খবর।

দু-ই, আজকের খবর কালকের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতও এক সময়ে খবর ছিল।

অতুলের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে একজন শ্রোতা বলে উঠল, মন্তব্য বন্ধ করে বলে যাও।

ঈষৎ হেসে অতুল বলল, সেই ভালো, মন দিয়ে শোনো।

গাঁয়ে এসেছি জেনে মাসিমা ডেকে পাঠালেন, বোধ হয় ভুলে যাও নি যে গোবিন্দ রায়ের স্ত্রীকে মাসিমা বলতাম—

অনেকেই বলে উঠ্‌ল, তিনি আমাদের সকলেরই মাসিমা।

মাসিমা বললেন, বাবা, একেবারে গাঁয়ে আসা ছেড়ে দিলে একি ভালো। আমরা বুড়ো বুড়ীরা যতদিন আছি আসা যাওয়াটা বন্ধ করো না।

অতুল বলে চলে, তোমরা যেমন গাঁয়ের খবর জিজ্ঞাসা করছ, তিনি তেমনি কলকাতার খবর জিজ্ঞাসা করলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমাদের সকলের খবর নিলেন, বুড়ী কাউকেই ভোলেনি

দেখলাম। তারপর অনটন বাইরে বিদায় নেওয়ার সময়ে দরজার কাছে এসে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, বাবা, নিরুপমার জন্ত যেমন তেমন একটা পাত্র খুঁজে দাও, তোমার তো অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। আমি বললাম, কালকে আবার আসবো তখন কথা হবে।

পরপর দু'তিন দিন মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝলাম, যে নিরুপমার বিয়ের ব্যবস্থা না ক'রে দিলে মাসিমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। জানো তো আমাদের দেশের বিবাহযোগ্য পাত্ররা বিবাহ করবে না আর অযোগ্যরা অসম্ভব সুন্দরী প্রত্যাশা করে। যার টাকা আছে হয় তো তার রূপ নাই, যার রূপ আছে তার হয় তো টাকা নাই—এ হচ্ছে কন্যাপক্ষের কথা। আবার পাত্র পক্ষে যার সাধ্য আছে তার সাধ নাই, যার সাধ আছে তার নাই সাধ্য। এ ভবন থেকে ঘুচিয়ে পাত্র সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। নিরুপমার এ সমস্তর কিছুই নাই। তার না আছে টাকা, না আছে চমক লাগাবার মতো রূপ, তার বাবা গৃহত্যাগী, মা অথর্ব। এমন মেয়ের পাত্র সংগ্রহের চেয়ে লটারিতে টাকা পাওয়া সহজ।

আচ্ছা মাসিমা, গাঁয়ে তো বিবাহযোগ্য ছেলের অভাব নেই, তাদের কাউকে বলে ছিলে?

বলিনি আবার! রমেন, বিভাই, হারু, প্রত্যেককে বলেছি। সব শুনে হাত জোড় ক'রে বলে, মাসিমা আর যা বলো করছি, বিয়ে করতে বলো না।

কেন ওরা কি বিয়ে করবে না।

মুখে তো তাই বলে, তারপরে একদিন দেখি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলো। ওদের দোষ দিইনে বাবা, যে কাল পড়েছে টাকা না পেলে বিয়ে করতে চায় কে।

ঠিক কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বললাম, পাসও!

না, বাবা, ও কথা বলো না, ওদের মনে খুব দয়ামায়া, এত অনটনের মধ্যেও অভাব বুঝতে পারিনে ওদের জন্তে। ওরা সব লক্ষী ছেলে।

তবে ওদেরই বলো না কেন, পাত্র জোগাড় ক'রে দিতে।

ওরা বলে, ওদের জানা শোনার মধ্যে কেউ এখন বিয়ে করবে না। তাই তো তোমাকে বললাম।

আমি এখন কেমন ক'রে মাসিমাকে বলি যে আমার জানাশোনার মধ্যে অর্ধেকের বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আর অর্ধেকের এখনো বিবাহের বয়স হয়নি। তবে এ বুঝলাম যে হাতে হাতে পাত্র সংগ্রহ ক'রে দিতে না পারলে গ্রাম ছাড়বার পথ বন্ধ। কি করা যায় ভাবতে লাগলাম।

জোতাদের একজন বলল, পাত্র জোগাড় করতে না পারো কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিতে পারতে, তোমার তো টাকার অভাব নাই।

এবারে অতুল হেসে বলল, অনেক দিন গাঁয়ে যাওনি, মাসিমার স্বভাব চরিত্র ভুলে গিয়েছ দেখছি। টাকা ও পাত্র দু-ই তাঁর চাই।

তখন কি হল?

ধৈর্য ধরো, সমস্ত বলছি। হঠাৎ মাথায় একটা প্লান এলো।

প্লানে কি হবে। পাত্র চাই।

দাঁড়াও না, দু-ই হচ্ছে। মাসিমাকে গিয়ে বললাম, পাত্র একটি জুটেছে, তবে বয়সটা কিছু বেশি।

কত বয়স বাবা?

এই বছর ষাট হবে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, তা হোক আজকালকার দিনে ষাট বছর এমন কিছু বেশি নয়। অবস্থা কেমন?

মন্দ নয়, কলকাতায় বাড়ী আছে, টাকা পয়সাও কিছু আছে। আর আছে প্রথম পক্ষের এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, ছেলেটি সরকারী অফিসে কাজ করে।

আর স্ত্রী।

সে আপদ অনেক দিন গিয়েছে মাসিমা। এখন কি আর আগের সেদিন আছে। এখন এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে আমাতা বাবাজীর শ্বশুর বাস করতে হয়, রাজি থাকো তো বলো, লিখি।

আগ্রহের সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, আজই লিখে দাও বাবা, এর চেয়ে ভালো আর কেমন ক'রে জুটবে ওর ভাগ্যে।

শ্রোতাদের একজন ভাবল, এর মধ্যে এত কাণ্ড ক'রে এসেছ, কিছুই জানতাম না।

কেন নিরুপমার বিয়ের খবর পাওনি?

পেয়েছি, কিন্তু এর মধ্যে যে তুমি আছ জানবো কেমন করে?

জানবার কথাও নয়, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে কি ঘটকের নাম থাকে?

পাত্রটি কে?

কেউ নয়।

তার মানে?

আহা ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত শোনই না।

পাড়ায় ভারতোদ্ধার সঙ্ঘ নামে যুবকদের এক ক্লাব আছে। সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য অনেক আগেই সমাধা হয়ে যাওয়ায় এখন সদস্যগণ গৌণ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ ক'রে বারোয়ারী পূজা করে, তাস, দাবা খেলে এবং মাঝে মাঝে টাকা জুটলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। সম্প্রতি তারা শুভঙ্করীর মায়াপাতকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছে। এখন তার রিহার্সাল চলছে। সন্ধ্যাবেলায় সঙ্ঘের বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন শুভঙ্করীর নৃত্য চলছে। আমাকে দেখে সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল, কেউ বল্‌ল, অতুলদা, কেউ অতুলকাকা, কেউ অতুলমামা, আপনাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হবে।

বেশ, এ আর কঠিন কি, একটা অভিভাষণ ঠিক ক'রে রাখি।

চলে যাবেন না তো, কলকাতার লোককে বিশ্বাস নেই।

এবারে বিশ্বাস করতে পারো, নিরুপমার বিয়ে না দিয়ে যাচ্ছি না।

নিরুপমার বিয়ে নাকি, কোথায় স্থির হল, কবে স্থির হল, বর কি করে, এই জন্যেই বুঝি এসেছেন, আপনি না হলে ওর বিয়ে হ'তো না—এই রকম কত প্রশ্ন ছেঁকে ধরলো।

বিয়ে সামনের শনিবারে, বর কলকাতার, বাড়ীঘর টাকাকড়ি আছে তবে বয়সটা বোধকরি একটু বেশি।

তা হোক।

তা হোক তো বল্‌লে, মেয়ে যে মুখ গম্ভীর করেছে।

এমন কি বেশি হবে।

আমিও তাই বলি, বছর আটেক, মেয়ের টাকাকড়ি নেই, ওর কমে কেউ রাজি হবে না।

তাই বলে একেবারে যাট।

কি আর করবো, তোমরা তো কেউ জোগাড় ক'রে দিলে না, আমি তো খুঁজে ওর চেয়ে কম বয়সের পেলাম না।

আমার কথা শুনে ভারতোদ্ধার সঙ্ঘ গম্ভীর হ'য়ে গেল, অল্পকালের জন্য পাতক্রিয়ার সংখ্যা নৃত্য বন্ধ হ'ল। কিছুক্ষণ পরে তারা বলল, বুড়ো বরের হাতে মেয়ে দিলে যে পাড়ার অপমান।

আর মেয়ে আইবুড়ো থাকলে বুঝি পাড়ার সম্মান। তোমরা কিছু করবে না, অপরে করলে পাড়ার অপমান বলে মুখ গম্ভীর করো। বেশ, আমি বুড়ো বরকে লিখে দিচ্ছি, বিয়ে হবে না, তোমরা যোগ্য বর খুঁজে নাও। এই বলে রাগের অভিনয় ক'রে বেরিয়ে চলে এলাম।

পরদিন যথাশাস্ত্র বিয়ের আয়োজন করতে সুরু ক'রে দিলাম। পাড়ার পাঁড়ী বাড়ী গিয়ে আসন্ন বিয়েতে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ জানালাম আর ভারতোদ্ধার সঙ্ঘের সদস্যদের প্রত্যেককে "গোপনে" বললাম যে অপরের কাছে বাই বলি, আপনার কাছে সত্য গোপন দিয়ে লাভ নাই, বরের বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বুঝলাম যে ভারতোদ্ধার সঙ্ঘ আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে। তারা মাসিমাকে বিয়ে ভেঙে দিতে অনুরোধ করলো, মাসিমা তাদের কুলে জবাব দিলেন, তোমাদের দিয়ে এক পয়সার সাহায্য হয় না, তোমরা যাও আমার সম্মুখ থেকে। ওদিকে বরের বয়স শুনে নিরুপমা কেঁদে কেঁদে দু'চোখ জবা ফুল করে ফেল্‌লে। প্রতিক্রিয়া যেমনি হোক আমি কেনাকাটা খাওয়া-খাওয়ার আয়োজন চালাতে লাগলাম। দুদিন বাদে বিয়ে।

শ্রোতারা বলে উঠল, তুমি ক্রমেই শার্লক হোমসের মতো রহস্যময় হয়ে উঠছ। তোমার প্রতিক্রিয়া শুনতে চাইনে, বর কে, বিয়ে কেমন হ'ল, তাড়াতাড়ি বলো, আমাদের অন্য কাজ আছে।

ঐ যে শার্লক হোমসের ওয়াটসন এসে উপস্থিত হয়েছে, বর কে, বিয়ে কেমন হ'ল ও এবারে বলবে, বলো হে রমাপদ।

রমাপদ ও অতুল বন্ধু, এক গ্রাম নিবাসী, বর্তমানে দু'জনেই কল্‌কাতা প্রবাসী।

রমাপদ শুধালো কি সেই নিরুপমার বিয়ের গল্প বাকি, বলেই হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল।

পাড়ার ছোকরাদের আড্ডা ঠকানো গিয়েছিল।

কেমন?

কেমন আর কি, তাদের শেষে হাতে পড়ে যার পরিগ্রহ অবস্থা।

অতুল বল্‌ল, আমি দু'কথায় মুখ বন্ধ ক'রে দি, তারপরে রমাপদ বলবে। আমি মাসিমাকে বলে দিলাম, বরের আসা সম্বন্ধে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না, বিয়ের দিনে বিকাল বেলা রমাপদ তাদের বিয়ে এসে উপস্থিত হবে।

আমি বিকাল বেলা রেল গাড়ী থেকে একাকী নামলাম। যারা আমাদের প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিতে এসেছিল তারা শুধালো, বর?

হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আসতে পারলেন না।

এখন উপায় ?

বিয়ে বন্ধ থাকবে।

সে কি হয়, সব প্রস্তুত।

বিয়ে বাড়ীতে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিয়ে না হলে গুরুতর অমঙ্গল, অপমান তো বটেই।

কেউ বল্‌ল, সত্তর বছরে লোক অসুস্থ হ'য়ে পড়লে তাকে হঠাৎ বলা চলে না।

কেউ বল্‌ল, নিরুপমার ভাগ্য ভালো যে বর বিয়ের আগে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু এসব মন্তব্যে কান্নার রোল থামলো না, আরও বেড়ে উঠল।

এমন সময়ে ভারতোদ্ধার সঙ্ঘের সেক্রেটারি তড়িৎ মুখী এগিয়ে এসে নিরুপমার মাকে বল্‌ল, মাসিমা, আমরা থাকতে আপনি চিন্তা করবেন না।

তিনি কান্নার অবকাশে বল্‌লেন, তোমরা তো বাবা গোড়া থেকেই আছ।

যা হওয়ার হয়েছে, সে কথা আর ভাববেন না, এখন নির্দিষ্ট লগ্নে বিয়ে না হলে আমাদের সঙ্ঘের অপমান। আমি বর খুঁজে আনছি। এই বলে সে ছুটে চলে গেল। আমরা সবাই বিয়ে বাড়ীতে বসে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতোদ্ধার সঙ্ঘের সদস্যগণ ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। মাসিমা, এই যে বর এনেছি, নিরাপদ বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

নিরাপদ পাড়ার ছেলে, নিরুপমাদের পার্টি ঘর, এ. জি. বেঙ্গলে কাজ করে, ক'দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছিল বেড়াতে।

নির্দ্দিষ্ট লগ্নে নিরুপমার সঙ্গে নিরাপদর বিয়ে হ'য়ে গেল। অমঙ্গল ও অপমান দু-ই এ যাত্রা এড়িয়ে গেল।

শ্রোতারা বল্‌ল, নিরাপদ ও ভারতোদ্ধার সঙ্ঘের সদস্যগণ তো আগেও ছিল, তবে নিরুপমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি কেন ?

এ আর বুঝলে না, যৌবন এডভেঞ্চার চায়। গতানুগতিক পন্থায় নিরুপমাকে বিয়ে করায় রোমাঞ্চ নেই, নূতন পরিস্থিতিতে তাকে বিয়ে করায় এডভেঞ্চার ছিল, তাই আজকে রাজি হয়ে গেল।

যাক খুব ফাঁড়া কেটে গেল।

কিন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট বরটি কে ছিল ?

কেউ নয়।

সকলে বিস্মিত হয়ে শুধায়, তার মানে ?

রমাপদ আর আমি যুক্তি ক'রে কাল্পনিক সত্তর বছর বয়সের অবতারণা করি, তখনই স্থির করেছিলাম যথা সময়ে রমাপদ একা এসে জানাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সে আসতে পারল না।

কি নিদারুণ Risk নিয়েছিলে।

একেই বলে Calculated risk। যেমন হিসাব করেছিলাম তেমনি ঘটলো তো।

অতুলদা, তুমি সব পারো, যাই হোক, ভবিষ্যতে আর এমন Risk নিয়ো না।

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবন যন্ত্রণা

নাটক

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাসে নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক ব্রান্ডেড মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ষ্টপারের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

জীবন-যন্ত্রণা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য ।

[বীরভূম আর সাঁওতাল-পরগণার প্রান্তসীমায় একটি গ্রামের দক্ষিণদিকে
শাল-তমাল আর মহুয়ার জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর পায়ে-চলা
একটি পথ। সেই পথের ওপর দিয়ে শ্যামল যাচ্ছিল
আর হরিপদ আসছিল। দু'জনের
মুখোমুখি দেখা।)

শ্যামল। কোত্থেকে আসছো হরিপদ? কোথায় গিয়েছিলে?

হরিপদ। শালবুনি গিয়েছিলাম দাদাঠাকুর। মেয়ের বাড়ী। তুমি এই সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যাচ্ছ?

শ্যামল। পোষ্টাপিসে যাচ্ছি।

হরিপদ। তা এই সন্ধ্যেবেলায় কেন? ফিরতে রাত হয়ে যাবে যে!

শ্যামল। হলে আর কি করছি বল। বুঝে পোষ্টাপিস, পিওন সবদিন আসে না। আমার নামে কলকাতা থেকে কাগজপত্র আসে তো! যাই—নিজেই গিয়ে নিয়ে আসি।

হরিপদ। শুনেছি আপনি কি-সব লেখেন-টেখেন। আমরা মুখ্খু সুখ্খু মানুষ ঠিক বুঝি না। তা বলছিলাম কি—একটা লাঠি হাতে নিয়ে গেলে ভাল করতেন।

শ্যামল। কেন, লাঠি কেন?

হরিপদ। জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে তো। শুনছিলাম বাকি একটা শেয়াল ক্ষেপেছে। সেদিন মহুন বাউরির বউ এসেছিল শুকনো শালের পাতা কুড়োতে, তাকে তাড়া করেছিল। আপনি এক কাজ করুন। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথটা ছেড়ে ডাঙাল-পাড়ার সাঁওতালদের বস্তির পাশ দিয়ে চলে যান। আসবার সময় ওই দিক দিয়েই আসবেন।

শ্যামল। কিন্তু হ্যাঁ হে হরিপদ, জঙ্গলে বাঘ-টাঘ নেই তো?

হরিপদ। না বাবু, এখানে বাঘ নাই, তবে মহুয়া যখন পাকে তখন ভালুক দু' একটা আসে মহুয়া খেতে। তবে শো-বাঘ আছে, আর-বাঘা আছে, দু'একটা বন-শুয়োর আছে। মহুয়া পাকলে টুপ্‌টুপ্‌ করে পাকা মহুয়া পড়বে গাছ থেকে আর সেই গন্ধে গন্ধে ব্যাটারা ছুটে আসবে অনেক দূর থেকে। কাজ কি বাবু, আপনি চলে যান ওই সাঁওতালদের বস্তি হয়ে।

শ্যামল। ঠিক বলেছ। আমি ওই পথেই যাচ্ছি।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[ছোট একটি পোষ্টাপিস। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। জোর বন্ধ করে পোষ্টমাষ্টার কাজ করছেন। হাতের কাছে খাতাপত্র ছড়ানো। পোষ্টমাষ্টারের হাতে কলম।]

মাষ্টার। (কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে হিসেব করতে করতে) পাঁচ আর তিনে আট, আর দুই দশ, আর—

সুমতি। ওগো শুনছো ?

মাষ্টার। আঃ ! দশ আর তিন তেরো—

সুমতি। বলি কালা হয়েছ নাকি ? এত যে চাকছি—শুনতে পাচ্ছ না ?

মাষ্টার। পাচ্ছি, পাচ্ছি। দশ আর তিন তেরো আর—

সুমতি। শুনবে না তুমি ?

মাষ্টার। আঃ, আবার চেঁচাও ! চেঁচিয়ো না বলছি। আমার হিসেবে ভুল হয়ে যাবে।

সুমতি। হলো তো আমার বয়ে গেল। হোক্ তোমার হিসেবে ভুল।

মাষ্টার। কি বললে ? ভুল হোক্ ? তুমি না আমার ইস্ত্রি।

সুমতি। এঁ, ইস্ত্রি ! ইস্ত্রিকে মানুষ মাথায় করে রাখে। আর তুমি ? তুমি আমাকে অপমান করতে পারলে আর কিছু চাও না। হোক্, হোক্ তোমার ভুল।

মাষ্টার। আবার ? আবার বলছো হোক্ আমার হিসেবে ভুল ?

সুমতি। হ্যাঁ বলছি। বলছিই তো !

মাষ্টার। এ তোমার মুন তেলের হিসেব নয়। পোষ্টাপিসের হিসেব। ভুল হলে চাকরি চলে যাবে। জানো ?

সুমতি। জানি জানি, খুব জানি। ভারি তো হিসেব, পাঁচ আনার পোষ্টকার্ড, সাত আনার—

মাষ্টার। থামো থামো, যা জানো না তাই নিয়ে কথা বলতে যাও কেন ? পাঁচ আনার পোষ্টকার্ড আজকাল হয় না। আজকাল সব পয়সা দিয়ে হিসেব। আনা-ফানা নেই।

সুমতি। তা না থাকলো তো আমার বয়েই গেল। আমি বলছি আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে করেও আর পরা চলছে না। কাপড় তুমি এনে দেবে কিনা বল।

মাষ্টার। হাজার বার বলেছি, আর বলতে পারব না। চুপ কর বলছি। এই যাঃ, আবার গোড়া থেকে ধরতে হবে। সব গুলিয়ে গেল। দশ আর তিন তেরো আর সাত কুড়ি—

সুমতি। রাখো তোমার কুড়ি (এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়ে) কি বলছো বল।

মাষ্টার। আঃ, ভাখো ভাখো কি সর্বনাশ। তুমি সংসারের কাজ কর্ম করছো করগে যাও। আমার এই কাজটা করতে যাও। তোমার মতন আমার একটি ইস্ত্রি আছে জানলে গভরমেন্ট আমাকে এ কাজটি দিত না। পোষ্টমাষ্টারের কাজ—এ কি সামান্য কাজ মনে করেছ ?

সুমতি। না যত বড় লাট-বেলাটের কাজ তা আমি জানি। চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি দিনরাত।

আমার কাপড় তুমি আনতে যাবে কিনা বল। নইলে তোমার কাগজপত্র সব আমি ছেঁড়ো ওল্ট-পাল্ট করে।

মাষ্টার। যাব যাব, কাপড় আনতে যাব। হাতের কাছে তো পাওয়া যায় না। আমাকে সময় বুঝে একদিন শহরে যেতে হবে। তাছাড়া টাকাও তো চাই। মাইনে পেলেই যাব।

সুমতি। মাইনে পেলেই যাবে? ততদিন আমি এই ছেঁড়া কাপড় পরে থাকবো? গাঁয়ের একটেরে পোষ্টাপিস, এদিকে লোকজন আসে না তাই। পাড়া-পড়শী যদি কেউ আসতো তো তার সুমুখে আমি বেরুতে পারতুম না। আচ্ছা, তোমার যদি দুটো ছেলেপুলে থাকতো তুমি কি করতে বলতে পার?

মাষ্টার। ছেলেপুলে এই জন্যেই দেয়নি ভগবান। ভগবানের দয়া। (সুমতির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো)।

সুমতি। আবার হা হা করে হাসছে ছাখো। তোমার হাসি দেখলে আমার সর্বাঙ্গে জ্বলে যায়। হেসো না বলছি, যাবো। তোমার হাতে পড়ে আমার দুর্গতির কিছু বাকি রইলো না।

মাষ্টার। বটে! আমার হাতে পড়ে তোমার দুর্গতি হয়েছে? কার হাতে পড়লে তুমি রাজরাণী হতে শুনি?

সুমতি। তুমি ছাড়া এ পৃথিবীর যে-কোনও লোক। যে-কোনও লোক আমাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো।

মাষ্টার। ধন্য হতো না গুষ্টির মাথা হতো! তোমাকে পেলে যেই যেই করে নাচতো। পাগল হয়ে যেতো। তাকে এতদিন পাগলা-গারদে থাকতে হতো।

সুমতি। নিজের সম্বন্ধে এত অহঙ্কার তোমার? যেকেরা বৌকে দুবেলা ভাল করে দুটো খেতে দিতে পারো না, কাপড় ছিঁড়লে কাপড় কিনে দিতে পারো না—এই তো তোমার মুরোদ! তবু অহঙ্কার দেখলে গা পিত্‌পিত্‌ করে। আমার যদি বয়েস থাকতো তো কি করতাম জানো?

মাষ্টার। কী করতে?

সুমতি। তোমাকে ছেড়ে দিতাম। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে পালিয়ে যেতাম।

মাষ্টার। গেলে না কেন? আমি কি বারণ করেছিলাম নাকি? আজ না হয় বয়েস হয়ে গেছে, তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু বয়েস তো এককালে ছিল! এক সময় তো যুবতী ছিলে।

(জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে জোরে)

মাষ্টার। আঃ, জ্বালালে দেখছি। এই অসময়ে কে আবার এলো ছাখো। (সুমতিকে) তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সরে যাও এখান থেকে। সরে যাও বলছি।

সুমতি। না, আমি সরবো না। আমি রইলাম এইখানে দাঁড়িয়ে। দেখুক আমাকে সবাই। সবাই দেখুক আমাকে। দেখুক—কেমন ছেঁড়া কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে পোষ্টমাষ্টার মশাইএর গিন্নি।

মাষ্টার। আঃ, ছি ছি ছি ছি! তোমাকে নিয়ে আমি (আবার কড়া নাড়ার শব্দ)—কে? এরকম

অসময়ে কে কড়া নাড়ছো? পোষ্টাপিস বন্ধ হয়ে গেছে। আমি কাজ করছি। দরজা খুলবো না।

শ্যামল। (বাইরে থেকে) আমি শ্যামল। খুলুন না দরজাটা একবার। অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাকটা দেখেই আমি চলে যাব।

মাষ্টার। (চেয়ার কেটে) ডাকটা দেখেই চলে যাবে। ডাক দেখবার সময়টি বেশ। যা যাঃ, আমি পারব না খুলতে। এখন আমি হিসেব করছি। আমাকে ডিস্টার্ব করো না। দশ আর তিন তেরো—নাঃ, সব ভুলে গেছি। আবার প্রথম থেকে ধরতে হবে। আমার এই বৌটা দিলে সব মাটি করে। দুই আর দুইএ চার—(হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়ায় কাগজপত্র দিলে উড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে) গেল—গেল—গেল—গেল, সব তছ্‌নাছ্‌ হয়ে গেল। পাখার হাওয়া দিলে সব শেষ করে। ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌—কাগজটা উড়ে গেল—আহা ধরো না গো, দাঁড়িয়ে রয়েছ চুপ করে—হাত দিয়ে ধরতে পারছ না? এই যে—ব্যস্‌, ধরেছি ব্যাটাকে। (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ তা ধরবে কেন? আমার যে একটু উপকার করা হবে।

সুমতি। কেন ধরবো? কাগজপত্র সব যাক্‌ না উড়ে। উপকারের কথা বোলো না। একটা উড়ো কাগজ ধরে উপকার করতে বলছো? বলি—সারাটা জীবন যে তোমার উপকার করে করে নিজের শরীরটাকে দিলাম শেষ করে—বলি সেদিক পানে কোনোদিন তাকিয়েছো না সেকথা কোনোদিন ভেবেছো?

শ্যামল। (বাইরে থেকে কড়া নাড়তে নাড়তে) একটিবার খোলো মাষ্টার, তোমার পায়ে পড়ি। ডাকটা দেখেই আমি চলে যাব। ফিরতে রাত হয়ে যাবে মাষ্টার। খোলো একবারটি।

মাষ্টার। তোর রাত হলো তো আমার বয়ে গেল। আমার কি? আমি এখন কাজ করছি। দোর খুলতে পারবো না।

শ্যামল। রাগ কোরো না মাষ্টার, খোলো।

মাষ্টার। তোর চিঠিপত্র কিছু নেই। কি জন্যে খুলবো?

শ্যামল। খোলো। চারটে টিকিট দেবো, আর চারটে খাম—

মাষ্টার। খাম টিকিট নিতে হলে দুপুরবেলা আসতে হয়। এখন আমার পোষ্টাপিস বন্ধ।

শ্যামল। আমাকেও তুমি এই কথা বলছো?

মাষ্টার। কেন বলবো না? তুই কি স্যাটসায়েব? গল্প-টল্প লিখিস বলে তুই কি একেবারে ইয়ে হয়ে গেছিস্‌ নাকি?

শ্যামল। খুলবে না? এত কষ্ট করে এলাম এতটা পথ—আবার ফিরে যেতে হবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তোমার শরীরে কি মায়া-দয়া কিচ্ছু নেই?

সুমতি। (ঠোঁট দিয়ে একরকম শব্দ করে) মায়া! দয়া! মায়া দয়া কাকে বলে জানে ও? মায়া নেই, দয়া নেই, পাথর—পাথর। একটি পাথরও যা ও-ও তাই।

মাষ্টার। ডাকো যার সঙ্গে কথা হচ্ছে তারই সঙ্গে হচ্ছে। তুমি বাড়ীর বৌ ঘরে মাঝখান থেকে গায়ে পড়ে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ কেন বলতে পার? আমার একটা মান সম্মান—

সুমতি। এইতেই তোমার মান-সম্মান চলে গেল?

মাষ্টার। গেল না? নিশ্চয়ই গেল। (আবার কড়া নাড়ার শব্দ) বেং তেরি—নিকুচি করেছে তোর—কাজকম্ম করতে দেবে না দেখছি। ঘরে বাইরে দামনে পেছনে—সব শত্তুর। আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। (উঠে গিয়ে) এই যে তবে দিলাম খিলটা খুলে। (খিলটা খুলে কপাট দুটো সরিয়ে দিয়ে) আয়!

শ্যামল। বাবাঃ! যেজাজে তোমার তিরিক্ষে হয়েই আছে দেখছি সব সময়।

মাষ্টার। হয়েছে কি এমনিই! সত্যের পয়লার গোলমাল। আসুক ব্যাটা পিওন। ওর চাকরিটি আমি খেয়ে দিচ্ছি স্থাখ্।

শ্যামল। সে তোমার যা খুশী তাই কর! আমি আমার চিঠিপত্র আছে কিনা দেখেই চলে যাব।

মাষ্টার। ওই স্থাখ্ আজ তোর মেলা চিঠি। ওই স্থাখ্ খাটের নীচে জড়ো করে রেখেছি।

শ্যামল। তবে যে তখন বললে আমার চিঠিপত্র কিছু নেই?

মাষ্টার। (হেসে) ওরকম বলতে হয়। —দেখিস্ যেন আর কারও চিঠিপত্র নিস্‌নি।

শ্যামল। আর কারও চিঠি নেবো আমি? বোনোদিন নিয়েছি? ছি ছি মাষ্টার, এই কথা তুমি আমাকে বললে?

মাষ্টার। ও, তুই একেবারে যুধিষ্ঠির রে! কত মজার মজার চিঠি আসে, জানিস? তুই তো কোন্ ছার, খোলাটোলা পেলে আমিই এক-একদিন লোভ সাম্‌লাতে পারি না। পড়ে দেখি। দেখেই আবার বন্ধ করে দিই। শুনবি তবে? একদিন একটা মেয়ে লিখেছে—

শ্যামল। থাক্ ও গল্প তোমার আর একদিন শুনবো। আজ উঠি।

মাষ্টার। তা উঠবি বই কি! নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে তো!

শ্যামল। দেরি করলে যে রাত হয়ে যাবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কতখানি পথ আমাকে যেতে হবে জানো তো?

মাষ্টার। যেতে হবে তো কি হয়েছে? কচি খোকা তো নোস্। তোর সঙ্গে আমার ক'টা কথা ছিল।

শ্যামল। কি কথা?

মাষ্টার। তুই তো বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলি! —শুনেছিস?

শ্যামল। কি? কি শুনবো?

মাষ্টার। আমাদের ঝগড়া।

শ্যামল। শুনেছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।

মাষ্টার। বুঝতে পারিসনি? তুই না গল্প লিখিস! এ তো একটা কচি খোকাও বুঝতে পারে। শোন্ তবে—ও-হতভাগী যদি এমনি করে তো ওর মুখে নুড়ো জেলে দেবো না তো কি করবো?

[সুমতি একটু দূরে—আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।
সেইখান থেকেই বলে উঠলো—]

সুমতি। তা আবার দেবে না! মুখে নুড়ো জেলে দেবে বই-কি! আ মরি-মরি, কি কথার ছিরি! কি আমার গুণের স্বামী!

মাষ্টার। ওই শোন্। গলার আওয়াজ শুনছিস? কাঠে যেন চোট্ মারছে

সুমতি। আ-হা নিজের কথাগুলি যেন মধুমাখা!

মাষ্টার। শুনলি তো? শোন্ তবে—আসল কথাটা বলি। ওই যে-কথাটা তোকে বলতে যাচ্ছিলাম। একদিন একটা খামের চিঠি—দেখলাম, খামের মুখটা ভাল করে আঁটা হয়নি। চিঠিখানা সরিয়ে রাখলাম। এই গাঁয়েরই চিঠি। নিতাই পাঁজুলী চাকরি করে কয়লাকুঠিতে। সেইখান থেকে লিখেছে তার বৌকে। ভাবলাম পড়েই দেখি না কি লিখেছে। আঃ, সে কি লেখা রে! হ্যাঁ বিয়ে করা সার্থক। বৌকে যদি এমনি করে লিখতেই না পারলাম! আর এই ছাখ্ আমার বাড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে ছাখ্। দিনরাত শুধু লাথি-ঝাঁটাই খাচ্ছে। যেমন চেহারা, তেমনি ছিরি—

শ্যামল। থাক, ও-সব আমাকে বোলো না। বলা তোমার উচিত নয়। আমি হাজার হলেও বাইরের লোক।

(আবার সুমতির গলার আওয়াজ শোনা গেল। আবার বললে—)

সুমতি। সে জ্ঞান ওর আছে? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সারা গাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে ঘরের কথা।

মাষ্টার। (সুমতিকে শুনিয়ে) আমি বলবো। আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে দেবো। আমি ন্যাংটো হয়ে নাচবো। তোমার কি? (শ্যামলকে) শোন্ তবে বলি। আর একদিনের একটা গল্প বলি।

শ্যামল। থাক্। আজ থাক্। আর একদিন শুনবো। আমি চললাম।

মাষ্টার। হ্যাঁ তা যাবি বই-কি। আমার কথা শুনে আর কি হবে, আমি কি একটা মানুষ রে! আমার কথা শুনবি কেন? আমার কথা আমার বিয়ে-করা বৌ শুনছে যে তুই শুনবি? নিজের কাজ হয়ে গেছে, ব্যস্, এবার চলে যাবিই তো। যা যা, বেরো দূর হ!

শ্যামল। আচ্ছা বল কি বলবে, শুনেই যাই।

(শ্যামল ঘড়ির খাটিয়ার ওপর চেপে বসলো)

মাষ্টার। (হেসে) হেঁ হেঁ বাবা, মিষ্টি কথা বললে কেউ শোনে না। মুখ খারাপ করলে তখন শোনে। এই তো সব মানুষ। ঘেন্না ধরে গেছে মানুষগুলোর ওপর। মানুষের চেয়ে বনের জানোয়ার অনেক ভাল।

শ্যামল। ও-সব কথা রাখো। কি বলতে চাইছিলে বল।

মাষ্টার। বলছিলাম কি—ওই তো একবার শুনলি একটা মেয়ের চিঠি খুলে পড়েছিলাম। মনটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছিল। আবার আর একদিন। সেদিনও তেমনি একটি খামের চিঠি। চিঠিটা বেশ মোটা মোটা। ভাবলাম বড় চিঠি। তাড়িয়ে তাড়িয়ে পড়া যাবে। খামের মুখে জল দিয়ে দিয়ে খুলে ফেললাম চিঠিখানা। ওমা, চিঠি কোথায়? চিঠিখানা ছোট, কিন্তু দু'খানা দশ টাকার নোট। বুঝি ছাখ্। অভিনারি চিঠির ভেতর টাকা পাঠিয়েছে। আমার তো এই সরকারী চাকরি, কতই-বা মাইনে পাই। যা পাই তাতে—এই তো আমার বৌ—কুলিয়ে সুলিয়ে চলতেও জানে না। টাকা যতদিন রইলো ততদিন খুব খেলে, তারপর ফুরিয়ে গেলেই ব্যস্, হাত টাকা। আমি তখন টাকা কোথায় পাই বলতে পারিস? চুরি করব? একটি পয়সা এদিক-ওদিক হলেই তো চাকরি চলে যাবে। ভাবলাম ওই বুড়িটা

টাকা দিই যেয়ে! কারও কিছু বলবার নেই। ধরতেও পারবে না—কিছু বলতেও পারবে না। বোমার ভড় খাওয়া হয়ে যাবে। দশ টাকার নোট দুটি বের করে নিয়ে চিঠিখানা সরিয়ে রাখলাম। যাক্, নিশ্চিন্তি হলাম। বাসটা কোনোরকমে চলে যাবে। কাজকর্ম শেষ করে চান করে খেতে বসলাম। ভাতের গ্রাস আর মুখে ওঠে না! খেতে আর কিছুতেই পারি না। খালি খালি মনে হতে থাকে—অন্যায় করেছি, আমি চুরি করেছি, আমি পাপ করেছি। বৌ বললে, হাঁগা তুমি ওরকম করছো কেন? খাচ্ছ না কেন? কি হয়েছে তোমার? শরীর-টরীর খারাপ নাকি? বললাম, না—কিছু হয়নি। বলেই উঠে পড়লাম। বৌ ভাবলে—বমিটমি করবো হয়ত। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি তাড়াতাড়ি পোষ্টাপিসে ঢুকে ইঁট চাপা দিয়ে নোট দু'খানি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম সেইখান থেকে বের করলাম। তারপর খামের সেই চিঠিখানির ভেতর নোটদুটি পুরে ছুটলাম বিনয় ঘোষের বাড়ীতে। পোষ্টমাষ্টার এসেছে—কি ব্যাপার? বিনয়ের কাকা বাইরে বসে বসে চেয়া খুরিয়ে শনের দড়ি কাটছিল। বললে, মাষ্টার মশাই, কিছু বলবেন? বললাম, হ্যাঁ বলবো। ডাকো বিনয়ের বৌকে। ডাকো আমার কাছে। ছেলেমানুষ বৌ, ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়ালো দোরের আড়ালে। বললাম, বৌমা, বিনয় একটা বড় মন্দ কাজ করেছে। এমন কাজ করতে তাকে মানা করে দিও। এই ভাখো এই খামটির ভেতরে তোমাকে কুড়িটি টাকা পাঠিয়েছে। এরকম করে টাকা পাঠানো বে-আইনী। এই বলে টাকা সুদ্ধ খামটি তুলে দিলাম বিনয়ের বৌ-এর হাতে। খামটি নিয়ে বিনয়ের বৌ গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আশীর্বাদ করলাম—বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো। আমার চোখে তখন জল এসে গেছে। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী ফিরে এলাম। বৌকে বললাম, দাও, এবারে ভাত দাও। খাই। খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সটান্ এক ঘুম। এবার বল্—ভাল কাজ করিনি?

শ্যামল। নিশ্চয়ই করেছ। লোভ জিনিসটাই খারাপ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

মাষ্টার। কি বললি? আহা, কথাটি তো বেশ ভাল কথা। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ঠিক বলেছিস। হিংসা আর লোভ—এই দুটো রিপু মানুষকে একেবারে টেনে নামিয়ে দেয়। রসাতলে নামিয়ে দেয়।

শ্যামল। রাত হয়ে গেল। এবার চলি।

(শ্যামল সত্যিই চলে গেল)

মাষ্টার। ভাখো ভাখো, ছোঁড়া সত্যিই চলে গেল। আরে বাবা, রাত হলো তো কি হলো? মনে সাহস থাকলে—ওরে ও শ্যামল, শোন্, শোন্! ফিরে আয়। তোর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে। সেটা এখনও বলা হয়নি।

শ্যামল। আর একদিন শুনবো। (দূর থেকে) আজ চললাম।

মাষ্টার। (এগিয়ে গিয়ে) না না, আর একদিন নয়। আজ না বললে ভুলে যাব। ফিরে আয়। আজই বলবো।

শ্যামল। আলোতে দেখছি। (ফিরে এসে) নাও, কি বলবে বল।

মাষ্টার। লিখেছিস সেইটে? সেই যে বলেছিলি—লিখবি।

শ্যামল। ও, তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে বলেছিলে—সেইটে তো?

মাষ্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গল্প-টল্প লিখিস্, তাই বলেছিলাম যে—আমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখ্। এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

শ্যামল। ভুলবো কেন? এই ভাখো, লেখাটা আমার পকেটেই রয়েছে। গল্প আরম্ভ করে তোমাকে শোনালাম। তোমার পছন্দ হলো না—

মাষ্টার। পছন্দ হবে কেমন করে? প্রথমেই লিখলি—আমি পাগল। আমাকে তাই মেনে নিতে হবে? আমি পাগল?

শ্যামল। শোনো কথা! আমি পাগল কেন লিখবো? লিখেছিলাম, এই ভাখো না—(পকেট থেকে কাগজগুলি বের করে) লিখেছিলাম, বেঁটেখাটো মানুষটি, উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, কথায় বার্তায় কেমন যেন একটু পাগ্‌লেটে পাগ্‌লেটে ভাব—

মাষ্টার। ওই তো লিখেছিস্। তাই-বা লিখবি কেন? আমি পাগল নই, তবু যদি পাগল লিখিস্ রাগ হয় না? ওইটে কেটে ফেলে আবার নতুন করে লিখবি। যা সত্যি তাই লিখবি।

শ্যামল। সত্যিটা কিরকম শুনি?

মাষ্টার। এই যেমন ধর্ আমার স্ত্রী। ওই বৌটার কথা লিখবি আগে। লিখবি—ওর মত খারাপ মেয়ে দুনিয়ায় নেই। লিখবি—ওই পেত্নীটার জন্যে ভদ্রলোকের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আসল কথাটা কি জানিস?

শ্যামল। কি?

মাষ্টার। ভালবাসা। ভালবাসা। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ভালবাসা যদি থাকে, তা'হলে পৃথিবীর সব রকমের সব দুঃখ কষ্ট তারা হাসিমুখে সহ্য করতে পারে।

শ্যামল। ঠিক বলেছ। এই ভালবাসাটাই হলো খাঁটি কথা। মস্ত বড় সত্যি কথা।

মাষ্টার। হ্যাঁ, তাহলে তুই জানিস দেখছি। লিখবি—মেয়েটা মাষ্টারকে ভালবাসে না। ভালবাসলে এত ঝগড়াঝাঁটি হয় না কখনও। স্ত্রীর ভালবাসা পেলে মাষ্টারের জীবনটা হয়ে উঠতো—মানে—হয়ে উঠতো একেবারে—কি বলবো? তোদের ভাষায় কি যেন বলে—কি যেন—বল্ না রে বাপু, ও-সব কি আর আমি জানি ছাই!

শ্যামল। মধুময়।

মাষ্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। মধুময়—মানে একেবারে মধুময়। মানে একেবারে grand মানে beautiful.

শ্যামল। তা না হয় লিখলাম। ভাখো মাষ্টার, তুমি লোক খুব ভাল। কিন্তু সবাই তোমাকে কি বলে জানো?

মাষ্টার। কি বলে?

শ্যামল। বলে বদমেজাজী। ভাল মেজাজে কেউ কখনও তোমাকে দেখতে পায় না। কেউ যদি একখানা পোষ্টকার্ড কিনতে আসে তো তাকে তুমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মারতে ওঠো। তাকে দেখতে এলে তাড়িয়ে দাও।

মাষ্টার। ও। ব্যাটারা আমার নামে এই সব বলে বুঝি?

শামল। বলে।

মাষ্টার। তা কি করতে হবে? কাজের সময় আমাকে যদি কেউ বিরক্ত করে তো তাকে পূজো করতে হবে? আদর করে তার চুমো খেতে হবে?

শামল। না না মাষ্টার, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ো না। শুনলাম তোমার এই বদমেজাজের জন্যে গ্রামের লোক তোমার বিরুদ্ধে একটি দরখাস্ত করতে চায়। আমি তাদের অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে থামিয়ে রেখেছি। কোনও কাজের জন্যে যদি কেউ এখানে মানে এই পোষ্টাপিসে আসে, তার সঙ্গে তুমি যেন ধাধা ঠাণ্ডা করে ভাল ব্যবহার কোরো। না করলে তোমার ক্ষতি হবে।

মাষ্টার। ক্ষতি হবে? আমার? আমার ক্ষতি হবে? কখ্খনো না। তুই দেখে নিস শামল, ক্ষতি আমার কেউ করতে পারবে না। চেষ্টা করতে কেউ কসুর করেনি। আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছে অনেকে, কিন্তু পারেনি কেউ কিছু করতে। উল্টে পিওন থেকে পোষ্ট-মাষ্টার হয়েছি। ভগবান আমার সহায়—বুঝলি? জীবনে আমি কারও ক্ষতি কখনও করিনি। আমার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। তবে কেউ যদি আমার ক্ষতি করে থাকে তো করেছেন ওই (বাড়ীর ভেতর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে) উনি।

শামল। উনিটি কে?

মাষ্টার। দূর বাবা! তাও বুঝতে পারলি নি? আমার উনি মানে আমার গিন্নি। এই যে আমার তিরিক্ষে মেজাজের কথা বললি, এর জন্যে দায়ী কে? ওই উনি। (গলার আওয়াজটা খাটো করে) কাজ নেই বাবা, আস্তে কথা বলি। শুনতে পেলে কিছু বাকী রাখবে না। তার চেয়ে চল্ আমরা বেরিয়ে পড়ি। জঙ্গলের রাস্তায় তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা।

শামল। সেই ভাল। চল।

(দু'জনেই বেরিয়ে পড়লো)

মাষ্টার। (বাড়ীর ভেতরে বোধকরি বা স্ত্রীকে উদ্দেশ করে) দোর খোলা রইলো। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। দোর বন্ধ কোরো।

(সুমুখে একজন সাঁওতালকে আসতে দেখে)

এই মরেছে! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। ওই মুংরা আসছে। আয়, এই গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ি। মুংরা যেন আমাদের দেখতে না পায়।

শামল। কেন, কি হয়েছে? ওকে এত ভয় কিসের?

মাষ্টার। আঃ, পরে শুনবি। এখন না। চলে আয় চট্ করে।

(মুংরা দেখতে পেয়েছে)

মুংরা। মেষ্টর! ও মেষ্টর!

মাষ্টার। এই যাঃ! ব্যাটা দেখতে পেয়েছে। দাঁড়াতেই বলো। কি রে মুংরা, কি বলছিস?

মুংরা। (পাতায় জড়ানো কি একটা জিনিস দেখিয়ে) এই ছাখ, এনেছি।

মাষ্টার। এনেছিস তো বুঝলাম। কিন্তু আমার হাতে পয়সা-কড়ি আজও কিছু নেই বাবা।

মুংরা। যেৎ বাবু, তুই কি রকম মাষ্টর। খুইসা নাই তো আনতে বলিস কেনে? ইটো আপুন আমি কাকে দিই বল্ দেখি।

শ্যামল। কী ওটা? বুনো খরগোস মনে হচ্ছে।

মাষ্টার। হাঁ, বুনো খরগোস। ওরা বলে সড়সড়ে। খুব সুস্বর মাংস। খেতে খুব ভাল লাগে। আমার স্ত্রী একদিন বলেছিল—আনিয়ে দিও, খুব ভাল রান্না করে খেয়ো খেয়ো। তা এমনি কপাল আমার, মুংরা তিন দিন তিনটে খরগোস্ আনলে—তা যেদিন আসে সেইদিনই হাতে আমার পয়সা থাকে না।

শ্যামল। কত দাম?

মাষ্টার। দাম বেশি নয়।

মুংরা। চার আনা বাবু। তুঁই নিবি?

শ্যামল। হাঁ, আমি নেবো। এই নে চার আনা পয়সা। আমি দিচ্ছি তোকে।

মাষ্টার। বাস বাস এই তো হয়ে গেল। কিন্তু দাঁড়া, তুই ওটা কুটতে পারবি না। মুংরা, আমি ছুরিটা এনে দিচ্ছি বাড়ী থেকে, তুই ওটা ভাল করে কেটে কুটে তালের পাতা দিয়ে বেঁধে দিয়ে যা। বাবু অনেকটা পথ যাবে কিনা, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। দাঁড়া, আমি ছুরিটা এনে দিচ্ছি। (মাষ্টার ছুরি আনতে গেল)

শ্যামল। (মুংরাকে) ভাখ্, মুংরা, দুটো ভাগ করবি। একটা আমার। একটা মাষ্টারের।

মুংরা। হঁ বাবু, তাই করে দিচি।

শ্যামল। জঙ্গলের ভেতর এগুলো থাকে। না?

মুংরা। হঁ বাবু, বহুৎ থাকে। দলে দলে লুকোই লুকোই ঘুরে বেড়ায়। আমরা তাল পেতে দিই একদিকে, তারপর খুব গোলমাল করা করে টিন বাজাই, বাজনা বাজাই। ওরা ভয়ে ভয়ে ডিউএর বিজুলিতে ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের জালের ভেতর আটক পড়ে যায়। আর পালাতে নারে। তখন টপাটপ্ ধরে নিই আমরা। ভারি সুন্দী মাত। আর ভারি সুন্দর খেতে। হাড়গোড় তো নাই। নরম তুলতুল্ করে। মারতে খুব মায়া হয় বাবু। কিন্তুক্ কি করবো, পেটের জ্বালায়—পেট বড় দুষমণ বাবু।

(বড় একটা ছুরি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো মাষ্টার। ছুরিটা মুংরার হাতে দিয়ে—)

মাষ্টার। এই নে। ওই তো পাতা রয়েছে তোর কাছেই। দে এবার ভাল করে কেটেকুটে ওই পাতা দিয়ে মুড়ে দে।

মুংরা। হঁ প, বুঝেছি। তুখে আর বলতে হবেক্ নাই।

শ্যামল। এসো মাষ্টার, ও কাজ করুক্। আমরা ততক্ষণ ওই গাছের তলায় বসে বসে গল্প করি।

মাষ্টার। সেই ভাল। আয়। ভাখ্, তুই গল্প লিখবি বলেছিস, কখন্ লিখবি বল্।

শ্যামল। তোমার পছন্দ হচ্ছে না, কেমন করে লিখি বল।

মাষ্টার। এই ভাখ্, তখন ওই সব কথা বললাম বলে তোর রাগ হয়ে গেল? পাগল-ছাগল লিখিস না বাপু, আমি পাগল নই। পাগল যদি বলতে হয় তো বলবি আমার স্ত্রীকে। ও হচ্ছে গিয়ে মস্ত বড়লোকের মেয়ে। এক কথায় বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলো আমার

সঙ্গে। বাপ নিতে এলো। গেল না কিছুতেই। বললে, 'স্বামী যার গরীব, বড়লোক বাপের অন্ন তার গলা দিয়ে গেরোবে না। আমি বেশ ভালই আছি বাবা, আমি যাব না।' একে পাগল বলবি না তো কী বলবি? বেশ আছে এখানে! বেশ আছে না ছাই আছে! ভাল একখানা শাড়ী কিনে দিতে পারি না, দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারি না, আর বলে কিনা ভাল আছি! ওর কি কম কই রে! সাধে ওই রকম করে চেঁচায়!

শ্যামল। তবে যে তখন যা-তা বলছিলে বৌ-এর নামে?

মাষ্টার। বলতে হয়, বলতে হয়। ওই সব যা-তা বলে, ঝগড়া করে, কোনো রকমে ভুলিয়ে রাখতে হয় ওকে। (হঠাৎ দুংরার দিকে নজর পড়তেই) ও কি রে দুংরা, দুটো ভাগ করলি যে? মাংস দুটো আয়গায় রাখছিস কেন?

শ্যামল। আমি বলেছি। এক ভাগ আমার। এক ভাগ তোমার।

মাষ্টার। আমার কেন? বললাম—আমার হাতে পয়সা নেই, তুই বেশ লোক তো! দু' আনা পয়সাই বা আমি এখন পাই কোথায়?

শ্যামল। পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।

মাষ্টার। ছি ছি, দু' আনা পয়সা খরচ করবার ক্ষমতাও আমার নেই। স্ত্রী খেতে চাইলে, তাই বললাম। কিন্তু স্ত্রী কি খাবে নাকি? খাবে না। বসে বসে যা মুখে আসবে তাই বলে আমাকে গালাগালি দেবে আর আমাকেই খাওয়াবে সব মাংসটুকু। ওই রকম ওর স্বভাব। জানিস? দাঁড়া তাহ'লে ওকে এই মাংসটা দিয়ে আসি। ভারি খুশী হবে। দে রে দে দুংরা, আমার ভাগটা দে।

দুংরা। এই যে এই বাবাটো বাবুকে দিই, আর এইটো তুই দে।

মাষ্টার। তাই দে। (মাংস নিয়ে ছুটে গিয়ে) গিন্নি! গিন্নি! এই ছাখো'—

শ্যামল। দে এবার আমার ভাগটা। এই ফাঁকে পালাই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

(শ্যামল চলে যাবার পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো মাষ্টার)

মাষ্টার। কই রে, শ্যামল কোথায় গেল? ওই তো—! ওরে ও শ্যামল! শ্যামল! ওরে শোন্, শোন্। পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? শোন্। (কাছে গিয়ে) তোকে একবারটি আসতেই হবে।

শ্যামল। কেন? আবার কেন?

মাষ্টার। কেন-টেন জানি না বাপু, তোকে ডাকছে আমার স্ত্রী। আয়।

শ্যামল। আজ আমাকে ছেড়ে দাও মাষ্টার। রাত হয়ে গেছে। আর একদিন আসবো।

মাষ্টার। না না আর একদিন নয়। আজই—এক্ষুনি আসতে হবে। তোকে না যদি নিয়ে যাই, রাত্তিরে আমাকে ঘুমোতে দেবে না। সারারাত গালাগালি করবে। আয় বাপু আয়। আয় আমার সনে।

শ্যামল। ছাড়বে না কিছুতেই? আচ্ছা—চল। [শ্যামলকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে]

মাষ্টার। এই ছাখো, ধরে এনেছি। এই—এরই নাম শ্যামল।

যুবতী। জানি। উনি তো প্রায়ই আসেন। বসুন। দড়ির ওই খাটেই বসুন। ওইটি ছাড়া বসতে দেবার কিছু নেই আমাদের।

শ্যামল। প্রণাম। আজ আর বলবো না। অনেকখানি পথ যেতে হবে।

সুমতি। একটু জল খান।

শ্যামল। না না—এ কী বলছেন আপনি? না—না—

সুমতি। শুধু এক গ্লাস জল। এই দুটি বাতাসা মুখে ফেলে দিয়ে জলটুকু খেয়ে নিন। খেতে হয়।

শ্যামল। খেতে হয়? কেন, ওই মাংসটুকু দিলাম বলে?

সুমতি। আজ্ঞে না। গরীবের বাড়ীতে এলেন, একটু মিষ্টিমুখ—

শ্যামল। বলছেন যখন—খাই। কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলুন।

সুমতি। হাঁা, তুমিই বলবো। তুমি আমার ছোট ভাইএর মতন।

শ্যামল। তাহ'লে আজ চলি দিদি। আবার দেখা হবে।

সুমতি। এসো। এখানে এলে দেখা কোরো। বাইরে বাইরে চলে যেয়ো না।

শ্যামল। আচ্ছা চলি। আজ আমাকে একটি প্রণাম করতে দিন। (সভ হয়ে প্রণাম করে) চলি।

সুমতি। বেঁচে থাকো ভাই। সুখে থাকো! আনন্দে থাকো!

শ্যামল। এসো মাষ্টার। আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।

মাষ্টার। চল্। জল খাওয়ালে, পান দিলে না?

সুমতি। বড় মানুষ যাদের, পানের পাট আছে বাড়ীতে?

মাষ্টার। তাও তো বটে! পান আমরা কেউ খাই না। সেকথা আমার মনেই ছিল না।

সুমতি। না না খাব না কেন? খাই। পান খাই, জরদা খাই, এই মাসেই শুধু বন্ধ করে দিয়েছি। আমার অসুখ করেছিল কিনা। ডাক্তারে-ওষুধে দশটা টাকা খরচ হয়ে গেল। তাই পান জরদা কেনা বন্ধ করে দিয়েছি।

মাষ্টার। বেশ বাবা, বেশ, তাই না হয় হলো। আয় শ্যামল! (বাইরে বেরিয়ে গিয়ে) শ্যামল! দেখলি?

শ্যামল। হুঁ।

মাষ্টার। কি ভাবছিস?

শ্যামল। ভাবছি—তোমার স্ত্রীর কথা।

মাষ্টার। ভাববার কি আছে?

শ্যামল। আছে। উনি তোমার জীবন দুর্বহ করে তুললেন কেমন করে সেই কথাই ভাবছি। তুমি বলছিলে—পত্নী। ছি ছি মাষ্টার, ও-কথা তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে কেমন করে? অমন সুন্দর চেহারা—

মাষ্টার। যাঃ সুন্দর কোথায়? ওকে সুন্দর বলে না।

শ্যামল। তোমার হাতে পড়ে ওঁর সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে।

মাষ্টার। তা বেশ বাপু, তাই না হয় হলো। আমিই বজ্জাত। আমার হাতে পড়েই ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাহলে তুই এক কাজ করিস। আমার যে-গল্পটা লিখবি—ও আমাকে ভালবাসে না—সে কথাটা তাতে আর লিখিস না। যদি লিখেছিস তো কেটে দিবি।

শ্যামল। দেবো। সব কেটে কেলে দিয়ে আবার নতুন করে লিখবো তোমার গল্প।

॥ শেষ ॥

কুহকিনী

নারায়ণকুমার চট্টোপাধ্যায়

মধুমাস নয়।

কিন্তু মধু-রজনী যাপনের উদ্দেশ্যেই সুরেশ্বর আর লীনা নিদাঘের তপ্ত বৈশাখে বের হয়ে পড়ল কলকাতা ছেড়ে। প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী তিথি। উৎসবটা শুধু দু'জনের মন সাক্ষিত্বেই প্রতিপালিত হবে। আর তা ছাড়া অনেকদিন ধরেই সমুদ্র দেখবার সাধ লীনার।

কলকাতা থেকে গোপালপুর অন-সী।

মাদ্রাজ মেল এসে পৌঁছাল ভোরবেলায় বহরমপুরে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গোপালপুর সমুদ্র-সৈকত।

ট্যাক্সি এসে থামল যখন তখন বৈশাখের প্রসন্ন সকাল। সমুদ্রের হাওয়া বইছে—ক্লান্তিহরা বাতাস। 'ছাপি-ভিলা'—একটি ইজ-বঙ্গ সাউথ ইণ্ডিয়ান হোটেল। সেই হোটেলের দোতলায় খোলা বারান্দা ঘিরে চেয়ার পাতা। সেখান থেকে দেখা যায় সমুদ্র। নীল সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু নীল নীলাম্বুরাশি। উত্তাল ঊর্মিমালার অফুরন্ত-অধীর।

সুরেশ্বর এইখানে এসেই উঠল। পূর্বাহ্নেই ঘর রিজার্ভ করা ছিল। সঙ্গে সঙ্গিনী লীনা,—উচ্ছলা-যৌবনা লীনা। মাত্র একবছর হল সুরেশ্বরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। লীনার মন সমুদ্র-তরঙ্গের মতনই উদ্বেলিত, দেহে চঞ্চল যৌবন।

সঙ্গের মালপত্তর ট্যাক্সি থেকে হোটেলের কুলিই নিয়ে এসে দোতলার ঘরে তুলে দিলে। হোটেলটিতে তেমন বেশি জনসমাগম নেই। আর এ-জায়গায় বেশি লোকের ভিড়ও হয়না—যেমন দেখা যায় দীঘা কিংবা পুরীর সমুদ্র-সৈকতে। বাঙালী তো নেই বললেই চলে।

'বেশ সুন্দর জায়গা, ভিড়-ভারাক্কা নেই। মা, তোমার রুচির প্রশংসা করি।' লীনা সুরেশ্বরের গালে মৃদু টোকা মেরে বললে।

'হ্যাঁ, ঢেউ এসে নিজেকে যদি হারিয়ে ফেলতে হয় ঢেউয়ের ভিড়ে, তাহলে শহর আর কী দোষ করল?'

সুরেশ্বরের কথায় লীনা সায় দিলে খুশিমনে।

দোতলায় সমুদ্রের দিকে মুখ-ফিরানো একখানা ছোট ঘর। ছোট একখানি খাট। দু'খানি চেয়ার আর ছোট একটি টেবিল।

হোটেলের ম্যানেজার এসে সাদর সম্ভাষণ জানালে। দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টান। ব্যবহারে নম্র, সাজ-পোষাকে কেতাদুরস্ত। সুরেশ্বর পত্রযোগে ঘর ঠিক করেছিল। তার এক অফিসের বন্ধুই এই হোটেলের সন্ধান দেয়।

ম্যানেজার সুরেশ্বর আর লীনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ-ঘরটা খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে কি? অসুবিধে হলে না হয় এর চেয়ে বড় ঘর ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি জানালে, 'না, এইতেই আমাদের চলবে। বেশ গোছানো ঘর। আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আর একটা কট আনিয়ে দেব?'

এবারে লীনাই উত্তর দিলে, 'নো, থ্যাঙ্কস্। ইট উইল বি টু। ছোট খাটে আমাদের কোন অসুবিধে নেই।'

সুরেশ্বর খুশি হল। লীনাকে আরো কাছে পাওয়া যাবে।

চা এসে গেছে। সঙ্গে টোস্ট, ডিমসিদ্ধ—প্রাতঃকালীন জলখাবার। ঘর-বেয়ারার আদর-আপ্যায়নও ভালো। আর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

'না, হোটেলটি ভালো।' লীনা সুরেশ্বরের দিকে তাকালে।

'আমার পছন্দটি হচ্ছে আসল'।—সুরেশ্বর হাসলে।

'যাবে, তুমি তো আর আগে থেকে দেখে-শুনে পছন্দ করনি!'

'তবুও অনুমান তো করেছি।'

সুরেশ্বরের কথায় মিষ্টি হেসে লীনাকে সমর্থন জানাতে হল।

হাত-মুখ ধোওয়ার জন্যে দূরে যেতে হলনা। ঘরের সংলগ্নই বাথরুম। সুরেশ্বর আর লীনা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিলে।

টিপয় থেকে চা ঢেলে ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে দিয়ে লীনা বললে, 'প্লিজ!'

'সে কি! এতো আমারই—'

সুরেশ্বর বাধা দিলে, 'আমাদের এ-ঘরে তুমি এখন আমাদেরই গেষ্ট।'

তিনজনই অতঃপর চা-পানে রত হল।

ছোট ঘরখানির সামনে খানিকটা খোলা বারান্দা। এ-পাশে ও-পাশে আরও দু'চারটে ঘর।

লীনা জিজ্ঞেস করলে, 'আশপাশে আর কারা আছেন?'

দক্ষিণ ভারতীয় ম্যানেজার উত্তর দিলে, 'এখন পাশের দু'খানি ঘর ফাঁকা। আর দুটোতে এক সাউথ ইণ্ডিয়ান ফ্যামিলি এবং একজন গুজরাটি ভদ্রলোক। বাট নো বেঙ্গলি ফ্যামিলি। চলে গেছে সব। আসবে আবার। এখন তো শীতলের শেষ। তবুও কিছু বাঙালী আসবেই।'

লীনা বললে, 'উই ডোণ্ট বদার ফর দ্যাট। আমাদের তার জন্যে কোন অসুবিধে হবে না।'

চা-পান শেষ হল।

সমুদ্র যেন ডাকছে। আর ঘরে থাকা যায় না।

'ডিনার দেবো ইউরোপীয়ান; কিম্বা যথারুচি-ভোজন?'

ম্যানেজারের কথায় লীনা বললে, 'না দু'বেলাই ইণ্ডিয়ান ডিস। সকালে ভাত আর রাত্রে রুটি মাংস।'

সুরেশ্বরের ব্যক্তিগত কোন পছন্দই নেই। লীনার পছন্দই তার পছন্দ। ম্যানেজার আর এক দফা বিনয়-সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলে।

'ঘর বন্ধ কর। চল সমুদ্রের ধারে যাই।'—লীনার চোখে সমুদ্র-দর্শনের ঔৎসুক্যের ছাপ।

সুরেশ্বর বললে, 'সারারাত ধরে ট্রেন জার্নি করেছ। বিশ্রাম নেবে না একটু?'

'এখানে কী বিশ্রাম নিতে এসেছি?'

কলকাতায় যে-লীনা নড়ে চড়ে বসতে চায় না—এখানে সমুদ্র সান্নিধ্যে তার জীবনে যৌবনের জোয়ার-তরঙ্গ জেগেছে এরই মধ্যে।

'কাপড়-জামা পালটাবে না?'

সুরেশ্বরের কথায় লীনা গ্রীবা ভঙ্গি হেলিয়ে বললে, 'এখন নয়।' বিকেলে সমুদ্রের রঙে ম্যাচ করে ড্রেস করব যেখন।

সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল লীনার দিকে। তার চোখে-মুখে সমুদ্রের স্বাদ

খানিকক্ষণ সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসল সুরেশ্বর আর লীনা।

লীনারই উচ্ছ্বাস বেশি। নীল তরঙ্গ ফেনার ফণা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে গোঁ গোঁ শব্দ করে—তারপর তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। আনন্দে লীনা হাততালি দিয়ে উঠল।

তারপর শুধু নিস্তব্ধতা। লীনার চোখ শুধু অনন্তলীন সমুদ্রে। কণ্ঠে তার আর কোন ভাষা নেই।

সুরেশ্বর কেবল ক্লান্তি বোধ করছে। সারা রাত জেগে এসেছে। আসার সময় তারই উচ্ছ্বাস ছিল বেশি। এখন শরীর বিশ্রাম চায়।

সমুদ্র-স্নানের পর্ব সুরু হয়েছে।

বেশি লোক নেই। সীজনে যারা এসেছিল তারা চলে গেছে। এখন ভাঙা হাটের বেলা। সুরেশ্বর লীনার তাতে আফসোস নেই। ভিড় তারা চায় না। তারা চায় একান্ত নির্জনতা। দু'জনে দু'জনকে যাতে নিবিড় করে অনুভব করতে পারে। আর সেইজন্যেই দীঘা কিংবা পুরী না গিয়ে এখানে আসা।

তবু সমুদ্র-স্নানে দেখা যায় অনেককে। বহরমপুর থেকে গাড়িতে এসে সমুদ্র-স্নান সেরে আবার ফিরে যাওয়া।

গোপালপুরেও এখনো কিছু লোক যে আছে তাও টের পাওয়া যাচ্ছে। মাদ্রাজী, অ্যাংলো, পাঞ্জাবী, সিন্ধি,—এমন কি বাঙালীও।

একটি বাঙালী দম্পতিকে দেখে লীনা কৌতুক অনুভব করলে। সমুদ্রে নেমেছে তারা স্নান করতে। সঙ্গে অবিশ্যি ছুলিয়া আছে। তবু বীরত্বের বড়াই দেখাতে পুরুষটি এগিয়ে যায় সমুদ্রের ঢেউ ভাঙতে। আর মুলায়ী বধূটি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিছুতেই এগুবে না সে। একটা বড় ঢেউ এসে বধূটিকে উল্টে ফেলে দিলে। ছুলিয়া তখন তার হাত শক্ত করে ধরেছে।

একে মোটা,—তায় ভীরু। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঘাপটে বেসামাল তার বিপর্যস্ত।

লীনা বলে, 'মাগো, কী ঘেন্নার দৃশ্য! অমন করে সমুদ্রে স্নান করতে নামা কেন বাপু!'

'তুমি স্নান করবে না?'

সুরেশ্বরের কথায় লীনা মাথা নেড়ে আপত্তি জানালে।

'সে কী! এখানে তো এই জন্যেই আসা'।

'না, ওভাবে আমি কিছুতেই সমুদ্র স্নান করতে পারব না।'

'ওভাবে করবে কেন? আঁটসাঁট করে কাপড় পরে নেবে। আণ্ডারওয়ার পরবে। না হয় সুইমিং কস্টিউম, তাও তো সঙ্গে করে এনেছ।'

ঘাড় বেঁকিয়ে লীনা বললে, 'আমি কিন্তু তা হলে তোমার হাত ধরে স্নান করব। ও ঘুলিয়া চলবে না। তুমি পারবে না লামলাতে আমাকে?'

বীরদর্পে সুরেশ্বর বললে, 'নিশ্চয়ই পারব। আমার প্র্যাক্‌টিশ আছে।'

বেলা বাড়ছিল। কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসে ওরা দু'জনেই উঠে পড়ল।

সেদিন আর সমুদ্রে স্নান করা ঘটে উঠল না।

সুরেশ্বর আর লীনা দু'জনেই সারারাত ট্রেন জার্নিতে ক্লান্তি অনুভব করছিল। হোটেলে খানপর্ব সেরে নিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দু'জনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

উঠল যখন তখন বিকেলের বেলা পড়ে এসেছে।

চা-জলখাবার প্রস্তুত। লীনাও তাড়াতাড়ি সাজ-সজ্জায় রত হয়ে উঠল।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছিল লীনা আর সুরেশ্বর।

সমুদ্রের নীল রঙে রঙ মিলিয়ে লীনা শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে। সর্ট হাতকাটা ব্লাউজ, পাতলা সিল্কের শাড়ি—লীনার সাজ-সজ্জায় নব-যৌবনের দীপ্তি।

ঘরোয়া মেয়েরা পরিবারে যে বেশ-ভূষা—এখানে তার ব্যতিক্রম।

সমুদ্রে এখানে-ওখানে ঘুলিয়াদের নিয়ে কিছু কিছু স্ত্রী-পুরুষ ঢেউ-এর খেলা খাচ্ছে।

কিছু স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছেও। কিছুদূর অগ্রসর হতে যে-দৃশ্য দেখলে লীনা তাতে সে থমকে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়ানোর কথা কিন্তু সুরেশ্বরেরই।

হয়ত লীনার ভয়েই সে দাঁড়ায়নি। লীনাই কিন্তু সেই সুযোগ করে দিলে। সমুদ্রের ধারে বালির ওপর হোগলার ঘর। সেখানে অর্ধ-উলঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গ তরুণী। নয় না, পরিধানে ফটিতট থেকে সর্ট সুইমিং ইজের। বক্ষ আবরণীতে দেহের নগ্নতা ঢাকা পড়েনি। সুস্থ সুঠাম দেহ-বল্লরী। বালির ওপর সর্বাঙ্গ মেলে ঘরে 'স্যাণ্ড বাথ' নিচ্ছে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে,—সমুদ্রের জলে তার রঙের প্রতিবিম্ব।

সুরেশ্বর বললে, 'সতুলি!'

লীনা জিজ্ঞেস করলে, 'কোনটা সসতুলি?'

'মানে?'

'মেমসাহেব না সমুদ্র-দৃশ্য?'

লীনার কথায় সুরেশ্বর বললে, 'দুর্বাস্ত। সমুদ্রে স্নান-রাইড আর স্নান-সেট সত্যিই অপূর্ব।'

লীনা হেসে বললে, 'তাতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু মেম-সাহেবকেও দেখ, কম সতুলি নয়।'

লীনার কথায় যেন বিদ্রূপের ইঙ্গিত। সুরেশ্বর বোকার মতন তাকিয়ে থাকে।

লীনা বলে, 'আচ্ছা, লজ্জা করছে না ওর?'

সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, 'কেন ?'

'এই যে আমরা ওকে দেখছি। আরো কতজন তো দেখছে ওকে এইভাবে শুয়ে থাকতে।'

'তাতে কী ?'

'তুমি সহ্য করতে পার আমি যদি অমনি খোলা গায়ে শুয়ে থাকি ?'

'আমাদের সঙ্গে ওদের এইখানেই তো তফাৎ। ওরা জানে জীবনকে কেমন ভাবে উপভোগ করতে হয়। যৌবনকে ওরা ভোগ করতে জানে বলেই যৌবন ওদের সহজে ছেড়ে যায় না।'

সুরেশ্বরের কথায় এবার আর এক ইঙ্গিত। লীনা কিন্তু দমবার পাত্রী নয়।

বললে, 'আমি যে প্রশ্ন করলুম, তার উত্তর তুমি দিলে না।'

'কী প্রশ্ন ?'

'আমি যদি আমার দেহকে অমনভাবে উন্মুক্ত করি এই প্রকাশ্য জনালয়ে তুমি সহ্য করতে পারবে ?'

সুরেশ্বর বললে, 'কেন পারব না ? আমার ও প্রেজুডিস নেই।'

'সত্যি বলছ ?'

'হ্যাঁ।'

সুরেশ্বরের জবাবে লীনা হাসলে, 'পিছিয়ে যেও না কিন্তু।'

'না, কখনো নয়। হায়ার আই উড এনজয়। আমি মনে করব তুমি স্পোর্টিং।'

খেতাঙ্গ তরুণীর 'স্যাণ্ড-বাথ' শেষ হল।

নিরাভরণ শ্বেত পদযুগল থেকে কটিতট,—একটা সুষম ছন্দ। বক্ষ-আবরণী ভেদ করে সুডৌল যৌবন আরো উদ্ধত। বালি মাখা গায়ে ইভ-তরুণী সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে। শ্বেত-হংসীর ডানা মেলে ঢেউএর পর ঢেউ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল দূরে,—আরো দূরে নীল নীল ঢেউ অতিক্রম করে। তুলিয়া অবশ্যই কাছে কাছে আছে,—আর আছে লাইফ বেলট।

সুরেশ্বর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

লীনা আপত্তি জানালে, 'কী দেখছ অমন হাঁ করে ?'

'দেখছি জীবন।' —সুরেশ্বর মৃদু কণ্ঠে বললে।

'আর দেখতে হবে না। চল এইবার হোটেলে ফেরা যাক্।'

'দূর! এর মধ্যে কেন ?'

'সন্ধে হয়ে আসছে। আর এদিকে তেমন মানুষজনও নেই।'—লীনা বুঝি বা ভয় পেয়ে গেছে।

'আর কেউ না থাকুক আমি তো আছি।' —সুরেশ্বর দৃঢ়কণ্ঠে বললে।

'ওঃ, কী সাহসী বীর পুরুষ ?'

লীনার এ পরিহাসে সুরেশ্বর আরো প্রদৃপ্ত হয়ে উঠল,—'সাহস যে আছে তার প্রমাণ কী আগে পাওনি ?'

'কবে, কোথায় গো ?'

'কেন ইডেন গার্ডেনের সেদিনের কথা কী ভুলে গেলে নাকি ?'

লীনার স্মৃতিপটে উদয় হল বটে অতীতের একদিনে ঘটনা। সুরেশ্বর তখনো লীনাকে স্ত্রী রূপে

লাভ করেনি। দু'জনে দু'জনকে জানে, চেনে আর ভালোও বাসে। ছুটির দিনে বিশেষ করে পূর্বরাগের পালা চলে কলকাতার রম্যস্থানে,—ইডেন গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, স্ট্র্যাণ্ড রোডে গঙ্গার ধার, সিনেমা, থিয়েটার,—বালিগঞ্জের লেক, আরো এখানে, ওখানে, সেখানে। কী রোমাঞ্চকর সেদিনগুলি!

হ্যাঁ, মনে পড়ছে তার।

ইডেন উদ্যানে একদিন সন্ধ্যায় একটা মাতাল তার সীনার ওপর একেবারে এসে পড়েছিল।

মাতালদের বড় ভয় সীনার। হাউমাউ করে ভয়ে সে চিৎকার করে উঠেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুরেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাতালটার ওপর। কিন্তু শারীরিক বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি আর। আশে পাশে অনেক লোকজন জমে গেল। আর তাদেরই হাতে মাতালের নিষ্কৃতিকে ছেড়ে দিয়ে সুরেশ আর সীনা স্ট্র্যাণ্ড রোডের রাস্তায় একখানি চলন্ত ট্যাক্সিতে চেপে বসেছিল। পুলিশ-হাঙ্গাম হতে পারে। কে যায় ওই বুট-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে?

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাদের দু'জনের বিয়ে হয়। একবছর পূর্বের ঘটনা। সীনার তা মনে পড়ে গেল।

'কিন্তু মাতালটার পরিণাম কী হল?'

সীনার কথায় সুরেশ বললে, 'হু উড কেয়ার ফর দ্যাট। উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে নিশ্চয়ই।'

'তোমার কাছ থেকে তো নয়!'

'বাঃ, আমিই তো প্রথম চ্যালেঞ্জ করি।'

'হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক। আর তার পুরস্কারও তো তুমি পেয়েছ!'

সীনার কথায় প্রতীপ সুরেশ বললে, 'হাঁ, আমি তোমাকে জয় করেছি।'

দু'জনেই দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রের ধারে। ইভ-রমণী তখনো চেটএর দোলায় দুলছে। পিছনে ওবেরাই ইউরোপীয়ন হোটেল। সেখানে বিজলী-মালায় বিচ্ছুরিত আলো। বিলিতি অর্কেস্ট্রাও সুরু হয়েছে।

'কতক্ষণ আর দাঁড়াবে? পা টনটন করছে। তুমি না হয় মেম সাহেবের মনোলীলা উপভোগ করছ।' —সীনার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর।

সুরেশ বললে, 'চল তাহলে এগুনো যাক, আর না হয় ত এইখানেই বস।'

'চল, এগুনোই যাক্!'

দু'জনে আবার পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল।

'যাই বল অতখানি বেহায়াপনা কিন্তু ভালো দেখায় না!'

সুরেশ হাসলে।

'হাসছ যে।'

'তোমার কথা শুনে।'

'কেন, হাসির কথা কী বললাম?'

সুরেশ বললে, 'এই কিছুক্ষণ আগেই না আমাকে জিগ্যেস করছিলে তোমার ওইরকম ভাব আমি সহ্য করতে পারব কিনা!'

'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। তুমি নিজেই সহ্য করতে পারবে না নিজেকে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ মানুষ অভ্যাসের দাস।'

কথায় কথায় এগিয়েই চলেছিল সুরেশ্বর আর লীনা।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পথ সন্ধ্যা আরো ঘনিয়ে এসেছে। আর তারা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। এখানে এখন বড় একটা মানুষের আনাগোনা নেই। দু'চারজন প্রবাসবিলাসী বিলাসিনী যারা সমুদ্রের এই ধারে এগিয়ে গিয়েছিল এইবার তারা ফিরে আসছে। সমুদ্রেও আর স্নানার্থী কেউ নেই।

'আর কতদূর যাবে?' —লীনা প্রশ্ন করলে।

'এরই মধ্যে ফিরতে চাও?' সুরেশ্বর বললে।

'আজ কিন্তু চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষ।'

'আকাশে চাঁদ নেই বটে; কিন্তু আমার মনের আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে।'

সুরেশ্বর আরো গা-ঘেঁষে সরে এল লীনার।

'এই কী করছ? লোকজন দেখে ফেলবে যে!'

সুরেশ্বর লীনার দেহটি টেনে নিয়েছে একেবারে নিজের বুকের কাছে।—'এখানে আবার দেখবে কে?'

লীনা বাধা দিতে চেষ্টা করে, 'ছাড়, ছাড়.—সত্যিই আমার ভয় করছে।'

'ভয় আবার কাকে? ইডেন গার্ডেনের মতন এখানে তো আর মাতাল নেই!'

'তুমিই তো মাতাল হয়ে উঠেছ!'

সুরেশ্বর লীনাকে তখনো বক্ষলগ্ন করে রেখেছে। চারপাশে আবছা অন্ধকার।

সমুদ্রের ধার নির্জন। এখানে কোন লাইট পোষ্টও নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাতের জমাট বাঁধা অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে এখনো কিছু দেরী আছে। এই কিছুক্ষণ হল মাত্র সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে।

তবুও অন্ধকার। আবছা গাঢ়তা অন্ধকার।

সমুদ্রের ঢেউগুলি আছড়ে আছড়ে পড়ছে। তরঙ্গগর্জনধ্বনি। হু হু করে বাতাস বইছে। লোনা জলের ছিট এসে লাগছে গায়ে, চোখে, মুখে।

সুরেশ্বর অনুভব করে লীনাকে। তার বিবাহিত পত্নী। তার শয্যাসঙ্গিনী।

কিন্তু এ যেন সে লীনা নয়। লীনার যে-দেহ এখন তার অনুভবের মধ্যে,—তার উত্তাপ সুরেশ্বরের বিবাহিত সত্যিকারের স্ত্রীর দেহের উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

সমুদ্রের ধারটাও নির্জন।

বালির পাড়ে পাশাপাশি বসেছিল সুরেশ্বর আর লীনা। তবু লীনা দু'একবার উঠি উঠি করেছে, 'চল, আর নয়। রাত হয়ে গেল।'

সুরেশ্বর বাধা দিয়েছে, 'এরই মধ্যে হোটেলে ফিরে কী করবে? এই তো সবেমাত্র সন্ধে পার হল।'

'কিন্তু এ ধারে লোকজন একটাও নেই। ভয় ভয় করছে।'

'আমি তো পাশে আছি।'

'তুমি তো একলা। কতখানি লড়তে পার?'

লীনার কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে সুরেশ্বর, 'পৃথিবীতে একজন মেয়ের জন্যে একজন পুরুষই চিরদিন লড়াই করে এসেছে।'

হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এল লীনার চোখে-মুখে। সুরেশ্বরের মধ্যেও কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা। একুনি যে, পৌরুষের বীরত্বের আস্ফালন তার কণ্ঠ জুড়ে সোচ্চারিত ছিল সমুদ্রের লোনা ঝড়ে তা যেন উড়ে গেছে।

লীনা চিৎকার করতে উদ্যত হয়েছিল;—সুরেশ্বরও। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জনেই কোন কথা আর বলতে পারল না। দু'জনের কণ্ঠই রুদ্ধপ্রায়।

আবছা অন্ধকারে মুখ-চোখ খুব স্পষ্ট নয়। তবু বোঝা গেল দুর্বৃত্তই একজন। হাতে বর্শাজাতীয় অস্ত্র একটা, পরণে নেংটি, মিশমিশে কালো গায়ের রং.—দুর্ধর্ষ চেহারার পুরুষ।

সুরেশ্বর লীনার পাশ থেকে একটু পিছিয়ে গেল। আর লীনা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

তবুও লীনাই বললে ভয়ার্ত কণ্ঠে, 'সঙ্গে যা আছে, সবই দিচ্ছি। প্রাণে মের না।'

'পাঁচ রূপীয়া দেও, হাঁড়িয়া পিয়েগা।' —ভাঙা হিন্দীতে জোয়ান খুশিয়া বললে।

সুরেশ্বরই মানি ব্যাগ বার করলে। প্রতিবাদের ভাষা এ-মুহূর্তে সে হারিয়ে ফেলেছে।

পাঁচটা টাকা পেয়ে বার কয়েক সেলাম ঠুকে খুশিয়া বীর বালির পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেল। অন্ধকারে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

পাঁচটা টাকা এমন কিছুই নয়। তবুও লজ্জায় সে কথা আর কাউকে প্রকাশ করা গেল না। সুরেশ্বর আর লীনা নীরবে এসে হোটেলে ঢুকল।

তাদের দেখে ম্যানেজার বললে, 'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

লীনাই উত্তর দিলে, 'সমুদ্রের ধারে।'

'এই অন্ধকারে?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা ভালো করেননি।'

'কেন?'

ম্যানেজার সতর্ক করে দিয়ে বললে, 'বিপদ-আপদ যদি কিছু হয়!'

লীনা জিজ্ঞেস করলে, কি ধরণের বিপদ?'

ম্যানেজার বললে, 'এই কিছুদিন আগেই এখানে এক রাহাজানি হয়ে গেছে। রিভলভার দেখিয়ে অন্ধকারে সমুদ্রের ওধেরাই হোটেলের কাছে এক ইজরায়লীর সর্বস্ব ডাকাতি করে নিয়েছে। ঘড়ি, আংটি, পার্স, ক্যামেরা—সবকিছুই।'

আতঙ্কের স্বরে লীনা বললে, 'আরমাটা তা হলে তো সেফ নয়।

ম্যানেজার উত্তর দিলে, 'আগে অবিশ্যি এমন দুর্ঘটনার কথা আমরা কখনো শুনিনি। এখানকার লোকাল লোকজন,—যে নেভার রব।'

সুরেশ্বর এতক্ষণ পরে কথা বললে, 'তাহলে বিভলভার দেখিয়ে মেম সাহেবের সর্বস্ব কেড়ে নিলে কারা?'

'বাইরের কোন গ্যাঙ্গ।'

সুরেশ্বর বললে, 'আমি কিন্তু জানি এখানকার লোকাল পুলিসরাও রয়েছেন। তারাও ভয় দেখিয়ে—'

'ইয়েস! দে আস্ক,—তারা টাকা পয়সা চায়। ভয় দেখিয়ে নয় আর দে নেভার—'

ম্যানেজারের কথা শেষ না হতেই লীনা বলে উঠল, 'রাদার দে বেগ। তারা ভিক্ষে করে, যদিও ঠিক ভিখিরির মতন ভিক্ষে চাওয়ার পদ্ধতি নয়।'

'ইয়েস ম্যাডাম। দে বেগ বুট স্লিক। কিন্তু তারা ডাকাতদের মতন লুঠন করে না।'

ম্যানেজারের কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে সুরেশ্বর আর লীনা এগিয়ে চলল দোতলায় তাদের ঘরের দিকে।

রাত্রে আহারাদির পর সুরেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল খোলা ছাদের 'পর। লীনাও এসেছে।

সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরাল। দামী সিগারেটের গন্ধে বাতাস ভুরভুরে হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও যেন নেশায় তেমন আর আমেজ নেই।

সামনে অবিশ্রান্ত সমুদ্রের গর্জন। কৃষ্ণপক্ষের রাত এইবার আরো ঘনীভূত।

'নাঃ, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। শুধু একরাশ অন্ধকার। চল ঘরে গড়িগে।'

লীনার কথায় সুরেশ্বর আকাশের প্রকাশ করে বললে, 'কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়ে আমাদের এখানে আসা উচিত ছিল। অন্ধকারে এসব জায়গা ভালো লাগে না।'

লীনা বললে, 'তবু ভালো পাঁচটা টাকার ওপর দিয়েই গেছে!'

'তুমি যে ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়লে।'

সুরেশ্বরের বীরত্ব আবার বুঝি মাথা চাগাড় দিয়ে উঠতে চায়।

লীনাই বাধা দেয়, 'থাক ও প্রসঙ্গ! লেট আস ফরগেট। পাঁচটা টাকা মনে কর একটা ভিখিরিকেই দিয়েছ। তার চেয়ে মনে কর আজ থেকে মাত্র কয়েকদিন পরে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।'

অন্ধকারে দু'জনে আবার খুবই কাছাকাছি হল। খোলা ছাদের ধারে কাছে এখন আর কেউ নেই। পাশের ঘর দু'খানি খালি। ওপাশের ঘর দুখানি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ওখানকার অধিবাসীরা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের বৈশাখের রাত সমুদ্রের হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। একটানা শুধু সমুদ্রের গর্জন আর নিবিড় অন্ধকার।

কিন্তু লীনার দেহে আর কোন উত্তাপই নেই। সুরেশ্বরের ঠোঁট দু'টিও কেমন না জানি শুকনো।

যদিও এই সুরক্ষিত হোটেলে এখন আর ভয় পাবার মতন কিছুই নেই, তবুও সুরেশ্বর আর লীনা যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরেই সরে দাঁড়িয়েছে!

পুজোর দিনকটি

অরুণা লাহিড়ী

পুজো আসছে আসছেই ভাল, এলেই তো ফুরিয়ে যায়। সারা বছরে আমরা বাঙ্গালীরা যে-কোন দেশেই থাকিনা কেন, এই কটি দিনের জন্যই যেন উৎসুক হয়ে থাকি। মা আসছেন—তাঁর আগমনে শরতের আকাশ, শিউলির সুবাস আমাদের মনে অপূর্ব্ব এক আগমনীর সাড়া জাগায়। এর সঙ্গে আছে একটু অবসরের আনন্দ। একঘেয়ে কাজের রুটিনটাকে তো সারা বছর আমরা নিজেদের পিছেই চলেছি। এই ফাঁকে পুজোর ছুটিতে হয়ত দূর দেশের কোন প্রবাসী মেয়ে মায়ের কাছে আসবে নয়ত দূরে থাকা চাকুরে ছেলে বৌ বাড়ী আসবে কিম্বা সবাই মিলে একটু বিদেশে বেড়াতে গিয়ে দুদিন হাঁফ ফেলে বাঁচবে। কিন্তু মা দুর্গার আগমনের আনন্দে আমরা মাতোয়ারা হয়েছি বাড়ীর মাটির কথা একবার ভাবছি কি? তিনিও তো সারা বছর ধরে সংসারটি মাথায় নিয়ে রয়েছেন! তাঁরও তো একটু ছুটি চাই।

কিন্তু চাইলেই কি তাঁকে ছুটি দেওয়া যায়! ওরে বাবা এখন বাড়ী ভরা লোক! কিন্তু তখনই তো যায়। কেমন করে তাই ভাবছেন! কেন আপনার বাড়ীতে রোজ যে নিয়মে কাজ চলে তার একটু ব্যতিক্রম হলই বা! বরং এই নতুনত্ব একটু বিশেষত্বই এনে দেবে। বছরের অন্য সময় এই রঙীন দিনগুলি আপনার মনে আলো জ্বালবে। কাজ ভাগ করে নিন। বাইরে থেকে জিনিষপত্র কিনে আনার ভার নিন পুরুষ মানুষরা। অনেক বাজার ভীতু পুরুষ মানুষ আছেন—তাঁদের চেয়ে হয়ত বাড়ীর চাকুরে মেয়েটি ভাল বাজার করতে পারেন—বেশ তো তিনি সঙ্গে যান।

—রান্নার ঝামেলা একেবারে ছেঁটে ফেলুন। খেটাতে হবে না। ঠাকুর দেখতে হবে না! একটা কোন ভাল আইটেম রাঁধুন। বেশীর ভাগ সেদ্ধ দিন—সেগুলিকে পিঁয়াজ ভাজা বা ঘি ভাজা দিয়ে মেখে স্বাদ আনলেই চলবে। যিনি ভাল খাবার তৈরী করবেন তিনি রান্না করবেন না—শুধু জোগাড় দেবেন। বিকেলের চায়ের ব্যবস্থা ছেড়ে দিন অল্প বয়েসী স্কুলের ছেলে বা মেয়েদের ওপর। তাদের বুঝিয়ে দিন এটি তাদের কাজ—না হলে কেউ চা খেতে পাবে না। দেখবেন ওরা উৎসাহের চোটে আপনাদের ঘুম থেকে তুলে চা খাওয়াবে। বাকি রইল রাতের রান্না। তরকারি করে রেখে বেরিয়ে পড়ুন—রুটি বা ভাতের ভার দিন চাকর কিম্বা ওপর। সে সুবিধেও যদি না থাকে—কুকারের ব্যবস্থা করুন। ঘর গোছাবেন মেয়েরা বা বৌরা। দেখুন তো চেষ্টা করে সবাই মিলে মাকে ছুটি দিতে পারেন কিনা! শেষে হয়ত তিনি কাপড় কাচতে বসে যাবেন। না, যার যার কাপড় তাঁরা নিজেরা কাচুন। ছোটদেরও শেখান, ভীষণ খুশী হবে তারা।

—বাড়ীর আগেই ঘর গোছান সেরে নিন। একেবারে সামনের বারান্দা বা ঘর সেটিতেই বসার ব্যবস্থা রাখুন। অল্প জায়গাতে যাতে অনেকে একসঙ্গে বসতে পারেন অথচ ঘরটি বেশ সুষ্ঠু রুচির

পরিচয় দেয় এইটি মনে রেখে ঘর গোছান। যাই কিছু রাখুন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রাখুন। কিছু ফুল দিয়ে একটি দুটি ফুলদানি বা খুব চকচকে করে মাজা কোন বাসন সাজিয়ে দিন। ঘরে ধূপ দিন। মৃদু একটি কৌটোয় কিছু ভাজা মশলা বা এলাচদানার ব্যবস্থা রাখুন। যাঁদের বাড়ীতে গানের চর্চা আছে তাঁরা একটি ছোট চৌকিতে একপাশে ডিভানের ধরণে সাজিয়ে তার ওপর গানের সরঞ্জাম যেমন তানপুরা বা হারমোনিয়ম রাখুন। মেঝেতে গালচে থাকে ভাল নয়ত সুন্দর একটা মাদুর পেতে রাখুন। প্রত্যেকে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা অভ্যেস করুন।

—এবার পোষাক। সকালের দিকে একটু হাল্কা ধরণের পোষাকই মানায় ভাল। যেমন সুতি শাড়ী বা হাল্কা রংএর যা কিনেছেন সেগুলি দিনের জন্য রেখে রাতের জন্য বেশ জমকালো রংএর শাড়ী আর গয়না আলাদা করে রাখুন। শুধু নিজের নয় ছেলেমেয়েদের পোষাকও কোনদিন কোনটি পরবে সব ভাগ করে তোয়ালে জড়িয়ে আলাদা করে ভাগ করে তাদের বুঝিয়ে দিন। তাহলে ঠিক বেরুবার সময় তারা আর যেমতা যাহা ঘরে কাড়াকাটি করবে না। নিজের কাপড় গয়নাও বেছে আলাদা করে ভাগ করে গুছিয়ে রেখে দিন। তাহলে বেরুবার সময় চটপট তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবেন—কর্ত্তাদের কাছে 'সাজতে বসে বেলা যায়' এই গঞ্জনা শুনতে হবে না। তাঁরটিও অবশ্য গুছিয়ে রেখে দেবেন। আবার ফিরে এসে যে যেমন তেমন করে সব কাপড়-চোপড় তাল পাকিয়ে ফেলে রেখে দেবেন তা করবেন না—তাহলে আপনার দেখাদেখি ছোটরাও তাই করবে আর কর্ত্তা তো করবেনই, সকলের কাপড়ের তলায় পড়ে আপনার সুন্দর নতুন শাড়ীটির একেবারে রফা রফা। রাগ করে যাকে বকবেন সেও পুজোর দিনে বকুনি খেয়ে রাগ করবে। তার চেয়ে বাড়ী এসে বা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু সময় করে—ব্লাউজ আজ ব্লকের পাউডারগুলো ব্রাস দিয়ে ঝেড়ে ভাঁজ করে তুলে দিন। আর শুধু কখনো তুলবেন না। তাহলে দাগ ধরে যাবে। বিশ্রী একটা গন্ধ থাকবে। শাড়ীগুলি ভাঁজ করে একটু ইস্ত্রি করে তবে তুলুন। জুতোও পরিষ্কার করে রাখুন—দেখুন পরেরবার ব্যবহারের জন্য জিনিষগুলি তৈরী রইল।

ষষ্ঠীর দিন সাধারণ একটি নতুন তাঁতের শাড়ী আলতা এইসব পরুন। কমবয়েসী মেয়েরা হাল্কা সাজুন।

সপ্তমীর সকালে—রঙিন কিছু পরে বানিয়ে গয়না পরুন। সন্ধ্যের সিল্কের শাড়ী। ঘোর রংএর শাড়ীর সঙ্গে একটু হাল্কা রংএর জামা পরুন। বেশ জমজমে গয়নার সঙ্গে।

মহাষ্টমীর অঞ্জলী যদি বেনারসীর সঙ্গে এক পা গয়না পরে দিতে যাওয়া হয় চমৎকার হয়। নিশ্চয়ই বাড়ীর কাছে অঞ্জলী দেবেন। সুতরাং প্রাণভরে সাজতে ক্ষতি কি! এই অবসরে বেনারসীতেও একটু হাওয়া লাগল। বিকেলেও সবচেয়ে ভাল শাড়ীটি পরুন।

নবমীর সকালে সিল্ক পরুন বা সুতিই পরুন একটু গাঢ় রংএ সাজুন, তখন সবার চোখে উৎসবের ঘোর। এদিকে দিনও যে ফুরিয়ে এলো। রাত্রের পোষাক হোক আরও জমকাল। আজই যে শেষ।

পোষাক পরার আগে—বেশ করে মুখ হাত পা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সেই ভিজে ভিজে মুখে, গলায়, হাতে একটু ক্রিম ঘষে নিন—তোয়ালেতে মুছে ফেলুন—এবার একেবারে একটি হালকা লেভের পাউডার মুখে হাতে গলায় মাখুন—গায় ট্যালকম পাউডার নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর

করে ধরুন করে কি বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিজের যখনকার যা গো তা যে ছাড়ান যাবে না তা তিনি ভালো করেই জানেন। শর্মিলা সম্বন্ধে ভয় ভাবনাও তাঁর তেমন কিছু নেই। মেয়ে হয়ে সে অনেক দিকে যে পুরুষের উপর টেক্কা দেয়, আর যে কোন অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যে তার আছে তা তাঁর জানা। তাঁর যা কিছু ভাবনা বিনিকে নিয়ে। বিনি নেহাৎ সাধারণ মিষ্টি নিরীহ একটি মেয়ে। শর্মিলার সঙ্গেই একসঙ্গে পড়ত। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজেও ঢুকেছিল। কিন্তু পড়াশুনা তারও আর হয়নি। শর্মিলা রাজনৈতিক দল ছেড়ে আর্ট কলেজে ঢোকবার আগে একবার কাশীতে যায় মার সঙ্গে দেখা করতে। বিনির শর্মিলার ওপর অন্ধ ভক্তি স্কুল থেকেই ছিল। এবার কিছুদিন সঙ্গ পেয়ে বিনি শর্মিলার একেবারে অনুগত শিষ্যা হয়ে ওঠে। শর্মিলার সঙ্গে সেও কলেজ ছেড়ে আর্টস্কুলে পড়তে এসেছিল। আবার আর্টস্কুল ছেড়ে অন্নপূর্ণা আশ্রমেও গেছে তার সঙ্গে।

এ অন্নপূর্ণা আশ্রমটি কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম।

নাম সত্যিই অন্নপূর্ণা আশ্রম নয়, পরাশর একটু হাসল,—আমি ঠাট্টা করে অন্নপূর্ণা আশ্রম বলি। আসল নামটা আরো গালভারী—গ্রামলক্ষ্মী সমবায়। তাতে পোলট্রি ডেয়ারী তাঁত সব কিছুরই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করা হয়েছে বলে শুনি। নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। জায়গাটা পাণ্ডবর্জিত বলা ঠিক নয়, ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, কিন্তু এখন ধ্বংসস্তূপের দেশ। কলকাতা থেকে প্রায় সওয়া একশ মাইল দূরে চিরতী বলে একটা গ্রাম। সেই গ্রামেরও বাইরে একটা ধ্বংসপুরী গোছের পোড়োবাড়ী আর তার চারধারের লালমাটির ডাঙা নিয়ে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পত্তন করা হয়েছে।

বলো কি!—অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল—ওই দু'টি মেয়ে ওই ধূ ধূ তেপান্তরের মধ্যে পোড়ো একটা বাড়িতে সঙ্গী সহায় ছাড়া একলা থাকে! কত আর বয়স হবে দু'জনের? বড় জোর কুড়ি একুশ?

বয়সটা ঠিকই ধরেছ। পরাশর বললে,—শর্মিলার একুশ আর বিনির কুড়িই হবে। তবে ঠিক সঙ্গী সহায় ছাড়া নয়। চিরতী গ্রামের বাইরে ওই পোড়ো ভিটে আর তার আশপাশের জমিজমা ছিল সিসিমার এক নব্বাইয়ের। তাঁদের বংশ প্রায় লোপই পেয়েছে। সিংহরায় তাঁদের পদবী। এককালে ছুদে রাজা হিসেবে ও অঞ্চলে সিংহের মতই তাঁদের প্রতাপ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে প্রতাপ অস্তে গেছে। বংশধারাও এসেছে শুকিয়ে। সিসিমার নব্বাই আর তাঁর ছোট ভাই ছিলেন সিংহরায়দের শেষ বংশধর। সিসিমার নব্বাই আর বনহ নিঃসন্তান অবস্থাতেই বিদেশে মারা গেছেন। তাঁর ছোট ভাই বিক্রম সিংহরায়ও বিদেশে মানে বর্মায় কাজ করতেন। সেখান থেকে শেষ বয়সে বর্মার নতুন আইনে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে দেশে ফিরে ওই পুরোন ভিটেতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বিয়ে-থাই করেননি। শর্মিলা যখন আর্ট কলেজে পড়বার আগে কাশীতে ছিল কিছুদিনের জন্যে, বিক্রম রায় তখন একবার কাশী বেড়াতে গিয়ে সিসিমার সঙ্গে দেখা করেন। শর্মিলা তাঁর কাছেই তখন ওই জায়গার বিবরণ শোনে। মাথার মধ্যে কথাটা তার ছিল। ছবি আঁকা শিখতে শিখতেই গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পরিকল্পনাটা তার মনের মধ্যে ঘোরঘর পাকিয়ে ওঠে ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে। তারপর বিনিকে নিয়ে হঠাৎ একদিন সেখানে গিয়ে হাজির মুরগী হাঁস গরু ছাগল পুষে আর তার সঙ্গে তাঁত বসিয়ে গ্রামের অর্থনীতির সংস্কার করবে বলে। একেবারে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় তাই ওরা নয়। বৃদ্ধ বিক্রম সিংহরায় মাস-কে-ওয়াস্তে হ'লেও পাহারাদার ও অভিভাবক হিসেবে আছেন।

পরাশর খামবার পর একটু কৌতুকের স্বরে বললাম,—সাহসকাও রামায়ণ শুনিয়েও তোমার সংকটটা কি তা কিন্তু বোঝাতে পারলে না। তোমার পিসিমার চরণটা কি যাতে তুমি এত বিচলিত? ওই চিঠিটাতে গিয়ে গরু, ছাগল, মুরগী আর তাঁতের খবরদারী করা?

না,—পরাশরের মুখে যেন আশঙ্কার ছায়া পড়ল,—তবুও ওখান থেকে বিনিকে উদ্ধার ক'রে কাশীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসা। নিজের মেয়ের ওপর তাঁর কোন হাত নেই তিনি জানেন। তার জন্যে ভাবনাও ছেড়ে দিয়েছেন বলেন। কিন্তু তাঁর তীর্থের পাতানো দিদির মেয়ে বিনির পরিণয়ের পাল্লায় পড়ে আখেরটা নষ্ট হচ্ছে এই ভাবনাতেই তাঁর শুয়ে বসে শান্তি নেই। আমাকে তাই লিখেছেন যেমন করে হোক বিনিকে ওখান থেকে নিয়ে তাকে কাশীতে পৌঁছে দিতেই হবে। চিঠিটা লিখেছিলেন চাকার ঠিকানায়, সেখান থেকে কাল সকালে হোটেলে এসে পৌঁছেছে।

এতে এত বিচলিত হবার কি আছে তা'ত বুঝতে পারছি না! সত্যি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—মেয়েটিকে ওখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ ত নয়!

শক্ত কাজ নয়!—পরাশর আমার ওপরই একটু যেন চটে উঠে বললে,—প্রথমতঃ আমি গিয়ে আঙুল নেড়ে ডাকলেই বিনি চলে আসবে কেন আমার সঙ্গে? আর দ্বিতীয়তঃ যদি বা কাশী ফিরে যেতে রাজী হয় তাহলে তাকে কাশীতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে আমি কি আর ফিরতে পারব?

কেন? না পারবার কারণ?

কারণ এই যে,—পরাশর ঝাঁঝের সঙ্গে বললে,—পিসিমা তাহলে আর আমায় স্বাধীনভাবে ফিরতে দেবেন না। এই বিনির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা মনে মনে অনেকদিন থেকেই তিনি ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। এতদিন শুধু নাগালের মধ্যে পাননি।

তা স্বাধীনতাটা না হয় বিসর্জনই দিলে! মুচকে হেসে বললাম,—দিতে'ত হবেই একদিন। বিনি মানে বিনতা দেবী দেখতে শুনতে কেমন? অত কুণ্ঠিত-টুণ্ঠিত নয় নিশ্চয়!

অত কুণ্ঠিত! পরাশরই জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানালে,—অমন মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায় না। যেমন চেহারায় তেমনি স্বভাবে। কিন্তু আমি যে স্বাধীনতা খোয়াতে কিছুতেই পারব না।

তবু তোমার মনে একটু দুর্বলতা যে আছে তা'ত লুকোতে পারছ না! কৌতুকের সঙ্গেই বললাম—শুধু পিসিমার উদ্দেশ্য বুঝেই নয়, নিজের দুর্বলতার জন্যেই তুমি বিনির কাছে ঘেঁসতে চাওনা। কেমন তাই না।

তা একেবারে মিথ্যে নয়! পরাশর স্বীকার করলে, মানুষের মন ত' বিশ্বাস নেই। শক্ত রাশও হঠাৎ ছিঁড়ে যায়।

তা'হলে এক কাজ করো না!—সুপরামর্শই দেবার চেষ্টা করলাম,—চিঠিটা ত' চাকা থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এ হোটেলে এসেছে। যেন ভাকের গোলমালে চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছোয় নি এই ভাবেই চেপে যাও না?

চেপে যাব!—পরাশর প্রায় স্তম্ভিত,—পিসিমার চিঠি পেয়েও যেন পাইনি বলে বোঝাব তাঁকে!

পিসিমার প্রতি মনের মধ্যে গাঁথা ভয় ভক্তিটা পরাশরের মনের মধ্যে কত গভীর তা তার মুখের ভাবেই বুঝলাম।

তাই এবার বললাম,—তাহলে ত' আর উপায় নেই! এক কাজ শুধু করতে পারি। তোমার

যদি আপত্তি না থাকে ত' তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারি সেখানে তোমার কি বলে ভ্যাকুয়াম ফেক দিয়েছে। বলো আপত্তি আছে!

আপত্তি! পরাশরের যেন কানে কথা গেল—তুমি যদি যাও ত তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

পরাশরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললাম,—ঋণীটণি কিছুই তোমায় থাকতে হবে না। অভিজ্ঞতায় একটু মুখবদল করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজের খুশিতেই যাচ্ছি।

সে অভিজ্ঞতা যে কি তখন যদি জানতাম!

এই ব্যবস্থাই পাকা করে পরের দিন ভোর সাড়ে ছটায় হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরলাম।

ট্রেন নয়, যেন গরুর গাড়ী।

সকাল সাড়ে ছটার ট্রেনে উঠেও টিকোতে টিকোতে সন্ধ্যা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলাম বেলা একটায়।

যেমন রেললাইন, স্টেশনেরও তেমনি ছিরি।

শুকনো রাঙা লাল কাঁকরের দেশ। দুপুরের রোদে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে।

একটিমাত্র অত্যন্ত নীচু প্ল্যাটফর্ম। নেহাৎ পাথরের একটা সাইনবোর্ড না থাকলে স্টেশন বলে চেনাই যেত না।

ইটের গাঁথুনি আর করোগেটের টিনে ছাওয়া একটা বড় গোছের ঘরেই স্টেশনের যাবতীয় কাজ হয়।

স্টেশন মাষ্টার আর একজন খালাসী ছাড়া স্টেশনে আর কেউ কাজ করে বলে মনে হল না।

আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটারই আকর্ষণ কিছু নেই। তবু সেও যেন এই আবহে স্টেশনটাকে তাচ্ছিল্য করে একটু বৃথা ভয় খেয়ে আমরা নামতে না নামতেই ছেড়ে দিলে।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাই ফাঁকা।

আমরা দুজন ছাড়া আর কোন যাত্রী নামেনি বা ওঠে নি।

নতুন অজানা জায়গায় খোঁজখবর কারুর কাছে না নিলে নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে নীল কোর্তাপরা রেলের খালাসীকে স্টেশনের ঘরের দিকে যেতে দেখে তাকেই ডাকলাম।

ও ভাই শুনছ।

লোকটি কালা বা অন্যমনস্ক যা-ই হোক সে ডাক অগ্রাহ্য করে স্টেশনের ভেতরেই চলে গেল।

অগত্যা তার পিছু পিছু সেখানেই গিয়ে ঢুকতে হ'ল।

খালাসীটিকে সেখানে দেখতে পেলাম না। আমরা পৌঁছোবার আগেই ওদিকের দরজা দিয়ে স্টেশনের পিছন দিকে সে বেরিয়ে গেছে বোঝলাম।

ঘরটায় আর কেউ আছে বলেও মনে হ'ল না প্রথমে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শুধু সুরের কোন বার্তা নিয়ে একঘেয়ে ভাবে বেজে যাচ্ছে।

এদিক ওদিক চেয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় ভারী গম্ভীর গলার আওয়াজ পেলাম পেছনেই।

কি চাই আপনাদের!

চমকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাকই হলাম। অমন ভারী গলাটাই আওয়াজ যাঁর গলা থেকে বেরিয়েছে সে মানুষটি নেহাৎ ছোটখাট বামন বললেই হয়।

এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয় বলে বিস্ময় প্রকাশ করবার মতই চেহারা।

গায়ের কোটটা দেখেই বুঝলাম, তিনিই স্টেশন মাষ্টার। পিছন দিকের দরজা দিয়ে সবে এসে ঢুকেছেন।

আমরা কিছু বলবার আগেই তিনি নিজে থেকে আবার বললেন, -ট্রেন ত এইমাত্র ছেড়ে গেল। সন্ধ্যে ছটা আটচল্লিশের আগে ত আর ট্রেন পাবেন না।

সবিনয়ে বলতে যাচ্ছিলাম,—মা', আমরা···

তিনি তার আগেই বাধা দিয়ে বললেন,—ও আপনারা ডাউনে যেতে চান? তা সে ট্রেনও বিকেল সাড়ে তিনটেয়।

স্টেশন মাষ্টারের কর্ত্তব্য শেষ করে তিনি কাঠের রেলিংএর কাটা দরজাটা খুলে তাঁর অফিসের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

বিনীত ভাবে এবার নিবেদন করলাম,—আমরা আপ ডাউন কোন দিকেই যাব না। এইমাত্র এই স্টেশনেই আমরা গাড়ি থেকে নেমেছি। এখন···

ও নেমেছেন! —আবার বাধা দিলেন স্টেশন মাষ্টার মশাই,—আপনাদের টিকিট?

টিকিট দু'খানা হাতেই ছিল। সে দুটো তাঁকে দিলাম।

আমাদের বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সন্দেহ করেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু টিকিট দুটো হাতে পেয়েই স্টেশন মাষ্টারের মুখের চেহারা যেন বদলে গেল।

তাঁর মুখে চেহারার পক্ষে অফিসের টেবিলটা বেশ উঁচু। দু'খানা ইট তলায় দিয়ে বসবার চেয়ারটাকে যথেষ্ট উঁচু করতে হয়েছে তাই। বেশ একটু যেন কসরৎ করেই তাতে উঠে বসে ভদ্রলোক এবার প্রসন্ন মুখে বললেন,—ও আপনারা বেড়াতে এসেছেন এখানে! বেশ! বেশ! বসুন বসুন।

বসবার জায়গা একটা ভাঙা সোফের তোষা বেঞ্চি। সেটাও একদিকে ইট সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

নিজেদের পরিচয়েই সেখানে বসে বলবার চেষ্টা করলাম,—আমরা এখানে এই প্রথম···

এবারও কথাটা শেষ করা গেল না।

স্টেশন মাষ্টার মশাই তার মাঝখানেই বললেন,—আহা প্রথম ত বুঝতেই পারছি। প্রথম নয় ত বার বার কেউ কি আর এখানে সখ করে আসে। তবে প্রথম একবার আসবার মত জায়গা। হুয়েন সাং-ও এসেছিলেন।

মাষ্টার মশাইএর গলায় এবার উৎসাহের উচ্ছ্বাস। তবু হুয়েন সাং শুনে আমরা বেশ একটু খ হয়ে গেছি।

পরাপর নিজের দরকারটা ভুলে একটু সবিস্ময়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—হুয়েন সাং যাকে সেই চীনা পর্যটক এখানে এসেছিলেন।

এসেছিলেন বই কি! —স্টেশন মাষ্টার সোৎসাহে জানালেন। —এখানেই তিনি সো-টো-চী-চী মানে হরিভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা করে গেছেন। এ জায়গাটা ত হ'ল সেই আদিকালের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। শ'দুই বছর আগেও এখানকার নাম ছিল কানসোনা। সে রাজধানীই ছিল চার মাইল লম্বা-চওড়া আর রাজ্য ছিল প্রায় তিন শ' মাইল এদিকে ওদিকে।

এখানে হুয়েন সাং বা এখন আপনাদের পণ্ডিতেরা যাঁকে বলেন য়ুয়ান চোয়াঙ, তিনি সম্রাট অশোকের বসানো কয়েকটা চৈত্যও দেখেছেন। এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল ত্রিশ-পঁইত্রিশটা। বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত সম্প্রদায়েরও ছিল তিনটে সঙ্ঘারাম আর হিন্দুমন্দির অন্তত পঞ্চাশটা। সে সবের চিহ্নও আজকাল অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

স্টেশন মাষ্টার সেই অতীতের দুঃখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন,—এসে ভালোই করেছেন। আপনাদের বয়স থেকেই ত এসব বিষয়ে আগ্রহ থাকা দরকার। তবে এসেছেন বড় অসময়ে। এই গরমের দিনে এ অঞ্চল ত একেবারে আগুনের খোলা। দিনের বেলা ঘুরে ফিরে দেখতেই পারবেন না।

এই বাঘমারা গোবিন্দপুরের মতন একটা স্টেশনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাত্র এমন একটি বাগবিদগ্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ স্টেশন মাষ্টারের দেখা পাব কল্পনা করতেও পারি নি।

আমাদের এ স্টেশনে নামার উদ্দেশ্য তিনি যা বুঝেছেন তার প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে হল না এখন।

তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা আগে যা ছিল সেটা একটু বিস্তৃত করে নিয়ে তার মধ্যে এসব পুরাকীর্তির সন্ধান নেওয়া ঢুকিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

স্টেশন মাষ্টার মশাইএর কথার যেন ঘের টেনেই পরাশর তাই বললে,—এ সময়ে এদিকে এসব দেখতে বড় কেউ তাহলে আসে না?

অন্য সময়েই বা বেশী আসে নাকি? স্টেশন মাষ্টার মশাই তাঁর দুঃখটা প্রকাশ করলেন,—আমরা দিল্লী আগরা জয়পুর দেখতে যাই বুঝেছেন, বাংলাদেশে কি ছিল না ছিল তার জন্যে ক'জন মাথা ঘামায়! আপনারা যে এসেছেন তাই যথেষ্ট। আপনাদের এ বয়সে আর গরম ঠাণ্ডা কি গ্রাহ্য করবার জিনিষ নাকি! তবে এখানে থাকবার একটা ব্যবস্থা দরকার। তা···

ওই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্টেশন মাষ্টার মশাইএর। উঁচু চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে একটু উত্তেজিত ভাবেই আবার বললেন,—যাক যেচে না চাইতে জল পেয়ে গেছেন মশাই। আপনাদের এখানে থাকার সমস্যা মিটে গেছে। আসুন আসুন চৌধুরী মশাই।

স্টেশন মাষ্টার মশাইএর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা আগেই বাইরের দরজায় নূতন আগন্তুককে দেখেছি।

স্টেশন মাষ্টার মশাইএর গলায় যে সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে তারই যোগ্য সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন চেহারা চৌধুরী মশাই-এর। স্টেশন মাষ্টার যেমন একহারা মানুষ চৌধুরী মশাই তেমনি দশাসই বিরাট বলিষ্ঠ সুপুরুষ। বয়সটা প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি পৌঁছেছে বটে, কিন্তু শরীরের সামান্য মেদ বৃদ্ধি আর চুলের পাক তাঁর আভিজাত্যকে যেন আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

মুখের হাসিটি তাঁর অমায়িক, স্টেশন ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি একটু বুলিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—আজ আপনার অভ্যর্থনাটা যেন একটু বেশী সাদর মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি বঙ্কিমবাবু?

আপনার অভ্যর্থনা সব জায়গাতে সব সময়েই সাদর! হেসে বললেন স্টেশন মাষ্টার বঙ্কিমবাবু,—তবে আজ একেবারে প্রার্থনা পূরণের মত যথাসময়ে আবির্ভাবটা আপনার হয়েছে বলে উচ্ছ্বাসটা একটু

বেশী জানিয়ে ফেলেছি। এইমাত্র আপনার কথাই ভাবছি, আর আপনি সশরীরে এসে হাজির। এঁরা দুজন এখানকার সব পুরোণো আমলের জিনিষ দেখতে আজ দুপুরের ট্রেনে এখানে নেমেছেন। আপনার কাছেই আতিথ্য নিতে এঁদের পাঠাতে যাচ্ছিলাম। তা ওঁদের চিঠি দিয়ে পাঠাবার আর দরকার হল না।

চৌধুরী মশাই প্রসন্ন দৃষ্টিতে আবার আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন বক্সীবাবুকেই,—আপনার আত্মীয় বুঝি?

আত্মীয়! বক্সীবাবু এবার অপ্রস্তুতভাবে বলেছেন,—না আত্মীয়-টাত্মীয় নয়।

আমাদের নামধামটুকুও যে তাঁর জানা হয়নি সেটা এতক্ষণে খেয়াল করে বলেছেন,—আমিও ওঁদের চিনি না। রাঙামাটির পুরাকীর্তি দেখতে এসেছেন বলেই ওঁদের থাকবার ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম। সত্যি, আপনাদের নামগুলোই ত এখনো জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

পরাশর ও আমি এবার আমাদের নাম-ধাম যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলেছি।

চৌধুরী মশাই নিজেই এবার উৎসাহ ভরে খুশি মুখে বলেছেন,—সেই চাকা থেকে এতদূর এসেছেন রাঙামাটির লোকেদের কীর্তি দেখতে? এসেছেন কি ইতিহাস পড়ে না কারুর কাছে শুনে?

এবার সত্য কথাটা জানাবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

পরাশর একটু ইতি সঙ্কোচ করে বলেছে,—আমরা সত্যি কথা বলতে গেলে শুধু এইসব দেখতেই আসিনি। এখানে সিংহীর আড়ালবাড়ি কোথায় জানেন বোধ হয়। সেইখানে আমাদের একটু কাজও আছে।

আপনারা আড়ালবাড়িতে যাবার জন্যে এসেছেন!

বক্সীবাবুর মুখে এবার স্পষ্ট একটু উদ্বিগ্ন বিস্ময়ের ছায়া দেখা গেছে।

তিনি একটু চুপ করে থেকে একটু যেন ক্ষুণ্ণ স্বরে আবার বলেছেন,—কই আগে বলেন নি ত!

না, মানে,—বলবার ঠিক সুযোগ পাচ্ছিলাম না। লক্ষিতভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছে পরাশর,—সিংহীদের আড়ালবাড়িটায় যাবার রাস্তা জানতেই আমরা এখানে ঢুকেছিলাম।

আড়ালবাড়িই যে আমাদের গন্তব্য সে কথাটা আগে না জানাবার ত্রুটিটা যে বক্সীবাবুর কাছে বড় নয় তাঁর পরের কথাতেই তা বোঝা গেছে। বিষণ্ণ সহানুভূতির সুরে তিনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তাতে আমরা কিন্তু বিমূঢ় হয়েছি।

বক্সীবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন,—আড়ালবাড়ীর দুঃসংবাদটা পেয়েই তাহলে আপনারা আসছেন?

দুঃসংবাদ! কি দুঃসংবাদ?—পরাশর অস্থির উদ্বেগের সঙ্গে বলেছে,—হ্ম বা কু কোন খবরই ত আমরা জানি না! কি হয়েছে কি সেখানে?

আপনারা কিছু না জেনেই এসেছেন!—এবার চৌধুরী মশাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আশ্চর্য ত!

পরাশর দুর্ভাবনায় উদ্বেগে একটু রূঢ় স্বরেই এবার জিজ্ঞাসা করেছে—কিন্তু ব্যাপারটা কি একটু দয়া করে খুলে বলবেন আপনারা? কি হয়েছে আড়ালবাড়িতে? শর্মিলা আর বিনতা বলে যে দুটি মেয়ে ওখানে থাকে তাদের কার কি হয়েছে?

তাদের কারুর কিছু হয় নি।—শান্ত স্বরে চৌধুরী মশাই-ই এবার জানিয়েছেন,—কিন্তু যাঁর অবর্তমানে ওঁরা এখানে আছেন, সেই ওঁদের পিসেমশাই বিক্রমসিংহ রায় আজ তিনদিন হ'ল নিরুদ্দেশ।

নিরুদ্দেশ! পরাশরের ব্যাপারটা বুঝতেই যেন দেরী লেগেছিল।

অবিশ্বাসের সুরে সে বলেছে,—কিন্তু তিনি ত' প্রায় বৃদ্ধ লোক। নিজের শেষ বয়সের আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবেন কেন? তাঁর বাড়িতে এমন সোনাদানা হীরে মাণিকও ছিল না যার জন্যে কেউ তাঁকে সরিয়ে নিতে যাবে। মাত্র সিংহীদের জড়াল বাড়ি, কিন্তু একটা মাস্তানার আমলের পোড়ো ভিটে বলেই ত' শুনেছি। এই দুটি মেয়ে সেটাকে কোন রকমে একটু আধটু মেরামত করে সেখানে আছে।

ঠিকই বলেছেন,—সহানুভূতির সুরে বলেছেন চৌধুরী মশাই,—আমরা এখানকার সবাই ত' এ ব্যাপারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। এটা অবশ্য তেপান্তরী মফঃস্বল বটে কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড কখনও এখানে ঘটেনি। ভাবনা হয়েছে আমাদের ওই মেয়ে দুটির জন্যেই। বুড়োই হ'ন আর অথর্বই হ'ন মাথার ওপর অভিভাবক হিসেবে ত' সিংহ রায় মশাই ছিলেন। এখন মেয়ে দুটির এখানে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহস অবশ্য ওদের যথেষ্ট! বন্ধুবাবু প্রশংসার সুরে বলেছেন বিশেষ করে ওই শর্মিলা মেয়েটির। আমার কাছে ইদানীং রাঙামাটির পুরোন ইতিহাস শুনতে আর তেমন কিছু পুরোন জিনিস দেখতে আসে মাঝে মাঝে। আমিও ছুটিছাটা পেলে জড়ালবাড়ি যাই। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তার সাহস আর মনের বল দেখে অবাক হয়েছি। দিনকাল অনেক বদলেছে তবু দু'টি ওই বয়সের যুবতী মেয়ের ওই গ্রামের বাইরে খাঁ খাঁ করা পোড়ো ভিটেয় শুধু একজন বুড়োর ভরসায় থাকা ত' চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু এখন সে ভরসাও নেই। তাই আগে মনে মনে যত বাহবাই দিয়ে থাকি এখন আর ওদের এখানে থাকা কোনমতেই উচিত নয় বুঝতে পারছি। যাক খবর কিছু না জানলেও আপনারা যে ঠিক এই সময়েই এসেছেন এটাও ভাগ্য বলতে হবে। ভগবানই আপনাদের পাঠিয়েছেন। বুঝিয়ে শুঝিয়ে এখন ওদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

বন্ধুবাবু এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে একটু হাঁফিয়ে মিনতিভরে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন।

পরাশর ওঁকেই যেন আশ্বাস দিতে বলেছে,—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় কি?

একটু থেমে তারপর জিজ্ঞেসা করেছে,—এখন জড়ালবাড়ি যাবার রাস্তাটা একটু যদি বুঝিয়ে দেন।

রাস্তা বোঝাতে হবে কেন! চৌধুরী মশাই উদার ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন—আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

না, আপনাকে মিছি-মিছি কেন কষ্ট দেব! আমরা একটু প্রতিবাদ করতে গেছি।

কিন্তু চৌধুরী মশাই সে প্রতিবাদ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন,—আরে কষ্ট কি মশাই। আমি ত' আপনাদের অতিথি হিসেবেই যেতে চাইছিলাম। এখনো যদি ইচ্ছে করেন ত' আমার ওখানেই উঠতে পারেন।

অনেক ধন্যবাদ!—আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবিনয়ে বলেছি কিন্তু এখন যা অবস্থা হয়েছে তাতে জড়ালবাড়ি ছেড়ে আপনার অতিথ্য নেওয়া উচিত ও হবে না বোধহয়।

তা অবশ্য হবে না। চৌধুরী মশাই স্বীকার করে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন, আমি ত' শর্মিলা আর বিনতাকেও এ ব্যাপারের পর আমার বাড়িতে এসে থাকবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলাম। আমার মেয়েও ওদেরই বয়সী অসুবিধে কিছু ওদের হ'তনা। কিন্তু বড় এক গুঁয়ে মেয়ে কিছুতেই রাজী হয়নি কি আর করব, তাই আমারই দু'জন সাইকেলে পাহারায় থাকতে হুকুম দিয়েছি দিনরাত।

একটু থেমে কিছুটা যেন কুণ্ঠিতভাবে বক্সীবাবুর দিকে ফিরে চৌধুরীমশাই এবার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছেন,—আপনাকে এটা দিতেই এসেছিলাম বক্সীবাবু। আমার ত দাবী কিছু বলেই মনে হচ্ছে। তবে মুখ্যু আবাড়ী ত! শালুককে পদ্মফুল ভেবে না হাস্যাস্পদ হই। আপনার রায় পেলে সাহস করে কর্তাদের কাছে পাঠাতে পারব। একটু দেখে রাখবেন।

নিশ্চয় দেখব! বলে বক্সীবাবু সোৎসাহে কাগজের মোড়কটা নেবার পর চৌধুরীমশাই-এর সঙ্গে আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠেছি।

পুরোন ছড খোলা একটা মরিস গাড়ী। চৌধুরীমশাই নিজেই তা চালান।

পরাশর সামনে তাঁর পাশে বসেছে। আমি আমাদের সামান্য মালপত্র নিয়ে বসেছি পিছনের সীটে।

জায়গাটার নাম রাঙামাটি বাকি ছিল। তার বদলে পোড়া মাটি রাখলেই বুঝি ভালো হত। প্রখর গ্রীষ্মের রোদে চারিদিক যেন তেতে আগুন হয়ে আছে মনে হয়েছে।

রুক্ষ রাঙা মাটি বলেই কাঁচা রাস্তাটা তেমন অবশ্য খারাপ নয়।

স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই দূরের গ্রামটা দেখা গেছে। তারমধ্যে কয়েকটা পাকা বাড়ি ও মন্দিরের চূড়ো খড়ো সব মাটির বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি বাড়ি তার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু। দূর থেকেই প্রাধান্যটা বোঝা যায়। শুনলাম সেইটেই চৌধুরীমশাই-এর পৈতৃক বাড়ি। আগেই অবশ্য সেই রকমই অনুমান করেছিলাম।

গাড়ি কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গেল না। গ্রামকে এক ধারে ফেলে একটা ঢেউ খেলানো বাঁজা ডাঙার ওপর দিয়ে চলল।

আমাদের কৌতূহল অনেক। যেতে যেতে চৌধুরীমশাই-এর কাছে যতদূর সম্ভব যেটাবার চেষ্টা না করে পারিনি।

গাড়িতে ওঠবার খানিক বাদেই পরাশর জিজ্ঞাসা করেছিল,—বক্সীবাবুকে কাগজের মোড়কে কি দিলেন? প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কিছু?

হ্যাঁ। গাড়ি চালাতে চালাতে চৌধুরীমশাই বলেছেন একটু যেন লজ্জিতভাবে হেসে,—দুটো পুরোণ মুদ্রা গোছের সেদিন এক জায়গায় খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়েছি। এখানে কণিষ্ক আর গুপ্ত যুগের কয়েকটা মুদ্রা আগে পাওয়া গেছে। নিজে দেখে ত ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই বক্সীবাবুকে দিয়ে গেলাম পরীক্ষা করতে।

বক্সীবাবু এসব ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ বাকি! জিজ্ঞাসা করেছি আমি। করেন ত স্টেশন মাষ্টারী!

স্টেশন মাষ্টারী করেন ত শুধু পেট চালাতে। চৌধুরীমশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন বক্সীবাবুর গুণ কীর্তনে,—নইলে এই প্রত্নতত্ত্বই ওঁর নেশা আর ধ্যানজ্ঞান। বিয়ে থা করেন নি, অন্য কোন দায় নেই। শুধু এই এক নেশা নিয়েই মত্ত হয়ে আছেন। এ স্টেশনে আছেন প্রায় বারো বছর। প্রোমোশন নেননি এখান থেকে বদলী হবার ভয়ে। সে রকম কোন কথা উঠলে ওপরওয়ালাদের হাতে পায়ে ধরে বদলী ঠেকিয়েছেন। এ অঞ্চলে স্টেশনে সাধ করে কেউ ত আর আসতে চায় না। তাই এ নিয়ে বিশেষ কিছু অসুবিধেও হয়নি।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ওঁর এত উৎসাহ হল কোথা থেকে?—জিজ্ঞাসা করলে পরাশর,—উনি কি আর্কিওলজির ছাত্র ছিলেন।

না, না সে সব কিছু নয়। হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই, তখনকার দিনে ম্যাট্রিকটা কোন রকমে পাস করে রেলের চাকরীতে ঢুকেছিলেন। ঘসতে ঘসতে কিছুদূর পর্যন্ত উঠে প্রথম তার পেয়েছিলেন এই স্টেশনের। তখন এটা একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন মাত্র। এখানে আসবার পর রাঙামাটির পুরোণো সত্য মিথ্যা গল্প গুজব সেকেলে লোকেদের মুখে কিছু কিছু শুনে আর দু একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বই-পত্র সাধ্যের অতিরিক্তও কিনে পড়াশুনা করতে সুরু করেন তখন থেকেই। পণ্ডিত বলে নাম কেনবার কোন লোভ কিন্তু নেই। এই নিয়ে মেতে থেকে যখন যা কিছুর সন্ধান পান তা প্রত্নবস্তুরই পাঠিয়ে দেন বেশীর ভাগ। শুধু সে সব জিনিষ পরীক্ষা করে তার পাঠোদ্ধার বা যথার্থ মূল্য নির্ণয় যে তিনি করতে পেরেছেন চিঠিপত্রে তাদের কাছে এইটুকু তারিফ পেলেই উনি খুশি। আমি ত এখানেই জীবন কাটালাম। এই বয়সে আমাকেও এ নেশা উনিই ধরিয়েছেন।

আপনারা তেমন দামী কিছু এখানে পেয়েছেন কি এ পর্যন্ত?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, তেমন কিছু গর্ব করবার মত এখনো পাইনি? চৌধুরীমশাই একটু যেন ইতস্তত: করে বলেছেন। মুস্কিল হয়েছে কি জানেন? আমাদের মত সখ করে প্রত্নতত্ত্ব যারা চর্চা করে তাদের ত আর সরকারী বিভাগের হুকুমনামা নেই। এখানে সেখানে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাই তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সামনে রাস্তার মধ্যে এক পাল গরুর জন্যে চৌধুরীমশাইকে গাড়িটা একটু সাবধানে ধীরে ধীরে চালাতে হয়েছে। আর সেইখানেই আমার জীবনের রং যে বদলে যেতে আমার সেই স্বপ্নের মেয়েকে হঠাৎ সেই গরুর পালের পায়ে লাল ধুলো ওড়ানো রাস্তায় আমি দেখেছি।

মেয়েটি প্রায় ছুটেই আসছিল। আমাদের গাড়িটা দেখে সে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে।

চৌধুরীমশাইও তাকে দেখে গাড়িটা থামিয়েছেন।

মেয়েটি গাড়ির বাঁ ধারেই একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। স্থান কাল ভুলে আমি তখন অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে আছি।

সুন্দরী তাকে হয়ত বলা চলে। কিন্তু আলুথালু বেশে লাল ধুলো মাখা চুল ও মুখের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় সে সৌন্দর্য চাপাই পড়ে গেছে তখন। আমি তার ওপর থেকে যে চোখ ফেরাতে তখন পারিনি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বুঝি কবিত্ব করা ছাড়া উপায় নেই। মনের মধ্যে নিজের অজান্তে এঁকে রাখা একটা কল্পনার ছবিই যেন আমি হঠাৎ সামনে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখে বিহ্বল হয়ে গেছি।

অতি দীর্ঘ মনে হলেও এ বিহ্বল আচ্ছন্নতা দু এক সেকেণ্ডের মাত্র।

পরাশরের কথায় আমার চমক ভেঙেছে।

একি বিনু! কোথায় যাচ্ছ তুমি? হয়েছে কি? উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

এই তাহলে বিনু মানে বিনতা? মনের ভেতর একটা অদ্ভুত বিদ্যুতের ঝিলিক যেন অনুভব করেছি। বিনতা পরাশরের মুখের দিকে কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারে নি। পরাশরকে ওখানে দেখাটা যেন তার কাছে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে হচ্ছে।

চৌধুরীমশাই তৎক্ষণে গাড়ির মোটর বন্ধ করে তাদিক দিয়ে নেমে পড়েছেন। মোটরের সামনে দিয়ে ঘুরে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনিও উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ সময়ে তুমি এমনভাবে ছুটে কোথায় যাচ্ছিলে বিনতা?

বিনতা এতক্ষণে যেন নিজেকে খানিকটা সামলাতে পেরেছে। একবার পরাশর আর একবার চৌধুরী মশাই-এর দিকে চেয়ে একটু থতমত খেয়ে বলেছে,—স্টেশনেই যাচ্ছিলাম। বক্সীবাবুর কাছে।

স্টেশনে? বক্সীবাবুর কাছে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন চৌধুরীমশাই তা এই রোদের মধ্যে অমন ছুটতে ছুটতে কেন?

শর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না! বিনতা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

পাওয়া যাচ্ছে না মানে? তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর,—কখন থেকে?

সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে। এখনো ফেরেনি। যাবার সময় আমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে বলে গিয়েছিল।

বিনতার উদ্‌ভ্রান্ত গলার স্বরটা যেন আমার বুকের ভেতর গিয়ে আঘাত করেছে। নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে না পেরে এবার গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করেছি,—তিনি মানে শর্মিলাদেবী ভোরবেলা কোথায় যাচ্ছেন তা কিছু বলে গেছেন?

বিনতা আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছে বেহাৎ যান্ত্রিকভাবে। আমাকে আলাদাভাবে লক্ষ্য করবার মত অবস্থা যে তার নয় তা বুঝেছি। যেন বৃষ্টিহীনের চাউনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে,—স্পষ্ট করে কিছু বলে যায়নি। তবে সিসেমমাইএর কিছু একটা হদিশ পেয়ে তারই সন্ধানে যে গেছে তা বুঝেছিলাম।

এখন ত তাহলে থানাতেই যাওয়া দরকার। বলেছি আমি।

কিন্তু পরাশর মাথা নেড়েছে। বলেছে,—না, এখুনি

বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ যখন বিপন্ন
তখন পড়বার জন্য চাই উদ্দীপনাময় রচনা।

মাতৃবন্দনা

দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার সংকলন

আদি যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শতাধিক কবির দেশবন্দনা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান ভূমিকা। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের ভূমিকা। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনা। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ২·৫০ ॥

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

শতাধিক আধুনিক কবির বহুবর্ণ কবিতার সংকলন ২·০০।

"চীনের আক্রমণে প্রবল সার্থক সময়োপযোগী দেশাত্মবোধক কবিতার সংকলন। সম্পাদক অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় উপযুক্ত সময়ে একটি জরুরী প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এজন্য তাঁর প্রশংসা প্রাপ্য।"—দেশ

আমাদের অন্যান্য প্রশংসিত প্রকাশন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনুষ্কর কাহিনী

অন্য নয়ন ॥ ৩·০০ ॥

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার

পদ্মরাগ বুদ্ধ ॥ ৩·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

মৌ ন ম ন

চরিত্রচিত্রণে পরমাকর্ষণীয়। ৭·৫০ ॥

চিরঞ্জীব সেনের নিপুণ লেখনীর নবতম আকর

ছন্নছাড়ার দ্বিতীয়িকা

ঘটনার পর ঘটনা। চমকের চমক। ॥ ৫·০০ ॥

পতাকা যারে দাও প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪·৫০ ॥ পাহাড়ী গাঁয়ের কথা নীলিমা দাশগুপ্ত ৫·০০ ॥ রাত্রিশেষের তারা (২য় মুদ্রণ) নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৫·০০ ॥ সমুদ্রলগ্ন (২য় মুদ্রণ) শক্তিপদ রাজগুরু ৪·৫০ ॥

অনন্ত আবৃত্তি। সুনীল রায় ১৫·০০ ॥
বর্ণচোরা। বনফুল ৬·০০ ॥
প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) গিরিশচন্দ্র : নবনাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ ২·৫০ ॥ অকস্মাৎ (নাটক) সুনীল মুখোপাধ্যায় ॥ ২·৫০ ॥

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১-সি. কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা —১২

থানায় যাবার কোন দরকার নেই। আমার পিসতুতো বোনকে আমি চিনি। সামান্য কোন বিপদ হলে তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা সে রাখে। সে যদি এখনো না ফিরে থাকে তার একটা উপযুক্ত কারণ নিশ্চয়ই আছে। আর তার এখনো না ফেরার মধ্যে সাংঘাতিক কোন শয়তানী কারণ যদি থাকে তাহলে এখুনি এখানকার থানায় গিয়ে তার প্রতিকার করা যাবে না। আগে আঙালবাড়িতেই চল। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার।

সেই বয়সেই এত সহজে এই বিবাহের মধ্যে পরাশর সমস্ত ব্যাপারটার কর্তৃত্ব নিয়েছে যে তাতে আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনের তখন সে অবস্থা নয়।

পরাশরের নির্দেশ মতই আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসেছি।

পরাশর আগের মতই চৌধুরীমশাইএর সঙ্গে সামনে বসেছে, বিনতা বসেছে পেছনে আমার পাশে।

কার পাশে কোথায় বসেছে, বিনতা তা তখন খেয়ালও করেনি নিশ্চয়।

কিন্তু আমি সেই শঙ্কিত উদ্বেগের মধ্যেই আমার পাশে তার উপস্থিতটুকুতেই যেন বশ হয়ে গেছি।

আর কিছু দূর যাবার পরই একটা নিচু গোছের টিলা পার হ'তে আঙালবাড়ির আয়তনটা দেখা গেছে।

দূর থেকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়েছে আমার।

দুয়ারে নিচু পাথুরে দেয়াল তোলা একটা পাথরে বাঁধানো লম্বা গোলের মত রাস্তায় সেখানে যেতে যেতে আঙাল নামটার সার্থকতাও বুঝেছি।

বাঁধানো গোলের মত রাস্তাটার নিচে নাবাল জমি। এক কালে সেখানে ঝিল গোছের কিছু নিশ্চয় ছিল। এখন তা শুকিয়ে বুজে এসে প্রায় রাস্তার নাগালই হয়ে গেলেছে। কোন বাঁধ-টাঁধের জন্যে নয়, আঙালবাড়ি নামটা এই পাথুরে গোলটুকুর জন্যেই একদা দেওয়া হয়েছিল মনে হয়েছে।

পাথুরে গোলটা পার হয়ে আঙালবাড়ির এলাকার মধ্যে ঢোকবার পর দেখা গেছে যে সবটাই তার ধ্বংসস্তূপ নয়। একদিকটা ধ্বসেপড়া গড়ের মত হলেও অন্যদিকটা মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

কোথাও পুরোণ দেয়ালের অবশেষ আর কোথাও নতুন লালের খুঁটি বেড়া দেওয়া বাইরের আয়গাটুকুর মধ্যে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের কিছু চিহ্নও বর্তমান। একদিকে তারের জাল দেওয়া ও তাপ তাপ করা কটা মুরগীর ঘর। আর একদিকে টিনের শেড দেওয়া একটা গোয়াল। সেখানে গরু মাত্র দুটি হলেও তাদের ব্যবস্থায় আধুনিক গোপালন পদ্ধতির ছাপ আছে। বসত বাড়ির এক ধারে তাঁত ঘরও একটি বর্তমান। সেখানে তাঁত একটি আছে বটে তবে চালাবার লোক অভাবে সেটি অচল। বাড়ির অদূরে একটি বৃহৎ ইন্দারার লাটা দিয়ে জল তোলবার ব্যবস্থা আছে। ইন্দারার চারিপাশে এই গ্রামের মধ্যেই কিছু তরীতরকারীর চাষ চোখে পড়ে।

এত সব খুঁটিয়ে অবশ্য সেই প্রথম আসায় সবায় দেখিনি। আঙালবাড়ির বহস্য আর আমার পাশে বিনতার উপস্থিতিই তখন সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে আছে।

আঙালবাড়িতে পৌঁছে অবশ্য একটা সমস্যার সমাধানের সঙ্গে আমাদের বিশ্বিত হতে হ'ল।

গাড়ি থামবার আগেই ইস্টারার ধারে আটা দিয়ে যে জল তুলছিল সেই মুনিষটি ছুটে এল আমাদের কাছে।

তার উত্তেজিত সম্ভাষণ শুনে আমরা যেমন বিস্মিত হলাম তেমনি স্বস্তির নিঃশ্বাসও ছেড়ে বাঁচলাম।

পরাশরের অনুমানই ঠিক। মুনিষটির কথায় বোঝা গেল শর্মিলা খানিক আগেই ফিরে এসেছে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার পর তার দর্শনও পাওয়া গেল।

মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি নিয়ে সে তখন বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেউ কিছু বলবার সুযোগ পাবার আগেই বিনতা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

কোথায় ছিলি কোথায় বলত!

অভিযোগে গলাটা তীক্ষ্ণ কঠিন করবার চেষ্টার সঙ্গে বিনতার মুখের সে উচ্ছ্বসিত আনন্দ সত্যিই উপভোগ করবার মত।

কিন্তু আমার মত শুধু সেদিকে দৃষ্টি তখন আর কার আছে।

পরাশরের সঙ্গে চৌধুরীমশাইও ব্যস্ত হয়ে শর্মিলার কাছে এগিয়ে গেছেন।

সত্যি কোথায় গেছলি শর্মী? —একটু ভর্ৎসনার সুরে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

এতদিন বাদে এখানে কি শাসন করতেই এলে নাকি পরাশর দা! —কৌতুকের ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেও শর্মিলার গলাটা যেন একটু ভারী হয়ে উঠেছে।

শাসন আপনাকে কারুর করা কিন্তু দরকার শর্মিলা দেবী। হাল্কা সুরে একটু হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই,—এতক্ষণ এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে আপনার সখীটির অবস্থা কি হ'তে পারে তা কি বুঝতে পারেন নি। বিনতা যে রকম উন্মাদিনী অবস্থায় ঘাটের ভেতর দিয়ে ছুটছিল আমি ত সত্যি আঁৎকে উঠেছিলাম।

বিনতাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেও শর্মিলার বেলা চৌধুরীমশাই যে আপনি ব্যবহার করেন সেটা তখনই লক্ষ্য করেছিলাম।

সেটা শর্মিলার ব্যক্তিত্বের জন্যে কি না তখন অবশ্য বিচার করে দেখি নি।

চৌধুরীমশাইএর কথায় শর্মিলা একটু স্নেহভরেই হেসে বিনতার দিকে চেয়ে বলেছে,—এত ভয় পাওয়ার কি হয়েছিল? আমিও কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি ভেবেছিলি?

বিনতা কিছু বলেনি। তার বদলে পরাশর একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছে,—এ সত্যি হাসি তামাশার সময় নয় শর্মী। কিছুটা আমি চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে শুনেছি, বাকিটা তোমার কাছে শুনতে চাই।

বেশ ত সবই শুনবে।—এবার গম্ভীর হয়ে বলেছে শর্মিলা,—সারাদিন ট্রেনে হায়রাণ হয়ে তেতেপুড়ে এসেছ এখন একটু বিশ্রাম করো, সবই তারপর বলব। শুনেই এখুনি ছুটে গিয়ে কিনারা করে ফেলবে এমন সমস্যা এটা বোধহয় নয়।

পরাশর না পাক আমরা এ কথায় একটু লজ্জা পেয়েছি।

চৌধুরীমশাই একটু কুণ্ঠিতভাবে আমাদের সকলকে উদ্দেশ করে বলেছেন,—আমি তাহলে এখন চলি।

একটু থেমে বিশেষভাবে শর্মিলার দিকেই চেয়ে আবার বলেছেন, যদি উচিত মনে করেন আপনার এতক্ষণের অদর্শন রহস্যটা আমায় পরে জানাবেন। আর আগে যা বলেছি আবার সেই অনুরোধই করে যাচ্ছি। যদি কিছু দরকার হয় বলবেন, বিশ্বাস রাখবেন যে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে সব সময়ে প্রস্তুত।

ধন্যবাদ! বলেছে শর্মিলা। কিন্তু চৌধুরী মশাইএর তা যেন কানে যায় নি।

কথাগুলো বলে তিনি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে সোজা আউলবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠবার সময় বিনতার এই উদ্বেল উত্তেজনার মধ্যেই শর্মিলার দিকে চেয়ে ঈষৎ কৌতুকের হাসিটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আর তাহলে এখানে কেন? ভেতরে এসো। —বলে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে শর্মিলা একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছে।

ও পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয় নি। —এবার সহজভাবে হেসে বলেছে পরাশর। তা পরিচয় দেবার সময়ই পেলাম কোথায়!

পরিচয় সারা হবার পর আমরা সবাই ভেতরে গিয়েছি। বাইরের বসবার ঘর হিসেবে সেটা বোধ হয় কাছারী বাড়ি গোছের কিছু ছিল। দেয়াল ছাদের কাটলগুলো এমন হাসেরাজি করা। ঘরটি কিন্তু যেমন প্রশস্ত তেমনি আগের আমলের পুরু গাঁথুনির জন্যে চমৎকার ঠাণ্ডা।

ঘরে বিলাসের সাজসরঞ্জাম না থাকলেও সাদাসিধে দরকারী জিনিষপত্র দিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো।

স্নান খাওয়া দাওয়া সারতে সেদিন বিকেল হয়ে গেছে।

তখনো পর্যন্ত আউলবাড়ির রহস্য সম্বন্ধে ইচ্ছে করেই কেউ কোন কথা তোলে নি।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করবার আগ্রহ কিন্তু দেখা যায়নি কারুরই। সেই বসবার ঘরটিতেই আবার আমরা সবাই সমবেত হয়েছি।

প্রথমে অবশ্য আসল প্রশ্নটাকে ঘুরে রেখে সাধারণ আলাপই একটু চালান হয়েছে।

তারপর হঠাৎ কি মনে করে তোমার উদয় বল'ত পরাশর দা। শর্মিলা সহজ পরিহাসের সুরে বলেছে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে লখ করে বেড়াতে এসেছ বলে'ত মনে হচ্ছে না! এতটা ভগিনী-প্রীতি তোমার ত' কখনো দেখিনি।

প্রীতিটা চোখে দেখবার বস্তু নয় বলেই জানি। পরাশরও হেসে পাল্টা জবাব দিয়েছে,—তবে সত্যিই প্রীতির টানে আসিনি স্বীকার করছি। এসেছি গিন্নীমার হুকুমে।

হুকুমে এসেছ! শর্মিলা একটা ভুরু একটু তুলেছে—কি হুকুম আবার মার।

হুকুম হয়েছে বিনুকে এখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেবার। পরাশর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যেই বিনতা ও শর্মিলার দু'জনের দিকেই চেয়েছে।

বিনতা কেমন একটু অসহায় ভাবে তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে। শর্মিলা কিন্তু হেসে বলেছে—তা নিয়ে যাও না। সত্যি এখন আর এ রকম গোলমেলে জায়গায় ওর থাকা উচিত নয়।

আর তোমার থাকা উচিত। প্রথম যমজের স্বরে বলেছে পরাশর তোমাদের কারুরই আর এখানে থাকা চলবে না। আমাদের সঙ্গে তোমাদের দু'জনকেই কালে এখান থেকে যেতে হবে। সোহাগে যা করবার করে নাও।

তা হয়না পরাশর দা।

শর্মিলার স্বরের দৃঢ়তায় পরাশর যেন চমকে গেছে। তবু কঠিন স্বরে বলেছে,—কেন হয় না! সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত শর্মী। এরকম একটা বিবাদের ভায়গায় জেদ করে তোমার থাকার কোন মানে হয়না। এখানে এমন কিছু রাজত্ব তুমি পেতে বসে'নি যা ছেড়ে গেলে তোমার সর্বনাশ হবে!

রাজত্ব বলেও তা ছেড়ে যেতে পারতাম হয়ত। শর্মিলার স্বর যেন বজ্রকঠিন, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কেউ আমায় এ জায়গা ছাড়াবে তা আমি সহ্য করতে পারব না

ভয় দেখিয়ে জায়গা ছাড়াবে। পরাশর এবার বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, ভয় আবার তোমায় কে দেখাচ্ছে?

কে দেখাচ্ছে জানি না, কিন্তু গত দু'মাস ধরে এমন কিছু সব অদ্ভুত ব্যাপার এই আড়ালবাড়িতে ঘটছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়ান বলে আমি মনে করি। একজন প্রৌঢ় দুর্বল পুরুষ আর দুটি আমাদের মত অল্পবয়সী মেয়ে যাতে আতঙ্কে দিশাহারা হয় এমন কোন কৌশলই বাকি নেই। তবে আমার অদ্ভুত বুদ্ধির চাকরেরা বেশীর ভাগ কাজে আসা বন্ধ করেছে, তবু আমরা হার মানিনি বলে শেষ পর্যন্ত পিসেমশাইকে লোপাট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতেই আমি সব ছেড়ে পালাব যদি কেউ ভেবে থাকে তার ভুল আমি ভাঙব। এ রহস্যের একেবারে মূল না খুঁড়ে বার করে আমি যাব না। তা ছাড়া পিসেমশাই এর কি হয়েছে না জেনে শুধু নিজেকে নিরাপদ করতে তুমিই কি আমায় যেতে বলো!

শর্মিলা উত্তেজিত ভাবে তার বক্তব্য শেষ করবার পর ঘরটা কয়েক মুহূর্ত একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শর্মিলার উত্তেজনা তখন আমাদের ভেতরও সংক্রামিত।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পরাশরই প্রথম শর্মিলাকে সমর্থন করে বলেছে, না তা যেতে তোমায় বলি না। এ রহস্যের মীমাংসা না করে আমিও এখান থেকে যাব না ঠিক করলাম। এখন তোমার মুখে গোড়া থেকে যা যা হয়েছে তা শুনতে চাই।

শর্মিলা সেই বিবরণ এবার দিয়েছে। সত্যিই ভয়াবহ বিবরণ।

মাস দুই আগে প্রথম একদিন গভীর রাত্রে তারা কাতর আর্তনাদের মত অমানুষিক এক চিৎকার শুনতে পায়।

শর্মিলা ও বিনতা ভেতরের একটি ঘরে শোয়, পিসেমশাই শুতেন এই বাইরের ঘরে।

সেদিন অধিক রাত্রে পিসেমশাই দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগান।

বাইরের ঘরে একটি লণ্ঠন সারারাত পলতে নামিয়ে জ্বালান থাকে। দরজা খোলবার পর তিনি সেইটি হাতে করে যে রকম কাঁপতে কাঁপতে তাদের ঘরে ঢোকেন তাতে তারা প্রথমটা একটু অবাকই হয়। অবাক হয়ে লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের চেহারা দেখেও। বৃদ্ধ হলেও বিক্রমসিংহ রায়কে সাহসী বলেই তারা জানে। কিন্তু সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে যেন সিটিয়ে উঠেছে তখন।

কি হয়েছে কি পিসেমশাই!—ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে শর্মিলা।

পিসেমশাই প্রথমটা কিছু বলতে পারেন না। তারপর অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বলেন, শুনতে পাচ্ছ।

শুনতে তারা তখন পেয়েছে বাইরে ঠিক যেন তাদের ইঁদারার কাছ থেকে কেউ যেন কাউকে গলা টিপে হত্যা করছে এমনি একটা কাতর আর্তনাদ দুবার রাত্রির অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে থেমে যায়।

প্রথম কিছুক্ষণ শর্মিলা ভয়ে কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে তারপর পিসেমশাই এর কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে ছুটে যায় হ'তে যায়।

বিক্রম সিংহ ও বিনতা দু'জনেই তাকে ধরে কোন রকমে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে।

ভোর না হতেই শর্মিলা খোঁজ করতে যায় এর ব্যাপারটার। পিসেমশাই ও বিনতা যান তার সঙ্গে।

বাইরে ইঁদারার কাছে বা আর কোথাও গত রাত্রের ঘটনার কোন চিহ্নই কিন্তু দেখা যায় না। শুধু বাইরের ওঁতেঘরে রাত্রের পাহারাদারের হিসাবে যে দুটি লোক থাকে তাদের কাউকেই পাওয়া যায় না।

দিনের বেলা তাদের বাড়িতে খোঁজ করতে পাঠিয়ে যে খবর পাওয়া যায় তা অদ্ভুত। সে দুটি লোক আগের রাত্রেই নাকি তাদের ঘরে ফিরে এসেছিল। তারপর সকাল না হতেই তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না।

রাত্রের ঘটনার কথা কোথাও চাউর না করে শর্মিলা বিনতা ও পিসেমশাই পরের রাত্রে বেশ একটু প্রস্তুত হয়েই থাকে। গ্রামের স্টেশনারী দোকান থেকে একটি জোরালো টর্চ তারা কিনে আনে। পদাতক পাহারাদারের জায়গায় আরো দুটি লোককেও বহাল করে রাত্রে আঙিনাবাড়িতে শোবার জন্যে।

সেই অমানুষিক আর্তনাদ কিন্তু সেদিনও মাঝরাত্রে শোনা যায়। এবার ইঁদারার কাছ থেকে নয় বাড়ির যে অংশটি তদ্রূপ সেই দিক থেকেই যেন।

পাহারাদারদের সঙ্গে শর্মিলা বিনতা ও পিসেমশাইকে নিয়ে টর্চের আলোয় হতখানি সম্ভব সেই পোড়ো বাড়ির অংশটা পরীক্ষা করে দেখে সেই রাত্রেই। কিন্তু কোন হদিসই পাওয়া যায় না এ রহস্যের।

এরপর থেকে উপদ্রব আরো বাড়তে থাকে। এবার আর শুধু ভয় দেখানো অমানুষিক চিৎকার নয়। তার সঙ্গে আরো অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা।

একদিন সকালবেলা উঠে ইঁদারার চারি ধারের বাঁধানো চত্বরে রক্তমাখা পায়ের কয়েকটা ছাপ দেখা যায়।

যে দুজন পাহারাদার এতদিন পর্যন্ত কোন রকমে টিঁকে ছিল তারা সেই দিন থেকেই হাওয়া। গোয়ালে বাগানে ও তাঁত ঘরে যারা কাজ করে তারাও এখন বিকেল হতে না হতেই কাজ ছেড়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত।

আঙিনাবাড়ির ও ঘর অপদেবতার কোপের কথা সারা গাঁয়েই তখন রটে গেছে। এরই মধ্যে একদিন রাত্রে পেছনের জংলা অংশটুকুর চেতর থেকে গভীর রাত্রে হঠাৎ আগুন জলতে দেখা যায়।

সকালবেলা খোঁজ করে দেখা যায় সেখানে একরাশ খড় কোথা থেকে কে জড় করে আগুন দিয়েছিল। গাঁয়ের লোককে সে কথা কিন্তু বিশ্বাস করান যায় না। তারা রাত্রে গা থেকে সেই অদ্ভুত আগুন আর ধোঁয়া দেখেছে। ব্যাপারটা যে ভৌতিক এ বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ আর নেই।

চৌধুরী মশাই এসব কথা শুনে অবশ্য নিজে থেকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর

বন্ধুক আছে। সেই বন্ধুক নিয়ে রাত্রে জাঙালবাড়িতে পাহারার থাকার প্রস্তাব তিনি করেন, কিন্তু শর্মিলাই তাতে আপত্তি জানায়।

কিছুদিনের মত তাঁর বাড়িতে বিনতাকে নিয়ে থাকার অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। এ অনুরোধ করবার জন্যে শর্মিলাদের সমবয়সী দুজন ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন চৌধুরীমশাই। কিন্তু শর্মিলা তাদের শুধু ধন্যবাদে ভাসিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত বিবরণ শুনে পরাশর ও আমি দুজনেই সত্যি একটু অবাক হই।

পরাশর আমার প্রশ্নটাই তোলে,—চৌধুরীমশাইকে পাহারা দিতে দিলে না কেন? তাঁর বাড়িতে গিয়ে কদিন থাকলেই বা ক্ষতি কি ছিল?

শর্মিলা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

বিনতার মুখে এ কথায় একটু হাসির আভাস দেখে পরাশর একটু বিরক্তির সুরে তাকেই জিজ্ঞাসা করে,—এতে হাসির কি আছে তাত বুঝতে পারছি না।

বিনতা ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়েই এবার কথাটা বলে ফেলতে বাধ্য হয় বোধ হয়।

সলজ্জ কৌতুকের সঙ্গে বলে,—হাসছি মানে চৌধুরীমশাইএর অবস্থাটা ভেবে। ভদ্রলোক কত চেষ্টাই করেন আমাদের সাহায্য করবার, কিন্তু শমী ওঁকে পাত্তাই দেয় না।

কেন? চৌধুরীমশাই কি লোক ভালো নয়?—আমিই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

আমার ত ভালো লোক বলেই মনে হয়।—বিনতা শর্মিলার দিকে কৌতুক কটাক্ষ করে বলে,—শমীর জন্যে উনি ত জান দিতে প্রস্তুত।

তুই থাম ত! —শর্মিলা ধমক দেয় বিনতাকে।

বিনতা থামলেও ব্যাপারটা অনুমান করে পরাশর এবার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে,—শমীর ওপর ওঁর দুর্বলতা আছে নাকি? উনি ত বয়স্ক লোক। ওঁর মেয়েরাই তোমাদের বয়সী শুনলাম।

মেয়ে কোথা থেকে থাকবে! এবার হেসে ফেলে বিনতা,—উনি বিয়েই করেন নি। ওঁর বয়সও এমন কিছু হয় নি। বাপ-মা মরা ভাইঝিদের মানুষ করেছেন বলে তাদেরই মেয়ে বলেন।

আচ্ছা খুব ওকালতি হয়েছে! —শর্মিলা এবার বিনতার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে ধমকায় দেয়,—অত যদি পছন্দ ত নিজেই স্বয়ম্বরা হ না। এখন আসল কথা বলব, না এই সব বাজে হাসি মস্করা চলবে?

না, না আসল কথাই বলি। —পরাশর শর্মিলাকে শান্ত করে।

আসল কথা তারপর আর বেশী কিছু নেই। —শর্মিলা বলে যায়—চৌধুরীমশাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে যেদিন ভাইঝিদের নিয়ে এসে অনুরোধ করে যান তার পরের দিনই বিকেলবেলা বক্সীবাবু আসেন স্টেশন থেকে আমাদের খোঁজ নিতে। তাঁর সঙ্গে এখানে আসবার পর থেকেই আলাপ হয়েছে। ঘোড়ায় চড়েই তিনি নিজে থেকে একদিন এসে আলাপ করে এ জায়গার প্রাচীন ইতিহাসের গল্প করে গিয়েছিলেন। আমরা সেকালের কোন কিছু নিদর্শন যদি পাই তা তাঁকে দেখাতেও অনুরোধ করে গিয়েছিলেন। নতুন করে সরকি বাঁধানোর মাটিটা চষবার সময় পুরোণ ভাঙা একটা তামার টুকরো পাওয়া যায়। তাতে কয়েকটা অক্ষর যেন খোদাই করা। সে টুকরোটা পেয়ে বক্সীবাবু যারপর নাই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ওই খোদাই করা তামার টুকরা কোনো সেকালের মন্দিরের জন্যে জমির দানপত্রের তাম্রশাসনের অংশ বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি আমাদের এ জায়গার

ওপর ভালো করে নজর রাখতে বলেন। হয়ত অত্যন্ত দামী কিছু এখানেই আমরা পেতে পারি সে আশ্বাসও দেন। তেমন কিছু অবশ্য পাই নি এপর্যন্ত। শুধু একদিন গোয়ালঘরটা বাড়াবার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আমাদের মুনিষ গোটা দুই পুরোণ মুদ্রা পেয়েছিল। সেগুলো বক্সীবাবুকে দেখবার জন্যে দিয়ে এসেছিলেন তারপরই। কিছুদিন বাদে উনি অবশ্য জানান যে সেগুলো সত্যিকার মুদ্রা নয়।

সেদিন আমাদের এখনকার বিপদের কথা চৌধুরীমশাইএর মুখে শুনেই তিনি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। ব্যাপারটার মানে তিনিও কিছু বুঝতে পারেন নি। সন্ধ্যা হ'তে সিসেমশাই-এর সঙ্গে এই বিষয়েই আলোচনা করতে করতে তিনি পাথুরে পোলের রাস্তার স্ট্রেশনে ফিরে যান। সিসেমশাই তাঁকে পাথুরে পোলের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মনে আছে। সিসেমশাই কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই নিরুদ্দেশ।

সন্ধ্যে পার হয়ে রাত হতেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। সিসেমশাই ভীতু আগে ছিলেন না। কিন্তু এইসব আজগুবি উপদ্রবের পর থেকে সন্ধ্যের পর তিনি আর বাড়ির বাইরে পর্যন্ত বার হন না। তাঁর এত রাত পর্যন্ত না ফেরার কোন কারণ না পেয়ে আমরা ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠেছি।

সেদিন নতুন বহাল করা সাহারাদারটাও বাড়ি থেকে দুপুরে একবার ঘুরে আসবার নাম করে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি।

তা সত্ত্বেও রাত যখন দশটা তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি—বলেছে শর্মিলা,—টর্চ নিয়ে আর বিনিকে সঙ্গে করে বাইরে খুঁজতে বেরিয়েছি। পাথুরে পোল পর্যন্ত ত দেখে এসেছি-ই সেছন দিকের পোড়ো পড়টারও এদিক ওদিক খুঁজেছি। তারপর গিয়েছি পশ্চিম দিকে গঙ্গার চর পর্যন্ত প্রায়। বিনির অবস্থা ত বুঝতেই পারছ। আমারও সমস্ত শরীর যেন ভয়ে অবশ। তবু মরিয়া হয়ে মনের জোরে কোন মতে নিজেকে খাড়া রেখেছি। চিৎকার করে ডেকে আর এত ঘুরে ঘুরেও সিসেমশাইএর কোন খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি আবার বাড়িতে। সেই খানেই বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেছে আতঙ্কে। বাবার সময় দরজায় নিজে হাতে তালা দিয়ে গেছলাম। সে তালা খোলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চের আলোয় সেই রক্তমাখা পায়ের দাগ দেখেই বিনি চিৎকার করে উঠেছে। আমারও তখন সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে টলে পড়বার অবস্থা।

পায়ের ছাপটা কি রকমের? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর,—বেশ বড় জোয়ান লোকের পায়ের ছাপ? ভেতরের দিকে যাবার না বাইরে বেরুবার মুখে পড়েছে মনে হয়?

শর্মিলা এক এক করে সব কটা প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে জানিয়েছে,—ছাপটা বড় জোয়ান পুরুষের নয়। ইঁদারার কাছে যেমন দেখা গেছল তেমনি যেন কোন ছোট মেয়ের পায়ের। দুটি মাত্র ন্যাংড়া অস্পষ্ট গোছের ছাপ ঘর থেকে বার হয়ে যাবার সময় যেন পড়েছে।

রক্তটা কিরকম লক্ষ্য করেছিলে? পরাশর আবার জিজ্ঞাসা করেছে,—জমাট বাঁধা কি? রক্ত কিছুক্ষণ পড়ে থাকলে যেমন হয়?

হ্যাঁ জমাট বাঁধাই! বলেছে শর্মিলা,—কিন্তু রক্ত কিনা তা আমারও সন্দেহ হয়েছে। আমার ত লালচে গাঢ় কোন রং বলেই মনে হয়েছিল। তাইতেই মনে যেন একটু সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সাহসের আর দাম কি? রক্তের বদলে রং-ই যদি হয় তাহলেও কেউ এই আওলবাড়িতে লুকিয়ে থেকে এসব করছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। কে সে হতে পারে সেইটেই ত গভীর রহস্য।

আচ্ছা সিলেমশাইকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে দরজার তালাটা ভাঙা না খোলা দেখেছিলে ?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, ভাঙা নয়, খোলাই দেখেছিলাম। এবার বিনতাই বলেছে,—তাই দেখে ত প্রথমে একটু আশা হয়েছিল যে সিলেমশাই হয়ত ফিরে এসেছেন। তারপর ঘরে ঢুকতেই মেঝের ওপর ওই পায়ের দাগ দেখে আমারও প্রায় হার্টফেল-এর অবস্থা। শমীকে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড বোধ হয় বোধ হয় সেই ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম।

এখন কিন্তু আপনাকে দেখে ততটা ভীত ত মনে হচ্ছে না ?—বিনতার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ নিয়েছি আমি।

এখন যে আপনারা এসে গেছেন ! —হেসে বুকটা আমার যেন অবশ করে দিয়ে বিনতা বলেছে, —তাছাড়া রাত্রি ছাড়িয়ে যাবার পর সব কিছুই বোধ হয় খানিকটা সয়ে যায়। সে রাত্রে বাইরের দরজাগুলোর শুধু খিল লাগাই নি তাতে চেয়ার টেবিল লাগিয়ে সহজে যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায় তার ব্যবস্থা করেছি। তারপর সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে নিয়ে জল দিয়ে ওই রক্ত না রঙ যাই হোক ধুয়ে ফেলে যখন শুয়েছি তখন সে নিশাচর। আতঙ্কটা অনেকখানি যেন কেটে গেছল। আজ দুপুর পর্যন্ত শমী না ফেরায় অবশ্য আবার দিশেহারাই হয়ে গেছলাম।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুমোতে কিন্তু পারিনি।—শমিলা আবার তার বিবরণ সুরু করেছে,—বিনি একদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো। ও ভয়ও যেমন বেশী পায় তেমনি ভুলে যেতেও ওর দেরী লাগে না। ও খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকেই জেগে থাকতে হয়েছে সারারাত। সেই রাত্রে আরো সব বিশ্রী উপদ্রব হয়েছে। জানালাগুলো সব বন্ধ করে শুয়েছিলাম। একবার এদিকে একবার নানা জানলায় কিসে যেন অনেকক্ষণ আঁচড়েছে। আমি তা অগ্রাহ্য করেই শুয়ে থেকেছি। তারপর আবার সেই গলাটিপে ধরা আর্তনাদ শোনা গেছে একেবারে যেন বাড়ির ঠিক বাইরে। সেই সঙ্গে শাবল বা ওইরকম কিছু নিয়ে মেঝেতে ঘা মারবার শব্দ।

বিনিকে না জানিয়ে তখন আমি উঠে পড়ে একবার যেখানে শব্দ হচ্ছিল সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শব্দটা তারপর সে দিকে থেমে গিয়ে আর একদিকে সুরু হয়েছে। এবার আমি তা গ্রাহ্য না করে মনটাকে শক্ত করে বিছানায় এসে রাতটা কাটিয়েছি। ভোর

হতে না হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছি বিনিকে নিয়ে। দেখি আমাদের দরোয়ান হিসেবে যাকে রেখেছিলাম সে লোকটা ফিরে এসেছে। বাড়িতে বাচ্চার অসুখের জন্যে রাত্রে আসতে পারেনি বলে সে কৈফিয়ৎ দিয়েছে। তাই দেখে নিয়ে তাকে ইচ্ছে করেই কিছু জানাই নি। কিন্তু অবাক হয়েছি বেলা একটু বাড়তে না বাড়তেই চৌধুরীমশাই তাঁর গাড়িতে বক্সীবাবুকে নিয়ে এসে পড়ায়।

তাঁরা এসে ব্যস্ত হয়ে পিসেমশাইয়ের খোঁজ করেছেন। খবরটা এবার তাঁদের জানাতে হয়েছে। হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে পিসেমশাইএর খোঁজে আসার কারণটা জিজ্ঞাসা করেছি সেই সঙ্গে। তাতে তাঁরা যা বলেছেন তা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়েছি। পিসেমশাই নাকি আগের দিন সন্ধ্যার সময় বক্সীবাবুকে গোপন একটা কথা জানিয়ে দেবার সময়ে তাঁকে বিশেষ করে পরের সকালে চৌধুরীমশাইএর বাড়িতে সকাল আটটার মধ্যে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। চৌধুরীমশাইও বক্সীবাবুকে অত্যন্ত দরকারী কি একটা গোপনীয় কথা তাঁর নাকি না জানালে নয়। সেই কথাটা জানিয়ে তারপর পুলিশে যাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করা নাকি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। পিসেমশাই তখনও গিয়ে না পৌঁছোনতে একটু চিন্তিত হয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন তারপর। কারণ পিসেমশাই বক্সীবাবুকে যে রকম ব্যাকুলভাবে গোপন কথাটা জানাবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর ওঁদের সঙ্গে সময়মত গিয়ে দেখা না করাটা বেশ অস্বাভাবিক।

পিসেমশাইকে সেই সন্ধ্যার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না শুনে, এ কয়দিনের সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানান উচিত বলে বক্সীবাবু ও চৌধুরীমশাই দুজনেই মত প্রকাশ করেছেন। চৌধুরী-মশাইএর জেদে তাঁর গাড়িতেই থানায় গিয়েছি তারপর। দারোগাবাবু সব শুনে দুজন পুলিশ নিয়ে একবার সারজমিনে তদন্ত করতেও এসেছেন। কিন্তু কিছুই অবশ্য করতে পারেন নি। আমাদের মত দুজন অল্প বয়সের মেয়ের এরকম নির্জন বাড়িতে থাকা উচিত নয় বলে উপদেশ দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের ভীত মনের কল্পনা এইরকম একটা ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন।

পিসেমশাইএর অন্তর্ধান হওয়াটা ত আর কল্পনা নয়। —শর্মিলা একটু থামবার পর বলেছে পরাশরকে,— সে বিষয়ে দারোগাবাবুর ধারণা কি ?

দারোগাবাবুর নাকি ধারণা পিসেমশাই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের কাছে যারা কাজ করে তাদের অনেকের কাছে এজাহার নিয়ে তার কাছে নাকি তাই শুনেছেন।

ঝগড়া কি কিছু হয়েছিল কখনো ?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ঝগড়া নয়, তবে একটু মতান্তর ইদানীং দু'একবার হয়েছে অবশ্য। স্বীকার করেছে শর্মিলা। —এইসব আজগুবি উপদ্রবে পিসেমশাই শেষ দিকটায় বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যি। তাঁর ভেতরকার কুসংস্কার একটু বোধহয় চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাঁর কেমন ধারণা হয়েছিল এতকালের পুরোণ পোড়ো ভিটের আবার চাষ আবাদ আর খোঁড়াখুঁড়ি করে এখানকার কোন বাস্তু দেবতার আমরা কোপে পড়েছি। আমাদের জন্যেই উনি তা পেয়েছেন। গ্রামসেবী সমবায়ের মত কাজ আমাদের বয়সী মেয়েদের দিয়ে এখানে হবার নয় তাই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাঝে মাঝে। তাতে দু'এক সময়ে একটু বেশি ধৈর্য হারিয়ে তাঁর অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে কড়া কথা কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু সে সব কথা তিনি গায়েও মাখেন নি।

আচ্ছা, যেদিন সন্ধ্যায় তিনি বরফঘর হ'ল,—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে সেদিনই বক্সীবাবুকে পাথুরে লোল পৌঁছে দেবার সময় পরের দিন চৌধুরীমশাইএর বাড়িতে যেতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছু কি তিনি বলেছেন? বক্সীবাবুর কাছে সে বিষয়ে কিছু শুনেছ?

হ্যাঁ শুনেছি। বলেছে শর্মিলা,—পিসেমশাই প্রথমে নাকি বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইকেই দোষ দিয়েছেন এ জায়গার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আমাদের ক্ষেপাবার জন্যে। গ্রামদেবী নয় আসলে এখানকার সেকালের কোন দামী জিনিষ খুঁড়ে পাবার লোভেই আমরা এখানে ডেরা করে আছি আর তাইতে কোন অপদেবতার কোপে পড়েছি বলে তাঁর ধারণার কথা পিসেমশাই বক্সীবাবুকে জানিয়েছেন। আমাদের মিথ্যে আশ্বাসে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যি কথা বলে এ অভিশপ্ত জায়গা ছাড়বার চেষ্টা করতেই অনুরোধ করেছেন তাঁকে।

কি বলেছেন তাতে বক্সীবাবু?

তিনি নাকি পিসেমশাই-এর অদ্ভুত ধারণার কথা শুনে হেসেছেন। তবে অপদেবতার কোপ বা যাই হোক এসব অদ্ভুত ব্যাপার যখন ঘটছে তখন আমাদের মত মেয়েদের এখানে না থাকাই ভালো এই মতই প্রকাশ করেছেন।

সেকালের যথের ধন টন পাবার লোভ সত্যি আপনাদের আছে নাকি! এবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

সেসে আপত্তি করব না কিন্তু লোভ কিছু সত্যিই নেই। হেসে বলেছে শর্মিলা।

এ পর্যন্ত কিছু তেমন পেয়েছ কি? জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ওই ত' বললাম, একটা খোদাই করা তাম্রশাসনের টুকরো, আর কটা মুদ্রা গোছের। সেগুলো সেকালের সোনার জিনার কি রূপোর ভগ্ন ভেবেছিলাম। কিন্তু বক্সীবাবু ত' বলেছেন তা নয়। তবে এখানে কুষাণ আর গুপ্ত যুগের মুদ্রা ত' বটেই এমন কি আরো সোনা রূপা পাওয়া আশ্চর্য নয়, বক্সীবাবুই একবার স্বীকার করেছেন। তাম্রশাসনের ভাঙা টুকরোতে তারই নাকি ইঙ্গিত আছে।

শর্মিলার কথা শেষ হবার পর খানিকক্ষণ কেউ আর কিছু আমরা বলিনি।

পরাশর গভীরভাবে কি যেন একটা ভাবতে ভাবতে একবার প্রায় নিজের মনেই বলেছে,—লোভ! লোভ! সমস্ত রহস্যের মূল হল লোভ।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে,—চৌধুরীমশাই তোমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার অনুরোধ করতে আসেন কবে?

সেই দিনই। বলেছে শর্মিলা,—খানা থেকে আমাদের প্রথমে এখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যান বিকেলবেলাই আবার তাঁর দুই ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন আমাদের তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে বলতে।

তোমরা রাজী না হওয়াতে একটু দুঃখিত হয়েছেন, না? পরাশর কেমন অদ্ভুত ভাবেই যেন তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে।

একটু নয় খুব। হেসে উত্তরটা বিনতাই দিয়েছে, আমি কাছে না থাকলে বোধহয় কেঁদে কেটিয়ে সাধাসাধি করতেন।

যাব্বি ভুই! শর্মিলা বিনতার পিঠে আবার একটা চাপড় দিয়েছে।

আমি থাকলে সত্যি কথাটা ত' আর মিথ্যে হবে না! বলে বিনতা হাসতে হাসতে শর্মিলার কাছ থেকে উঠে আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসেছে।

সত্যি আপনাদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি।—শর্মিলাকে উদ্দেশ করেও বলেছি বিনতার দিকে চেয়ে।

আমার সাহস টাহস নেই। হেসে বলেছে বিনতা,—আমি যা কিছু করেছি ওর ভরসায়। তবে সে রাত্রে কিন্তু ভয়টা পাবার মত কিছু বোধহয় হয়নি।

না,—শর্মিলা বাধা দিয়েছে বিনতার কথায়,—সে রাত থেকে কেন জানি না সব উপদ্রব যেন থেমে গেছে।

তা'হলে সেটা চৌধুরীমশাই-এর জন্যে। হেসে বলেছে পরাশর।

চৌধুরীমশাই-এর জন্যে! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা,—তিনিই সব থামিয়েছেন নাকি?

তিনি ত' তাই বলেন। পরাশর জানিয়েছে,—তিনি নাকি তোমাদের একঘেঁয়েমিতে নিরুপায় হয়ে দিনে রাতে একজন করে পাহারাদারের ব্যবস্থা করেছেন।

মিথ্যে কথা!—শর্মিলা হঠাৎ তীব্র প্রতিবাদ করেছে,—পাহারাদার নয় বোধহয় চর লাগিয়ে রেখেছেন আমাদের ওপর নজর রাখবার আর নিজের কোন মতলব হাসিলের জন্যে। আমি আজই তার প্রমাণ পেয়েছি।

কি প্রমাণ?—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে উত্তেজিত ভাবে।

প্রমাণ প্রথমতঃ ওদিকের পোড়ো মহলের এক জায়গায় লুকোন একটা টর্চ একটা মাপবার ফিতে আর একটা ছোট প্রয়োজনের চোঙার মত জিনিষ। পাহারা দিতে এসব জিনিষের নিশ্চয় দরকার হয় না! তা ছাড়া ওঁর পাহারাদার গ্রাম থেকে আসা যাওয়া না করে ডিঙিতে গঙ্গা পার হয়ে যাতায়াত করে কেন? পাহারাদারের বদলে চর ওঁর একজন নয় অন্ততঃ দু'তিন জন আজ ক' রাত ধরে এখানে আসছে।

এসব তুই কি বলছিস!—ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে বলেছে বিনতা।

যা দেখেছি তাই বলছি। ঔত্তেজিতভাবে বলেছে শর্মিলা,—আজ তোর বেলা উঠে, পিসেমশাই-এর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্যের অন্য কোন দিকে হদিস পাওয়া যায় কি না দেখতে আমি পশ্চিমের গঙ্গার দিকটায় একলা গেছলাম। এখন গরমের দিনে এ দিকটায় চড়া পড়ে গঙ্গা অনেক দূর সরে গেছে। সে চড়ার মাটি কিছুদূর পর্যন্ত শক্ত, তারপর নরম কাদা। সেই নরম কাদার চরের কাছাকাছি গিয়ে তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এদিকটার নদীর পাড় এমন নির্জন যে ভুলেও কেউ কখনো আসে না। এখানে এতগুলো পায়ের দাগ তাহলে কোথা থেকে পড়ল? পায়ের দাগগুলো যে সদ্য সদ্য আগের রাত্রেই পড়েছে তার প্রমাণও পাই। শক্ত পাড়ে জুতো খুলে রেখে আমি সেই পায়ের দাগ ধরে একেবারে গঙ্গার জলের ধারা যেখানে রয়েছে সেখান পর্যন্ত চলে যাই তারপর। সেখানে নরম বেলে কাদায় একটা ডিঙি যে তুলে রেখে আবার ঠেলে জলে ভাসান হয়েছে তার স্পষ্ট চিহ্ন পড়ে রয়েছে।

গঙ্গার ধার থেকে ফিরে এসে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি পায়ের দাগ ক্রমশঃ শক্ত জমিতে অস্পষ্ট হয়ে এলেও তাতা গড় বাড়িটার দিকেই গেছে। গড় বাড়িটায় ঢোকবার পর

পায়ের দাগ না পেলেও এখানে সেখানে গঙ্গার কাদায় ছিটে লেগে থাকতে দেখে কোন দিকে লোকগুলো গেছে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

সেই কাদার ছিটে ধরে এদিকে ওদিকে একটু খোঁজ করতেই লুকোন ওই জিনিষগুলো একটা ভাঙা ঝুনুসির মধ্যে দেখতে পাই। চৌধুরীমশাই-এর পাহারা দেবার ব্যবস্থা করার মানে বুঝতে পারছ এবার।

কিন্তু এসব চৌধুরীমশাইএর-ই ভাজ ভাবছ কেন?—পরাশর একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে।

ভাবছি তিনি পাহারার বড়াই হঠাৎ বোধহয় মুখ ফস্কে তোমার কাছে করে ফেলেছেন শুনে। শর্মিলা ভাঁড়ারো গলায় বলেছে, প্রথমে একটু অস্পষ্ট সন্দেহই আমার ছিল কিন্তু ওঁর লোক পাহারায় আছে শোনবার পর নিশ্চিত বুঝতে পারছি এ সবের পেছনে উনি আছেন।

জিনিষ-পত্রগুলো যেমন ছিল তেমনিই রেখে দিয়েছ না নাড়াচাড়া করেছ?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

আমি কি অত আহাম্মুক!—শর্মিলা একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছে,—ঠিক যেমন ছিল তেমনিই আছে।

তা'হলে—পরাশর খুশি মুখে বলেছে, আজ রাত্রেই এ রহস্যের মীমাংসা হয়ত হ'তে পারে।

মীমাংসা হয়েছে সত্যিই। কিন্তু তার আগে সকলের ভোগান্তি যা হয়েছে তা বড় কম নয়।

সে দুর্ভোগ আমার কাছেই শুধু সৌভাগ্যের চেয়েও বেশী কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্যভেদের যে প্ল্যান হয়েছে তাতে ঠিক হয়েছে দুটি দলে ভাগ হয়ে গভীর রাত্রে আমরা গোপনে দু'দিক থেকে গঙ্গার তীরের দিক ও পোড়ো গড় মহলের ওপর নজর রাখব। আমার সঙ্গে আছে বিনতা ও পরাশরের সঙ্গে শর্মিলা।

আমাদের ওপর ভার পড়েছে নিঃশব্দে ওই পোড়ো বাড়ির কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে পাহারা দেওয়া।

পরাশর আর শর্মিলা গিয়েছে গঙ্গার দিকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। একাদশী কি দ্বাদশী হবে কারণ প্রায় সমস্ত রাতই অন্ধকার থাকবে বলে দিয়েছে শর্মিলা সিসেমশাই-এর পাঁজি দেখে।

রাত দশটা বাজবার পর নিঃশব্দে শুধু একটি করে টর্চ আর ছোট একটা করে লাঠি নিয়ে আমরা দু'দল আস্তানাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আলাদা আলাদা পথ ধরেছি। বিনতার হাতে টর্চটা দিয়ে লাঠিটা অবশ্য রেখেছি নিজের কাছে।

বিনতা ও শর্মিলাকে সঙ্গে রাখবার ইচ্ছে অবশ্য পরাশরের প্রথমে ছিল না। ওরা দু'জনে বাড়িতেই দরজা বন্ধ করে থাকবে আর আমরা দু'জনে দুদিকে পাহারা দেব এই প্রস্তাবই সে করেছিল।

কিন্তু শর্মিলা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়েছে।

বলেছে,—এতদিন আমরাই সব বকল সইলাম আর এক রাত্রে পৌরুষ দেখিয়ে তোমরা আসল বাহাদুরীটুকু নেবে, সে হবে না। আমি অন্ততঃ তোমাদের সঙ্গে থাকবই!

আর আমি একলা এই বাড়িতে থাকব না কি!—বিনতা শঙ্কিত গলায় বলেছে,—সে আমি পারব না।

দল তাড়াতাড়ি তারপর হয়ে গেছে। বিনতা যে আমার দলে পড়েছে তাও শর্মিলারই ব্যবস্থায়।

সঙ্গায় দিকে পাহারায় থাকাটা শুধু বেশী জরুরী নয় বিপদের সম্ভাবনাও সেখানে থাকতে পারে।

পরাশর সেই ভারটা নিতে চাওয়ায় শশিলা আপত্তি করেনি। শুধু বলেছে, তাহলে তোমার সঙ্গেই আমায় থাকতে হবে।

কেন? আমায় ভরসা দিতে?—পরিহাস করেছে পরাশর।

তাই বা নয় কেন?—জবাব দিয়েছে শশিলা,—তাছাড়া তুমি যত বীরপুরুষই হও, এখানকার অলিগলি ত কিছু জানো না। কোথা দিয়ে ওরা আসে, কোন দিকে যায় আমি সঙ্গে না থাকলে বুঝবে কি করে? আমরা নদীর দিকে থাকব আর এরা পাথুরে পোলের কাছ থেকে গড়মহল আর পাথুরে পোল দু'দিকেই নজর রাখবে।

সেই ব্যবস্থা মতই বিনতার সঙ্গে পাথুরে পোলের খানিক দূরে কটা খেজুর গাছের জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সত্যি গা ছমছম করা রাত। চাঁদ না থাকলেও আকাশে তারার যেন ফুল ফুটেছে আর তার মৃদু আলোয় চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর আবছা ভাবে সব কিছু দেখাও যাচ্ছে।

সেই আবছা ভাবটাই যেন আতঙ্ক মাখানো রহস্যটা আরো গাঢ় করে তুলেছে।

গড়মহলের ধ্বংসস্তূপটা দিনের বেলাতেই কেমন একটু ভুতুড়ে গোছের লেগেছিল। ঈষৎ তরল অন্ধকারে সেটা যেন একটা বিভীষিকার সঙ্কেত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি চুপ করেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

বহুদূরে গ্রামের কোন একটা মন্দিরের কি পুজোর আমি না ঘণ্টা কাঁসরের ধ্বনি মাঝখানের ভেপান্তর পার হয়ে ক্ষীণভাবে কানে বাজছিল।

সেটা থেমে যেতে নিস্তব্ধতাটা যেন বিরাট চাকনার মত আমাদের ওপর নেমে এল।

ও কি!—বলে হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে শিউরে উঠে আমার কাছে ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

শিউরে আমিও উঠেছিলাম। তারপর অবশ্য লজ্জিত হয়ে হেসে ফেললাম।

আচমকা একটা হাওয়ার ঝলকে খেজুর গাছের পাতাগুলো দোলা খেয়ে মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটায় কিন্তু গা সিরসির করে উঠেছিল।

নিজের ভয় পাওয়াটা গোপন করে বিনতাকে একটু কৌতুকের সুরে বললাম,—ওটা কিছু নয়। খেজুরের পাতাগুলো হাওয়ায় নড়ছে। কিন্তু এখন ঘরে বিল দিয়ে ঘুমোলেই ভালো হ'ত মনে হচ্ছে নিশ্চয়!

মোটেই না।—দেখতে না পেলেও বিনতার ঠোঁট ওল্টানোটা যেন আমি অনুভব করেছি,—ঘরে থাকলে ভয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

যাক্ বাইরে অজ্ঞান হবার তাহলে ভয় নেই।—হাল্কা আলাপটা চালিয়ে যেতে চাইলাম।

বলে ত! আপনি আছেন!—বলে বিনতা একটু হাসল। উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হ'ল না।

চুপ—বিনতা চাপা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল,—দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখতে আমিও পেয়েছি। পোড়ো গড়মহলের পেছন দিকে এক নিমেষের জন্যে একটা আলোর চমক। কেউ টর্চটা জ্বেলেই যেন নিভিয়ে দিয়েছে।

পরাশর আর শর্মিলাই টর্চটা জেলেছে ভাবতে পারতাম। কিন্তু তা'ত সম্ভব নয়। তারা স্পষ্ট করে বলে গেছে যে গড়মহলের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গঙ্গার চড়ার দিকেই তারা থাকবে। যদি কোন কারণে এদিকে তারা আসতে বাধ্যও হয়ে থাকে তাহলেও টর্চ জেলে সংকেত দেবার ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হয় নি। সেরকম কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হ'লে আমরা সজোরে শিস দিয়ে পরস্পরকে ডাকব এই কথাই আছে।

হঠাৎ এ টর্চ তাহলে কার হাতে জ্বলে উঠতে পারে?

চাপা উত্তেজিত গলায় বিনতাকে জিজ্ঞেস করলাম,—এই পাথুরে পোল দিয়ে ছাড়া আশাল-বাড়িতে ত' অন্য রাস্তাতেও আসা যায়!

আসা ত যে কোন দিক দিয়ে যায়। তবে গাড়ির রাস্তা এই একটাই। বললে বিনতা,—পূব দিকে ত গঙ্গার চড়া আসেই জেনেছেন, উত্তর দক্ষিণেও এককালে বোধহয় বড় রিশ ছিল এখন অব-শ্যকনো জলা হয়ে আছে। পায়ে হেঁটে সে দিক দিয়ে কেউ আসে না।

যায় না এলে নয় তেমন কেউই এসেছে মনে হচ্ছে। আসুন ব্যাপারটা দেখতে হবে।

সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে আবার বললাম,—সাবধানে আসবেন কিন্তু। অন্ধকারে ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়।

বাঁ কাঁধের স্পর্শটুকুর রোমাঞ্চ বুঝিয়ে দিলে বিনতা আমার অত্যন্ত কাছে ঘেঁসে এসেছে।

কিছুদূর পর্যন্ত সমতল মাঠের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নেই যেতে পারলাম। গড় মহলের কাছাকাছি যেতেই অসুবিধে সুরু হল।

এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু জমি। এখানে সেখানে পোড়োবাড়ির নানা ভাঙা চাঙড়া পড়ে আছে। জংলা কাঁটা গাছের ঝোপও হয়েছে অনেক জায়গায়।

টর্চ জ্বালবার উপায় নেই। অতি সাবধানে এ সব বাধা এড়িয়ে যখন গড় মহলের উত্তর দিকটায় পৌঁছোলাম তখন এতখানি কষ্ট করা বৃথাই হয়েছে মনে হ'ল।

দৈত্যাকার গড় মহলের ধ্বংসস্তূপের দরুণই জায়গাটায় তারার আলোর ক্ষীণ দ্যুতিও নেই। সব যেন জমাট অন্ধকার।

এখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া নেহাৎ দৈব সহায় না হ'লে অসম্ভব।

সেই দৈবের সাহায্যই পাব ভাবতে পারি নি।

এদিক ওদিক একটু খুঁজে আবার পাথুরে পোলের দিকেই ফিরে যাব ভাবছি, এমন সময় বিনতা আমার হাতটা চেপে ধরল।

তারপর কানের কাছে মুখ তুলে ফিস ফিস করে উত্তেজিত ভাবে বললে,—বাঁ দিকটায় চেয়ে দেখুন।

দেখলাম এবং দেখে অবাক হলাম। গড় মহলের একটা ধসে পড়া ছাদের ফাঁক দিয়ে তারাভরা আকাশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

সেই তারা ছিটোনো কালীবরণ আকাশের পশ্চাৎপটে একটি না দুটি যেন ছায়া দিয়ে গড়া মূর্তি দাঁড়িয়ে।

একজন বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান মনে হয় আকার দেখে। তার পাশে একটা ছোট ছেলেই মনে হল।

মূর্তি দুটো কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তুপের ভেতর দিকেই এগিয়ে গেল।

যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে তাদের অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন, বাইরের তারাভরা আকাশের ফালিটুকু পেছনে থাকায় তাদের সামান্য রেটুকু দেখা গিয়েছিল বড় মহলের ভেতর দিকে এগিয়ে যাবার পর সে অন্ধকারে তাও আর পাওয়া গেল না।

কিছুটা আন্দাজে কিছুটা থেমে থেমে পায়ের শব্দ ধরে খানিক দূর পর্যন্ত তবু কাছাকাছিই থাকতে পারলাম।

মূর্তি দুটো সম্বন্ধে অনেক ভাবনাই তখন মনের মধ্যে খেলে যাচ্ছে। ছোট ছেলের মত যাকে দেখেছি ইঁদারার ধারে ও ঘরের মেঝের এরই কি পায়ের রক্তাক্ত ছাপ পড়েছিল?

অনুসরণের অসুবিধের দরুণ এরা নাগালের বাইরে চলে যাবার আগে শিস্ দিয়ে পরাশর ও শশিলাকে ডাকে দেব কিনা যখন ভাবছি তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা আলগা ইটের চাপড়ার ওপর পা দিয়ে হেসে অস্ফুট চিৎকার করে কাৎ হয়ে পড়ে যাবার আগেই বিনতাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম বটে কিন্তু তখন সামনের অন্ধকারেই যেন বজ্রবরে হাঁক দিয়ে উঠল।

কে ওখানে? খবরদার! নড়লেই গুলি করব!

সেই সঙ্গে টর্চের জোরালো আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল আর তৎক্ষণাৎ অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনিও শুনলাম,—এ কি আপনারা!

টর্চ নিয়ে মূর্তি দুটি এগিয়ে আসবার পর তাদের দেখে আমরাও বিমূঢ়!

একজন চৌধুরীমশাই আর অন্যজন বক্সীবাবু!

দুজনেরই পরণে গাঢ় রঙের সার্ট প্যান্ট। বক্সীবাবুর হাতে টর্চ আর চৌধুরীমশাইএর হাতে একটা পিস্তল। নেহাৎ বেঁটে খাটো বামন গোছের চেহারা বলেই বক্সীবাবুকে ছোট ছেলে বলে ভুল হয়েছিল।

চৌধুরীমশাই কাছে এসে হেসে যা জিজ্ঞাসা করলেন মনে মনে আমি তাঁদের সম্বন্ধে তখন তারই জবাব খুঁজছি।

আপনারা এখানে কি করছেন?—হাসি মুখে হলেও একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরীমশাই।

এই আপনাদের ওপর নজর রাখছিলাম!—মুখ দিয়ে কথাটা যেন ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

বেশ! বেশ!—চৌধুরীমশাই কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবে নেবারই যেন জোর করে বললেন,—পরস্পরের দিকে নজর রেখে আরো উপায়ের কিছু সন্ধান পাওয়া যায় কি না দেখি আসুন।

নিরুপায় হয়ে তাঁর কথাই এবার মানতে হ'ল।

আমি বিনতাকে নিয়ে তাঁদের পেছনে থাকবার চেষ্টা করলাম একবার। কিন্তু চৌধুরীমশাই একটু শক্ত গলাতেই বললেন,—না, না, পেছনে নয় আমাদের সামনে চলুন।

আদেশটার যেন কৈফিয়ৎ হিসেবেই বললেন সেই সঙ্গে,—এখানে সামনে পিছনে দুদিকেই বিপদের সম্ভাবনা। তবু পিস্তলটা যখন আমার হাতে তখন আমি পেছনে থাকলেই আপনাদের অন্ততঃ পাহারা হবে।

এই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়ে বিনতাকে নিয়ে তাঁদের আগে আগে যেতে হল।

আমাদের হাতের মুঠোর পাবার পর ঠিক আলো সম্বন্ধে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর সাবধানতাটা একটু শিথিল হয়েছে দেখলাম।

গড় নগরের ধ্বংসস্তূপে পথ বলে কিছু নেই। এখানে ওখানে ভেঙে পড়া ছাদ ওখানে দেওয়াল কি থামের আশপাশ দিয়ে বড় বড় ইট পাথরের চিবি ডিঙিয়ে কোন রকমে কখনো মাথা নুইয়ে, কখনো কাৎ হয়ে যেতে হচ্ছে।

মনে মনে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর এ রহস্য নাটকের ভূমিকা তখন আমি সঠিকভাবেই বুঝে ফেলেছি।

পরাশর ঠিকই অনুমান করেছিল। ভূতুড়ে ব্যাপার এতদিন যা ঘটেছে সেটাই সে রহস্যের মূলে আছে। এই ধ্বংস পুরীতে অন্যান্য মূল্যবান কিছু পাবার আশাতেই দুজনে শর্মিলা ও বিনতাকে এখান থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়েছেন। বাধা ছিলাবে পিসেমশাইকে সরাবার ব্যবস্থা হয়েছে আগেই। তাঁকে একেবারে সেরেই করে দেওয়া হয়েছে হয়ত। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোথাও অসহায় ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

এঁদের সব শয়তানী আজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাবার পর আমাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা এঁরা করবেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। এই ধ্বংস পুরীর কোথাও আমাদের শুম খুন করে পুতে রাখলে সুদ সুদান্তরেও ত কেউ তা জানতে পারবে না।

এখনি পেছন থেকে পিস্তল ধরে আমাদের সেই রকম কোন গুপ্ত কুটুরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না কে জানে।

অসম্ভব জেনেও এঁদের কবল থেকে মুক্তি পাবার শেষ চেষ্টা তাই করতেই হবে।

একটু সময় নেবার ও এঁদের বর্তমান মতলবটা বোঝবার চেষ্টায় যেতে যেতে গলাটা সহজ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা আপনারা এলেন কোন দিক দিয়ে। পাথুরে গোল দিয়ে অবশ্যই আসেন নি।

ও, সেই দিকেই আপনারা পাহারায় ছিলেন বুঝি! বক্সীবাবু কেমন বিশ্রী ভাবে হাসলেন মনে হল,—আপনাদের কথা ভাবি নি, তবে ওদিকে কারুর নজর থাকবে অনুমান করে মাঠ জলা ভেঙে আমাদের বেশ কষ্ট করেই আসতে হয়েছে।

কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? কি খুঁজছেন আপনারা? আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

সাপের গর্ত!—বলে হাসতে গিয়ে হাসিটা যেন চৌধুরীমশাই-এর গলায় আটকে গেল।

একটা ভাঙা দেয়াল হাঁ করা কোকরের ভেতর দিয়ে পা বাড়িয়ে বক্সীবাবুর হাতের টর্চের আলোয় যা তখন দেখেছি তাতে আমরাও নিশ্চল নির্বাক।

ঘরের যাবিশ ছড়ানো ভাঙা মেঝের ওপর একটি দীর্ঘ দোহের মানুষ পড়ে আছে।

পিসেমশাই!—বলে বিনতার ব্যাকুল চিৎকারে তাঁর পরিচয় বুঝতে দেরী হয় নি।

সুযোগ বুঝে সেই মুহূর্তে আমি অসাধ্য সাধন করে ফেলেছি। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আমাদের পেছনে তখন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছেন।

আচমকা পেছনে ফিরে সজোরে ছোঁ মেরে চৌধুরীমশাই-এর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে এক লাফে

অন্য দিকে সরে যেতে যেতে আমি মুখের ভেতর বাঁ হাতের কটা আঙুল ঢুকিয়ে প্রাণপণে শিষ দিলাম।

তারপর চিৎকার করে বললাম,—আমার দিকে সরে এসো বিনতা। টর্চটা ধরে থাকো ওদের ওপর।

ওদের দুজনকেও সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে হুঙ্কার দিলাম,—সাবধান! যেমন আছেন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন নড়বার চেষ্টা করলেই বিপদ জানবেন।

বিনতা তখন আমার নির্দেশ মত—আমার কাছে সরে এসে ওদের ওপর টর্চ জেলে ধরেছে।

তার আলোয় চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর হতভম্ব হওয়ার ভানটা বেশ নিখুঁত মনে হ'ল।

আমার দিকে যেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে তিনি বললেন,—আপনি করছেন কি মশাই! পাগল হয়ে গেছেন নাকি! পিস্তলটা নামান, আপনার হাত যা কাঁপছে তাতে হঠাৎ গুলি ছুটে যেতে পারে।

পারেই ত!—তীব্র স্বরে বললাম,—আর সেই বুঝেই নড়বার চেষ্টা করবেন না। পরাশর আর শর্মিলা দেবী এখুনি আসছেন। ওঁরা এলেই আপনাদের যা ব্যবস্থা করবার করছি।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পরাশর আর শর্মিলা সেই কোকরের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ব্যস্ত ভাবে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে আর যারা ঢুকল তাদের দেখেই আমি অবাক।

পোষাক দেখেই বুঝলাম থানার দারোগাবাবু ও দুজন পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে আবার পিছমোড়া করে বাঁধা একটা মুখে কালীঝুলি মাখা দুষমন গোছের লোক।

বিনতা তাকে দেখে বলে উঠল,—আরে এ ত আমাদের সেই পুরোন দরোয়ান। কাজ ছেড়ে যে পালিয়ে ছিল।

আমার কিন্তু তখন সে সব দিকে মন দেবার সময় নেই।

উত্তেজিত ভাবে বললাম,—শোনো পরাশর, শুনুন দারোগাবাবু, সমস্ত চক্রান্তের মূল দুজন ওই সামনে দাঁড়িয়ে। চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবু! হাতে নাতে আজ ওঁদের ধরেছি!

পরাশর ও দারোগাবাবু দুজনেই এবার হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর দারোগাবাবু কেন বুঝলাম না হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন,—তাই নাকি! কিন্তু আপনার হাতের পিস্তলটা এবার নামান। আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর ভাবনা নেই।

বাধ্য হয়েই পিস্তলটা তখন নামাতে হ'ল।

পরাশর তখন যা করছে তা দেখেই আমার প্রায় চক্ষুস্থির।

চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে গিয়ে ওঁদের ডান হাত দুটো ধরে নাড়া দিয়ে সে বলছে,—সকলের তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা দারোগাবাবুকে নিয়ে এ ভাবে সাহায্য করতে না এলে এ রহস্যের মীমাংসা আজো হ'ত না।

শর্মিলার কাণ্ড দেখে আরো আমি হতভম্ব।

কোথায় সেই তেজ আর বেপরোয়া সাহসের কঠিন ভঙ্গী। সে যেন হঠাৎ সলজ্জ সঙ্কুচিত গ্রামের মেয়ে হয়ে গেছে।

চৌধুরীমশাইএর কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে লজ্জাজড়িত স্বরে তাকে বলতে শুনলাম,—সম্পূর্ণ ভুল করে অন্যায় ভাবে আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম। আমায় মাপ করবেন।

মাপ অত সহজে হবেনা। খেসারৎ না পেলে মাপ নেই।

হঠাৎ শর্মিলার হাত দুটো ধরে ফেলে চৌধুরীমশাই এর ওই মোটা রসিকতা মার্কা জবাব আর তাইতেই শর্মিলার সলজ্জ খুশির হাসি দেখে মাথাটাই তখন আমার ঘুরতে সুরু করছে।

দারোগাবাবুই এসব নাটকে যবনিকা ফেলে বললেন,—আচ্ছা আপনারা তাহলে এগোন আমি এই দশরথ বাহাদুরকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমাকেও কি থানায় নিয়ে যাবেন?

সিংহমশাই ইতিমধ্যে যে মেঝের ওপর উঠে বসেছেন তা কেউ বোধহয় লক্ষ্য করে নি। ওঁর কাতর আক্ষেপ শুনে সেদিকে দৃষ্টি গেল।

দারোগাবাবু হেসে বললেন,—না, আপনাকে আর থানায় নেব না। বুড়ো বয়সে ভোজের যে শাস্তি আপনি পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। আপনাকে ট্যাক্সিতে করে বাড়িতে পাঠাবারই ব্যবস্থা করছি। এ বয়সের তাড়া খা আর বোধহয় ঘোড়া লাগবে না। শেষ কটা দিন তাই আপনার কাশীবাস করাই বোধহয় ভালো।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনো আমার কাছে ধাঁধার মত। বিমূঢ়ভাবেই বিনতাকে নিয়ে পরাশর ও শর্মিলার পিছু পিছু কোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সমস্ত রহস্যটা তারপর পরাশরের কাছে শুনে বুঝেছি। সিংহমশাই সিংহ রায়মশাই বুড়ো বয়সে শুশ্রূষনের লোভে পড়েছিলেন বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইএর আলাপ শুনে। শর্মিলা আর বিনতাকে নিজেই ডেকে এনে জায়গা দিলেও তখন তিনি তাদের সরিয়ে দিয়ে শুশ্রূষন একলা খোঁজবার জন্যে ব্যাকুল। বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাদের রাজী না করতে পেরে পুরোণ পাহারাদার দশরথের সাহায্যে তিনি শর্মিলাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার ফন্দি আঁটেন। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার ভান করেন সেই জন্যেই। দশরথের গা গঙ্গার ওপারে। তারই ডিঙিতে তিনি প্রথম ওপারে তারই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তারপর রোজ রাত্রে তার ডিঙিতে আসতেন এপারে শর্মিলাদের ভয় দেখাতে। দশরথ অনেক টাকা-কড়ির আশায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এ পর্যন্ত তার কিছু না পেয়ে সে সিংহ রায়মশাইএর ওপর খাপ্পা হয় ও ঝগড়ার মধ্যে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডিঙি করে ওপারে পালাবার চেষ্টা করে। দারোগাবাবু ও পরাশরের সতর্কতায় ধরা পড়ে সে সেইখানেই। পড়ে গিয়ে সিংহ রায়মশাইএর তখন পা ভেঙে গেছে। আমরা সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখতে পাই।

আড়ালবাড়ির রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু হয়েছে।

শর্মিলা ওখানেই আছে স্বেচ্ছায় সানন্দে চৌধুরীমশাইএর ঘর আলো করে। বিনতাকে বিয়ে করে আমি বিয়েতে চাকরী নিয়ে চলে গেছি। মুখে কিছু না বলুক পরাশর মনে মনে বোধহয় একটু আহত হয়েছে। বিনতার প্রতি দুর্বলতার কথা নিজেই সে এক সময়ে আমার কাছে স্বীকার করেছিল।

বিষয়টা পড়ে ফেলে কাগজের এতদিনের নিয়মটা না ভেঙে পারলাম না। পূজা সংখ্যায় এ ধরণের বড় লেখা দেওয়া আমার কাগজের দস্তুর নয়। এ লেখাটা কিন্তু ছাড়তে না পেরে তখনি পাঠিয়ে দিলাম কম্পোজ করতে।

কম্পোজ হওয়া মেক-আপ প্রুফটা নিজেই দিয়ে এলাম পরাশরকে দেখবার জন্যে।

পরের দিনই বাড়িতে এসে পরাশর আমাকে এই ঘরে ত সেই ঘরে।

কি সব আবোল তাবোল ছেপেছ আমার নামে? সবখানে পরার সে জানতে চাইলে।

কেন তোমার প্রথম গোয়েন্দাগিরির গল্পই ত ছাপছি—অবাক হয়ে বললাম।

আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি!—পরাশর বলে উঠল,—সব মিথ্যে বানানো গল্প। আমার জ্যাঠা, কাকা, পিসি, মাসী কেউ নেই। আমার বাবা ছিলেন বংশের একমাত্র সন্তান! আমিও তাঁর সবেধন নীলমণি ছেলে। আমার মাও ছিলেন বাপ-মার একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া চাকায় আমি কখনো পড়িনি, পড়েছি লৌহাটী আর লক্ষ্ণৌতে। রাঙামাটিতে কোন জন্মে আমি কখনো যাইনি। খবর নিয়ে জানলাম সে জায়গার একটু আধটু সঠিক খবরের সঙ্গে আগাগোড়া কল্পনার ভেজাল দিয়ে ওই আজগুবি ব্যাপার সাজানো হয়েছে।

তাহলে এখন উপায়!—আমি একেবারে অকূল পাথারে পড়ে বললাম,—তোমার নামের লেখা বেরুবে বলে আমি বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছি। তুমি তাহলে একটা কবিতাই দাও। ছেপে দুখ রক্ষা করি।

বেছে নাও।—পরাশর টেবিলের ওপর মোটা বাঁধানো খাতাটা রাখলে।

আগে থেকেই সব আঁচ করে সে কি তৈরী হয়ে এসেছিল?

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন ৫৫-২৫৪৯

পরিচয়ক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও নিউ হ্যাম্পডন পাবলিসিটি লিঃ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীপতি চৌধুরী তাঁর ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন। অন্যদিন তিনিও সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠে পড়েন। কিন্তু আজ আর তাঁর উঠবার মন নেই। কাজকর্মের চাপও যে বিশেষ কিছু আছে তা নয়। ঘরে ঘরে শুধু সিগারেট খাচ্ছেন আর চায়ের অর্ডার দিচ্ছেন। বাইরে টুলের ওপর যে বেয়ারাটি বসে আছে সে যাবার জন্যে উসখুস্ করবে তা শ্রীপতি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু সুবল যতই ছটফট করুক তিনি তাকে উঠতে দেবেন না।

কিছু কিছু লোককে কষ্ট দেবার ক্ষমতা শ্রীপতির আছে। মাঝে মাঝে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে আরো দু'একটি কেরানীকে আরো কিছু কাজ চাপিয়ে দিয়ে অফিসে আটকে রাখতে পারতেন শ্রীপতি। তারা মনে মনে তাঁকে গালাগাল দিত, আড়ালে বাপান্ত করত কিন্তু সামনে কেউ কিছু বলতে পারত না। যৌবন গেছে। কিন্তু পঞ্চাশ পেরোবার পর অফিসে এই প্রতিপত্তিটুকু রয়েছে শ্রীপতির। কিছু সংখ্যক কেরাণী তাঁর সামনে মাথা তুলতে পারে না।

আজ যে তাঁর মেজাজ খারাপ তা সবাই টের পেয়েছে। যারাই তাঁর কাছে এসেছে তারাই তাঁর বকুনি খেয়েছে। টেলিফোনে যে সব পার্টির সঙ্গে কথা বলেছেন শ্রীপতি তাঁদের সঙ্গেও ব্যবসায়ী-সুলভ মিষ্টভাষী হতে পারেন নি। সামান্য কারণে এমন কি অকারণেও রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছেন। আজ সারাদিনের শেষে বড় ক্লান্তিবোধ করছেন শ্রীপতি। কিছু বা লজ্জিতও। এসব কিছুর দরকার ছিল না। নিজের আচরণকে সংযত করতে পারলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত।

কিন্তু সব সময় তা পারা যায় না। মানুষের মেজাজ সব সময় তার নিজের হাতে নয়। তা বিগড়ে দেবার জন্যে ঘরে বাইরে অনেকেই ওৎ পেতে বসে আছে।

মেজাজ বিগড়াবার পালা আজ অবশ্য ঘর থেকেই শুরু হয়েছে শ্রীপতির। কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি লেগে রয়েছে।

তাঁদের হিন্দুস্থান পার্কের সাংস্কৃতি ক্লাব উদয়নের সঙ্গে অদীমা বড় বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়েছেন। বিরোধটা তাই নিয়ে। ক্লাবে ছেলেরাও আসে, মেয়েরাও আসে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকের অনুষ্ঠান সবই চলে ক্লাবে। ক্লাবের অফিস ঘর কোথায় যেন একটা আছে। কিন্তু গুটি তিনেক তরুণ তরুণী মিলে যে ছোট একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে তার বৈঠক বসে শ্রীপতিরই ড্রয়িংরুমে। তিনখানা ঘরের একটি ফ্লাট ভাড়া নিয়ে বহুদিন ধরেই ওই বাড়িতে রয়েছেন শ্রীপতি। এ বাড়িতেই তাঁর ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে ইউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে গবেষণায়

হত। অবশ্য নিজে খরচ করে শ্রীপতি তাকে পাঠায়নি। নিজের যোগ্যতায় স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়েছে সে। এখন বাড়িতে শুধু শ্রীপতি আর অসীমা। আর একটি চাকর নিত্যানন্দ।

বেশ একটু নিরিবিলিতে দিনগুলি বিশেষ করে অফিস ফেরৎ সন্ধ্যাগুলি কাটাবেন এই হল মনের ইচ্ছা শ্রীপতির। কিন্তু অসীমা যেন পণ করেছেন তা কিছুতেই হতে দেবেন না। তিনি দিনের পর দিন যেন বেশি সামাজিক হচ্ছেন। সমাজ কল্যাণের ব্রত তাঁকে পেয়ে বসেছে। শ্রীপতি যত নির্জনতা চান অসীমার তেমনি লোকজন না হলে চলে না। এই নিয়ে মন কষাকষি কথা কাটাকাটি প্রায়ই হয় আজকাল।

আজ অবশ্য শুরু হয়েছিল লতি থেকে জামা-কাপড় আনা নিয়ে।

অফিসে যে সার্ট আর ট্রাউজারটি পরে যাবেন শ্রীপতি তা যথাসময়ে এসে পৌঁছায়নি।

আর তা শুনেই মেজাজ বিগড়াতে শুরু করেছে শ্রীপতির।

'আজই না হয় লতি বন্ধ। কিন্তু কাল কেন পাঠালে না? কাল কী হয়েছিল?'

অসীমা বলেছেন, 'কাল ভুল হয়েছিল। সময় পেয়ে ওঠে নি।'

'কী করে সময় পাবে? ওকি আর সংসারের কাজ করবার ফুরসৎ পায়? ওতো শুধু তোমার ক্লাবের ফরমায়েস খাটার জন্যে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অসীমা ফোঁস করে উঠেছেন 'কেবল ক্লাব আর ক্লাব। দিনে অন্তত একবার করে ক্লাবের মুণ্ডপাত না করতে পারলে তোমার ভাত হজম হয় না। তোমার চাকর তোমার সংসারের কাজই করে। বাজার করে, রান্নাবান্না করে, ঘরদোর গুছোয়। ক্লাবের কাজ সে আর কতটুকু করতে পারে। তুমি দিনের পর দিন এত হিংসুটে হচ্ছ কেন বলতো। দেখে-শুনে এত লজ্জা লাগে আমার।'

'তাই নাকি।'

'তা ছাড়া কি। তুমি বাইরের লোকজন মোটে দেখতে পার না।'

'আর তুমি ঠিক উল্টো। বাইরের লোকজন নিয়েই আছ। ঘরের লোকটি এখন তোমার কাছে অবান্তর।'

'এমন খোঁটা দিলে তো তুমি শতবার শোনাচ্ছ। আর কত শোনাতে চাও।'

'হাজার বার শোনাব।'

'বেশতো, শোনাও না। হাজার কেন লক্ষবার শোনালেই বা তোমাকে কে বারণ করে? তুমিই তো এই ক্লাবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে।'

'তখন কি আর জানি তার পরিণাম এই হবে?'

'কী পরিণামে হয়েছে শুনি? ক্লাব তো উঠে যেতে বসেছিল আমি আর মিসেস্ গুপ্ত দিনরাত খেটে তাকে টিঁকিয়ে রেখেছি। এখন আরো অনেকে আসছেন। বেশ বিদ্বান বুদ্ধিমান নামকরা সব আসেন আমাদের ক্লাবে তা জানো? কত ভালো ভালো সব আলোচনা হয়। কোন কোন দিন গানের আসর বসে। কোন কোন দিন সাহিত্যের কথা ওঠে। সে দিন আমাদের অরুণ কি সুন্দর একটি গল্প পড়ে শোনাল। তুমি যাও না শুনতে পাওনা।'

'দরকার নেই শুনে। আমার মত অরসিক কি কিছু বুঝবে?'

'ওই হয়েছে তোমার এক কথা। মিথ্যে নয়। দিনের পর দিন তোমার রস-কস কমে যাচ্ছে। কেবল হিংসে সর্বস্ব হয়ে উঠছ তুমি।'

একথা শুনে শ্রীপতি রাগে ফেটে পড়েছিলেন, 'হিংসের যথেষ্ট কারণ আছে আমার। তুমিই আমাকে হিংসুটে করে তুলছ। ওই ক্লাবের সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। হয় তুমি ক্লাবে থাকবে, নয় বাড়িতে থাকবে। দুটো চলবে না।'

'দেখা যাক।'

স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা নিয়ে শ্রীপতি অফিসে চলে এসেছিলেন। তারপর সারাদিন তাঁর কথায় কটুতা, আচরণে রূঢ়তা বেরিয়ে পড়েছে। এখন এই সন্ধ্যার ছায়ায় শ্রীপতি বড় পরিশ্রান্ত বোধ করছেন। রাগের চাপে নয়। ঝগড়ার তীব্রতায়। নিজের মনের ক্রোধ আর বিদ্বেষ অন্যকে যতটা না জ্বালায় নিজেকে তার চেয়ে বেশি দগ্ধ করে। তা জানেন শ্রীপতি। কিন্তু জেনেও কি দগ্ধ না হয়ে পারেন?

অসীমার সঙ্গে মিল আর হবে না। শ্রীপতি ভাবতে লাগলেন বাকি দিনগুলি এই ভাবেই কাটাবে। অথচ ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর দুজনে আরো কাছাকাছি আসবেন শ্রীপতি ভেবেছিলেন। সংসারে ঝামেলা নেই, জটিলতা নেই। অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সংস্রব নেই। শুধু তাঁরা দুজন। কিন্তু কে জানত তরুণ-তরুণীদের এক ক্লাব জুটিয়ে এনে অসীমা সেই দুজনের মধ্যে ক্রমেই ব্যবধানকে বড় করে তুলবে। ছেলেমেয়ের কাছে না থাকায় অসীমার মনে একটা শূন্যতা বোধ আছে তা শ্রীপতি জানেন। কাছে থাকলেও তারা দূরত্ব গড়ে তুলত। সন্তান বড় হলে তাই হয়। মানসিক দিক থেকে তারা অনেক দূরে সরে যায়। তখন ফের স্বামী-স্ত্রী কাছাকাছি আসে। তাদের মধ্যে নতুন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নতুন প্রণয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু অসীমা সাজে সজ্জায় চাল চলনে সেই নবীনতা অন্যভাবে লাভ করতে চায়। তার দ্বিতীয় যৌবন যেন শ্রীপতির জন্যে নয় উদয়নের জন্যে। উদয়নের উচ্চ আদর্শ। সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভার যেন সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আসলে উদয়নের যুবকত্বই অসীমাকে আকর্ষণ করে। তা কি আর শ্রীপতি জানেন না? আবার ঈর্ষায় জ্বলতে থাকেন শ্রীপতি। অসীমা তাঁর সংসারের মধ্যে আর একটি গোপন সংসার গড়ে তুলেছেন। World within the world.

অসীমা প্রায়ই বলেন, 'তুমিই বা কেন অফিস থেকে এসে ঘরে চুপচাপ বসে থাকো! আমাদের ক্লাব তোমার যদি পছন্দ না হয় তুমি তোমার নিজের পছন্দমত ক্লাব খুঁজে নাও। আমার বন্ধুদের যদি তোমার পছন্দ না হয় তুমিও বন্ধুত্ব করো। তোমার পুরোন বন্ধুরা আজকাল আর কেউ আসেনা বলে দুঃখ করে কি করবে। নতুন বন্ধুত্বের জন্যে হাত বাড়াও। এই বয়সে সবাইর সঙ্গে গলাগলি হওয়া যায়না তা মানি। কিন্তু মোটামুটি আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা করা যাবে না কেন?'

শ্রীপতির মনে হয় বেশ সহজ সমাধানের পথ দেখিয়ে যেন অসীমা, 'তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে থাকো আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে থাকি। তুমি তোমার জগতে থাকো আমি আমার জগতে থাকি।'

দুই জগতের মিলের যেন আর দরকার নেই। তাঁরা যখন নতুন কিছু আর গড়ে তুলতে পারবেন না, না মৈথিক না সাংশ্লেষিক তখন আর মিলে মিশে থেকে লাভ কি। তখন যেন শুধু ভিন্নতা আবিষ্কার করবার জন্যেই মিলিত হওয়া, যেন বিভেদ বৈষম্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দেওয়ার জন্যই চোখে চোখে তাকানো। কিন্তু অসীমা যত সহজ সমাধানের পথ দেখিয়ে দেন সমাধান তো অত সহজ নয়। অসীমা সামাজিকতার চর্চায় দক্ষ হয়েছেন কিন্তু শ্রীপতি চলেছেন বিপরীত পথে। তিনি দিনের পর দিন অসামাজিক হতে হতে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু নেওয়ার পর আবিষ্কার করেছেন সেই ঘরের কোণ শূন্য। অসীমা সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই ঘরে থাকেন না। তাঁর সোসাল কল লেগেই থাকে। আর যেদিন থাকে না সেদিন বহুজন পরিবৃত হয়ে থাকেন। অসীমাদি বহু তরুণ তরুণীর পৃষ্ঠপোষিকা, আশ্রয়দাত্রী, প্রশ্রয়দাত্রী। তাদের মনে শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা জাগায় অসীমা। পরস্পরের মধ্যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ সুবিধা করে দেন। নিজেদের একটি পুরোন সম্পর্ক যে ঘরচে পড়ে পড়ে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে দিকে তাঁর খেয়াল নেই। নিজের মনেই একটু হাসলেন শ্রীপতি। প্রসন্নতার হাসি নয় বিচক্ষণতার হাসি। হেসে সিগারেট ধরালেন।

হঠাৎ শ্রীপতির কানে এল অফিসের হল ঘরের এক কোণ থেকে টাইপ রাইটারের খটখট শব্দ আসছে। কী আশ্চর্য। তাঁর মত হতভাগা কেউ এখনো অফিসে রয়েছে না কি? তাঁর ধারণা সবারই ছুটি, চলে গেছে। অচল শুধু শ্রীপতি নিজে। ধাক্কৃত মুরারি হয়ে বসে আছেন।

বেয়ারাকে ডেকে শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করলেন 'গোবিন্দ, কে এখন টাইপ করছে দেখতো?'

'আজ্ঞে মিসেস মজুমদার। আমাদের নতুন লেডী টাইপিষ্ট।'

শ্রীপতি বললেন 'ডাকোতো এখানে। কী টাইপ করছে দেখি।'

একটু বাদেই একটি তরুণী মেয়ে কাটা দরজা ঠেলে শ্রীপতির ঘরে এসে ঢুকল। সুশ্রী বলা যায়না। কালো ছিপছিপে চেহারা। তবে ওরই মধ্যে একটু লাবণ্য আছে। এ লাবণ্য তরুণ মেয়ের। শ্রীপতি লক্ষ্য করলেন ওর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। হাতে একগাছি করে চুড়ি ছাড়া কোন গয়না নেই। কাঁধাতে একটি ঘড়ি অবশ্য আছে। দেশী ঘড়ি। কম দামি। কত বয়স হবে মেয়েটির? তেইশ চব্বিশ, তার বেশি নয়।

শ্রীপতি একই সঙ্গে মনিব আর অভিভাবকের সুরে বলছেন, 'তোমাকে তুমিই বলছি। কী নাম যেন তোমার।'

মেয়েটি সবিনয়ে সলজ্জভাবে বলল 'রেখা।'

'রেখা! বেশ।' শ্রীপতির গলা একটু যেন স্নেহকোমল হল—'এতক্ষণ ধরে কী টাইপ করছিলে? এত কাজতো আমার অফিসে করতে হয়না। তোমার সঙ্গীরা কি তাদের কাজও তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে।'

রেখা বলল 'তা কেন। আমি আমার নিজের কাজই করছিলাম। কিছু এরিয়র পড়ে ছিল সেগুলি শেষ করে—'

শ্রীপতি বললেন 'শেষ করে অন্য কিছু করছিলে বুঝি উপুরি রোজগারের জন্যে?'

'না তা নয়, আমার স্বামীর খান দুই অ্যাপলিকেশন টাইপ করে দিচ্ছিলাম।'

শ্রীপতি একটু হাসলেন 'স্বামীর অ্যাপলিকেশন? লুকিয়ে লুকিয়ে এই সব হচ্ছিল বুঝি? কেন তোমার স্বামী কি কিছু করেন না?'

'করেন। তবে সে চাকরি তেমন সুবিধের নয়। মাইনে কম। তাও নিয়মিত পাননা।'

'তাই বুঝি আরো ভালো কিছুর চেষ্টা হচ্ছে? বেশ বেশ। বোসো। আমি বলছি বোসো তুমি।'

মেয়েটিকে ইতস্তত করতে দেখে একটু ধমক দিলেন শ্রীপতি।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার সামনে লেডী টাইপিষ্ট সংকুচিত হয়ে বসল।

রেখার দুঃখ দেখে শ্রীপতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন 'এখন তো আর অফিস আওয়ার্স নয়। এখন আর-অফিশিয়াল গল্পিশ একটু চলতে পারে। বোসো তোমার স্বামীর গল্প শুনি। গোবিন্দ, আরো দুকাপ চা দাও তো।'

রেখা সবিনয়ে বলল 'চা আমি বেশি খাইনে।'

শ্রীপতি বললেন 'না খেলেও সামনে নিয়ে বসে থাকতে ক্ষতি কি। বোসো। শুনি তোমাদের ঘর সংসারের কথা। কে কে আছেন সংসারে?'

রেখা সবিনয়ে লজ্জিতভাবে বলল 'এখানে চেতলায় বাসায় আমরা শুধু দুজন আছি।'

শ্রীপতি ভাবলেন শুধু দুজন। কথাটা শুনতেও কি ভালো লাগে। অনেক দিন পরে যেন নতুন শুনলেন কথাটা।

'আর সব?'

'শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর আ ওঁদের ছেলেমেয়েরা সব শান্তিপুরে আছেন। ওঁরা মাঝে মাঝে আসেন। আমরাও যাই।'

'বেশ। আর তোমার বাপের বাড়ির সব? কে কে আছেন?'

'সবাই আছেন। বাবা মা। ভাই বোন। ভাইবোন ছোট। স্কুলে পড়ে। মাইনে বাবদ কিছু কিছু দিই। বাবা একা পেরে ওঠেন না।'

'খুব ভালো। দেওয়া তো উচিতই। তোমার স্বামী কিছু মনে করেন না তো?'

'কেন মনে করবেন? তিনি তো আগে থেকেই সব জানতেন। বিয়ের আগেই আমি সব বলে নিয়েছিলাম।'

'বিয়ের আগেও কথা বলবার তোমার সুযোগ হয়েছিল? তাই বলো। আগে থেকেই জানা শোনা ছিল তা হলে।'

রেখা লজ্জায় মুখ নামাল।

'খুব মিশ মিশ আছে?' একটু যেন ঘুষঘুষে মত বলল শ্রীপতি।

'আমার জন্যে খুব ভাবেন। এই যে আফিস থেকে আমায় ফিরতে আজ একটু দেরি হবে তার জন্যে বারবার খবরদার করবেন। আমি বলি অত ভাববার কি আছে। যা রাস্তাঘাটের অবস্থা দেরি তো হবেই। ওঁর আগেই ছুটি হয়ে যায়। আমার আগেই তিনি বাসায় গিয়ে পৌঁছান। গিয়ে সব নিজের হাতে করা চাই। ঘর ঝাঁট দেবেন, উনুন ধরাবেন, খাবার করবেন। কি চাকর তো নেই। দুজনে মিলেই সব করি। কিন্তু তিনি আমাকে বেশি কিছু করতে দিতে চান না। বলেন, তোমার শরীর ভালো না, অফিসে তোমার খাটুনি বেশি। শুনুন কথা, খাটুনি যেন ওঁরই কম।'

চা শেষ হল। রেখা উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে নমস্কার করল। তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

শ্রীপতি বললেন 'কিছু না, কিছু না। তুমি বরং আমার নষ্ট সম্পদ উদ্ধার করেছ। তোমাকে কি আমি পৌঁছে দেব? আমার গাড়ি আছে।'

রেখা সবিনয়ে বলল 'আমি নিজেই যেতে পারব। সবাই বলে আপনি খুব কড়া। কিন্তু আপনি এমন—'

শ্রীপতি বললেন 'আমরা সবাই নানা মেজাজের মানুষ, ক্রীচার অব সারকামস্টানস।'

রেখা আগে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে শ্রীপতি বেরোলেন অফিস থেকে। বেয়ারা সেলাম জানাল, দারোয়ান সেলাম জানাল।

গাড়িতে উঠে বসলেন শ্রীপতি। ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ভাবল অসীমার মেজাজ কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে? সে তো রেখার দেখা পায়নি?

না পেলেও শ্রীপতি তাঁকে বলবেন 'একদিন আমরা তো ওদের মতই ছিলাম। চল, সেই দিনটিতে একবার ঘুরে আসি।'

পূজায় সদ্য প্রকাশিত নূতন উপন্যাস

অপরাজেয় কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি

তোমার হলো জয়

শৈলজানন্দের গল্প বলার ভঙ্গী অনন্যসাধারণ সে কথা সর্ববাদীসম্মত। সেই অপরূপ ভঙ্গীতে এমন একটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন যেখানা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এই উপন্যাসে বহু বিচিত্র চরিত্র নরনারীর সমাবেশ এবং বিস্ময়বিমুগ্ধ পাঠকের রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলকে সজাগ রাখবার মত লিপিকুশলতা ত আছেই অধিকন্তু আছে এমন একটি অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য যা মনুষ্যত্ব পাঠকপাঠিকাকে অভিনব একটি চেতনার উপকূলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়। দাম ৭·০০ টাকা।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

সন্ধ্যা মালতী

৪·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নূতন উপন্যাস

মনের মতন

৩·০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

দুয়ে মিলে এক

৪·০০

অবধূতের উপন্যাস

কৌশিকী কানাড়া

৩·৫০

কলিকাতা পুস্তকালয়

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দামী পাথর

— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অশোক বললে, আস্ট্ লুক!

বলবার আগেই দেখেছিলুম আমি। বাঁ-দিকের খাড়া পাহাড় থেকে তিন চার টন ওজনের পাথর খসিয়ে পড়েছে একখানা। এখন আর সে নেই, পাশের খাদ বেয়ে বুনো কলার জঙ্গল আর টাইগার-গার্সের ঝাড় বিধ্বস্ত করে অতলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথের ওপর পড়ে আছে তার স্মৃতি—ঘাসের চাঙড় মেশানো কিছু লাল ঝুরো মাটি, এক রাশ গুঁড়ি। তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যাওয়ার আগে সরু পাহাড়ী রাস্তার আধখানা সে সঙ্গে করে নামিয়ে নিয়েছে। গত দুদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এদিকে, তারই ফল।

আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম নিঃশব্দে।

সকালের আলোয় বৃষ্টিধোয়া হিমালয় যেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ আলোর দীপালী জ্বালিয়েছে—এমনি মনে হচ্ছিল। ঘাসে শুকতারা গাছে-গাছালির মর্মর উঠছিল, দূর থেকে একটা ঝর্ণার শব্দ আসছিল, এদিকে একটা দীর্ঘ পাহাড়ী গাছের ওপর খুদে মৌমাছিরা চাক বাঁধছে—তাদের গুণ-গুণানিতে ভরে উঠছিল বাতাস। যতক্ষণ আমরা মোটরে বসেছিলুম, ততক্ষণ পাহাড়ের পথ ছিল আমাদের কাছে কয়েকটা ছুটে চলা ছবি, কিছু বিপজ্জনক বাঁক, হঠাৎ দেখা এক আধটা ঝর্ণার তরল রূপোর ঝলক। কিন্তু গাড়ী থামিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে পড়বার পর সব রঙ, সব ধ্বনি, সব রূপ নিয়ে পাহাড় আমাদের চারদিকে জীবন্ত হয়ে উঠল—যেমন করে যাদুকরের কৌশলে ক্যানভাসের পোর্ট্রেট রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু বিরক্তিতে ভরে গেল অশোকের মুখ। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, তা হলে দশটার ভেতরে আমরা ওখানে পৌঁছুব কী করে? হাউ? সব পণ্ড হয়ে যাবে যে!

আমি বললুম, নাই বা পৌঁছোনো গেল আজকে। এসো, কোথাও বসা যাক এখানে, পাহাড়ীদের বস্তি থেকে কিছু খাবার-টাবার কিনে এনে পিকনিক করা যাক।

অশোক বললে, পাগলামি রাখো। যেতে হবেই, অ্যাণ্ড্ ইট্স্ ভেরী আর্জেণ্ট।

—কিন্তু যাবে কী করে?

রাস্তা এমনিতেই সরু, তার ওপর অর্ধেকটা তার ভেঙে পড়েছে। এর ওপর দিয়ে গাড়ী বের করে নিতে গেলে ডানদিকের চাকা দুটো একেবারে মহাশূন্যতার সীমান্ত ঘেঁষে যাবে। আর সেই এক ইঞ্চি মাটি যদি পাথরটার ধাক্কায় ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে গাড়ীও কাত্ হয়ে যাত্রা করবে অতলের দিকে।

অশোক বললে, আর একটা পথ আছে। কিন্তু তা হলে আবার চল্লিশ মাইল উজিয়ে যেতে হয়, একটা ডার্টি কনজেস্টেড টাউন পেরুতে হয়, দু ঘণ্টা বসে থাকতে হয় খেয়ার জন্যে, তারপর আবার

মিশ মাইল আসতে হয় এদিকে। তার মানে বেলা তিনটে। ডিরেক্টার্স্ মীটিং মিটে যাবে তার আগে। সে অসম্ভব—তা হলে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

—না-ই বা হল মানে। দিনটা আজ কাটানো যাক না এখানেই। গাড়ীটা ব্যাক করিয়ে কোনো একটা জায়গায় রাখা যাক, তারপর ঘোরা যাক এদিক ওদিক।

—আর বোর্ডের মীটিং?

—একবার না হয় বাদই পড়ল মীটিংটা।

দামী আর্মাস ক্রোমের চশমার নীলাভ কাঁচের ভেতর দিয়ে অশোক কিছুক্ষণ উগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—অমন করে আমার দিকে কেন তাকাচ্ছ ভাই? পাথরটা কিন্তু আমি ফেলিনি।

—তুমি না ফেললেও তোমার জন্যেই কাণ্ডটা ঘটল। পয়লা নম্বরের অযাত্রা।

—অযাত্রা? এ অপবাদটা তুমিই প্রথম দিলে আমাকে। আজ পর্যন্ত অন্য কারুর মুখে আমি শুনিনি।

অশোক হতাশভাবে পাশের কাশভাটের বাঁধানো জায়গাটুকুতে বসে পড়ল।

—মাইল খানেক দূরে রাস্তার কুলিরা বোধ হয় এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। তখন ঝড়ের মতো গাড়ী চালিয়ে আসছিলুম, আদৌ কানে তুলিনি সেটা। এখন দেখছি ভারী ভুল হয়ে গেছে।

—এক মাইল দূরে ভুল ভাঙলেই বা কী লাভ হত?

—তা বটে।

অশোক তাবুকের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল চুপ করে। পকেট থেকে বড়ো একটা পানের ডিবে বের করল, একটা পান মুখে পুরল, ডিবে একটুখানি চুণ লাগিয়ে নিলে, এক মনে পান চিবুতে লাগল দু তিন মিনিট। তারপর বেশ লম্বা ছেড়ে দিয়ে বললে, তা হলে আর কী করা—

—কিছুই করবার নেই।—আমি তাকিয়ে দেখছিলুম সেই দীর্ঘ পাহাড়ী গাছটার দিকে। সবুজের মতো চাক নেমেছে একটা, অসংখ্য পাহাড়ী মৌমাছির গুঞ্জন উঠছে। পাহাড়ের কোন্ ফুল থেকে মধু আনে ওরা? কি রকম তার স্বাদ? আমি জানি না। কিন্তু এখন আমার মনে হল যদি সবুজের দীপালী জ্বালা পাহাড়ের এই নিরালায়, দূরের একটা ঝর্ণার ডাক শুনতে শুনতে, পাহাড়ী মধুতে এক একটা পাত্র ভরে নিয়ে একটু একটু করে চুমুক দেওয়া যেত এখন, তা হলে খুব ভালো লাগত।

অশোক উঠে দাঁড়ালো, আড়ামোড়া ভাঙল।

—কী বলো, চেষ্টা করব একবার?

—কিসের চেষ্টা?

—গাড়ী বের করবার? বলা যায় না, কোনো রকমে হঠাৎ বেরিয়েও তো যেতে পারি?

আমি চেয়ে দেখলুম রাস্তার ডানদিকে। সুনো কলার অবল আর টাইগার কার্বের ঝাড় বিধ্বস্ত করে পাথরটা যে শূন্যতায় নেমে গেছে, তার দিকে চোখ পড়তে হৃৎপিণ্ড ধক ধক করে উঠল। সুন্দর আর ভয়ঙ্কর মিলে পাহাড় অপূর্ব। কিছুক্ষণ এর মধ্যে বসে থাকলে নেশা ধরে—দুঃসাহসিকতার আকুলতা পেয়ে বসতে থাকে ধীরে ধীরে। মনে হয়, দেখা যাক না—কী ঘটে।

অশোকের প্রস্তাবে প্রায় সায় দিতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ যেন কৌতুকের হাসির মতো শব্দ উঠল একটা। তারপরেই যেখানে পাথরটা পড়েছিল, ঝর-ঝর করে আরো এক রাশ ঝুরো মাটি আর আট দশটা পাথরের ছোট বড়ো চাঙড় আছড়ে পড়ল সেখানে। ঠিক মনে হল, আমাদের কথাগুলো কান পেতে কেউ শুনছিল—মুহূর্তে সমস্ত পরিকল্পনাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল।

শিউরে, লাফিয়ে সরে গেল অশোক।

—হল রাস্তা সেকনো। চলো, সরে পড়ি।

—হিক্স নিতে চাও না?

—হিক্স? মরব নাকি?—হতাশায় মুখ কালো করে অশোক বললে, মরতেও দুঃখ নেই ভাই, কিন্তু ভালো বিলিতী গাড়ীটা যদি যায় তা হলে মনেও শান্তি পাব না। কয়েক মাস আগে অনেক কায়দা করে আনা হয়েছে ইউ. কে থেকে, বাইশ হাজার টাকা খরচ পড়েছে।

ঠিক কথা, দামী বিলিতী গাড়ী। শাদায় আর সবুজে অপূর্ব তার চোখ জুড়োনো রঙ, এভারব্রাইট ঈলের অংশগুলো যেন চাঁদের টুকরোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে। পথ দিয়ে গাড়ীটা যখন আসছিল, তখন এক মুঠো নরম ফেনার মধ্যে ডুবে বসেছিলুম আমি—গাড়ীর এঞ্জিনে স্কীণতম গুরুন-টুকুও ছিল না। যেন সে মেঘের ওপর দিয়ে ভাসছিল। এতক্ষণ পাহাড় ছিল ছবি, পথ ছিল শুধু আনন্দে ছুটে চলার জন্যে। এখন পাহাড় আমাদের ঘিরে আছে, গাড়ীটার আর কোন কাজ নেই। এখন দামী গাড়ীটার একটা নিরুপায় করুণ মূর্তিটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম।

অশোক বললে, ব্যাস মিটল। ঘাস কায় এ্যাণ্ড নো ফায়ার। চলো, এবার ফিরি। আবার চল্লিশ মাইল উজিয়ে—যাবে চলে চলো নিজ নিকেতনে।'

আমি বললুম, হিক্‌নিক?

—শাট-আপ।

অগত্যা পাহাড়ের সেই ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই স্বর্গীয় ডাক, সেই সবুজ স্নিগ্ধতার উৎসব ছেড়ে আবার গিয়ে উঠতে হল দামী মোটরে। সেই ফেনার মতো নদীর ভেতরে শরীর ডুবিয়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দ গতির মধ্যে হারিয়ে গেলুম আমি। একটু ব্যাক করে, চওড়া মতন একটা বাঁকে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলুম, সেই পথেই ফিরে চললুম।

জানলার ফাঁকে ছবির পর ছবির একজিবিশন। কখনো এক ঝলক ডেইজী, কখনো থোকায় থোকায় সোনালী বিন্দু ছিটানো সোনালি ফুলের বাগ, কখনো বা রক্তলাল মঞ্জরীর আভাস। পাহাড়ী বাঁশবন, শাল সেগুনের গাছ, অকিড, পাখি, পথের ওপর দিয়ে ছুটে পালানো বানরের দল। এখন দামী গাড়ীটা, তার আরাম, তার গতি—এইগুলোই সত্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমি দেখছি ষ্টিয়ারিঙের ওপর আলতোভাবে হাত ফেলে দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে অশোক, হর্ষের শব্দে চমকে ছুলছে পাহাড়ী বাঁক, ছায়ার আকরি কাটা কালো পীচের পথ চারটে শাদা সুন্দর নিউম্যাটিক টায়ারের নীচে নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে।

একটু আগেই শব, আলো আর লতা-পাতা ঝুরো মাটি বুনো ফুলের গন্ধ যেখানে যে পাহাড়টার ভেতরে আমরা ডুবে যাচ্ছিলুম, দামী গাড়ীটা তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের। পাহাড় চেয়েছিল, সীটিঙের পথ আটকে দিয়ে নিজে ভেতরে আমাদের গ্রাস করে নেবে, কিন্তু সে সুযোগ

তাকে আমরা দিইনি। অশোকের দামী গাড়ীটা যন্ত্রের শক্তি হয়ে প্রকৃতির কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিল? তবু মাইল কয়েক এগিয়েই থাকতে হল একবার।

পানের ডিবে খুলে অশোক বললে, লুক হিয়ার, একদম খালি।

—পান খেয়ো বাড়ী ফিরে।

—উই. হ্যাট্ ওন্‌ট্ ডু। এক তো মীটিংএ যাওয়া হলনা, মেজাজ আগুন হয়ে আছে; তার ওপর পানও যদি একটা অন্ততঃ না পাই তা হলে ছুম করে অ্যাক্সিডেণ্ট বাধিয়ে ফেলব কোথাও।

আমি বললুম, তা হলে থামো। ওই তো অদূরে পাহাড়ী বস্তি, আর পথের ধারে পান বেচছে গিরিকুমারী।

—বেশ বলেছ গিরিকুমারী।—অশোক হাসল: মানায় কিন্তু ওদের।

দামী গাড়ী ব্রেকের শাসনে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তে। আমরা নেমে গেলুম দোকানটির দিকে। গৌরাঙ্গী পশ্চারিণী তার হাসি ভরা উজ্জ্বল চোখ তুলে সরল কৌতূহলে আমাদের দিকে চাইল।

ছোট বস্তি, তাও পাহাড়ের ঢালের দিকে, ওপর থেকে তার অস্তিত্ব প্রায় নজরেই আসে না। একটু ঝুঁকে তাকালে তবেই দেখা যায় কাঠের ঘর, ছাগল-মুরগী, ভুট্টার ক্ষেত, কোয়াসের মাচা। মেয়েটি কিন্তু দোকান করেছে রাস্তার ওপরেই। বস্তির ক্রেতা তো তার আছেই, তা ছাড়া পথের খরিদ্দারও তার পাওয়া দরকার।

গায়ে মলিন এতিয়াতের একটা চাদর, পরনে ঘাঘরার ধরণে লাল শাড়ী। কপালে জলজলে সবুজ টিপ, হরিদ্রাভ-গৌর নটোল হাতে লাল কাচের চুড়ির পোছা। সুন্দরী কিনা বলা শক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্য আর প্রসন্নতা তাকে যেন পাহাড়ী ফুলের মতো ফুটিয়ে রেখেছে।

অশোক বললে, পান রাখো ছ?

—রাখো।—মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। পান ভালো কি না। এ রকম প্রশ্ন বোধ হয় সে প্রথম শুনল।

—আচ্ছা, দুটো দাও।

মেয়েটি পান সাজছিল, আর আমি তার দোকানটিকে দেখছিলুম। চায়ের ব্যবস্থা আছে। কাচের বোয়ামে কিছু বিস্কুট আছে, একটি এনামেলের ছোট গামলায় কাল আলুর দম রয়েছে, বিড়ি আছে, অচেনা অদ্ভুত সেবেলের দেশলাই আছে, সস্তার ক'টা সিগারেট আছে। দুটো ছোট ছোট করবী—অর্থাৎ কুমড়ো আছে, আর কয়েক ঝাঁটি কোয়াসের ডগা রয়েছে। খান কয়েক কাপড়-কাচা সাবানও দেখলুম। চার হাত বাই আড়াই হাতের মতো জায়গার ভেতরে এমন মাল্টিপারপাস দোকান একমাত্র হিমালয়েই সম্ভব।

তবু পাহাড়ের ভেতরে কী আশ্চর্য মানিয়ে গেছে সব। চারদিকে সবুজ, চারদিকে ঠাণ্ডা ছায়া, ফুল এখানে ওখানে, পাখির ডাক, দু-চারটি অপরিচ্ছন্ন শিশুর ছুটোছুটি, পাশেই একটি ছোট ঝর্ণার অবতরণ আর সেখানে দু'টি কিশোরী মেয়ের স্নান—সব মিলে এই দোকানটি যেন এখানে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আবার একটু একটু করে পাহাড়ের নেশা আমাদের ঘিরে ধরতে লাগল,

চাপার কলির মতো মোটা মোটা আঙুলে মেয়েটি পান সাজছিল—আমি দেখলুম, সেই দিকে অশোকের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে।

বললুম, অশোক, একটু চা খেলে হয় না?

কেমন যেন চমকে গেল অশোক। যেন ঘুম থেকে ওকে জাগালুম আমি।

—চা? এখানে?

—কেন, ক্ষতি কী।

—না, ক্ষতি কী!—অশোকও যেন আমারই মতো আচ্ছন্ন হল: দেখা যেতে পারে ট্রাই করে। এ দিদি চিনা হোমদাই?

দিদি শুনে মেয়েটির মুখ কৌতুক আর খুশিতে ভরে গেল। তার আঠারো উনিশ বছর বয়সে দুটি বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে এ-রকম সম্ভাষণ বোধহয় সে শোনেনি।

—হোইনুহ।

—রামরো?

—রামরো।

সামনের নড়চড়ে কাঠের বেঞ্চিটায় বসে পড়লুম আমরা। পাহাড়, সবুজ, ঠাণ্ডা, নির্জনতা, কাঁসার গ্লাসের সেই চা, মেয়েটির স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল প্রসন্নতা—সবাই আমাদের ঘিরে ধরল, টেনে নিলে নিজেদের ভেতরে, আমাদের মগ্ন করল। অশোক ডিরেকটারস মীটিঙের দুঃখ ভুলল, আমি চা-বাগানে বেড়াতে না পারার ক্ষোভ ভুলতে পারলুম তারপর—তারপর নিতান্ত ইতর জনের মতো—কল্পনাতীত ভাবে, সেই বাল আলুর দম কিনে খালপাতায় করে খেতে আরম্ভ করলুম আমরা।

এইভাবে কতক্ষণ কাটত, জানিনা। হয়তো সারাটাদিন, হয়তো আরো বেশি, হয়তো তিনে তিনে পাহাড়ের মায়া আমাদের জীর্ণ করতে থাকত। কিন্তু হঠাৎ শব্দ হল: উঁক্-উঁক্-উঁক্—

আপনাদের সেই দামী মোটরটা। এতক্ষণ তার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু এর ভেতরে কখন দু'তিনটে পাহাড়ী বাচ্চা গিয়ে তার রহস্যভেদে তৎপর হয়েছে, গাড়ীতে বন্ধ ছিল না, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নরম পুলকে হর্ণ বাজাচ্ছে তারা।

ওই শব্দে কে যেন আমাদের চমুক মারল। যেন কে তার নরম হাতে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরছিল, ঘুম পাড়াতে চাইছিল; হঠাৎ কোথা থেকে একটা গুলি বিঁধল তার হৃৎপিণ্ডে, একটা চাপা কান্না ঠিকরে উঠল তার বুক থেকে, হাতদুটো শিথিল হয়ে খুলে পড়ল।

আর উঠে দাঁড়ালো অশোক। কোনো হিসেব না করে, একটা দু'টাকার নোট মেয়েটার কাঠের বাক্সের ওপর ফেলে দিয়ে বললে, দিদি, এই নাও। তোমায় কিছু ফেরৎ দিতে হবে না।

মেয়েটা অবাক হয়ে গেল, বোধহয় আপত্তি করতে চাইল, কিন্তু তার আগেই অশোক জোর পায়ে এগিয়েছে গাড়ীর দিকে। বললে, ইস্, আন্‌নেসেসারি দেরী করলুম খানিকটা। হাউ ফুলিশ।

ফুলিশ?

কিন্তু আমি জানি। আমি জানি, যদি দামী গাড়ীটা চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যেত, তা হলেই হয়তো আজ—অন্তত: আজকের জন্যে—এই বেলাটার জন্যে—মনে প্রাণে খুশি হত অশোক।

———

অন্তরীক্ষে

গুজবে কান দেবেন না।

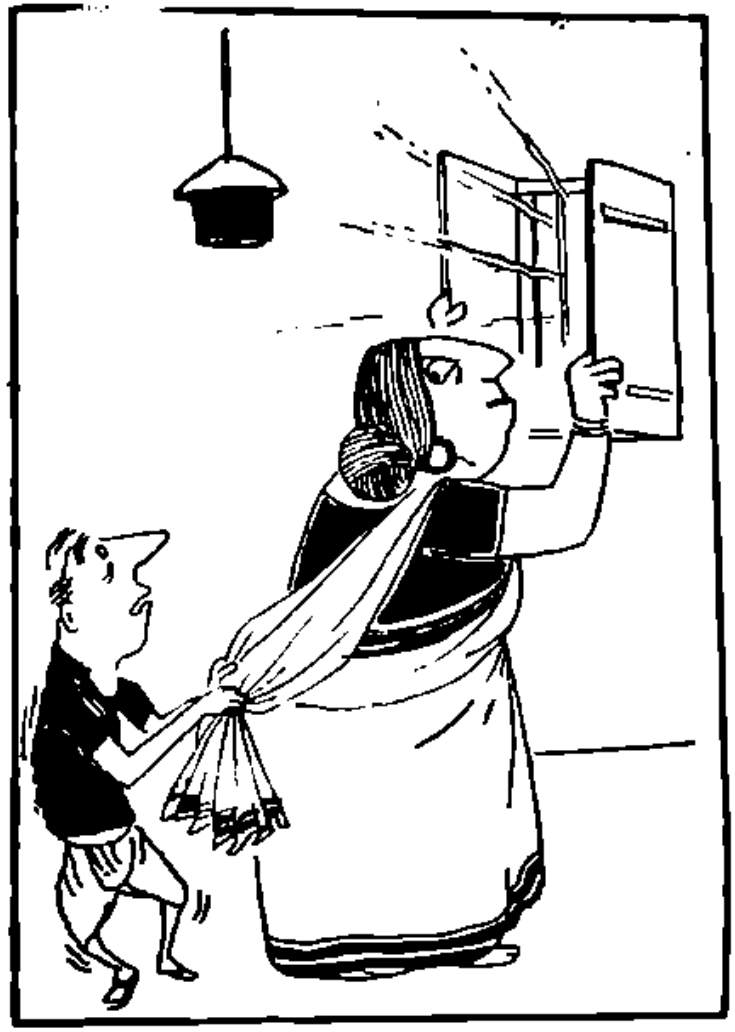

ছিঃ ছিঃ সাইরেন শুনে অত ভয়!

বাঃ, অদ্ভুত করছেন! শুধু আপনিই বাঁচুন!

সাবধান! দেওয়ালেরো কান আছে!

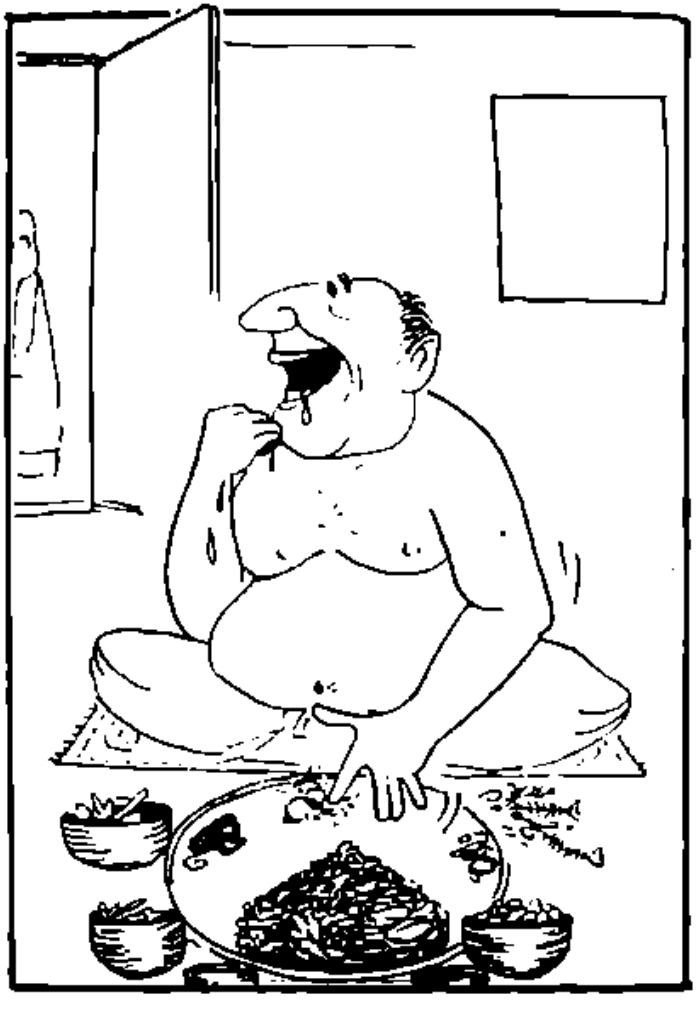

অত খাচ্ছেন ! আর সবাই যে না-খেয়ে থাকবে।

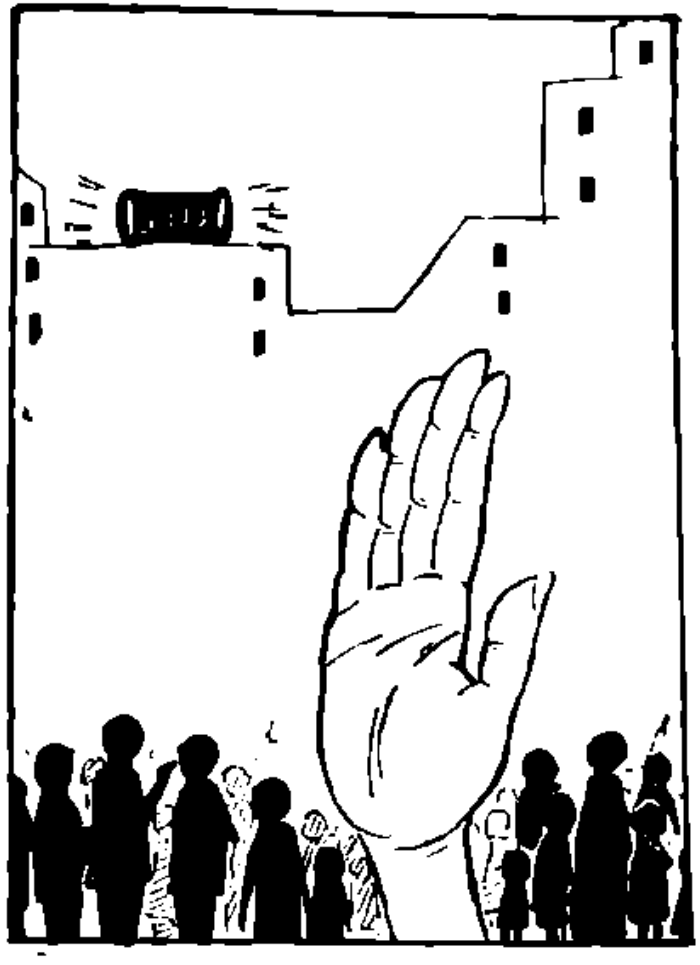

সাইরেন :

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র আজ সমাজ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। চলচ্চিত্রের এই মর্যাদা লাভে রসান্বেষী মাত্রেই আনন্দিত। কিন্তু এ হেন মর্যাদা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের নব মূল্যায়নেরও একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র যেন একটা দোটানার মধ্যে চলেছে—একদিকে রসসৃষ্টির উৎকর্ষতা ও রুচিবান দর্শকদের পরিতৃপ্তিদানের প্রয়াস অন্যদিকে বিলাসিতার মোহময় বিকৃত জীবনের রঙ্গার এই দুইই আজকে চলচ্চিত্রে বর্তমান। বিশ্বের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে চলচ্চিত্র তার যোগ্য স্থান গ্রহণ করুক এই মতের পৃষ্ঠপোষকদের প্রাধান্য তাই সবার পক্ষেই আশার কথা। জীবনের কল্যাণকর রূপের চিত্রায়ণই চলচ্চিত্রের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আশার কথা হলিউডেও চলচ্চিত্রের নব মূল্যায়নের ঢেউ এসে পড়েছে। রোমান্টিসজম ও নৃত্যগীতের বাহুল্য বর্জিত ছবি তোলায় আজ বিদেশী পরিচালকদের মধ্যেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে—সেরা সেরা বিদেশী চলচ্চিত্র এই নব পথেরই ইঙ্গিত। চলচ্চিত্র শিল্পে এই সাম্প্রতিক আত্মসচেতনতা একান্ত লক্ষ্যণীয়। প্রমোদের মাধ্যম হিসেবেই যে চলচ্চিত্র পরিচিতি লাভ করেছিল শিল্পগত দায়িত্ববোধ আজ তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পথ ছেড়ে চলচ্চিত্র আজ একটা পরিষ্কার রূপ নিয়েছে।

চলচ্চিত্রের এই নব মূল্যায়নে—শিল্পসৃষ্টির এই সব আধুনিক রচনায় আজ চলচ্চিত্র স্রষ্টার মতো চলচ্চিত্র দর্শকের দায়িত্বও অপরিসীম। সবচেয়ে বড়ো কথা নিছক ভালো লাগা, সাময়িক আনন্দ পরিবেশনের মোহ ছেড়ে আমরা আজ নূতন ধরণের সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টির দিকে এগিয়ে চলেছি। শিল্পের বিচার বা মূল্যায়ন শুধুমাত্র যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা অনুভূতিতেই সীমাবদ্ধ নয়—এটা যে আমরা বুঝতে পেরেছি—চলচ্চিত্রের সাফল্যের নিঃসন্দেহে এটা একটা ইঙ্গিত।

ক্যামেরা বা ট্র্যাকব্যাকের কারদা ছাড়াও চলচ্চিত্রশিল্প আজ উৎকর্ষতার এক নূতন দিকে এগিয়ে চলেছে—সে এক সাধনার নূতন পথ। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে—চলচ্চিত্রকে সার্থক শিল্প হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে একটা সম্মিলিত প্রয়াসের দরকার সে প্রয়াসের অংশীদার চলচ্চিত্র পরিচালক, কলানুশীলী ও রসান্বেষী দর্শক সমাজ। এঁদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তৈরী থাকতে হবে। সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টির এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনীয় বিষয়। অর্থলাভের কৌলীণ্য লাভের মোহময় পরিণতিকে বাদ দিয়ে শিল্পগত সচেতনতা ও সাফল্যলাভ করতে হলে যে প্রস্তুতি থাকা দরকার দুঃখের বিষয় আজকের দিনেও সে প্রস্তুতি আমাদের অনেকেরই নেই। অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই তাই পরিচালকের বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত মানস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তুচ্ছতা ও গুরুত্বহীনতা, দুর্বল বিষয়বস্তু নির্বাচন, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করতে না পারলে সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টি আজ কোন রকমেই সম্ভব নয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র

—সেবাব্রতী

বিশ্ব চলচ্চিত্র সভায় ভারতের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে সেকথা অনস্বীকার্য।

সিনেমায় ছবি দেখাবার এই যন্ত্রটি বিজ্ঞানের এক অদ্ভুতপূর্ব বিস্ময়। প্রথমে এটি কথা বলতে পারতো না। সেটা ছিল সিনেমার নির্বাক যুগ। তখন এটি ছিল অসম্পূর্ণ। সেই তখন থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছিলেন একে কথা বলাবার। প্রথমে গ্রামোফোন রেকর্ডে শব্দ তরঙ্গ ধরে রেখে প্রক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে তাকে নির্বাক ছবির সঙ্গে সমান তালে চালিয়ে কোনোরকমে আমাদের মনের সেই অসম্পূর্ণতার ক্ষোভ মেটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না।

অচিরকালের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের এই দুরূহ সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো। শব্দ তরঙ্গকে আলোক তরঙ্গে এবং সেই আলোক তরঙ্গকে পুনরায় শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করবার অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হলো।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় একটি সিনেমা গৃহের নামকরণ করেছিলেন—'রূপবাণী'। উদ্বোধনের দিনে বলেছিলেন—পৃথিবী তার কোনো বস্তুকেই চিরদিনের জন্য ধরে রাখে না। বস্তুপুঞ্জ অবিনশ্বর নয়। কিন্তু বিজ্ঞান বলবে ধরে রাখবো। প্রথমে ধরবে তার রূপ। তারপর ধরবে তার বাণী।

বিজ্ঞানের এই দান মানুষ গ্রহণ করলে। যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। আগে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল মানুষের চোখ। তারপর তৃপ্তিলাভ করলো মানুষের দুটি ইন্দ্রিয়—চোখ আর কান একই সঙ্গে।

মানুষের মস্তিষ্ক যে-বস্তু আবিষ্কার করেছে সে যদি মানুষের সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই নিরস্ত হয়, তাহ'লে তাকে চিরস্থায়ী করা যায় না। তখন মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা আবিষ্কৃত সেই যন্ত্রকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলো মানুষের হৃদয়-মনের কাছে। যন্ত্র বললে, 'আমি তোমার মনের ক্ষুধা —তোমার রসের ক্ষুধা মেটাবো, আমাকে বাঁচাও।'

তখন থেকে সেই যন্ত্র মানুষকে তার গল্প শোনাতে আরম্ভ করেছে। মেটাতে সুরু করেছে তার মনের ক্ষুধা—তার রসের পিপাসা। তখন থেকে গল্প-সাহিত্য এবং নাট্য-সাহিত্য হয়েছে তার উপজীব্য।

মানুষের হৃদয়-মনে রস পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভারত কোনোদিনই পিছিয়ে থাকেনি। বাংলাদেশ তো নয়ই।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এই যন্ত্রটির ব্যবহার কৌশল জেনে নিতে অসুবিধা হলো না। সেই নির্বাক যুগে তাই দিয়ে আমরা আমাদের চোখের পিপাসা মেটালাম। অমরেশ সিনেমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত অনাদি বোস হলেন অগ্রণী। রঙ্গমঞ্চের সীমিত পরিধির মধ্যে যা ছিল অসম্ভব, এই যন্ত্রটির সাহায্যে মানুষের চোখের পিপাসা মিটিয়ে সেইখানে এনে দিলেন একটি বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। রঙ্গমঞ্চের ওপর প্রেক্ষাগৃহের দর্শক যেখানে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ গঙ্গা। সেই গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো

শৈবলিনী। প্রতাপ ও শৈবলিনীর সেই সন্তরণ দৃশ্যের মধ্যে ছিল এই নবাবিষ্কৃত শিল্পটির ব্যবসায়িক সম্ভাবনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ।

জে-এফ্ ম্যাডান কোম্পানী গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে এই নির্বাক চলচ্চিত্রের ব্যবসা সুরু করলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী গল্পের ছবি তুললেন—England returned.

তারপর ছবির পর ছবি তৈরি হতে লাগলো। বোম্বাই শহরে হিন্দী এবং কলকাতা শহরে বাংলা ছবি তোলবার হিড়িক পড়ে গেল।

সবই হতে লাগলো আউটডোরে। ছবি তোলার তখনো মাত্র সূর্য্যের আলো। পাকা ফ্লোর তৈরি করে ইলেকট্রিকের আলোয় ছবি তোলার ব্যবস্থা তখনও হয়নি। সে ব্যবস্থা প্রথম করলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তারপর ষ্টুডিয়ো তৈরী করলেন জে-এফ্ ম্যাডান। দমদমে একটি বাগানবাড়ী নিয়ে ছবি তোলা সুরু করলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী। বর্দ্ধমান জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এলেন শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু। সিনেমা ছবির প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ। সে পরিচয় তিনি দিলেন Flames of flesh ছবিখানি তৈরি করে। তখনকার দিনে ছবি কথা বলতো না। কাজেই টাইটেল লিখে গল্পটি বুঝিয়ে দিতে হতো। এই চিত্রনাট্য রচনা ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেবকীকুমারই সর্ব্বপ্রথম চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ছবিতে একটি ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও করেছিলেন।

তার পরেই এলো সবাক চিত্রের যুগ। ম্যাডান-কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম টকি মেসিন আনালেন। ষ্টুডিয়ো ফ্লোর তৈরি করে টকি ছবি তুলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে নমুনা স্বরূপ কয়েকজন খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীর আবৃত্তি বক্তৃতা, গান ইত্যাদি তুলে দেখাতে লাগলেন। ছবিঘরেও নতুন মেসিন বসাতে হলো। তাঁদের প্রথম টকি ছবি হলো—জামাই ষষ্ঠী।

বোম্বাই থেকে এলো—'আলাদ-আরা'।

শ্রীযুক্ত বি-এন সরকার তখন নিউ থিয়েটার্সের পত্তন করেছেন। টালিগঞ্জে ষ্টুডিয়ো তৈরি হয়েছে। ছবি দেখাবার জন্য চিত্রা এবং নিউ সিনেমা তৈরি হলো।

কড়িয়াপুকুরে তার আগেই তৈরি হয়েছে 'শো হাউস' তারপর হলো—'টকি শো হাউস'।

এইবার ছবি তোলবার হিড়িক পড়লো কলকাতায় বোম্বাই-এ এবং পুনায়। পুনায় হিন্দী ছবি তুলতেন একা শান্তারাম। সেখানকার ষ্টুডিয়ো তিনি বোম্বাই-এ নিয়ে এলেন। নিউ থিয়েটার্সে তখন দেবকীকুমার বোস, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বোস, হেমচন্দ্র চন্দ্র এবং আরও অনেকে। প্রেক্ষাগৃহ আতর্থী অনেকগুলি ছবি করেছেন নিউ থিয়েটার্সে।

'চিত্রা' তখন তৈরি হয়ে গেছে। 'চণ্ডীদাস' ছবি নিয়ে আবির্ভূত হলেন দেবকীকুমার। 'ভাগ্যচক্র' নিয়ে নীতীন বসু, 'দেবদাস' নিয়ে প্রমথেশ বড়ুয়া।

সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি পড়লো নিউ থিয়েটার্সের ওপর। বাংলা এবং হিন্দী দুরকমের ছবি তৈরি করছেন তাঁরা। সারা ভারতে নিউ থিয়েটার্সের নাম ছড়িয়ে পড়লো।

বাঁধা ডিরেক্টার, বাঁধা আর্টিষ্ট। হাতীমার্কা ছবির অমজমকার।

তাঁদের দেখাদেখি কলকাতা শহরে তখন একটির পর একটি ষ্টুডিয়ো তৈরী হতে লাগলো। ছবির পর ছবি আসতে লাগলো।

ওদিকে বোম্বাই থেকে নতুন নতুন হিন্দী ছবিও আসছে একটির পর একটি। কলকাতার বাজার হিন্দী ছবিতেও ছেয়ে গেল। সিনেমা-শিল্পে তাঁদের লগ্নির পরিমাণ বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। হিন্দীর বাজার অনেক বড়। বাংলার বাজার তার তুলনায় কিছুই নয়।

নির্বাক যুগে একখানি ছবি তৈরি করতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হতো, সবাক চিত্রের যুগে সেই অর্থের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। তবু ছবি তৈরির জন্যে টাকার অভাব হলো না। টাকা যাঁদের আছে তাঁরা অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন এই ব্যবসার দিকে। কারণ যে-ছবি ভাল চলে সে-ছবিতে লাভের পরিমাণও অনেক বেশি। কাজেই ছবির নির্মাতারা যেমন ছবির মানকে নীচে নামিয়ে আনলেন, তেমনি এক শ্রেণীর কারবারী চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগলেন। অর্থ লগ্নীর একটি ভাল ক্ষেত্র পেয়ে দেশের দু'একটি ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছিল এই কারবারে টাকা খাটাবার জন্যে। কিন্তু সিনেমা-শিল্প তখন পুরোপুরি অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্ক তখন হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

সরষে দিয়ে ভূত তাড়ানোর একটা কথা আছে। কিন্তু যে সরষে দিয়ে ভূতকে তাড়ানো যায়, সেই সরষের ভেতরেই ভূত যখন তার স্থায়ী আশ্রয় নির্মাণ করে নেয়, তখন আর ভূতকে তাড়ানো যায় না। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো। যে প্রশস্ত ক্ষেত্র দিয়ে এই শিল্পটির গতিবিধি—সেই ক্ষেত্রটি পুরোপুরি চলে গেল ব্যবসাদারের হাতে। কাজেই অনাচার এখানে আর অনাচার রইলো না। সত্যের মুখোস পরে মিথ্যা এখানে তার রাজত্ব বিস্তার করে বসলো।

সেই রাজত্ব এখন কায়েমী হয়ে বসেছে।

যে-রাজত্বই হোক্, ছবি যাঁরা তৈরি করছেন—যাঁরা পরিচালক, যাঁরা অভিনেতা অভিনেত্রী—তাঁদের কিছু এসে যায় না। অভিনেতা অভিনেত্রীরা যেমনি গাড়ী করে ষ্টুডিয়োতে আসেন, গাড়ী করে বাড়ী ফিরে যান। যাঁদের নাম ডাক হয় তাঁরা মোটা মোটা টাকা হাঁকেন। যাঁদের না হলে চলে না তাঁরা সাদা টাকার সঙ্গে কালো টাকা হেঁকে বসেন।

এরই ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পেরিয়ে গেল।

এই সর্বনাশা যুদ্ধ আমাদের দেশে কালো টাকার রাজত্ব বসিয়ে দিলে। বোম্বাইএর ছবির মূলধন বেশি। সেখানে তখন চুনোপুঁটি অভিনেত্রীও তিন চার লাখের কম কথা বলে না। একটু নাচতে গাইতে জানে—তার ওপর যদি যুবতী হয়—আর অঙ্গসৌষ্ঠব ভাল থাকে, তাহ'লে তো আর কথাই নেই।

একটা কথা আছে—'লিখতে লিখতে লেখে।' সিনেমার ছবিও তাই হলো। ক্যামেরা আর সাউণ্ডের কাজ ধীরে-ধীরে ভাল হতে লাগলো। আগেকার দিনের কাজের তুলনায় যুদ্ধোত্তর সিনেমার যান্ত্রিক উৎকর্ষ উঁচু ধরের হলো।

জনসাধারণের রুচিবোধ পরিচ্ছন্ন হতে লাগলো। বোম্বাইএর দেখাদেখি মাদ্রাজে তখন খুব বড় বড় ষ্টুডিয়ো হয়েছে। হিন্দী ছবির বাজারে বোম্বাই-এ-মাদ্রাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়ে গেল। বোম্বাই তখন হলিউডকে নকল করতে আরম্ভ করেছে। বোম্বাইএর অধিকাংশ হিন্দী ছবিতে তখন ভারতীয় ছাপটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বোম্বাইএর ছবি দেখলে সে ছবি যে ভারতবর্ষে তৈরি সেকথা মনে হয় না। গল্পাংশ থেকে আরম্ভ করে অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজ-পোষাক চাল-চলন সবই যেন

বিদেশী। এর জবাবে তাঁরা বলেন—ভারতবর্ষের বাইরের কয়েকটি দেশের বাজার থেকে ছবি দেখিয়ে তাঁদের টাকা তুলতে হয়, কাজেই ছবির পরিবেশে সাজ-পোষাক সম্পূর্ণ ভারতীয় হলে তাঁদের চলে না।

বাংলাদেশ কিন্তু তখনও অন্য পথে হাঁটছে। সিনেমার ছবিতেও বাংলা তখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। প্রথম যুগের দোষত্রুটি ক্রমশঃ সংশোধন করে সিনেমা-শিল্প যাতে উন্নত ধরণের হতে পারে, তার জন্য গল্প-লেখক, চিত্রনাট্য-রচয়িতা, অভিনেতা অভিনেত্রী সুরশিল্পী—সকলে একযোগে এগিয়ে চলেছেন।

মানদণ্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সিনেমা-শিল্প এখন বিশ্বের দরবারে সম্মানিত। কয়েকজন অগ্রগামী সিনেমা ছবির পরিচালকের কল্যাণে আমরা এই গৌরবজনক সম্মান লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁদের অগ্রণী যিনি তাঁর নাম শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়।

পূজা উপলক্ষে বিশেষ পুরস্কার

১ম পুরস্কার ১০০৲ মূল্যের, ২য় পুরস্কার ৫০৲ মূল্যের ও ৩য় পুরস্কার ২৫৲ মূল্যের "হাইকো" বস্ত্রাদি। ১৮ই ভাদ্র হইতে ১৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ও তদূর্দ্ধের ক্যাশমেমোগুলি লটারীর টিকিট বলিয়া গণ্য হইবে। লটারীর তারিখ ১১ই অগ্রহায়ণ—৫ ঘটিকা।

রিবেট :—৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত টাকা প্রতি দশ পয়সা।

হাইকো ফেব্রিক্স্ এম্পোরিয়ম

৭৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৬

(উল্কা সিনেমার বিপরীত দিকে।)

জার্মানীর চলচ্চিত্র

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জার্মানীর অবদান যেমন অবিস্মরণীয়, বিশ্বের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও জার্মানীর ভূমিকা তেমনি অনন্য। গ্যেটে, শিলার, হাইনে প্রমুখ জার্মান সাহিত্য-রথীদের রচনা বিশ্ববাসীকে যেমন মুগ্ধ অভিভূত করেছে; প্লাঙ্ক, আইনষ্টাইন, হাইসেনবার্গ প্রমুখ জার্মান বিজ্ঞানীদের অবদানে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে; জার্মান চলচ্চিত্রের অনন্য পরিচয় তেমনি বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করেছে।

চলচ্চিত্র জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই জাতির ঐতিহ্য তার সংস্কৃতি, তার সমাজজীবন ও তার জীবনধারা প্রতিফলিত হয়। জার্মানীর চলচ্চিত্রের মধ্যে আমরা জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক-জীবনের এই প্রতিফলনই দেখতে পাই। বিশ্বের অন্যান্য জাতির চলচ্চিত্রের মতো জার্মান চলচ্চিত্রও নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে উত্তীর্ণের পথে নানা বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে অগ্রসর হয়েছে।

নির্বাক যুগ—

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে জার্মান চলচ্চিত্র যে বিশিষ্টতা অর্জন করে তা সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তার ফলে জার্মানীর চলচ্চিত্রে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল। এই স্বর্ণযুগের ব্যাপ্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এবং খ্যাতি এরিক পোমার, ফ্রিৎস লাঙ, আর্নেস্ট লুবিৎসচ্, প্রমুখ প্রযোজক ও ও পরিচালকদের অবিস্মরণীয় অবদান এবং পোলা নেগরী, অস্টা নীলসন ও কোনরাড ভিডট্ প্রমুখ শিল্পীদের অনন্য অভিনয়ের জন্যে।

এরই ফলে বার্লিন সে-যুগে ইউরোপে চলচ্চিত্র নির্মাণের 'রাজধানী' হয়ে উঠেছিল এবং শুধু জার্মানীর নানা প্রান্ত থেকে নয় সমগ্র ইউরোপ থেকে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতারা বার্লিনে সমবেত হতেন তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিশিষ্ট কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।

জার্মানীর এই স্বর্ণযুগের একটি সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র হচ্ছে 'দি ক্যাবিনেট অফ ডাঃ কালিগারী।' চলচ্চিত্রের সাফল্যের মূলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় যেমন অনেকখানি, তেমনি দৃশ্যপরিকল্পনা ও দৃশ্যপটও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জার্মান চলচ্চিত্র জগতের বরীয়ান নেতা এরিক পোমার হচ্ছেন 'ডাঃ কালিগারী' চিত্রের প্রযোজক এবং তাঁরই ক্রস, কোনরাড ভিডট্ ও লিল দাগওভার মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা। এই চিত্রের দৃশ্যপট অঙ্কন করেন খ্যাতনামা শিল্পী রীমান ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ রোরিগ্ এবং তার্ষ। 'ডাঃ কালিগারী' চলচ্চিত্রটি সারা বিশ্বে সাফল্য অর্জন করে—যা ছিল একান্ত অপ্রত্যাশিত। যদিও এই চিত্র নির্মাণের ব্যয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম, তবু পোমার-এর মনে একটা সংশয় জেগেছিল যে অর্থ তিনি বিনিয়োগ করেছেন সেটাই যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। এই চলচ্চিত্রের সাফল্যের মূলে ছিল অভিনব প্রচার অভিযান। প্রচারপত্রে যে ধরণের ব্যঙ্গ কৌতুক ব্যবহার করা হয়েছিল তা ইতিপূর্বে

কখনও করা হয়নি। প্রচারপত্রে শিরোনামা থাকত—'ডাঃ কালিগরী কে ?' 'আপনি কি ডাঃ কালিগরীকে দেখেছেন ?' এই রীতি পরবর্তীকালে প্রচারপত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

'ডাঃ কালিগরী'র কাহিনী একজন অন্ধাচারীকে ঘিরে এবং একজন অন্ধাচারী পৃথিবীকে যেভাবে দেখে তারই প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটিত এই চিত্রে।

এই নির্বাক যুগের আর একটি অনন্য চিত্র হিসাবে প্রশংসিত 'ফোয়ান অফ আর্ক'। এই চিত্রে ক্যামেরার কাক-কৌশল নয়নমনকে বিমোহিত করে। এখানে আলোকচিত্র কেবল শিল্প সুষমা বিস্তার করেনি কিভাবে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে মানবজীবনের অন্তরতমের স্পর্শ লাভ করা যায় তারও পরিচয় দিয়েছে।

চলচ্চিত্র জগতের জগলোকে ওয়াল্ট ডিসনের আবির্ভাবের বহু পূর্বে জার্মানীতে লতে রিনিগার একখানা চলচ্চিত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি তুলি ব্যবহার না করে আলোছায়ার এক অপূর্ব কৌশলে শাদা দৃশ্যপটে কালো ছায়ার মতো অবয়ব ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর সুবিখ্যাত ছায়াচিত্রের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'রাজকুমার আহমেদ'। তিনি প্রথমে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে এই ছায়াচিত্র নির্মাণ করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই ছায়াচিত্র বয়স্কদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

সবাক যুগ—

জার্মানীর চলচ্চিত্র ইতিহাসের নির্বাক যুগকে কলা-সমালোচকেরা একটি স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। নির্বাক যুগের পরবর্তীকালে জার্মানীর সবাক চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচনা করেছে। কিন্তু চলচ্চিত্র কলাকৌশলের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এ যুগের সবাক চিত্র তুলনামূলক বিচারে নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের মানে এখনও উন্নীত হতে পারে নি।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের জীবনবেদ, তার সামাজিক বোধ, নৈতিক বোধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে চলচ্চিত্রে। বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্প তাই নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। নানা কারণে বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে অর্থনীতি ও শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। তার ফলে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ এখন সরকারের সাহায্য ছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না। এইভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী সাহায্য লাভ করে চলচ্চিত্র শিল্প টেলিভিশনের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই জার্মানীতে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। 'ফাউণ্ডেশন অফ দি ইয়ং জার্মান ফিল্ম' নামে এটি অভিহিত। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পগত নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সাহায্য করা এবং প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের সুযোগ করে দেওয়া। এর ফলে প্রতিভাবর তরুণ পরিচালকেরা যাঁরা বর্তমান চলচ্চিত্র পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে পারছেন না তাঁরা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে অগ্রসর হয়েছেন। এই তরুণ পরিচালকেরা অজ্ঞাত অপরিচিত প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বার করে জার্মান চলচ্চিত্রের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে চাইছেন।

জার্মান চলচ্চিত্র শিল্পকে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন না বটে, কিন্তু প্রতি বছর নানারকম পুরস্কার দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতিতে উৎসাহ প্রদান করছেন। মনোরঞ্জক চলচ্চিত্রের জন্যে যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়, তেমনি চিত্রনাট্য ও সংলাপের জন্যেও পুরস্কার আছে এবং সাংস্কৃতিক ও শিশুদের চলচ্চিত্রের জন্যেও পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু শুধু স্বদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে উৎসাহ প্রদান নয়, বার্লিনে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। যে কোনো দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে বার্লিনের 'গোল্ডেন বিয়ার' পুরস্কার লাভ বিশেষ কৃতিত্ব ও গৌরবের পরিচায়ক।

শিশু চলচ্চিত্র—

জার্মান চলচ্চিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানকার শিশু চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু না বললে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জার্মানীতে শিশুদের চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তার মধ্যে চলচ্চিত্র হচ্ছে অন্যতম প্রধান। বর্তমান জার্মানীতে চলচ্চিত্রের শতকরা প্রায় আশিভাগ শিশুদের জন্যে নির্মিত হয়। এর মধ্যে যেমন কাহিনীভিত্তিক চিত্র আছে, তেমনি আছে বিজ্ঞানভিত্তিক চিত্র, রূপকথার চিত্র, নিউজ রীল, এবং তথ্যচিত্র। প্রায় প্রতি মাসে জার্মানীতে শিশুদের জন্য একটি নিউজ রীল নির্মিত হয়।

শুধু স্বদেশের শিশু চলচ্চিত্র নয়, বহির্দেশ থেকেও ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র মাঝে মাঝে আনিয়ে শিশু দর্শকদের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেবার চেষ্টা করা হয়।

শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণকালে পরিচালকদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ একদিকে যেমন শিশুদের মনস্তত্ত্বের ওপর নজর রাখতে হবে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা ও সৌন্দর্যের দিকটিও উপেক্ষা করলে চলবে না। চিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী গুরুত্ব অবরোহের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক চিত্রে প্রধান উপজীব্য হচ্ছে শিক্ষা এবং সেকারণে এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বিরোধ অতি অল্প। পক্ষান্তরে বিষয়ভিত্তিক চিত্রে একদিকে সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং অন্যদিকে শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব দিকে দৃষ্টি রেখেই জার্মানীতে বর্তমানে শিশু চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। রূপকথার কাহিনী রূপায়ণের প্রাচীন পদ্ধতি পরিহার করে এখন নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। এইভাবে তোলা 'দি লিটল মুক', 'দি নাইটার', 'মিসেস হোলী', 'কিং ড্রসেলবার্ট' শিশু চলচ্চিত্রগুলি ছোটদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বহু দেশে এগুলি বিক্রীত হয়েছে।

শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণে পাপেট বা পুতুল অভিনয়ের একটা মূখ্য ভূমিকা আছে। পুতুলের দ্বারা অভিনীত চিত্রে বাস্তব জগতের ওপর যেমন যাদু প্রভাব বিস্তৃত হয় তেমনি বিস্ময়কর ঘটনাবলী বাস্তব হয়ে ওঠে।

শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতারা রূপকথার ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন রূপকথাকে যেমন রূপায়িত করেন তেমনি আধুনিক রূপকথাও চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। সাম্প্রতিক রূপায়িত একটি আধুনিক রূপকথা হচ্ছে 'ডানিয়েল এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন'। এটি হচ্ছে একটি ছোট ছেলের কাহিনী, যার টাই সাইকেল জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করে। শিশু ডানিয়েল জানতে চায় বিশ্ব সাইকেল চ্যাম্পিয়ন 'টুর দ্য ফ্রান্স'-ও কি তার মতো দুষ্টু হয়।

শিশুরা তাদের বাস্তব জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাতেও আগ্রহ অনুভব করে বলে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সব সময় উপযুক্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান করতে হয়। এক্ষেত্রে শিশু বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয়ে তার কাল্পনিক জগতের সঙ্গে কে বৈপরীত্য দেখে সেটা উন্মোচন করা যেমন দরকার, সেই সঙ্গে মানব জীবনের নৈতিক বোধও তার কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক মৈত্রীরচনা—

চলচ্চিত্র শুধু চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষাদানের মাধ্যম নয়, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের একটি প্রধান উপায়। চলচ্চিত্র তারকারা যতই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোন না কেন, তাঁরা তাঁদের জাতীয় সত্তা কখনই ভুলতে পারেন না। তাঁদের ব্যক্তিত্বে ও অভিনয়-শৈলীতে তার প্রভাব দেখা যাবেই। এখনই বিশ্ববাসীর চোখে গ্রেটা গার্বো হচ্ছেন সুইডিশ, চার্লি চ্যাপলিন ইংলিশ এবং মার্লিন ডেট্রিচ জার্মান, যদিও এঁরা তিন জনেই এখন আমেরিকার নাগরিক।

চলচ্চিত্রের মধ্যে সব সময় দুটি জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে; জাতীয় শিল্পসত্তা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রচেষ্টা। এ কারণে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে যৌথ প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে জার্মান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালে জার্মান বিদেশী সহযোগিতায় একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। বর্তমানে বছরে ২০টির বেশি চলচ্চিত্র বিদেশীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে।

এই যৌথ প্রয়াসে ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে জার্মান চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সহযোগিতা সর্বাধিক। ১৯৬৩ সালে জার্মান যৌথ প্রয়াসে যে কটি চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে তার অর্ধেক হয়েছে ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে। সম্প্রতি ভারত-জার্মান যৌথ প্রয়াসে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে।

আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনে চলচ্চিত্রের এই যৌথ প্রয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশের মানুষ চলচ্চিত্রের পাদপীঠে একসঙ্গে কাজ করার ফলে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছেন। এই যৌথ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জাতিগত ভুল বোঝাবুঝি অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের চিন্তাকর্ষক শব্দসজ্জার সমৃদ্ধ প্রচার পত্রের দ্বারাও করা যায় না সহজে। বিদেশী চলচ্চিত্র নির্মাণে যে বহু সংখ্যক জার্মান অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কারুশিল্পীরা সহযোগিতা করছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায় আন্তর্জাতিক মৈত্রী রচনায় জার্মান চলচ্চিত্রের অবদান কতখানি এবং এই মহৎ প্রয়াসে সহযোগিতার জন্যে তাঁরা কত আগ্রহী।

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LIMITED

LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL
RUBBER PRODUCTS IN INDIA

Regd. Office :
"LESLIE HOUSE"
19, Chowringee,
CALCUTTA-13

Head Office (Sales)
60B, Chowringee,
CALCUTTA-20

Branches at :-
AHMEDABAD : BOMBAY : BANGALORE : CALCUTTA : DELHI
GAUHATI : HYDERABAD : KANPUR : KOTTAYAM
LUDHIANA : MADRAS.

সোভিয়েট ছায়াছবি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প খুব বেশীদিন পৃথিবীর সম্পদ বলে গণ্য হয়নি, কারণ পৃথিবীর সুখী সমাজ রাশিয়ার ছবিকে গোড়ার দিকে সোভিয়েটের সমাজ জীবনের বিজ্ঞাপন বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু বস্তুত যে সেটা ঠিক নয়, তার প্রমাণ পাবার পর আজ সাংস্কৃতিক জগৎ, বিশ্বের সকল সুখী সমাজ সোভিয়েট ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একথা ঠিক যে প্রথম যুগে ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবের পরই আধুনিক সোভিয়েট চলচ্চিত্রের জন্ম, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রচার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেই এর ব্যবহার সুরু। মহান্ লেনিনেরও অনুরূপ অভীপ্সার কথাও জানা যায়। জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের কথাকে পৌঁছে দেবার কাজে সিনেমার অংশগ্রহণকে একরা একান্ত আবশ্যক বলে ঘোষণাও করেছিলেন—এবং তখনকার চলচ্চিত্র নির্মাতারা রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে সাহায্যও করেছিলেন,—তাই একেবারে গোড়ার দিকে সোভিয়েট ছবিকে দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজতান্ত্রিক জীবনের মুখর ছবি বলে মনে হতো।

Poem of the sea ছবিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সমাজতন্ত্রবাদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস যেমন এতে প্রতিফলিত হয়েছে—তেমনি এর মধ্যে সুখ জীবনাদর্শকে কত সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে। Height কিম্বা This is how it began ছবি দুটিও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কথাই বলেছে। The house I live in. The communist, the volunteers প্রভৃতি ছবিও তাই। এই ভাবে ছবিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নত দিকের উন্মুক্ত ঘোষণা, মানুষের সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগ এবং জাতিগতভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণের উদ্ভাবনাই এসব ছবিতে দেখানো হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে থেকেই সোভিয়েট ছবিতে শিল্পরূপ ফুটে উঠতে সুরু করে। সোভিয়েট ছবির সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিভা হলো সোভিয়েট চিত্র-পরিচালক আইজেনষ্টাইন (S. Eisenstein)। এঁর কৃতিত্ব হলো 'মন্তাজ' সৃষ্টির ব্যাপারে। পৃথিবীতে সিনেমা চিত্রে আমেরিকার গ্রিফিথস্ সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে 'মন্তাজ' সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ছবির ভাষা আর মানুষের মুখের ভাষা এক নয়; মনের কথা আর মুখের কথা চিত্রে দেখানোর যে কৌশল—কাছ থেকে আর দূর থেকে shot নিলে যে ছবির তিন্নার্থ হয়, আবেদনের পার্থক্য ঘটে, তা গ্রিফিথসই সর্বপ্রথম বিশ্বে সকলের কাছে প্রথম আবিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একথা সত্য; কিন্তু এই জাতীয় মিনিসের সার্থক প্রয়োগ আমরা প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের ছবিতে দেখতে পেলাম এবং তা সর্বপ্রথম পেলাম ঐ আইজেন-ষ্টাইনের তৈরী ছবিতে। তিনি সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন—কিন্তু চিত্রনির্মাণের কৌশলের দিকে তাঁর যখনই ঝোঁক দেখা গেল, একটি সহজাত প্রতিভা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলো। গোটা ছবিতে চরমোৎকর্ষের জন্যে ব্যঞ্জনাকে তিনিই প্রথম আরোপ করলেন। (এবং রাশিয়ার চলচ্চিত্রে এই সার্বিক ব্যঞ্জনাকেই 'মন্তাজ' বলে অভিহিত করা হয়।) এঁর তোলা Battleship potyomkin পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ছবির একটি বলে অভিহিত করা হয়।

October নামক বিখ্যাত ছবিতে সিঁড়িতে গুলি খেয়ে মরার একটি দৃশ্য আছে—কসাক্‌রা গুলি করেছে বিপ্লবীদের একেক জনকে,—সেই দৃশ্যে খুব কাছ থেকে বুকের বড় একটি ছবি—রক্তমাখা, আর্তনাদকাতর, কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রতিমূর্তি—সেই বীভৎস, করুণ অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্পষ্ট উচ্চারণের ব্যঞ্জনায় সুরটি October ছবির সর্বত্র ধ্বনিত করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রোপাগাণ্ডা ছবি ধীরে ধীরে শিল্প-প্রতিভার দ্বারা দীক্ষিত হয়ে চলচ্চিত্ররসিক সকল মানুষের সম্পদ হয়ে উঠতে লাগলো। আমাদের আইজেনস্টাইনের এই ব্যঞ্জনাকৌশল নির্মাণের প্রতি আনুগত্য দেখাতে একটি চিত্রশিল্পী সমাজ গঠিত হয়েছে।

আইজেনস্টাইনের সংগে ব্যাতিমান আরো অনেক পরিচালকের নাম পড়ছে; বিশেষ করে পুডভকিন (V. PuJovkin) এবং ডোভ্‌শেঙ্কোর (A. Dovzhenko) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধীরে ধীরে প্রচারধর্মী ছবি মানবতামুখী হয়ে উঠলো। Mother, The Earth, The childhood of Maxim Gorky, Road to Life প্রভৃতি ছবির কথা এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্বকে জীবনকে মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করার জন্যে যে প্রচার তার প্রয়োজন রাষ্ট্রিক দিক থেকে যতটা, মানবিক দিক থেকে, সুস্থ জীবনাদর্শের দিক থেকে তার চেয়ে কম নয়।

সোভিয়েট জীবনকে মানবিক থেকে রূপায়িত করার জন্য সিনেমা শিল্পীদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বর্তমান যুগে জাতির যাঁরা বরেণ্য শ্রদ্ধার্হ—তাঁদের জীবনচিত্রকে প্রতিফলিত করেও বহু ছবি তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে। The Ulyanov Family ছবি এই প্রসংগে স্মরণীয়। এই সব ছবির সংগে সংগে বিশ্বমৈত্রী নিয়েও ছবি তৈরী করা সুরু হলো। The Unyielding ছবিটি নিজের জন্যে বাঁচার অর্থ শুধু স্বার্থপরতা সূচিত করে না, সমাজ-জীবনকেও সংস্থ করে,—জাতির প্রয়োজনে ব্যক্তিজীবনকে বাঁচিয়ে রাখাই হলো যথার্থ বাঁচা—এই রকম কথাই বলছে।

আজ সোভিয়েট ছবির একটি মানবিক কল্যাণের দিক পৃথিবীর সর্বত্র শ্রদ্ধার সংগে স্বীকৃত। জার্মাণ জাতির হিংসা-ঘৃণার অমানুষ রূপের দিকটি দেখানো হয়েছে Professor Mamlock ছবিটিতে, মানব কল্যাণের দিক থেকে এই ছবি পৃথিবীতে সর্বত্র শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ইদানীংকালে The letter that was not sent কিম্বা The fate of a man প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যেও মানবপ্রেমের অনন্য নিদর্শন রয়েছে।

যুদ্ধকে রুশজাতি যে কি গভীর ও প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে—তার নিদর্শন তাদের সাহিত্যে যেমন ফুটে উঠেছে বা শিল্পের অন্যক্ষেত্রে যেমনভাবেই ধরা পড়ুক সোভিয়েট ছবিতে তাদের যুদ্ধ-জুগুপ্সা সংঘাতিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে ছবি দেখলেই বোঝা যাবে সোটাজাতি যুদ্ধকে কি সাংঘাতিক ঘৃণা করে। যুদ্ধ যে মানবজাতির কত বড় শত্রু—আর কি ধরণের অভিশাপ—তা সোভিয়েটের প্রায় সব ছবিতেই বলা হয়েছে। আমার এতাবৎ উল্লিখিত ছবিগুলিতেই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখানো হয়েছে—কোনোটায় খোলাখুলিভাবে, কোনোটায় বা পরোক্ষভাবে, ইংগিতের মাধ্যমে।

সোভিয়েট দেশে এখন নানারকম ছবি তৈরী হচ্ছে। শুধু যে রাজনৈতিক প্রচার, মানবতার জয়গান, যুদ্ধবিরোধী জিগির—এই সবই চলচ্চিত্রের বিষয়—তা নয়। সামাজিক জীবনের শাশ্বত মানবিক বোধ ও বৃত্তিগুলিকে কেন্দ্র করেও অনেক ছবি নির্মিত হচ্ছে। Other people's children ছবিটির কথা মনে পড়ছে। সামাজিক সমস্যামূলক একটি গল্প নিয়ে ছবিটি তৈরী—অথচ আগাগোড়া মানবীয়

আবেদনে ভরা। এক বিপত্নীকের দুটি কিশোর সন্তান এবং তার এক প্রণয়িনীকে নিয়ে গল্প; প্রণয়িনীটি শিশু সন্তানদের চায় না। শিশুসন্তান দুটি এক বয়স্কা ছাত্রীর অনুগত হয়ে পড়লো, বিপত্নীক পিতা এই ছাত্রীটিকে বিয়ে করে পরে গোটা সংসার ছেড়ে তার পূর্ব প্রণয়িনীর কাছে গেল, আর ঐ ছাত্রী বধূটি অন্যের দুটি সন্তানের সঙ্গে থেকে গেল। কি অভিনয়ে, কি পরিচালনায় ছবিটির উৎকর্ষ বিশ্বের সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। এমনকি হাসির মজাদার উপভোগ্য ছবিরও অভাব নেই সোভিয়েট ইউনিয়নে। Three plus two নামে একটি সাংঘাতিক মজার কমেডি ছবি কিম্বা I bought a Daddy-র মতো হাসির অথচ মানবিক ছবি অদ্ভুতভাবে সকলের আনন্দের কারণ হয়েছে।

এ ছাড়া মানবদেহের প্রাচীন গাথা, উপাখ্যান প্রভৃতি থেকে কাহিনী নিয়ে ছবি তোলা হচ্ছে রাশিয়ায়। আমাদের 'পঞ্চতন্ত্র' থেকেও কয়েকটি গল্প নিয়ে রুশ ছবি তৈরী হয়েছে। The Golden deer নামে যে ছবিটি জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হয়েছিল—তা আমাদের ভারতেরই গল্প নিয়ে তৈরী।

ছোটখাটো feature film নির্মাণের ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাশিয়ার কৃতিত্ব কম নয়। This is my native land ছোট্ট ছবি, ভারতের কয়েকটি বড় সহরে অনুষ্ঠিত film festival উপলক্ষে দেখানো হয়েছিল। এই জাতীয় আর একটি ছবি হচ্ছে Tale of the Don। সোলোকভের ছোট দুটি গল্পের চিত্ররূপ, পরিচালনা করেছেন V. Fetin। আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়ে একটি সুন্দর ছোট্ট ছবি ওখানে উঠেছে, সেটির নাম হলো In memory of India's Great son। এছাড়া Friendship Visit to India. On the ocean's Bed, Dragonfly and the Ant, Eight days in the Sputnik প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য ছোট্ট ছবি। সোভিয়েট রঙিন ছবিগুলি যেমন মনোরম, তেমনি নয়নাভিরাম। জলকেলি সম্বলিত জলনৃত্যের একটি রঙিন ছবি ত' অপূর্ব, বোধহয় অভূতপূর্বও। বড়, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রঙিন ছবি সম্পর্কেও এই একই মন্তব্য খাটে।

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় রাশিয়ার ছবি পুরস্কৃত হয়েছে। Battleship Potyomkin, Mother, The Earth—এই তিনটি রুশ ছবি ব্রুসেলসের চিত্রমেলায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বারোটি ছবির মধ্যে গণ্য হয়েছে। মস্কো থেকে রুশ সংস্কৃতি-মন্ত্রী মাননীয় N. Mikhailov জানাচ্ছেন—"During the post-war years, Soviet films have been awarded with 237 different prizes and honorary diplomas"। ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত কানের দ্বিতীয় ফেস্টিভ্যালে রুশ ছবি The cranes are flying শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং গ্র্যাণ্ড পুরস্কার পায়। And quiet flows the Don—ছবিটিও নানা জায়গায় নানা পুরস্কার পায়।

১৯৫৩ সালের পর থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে ছবি তোলার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ১৯৫৫ সালে যেখানে মাত্র পূর্ণাংগ ৪৫টি ছবি উঠেছিল, সেখানে ১৯৫৮ সালে ১০০টি পূর্ণাংগ ছবি তৈরী হয়। তারপর থেকে প্রতি বছরই নির্মিত ছবির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুধু সংখ্যার দিকে নয় গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকেও সোভিয়েট ছবির দিকে আজ সকলের চোখ পড়েছে।

বর্তমানে ঠিক হয়েছে যে এই ১৯৬১ সালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট ১১৫০০০টি সিনেমা হাউস নির্মাণ শেষ করা হবে—এর মধ্যে পঁচাত্তরই হাজার শুধু গ্রামাঞ্চলে থাকবে—যাতে প্রত্যেক গ্রামের মানুষই নিয়মিত সিনেমা দেখার সহজ সুযোগটুকু পায়। অতি অল্পদিনেই সোভিয়েট চিত্র-শিল্প বিশ্ব সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়াছে।

———

হলিউডের সমস্যা

বিনয় ঘোষ

লাইট হাউসের নিবিবেচার থিয়েটারে একটা বাংলা ছবি দেখানো হবে। পরিচালক একেবারে নবাগত। এইটি তাঁর প্রথম ছবি। বাছাই-করা কিছু পরিমাণ লোককে ছবিটি দেখবার আমন্ত্রণ জানানো হলো। স্থানীয় বিশিষ্ট সাংবাদিকবর্গ এবং কয়েকজন বিদেশীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। ছবিটি সম্বন্ধে সাংবাদিকেরা প্রায় সকলেই উচ্ছ্বসিত হলেও দু'চারজন একটু 'কিন্তু-কিন্তু' করলেন। ছবির কোনও কোনও বিষয় নিয়ে দু'একজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলাম। মতৈক্য ঘটলো না সব ক্ষেত্রে। 'আমাদের দেশের দারিদ্র্যকে বিদেশীদের চোখের সামনে এমন ভাবে তুলে ধরা ঠিক হয়নি'—তাঁরা বললেন। আমি বললাম, 'গল্পের নায়ক কাহিনীই একটি পরিবারের দারিদ্র্যকে জড়িয়ে। তা ছাড়া, মহা ধনীর দেশেও দরিদ্র কিশোরকে অন্ন এবং বস্ত্রের অভাবে (শীতে) মরতে হয়েছে, এমন ছবি ও দেশ থেকে তৈরী হয়ে এ-দেশে এসেছে। গল্পটি বলা হল কত সুন্দর ভাবে, শিল্পের সঙ্গে সত্য কতটা সুসমঞ্জস হয়েছে, এটাই বিচার্য।'

আমেরিকান বন্ধুটি বললেন, ছবিটি অতি চমৎকার হয়েছে। তবে, তাঁর বিবেচনায় কোনও কোনও জায়গায় কিছু কিছু কাঁচি চালিয়ে পনেরো কি কুড়ি মিনিট সময় পরিচালক মহাশয় বাঁচাতে পারতেন।

ঘটনাটা "পথের পাঁচালি" সম্পর্কে।

'পথের পাঁচালি' এবং তারপর 'অপরাজিত' ছবি দুটির পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা। আমেরিকার একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে যে ছবি দেখবার জন্যে দর্শকের ভিড় জমেছিল, তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্যই ছিল প্রধান আকর্ষণীয়। পূর্ব-দেশীয় আজগুবি চীজের চমক নয়।

…নীচের খোপগুলো, সাহপালাকে ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছুলে চার দিকের হাওয়া এসে গায়ে লাগে। চিন্তা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এ সবের বেলাতেও এই সত্যটি প্রযোজ্য। যথেষ্ট পরিমাণে উঁচুতে পৌঁছুতে পারলে এ সবই ক্ষুদ্র সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। দেশের সীমানা, কালের সীমানা, দুটোই।

বিশ বছর আগেও আমেরিকার চিত্রপরিচালক, চিত্রনির্মাতারা বিশ্বাস করতেন, সেই ছবিটিই ভালো ছবি, যেটি তৈরি করা হবে বিশেষ এক পক্ষাংপটে, যার দর্শক হবেন সেই বিশেষ একটি অঞ্চলের নরনারী। "মি রিভার" নামক চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত পরিচালক জাঁ রেণোয়া (Jean Renoir) ঐ কথাগুলি কবুল করেছেন এবং তার পরে বলছেন যে, তখন একটা কথা আমি বেমালুম ভুলে বসেছিলাম। সেই কথাটা হলো। মানুষের দুঃখই, ভুলভ্রান্তির উপলব্ধি কোনও দেশ, কোনও কালের সীমানায় আবদ্ধ থাকে না।'

যা উচুদরের শিল্প, তার আবেদন বিশ্বজনীন। কথাটা এক দিক দিয়ে সত্যি, আরেক দিক দিকে নয়। অর্থাৎ উচুদরের শিল্পের আবেদনটা বিশ্বজনীন হলেও সার্বজনীন যে হবেই, এমন কথা নেই। বরঞ্চ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সর্বক্ষেত্রেই না হলেও) তা হয় না।

ধরা যাক, সত্যজিৎ রায়ের অজস্র ছবির কথা। সবগুলি কি হিট্ হয়েছে? তিনি নিজেই বলেছেন, 'পথের পাঁচালি' ছবিটি সুর আর গল্পটির সুর একগ্রামে বাঁধা। দর্শক সাধারণের চোখে-কানে বেসুর ঠেকেনি। কিন্তু 'অপরাজিত' ছবিটিতে তিনি গল্পের সুরের সঙ্গে অন্য সুর এখানে ওখানে মিশিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস নিশ্চয়ই ছিল, এতে রসভঙ্গ হচ্ছেনা, হচ্ছে রসসৃষ্টি। বিদগ্ধ রসিক দর্শকেরা খুশিই হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘুর দলে। অতএব 'অপরাজিত' ছবিটি অর্থমূল্যের বিচারে, নিজের দেশে, পরাজিত হলো। এ কথা সত্যজিৎবাবু বলেছেন। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল ইউরোপের ফিল্ম ফেস্টিভাল। অল্পের মুখটির ওপর বর্ষীয়সী ঘিয়েই নির্ধারিত হলো। এবং এটাও বোঝা গেল, বাংলা ছবি (শুধু তাই কেন, যে-কোনও দেশের ছবিই) এখন থেকে পরমুখাপেক্ষী হবার দিকেও নজর রেখে চলতে পারবে। এই সম্ভাবনা আর সুযোগ কিছুদিন আগে পর্যন্তও অভাবিত ছিল।

অন্য দেশ থেকেও নজীর নেওয়া যাক।

রসেলিনির 'রোম ওপন সিটি' ছবিটির কী গতি হতো, যদি সেটি হঠাৎ ইতালির রুগ্ন অর্থনীতি পেরিয়ে ভিন দেশের বন্ধুজনের নজরে পড়বার সুযোগ না পেতো! অথচ ঐ বন্ধুজনের অর্থাৎ গুণগ্রাহী কলারসিকদলের সংখ্যা যেমন ইতালিতে, তেমন ফ্রান্সে, তেমনি আমেরিকায় খুব বেশী ছিল না। না-ই থাকলো খুব বেশী। কিছু তো ছিল সবখানেই। রাই কুড়িয়ে বেল। রসোলিনীর মত গুণী প্রতিভার আগুন তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের অনাদরকে বুদ্ধুদ্ বেখাতে পারলো।

সিনেমাশিল্প কোথায় পড়ে থাকতো, যদি এঁদের মত গুণী শিল্পীর সৃষ্টি পক্ষবিস্তারের সুযোগ না পেতো। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ক্ষেত্র হচ্ছে এই পক্ষবিস্তারের মহাকাশ।

ইতাবসরে একবার হলিউডের আকাশটা পর্যবেক্ষণ করা যাক। কিছুকাল যাবৎ ওখানকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা আশাপ্রদ নয়।

প্রতি সপ্তাহে সেখানে দর্শকের সংখ্যা, কমতে কমতে নেমে এসেছে সাড়ে চার কোটিতে। সংখ্যাটিকে আরও উঁচু দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছে। এই পতনের কারণ বহু।

এমন দিন ছিল যখন মোগলাই মেজাজে আকেল গুলার চেলে, অকাতরে তারকার মালা সাজিয়ে ছবি তৈরি করতেন প্রযোজকেরা। দর্শকেরা কাঁপিয়ে পড়তো পতঙ্গের মত, দলে দলে। এখন আর তা হচ্ছে না।

'টেন কমাণ্ডমেন্ট্স' ; 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ্' ; 'দি রিজ অন দি রিভার কোওয়াই' ; 'দি ইয়ার নাইন্স্'—এই সব ছবি তৈরি করবার খরচ বিপুল। প্যারামাউণ্ট ষ্টুডিয়োতে সেসিল বি ডেমিলের পরিচালনায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার খরচ করে তৈরি হলো 'টেন কমাণ্ডমেন্ট্স'। ক্লার্ক গেবল্, জেম্স্ ষ্টুয়ার্টের মত উজ্জ্বল তারকাখচিত চিত্র তৈরি হলো : 'ম্যাণ্ড অব এঞ্জেলস্' আর 'দি স্পিরিট অব সেণ্ট লুই'। শেষের ছবিটি তৈরি করার পরও কিছুটা কম পড়লো, ৬০ লক্ষ ডলার মাত্র। অথচ খরচের অঙ্কেও যখন উঠে এলো না তখন অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো নিশ্চয়ই।

প্যারামাউন্টের জোর বরাত। নইলে 'টেন কমাণ্ডমেণ্ট্‌স' যদি মার খেতো, তা হলে প্যারামাউন্ট ষ্টুডিয়োর দরজায় তালা পড়তো নির্ঘাৎ। এই জাতীয় বিপুল ব্যয়সাধ্য, বিরাটায়তন ছবি তৈরির ঝুঁকি এবং ঝোঁক এখন হলিউড থেকে সযত্নে ও সভয়ে পরিবর্জিত। তার চাইতে অনেক নিরাপদ হলো সাড়ে সাত লাখ, আড়াই লাখ—এমন কি, দেড় লাখ ডলারের বাজেট। এই সব বাজেটের মধ্যে ধরা যেতে পারে: টুয়েন্থ এ্যাংগ্রী মেন; টাইম লিমিট; স্যাট্ নাইট অথবা পরিচালক চায়েফস্কির 'র‍্যাচিলর পার্টি' আর 'দি সক্‌স্'।

হলিউডের এই হাল হবার হেতুটা কী?

মূল হেতু হচ্ছে, টেলিভিশন। তা ছাড়া আছে, ব্যক্তিগত ভাবে ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক প্রযোজকের অভ্যুদয়। আমাদের দেশেও সেটা ঘটেছে। অসংখ্য বয়স্পতি, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে হলিউডের বিরাট বিরাট ষ্টুডিয়ো পড়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুগুলির মত। কর্মচারীদের সংখ্যা, বেতনের পরিমাণ কমানো হয়েছে, প্রায় সবগুলি ষ্টুডিয়োতেই। তাতেও বাঁচোয়া নেই। ডাইনোসরের সদৃশ ষ্টুডিয়োগুলিকে যন্ত্রপাতি আর সাজ সরঞ্জাম সমেত ঠিকঠাক রাখার দায় কি কম? এই সব দামী দামী যন্ত্রপাতি, সাউণ্ড-ষ্টুডিয়ো সব পড়ে রইল অকেজো হয়ে। যেন খেতমজুরী গোরার দায় চেপেছে সবার ঘাড়ে।

স্বাধীন, পৃথক, ব্যক্তিগত চিত্র প্রযোজনার ফলে অনেক ছবিই তৈরি হয়েছে হলিউডের বাইরে। এমন কি, দেশের বাইরে পর্যন্ত। হিসেব থেকে জানা গিয়েছে, শতকরা ৫০ টি ছবি, এমন কি তারও বেশী, তৈরি হয়েছে হলিউডের বাইরে।

'দি ব্রিজ অন দি রিভার কয়াই', 'সায়োনারা', 'এ কেয়ারওয়েল টু আর্মস', 'দি কোয়ায়েট আমেরিকান' ইত্যাদি ছবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

হলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রায় টলোমলো করে তুলেছিল তার ক্ষুদে, কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, টেলিভিশন। আবার এই টেলিভিশনই হাত বাড়িয়ে নিমজ্জমান চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কি ভাবে? বলছি।

হলিউডের যা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি, যার মধ্যে আছে মামুলি গল্প আর মাঝারি-ধরের তারকা, সেই সব ছবি টেলিভিশনে দেখানো হতে লাগলো। দেখানো হতে লাগলো সপ্তাহে প্রতি রাত্রে এবং একই রাত্রে একাধিক বার। সেই একই ছবি আবার সিনেমাতে দেখতে যাবে কে?

প্রতিযোগিতা সুরু হলো। এক দিকে বিরাট-বপু কুস্তিগীর পালোয়ান, অপর দিকে লঘু-দেহ ছুছুন্দর পাঁচ জানা ক্ষুদে পালোয়ান। ফল যা হবার তাই হলো।

টেলিভিশন প্রোগ্রামের খরচ অনেক কম। ঝুঁকিও কম। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সিনেমার চাইতে টেলিভিশন অনেক বেশী অকুতোভয়। অভিনয়ের দিক দিয়েও তাই।

টেলিভিশনের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সিনেমার প্রতি জনসাধারণের টান শেষ কয়ে। 'ইউনিভার্সাল ষ্টুডিয়োর' মত এমন সুপ্রতিষ্ঠ আর নামকরা ষ্টুডিয়ো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হলো।

'রিপাবলিক পিকচার্স' তো সিনেমার পাট তুলে দিয়ে সোজা লেগে গেল টেলিভিশনের ছবি তৈরি করতে।

টেলিভিশনের ছবির জন্যে অভিনেতা, অভিনেত্রী তো চাই-ই; আরও চাই টেকনিশিয়ান; চাই ষ্টুডিয়ো, চাই ডিরেক্টর, চাই লেখক, সম্পাদক—এই সবই। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও স্বাক্ষরিত হলো সন্ধি। হলিউডে ছোটছোট টেলিভিশন ষ্টুডিয়ো তৈরি হতে লাগলো রাশিরাশি। বড় বড় সিনেমার ষ্টুডিয়োগুলি টেলিভিশনের জন্য ভাড়া দেওয়া হতে লাগলো—অবশ্যি খুব খুশি হয়ে নয়। নিরুপায় হয়েই।

সিনেমার কাজে সুনিপুণ, অভিজ্ঞ বহুকুশলীদের নিয়ে লাগানো হলো টেলিভিশনের কাজে। আমেরিকার দুই বৃহৎ টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান, সি, বি, এস, (Continental Broadcasting System) আর এন, বি, এস, (National Broadcasting System) তাঁদের দুই বিরাট 'টেলিভিশন সিটি' গড়ে তুলেছেন একেবারে হলিউডের মাঝখানে।

'আর-কে-ও রেডিয়োর' (R K O-Radio) মত এত বড় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত তার ষ্টুডিয়োর সব কিছু বিক্রী করে দিয়েছে 'ডেসিলু প্রোডাকশনস্' নামক সংস্থার কাছে, টেলিভিশন প্রোগ্রাম তৈরি করাই যাঁদের একমাত্র কাজ।

প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেমার জান, প্রাণ, মান এমনি করে নানা দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এখন তার ক্ষুদে প্রতিদ্বন্দ্বী টেলিভিশনই। বহু লেখক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীও ভিড়েছেন এখন টেলিভিশনের দরবারে। অনেক সিনেমার গল্প আগে টেলিভিশনের পর্দানশীন হয়ে, দর্শকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়ে এনে, তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে সিনেমার কাজে আত্মসমর্পণ করে।

হলিউডের হালচাল চলতির ছবিটা এই রকমই অনেকটা।

সম্প্রতি বার্নার্ড শ'য়ের 'পিগ্‌ম্যালিয়ন' নাটকের নব চিত্ররূপ 'মাই ফেয়ার লেডি' বাজার গরম করে রেখেছে। গীতিনাট্য রূপে বইটি মঞ্চে অভিনীত হতো। হলিউডে নাটকের চিত্ররূপের প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় 'চ্যারিটি' হিসেবে। কার জন্যে এই চ্যারিটি? 'মোশন পিকচার রিলিফ ফাণ্ডের' জন্যে। ঐ শো-য়ের সঙ্গে এক বিরাট 'পার্টির' ব্যবস্থাও আয়োজনও করা হয়েছিল। তারকা-মণ্ডলোচ্ছাসিত সেই ভোজসভায় এক জোড়া দর্শকের আসনের দাম ছিল ২৫০ ডলার।

হালে হলিউডের দুর্দিনের অবসান হতে চলেছে। দুর্দিনের পুনরভ্যুদয়ের লক্ষণ, আশু প্রত্যয়ে হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ম্যারাথন ষ্ট্রীটে প্যারামাউন্ট ষ্টুডিয়োর বন্ধ দরজার পুনরুদ্ঘাটন হয়েছে। এর নূতন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়েল্টনার বহুদিনের পুরোনো লোক, যাঁকে বলে। প্যারামাউন্টের সঙ্গে আছেন সেই ১৯২২ সাল থেকে।

১৯৩৩ সালের প্রথম নয় মাসে প্যারামাউন্টের নেট আয় দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের উপর। ঐ কয় মাসে ইউনাইটেড আর্টিষ্ট-এর আয় হয়েছিল, ইনকম ট্যাক্স বাদে, ৭০ লক্ষ ৫ হাজার ডলারের উপর। আর, একটিমাত্র ছবি ('মেরি পপিন্‌স্') থেকে ডিজনী ষ্টুডিয়ো, কমসেকম ২ কোটি ডলার আয় করবার আশা রাখে।

'মেরি পপিন্‌স্' হচ্ছে ডিজনীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'মাই ফেয়ার লেডি'-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

চলছে। 'পলিন্‌দ্' আর 'কেয়ার লেডি'র মধ্যে ঘটিত ঘরোয়া ঘটনা একটু আছে। 'মেরি পলিন্‌দ্'-এর নায়িকা জুলি এণ্ড্রুজ লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে 'মাই ফেয়ার লেডি'-তে ফুলওয়ালী এলিজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ১৮ মাস এবং নিউইয়র্কে পাকা দুই বছর। এলিজার ভূমিকা ছিনিয়ে নিয়ে গেল অড্রে হেপবার্ণ। জুলি রাজি হয়ে গেল ডিজনীর 'মেরি পলিন্‌দ্'-এ নায়িকারূপে অবতীর্ণা হতে।

চোখের সামনে দিয়ে অতি দ্রুতবেগে পর পর কোনও বস্তুর ছবি যদি চলে যায় তা হলে আমাদের মনে হয়, ছবি নয়, যার ছবি সে-ই নড়ছে, হাঁটছে, ছুটছে। এই দৃষ্টিবিভ্রমকে ভিত্তি করেই বিজ্ঞানী এডিসন তৈরি করেন তাঁর 'কিনেমাটোস্কোপ', ১৮৮৯ সালে। এটা তৈরি করতে গিয়ে এডিসন এক জায়গায় আটকে গিয়েছিলেন। ফিল্ম নামক বস্তুটি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এমন সময়ে জর্জ ইস্টম্যান এলেন ফিল্ম হাতে নিয়ে। এক ইঞ্চি চওড়া, পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক টুকরো ফিল্ম এডিসন কিনলেন হাজার ডলার দিয়ে। তৈরি হলো কিনেমাটোস্কোপ। কিনেমাটোস্কোপের চলন্ত ছবি দেখতে হতো এক একজন করে, ঐ যন্ত্রের ফুটোতে চোখ লাগিয়ে। এডুইন পোর্টার নামে এডিসনের এক ক্যামেরাম্যান এর পরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের তামাসা বাদ দিয়ে, তৈরি করে বসলেন একটা পুরো গল্পের ছবি। নাম দিলেন 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'। এটা ১৯০৩ সালের ঘটনা। সিনেমার নাম তখনও সিনেমা হয়নি। সিনেমার পূর্বসূরি এই বিষয়টি পরিচিত ছিল 'নিকেলোডিয়ন' (NICKELODEON) নামে। ভাঙা গুদামঘরে কিম্বা তজ্জাতীয় অকুস্থলে এই ঘটনা ঘটতো। পাঁচ সেন্টের টিকিট কিনে লোকেরা দেখতে যেতো। দস্তুরমত হিট্ হয়ে দাঁড়ালো ঐ 'গ্রেট ট্রেন রবারি'। তারপর খরস্রোত ব্যাঙের ছাতার মত এই নিকেলোডিয়নের ব্যবসা গজিয়ে উঠতে লাগলো আমেরিকায়।

প্রথম পুরোদস্তুর কাহিনীচিত্র তৈরি হয়েছিল কিন্তু ইউরোপে। বলাবাহুল্য, রঙ্গমঞ্চকে অনুসরণ করা হয়েছিল সে সব ছবিতে। আমেরিকাবাসী হাঙ্গেরিয়ান এডলফ্ জুকর ১৯১২ চার রীলের একটি ছবি আমদানি করলেন ফ্রান্স থেকে। ছবিটির নাম 'কুইন এলিজাবেথ'—স্বনামধন্যা মঞ্চাভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড নেমেছিলেন সেই ছবিতে।

ছবিটি অবশ্যি তেমন ভালো হয়নি। কিন্তু এর পরে যে কয়টি ভালো কাহিনী চিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য, সেগুলিও ইউরোপে তৈরি। একটি হচ্ছে 'কুয়ো ভাডিস্'—ইতালিতে তৈরি, ১৯১৩ সালে। আরেকটি, 'কাবিরিয়া', ১৯১৪ সালে তৈরি; ইতালিতেই। 'কুয়ো ভাডিস্' তৈরির খরচ পড়ে ৯ হাজার ডলার। ১৯১৪-১৫ সালের মধ্যে যে ছবিটি এক লক্ষ ডলার খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে 'দি বার্থ অব এ গ্রেট নেশান'। তখনকার দিনিরিখে এতটা ঝুঁকি নেওয়া দস্তুরমত জুয়া খেলার সামিল। প্রযোজক ডেভিড গ্রিফিথের বুকের পাটা ছিল, স্বীকার করতে হবে। অবশ্যি খেলাতে তিনি হেরে যাননি, জিতেছিলেন এবং ফিরে পেয়েছিলেন বহু লক্ষ ডলার।

এর পরে এলো চলচ্চিত্রের আকাশে তারকার অভ্যুদয়ের যুগ। এই গ্রিফিথই আবিষ্কার করলেন মেরি পিকফোর্ডকে, যখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। তারকার ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত চিত্রাভিনেত্রী সম্ভবতঃ পিকফোর্ডই প্রথমা। এঁকে প্রযোজনা করেই এডলফ্ জুকর তাঁর বিরাট চলচ্চিত্র জগৎ গড়ে তোলেন, পরিচালিত করেন। সেই সঙ্গে পেয়ে নিলেন আরেকজন অসাধারণ প্রতিভাবানকে—চার্লি চ্যাপলিন।

ওয়াল্ট ডিজ্‌নে

সুপর্ণ রায়

ওয়াল্ট ডিজ্‌নে-কে কী আখ্যা দেবেন তাঁর কালের ঐতিহাসিক ? শিল্পী ? শিক্ষাগুরু ? আবিষ্কারক ? না কি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ?

আসলে এর প্রতিটি অভিধাই তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য। তাঁর সম্পর্কে অন্তত একটি বিষয়ে আগামী দিনের ঐতিহাসিকগণ এক মত হবেন : ওয়াল্ট ডিজ্‌নে ছিলেন এমন এক প্রতিভা যিনি চিত্রামোদীদের একই সঙ্গে বিতরণ করেছেন শিক্ষা এবং আনন্দ।

তাঁর ছবির প্রতিটি চরিত্রই আজ বিশ্ববিখ্যাত : মিকি মাউস, বদমেজাজী পার্তিহাঁস ডোনাল্ড, গো কোয়াইট এবং তার সঙ্গী মজাদার বামন, প্লুটো ও কুকুরছানা। দেশ-বিদেশে শুভেচ্ছা-সফরে রত এরাই নতুন মহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত। এরা অভিনন্দন পেয়েছে সর্বত্র। যেখানে গেছে সেখানেই হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেছে, প'ড়ে উঠেছে বন্ধুত্বের স্থায়ী বন্ধন।

ওয়াল্টের মজাদার কার্টুনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এলো সিরিয়াস অভিনেতারা : 'বীবর উপত্যকায়' বীবর সমাজ 'সীল দ্বীপ'-এ সীলমাছের দল, ফগালি পর্বায় দেখা দিলো আফ্রিকার সিংহ, কাঠবেড়ালী, পেরী। এদের একটিও কিন্তু আঁকা ছবি নয়, প্রত্যক্ষ জীবন থেকে আহরিত।

প্রকৃতি-বিদ্যা, ভূগোল, আর ইতিহাসের উৎকৃষ্ট শিক্ষক ওয়াল্টার। টেলিভিশনে ডিজ্‌নের দুটি চরিত্র ডেভিড ক্রকেট আর ডানি শিলো ইতিহাস দেখাবার সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের প্রচুর আনন্দও দিয়েছে।

অতৃপ্তি এবং অস্থিরতা অহোরাত্র দগ্ধ করছে ওয়াল্টের মন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে তাঁর অসীম উৎসাহ। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ওয়াল্টকে 'জর্জ ওয়াশিংটন মেডাল' দিতে গিয়ে বলেছিলেন : ওয়াল্ট ডিজ্‌নে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার দূত···খুব কম লোকই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা তাঁর মতো দিতে পেরেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন যারা পৃথিবীর দূরবর্তী দেশগুলিতেও পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি তাঁদের নেতৃস্থানীয়।

১৯২৮ সালের শরতের এক সন্ধ্যায় নু ইয়র্ক-এর কলোনী থিয়েটর-এ একজন নতুন অভিনেতাকে দেখা গেলো। "স্টীমবোট উইলী" নামে একটি ছবিতে। এইটিই প্রথম সবাক কার্টুন ছবি।

ক্লার্ক গ্যাবলের চাইতেও তার কান দুটো বড়ো, পা দুটো তার ঘরানের মোজার মতো, জো ই ব্রাউনের চাইতেও বিশাল তার মেতো হাসি, দুমুটি তার দোনার। নতুন অভিনেতাটির নাম মিকি মাউস।

সেই রাতে মিকি এবং তার সৃষ্টিকর্তা ওয়াল্ট ডিজ্‌নে-র সেই যে পৃথিবী বিজয় শুরু হলো আজো তা অব্যাহত।

'দি নু ইয়র্ক টাইমস' নতুন ছবিটিকে "অভিনব" বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলো।

এইভাবে জন্ম হলো পৃথিবীর সব চাইতে প্রভাবশালী ইঁদুরটির। মিকি-কে অনুসরণ ক'রে ডিজ্‌নে চলে গেলেন জীবজন্তুর অপরিচিত রাজ্য, বহু দূরবর্তী লোকালয়, সেখানকার মানুষদের দুঃসাহসিক জীবন এবং সেই সব অঞ্চলের ভৌগোলিক সৌন্দর্যের মাঝখানে।

লাফিয়ে লাফিয়ে জন্মের চূড়া থেকে চূড়ায় উঠলো মিকি মাউস—আর পর্দার গায়ে তার আত্মপ্রকাশের আগে সর্বদাই জ্বলে উঠেছে তিনটে কথা: "ওয়াল্ট ডিজনের নিবেদন।"

পনেরোটি ভাষায় লেখা বইয়ে আছে মিকি-র ছবি, টেলিভিশনের 'মিকি মাউস ক্লাব'-এর সে একজন অভিনেতা, এবং ছায়াছবির মায়াপুরী ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা।

ইতালিতে তার নাম টপোলিনো, জাপানে মিক-কি-মা-উ-স্থ, মেক্সিকোতে রেটন মিকি, জার্মানীতে মিকি মৌস, ফিনল্যাণ্ডে মিককি হিরি এবং অন্য অনেকগুলি দেশে শুধু মিকি। পৃথিবীর সবাই তাকে জানে, ভালোবাসে।

ইঁদুর হ'লে কী হবে, মিকি একটি বহুমুখী প্রতিভা। কখনো সে কৃষক, কখনো জাদুকর, আবার কখনো সে প্রেমিক। সে গ্রহ-তারকা, ধূমকেতুর গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বহুবার সে লঙ্ঘন করেছে স্থান কাল আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা। শেষ পর্যন্ত জয়ী সে হবেই। কিন্তু প্রতিবারই প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক জাহাজ এবং বিমানের গায়ে মিকি-র ছবি আঁকা থাকতো। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রেও ছিলো তার অবারিত গতি।

থাইল্যাণ্ডের রাজা ভূমিফুল ওয়াল্ট ডিজনে-কে উপহার দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমার সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে এই সম্মানে ভূষিত করছি, কিন্তু আমার অন্তরের নিবেদনও রইলো এর সঙ্গে। একেবারে শিশুকাল থেকে আমি আপনার কার্টুনের অনুরাগী।"

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসের ভেতরে মিকি-কে আনবার বাণী আনিয়েছিলেন। ব্রিটেনের বিধবা রাণী মেরী যখনই সিনেমা দেখতে যেতেন, পর্দার গায়ে মিকি-কে দেখবার প্রত্যাশা রাখতেন।

ওয়াল্টার এলিয়াস ডিজ্‌নে মানুষটি এবং ইঁদুর মিকি মানবজাতির উপরে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে 'ডিজ্‌নে সংগঠন' লাভ করেছেন সাত সো পুরস্কার। মিকি, ডোনাল্ড, কুকুর গুফী, এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি যে আন্তর্জাতিক ঐক্য কতখানি প্রতিষ্ঠা করেছে তারই পরিচয় দেশ বিদেশের ওই অসংখ্য উপাধিতে।

নিজেকে কখনোই শিক্ষাদাতা মনে করে না ওয়াল্ট, বরং কেউ ওই আখ্যা দিলে সবিনয়ে আপত্তি জানান। তথাপি, পশুজগৎ নিয়ে যে ক'টি ছবি তিনি তুলেছেন এবং যাদের তিনি বলছেন ইুলাইফ অ্যাডভেনচার্স, সেই ছবিগুলি শিক্ষাবিদদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'সীল আইল্যাণ্ড', 'ইন ব্রীডার ভ্যালি', এবং 'দি লিভিং ডেসার্ট' তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর। এই সব ছবিতে মানুষের কোনো রকম চিহ্নই তিনি রাখেননি। বেড়া, গাড়ির চাকার দাগ, বাড়ি-ঘর, টেলিগ্রাফের তার—সব অনুপস্থিত। এই পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে পশু-জগতের অতি ঘনিষ্ঠ চিত্রের সমাবেশে তাঁর ছবিগুলি হয়ে উঠেছে অতি উপভোগ্য। অতি সহজেই তারা কোটি কোটি মানুষের মন জয় ক'রে নিয়েছে।

তাঁর নির্মিত ট্রু লাইফ অ্যাডভেনচার্স : মরক্কোর যাযাবর নীল মানুষ, জাপানের জেলে, শ্যামদেশ, আলাস্কার এস্কিমো, সুইজারল্যাণ্ড, সর্বিত—জঙ্গুর দেশে ডোক্তার্ড শাভিইসের দুঃসাহসিক অভিযান, মহাকাশে মানুষ ইত্যাদি শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নয়, কমুনিষ্ট রাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহুদেশের লাখো লাখো স্কুলে শিক্ষার অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ বিশেষে ছেলে-মেয়েদের অবশ্য দ্রষ্টব্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে।

একদিন একটি বাচ্চা ছেলে ওয়াল্ট ডিজ্‌নে-কে প্রশ্ন করেছিলো : "আপনিই কি মিকি মাউসের চেহারাটা এঁকেছেন?" ডিজ্‌নে স্বীকার করলেন তিনি এঁকেছেন। "ছবির সব মজার-মজার ঘটনা আর কথাবার্তাগুলি তো আপনারই বানানো?"

"তাও নয়।"

ছেলেটি এবার মরিয়া হ'য়ে শুধালো : "তা হলে আপনি নিজে করেন টা কি?"

ডিজ্‌নে-কে অনেকবারই এই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি হেসে চুপ ক'রে থেকেছেন। কেউ নাছোড়বান্দা হ'লে অবাবে বলেছেন : "মাঝে-মাঝে নিজেকে আমার মনে হয় ছোট একটা মৌমাছি। স্টুডিয়োর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াই, আহরণ করি পরাগ, সবাইকে প্রেরণা যোগাই। নিজেকে আমি ব্যবসায়ী ব'লে মনে করি না, শিল্পী তো নয়ই।"

পদের মোহ বা সস্তা খ্যাতির লোভ ওয়াল্টের নেই। অনেককে নিয়ে তিনি কাজ করেন, তাদের কৃতিত্ব স্বীকারে তিনি সব সময়ই পঞ্চমুখ।

পোষা কিংবা চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের মধ্যে তাদের আসল চেহারা খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বন্যেরা বনে সুন্দর' এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন ওয়াল্ট। তিনি তাই ক্যামেরাম্যানদের পাঠিয়েছিলেন দুর্গম অরণ্যে, উত্তুঙ্গ গিরিচূড়ে, তপ্ত মরুভূমির ধূসর রাজ্যে। তাই, জীবজন্তুদের নিয়ে নির্মিত তাঁর প্রতিটি ছবি অমন বাস্তব, জীবন্ত, মর্মস্পর্শী। তাঁর ট্রু লাইফ অ্যাডভেনচার্স কতগুলি বিক্ষিপ্ত বিসর্গ—চিত্র নয়, একটি নিটোল কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত, নাটকীয় মুহূর্তের সমাবেশে রসোত্তীর্ণ।

ওয়াল্ট অতীত উপভোগ করেন, কিন্তু বেঁচে আছেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে। তিনি বিশ্বাস করেন : নিয়ত সৃষ্টি ক'রে যাওয়াতেই মানুষের প্রকৃত জীবন, তার সত্যিকারের আনন্দ। কোনো জিনিস একবার তৈরি হ'য়ে গেলে তা নিয়ে আর কতক্ষণ ব'সে থাকা যায়? তখুনি আবার শুরু করা দরকার নতুন কাজ। নইলে আনন্দ কোথায়?

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প

গোপাল ভৌমিক

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের ঐতিহ্য প্রায় সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর কালের হলেও বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তার স্থান খুব উর্দ্ধে এমন কথা বলা যায় না। সংখ্যাধিক্যের বিচার বা গুণগত উৎকর্ষের বিচার—এই উভয় দিক থেকেই এ মন্তব্য করা চলে। চলচ্চিত্রের প্রায় উদ্ভাবক আমেরিকা আজও চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সকলের পুরোভাগে অবস্থিত। পৃথিবীরও অন্যান্য এমন অনেক দেশ আছে যারা বৃটেনের অনেক পরে চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিয়ে গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে সে ইতিহাস হল কার্যত ক্রমাবনতির ইতিহাস। এখনও লোকরঞ্জনকারী বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের মধ্যে বৃটেনে চলচ্চিত্রের স্থান সর্বাগ্রগণ্য হলেও, তার মহিমা যেন ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছে।

চলচ্চিত্র দর্শনের দিক থেকে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ১৯৪৬ সালটি ছিল বৃটেনের জীবনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এই বৎসর ১৩৫½ কোটি বৃটিশ নরনারী ছিলেন চলচ্চিত্র দর্শক। সে ক্ষেত্রে তার উনিশ বৎসর পরে ১৯৬৩ সালে বৃটিশ চলচ্চিত্র দর্শকের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৭½ কোটি মাত্র। ১৯৪৬ সালে সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের মোট সংখ্যা ছিল ৪,৭০৩টি। এই সংখ্যা কমে ১৯৬৩ সালে মোট ২,১৯৭টিতে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যাতত্ত্ব বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমাবনতিরই পরিসূচক।

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। এর একটি বড় কারণ হিসাবে এগিয়ে দেওয়া হয় চলচ্চিত্রেরই সমগোত্র টেলিভিসনকে। টেলিভিসনের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই পরিমাণে লোকের চলচ্চিত্র দেখার আগ্রহও যাচ্ছে কমে। টেলিভিসনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা মানুষের রুচি বৈচিত্র্য যেমন সৃষ্টি করছে, তেমনই টেলিভিসনের মাধ্যমে ঘরে বসে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পেয়ে মানুষের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার আগ্রহ যাচ্ছে কমে। এ উক্তির যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করা চলে না। সেই সঙ্গে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণও বর্তমান বলে আমি মনে করি। সেটা হল এই যে চলচ্চিত্রকে বর্তমান যুগের প্রয়োজনে বৃটেন এড়িয়ে যেতে না পারলেও বৃটিশ প্রতিভা একে ঠিক আত্মস্থ করে নিতে পারে নি। বৃটেনের নিজস্ব ঐতিহ্য হল তার নাটকে ও থিয়েটারে। এক্ষেত্রে তাকে অনন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের সম্বন্ধে আদৌ সে উক্তি করা চলে না। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বৃটেনের জাতীয় প্রতিভা এই নতুন শিল্প মাধ্যমটিকে ঠিক আত্মস্থ করে উঠতে পারে নি। তাই বলে দীর্ঘ ৭০ বৎসরের জীবনে বৃটিশ চলচ্চিত্রের সুদিন কখনও আসে নি এমন নয়। নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে তার সে সুদিন মাত্র কয়েক বৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল। সেটা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কথা। সে সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা দেশগুলির মধ্যে বৃটেনের স্থান ছিল প্রথম সারিতে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মার্কিন

চলচ্চিত্রের প্রভাবে শীঘ্রই বৃটিশ চলচ্চিত্রের গৌরব হয়ে পড়েছিল পরিম্লান। নির্বাক যুগ সবাক যুগে সে হৃতগৌরব বৃটেন পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। পুনরুদ্ধার করার কোন প্রয়াস যে তার আছে, তাও মনে হয় না। তারও কারণ বোধ হয় এই যে, চলচ্চিত্রকে বৃটেন তার জাতীয় প্রতিভার অঙ্গীভূত করে তুলতে পারে নি। দ্বিতীয়ত বিদেশের বাজারে তো বটেই, খাস বৃটেনের বাজারেও মার্কিন চলচ্চিত্র আজ তার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এ অবস্থার হাত থেকে বৃটেনের মুক্তি পাবারও কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। তার কারণ, এই উভয় দেশের চলচ্চিত্র একই ইংরেজি ভাষায় তোলা। অথচ চলচ্চিত্রের স্বর্গরাজ্য আমেরিকা চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃটেনের চেয়ে সর্বব্যাপারেই অধিক শক্তিশালী। আর্থিক সামর্থ্য, যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ, চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তার সংগঠন প্রভৃতি সকল দিক থেকেই আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃটেনের দাঁড়ানো শক্ত।

মার্কিন চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের নিজস্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই মারাত্মক সম্ভাবনা যাতে না দেখা দেয়, সেই জন্য খাস বৃটেনের প্রেক্ষাগারগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে বৃটিশ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আইন করতে হয়েছে বৃটিশ শাসক কর্তৃপক্ষকে। এই আইনের বলে বৃটিশ প্রেক্ষাগারগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৃটিশ চলচ্চিত্র প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। ১৯২৭ সাল থেকে বৃটেনে এই আইন চালু আছে। এ যেন নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে বাঁচার মত অবস্থা। পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রের প্রথম প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বর্তমান আইন এই যে অন্তত শতকরা ত্রিশ ভাগ বৃটিশ চলচ্চিত্র দেখাতে হবে। ১৯৪০ সাল থেকে এই নির্ধারিত কোটার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নি। এই জাতীয় বিধিনিষেধ আরোপের ফলে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

বৃটিশ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক সংস্থা কর্মরত থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দুটি নাম সুপরিচিত তার একটি হল সুবিখ্যাত র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও অপরটি হল অ্যাসোসিয়েটেড্ বৃটিশ পিকচার কর্পোরেশন। এ দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র বন্টন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কাজে নিরত। এ দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত কোন কোন চিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জন করেছে। বৃটেনের নিজস্ব কাহিনী-চিত্রের গুণগত উৎকর্ষ মোটামুটি উচ্চমানের হলেও মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার পেরে ওঠা মুস্কিল। তবে ছোট ছোট তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটেনে তথ্যচিত্র নির্মাণের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ১৯২৯ সাল থেকে। প্রথম সরকারের তরফ থেকে এই তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়। পরে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই তথ্যচিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তথ্যচিত্র নির্মাণ ব্যবস্থা খুবই সম্প্রসারিত হয়। বৃটিশ তথ্যচিত্রের গুণগত উৎকর্ষ খুবই উচ্চমানের। বহু বৃটিশ তথ্যচিত্রের ভাগ্যে এ পর্যন্ত অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জুটেছে। এ ক্ষেত্রে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের উৎকর্ষ ও অনন্যতা অনস্বীকার্য। ইদানীং কালে টেলিভিশনের ব্যাপক আবির্ভাব এরূপ তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

জাপানি চরিত্র ও চলচ্চিত্র

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

'জাপানে প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এইজন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে।...জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই।'

'জাপান যাত্রী' রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবনচর্যার মিলনভূমিরূপে জাপানকে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'জাপানি বাজে চেঁচামেচি বগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের কলহ করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।...এদের জল ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো শুদ্ধ।...এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে।'

জাপানিদের এই সৌন্দর্যবোধ জীবনযাত্রার সর্বকর্মে বিধৃত রয়েছে। তাঁরা সুন্দরের পূজারী, 'সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পন করেছে'। এই সৌন্দর্য সাধনা জাপানি গৃহসজ্জায় ও জীবন চর্চায় যেমন তেমনি রূপায়িতপর্যায় শিল্পকর্মেও। দেশের চরিত্রটি অভূতপূর্বভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পে প্রকাশলাভ করেছে। জাপানি চরিত্রের যে প্রধানগুণ সংযম, সেই সংযমী মানস জাপানি চলচ্চিত্রেও প্রকাশিত দেখা যায়।

এশিয়ার পূর্বপ্রান্ত ভূমির সাগর পরিবেষ্টিত এই ভূখণ্ডে প্রকৃতি যেমন আপন হাতে সৌন্দর্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তেমনি স্রষ্টা এদের অন্তরের মধ্যে দিয়েছেন সৌন্দর্যচেতনার সংযত শান্তি ও স্নিগ্ধতা। এই স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্যের শান্তি জাপানি চলচ্চিত্রে এক অনাস্বাদিত মাধুর্য বিস্তার করে রয়েছে।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে যেমন আমাদের দেশে তেমনি জাপানেও চলচ্চিত্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই চলচ্চিত্র জাপানে সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অর্থাৎ চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনযাত্রার খতিয়ান কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমান জাপানের মতো ছোট দেশটিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী গৃহ গড়ে উঠেছে ৩,৫৫১টি। আর সব থেকে বিস্ময়কর তথ্য ১৯৬০ সালের হিসেব থেকে জানা যায় যে-এই প্রদর্শনীগৃহে দর্শক সংখ্যা প্রায় ৫১০,০০০,০০০ জন হয়। দর্শক সংখ্যার এই খতিয়ানই প্রমাণ করছে জাপানের চলচ্চিত্র রাজ্যের জনপ্রিয়তার চরম ও পরম বার্তা।

জাপান নিজস্ব ভঙ্গিমায় চলচ্চিত্রের জন্যে বিশ্বচলচ্চিত্র জগতের এক বিশেষ আসনের অধিকারী। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ পেরিয়ে চলছে জাপান চলচ্চিত্র নির্মাণ। এই অগ্রগতি যেমন পরিমাণে তেমনি মূল্যবান রূপে উল্লেখ্য। জাপানে চিত্রনির্মাণের ষ্টুডিওগুলোতে বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছবি তোলা হয়। ১৯৬০ সালে জাপানের মোট ৩৫৭টি ফীচার-চিত্র নির্মাণ করা হয় এবং এর মধ্যে রঙিন ও বিস্ফারিতপর্দায় ছবিও রয়েছে। জাপানের রঙিন চলচ্চিত্র জাপানিদের সৌন্দর্যস্নিগ্ধ রঙিন মনেরই প্রতিফলন। এবং এই চিত্রগুলি যে কত বিশুদ্ধ নয়ন-লোকের সৃষ্টি তা রবীন্দ্রনাথের জাপানি ছবি প্রসঙ্গের মন্তব্যকেই এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি

আধুনিক জাপানের ছবি দেখে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না।' জাপানি নাচের ভঙ্গিমা প্রসঙ্গে বা নারীর সাজপোষাকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে শালীনতার ছাঁচামো দেখেছিলেন তা জাপানি চলচ্চিত্রে পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হচ্ছে। কোথাও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেহদ আবেদন নেই অথচ নারীর ব্যক্তিত্ব ও সহজ সাচ্ছন্দ্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। জাপানি চলচ্চিত্র নরনারীর হাতে হাত মিলিয়ে চলার বহু জীবন্ত আদর্শ উপস্থাপন করেছে।

নতুন নতুন আঙ্গিকে বহু জাপানি চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। বিদেশে প্রদর্শিত জাপানি ছবির অধিকাংশেই দেখা যাচ্ছে আঙ্গিককলা এবং অভিনয়নৈপুণ্যের জন্যেই বিশেষভাবে উচ্চ প্রশংসিত। ১৯৫১ সালে নির্মিত 'রশোমন' কাহিনীচিত্রটি ভেনিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাণ্ড প্রীক্স্ বা শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছে। কেন্স আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সেট অব হল' ছবিটি গ্রাণ্ড প্রীক্স্ লাভ করে। 'দি রিক্স্ ম্যান' কাহিনীচিত্রটিও ভেনিসে ১৯৫৮ সালে পায় গ্রাণ্ড প্রীক্স। বিশ্বের অন্যান্য বহু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও জাপানি চলচ্চিত্র বিশেষ বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে এবং করছে।

জাপানি চলচ্চিত্র নির্মাতারা যেমন ছবি তুলেছেন তেমনি জাপানি চরিত্র ও চিত্রশিল্পে বিদেশীরাও জাপানে কিছু ছবি নির্মাণ করেছেন। এই ধরণের একটি ছবির নাম করা যায় 'ম্যাডাম বাটারফ্লাই'। এটি পাকৃসি'জ পুচিনাটা জাপানি ও ইতালীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় হয়েছে। ফরাসি এবং মার্কিন চিত্র নির্মাতাদের সহযোগিতাতেও কিছু কিছু চিত্র উঠেছে।

জাপান ১৯৬৩ সালে বিদেশে ২,২৪৪ খানি ছবি পাঠায় প্রদর্শনের জন্য। এই ছবিগুলোর মধ্যে ১,৭৩৪টি ছিল কাহিনীচিত্র, ১৪১টি ছিল ছোটোখাটো কাহিনী নিয়ে আর ৩৬১টি তথ্যমূলক চলচ্চিত্র।

জাপানের হক্কু জাতীয় তিনছত্রের কবিতা যেমন অপূর্ব রস ব্যঞ্জনায় ভরা তেমনি জাপানি স্বল্প পরিসরের চিত্রগুলিও ব্যঞ্জনাবহুল ও বর্ণাঢ্য। অল্প চরিত্র কিন্তু সংখ্যাতীত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। জাপানি চরিত্রের নিজস্ব গাম্ভীর্য তাদের চলচ্চিত্রের রূপায়ণপর্যায়ে বেশ স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। জাপানিদের গৃহসজ্জায় ফুলের ব্যবহারে যে নিপুনতা ও সৌন্দর্যবোধ তাই অন্যরূপে চলচ্চিত্রে সৌন্দর্যের রূপ ও রঙের সমন্বয় সাধন করছে।

পাশ্চাত্যদেশ দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববাজারে আপন শিল্প সামগ্রীর পশরা সাজিয়েছে এবং বেশ উঁচুদরের আসনও অধিকার করে কিন্তু জাপান প্রাচ্যের শিল্প সুষমার ভাণ্ডার দুহাতে বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়েছে। সেইদিক দিয়ে জাপান প্রাচ্যের পূর্বপল্লী হয়েও পাশ্চাত্যের ভুবনজোড়া মহিমাকে নিজের কর্মের গৌরবে আচ্ছন্ন করেছে।

এইখানেই জাপানি চরিত্র সার্থকতায় উপনীত এবং সেই সার্থকতা তাঁদের অন্যান্য শিল্পের উৎকর্ষের মতোই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সফলতার শিখরে আরোহণ করতে সর্বদাই অগ্রণী।

———

সোফিয়ার দেশের চলচ্চিত্র

=(ইতালি)=

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতালি দেশটায় এলে আমাদের মনে হয়, আমরা মানবিক-প্রকৃতি-সমৃদ্ধ দেশে এসে হাজির হলাম। জনদরদী ও অন্তরাবেগ এই দুটি জিনিস এখানকার লোকেদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিদেশীরা এখানে এলে পরিচয় পাবেন এক উষ্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয়।

শিল্প ও সাহিত্য বুঝি ইতালির রক্তের লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা। সেই সীজারের সময় থেকে আজ অবধি মানবিকতা বোধের সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্য ইতালিয়রা সযত্নে লালনপালন ক'রে আসছেন। বিশ্বের দরবারে ইতালির অবদান কী, সেকথা যখন কোন বিদেশীর চিন্তা করতে বসেন, তখন যে-কথাটি প্রথমেই ওঁর মনে আসে তা হ'ল ইতালির রেনেসাঁসীয় চিত্রকলা ও অপেরাশ্রেণীর সঙ্গীত। এবং এই দুটি ক্ষেত্রে ইতালির আজও তুলনা বিরল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দুই শতাব্দী ধরে এই দেশ প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের সুসজ্জিত স্টুডিয়ো হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। সেই যুগটি যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন ইতালির সৃজনী ক্ষমতা চালিত হতে দেখা গেল সুর ও অভিনয়ের খাতে।

যতদূর জানা যায়, চলচ্চিত্র ইতালির অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্পসৃষ্টি। জাতশিল্পী এই ইতালিয়ানরা—যেমন ভাস্কর্য, যেমন চিত্রকলা, তেমনি সুরের এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এঁদের পারদর্শিতা দর্শনীয়। শুধু গানে এরা বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, তার সঙ্গে কালক্রমে যোগ করলেন অভিনয়। সৃষ্টি হল অপেরা বা গীতিমূলক অভিনয়ানুষ্ঠান। কিন্তু অপেরাকে অতঃপর সম্মুখীন হতে হল আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী হল সিনেমা।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আমরা দেখতে পাই, সিনেমার ক্ষেত্রে ইতালি এগিয়ে চলেছে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে। ইতালিয়ানরা বোধহয় দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল, সিনেমা-শিল্পের শৈশবদশা ঘোচাতেই হবে। তার ফলে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, চলচ্চিত্র-শিল্প ওখানে অন্যতম প্রধান শিল্প। সিনেমা ক্ষেত্রের নানাদিকে নানাধরণের প্রতিভা অনেক আবিষ্কার হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আজ আমরা দেখছি, ওঁরা সিনেমার মধ্যে 'আর্ট' ও 'ইণ্ডাষ্ট্রি' উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করেছেন। 'ইণ্ডাষ্ট্রি' হিসেবে আমেরিকার ঠিক পরেই আজ ইতালির স্থান।

হলিউড নানা দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীর মিলনক্ষেত্র। ইতালির অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেকেই গিয়েছেন হলিউডে। ওঁদের মধ্যে নামও করেছেন অনেকে যথেষ্টই। ওঁরা যদি নিজের দেশে থেকে ইতালির চলচ্চিত্র শিল্পের সেবায় রত থাকতেন তাহলে ইতালির শিল্প আরো উন্নত হত অবশ্যই। তবে একথাও আমাদের মনে হয় যে, প্রতিভাবানদের দেশ থেকে দু-দশ জন প্রতিভাবান কমে গেলেও দেশ দেউলিয়া হয়ে যায় না। বিশ্বযুদ্ধের পর এই কয়েকটি বছরেই ওঁরা সিনেমাকে আর্টের পর্যায়ে তুলতে পেরেছেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

এর মূলে কিন্তু বিশ্বযুদ্ধেরই একটা অংশ আছে বলে মনে হয়। রবার্তো রোজেলিনী, লুইগি জাম্পা, ভিত্তোরিয়া ডি সিকা—এঁরা কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাধর খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক। এঁরা যখন সিনেমা মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন স্টুডিয়োর অসুবিধা ও অর্থের অভাব পদে

পথে এঁদের বাধা দিয়েছে। অতএব তাঁরা বাঁধা হলেন নিজস্ব দৈহিক সৌন্দর্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে। এর ফলে যা সৃষ্টি হল তা হল এক মনোজ্ঞ ক্লাসিক-সিরিজ বা প্রদর্শনী শিল্প। সারা জগতে এই শিল্পসৃষ্টির সুবাস পড়ল ছড়িয়ে।

কিন্তু মোহ্য মোহী কিৎ পারল না। ইতালির এই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টিও ইতালিতে জনপ্রিয়তা পেলনা। যেন একটা চমৎকার জিনিস এক রকম মাঠেই মেরে গেল বলতে গেলে। ফলে ইতালির সিনেমা শিল্পকে পা বাড়াতে হল হলিউডের পথে। জীবনরসপূর্ণ তৈ চৈ ফাপানো সস্তা চটুল জনপ্রিয় ছবি তৈরি করতে লাগল মাইকেলেঞ্জেলোর দেশের লোকেরা।

মুসোলিনীর ইতালিতে মেয়েদের স্থান ছিল পুরুষদের নীচে। ১৯৪৭ সালে ইতালির যে নতুন সংবিধান হল তাতে মেয়েদের দেওয়া হল অনেকখানি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। অপেক্ষাকৃত নীচু শ্রেণীর মেয়েদের, অর্থাৎ যারা সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ে, 'টপ্ সোসাইটি'র নয়,—তাদের পক্ষে আরেকটি প্রবল প্রলোভনের যোগাল সিনেমা। এর মধ্যে দিয়েই তারা যেন একটা মুক্তির আনন্দ পেলে। আমেরিকান ফিল্মগুলোতে তারা দেখতে লাগল,—চাকুরে মেয়েরা কীভাবে এবং কতভাবেই না উন্নতি করছে জীবনে। নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের খুশিমত পেশা গ্রহণ, স্বীয় রুচি অনুযায়ী জীবন যাপন, পছন্দসই মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধা, যথেচ্ছ প্রচুর উপার্জন ও খরচ করা, সুদর্শন সুপুরুষ 'অ্যাডমায়ারার'রা সহলাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকা—এককথায়, যাকে বলে পরিপূর্ণ 'গ্ল্যামার লাইফ'। অতএব ইতালির মেয়েরা যে সেদিকে ঝুঁকবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে ধারণাটা চলিত আছে, তা আছে ইতালিয়ানদের মধ্যেও। অর্থাৎ এই লাইনে চটপট মানি নামযশ হওয়া যায়। যায় বড়লোক হওয়া। বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালির যে নবজন্ম হল তার ফলে একদল বিশ্ব-রূপসীর হল অভ্যুদয়—যারা আগে ছিল নগণ্য, দেখতে দেখতে তারা হল চিত্রতারকা। এই হঠাৎ খ্যাতি এনে দেবার ক্ষমতা আছে বলেই ভারতের মত ইতালিতেও সিনেমার প্রতি মানুষের এত মোহ। সোফিয়া লোরেন ও জিনা লোলোব্রিজিডার নাম আজ সারা জগতে ব্যাপ্ত, তাঁদের সৌন্দর্য আজ কিংবদন্তী, তাঁদের পয়সা আজ কে গোণে! প্রথম দিকে কিন্তু এঁদের মত 'স্টার'-দেরও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ে অনেক কিছু উৎসর্গ ক'রে তবে উন্নতি করে হয়েছে।

১৯৫০ সালে এক রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রতি দশজন ইতালির মেয়ের মধ্যে সাতজনই সিনেমা, স্টার হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, রেখে সেই স্বপ্ন। আর কত গরিব মা-বাবাই যে তাঁদের উঠতি বয়সের মেয়েদের সিনেমার নায়িকা হবার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছেন, তার বোধহয় ঠিক-ঠিকানা নেই। কারণ এ চেষ্টা সফল হলে সংসারের ও জীবনযাত্রার হাল ফিরবে, সুখের মুখ দেখতে পাবে তারা।

হলিউডকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে অতিক্রম করতে না পারলেও ইতালি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে। তার কল্পনাশক্তি ও সৃজনী প্রতিভা চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা বজায় রেখে ক্রমাগ্রসরমান। হয়ত এখনও তার সৈশবাবস্থা কাটেনি, কিন্তু সামনের দিকে পদক্ষেপ তার সুদৃঢ়, লক্ষ্য অটুট ও স্থির। চটুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সৃষ্টি না করুক, শিল্প-সম্মত চলচ্চিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতালি যে একসময় না একসময় অগ্রণী হবেই, তা অসংকোচে বলা যায়।

———

ফরাসি চলচ্চিত্র

উমা দেবী

পাহাড় সমুদ্র নদী আর দ্রাক্ষাকুঞ্জবন-শোভিত সুন্দর এই ফরাসি দেশটির কথা ছেলেবেলা থেকে স্বপ্নময় হয়ে কার না মনে হয়েছে? এদেশের শিল্পচেতনা আর শিল্পসাধনা—জীবনের বড় কাছাকাছি আবেগময় অথচ সুন্দর এবং সংবিদ্‌বিলম্বি।

ফরাসি দেশের তথা পৃথিবীর সকল দেশেরই চলচ্চিত্রের ইতিহাস আধুনিক কালের। এত আধুনিক যে এর অন্যান্য শিল্প-কলা ভগিনীদের কাছে নিতান্তই অপোগণ্ড বললেই হয়। বাল্যলীলা কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে এই শিল্পকলা তারুণ্যে উপস্থিত হল—বয়ঃসন্ধি নজরেই পড়ল না। যার আদিপর্ব সুপ্রাচীন অতীতের শিলালিপিতে নেই—তার কোনো কৌলীন্যও নেই। কিন্তু আধুনিক মনের কাছে যেমন "কংসরাজের বংশধরের" পরিচয়পত্র কোনো গৌরব বহন করে না—তেমনি আধুনিক কলাবিদের কাছেও অতীত বলেই যে মূল্যবান তা নয়—অতীত সর্বদাই মূল্যবান ইতিহাসের চোখে।

কিন্তু সত্যসত্যই কি বলছি চলচ্চিত্রকলা একেবারে ছুঁইকোড় শিল্প? না—তা নয়। একটা তুলনা দিলে বলা হয় না—"সোনার পাথর বাটি"র তুলনা। সোনার পাথর বাটি হয়তো কল্পনা মাত্র—কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে এই উপমাই প্রযোজ্য। চিত্রকলা ও অভিনয় কলা—দুই মিশিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের আবির্ভাব। তবে দুই তারা মিলে এক মুক্তাহার হয়নি—এ একেবারে এক তৃতীয় তারার উদয়। চলচ্চিত্র শিল্পের এই তৃতীয় তারকা আধুনিক মনের আমোদ-পিপাসা ও শিল্পতৃষ্ণা দুইই মিটিয়েছে।

কিন্তু সব শিল্প সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য—অর্থাৎ এ মেটায় রসের তৃষ্ণা। শিল্পের বিশিষ্ট প্রকাশ প্রণালীতে শিল্পগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য—আবেগ ও আঙ্গিক—এ দুটির মধ্যে প্রথমটি উপেয়—দ্বিতীয়টি উপায়।

চলচ্চিত্রকলার আর একটি এর যৌথ-শিল্পত্বের ব্যাপকত্ব। প্রায় তিন শ' বিভিন্ন শিল্প আর কর্ম প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এর সাধনাসিদ্ধি। এত বিভিন্ন প্রকার মানবচিত্তের রঞ্জন ও অনুরঞ্জনে যার প্রকাশ তার রূপমহিমা যে সর্বাগ্রগণ্যের মধ্যে অন্যতম তা স্বীকার করতেই হবে।

পূর্বেই বলেছি আবেগ ও আঙ্গিক—এই দুটি যে কোনো শিল্পকলায় যথাক্রমে উপেয় ও উপায়। উপায় যাতে উপেয়কে ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে ফরাসি শিল্পীচিত্ত সজাগ। ফরাসি সিনেমার অন্যতম গুরু রেনোয়া এই কথাই বলেন যে, আর্ট যদিও বক্তব্যের চাইতে রূপোদ্ভাবনা এবং স্টাইলের প্রকাশ যদিও খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মনই পরিচালকের ধ্যানের ধন। তাই চরিত্রগত আবেগের তাৎপর্য সঠিক দেখাতে হবে—এবিষয়ে টেকনিক যেন সহায়তা করবে মাত্র—কিন্তু টেকনিকের বাড়াবাড়িটা পরিহার্য। আমেরিকার ঠিক এর উল্টোটিই ঘটে—সেখানের হৃদয়ের চেয়ে কলাকৌশলের দাম বেশি।

ফরাসি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর প্যারিসের গ্র্যাণ্ড কাফেতে। প্রথম প্রথম বহিঃপ্রকৃতির মূকাভিনয় সামরিক ঘটনাবলীর চিত্ররূপ এবং তথ্যমূলক চিত্র পরিবেশন ছিল এর মুখ্য ব্যাপার। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Georges melie's-এর শিল্পরূপ প্রকাশ করবার

চেষ্টা করলেন। সবাকারের শিল্পসৃষ্টি প্রথম ঘটল Charles Pathe-র হাতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে থেকে বিশ্ব বাজারে ফ্রান্সেরই একচেটিয়া অধিকার হয়েছিল বলতে অত্যুক্তি হবেনা। ১৯২৯ সালে ৭২টি ১৯৩০-এ ৯০টি, ১৯৩১-এ ১৫৯টি এবং ১৯৩২-এ ১৭৭টি ছবি ফ্রান্সে তৈরি হয়। Rene clair, Gicquer feyder, Julien Duvivier এবং Marcel Carne'-র নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের সময় সিনেমা শিল্পের সৌভাগ্য আবার ফ্রান্সে ফিরতে সুরু করল। কিন্তু কিছুদিনের জন্য মাত্র। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ ফ্রান্সের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগ। Marcel Carne-র Les Enfants du Paradis এবং Portes de la Nust নামে দুটি চিত্র, Rene' clement-এর La Bataille de Rail নামক চিত্র, Clande Autant Lara-র Le Diavle an corps নামক চিত্র এবং Chistian Jaques-এর Barhe-Blene বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে ফ্রান্সের হলে অবস্থানকার ক্রমেলার ডিমিয়ে, গ্রাস ইত্যাদি স্থানে। ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালেও অনুরূপ সম্মান পেল ফ্রান্সের কয়েকটি চলচ্চিত্র। ১৯৫০ সালে যেসব চিত্র সম্মানলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Collette Andry-এর Gigi H. G. Clonzot-এর Manon এবং আরোও অনেকগুলি চিত্র—যেমন Rendezvous avec la chance, La Beaute du Diable, Justice est faite ইত্যাদি।

এখন রঙিন ছবি তোলাতেও ফরাসির জুড়ি কম।

সাম্প্রতিক কালে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জাঁ রেনোয়ার নাম জানে না—এমন লোক কমই আছে। শিল্পী হিসাবে রেনোয়ার মহত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এই বিখ্যাত সিনেমাশিল্পী কিছুকাল আগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন "The River" ছবিনির্মিতির কাজে। সেই সময় এদেশের অনেকের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল এবং সেই প্রসঙ্গে সিনেমা-শিল্প তাঁর মতামত জানবার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

আপনিও একজন সৈনিক—

এই রণহুঙ্কারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনি কি করছেন ?

Bengali DA 61/61

। পূর্ব্ব রেলওয়ের জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক আগে থেকেই পরিচিত তাই নিয়ে মহৎ শিল্প নির্মিতি সহজ ও স্বাভাবিক—এমন কথা যখন পড়ি তখন আমাদের ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের সিদ্ধরসের কথা মনে পড়ে। দুর্গতির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ শিল্পের বিকাশ—এমন কথা চেখভ-মনের চমক লাগায়।

জাঁ রেনোয়া সেদিন যিনি বিখ্যাত ফরাসি চিত্র পরিচালক এবং ইউনেস্কোর ফিল্ম ডিভিসনের প্রধান কর্মকর্তা,—চলচ্চিত্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে, চলচ্চিত্রকে আবার মানুষের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মানুষে মানুষে—জাতিতে জাতিতে (বুঝি বা অতীতে ও বর্তমানেও) মৈত্রীর বন্ধনে শিথিল হয়ে গেছে তাকে আবার সুদৃঢ় করে তোলার দায়িত্ব চলচ্চিত্রশিল্পের।

ফরাসি চলচ্চিত্রশিল্পে শুধু ফরাসিদের কথাই কথা বলা হয়নি, সর্বমানবের কথাও বলা হয়েছে। ফরাসি চিত্র "লুসে তোয়া জ পারি", "আ জ দা সিবর্তে", "মা প্রাঁদ ইলিউসিঁও" "রঞ্জা" বা "জাঁ কার্দে জ বাল" ইত্যাদি চিত্রই তার প্রমাণ।

রেনোয়া, কার্নে, ক্লাভিলিয়ে, প্যাগোল ইত্যাদি প্রবীন ও প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকেরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন—এখন সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছেন—ভাদিম কারগানভ, জাঁ রেনোয়া, জর্জ ফ্রাঞ্জো ইত্যাদি নবীন পরিচালকেরা। এঁদের চিত্রশিল্পে বাস্তবিকতার প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ সহজেই লক্ষ্য হয়।

বর্তমানে সিনেমা শিল্প ক্রমে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকলার অনুশীলনে স্তিমিত নয়—এর সঙ্গে সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্রকলার সুন্দর কারুকাজও এসে মিলেছে।

অতি আকর্ষণীয়

পূজা কনসেসন

শতকরা ১০৲ টাকা কমে বাঙ্গালোর
বেনারসী এবং সিল্কের শাড়ী

• •

শতকরা ১৫৲ টাকা কমে
কয়েম্বাটোর লক্ষ্ণৌ এবং সুতীর
ছাপা শাড়ী

• • •

শতকরা ২৫৲ টাকা কমে
রকমারী চাদর বিশেষ করে
বোম্বাই চাদর

আজই আসুন

বেঙ্গল ষ্টোর্স লিঃ

(ভাপ নিয়ন্ত্রিত)

৮এ, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা-১৩

• পূজা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে।

With Season's Greetings

From Manufacturers of :

CROWN BRAND

ALUMINIUM WARES &
ANODISED ARTICLES

Brighten your home with
choicest articles

IN EYE PLEASING COLOURS

Visit Our Showroom
For Your Festival Shopping

JEEWANLAL (1929) LIMITED

Crown Aluminium House
23, Brabourne Road, Calcutta-1

আপনি কোন্ পত্রিকা পড়েন ও কেন পড়েন ?

একদিন হয়তো এই প্রশ্নের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা সার্থকতা ছিল না কিন্তু আজ জগতের ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শুধু আপনার আমার নয়, সমস্ত জাতির ভাল-মন্দ উত্থান-পতন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে।

আপনি কোন্ পত্রিকা পড়েন ? কি ভাবে পড়েন ? হাতের সামনে সুবিধা মতন যখন যে পত্রিকা পান, তাই পড়েন ? না বিশেষ কোন পত্রিকা আছে, যা না পড়লে মনে হয় দিনটা ফাঁকা ফাঁকা যাচ্ছে।

শুধু একা আপনার কথা নয়। আপনার বাড়ীতে, আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা তাদের হাতে কোন্ পত্রিকা আপনি পড়তে দেন ? এমন কোন একখানা পত্রিকা পেয়েছেন কি, যা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় আপনার বাড়ীর সকলে পড়তে পারে এবং সকলেই সমানভাবে তা থেকে আনন্দ আর শিক্ষা পেতে পারে ?

আপনি যে-পত্রিকা পড়েন বা আপনার ছেলেমেয়েদের হাতে যে-পত্রিকা ধরে দেন, ভেবে দেখেছেন কি তাতে আপনার ও তাদের মনের চাহিদা মিটছে কি না ? সে কি শুধু অবসর-বিনোদনের খেলা ? না, তা থেকে আপনি আপনার মনের তৃপ্তি, অবসরের আনন্দ, চিন্তার খোরাক, জীবন-পথের পাথেয়র সন্ধান পান ? সে-পত্রিকা কি আপনাকে এনে দেয় আপনার জাতির, আপনার সমাজের, আপনার সাহিত্যের আধুনিকতম সংবাদ ? সে-পত্রিকা কি আপনার জীবন-যাত্রার পথে এগিয়ে চলার সহায় হচ্ছে ? সে-পত্রিকা কি আপনার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারার রূপ ফুটিয়ে তুলছে ও তুলে ধরছে আপনার সম্মুখে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহা সম্ভাবনার ইঙ্গিত ? যদি তাই না হয়, তাহলে সে-পত্রিকা পড়বার সার্থকতা কোথায় ? নিজের মনের অন্তঃপুরে এবং নিজের বাড়ীর অন্তঃপুরে যে-পত্রিকাকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই দাবী আছে। সে-দাবী কি সে-পত্রিকা মেটাতে পারছে পূর্ণ মাত্রায় ? আজ পত্রিকা কেনবার

সময় আপনাকে এই সব কথা নিজের মনে ভেবে দেখতে হবে। আজকে আপনাকে আমাকে নিয়ে একটা নতুন জাতি গড়ে উঠ্‌ছে আজকে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের যাচাই করে নিতে হবে।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে, এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, একুশ বৎসর পূর্বে, বাঙালীর সমস্তাবহুল জীবনের সন্ধিক্ষণে 'গল্প-ভারতী' আত্মপ্রকাশ করে জাতির মানসিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বিপন্ন লগ্নে 'গল্প-ভারতী' জাতির নব জাগরণের এক মহৎ আদর্শ তার প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে। জাতির উন্নয়নের কাজে সাহিত্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'গল্প-ভারতী' বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সঞ্জীবনী সুর ধ্বনিত করে তুলেছে এবং আপনার অন্তরের চাহিদা মেটাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

'গল্প-ভারতী'র পরম সৌভাগ্য যে বাংলার প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তানায়ক এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যরথীই 'গল্প-ভারতী'কে তাদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ করে আসছেন এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই আজ 'গল্প-ভারতী' বাংলার মানসিক জগতে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে, ও সাহিত্য জগতে এক গৌরবময় নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সাহিত্য সাধনার ব্রতে আমরা আপনার একান্ত সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

আজ আমরা সারা ভারতে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে 'গল্প-ভারতী'কে পৌঁছিয়ে দেবার এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। আপনি বাঙালী, আমাদের একান্ত অনুরোধ, নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের মহা সম্ভাবনাপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অর্ঘ, মহা আদর্শের বাহক 'গল্প-ভারতী'র পাঠক হয়ে ঘরে ঘরে তার বার্তা প্রচারে সহায়তা করুন!

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিঃ
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা-৬

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

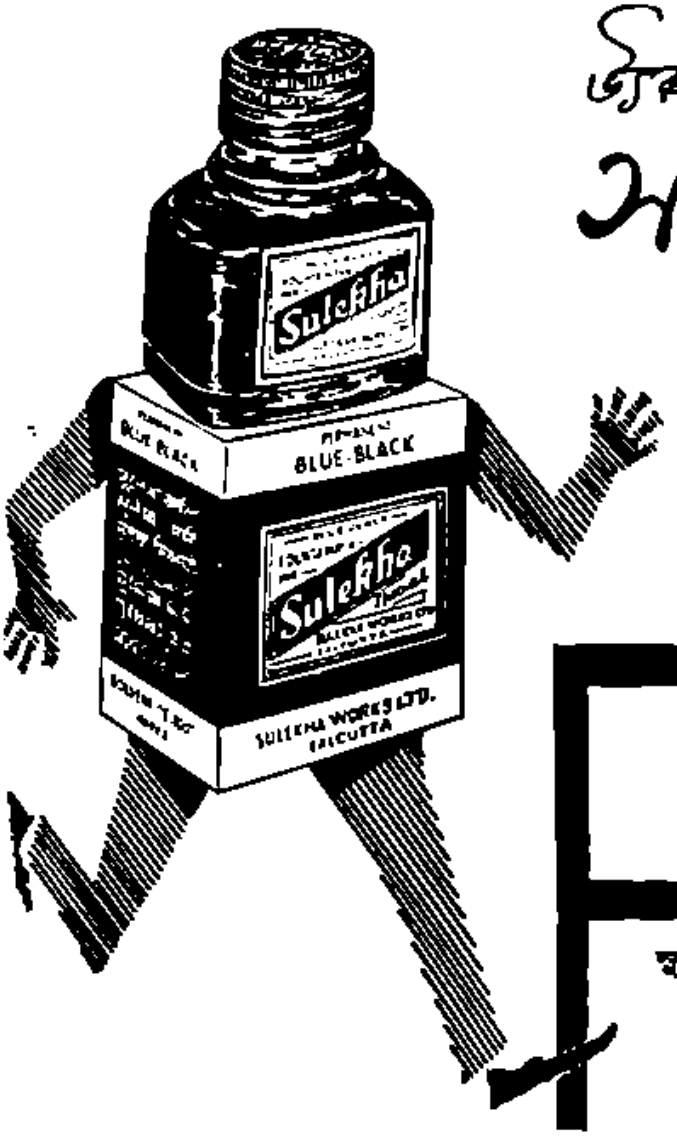

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্মোকলেস

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০, ৩১২০ এম.এস. শিশিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PRO/SW-13

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

কার্ত্তিক—১৩৭২

NOVEMBER-1965

সম্পাদক :

কালিদাস নাগ

সহঃ সম্পাদক :

কল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা।

Price Re. 1·00

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম. এ. ডি. লিট্ বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (কলি) ডি. লিট্ (লণ্ডন) বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদম্ কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

চ্যবনপ্রাশ :—সর্দ্দি, কাশি, শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ, হৃদ্‌রোগ দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রের ন্যায় কার্য করে। শক্তিহীন, ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য রসায়ন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সকলের পক্ষে, সকল ঋতুতে সমান উপযোগী। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

হলা পিয় সহি—

হলা পিয় সহি

তালতমালের তপোবনে নয়,

মৃগশাবকের আদরে আহ্লাদে নয়

—গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ কালের বরবর্ণিনী শকুন্তলা আজও

'হলা পিয় সহি।' 'হলা পিয় সহি।' ব'লে

সখিনীদের খুঁজছে সৌন্দর্যেরি বরণডালায়

আজ তার না হলেই নয়

বোরোলীন ক্রীম

সকল কাজে সবার সাজে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস,– কলিকাতা-৩

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৪টি কার্যকরী ঔষধের নিখুঁত মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অবসাদ কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়া, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

শিশুর কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

পাইওনীয়ার

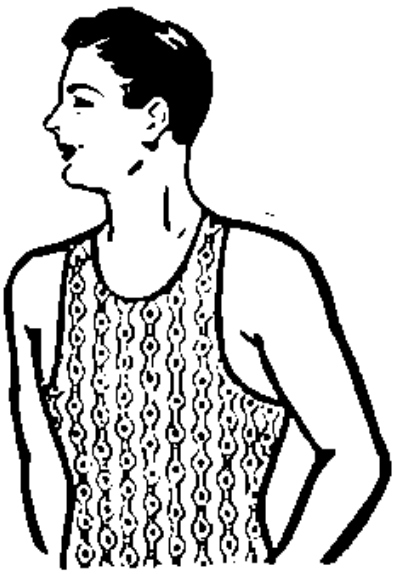

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেস সার্ট, ড্রয়ার এবং স্লীক্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রসালী সিনেমার পার্শ্বে; রতিং স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; বহুমুখ মসীকুঞ্জিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্ডাষ্ট্রী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাওয়ারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ধাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম ক্ষেত্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

এই সংখ্যায়

কথা প্রসঙ্গে—	৩৪৭
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)—	৩৫০
পাঠক-পাঠিকার কলম—	৩৫৩
বিশ্ব বাতায়ন—	
বিচিত্রা—	৩৫৫
সোভিয়েত জনগণের সাতসালা পরিকল্পনা—এন. ওগারিন	৩৬১
রুশভূমির মহান প্রতিভা—এল. ম্যাকসিমোভা	৩৬৩
চলতি দুনিয়া—	৩৬৭

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ

উৎসবের আনন্দে কর্তব্য না ভুলে যাই—আভা পাকড়াশী ৫১৩

সেই সুন্দরী যার পা সুন্দর—সুরঞ্জনা সেন ৫২৫

আপনি সৈনিক (গল্প)—গৌরীশংকর দে ৫১৭

শুভ-বিবাহ (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৩১

শহীদ (গল্প)—মৃত্যুঞ্জয় গুহ ৫৩৭

খেলাধূলা— ৪৭৯

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রাম দুলাল সরকার স্ট্রীট,কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

পাথা

২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

৫,৬ হেয়ার স্ট্রীট.

ফোন : ১৩-১৮৯১

১৪,হেয়ার স্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

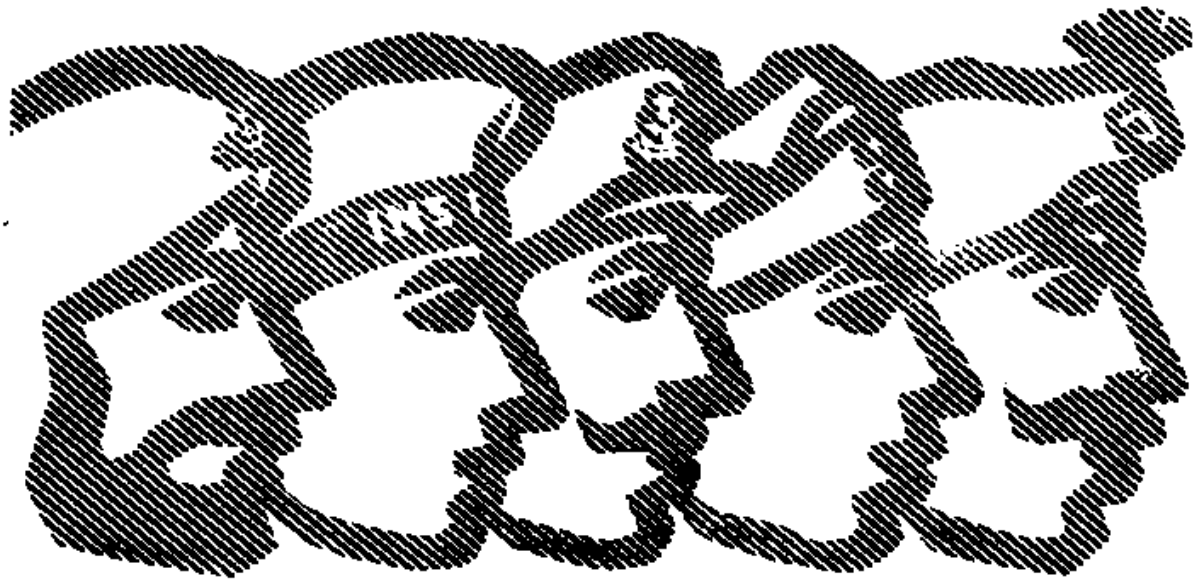

আমরা আমাদের জোয়ানদের জন্য একান্তভাবে গর্বিত। তারা আমাদের স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করেছে। তারা শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করেছে। এই কাজে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছে, আর আহত হয়েছে আরো বেশী। আমাদের জোয়ানরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে। আসুন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে আমরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করি।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

DA 65/F6 Bengali

এই সংখ্যায়

পাক ভারত সংঘর্ষ (সংযোজন)—

আমাদের জন্মভূমি— গ

সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরং তাকে জটিলতর করবে ছ

জম্মু ও কাশ্মীরের একটি অপ্রকাশিত মানচিত্র

একটি বিরাট বড়যন্ত্র— ঝ

ভারতের উপর পাকিস্তানের হামলা (ঘটনাপঞ্জী) ড

পাক-ভারত সংঘর্ষ ও পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন (১৯৭১-১৯৬৫) ঘ

যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন— ব

রাষ্ট্রসংঘ ম

প্রচ্ছদ :—ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেঃ জেনারেল হরবক্স সিং সহযোগী অফিসারদের সঙ্গে সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পরিদর্শন করছেন।

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

॥ কথা প্রসঙ্গে ॥

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি।

এখন যে রাশিয়াকে আমরা দেখছি, রাশিয়া তখন এ-রূপ পরিগ্রহ করেনি। তখন সবেমাত্র ওই বিরাট বিশাল দেশটাকে তারা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। তখন আমরা শুনলাম—রাশিয়া নাকি তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে প্রচুর শস্য উৎপাদন করেছে। এবং এত প্রচুর শস্য হয়েছে যে তা নিয়ে তারা কি করবে বুঝতে পারছে না। রাশিয়া ছিল কম্যুনিষ্ট, আর আমরা ছিলাম ইংরেজের অধীনে। দু'জনের সম্পর্ক বিশেষ ভদ্র ছিল না। তার ওপর রাশিয়াকে বলতো। 'আয়রণ কার্টেনের দেশ।' লোহার আল দিয়ে ঘেরা। দেশের ভেতরের খবর বাইরে বেরুতো না। যাও বা বেরুতো তাও বিকৃত হয়ে। ইংরেজরা যা বলতো, আমরাও তাই বলতে লাগলাম। বলতে লাগলাম—'Russia is nothing but a wheat producing country.' লোকগুলো খাবে যাবে আর ষাঁড়ের মত মোটা হবে!

তখন রসিকতা করে রাশিয়াকে যে-কথা বলেছিলাম, আজ আমরা তার মর্মার্থটুকু যেন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি—একটা মোটা দেশকে গড়বার আগে রাশিয়া কেন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল শস্য উৎপাদন করবার কাজে। তারা জেনেছিল মানুষের পেটের ক্ষুধা কারও কথা শুনবে না, সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন হবে খাদ্যের।

দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার ক্ষুধা নিবারণের অন্ন আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এ-কথা জানেন না বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু জেনেও যাঁরা জানতে চান না, আজ আঠারো বছরের স্বাধীনতার পরে মৃত্যুকালে হরিনামের মত 'জয় কিষাণ' বলে তাঁদের আর্তনাদ ছাড়তে হয়!

কিন্তু কোথায় সেই কিষাণেরা? মাটিকে ভালবেসে জমিতে যারা সোনা ফলাতো? আঠারো বছর বয়স পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য হয়েছে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা খুব সার্ট আর পাজামা নোংরা হয়ে যাবার ভয়ে কলে-কারখানার চাকরিতে গিয়ে ঢুকেছে। দৈবাৎ যারা এখনও সকল আছে তারা বলে—চাষ করতে গিয়ে জল পাই না, সার কেনবার পয়সা নেই, ষোলো আনার জায়গায় দু'আনা ফসলও পাই না হুজুর, কাজেই চাষ-আবাদ ছেড়ে দিয়েছি। একরের পর একর জমি অনাবাদী পড়ে আছে।

'তোমাদের চলে কেমন করে? খাও কি?'

জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'বেশি দাম দিয়ে কিনে খাই আজে।'

'কিনতে তো টাকা'র দরকার!'

কিষাণ বলে, 'সরকার আমাদের খুব ভাল। সে ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। ভূষিঋণ পেয়ে থাকি আমরা। তাইতে ক'টা মাস বেশ ভালই চলে যায়।'

'চাষ কর না, অথচ ভূষিঋণ পাও?'

কিষাণ জোর গলায় বলে, 'পাব না কেন?'

'ঋণের টাকা শোধ দাও কেমন করে?'

কিষাণ হেসে বলে, 'চার-চারটে ছেলে কারখানায় চাকরি করছে। আপনাদের আশীর্বাদে তারা যা মাইনে পায় তাই থেকে ভাগাভাগি করে দেনার টাকা শোধ করে দেয়।'

এই তো আমাদের দেশের অবস্থা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছে। একদিকে পাকিস্তান, একদিকে চীন। দেশ এখন দুই শত্রুর সম্মুখীন।

যুদ্ধ মানেই সম্পদের অপচয় আর শক্তিক্ষয়।

ইংরেজ যখন আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই তারা এই ব্যবস্থাটি করে দিয়ে গেছে।

জীবন দিয়েছে আর তার পিছু পিছু মৃত্যুকে দিয়েছে লেলিয়ে।

আমরা আজ সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেখছি—দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব।

চালাও র‍্যাশান-কন্ট্রোল।

এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। দেশে যেখানে যতটুকু খাদ্যশস্য হয়েছে সবটুকু সরকার যদি হস্তগত করতে না পারে, চোরা-কারবারীদের পোয়া বারো। গোপন সুড়ঙ্গপথে খাদ্যশস্যের বিরাট অংশ চালান করে দিয়ে চারিদিকে নাই নাই রব তুলে দেবে। অবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকবে তার মূল্য হবে আকাশ ছোঁয়া।

দেশের এই দুঃসময়ে সরকারকে এই আক্রোশ-সেলামী দিতেই হবে।

কিন্তু কেন?

যে-দেশের মানুষের ধর্ম ছিল অতিথি সৎকার, শত সহস্র অন্নহীন দরিদ্রকে একদিন যারা অকাতরে অন্নদান করেছে, আজ তাদের সেই শতাব্দীর অবারিত দ্বার রুদ্ধ। একমুঠি তণ্ডুল সেখানে দুষ্প্রাপ্য।

আত্মীয় কুটুম্ব দূরের কথা, বাঙালীর বাড়ীতে আজ মেয়ে-জামাই-এর প্রবেশ নিষেধ।

এই শোচনীয় দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের সরকার বলছেন—পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু আগমন, মানুষের অন্নহার বৃদ্ধি।

পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুর আগমন রোধ করা যখন সম্ভব নয় তখন এর একমাত্র প্রতিকারের উপায় হলো অন্ননিয়ন্ত্রণ।

জন্মনিয়ন্ত্রণ করুন—বাস্তুনিয়ন্ত্রণ করুন—কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু সরকারের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ—গত আঠারো বছর ধরে যেমন থেকেছেন খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে সরকার যেন তেমনি উদাসীন না থাকেন!

উদাসীন ছিলেন না সরকার। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহু অর্থব্যয় তাঁরা করেছেন, ব্লক তৈরি হয়েছে, অনেক গ্রাম-সেবক এবং গ্রাম-সেবিকা চাকরি পেয়েছে, অনেক চাষবাবু চাষীদের অনেক হিতোপদেশ দিয়েছে, চাষীরা কৃষিঋণ পেয়েছে, কিন্তু কাজের মত কাজ কিছুই হয়নি। দিগন্তবিস্তৃত ধানের মাঠ অনাবাদী পড়ে আছে, সেচের পুকুর রেষেমাত্র শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ধানের মাঠে উদ্ভাস্ত কলোনী গড়ে উঠেছে, চাষীর ছেলেরা সাইকেলে চড়ে কলে-কারখানায় চাকরি করছে।

চাষ করতে হলে মাঠে গিয়ে কাদামাটি ঘাঁটতে হয় কাজটা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। পচা গোবরের সারের গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়। কাজেই এসব নোংরা কাজ যারা করে তারা করুক। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে—যারা এই সব দেখাশোনার ভার পেয়েছেন, আপিসে বসে কাগজেকলমে কাজ তাঁদের ঠিকই চলে। রিপোর্টের পর রিপোর্ট লিখে চাকরি তাঁরা ঠিকই বজায় রাখেন! ওপরওলার টেবিল মাসাবিধ ফাইলে ফাইলে ভরে ওঠে। খবরের কাগজে খবর বেরোয়—এবছর ফসলের উৎপাদন সন্তোষজনক।

সুতরাং দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

জাহাজ বোঝাই গম আসছে আমেরিকা থেকে, আমরা চিন্তা করবো কোন্ দুঃখে?

কিন্তু আমাদের দেশেই একটা বড় দামী কথা প্রচলিত আছে—

'না দিব চরণে হাত
না খাব পরের ভাত।'

খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা, আর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে অকর্মণ্য মেরুদণ্ডহীন সরিসৃপের মত বুকে হাঁটা—দুই সমান অপরাধ।

চরম দুর্গতির দিনে যে-মানুষ তার ন্যায়নিষ্ঠা থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তার সেই অপরাজেয় মনুষ্যত্বের গৌরব—সব চেয়ে বড় গৌরব।

সমগ্র জাতিকে আজ তার মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে—

'না দিব চরণে হাত।
না খাব পরের ভাত।'

এই যদি করতে পারে ভারতের আপামর সাধারণ যদি তার অপরাজেয় মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে সারা জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চায় তো তাদের আজ শুধু এই একটি মাত্র পথ—যে-পথ সত্য ও ন্যায়ের পথ—। এই পথে যাঁরা যাত্রা করেন, ভারতীয় দর্শন তাঁদেরই বলেন—অমৃতপথযাত্রী।

অগ্রদীপ

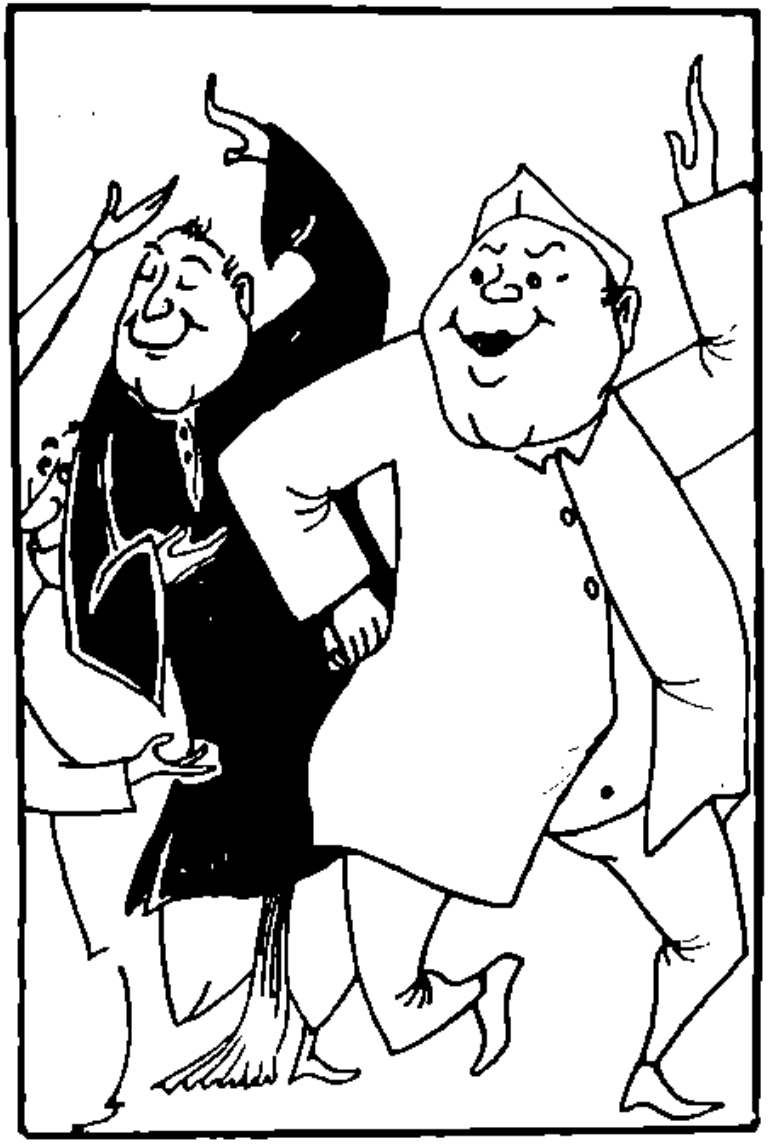

দেশের স্বাধীনেই এদের আনন্দ!

মাথা ভূখা তঁ—

পঞ্চম বাহিনী নিপাত যাক্!

...'সখি ধরধর' ভাব নয়!

—এখন বীর দর্পে কাঁপাবে। মেদিনী

পাঠক পাঠিকার কলম

(এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।)

(মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন্)

ক্রিকেট মোচ্ছব

সবিনয় নিবেদন,

দেশ আজ মহাবিপদের সম্মুখীন এবং আমাদের সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিবার জন্য নেতৃবর্গ প্রায় প্রতিদিনই আবেদন জানাইতেছেন। আমরা যেন কোন উৎসবে ধুমধাম না করি, পূজামণ্ডপে আমোদ না করি, কালীপূজায় বাজি না পোড়াই, আমরা যেন সকল প্রকার অর্থের অপচয় বন্ধ করি এবং এমন কি আমরা যেন কম খাইয়া দিনপাত করি। অর্থাৎ কৃচ্ছসাধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা যেন স্থাপন করিতে প্রস্তুত থাকি।

কিন্তু দেখিতেছি, দেশের দরিদ্র জনসাধারণ এই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ না হইলেও, দেশের গণ্যমান্য ধনপতিরা ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান করিয়া ক্রিকেট মাঠে মহিলাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার সুযোগ ছাড়িতে রাজী নন। শুধু তাই নয় এই সুযোগ লাভ করিবার জন্য তাঁহারা বহু লক্ষ টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত। অবশ্য টাকাটা তাঁহারা দিবেন না। টাকা দিবে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। তাহাদের প্রলুব্ধ করিয়া খেলার মাঠে টানিয়া আনা হইবে।

আমরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের আগামী ক্রিকেট সফর সম্পর্কেই উক্ত কথাগুলি লিখিলাম। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য ভারত সরকার কিছুদিন আগে সফর বাতিল করিয়া দেন। তাহাতে ঐ সকল গণ্যমান্য ধনপতিদের মাথায় যেন বাজ পড়িল। তাঁহারা সফরটিকে সফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চারিদিক হইতে সরকারের উপর যে কি চাপ, কী অনুনয় বিনয়। যেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রিকেট খেলা না দেখিলে (যদিও ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখা হইয়াছে)—জন্মটাই বৃথা গেল। তাঁহাদের মেয়েরা মাঠে গিয়া বাহার দেখাইতে পারিবেন না, তাঁহারা নিজেরা ঐ সূত্রে হাজারো মজা লুটিতে পারিবেন না—এ দুর্ভাগ্য কি সহ্য করা যায়? শেষ পর্যন্ত সরকার সম্মত হইলেন। তারপর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ বলিল যে তাহারা সফরে আসিবে না—কারণ বর্তমানে ভারতের পরিস্থিতি ক্রিকেট সফরের অনুকূল নয়।

আবার বজ্রাঘাত। আবার প্রাণপাত চেষ্টা! তা কি হয়! আপনারা আসুন! দয়া করিয়া আসুন! পরিস্থিতি ভালই। আমরা বুক দিয়া আপনাদের রেখিব, সেবা করিব। এবংপ্রকার অনুরোধ উপরোধে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পাঠানো হইতেছে। শুধু তাই নয়, একজন মহামান্যবর মহারাজে

সফর পাকা করিবার জন্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ধাবিত হইতেছেন, সেখানে গিয়া তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া প্রয়োজন হইলে প্রায়োপবেসন করিয়া তিনি তাহাদের সফরে আসিবার জন্ত রাজী করাইবেনই।

ব্যাপার দেখিয়া হাস্ত সম্বরণ করা কঠিন। একদিকে আমাদের সর্বপ্রকার অপচয় বন্ধ করিতে বলা হইতেছে, অপরদিকে আমাদের মোটা টাকা খরচ করিয়া ক্রিকেট খেলা দেখিবার জন্ত প্রস্তুত করা হইতেছে!

ভাবিতে গেলে, সামান্ত খেলা বইত নয়। তাহার জন্ত এমন আদেখলেপনা কেন? বিশেষ দেশের এই দুঃসময়ে। এই সূত্রে কত টাকার শ্রাদ্ধ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখুন তো? দেশের অবস্থা ফিরিলে, কত ক্রিকেট দলই ভারতে আসিবে। যাহাকে ডাকিব সেই আসিবে। এত টাকা, এত খানাপিনা, এত আরাম, এত তোষামোদ—তাহারা তো আর কোথাও পায় না।

তাই বলিতেছি, সরকার আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই সফর বাতিল বলিয়া ঘোষণা করুন। নচেৎ দেশের মানুষকে আপৎকালে অপব্যয় না করিবার জন্ত এবং কৃচ্ছ সাধন করিবার জন্ত বলা পরিহাসের মত শুনাইবে।

ইতি—

বৈদ্যবাটি

রামকমল ঘোষ

এ সম্পর্কে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড নিজেরাই এই সফর বাতিল করে দিয়েছে।—গঃ সঃ

॥ প্রকাশিত হলো ॥

জীবন-শিল্পের সুখ-দুঃখের সুর মূর্চ্ছনা। মনে রাখবার মতন প্রেম, ব্যর্থতা আর জীবন প্রবাহের ধারা চলেছে নানা পথে, কিন্তু এসে মিশেছে একই সংগমে। সেই সংগমের রাগিনীই ধ্বনিত হয়েছে—অনিল কুমার ভট্টাচার্যের সদ্য প্রকাশিত কাহিনী ধারায়—

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

অর্চনা পাবলিশার্স: ৮ বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

আধুনিক কবিতার আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই—

অনিল কুমার ভট্টাচার্যের

সাগর আকাশ

দাম—২·০০

ডি, এম, লাইব্রেরী: বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বিচিত্রা

কর্তারা এখন গৃহিণীদের মুঠোর মধ্যে

পশ্চিম জার্মানীতে সংসারের কর্তৃত্ব ক্রমশ গৃহিণীদের হাতে চলে গেছে। সংসারের যাবিছু দরকার, যা কিছু কেনাকাটা, সেলাইকল থেকে শুরু করে রেডিও, টেলিভিশন আর মোটরগাড়ি পর্যন্ত এখন গৃহিণীদের তাঁবে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা এখন মহিলাদের মন ভোলাবার মত বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে।

কর্তারা যে এখন গৃহিণীদের "মুঠোর মধ্যে" তা বেশ পরিষ্কার। পশ্চিম জার্মানীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামী মাসমাইনে পেয়েই স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। শ্রমিক মহলে এটা বেশি দেখা না গেলেও সরকারী চাকরে, কেরানী বাবুরা বেশির ভাগই মাইনে এনে স্ত্রীকে দেয়। গৃহিণীরা আসলে সংসার চালান ও কর্তাদের যা হাতখরচ দেন তাতেই বেচারীদের চালাতে হয়। এথেকে যদিবা কিছু বাঁচে কড়া গৃহিণীরা সেটি কেড়ে নেন। পশ্চিম জার্মানীতে একটা আইন আছে যে স্ত্রীদের হাতখরচার স্বামীদের তাগ বসাবার কোন অধিকার নেই। স্ত্রীদের বর্তমান প্রতিপত্তি দেখে স্বামীরা নিজেদের জন্ত অনুরূপ একটা আইনের কথা ভাবছেন।

পশ্চিম জার্মানীতে এখন কাজকরা মেয়েদের সংখ্যা সাড়ে নয় মিলিয়ন; এদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন বিবাহিতা। সুতরাং বহু সংসারেই স্বামী স্ত্রী দুজনেই নাদে গেলে বেশ মোটা টাকা ঘরে আনে। অনেক স্বামী স্ত্রী কে কত মাইনে পায় পরস্পরকে বলে না। তবে বয়স বাড়লে, ধরুন ৪৫ পেরুলে রোজগারের অঙ্কটা কেউ কারুর কাছে আর গোপন করেনা।

গৃহিণীদের অবস্থোন্নতি সত্ত্বেও কর্তারা যে লুকিয়ে চাপিয়ে বেশ দু'পয়সা জমাচ্ছেন তা তাদের সম্পত্তি ও সঞ্চয়ের হিসাব দেখলেই ধরা পড়ে। মেয়েরাও দুই যুদ্ধের কল্যাণে আর্থিক স্বাধীনতালাভ করেছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় বিয়ের পণ যোগাতে মেয়েদের মুখ শুকিয়ে যেত অথচ আজ তাদের টাকায় যখন সংসারের বহু খাই মেটে তখন সংসারে তাদের দাপট হবে সেটাতো স্বাভাবিক।

শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার অভিনব পন্থা

মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে শিশুদের নানা প্রকার শারীরিক অক্ষমতা দেখা যায় যেমন স্পর্শশক্তি বোধশক্তি, চলচ্ছক্তি ও বাক্‌শক্তি হয় নষ্ট হয় নয় দোষ পায়। এইসব শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারেনা ও তার ফলে বড় হয়ে এক অভিশপ্ত জীবনযাপন করে। একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতেই মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার শিশু আছে ও সারা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

এদের শিক্ষাদীক্ষার জন্ত পশ্চিম জার্মানীর কোলোন শহরের উপকণ্ঠে একটি স্কুল আছে যার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় শতখানেক। এদের শিক্ষাদানের জন্তে এই স্কুলের শিক্ষকরা এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তারা এমন একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন যাকে বলা চলে "আলোক লেখনী"।

এই পদ্ধতিতে ফ্ল্যাশলাইট সংযুক্ত একটি টুপি শিশুর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অক্ষর লেখা একটি বড় ব্ল্যাকবোর্ডের চার্টে শিশু আলো ফেলে ফেলে গোটা বর্ণপরিচয় ও সম্পূর্ণ বাক্য তৈরী করতে শিখে নেয়। পরে একদল চিকিৎসক ও কলাকুশলী মিলে এই পদ্ধতির আরও কিছুটা উন্নতি করেছেন। এখন চার্টে লেখা প্রত্যেক অক্ষরের মাঝখানে একটি ছোট ফোটোসেল রাখা হয়। এর ফলে শিশুদের নিক্ষিপ্ত আলোক সংকেতগুলি বৈদ্যুতিক স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়ে সেগুলির সাহায্যে একটি বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুরা এই কৌশলটি খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছে ও এখন তারা এই পদ্ধতিতে তাদের আলোক নিয়ন্ত্রিত টাইপরাইটার চালিয়ে সম্পূর্ণ রচনাদি লিখতে পারে। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কোলোন স্কুলের এই সাফল্যের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে ও পৃথিবীর নানাদেশ থেকে এসম্বন্ধে খোঁজখবর আসতে শুরু করেছে। এই অভিনব টাইপরাইটারের আরও উন্নতি সাধনের জন্য গভর্নমেন্ট থেকেও উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই অল্পদামে এই টাইপরাইটার প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হবে। সাধারণ টাইপ-রাইটার দিয়ে কাজ চলে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বাঘাকড়ির চাটনির যুগ

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে জার্মানদের খুব বদনাম ছিল এতকাল। ফরাসীরা কোন কারণে জার্মানী বেড়াতে গেলে পেটের চিন্তায় শুকিয়ে যেত। আগে জার্মানদের প্রধান খাদ্য ছিল আলু। সঙ্গে ওরা খেতো চর্বিওয়ালা শূয়রের মাংস আর টক টক বাঘাকড়ির চাটনি যার জার্মান নাম হল সাউয়েরক্রাউট।

আজ কিন্তু আর জার্মানদের সম্বন্ধে ও কথা বলা চলেনা। এখন জার্মানরা আন্তর্জাতিক খাদ্যের পক্ষপাতী। যুদ্ধোত্তর যুগে শুকনো সব্জি ও বাদামী চিনি খেয়ে দিন কাটানোর কথা ওরা ভুলে গেছে। এমন যে আলু তাও আর জার্মানদের সব রান্নার স্থান পায়না। এখন পশ্চিম জার্মানীতে ভালোমন্দ খাওয়ার খুব ধুম।

যুদ্ধের পর জার্মানী থেকে মুরগী উধাও হয়েছিল। তারপর দেশের স্বচ্ছলতা ফিরতে জার্মানরা একটুআধটু মুরগী চাখতে শুরু করলে। মুরগী আমদানি হল অষ্ট্রিয়া থেকে। অষ্ট্রিয়া থেকেই একজন এসে রেষ্টুরেন্ট খুলে বসল। এখন সেই লোকটিই পশ্চিম জার্মানীর প্রত্যেক বড় ও মাঝারি শহরে একটা করে রেষ্টুরেন্ট খুলে বসেছে। এর রেষ্টুরেন্টের বিশেষত্ব হল কষা মুরগী, মুরগীর সুরুয়া ও অষ্ট্রীয়ান মদ। এখন তার রেষ্টুরেন্টে সসেজও থাকে ও খাবারের সঙ্গে আলাদা নুন, গোলমরিচ ও টোম্যাটো কেচাপ দেওয়া হয় যার কথা জার্মানরা অনেকদিন ভুলে মেরে দিয়েছিল।

অষ্ট্রিয়ান রেস্টুরেন্ট মালিকের মত একজন জার্মানও নানা শহরে রেস্টুরেন্ট খুলেছে। এই রেস্টুরেন্টের খ্যাতি হল ফরাসী খাবারের নামে। তবে যারা খানদানি খাইয়ে তারা ইতিমধ্যেই প্রাচ্যদেশীয় খাদ্যের স্বাদে মজেছে। তাই আগে যেখানে পশ্চিম জার্মানীতে চীনে রেস্টুরেন্ট আঙুলে গোনা যেত এখন তা একেবারে ব্যাঙের ছাতার মত চারদিকে গজিয়ে উঠেছে। নামকরা চিত্রতারকাদের মতই আজ চীনে বাবুর্চিদের খ্যাতি। রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় ইতালীয়ান ও যুগোস্লাভরাও বেশ জমিয়ে বসেছে।

এতো গেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে খুব বদনাম্বার পালা। বাড়ির হালচালও পাল্টেছে। বেনের দোকানে যান, সেখানে দেখবেন কর্ত্রীঠাকুরুণরা কেউ চীনে বাঁশের কোঁড় কিনছে, কেউ কিনছে জাপানী টুনা মাছের টিন, কেউবা চাইছে অয়েস্টার। গরম মশলা, বাজার জন্ত অলিভেন্ট তেল ও ভিনিগার এখন অঢেল বিক্রি হয়। সুখে, সম্পদে পশ্চিম জার্মানী আজ যেমন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, ভোজনের ব্যাপারেও সে আজ এক হাত দেখিয়ে দিতে চায়। খাওয়ার ব্যাপারে ফরাসীদের কথায় সে তার জংলী নাম ঘোচাতে চায়।

মৃত বালকের জীবনলাভ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ এক আশ্চর্য কাহিনী। শীতকাল, খানা, ডোবা, পুকুর, হ্রদ, নদী সব ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে। হামবুর্গ শহরে ছেলেমেয়েরা একটা জমাট বাধা পুকুরের ওপর খেলা করছে। হঠাৎ পাঁচবছরের ছেলে টমাস হার্ডার ভিড় থাওয়া বরফের ফাঁক দিয়ে নিচে তলিয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটল বিকেল ৪টা ৫১ মিনিটে। দমকলে খবর গেল ৪টা ৫৬ মিনিটে। দমকল এসে বরফ কেটে ছেলেটিকে তুলতে যখন তখন ঘড়িতে বেজেছে ৫টা ৫ মিনিট অর্থাৎ টমাস বরফের নিচে ছিল মোট ১৪ মিনিট। সঙ্গে সঙ্গে টমাসকে পাঠানো হ'ল হাসপাতালে। টমাসের অবস্থা দেখে ডাক্তাররা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাই কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়া শুরু করতে আরও সাতমিনিট কেটে গেল।

হার্টের স্পন্দন থেমে গেলে চারপাঁচ মিনিটের মধ্যে দেহ অক্সিজেন হারাতে শুরু করে। অক্সিজেন কমতে শুরু করলে মস্তিষ্কের কোষগুলিতে প্রথমেই ধাক্কা লাগে। পাঁচমিনিট তাজা অক্সিজেন না পেলে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনা প্রায় অসাধ্য।

যাই হোক ডাক্তাররা প্রথমেই টমাসের পেট থেকে পাম্প করে জল বার করতে লেগে গেলেন। তারপর শুরু হ'ল বাইরে থেকে হার্টের ওপর মালিশ আর অক্সিজেন যোগান। প্রায় ৫০ মিনিট পরে শুনা গেল দুর্বল হার্টের স্পন্দন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রোলিন ইঞ্জেকশন দিলেন ডাক্তাররা যাতে হার্ট চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হার্টের স্পন্দন দুর্বল হলেও যখন নিয়মিত হয়ে উঠলো, তখন ডাক্তাররা টমাসের হার্টে একটা পেসমেকার (হার্টকে চালাবার যন্ত্র) লাগিয়ে দিলেন। এদিকে বাইরে থেকে হার্টের ওপর মালিশ চালানো হ'ল প্রায় চারঘণ্টা ধরে।

নিজে কর

খেলনার প্রদর্শনী

খেলনা পেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর কিছুই চায় না। আগে যেওয়াজ ছিল তৈরী খেলনা আর এখন বিশেষত বিদেশে যেওয়াজ হয়েছে 'নিজে তৈরী ক'রে নেও' খেলনার চেষ্ট। এগুলো অনেকটা 'মেকানো' ধরণের। অনেকগুলো আলাদা আলাদা অংশ থাকে যেগুলো জুড়ে জুড়ে নানারকমের খেলনা করা যায়। ছোটরা এগুলো পেয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে ভেবে মাথা খাটিয়ে মনেমত সব খেলনা তৈরী করতে পেরে খুব খুশি হয়।

এইরকম খেলনার একটি প্রদর্শনী গতমাসে পশ্চিম জার্মানীর নুরেনবের্গে হয়ে গেছে। পৃথিবীর ২২টি দেশের ১০৬১টি প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিল আর সারা পৃথিবী থেকে খেলনা কিনতে নুরেনবের্গে লোক এসেছিল প্রায় ষোলহাজার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে একটি আশ্চর্য খেলনাঘর এনেছিল। ছেলেমেয়েরা এই ঘরে প্লাষ্টিকের পাত তৈরী ক'রে তাদিয়ে ৫০ রকম বাঁচে কেটেকুটে নিয়ে বিমান, মোটরগাড়ী, জাহাজ ও নানারকম জীবজন্তু বানাতে পারে। গয়না তৈরীর বাক্স দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নানারকম বাতুর গয়না তৈরী করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন অংশে ভরা এমনসব খেলনার বাক্স এসেছিল যেগুলি জুড়ে জুড়ে নানারকমের বিমান, সুসজ্জিত বিজ্ঞান গবেষণাগার, মাইক্রোস্কোপ মায় গ্রামোফোন পর্যন্ত তৈরী করা যায়।

অনেক ছেলে যাদের খুব মোটরগাড়ী বাতিক, তাদের জন্যে এবারের প্রদর্শনীতে প্রথম দেখা দিয়েছে "ইলেকট্রিক কার"। এতে আসলের মত সবকিছুই আছে যেমন চার রকমের গীয়ার, ক্লাচ, নিউট্রাল গীয়ার ও "ইগ্নিশন কি···। ঘরে এনে ছেলেরা এই গাড়ী চালালে বাড়ির লোকেদের কানে তালা লেগে যাবে এইসা শব্দ হয় এতে। যেসব ছেলেরা "যুদ্ধ যুদ্ধ" খেলতে ভালবাসে, তাদের খেলার জন্যও যাবতীয় যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী হয়েছে যেমন সাইলেন্সার দেওয়া পিস্তল, হ্যাণ্ডগ্রেনিড, ফিল্ডগ্লাস, আর নাইক অর্থাৎ গুপ্তচরের পক্ষে যাকিছু দরকার সব!

ডলপুতুলগুলি আগেকার মত দেখতে শান্তশিষ্ট হলেও অনেক তোল বদলাছে। ওরা এখন গান গাইতে পারে, কিন্তু বার ক'রে ভেংচাতে পারে, ঠোঁট ওলটাতে পারে, মুখে দুঃখের ভাব করতে পারে, আর সাজপোশাকের তো কথাই নেই। আজকাল আবার নানাবাঁচের আলগা গয়নাসমেত ডলপুতুল পাওয়া যায় যাতে তিনি এক একসময় এক একরকম বেশসজ্জা করতে পারেন।

চলচ্চিত্র ও নাটক যোগে উদ্ভট জগত

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দু'হাজার দর্শক দেখে রোলার স্কেটার চালিয়ে একজন তরুণ লোকে লোকারণ্য শহরের ভীড়ে গাড়িঘোড়া ট্রাম বাস কাটিয়ে চলেছে। চোখের মত বাজনার তালে তালে ঐ দুঃসাহসী তরুণ কয়েকটা বাধা কাটিয়ে পথের লাল আলোর সামনে এসে মাঝের উঁচুতে সটান দাঁড়িয়ে গেল। ফুট করে একটা শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের বিস্মিত চোখের সামনে রোলার স্কেটার চালিয়ে সেই ত্যাগা কসরতবীর মঞ্চের ওপর এসে হাসতে হাসতে সবাইকে অভিবাদন জানালে।

অনেকগুলো ফিল্ম প্রোজেক্টরের সাহায্যে মঞ্চের পেছনে একটা বিরাট পর্দায় দেখানো হ'ল যানবাহনের ভীড়, পথঘাট ও ঘরবাড়ি। পর্দার ওপর ফিল্মের ছবি ও মঞ্চের ওপর জীবন্ত নাচের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সংগঠক কার্ল বুখহান এক অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "যে উদ্ভট জগতে আমরা বাস করি" ব্যাপারটি 'প্যানোরামা ভিসন শো' পদ্ধতিতে পশ্চিম জার্মানীর এসেন শহরে এই প্রথম উপস্থাপিত করা হ'ল।

ফিল্মের নানা কৌশল টেপ-রেকর্ডার, নাচ ও অজস্র গানের যোগাযোগে কখন মঞ্চে কখন পর্দায় প্রযোজক হাইঞ্জ পিটার হিলকনিস যে জগত সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই উদ্ভট। সুন্দরী নর্তকীরা কখন পর্বত ও উপত্যকার ওপরে ভেসে চলেছে, কখন নাচতে নাচতে সত্যিকারের স্টুয়ার্ডেসরা চলছে তীব্র শব্দকারী ছোট বিমানগুলির দিকে, কখন নানারকম বাজনার সুরের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে একা এক গাইয়ে। নানারকম চোখের ধাঁধা ও শব্দের কৌশলে দর্শকচিত্ত কখন ভরে উঠছে বিস্ময়ে কখন ভয়ে ও কখন বা বিহ্বলতায়।

নাচ, গান ও নাটকের "জীবন্ত" ভাস্কর্যেরা প্রায় সবাই চেক। এর আগে ব্রুসেলস্ শহরে ১৯৫৮ সালের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে প্রাগের "লাটের্না ম্যাজিকা" রঙ্গানুষ্ঠান তাদের কিম্ভ ও থিয়েটারের অপূর্ব সমন্বয়ে এক আন্তর্জাতিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল। "উল্টো জগতের" পরিচালকদ্বয় হলেন হাইজ পিটার ছিলেনফিল্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার মিরোস্লাভ স্টানেক। শিল্পীদের মধ্যে চেক ও জার্মানরা ছাড়াও আছেন মার্কিন, ইংরেজ, হাঙ্গেরীয় ও ইতালীয়।

"উল্টো জগত্" সাধারণ নাটকের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ দেয়। পেছনের পর্দায় দ্বি-মাত্রিক ছিমের কৌশলে শিল্পী মঞ্চে এক স্বপ্নময় মায়াজগতের সৃষ্টি করে। বিখ্যাত সমালোচকরা ইতিমধ্যেই এই ধরণের রঙ্গানুষ্ঠানের প্রশস্তি গেয়েছেন। এদেশের পর পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য শহরে "উল্টো জগত্" দেখানো হবে ও তারপর এই দলটি প্রায় দুবছরের জন্য আমেরিকা পাড়ি জমাবে।

বিমান আক্রমণ আশ্রয়স্থলে

ব্যাঙের ছাতার আবাদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অনেকেই ভূগর্ভে বাঙ্কার বা আশ্রয়স্থল বানিয়েছিল। ভূগর্ভে এরকম শত শত আশ্রয়স্থল আজও রয়ে গেছে। যেগুলোর হদিস পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত মোট ১৮১টি অক্ষত ও ৮০টি বোমা-বিধ্বস্ত আশ্রয়স্থলের খোঁজ পাওয়া গেছে।

মিলিটারীদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী খরচে ভূগর্ভে যেসব বাঙ্কার তৈরী হয়েছিল সেসব ভেঙে ফেলা হয়েছে কিন্তু মাটির ওপরে যেগুলো ব্যবহারযোগ্য ছিল, সেগুলো এখন গুদামঘর হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সেগুলো যে একদা বাঙ্কার ছিল তা সহজে বোঝা যায় না কেননা নতুন রঙ লাগিয়ে আলো ফুটিয়ে, সামনে বাগান বানিয়ে সেগুলোকে এখন রিয়ি "সভ্যতব্য" ক'রে তোলা হয়েছে। মাটির তলায় যেগুলো রয়ে গেছে সেগুলোও পড়ে নাই। সেগুলোর স্যাঁতসেঁতে গরম অন্ধকারে পশ্চিম জার্মানীর পরম প্রিয় খাদ্য ব্যাঙের ছাতার চাষ পুরোদমে চলেছে বাজারে জমানো ব্যাঙের ছাতা বাজারে এলেই হু হু ক'রে বিক্রি হয়ে যায়। মাটির তলায় এই ব্যাঙের ছাতার আবাদ অনেকেই দেখতে আসে।

তবে এধরণের আবাদ আর বেশিদিন চলতে দেওয়া হবেনা কারণ সম্প্রতি স্থির হয়েছে এগুলোকে ভেঙে ফেলে সেই জমিতে সব বসতবাড়ি কিম্বা নতুন রাস্তাঘাট তৈরী হবে। তবে ভাঙবো বল্লেই তো আর ভাঙা চলেনা ; বারুদ দিয়ে এগুলো উড়িয়ে দিতেই বিশেষজ্ঞের অনেকদিন মাথা ঘামাতে হয়, যেমন সময় লাগে তেমনি খরচ পড়ে। তাছাড়া ধ্বংসাবশেষ সরাতে গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক বছর পাঁচলক্ষ মার্ক আলাদা খরচ করতে হয়। কংক্রীট ইস্পাতের তৈরী এক ঘনফুট বাঙ্কার ভাঙতে ৮০ থেকে ১০০ মার্ক লাগে ও সচরাচর এক একটা বাঙ্কারে প্রায় ৫০০০ ঘনফুট মালমশলা থাকে। তবে ক্ষতি হিসেবে জার্মানরাও কম ব্যবসাদার নয়। সহজে কোন জিনিষ তারা নষ্ট করেনা। লোহালক্কড় কংক্রীটের চাঁই থেকে তারা সিমেণ্ট আলাদা করে নিয়ে কের রাস্তাঘাটও বাড়ি তৈরীর কাজে লাগাচ্ছে।

———

নির্মল
বার সাবানে
জামাকাপড় ঝকঝকে পরিষ্কার হয়
কম খরচে, কম সময়ে, কম পরিশ্রমে
নির্মল বার সাবানের দামও কম, চলেও বেশীদিন। নির্মল ব্যবহার ক'রে দেখবেন—প্রচুর ফেনা হয়, ময়লা আর ঘামের দাগ সহজেই ছেড়ে যায়, কাপড়চোপড় একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়। নির্মল বার সাবান দিয়ে কাপড় কাচলে সময় আর পরিশ্রম দুইয়েরই সাশ্রয় হয়। আজ থেকেই নির্মল বার সাবান ব্যবহার করুন। ছোটবড় দু' সাইজেই পাবেন।
Nirmal
BAR SOAP
কুসুম প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
৯, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

মহান অক্টোবর বিপ্লবের ৪৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঃ

ভারতের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন! সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা বিকাশলাভ করুক ও দৃঢ়তর হউক!

অক্টোবর বিপ্লবের ৪৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান

সোভিয়েত জনগণের সাত সালা পরিকল্পনা

এল. ওগারিন, এম. এস-সি (অর্থনীতি)

সোভিয়েত জনগণের সাতসালা পরিকল্পনা সোভিয়েত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা। ১৯১৭ সনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রুশিয়ার বিভিন্ন জাতি ও জনগণের কাছে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাবার এক সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। যুদ্ধের হস্তক্ষেপের ফলে তিনটি অসম্পূর্ণ পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের আমলে একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়িত করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে ১৯৫৯ সনে গৃহীত সাতসালা পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পূর্ণ করছে।

যদিও এই পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি করার (৮০ শতাংশে) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুহৃৎদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে এই পরিকল্পনা পুরাপুরি রূপায়িত হবে। তবে কিছু কিছু পশ্চিমী ভাষ্যকার এই পরিকল্পনাকে "অসম্ভব" বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনীতিবিদই সোভিয়েত সাতসালা পরিকল্পনার যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ববর্তী পরিকল্পনাসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সঠিক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

সমাজতন্ত্রের পরিবেশে তার পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে সুবৃহৎ ঐতিহাসিক কালের মধ্যেই—যুদ্ধপূর্ব ১৩ বছর ও যুদ্ধোত্তর ১২ বছর—অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক চূড়ান্ত উঁচু মানে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ এর অর্থ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং নবীন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কার্যকর সহায়তাদানের সম্ভাবনা।

বিদ্যুৎ ইনজিনিয়ারিং

বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সাতসালা পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ ইনজিনিয়ারিং-এর ক্ষমতার উন্নয়নকে। বিদ্যুৎ ইনজিনিয়ারিং হল

জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখার প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তি। শুধুমাত্র ১৯৬১ সনেই ১ কোটি ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করা হবে (এটি হল প্রাক্‌বিপ্লব যুগে রুশিয়ার সমস্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ঠিক দশগুণ বেশী)। বিদ্যুৎ ইনজিনিয়ারিং ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে সম্ভব হবে বছরে ৫১,০০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন ; এটিই সাতসালা পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্য। বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ এই দু'ধরণের বিদ্যুৎকেন্দ্রেই। তৈল ও গ্যাস হল সর্বাধিক মিতব্যয়ী জ্বালানি এবং আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের মূল কাঁচামাল।

তৈল উত্তোলন দ্রুত বাড়ছে : সাতসালা পরিকল্পনার শেষে ২০ থেকে ২৫ কোটি টন তৈল উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৯৬১ সনের শেষে যে তৈল ও গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে তার ঠিক ঠিক পরিমাণ হল ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন তৈল ও ১৩ কোটি ঘন মিটার গ্যাস।

লৌহ ও ইস্পাত ধাতুশিল্প বাদ দিয়ে আধুনিক অর্থনীতির সকল উন্নয়ন অসম্ভব। সাতসালা পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রয়েছে যে, বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টন থেকে ৯ কোটি দশ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। ১৯৬১ সনে প্রকৃত ইস্পাত উৎপাদন ৯ কোটি টনের কম হবে না, অর্থাৎ ইস্পাত উৎপাদন পরিকল্পনার সর্বোচ্চ পরিমাণে গিয়ে পৌঁছাবে।

আরও উন্নততর জীবনযাত্রার মান

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া। এই সাতসালা পরিকল্পনার উদাহরণ থেকেই এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে ভোগ্যপণ্য ও খাদ্যশিল্পের উন্নতির হার দ্রুততর করার উপর। ১৯৬৫ সনে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়বে ৭'৭ শতাংশে এবং খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়বে ১০ শতাংশে। সম্প্রতি ভারী শিল্পের কাঠামো ও তার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে : ইনজিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পসংস্থাগুলিতে উৎপন্ন হচ্ছে বস্ত্র, পোষাক, জুতা, ও গৃহস্থালীর সাংস্কৃতিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশী বেশী কাঁচামাল। এইভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপর ভারী শিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও প্রসার লাভ করছে। শিল্প উৎপাদনের প্রসার বিশেষের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের আরও বিকাশকে কোনক্রমেই বাধিত করেনা বরং একে ধরেই নেয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ২০ কোটি জনসমষ্টির উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা ও ক্রয়বর্ধমান চাহিদা, জাতীয় অর্থনীতির কোন কোন শিল্পের দ্রুত বিকাশের প্রয়োজনীয়তা— এ সবগুলিই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বাজারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সংহত করার ব্যাপারে অবদান রচনা করবে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাতসালা পরিকল্পনা পরিপূরণ এবং এবং অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের এক নতুন পর্যায়ে উত্তরণ সৃষ্টি করছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার অনুকূল অবস্থা।

কেন এরকম হয়? কেন এই সোভিয়েত ঔপন্যাসিকের, এই মহান লেখকের সাহিত্যকর্ম তাঁর জীবিতাবস্থায়ই অনেকদিন আগেই চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে? গত ২৪শে এপ্রিল মিখাইল শোলোকফের ৮০তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়েছে। এটা আর গোপন নেই যে তাঁর পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশিত হয় লক্ষ কোটি কপি ও তিনি ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, নরওয়ে ও ফিউঁয়ার—বস্তুতঃ সারা দুনিয়ায় ব্যাপক ভাবে পরিচিত। কিন্তু শোলোকফ বড় বড় সভা সমিতিতে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করেন না, তাড়াহুড়ো করে লেখেন না। তিনি প্রকাশকদের তাঁর উপন্যাস দিয়ে চাপা দিয়ে ফেলেন না। দক্ষিণ সোভিয়েত ভূমির কুবান অঞ্চলে, ডন নদীর তীরবর্তী ভেশেনস্কায়া গাঁয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন তিনি। তথাপি জনসাধারণের হৃদয়মনের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব—এই প্রভাব বিস্তার করেছেন মাত্র তাঁর প্রতিভা ও জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের দ্বারা।

তাঁর রচনাবলী

১৯২৩ সনে শোলোকফ রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্পগুলি যেগুলি পরে "ডনের কাহিনী গুচ্ছে" সন্নিবিষ্ট হয়। ১৯২৫ সনে তিনি তাঁর উপন্যাস "ধীর প্রবাহিনী ডন" রচনা সুরু করেন। ১৯৩২ সনে তিনি "অনাবাদী ভূমি জাগলো" উপন্যাসের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সনের প্রাক্‌কালে তাঁর "একটি মানুষের ভাগ্য" প্রকাশিত হয়, আর ১৯৩৯ সনে "অনাবাদী ভূমি জাগলো" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা সমাপ্ত হয়। আমরা সবাই জানি শোলোকফ বর্তমানে "এঁরা নিজ দেশের জন্য লড়েছিলেন" উপন্যাসটি রচনায় ব্যাপৃত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি নিজে যা দেখেছেন ও শুনেছেন তার ভিত্তিতে রচিত এই উপন্যাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নাটক ও বিজয়ের এক পরিপূর্ণ রূপে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের ভিত্তি ঘটনাবলী সম্পর্কে শোলোকফের গভীর চিন্তা ও দার্শনিক বিচার। সমরাঙ্গন থেকে শোলোকফ যেসব রিপোর্ট পাঠাতেন সেগুলি আমাদের স্মরণে আছে। এইসব রিপোর্টে যেমন ক্রোধ ফুটে বেরত তেমনি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যে আদর্শের জন্য সোভিয়েত সৈনিকরা লড়াই করেছিলেন সেই আদর্শের ন্যায্যতা সম্পর্কেও আত্মবিশ্বাস ছিল এইসব রিপোর্ট। এরকম একজন সৈনিক আন্দ্রেই সোকোলফ (একটি মানুষের ভাগ্য)। মনে হয়েছিল তিনি যুদ্ধের সময় হারিয়েছিলেন সবকিছু—তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর বাড়ীঘর, তাঁর সুখী পরিবার। তাঁর হৃদয় হয়েছিল ছিন্নভিন্ন, তবু অত্যাচারে তিনি ভেঙে পড়েননি—নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি তিনি। তৎসত্ত্বেও, আত্মিক দিক থেকে তিনি হয়ে পড়েছিলেন হেটলিয়া। কোন কিছুই আর তাঁকে স্বদেশের জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে বলে মনে হতনা। কিন্তু তখনই আবির্ভূত হল একটি ছোট বালকের মূর্তিতে এক ঝলক উষ্ণতা। যুদ্ধে অনাথ এই ছোট সবুজ চারাগাছটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিপালনের প্রয়োজন ছিল। আর এই প্রতিপালক হবার সিদ্ধান্তই করেছিলেন আন্দ্রেই শোলোকফ।

কিন্তু দুনিয়ার "ধীর প্রবাহিনী ডন"ই শোলোকফের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসাবে, এবং খুব সঙ্গতভাবেই, বিবেচিত হয়। নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম যখন সুরু, সেই সময় যে কসাক শ্রীগরি মেলেকফ সহানুভূতি ও বিরূপতার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল তার ট্র্যাজেডি আমাদের

মিখাইল শোলোকফকে যে কাজ করতে হয় তার বিপুলতার যথাযথ ধারণা এখেকে প্রায় পাওয়াই যাবে না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসে ও অতি প্রত্যুষে লেখবার সময় স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন তিনি।

শোলোকফের উপর জনগণের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। এক সময় তিনি বলেছিলেন: "সম্ভবতঃ আমাদের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এমন ভাবে লেখা যাতে আপনি যা লিখছেন তারজন্য সবসময় দায়ী থাকতে পারেন।..." তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার জন্য শোলোকফের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জনগণের। জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে আশা করে আছেন নতুন নতুন বই, নতুন নতুন সৃজনশীল আবিষ্কার; জনসাধারণ সোভিয়েত সাহিত্যের চমকপ্রদ উন্নতির সঙ্গে শোলোকফের নামকে জড়িত রাখতে চান।

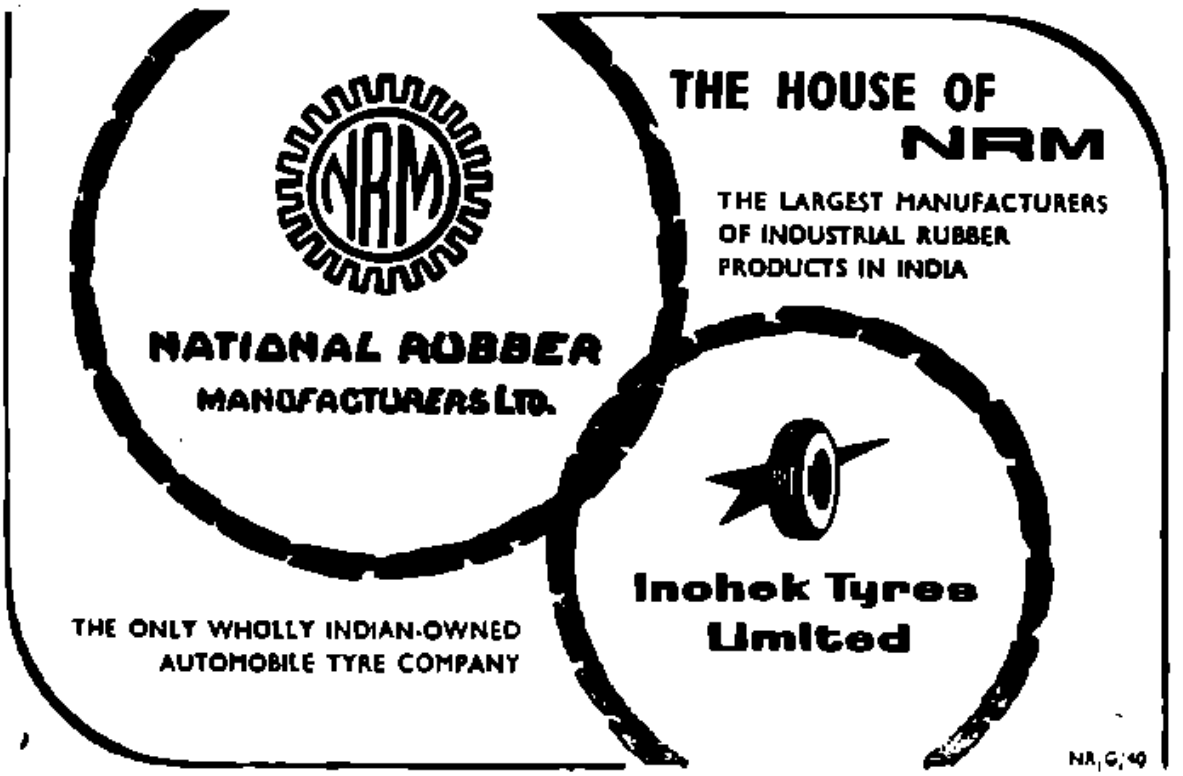

চলতি দুনিয়া

হাসপাতালে "ব্ল্যাক বুক"

জানেন কি প্রতিটি হাসপাতালে একখানা ক'রে 'ব্ল্যাক বুক' থাকে? রোগীরা এর অস্তিত্বের কথা কখনোই জানতে পারে না। কিছু মেয়ে-পুরুষ মনে ক'রে তারা অসুখে ভুগছে, অথচ সত্যি তারা নীরোগ। কাল্পনিক রোগাক্রান্ত এই সব নরনারী হাসপাতালের বহির্বিভাগে অথবা প্রতিদিন ভিড় করে; আসল রোগীদের অসুবিধা ঘটায়। হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধার এরা অপব্যবহার করে। এদের নামের তালিকা ও কাল্পনিক রোগের বিবরণ থাকে হাসপাতালের 'ব্ল্যাক বুক'-এ। হাসপাতালগুলোও এখন সেয়ানা হ'য়ে উঠেছে। এই সব মিথ্যা রোগীদের পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দেয়। কারণ অনেকে হাসপাতালে যেতে চায় ভালো থাকা-খাওয়ার লোভে। সারারাত বেচে না থাকা হ'য়ে গেছে তার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে গেছে এমন মেয়েদেরও দেখা গেছে।

মেডাল ফেরৎ

দুজন লোক তাদের এম. বি.ই মেডাল ফেরৎ পাঠিয়েছেন, কারণ ওই একই মেডাল দে'য়া হয়েছে চারজন বীট কবিকে। ওই দু'জন ব্যক্তির একজন হলেন বয়েস এয়ার কোর্স-এর ভূতপূর্ব স্কোয়াড্রন লীডার পল পীয়ারসন। তাঁর বয়েস এখন ৬৪। বর্তমানে তিনি একটা কম্পিউটার কার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি মনে করেন বীটলের ওই পুরস্কার দে'য়াতে মেডালটির অপমান করা হয়েছে, মেডালটিকে সস্তা ক'রে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের 'অবিমৃষ্টকারীতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনকেও চিঠি দিয়েছেন।

আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী

মু আন তাউনীকে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী বলে নির্বাচিত করেছেন আমেরিকাবাসীরা। মু-এর বয়েস এখন কুড়ি। ওহিয়োতে তিনি আর্টের ছাত্রী। তিনি 'মিস ইউ. এস এ ১৯৬৫' আখ্যা অর্জন করেছেন। 'মিস ইউনিভার্স' আখ্যা অর্জনের জন্য তিনি শীঘ্রিরই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

অদ্ভুত বন্দিনী

বাবা-মা আঠারো বছর মেয়েটিকে খাঁচায় আটকে রেখেছিল। সম্প্রতি পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে।

মেয়েটির বয়স এখন ছত্রিশ। দক্ষিণ ইতালীর একটা খামার বাড়ির ভেতরে কাঠের খাঁচায় তাকে আটকে রাখা হয়। একটা বেনামী চিঠি পেয়ে পুলিশ সেই খামার বাড়িতে হানা দেয়,

ইডা বার্জাকে উদ্ধার করে। বাইরের দুনিয়া থেকে এতকাল বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তার আচার আচরণ সবই অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। পুলিশ যখন তাকে খাঁচা থেকে বার ক'রে আনে, তখন তার পরনে ছিল কেবল কয়েক কালি ছেঁড়া ন্যাকড়া। তার হাত পা দেখাচ্ছিল শুধু সরু কাঠির মতো।

প্রতিবেশীরা পুলিশকে বললো উদ্ধার হওয়ার আগে পর্যন্ত ইডা বেশ স্বাভাবিক আর সুন্দরী ছিল। সে প্রেমে পড়ে। তারপরই তার আর খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। ইডার বাবা জেরার উত্তরে পুলিশকে জানালেন যে মেয়ে যাতে পরিবারের মুখে চুন-কালি দিতে না পারে তার জন্যই তিনি মেয়েকে ওইভাবে আটকে রাখেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গল্পের খোরাক

মধ্য রাত্রি। নার্সদের হোস্টেলে একটি শয্যাকক্ষের সামনে দুই যুবককে আবিষ্কার করলেন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাট্রন।

দুটি যুবকই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র। তারা ম্যাট্রনকে জানালো: "ছাত্রদের পত্রিকায় একটা গল্প দেবো, তার খোরাক যোগাবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।"

তবু অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাট্রন পুলিশ ডাকলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটা জানানো হলো। ছেলে দুটির জরিমানা হ'য়ে গেলো। অক্সফোর্ড-এ র‍্যাড ক্লিফ নার্স হোস্টেলে ঢোকা কত সহজ এই বিষয় নিয়ে একটা কিছু লেখবার ইচ্ছা নিয়ে ওরা রাত দুপুরে ওখানে গিয়েছিল।

প্রেমের জন্য 'ছুটি'

কৌঅপারেটিভ কমিশন এই মত জানিয়েছেন যে মাসে অন্তত একবার ক'রে স্ত্রী-র সঙ্গে দেখা ক'রে আসার জন্যে কিছু কিছু অপরাধীকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁদের ধারণা এতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কমে যাবে। হয়তো এই ব্যবস্থায় দু'চারজন অপরাধী পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। তবু অসংখ্য পরিবারের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সেই ঝুঁকি নেবারও সার্থকতা আছে।

জীবনের সেরা জিনিস কি ?

প্রশ্নটা উঠেছিলো চায়ের আসরে: জীবনের সেরা জিনিস কি ? যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের উপরে—তাদের একজন বললো: স্বাস্থ্য, চারজন বললো টাকা। যাদের বয়েস একুশের নিচে তাদের একজন বললো: হাসি-ঠাট্টা, চারজন বললো: প্রেম। মানুষের যত বয়েস বাড়ে ততই বোধ হয় মূল্যবোধ তার কাছে বদলে যায়। বয়স বাড়লে যদি মনে হয় টাকাই জীবনের সেরা পদার্থ, তবে বয়স না বাড়াই ভালো।

অসম দম্পতি

পঁচিশ বছরের সুন্দরী অভিনেত্রী সোনিয়া রোমানফ ৮১ বছরের এক বৃদ্ধকে বিয়ে করেছেন। বৃদ্ধ পরেছেন বানি-র মাথা-জোড়া টাক। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটা চলা করেন। সোনিয়া বিবাহিত

জীবনে নাকি খুবই সুখী। অন্তত তিনি নিজে এ কথাই অনেককে বলেছেন। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় তিনি প্রচুর উপহার সঙ্গে নিয়ে যান। তা ছাড়া, লরেন্সো পড়তে ভালবাসেন ব'লে সোনিয়া তাঁকে অনেকগুলি সাময়িক পত্রের গ্রাহকও ক'রে দিয়েছেন।

মানুষখেকো কুমীর

পূর্ব বোর্নিয়োর নদীগুলিতে আগে কুমীর কিলবিল করতো। এখন তারা প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে। এক ইঞ্চি কুমীরের চামড়ারও চড়া দাম। তাই যে পারে সেই কুমীর মারে। বিশেষ ক'রে মানুষখেকো কুমীরদের বোধহয় আর বাঁচতে দেওয়াই হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মানুষখেকো কুমীরদের চামড়াই সব চাইতে সেরা জাতের চামড়া। মানুষ খায় বলেই কি ওই কুমীরগুলির চামড়া অত সুন্দর? বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করেছেন, কোনো সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছাতে পারেন নি।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে একদিকে সমাজসেবী এবং রাজনীতিকের যেমন দুশ্চিন্তার শেষ নেই, তেমনি বিজ্ঞানীরাও জন্ম-নিরোধের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ক'রেই চলেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে একটি অভিনব গবেষণা চলেছে। এই গবেষণা সার্থক হ'লে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ খুবই সহজ হবে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এমন একটা টীকা আবিষ্কার করতে, যা নিলে মেয়েদের সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেবে না।

এবারে গ্রাম আগে

নগরবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ফ্যাশনই গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাকে সাধারণতঃ প্রভাবিত ক'রে থাকে। কিন্তু জার্মানীর ব্যাভেরিয়াতে ঘটে তার উল্টো। সেখানে গ্রামের কৃষকদের পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশন শহরের মানুষদের প্রভাবিত করে। শহরের উপরে গ্রামের এই ধরণের প্রভাব সত্যি বিস্ময়কর।

জার্মানীর দক্ষিণ রাষ্ট্র ব্যাভেরিয়া ও সেখানকার প্রধান শহর মিউনিখ-এ জামা-কাপড়ের ফ্যাশনের উপরে জার্মান কৃষকদের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রভাব অপরিসীম। কৃষকদের পোষাক হ'লেও তাতে আছে রুচিবোধের নিখুঁত পরিচয়। বিশেষ করে অভিজাত ঘরের নর-নারীরাও এখন কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত এইসব জামা-কাপড় ব্যবহার করছেন। শহরের মানুষদের পরিচ্ছদের উপরে গ্রাম্য পরিচ্ছদের এমনি প্রভাব অষ্ট্রিয়াতেও অনেক দিন থেকে দেখা যাচ্ছে।

য়ুরোপের যে সব অঞ্চলে ডি খেলার প্রচলন সেই সব অংশই ব্যাভেরিয়ার লৌকিক পরিচ্ছদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বেশী—মিউনিখের বুলেভার্ডে, ভিয়েনায়, হলব্রাক শহরে, এবং অন্যত্র! যে সব পোষাক বহুদিন শুধু অবহেলা অঞ্চল এবং গ্রাম্য এলাকাতে প্রচলিত ছিলো, এখন তা শহরের তরুণ-তরুণীদের খুবই প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। শুধু জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ানরা নয়, মার্কিনীরা এবং ইংরেজরাও ওই সব গ্রাম্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে শুরু করেছেন। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় আজকাল এই

সব পোষাক বেশ রপ্তানী হচ্ছে। এমনকি সুদূর আপ্'নেও। হঠাৎ শহরের লোকেরা গ্রাম্য পরিচ্ছদের এমন ভক্ত হ'য়ে উঠলেন কেন? এর কারণ বোধ হয় এই যে শহরে থেকেও তারা উপভোগ করতে চান অপরূপ-প্রকৃতির রূপ, গ্রামের রমণীয় ও শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। অন্তত পোষাকের মধ্যে দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়। আর অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই এই ধরণের পরিচ্ছদ শহরে চালু করেছিলেন প্রথম।

শহরের লোকেরাও গ্রাম্য পরিচ্ছদ পরার ফলে তারা যখন ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে যান তখন সেখানকার লোকদের সঙ্গে তাদের গ'ড়ে ওঠে একটি সহজ সরল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

এক হাজার পাতার একটি সংখ্যা

'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকা গত ১৭ই অক্টোবর (রবিবার) এক হাজার পাতার একটি সংখ্যা বের করেছেন। কাগজটির ইতিহাসে এই বিশেষ সংখ্যাটি শুধু অদ্ভুতপূর্ব নয় বৃহত্তম। এই সংখ্যাটির ওজন হচ্ছে ৭ পাউণ্ড ১১ আউন্স। এই সংখ্যাটিতে আছে ১৫টি বিভিন্ন বিভাগ এবং ১২ লক্ষ লাইন বিজ্ঞাপন। সংখ্যাটি ছাপতে লেগেছে ৪,১৮৭ টন নিউজ প্রিণ্ট।

মেয়েদের চাকুরীর বয়স

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন যে, চল্লিশ বছরের উপরে যাঁদের বয়স এমন সব মেয়েদের চাকরী করা উচিত। তাঁদের বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, চল্লিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে মেয়েরা তাঁদের কর্মক্ষমতার শীর্ষস্থানে পৌছায়। এবং ঐ সময় তাদের চূড়ান্ত দায়িত্ববোধ অন্যায় আর সন্তান সন্ততিরা সব বড় হয়ে উঠার দরুণ সংসারের কাজও অনেক হালকা হয়ে যায়।

দেহ মনকে সুস্থ রাখার জন্য তরুণী মা'দের যাদের চাকরী ও ঘর দুইই সামলাতে হয় তাদের কম খাটতে ও বেশী বিশ্রাম করতে বলেছেন। তা না হলে বেশী পরিশ্রমে তাদের স্বাস্থ্যের ওপর অযথা চাপ পড়ে।

প্রেম নিবেদন

ওয়েলস শহরের এক মহিলা বিলাতের একটি সুবিখ্যাত মেয়েদের কাগজে লিখেছেন, আজকাল তরুণ-তরুণীরা যেভাবে সবার রাস্তায় চুমো বিনিময় ও প্রেমালিঙ্গন করে তা দেখে সত্যিই স্তম্ভিত ও হতভম্ব হতে হয়।

তারা কি বুঝতে পারেনা যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতা কত গর্হিত ও এর পরিণাম কি অমঙ্গলজনক। তিনি বলেন, প্রেম নিবেদনেরও বিধি নিয়ম ও স্থান কাল আছে।

শিক্ষক

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রস্তাবটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। নমিতা কালো ভুরু জোড়া একটু সঙ্কুচিত করে, গ্রীবাটা একটু বেঁকিয়ে খানিকটা অনুনয় ও অবজ্ঞার সুরে বললে—আজ পড়ান থাক মাস্টারমশাই। পড়তে ভাল লাগছে না। সিনেমার টিকিট কাটিয়ে রেখেছি দুটো। চলুন ঘুরে আসি দুজনে।

—আমি যাব! সুকুমার একটু আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল নমিতার মুখের দিকে। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়ানর পেশা নিয়ে সারাদিনই কোলকাতা শহরটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে হয়। এম. এ. পাশ করে চাকরির ধান্দা না করে, অধ্যাপনার এ বৃত্তিটা মন্দ লাগে না। অনেকের অনেক কিছু আদর আবদার হাসিমুখে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ঠিক এ ধরণের একটা লঘুসুখের প্রত্যাশা নিয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রী এ প্রস্তাব কখনও করেনি। পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখার মধ্যে কেমন একটা সমবয়সীসুলভ প্রীতির সম্পর্ক থাকার দরকার থাকে। কোন ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে সে সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তবু যুগ পালটেছে—ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের সেই কড়া বাঁধুনি শিথিল হয়েছে—শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে সযত্নে ব্যবধান রচনা করে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারলে তবেই পেশাদার জিনিষ সহজে পেশাদার যায়। নমিতার বাবা প্রথমদিন এই ধরনের সদুপদেশ দিয়েছিলেন সুকুমারকে। সেটা মেনেই চলছিল সুকুমার—মন্দ লাগছিল না। বয়সের ব্যবধান এমন কিছু নয়। তবু আজকের এ প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত। কিসের একটা সঙ্কোচে সুকুমার অস্বস্তিবোধ করছিল।

এসব কিছুই নমিতার মনযোগে পড়েনি। পড়বেও না। আগে থেকেই সেজেগুজে তৈরী ছিল। সকাল থেকেই মেঘ থমথম আকাশ। এখন বিকেল, কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। প্রকৃতির প্রভাবটা রয়েছে নমিতার দেহে মনে। নিজের সাজগোজ আর একটু নিখুঁত করে নেওয়ার দিকে তার দুটি হাত, দুটি চোখ ব্যস্ত। সেই আবদারের সুরটা আবার শোনা গেল—উঠুন না।

—কিন্তু আমি তো বড় একটা সিনেমা দেখিনা। সুকুমার নিজের অবস্থিটা সতর্পণে চেপে রাখতে চাইছে।

—সেজন্যেই দেখা দরকার। সিনেমা দেখা মানে তো খানিকটা সময় কাটানো। একঘেয়ে সময় থেকে একটু ফাঁক ছেড়ে বাঁচা।

সুকুমার একটু হেসে বললে—তার ওপর যখন আকাশে মেঘ, বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস তখন বাড়ির ভেতরটা ভয়েট লাগবেই।

খুসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নমিতা। সেই জন্যেই কথাটা ওকে ঐভাবে বলা। ছাত্রীর মনের খোরাক খানিকটা মিটিয়ে চলা, আধুনিক নতুন রীতির পড়ান পদ্ধতির পর্য্যায় পড়ে। নমিতার বাবার এ ধরণের মতবাদটা প্রায় মেনেই নিয়েছে সুকুমার। তবু সুকুমারের মনে হল নমিতার বাবা মিঃ মুখার্জির একবার অনুমতি নেওয়া উচিত।

মিঃ মুখার্জি বড় ব্যবসায়ী, ব্রাসস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রোপ্রাইটার। আদর কায়দা

সাহেবী হলেও তাঁর এই একমাত্র আদুরে মেয়ের তিনিই অভিভাবক। তাঁর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

সুকুমার জিগেস করলে—তোমার বাবাকে জিগেস করেছ? তাঁর অনুমতি নেওয়া দরকার।

হাত দুটো নেড়ে নমিতা বললে—ওসব আমার নেওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু ওর অনুমতি নেওয়া হয়ে গেলেই হয় না। কোথায় যেন বারবার ঠেকল সুকুমারের। একটু ইতস্তত: করে উঠে পড়ল।

—আপনি কি বাবার কাছে যাচ্ছেন? নমিতার প্রশ্নে অল্প সুর। ক্ষুণ্ণ ভাব।

—হ্যাঁ, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, আমার একবার কথা বলে নেওয়া দরকার।

—আমি যে বললাম, তার কোন দাম নেই বুঝি?

এ ধরণের প্রশ্ন এমনভাবে করে বসে নমিতা যে ঠিক মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিতে অসুবিধে হয়। এখনও তাই হল। সুকুমার বললে—আমি সমর্থন জানালে তোমার দাম আরও বেড়ে যাবে নমিতা!

নমিতা খুসি হল। ওর হালকা তনুলতাটি খুসির জোয়ারে ভেসে নিচের তলায় নেমে এল। ও যেন বয়সের অনুপাতে বড্ড ছেলেমানুষ। তাই—!

মিঃ মুখার্জি সকালের দিকে এক বেলা অফিস যান। বিকেলের দিকে নিজের বাড়ির দপ্তরেই থাকেন নানা কাজের তাঁড়ে। শুধু মুখ তুলে তাকালেন সহাস্যে। পাইপটা দাঁতে কামড়ান ছিল তাঁর স্বাভাবিক কায়দায়। বললেন—কি ব্যাপার?

—নমিতা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

—গ্লাড্‌স্ নাথিং স্ট্রেঞ্জ্!

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম···!

—বেশতো! এতে বলার কি আছে! ইয়ং বয়—গো এনজয়! পড়াশোনাটাই সব নয়। একটু রিলিফ্ চাই। উইস্ ইউ গুড লাক্—! মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। ওর মুখটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। এইটুকুই যেন দেখতে চাইছিলেন।

নমিতা হাসিমুখে যেন মজাটা উপভোগ করল। নমিতার কথাই রইল। বাপের হাতের মিষ্টি আদরের প্রলেপ পিঠে মেখে হাসিমুখে সুকুমারের সঙ্গে বেরিয়ে এল নমিতা।

বাড়ির বিরাট হাডসন্ গাড়ি। সুকুমার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ—শিক্ষকতা করার জন্যে যে ভদ্রবেশটুকু প্রয়োজন, তাই আছে। বাহুল্যবর্জিত। হাডসনের নরম কোমল গদিতে একটু অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। গাড়িটা হাওয়া কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। নমিতা প্রথমটা সীটে চুপ করে বসে রইল। বর্ষণসিক্ত মাতাল হাওয়া উপভোগ করল। সুকুমার একসময় বললে—কি হল! একেবারে চুপ করে বসে যে?

নমিতা সচেতন হল। গদির স্প্রিং-এ দুবার দুলে নিয়ে একটু ভেবে হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—না কিছু হয়নি।

—একেবারেই যে কিছু না, তাতো মনে হচ্ছে না।

—কি করে বুঝলেন?

সুকুমার ওর সরলতায় নিজে সরল হতে চাইল। বললে—তোমার মত মেয়ে তো চুপ করে বসে থাকে না। তাছাড়া তুমি যা চেয়েছিলে, তোমার ইচ্ছামতই তো সব হয়েছে।

নমিতা মুখ টিপে হাসল, বললে—শুধু একটি ব্যতিক্রম হয়েছে। সিনেমা দেখার প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকে প্রথম এসে বেশী খুসি হওয়ার। নমিতার মুখে অল্প হাসি, অভিমানিনীর আনত দৃষ্টি, মুখে রক্তিম আভা।

সুকুমার একটু অস্বোস্তি বোধ করল। কি রকম একটা আড়ষ্টভাব। নমিতাকে সম্পূর্ণ জানা নেই। পড়াতে এসে এতটা জানবার আর সুযোগ কোথায়। সেখানে পরস্পরকে জানার পরিসর অল্প। আজ সে পরিধির পরিসর ছেড়ে এগিয়ে আসা হয়েছে। এখানে নমিতা আর একটু প্রসারিত। তাই একটা বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে সুকুমার ওকে চিনতে চাইছিল। সুকুমার হেসে বললে—আমার তরফ থেকে প্রস্তাবটা খুব সঙ্গত হত না। তোমার কাছে আমার প্রথম পরিচয়, আমি তোমার শিক্ষক। তার একটা মর্যাদা আছে। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের কাছে নিজেদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। নিজের কাছে নিজে বিনত থাকার দায়িত্ব।

নমিতা হেসে উঠল। বললে—সেকেলে পণ্ডিতের কথা ছাড়ুন। চেহারায় পোষাকে সেকেলে পণ্ডিত মোটেই মন আপনি। তাহলে ওসব কথা বলার কি দরকার।

সুকুমার বললে—তা অবশ্য ঠিক।

—একটু বেড়াব, খেলব, আনন্দ করব—এতে অত সব দায়িত্ববোধ, নীতিবোধগুলো টেনে এনে অহেতুক জায়েলা বাড়ান কেন! অতশত আমি বুঝি না। এই দেখুন না—গাড়ি ছুটছে, বাতাসের ঝাপটায় আমি বেসামাল। কোনটাই তারই ইচ্ছায় ঘটছে না। অথচ এই উচ্ছ্বাসের আনন্দও কম নয়। অস্বীকার করতে পারেন?

সুকুমার অবাক হয়ে ওর কথা শুনল। কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল চিত্তাপ্রসূত হলেও, তার একটা গভীরতা আছে। সুকুমার বললে—তুমি এত কথা শিখলে কোথা থেকে?

নমিতা লজ্জা পেল। লজ্জায় চুপ করে গেল।

সিনেমা হলের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা হলে বসে সময় কাটতে লাগল। সিনেমার আখ্যান-বস্তু মন্দ নয়। প্রথম প্রেমের ব্যর্থ পরিণতি। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে নায়িকা যাকে আপন করে নিয়েছিল, সে তাকে ত্যাগ করে জীবনের আরও উঁচু প্রতিষ্ঠার আশায় অন্য এক বিত্তশালী কন্যার প্রেমে হাবুডুবু। প্রথম নায়িকা অনুতপ্ত, লজ্জিত। দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে জীবনে নতুন করে দাঁড়াবার ব্রত আরম্ভ করেছে।

নমিতা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললে—কে বোকা বলুন তো?

—বোকা আবার কে হবে?

—আপনি কিছু বোঝেন না—প্রথম নায়িকাই বড্ড বোকা।

সুকুমার একটু যেন চমকে উঠল। নমিতাকে যতটা ছেলেমানুষ মনে হয়েছে, সত্যি কি ততটা ছেলেমানুষ? কথার জবাব না দেবার সুযোগ আছে। সিনেমার ঘটনা প্রবাহের দিকে নিবিষ্ট হতে চাইল সুকুমার। সেটা সত্যিই, প্রথম নায়িকা প্রতিষ্ঠা পেল। সুকুমার বড্ড বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

সিনেমা শেষে ফেরার সময়, আবার সেই উন্মত্ত হাওয়া। কিন্তু সুকুমার নির্ব্বাক।

নমিতা বললে—কথা বলছেন না কেন?

সুকুমার একটু হাসল। বললে—কি আর কথা বলব!

—আপনি বোধহয় রাগ করেছেন আমার ওপর।

—না। রাগ করব কেন?

—নায়িকাকে বোকা বলতে আপনি রাগ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলুন, সে নায়কের মত চালাক হতে পারল না কেন?

সুকুমার সোজা হয়ে বসল। বললে—নায়ক সুবিধাবাদী, নৈতিক চরিত্রভ্রষ্ট মানুষ। আর প্রথম নায়িকা, একবার ভুল করলেও, সেই প্রকৃত মানুষ। ভুল শোধরাতে জানে।

নমিতা যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বললে—ভুল শোধরাবার ঐ একটা পথ যে আছে তা নয়। প্রথম নায়ক তাকে বঞ্চিত করেছে, তাই বলে যে আর সব অজ্ঞাত নায়করাও যে করবে, এমন কোন কথা নেই।

সুকুমার—'দাঁড়াও দাঁড়াও' করে চেঁচিয়ে উঠে গাড়ি দাঁড় করাল। বললে—এই গলিটার মুখেই আমার মেস।

—ও মা! তাই নাকি!

সুকুমারের সঙ্গে নমিতাও নেমে দাঁড়িয়েছে নীচে। বললে—চলুন আপনার মেসটা দেখে আসি।

সুকুমার আশ্চর্য্য হয়ে বললে—এখন রাত দশটা। বাড়ি ফিরবে না?

ও আমার অভ্যাস আছে। বাবাকে তো বলেই এসেছি।

মিঃ মুখার্জি'র 'সো এনজয়' কথাটা কানে বাজছিল সুকুমারের। একটু গুছিয়ে নিতে চাইল নিজেকে সুকুমার। বললে—কিন্তু এত রাত্রে, পুরুষদের মেসে মেয়েছেলে নিয়ে যাওয়া—!

নমিতা সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল গম্ভীর মুখে।

সুকুমার বললে—তুমি কিছু মনে কর না নমিতা।

—না, মনে করবার কি আছে। আমার এসব অত মনে থাকে না।

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। ঐ শব্দের মধ্যেই গলা তুলে সুকুমার বললে—কিন্তু আমার থাকে। আমি নিজের কাছে নিন্দনীয় হয়ে উঠতে পারিনা।

গাড়ির গর্জ্জনে কথাটা চাপা পড়ে গেল কিনা বোঝা গেল না।

গাড়িটা সামনে থেকে বেরিয়ে যেতে, সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শরীরটা হালকা মনে হচ্ছে।

আলোর স্বপ্ন

পরিতোষ মজুমদার

ঐজের দিকে তাকায় পার্থ। তারপর দৃষ্টিটা চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোর ওপর পড়ে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা ঘৃণার বিষাক্ত সাপ যেন পাক খেয়ে ওপরে উঠে আসে। চারদিকের লোকগুলোর ভেতরে নিজেকে কল্পনা করেও ভীষণ ছোটো আর নীচু মনে হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মন যেন এই জায়গায় এক হয়ে গেছে। নিজের ওপরেও রাগ হয়। এই নারকীয় পরিবেশে আসাটাই উচিত হয় নি। অনেকবার নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারে নি। যার আকর্ষণ আইভির জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। অনেক বুঝিয়েও যার হাত থেকে আইভির হাত ছাড়াতে পারে নি—সেই পরিবেশটাকেই নিজে চোখে দেখতে এসেছে পার্থ। কী এমন আনন্দ এ জীবনের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে আছে, যার হাতছানি অনেক চেষ্টা করেও আইভি এড়াতে পারে নি।

টাকা? ইউরোপে যে কোনো শ্রমের বিনিময়েই তো বেঁচে থাকবার মতো অর্থ পাওয়া যায়। তবে হ'তে পারে আলো-ছায়ার সময়ে দাঁড়িয়ে এতোগুলো কামনা-ভরা দৃষ্টির মাঝে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে মাদকতা আছে—সে নেশাই হয়তো বা ওকে এজীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া খুলতে দেয় নি।

ওয়েট্রেসের ডাকে সংবিত ফেরে। সামনের টেবিলে দিয়ে যাওয়া ভাল্পেনের গ্লাসটা মুখে তুলতে গিয়েও রেখে দেয় পার্থ। ইচ্ছে করেনা। একটু আগের তৃষ্ণাটা যেন ইতিমধ্যে ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

প্যারিস সহরের সবচেয়ে কুখ্যাত নাইট ক্লাব এটা। সুতরাং সমাজের নীচু স্তরের লোকজনেরই বেশী আনাগোনা এখানে। এমনিতেই ফ্রান্সের নাইট ক্লাবগুলো কন্টিনেন্টের অন্য দেশের নাইট ক্লাবগুলোর চেয়ে নগ্ন। উদ্দাম ফরাসী জাত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেই ভালোবাসে। সেই কারণেই রোববারের সকালে গীর্জায় যতো লোক জমা হয়, সন্ধ্যায় তারচেয়ে অনেকবেশী জমে নাইট লোকালগুলোতে।

পাশের লোকগুলোর একরাশ চিৎকারে মনটাকে সজাগ করে দেখে ঐজের আলোগুলো মৃদু হয়ে আসছে। একটানা ঢিমে তালে বেজে চলা বাজনার সুর উচ্চগ্রামে উঠেছে। আর তারই সঙ্গে ছন্দ রেখে একটি মেয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রায়-বিবসনা দেহটাকে নি-পোষাক করার তোড়জোড় সুরু করেছে।

পার্থ ভাল্পেনের গ্লাসটাকে পূর্ণ রেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। মানুষগুলোর ওপর একরাশ ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে ক্যাবারে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। কিছুক্ষণ আগেকার ঘৃণায় তিক্ত মনটাই ওকে শান্ত হ'তে দেয় না।

ঘুরতে ঘুরতে প্যারিস সহরের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে আসে পার্থ। সেন নদীর ওপর

সিঁড়ি আর সেই এত্তিয়েন দরজা দু'টিকে যোগ করা সেতুটার উপরের নিওনবাতির মিছিলের প্রতিবিম্ব পড়েছে। ঢেউয়ের দোলায় আলোর রেখাগুলো একটু একটু কাঁপছে। যেন। উদ্যান ক্লাবের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে যেন। সুইস-আল্পসের বরফ-গলা জলে স্নান নিয়ে বহু উথান পতনের পথ বেয়ে ঢেউগুলো যেন এই একমুঠো আলোর পিপাসাতেই এতোদূরে ছুটে এসেছে। সেতুর পীলার-গুলোর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে আবার এগিয়ে গেছে দূরের ডাকে।

পার্থ নিজের ভেতরেও একমুঠো আলোর আকাঙ্খায় একরাশ অন্ধকার পাড়ী দিয়ে আসা ঢেউগুলোর স্পন্দন অনুভব করে। ইচ্ছে যায় নিজেকেও ঢেউগুলোর সঙ্গে ভাসিয়ে দিতে। জীবন-ভর ভেসে বেড়াতে। কিন্তু পারে না। আইভিই যেন তা' দেয় না।

এক একবার ইচ্ছে যায় নিজের জীবনের থেকে ওকে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে। এমনকি পরিচয়ের শেষচিহ্নটুকুও রোদের অতল জলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তারপর ফেলে দিয়ে আসা দশজনের মতো একটা শান্ত স্নিগ্ধ ঘরের কোণে নিষ্ঠ দু'টো হাতের আশ্লেষীতে আগামী জীবনটা পার করে দিতে। জীবনের প্রাঙ্গণে আইভির পদধ্বনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু স্বীকার না করলেই কি কোনো সম্পর্ক ছেদ করা যায়? পারা যায় নিজের জীবনের পট থেকে কাউকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে?

আইভি কি চায়? হয়তো বা তা' ও নিজেও জানে না। হয়তো বা জেনেও সে চাওয়ার প্রতি ওর বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

পার্থ উঠে পড়ে। রোদের জলে অনেকক্ষণ আগেই চাঁদ নেমে এসেছে। সিঁ সহরের ওপরেও ঘুমের একটা স্নিগ্ধ আবেশ জড়িয়েছে। দূরের সেতুর ওপরকার নিওন বাতিগুলো কেমন যেন ঘোলাটে চোখে উদাস দৃষ্টিতে পৃথিবীটাকে দেখছে। এতোক্ষণে আইভিও নিশ্চয়ই ট্রিপটিস শেষ করে সামনে গেস নিয়ে বসে কারুর সঙ্গে গল্পগুজব করা বসে চলেছে। আইভি অবশ্য কথা বলতে ভালোবাসে। সে কথার যে সব সময় মানে খুঁজে পাওয়া যায়, তাও নয়। তবু ও একটানা বলে চলে। প্রথমদিকে ওকে পার্থর প্রগলভতা বলে মনে হ'তো। ক'দিন পরে অবশ্য বুঝেছিলো অর্থ ছাড়া অনর্গল কথা বলে যাওয়াতেই ও আনন্দ পায়। যেসে কথা তো অনেকেই বলে, তাই ওর অর্থহীন কাকলীই পার্থর ভালো লাগতো।

রাত হয়ে গেছে। পলে পলে রাতের বয়েস ভারী হচ্ছে। পার্থ জানে, বাড়ী গিয়েও ঘুম আসবে না। আজকের সন্ধ্যাটা ওর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে ছন্দ নিয়ে এসেছে, তার হাত থেকে এতো তাড়াতাড়ি নিস্তার ও পাবেনা। তার চেয়ে অনেক ভালো রাস্তার ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে বাকী রাতের আয়ু শেষ করে দেওয়া। অথবা, চুপ করে এখানে বসে থেকে রোদের একটানা অবিরাম ঝরে চলা দেখা। তবু একসময় চাঁদ চলে পড়ে। পার্থকেও বাড়ীর দিকে এগোতে হয়।

ঘরে ঢুকে ইচ্ছে করেই আলো জ্বালে না। জ্বালতে ইচ্ছেও করে না। কি হবে? যে জীবনের ঘরের দাইরে কোনো আলো নেই, বাইরের আলোতে তার অন্ধকার আর কতোটুকু কাটবে। তার চেয়ে অনেক ভালো এই অন্ধকারের গর্ভেই নিজেকে সঁপে দেওয়া।

* * *

মেয়েটিকে নজরে পড়তেই একটু চমকে উঠেছিলো পার্থ। দূরে সমুদ্রের ওপারে পূর্ব অন্ত

যাচ্ছে। তারই শেষ রশ্মির ছটায় অষ্টিয়ার সমুদ্রোপকূলে একলা দাঁড়ানো মেয়েটিকে কি রকম অসহায় আর বিষণ্ণ বলে মনে হয়েছিলো। পেছনে অস্পষ্ট ইতালির সহর; সামনে বিশাল সমুদ্র। সংকীর্ণতা এবং উদারতা—এই দুই জগতের মাঝামাঝি দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখে পার্থর মনেও নিঃসঙ্গতা ঢেউ তুলেছিলো। পার্থকে এগিয়ে আসতে দেখেই মেয়েটি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো। তারপর পরিষ্কার ইতালিয়ান ভাষায় শুভসন্ধ্যা জানিয়ে বলেছিলো,—কি সুন্দর সন্ধ্যাটা, তাই না?

মেয়েটিকে প্রথম নজরে ইতালিয়ান বলেই মনে হয়েছিলো। টানা টানা নীলাভ চোখ দুটিতে সামনের সমুদ্রের ছায়া ছড়ানো। কোমলতা মাখানো একটা অবয়ব। স্নিগ্ধতায় ভরা।

উত্তরটা দিতে একটু দেরীই হয়েছিলো পার্থর। দেরী হওয়ার প্রহরগুলো একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো মেয়েটির দিকে। তারপর বলেছিলো,—হ্যাঁ, সত্যি সুন্দর সন্ধ্যাটা।

ইচ্ছে থাকলেও এর বেশী বলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একদিকে নিজের ইতালিয়ান ভাষার অপ্রয়োগতা অন্যদিকে অপরিচিতা। দুয়ের মাঝখানে ওর অপ্রস্তুত অবয়বটা বুঝতে পেরেই মেয়েটি এগিয়ে এসেছিলো। একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেসা করেছিলো,—আপনি তো বিদেশী?

পার্থ মাথা নেড়ে ওর কথার সমর্থন জানিয়েছিলো।

—আপনি কি ইতালিয়ান ভাষা জানেন?

ওর জিজ্ঞেসায় পার্থ ভাঙা ভাঙা ইতালিয়ান ভাষাতেই উত্তর দিয়েছিলো,—লিয়ঁ ইউনিভার্সিটিতে আমার ক'টা ইতালিয়ান বন্ধুর কাছ থেকে অল্প একটু শেখা।

ওর কথা শেষ হ'তেই মেয়েটি আনন্দে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠেছিলো।

আপনি লিয়ঁতে থাকেন? আমার বাড়ী হলো রোনের ওপারে সেন্ট এতিয়েনে। আর যখন ফ্রেঞ্চ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেন তখন ফরাসী ভাষাটা নিশ্চয়ই খুব ভালো জানেন।

মেয়েটির উচ্ছলতা পার্থর ভালো লাগে। নিঃসঙ্গবোধটাও যেন কিছুটা কেটে যায়। বিশাল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণের একাকীত্ব বোধটা যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিলো। মেয়েটিও যেন কথা বলতে পেরে কিছুটা সহজিয়া হয়। ওর জিজ্ঞাসায় পার্থ বলেছিলো,—মোটামুটি আমি বলতে পারেন।

পার্থর উত্তরে একটু চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করেছিলো,—ভাষা না জেনে আসাতে আপনার নিশ্চই খুব অসুবিধা হচ্ছে?

মেয়েটির প্রশ্নে ওর দিকে সোজাসুজি দৃষ্টি তুলেই পার্থ বলেছিলো,—না, অসুবিধা আর কোথায়। আর ইউনিভার্সিটি কদিনের জন্য বন্ধ। তাই ভাবলাম এই সুযোগে অষ্টিয়ার সমুদ্রটা দেখে যাই। সমুদ্রের নিজস্ব তো একটা ভাষা রয়েছে, সেই ভাষা যখন জানি আর তার দুয়ারেই যখন এসেছি, তখন সুবিধা-অসুবিধার কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না।

এর পরের প্রহরগুলোতে দু'জনেই দু'জনার অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসে আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ জীবনে আইভির সাহচর্য যেমন পার্থকে উজ্জীবিত করেছে, পার্থর পাশে দাঁড়িয়ে আইভিও একা জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছে। পার্থ যেমন ওর দেশের কথা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলেবেলার কাহিনী অসংকোচে ওকে বলেছে; আইভিও তেমনি ওর পিছে ফেলে আসা দিনগুলোর ইতিহাসের কোনো পরিচ্ছদ লুকোই নি। সে ইতিহাসের কোনো

পাতাতেই হয়তো বা আলোর ছোঁয়া নেই—তবু পার্থ তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে একটা মনের বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্খার বাদল-সন্ধ্যার কাজল প্রহরের স্বপ্ন।

• • • •

অন্ধকারে আমার জন্ম। মায়ের আঁধারের আড়ালে আমি বড়ো হয়েছি। স্বপ্ন? এরকম একটা জীবনে কি করে আর দেখবো?

আর্মান এস. এস. বাহিনী যেদিন আমাদের সহরে হানা দেয়, তখন আমার বয়েস খুব বেশী হলে তেরো চৌদ্দ বছর হবে। সামাজিক নিয়মে 'বাবা' বলতে যা বোঝায় আমার তেমন কেউ ছিলো না। একটু বড়ো হয়ে বুঝেছিলাম, আমার এই পৃথিবীতে আসা নিয়েই বাবা মা'র মধ্যে মতান্তর হয়েছিলো। মা'র ছিলো মাতৃত্বের লোভ আর বাবার ছিলো অসামাজিক উদ্দাম জীবনের আকাঙ্খা। আমি পৃথিবীতে এলে মা'কে সামাজিক নিয়মে বিয়ে করে বৈধ জীবন যাপন করতে হবে—অথচ সে জীবনের প্রতি তার ছিলো প্রচণ্ড অনীহা। তাই শেষ পর্যন্ত মা'কেই ছেড়ে গেলো।

বাবা ছেড়ে চলে যাবার পর মা'র সব আক্রোশ পড়লো আমার ওপর। তখন তারও মাতৃত্বের লোভ মিটে গেছে। আরম্ভ হয়েছে দু'টো পেট চালাবার সংগ্রাম। আর যে সংগ্রামের সূত্রপাতের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি।

হিটলার বাহিনী যেদিন রোন নদীর ওপারে লিঁয় সহরের পাশের মাঠে ছাউনি ফেলেছিলো—মা সে রাতে ওদের কাছে গিয়েছিলো কিছু রুটি রোজগারের আশায়।—হ্যাঁ, আমি জানি বেশের বয়সেও সেদিন একখণ্ড রুটি পাওয়া কতো অসম্ভব ছিলো। যে অন্ধকারে মা লিঁয়ের পাশের মাঠে রুটির খোঁজে গিয়েছিলো—সেই সন্ধ্যা বারবার ফিরে এলো; কিন্তু ফিরে এলো না শুধু মা।

আর আমি? সেই বয়েস থেকে অন্ধ জীবনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলাম। কখনো রুটির লোভে আর কখনো পুরুষগুলোর লোলুপতায় ভরা দৃষ্টি দেখবার নেশায়। দেহ বিক্রীর পয়সায় যাকে বেঁচে থাকতে হয়—তার জীবনে আর যাই হোক, সতীত্বের অথবা নারীত্বের যন্ত্রণা থাকে না। সুতরাং বলাই বাহুল্য ওসব বালাই আমারও ছিলোনা।

যে পুরুষ নৈতিকতার মুখোস এঁটে ঘুরে বেড়ায়, আমার পীনোন্নত বুক আর স্বচ্ছ ফ্রকের ওপরে ফুটে ওঠা নিতম্বের প্রতিটি রেখার ওপরে দৃষ্টি পড়লে, তাদের সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ নৈতিকতা মাখানো চাউনিতে যে কামনার আভাস ফুটে উঠতো—সেটাই আমার মন ভরাতো। সত্যি বলতে কি, বড়ো হয়ে যাবার কাহিনী শুনে আমার পুরুষ জাতটার ওপরেই বিতৃষ্ণায় জন্মেছিলো। আর সেই কারণেই অন্য সব পেশা থাকতেও যারের ট্রিপটিস গার্লের জীবনকেই বেছে নিয়েছি। আমার পীনোন্নত যৌবন দুটো একটু উদ্ধত হলে পুরুষগুলো যতো উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, তারচেয়ে বেশী উত্তেজনা অনুভব করি আমি আমার ভেতরে। হ্যাঁ, ওদের ঘায়েল দিতে পারায়।

• • • •

পার্থ তাকিয়ে দেখে জানালার বাহিরে আঁধার কেটে গিয়ে পুব আকাশে রঙের ছোপ লেগেছে। ছবির মতো লিঁয় সহরের বুকে পড়েছে নূতন সূর্যের প্রথম রশ্মি। আর সে রশ্মির মাঝে আবছা অস্পষ্ট আইভির মুখাবয়ব। অন্ধকারকেই সে বেছে নিয়েছে আলোর মুখোমুখি একদিন হবার আশায়।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় তরফদার

ক'জের কেরামতী

একে পুজোর বন্ধ। তায় পাক-চীন দুশমনি। মাথা ঘুলিয়ে গেছে। মাথা গরম হয়ে আছে। বিচিত্র কোন চিত্র বা ঘটনা মাথায় আসছে না। কী লিখবো ভাবছি এমন সময় কলমবাজ বন্ধু এসে হাজির।

কী রে অমন মনমরা হয়ে বসে কেন ?

বললাম, লেখা আসছে না, এ-মাসের চিত্র বিচিত্র।

এই কথা! শোন্, এবার একটা ডক্টরেটের থিসিস লিখে দে।

ডক্টরেটের থিসিস। সে আবার কি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই। ভয় নেই। থিসিসটা আমি তোকে দিয়ে যাচ্ছি। সেইটে এবার লিখে দে।

এই বলে পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার সামনে রেখে বললে, প্রত্যেক বছরই দেখছি অনেকেই ঘটপট ডিগ্রিস্ পেয়ে যাচ্ছে। গবেষণার কতই না বিষয়: গো পালন, ক্ষৌরকর্ম বিবর্তন, শিশুশিক্ষা, অক্ষর পরিচয় আরও কত না বিষয়। আমি যে 'গবেষনা' করেছি তা একেবারে মৌলিক।

কী রকম!

আমি দেখিয়েছি, আমাদের বাংলা বর্ণমালার প্রতাপ। এক একটা অক্ষরের কী দাপট! ধর এই "ক" অক্ষরটা, ঐ একটা অক্ষরকে নিয়ে তাকে প্রতি পদের আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহার করে আমি একটা গোটা কাহিনী রচনা করেছি। রীতিমত দুঃসাধ্য কাজ। অতএব এই থিসিস-কে মারে কে! আমার ডক্টরেট আটকাতে পারবে না কেউ। নে, তোকে ভালবাসি, তোর পত্রিকাটাকেও ভালবাসি। তাই তোর পত্রিকাতেই এটা আগে বেরিয়ে যাক। শোন, থিসিসটা পড়ি।

এই বলে বন্ধুবর কাগজগুলো তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলে:

"কবিতাকণ্ঠকাব্রি কোমল কায়া কাঞ্চন কুমারী কালীঘাটের কৃষ্ণ কিশোর কবের কনিষ্ঠা কন্যা।

কলিকাতায় কায়স্থ কুল কঞ্জন কিরণকুমার কবুতরী কাঞ্চন কুমারীর করগ্রহ করেন।

কিরণ কুমার কায় কোম্পানীর কার্যালয়ে কেশিয়ারের কার্য করিয়া কিছু কিছু কামান।

কাঞ্চন কুমারীর কমনীয় কান্তি, কোমল কলেবর, কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, কুটীল কটাক্ষ কিরণকুমারকে করায়ত্ত করিল।

কাঞ্চন কুমারী কাস্তের কামানো কড়ি কাটলেট, কারি, কোর্মা, কালিয়া, কোপ্তা কাবাবে কাবার করিতেন, কখনো কখনো কাপেটে কারুকার্য করিয়া কবিকুলের কেরামতি করিতেন।

কিরণকুমার কান্তা কাঞ্চনের কোন কার্যে কখনো কোন কার্পণ্য করিতেন না।

করুণাময়ী কালিকার কৃপায় কিন্তু কাল কৌতুকে কাটিল। কালে কালে কাঞ্চন কুমারীর কপালক্রমে কয়েকটি কুলোক কুমন্ত্রণা করিয়া কিরণ কুমারকে কোন কুলটার কুলায় কীলিত করিল।

কিরণ কুমার কুলটার কুলায় কাপ্তেনী করিয়া কালাতিপাত করেন। কায়ক্লেশে কায়ানো কড়িতে কাপ্তেনী করা কষ্টকর। কিছুতেই কুলায়না, কাজেই কুশীদদের কাছে কর্জ্জ করেন।

কর্জ্জ করিয়া কতকাল কাটিবে?

কর্জ্জের কল্যাণে কিরণ কুমার কাহিল। কাজে কাজেই কার্য্যালয়ের ক্যাশে করার্পণ করিয়া কিছুকাল কাটাইলেন।

কার্য্যালয়ের কেরানীরা কিরণের কাপ্তেনীর কথা কার্য্যালয়ের কর্ত্তাদের কহিল। কার্য্যাধ্যক্ষ ক্রোধ করিয়া কিরণকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

কিরণের কুকর্ম্মের কারণ কর্ম্মচ্যুতির কথা কাঞ্চন কুমারীর কর্ণ-কুহরিত করিল। কাঞ্চন কুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে কিরণকে কতই কাকুতি করিলেন। কিন্তু কিরণ কান্তার কাতর ক্রন্দনে কোপ করিয়া কঠিন কঠোর কটু কথা কহিলেন। কাঞ্চন কুমারী কান্তের কদাচারে কপালে করাঘাত করিয়া কতই কাঁদিলেন।

কুপিত কিরণ কান্তার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না—কুলটার কুলায় কালাতিপাত করেন।

কাঞ্চন কুমারী কান্তের কদাচারে কেবল ক্রন্দন করেন, ক্রন্দনে ক্রন্দনে কঠিন কাশ কাঞ্চনকে কাতর করিল।

কাঞ্চন কুমারী কিরণ কুমারের কুকর্ম্মের কথা কৃষ্ণ কিশোরকে কহিলেন। কৃষ্ণ কিশোর কন্যাকে কাশীঘাটের কুলায় কাল কাটাইতে কহিলেন।

কাশীঘাটের কুলায় কাঞ্চন কুমারীর কাশ ক্রমে কঠিন করিল। কৃষ্ণ কিশোর কলিকাতার কবিরাজ কাশী কুমার কবি কঞ্চনকে কন্যার কাশারোগ্য করিতে কহিলেন।

কবিরাজ কাশী কুমার কাঞ্চন কুমারীর কাশ কমাইবার কারণ কত কি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কাশ কমিল না। কাঞ্চনকে কৃতান্তের করাল কবলে কবলিত করিল।

কদাচারী কিরণ কুমার কুলটার কুলায় কাল কাটায়। কুহকিনী কুলটা কিরণের কড়িসকল কলে-কৌশলে করায়ত্ত করিয়াছে। কড়িহীন কিরণের কায়ক্লেশে কুলটার কুলায় কাল কাটে। কিন্তু কত-কাল কাটিবে? কুলটার কাছে কেবল কড়ি-কাঞ্চনের কদর। কুলটা কালক্রমে কিরণের কানে কটুকাট্য কহিল। কোপান্ধ কিরণও কঠিন কাণ্ড করিলেন—কুলটার কেশাকর্ষণ করিয়া করাঘাত করিলেন। কুলটাও কিরণের কণ্ঠে করার্পণ করিয়া কটূক্তি করিল।

কিরণ কুমার কৃত কুকর্ম্মের কারণ কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কুলটার কুটীরস্থ কুলের কবলিত করিয়া কান্তাত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেদিন ডঃ কিল-এর বিষয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর নমুনা দাখিল করেন। সে সম্বন্ধে গবেষণা করবার ভার বন্ধুকে বলব।

বন্ধুর উক্ত নিবন্ধটি ডঃ কিল-এর থিসিসরূপে আশা করি অচিন্ত্যবাবুর সমর্থন লাভ করবে।

ইজরেলের মেয়ে ব্রাকা ফুল

সুপর্ণ রায়

"চলো, আমরা জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে যাই। হিটলার যুদ্ধের আগুন আমাদের নতুন ক'রে করছেন।"

স্বামী উত্তর দিলেন: "অত ভয় পাবার কী আছে! ধরুন না হয় আমরা ইহুদী পরিবার। কিন্তু জার্মানী আমাদের দেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমি কাইজারের পক্ষে লড়েছি। প্রায় চারশো বছর ধ'রে আমরা জার্মানীতে বসবাস ক'রে আসছি। বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে। যুদ্ধ লাগলেও আমাদের আতংকের কোনো কারণ নেই।"

ক'য়েকদিন পরে কিন্তু স্ত্রী-র আশংকাই সত্য ব'লে প্রমাণিত হলো।

৯ই নভেম্বর। ১৯৩৮। ঘাউ ঘাউ করে পুড়তে শুরু করলো জার্মানীতে ইহুদীদের প্রতিটি উপাসনালয়। হিটলার চালাও আদেশ দিয়েছেন সমস্ত ইহুদী পুরুষদের কয়েদ ক'রে ধরাধাম থেকেই সরিয়ে দেবার জন্য। সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হলো সমগ্র জার্মানীতে। আতংকিত মা এক মেয়ে লোত্রা-কে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। আরেক মেয়ে ব্রাকা-কে নিয়ে চলে গেলেন ব্রিটেনে। স্বামী পালিয়ে না গিয়ে আত্মহত্যা করলেন; তার সব বিশ্বাসের ভিত মাত্র ক'য়েকদিনের ভেতরেই সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছিল।

ব্রিটেনে বছরখানেক কাটাবার পরই মা ব্রাকা-কে নিয়ে গেলেন প্যালেস্টাইনে। সেখানেই বেশির ভাগ আত্মীয়-স্বজন। ব্রিটেন বেশ ভালো লেগেছিল ব্রাকা-র। তাই সেখান থেকে যাবার সময় ও প্রবল আপত্তি তুলেছিল। তবে প্যালেস্টাইনে ক'য়েক বছর থাকার পর ও অনুভব করলো এ-দেশই ওর নিজের।

প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের ধারণা হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগ এনে দেবে। হিটলারের বিরুদ্ধে তারা কি নিজেদের সংগঠিত করবে? নাকি ইহুদী আর আরবদের হাতে অস্ত্র দিতে ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছুক থাকবেন?

ব্রিটিশ সরকার প্রথম দিকে অনিচ্ছুকই ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে একের পর এক বিপর্যয় দেখে মত পাল্টাতে বাধ্য হলেন। পালমাক নামে এক গুপ্ত ইহুদী বাহিনীকে ইংরেজ সরকার অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন।

এই সময়ে ব্রাকা ফুল সতেরো তরুণী, তবু অভিজ্ঞা। তার দেহ ঘিরে ধীরে ধীরে গাপড়ি খেলছে যৌবনের পারিজাত। একবার তাকালে নির্নিমেষ মতো কেবল তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, ভারতীয় রমণীদের মতো কালোচুল পেছনে খোঁপা ক'রে বাঁধা। নীল চোখের দৃষ্টি প্রখর। দীর্ঘাঙ্গী তরুণীকে দেখলে মনে হয় সবে সে কলেজে ঢুকেছে।

একদিন রাকা ওর মা-কে অবাক করে দিয়ে বললো: "মা, তোমাকে এতদিন বলিনি, আমি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থায় ভর্তি হয়েছি। এখন পালমাক-এ যোগ দিতে চাই। আমাকে অনুমতি দাও।"

মৃত্যু-বাহিনীর সদস্যদের পরিণাম কী হতে পারে রাকা-র মা ভালো ক'রেই জানতেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদী তরুণ-তরুণীকে ছদ্ম সৈন্য হিসাবে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগোস্লাভিয়া হাঙ্গারী, রুমানিয়া এবং ইতালীতে। তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি। আর কোনোদিন ফিরে আসবে ব'লেও মনে হয় না।

নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে মেয়েকে ছেড়ে দিতে মা-র মন কিছুতেই সায় দিলো না। কিন্তু সায় না দেয়া, হাঁপিয়ার করা এক জিনিস, আর মেয়েকে ধ'রে রাখা স্বতন্ত্র কথা। রাকার শিরা উপশিরায় বইছে টগবগ যৌবন। সাবধানীরা বাঁধে বাঁধুক, বাঁধভাঙাই তার মতো আদর্শবাদী, বিদ্রোহী মেয়ের স্বাভাবিক রীতি। শেষপর্যন্ত চোখের জল মা-কে মুছে অনুমতি দিতেই হলো। মা দিলে রাকা রাতের অন্ধকারে হয়তো পালিয়ে যেতো।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম বিরোধ করতেই হবে।

একটু আগেও যারা ছিলো পরস্পরের মিত্র সেই ইংরেজ এবং ইহুদীদের মধ্যে শুরু হলো লড়াই। উনিশ বছরের যুবতী রাকা-র উপরে পড়লো ইহুদী মেয়েদের যুদ্ধ-বিদ্যায় তালিম দেবার ভার।

হিটলারের অমানুষিক নির্যাতনের পরেও বেঁচে থেকে কিছু ইহুদী নর-নারী জার্মানী থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল প্যালেস্টাইনে। দলে দলে ইহুদী উদ্বাস্তু চ'লে আসছিল রাশিয়া থেকে। প্যালেস্টাইনে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন ব্রিটিশ সরকার, চাইলেন প্যালেস্টাইনের সবগুলি দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা বিদেশী সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো, উঠে প'ড়ে লাগলো ইহুদী শরণার্থীদের গোপনে প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসার জন্য।

আহার নিদ্রা ভুলে সেই কাজে লেগে গেলো রাকা মুদ। গুপ্ত-সামরিক সংস্থার পরিচালনা শুধু নয়, সাংগোনার যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণও সে নিলো।

বিপ্লবীরা উড়িয়ে দিতে লাগলো ব্রিটিশ সরকারের থানা, মাটির তলার গোপন অস্ত্রাগার, তুলে ফেলে দিলো পুঁতে-রাখা মাইন। এই সব নাশকতামূলক কাজে রাকাও ঝাঁপিয়ে পড়লো বিপ্লবী অসংখ্য যুবক-যুবতীদের সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারও মরিয়া হ'য়ে উঠলেন, চালাও আদেশ দিলেন সশস্ত্র কোনো ইহুদী বিপ্লবীর দেখা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে।

১৯৪৫ সাল। মনে-মনে এতদিন যে দীক্ষাগুরুর কল্পনা ক'রে এসেছে, তারই যেন দেখা পেলো রাকা। দীক্ষাগুরুর নাম গিডিয়ন। বিশবছরের যুবক। যেমন লম্বাচওড়া, তেমনি সুন্দর। তার কাছ থেকে রাজনীতি এবং সংস্কৃতির নানা পাঠ নিলো রাকা। গিডিয়নও আদর্শবাদী। যুদ্ধকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। তবু প্যালেস্টাইনের অধিকার রক্ষার জন্য এখন সে কৃতসংকল্প।

একদিন আবেগ-কম্পিত গলায় ও রাকাকে বললো: "রাকা, হত্যা আমাদের অভিপ্রায় নয়। যে ব্রিটিশ সৈন্যরা ক'দিন আগেও আমাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের হত্যা

করতে আমরা চাইনা। আমরা গড়ে তুলতে চাই ইজরেল, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। আমাদের স্বতন্ত্র, নিজস্ব একটি রাষ্ট্র চাই-ই চাই।"

ওদের দুজনের মধ্যে শুরু হলো এক বিচিত্র প্রেম। ব্রাকাকে কোনোদিনই বোধহয় সম্পূর্ণরূপে পায়নি গিডিয়ন। তবে এই পশ্চিমী তরুণীর প্রতি সে দারুণ আকৃষ্ট হয়েছিল। আর ব্রাকার কাছে গিডিয়ন ছিলো জয়, মদন, আর আদর্শের সজীব প্রতিমূর্তি। তার কাছে গিডিয়নই ছিল নতুন প্যালেস্টাইন, নতুন ইজরেল। ব্রাকাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধিয়ার পার্বত্য এলাকায় তখন প্রেমের অবকাশ কোথায়? চারদিকে শুধু সাজো সাজো রব।

যেখান দিয়ে একদিন মহত্তম ইহুদী,—নাজারেথের যীশু হেঁটে গেছেন, গ্যালিলির সেই বালু-প্রান্তর লাল হ'য়ে উঠলো রক্তে, সিক্ত হলো স্বেদ আর চোখের জলে। যারা তাঁকে বোঝেনি, বুঝবার চেষ্টাও করেনি তারা একদিন ক্রুশ বিঁধেছিল যীশুকে, আর যারা খ্রীষ্টান ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয় তাদেরই হাতে ক্রুশবিদ্ধ হলো শতশত ইহুদী নর-নারী। তবু, দু'হাজার বছরের নির্বাসন, নিরুদ্দেশ যাযাবর জীবন, নির্যাতন, এবং গ্যাসচেম্বার মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিলো এক নতুন যোদ্ধজাতি। যে পশ্চিমী প্রভুরা ধরেই রেখেছিল, ঔপনিবেশিকবাদ চিরকাল টিঁকে থাকবে, তাদের সেই সুখস্বপ্ন কাচের কেল্লার মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। য়ুরোপের মৃত্যু-গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো অসংখ্য ন্যাজারী যোদ্ধা। জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে ফুলিঙ্গের মতো আবির্ভূত হলো নতুন ইহুদীর দল।

পনেরো বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন গিডিয়ন। ব্রাকা তার শূন্য স্থান পূরণ করতে চাইলো। মা আবার ওকে সতর্ক ক'রে দিলেন। বারণ করলেন বিপদের মুখে অমন ক'রে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু মা-র কথায় কান দিলো না ব্রাকা। তখন মা বললেন: "তাহলে, তোমাদের দলকে আমিও যাতে সাহায্য করতে পারি সে ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

ব্রাকা-র মা তার আগেই মিষ্টান্নের একটা দোকান খুলেছিলেন। বিপ্লবীদের অনুরোধে তিনি মিষ্টান্নের মোড়ক পাঠাতে লাগলেন জেরুসালেমের ব্রিটিশ কারাগারে। কেক আর মিঠাইয়ের ভেতরে থাকতো গুপ্ত বার্তা। দু' মাসে একবার ক'রে কারাগারে গিয়ে গিডিয়নের সঙ্গে দেখা করতো ব্রাকা। ইচ্ছা থাকলেও, কারা-কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ম-কানুনের জন্য, এর চাইতে একটি বারও বেশি দেখা করার সুযোগ ওর ছিলো না।

একদিন ব্রাকা গিডিয়নের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, এমন সময় কারাগারের বারান্দায় ওকে থামিয়ে দিয়ে একজন ব্রিটিশ অফিসার শুধালো: "জেরুসালেমের কারাগার সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কী রকম? খুব খারাপ কি?"

ব্রাকা গলায় বিদ্রূপ মিশিয়ে বললো: "না, খুব খারাপ কি! এখানে গ্যাস চেম্বারও নেই, কিংবা ঘাসদের পিটিয়েও নেই।" তারপর উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলো: "ইহুদীদের ধ'রে ধ'রে জেলে পুরবার কোনো নৈতিক অধিকারই আপনাদের নেই।"

স্পষ্টভাষী মেয়েটির প্রতি তরুণ ব্রিটিশ অফিসার আকৃষ্ট না হ'য়ে পারলোনা। কারা-প্রাঙ্গণে জন্ম নিলো প্রেম।

ওদের অনেক রাত কেটে যেতে লাগলো পরস্পরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা

ক'রে। ব্রাকা তাকে খুলে বললো ওর দেশের মানুষ, তাদের আদর্শ, তাদের স্বাধীনতা স্পৃহার কথা। আর তরুণ অফিসার ব্রাকাকে জানালো গান্ধীজীর পরিচয়, ওর সামনে তুলে ধরলো সমাজতন্ত্রের আদর্শ। অকপটে বললো সেখানার সৈন্য সে নয়।

তরুণ অফিসার শেলবী ব্রাকাকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু ব্রাকা অসম্মতি জানিয়ে বললো: "তা কি ক'রে সম্ভব! আপনি শত্রুপক্ষের অফিসার আর আমি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার নেতা।"

ব্রাকার সঙ্গে মিশে শেলবী'র যেন চোখ খুলে গেলো। ইহুদীদের দুঃখ দুর্দশা সে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করলো। নানা গোপন খবর জানিয়ে সে সাহায্য করতে লাগলো ব্রাকাকে।

তখনো ব্রাকা জেলে গিডিয়নকে দেখতে যেতো, তাকে মাঝে-মাঝে চিঠি লিখতো। এতে একটু ঈর্ষা বোধ করতো শেলবী। আবার সে বিয়ের প্রস্তাব করলো। কিন্তু গিডিয়ন জেলে, আর সে বিয়ে করছে—একথা ভাবতেই নিজেকে ব্রাকার অপরাধী মনে হলো। তাই ও বিয়েতে রাজী হলো না। যুদ্ধ শেষ হ'লে বিয়ে হবে—জানালো ব্রাকা।

একদিন ব্রাকা ম' তিনেক ছেলে-মেয়েকে ট্রেনিং দিচ্ছিল। সেইখানেই আবার ইহুদীদের একটা গোপন অস্ত্রাগার। একেবারে হঠাৎ এসে একদল ব্রিটিশ সৈন্য জায়গাটা ঘিরে ফেললো। কিন্তু ঘণ্টাপাঁচেক ধ'রে আতিপাতি ক'রে খুঁজেও তারা সন্দেহ করার মতো কোনো জিনিস খুঁজে পেলো না। তারা দেখলো ব্রাকা ডাইনিং হলে ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম শেখাচ্ছে।

ব্রিটিশ সৈন্যরা চ'লে গেলো। আসলে আগের দিন রাতেই শেলবী ব্রাকাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল। ডাইনিং হলের মেঝে খুঁড়ে, সব অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রেখে, আবার রাতারাতি সিমেন্ট ক'রে দিয়েছিল ব্রাকার অনুগত ছেলে-মেয়েরা।

আন্দোলন আরো জোরদার হ'য়ে উঠলো। একটা থানা উড়িয়ে দেওয়া হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রাকা একবারও বাড়ি এলো না। শেলবীও যেন উবে গেলো কর্পূরের মতো। ব্রাকার মা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

একদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ ব্রাকা আর একজন ইহুদী সৈন্য ছুটতে ছুটতে এসে ব্রাকাদের বাড়িতে ঢুকে গেলো। ব্রাকা মা'র হাতে একটা বন্দুক দিয়ে বললো: "এটা লুকিয়ে রাখো।" মিনিট তিনেক পরেই একজন উচ্চশিক্ষিত ব্রিটিশ অফিসার এবং দুজন সৈন্য এসে ব্রাকাদের বাড়িতে ঢুকে তল্লাসী শুরু ক'রে দিলো। কিন্তু ইহুদী সৈন্য কিংবা রিভলবার কিছুই তাদের চোখে পড়লো না। ইহুদী সৈন্যটি লুকিয়ে ছিল ছাদে। লণ্ড্রীতে পাঠাবার আগে চাকর-আলা যে বড়ো ঝুড়িটাতে ময়লা জামা-কাপড় রাখা হতো তার ভেতরে।

কিন্তু ব্রাকার মা বুঝতে পারলেন এইভাবে চললে ব্রাকার সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি আবার ওর হাত ধ'রে কাতর গলায় বললেন: "চল্, আমরা কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় গিয়ে বেড়িয়ে আসি। তোর বোনের সঙ্গে দেখা হবে। তাছাড়া প্রত্যেক সৈনিকেরই মাঝে-মাঝে অবসরেরও তো প্রয়োজন রয়েছে।"

ব্রাকা এবার মা'র প্রস্তাবে রাজী। প্যালেস্টাইন ছেড়ে সে চ'লে যাবে। মা-কে বললো: "আমাকে আর ছ হপ্তা সময় দাও। তাহলেই এদিকের কাজকর্ম সেরে, গিডিয়নের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে, আমার জায়গায় একজন লোক ঠিক ক'রে তোমার সঙ্গে চ'লে যেতে পারবো।"

কিন্তু প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বারুদের ছিলার মতো টান-টান। বাতাসে বারুদের গন্ধ। সে-দেশের প্রতিটি মানুষই তখন 'চক্রী'। পাওয়ার কোম্পানী ইলেকট্রিক কারেন্ট

বন্ধ ক'রে দিলো। যানবাহন সংস্থা বিভিন্ন রাস্তার মাঝখানে বাস দাঁড় করিয়ে রাখলো, যাতে ইংরেজ সৈন্যদের চলাচলে অসুবিধা হয়। ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা বিপ্লবীদের পালা-বাকল যোগাবার কাজে ব্যস্ত।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা জাহাজ আসার কথা। তার জন্য বিপ্লবীরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে সমুদ্রের ধারে।

জাহাজটা এলো না। অন্ধকারের ভেতর থেকে অতর্কিতে ছুটে এলো ইংরেজদের একটি সাঁজোয়া বাহিনী। ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের সার্চ লাইটের আলোতে চারিদিক ফর্সা হ'য়ে উঠলো।

মাত্র আটটি ছেলেকে নিয়ে মেশিনগানের গুলি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগলো ব্রাকা। একটা পোড়ো বাড়ির আড়াল থেকে।

হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধলো ব্রাকার বুকে। সঙ্গীদের বললো: "আমি জখম হয়েছি। তোমরা পালাও। যতক্ষণ পারি আমি গুলি চালিয়ে যাবো।"

আহত অবস্থায় ব্রাকা এবং তার সঙ্গী চারটি বালক ইংরেজদের হাতে বন্দী হলো। কিন্তু থানায় নিয়ে বহু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও পুলিশ কোনো উত্তর ওদের কাছ থেকে আদায় করতে পারলো না। ব্রাকা অচৈতন্য হয়ে পড়লো। হাসপাতালে নিয়ে যাবার ক'য়েক মিনিটের মধ্যেই ওর মৃত্যু হলো।

ব্রাকার মা পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে দেখলেন টেবিলের উপরে শেলবী'র দুখানা চিঠি। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চিঠি দুখানা সরিয়ে ফেললেন। তিনি তখনো জানতেন না যে ব্রাকা মারা গেছে, সেদিন দুপুরেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হবে।

সেই মুহূর্তে বাড়ির ভেতরে হুড়মুড় ক'রে ক'য়েকজন ব্রিটিশ পুলিশ ঢুকে পড়লো। কোনোরকম অনুমতি না নিয়ে, ওয়ারেন্টবিহি না ক'রেই সারা বাড়িতে খানা-তল্লাশী চালালো।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পাবার সঙ্গে-সঙ্গে মা সমাধি-স্থানে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন সেখানে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা:

ব্রাকা ফুল

দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে দ্রুত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। কোনোরকম বক্তৃতা বা ভাষণ নয়। ওখানে হাজির ছিলো শুধু জনকয়েক আত্মীয়-স্বজন। হাজার হাজার ইহুদী তরুণ-তরুণী এসেছিল ব্রাকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দিতে। কিন্তু তাদের সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।

ব্রাকাকে সমাহিত করার পর আবার তাদের বাড়িতে ইংরেজ সৈন্যরা খানা-তল্লাশী চালালো; কিন্তু এবার তাদের চোখে জল।

ব্রাকার ঘরে পাওয়া গেলো সিডিয়নের একখানা ছবি। শেলবী'র শেষ চিঠিগুলি ব্রাকার মা আগেই নষ্ট ক'রে ফেলেছিলেন। তার ভূমিকা ইংরেজদের কাছে অজানাই থেকে গেলো।

মাত্র দু'হপ্তা সময় চেয়েছিল ব্রাকা ফুল। এর ভেতরে কাজ শেষ ক'রে সে মা'র সঙ্গে চ'লে যাবে আমেরিকায়। বোনের সঙ্গে দেখা হবে। মা বলেছিলেন: "সৈনিকেরও তো বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে।" কিন্তু বিশ্রাম নেবার মেয়ে ব্রাকা নয়। মাত্র কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বিপুল সংখ্যক ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিলো স্বাধীনতার পূজারিণী। তার কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় বৃটিশ রাজদের তীরে সংগ্রামরত বাঘা যতীনের মৃত্যুবরণের ইতিহাস। আধুনিক ইজরেলের একটি গৌরবময় অধ্যায় রচিত হলো উনিশ বছরের বীরাঙ্গনার বুকের রক্তে।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতীর সম্পাদক দায়ী নন)

বিজয়ার অভিবাদন জানাই সবাইকে :

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।
যারে যারে তোরে, ফিরে পেতে হবে, বিশ্বের অধিকার।"

... ...

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে, মরব না তাই মরব না।
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে মরব না।"

* * *

মুখোশ খসে পড়েছে। "মিত্রদের" স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। নানা ক্ষেত্রে নানা স্তরে তাদের ভারতবিরোধী গোপন সলাপরামর্শ আর ভারতধর্ষের প্রতি তাদের ঘৃণ্যতা আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট! "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"—এই আতঙ্কে তারা বেসামাল। ভারতকে দাবিয়ে রাখতে হবে, ভারতকে ভিখারী করে রাখতে হবে চিরকাল, তবেই তো ভারতের বুকে মুরুব্বিয়ানা চলবে আমাদের, তবেই তো আমাদের প্রাধান্য বজায় থাকবে এশিয়ায়।—এই অমানুষিক প্রবৃত্তির বশে তারা একদিকে ভারতকে সাহায্য দিয়ে ঋণীভূত করবার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তানকে প্রশ্রয় দিয়েছে, ভারতকে মারবার জন্যে তাদের হাতে কোটী কোটী টাকার গোলাগুলি মারণাস্ত্র তুলে দিয়েছে, নানা চাতুর্য অবলম্বন করে তাদের দিয়ে ভারতকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করে চলেছে। তাই তো আজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠ দিয়ে একটি মহাসত্যবাক্য

নির্গত হয়েছে—"আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তারা, পাকিস্তান, না তাদের সেনাবাহার স্বরূপ ইংলণ্ড ও আমেরিকা।" অতএব :

"চিনেছি তোমারে, চিনেছি ধরণী প্রভু
মোহ বশে যেন তোমার চাতুরী ভাঁদে
ধরা পড়ে ভুল আবার করি না কভু।"

• • • • •

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর আগে এতবড় গৌরবের অধ্যায় আর কখনো রচিত হয়নি। নির্বান্ধব নিঃসহায় ভারতবর্ষ একা লড়ছে সারা দুনিয়ার প্রবলতম শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে। শুধু লড়ছে নয়, রণক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর শৌর্যবীর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন শ্রেষ্ঠ বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। প্রচণ্ডতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত করে ছদ্মবেশী বন্ধুরা প্রতিবেশী শত্রুকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল, ভেবেছিল তার আঘাতে চোখের নিমেষে ভারত লুটিয়ে পড়বে মাটিতে, কাতরকণ্ঠে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, আর তখন তারা এসে ভারতকে "উদ্ধার" করবে, অর্থাৎ তার ঘরকে আরও ভাল করে দেবে, খানখান করে দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলে,—কী দেখলে তারা? তারা ভারতের কাছে "বিশ্বরূপ" দর্শন করলে। অর্জুনের মতো নয়, দুঃশাসনের মত।

সারা পৃথিবীতে ভারতের বন্ধু আছে একজন। কিন্তু সে বন্ধু থাকে দূরে। অনেক সহায়তা সে ভারতকে দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী সক্রিয় সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও সে যা করেছে এবং করছে তার জন্যে ভারতবর্ষ তার কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হয়ে রইল। এ কৃতজ্ঞতা মানবিকতার আদর্শের প্রতি, দলীয় আদর্শের প্রতি নয়।

• • • •

বাঙালী ভীরু, বাঙালী লড়াই করতে জানে না, বাঙালীরা যুদ্ধের নামে ভয় পায়, বাঙালীরা সেনাদলে ভর্তি হবার যোগ্য নয়—এই অপবাদ যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছিল। বাঙালী ইদানিং হয়ে উঠেছিল উপহাসের পাত্র দেশে এবং বিদেশে। যে বাঙালী একদা ভারতবর্ষকে পরিচালিত করেছে, নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে বাঙালী যেন মরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আততা বুঝি চিরদিনের মতো কাপুরুষত্ব ও অকর্মণ্যতার কলঙ্কপঙ্কে ডুবে রইল। এই যুদ্ধ সেই কলঙ্ককে চিরদিনের মতো অপসারিত করেছে। বাঙালী তার নষ্টগৌরব ফিরে পেয়েছে এই যুদ্ধে। বাঙালীর মাথা আবার উঁচু হয়েছে। বাঙালী প্রমাণ করেছে, শৌর্যে বীর্যে রণকৌশলে আর অসমসাহসিকতায় সে কারুর চেয়ে কম নয়। এই যুদ্ধে যারা নিজেদের প্রাণ দিয়ে আমাদের নষ্ট ইজ্জত ফিরিয়ে দিয়ে গেল তাদের যেন আমরা না ভুলি। যুগে যুগে যেসব মহাপুরুষ বাঙলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন, এই সব তাজা তরুণ প্রাণের যুবকের রক্ত তাঁদের মহিমার চেয়ে কম নয়। তরুণী স্ত্রী, বৃদ্ধ জনকজননী, কচি শিশুপুত্রের মায়া তাদের দেশপ্রেমের দুর্দম মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার গতিরোধ করতে পারেনি, জীবন সম্ভোগের সকল সুখলালসাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে তারা দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে শত্রুর সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, তাকে মেরেছে আর নিজের মরণকে তারা হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছে। তারা আমাদের আত্মার আত্মীয়। তারা বাঙালীর কাছে চিরকাল পূজ্য এবং স্মরণীয়—

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তপন চৌধুরী, প্রবাল রায়, পীযূষকুমার চৌধুরী, ভাস্কর গুহ রায়···

এদের নাম আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। আমরা এই নামগুলি দেখতে দেখতে আমাদের যাত্রা শেষ করি। আমাদের পরে যারা আসবে তারা এই নামগুলি দেখে আর তাদের কীর্তির কথা জেনে প্রেরণা লাভ করুক। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে বধূরা কামনা করুক এমনি সন্তানের। বাঙলা দেশের যুবসমাজ তাদের সেই মহামৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণধর্মে দীক্ষা লাভ করুক। অযুতকণ্ঠে ধ্বনিত হোক :

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক তারি জয় হোক।
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি।"

• • • •

চারিদিকে ব্যাপার যা চলেছে তার কিছু জানাই এবার।

চীনারা পাহাড়ের আড়ালে নানারকম কাণ্ড করছে, তার নানা বিবরণ মাঝে মাঝে খবরের কাগজ মারফৎ আমরা জানছি। কিন্তু সেই সব খবর তথ্যের দিক দিয়ে কতখানি নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে আমরা পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারিনা। তার কারণ চীনাদের গতিবিধি যেমন রহস্যজালে আবৃত তেমনি তাদের গোপনীয়তা। সেই জন্যেই বড় বড় কূটনৈতিক পণ্ডিতরাও বলেন, চীনারা যেমন দুর্জেয় তেমনি ভয়ঙ্করী। সম্প্রতি চীনা এলাকার প্রত্যক্ষভাবে দেখা কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে। সেখানকার কয়েদখানা থেকে সম্প্রমুক্ত এক তিব্বতীযুবক সম্প্রতি কালিমপঙএ এসেছেন। তাঁর নাম দবসাং নগোডাপ। তিব্বতীয় হলেও তিনি ভারতের নাগরিক। চীনারা যখন তিব্বত আক্রমণ করে তখন তিনি তিব্বতীয় সেনাদলে যোগ দেন এবং অসীম সাহস ও শৌর্য প্রকাশের পর চীনাদের হাতে বন্দী হন।

কালিমপঙএ এসে তিনি এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন,—চীনারা কিভাবে তিব্বতকে গ্রাস করেছে এবং সর্বাদিক দিয়ে তাকে শেষ করেছে তারই কাহিনী।

নগোডাপ-এর বয়স প্রায় ২৮। ভালো ইংরাজী জানেন। তাঁর বিবৃতি থেকে জানা যায়, চীনাদের হাতে বন্দী হবার পর ১৯৫০ সাল থেকে এবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি নানা জেলে দিন কাটিয়েছেন। বেশীদিন তাঁকে একস্থানে রাখা হত না। কিছুদিন পরেই তাঁর চোখ বেঁধে বন্ধ গাড়িতে করে অন্য জায়গায় অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হত।

ছাড়া পাবার পর তিনি কৌশল করে চীনা অধিকৃত এলাকার নানা জায়গা ঘুরে ভারতে এসেছেন। চীনাদের বিদ্যুৎগতি-কর্মতৎপরতা তিনি প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তিনি বলেছেন, চীনারা ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আয়োজন করছে। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের এই প্রচুর ব্যয়বহুল যুদ্ধ-প্রস্তুতি বিনা উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর আরো বিশ্বাস যে, একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে চীনারা সর্বদিক দিয়ে রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে। তিনি মনে করেন, খুব শীঘ্রই চীনাবাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ

করবে এবং কিছু জায়গা দখল করে নিয়ে তাদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করবে। এমনি করে তারা ক্রমাগত ভারতবর্ষকে চাপ দেবে।

নগোডাপ দেখে এসেছেন বহু চীনা সমর-নায়ক ভারতের সীমানার ওধারে ঘোরাঘুরি করছে। বড় বড় সড়ক বানাচ্ছে তারা। বিমানঘাঁটি তৈরী করছে। শুধু তাই নয়, তিব্বতীদের নিজেদের ঔপনিবেশ করে নিয়ে তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিয়ে সেনাদল গঠন করছে। অর্থাৎ চীন কর্তৃক পরবর্তী ভারত আক্রমণে আমরা দেখতে পাব তিব্বতী সৈন্যরা তাদের পুরোভাগে রয়েছে।

নগোডাপ আরো বলেছেন, তিব্বতে ধর্ম বলতে আজ আর কিছু নেই। ন্যায় এবং নীতিও সেখানকার জীবন থেকে অপসৃত হয়েছে। পাঞ্চেনলামা এই নীতিধর্ম রক্ষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি কোথায় তা কেউ জানে না।

নগোডাপ্-এ বিবৃতি পড়ে বুঝতে পারছি—

Shape of things to come!

• • • •

মাঝে মাঝে আমাদের দেশে ছাত্রদের অথবা জনসাধারণের জ্ঞানের বহর সম্বন্ধে নানা কৌতুককর সংবাদ জানানো হয়। সেইসব সংবাদ, অর্থাৎ সেইসব অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর শুনে আমরা খুব হাসি।

আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন পুরোদস্তুর শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের লোক পায়নি। স্বাধীন হবার ১৮ বছর পরেও যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। অতএব এখানকার ছাত্র বা জনসাধারণ যে সহজ জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে উপহাসাস্পদ হবে তাতে আর বিচিত্র কী। কিন্তু "শিক্ষার মক্কা" খাস ইংলণ্ডে তো শুনতে পাই সব মানুষই শিক্ষিত, দিস্ গ্রেট। কিন্তু সেখানকার লোকেও মাঝে মাঝে জ্ঞানের বহর যা দেখায় তা বড় কম নয়। সম্প্রতি সেখানকার একটি বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেখানকার মানুষের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে এক সার্ভে করেন। সেই সার্ভের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৃটেনের ১০০ জন নাগরিকের মধ্যে ৯৫ জন জানে বিটস্ কাদের বলে। এবং তাদের সনাক্ত করতেও পারে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক নেতা ও নামজাদা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বড় সরেস।

যথা :—

স্যার আলেক ডগলাস হোম (প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী) সম্বন্ধে তাদের উত্তর—তিনি একজন কৌতুকাভিনেতা।

অর্থ-মন্ত্রী জর্জ ব্রাউন সম্পর্কে উত্তর—তিনি একজন ভাকসোকোমবাদক ও গায়ক।

রেজিনল্ড্ মডলিংক (প্রাক্তন রাজস্ব অধিকর্তা) সম্পর্কে উত্তর—তিনি একজন টেলিভিশন-ঘোষক।

প্রমুখা ফেলেক্সারীয় নায়িকা ক্রিষ্টিন কীলার সম্পর্কে উত্তরটি সবার সেরা নমুনা—তিনি একজন ধর্ম প্রচারিকা।

• • • •

বাঙালী যে যুদ্ধে যেতে ভয় পায় না, বাঙালী যে লড়াই করতে জানে, সৈনিক বা বৈমানিক হিসাবে বাঙালী যে কারুর চেয়ে কম নয়, তা কি এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি? তা যদি হয়ে থাকে

তাহলে বাঙালী রেজিমেন্ট গঠন করতে আর আপত্তি কিসের? রাজনীতি নিয়ে মতের অমিল থাকতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন দল থাকতে পারে, কিন্তু দেখা গেল যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার পবিত্র কাজে কোথাও কোন দ্বিমত নেই। (পাবও দেশদ্রোহী কিছু কিছু থাকতে পারে—তারা বর্তব্যের মধ্যে নয়)। এবং সময় যা এলো, তাতে আর কোনদিন দেশরক্ষার কাজে ঢিলে দেওয়া চলবে না। সর্ব সময়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যেকোন সময়ে যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। পড়তে পারে নয়—এখনি আমরা রীতিমতো যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে বাস করছি। দুদিকে দুই ন্যায়-অন্যায়-বিচার-বোধহীন শঠ হিংস্র শত্রু ওৎ পেতে বসে আছে। শুধু ওৎ পেতে বসে নেই। তারা রীতিমতো কর্মতৎপর। কেবল তাই নয়, বাঙলা দেশের ঘারে কাছেই তাদের অবস্থিতি, বাংলাদেশ তাদের কামানের মুখেই বলতে গেলে। তাই আজ বাঙালী সেনাদল গঠন করার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। বাঙালী সেনাদল তৈরী হচ্ছে, বাঙালীর ছেলেরা যুদ্ধে যাবার জন্যে নাম লেখাচ্ছে, বাঙালীর ছেলেরা রণসাজ পরে কুচকাওয়াজ করছে—এই সংবাদ যখন পত্রিকায় পড়বে বা কুচকাওয়াজের দৃশ্য যখন প্রত্যক্ষ করবে বাংলার জনসাধারণ, তখন গোটা বাঙালীজাতের মধ্যে নতুন চেতনা জাগবে, নতুন এক মহৎ প্রেরণায় তারা স্পন্দিত হবে, বাঙালী জনমানসের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত হবে, বাঙলায় আসবে এক নতুন জীবন। এক মহান আদর্শের সংঘাতে বাঙালী তরুণদের মতিগতি পালটে যাবে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরম প্রকাশ দেখা যাবে।

বাংলাদেশের যাঁরা আজ ভাগ্যনিয়ন্তা, আমাদের কথা কি তাঁদের কানে পৌঁছোবে। দুঃখ এই যে, নিজের দেশকে বড় করব, নিজের জাতকে বড় করব—এমন চেতনা-সম্পন্ন নিঃস্বার্থ দেশ-প্রেমিক নায়ক আজ আমাদের মধ্যে নেই। এখন আছে বিভিন্ন দল আর দলীয় স্বার্থ। থাকতেন যদি সেই অমিতবীর্য পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের মধ্যে, তাহলে বোধকরি এত কথা লেখবারই প্রয়োজন হত না। তাহলে—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"—সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পেতো জগতের লোক।

যে ইংরেজ বাঙালীকে চিরকাল ভয় করেছে, তারাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালী রেজিমেন্ট গঠন করেছিল এবং কোনদিক দিয়েই তার ফল খারাপ হয়নি—বরং ইংরাজ দপ্তরের নথিপত্রে সেই রেজিমেন্টের অনেক গৌরবজনক কার্যকলাপের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বাঙালীর ছেলেরা লড়াই করতে পিছপাও হয়নি কোন দিন। কোন দিন হবে না। যাযা বতিনের দেশ বাঙলা, নেতাজী সুভাষের দেশ—এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই বোধকরি যথেষ্ট হবে। তাহলে আজ এই চরম প্রয়োজনের দিনে বাঙালী ফৌজ গঠন করা হবে না কেন?

আওয়াজ উঠুক: বাঙালী রেজিমেন্ট চাই।

• • • •

ভারতের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র যে কত কুটিল এবং গভীর সে সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এক অত্যন্ত চিন্তাশীল মন্তব্য করেছেন। কিছুদিন আগে কাশ্মীর থেকে আগত সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা সভায় তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে যে গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে

মার্কিন কর্তারা দায়ী। শুধু তাই নয়, মার্কিনচক্র, এমন কি, পাকিস্তানকে খুশলে, তাকে দিয়ে চীনকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। উদ্দেশ্য, চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে, ভারত বেকায়দায় পড়বে এবং তখন কালনেমির পক্ষে লঙ্কাভাগ করার সুবিধা হবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সারা ভারত তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধির জন্যে ধন্যবাদ জানাবে।

• • • •

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গত জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সামনে একটি কেক স্থাপন করা হয়েছিল। মস্তবড় কেক। তার আকার একটি প্যাটন ট্যাংক-এর মত। চমৎকার কারিগরি, হুবহু একটি কেকের ট্যাংক। শাস্ত্রীজী ছুরি দিয়ে সেই ট্যাংক কেটে ফেলে বললেন, তিনিও একটি প্যাটন ট্যাংক ধ্বংস করলেন। ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে উপভোগ্য বোধ হয়নি। শাস্ত্রীজী খাঁটি ভারতীয় ঐতিহ্যে তাঁর জীবন পরিচালিত করেন দেখে এবং বিদেশেও। সেজন্যে বিদেশের মানুষ তাঁকে সম্ভ্রম করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। তাঁর জীবন যেভাবে কেটেছে তাতে জন্মদিনে তিনি কোনদিন কেক কাটেন নি। কারণ ওটা একেবারেই বিজাতীয় প্রথা। তারপর আবার কেকের প্যাটন ট্যাংক! আমাদের অভ্যর্থনারা তো শত্রুর ট্যাংক ধ্বংসের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে—সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে নকল ট্যাংক ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা তাঁর আমলারা করেছিলেন তা হাস্যকর মনে হয়েছে আমাদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তো আর সেই রকম পণ গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয়নি যে সেই নকল বুঁদির কেল্লার মত একটা নকল ট্যাংক তাঁর সামনে হাজির করতে হবে!

"অস্ত্রস্পর্শ করব না আর চিতোর রাখার পণ
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।"

শাস্ত্রীজী সরল মানুষ। আমলারা যে ব্যবস্থা করেছিল তিনি হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যেন ওই কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে!

• • • •

সাবাস পাঞ্জাবের বধূ শ্রীমতী হরভজন কাউর! স্ত্রীরূপে তুমি ধন্য, মাতারূপেও তুমি ধন্য। তোমার কণ্ঠ দিয়ে যে বাণী নির্গত হয়েছে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক, ভারতবর্ষের মায়ের মহিমা সারা জগতের লোক চোখ মেলে দেখে ধন্য হোক।

সাম্প্রতিক লড়াইএ রণাঙ্গনে নিহত বীরশ্রেষ্ঠ অজিত সিং-এর বিধবা পত্নী শ্রীমতী হরভজন কাউর এক প্রতিরক্ষা সমাবেশে বলেছেন যে তাঁর ছেলের বয়স মাত্র একবছর। বড় হয়ে পাকিস্তানি আক্রমণের গালটা জবাব দেবার জন্যে সে সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দেবে। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাঁর স্বামী প্রাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তিনি কাতর নন, তাঁর ছেলে বড় হয়ে উঠুক, বড় হয়ে সে তার বাপের মৃত্যুর গালটা জবাব দিক—সেই দিনের অপেক্ষায় তিনি প্রার্থনা করছেন।

আমরাও সেদিনের অপেক্ষা করব। স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশকন্যা শ্রী আবার ভারতের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করুক। তাঁদের কণ্ঠে সেই দুষ্কৃতদলন মহামন্ত্র বিঘোষিত হোক —"মার, মার, শত্রু মার।"

এইখানে, সীতারাম উপন্যাসের সেই অবিস্মরণীয় লাইনগুলি উদ্ধৃত করবার বাসনা সম্বরণ করতে পারলাম না—

"এই মার মার শব্দে আকাশ প্রান্তর কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে সেও মার মার শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে সেও মার মার শব্দ করিতেছে। মার মার শব্দে হিন্দুরা চারিদিক হইতে চারিদিকে ছুটিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, 'জয় মা চণ্ডিকে! চণ্ডী এসেছেন। চণ্ডীর হুকুম, মার মার মার। জয় চণ্ডিকে।' সত্যারাম ভাবিলেন, এ কি এ! তখন দেখিতে দেখিতে সত্যারাম দেখিলেন, মহানন্দীহ্রদের শ্যামল পয়স্বরাশি মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে অসংখ্য ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, 'মার মার শত্রু মার।'... স্ত্রীর লজ্জা নাই, ভয় নাই, জ্ঞান নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে, 'মার, শত্রু মার! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু—মার। মার, শত্রু মার।'

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল।"

• • • •

ভারত থেকে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তারই প্রতিদানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভারতের কুৎসা রটনা করছে, ভারতকে সর্বদিক থেকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে, ভারতের বিরুদ্ধে হাজারো মিথ্যা কথা রটনা করছে, বিষোদ্গার করছে। —আমেরিকার দু'খানা "হেরল্ড" সাপ্তাহিক "টাইম" আর "নিউজ উইক"। "যার খাই, তারই বুকে বসে, তার দাড়ি ওপড়াই"—এই প্রবাদ বাক্যটি যেন এদের জন্যেই রচিত হয়েছিল। সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে এই দুটো কাগজ ভারতের বিরুদ্ধে যে নোংরামি প্রচার করেছে এবং এখনো করছে তা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদেশ-পরায়ণতার দলিলরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল। এই অপকীর্তি তাদের নতুন নয়। বারে বারে তারা ভারতের কেচ্ছা গেয়েছে ইতরের মতো। ডাঃ বিধানচন্দ্র একবার এদের ওপর মহাক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এবারও নানা প্রদেশে এদের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। দিল্লীতে এই দুটো পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা প্রকাশ্য রাজপথে পোড়ানো হয়েছে। বোম্বাই সহরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। পৌরসভার সদস্য এইচ. এস. ত্রিবেদী এই মহৎসবে নেতৃত্ব করেন। এক বিরাট জনতার কণ্ঠে ক্রোধ ও ধিক্কার ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু এরকমের কয়েকখানা কাগজ পুড়িয়ে তো তাদের জব্দ করা যাবে না। তারা খ্যাকশেয়ালের মত সেয়ানা। তারা জানে, এই রকম ঘটনায় তাদের প্রচার বাড়বে বৈ কমবে না। আর আমরাও এমন আহেম্মুখ যে ওই দুটো কাগজ পড়তে না পেলে যেন আমাদের ভাত হজম হয় না। দেশের কাগজের কোথায় কে এতটুকু কি লিখলে তার জন্যে তো সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তৎপরতার অভাব নেই। কিন্তু এদের বেলায় এতখানি ঔদাসীন্য কেন? অন্য কোন দেশ হলে কিছুতেই এরকম বেয়াদবি সহ্য করত না—গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে ইতঃস্তত করত না এবং বাড়িপর আর তাদের ঢুকতে দিত না। এদের সায়েস্তা করা কিছু শক্ত নয়। হুকুম দেওয়া হোক, এদের ভারতে প্রবেশ নিষেধ, তাহলেই দেখবেন, সুড়সুড় করে এরা নাকে খৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতেও এদের বিশ্বাস নেই—রীতিমতো মুচলেকা লিখিয়ে নিতে হবে—তবেই তারা ভারতে ঢুকতে পারবে।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর দরকার। তাছাড়া এরা এমন কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু নয় যে এদের আমদানি করতেই হবে। এদের আসা বন্ধ করে দিলে অনেক টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে—সেকথাটাও কর্তাদের ভেবে দেখা দরকার বলে মনে করি।

• • • •

আমাদের দেশে কবে আসবে! কবে আসবে! উদগ্র আগ্রহে অনেকেই অপেক্ষা করছে। অবশ্য রঙের খবর সন্দেহ নেই—"টেলিভিশনে রঙ চলচ্চিত্র।" জনমতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ টেলিভিশনে স্যাটা ছবি দেখানো হচ্ছে, স্যাটা মেয়েটির বিবাহোৎসব, কনে কয়েকটা ফুল দিয়ে তার দেহের অংশবিশেষ আড়াল দিয়েছে, বর একটা টুপি দিয়ে আব্রু বাঁচিয়েছে। তাছাড়া তাদের শ্রীঅঙ্গে আর কোন বেশবাস নেই। ডিউক অফ বেডফোর্ডের সৌজন্যে ডিটায় এইসব ছবি তোলা হয়েছে। শুধু কি বিয়ে, নগ্নকান্তি বাজনদার ঢোলো বাজাচ্ছে, উদোম সব ক্রিকেট খেলোয়াড় মাঠে ছুটোছুটি করছে, আর তাই দেখে দর্শকরা পাগলের মতো উল্লাসধ্বনি করছে। দৃশ্যগুলি কল্পনা করেই শিউরে উঠছি, রোমাঞ্চিত হচ্ছি! আমাদের দেশেও টেলিভিশন এসে গেছে না? দিল্লীতে? আহা! দিল্লীওয়ালারা কি ভাগ্যবান!

• • • •

পাক-হানাদারদের কবল থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়েছে কে? প্রথম যে মানুষটি এই হানাদারদের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে দেয় তার কথাই আজ সেখানকার লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তার নাম মহম্মদ দীন। এক গরীব মেষপালক।

দলে দলে হানাদাররা ছদ্মবেশে কাশ্মীরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ তাদের কোন সন্ধান জানে না। কারুর মনে কোন সন্দেহ নেই। এক মহাসর্বনাশ যে ঘনিয়ে আসছে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোন ধারনাই নেই।

এমনি সময়ে একদিন সেই মেষপালক গুলমার্গের নিকটবর্তী পুলিশ চৌকিতে হাজির হয়ে খবর দেয় যে অদূরে বনের মধ্যে বহু সশস্ত্র হানাদার জমায়েৎ হয়েছে।

তারিখটি ছিল ৪ঠা আগস্ট। গুলমার্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ফিরোজপুর নালার টিলার উপর মহম্মদ দীন ভোরবেলা তার মেষগুলিকে চরাচ্ছিল এমন সময় বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো শতাধিক তথাকথিত মুজাহিদ। তাদের পরণে সবুজ সালোয়ার আর সবুজ কুর্তা, তারা মহম্মদ দীনকে ধরে নিয়ে গেল তাদের দলনায়কের কাছে। তাকে ভয় দেখানো হল, প্রলোভন দেখানো হল, বলা হল তারা এক মহৎ কাজেই আল্লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এখানে এসেছে। এখান থেকে তারা শ্রীনগর যেতে চায় এবং এই কাজে মহম্মদ দীনকে তাদের সাহায্য করতে হবে। কী সাহায্য করতে হবে? মহম্মদ দীনকে নিকটস্থ ট্যাংমার্গ শহরে যেতে হবে, সেখানে সে যতগুলো পারে লরি ভাড়া করে এইখানে নিয়ে আসবে, লরিওলাদের বলা হবে যে কাঠ চালান দেবার জন্যে লরিগুলি দরকার। এই আদেশের পর মহম্মদ দীনের হাতে দেড় হাজার টাকার ভারতীয় মুদ্রা দেওয়া হল তার কাজের বকশিস স্বরূপ: আরও হাজার টাকা দেওয়া হল লরি ভাড়ার বায়না বাবদ। তাকে আরও বলা হল যে খবরদার, সে যদি তাদের আদেশ পালন না করে বা তাদের এই গোপন আস্তানার কথা প্রকাশ করে দেয় তাহলে সে যেখানেই থাক, তাকে এবং সেই সঙ্গে তার পরিবারের অন্য সবাইকে তারা জবাই করবে।

মহম্মদ দীন সেই টাকা সমেত সোজা চলে গেল ট্যাংমার্গের পুলিশ ষ্টেশনে। টাকার লোভ তাকে কর্তব্যচ্যুত করেনি—দেশকে বাঁচাবার প্রেরণায় মহম্মদ দীন সেদিন শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারই কাছ থেকে খবর পেয়ে কর্তাদের চমক ভাঙলো।

—শ্রীনগরের হেড-কোয়ার্টারে খেতার বার্তা চলে গেল। সেখান থেকে খবর গেল দিল্লীতে। শুরু হল হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান।

• • • •

কত রকমের বিদেশী শয়তান যে আমাদের দেশে এসে অবাধে তাদের নোংরা কাজ চালায়, দরকার হলে খাপটি মেরে থাকে, সাধু সেজে থাকে, বন্ধুর ছদ্মবেশে পিছন থেকে ছুরি শানায় আর ভারতের ক্ষতি করবার চেষ্টা করে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। তারা কেউ আসে সাহিত্যিক রূপে, কেউ বা ধর্মপ্রচারক রূপে। সম্প্রতি এমনি এক ভারতদ্রোহী পাক-দরদী সাংবাদিক ধরা পড়েছে। তার নাম রিচার্ড ক্রিচফিল্ড। তার বর্তমান আস্তানা দিল্লীতে। ওয়াশিংটন ইভনিংষ্টার নামে একটা ইতর-স্বভাব ইয়াংকি সংবাদপত্রের সে প্রতিনিধি। সে ভারতে আসে এক মার্কিন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে এবং নাগপুরের হিস্লপ কলেজে সাংবাদিকতার অধ্যাপকরূপে যোগ দেয়। শুরু থেকেই "অধ্যাপক" ভারতের কেচ্ছা গাইতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, কৃষ্ণ মেনন ও ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে এক অশ্লীল ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেও সে পেছপা হয়নি। দেখে শুনে নাগপুরের ছাত্ররা সহ্য করতে পারেনি। একদিন তাকে ঘরে বেদম প্রহার দিয়ে নাগপুর থেকে বার করে দেয়।

১৯৬২ সালের ঘটনা। পুলিশ পাহারায় ক্রিচফিল্ড দিল্লীতে এলো। তারা দিয়েছিল, পত্রপাঠ তাকে ভারত থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি, লোকটা এখনো এখানে আছে এবং এখানে বসেই পাকিস্তানের অনুকূলে তার লেখা নিজের দেশের কাগজে পাঠাচ্ছে। তবে আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই তাকে এখান থেকে বিতাড়িত করা হবে।

ক্রিচফিল্ড একা নয়, তার মতো ভারতবিদ্বেষী ও ভারতের অহিতকামী গুপ্তচর সদৃশ নজার বিদেশী আরও অনেক আছে, অবাধে তারা এদেশের যত্রতত্র বিচরণ করছে, যা তা লিখছে। ভারত সরকারের উচিত, কঠোর হাতে তাদের দমন করা। আর ক্ষমাঘেন্না নয়, যথেষ্ট সহনশীলতা দেখানো হয়েছে এতোদিন। আমাদের সেই সহনশীলতাকে দুর্বলতা মনে করে তারা বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছে—এখনো বেড়াচ্ছে। কিন্তু আর নয়। তারা জেনে রাখুক, ভারতের বুকে বসে ভারতেরই সর্বনাশ চেষ্টার দিন তাদের ফুরিয়েছে। ভারত সরকার যদি তাদের দুরস্ত না করেন, ভারতের অধিবাসীরা তাহলে আইন নিজের হাতে নেবে এবং তখন আর তাদের সপরীরে ঘরবন্দ হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

• • • •

শোনা গিয়েছিল, ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরতি হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি যুদ্ধ থেমেছে? আমাদের সৈন্যরা হয়ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে বন্দুক নামিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানের সৈন্যদের প্রতি সেরকম কোন আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলে তো মনে হচ্ছে না। কারণ তারা তো রীতিমত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে—আক্রমণ করে চলেছে সকল রণাঙ্গণে, পশ্চিম এবং পূর্ব, উভয় ধারেই। "ব্যাপার যা চলছে" প্রেসে যাবার সময় সংক্ষেপে পরপর কয়েকদিনের ঘটনার সারাংশ লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি—তাদের মধ্যে শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতি নয়, আরও নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার আভাস ইঙ্গিত পাঠক পাবেন। এইসব ঘটনার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব এতই স্পষ্ট যে কোন মন্তব্যের প্রয়োজন হবে না। ··জম্মু-কাশ্মীরে পাক-গুলিবর্ষণ···। ইছোগিল খালের ধারে পাকবাহিনীর লোকেরা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে চলেছে। ···কৃষ্ণনগর থেকে খবর এসেছে, রাস্তার দু'পাশে সারবন্দী পুলিশ, আর তাদের মাঝখান দিয়ে

চোরাকারবারিরা চাল পাচার করছে। ব্যাপারটা ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের চোখের সামনেই। তিনি মহা উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'এখনকার পুলিশ ঘুষখোর। নবীয়ার কোন শাসনব্যবস্থা নেই।' হায় মুখ্যমন্ত্রী! বেফাঁস কথা বলে আপনি নিজের গায়ে কালি লেপন করলেন॥···এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিক সম্প্রতি ইউরোপ সফর করে এসে বলেছেন, বিদেশে ভারতের প্রচারের অত্যন্ত অব্যবস্থা, ইউরোপে ভারতের হয়ে কথা বলবার কেউ নেই, তিনি সেখানে একজন ভারতীয় দেখলে পাঁচজন পাকিস্তানি দেখেছেন, পাকিস্তানি সরকার এদের সবদিকে বিছিয়ে পড়িয়ে বিদেশে পাঠান, ইউরোপের সাধারণ মানুষের মনে এরা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে, ভিয়েনাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করেও পাক ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কোন খবর বার করতে পারেন নি। ·····ভিথোরাগড়ে ভিন্ন রকম পাকহানা প্রতিহত। যুদ্ধবিরতির পর পাকিস্তানীদের বড়রকমের আক্রমণ॥···আমেদাবাদে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে জাতির নবজন্ম লাভ হয়েছে॥···কর্তব্যজ্ঞান···গতমাসে পাকিস্তানী বিমান যোধপুর ও বারমার মধ্যে যে ট্রেনে বোমা ফেলে সেই ট্রেনে যাচ্ছিলেন ডাক-পিওন মুলচাঁদ। তিনি বারদিন ধরে পায়ে হেঁটে বারমার জেলার গাধরা রোডে গিয়ে পৌঁছোন এবং সমস্ত চিঠিপত্র অক্ষত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন॥··বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির পাক-প্রীতি দেখে অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। একজন বলেছেন, সংবাদে প্রকাশ কতকগুলি বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতে কারবার চালিয়ে আক্রমণকারী পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থসাহায্য করে চলেছেন। এই ধরণের কয়েকটি ব্যাঙ্ক সম্প্রতি পাকিস্তানের "ডেফেন্স ডিফেন্স" লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, অথচ ভারতের প্রতিরক্ষা তাণ্ডারে এক পয়সাও দেননি। ভারতের মধ্যে ভারতীয়দের অর্থে কারবার চালিয়ে তাঁরা পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য করেন কোন্ সাহসে?···আমাদের একটি পত্রিকায় একটি সত্য তথ্য সুন্দর ভাবে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, পাকিস্তানে কাক মরেছে আর হাহাকার উঠেছে ইংলণ্ড আমেরিকায়—যেন তাদেরই সর্বনাশ হয়েছে। ভারতের সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদ পত্রের এবং বি. বি. সির প্রচার যেন বিপুল এক মিথ্যার বিস্ফোরণ॥···ব্যবসায়ীর দেশপ্রেম! যুদ্ধের সময়েও পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে তাদের অনেক টাকার যোগান দিয়েছেন এবং নিজেও বহুলক্ষ টাকা কামিয়েছেন এই অভিযোগে কলকাতার কোটীপতি ব্যবসায়ী গায়ালাল সারোগী আর তাঁর পুত্রকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর মুনাফার পরিমাণ নাকি কোটি টাকারও বেশি এবং তা বৃটেনের ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে! বাঃ! বড় সারোগী বাপ বেটা!!···ভেহট সীমান্তে পাক পুলিশের গুলীবর্ষণ॥ · জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে শত্রুরা আমাদের ঘাঁটির দিকে গুলীবর্ষণ করছে এবং তারা লাহোর ও শিয়ালকোট খণ্ডে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার চেষ্টা করছে॥···কলকাতার বস্তী এলাকা এবং পার্ক অঞ্চলে শীঘ্রই ট্রেঞ্চ খনন সুরু হবে॥···ইছোগিল খালের কাছে ভারত-পাক গুলী বিনিময়॥··· ভিথোরাগড়ে অনধিকার প্রবেশ নয়, রীতিমত পাকিস্তানী আক্রমণ, বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন॥··· লাহোর খণ্ডে পাকিস্তানের অবিরাম গোলাবর্ষণ॥···নবীয়ায় পাকগুলীবর্ষণ অব্যাহত॥···লাদকে ও সিকিম সীমান্তে চীন তৎপরতা॥···পাকিস্তানকে বিনা বিমান দেবে বলে চীনের প্রতিশ্রুতি॥···মার্কিন ঘুরাচুরী ধরা পড়ে গেছে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। অর্থাৎ মুখে আমাদের বন্ধু সাজলেও আসলে মার্কিণ কূটচক্র আমাদের সর্বনাশ করবার জন্যেই সদা সচেষ্ট॥···ভারত যুদ্ধে বিজয়ের প্রচারে

বেরেছে,—বলেছেন সিংহলের সাংবাদিক মহাসভার বিশেষজ্ঞ কলকাতায় এক সাক্ষাৎকারে; তিনি সম্প্রতি ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করে দেখেছেন যে পাকিস্তান সাম্প্রতিক যুদ্ধের ব্যাপারে ওইসব দেশে তাদের পক্ষে প্রচণ্ড প্রচার চালাচ্ছে। এবং তাদের তুলনায় ভারতীয় প্রচার যেমন প্রাণহীন তেমনি অপর্যাপ্ত।··· পাকিস্তান বাহিনী গাদ্দার সহর থেকে পালাবার আগে সহরটিকে শ্মশানে পরিণত করে গিয়েছে॥·· শ্রীনগরে এক সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাজ্যের সরকারী দপ্তর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। বহু ক্ষতি হয়েছে বলে প্রকাশ। জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান যে, এই অগ্নিকাণ্ড আন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের ফল॥···আসামের তিনজন ব্রিটিশ চা-করকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে॥···বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী আক্রমণ অব্যাহত॥···আসামে এখনো অবিরাম পাক-অনুপ্রবেশ চলেছে॥···আসাম রাজ্যের বাসিন্দা কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিকের কার্যকলাপে রাজ্যসরকার চিন্তিত হয়েছেন॥···গাদ্দারের কাছে প্রচণ্ড পাক আক্রমণ। পাকিস্তান কর্তৃক চীনের কাছে পূর্ববঙ্গকে ইজারা দান, আজাদ পূর্ববঙ্গ বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিনে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে॥···পাটনায় স্থানীয় ক্যাডেট কোরের শিবিরস্থ রান্নাঘরে খাবারে বিষ মেশাবার চেষ্টায় পুলিশ বিহার কারোর নামে এক মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। প্রায় ছ'শো ক্যাডেটের অন্নে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ ছ'শো ক্যাডেট বেঁচে যায়॥···মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদদের তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত হল—অসিতকুমার ঘোষ। নেফার রণাঙ্গনে বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তান-রণাঙ্গনে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।

উপরে উল্লিখিত ছোট ছোট সংবাদগুলির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যাবে, দারুণ দুর্দিনের কালো মেঘ আমাদের জীবনের দিগন্তকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু তাই বলে আমরা ভীত হব না। ভয়কে আমরা জয় করেছি। জাতীয় জীবনে আজ নতুন চেতনা এসেছে। সেই চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে আমাদের। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সরকারের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হোক। আজ আর অন্য কোন লক্ষ্য নয়। একটি মাত্র লক্ষ্য আমাদের—শুধু প্রতিরক্ষাই নয়, প্রয়োজন হলে প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের দ্বারা আমরা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। আজ আর কথা নয়, মায়া নয়, মমতা নয়—আজ নির্মমভাবে শত্রুকে মারতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমাদের জীবনের সকল প্রস্তুতি চলুক। সেই লক্ষে নিয়োজিত হোক কবির শঙ্খাহরণ মহামন্ত্র—

"প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এদি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জন॥
ঘনঘন দামিনী-ঝলক-ভরা যামিনী।
অন্তর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জ্বালো তীব্র অনল,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত
মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চম্পা একটু একটু করে এবার তাদের সমস্ত কাহিনীই আমার কাছে বলেছে। সে কাহিনী সত্যিই আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ছকে পড়ে না।

একটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের অনাথ মেয়ে। সে পরিবার কবে যে বাংলা দেশ থেকে উত্তর বিহারের একটি নগণ্য গঞ্জে প্রবাসী হয়েছিল তারা নিজেরাই জানে না। ভাষাটুকুর যোগ-রক্ষা ছাড়া তাদের আচারে ব্যবহারে বাংলা দেশের ছাপ প্রায় মুছেই গেছে। ছেলেবেলাতেই মা বাবা দুজনকে হারিয়ে আশ্রয় পেয়েছে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে। সেখানে ঠিক অবাঞ্ছিত উপদ্রব বলে কিছু গণ্য হয়নি বাড়ির কর্ত্রীর স্নেহে ও উদারতায়। ছেলেবেলাতেই চম্পার চেহারা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে তিনি সে বাড়ির অন্য অনেকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাকে পড়াশোনার সুযোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত উত্তর বিহারের প্রধান একটি শহরের কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানকার ছাত্রীদের হোস্টেলে থাকবার সুযোগও চম্পা পেয়েছে এই করুণাময়ীর কৃপায়।

এই হোস্টেলেই চাচাজির মেয়ে চামেলীর সঙ্গে তার পরিচয়। নামের সাদৃশ্য থেকে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছে। গ্রীষ্মের এক ছুটিতে চামেলীর নিমন্ত্রণে চম্পা তাদের বাড়িতে ছুটিটা কাটাতে গেছল। সেখানেই নিয়তির একটি নিষ্ঠুর কৌতুক ও একটি অভাবিত আঘাত তার জীবনে বিপর্যয় এনেছে।

জায়গাটার নাম নারকেটিয়াগঞ্জ। বড় গোছের না হলেও ও অঞ্চলের মাঝারি রকমের ব্যবসার কেন্দ্র। চাচাজি সেখানকার ধনী একজন ব্যবসায়ী। চাচাজির বাড়িতে ছুটি কাটাবার সময়েই উদ্ভিন্ন-যৌবনা চম্পার জগৎ এক মুহূর্তে এক আশ্চর্য আলোড়নে টলমল করে উঠেছে। সে আলোড়ন দুর্বোধ দুর্বার এক আকর্ষণের। চাচাজির বাড়িতে থাকতেই একদিন কোন এক সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন দেখেছে। চাচাজির বাড়ির চালচলন সেকেলে। পুরুষ ও মেয়েদের মহল আলাদা। তবু সম্মানিত অতিথিকে একবার দেখবার সুযোগ পেয়েছে। দেখে কৌতুক বোধ করবারই কথা। নেহাৎ অল্পবয়সী একটি ছোকরা বললেই হয়। কিন্তু সেই এক মুহূর্তের দেখা কৌতুক ছাপিয়ে দেহের সমস্ত রক্তাণুর ছন্দ যেন বদলে দিয়েছে চম্পার। ছন্দের এ রকম অঘটন

যে সম্ভব তা চম্পার ধারণা ছিল না। সে বিহ্বল যেমন হয়েছে তেমনি একটু শঙ্কিতও। এ অনুভূতি ঠিক প্রীতিকর নয় কেমন একটু অস্বস্তির। তবু দুদিন বাদেই মনের এ অস্থিরতা কেটে যাবে মনে করেছে। কিন্তু তা কাটেনি। চাচাজির অতিথির সঙ্গে আবার তার দেখা হয়েছে পরের দিনই। ভালোভাসা ভাবে তখন জেনেছে চাচাজি অকারণে এ অতিথির এত সম্বর্ধনা করেন নি। চাচাজির ব্যবসায়ের স্বার্থও তাতে আছে। অতিথি নাকি এ অঞ্চলের কয়েকটি বড় ব্যবসার মালিক। সেই সূত্রে এখানে এলে দিনের জন্যে এখানকার ডাকবাংলোয় আছে। চাচাজিদের সঙ্গে অতিথির কিছু একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও বুঝি আছে বলে শুনেছে।

লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে। চামেলী ও তার মার সঙ্গে গঞ্জের একটি বিখ্যাত দেবস্থানে পেছল পুজো দিতে। সেখানে এক্কাওয়ালার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়েছে ভাড়া নিয়ে। এক্কাওয়ালা অত্যন্ত রুঢ় হয়ে উঠে তাদের সম্মান রেখে কথা বলে নি। সেই সময়ে অতিথি মন্দির থেকে বেরিয়ে তাদের দেখেছে। সে সেখানে পুজো দিতেই এসেছিল। তার দুই ধমকে এক্কাওয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। লোকটি তার ভাড়া করা মোটরে তারপর চম্পাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। গঞ্জে তখন ওই একটি মোটরই ভাড়া খাটে। সেটি ভাড়া নিয়ে ঘোরাফেরার বিলাস যার তার সাধ্য নয় এটুকু চম্পার বুঝতে দেরী হয় নি।

নিয়তির অতর্কিত নির্মম আঘাত এসেছে ঠিক এই সময়ে। যার স্নেহ ও দয়া চম্পার একমাত্র ভরসা সেই করুণাময়ী অভিভাবিকার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছেছে পরের দিনই। চিঠিটা কলেজ হোস্টেলের ঠিকানা ঘুরে আসায় একটু দেরীতে পৌঁছেছে। চম্পার তখনই ফিরে না গেলে নয়। চিঠিতে সেই কথাই একটু আদেশের রূঢ় সুরে লেখা। চম্পা যেন চিঠি পেয়েই কলেজ হোস্টেলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফিরে আসে এই নির্দেশ। চিঠি পড়েই তার সৌভাগ্যের দিন যে শেষ তা চম্পা বুঝেছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে যাওয়া নিয়ে। অল্প বয়সী কোন মেয়ের অতখানি পথ একলা ট্রেনে যাওয়া ও অকালে অচিন্ত্যনীয়। চামেলীর মার অনুরোধে চাচাজি চম্পার সঙ্গে একজন কাউকে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু একথাও জানিয়েছেন যে তাতে দু একদিন দেরী হবে। সমস্যার সমাধান হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে। চাচাজির অতিথি কিছুক্ষণ বাদে দেখা করতে এসেছে। গল্প থেকে সেই দিনই সে চম্পার বাড়ির পথেই ট্রেনে যাচ্ছে। চম্পাকে তার নিজের স্টেশনে নামিয়ে দেবার ভার নিতে সে সানন্দে রাজী হয়েছে চাচাজির অনুরোধে।

চম্পা অবশ্য থার্ড ক্লাসেই গেছে মেয়েদের কামরায়। অতিথি ভদ্রলোক ফার্স্ট ক্লাসে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে নেমে সে চম্পার খোঁজ খবর নিয়েছে। চম্পার গন্তব্য হায়াঘাট। ট্রেনে সেখানে পৌঁছেছে সন্ধ্যা বেলায়। স্টেশনে তাকে নিতে কেউ আসেনি। আসবার কথাও নয়। লোকটি সে কথা জেনে যা করেছে তা আশাতীত। নিজের যাওয়া মুলতুবি রেখে সেও ওই স্টেশনে নেমেছে চম্পাকে পৌঁছে দেবার জন্যে। হায়াঘাট গণ্ডগ্রাম বললেই হয়। একটি দুটি এক্কা কখনো সখনো স্টেশনে পাওয়া যায়। সেদিন পাওয়া যায় নি। লোকটি নিজের জিনিষপত্র স্টেশনে জমা করে রেখে হেঁটেই চম্পার সঙ্গে গেছে তাকে পৌঁছোতে। চম্পার সঙ্গের জিনিষ বলতে একটি বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ। লোকটি চম্পাকে তা বইতে দেয়নি। হাঁটাপথে যেতে যেতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু আলাপ তাদের হয়েছে। লোকটি দু একটি প্রশ্ন করেছে চম্পার পড়াশুনা ও তার পরিবারের বিষয়ে। চম্পা বেশী কিছু

বলেনি কিন্তু সে যে অনাথ মেয়ে হিসেবে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিতা একথাটা গোপন রাখতে পারেনি।

গোপন করলেও বাড়িতে পৌঁছোবার পর চম্পার অভ্যর্থনার নমুনা দেখেই হয়ত সে কথা লোকটি অনুমান করতে পারত। বাড়িতে ঢোকবার পরই যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে সিসেমদাই বলে কেঁদে উঠে চম্পা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছে। সিসেমদাই কিন্তু বেশ কঠিন মুখেই সরে দাঁড়িয়ে অপ্রসন্ন স্বরে বলেছেন,—এতদিনে আসবার সময় হ'ল তোমার! তারপর বেশ একটু সন্দিগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চম্পার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলেছেন, ইনি কে?

চম্পা কিছু বলবার আগে লোকটি নিজে থেকে বলেছে,—আমার পরিচয় দেবার কিছু নেই। সঙ্গীর অভাবে ওঁর আসবার অসুবিধে হচ্ছিল। আমি এই পথেই যাচ্ছি বলে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

ও।—বলে ভুরু কুঁচকে সিসেমদাই ভেতরে চলে গেছেন। চম্পার সঙ্গীকে বসতে পর্যন্ত বলেন নি।

ক্ষোভে লজ্জায় চম্পার চোখে জল এসেছে। সঙ্গীর দিকে ফিরে কি বলতে গিয়েও সে পারেনি। ঠোঁট দুটো শুধু তার কেঁপে উঠেছে।

তার সঙ্গীই স্নিগ্ধভাবে হেসে ক্যানভ্যাসের ব্যাগটা চম্পার হাতে দিয়ে বলেছে,—তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমি কিছু মনে করিনি। আচ্ছা চলি।

মনের এই বিক্ষুব্ধ বিচলিত অবস্থাতেও লোকটির তুমি বলে সম্বোধনটা চম্পার কানে বেজেছে। মানুষটা যে অন্তত অশিক্ষিত নয় তা ভালো করেই জানা গেছে সামান্য পরিচয়েই। তাই অন্তত ওই বয়সের এক যুবকের পক্ষে তার মত একজন তরুণীকে হঠাৎ তুমি বলা বেমানান ঠেকেছে অন্তত।

তুমি টা যদি কানে বেজে থাকে লোকটির পরের কথায় চম্পা একেবারে চমকে গেছে।

চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটি বলেছে, একটা কথা বলে যাই। এখানে তোমার আশ্রয় খুব পাকা বলে মনে হচ্ছে না। যদি সেরকম কোন বিপদে পড়ো তাহলে আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমি যতটুকু পারি সাহায্য করব। ইচ্ছে করলে আমাদের কাছেও থাকতে পারো। আমার স্ত্রীর তোমারই মত একটি ছোট বোন ছিল। দু'বছর আগে মারা গেছে। সে তোমায় পেলে খুশি হবে। এই আমার নাম ঠিকানা।

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে চম্পার হাতে দিয়ে সে চলে গেছে।

অসাড় হাতে কার্ড-টা নিয়ে শুধু নামটুকুই পড়তে পেরেছে চম্পা। নিখিল ধর। তারপর সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

চম্পাকে তার কলেজের পড়া'ও বটেই পুরোণ আশ্রয়ও ছাড়তে হয়েছে।

নিখিল ধরের কাছে সে অবশ্য সাহায্য চায়নি। সে আশ্রয় নিয়েছে চাচাশ্বশুরের বাড়িতে। চাচেমশী ও তার মা তাকে নিজেরাই নেবে জায়গা দিয়েছেন তার বিপদের কথা শুনে।

চাচেমশী ও তার মা তাকে পড়াশুনা বন্ধ না করবার জন্যেও পেড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু চম্পা আশ্রয়টুকুর বেশী অনুগ্রহ নিতে রাজী হয়নি। মা পড়াশুনা করেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট, এখন সে শুধু নিজের পেট চালাবার মত একটা কাজ চায়। কলকাতা বোম্বাই দিল্লীতে মেয়েরা ত আজকাল অনেক

রকম কাজ করে। দরকার হলে সে সেই সব শহরেই যাবে। আপাততঃ সে চায়েশীর যার সহায় হয়েছে তাঁর সংসার দেখাশোনার ভার নিয়ে।

বছর দুয়েকের মধ্যে সে সংসারেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চায়েশীর বিয়ে হয়ে তার শ্বশুরবাড়ি পাটনায় চলে গেছে। চাচাজি অন্য কোথায় নতুন কি চিনির কারখানায় অংশীদার হয়ে সেখানেই বেশীর ভাগ থাকেন।

সেখান থেকেই একবার বাড়িতে এসে চাচাজি চম্পার নতুন কাজের ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন।

কাজটা কোথায় ও কি তা জেনে চম্পা স্তম্ভিত হয়েছে। এখানেও অদৃষ্টের সেই নির্মম কৌতুকই যেন উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। আগুনে পোড়া ক্ষতের মত বুকের মধ্যে যার নামের দাগ সে চাপা দিয়ে ভুলে থাকতে চায় চাকরী তারই কাছে। নিখিল ঘরেরই একটি কারখানার চাচাজি এখন অংশীদার। তাকেই দেখাশুনা করবার জন্যেই চম্পাকে চাচাজি নিয়ে যেতে চান।

নিখিল ঘরের সত দু'বছরের মর্মান্তিক কাহিনী চম্পা এই প্রথম শুনেছে চাচাজির মুখে। নিখিল ঘরের জীবনে এমন কিছু এরই মধ্যে ঘটেছে যার জন্যে সে আর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়। যা ঘটেছে তা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয়। নিখিলের স্ত্রী হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক অবস্থায় মারা গেছেন। তাই থেকেই নিখিলের মাথার বিকৃতির সূত্রপাত। আর সব ব্যাপারে সহজ স্বাভাবিক হলেও স্ত্রীর মৃত্যুর কথা সে মোটে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা স্ত্রী তার এখনো জীবিত। কোন কারণে তার কাছ থেকে আত্মগোপন করে আছে।

এ রকমের অদ্ভুত ধারণা হবার একটা ক্ষীণ কারণ অবশ্য আছে। নিখিলের স্ত্রীর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় হয়নি।

ওই অঞ্চলের ভায়োরার জঙ্গলে নিখিলের বিস্তীর্ণ একটা এলাকা ইজারা নেওয়া আছে। নিখিল তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই জঙ্গলের কাঠ কাটার কাজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়ার মত জায়গা সেটা নয়। তবু নিখিল যে নিয়ে গিয়েছিল তা শুধু ওই নির্জন পরিবেশে স্ত্রীর মন একটু শান্ত হবে এই আশায়।

কিছুদিন ঘরে তার স্ত্রী একটা অদ্ভুত কারণে অনর্থক ক্ষুব্ধ আহত হয়ে ছিলেন। নিখিল বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এই দেশেরই মেয়ে বিয়ে করেছে। চাচাজির সঙ্গে সেই দিক দিয়ে একটা দূরের সম্পর্কও তার আছে। তাদের বিবাহিত জীবন বহুকাল ধরে সুখেরই ছিল। কিছুদিন আগে থেকে তার ওপর অশান্তির ছায়া ঘন হতে সুরু করেছে। অশান্তির কারণটা একটু অসাধারণ। নিখিল কে জানে কোন দুর্জ্ঞেয় শারীর রহস্যের যাদুতে বয়সের ভার থেকে যেন মুক্ত। প্রায় প্রৌঢ়ত্বের কাছে এসে পৌঁছোলেও দেহে তার অক্ষয় যৌবনের দীপ্তি। এই ব্যতিক্রমই নিখিলের দাম্পত্যজীবনের অশান্তির মূল হয়ে উঠেছে। পরিচিতেরা সময়ে অসময়ে তার স্ত্রীকে পরিহাস করেছে দুজনের বয়সের তফাৎ উল্টো করে বাড়িয়ে। অপরিচিতেরা স্ত্রীকে তার শুরুজন স্থানীয়া মনে করেছে। নিখিলের স্ত্রী সাধারণ গ্রাম্য অল্প শিক্ষিতা মেয়ে। প্রকৃতির এ খেয়াল সহজভাবে সে মেনে নিতে পারেনি। পাঁচজনের কথা ও পরিহাস থেকেই তীব্র ক্ষোভ ও অন্তর্দাহের সূচনা হয়েছে তার মনে। নির্জনে এক সঙ্গে কিছুদিন কাটালে হয়ত স্ত্রীকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারবে এই ভেবে নিখিল তাকে নিয়ে জঙ্গল মহলের কুঠি বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়েছে তাতে। নিখিলের স্ত্রী যমুনা সেখানে সারাক্ষণ ভয়ে

ঘরে কাটিয়েছে। অকারণে ঝগড়াঝাটি করেছে যখন তখন। তারপর একদিন হঠাৎ যেন সহজ প্রসন্নতা ফিরে পেয়ে নিখিলকে বলেছে—আর তার কোন দুঃখ নেই। চির যৌবনের মন্ত্র কোথায় পাওয়া যায় সেও জেনে ফেলেছে এবার। স্ত্রীর মুখে এটা সহজ পরিহাসের সুর মনে করে আশ্বস্ত হয়ে নিখিল খুশি মনে কাজের তদারকে বেরিয়েছে সেদিন। বিকেলে ফিরে এসে যমুনাকে কুঠিবাড়িতে আর দেখতে পায়নি। উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে তার খোঁজে লোকজনকে পাঠিয়ে নিখিল নিজেও বেরিয়ে পড়েছে। যমুনাকে কিন্তু পাওয়া যায়নি। অনেক রাত্রে কুঠিতে ফিরে যমুনার খোঁজ কেউ পায়নি জেনে নিখিল সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে নিজেই আবার বেরিয়ে পড়েছে উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরতায়।

দুদিন তারপর নিখিল ধরও নিখোঁজ। তাকে যখন পাওয়া গেছে তখন সে অরণ্যের এক গভীর অংশে আর বিকারে বেহুঁশ।

তাকে শহরের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার স্ত্রীর পরিণাম তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত জানতে দেওয়া হয় নি।

যমুনার যা হয়েছে তা সত্যিই বড় শোচনীয়। কি কারণে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে কুঠিবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে গেছল বলা যায় না। জঙ্গলের মধ্যে তার মৃতদেহ নিখিলকে পাওয়ার আগের দিনই পাওয়া গেছে একটা খাড়া পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্যে। যমুনা জঙ্গলের পথে নিজের অজ্ঞাতে সেখানে পা ফস্কে পড়ে গেছল না ঝাঁপ দিয়েছিল স্বেচ্ছায় তা জানবার উপায় নেই।

নিখিলের অসুখের মধ্যেই যমুনার দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। নিখিল সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর তাকে সে কথা জানান হয়।

কিন্তু নিখিল তা বিশ্বাস করেনি। প্রথমে পরিহাস ভেবেছে তারপর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করেছে, তারপর কি যেন ভেবে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার অপ্রকৃতিস্থতা তখন থেকেই সুরু।

এই অবস্থায় নিখিলের মন ও শুশ্রূষার ভার চাচাজি চম্পার কথাই ভেবেছেন। মনে মনে দ্বিধা সংশয় আশঙ্কা থাকলেও চম্পা রাজী না হয়ে পারে নি।

দিবারাত্র নিখিলের সান্নিধ্যে থেকে তাকে সেবা করতে পাওয়া যেমন একদিক দিয়ে চম্পার কাছে আশাতীত সৌভাগ্য, তেমনি তা শাস্তিও আরেক দিক দিয়ে। নিখিল সারাক্ষণ তার স্ত্রীর চিন্তাতেই বিভোর। চম্পার কাছেও তার বিভ্রান্ত মনের অলীক ধারণার কথা সে ক্রমশঃ প্রকাশ করেছে। চম্পা প্রথমে সায়ও দেয়নি, প্রতিবাদও করেনি। শুধু চাচাজিকে নিখিলের মনের বিকার যে ক্রমশঃ বাড়ছে তা জানিয়েছে।

চাচাজির সত্যকার পরিচয় তখনও চম্পা পায়নি। নিখিলের একান্ত হিতৈষী আত্মীয় বলেই তাঁকে জেনেছে। নিখিল স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তার কাজ করবার সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন। চাচাজিকেই তার হয়ে সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে দেখে চম্পা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাই অনুভব করেছে।

তাই চাচাজি যখন প্রথম তার কাছে তাঁর অদ্ভুত প্রস্তাব করেছেন তখন চাচাজির যুক্তিই মেনে নিতে খুব বেশী দ্বিধা সে করেনি। দিয়ে বিষকয়ের মত নিখিলের মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার জন্যেই তার অলীক ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া দরকার এই ছিল চাচাজির যুক্তি। চাচাজির পরামর্শ মত মনের দ্বিধা সঙ্কোচ জয় করে চম্পা নিখিলের মৃতা স্ত্রী সেজে তাকে দেখা দিয়েছে কয়েকবার। এই

সময়েই নিখিল আমাকে প্রথম চিঠি লেখে। নিখিলকে ছায়ামূর্তি দেখিয়ে সুফল কিছু না হলেও চাচাজির আদেশ অমান্য করবার কোন কারণ চম্পা পায়নি।

তার সঙ্গেই জেগেছে জঙ্গল মহলের সেই কুটিবাড়িতে নিখিলকে নিয়ে গিয়ে তাকে স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দেখাবার ব্যবস্থার কথা শুনে। এইবার প্রথম সে চাচাজির সঙ্গে তর্ক করেছে। কিন্তু চাচাজি তার প্রতিবাদ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। যেখানে সাঁঝাই নিখিল তার স্ত্রীকে হারিয়েছে সেই জঙ্গল মহলে তার স্ত্রীর ছায়ামূর্তির দেখা পাওয়াই নিখিলকে রোগমুক্ত করার শেষ উপায় বলে চাচাজি বুঝিয়েছেন। চম্পা রাজী না থাকলে রেবতী বা আর কাউকে দিয়ে এ চেষ্টা তাঁকে করতে হবে, এ ইঙ্গিত দিতেও ছাড়েননি। রেবতী চাচাজির ওই শহরের বাসার দাসীকন্যা ও তাঁর স্নেহের পাত্রী।

চম্পাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হ'তে হয়েছে। এবারকার আয়োজন দেখে ও নির্দেশ শুনে তার সন্দেহ গাঢ় হয়েছে আরো। এবারে শুধু দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নয়, কুটিবাড়ি থেকে নিখিলকে ছায়ামূর্তির ইঙ্গিতে বনের মধ্যে বহুদূরে তার স্ত্রী যেখানে মারা গেছে সেই খাদ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া। [ক্রমশঃ

আগামী মাসের আকর্ষণ

লিখনভঙ্গীতে ও বিষয়বস্তুতে একটি অসাধারণ রচনা

বাজে বাজে বাঁশী

অভিনব টেকনিকে লেখা একটি চিত্রগল্প, শীঘ্রই যা সিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত হবে। এক নিষ্ঠুর নৃশংস ঐতিহাসিক চরিত্রের বিস্ময়কর বিবর্তন—মহাজীবনে উত্তরণ। প্রণয়বেদনার মধুর আলেখ্য। "বাজে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান। সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।" কাহিনীর মধ্যে সেই পরম সুরের জাল বোনা। রচনা করেছেন, বহু দিনের অভিজ্ঞ লেখক—আনন্দ দেবরাজ। রচনাটি নানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। এক যশস্বী চিত্র-পরিচালক কাহিনীটির বাংলা ও হিন্দী চিত্ররূপ তৈরী করবার ভার নিয়েছেন।

জাস্পাত্যজীবন

চার্লি চ্যাপলিনের ঘটনাবহুল জীবনে বারে বারে যে আঘাত এসেছে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য যে কোন মানুষ হয়ত ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতো, কিন্তু চার্লি চ্যাপলিনের ছিল দুর্জয় প্রাণশক্তি আর অদম্য আশাবাদ। তারই জোরে তিনি সকল দুর্বিপাকের সমুখীন হয়ে তাদের জয় করেছেন, আশাবাদের প্রেরণায় সুদিনের জন্যে অপেক্ষা করেছেন শান্ত সমাহিত চিত্তে। মানুষকে তিনি বিশ্বাস করেছেন আজীবন। বহু মানুষ তাঁকে ঠকিয়েছে, তাঁকে বিপথে ফেলেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আজীবনের বিশ্বাস হারাননি।

জীবনে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন তিনি। বহু নারী-সঙ্গ করেছেন। ভাবপ্রবণ মানুষ তিনি। বারে বারে মেয়েরা তাঁর মনে মোহ বিস্তার করেছে। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। তাঁর উচ্ছল উদ্দাম কর্মজীবনের অন্তরালে আর একটি সত্তা ছিল—শান্ত সুখনীড়ের মধ্যে সংসারী মানুষের সত্তা। শরৎচন্দ্রের জীবনানন্দের মতো একাধিকবার তাঁকে বলতে শুনেছি, "কে বলবে এমনি উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরী জীবনই আমার কাম্য। আমি স্ত্রী চাই, পুত্র চাই, চাই সুখীসংসারী জীবন। মরণকে যেদিন ঠেকাতে পারবো না, সেদিন স্ত্রীপুত্রদের অশ্রুভরা চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে চাই।"

সেই আশায় তিনি বিবাহ করেছেন। একবার নয়। পর পর চারবার। একটির পর একটি পর পর তিনটি বিবাহ কিছুদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদের বেদনায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তবুও তাঁর মনের আকাঙ্খা আর আশাবাদ বিলুপ্ত হয়নি। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে চতুর্থবার বিবাহ করেছেন এবং আজ বিশ বৎসরকাল সেই স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছেন।

বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর প্রথম দুটি বিবাহের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

• • • •

১৯১৭ সাল। চার্লির জীবনে খ্যাতি আর অর্থের সৌভাগ্যলক্ষ্মী তখন মধ্যগগনে।

তাঁর প্রযোজিত অভিনীত ও পরিচালিত ছবির পর ছবি হিট্ করছে। অজস্রোতের মতো টাকা আসছে আর সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে দেশে দেশে তাঁর জয়ধ্বনি।

কিছুদিন আগে মুক্তিলাভ করেছে তাঁর নতুন ছবি—'পোলডার আরমস'। চারদিকে সেই ছবির বিপুল চাহিদা।

সেই সময় একদিন বিখ্যাত প্রযোজক সামুয়েল গোলডুইনের আহ্বানে এক মজলিশে গিয়েছিলেন চার্লি। সেখানে মিলড্রেড হ্যারিস নামে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হল।

আত্মকাহিনীতে চার্লি বলেছেন, তার ষোলডুইনের আহ্বানে যদি তিনি সেদিন সাড়া না দিতেন তাহলে তাঁর জীবন হয়ত সম্পূর্ণ অন্য পথে প্রবাহিত হত।

সুন্দরী এবং চলনবলনের মেয়ে মিলড্রেড হ্যারিস। মজলিশের শেষে চার্লিকে বললে, "আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবেন, মিঃ চ্যাপলিন?"

এ আহ্বানে চার্লি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। মোটরের মধ্যে দুজনে বন্ধ হয়ে বসলেন। আলাপ চলতে লাগল মৃদুকণ্ঠে।

চার্লি বললেন—'তুমি কী সুন্দর।'

মিলড্রেড বললে—'আপনার সঙ্গে এই যাত্রায় মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের পথে চলেছি!'

মিলড্রেডকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে চার্লি তাঁর ডেরায় ফিরলেন। তিনি তখন অ্যাথলেটিক ক্লাবে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন এলো। ফোন করছে মিলড্রেড।

—"কি করছেন?" কথার সুরে অলস আবেশ।

চার্লি জবাব দিলেন—"এইবার খাওয়া দাওয়া সেরে শোব ভাবছি। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়ব। তারপর ঘুমুব।"

কথা চলতে লাগল। চার্লি কি খেতে ভালবাসেন, কী বই পড়তে ভালবাসেন সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠেন—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে মিলড্রেড।

শেষকালে মিলড্রেড বললে—"এবার তাহলে বিদায়। শুভরাত্রি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আপনার কথা ভাবব।"

চার্লি হেসে বললেন—"বেশী রাত অবধি জেগে থেকো না, শরীর খারাপ হবে।"

এমনি করে যে পরিচয় শুরু হল তা নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে বিলম্ব ঘটল না।

নাচের আসর, প্রমোদ ভ্রমণ, নিভৃত ডিনার, গোপন মিলন।

কিছুদিন বাদে মিলড্রেড বললে—'আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।'

—'কিসের ভাবনা?'

চার্লির বুকে মুখ লুকিয়ে মিলড্রেড যা বললে, তাতে চার্লির মনেও ভাবনা ধরল। তাহলে তো আর দেরী করা চলে না।

সেই সময় চার্লির বিশ্বস্ত সেক্রেটারীরূপে কাজ করছিল টম হ্যারিংটন। লোকটি ছিল এক অদ্ভুত টাইপ। নিঃশব্দে কাজ করত। যেমন দক্ষ তেমনি বুদ্ধিমান, আর তেমনি বিশ্বাসী। চার্লি বলেছেন, টম হ্যারিংটনের মতো খাঁটি আর সৎ মানুষ তিনি জীবনে বেশী দেখেননি।

কয়েকদিন পরে সকালে প্রাতঃরাশের সময় চার্লি টমকে ডেকে বললেন—'টম, আমি বিয়ে করব, ঠিক করেছি।'

মনিবের কথা শুনে টম একটুও বিস্মিত হল না। শান্তভাবে বললে—'কবে?'

—'আজ কি বার?'

—'মঙ্গলবার।'

চার্লি বললেন—"তাহলে শুক্রবার। সেইরকম ব্যবস্থা কর।'

কিছু কম আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংসারের কাজে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই মিলড্রেডের। সে চায় অভিনেত্রী হতে; চার্লির ঘরনী—এই পরিচয়ের জোরে চিত্র-জগতে প্রতিষ্ঠালাভেই তার যা কিছু উৎসাহ যা কিছু আগ্রহ।

চার্লির সেটা একেবারেই মনঃপূত নয়। প্রথম থেকেই মিলড্রেডকে তিনি বাধা দিলেন। বললেন, স্ত্রীকে তিনি স্ত্রী হিসাবেই পেতে চান। ঘর-সংসারকে অবহেলা করে অভিনেত্রী হওয়া চলবেনা। এই নিয়েই বাধল কলহ। পরবর্তীকালে মিলড্রেড এ সম্পর্কে লিখেছে "চার্লি আমাকে ঠিক কথাই বলেছিল। কিন্তু অতটা অধৈর্য হওয়া তার ঠিক হয়নি। তাই বা তখন বয়স আমার। আর কিছুদিন যদি সে অপেক্ষা করত, আমি নিজেই হয়তো আমার ভুল বুঝতে পারতাম।"

সে যাই হোক, চার্লির মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেমিলড্রেড মেট্রো-গোলডুইন-মেয়ার পিকচার্স-এর সঙ্গে চুক্তি করে বসল। ব্যাপারটা জানবার পর চার্লির ক্রোধের অন্ত রইল না। কিন্তু মিলড্রেডের সেই এক কথা, অভিনেত্রী জীবনকেই সে বাঁকড়ে ধরে থাকবে। আর একটা ব্যাপারেও চার্লির মতামতকে সে অগ্রাহ্য করে চলতো। নিজেদের বাড়ীতে প্রায়ই সে পার্টি দিত। নানান রকমের লোক আসত সেই সব মজলিশে। তাদের কোলাহলে চার্লি প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন। ষ্টুডিয়োতে তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। কাহিনী রচনা, পরিচালনা, অভিনয়, দৃশ্য বিন্যাস—সবকিছুই করতে হত তাঁকে। সারাদিন সেই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বাড়িতে এসে যে একটু বিশ্রাম নেবেন, তার উপায় নেই। বাড়িকে তো মিলড্রেড প্রায় হাট বানিয়ে ছেড়েছে। অনেকবার ঐ নিয়ে অনুযোগ করেছেন চার্লি, কিন্তু মিলড্রেড নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত চার্লি ষ্টুডিয়োয় যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। বাড়ীতে ঢুকে সরাসরি তাঁর শয়নকক্ষে চলে আসতেন। তাতেও মিলড্রেডের আপত্তি। আপত্তি থেকে কলহ। মিলড্রেড বলতো, "আমার বন্ধুরা বুঝি তোমার যোগ্য নয়। যাও, দুদণ্ড গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু গল্প করো, তাতে তোমার জাত যাবে না।" রকম সকম দেখে বিতৃষ্ণায় বিরক্ত হয়ে চার্লি শেষ পর্যন্ত বাড়ি আসাই ছেড়ে দিলেন।

তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন বছর খানেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। বিয়ের পর মাস কয়েক বাদেই হয়তো বিচ্ছেদ ঘটত। ঘটেনি, তার কারণ মিলড্রেড তখন অন্তঃসত্ত্বা। চার্লি তা জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, জননী হলেই মিলড্রেডের সব ছেলেমানুষির অবসান ঘটবে; মিলড্রেড বুঝতে পারবে, খুবই তার যোগ্য আশ্রয়। পারিবারিক জীবনের তীব্রতম অশান্তির মধ্যে এই একটিমাত্র আশাকে অবলম্বন করে শান্ত চিত্তে চার্লি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মিলড্রেডকে সুখী করবার জন্য তখনো তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

যথাসময়ে একটি ছেলেও হল মিলড্রেডের। কিন্তু বাঁচল না। তিনদিন পরেই শিশুটির মৃত্যু হল। পুত্রশোকে কাতর হলেন চার্লি। কিন্তু স্ত্রীর কথা ভেবে নিজেকে শান্ত করলেন। এ শোক তো তাঁর একার নয়, মিলড্রেডেরও। সেই নিদারুণ দুঃখের মধ্যে মিলড্রেড যাতে একটু আনমনা থাকে, একটু যাতে হাসি ফুটে ওঠে তার বোগপাণ্ডুর ওষ্ঠে, তার জন্য চার্লি কোনও চেষ্টারই ত্রুটি রাখেন নি। নিজের অসহ্য বেদনাকে লুকিয়ে রেখে তিনি হাসতেন, রসিকতা করতেন, অন্যের ভাবভঙ্গী নকল করে দেখাতেন, নাচতেন। আর এ-সবই করতেন কয়েকটি আনন্দমুহূর্তের জন্য। একদিন তো তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত মেক-আপ নিয়েই স্ত্রীকে দেখতে গেলেন।

যদি তাকে একটু হাসাতে পারেন। মিলড্রেড এ সম্পর্কে বলেছিল, "তাঁর নিজের হৃদয়ই তখন শোকে মুহ্যমান। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁর কাছ থেকে যে মমতাপূর্ণ ব্যবহার আমি পেয়েছি, তার তুলনা হয় না।"

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মিলড্রেড পথে বেরিয়ে এসে দেখে, নতুন একখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি বললেন, "মিলি, এ গাড়ি তোমার। তোমার জন্যেই কিনেছি।" বাড়িতে এসে মিলড্রেড বললে, ছেলের জন্যে দুজনে মিলে যে নার্সারি সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেইখানে তাকে একবার নিয়ে যেতে হবে। শূন্য ছোট্ট একটি পালঙ্ক, তার পাশে অশ্রুর খেলনা। ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরবে মিলড্রেড, চার্লি তাই খেলনা কিনে রেখেছেন। সেই শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিলড্রেড একসময়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। মৃত শিশুটিকে কবর দিয়ে তার সমাধি ফলকের উপরে ছোট্ট একটি কথা উৎকীর্ণ করে দেওয়া হল, "দি লিটল মাউস।"

দিন কয়েক একটু স্থির হয়ে রইল মিলড্রেড, তারপরেই তার পুরনো আকাঙ্খা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অভিনেত্রী হতে হবে। বাড়িতে একটার পর একটা পার্টির আয়োজন করতে লাগলো সে, আর সেই উদ্দাম মাইফেলের মধ্যে চার্লি যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি চান শান্তি, চান বিশ্রাম। কিন্তু মিলড্রেড তাঁকে শান্তি দেবে না। বাড়ি থেকে পালিয়ে পথে-পথে আর নয়তো সমুদ্রতীরের নির্জন নৈঃশব্দের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চার্লি।

কয়েকদিন বাদে তিনি সত্যিই পথে বেরিয়ে এলেন, আর বাড়ি ফিরলেন না। লস এঞ্জেলস অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেই পুরনো আস্তানায় গিয়ে উঠলেন। আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা না ওঠা পর্যন্ত সেইখানেই তিনি ছিলেন।

এই বিচ্ছেদ অবশ্য দুজনার মধ্যে আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল। সেই সময় চার্লি "দি কিড" নামে ছবিখানি শেষ করার কাজে ব্যস্ত।

মিলড্রেড-এর সম্বন্ধে নানা গুজব তাঁর কানে আসতে লাগল। বুঝলেন, আর একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। তার কোন সার্থকতাও নেই। মিলড্রেডকে বললেন সে কথা। আরও বললেন, মিলড্রেড এ বিষয়ে যত টাকা চায় তা তিনি দেবেন।

স্থির হল, এ বিষয়ে দু'জনেই গোপনতা অবলম্বন করবেন। মিলড্রেড অবশ্য আদালতে চার্লির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করবে, স্বামীর মানসিক নিষ্ঠুরতার জন্যে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, স্বামী সে মামলায় প্রতিবাদ করবে না, ফলে মামলা একদিনেই শেষ হয়ে যাবে। লোক জানাজানি হবে না। এবং দুজনেই কেউই সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি দেবেন না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হল না। চতুর সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়ে মিলড্রেড লম্বা এক বিবৃতি দিয়ে বসল; চার্লির অপরাধকে খুব কঠোর ভাবে অঙ্কিত করল।

পরে চার্লি যখন মিলড্রেডকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে ওই বিবৃতি দিলে তখন মিলড্রেড জানালো যে, সাংবাদিকরা তাকে বলেছিল যে চার্লি নাকি মিলড্রেড-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কটু বিবৃতি দিয়েছেন, তাই সে-ও কতকটা রাগের বশেই সাংবাদিকদের কাছে চার্লির বিরুদ্ধে বলেছিল।

মিলড্রেড চার্লির কাছে যত টাকায় এই মামলা নিষ্পত্তি করবে বলেছিল, আদালতে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা চাইল। দুলক্ষ ডলার খেসারত দিয়ে চার্লি তাঁর প্রথম বিবাহের ছেদ টানলেন।

• • • •

"দি কিড" সারা বিশ্বে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, চলচ্চিত্র জগতে আর কোন ছবিই বোধ করি তেমনতর আলোড়ন আর উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে নি।

"দি কিড' ছবি থেকে বহু টাকা উপার্জন করলেন চার্লি। সাংসারিক জীবনের অশান্তি দূর হয়েছে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। বেশ আছেন একা একা। মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নারী সঙ্গ করছেন, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ করছেন। ইতিমধ্যে মাকে তিনি ইংলণ্ড থেকে হলিউডে নিয়ে এসেছেন। সমুদ্রের ধারে তাঁর জন্যে একটি সুন্দর বাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন।

মাকে সুখী করে চার্লির মনে হয়েছিল যে তাঁর জীবন এতদিনে সম্পূর্ণ সার্থক হল।

"দি কিড" ছবির পর, তুললেন "আইডল রাস"। তারপর "পে ডে"।

পরবর্তী দুখানি ছবি "দি সিলগ্রিম" এবং "এ উওম্যান অব প্যারিস" চার্লির খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। পর পর ছবি তুলতে লাগলেন তিনি।

"এ উওম্যান অব প্যারিসের" পর "দি গোল্ড রাশ"। ১৯২৫ সাল।

এই ছবির জন্যে নতুন একটি নায়িকার সন্ধান করছিলেন চার্লি।

অনেক মেয়েকেই পরীক্ষা করে দেখলেন। কাউকেই পছন্দ হল না। এই সূত্রে লীটা গ্রে নামে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল তাঁর। লীটাকে দেখলেন চার্লি। মুখখানা যেন চেনাচেনা। মনে পড়েছে। "দি কিড" ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় লীটা অভিনয় করেছিল। হঠাৎ তাকে ভারি পছন্দ হয়ে গেল চার্লির। দুরন্ত উচ্ছল প্রকৃতির মেয়ে। সেই সঙ্গে অপরূপ রূপবতী। বয়েস সতেরো আঠারো।

লীটার আসল নাম লোলিটা ম্যাকমারে। ষ্টুডিয়োতে আসবার সময় মাকে সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। লীটার মা নিজেও এর আগে চার্লিরই একটি ছবির ছোট্ট একটি ভূমিকায় নেমেছিলেন।

লোলিটা ম্যাকমারে নামটা পছন্দ হলনা চার্লির, তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করলেন লীটা গ্রে। লীটার মা কোনও আপত্তি করলেন না। তাঁর মাথায় তখন নানান রকমের ফন্দি খেলছে। চুক্তিপত্র সই হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের হাতে ষ্টুডিয়োর ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করলেন। চার্লি যে তাঁর কোনও কাজেই বাধা দেবেন না, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছিলেন। ষ্টুডিয়োর কর্মচারীরা তো অবাক। সামান্য একশট্টার ভূমিকায় নামতে পারলে যাদের ধন্য হয়ে যাবার কথা এখনই তাদের এত দাপট। ভবিষ্যতে তাহলে আরও কত কী দেখতে হবে কে জানে।

লীটাকে নিয়ে কম হৈ-চৈ করা হয়নি। রীতিমত পাবলিসিটির চমক লাগানো হল। কাগজে-কাগজে কলাও করে ঘোষণা করা হল তার আগমন-বার্তা, বিজ্ঞাপনের ঝুরড়ি ঝাপিয়ে সবাইকে চমকে দেওয়া হল। কী তার ভাষা! কী তার বিন্যাস! বলা হল, "ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রাচীন বংশের মেয়ে সে। স্পেনের যে ক'জন অসমসাহসী পুরুষ সর্বপ্রথম ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতে এসে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁদেরই একজন—অ্যান্টোনিও বোতারো—তাঁর পূর্বপুরুষ। সব বিষয়েই লীটা গ্রে এক অসামান্য মেয়ে।" লীটার জন্যে বিজ্ঞাপনে যে অতিশয্য ও আড়ম্বর দেখা দিয়েছিল, সচরাচর কোন অভিনেত্রী সম্বন্ধে তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

চার্লি আর লীটাকে অতঃপর সব সময়েই একত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতে লাগল। যেখানে চার্লি, সেইখানেই লীটা, যেখানে লীটা, সেইখানেই চার্লি।

কিছুদিন পরেই যা ঘটবার তাই ঘটল। লীটা আর তাঁর আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে নিঃসঙ্গে চার্লি একদিন মেক্সিকোর এক অখ্যাত গ্রামের দিকে রওনা হলেন। যাবার আগে ইুডিয়োর লোকজনদের বলে গেলেন, "গোল্ড রাশ"-এর জন্য গোটাকয়েক লোকেশন-পট ঠিক করবার জন্যে তিনি একবার গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু সাংবাদিকদের অত সহজে ধোঁকা দেওয়া গেলনা। কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এ তারা আগে থাকতেই ঁাচ করতে পেরেছিলেন। চার্লিকে অনুসরণ করে তারাও সেই গ্রামে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোকরা কিছু জানত না, ব্যাপার দেখে তারা হতভম্ব। কোনও কালেই এসব হৈ-হল্লা পছন্দ করেন না চার্লি, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, নিজের জালেই তিনি জড়িয়ে গিয়েছেন। বিবাহ-পর্ব সমাধা হবার পর দল বেঁধে সবাই গিয়ে ট্রেনে উঠলেন আবার, ট্রেনের ডাইনিং কারেই সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হল। চার্লি ভেবেছিলেন, এ-বারে অন্তত সাংবাদিকদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। যখন বুঝলেন, কিছুতেই তারা ক্ষান্তভাগ করবে না, তখন চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে লীটাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন তিনি, তারপর নববধূর হাত ধরে খেত-খামার পাড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বিয়ের পর লীটার মা আর বিধিমাও চার্লির বীভারলি হিলসের নতুন বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলেন। এবং আরও কিছুদিনের মধ্যেই চার্লি নিঃসংশয় হলেন যে, বিয়ের ব্যাপারে এ-বারেও তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। ঘর করে সংসার চালাতে হয়, দেখা গেল যে, মিলড্রেডের মতই লীটাও সে বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞা। তার চাইতেও ভয়ের কথা, অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন ইচ্ছেও তার নেই। বাড়িতে এতদিন চাকর-বাকরাই ঘর-সংসারের কাজ চালিয়ে এসেছে, লীটা আসবার পর আরও কয়েকটি পরিচারিকা নিয়োগ করতে হল। সেই সঙ্গে এসে জুটল লীটার অসংখ্য বন্ধুবান্ধবী। বান্ধবীদের সকলেই প্রায় ফিল্ম এক্সট্রা। কিছুদিন আগে লীটা নিজেও তো তাই ছিল। দুঃখের দিনের সঙ্গী তারা। সেই দুঃখের কবল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে লীটা। সে এখন চার্লস চ্যাপলিনের ঘরণী, তার ঐশ্বর্যের এখন অন্ত নেই। আসুক, বন্ধুরা এসে দেখুক তার সৌভাগ্য, চালাও হাতে বান্ধবীদের সে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো। ফিলস্ এক্সট্রাদের কলকোলাহলে, আর সংসারের অব্যবস্থায়, দু'দিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন চার্লি। চার্লি আর লীটার চরিত্রে কোনও খানেই কোনও মিল ছিল না। যে-সুরে চার্লি তাঁর জীবন বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন সে সুরের কোনও খবরই রাখত না লীটা। দিন কয়েকের মধ্যেই চার্লির স্বপ্নভঙ্গ হল।

কিছুদিন পরে অকস্মাৎ চার্লি একদিন ঘোষণা করলেন, লীটাকে নিয়ে "গোল্ড রাশ" বইয়ের যে-ক'হাজার ফুট ছবি তোলা হয়েছে তা বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় নতুন কোনও অভিনেত্রীকে দিয়ে অভিনয় করানো হবে। লীটা তখন সন্তান সম্ভবা। সবাই ভাবল, অভিনেত্রী জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে লীটা হয়তো এবারে সংসারের কাজে মন দেবার চেষ্টা করবে। চার্লি নিজেও ঠিক সেই রকমটাই আশা করেছিলেন। সে-আশা ব্যর্থ হল।

এবং সেই আগের মতই দিন কাটতে লাগল তাঁর। ইুডিয়োতে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে যখন একটু শান্তি পাওয়া দরকার, তখন রাস্তায় রাস্তায় চার্লি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। লীটা তখন তার বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছে, অষ্টপ্রহর সেখানে উৎসব চলছে। ১৯২৮ সালের বসন্তকালে একটি ছেলে হল লীটা গ্রের। বাবার নামে তার নামকরণ করা হল চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন।

যন্ত্রণা আর আনন্দের এই সন্ধিক্ষণেও কাজ থেকে অবসর নেননি চার্লি, দ্রুত গতিতে তিনি তখন তাঁর "গোল্ড-রাশ"এর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিছুতেই তিনি বিচলিত হবেন না, কিছুতেই তিনি ভেঙে পড়বেন না। কাজ আর কাজ। কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন তিনি। শুধু মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যেত, কাজ করতে করতে হঠাৎ এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন তিনি, মাথা নিচু করে ষ্টুডিয়োর এক কোণে গিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, আঙুল মটকাচ্ছেন, আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন।

লীটার জায়গায় নতুন যে অভিনেত্রীটিকে নেওয়া হল, তাঁর নাম জজিয়া হেল। মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম করে তোলা অনেকগুলি দৃশ্য বাতিল করে দিয়ে নতুন করে নতুন অভিনেত্রী নিয়ে সেগুলি আবার তৈরি করা হল। "গোল্ডরাশ" বইখানি যখন শেষ করলেন চার্লি, বাস্তব জীবনে তখন চূড়ান্ত রকমের অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বিপর্যয়, সেই দুর্বিপাক সত্ত্বেও তাঁর শিল্পী-সত্তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। "গোল্ড রাশ" দেখে একবাক্যে সবাই স্বীকার করল, এ একটি মহান সৃষ্টি, চার্লি এই ছবিতে তাঁর প্রতিভার এক প্রদীপ্ত পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে শিল্প-সাধনায় মগ্ন হতে হলে যে একাগ্র অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়, চার্লির জীবনে কখনোই তার অভাব ঘটেনি। সেই সঙ্গে যন্ত্রণার গ্রন্থি-মোচনের আর একটি অস্ত্রও তাঁর ছিল। সে তাঁর অসাধারণ প্রাণ প্রাচুর্য। সেই অদম্য প্রাণশক্তি দিয়েই তিনি নিষ্ঠুরতম আঘাতকে সহ্য করেছেন, চরমতম বিপদের দিনেও হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। "দি কিড" বইখানি যখন তুলেছিলেন, তার কিছুদিন আগেই মিলড্রেড-এর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আর "গোল্ড রাশ" যখন তোলেন, তখন লীটার সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটলেও তাঁর বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রথম পুত্রের জন্মলাভের ন মাস বাদে আর একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন চার্লি। পিতৃব্য সীডনির নামানুসারে তার নাম রাখা হল সীডনি চ্যাপলিন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু মনের মিল হল না। বাড়িতে প্রায়ই পার্টি দিত লীটা। অষ্টপ্রহর তার বান্ধবীদের কলরবে সারা বাড়ি মুখর হয়ে থাকত। চার্লির সেটা ভাল লাগত না। সেই উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে বিরক্ত বোধ করতেন তিনি। শেষ পর্যন্ত, উপায়ান্তর না দেখে, বাড়িতে যাওয়া তিনি বন্ধ করলেন। ষ্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে চলে যেতেন সাণ্টা মনিকায়। মেরিয়ন ডেভিসের বাড়িতে গিয়ে দুজন গল্প করতেন। সংবাদপত্রের মালিক উইলিয়ম র‍্যাণ্ডলফ হার্স্টও সেখানে আসতেন। তিনজনে মিলে গল্পগুজব চলত।

টাকা আছে বলেই যে দুহাতে তার অপব্যয় করতে হবে, চার্লি এটা কোনও কালেই পছন্দ করেন নি। এই নিয়ে লীটার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর কলহ হত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা একদিন চরমে উঠল। সারাদিন ষ্টুডিয়োতে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর চার্লি সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন। এসে দেখেন, অত রাত্রেও লীটার বন্ধুবান্ধবরা আসর জমিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে অনেকেই মদিরামত্ত। সমস্ত মিলিয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল, বে-আব্রু, বীভৎস আবহাওয়া। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন চার্লি; তৎক্ষণাৎ সবাইকে তিনি বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। ব্যাপারটা বরদাস্ত হল না লীটার। দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে-ও বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। তার কিছুদিন বাদেই শোনা গেল, আদালতে

গিয়ে সে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনেছে। লীটার কৌঁসুলিরা আদালত থেকে আদেশ জারি করে চার্লস চ্যাপলিনের সমস্ত সম্পত্তি আটক করবার ব্যবস্থা করলেন। সব কিছুই আটক করা হল, বাড়ি, ষ্টুডিয়ো সব। যে অর্থ চিত্রশিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন চার্লি, তাও বাদ পড়ল না। ব্যাঙ্কে চার্লির যে অ্যাকাউন্ট ছিল, তার উপরে তো বটেই, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, এমন কি ভৃত্যদের অ্যাকাউন্টের উপরে পর্যন্ত টান পড়ল। লীটার কৌঁসুলিরা সন্দেহ করেছিল, অন্যের অ্যাকাউন্টে নিজের টাকা তিনি সরিয়ে ফেলতে পারেন। নিজের বাড়ি থেকে সীডনির বাড়িতে উঠে এলেন চার্লি। ষ্টুডিয়োতে ঢোকবার অনুমতি নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই পরবর্তী ছবি "দি সার্কাস"-এর কাজ তাঁকে বন্ধ রাখতে হল।

লীটা গ্রে ওদিকে বিভিন্ন কাগজে একটার পর একটা বিবৃতি দিয়ে চলেছে। চার্লসকর সব অভিযোগ, যদিচ অধিকাংশেই তার ভিত্তিহীন। আপন বান্ধবী মার্থা কেনেডির নামের সঙ্গে চার্লির নাম জড়িয়ে কুৎসা রটনা করতেও লীটার তখন আটকায়নি। চার্লি কিন্তু নীরব। একটা অভিযোগেরও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের উপরে যে একটা নির্মম অত্যাচার চলছে, যে কেউ সেটা বুঝতে পারত। ডাক্তার এসে উপদেশ দিলেন, পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্রাম! সেই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে কে তাঁকে বিশ্রাম দেবে? সীডনির কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে গেলেন। সেখানে গিয়েও শান্তি পেলেন না। দুর্ভাগ্য তাঁর পিছন পিছন যেন থাবা উঁচিয়ে ছুটে এসেছে। রীজ হোটেলে গিয়ে উঠলেন, টেলিফোনে বারকয়েক কে যেন তাঁর খোঁজ করেছে। নিজের নাম সে জানায়নি। চার্লি সে-রাত্রে তাঁর কৌঁসুলি জ্যাক ডার্কারের বাড়িতে গিয়ে আহার করলেন। পথে বেরিয়ে এসে এখানে-ওখানে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শান্তি নেই, কোথাওনেই তাঁর শান্তি নেই। টেলিফোনে কে তাঁর খোঁজ করছিল? আদালতের কোনও কর্মচারী নয় তো? হোটেলে ফিরে গেলেই তাঁর উপরে সে হয়তো নতুন কোনও সমন জারি করবে। না, রীজ হোটেলে তিনি আর যাবেন না। কোথায় যাবেন তা হলে? কোথায় গিয়ে রাত কাটাবেন? ঘুরতে-ঘুরতে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলেন, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "ছোটখাট কোনও হোটেল জানা আছে তোমার? অখ্যাত কোনও হোটেল? এক-রাত্তিরের জন্য আমাকে একটা ঘর জুটিয়ে দাও। না, সদর রাস্তায় নয়, পার যদি তো কোনও গলিঘুঁজির মধ্যে নিয়ে চল আমাকে। যেন কোন হুল্লোড় না থাকে, যেন একটু নিরিবিলি হয়।"

কয়েকটা হোটেলই জানা ছিল ড্রাইভারের, কিন্তু একটা হোটেলেও জায়গা পাওয়া গেলনা। সমস্ত ঘর ভাড়া হয়ে গিয়েছে, শিফনদিবসের কোনও ঘরও খালি নেই। পরপর কয়েকটা রাত্রি অনিদ্রায় কেটেছে, অবসাদে ভেঙে পড়ছে তাঁর শরীর। আর কতক্ষণ এইভাবে ঘুরে বেড়াবেন! ক্লান্ত চোখ তুলে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আর কোনও হোটেল জানা নেই তোমার? একটা মাত্র রাত্তিরের জন্য একটু আশ্রয় চাই আমি। তাও আমাকে জুটিয়ে দিতে পারবেনা?" ড্রাইভার বললে, "রাত প্রায় দুটো বাজতে চলল। যে-রকম ঘর আপনি চাইছেন সারারাত খুঁজেও বোধ হয় তা পাওয়া যাবেনা। মাঝারী গোছের হোটেলগুলি সব ভর্তি হয়ে আছে। তার চাইতে আমি বলি কি, বড় কোনও হোটেলে চলুন। পয়সা কিছু বেশী লাগবে অবিশ্যি, কিন্তু ঘর ঠিক পেয়ে যাবেন।"

একমুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন চার্লি। তারপর বললেন, "ভেবেছিলাম বলবনা। কিন্তু না বলে আর কোনও উপায় নেই এখন। আমি চার্লি চ্যাপলিন।" ভেবেছিলেন, এইটুকু শুনেই

ড্রাইভার হয়তো তাজ্জব বনে যাবে। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত সেই নামটি শোনবার পরেও তার যখন কোনও ভাবান্তর ঘটলনা, চার্লি তখন বললেন, "বড় হোটেলে আমি যাবনা। ছোট হোটেলগুলিও দেখছি ভর্তি হয়ে আছে। কী করা যায় তাহলে? আমি বলিকি, তোমার বাসায় আমাকে নিয়ে চল। একটা রাত্তিরের জন্যে আমাকে আশ্রয় দাও। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।"

ঘুম শুধু চার্লিরই পায়নি, ড্রাইভারটিরও পেয়েছিল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "বেশ তো আমার ওখানেই চলুন।"

সত্যিই সেই রাত্রে জগৎবিখ্যাত অভিনেতা কোটিপতি চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন এক দরিদ্র ট্যাক্সিচালকের ঘুপসি ঘরের মেঝের উপর কম্বলের বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়েছিলেন।

• • • •

বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবী করল লীটা, তার অঙ্কটা প্রায় অবিশ্বাস্য। সংবাদপত্রে তার সেই দাবিকে "দ্বিতীয় সোল্ড রাশ" বলে বর্ণনা করা হল। চার্লির কাছ থেকে সে ইতিপূর্বে তদারেরও বেশী আদায় করেছিল। টাকাটা দিয়ে দিলেন চার্লি। লীটার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে তিনি তখন যে কোনও মূল্য দিতে রাজী ছিলেন।

পর-পর দুটি মেয়েকে বিয়ে করলেন চার্লি, কিন্তু দুজনের কেউই তাঁর গৃহিণী হতে চায়নি। তারা চেয়েছিল অভিনেত্রী হতে। তারা ভেবেছিল, চার্লির মতন বিখ্যাত একজন প্রযোজক-পরিচালককে যদি স্বামী হিসাবে পাওয়া যায় তো দেখতে না দেখতেই তারা অভিনয়-জীবনের সপ্তমস্বর্গে আরোহন করতে পারবে। চার্লি যখন তাতে বাদ সাধলেন, যখন খোলাখুলি জানালেন যে, স্ত্রীর কাছে শান্তিপূর্ণ সাংসারিক জীবনই তাঁর কাম্য, ক্রোধে আর হতাশায় তখন উন্মত্ত হয়ে উঠল তারা, তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা জানত, কোলাহল তিনি সইতে পারেন না। সমস্ত জেনেও দিনের পর দিন হইহল্লা নাচগান আর পার্টি দিয়ে তাঁর গৃহকে তারা এক অশান্ত কোলাহলে পূর্ণ করে তুলেছিল। মিলড্রেডের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন দু'বছর স্থায়ী হয়েছিল—(বছরখানেকের মধ্যেই অবশ্য স্বেচ্ছায় তাঁরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন); লীটার সঙ্গে বছর তিনেক।

মামলা চলবার সময় বিভিন্ন মহিলা-প্রতিষ্ঠান থেকে লীটাকে সমর্থন করা হয়। তাঁরা দাবি জানালেন, চার্লি চ্যাপলিনের বইগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেলেন চার্লি। আশঙ্কা হল, তাঁর অভিনয়-জীবনের বুঝি এবারে সমাধি রচিত হতে চলেছে। কিন্তু না, সকলেই লীটার পক্ষ সমর্থন করেনি। মার্কিন সমালোচক এইচ. এল. মেনকেন সেই সময় লিখেছিলেন, "দুদিন আগেও চার্লিকে যারা দেবতা মনে করত, চার্লির এই সঙ্কটকালে তাদেরই দেখি আনন্দের অন্ত নেই। চার্লির এতে উপকারই হল। জনচিত্ত বলতে যে কী বস্তু বোঝায়, চার্লি সেটা শিখে নিলেন।" তাছাড়াও তাঁর সমর্থনের অভাব হয়নি। রেনে ক্লেয়ার, লুই আরাগঁ, আরথেঁ, হুলাকে, মাঁরে এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময় তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

দু'দুবার দাম্পত্য জীবনের ট্রাজিডি সত্ত্বেও চার্লি একটি সুখের নীড়, একটি গৃহিণী-সচিব-সখীর কল্পনা ও আশা ছাড়তে পারেন নি।

তাই কয়েক বছর পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। তৃতীয় বারের স্ত্রী পলেট গডার্ড। সে বিবাহও টেকেনি। তারপর পঞ্চাশোর্ধে চতুর্থবার বিবাহ করেছেন এবং বিশ বৎসরকাল সেই চতুর্থ বারের স্ত্রী উনার সঙ্গে পরিপূর্ণ দাম্পত্য সুখ ও শান্তি উপভোগ করছেন।

পলেট গডার্ড আর উনার কথা "সম্রাটের নির্বাসন" অধ্যায়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে: চার্লির জীবন-দর্শন—নারীসঙ্গ—যৌনজীবন—কর্মজীবনের অব্যাহত জয়যাত্রা—ঘটনা প্রবাহ।

এশিয়া

সুশীল সিংহ

[এ গল্প কিভাবে লেখা হলো, কোথায় সুরু করে কোনজায়গায় ছেদ টানলে সবটা পরিষ্কার হয়, তা আমার নিশ্চিতভাবে জানা নেই।

সীতেশ নামে এক সম্প্রতি অসুস্থ ভদ্রলোকের ডায়েরী নিখিল হালদার নামে এক তরুণ কথা সাহিত্যিকের হাতে আসে। সীতেশের অসুখের বিবরণ যথাস্থানে হবে। তাঁর ডায়েরীও আর পাঁচজনের মতোতো নয়ই, একেবারে অন্য রকম কিছু। নিখিল হালদার, এই ডায়েরীটি তাঁর এক বন্ধু শান্ত রায়কে দেখান। দু'জনে সেই ডায়েরীর মধ্যে ডুবে যান। বলা বাহুল্য, ডুবে যাওয়ার মত অনেক প্রসঙ্গই সীতেশের ডায়েরীতে আছে।

ব্যক্তিগতভাবে ডায়েরীর লেখককে আমি চিনি না। তবে নিখিল ও শান্তবাবু দুজনের সঙ্গেই আমার বিলক্ষণ আলাপ আছে। শান্ত রায়ের প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে সীতেশবাবু বিয়েটারের সেই অভিনেত্রী মেয়েটির প্রতি ভিতর ভিতর তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে বুঝিয়েছিলেন অন্যরকম। নিজের মনকে চোখ ঠারার জন্যেই তার মানসিক জটিলতা ও শারীরিক অসুস্থতা।

কিন্তু নিখিল তা মনে করে না। তার বিশ্বাস সেই অভিনেত্রী মেয়েটি বা আরও দু-পাঁচটি বিষয় বা সীতেশবাবু তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা অনেকটা যাত্রাদলের বিবেকের মত হয়েছে। ভদ্রলোক অসুস্থ হয়েছেন বলেই সেই অভিনেত্রী, ফিরিওয়ালা, বাদামওয়ালা ইত্যাদির কাহিনী এত বড় হয়ে চোখে পড়ছে। ওইসব সীতেশবাবুর জীবনের কিছু ঘটনামাত্র, তার বেশী কিছু নয়।

নিখিল ও শান্ত রায় দুজনেই বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি দিক বিশেষভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে চাইলেও দুজনেই মনে মনে মেনেছে যে এই অভিনেত্রী ইত্যাদির প্রসঙ্গ ছাড়া এই ডায়েরীর লেখকের অনুভূতি গভীরতর কিছু, তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলার জন্য ছটফট করেছে। সেই গভীরতর, তাৎপর্যপূর্ণ বলার কথা কি তা ধরার জন্য ওরা রীতিমত গবেষণা করেছে বলা যায়।

আমার আকর্ষণও ওইখানে। তাই আমি এ গল্পে সেই ডায়েরী, ডায়েরীর লেখক সীতেশ-বাবুর কথা যেমন এনেছি, শান্ত রায় ও নিখিলের কথাও বাদ দিইনি।]

সীতেশের ডায়েরীর এই জায়গাটা তখন ওরা পড়ছিল, "সেই স্বর্গ। ছেলেবেলায় কোন এক রূপকথায় এই স্বর্গের কথা পড়েছিলাম। এখন খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই স্বর্গের ধারে শিলা-খণ্ডের ওপর তরবারি রেখে রূপকথার সেই কিশোর রাজকুমার অশ্বশিশুর জল পান করেছিল। তার অশ্বশিশুর চুমকি বসানো পোষাকের খানিকটা সিয়েছিল ভিজে। রাজপুত্র পিছন ফিরে দেখে সেখানে খোলা গায়ে দাঁড়িয়ে এক ছেলে। তার কালো খোলা গা। কানে তার টকটকে লাল ফুল। পরণে গাছের বাকল। রাজপুত্র, যার সব আছে, সে হাত বাড়িয়ে বলল, আমায় ওই ফুলটা দেবে? ছেলেটা বলল, দোব। তাদের ভাব হল। ওরা অনেক খেলা করল। তারপর খেলতে খেলতে একসময় দু'জন স্বর্গের ধারে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর....."

পড়তে পড়তে শান্ত রায় এইখানটায় থামল। কিছুক্ষণ সে যা নিখিল কোন কথা বলল না।

তারপর শান্ত তার নিজস্ব ভাষায় বলল, প্রাসাদ, সহর, লোকালয় আর সভ্যতার বাইরে নির্জন, শান্ত ভূমিতে এসে রাজকুমারও সরল ভিখারী হয়, এই কথাটাই কি উনি বলতে চাইছেন?

নিখিল হালদার উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাল। তার চোখ আরো সামান্য আলা করায় সে ঘরটার চারদিকে ভাল করে দেখল। বলল, ঘরটা ধোঁয়ায় একেবারে ভরে গেছে, চোখ যে এইরকম জ্বালা করছে তা বুঝতেই পারিনি। জানলার একটা পাল্লা খুলে দি।

নিখিল উঠে দাঁড়াল। শান্ত নিজের মনে ডায়েরীর কতকগুলো পাতা উল্টে গেল। ওদের সামনের টেবিলে অযত্ন অগোছাল কাগজ-পত্রের মাঝখানে ছাইদানে সিগারেটের টুকরো উপচে উঠেছে। সেটার দিকে নির্দেশ করে সামান্য আগে শান্ত রায় বলেছিল, ওটার অবয়ব 'সিম্বলিক', অফিস টাইমে বাস ট্রাম ও মানুষগুলোর মত। ঘিঞ্জেলি—

নিখিল ও শান্ত রায় দু'জনেই তরুণ কথাশিল্পী। প্রতীকে, প্রতীক ধোঁয়ায়, প্রতীক ব্যবহারে ওদের অশেষ আগ্রহ ও অপার অবজ্ঞা। নতুন রীতিতে নতুন গল্প লিখে পাঠকের নিহিত অবচেতনে ঘা দিয়ে চৈতন্যের উন্মেষ ঘটানোই তাদের বহু বিঘোষিত লক্ষ্য। স্বর্গ ও নরক, এই দুটোর সম্পর্কেই তাদের সমান উৎসাহ ও ঔদাসীন্য। এই দুই বস্তুর সম্পর্কেই তাদের ভাষায় তারা সমান, ডিটাচড্। তাদের মাথা যত, নিজের ওপর নিজেদেরই চাপান তার তার চেয়ে বেশী। তারা বদ্ধ ঘরে বসা পছন্দ করে। লেখার সময় তো বটেই, আলোচনার সময়ও ওরা চায় দরজা জানালা বন্ধ থাকে। ওদের বিবেচনায় এতে মনঃসংযোগের সুবিধা ঘটে। ওরা বলে, কনসেনট্রেসন।

সম্প্রতি নিখিলের সূত্রে শান্তরও সীতেশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সীতেশের বয়স একত্রিশ। অবিবাহিত। আজ প্রায় চার মাস সে শয্যাশায়ী। প্রথমে মনে হয়েছিল তার টি. বি. হয়েছে। পরে ডাক্তাররা প্রকাশ করেছেন যে এই রোগ তাঁদের অচেনা। এখনো তাঁরা বুঝতে পারেননি অসুখটা কি। মেডিকেল জার্ণালে নাকি এই নিয়ে লেখালেখি হবে। রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ হয়েছে, বুকের ভেতরের ছবিও নেওয়া হয়েছে বার সাত আট। রোগ ধরা পড়েনি। ডাক্তাররা বারবার তাদের পেসেন্টের কাছে জানতে চেয়েছেন যে গত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে সে বিশেষভাবে বুকে কোন আঘাত পেয়েছে কিনা।

রোগেও প্রকাশও অদ্ভুত। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। কোনটাই নিয়মিত নয়। কোন কোনদিন জ্বরের মাত্রা বাড়ে। একদিন অজ্ঞানও হয়ে গেছে। শরীর কেমন যেন অবসন্ন। মনে স্ফূর্তি আছে। অন্ততঃ শারীরিক অবসাদ তার মনকে সম্পূর্ণ স্ফূর্তিহীন করতে পারেনি। পারেনি যে তার প্রমাণ এই ডায়েরী। প্রমাণ সীতেশের ব্যবহার ও আলাপ। আলাপে সীতেশ এমন সব ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলে যা শুনে অবাক হতে হয়। নিখিলের ধারণা সীতেশের অসুখ, মানসিকতা ও বিচিত্র অনুভূতি ও চিন্তাকে কেন্দ্র করে এমন 'ক্লীয় অফ কনসাসনেস' দেখানো যায় যা গল্পের জগতে মোরগাল আনবেই।

সীতেশের ডায়েরীও বিচিত্র। সেটার কোথাও তার নাম লেখা নেই। দৈনিক সংবাদপত্র থেকে ছবি কেটে এখানে ওখানে লাগান আছে। কোনও পাতায় কেবলমাত্র সংবাদপত্রের হেডিং কেটে আটা দিয়ে সাঁটান। কোনও পাতায় নিজেই কিছু লিখেছে। লেখার পাশে কোথাও তারিখ ও

সময় আছে, কোথাও নেই। খবরের কাগজ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃত যে দিন-ক্রম বা পরম্পরা রেখে সাজান আছে তা-ও নেই। এই সপ্তাহের কাগজের টুকরোর পাশেই আছে একবছর আগেকার কাগজ থেকে কাটা কোন সংবাদের অংশ। ডায়েরীতে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত যে যতই সেটা এগিয়েছে ততই তাতে লেখার তাপ এসেছে কমে, তুলনায় অনেক বেড়েছে ওই সংবাদ-পত্রের কাটিং।

নিখিল বন্ধ ঘরের জানালার একটা পাশ খুলে দিলে শান্ত রায় তরল কণ্ঠে বলল, অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। তুমি যখন সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যে জানলা খুললে, তখন আমি ডায়েরীর কোন পাতা খুলে বসে আছি দেখো।

এই বলে সে সেই খোলা পাতাটা তুলে ধরল। দরকার ছিল না, কেননা বহুবার রেখে রেখে ডায়েরীর পাতাগুলো নিখিলের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

শান্ত রায় যে পাতাটি খুলে আছে সেখানে কোন এক পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণের ছবি। তারপরের পাতায় লেখা আছে: চীন কর্তৃক দ্বিতীয় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

নিখিল খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি যখন ধোঁয়া বার করার জন্যে জানলা খুলছি তখন তুমি ভেতরে এ্যটম্ বোম এক্সপ্লোসনের ছবি খুলে বসে আছ, এতে যে যোগাযোগই তুমি দেখো, আমি পোলিটিকাল থ্রোরি গহন করি না। আই হেট—

—আমিও। কেননা পোলিটিকাল যা কিছু তাই গল্প। এমন বেজায় গল্প যে তার চেয়ে জমজমাট গল্প আর কিছু নেই। অথচ জিনিষটা গল্পই।

শান্ত রায় তার নিজস্ব বাক্‌নিপুণতায় অনেক কথার ফুলঝুরি ঝরাল। তাতে আরো অভিভূত না হয়ে নিজের কথার জের টেনে নিখিল বলল, অথচ শান্ত, তুমি বারবারই ওই ডায়েরী থেকে রাজনীতি বার করছো।

শান্ত বলল, তোমারও কি তাই মনে হয় না? তাই যদি না হবে তাহলে এগুলো যত্ন করে তুলে রেখেছি কি মানে হয়? এই যে, শান্ত সদা তুলে আবার ডায়েরী থেকে পড়তে লাগল: "ভারতের বিরুদ্ধে জুলফিকার আলি ভুট্টোর আর একরকা বিষোদ্গার ও বিষের প্রচার", "মালয়েসিয়াকে ধ্বংস করিবই, সুকর্ণ," "ভারত কর্তৃক পরমাণবিক ছলের প্রস্তাব," "জাপান পরমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম," "ব্রহ্মদেশ হইতে আগত নূতন ভারতীয় উদ্বাস্তু," "মালয়েসিয়ায় যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা: টুকু আবদুল রহমান," "পাকিস্তান কর্তৃক আমেরিকান ট্যাংক ব্যবহার" "ইন্দোনেসিয়া অচিরে আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হইবে," "ভিয়েতনামে যুদ্ধ এখন চলিবে, জনসন," ; "সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত: সৌদি আরবকে উপলক্ষ করিয়া প্রেসিডেন্ট জনসনের উদ্দেশে তোপ সভায় প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘোষণা" ...

শান্ত রায় এইখানে থেমে আবার জানতে চাইল, এগুলো কি পোলিটিকাল নয়?

নিখিল নিজেকে সংযত করে বলল, কিন্তু এইসব খুলোয় বারোয়ানা ডায়েরীতে এসেছে ভদ্রলোকের নিজের লেখার শেষের দিকে। তুমি ডায়েরীর শেষের দিকটাই দেখছো, গোড়ার দিকটা দেখো। মানুষটাকে খোঁজ। আমরা চাই কি? চাই গল্প। তাৎপর্যপূর্ণ গল্প। আর সেই গল্পের জন্যই তো মানুষটাকে খুঁজতে চাই। এসো শান্ত আমরা এখন থেকে আমাদের মন্তব্যগুলো মাঝে মাঝে কাগজে নোট করি। রাজনীতির ব্যাপার তোল তো—মাই ফরগেট।

॥ দুই ॥

ডায়েরী আরম্ভ হয়েছে বিকেলের বর্ণনায়। দীর্ঘ রোগশয্যায় মানুষের কাছে বিকেল কেমন যেন করুণ হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোকের—অর্থাৎ শীতেশেরও বিকেল বেলায় মনের মধ্যে অনেক কিছু হয়। তাঁর ভাষায়: (শান্ত রায় পড়ছিল) "ঠিক এমনি সময় আমার পাশাপাশি দুটো ছবি মনে হয়। মনে হয়, কোথায় কারা যেন ঘরের দিকে একসঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। তারা কেউ কোন কথা বলছে না। তাদের প্রত্যেকের মাথা মাটির দিকে খানিক ঝুঁকে মাঝপথে আকাশ পানে চাইতে গিয়ে থমকে থেমে গেছে। সেইভাবে তারা হাঁটছে। আমার কেবলই এই ভেবে কষ্ট হয় যে সারাদিনের শেষে গাঁয়ে ফিরল যারা মানুষ মাথার ওপর আর একবার সূর্য চাইছে…"

প্রতীকের মত রূপকল্পেও নিখিল দাশদার ও শান্ত রায়ের সমান কৌতূহল। বিকেলের বর্ণনায় মগ্ন শান্ত রায় অন্যমনস্ক ভাবে পড়া থামিয়ে যেন চুপ করে কিছু খুঁজল। তারপর জানতে চাইল, পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ নিতান্ত ঘাসের পর্যায়ে আছে এই কথাটাই কি উনি বলতে চাইছেন?

নিখিল মন্তব্য করল, তুমি তো জানো এরপরই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত অন্য ছবি ফুটে উঠবে। পড়ো।

শান্ত পড়ল: মনে মনে এমনি ছবি দেখতে দেখতে যখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন আমি হঠাৎ একেবারে অন্য ছবি দেখি। যদি না দেখতাম, তাহলে বেঁচে থাকাই অসহ্য হয়ে উঠত। ছবিটা আরম্ভ হয় এইভাবে। শিকলের কথা মনে আসার পর একটা টুন টুন আওয়াজ কোথা থেকে যেন ভেসে আসে। কানের কাছে বাজে। দেখতে দেখতে সেই আওয়াজ একটা মিঠে বোল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট দেখতে পাই এক সাঁওতাল যুবতীর দিকে তারই চিকণ বাছুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কি সুন্দর! জীবন, জীবনকে প্রণাম করি। আনন্দিত হই।"

নিখিল বলল, এই যে প্রথমে আঁধার, তারপর আলোর কথা মনে হওয়া, একে আমি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। আমার গল্পের জন্য এই দিকটা আমি বিশেষভাবে নোট করলাম।

শান্ত রায় বলল, আমার কিন্তু এঁর ভাষাটাই বেশ মনে লাগছে। যেন নতুন নতুন। দেখো, দেখো, বিকেলের বর্ণনা করেছেন, কেমন? বিকেল এসেছে, ঘুরিয়েও যাচ্ছে, এই কথাটি বলার কেমন মুন্সিয়ানা:—"তখন মৌসুমী ফুলের মত বাহারে বিকেল (মৌসুমী ফুল সুন্দর ও স্বল্পায়ু—বিকেলও, পড়ার মাঝে শান্ত মন্তব্য করল) অনেক দূর গড়িয়ে যায়। যেন একা দোকার খেলাঘর থেকে খেয়ার সময় সখীর সঙ্গে আড়ি করে একলা খুকীর মাথার লাল ফিতের ফুল গেছে ভেঙে, মুখখানা অভিমানে থমথমে।" আবার আর একজায়গায় লিখেছেন: "নারাঙী রোদ্দুরের বিকেল তার কমল রেণু নিয়ে গাঁয়ের দুপুরে একবার শোনা পাখির শিষের মত অনেক, অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।" তারপর আবার, "এখনো একটুখানি ম্লান বিকেল গান শেষে মেয়ালার তলানির মত আকাশের গায়ে এখানে ওখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে।"

শান্ত রায় মন্তব্য করল, শেষ ছবিটায় সবই প্রচ্ছন্ন রেখে অথচ কেমন প্রাঞ্জল ভাবে বলা হল যে অন্ধকার প্রায় হয়ে এসেছে এবং সেটা তার ভাল লাগছে না। উনি শুধু ছবি আঁকেননি, ফটো-গ্রাফি করেননি। বিকেল আসা ও যাওয়ার মধ্যে সময়ের গতি, আর সেই গতির যে একেই তাঁর মনে হচ্ছে সেটিও ধরেছেন। ভদ্রলোক তাঁর বলার কথা নিজের মত করে বলতে জানেন।

প্রায় উচ্ছ্বসিত শান্ত রায়কে নিখিল হালদার মনে করিয়ে দিল, তুমি কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গীতে বাইরেটা দেখে কেবলই মুগ্ধ হচ্ছো। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু মানুষটাকে খুঁজে বার করে তার বক্তব্য সঠিক ভাবে বোঝা।

শান্ত বলল, কে বলল এই বর্ণনা কেবল মাত্র তাঁর বাইরের দিক? ভেতর থেকে উঠে না এলে কখনো এমন ভাষায়, উপমায় ছবি আঁকা যায়? ভদ্রলোকের ভিতর সজীব। আমার গল্পে তাঁর এই সজীবতার দিক আমি ফোটাব।

ওরা দুজনেই আবার সিগারেট ধরাল।

যে মানুষটি রোগশয্যায় শুয়ে এ হেন বর্ণনায় নিজেকে বিস্তারিত করেছেন, বিকেল হওয়ার সময় থেকে তাঁর যে কিছুই ভালো লাগে না, উপরন্তু ভয় করে সে কথাও তিনি ডায়েরীতে অকপটে স্বীকার করেছেন। সীতেশের মনে পড়ে ডাক্তার তাকে ঠাণ্ডা লাগাতে মানা করেছে। সে চাদরটা বুকের ওপর টেনে নেয়। জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে ঘরের মধ্যে চায়। সেখানে দেওয়াল, ফুল, নানা আসবাব, রবি ঠাকুরের ছবি ইত্যাদি দেখতেও তার ভাল লাগে না। মনে হয় ওই আসবাবগুলো, এমনকি দেওয়ালও তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চাইছে: কেমন আছো? আর রক্ত উঠেছে নাকি? জ্বর কত? তোমার রক্ত উঠছে কেন?…তার ভাষায়, "আমার ঘরের চার দেওয়াল যেন আপ্যায়িত অতিথির মত আমার দিকে চায়। বিধাতার মত নির্বিধ, নিরপেক্ষ গলায় আমার কাছে সেই বাদামওয়ালা, সেই বিস্কাওয়ালা, রাতের মোগলসরাই আপ গাড়ীর সেই যাত্রী, আর সেই বিয়েটারের মেয়েটির কথা জানতে চায়। এই জানতে চাওয়া আমি স্পষ্ট শুনতে পাই, আর কেউ পায় না। অথবা, "ঘরের চার দেওয়াল যেন গুপ্তচরের ঘনিষ্ঠতায় আমার আর একটু কাছে সরে আসার চেষ্টা করল। কেননা অন্ধকারের ফিকে ছায়া তখন জানালার শিক ঘরে নাড়া দিচ্ছে। বলল, তাহলে বলো, কেন উঠল রক্ত তোমার মুখ দিয়ে? কেন?"

মানসিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে তার কাছে ঘরের দেওয়ালও যে দৃষ্টিগ্রাহ্য শরীর হয়ে উঠেছে তার অর্থ এই নয় যে বাড়ীর লোকেরা তার কাছে আসেনা, কথা বলেনা। কাছে আসে। কথা বলে। গোড়ার দিকে সব সময় কেউ না কেউ তার ঘরে থাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, নিজেকে সকলের কাছ থেকে দূরে করছে। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে নানা চিন্তা করা তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গী খানিকটা সিনিক হয়ে উঠেছে। আর তাই তাকে খুশী করার জন্য যে সমস্ত আয়োজন, সেই সব ছোটখাটো আয়োজনই তাকে অখুশী করে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রোগীর ঘরে ফুলদানে ফুল রাখে বাড়ীর লোকেরা। সেদিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, "ছোট্ট টিপয়ের ওপর একগুচ্ছ টাটকা ফুল প্রসাধনের নিয়ম রক্ষা করে মেকি হাসি হাসছে।" ঘরেতে ধূপকাটি জ্বালান হয়। তাঁর বিবেচনায়, "ধূপ আর ওষুধ—এই দুয়ের গন্ধে চাপা কলহ জুড়ে দিয়েছে। আমার মুখ দিয়ে যে রক্ত ওঠে সেই রক্তের গন্ধ যদি মিশে যায় ঘরের হাওয়ায়, তাই কত ছলাকলায় না সাজিয়ে রাখা আছে ঘরখানা!"

তার ভিতরের এই বিক্ষোভ ভিতরে ভিতরে তার মনকেই দুর্বল করেছে। দুর্বল করেছে বলেই নিজের অসুস্থতা নিয়ে তার নিজের মনে নানা প্রতিক্রিয়া। ডাক্তার বলতে পারেনি রোগের কারণ।

বাড়ীর লোকেরা তাই জানে না, কেন। সে নিজেও তো জানে না। জানেনা বলেই কি তার চোখে দেওয়াল, আসবাব ইত্যাদি দৃষ্টিগ্রাহ্য শরীর হয়ে ওঠে? তারা জানতে চায়, কেন উচ্চল রক্ত তোমার মুখ দিয়ে। আসলে এইভাবে সে নিজেই কি নিজের কাছে জানতে চায়?

এই সবের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করে। হাসির কথা ভাবে। সেই নির্জন শান্ত বর্ণাঢ্য ঘরে যেখানে কিশোর রাজকুমার হাত পেতে ফুল চায়, সেই রূপকথার গল্প মনে করে। আরও কত কি! কিন্তু তার ভাষায়, "অন্ধকার যতই গাঢ় হয়ে ওঠে ততই আমি অসহায়, নিরবলম্ব হয়ে পড়ি।" অথবা, "এই দেওয়াল, ওষুধ, বুলকাটি, গন্ধ, ফুল, আসবাব—এই সব কিছু যেন—রবিঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গীতে চাপা গলায় ভীষণ ফিস্ ফিস্ করছে। ওরা জানতে চায়, কেন?"

এতদূর পড়ে শান্ত রায় ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, ভদ্রলোকের মানসিক সজীবতা যেমন আছে, তার উল্টোটাও কিছু কম নেই। এঁর মানসিকতা থেকে চৈতন্য প্রবাহের গভীরে আসা বড় কঠিন।

ওরা আবার সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিল।

॥ তিন ॥

এই ভাবে যেতে যেতে একদিন সন্ধ্যায় সীতেশের মনে হল সবাই একসঙ্গে তার কাছে জানতে চাইছে: কেন? কেন? কেন?

সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঘরটার মধ্যে রীতিমত একটা সভা বসেছে। দেওয়াল, ফুল, আসবাব এইসব দৃষ্টিগ্রাহ্য শরীর নিয়ে সেই সভায় আসীন।

সীতেশ তার বিছানা থেকে নেমে সভাসদদের গা বাঁচিয়ে সাবধানে হেঁটে তার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলো। একবার ভাবলো ফিল খুলে দেয়। কি ভেবে দিল না। একবার ভাবল বোনকে কাছে ডাকে। ডাকল না। কি ভেবে ঘরের আলোটা সে নিভিয়ে দিল। সে ফিরে এসে বিছানায় বসল। দেখল তখনো সেই সভা—সেই দেওয়াল, ফুল, আসবাব ইত্যাদি—তার দিকে অপলক চেয়ে আছে। সীতেশ সেই সভার উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল, বেশ, তবে শোন, আমি কি কি অন্যায় করেছি। যদি বলো অন্যায় নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী—পাপ। তবে তাই মেনে নোব।

এই কথা বলার পর সীতেশের সামান্য শীত বোধ হল। সে সেদিন জানালাটাও প্রায় বন্ধ করে দেয়, সে কথাও সে ডায়েরীতে লিখেছে।

নিখিল হালদার বলল, এরপর কি লেখা আছে আমি জানি। যাত্রাপথের বিবেকের মত ব্যাপার—

শান্ত রায় বলল, আমি তা মনে করি না। এর পরের ব্যাপার বা উল্লেখই তার নিহিত অবচেতন। তার শারীরিক অসুস্থতা, তার মানসিক সজীবতা ইত্যাদি সব কিছুর মূলই এই চারটি কাহিনীর মধ্যে আছে যা সেদিন সভার উদ্দেশে অন্ধকার ঘরে ওরা সীতেশবাবু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনের সেই সভার উদ্দেশে সীতেশ যে চারটি কাহিনী শুনিয়েছিল তা তার ডায়েরী থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এক : বাদামওয়ালা

আমার বয়স তখন এগারোর কাছাকাছি। একদিন শনিবার দুপুরে স্কুলের শেষে আমরা বেশ ক'জন ফিরছি। পাড়ার সামনে বাদামওয়ালার কাছে দু'পয়সার বাদাম কিনতে দাঁড়াল দু'জন। দাঁড়ি-পাল্লায় যখন ওজন হচ্ছে তখন ওরা দুজন দুমুঠো তুলে নিয়ে সাত হাত তফাতে সরে গেল। বাদাম ওয়ালা পাশড়ী ঝাঁকায় নামিয়ে বাদামওয়ালা ছুটে গেল তাদের দিকে। এই সুযোগে আমাদের আর সবাইকার হাত ঝাঁকা থেকে বাদাম লুট করতে লাগল। তাকে তেড়ে আসতে দেখে আমরা পালালাম। আমার কদুই লেগে ঝাঁকা উল্টে সব বাদাম রাস্তায় ছড়িয়ে গেল।

দুই : আপ মোঘলসরাই-এ রাতের যাত্রী

তখন আমি কোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শরীর আর মন বাঁশির মত বাজে। মনে জাগি, আমার ইচ্ছা হওয়া মাত্র আকাশের তারাগুলো ফুল হয়ে ফুলবে। কড়িং-এর ডানা ভেঙে দুরন্ত বালকের যে নিষ্ঠুর আনন্দ, যৌবনমত্ততার খেয়ালি বিশ্বাসঘাতকতায় সে আনন্দের স্বাদ তীব্রতর। আমি তা আস্বাদ করেছি।

ওপরে বাঙ্কের কাঠের পাটায় শায়িত ভদ্রলোকের ঘুম ভেঙেছিল বর্ধমান ষ্টেশনের গোলমালে—যেখানে আমি উঠেছিলাম। একবার চারদিক চেয়ে তিনি নিজের নস্যদান খুললেন। ছাত্রবেশায় মুহ্ নেশা ছিল বলে ও ঘুম তাড়ানোর জন্য আমি একটিপের উদ্দেশ্যে হাত তুললাম। সেই সূত্রে পথের আলাপ। তিনি বললেন, কতদূর যাবেন?

আমি—আসানসোল। আপনি?

তিনি—পারাজ।

একটু থেমে তিনি, পারাজে যদি ঘুমিয়ে থাকি তুলে দেবেন আমায়? তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমোই।

আমি—কোন চিন্তা নেই। ঘুমোন। ডেকে দোব।

গাড়ীতে ভীড়। কোনরকমে বসেছি। নামেই বসা। দাঁড়াচ্ছি বারবার।

গাড়ী ঢালিত ও থানাজংসন পার হয়ে গলসীতে ঢুকেছে ও থামছে। একমুহূর্ত আগেও চিন্তা করিনি। ভীষণ ভাবে নাড়া দিলাম ভদ্রলোককে। বললাম, দাদা, আপনার ষ্টেশন এসে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে লাফ দিয়ে নামলেন ভদ্রলোক। ভদ্রতা করে একবার ছোঁই নমস্কার করলেন। তাঁরই জায়গায় শুয়ে টের পেলাম সেই ভদ্রলোকের গায়ের তাপে তখনো কাঠের পাটা গরম হয়ে আছে। এমনি ভাবে শুয়ে যাবো বলেই এই বিশ্বাসঘাতকতা। জোনাক-জ্বলা মৃদু অন্ধকারে গলসী ষ্টেশনের সেই নিস্তব্ধে আপ মোঘলসরাই দু'মিনিটের পরমায়ু যাপন। সেই দু'মিনিটে কেরোসিনের বাতি জেলে ষ্টেশন মাষ্টারের লোক কেরি করার মত বলেছিল কি গ—অ—ল—স—সী—ই—ই—।

সেই যাত্রীটি কি আবার উঠেছিল? সেই ফুল ষ্টেশনেই কি সে নেমেছিল সেদিন? কোন প্রিয় পরিজনের কাছে যাচ্ছিল সে? সে সব কথা জানার অনেক আগে আমার উদাসীন বিশ্বাসঘাতকতা ও গাড়ীর দুলুনি আমার দু'চোখে ঘুম এঁকে দিল।

তিন : রিক্সাওয়ালা

চাকরী তখন প্রায় চারবছরের পুরোণো হয়েছে। মাসের শেষ। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম দাওয়াতে। নামল বৃষ্টি। শেষ শ্রাবণের আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি। বেশ কমলেও কখনোই একেবারে থামল না। আপিস আমার বেশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপরে বর্ষণের বেগ বাড়ল। পকেটে হাত দিয়ে একটি মুদ্রার ছোঁয়া পেলাম। সিটোল আধখানা টাকা। আমার আহ্লাদ আর সেই মুদ্রার চাপা গলায় কথা হল।

রাত এগারোটার কাছাকাছি বন্ধুর চাকর আনল রিক্সা। তিন আনার পথের জন্য আটআনা কবুল করলাম। ছপ্ ছপ্ শব্দ পথের ওপর। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। রাস্তায় গম্ গম্ করছে অন্ধকার। রিক্সাওয়ালা সপ্ সপ্ করছে। কাঁপছে। আমিও ভিজেছি।

বাড়ীর দুয়ারে নেমে রিক্সাওয়ালার ভেজা কড়াপড়া, জলে চোপসান হাতে, অন্ধকারে, আমি আধুলি দিলাম। পকেটে হাত দেওয়ার আগে আমি জানতাম ওটা অচল। সেই উপার্জন হাতে নিয়ে ঝড়বৃষ্টি রাতে রিক্সাওয়ালার হাত তার ভাগ্যবিধাতা ভগবানকে নমস্কার জানাল। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশে।

চার : থিয়েটারের সেই মেয়ে

অফিসে প্রতিবার নাটক হয়। সেবার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এলেন এই সহরের একজন অভিনেত্রী। টাকা নিয়ে অভিনয় করে তরুণী। অতএব তার অঙ্গে সিল্কন। আঁখিতে অভিমানের অহঙ্কার। বেণীতে চঞ্চলতা। অভিনয় করবে আমার বিপরীতে। মহড়া ঘরে জমাট ভীড়—কুশীলব উদ্যোক্তা আর দর্শক শ্রোতাদের। অদম্যিকুমা, চঞ্চলতা, অকারণ হাসি ঘরের মধ্যে উপস্থিত। কারো কারো হাতের সিগ'রেট জ্বলছে হৃৎপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করে।

মেয়েটি সপ্রতিভ, সহজ। সেই ঘোড় বড়ি খাড়ার রোমান্টিক সম্পর্ক নায়ক-নায়িকার মধ্যে অভিনয়ের সূত্রে ওকে কাছে টানার জন্য কোনও ছলনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি একবারও সেদিকে গেলাম না। আমি দূরত্ব বজায় রেখে ডায়লগ বলে যাচ্ছি।

মেয়েটি মহড়ার মাঝে একজায়গায় আমায় বলল, আমার হাত ধরুন। এইখানটায় ধরতে হবে, এই দেখুন বইএ লেখা। আসুন।

সবাই তাকাল আমার আমন্ত্রিত ও তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত দুটির দিকে।

আমি—আজ থাক। আর একদিন হবে।

এইভাবে পরপর ক'দিন গেল। কোনদিনই অভিনয়ের সূত্রে তাকে কাছে টানলাম না। মনে মনে ধরে নিলাম আমার ভদ্রতাবোধে সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। কতজন, কত অছিলায় ওকে নিয়ে টানাটানি করে। আমি এক ব্যতিক্রম।

এরপর একদিন মহড়াঘরে তাকে পথ করে দেওয়ার জন্য সরে দাঁড়িয়েছি; হঠাৎ ফুঁসে ওঠার মত ঠোঁট চেপে মেয়েটি বলল, ভয় নেই, আপনাকে আমি ছোঁব না।

সারা রাত কথাটা ফিরে ফিরে মনে পড়ল। বুঝলাম আমার ব্যবহারে ভিতরে ভিতরে সে

অত্যন্ত অপরাধিতা বোধ করেছে। আমার অহঙ্কারটাই প্রকট হয়েছে তার সামনে। আর তাই, সে আমায় ঘৃণা করার চেষ্টা করছে। সে আহত হয়েছে।

আমার খুব ইচ্ছে হয়—সেই রক্ত-করা মুখ, সেই রুক্ষ চিবুক, সেই স্ফীত নাসার খরীরিণী একবার এসে আমার খোলা বুকে মাথা রাখুক। আর আমি তার কানে কানে বলি: বিশ্বাস করো, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমি আমার অহঙ্কার দেখতে পাইনি। এত অহঙ্কার আমার, এত!

এই চারটি বৃত্তান্ত বলা হয়ে গেলে সীতেশ থামল। ঘরটায় স্তব্ধতা। দেওয়াল, ছুল, ওষুধ, ধূপকাঠি, আসবাব—সমস্ত সভা, গুম হয়ে কি যেন ভাবতে থাকল। সে সবের উদ্দেশে বলল: যা বললাম, এই। আর কিছু নেই। এইতো অনেক।

তখন ওরা এক বিপুল কলেবরের ডাক্তারীর বই টেনে আনল। সীতেশও নেমে এল তাদের মাঝখানে। সেই বইএ চোখ রাখল। সেখানে রোগের কারণ, চিকিৎসা, আরোগ্যের পথ ইত্যাদি খুঁজতে গিয়ে তারা দেখল সেটা ডাক্তারীর নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের বই। যে পাতাটাই তারা খুলল সেখানেই মস্ত বড় বড় অক্ষরে তারা দেখল লেখা আছে: লুঠ, বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্বাপহরণ, শঠতা, অহঙ্কার, ব্যবহারের ভুল—যুদ্ধ।

পাতার পর পাতা এই লেখা দেখতে দেখতে ও পরস্পরকে দেখাতে দেখাতে ওরা অনেক মৃত সেনাপতির রক্তাক্ত মুখ দেখতে পেয়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

এইদিনই সীতেশবাবু অজ্ঞান হয়ে যান। বাড়ীর লোকেরা দেখতে পায় যে অন্ধকার ঘরে সীতেশ মাটিতে পড়ে আছে। জ্ঞান নেই।

১ চার ১

অজ্ঞান হওয়ার পর সীতেশ কেমন বোধ করে তার দুটি ছোট্ট উল্লেখ তার ডায়েরীর শেষের দিকে আছে। তার যেন মনে হয়েছিল সে যেন পরে স্বর্গীর ঘরে শুয়ে আছে। সে আবছা গলায় জানতে চেয়েছিল, মা, আমি কি স্বর্গের কোলে শুয়ে আছি?

মা বলেছিল, না বাবা, এইতো আমার কোলে। আমার হাত তোমার কপালে।

সীতেশ বলেছিল, মা, তোমার আরও ঠাণ্ডা হাত দাও।

—এই যে বাবা, আইস ব্যাগ ভরা হচ্ছে।

সীতেশ চোখ মেলে চাইল। দেখল, ঘরের দেওয়াল, ছুল, ওষুধ, আসবাব এই সব মানুষ হয়ে তাকে ঘিরে আছে। বাবা, ডাক্তার, বোন, পাশের বাড়ীর কাকীমা সবাই তাকে দেখছে।

আবার চোখ বন্ধ করল সীতেশ। সেই অবস্থায় সে টের পেল মা ছাড়া ঘরের আর সবাই—যারা তাকে ঘিরে ছিল—সবাই আবার দেওয়াল, ছুল, গন্ধ, আসবাব ইত্যাদি নিরপেক্ষ বস্তুতে পূর্ববৎ পরিণত হয়ে নিজেদের মধ্যে দ্রুত ব্যস্ততায়, চাপা গলায় জরুরী পরামর্শ সভা ডাকছে।

। পাঁচ ।

শান্ত রায় দুম করে বলে বসল, নিরপেক্ষতার নীতিকে নিন্দা করাই কি এর উদ্দেশ্য ?

নিখিল হালদার বলল, নিন্দা কোথায় দেখলে ?

—নিন্দা নয় ? নিরপেক্ষ যে সে কেবল শুনতে পারে। ছুটোছুটি করতে পারে বড় জোর। মরতেও পারে না, মারতেও না। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাবারতেও পারে না।

নিখিল বলল—তুমি খোলা মনে চিন্তা করছো না।

শান্তও এক অভিযোগ করল—তুমিও খোলা মনে চিন্তা করছো না।

তারপর দুজনে তর্ক সুরু হল। তুমুল তর্ক। সে তর্কে ভেসে গেল নীতেশের ডায়েরী আর নীতেশ। ওরা কি বলতে চায়, বুঝতে ও বোঝাতে চায় তাই ওরা ভুলে গেল। প্রতীক বিলাসী দুই তরুণ অজস্র প্রতীকের, রূপ কল্পের কথা বলল। তারপর দুজনেই ঠিক বোঝার দাবী করে পরস্পরের দিকে তুঁসতে লাগল। একজন দাবী করল, আমি যা বুঝেছি, তাই ঠিক। আর একজন তার ওপর গলা তুলে বলল, তুমি নয়, আমি ঠিক বুঝেছি। ওদের একজন টেবিলে মুষ্টাঘাত করল। অন্যজনও করল।

[আমার এই দেখে দুঃখ হল যে ওরা এত বোঝে, বোঝার চেষ্টা করে, নিজস্ব রীতিতে প্রতীক গড়ে, সাজায়, অথচ সেই প্রতীক ওরা চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও দেখেও দেখছে না। দেখতে পাচ্ছে না। আমার বারবারই মনে হতে লাগল যে ওই ডায়েরী ও তার লেখক এই দুইএ মিলে যেন এক ভূখণ্ডের প্রতিভূ। সেই ভূখণ্ডের নাম—নাই বা করলাম সে নাম। আর নিখিল হালদার ও শান্ত রায়। যেন দুই সোলার্ড। দুটি সোলার্ড এই ভূখণ্ডের কাছে এসে ভিতরের সব কিছু ঠিক মত না বুঝে অথচ সব বোঝার দাবীতে গোঁয়ারের মত পরস্পরকে তুঁসছে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম সেই ডায়েরী আর লেটিকে ঘিরে তারা দুজনে—এই তিনের মাঝে পৃথিবীর সব ভয়ঙ্কর ও সুন্দর সম্ভাবনা সংহত হয়ে আছে।]

উৎসবের আনন্দে কর্তব্য যেন ভুলে না যাই

আভা পাকড়াশী

বিজয়া দশমী শেষ হল। মিলন সম্ভাষণ মিষ্টিমুখও অনেক হল। এরমধ্যেই আবার আমাদের আর এক উৎসব কালী পুজো। মার এবার সংহার মূর্তি। পশ্চিমে বলে দেওয়ালী বা দীপাবলী। এইদিনে ওরা আলো দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে মা লক্ষ্মীর আবাহন করে। সবাই নতুন কাপড়-জামা পরে; দেওয়ালী শেষে ঠিক আমাদের বিজয়ার মত প্রণাম, কোলাকুলি—শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়। আর আছে "ভাই-দুজ" আমাদের মতই "ভাই-ফোঁটা"।

আমরা আলো জ্বেলে অমঙ্গলকে দূর করি—অমাবস্যার ঘোর কালো শত্রু সংহারে—তারপর বাজি পুড়িয়ে আমরা জয়োৎসব করি। আজকে দেশের যা অবস্থা, এই সংকটের দিনে আমাদের মেয়েদেরও যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। কখনো আমাদের ঐ সংহারিণী মূর্তি ধরতে হবে শত্রু বিনাশের জন্য, কখনো বা আমাদেরই স্বামীপুত্রকে অভয় দিতে হবে, দিতে হবে শক্তি সাহস। আবার মা লক্ষ্মীর অংশ হয়ে নিপুণ হাতে সংসারের হালও ধরতে হবে। দেশের এই সংকটে কিছুই অপচয় করা চলবে না। আবার আমাদের চিরাচরিত প্রথা এই উৎসব অনুষ্ঠানও পালন করে যেতে হবে। তবে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে। আগে ভাবতে হবে, দূরে সেই পাহাড়ের ওপর ঠাণ্ডা বরফের মধ্যে বসে যে সব জওয়ান ভাইরা আমাদেরই রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তাদের জন্যে। দুর্গাপুজো, দেওয়ালী, ভাইফোঁটা সবই তাদের অন্ধকার মনে শুধু একটি উৎসবের প্রদীপের রেশ জাগছে মাত্র। অতীতের আনন্দের ফুলঝুরির ছটা ভাসছে তাদের চোখে। এইসব জওয়ান ভাইদের আরও খাবার চাই, পোষাক চাই। তাই আমাদের কম খেতে হবে, পোষাক বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে হবে।

তারই কয়েকটি সহজ উপায় বলছি। দশ্রীতে দুটি তিনটি ভাল শাড়ী কাচাতে যা খরচ তাতে অনায়াসে আপনি আরও একটি দুটি ব্লাউজ বা ফ্রকের সংখ্যা বাড়াতে পারেন। কাজেই দশ্রীতে না পাঠিয়ে নিজেই বাড়ীতে কাচবার ব্যবস্থা করলে আনন্দও পাবেন, খরচ কমবে।

আগেই বলেছি ঘাম না শুকিয়ে জামা কাপড় গুছিয়ে তুলে রেখেন না। তোলবার আগে ভাল সিদ্ধের জামা থেকে ব্রাস করে পাউডারগুলি তুলে দিন। বেশ কিছুক্ষণ হাওয়া লাগিয়ে তারপর জামা কাপড় তুলবেন। ছাতার ব্যবহার করা অভ্যাস করুন। এতে শাড়ী জামার ইস্ত্রিও নষ্ট হবে না, আবার হাওয়াও লাগবে।

আপনার গয়না বা ব্যাগের ভেতর শাড়ীর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটি আগে দেখে নিন। হয়ে থাকলে মেরামত করুন। এবার শুধু জলে ডুবিয়ে দেখুন রং ছাড়ে কিনা। পরে সাবানের ফেনার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে ময়লাটুকু বার করে দিয়ে অনেকখানি পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন। সিল্কের শাড়ী হলে সিঠের জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলে খুব পরিষ্কার হয়। তারপর সামান্য একটু ময়দা বা অ্যারারুটের মাড় দিয়ে শুকিয়ে নিন। অল্প ভিজে থাকতে থাকতে তুলে নিয়ে দু'জনে ধরে বেশ সুন্দর করে ভাঁজ করুন। কিন্তু উল্টো দিকে ভাঁজ করবেন আর ইস্ত্রিও করবেন উল্টো দিকে। একটু জরীটরী থাকলে একটি পাতলা ভিজে কাপড় শাড়ীর ওপর পেতে নিয়ে তারপর ইস্ত্রি করুন। কাশ্মীর বা মুর্শিদাবাদী সিল্ক বা 'ওয়াস্ অ্যাণ্ড ওয়ার' এইভাবে অনায়াসে কেচে নিতে পারেন। 'ওয়াস্ অ্যাণ্ড ওয়ার' ব্যবহার করলেই কুঁচকে যায় সুতরাং একটু মাড় দিয়ে অল্প গরম ইস্ত্রির টান দিন, দেখুন আবার সেই নতুনটি হয়ে যাবে। টেরিকট বা ঐ ধরণের শাড়ী শুধু সাবান জলে দিয়ে আলতো আলতো করে কেচে নিন।

এবার আসুন দাগের কথা বলি।

কেউ কাপড়ে চা বা কফি ফেলেছেন। কিন্তু আগে দেখতে হবে কাপড়টি কি কাপড়, তার ওপর গরম সইবে কিনা। নাহলে কাপড়ের উল্টো দিক দিয়ে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে ধুয়ে ফেলে দেখতে পারেন। অনেক সময় এতেই দাগ চলে যায়। না হলে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড জায়গাটিতে ঘষে দিন। প্রথমেই কিন্তু কক্ষনো সাবান দেবেন না।

কেউ হয়তো ভাল কাপড়ে সিঁদুর ফেলেছেন অঞ্জলি দিতে গিয়ে, কিম্বা লিপষ্টিকের দাগ লেগে গেছে। গ্লিসারিণ গরম করে ঐ জায়গাগুলি ভিজিয়ে দিন। আধঘণ্টা ভেজাবার পর এবার গরম সাবানের ফেনার মধ্যে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নিন। রঙীন কাপড়ের জন্য এটিই সবচেয়ে নিরাপদ। আরও হয়তো বেশী কিছু তেল-চেলে জিনিষ লেগেছে বা মাংসের ঝোল বা তরকারির দাগ। আগে গ্লিসারিণে ভিজিয়ে রেখে দেখুন তাতেও যদি দাগ না ওঠে তবে Carbon tetrachloride আনিয়ে ঐ দাগধরা জায়গাগুলিতে তুলো দিয়ে লাগিয়ে দিন, তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। কাপড় যদি রঙিন হয় তাহলে কিন্তু গরম জলে ধোবেন।

বেশী গরম ইস্ত্রি কক্ষণো ব্যবহার করবেন না। কাপড় একেবারে শুকনো থাকলে অল্প জলের ছিটে দিয়ে তারপর ইস্ত্রি করবেন। ইস্ত্রি ভাল হবে। কিন্তু অল্প ভিজে কাপড়ও কক্ষণো আলমারিতে তুলবেন না। ন্যাপথলিন, মথবিণ বিং বা ছোট পোটলা করে কালোজিরে কাপড়ের আশে পাশে রাখলে পোকা হবে না। কিন্তু কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে যেন কক্ষনো দেবেন না। ন্যাপথলিনের আবার দাগ ধরে। দিতে হলে ন্যাকড়ার টুকরায় বেঁধে দেবেন।

এইভাবে বাড়ীতে কাপড় কেচে আর রেখে পরে দেখুন। যতদিন পরবেন একেবারে নতুনের মত থাকবে আর টিকবেও বেশীদিন।

সামনেই যে উৎসবটি সেই সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি—কালী পুজোতে শ্যামা মায়ের আবাহন এবার থাক আমাদের অন্তরে অন্তরে। প্রাণ দিয়ে মাকে ডাকুন। এবার দেশের এই অবস্থায় আমরা না হয় প্রদীপ দিয়েই বাড়ীর সামনেটুকু শুধু সাজালাম। ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে অবশ্যই বাজি কিনে দিলাম। দেখবেন অনের যেন কক্ষণো বাজি একা একা পোড়াতে দেবেন না। আর নাইলন বা টেরিকট পরে বাজি পোড়াতে কিছুতেই দেবেন না।

এরপর আসছে ভাইফোঁটা। সেদিন নিজের হাতের তৈরী খাবারে ভাইয়ের বেকাবিটি ভরে দিন। ওদেশের আর এদেশের একটি দুটি খাবারের নমুনা দিচ্ছি।

বেসনের কচুরি—আটা ঝিরঝিরে করে চেলে নিন বা সাদা ময়দা দুন মিশিয়ে নিন। বেসন ঘন করে গুলে নিন। তাতে নুন, চিনি দিন। কড়াই তেল দিয়ে ভিজে কোচন দিয়ে বেসন ভাজুন। মাঝিয়ে কচুরির গুঁড়ো মশলা দিন। গরমমশলা, জিরে, লঙ্কা একসঙ্গে ভেজে গুঁড়িয়ে নেবেন এই আর কি। এবার বেসনটি মেখে নিন। মশলা দিয়ে পুর তৈরী হল। ময়দার ভরে মেলে নিয়ে ভাজুন। আলুর দমের সঙ্গে দিন।

মুগের নাড়ু—ছোট কাঁচা মুগের ডাল। রাত্রে ডাল ভিজিয়ে রাখুন। সকালে বেটে নিন। বাটা ডাল দিয়ে ভাজুন। বেশ ভাজা গন্ধ বেরুলে আন্দাজ মত ঘন চিনির রস ঢেলে দিয়ে আধার ঘি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ছোট এলাচ গুঁড়ো আর অল্প কেওড়ার জল দিন। পাক হয়ে গেলে একটু গরম থাকতে নাড়ু পাকিয়ে নিন।

আসনের পাশে প্রদীপ জেলে ধান দুর্বা চন্দনের বাটি সাজিয়ে খাবারের বেকাবিটি ভাইকে ধরে দিন। আমাদের রক্ষার জন্ত সে যখন আসবে এগিয়ে যাবে; এই শুভকামনা বা আশীর্বাদই হবে তার রক্ষাকবচ। এই শুভদিনটিই তার দুদিনে চিন্তায় ও আনন্দের খোরাক জোগাবে।

সে-ই সুন্দরী যার পা সুন্দর

সুরঞ্জনা সেন

সুন্দর পা মর্মর-স্তম্ভের মতো। তাই, শুধু আমাদের কবি জয়দেব নয়, পশ্চিমের কবি-শিল্পীরাও নারীর চরণ-সৌন্দর্যের প্রশস্তিতে মুখর। আপনার পা আপনার রূপের অন্যতম পীঠস্থান। উপযুক্ত যত্নের অভাবে পা শুধু কুশ্রী নয়, স্বাস্থ্যহানির কারণও হ'য়ে উঠতে পারে। পদ-যুগলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বাড়ে এমন কিছু উপায় জেনে রাখা প্রত্যেক মেয়ের পক্ষেই দরকার।

মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কোন মেয়ের পায়ে আঘাত কিংবা ব্যথা আছে। পায়ে যন্ত্রণা থাকলে মুখের চেহারাও হয়ে বিকৃত। পা দু'টি ক্লান্ত বা অবসন্ন থাকলে সমস্ত শরীরই ক্লান্ত দেখায়। অসুন্দর পা যেমন সৌন্দর্যের ক্ষতি করে এমন আর কিছুই নয়। দেহের সৌন্দর্য অনেকখানি ফুটে ওঠে হাঁটা, চলার ভঙ্গিতে। কিন্তু পায়েই যদি গলদ থাকে তাহলে দেহের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হতে বাধ্য। এমনকি সুন্দর-সুন্দর জামা-কাপড়গুলোও যেন তখন বেমানান লাগে।

জুতোর গোড়ালী যদি অতিরিক্ত উঁচু হয়, মানে আড়াই ইঞ্চির বেশি, তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। জুতোর গোড়ালী অতিরিক্ত উঁচু হলে হাঁটবার সময় শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে শরীরের ভেতরকার কল-কব্জা নড়ে-চ'ড়ে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়তে পারে। তার ফলে দেখা দেবে পিঠে যন্ত্রণা, বিশ্রী রকমের ব্যথা-ব্যথা, বিটবিটে মেজাজ। শুধু তাই নয় অতিরিক্ত উঁচু গোড়ালীর জুতো পরলে কোমরে অস্বাভাবিক বেঁকে বৃদ্ধি ঘটে।

পা শুধু অতি প্রয়োজনীয় দু'টি অঙ্গ নয়। ঠিক মতো যত্ন নিলে অতি সুন্দর দু'টি অঙ্গ। সমুদ্র-সৈকতে সোনালি বালুর উপরে দুধে-আলতা রঙের দুটি পা কেমন লাগে কল্পনা ক'রে দেখুন তো। আজকাল সাধারণতঃ কোনো অলঙ্কার পরা হয় না, প্রসাধন ব্যবহার করা হয় না ব'লেই চরণ যুগল এত সুন্দর দেখায়।

পায়ের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার: পায়ে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত চলাচল করে এমন ব্যায়াম, ত্বকের মসৃণতা রক্ষা, নখের যত্ন। পায়ে ব্যথা লাগে এমন জুতো কখনোই ব্যবহার করবেন না।

বাইরে বেরুতে গেলেই আমরা আজকাল জুতো পরি। পরা দরকার। কিন্তু বাড়িতে ফিরেই একটুও দেরি না ক'রে পা থেকে জুতো খুলে ফেলবেন। পা দুটো রগড়ে নেবেন, তাহলে রক্ত চলাচলের কাজ ভালো হবে। বাড়িতে স্লিপার পরবেন। সব চাইতে ভালো বাড়ির ভেতরে খালি পায়ে চলাফেরা করা। দিন-রাত্রির বেশির ভাগ সময় জুতো থেকে পায়ের মুক্তিই পায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিদিন খালি পায়ে নরম ঘাসের উপর বেশ কিছু সময় চলা-ফেরা করা শুধু গা নয় চোখের পক্ষেও খুব ভাল। শিশুদের খালি পায়ে ছুটোছুটি করতে দেওয়া উচিত। অনেক মা-বাবাই নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য এই প্রয়োজনটি অবহেলা করেন।

শুধু স্বাস্থ্যের কারণে নয়, সৌন্দর্যের খাতিরেও পায়ের নখ মাঝে মাঝে কাটা দরকার। নখের তলায় যে ময়লা জ'মে থাকে তা পরিষ্কার করবেন।

পরবার আগে জুতো এবং মোজার ভেতরে জীবাণু প্রতিরোধক পাউডার দিয়ে নেবেন। বেশি ভারি চামড়ার জুতো ব্যবহার করবেন না।

নিয়মিত হাঁটা-চলা এবং সাঁতার পায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী। যাদের সে সুযোগ নেই তারা পায়ের স্বাস্থ্য ভালো করে, এমন কয়েকটি ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করলেও উপকার পাবেন।

আপনি সৈনিক

গৌরীশংকর সে

অশোক স্বপ্ন দেখছিল ওদের সৈন্যবাহিনী একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছে। কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে দিগন্ত পর্যন্ত মাঠ।

হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দু'দিকের মাঠে উঠে দাঁড়ালো হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য। যেন মাঠের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অপরূপ দেবার রূপান্তরিত হয়েছে। তারা এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। প্রতিটি সৈন্য তাকিয়ে আছে বিষণ্ণ বোবা চোখে। অশোকের বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যেন ঠাণ্ডা ক'রে দিলো শীতের বাতাসের মতো সেই বিষণ্ণতা। তারপর যেমন তারা হঠাৎ উঠে এসেছিল, তেমনিই মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো একে একে। মিশে যাওয়ার ঠিক আগেও তাদের করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো অশোকের মুখে।

ঘুম ভেঙে গেলো। ও বিছানায় উঠে বসলো। জানালার বাকিটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঝলমল্ করছে শুকতারা। অন্ধকারের যবনিকা কম্পমান। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে আসছে সেই কান্না। প্রতি রাতেই যেমন শোনা যায়। কান্না নয়, বিলাপ।

প্রথম রাতে অশোকের মনে হয়েছিল বেহালার সুর। কোনো দুঃখী শিল্পী বুঝি ছড়ের টানে টানে বেদনার সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে সুপ্তিমগ্ন অন্ধকার চরাচরে। একটুক্ষণ কান পেতে রাখার পরই অশোক বুঝতে পেরেছিল বেহালার কান্না নয়, নারীকণ্ঠের বিলাপ। খুব কাছেই যেন কে এক যুবতী ঢুকরে ঢুকরে কাঁদছে। তার কান্নায় আকাশ আর পৃথিবীও গভীর শোকে স্তব্ধ।

এ বাড়িতে আসার পর অশোক প্রতিরাতে শুনেছে ওই বুকফাটা কান্না। প্রতিদিনই শেষরাতে ওর ঘুম ভেঙে গেছে।

অন্যরাতের তুলনায় আজকের বিলাপে শোকের বেগ যেন আরো বেশি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কান্নাটা বারবার প্রতিহত হচ্ছে শেষরাতের স্তব্ধতায়। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো অশোক।

অন্যান্য দিন কান্নাটা শুনবার পরেও ও বিছানাতেই শুয়ে থেকেছে। কিন্তু আজ পারলো না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

কান্নাটা আসছে উপরতলা থেকে। মালা কিংবা সুভদ্রার ঘর থেকে। হ্যাঁ, আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এই কান্না?

কয়েকটা দিনের ঘটনা একসার ছবির মতো ভেসে গেলো অশোকের চোখের উপর দিয়ে:

ক্যান্টেন কেরার পথে দেখা হয়েছিল অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে। সে জিগেস করেছিল: "কী ব্যোস। মুখ অমন বেজার ক'রে আছো কেন?"

অশোক অসন্তুষ্ট গলায় বলেছিল: "আর বলো কেন। উল্টা সমঝিলি রাম। ছুটি চেয়েছিলুম এক মাসের, পেলুম সাতদিনের। ভেবেছিলুম বাড়ি যাবো। তা কলকাতায় যেতে আসতেই তো সাতদিন কেটে যাবে।"

অর্জুন সিং বললো: "ও, এই ব্যাপার! তা তুমি একটা কাজ করো না। আমাদের বাড়ি অমৃতসরে এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। ছুটিটা সেখানেই কাটিয়ে এসো।"

অশোক বললো: "কী ক'রে হয়। আমি না হয় তোমার বন্ধুই হলুম। কিন্তু তোমার বাড়ির লোকেরা তো আমায় চেনে না।"

অর্জুন সিং বলেছিল: "আরে বাড়িতে থাকার মধ্যে তো আমার স্ত্রী মালা আর বোন সুভদ্রা। ওরা তোমার নাম আমার মুখে দিনের মধ্যে লক্ষবার শুনেছে। অপরিচিত থাকলেটা কোথায়! আমি তো আর যেতে পারছি না। তুমি গেলে বরং আমার খোঁজ-খবরও দিয়ে আসতে পারবে।"

অমৃতসরে অর্জুন সিংদের বাড়ি খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না।

বাড়িটা একতলা হলেও ভারি সুন্দর। সামনে একফালি বাগান। কয়েকটা গোলাপ ফুটে আছে।

বাড়ির সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে কড়া নেড়েছিল অশোক। ভেতর থেকে দরজা খুলে ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল এক সুন্দরী মহিলা। অশোক নমস্কার ক'রে নিজের নাম বলেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাটি প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলেছিল: "আসুন, আসুন। খুব খুশী হয়েছি আপনি আসাতে। আমি মালা। বসুন, একটু চা ক'রে আনি।"

যাবার সময় রেডিওটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল মালা। মুহূর্তের মধ্যে সুরেলা হ'য়ে উঠেছিল ঘরখানা।

নরম সোফায় গা এলিয়ে ওর মনে হয়েছিল যেন নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। কোথায় কাজের উষর প্রান্তর, আর কোথায় অমৃতসরের এই শান্তিনিকেতন।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুলেছিল অশোক। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকছে। হাতে খান-দুই বই, আর একখানা খাতা। মালার চাইতেও সুন্দরী। ভুরু দুটি ঘনসন্নিবদ্ধ কালো। একমাথা কালো চুল। ছিপছিপে চেহারা। নিশ্চয়ই সুভদ্রা।

ঘরের ভেতর একজন অপরিচিত যুবককে দেখে প্রথমটায় থমকে গিয়েছিল মেয়েটি। একটু সম্বিত ফিরতেই, অশোক কিছু বলবার আগেই, ও ভেতরের ঘরে চ'লে গিয়েছিল।

ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে এসেছিল মালা। টেবিলের উপরে রাখতে রাখতে বলেছিল: "সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলো।"

"না। ও বোধহয় আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে। আমাকে তো চেনে না।"

মালা ডাকলো: "সুভদ্রা। এ ঘরে এসো। তোমার দাদার বন্ধু অশোকবাবু। যার গল্প আমরা এত শুনেছি।"

আবার এ ঘরে এসেছিল সুভদ্রা। ওর পরনে এখন গোলাপী রঙের শালোয়ার-পাঞ্জাবী। বুকের উপরে আড়াআড়ি ক'রে পরা একটা গোলাপী ওড়না; যেখানে রাজকন্যার মতো।

সুভদ্রার চোখে পরিচয়ের আলো। নমস্কার ক'রে নিঃসঙ্কোচে এসে বসেছিল অশোকের পাশে। প্রথমে একটু জড়তা ছিলো, গল্প করতে করতে তা-ও কেটে গেলো। বন্ধুর গল্প শুনতে

চায় সুভদ্রা। শিশুর মতো ওর আগ্রহ। এ-রকম শ্রোতা পেয়ে অশোকও ব'লে গেছে সৈনিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, বিচিত্র ঘটনার কথা। সুভদ্রা বলেছে ওর কলেজের গল্প, সহপাঠিনী আর অধ্যাপিকাদের নানা প্রসঙ্গ।

সুভদ্রা এবং মালার নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার ভালো লেগেছিল অশোকের। মনে হয়েছিল নিজের বাড়িতে না যেতে পেরে কোনোই ক্ষতি হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা খুব সুন্দর জোছনা উঠেছিল। অশোক আর মালা গিয়ে বসেছিল বারান্দায়। হাসনুহেনার তীব্র গন্ধে মদির হ'য়ে উঠেছিল বাতাস। অশোক মালার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল: "এমন ভাবে যে আমার সঙ্গে মিশছেন, যদি আমি এর সুযোগ নিই।"

মালা হেসে উঠে বলেছিল: "না মশাই, তা আপনি পারবেন না। দেখেই বুঝেছি আপনি হলেন একজন খাঁটি ভোদা। বাড়িতে, কি লড়াইয়ের ময়দানে বিশ্বাসঘাতকতা আপনার অসাধ্য। বাজে বড়াই করবেন না।" তারপর পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলেছিল: "তার চেয়ে একটা কাজ করুন। আমার মনদের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করুন। সুভদ্রা খু-উ-ব ভালো মেয়ে।"

পরদিন ভোরে অশোক গিয়েছিল স্বর্ণ মন্দির দেখতে। ফিরে আসার পরই ওর মনে হয়েছিল বাড়ির আবহাওয়ার কী যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনটা যে কী এবং কেন, অশোক চেষ্টা ক'রেও তখন তা বুঝতে পারেনি।

তবে প্রথম দিন এ বাড়ির পরিবেশে যে একটা আনন্দ, উজ্জ্বলতা, এবং উৎসবের ভাব লক্ষ্য ক'রে অশোক উদ্দীপ্ত বোধ করেছিল সেই ভাবটা যেন পরদিন দুপুর থেকেই বিদায় নিয়েছিল। তার মানে এই নয় যে অতিথির প্রতি ওরা কোনো রকম তাচ্ছিল্য বা উদাসীনতা দেখিয়েছে। এত সেবা যত্ন অশোক জীবনেও পায়নি। প্রবাসের কয়েকটি দিন মধুর হ'য়ে উঠেছিল দুটি নারীর আন্তরিক আতিথেয়তায়। তবু যেন কিসে কী হ'য়ে গেলো।

একদিন বিকেলে অশোক দেখলো মালার চোখ দুটো কেমন লাল। মুখ ফোলা-ফোলা। অশোক ভেবেছিল দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমোবার জন্যেই বোধহয় মালাকে ও রকম দেখাচ্ছে। কিন্তু গল্প করতে করতে হঠাৎ সুভদ্রাই বা কেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে! মালকের তখন গাইতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে।

সহজভাবে হয়তো ওরা আলাপ করছে, একটা অদৃশ্য বৃত্ত যেন হঠাৎ কঠিন হ'য়ে অশোককে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে ওদের কাছ থেকে। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় ভ'রে গেছে ঘর। নিজেকে ভীষণ অসহায় লেগেছে অশোকের। কী এক রহস্যময় বেদনা যেন নীরবে সাপনে কাজ ক'রেছে মালা আর সুভদ্রার বুকে। ওরা দুজন শুধু তা জানে। আর কাউকে ওরা তা জানাতে চায় না। এই বিষয়ে ওরা নিজের থেকে কিছু না বললে জিগেস করা অশোভন হবে। তাই চেষ্টা ক'রেও অশোক শেষ পর্যন্ত আর জিগেস করতে পারে নি। সমস্ত ব্যাপারটা অশোকের মনগড়াও তো হতে পারে।

সবচেয়ে রহস্যময় মনে হয়েছে রাত্রির এই আর্ত কান্না। সারা পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন অবসর পেয়ে যেন ফুকরে ফুকরে কেঁদে উঠেছে আদিম অন্ধকার।

বিশেষ ক'রে, আজকের কান্নাটা একেবারে বুকের ভেতরে এসে নাড়া দিয়েছে। করুণ সেই বিলাপ থেমেছে, কিন্তু তার রেশ এখনো আচ্ছন্ন ক'রে আছে মন।

চারিদিক ফর্সা হ'য়ে উঠেছে। ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে বাগানে। গোলাপের পাপড়িগুলি আরো রক্তিম দেখাচ্ছে।

নিজের ঘরে এসে টুকি-টাকি জিনিসপত্র সুটকেসে গোছগাছ ক'রে নিলো অশোক। আরেকটু পরেই ও বেরিয়ে পড়বে। কর্তৃপক্ষের আদেশ এসেছে ওকে কাশ্মীরে যেতে হবে।

উপরতলার দরজা জানালা খোলার শব্দ কানে এলো।

একটু পরে চা নিয়ে এলো মালা। অশোক তাকিয়ে দেখলো তার চোখ লাল, মুখ কোলা-কোলা। চুলে একটা রুক্ষতা। রাত্রি জাগলে যে রকম হয়। কী সেই গোপন বেদনা, যা মালা এবং সুভদ্রাকে এমনভাবে বদ্ধ করছে? অশোক জিগেস করবে না কি? কিন্তু, থাক। এ-কদিনই যখন জিগেস করেনি তখন যাবার বেলায় আর কেন। হয়তো ওরা বলবে না। হয়তো বলবে, আর ভারি হ'য়ে উঠবে অশোকেরও মন। জীবনের কত রহস্যই তো অব্যক্ত থেকে গেছে, এরাও তাই হোক।

"ক'দিন আপনাদের বড়ো কষ্ট দিয়েছি?" এরকম কিছু হ'লে যাবে, ভেবেছিল অশোক। কিন্তু বিদায় মুহূর্তে কিছুই বলা হলো না।

সুভদ্রা আর মালা এগিয়ে দিতে এলো বাড়ির ফটক পর্যন্ত। ওদের চোখে জল। ভিজে উঠেছে অশোকেরও চোখ। মালা হঠাৎ আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে চ'লে গেলো ঘরে। অশোক একটু অবাক হলো। ক'য়েকদিনের ভেতরেই মালা প'ড়ে গেছে সত্যি। কিন্তু তাই ব'লে মালা অমন ক'রে চ'লে গেলো কেন? ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হলো না কি!

বাড়ির ফটকে তখনো স্তব্ধমূর্তি সুভদ্রা। অশোকের অবাক ভাব লক্ষ্য ক'রে ও অপ্রস্তুত গলায় বললো: "অশোকবাবু, আপনি সৈনিক। আপনাদের জীবনে ছুটি জিনিসটা বড়ো দুর্লভ। তাই, যদি অবসর নিতে আসছেই তা অতিবাহিত হওয়া উচিত। নইলে নতুন প্রেরণা নিয়ে লড়াই করবেন কী করে? সেই জন্যই বৌদি আপনাকে খুণাক্ষরেও জানতে দেননি। আমাকেও বলতে বারণ করেছিলেন।" সুভদ্রার গলা কান্নায় বুজে এলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো: "জানতে তো পারবেনই।.....আপনি যেদিন এলেন, তারপর দিন বেলা দশটা নাগাদ একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দাদা মারা গেছেন।"

• • • •

রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই বাংলার কংগ্রেসে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের "বন্দেমাতরম" গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার স্বরলিপি তৈরী করে জাতীয় মহাসভায় গান করেন। ক্রমে সেই "বন্দেমাতরম" ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল-মন্ত্ররূপে দেশপ্রেমিকদের ও সংগ্রামীদের প্রাণে এক অভাবনীয় উন্মাদনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, এবং অসুরক্ষ শক্তির প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই বন্দেমাতরম গান সেদিন বিদেশী শাসকদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। অনেক শহীদ, বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণত্যাগ করার শেষ মুহূর্তে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে অমর হয়েছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ ১৩ ॥

সিঁড়ির একটা ধাপে পা ফুলেছিল রবি। পা তার তোলাই রইলো। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার বৌদিকে। অনেকদিন পরে দেখলে তার সেই বাল্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীকে। দেখে আর চেনা যায় না। অনেকখানি বড় হয়ে গেছে সে। অনেক সুন্দর হয়েছে।

রবি ডাকলে, 'বৌদি'!

ডাকতে গিয়ে গলাটা তার ধরে এলো। দু'চোখ ভরে এলো জলে। ঠোঁটদুটো তার কাঁপছিল, তবু আর একবার ডাকলে, 'বৌ—'

ডাকটা শেষ হ'লো না।

লক্ষ্মী বললে, 'থাক্ আর বৌদি বলে ডাকতে হবে না। তোমার লজ্জা হলো না আমার এখানে আসতে? আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ কোন্ মুখে?

সত্যিই। তার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। তার বাবার দেওয়া এত এত টাকা সে নষ্ট করে ফেলেছে। আজ সে তার বৌদির কাছে অপরাধী। সত্যিই অপরাধী।

লক্ষ্মী বললে, 'বাবার বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি সব নষ্ট করে ফেলেছো তো? বল—সত্যি কিনা!'

রবি আবার বললে, 'বৌদি'—

লক্ষ্মী বললে, 'কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি আগে বল—আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা।'

রবি বললে, 'হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু—'

'যা আর কিন্তু নয়।' লক্ষ্মী বললে, 'ছিঃ! তোমাকে খুব ভাল বলে জানতাম আমি। কিন্তু তুমি যে এমন হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ভাল যদি কোনদিন হতে পার তো এসো আমার কাছে। আজ তুমি যাও—আমার চোখের সুমুখ থেকে চলে যাও। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়। কি বলতে কি বলে ফেলবো। তার চেয়ে—যাও।'

রবি আর কোনও কথা বললে না। মাথা হেঁট করে চলে গেল সেখান থেকে।

ওপর তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

—'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। এতদিন পরে দুজনের দেখা। এ কী হলো? এ কী হলো?'

বলতে বলতে বাইরের ঘরে এসে দেখলে—রবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে।

বললে, 'দেখলে তো! আচ্ছা আজ তুমি যাও। কাল বিকেলে আমি যাব তোমার কাছে। লক্ষ্মীর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক্, তারপর সে কি বলে শুনবো। তারপর তোমাকে গিয়ে বলে আসবো সব।'

রবি বললে, 'সেই ভাল।'

বলে আর সে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলে না। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওদিকে লক্ষ্মী তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। ছুটে তার নিজের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

রবি ভাবতে পারেনি যে শুশুর তার বাড়ীতে আসবে। কিন্তু সত্যিই এলো।

রবি তাকে সমাদর করলে, বসতে বললে। তারপর একটি আলমারি খুলে একতাড়া কাগজ বের করে আনলে। বললে, 'আচ্ছা শুশুর, মধুপুর তুমি কতদিন যাওনি?

শুশুর বললে, 'এতদিন পরে মধুপুরের কথা কেন?'

'সেই বাড়ীটার কথা তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

আর বাড়ীর পেছনের সেই নালাটা? বর্ষার সময় যেটা জলে ভরে থাকতো?'

পৃথিবীতে এত বস্তু থাকতে সামান্য একটা নালার কথা তার কাছে অগ্রাধিকার পেলো কেন শুশুর তা বুঝতে পারলে না। অথচ বর্ষায় সেই নালাটা যেমন কানায় কানায় ভরে থাকতো রবির চোখ দুটোও তেমনি কানায় কানায় ভরে উঠলো। লজ্জা হলো রবির। তাই সে গোপনে তার চোখ দুটো মুছে আবার এসে দাঁড়ালো শুশুরের কাছে।

শুশুর বললে, 'সে নালা কি আর আছে? সেখানে বড় বড় বাড়ী উঠেছে। সে-সব জায়গা দেখলে আর চিনতে পারবে না।'

এমনি পরিবর্ত্তন হয় সব-কিছুর। এ পৃথিবীতে কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে না চিরদিন। নালাটা নেই শুনে রবি কেমন যেন হতাশ হয়ে গেল। চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

শুশুর জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার হাতে ও কাগজগুলো কিসের?'

রবি তার হাতের ফাইলটা বাড়িয়ে ধরে বললে, 'পড়ে ছাখো।'

শুশুর পড়তে লাগলো আর রবি বলে যেতে লাগলো।

'আমি কি ঠিক করেছি জানো? বাবার দেওয়া পঁচিশ হাজার টাকা আমি দিতে পারিনি বৌদিকে। তার বদলে বাড়িঘর দোর—যেখানে যা কিছু আছে সবই আমি লিখে দিচ্ছি বৌদির নামে।'

শুশুর অবাক হয়ে তাকালে রবির মুখের দিকে। কথাটা অবিশ্বাস্য। মানুষে তাই কখনও পারে নাকি?

'আর তুমি? তুমি কি করবে? সবকিছু দিয়ে-থুয়ে তোমার তো গাছতলা সম্বল!' বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠলো শুশুর।

রবিও হাসলো। ম্লান একটুখানি হাসি। বললে, 'আমার তো থাকবার মধ্যে আছে ওই

বাচ্চা ছেলেটা। ওকে পাঠিয়ে দেবো ওর মামার বাড়ীতে। তারপর আমি আমার যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকে চলে যাব। একা মানুষ—যেমন করে হোক চলে যাবে।'

শুধময় বললে, 'ভাল। ভাল।'

পাগল ছাড়া এরকম কথা বলে না কেউ। শুধময় ভাবলে রবির মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু এটা কি ভাল হলো?'

রবি বললে, 'ভাল মন্দ বুঝি না ভাই। আমার যা মনে হলো আমি তাই করলাম।'

শুধময় এইটিই চেয়েছিল। যা চেয়েছিল তাই যখন হয়ে গেল তখন বলতে দোষ কি? বললে, 'কিন্তু কেন? এরকম মনের ইচ্ছেটা হলো কেন?'

কেন হলো তাই কি বলা যায় নাকি? মানুষের বেয়াড়া মন কখন যে কি করে বসে মানুষ নিজেই তা বুঝতে পারে না। রবি চুপ করে রইলো। কিছুই সে বলতে পারলে না।

শুধু বললে, 'ডিভোর্সটা রেজেষ্ট্রি হয়ে গেছে। বৌদিকে বুঝিয়ে বোলো—পুজো আছে বাড়ীতে—সেটা তো করতেই হবে। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো। সেই লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন আমি বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এই ক'টা দিন বৌদিকে তুমি অপেক্ষা করতে বোলো।'

শুধময় বললে, 'তাহ'লে শোনো। এখন এ-সব কথা আমি লক্ষ্মীকে কিছু বলবো না। পুজোর পর একদিন আসবো, সেইদিন আমার হাতে ডিভোর্সটা তুমি দিও। সেই ডিভোর্স আমি লক্ষ্মীর হাতের ওপর ফেলে দিয়ে বলবো—এই দ্যাখ্, হতভাগী, তুই কি করলি দেখ্। একটা মানুষকে তুই ঘরছাড়া করে দিলি?'

রবি বললে, 'সে তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।'

পুজো পার হয়ে গেল নির্বিঘ্নে।

বিজয়া দশমীর দিন লক্ষ্মী জানলার কাছটিতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল বাইরের দিকে তাকিয়ে। কি যেন সে ভাবছিল।

শুধময়কে দেখে ডাকলে, 'দাদা, শোনো।'

'কি বলছিস?'

লক্ষ্মী বললে, 'যাও না একবার ও-বাড়ীতে। দেখে এসো ঠাকুরপো পুজোটাও শেষ পর্যন্ত দিলে হয়ত বন্ধ করে।'

শুধময় বললে, 'তুই পাগল হয়েছিস্? এখন যায়?'

'কেন? যায় না কেন?'

শুধময় বললে, 'গেলেই তো হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে। মাতালের কি আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে? হয়ত বলবে—তুমি ভাই আমাকে বাঁচাও।'

লক্ষ্মী বললে, 'তাহ'লে আমিই একবার চুপিচুপি যাব নাকি?'

'ছিঃ! এ-কথা তুই মুখে আনছিস কেমন করে? সেই কথাটা ভুলে গেছিস? তোকে ও-বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না বলে খুব যে বড়াই করেছিল—'

'তা করুক্।'

'না না শোন্। আমার মামলার রায়টা বেরোক্। তার্থ্ না বাঁচাবন কি করে। আর ক'টা দিন চুপচাপ বসে থাক্।'

চুপচাপ বসেই রইলো লক্ষ্মী।

শুধন্য কিন্তু চুপ করে রইলো না। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন রবির বাড়ীতে গিয়ে দেখে, রবি যা বলেছিল ঠিক তাই করেছে। বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একটা ঝি সঙ্গে যাচ্ছে। ছেলেটাকে নিয়ে সে তার মামার বাড়ীতে রেখে আসবে।

দুটি মাত্র চামড়ার সুটকেস নিয়েছে সঙ্গে। আর সব আসবাবপত্র—যেখানকার যা ঠিক সেইখানে যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

রবি বললে, 'এসেছ? তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

শুধন্য বললে, 'সত্যিই চলে যাচ্ছ?'

রবি বললে, 'হ্যাঁ।'

মুখ দেখে মনে হয় মনে তার কোনও দুঃখ নেই। দলিলটা বের করে রবি বললে, 'এই নাও দলিল। বৌদিকে গিয়ে বোলো—'

এতক্ষণ পরে গলাটা তার কে যেন চেপে ধরলে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।

শুধন্য জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন যাবে?'

'—আর একঘণ্টা পরে। দশটায় ট্রেন। একজন দরোয়ান রইলো। অনেকদিনের পুরোনো লোক। বৌদি তাকে চেনে। তার মাইনেপত্র সবই আমি চুকিয়ে দিয়েছি। বৌদি যদি ইচ্ছে করে তো তাকে রাখতেও পারে, ছাড়িয়েও দিতে পারে। তারই হাতে বাড়ীর চাবি থাকবে।'

দলিলটা নিয়ে শুধন্য আর দাঁড়ালো না। বললে, 'কাজটা কিন্তু ভাল করলে না রবি।'

রবি কোনও কথা বললে না। শুধন্য চলে গেল।

লক্ষ্মী আজকাল রোজ সকালে স্নানটান করে।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বাড়ীর দরজায় ঝিঙ্কা দাঁড়িয়েছিল। ঝি ডাকলে, 'এসো দিদিমণি।'

লক্ষ্মী আসছে। শুধন্যের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

'এই তার্থ্, তোর দাদা তোর জন্যে কি করলে তাখ।'

বলেই সে রবির দেওয়া দলিলটি লক্ষ্মীর হাতে ধরিয়ে দিলে।

লক্ষ্মী আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জিজ্ঞাসা করলে—'কি এটা? কি করলে তুমি?'

যুদ্ধ জয় করে এসে বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল সেনাপতি যেমন আনন্দের হাসি হাসে, শুধন্যও তেমনি হাসতে হাসতে বললে, 'তোর শ্বশুর বলেছিল—বৌমা যেন এ-বাড়ীতে না আসে। এখন? তোর শ্বশুরের ওই এত বড় বাড়ী—আরও যেখানে যা-কিছু আছে—সব তোর। তুই সব-কিছুর মালিক। এই যে তার দলিল।'

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'সবই দিয়ে দিলে আমাকে? তাহলে ঠাকুরপোর কি রইলো?'

শুধন্য বললে, 'তার রইল গাছের তলা আর রইলো মাথার ওপর খোলা আকাশ।'

লক্ষ্মী চুপ করে শুনলে কথাটা। মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

শুধময় বললে, 'এই দলিলে তোকেই সবকিছু লিখে দিয়ে ও তার ছেলেটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে বাড়ী ছেড়ে।'

লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলে। বললে, 'চলে যাচ্ছে বাড়ী ছেড়ে?'

'চলে যাচ্ছে কি বলছিস? চলে হয়ত গেছে এতক্ষণ।'

দলিলটা হাতে নিয়ে লক্ষ্মী উঠে দাঁড়ালো। দেয়ালের পাশে যে আলমারিটা ছিল সেইটে খুললে। শুধময় ভাবলে বুঝি দলিলটা রাখবে। কিন্তু দলিল সে রাখলে না। কি যেন নিলে সেখান থেকে। তারপর ফিরে বললে, 'আয়।'

শুধময় বললে, 'গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছিস তো দলিলটা সঙ্গে নিচ্ছিস কেন?'

লক্ষ্মী বললে, 'গঙ্গার ধারে বসে বসে পড়বো ভাল করে।'

শুধময় বললে, 'ফিরে আয়, তারপর দু'জন একসঙ্গে গিয়ে বাড়ীটার দখল নেবো।'

'সেই ভাল।' বলে লক্ষ্মী বাইরে গিয়ে রিক্সায় চেপে বসলো।

রবি চলে যাচ্ছে বাড়ী ছেড়ে।

কিন্তু এই বাড়ী—যে বাড়ীতে সে জন্মগ্রহণ করেছে, যে-বাড়ীতে এত বড়টি হয়েছে সে—তার পিতৃপুরুষের সেই ভিটে ছেড়ে যেতে মন কি চায় সহজে?

কি দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে।

সদর দরজায় একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। তাইতে উঠবে গিয়ে।

রবি প্রণাম করছে ঠাকুর দালানে।

জোরে আর-একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে নামলো লক্ষ্মী আর তার ঝি।

লক্ষ্মীর পরণে সাদা থান। নিরাভরণা রজনীগন্ধার মত শুভ্রবসনা তন্বী তরুণী ধীর মন্থর গতিতে গিয়ে দাঁড়ালো ঠাকুর দালানের সুমুখে।

রবি পেছন ফিরতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা।

চীৎকার করে উঠলো রবি।

'বৌদি!'

আর কোনও কথা নয়। ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপছে। দু'চোখ জলে ভরে এসেছে।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

রবির গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। ধরা-ধরা গলায় বললে, 'জানি না।'

লক্ষ্মী বললে, 'মদ খেয়ে মানুষ এমন অমানুষ হয়ে যায়—জানা ছিল না।'

'মদ?' রবি জিজ্ঞাসা করলে, 'কে মদ খেয়েছে?'

লক্ষ্মী বললে, 'তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুমি। মদ খেয়ে বাপের টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি সব উড়িয়ে দিয়েছ।'

রবি বললে, 'উঠিয়েছি। কিন্তু মদ খেয়ে নয়। মদ আমি জীবনে কোনোদিন খাইনি বৌদি। আমি এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে—'

হাত বাড়িয়েছিল লক্ষ্মীর পায়ে হাত দেবার জন্যে। লক্ষ্মী সরে দাঁড়ালো।

রবি বললে, 'বিশ্বাস না হয় আমি আমার ছেলের দিব্যি করে বলছি। মদ যদি কোনোদিন খেয়ে থাকি তো আমার ওই ছেলে যেন মরে যায়। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।'

'কোথায় তোমার ছেলে?' লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে।

আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে রবি।—'ওই তো ঝিএর কোলে।'

লক্ষ্মী ঝিকে কাছে ডাকলে। বললে, 'নিয়ে এসো ওকে।'

ছেলে কোলে নিয়ে ঝি এসে দাঁড়ালো।

লক্ষ্মী রবির দিকে তাকালে। বললে, 'ওই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল—যে কাজ তুমি করেছ সে-কাজ আর জীবনে কখনও করবে না।'

'কি কাজ বৌদি?'

'কি কাজ? লজ্জা করে না বলতে? এই ছেলে থাকতে আমার মত এক অসহায় বিধবাকে এই বাড়ী আগলাবার ভার দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ বাড়ী ছেড়ে? এই নাও তোমার দলিল।'

দলিলটা দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে লক্ষ্মী রবির পায়ের কাছে।

'এই বাড়ী—বিষয়সম্পত্তি কিছুই আমি চাই না ঠাকুরপো। আমি শুধু একটি জিনিস চাই তোমার কাছ থেকে।'

এই বলে ঝি-এর কোল থেকে ছেলেটাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে লক্ষ্মী বললে, 'চাই শুধু তোমার এই ছেলেটিকে আর চাই এই বাড়ীতে একটুখানি আশ্রয়।'

লক্ষ্মীরও চোখদুটি জলে ভরে এলো।

রবি তার পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে একটি প্রণাম করতে গিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। সে কান্না শেষ পর্যন্ত থামাতে হলো লক্ষ্মীকে। ছেলেকে আবার ঝি-এর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে রবিকে তুলে ধরে বললে, 'চল—বাড়ীর ভেতর চল।'

• • • •

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ইংরাজ সরকারের খেয়ালখুশী মত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিনাবিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানই এর উদ্দেশ্য। আলফ্রেড থিয়েটারে এক বিরাট জনসভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়। এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বিশেষ অনুরোধে কবির ভারত বন্দনা "দেশে দেশে নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী"—এই গানটিও সেইদিনই সর্বপ্রথম গীত হয়।

শহীদ

মৃত্যুঞ্জয় গুহ

॥ ১ ॥

সেপ্টেম্বরের শেষ। দক্ষিণ বাংলাদেশে সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকার আকাশের তারাগুলো জ্বলছে। এখনই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। মশাগুলো এবারে মরবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই জল-নিকাশের নালার ভেতর থেকে একটা মানুষ ধীরে ধীরে শুড়িসুড়ি বেরিয়ে এল। সাপের মতো বুকে হেঁটে সে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল, খানিকটা জলকাদা ভেঙে নদীর ধারে কাশবনে ঢুকে পড়লো। কাশবন একটু নড়ে উঠলো, তারপর সব চুপচাপ। একটা ঝিঁঝে ভয় পেয়ে আকাশে উড়তে লাগলো। একটা মাছরাঙা চোখ পাকিয়ে খানিকক্ষণ দেখলো, তারপর উড়ে পালিয়ে গেল আরও দক্ষিণ দিকে।

ছোট্ট নদী। ওপারের ছোট্ট দ্বীপটিকে যেন একটা বৃহৎ অজগরের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। সুন্দরবনের আর পাঁচটা নদীর মতো এতেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এখন ভাঁটার সময়, নদীর মাঝখান দিয়ে অল্প স্রোত ছিপ্ ছিপ্ ক'রে বইছে। দু'পাশেই অনেক দূর পর্যন্ত পাড় জেগে রয়েছে, নরম কাদায় ঢাকা। বাতাসে একটা মৃদু সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। মানুষটি ধীরে ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘাসের উপর দিয়ে মাথা তুলে তাকালো। সাবধানে চারিদিক দেখতে লাগলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, জলের ধারে কাদার উপরে একটা ডিঙি কাত হ'য়ে পড়ে আছে। সে চুপ ক'রে কানপেতে খানিকক্ষণ শুনলো, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নরম কাদার উপর দিয়ে এগিয়ে গেল ডিঙিটার দিকে। ডিঙিটাকে তার কাদার আশ্রয় থেকে জলের মধ্যে টেনে নামালো। কাদার মধ্যে বাতাস ভরে নেবার এক অদ্ভুত আওয়াজ উঠে নিস্তব্ধ আকাশ মথিত ক'রে দিল।

ডিঙিটা জলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে ডিঙিটা আশ্রয় ক'রেই খুব সন্তর্পণে সাঁতরাতে লাগলো। ডিঙিতে উঠতে সাহস পেল না, পাছে কেউ দেখে ফেলে। ভাঁটার টানে সে দক্ষিণদিকে ভেসে চললো। ঠাণ্ডায় তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে মনে মনে ভয় পাতে লাগলো। বুঝলো, তার বেশ ভয় ক'রছে।

শুক্লপক্ষের রাত্রি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঘষিত ওড়নার মতো স্বচ্ছ সাদা মেঘে চাঁদটা মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে, তবুও বেশ পরিষ্কার রাত্রি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। নদীর এপারে ওপারে কোথাও একটি আলোর রেখাও চোখে পড়ছে না। আশেপাশে কোথাও একটি জেলে-ডিঙিও দেখা যাচ্ছে না। দীর্ঘ নদীটি শান্ত নিস্তব্ধ। তার মধ্যে দিয়ে সে ভেসে চলেছে, নিঃসঙ্গ, একেলা।

শীতে আর ভয়ে শরীর হিম হ'য়ে যাচ্ছে। শরীর গরম করার উদ্দেশ্যে সে জলের মধ্যে জোরে জোরে পা ছুঁড়তে লাগলো। আর সাহস দিতে পাবার জন্য আপন মনে গালি-গালাজ ক'রতে লাগলো। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, নদীটা ক্রমশ চওড়া হ'য়ে গেছে। পাছে বাহির

সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এই ভয়ে সে আরও জোরে সাঁতার কাটতে লাগলো। মধুমতি নদী, পৌষের রাত্রি এবং অন্ধকার নিঃসঙ্গ পৃথিবী, সবকিছুর ওপর সে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল। তারপর নৌকার আশ্রয় ছেড়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগলো। একটু পরেই মাটির আশ্রয় পেয়ে সে কোন প্রকারে নিজেকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে চললো। তারপর উঠে ক্লান্তিতে অবসাদে শুয়ে পড়লো, একটা ক্লান্ত জন্তুর মতো জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো। লোকালয়ে ফিরে যাবার শেষ সম্বল জেলে-ডিঙিটা স্রোতে ভেসে বাঁকের ওধারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

(২)

সে একজন পাকিস্তানী ছত্রী সৈন্য, নাম মকবুল ইসলাম। পাকিস্তান তখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব সীমান্ত বরাবর তুমুল লড়াই শুরু হ'য়েছে। পশ্চিম বাংলা এবং আসামের সীমান্ত বরাবরও বিপুল সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে মকবুল এবং তার সাথী ইয়াসিনের ওপর আদেশ হ'ল, ভারতের বিরুদ্ধে গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতক হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চিম বাংলায় যেতে হবে। রাতের অন্ধকারে একটি শক্তিশালী জেট-বিমানে ক'রে তারা এলো, তারপর এক সময় চালকের নির্দেশ পেয়ে তারা দু'জনে দু'টো রক্তচোষা বাদুড়ের মতো বিমান-দ্বারসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো পশ্চিম বাংলার বুকে। তারপর তারা ধীরে ধীরে নেমে এলো একটা ধানক্ষেতের মধ্যে।

তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল হালকা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, গুলি, শুষ্ক-খাদ্য, ম্যাপ এবং দরকারী আরও অনেক কিছু। পাকিস্তানের পক্ষে কাজ ক'রবার মতো অনেক গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতক তখন পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছড়িয়ে ছিল। ব্যবস্থা ছিল, সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী তারা সকলেই ছত্রী-সৈন্যদের সহায়তা ক'রবে। এদের সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য নাশকতা। ভারতের নিরাপত্তার বহু ও বিভিন্ন ব্যবস্থার, যেমন—রেলপথ, সড়ক, জলাধার, পুল, কারখানা, বিমান-বন্দর ইত্যাদির ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। তারা হ'ল গোপনতার সহীসপ, ছোবল দেবার ও বিষ ঢালবার কাজটা তারা গোপনেই সারতে চায়!

তাদের বলা হয়েছিল যে, কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বিমান-বন্দরের কাছে তাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে সুযোগ বুঝে তাদের বিমান-বন্দরটির ক্ষতি ক'রতে হবে। এতে প্রাণ গেলেও তাদের পশ্চাৎপদ হওয়া চলবে না। এইভাবে জীবন-পণ ক'রে একেবারে মরীয়া হ'য়েই তারা এখানে এসেছে।

কিন্তু তাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে অনেক দক্ষিণে সুন্দরবনের এক জনবিরল গ্রামে। এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে চলাফেরা করাই যায়। তাছাড়া তাদের যে ম্যাপ দেওয়া হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তার মিল খুবই কম। দু'দিন দু'রাত্রি ধ'রে গোপনে তারা কত খোঁজাখুঁজি ক'রল। কিন্তু কোথায় রেলপথ, আর কোথায় বিমান-বন্দর! কোনটারই তারা হদিশ পেল না। তাদের সঙ্গে যে শুকনো খাবার ও পানীয় জল ছিল তা ফুরিয়ে

গেল। অনাহারে অনিদ্রায় আর মশার কামড়ে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠল। এখন একান্ত প্রয়োজন খাদ্য ও পানীয়ের, আর একটু বিশ্রামের।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা মুসলমান প্রধান গ্রামে এসে পৌঁছাল। সেখানে একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখে তাদের মনে একটু ভরসা হ'ল। তাই তারা এগিয়ে গিয়ে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাল। সরল গ্রাম্য বৃদ্ধটি এরকম দু'জন অস্ত্রধারী সৈনিককে দেখে খুবই ঘাবড়ে গেল। তাই বুঝে শুনে তখনই তাদের জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা ক'রল। তারপর বাইরের ঘরে তক্তপোষের উপর একটা সতরঞ্চি পেতে তাদের বিশ্রাম ক'রতে দিল।

কিন্তু বৃদ্ধের ছেলে আবদুল লোকটা লেখাপড়া জানে। সে খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শোনে। বাড়ি ফিরে সব দেখে শুনে তার মনে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তার মনে হ'ল, এরা পাকিস্তানী ফৌজী-সৈন্য নয়তো, যাদের কথা রোজ খবরের কাগজে লিখছে? একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল তার বন্ধু সিরাজের কাছে। অব্যর্থ শিকারী হিসেবে তার খুব নাম রয়েছে। এরই মধ্যে কয়েকটি বাঘ ও কুমীর শিকার ক'রে সে বেশ কৃতিত্ব অর্জন ক'রেছে।

দেখতে দেখতে খবরটা চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। আর আবদুলের বাড়ির বাড়িতে অনেক লোকের ভিড় জমে গেল। চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনা! কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পায় না। তখন গ্রামের মোড়ল একজনকে ডেকে বলল, "এই ছুটে যা, শীগগির থানায় গিয়ে খবর দে।"

এরই মধ্যে মকবুলের ঘুম ভেঙে গেছে। এখানকার মুসলমানেরা তাদের সহায়তা করবে ভেবেছিল, কিন্তু তা হ'ল না দেখে সে বেশ ঘাবড়ে গেল।

তখনই ইয়াসিনকে ডেকে বলল, "অ্যাই ইয়াসিন, আহাম্মক কোথাকার, শীগ্‌গির ওঠ, চল এখনই পলাই। আমার জানি ক্যান্ ব্যাপারডা সুবিধার লাগতাছে না।"

ইয়াসিন ধড়মড় করে উঠে বলল। কিন্তু কাঁচা ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে ভাই, ব্যাপারডা কী? এত চিল্লাস ক্যান্?"

"আরে ব্যাটা, চাইয়া ভাখ কত মানুষ জড় অইছে। আর দেরী ক'রলে, পুলিশে ধইরা নিবো।"

"হ, তাইতো! ঠিকই কইচস। এখন কী করন যা'তো?"

"চল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পলান যাইক।"

ব্যাগ আর জলের বোতল কাঁধে ঝুলিয়ে তারা তখনই বেরিয়ে পড়ল। একজনকে জিজ্ঞেস ক'রল, স্টেশনটা কোনদিকে, আর কতদূর। তারপর প্রায় মেটে রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল। কিন্তু কৌতূহলী জনতা নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাদের অনুসরণ ক'রতে লাগলো। এতে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল। দু'একবার পেছন ফিরে ধমক দিল, কিন্তু তবুও জনতা নিরস্ত হ'ল না। এতে তারা আরও চিন্তিত হ'য়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি এই গ্রাম ছেড়ে সরে পড়বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

হঠাৎ দূরে দেখা গেল, একজন দারোগা কয়েকজন সশস্ত্র সিপাই সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। এতে তারা খুবই শঙ্কিত হ'য়ে পড়ল এবং দৌড়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে প'ড়ল। দারোগা পুলিশ আর জনতা তখন তাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ধ'রল। এতে তারা মরীয়া হ'য়ে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। এইভাবে চলল খানিকক্ষণ। তারপর একসময় হঠাৎ একটা গুলি লাগায় ইয়াসিন

স্তব্ধভাবে অবস্থা হ'য়ে প'ড়ল। তবুও তারা নদীতীরে হ'য়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে লড়াই ক'রল। কিন্তু একসময় তাদের গুলি ফুরিয়ে গেল। তখন এদিকে সব চুপচাপ। এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় কী! ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মকবুল অস্থির হ'য়ে পড়ল। অকর্মণ্য রাইফেলটা ফেলে দিয়ে সে একসময় গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। আহত ইয়াসিন সেখানেই প'ড়ে রইল।

॥ ৩ ॥

এদিকে সব চুপচাপ হ'য়ে যেতেই দারোগাবাবু তার দলবলসহ এগিয়ে গেলেন। আহত ইয়াসিন ধরা পড়ল। সে যে একজন পাকিস্তানী ছত্রী-সৈন্য দারোগাবাবু তা দেখেই বুঝতে পারলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বেঁধে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। ওদের পরিত্যক্ত রাইফেল দু'টো পাওয়া গেল। কিন্তু আর একজন পাকিস্তানীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! এতে সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, চিড়িয়া ভাগ গিয়া!

যাই হোক, একজন পাকিস্তানী ধরা পড়েছে, এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। দারোগাবাবু সেই আনন্দেই ভরপুর। আর অপেক্ষা না ক'রে তিনি তখনই তার অস্ত্রধারী সিপাইদের সাহায্যে বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে থানার দিকে রওনা হলেন।

দারোগাবাবু আর একজন পাকিস্তানী সন্ধান না ক'রেই চলে গেলেন। এটা আবদুল এবং সিরাজ কারও মনঃপুত হল না।

সিরাজ বলল, "আবদুল ভাই, পাকিস্তানীটা এভাবে আমাদের গাঁ থেকে পালিয়ে যাবে! এটা তো খুব লজ্জার কথা! আমার মনে হয়, ব্যাটা নদী পার হয়ে ঐ ব-দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। একটা নৌকা জোগাড় কর, আমি এখনই ওপারে যাব।"

আবদুল উত্তর দিল, "না ভাই, রাত ক'রে একলা তোর যাওয়ার কোন দরকার নেই। কাল দিনের বেলায় সকলে মিলে খোঁজ করলেই হবে।"

"তুই তো আচ্ছা ভয়পুক! জানিস না আমি একজন শিকারী। একলা একলা কতরাত বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি। চল, আর দেরী ক'রলে ব্যাটা ওপার থেকেও পালিয়ে যাবে।"

তারা তখনই একটা নৌকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর মকবুল ঝোঁপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে গেল।

নদীর পাড়েই জেলেদের ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। মকবুল তার মধ্যে প্রবেশ ক'রল। ঘরে কোন দরজা নেই, সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটে ঘরটিরও বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তবুও এর মধ্যে থাকলে, সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার কামড় থেকে খানিকটা বাঁচা যাবে। ঘরের কোণে একটা বালি গামলা পড়ে আছে। দড়ি থেকে ঝুলছে একটা ছেঁড়া জাল। মকবুল জামা-কাপড় খুলে

নিজেকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। একপাশে একটা ছেঁড়াচিটে লঙ্গরকি পড়ে ছিল। সেটা কোন প্রকারে গায়ে জড়িয়ে সে কুকুর কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

মকবুল এখানে পালিয়ে এসেছে বাঁচবার জন্য। কিন্তু সে তো জানেনা যে এখানে জীবন ধারণের অবস্থা খুবই প্রতিকূল। প্রতিপদেই এখানে মৃত্যু যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

চব্বিশ পরগণার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রতীরের এই সব দ্বীপের আশপাশ দিয়ে অসংখ্য নালা খাড়ি প্রবাহিত হয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যখন জোয়ারের জল আসে তখন নালাগুলি কানায় কানায় ভরে ওঠে, বেশির ভাগ জায়গা সাময়িকভাবে জলে ডুবে যায়। আবার জল যখন নেমে যায় তখন রেখে যায় পলিমাটির স্তর। এখানে লোকবসতি নেই। জল অত্যন্ত লোনা। পানের অযোগ্য। নদী-নালায় রয়েছে অসংখ্য কুমীর, হাঙর। বনভূমির মধ্যে ঘাস গজাতে পারে না, ঘাসের আস্তরণ দেখা যায় সমুদ্রের ধারের উঁচু বালুতটে। বনের মাঝে মাঝে দেখা যায় জলাভূমি। এখানে প্রতিদিনই জোয়ার-ভাঁটা খেলে। তাই অন্যান্য স্থানের বনভূমির মতো এখানে ছোট ঝোঁপ-ঝাড় বা জঙ্গল অত বেশি জন্মায় না। এখানে সাধারণভাবে দেখা যায়, সুন্দরী গাছের নিবিড় বন। নদী ও খালের পাড়ে কর্দমাক্ত ভূমিতে জন্মায় কেওড়া ও বাইন গাছ। আর দেখা যায় গর্জন, কাঁকরা ও গোলপাতার গাছ। বনের মধ্যে চিতল হরিণ ঝাঁক করে ঝাঁকে ঝাঁকে, আর আছে অন্য কিছু কর্কর হরিণ, আর বুনো শুয়োর। এ ছাড়া আছে সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘ। এ বাঘ জন্ম থেকেই মানুষখেকো। এখানে তাই প্রতিপদেই মৃত্যুর বিভীষিকা।

গভীর রাত্রে একটা শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত শব্দে হঠাৎ মকবুলের ঘুমটা ভেঙে গেল। সে মনে মনে বলল, "হালা নিশ্চয় আমারে শুংখেছে। না অইলে অমন আওয়াজ করে ক্যান্।"

সে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসল। ধারালো ছুরিটা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, দরকার হ'লে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে।

শুয়োরটা সামনের রাস্তা-দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল, তারপর হঠাৎ কেন জানি ঘুঁৎ ঘোঁত করতে করতে পাশের জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

"ব্যাটা ভয় পাইচে। কিন্তু নিশ্চয় আর কাউরে শুংখেছে।"

মকবুল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। এক মুহূর্তে খড়ি থেকে তার জামা-কাপড় টেনে নিল, তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে গিয়ে বালিয়াড়ির ওপর টানটান হ'য়ে শুয়ে পড়ে সে চারিদিকে দেখতে লাগলো। নদীর কিনারা থেকে এক ঝাঁক মাছ ছরছর শব্দ ক'রে গভীর জলে লাফিয়ে পড়ল। কাছেই কোথায় যেন একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠলো। একটা প্যাঁচা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, সে শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

সিরাজ মকবুলকে দেখতে পায়নি। সে কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শুয়োরটা হঠাৎ এভাবে হুড়মুড় করে ছুটে গেল দেখে সে থমকে দাঁড়াল। শুয়োরটা চলে যেতেই সে আবার কুঁড়ে ঘরটার দিকে রওনা হ'ল।

আলো-আঁধারে মকবুল তার মুখটা ভাল ক'রে দেখতে পেল না, তবে তার ছায়াটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল। দীর্ঘ দেহ, বেশ স্বাস্থ্যবান। শিকারীর পোষাক পরা। তান হাতে একটা রাইফেল আলতোভাবে ধরে রয়েছে, দরকার হ'লেই এক মুহূর্তে তাক ক'রতে পারবে। বাঁ হাতে

রয়েছে একটা টর্চ, নেভানো, কিন্তু দরকার হ'লেই যে কোন মুহূর্তে তা জ্বালতে পারবে। আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, তার পেছন দিকে কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে এক গাছি দড়ি আর একটা ধারু ছোরা।

এমন সময় শূয়োরটা হঠাৎ আবার ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ছুটে এল। সিরাজ ঝট্ ক'রে মুখে একটা ইঁটু মাটিতে রেখে তাক করল। গুলির শব্দ হ'তেই সকলে লাফিয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে শূয়োরটা করুণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল, খানিকক্ষণ ধাপোধাপি করল, তারপর মরণ আক্ষেপে টান্-টান হ'য়ে পেছে একবার স্থির হ'য়ে গেল।

অদ্ভুত নিশানা! ওস্তাদ শিকারী!

ভয়ে মকবুলের শরীর হিম হয়ে গেল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে স্থির হ'য়ে রইল। ঘাসের ফাঁক দিয়ে শিকারীকে লক্ষ্য ক'রতে লাগলো। এখন পশ্চাদপসরণ করা একেবারে অসম্ভব। তা করতে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে, আর তাহ'লে মৃত্যু অনিবার্য। তার অন্তরাত্মা বলল, মকবুল, সাবধান! এই লোকটি তোমার শত্রু, এখানে এসেছে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। সে যে সময়মত সাবধান হ'তে পেরেছে, এজন্য মনে মনে খোদাতালাকে ধন্যবাদ জানাল।

কেন জানি মকবুলের মনে পড়ে গেল পূর্ব বাংলার অবস্থিত ছায়া-নিবিড় সেই ছোট্ট গ্রামখানির কথা, যেখানে সে তার বাল্যকাল এবং কৈশোর অতিবাহিত করেছে। এই তো সেদিনের কথা, হিন্দু-মুসলমান তারা সকলেই কেমন সুন্দর একসঙ্গে শান্তিতে নিরুপদ্রবে বাস করছে। ছেলেবেলায় তারা সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে কত খেলা করেছে। নদীতে সাঁতার কেটেছে। আবার বড়দের সঙ্গে মাঠে গিয়ে চাষ-আবাদের কাজে সাহায্য করেছে। কখনও হিন্দু-মুসলমান ব'লে তারা বিচার করেনি। তারপর হঠাৎ কি হ'ল, মোল্লারা আর সাঁয়ের পাণ্ডারা তাদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করতে লাগল। তারা জিগির তুলল—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন তাদের সাধের পাকিস্তান সৃষ্টি হ'ল। তখন চারিদিকে কী উত্তেজনা। পাকিস্তানে তখন মুসলমানদের রক্ত গরম, হিন্দুদের তারা মানুষ ব'লেই মনে করে না। তাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার চলতে লাগল। সেও তো অত্যাচার নেহাৎ কম করেনি। তারই ফলে তাদের গাঁয়ের হিন্দুরা, এমনকি তার ছেলেবেলার বন্ধুরা পর্যন্ত, সব একে একে দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে যেতে লাগল।

কিন্তু তাতেই বা তাদের কী লাভ হয়েছে। তাদের দারিদ্র্য তো কোনদিনই ঘুচল না। তার বুড়ো বাপ তো বলতে গেলে একরকম না খেতে পেয়েই মরে গেল। আর সেও তো প্রাণের দায়ে নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, দারুণ ভারত-বিদ্বেষ থেকেই এবারকার এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, পূর্ব বাংলার কেউই এ যুদ্ধ চায়নি। তাদের ওপরে এ যুদ্ধ জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর দখল করলে পশ্চিম পাকিস্তানেরই লাভ ষোল আনা। কিন্তু তাতে পূর্ব বাংলার কী এসে যায়? অথচ এজন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে প্রাণের বিনিময়ে।

এই যুদ্ধে পূর্ব বাংলার কিংবা তার নিজের কী লাভ হয়েছে? লাভ যা হয়েছে তাতো সে দেখতেই পাচ্ছে। পূর্ব বাংলা বরাবরই প্রাচুর্যের দেশ ব'লে বিখ্যাত। কিন্তু সেখানেও এখন চাল-ডাল,

হুন-তেলের দাম আকাশছোঁয়া। কোরোসিন তেল আজ দুষ্প্রাপ্য, তাই সকলকে এখন বাধ্য হ'য়েই নিম্প্রদীপের ব্যবস্থা ক'রতে হয়েছে।

দেশ ভাগ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আর জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। সে বিবাদ আজও চলছে। কখনও নীরবে কখনও বা সংগ্রামের আকারে।

পাকিস্তান কী তা সে জানে না। এ লড়াই কিসের জন্য তাও সে জানে না! তবুও সে লড়ে গেছে, কারণ তার আর ফেরার কোন উপায় ছিল না।

সে অনেকের মুখেই শুনেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পূর্ব বাংলাকে একটা উপ-নিবেশের মতো ব্যবহার ক'রছে। সেও সেকথা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে। দেশের সর্বত্র, এমনকি সেনাবাহিনীতেও উঁচু-নীচু সব স্তরগুলিতেই রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। আর তারাতো কেউই পূর্ব বাংলার মানুষদের মানুষ ব'লেই মনে করে না। কথায় কথায় গালি দেয়। সে পূর্ব বাংলার লোক, তাইতো আজ তাকে এমন ক'রে শত্রুর দেশে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

সে ভাবতে লাগল, শিকারী হিন্দু না মুসলমান তা সে জানেনা। আর তা জানারও কোন দরকার নেই। এটা ঠিক যে এক সশস্ত্র শিকারী বনে এসেছে শিকার খেলতে, আর প্রাণভয়ে ভীত তাড়া খাওয়া এক জন্তুর মতো তাকে এখন সব সময় পালিয়ে বেড়াতে হবে, শিকারীর মারণাস্ত্র থেকে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে হবে। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তার কান্না পেল। নিজের অদৃষ্টকে সে ধিক্কার দিল।

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। এখন সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, শিকারী ক্ষিপ্রহস্তে ছালটা ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘরটা সেখানেই প'ড়ে রইল।

ফেডারেল চ্যান্সেলার ডক্টর এরহার্ড

সকলের জন্য সুখ ও শান্তি—

জার্মাণীর ফেডারেল রিপাবলিকের চ্যান্সেলরের প্রধান কামনাই এই :

জীবনযাত্রার উচ্চতর মান, সমৃদ্ধতর এবং শান্তিময় জগৎ—সম্প্রসারিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উন্নততর অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা—সকলের জন্য এবং সব সময়ের জন্য এই সব জনহিতকর কার্যে সাফল্যলাভের একমাত্র উপায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মাণী
একটি বিশ্বস্বাস্থ্য সহযোগী

মকবুল এতক্ষণে নিশ্চিত বুঝেছে যে, এর সঙ্গে চালাকি চলবে না। সে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নিল, তারপর আড়ালে থেকে শিকারীকে অনুসরণ ক'রতে লাগল। মনে মনে বলল, "হুঁ হুঁ চান্দ, আমি তোমার পিছনে ঠিক আঠার মতো লাইগ্যা আছি। চুপিসারে হঠাৎ পিছন থিক্যা আইসা আমারে আক্রমণ ক'রবা, সেডা হবার দিমু না।"

সিরাজ ঘরের মধ্যে ঢুকে ডিবে জ্বালিয়ে সব ভাল ক'রে দেখল। ঘরের কোণায় একটা চিমনি ভাঙা লণ্ঠন দেখতে পেল। সেটা জ্বালিয়ে দরজার মাথায় টাঙিয়ে দিল। লণ্ঠনটা প্রচুর ধুম-উদ্গীরণ ক'রে জ্বলতে লাগল। ঘরে একটা গামলা ছিল। সে গামলাটা উলটিয়ে রেখে তার ওপর বসল, দরজার দিকে মুখ ক'রে। রাইফেলটা কোলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখল, তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

মকবুল স্বগতোক্তি ক'রল, "ধাটাতো আইচ্ছা চালাক! ক্যামন কান্দ পতচে ছাখনি! আয়ে হালা, কুত্তির ভাই, মকবুল কী অ্যাত বড় আহাম্মক যে ত'র কান্দে পাও দিবো!"

সমগ্র পরিস্থিতিটা কল্পনা ক'রে সে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। সেই সঙ্গে দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগল। তবুও এরই মধ্যে তার একটু স্ফূর্তি হ'ল এই ভেবে যে, সে এখন শিকারীকে চোখে চোখে রাখতে পারবে। আর প্রয়োজন হ'লেই সে সাবধান হ'তে পারবে। এইভাবে তারা দু'জনেই অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

শেষে এক সময় রাত্রি প্রভাত হ'ল।

॥ ৫ ॥

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ওপারে একটা নৌকোর শব্দ শোনা গেল। নৌকা ঘাটে ভিড়বার আগেই সিরাজ বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, আবদুল তার জন্য রুটি গোস্ত আর জল নিয়ে এসেছে। তারা দু'জনে খানিকক্ষণ পরামর্শ ক'রল। তারপর একসময় চামড়াটা নিয়ে আবদুল ফিরে গেল।

সিরাজ ঘরে ঢুকে খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখল। তারপর রাইফেলটা হাতে ক'রে বেরিয়ে এল। ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখতে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। সূর্যের আলোয় সিরাজকে দেখা গেল বিরাট একটা কালো ছায়ার মতো। কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় মকবুলের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠল।

কিন্তু সে সাহসী পুরুষ, ভয়কে আমল দিল না। সে তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। শিকারী চোখের আড়াল হ'তেই সে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা জল খেল, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকখানা রুটি আর এক খাবলা গোস্ত নিয়ে ছুটে পালিয়ে এল। নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

কিন্তু শিকারীর দিকে তাকিয়ে রুটি তার গলায় আটকে গেল। ভয়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সে দেখল, শিকারী নীচু হ'য়ে মাটিতে তার পায়ের দাগ লক্ষ্য ক'রছে।

সে কপালে করাঘাত ক'রে বলল, "হায় আল্লা, আমি কত বড় আহাম্মক! আমার আরও সাবধান হওয়া দরকার আছিল।"

সিরাজ তখনই ঘরে ফিরে এল। আর সেখানে তার রুটি-সেঁকের অবস্থা দেখে সে আরও চটে গেল। তবে এটা সে নিশ্চিত বুঝল যে, পাকিস্তানীটা নিকটেই কোথাও আছে। সে দরজার সামনে গিয়ে বসল, রাইফেলটা রাখল কোলের ওপর। তারপর যেন তাকে দেখিয়ে রুটি সেঁকা খেতে লাগলো। মকবুল দেখল, ওর মুখের ভাব শান্ত কিন্তু দৃঢ়, সংকল্পে অটল।

খানিকক্ষণ পরে সিরাজ উঠল। উদ্বৃত্ত খাদ্য পকেটে ভরে নিল, আর জলের বোতলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর পাকিস্তানীদের সন্ধানে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সাবধানে তাকে খুঁজতে খুঁজতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। আর এদিকে মকবুল তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রতে লাগলো। সিরাজ তার শিকারীর চেতনা দিয়ে অনুভব ক'রল, কে যেন তাকে অনুসরণ ক'রছে! তাই সে আরও সতর্ক হ'ল। সে খানিকটা এগিয়ে যায়, তারপর হঠাৎ ঘুরে পেছনদিকে ছুটে যায়, যাতে পাকিস্তানীটাকে পাকড়াও ক'রতে পারে। সে অত্যন্ত ফুর্তিলা এবং চটপটে। এত চটপটে যে মকবুল কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। তাই মকবুল খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। শিকারী থেকে তার দূরত্ব ক্রমশ বাড়াতে লাগলো। আর ঠিক পেছন পেছন না গিয়ে আশেপাশে ঝোপ-ঝাঁড়ের আড়ালে থেকে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে লাগলো। একবার ভাবল, পালিয়ে যায়। কিন্তু শিকারীর নজর এড়িয়ে এখন আর তা করা সম্ভব নয়। তার আরও ভয় ক'রতে লাগলো। এই ভেবে যে, না জানি কখন কোন্ হীংস্র-জন্তু বা পাখি তার অস্তিত্বের কথা ফাঁস ক'রে দেয়। তাহ'লে তার আর রক্ষা থাকবে না।

এমনি ক'রে বেলা গড়িয়ে গেল। সূর্যের রঙ আরক্তিম হ'য়ে উঠল। রৌদ্রের তাপ নিষ্প্রভ হ'ল। সমুদ্রের গন্ধ নিয়ে মন্দ মধুর বাতাস বইতে আরম্ভ ক'রল। গাছের পাতায় শির শির শব্দে শিহরণ জাগল।

কিন্তু শিকারীর কোন ক্লান্তি নেই। এতে মকবুলের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। তার মনে হ'ল, শিকারী এইভাবে অনন্তকাল ধ'রে তার অনুসন্ধান ক'রে যাবে। এর হাত থেকে তার আর নিস্তার নেই।

একটা পরিষ্কার খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে শিকারী পকেট থেকে রুটি বের ক'রে খেতে লাগল। সে বেশ জানে যে, পাকিস্তানীটা তার জায়গা ছেড়ে নড়তে পারবে না, কাজেই শিকার ক'রে যে কিছু খাবে তাও সম্ভব হবে না। সে শুধু তাকিয়ে দেখবে, আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে শুধু কষ্ট পাবে। এর চেয়ে শাস্তি আর কী হ'তে পারে! এইসব কথা ভেবে মকবুল মরীয়া হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেল, তারপর এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হ'য়ে নদীর ধারে চলে গেল। সেখানে গিয়ে হাতের কাছে যতগুলি ঝিনুক পেল তাই গিলতে লাগল। কিন্তু বমি হবার উপক্রম হওয়ায় ক্ষান্ত হ'ল।

কিন্তু এতক্ষণে সে তার ভুল বুঝতে পারল। শিকারী তো এতক্ষণ ধরে এইটাই চাচ্ছিল। এখন সে আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে কী ক'রে? তাকে এখন বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পার হয়ে যেতে হবে। শিকারীর দৃষ্টি এড়িয়ে সে তা ক'রবে কী করে? ডিঙিটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য এখন তার আফসোস হ'ল। হায়! সে যদি ডিঙিটা ডাঙায় তুলে ঝোপ-ঝাঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখত, তাহলে

তাকে এখন এমন বিপদে পড়তে হ'ত না। হায়! সে যে ফাঁদে আটকা পড়েছে তা থেকে সে এখন কেমন ক'রে উদ্ধার পাবে? শঙ্কা-পীড়িত হ'য়ে সে সেখানেই একটা পাথরের মূর্ত্তির মতো বসে রইল।

এমন সময় হঠাৎ একটা বক উড়ে এসে একেবারে তার গায়ের উপর বসল। কিন্তু তাকে দেখেই চমকে ক-অক্ ক-অক্ শব্দ কর'তে ক'রতে আবার উড়ে গেল। এতে মকবুলও চমকে উঠে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে দৌড় মারল জঙ্গলের দিকে। প্রতিমুহূর্ত্তেই তার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, একটা গুলি এসে তার পাঁজরটা এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দেবে। কিন্তু, আশ্চর্য, সে রকম কিছুই ঘটল না। সে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে জঙ্গলের মধ্যে আরও অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে তবে থামল। আর একটা আর্ত্ত জন্তুর মতো সজোরে হাঁপাতে লাগল।

একটু সুস্থির হয়ে মকবুল যখন ফিরে এল তখন দেখল শিকারী নদীর ধারে একটা গাছের গুড়িতে বসে সিগারেট টানছে। তার এরকম নির্লিপ্ত নির্বিকার মূর্ত্তি দেখে তার খুব হিংসা হ'ল। এদিকে সে প্রাণের দায়ে ছুটোছুটি ক'রে মরছে, আর ওদিকে ও কেমন দিব্যি সিগারেট টানছে!

বাহির হইল

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা একত্রে

সম্পাদনা : ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত এম. এ., ডি. ফিল.

মধুসূদনের রচনাবলী বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাইলেও মধুসূদন-চর্চার সুবিধার জন্য তাঁহার সমগ্র রচনা আমরা একটী খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলাম। তাঁহার ইংরেজী রচনা এযাবৎ প্রায় অপ্রাপ্য ছিল—সেই অভাব মিটাইবার জন্য তাঁহার সমগ্র ইংরেজী রচনা, মৌলিক, অনুবাদ ও প্রবন্ধাদি এপর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই বর্তমান খণ্ডে সংযুক্ত হইয়াছে। সিটি কলেজের বাঙলাভাষার অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত এই খণ্ডটির সম্পাদনা করিয়াছেন এবং মধুসূদনের জীবনী ও সাহিত্যসাধনার কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সূচী

কাব্য	নাটক ও প্রহসন	ইংরেজী রচনা
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	POEMS
মেঘনাদবধ কাব্য	একেই কি বলে সভ্যতা?	CAPTIVE LADIE
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	OTHER POEMS
বীরাঙ্গনা কাব্য	পদ্মাবতী নাটক	RIZIA : EMPRESS OF INDE
কবিতাবলী	কৃষ্ণকুমারী নাটক	RATNAVALI
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	মায়া-কানন	SERMISTA
নানা কবিতা	হেকটর-বধ	NIL DARPAN

ডিমাই অক্টেভো আকার : ৭৪৮ পৃষ্ঠা : লাইনো টাইপে ভাল কাগজে ঝরঝরে ছাপা : মধুসূদনের ছবি ও বাঙলা ইংরেজি হাতের লেখার দুটি আর্ট প্লেট, স্বর্ণাঙ্কিত বেক্সিন বাঁধাই : সুন্দর প্রচ্ছদ

দাম পনর টাকা

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

এদিকে সিরাজ তখন ভাবছে অন্য কথা।

সে ভাবছে, অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! পাকিস্তানীটা নিশ্চয়ই মুসলমান আর সে নিজেও মুসলমান। হায়! একজন মুসলমান হয়েও সে একজন মুসলমানকে হত্যা করার জন্যে এমন ক'রে ঘুরছে! আচ্ছা, এতে কি তার গুনাহ্ হবে? একথা ভেবে তার মনটা একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু তখনই তার মনে হ'ল, দেশ বড় না ধর্ম বড়? তার বিবেক বলল, দেশই বড়। মুসলমান হ'লেও সে একজন ভারতীয় নাগরিক। আর পাকিস্তানী হ'ল ভারতের শত্রু। কাজেই পাকিস্তানীটা হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সে তার শত্রু।

পাকিস্তানের লম্বী নেতারা আজ জোর ক'রে ভারতের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। আর এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধে সভ্যদেশের রীতি-নীতি সব বিসর্জন দিয়েছে। পাকিস্তানী বৈমানিকরা নিরপরাধ নিরীহ নাগরিকদের উপর, হাসপাতালের উপর, নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ক'রছে। মন্দির মসজিদ গীর্জা গুরুদ্বার প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। শত্রুর বিমান এখনও বারে বারে এসে হানা দিচ্ছে, কাপুরুষের মতো ইতস্ততঃ বোমা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। এরা সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। এদের ক্ষমা নেই।

ভারত এক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সকলের সমান অধিকার। তাই এখানে এখনও প্রায় ছয় কোটি মুসলমান কেমন নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে বসবাস ক'রছে! তাদের অনেকেই ভারতের জন্য কামনা ক'রে মসজিদে প্রার্থনা করছে। ভারতেরই এক মুসলমান বীর আবদুল হামিদকে অনন্যসাধারণ বীরত্বের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান "পরম বীরচক্র" দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছেন এবং বীরের মতো প্রাণ দিয়েছেন।

কী এক জাদুমন্ত্রে আজ সমগ্র জাতির চিন্তা এবং উদ্যম সহসা এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে! জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের আটচল্লিশ কোটি নর-নারী এখন একই সঙ্কল্পে আবদ্ধ যেমন ক'রেই হোক মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা ক'রতে হবে। ভারতবাসীর জীবনে আজ একটি মহৎ ব্রতের উদ্বোধন হয়ে গেছে। শত্রুর মোকাবিলা ক'রতে হবে। হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, শিখ নাই, খৃষ্টান নাই, এখানে তাদের একটি মাত্র পরিচয়, তারা সকলেই ভারতবাসী। একজাতি একপ্রাণ একতা।

সিরাজ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। পেছনে একটু খস্ খস্ আওয়াজ হ'তেই সে চমকে পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পাকিস্তানীটা কখন যেন তার একেবারে পেছনে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। মকবুল তার ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল সিরাজের পিঠে। একটা করুণ আর্তনাদ ক'রে সে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর মকবুল জলের ধার দিয়ে দৌড়াতে লাগল।

সিরাজ বুঝল, তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজেকে তুলে ধরল। তারপর গুলি ক'রল।

মকবুল বেশ জোয়ান, সে তখনই পড়ে গেল না। এরকম যে হ'তে পারে, তা সে ধারণাও ক'রতে পারেনি। সে যেন বিশ্বাস ক'রতেও পারছিল না। তার হাত থেকে ছুরিটা খসে পড়ল। টলতে টলতে সে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু তার দৃষ্টি ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে এল। শেষে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তার মাথাটা পড়ল গিয়ে জলের মধ্যে। তার মনে হ'ল, মাথাটা এখনই জল থেকে তুলে নেওয়া দরকার। সে অনেকবার চেষ্টা ক'রল, কিন্তু পারল না। আস্তে আস্তে তার দেহটা স্থির হয়ে গেল।

———

একটা দিনের তরেও কাগজ ছাড়া ! ভাবতে পারেন ? ... না !

ইস্কুলের ছোট্ট ছেলে, মা, বাবা, শিক্ষক, গবেষণা-কর্মী,
দেশনেতা, ইঞ্জিনীয়ার—সকলেরই কাগজের দরকার।
তাছাড়া শিল্পদ্রব্যের প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্যে
কাগজের নিত্য নতুন কত কী প্রয়োজন।

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ খরিদ্দারদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে—
সবচেয়ে পাতলা কাগজ থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে পুরু বোর্ড
পর্যন্ত—বহু বিচিত্র ধরনের কাগজ আর বোর্ড তৈরি ক'রে থাকে।

ROHTAS

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ডালমিয়ানগর (বিহার)

খেলাধূলা

অলিম্পিক থেকে ফুটবল বাদ—

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির আমেরিকান সভাপতি মিঃ অ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ জানান যে, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন তাকে জানিয়েছে অপেশাদারী ফুটবল ফেডারেশন নূতনভাবে গঠন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, এক আই, এফ, এ অপেশাদার ও পেশাদার এই ফুটবল প্রতিযোগিতাই চালিয়ে থাকে অথচ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অপেশাদার কমিশন স্থির করেন যে, ফুটবল ফেডারেশনকে পেশাদার ও অপেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্যে পৃথক ফেডারেশন গঠন করতে হবে। সেই জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি অলিম্পিক গেমস থেকে ফুটবল বাদ দেবার বিষয় চিন্তা করছেন। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে ফুটবল প্রতিযোগিতা থাকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জামনগরে রাইফেল শিক্ষার ব্যবস্থা

গুজরাট রাজ্য রাইফেল শিকার উদ্যোগী সম্পাদক শ্রীকে. জি. প্রভু বলেন যে, গুজরাটের প্রত্যেক জেলায় একটি করে রাইফেল ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত এইসব ক্লাবে ৫ হাজার লোককে রাইফেল চালান শেখান হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, এইভাবে যদি প্রত্যেক জেলায় শেখান চলে তা হলে ১৯৬৭ সালের মধ্যে গুজরাটে ২ লক্ষ লোক রাইফেল চালনায় যোগ্য হয়ে পড়বেন। এক আমেদাবাদেই আগামী ২৭শে অক্টোবর থেকে ১৭টি রাইফেল ক্লাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকার প্রতি বছরে ২২ লক্ষ লোককে পুরুষ ও মেয়ে নির্বিশেষে সকলকেই রাইফেল শেখাবেন বলে স্থির করেছেন। এর জন্যে যত গুলি লাগবে তাও প্রত্যেক রাইফেল ক্লাব যাতে কমদামে পায় তারও ব্যবস্থা করবেন।

পর্ব্বতারোহণ শিক্ষায় বাঙালী মেয়ে

এবছর দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের বার্ষিক কোর্সে কলকাতার চারজন মেয়ে যোগ দিচ্ছেন : নীলাঞ্জনা সরকার, ইন্দিরা বিশ্বাস, সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ও সুজয়া গুহ।

ডেভিস কাপ

অষ্ট্রেলিয়ার লন টেনিস এসোসিয়েশন ঠিক করেছেন যে, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনাল ভারত ও স্পেনের খেলা আগামী মাসে স্পেনের বার্সিলোনা শহরে হবে। ভারত কলকাতাতে খেলবার ব্যবস্থা করবার যে অনুরোধ করেছিল তা তারা অনুমোদন করেনি।

ইরাণের মন্ত্রীর দল ভারতে এলে তাদের সঙ্গে কয়েকটি প্রদর্শনী লড়াই হবে। সেইসব লড়াই-এর খেলা দেখে তারপর ঐ ৮জনকে মনোনীত করা হবে।

ডিসকাস ছোড়ার নূতন রেকর্ড

চেকোশ্লোভাকিয়ার এথলেট লুডভিক ডানেক ডিসকাস ৬৪ মিটার ২২ সেন্টিমিটার দূরে ছুড়ে নূতন বিশ্বরেকর্ড করেছেন। এর আগের রেকর্ড ছিল ৬৩ মিটার ৪৫ সেন্টিমিটার। ঐ রেকর্ডও ডানেক করেন গত বছর আগষ্ট মাসে।

টেবিল টেনিসে এশিয়ার প্রাধান্য

ইউরোপের আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা এই মাসেই আরম্ভ হবে। ডাচ, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রেলিয়ার ওপেন টুর্নামেন্টও আরম্ভ হবে। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবর যে, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের টেবিল টেনিসের মানের অনেক তফাৎ। জাপান ইউরোপের বহু চ্যাম্পিয়ানদের পরাজিত করে ১৩ বছর আগে বোম্বাইতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তারপর তাদের প্রাধান্য চলে আসছিল। এরপর এল চীন। গত এপ্রিলে যুগোশ্লাভিয়ায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চীন ৪টি বিষয়ে বিজয়ী হয়। বাকী ২টির গৌরব পায় জাপান। এশিয়ার একতরফা প্রাধান্য বজায় থাকে। প্রাক্তন ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন ও ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন ভিক্টর বার্ণী বলেছেন যে, টেবিল টেনিসে এশিয়ার পিছনে অনেক দূরে অন্যান্য মহাদেশ।

ইউরোপিয়ান এথলেটিকসে রাশিয়ার সাফল্য

ইউরোপিয়ান এথলেটিক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি, ষ্টুটগার্ট সহরে শেষ হল। পুরুষ বিভাগে বিজয়ী হল রাশিয়া। ষ্টেডিয়ামের চারদিকে রাশিয়ার অধিনায়ক পিয়োত্র বলতনিকভ "গোল্ড কাপ" নিয়ে মার্চ করলেন। গোল্ডকাপে রাশিয়ার নাম খোদাই হল। রাশিয়া ও ফেডারেল জার্মানির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল। শেষ বিষয় ৪×৪০০ মিটার দৌড়। প্রতিযোগী ছয়টি দেশ। রাশিয়ার এথলেটদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাই তাদের সাফল্য এনে দিল। ফেডারেল জার্মানি হল দ্বিতীয়। ইউরোপিয়ান কাপে এথলেটিক প্রতিযোগিতা এই প্রথম। নূতন পদ্ধতিতে এবারে প্রতিযোগিতা হয়। রাশিয়া, ফেডারেল জার্মানি, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, ডিমক্রেটিক জার্মানী ও বৃটেন যোগ দেয়। প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক দেশের থেকে একজন করে প্রতিযোগী থাকে। হিট না করে একেবারে ফাইন্যাল করা হয়।

জাতীয় জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতা

৪ঠা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বোম্বাইয়ের প্যারেলে জাতীয় জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সময় তৃতীয় মালখাম প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। সার্ভিসেস দল ছাড়া নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই যোগদানের সম্মতি জানিয়েছেন—পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, কেরালা, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজ।

ওয়ার্লড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

বৃটেনে আগামী বছর, ওয়ার্লড কাপ সিরিজের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এই ব্যাপারে এখনই বিশ্বের সকল দেশের ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। অক্টোবরের

সোভিয়েত দেশ

"……চাষা-ভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে।

এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কি আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।" —সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

আপনি কি জানেন ???

আজ বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি, শিল্প ও কারুবিজ্ঞানের প্রগতির কোন দিগন্তে সোভিয়েত জনগণ পৌঁছেছে?

আপনি কি জানেন ???

লেনিন, পুশকিন, তলস্তয়, নিজামি, গোর্কী, গাগারিন, ভালেন্তিনা, তেরেশকোভা-নিকোলায়েভার দেশ সম্পর্কে সবকিছু?

আপনি কি জানেন ???

শান্তি ও স্বাধীনতা-কামী সোভিয়েত জনগণ আজকের বিশ্বঘটনাবলীকে কি চোখে দেখছেন?

আর আপনি কি জানেন ???

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রতীক ও ভারতের প্রগতির দিকচিহ্নস্বরূপ দুর্গাপুর, রাঁচি, শিবসাগর, বালিমেলা, বারাউনি প্রভৃতি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে?

এই সমস্ত এবং আরও অনেক কিছু জানতে হলে, পড়ুন—

সোভিয়েত দেশ

সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা—ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর মুখপত্র এবং সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে জানার এক বাতায়ন—বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া সহ ১২টি ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজী ও নেপালী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা।

চাঁদার হার (১৫ই অক্টোবর থেকে)

	এক বছর	তিন বছর
বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও নেপালী ভাষা সংস্করণ	টাঃ ৫·০০	টাঃ ১০·০০
ইংরাজী সংস্করণ	টাঃ ৬·০০	টাঃ ১২·০০

॥ আজই গ্রাহক হোন ॥

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :— **সোভিয়েত দেশ**

১১১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পাক
ভারত
সংঘর্ষ

আমরা আমাদের কৃষকদের জন্য গর্ব বোধ করি। তাদেরই হাতের ছোঁয়ায় শস্য জন্মায়। খাদ্য চাই আমাদের সীমান্তরক্ষী জোয়ানদের জন্য, কারখানার শ্রমিকদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য। উত্তরোত্তর আরো ফলন চাই। এই ভাবেই আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব। আমাদের কৃষকরা জানে যে খাদ্য আমদানীতে আমরা যত কম খরচ করব, আমাদের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার কাজে তত বেশী ব্যয় করতে পারব। কৃষকরা সমগ্র জাতির সেবায় রত। আপনিও তো তাই?

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

DA 65/FT Bengali

আমাদের জন্মভূমি—ভারতবর্ষ

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মানব-সভ্যতা যখন নিতান্তই শৈশব-অবস্থায়, বেশির ভাগ দেশই যখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে রক্তাপ্লুত হানাহানিতে লিপ্ত, তখন ভারতের তপোবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল শান্তির অমৃত-বাণী: "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্"; ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারো ধন আকাঙ্ক্ষা করবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখা গেছে দরায়ুস, আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, এটিলা, চেঙ্গিস খান এবং হৈমুবলদের মতো রক্তপিপাসু সম্রাট বা সেনাপতি। একমাত্র ভারতের মাটিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রিয়দর্শী অশোক। পৃথিবীর পরাক্রান্ত সম্রাটদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না, যুদ্ধের পথ মানব-জাতির কল্যাণের পথ নয়। তাই তিনি করুণা ও মানবতার প্রতিমূর্তি বুদ্ধের অহিংসা, শান্তি, আর মৈত্রীর বাণী প্রচার করলেন ভারতে এবং ভারতের বাইরে।

সম্রাট অশোকের পরে শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষগণও প্রচার করলেন প্রেম-ধর্ম। ঘৃণা, দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষপূর্ণ জগতে তাঁরা নিয়ে এলেন ভ্রাতৃত্ব, প্রেম এবং ঐক্যের আদর্শ। উনবিংশ শতকে এই ভারতবর্ষ থেকেই একদিন ঋষি রামকৃষ্ণ এবং তাঁর বিশ্ববিশ্রুত শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর সামনে আবার তুলে ধরলেন মানুষের ঐক্যের আদর্শ, প্রচার করলেন প্রেম ও মৈত্রীর বাণী। বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ভারতবাসীর মনে সেদিন সঞ্চারিত করলো আত্ম-প্রত্যয়, ও শক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহ। সেদিন বিবেকানন্দই ভারতের শান্তি-মন্ত্র ও মৈত্রীর বাণী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একেকে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব।" পররাজ্য গ্রাস কিংবা অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ ক'রে উপনিবেশ স্থাপন কখনোই ভারতের লক্ষ্য ছিল না বা আজও নয়। জাতিতে-জাতিতে, মানুষে-মানুষে বিভেদ দূর ক'রে প্রেম ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ বিশ্ব-পরিবার গঠনই ছিল ভারতের স্বপ্ন। তাই সে সারাজগতে একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বপ্রেমের বার্তা, মিলনের মন্ত্র। যুগে-যুগে বিশ্ব-মানবের সংঘর্ষ সাধনের স্বপ্ন দেখেছে এই ভারতবর্ষই। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' সেই আদর্শেরই আধুনিক প্রতিচ্ছবি।

একদিন সমস্ত এশিয়াকে বুকে ক'রে রেখেছে ভারতবর্ষ। এক দেশ অন্য দেশের উপর অন্যায় নিপীড়ন করলে তার প্রতিবাদে সে হয়েছে মুখর। নিজে মুক্তিলাভ ক'রেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, যে-দেশেই মুক্তিকামী মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, তাকেই ভারত জানিয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। যে চীন অতর্কিতে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ভারতকে আক্রমণ করেছে, সেই চীনের

বিশ্ব যখন অযুক্ত হয় তখন ভারতই তাকে জানিয়েছিল আন্তরিক অভিনন্দন ; চীন যাতে রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য-পদ পায় তার জন্য ভারতই বারবার দরবার করেছে রাষ্ট্রসংঘের কাছে। যে ইন্দোনেশিয়া পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় ভারতের শত্রুতাচরণে উদ্যত হয়েছিল সে দেশের মুক্তি-সংগ্রামীরা একদিন উদ্দীপনা পেয়েছিল এই ভারতেরই মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে। বহুদিন ধ'রে বিদেশী শক্তির শোষণ আর শাসনে জর্জরিত আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি যখন একের পর এক স্বাধীনতা অর্জন ক'রে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে শোভা পেতে লাগলো, তখন তার প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিলো ভারত। সুয়েজ, কঙ্গো, হাঙ্গারী প্রভৃতিকে নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তাতে ভারত ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করেছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে। এখনো ভিয়েৎনামে মার্কিন-নীতির সে তীব্র বিরোধিতা করছে, নিজের স্বার্থকে বিপন্ন ক'রেও। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা, ভারত চিরদিনই ন্যায় ও সত্যের পূজারী, অন্যায় ও অসত্যের বিরোধী। এই হল আমাদের জন্মভূমি—ভারতবর্ষ। তার বুকে যদি কেউ অস্ত্র হানে তবে সে আঘাত শান্তির ও অহিংসার-বুকে হানারই সমান। আজ তাই ঘটেছে। পাকিস্তান অন্যায়ভাবে ভারত আক্রমণ করেছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা আক্রমণকারী পাকিস্তানকে প্রতিহত না ক'রে তাকে সাহায্য করতে তৎপর হ'য়ে উঠেছে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র। তাহলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আজ কোথায়! অন্যায় ক'রেও যদি কোনো রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে প্রশ্রয় পায় তবে কি পৃথিবীকে চরম সর্বনাশের পথেই ঠেলে দেওয়া হবে না? তবে বিশ্বশান্তি আসবে কোন পথে? বিশ্বশান্তির কথা শুধুই মৌখিক ; এতটুকু আন্তরিকতা তাতে নেই তাই বুঝতে হবে না কি? কিন্তু যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে বিশ্বশান্তির আশায় কুঠারাঘাত করছে, সেই সব রাষ্ট্রের জেনে রাখা উচিত যে ভারত শান্তি চায়, চিরদিনই সে শান্তির পূজারী, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বপরিবারে তারই স্বপ্ন। কিন্তু সে দুর্বল নয়। তার শক্তি অসীম, তার সম্ভাবনা অনন্ত। আজ শুধু সে সুপ্ত। যেদিন সেই অগ্নি-গিরির সুপ্তি ভঙ্গ হবে সেদিন সমগ্র পৃথিবী জানতে পারবে, সে মৃত নয় সে জীবিত।

আর, আজ দেশবাসীকে আমরা বিশেষকরে বলবো যে, ভিক্ষা ক'রে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। ভিক্ষুক চিরদিনই ভিক্ষুক থেকে যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশ যদি অন্নে-বস্ত্রে, অস্ত্রে—স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হতে পারে তার চেয়ে দুঃখের ও লজ্জার কথা আর কিছু হতে পারে না, তবে কোনোদিনই ভারতবাসী প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না, পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ভারতের গৌরব হিমালয়ের চূড়ার মতোই তুঙ্গ, তার জ্ঞান-গরিমা ভারতমহাসাগরের মতোই গভীর। গরীয়ান তার সভ্যতা। কিন্তু সেই চেতনা আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি ; আমরা আজ আত্মবিস্মৃত। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত, জন-সংখ্যা প্রচুর। এই দু'য়ের সমন্বয়ে ভারত সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কেবল আত্মপ্রত্যয়কে ফিরে পাওয়া ও ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার আজ প্রয়োজন, কিন্তু সেই বিষয়ে আমরা উদাসীন।

আর উদাসীন বা অলস থাকলে চলবে না। আত্ম-প্রত্যয় আর আত্মসম্মান আমাদের ফিরে পেতেই হবে। আমরা অজর, আমরা অমর, অনন্ত শক্তির উৎস। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একদিন এই দেশের যুবকেরাই এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর এক হাতে গীতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লে আজো যুবকদের দলে

দলে আত্মাহুতি দিতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বহ্নি জ্বালাতে হবে অন্তরে, আসন্ন হিমাচল সমর ভারতে জাগিয়ে তুলতে হবে এক প্রচণ্ড আলোড়ন, এক বিপুল তপস্যার মোমশিখা। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষা ক'রে কখনো আত্মমর্যাদা কিংবা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। তাই আমাদের সর্বপ্রথম হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র সব উৎপাদন করতে হবে নিজেদের দেশে। তা হলেই ভারতবর্ষ মহাশক্তিতে রূপায়িত হবে, তখন পৃথিবীর কাছে আমরা সসম্মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। আর সেদিন ভারত শান্তির পথ, মৈত্রীর পথ ক'রে তুলবে আরো সুগম। মহাভারতের সেই স্বপ্ন সার্থক হ'লে শুধু এশিয়াতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে নেমে আসবে চিরস্থায়ী শান্তি। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত দেশ মিলে গ'ড়ে উঠবে এক আদর্শ বিশ্ব-পরিবার, আর সেই সংগঠনের পথ-প্রদর্শক হবে আমাদেরই পবিত্র জন্মভূমি ভারতবর্ষ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—বন্দেমাতরম্।

• • • •

রোমান কারমেন ডকুমেন্টারি ছবির পরিচালক হিসেবে ভারতে সুপরিচিত। ১৯৫৮ সালে তিনি ভারতে এসে এখানে দীর্ঘকাল থেকে "ভারতের আকাশে নব সূর্যোদয়" (ডন ওভার ইণ্ডিয়া) নামে একটি সুন্দর রঙিন ডকুমেন্টারি ছবি তোলেন। স্বাধীন ভারতের নতুন এক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার কাজে জনগণের প্রয়াসই ছিল এই ছবিটির বিষয়বস্তু। কিউবা ও ঘানার নতুন জনজীবন সম্পর্কে কারমেনের তোলা দুটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

কারমেনের সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি এই "দেশরক্ষার মহাযুদ্ধ" ছবিটিতে ১৯৪১ সালের ফিনল্যাণ্ড কৌজের আকস্মিক ভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের সময় থেকে সোভিয়েত কৌজের ১৯৪৫ সালে বার্লিন দখল পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে যেসব সোভিয়েত সাংবাদিক, সামরিক রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ও চলচ্চিত্র—ক্যামেরাম্যান যুদ্ধের ছবি ও নিউজরীল তুলেছিলেন, কারমেন সেই ছবিগুলির অংশ বাছাই করে, পরপর লাগিয়ে, ধারাবিবরণী সহ এই ছবিটি উপস্থিত করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ২৩৬ জন সোভিয়েত ক্যামেরাম্যান রুশে গিয়ে মোট প্রায় ১৬ লক্ষ মিটার নিউজ-রীল তুলেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে ৪০ জন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এই সমস্ত নিউজ-রীলের নির্বাচিত অংশই কারমেন এই ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। সেই সঙ্গে, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়গুলির মুহাফিজখানার রক্ষিত নিউজ-রীল থেকে এবং কতকগুলি মার্কিন নিউজ-রীল সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ থেকে কারমেন যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ছবিটির প্রারম্ভে এইসব বিদেশী সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করা হয়েছে। ছবিটির ধারাবিবরণী রচনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সের্গেই খিরনক।

SO BRIGHT, SO WHITE!

It is a real pleasure to wear clean and white clothes. Always wash your clothes with CHANDNI Washing Soap and feel the difference

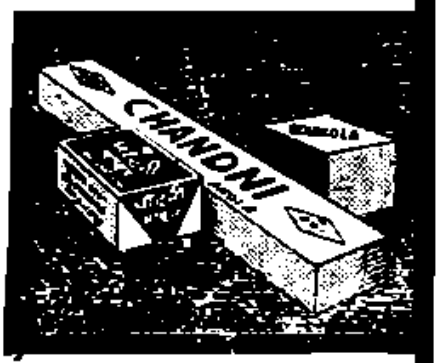

CHANDNI

Washing Soap

BERAR OIL INDUSTRIES,
Akola - Maharastra

FP/CI 463

সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরং তাকে জটিলতর করবে

কয়েকদিন আগে 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, কাশ্মীরে গণভোটের কথা তোলা আর উচিত হবে না। সত্যি বলতে কি, মার্কিন দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই আজ এই মত ঘোষণা করেন। আসলে গণভোটের ধুয়ো শুধু পাকিস্তানীরাই তোলে এবং এই ধুয়ো তোলার আসল মতলব হল, কাশ্মীর গ্রাস।

প্রকৃতপক্ষে, গণভোট রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ বলে কখনই কোথাও স্বীকৃতি পায় নি। আন্তর্জাতিক আইনে গণভোটের কোন স্থান-ই নেই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যাবে গণভোটের দাবি কোথাও তেমন স্বীকৃতি পায়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এবং দু'চারটি ক্ষেত্রে যদিও বা এ দাবি গ্রাহ্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও গণভোট সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা সমস্যাকে আরও জটিল করে দিয়েছে অথবা নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

জনসাধারণ বা কোন বিশেষ এলাকার ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের যুগে। তখন গণভোটের প্রয়োগ হয়েছিল জয়-করা পররাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্যে। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস সে গণভোটকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেন। ১৮৪৮ সালে পুনরায় ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদীরা গণভোটের দাবি তোলেন। ইওরোপে একাধিকবার গণভোটের দাবি তোলা হয়েছে—গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করা হয়েছে, গণভোটের নামে পররাজ্য দখল করা হয়েছে।

কূটনীতিক রাজনীতিকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতাগণ কর্তৃক নিন্দিত এবং বিশ্ববাসী কর্তৃক বিস্মৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নাম দিয়ে নতুন করে এই গণভোটের দাবি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ও কয়েকবার তোলা হয়েছিল। কিন্তু সংযুক্ত শক্তি-গোষ্ঠী সে কথায় কান না দিয়ে তাদের গোপন চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মেসপটামিয়াকে ভাগ করে নিল।

বিংশ শতাব্দীতে গণভোট

গণভোট নীতির সর্বাধিক অপব্যবহার হয়েছিল ১৯১৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে।.....এখানে বিজেতারা বিজিতদের ভূমি-দখলের হাতিয়ার হিসেবে এই নীতির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিল। যেখানে গণভোট হলে এলাকা দখলের কোন সম্ভাবনা ছিল না সেখানে গণভোটের নাম উচ্চারণ করা হয়নি। অথচ যেখানে আশা ছিল সেখানে তা মহা উল্লাসে করা হয়েছিল। কোন কথাবার্তা না করেই তাই আলসেস লোরেনকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদিকে অষ্ট্রিয়া যেখানে গণভোটের দাবি তুলেছিল সেখানে তা করা হয়নি। কেন না বিজয়গোষ্ঠী এ নীতিকে তখন অবান্তর মনে

করেছিল। পূর্ব ইওরোপের অন্যত্রও ঐ সময় গণভোটের কোন দাবি গ্রাহ্য করা হয় নাই অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে সে কথা চাপা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকাতেও এই গণভোটের ব্যাপারে একাধিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণভোট গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

গণভোট আদর্শের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, গণভোট সমস্যার সমাধান ঠিক করতে পারে না। উপরন্তু নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে অথবা সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে। আসলে গণভোট গ্রহণের উপযুক্ত পন্থা এখনো পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি। গণভোট প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি করে এবং উৎকোচে প্রশ্রয় দেয়। নানা রকম সন্ত্রাস ও ভীতিপ্রদর্শন শুরু হয়। কাজেই ভোটদাতারা তাদের মনের ইচ্ছার পরিবর্তে তাদের ভয় ও লোভের স্বাক্ষর দিয়ে যান। গণভোটে জনসাধারণের ইচ্ছা ঠিক ঠিক জানা যায় না। তার প্রধান প্রমাণ হল সারল্যাণ্ডের গণভোট। ১৯৩৫ সালের গণভোটে সারল্যাণ্ড জার্মানীর হাতে ফিরে যায়। ১৯৪৭ সালে তারা ফ্রান্সের পক্ষে ইচ্ছা জানায় এবং ১৯৫৭ সালে 'আন্তর্জাতিকরণ' প্রত্যাখ্যান করে সারল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষে রায় জানায়।

কৃত্রিমভাবে বিখণ্ডিত জাতির একীকরণে সাধারণ নির্বাচনের কথা বলা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তা সম্ভব হয় না। পটসডাম চুক্তিতে ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাই আজো জার্মানী বিভক্ত, কোরিয়া বিখণ্ডিত এবং ভিয়েতনামময় মারমুখী। কাজেই দেখা যায় যে, গণমত জানার রাস্তা হিসেবে গণভোট গ্রহণ এ-যুগে অবান্তর হয়ে গেছে।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে নতুন করে জড়িয়ে ফেলে গণভোটের দাবি তোলা। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী খুব ন্যায়সংগতভাবেই ভারত তার সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য। সেখানে গণভোটের প্রশ্ন তোলা মানে আমাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা। সিংহলের তামিলরাও গণভোটের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলতে পারে। তাহলে তো ঠিক এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ গণভোটের দাবির হুঙ্কার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে তুলবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে কি লেবানন বলে কিছু থাকবে? কুর্দদের ঐ অধিকার দিলে কি ইরাক, ইরান বা তুরস্কের মানচিত্র আজকের মতন থাকবে? তাহলে তো ইয়েমেনের শিয়া, সুলতানের ওমান, আলজিরিয়া বা মরক্কোর বারবারদেরও ঐ অধিকার দিতে হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে আফ্রিকার কী একটিও দেশ থাকবে?

বিশ্বের তথা ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণভোটের কথা আর উঠতেই পারে না এবং পরিস্থিতি পরিবর্তিত সে কথা রাষ্ট্রসংঘও স্বীকার করেন। অন্যথা স্পেন এই আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য হতে পারত না। গণভোট আজ অচল। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ওপেনহেইম বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক নীতির প্রয়োজনে গণভোট কখনও যেমন অত্যাবশ্যক কখনও আবার তেমনি অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয়।

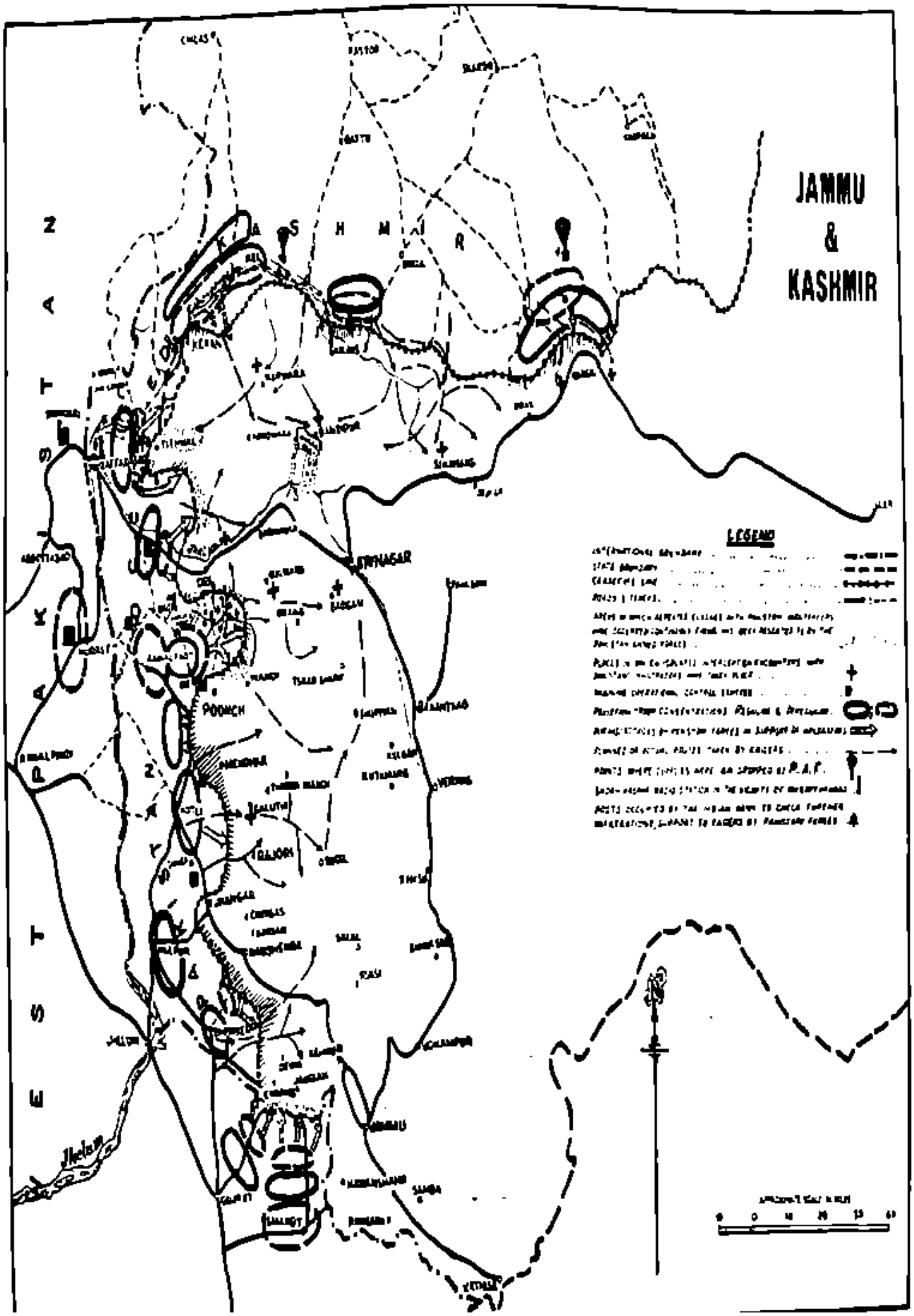
JAMMU
&
KASHMIR
LEGEND
SRINAGAR
POONCH
RAJOURI
JAMMU
KATHUA
SAMBA
KUPWARA
BARAMULLA
KARGIL
LEH
Jhelum

একটি বিরাট ষড়যন্ত্র

পশ্চিমী শক্তিগুলির আশা ছিল, পাকিস্তান কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি শক্ত খুঁটি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সে আশা যে নিতান্তই দুরাশা তা খুব পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। গত তিন বছরে পাক-চীন বাণিজ্যের রেকর্ড দেখেও তারা সে আশা ছাড়তে ইতস্ততঃ বোধ করছিল। পাকিস্তান কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছে, সীমান্ত চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং অসামরিক বিমান চলাচল ও দূর পাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয়, চীনের কাছে সাহায্যও গ্রহণ করেছে। অবশ্য এতদিনে অন্তত সবাই বুঝতে পারছেন যে, এই পাক-চীন আঁতাতের অন্তরালে একটি বিরাট ষড়যন্ত্রকে ঢেকে রাখা হচ্ছে এবং পাকিস্তান ও লাল চীনের সাম্প্রতিক কয়েকটি উক্তি ও চলতিতে তা ক্রমেই প্রকট হয়ে পড়ছে। এই ধরণের দু'চারটি বিবৃতি থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় পাক সরকার বলেছিল যে, সে রাষ্ট্রসংঘের সনদ নয় এমন দেশসহ প্রায় সব দেশের কাছেই সাহায্য চেয়েছে। "রাষ্ট্রসংঘের সনদ নয় এমন" বলতে চীন ও ইন্দোনেশিয়াকেই মনে পড়ে।

নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টো স্পষ্ট ভয় দেখিয়েছিলেন যে, সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে—অর্থাৎ চীন এ যুদ্ধে তার নোঙরা নাক গলাতে পারে। আবার ভারত-পাক সংঘর্ষে পাকিস্তানকে সমর্থন জানানর জন্যে পাক সরকার চীনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

হাথে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে করাচীতে চেন-ইর হঠাৎ উপস্থিতি .....

এবং তারপর ৭ই সেপ্টেম্বর চীনা সরকারের প্রকাশ্যে সমর্থন।

আগেও চীনা ও পাকিস্তানী নেতারা একাধিক বিবৃতিতে পাক-চীন অশুভ আঁতাতের ইঙ্গিত দিয়েছিলো। এই আঁতাত হল ভারত বিরোধী। ভারত বিদ্বেষীতার জন্যে পাকিস্তান ঐ আঁতাতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু চীন এ আঁতাত গড়েছে অন্য মতলবে। সে মতলব হল সারা এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার।

মিঃ ভুট্টো কিছুদিন আগে বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হলে এশিয়ার বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য করবে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য উপমন্ত্রী বলেছিলেন, যদি কোনদিন পাক-ভারত যুদ্ধ হয় তবে চীন নিশ্চয়ই পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। ভারতকে নয়।

১৯৬৪ সালের ৭ই মার্চ পাকিস্তান সফরের সময় মার্শাল চেন-ই পাক সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, চীন-ভারত বিরোধের সময় পাকিস্তান চীনকে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেকথা চীন কখনও ভুলবেনা। "আসুন আমরা আপনাদের ব্যর্থ করবো না।"

এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সম্মেলনে চীন যে নীতি সমর্থন করেছিল তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে চীন ভারতকে হুমকী দিয়ে সিকিম সীমান্ত লংঘন করে আক্রমণাত্মক কাজ আরম্ভ করে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রেডিও পিকিং থেকে চৌ-এন-লাইয়ের এক ঘোষণা প্রচারিত হয়। তাতে চৌ বলেছেন যে, চীন পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানকে সমর্থন করবেন এবং কাশ্মীরিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। মিঃ ভুট্টো রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বলেন যে, চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য না হওয়া পর্যন্ত এশিয়া সম্পর্কিত কোন আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ শক্তিহীন হয়ে থাকবে।

চীনা একনায়কত্ব পাক একনায়কত্বের সঙ্গে আঁতাত করে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে অধিকার বিস্তারের ষড়যন্ত্র করে চলেছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আজও যদি বাস্তব বিমুখী হয় তবে তারা বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যেমন তারা চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়া দখলে সাহায্য করে। তখন হিটলারের দাবী ছিল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

আজ পাকিস্তানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করা হলে পাকিস্তানের অস্তিত্বই বানচাল হয়ে যাবে। ১৯৭০ সালের তথাকথিত সাধারণ নির্বাচনে ১৯৫৬ সালের ভারতীয় আইন অনুযায়ী মাত্র ২১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ভোট দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। তবুও ফলাফলে দেখা যায়, মোট ভোটদাতাদের ৩৩ শতাংশ জিন্নার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও জিন্নার সমর্থকরা ভারত বিভাগের দাবী জানায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মাত্র ১৬ শতাংশ মুসলমান দেশ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, পাখতুনিস্থান, বালুচিস্থান, কালাত, সওয়াত এবং চিত্রলবাসীরা ভোট দেয়নি। আজ পাকিস্তানের একনায়কেরা মাত্র ১৬ শতাংশ ভোটের জোরে ৭ কোটি পূর্ববঙ্গবাসী, পাখতুনিস্থান প্রভৃতি দেশের ওপর আধিপত্য চাপিয়ে দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের লোকদের পাকিস্তানী কলোনীতে থাকতে চান কিনা তা স্থির করবার অধিকার কেন দেওয়া হবে না? পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন-ভাবে বাঁচবার দাবী তুলেছেন। পাখতুন এবং বালুচরাও বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে।

চীনও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমর্থন করে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। চীন নিজে তিব্বত, পূর্ব তুর্কিস্থান এবং মঙ্গোলিয়ায় কলোনী করে বসে আছে। চীনা তুর্কিস্থানের কাজাক মুসলমানেরা চীনের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাকিস্থানে হাজারে হাজারে যাচ্ছে। চীন সব সময় বলে বেড়ায়, সে দেশে কোন জাতি বিদ্বেষ নাই। সংখ্যালঘুরা নিরাপদ। তা যদি হয় তবে কাজাক মুসলমানেরা কেন পালিয়ে যাচ্ছে? চীন এই এলাকাতেই আণবিক বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করেছে। এই অঞ্চলের লোকেরা গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চীন আসলে উইগুর এবং কাজাক মুসলমানদের বিশ্বাস করে না। চীনের মূল ভূখণ্ডে জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য চীন চাপ দিয়ে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে সেখানে হানদের এনে বসাচ্ছে। চীনা তুর্কিস্থানে কাজাক মুসলমানদের সংখ্যা ৮৫ ভাগ হলেও ক্রমে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে হানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে।

চীন তিব্বতেও একই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গত ১৫ বছর ধরে চীনা সৈন্যরা তিব্বতীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৭০ হাজার তিব্বতী তিব্বত থেকে পালিয়ে এসেছে।

তিব্বতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। বস্তুতঃপক্ষে বৌদ্ধধর্মকে প্রায় লুপ্ত করা হয়েছে। তিব্বতীদের সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং নির্বিচারে হত্যা ও গ্রেপ্তার করে তাদের ঘুমিয়ে রাখা হয়েছে। তিব্বতী ছোট ছেলেমেয়েদের হাজারে হাজারে চীনে নিয়ে গিয়ে পাকা কমিউনিষ্ট বানানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে হানদের তিব্বতে এনে বসানো হচ্ছে। চীন উপনিবেশিকদের সবরকম নিম্নস্তরীয় কাজই তিব্বতে করছে।

আজ ইনার মঙ্গোলিয়ায় মঙ্গোলিয়ানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে। এখানে এখন হানদের এনে বসানো হয়েছে।

চীনের মোট সীমানা ৪০ লক্ষ বর্গমাইল। তার মধ্যে চীনের জমি হচ্ছে সাড়ে ১০ লক্ষ বর্গ মাইল। বাকী জমি হচ্ছে তার কলোনী। যে চীন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমর্থন করছে, আজকে তাকেই তার কলোনীগুলিতেই এই অধিকার দিতে বলা হোক। এখানে চীন হিটলারের মতই কাজ করছে। চীন নিজেকে মার্কসবাদী বললেও আসলে দেখা যাচ্ছে নিজের সুবিধা অনুযায়ী সে মার্কসবাদকে সাজিয়ে নিয়েছে। রাশিয়াকে সে শোধনবাদী বলে গালাগাল করছে। চীন যেমন ভারতকে ধ্বংস করবার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তেমনিই বিশ্ববাসীর হতাশতকে অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য চালাচ্ছে। প্রকাশ্যে এ বাণিজ্যের কথা অস্বীকার করলেও ১৯৬০ সাল থেকে এ বাণিজ্য চলছে। ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায়, চীনের সঙ্গে তার বাণিজ্যের পরিমাণ কয়েক লক্ষ পাউণ্ড। অবশ্য এখন চীনকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাণিজ্যের হিসাবে চীনের কোন উল্লেখ করা হচ্ছে না। গত দুই বছরে দক্ষিণ আফ্রিকা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হংকংয়ে স্থায়ী বাণিজ্য কমিশনার নিযুক্ত করেছে।

আফ্রিকার দেশগুলি চীনের এই দুইমুখো নীতি বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে গিয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চীন এবং পাকিস্তান উভয়েই নীতির দিক দিয়ে অসৎ এবং কপট। পাকিস্তান কোনদিনই কমিউনিজিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী নয়।

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য
প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়।
সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের
ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায়
রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর
হিমসার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ
পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

হিমসার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

ভারতের উপর পাকিস্তানের হামলার
ঘটনাপঞ্জী
১৯৬৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৬৫

রাষ্ট্রপুঞ্জের 'নিরাপত্তা' পরিষদ ভারত এবং পাকিস্তানকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দেয় এবং এই আদেশের আগে দু'দেশের সৈন্য যেখানে ছিল সেখানে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে।

কচ্ছ এলাকাতে পাকিস্তানী বিমান শুজবাটের মুখ্যমন্ত্রী বলবন্ত রায় মেহতার বিমানবাহিনীকে ভূ-পাতিত করে।

লাহোর খণ্ডে ভারতীয় বাহিনী আকাশ-যুদ্ধে একখানি পাকিস্তানী এফ-৮৬ সেবার জেট ভূ-পাতিত করে। বাকির যুদ্ধে পাকিস্তানের সর্বপ্রথম ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার। ওই ক্ষেপণাস্ত্র 'স্যাটো'র নামাঙ্কিত।

চৌম্বিক এলাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর মিস্টার বিমান শত্রুপক্ষের ১২খানি ট্যাংক এবং প্রচুর সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করে। শিয়ালকোট খণ্ডে ভারতীয় বিমানবাহিনী ওই সময় স্থল-বাহিনীকে রক্ষা করছিল।

ভারতীয় রক্ষা বাহিনী কর্তৃক হুসেনওয়ালা খণ্ডে শত্রুপক্ষের দু'খানি পেরমান ট্যাংক দখল। দখল করার সময় দু'টি ট্যাংকই ছিল সচল অবস্থায়।

বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলায় আম্বালা জেলায় একটি গ্রামে শত্রুপক্ষের একখানি বিমান বিধ্বস্ত, অন্য একখানি অমৃতসরে ভূ-পাতিত।

পাকিস্তানী বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত হাজার পাউণ্ড ওজনের দু'টি বোমার আঘাতে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের বেড়শ বছরের পুরোনো সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত।

বে-সামরিক এলাকায় পাকিস্তানের বে-পরোয়া বোমা বর্ষণ।

যোধপুরে দু'বার পাকিস্তানী বিমানের হানা।

পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে ওই অস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। কারণ এবার সে খোলাখুলিই জানিয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের

সংযোজন—০

বিরুদ্ধে মার্কিনী অস্ত্র ব্যবহার থেকে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকসভায় এক ভাষণে এ-কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং।

ব্রিটেন যে ভারতকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ ক'রে দিয়েছে তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চ্যবন অন্যায় ব'লে বর্ণনা করেছেন।

সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৬৫

অম্বু-শিয়ালকোটে ভারতীয় অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে বোমা ফেলতে এসে পাকিস্তানী সেবার জেটগুলি মুচেতগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে নিজেদের এলাকাতেই বোমা ফেলে যায়।

অম্বুর বে-সামরিক এলাকায় পাকিস্তানী বিমানের হানা।

যে ষষ্ঠ আর্মাড ডিভিসনের উপর পাকিস্তানের প্রায় অবিচল আস্থা ছিল অম্বু-শিয়ালকোট খণ্ডে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে তার পর্যুদস্ত অবস্থা।

ভারতীয় ক্যানবেরা বিমানের আক্রমণে কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তের ২০ মাইল উত্তরে বাদিনে অবস্থিত পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটির প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি ও সেখানকার রাডার যন্ত্রটি বিকল।

সারগোধা বিমান-ক্ষেত্রের উপর আবার ভারতীয় বিমানের আক্রমণ।

বার্মার-সিন্ধু এলাকায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গাদরা রোড স্টেশনের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ডালি শহর ভারতীয় বাহিনীর অধিকারে।

শিয়ালকোট খণ্ডে শত্রুপক্ষের আরো কুড়িটি ঘাঁটি ভারতীয় বাহিনীর দখলে।

লাহোর খণ্ডে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে শত্রুপক্ষের ১৫টি ট্যাংক ধ্বংস।

ভারতীয় বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে ছ'খানি পাক ট্যাংক ধ্বংস এবং ছ'খানি অক্ষত!

ভারতীয় বিমানের আক্রমণে জগোয়ান এলাকায় শত্রুপক্ষের ছ'খানি ট্যাংক ও ছ'খানি সাঁজোয়া গাড়ি বিধ্বস্ত।

সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৬৫

লাহোর খণ্ডে আকাশ-যুদ্ধে পাকিস্তানী বিমান ভূ-পাতিত।

বার্মার এলাকায় গাদরা রোড এবং গাদরা শহরের উপর তিনবার পাকিস্তানী বিমানের বোমা বর্ষণ।

ওয়াগা সীমান্তে বহু গ্রামে বে-সামরিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে কিছু সশস্ত্র সৈন্য রেখে পাকিস্তানী বাহিনীর পলায়ন।

কুচবিহার সীমান্তে ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর গুলিবর্ষণ।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর, জলন্ধর এবং লুধিয়ানা জেলায় বে-সামরিক জনসাধারণের উপর পাক-বিমানের বেপরোয়া বোমা বর্ষণ।

অমৃতসরে পাঁচখানি পাকিস্তানী সেবার জেট বিমান গুলি-বিদ্ধ হয়ে ভূ-পাতিত।

যোধপুর শহরে ৪৯ বার হানা দিয়ে পাকিস্তানী বিমানের ১০৯টি বোমা নিক্ষেপ। জেলা হাসপাতালটি বোমা-বিধ্বস্ত।

শিক্ষামন্ত্রী চাগলা লণ্ডনের বিমান ঘাঁটিতে তাঁর ভাষণে বলেন যে, পাক-ভারত সংঘর্ষে ব্রিটিশ সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট।

পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো লণ্ডনে তাঁর ভাষণে বলেন, যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যে আহ্বান জানিয়েছেন তা পাকিস্তান মেনে নেবে কি না তা নির্ভর করছে নিউইয়র্কে গিয়ে তাঁর আলোচনার উপর।

একজন পাক-সরকারী মুখপাত্র রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় ঘাঁটি আক্রমণের সময় পাক বিমান সেনারা বোমা বর্ষণ করেছে।

করাচীতে ১০,০০০ হাজার ছাত্রের এক জনতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ এবং ভারত বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে, ইউ. এস. আই. এস গ্রন্থাগারটিকে পুড়িয়ে ফেলে, রাষ্ট্রসংঘের পতাকা টেনে নামায়, যুক্তরাষ্ট্রের কনসালেট অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সেই দেশের পতাকাটি ছিঁড়ে ফেলে।

বৃহস্পতিবার ৩-৩০ মিনিটে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুবখান সেই মর্মে কিন্তু কম্যাণ্ডারদের আদেশ দেন।

যুদ্ধ-বিরতিকালে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান সীমান্তের তিন দিক দিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে। শিয়ালকোট খণ্ডে পাকিস্তানের ১৪ মাইল ভিতরে; আর লাহোর খণ্ডে ৮ মাইল ভিতরে। রাজস্থান এলাকায় ভারতীয় সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশের প্রায় তিরিশ মাইল অভ্যন্তরে।

যুদ্ধ-বিরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পাকিস্তানী বিমান অমৃতসরের বে-সামরিক এলাকায় বোমা বর্ষণ ক'রে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। যোধপুর এবং শ্রীনগরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে অমৃতসরে বোমা বর্ষণ ক'রে পাকিস্তান যে নৃশংসতা আর বর্বরতার

পরিচয় দিয়েছে এবং নির্লজ্জভাবে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে তার জন্য ভারত রাষ্ট্রসংঘের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে।

লোক-সভায় প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী জানান যে, বলবন্ত মেহতার বিমানটি পাক বিমানের গুলিতেই বিধ্বস্ত হয়।

বিদেশমন্ত্রী চাগলা বোম্বাইতে এক ভাষণে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতির পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী না হচ্ছে ততদিন ভারতীয় সৈন্য যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।

যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ মেনে নেবার কয়েকঘণ্টা পরেই জম্মু থেকে ৮৬ মাইল দূরে ছাম্বের এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্য প্রথম যুদ্ধ-বিরতি অমান্য করে।

যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেবার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই শিয়ালকোট-পাসরুর রেলপথের কাছে চৌবিন্দা থেকে দু'মাইল উত্তর-পূর্বে, ট্যাংকের সাহায্য নিয়ে পাক-বাহিনী যুদ্ধ-বিরতি সীমা লঙ্ঘন ও ভারতীয় ঘাঁটি দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার তাদের সতর্ক ক'রে দিলে তারা নিজেদের এলাকায় চ'লে যায়।

যুদ্ধ-বিরতি কার্যকরী হওয়ার মুহূর্তটি যতই কাছে এগিয়ে আসতে থাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনারা যে-সব ঘাঁটি দখল ক'রে নিয়েছেন সেগুলি থেকে তাদের হটিয়ে দেবার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা তত্ই যেন মরিয়া হ'য়ে আক্রমণ চালায়।

যুদ্ধ-বিরতি কার্যকরী হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে।

এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এই ব'লে পাকিস্তানকে সতর্ক ক'রে দেন যে, কাশ্মীর বা ভারতের অন্য কোনো অংশের উপর পাকিস্তান যদি আবার নতুন ক'রে আক্রমণ চালায় তবে ভারত সর্বশক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবে।

সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৬৫

জম্মু, কাশ্মীর এবং রাজস্থানে পাকিস্তান কর্তৃক বহুবার যুদ্ধ-বিরতি নির্দেশ লঙ্ঘন।

ফিরোজপুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে কাসিলকালে পাক-সৈন্যের অন্যায় অনুপ্রবেশ।

জেনারেল জে. এন. চৌধুরী নয়া দিল্লীতে ঘোষণা করেছেন, ভারত বর্তমানে দখল ক'রে আছে পাকিস্তানী ভূ-খণ্ডের ৬৯০ বর্গমাইল। পাকিস্তান দখল ক'রে আছে ভারতীয় ভূ-খণ্ডের ২৪০ বর্গমাইল। এ ছাড়া, রাজস্থানে ভারতের দখলে রয়েছে ৬০০টি ঘাঁটি, আর পাকিস্তানের দখলে আছে ১০০টি ভারতীয় ঘাঁটি।

সাম্প্রতিক পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানী নিহত সৈন্যদের সংখ্যা ৪,৮০২। এদের মধ্যে বাইশ জন অফিসারও আছেন। ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছে ২০ জন অফিসার সমেত ৪৪৭ জন পাকসৈন্য। ভারতের পক্ষে শহীদ হয়েছেন ১,৩৩৩ সৈন্য। এদের মধ্যে আছেন ৮০জন অফিসার।

জেনারেল চৌধুরী বলেছেন, সাম্প্রতিক সংঘর্ষে মোট ৪৭১টি পাকিস্তানী ট্যাংক নষ্ট হয়ে গেছে। এদের মধ্যে ৩৩টি ট্যাংক ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে। ভারত হারিয়েছে কেবল ১২৮টি ট্যাংক।

এয়ার মার্শাল অর্জন সিং বলেছেন, পাকিস্তান হারিয়েছে মোট ৭৩টি বিমান, আর সেখানে ভারত হারিয়েছে মাত্র ৩৫টি।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীরে পাক অনুপ্রবেশের সুযোগ যাতে এমন কোনো ব্যবস্থা ভারত কখনোই মেনে নেবে না।

সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৬৫

জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ভারতে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি সমস্ত দিক থেকেই স্থায় এবং সুসম্পূর্ণ।

পাকিস্তানী কম্যাণ্ডারগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিহত পাক সৈন্যদের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ভারতীয় বাহিনীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। ভারতীয় সেনারা তাদের অনুরোধ রক্ষা করে।

দিল্লীর মুসলিম নাগরিকগণ এক বিরাট জনসভায় সমবেত হয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ভারতের পাঁচকোটি মুসলমান কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লেই মনে করেন।

বাইরে থেকে যারা পাক-ভারত সংঘর্ষে টীকাটি দেবার চেষ্টা করছে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো তাদের তীব্র নিন্দা করেন।

মুলাইয়াংকির উত্তরে কাছিলকা এলাকায় ১০০০ পাকিস্তানী সৈন্যের একটি ফৌজের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

নয়া দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তান যদি তার সৈন্য অপসারণ না করে তবে যেখানে আছি আমরা সেখানেই বসে থাকবো।

নিম
টুথ পেস্ট

এর প্রচুর ফেনা দাঁত সাদা
ঝকঝকে করে আর মুখে আনে
মধুগন্ধময় স্নিগ্ধতা।

TOOTH PASTE

একমাত্র
ডেন্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
"ফ্লুরোরাইড" প্রভৃতি
বহুবিধ আধুনিক
উপাদান

CNC-3 BEN

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ

পাক-ভারত সংঘর্ষ ও পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন

[১৯৪৭-১৯৬৫]

ভূস্বর্গ কাশ্মীর বেশ কিছুদিন অচঞ্চল ছিল। দক্ষ জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাদিক ঐ প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরে যে আবার এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা জনসাধারণ তা জানতেন না। ১৯৪৭-এর যে পুনরাবৃত্তি হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। কূটচক্রী পাকিস্তান কিন্তু কিছুতেই শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। কাশ্মীরকে সে বলপূর্বক গ্রাস করবেই।

গ্রাস করতে সে ১৯৪৭ সালেই চেয়েছিল। সেদিনও সিন্ধুর উত্তর পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কগণ কাশ্মীরীদের শান্তির নীড় ধ্বংস করবার জন্যে সশস্ত্র হানাদার পাঠিয়েছিল কাশ্মীর রাজ্যে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে কাশ্মীরীদের উপর এক ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল বরবরোচিত পাকিস্তানীগণ। সেই সঙ্কট মুহূর্তে ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর কাশ্মীরের মহারাজা ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, ভারত যতই শান্তিপ্রিয় হোক, মানবাত্মার এই অপমানে, সে কিছুতেই সহ্য করবেনা। শুধু তাই নয় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পিছনে কাশ্মীরের একমাত্র রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ আবদুল্লার পূর্ণ সমর্থন ছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেদিন পাকিস্তান কবুল করলেও মুসলীম লীগের নেতারা সন্তুষ্ট হননি। কাশ্মীর তাদের চাই-ই, কারণ সেখানে মুসলীম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই ১৯৪৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারা কাশ্মীর সীমান্তে সশস্ত্র হানাদার পাঠাতে শুরু করে।

কিন্তু আইনত যেদিন কাশ্মীর ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইদিনই ভারতবাসী পাকিস্তানের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কালক্ষেপ না করে ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে হানাদারদের হটিয়ে দেয়। আমাদের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা ও শ্রীনগরকে রক্ষা করে। ১৯৪৮ সালের ২রা জানুয়ারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রচুর সংখ্যায় সশস্ত্র হানাদার ভারতের-অংশ কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন যে, আমাদের উচিত ছিল পাকিস্তানে অবস্থিত এদের ঘাঁটীগুলি ধ্বংস করা। কিন্তু শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিধি সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে এবং পাকিস্তান এদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করবে এই আশায় এ কার্যে ভারতীয়গণ বিরত রইলো। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের এই সততার মূল্য দেয়নি। পাকিস্তান হানাদারদের অস্ত্র, খাদ্য ও পেট্রল দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, পাকিস্তান হানাদারদের সবরকম ভাবে সাহায্য করছে।

অবশেষে ভারত জাতিসংঘের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। শান্তির পূজারী ভারত কখনই অস্ত্রের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করতে চায়নি। ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট এক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রদ্বারা পরিষদকে এই

মর্মে অনুরোধ করা হয় যে, পরিষদ যেন পাকিস্তানকে আক্রমণাত্মক কার্যাবলী থেকে বিরত করে। এই একই পত্রে ভারত পরিষদের জরুরী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করে।

নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীআয়েঙ্গার আমাদের বক্তব্য পেশ করেন। তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আক্রান্ত ভারত সেদিন যে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

কিন্তু ভারতের আন্তরিকতার উত্তরে পাকিস্তান মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সে নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করে যে, হানাদারদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লা খাঁ পরিষদে ঘোষণা করেন যে, তথাকথিত হানাদারদের পাকিস্তান কোন প্রকারে সাহায্য করছে না। কিন্তু পাকিস্তানের এই মিথ্যা চাপা থাকেনি। জাতিসঙ্ঘ প্রেরিত কমিশনের সামনে জাফরুল্লা খাঁ স্বীকার করেন যে, ১লা মে থেকে তিনটি পাকিস্তানী ব্রিগেড কাশ্মীরে অবস্থান করছে। আশ্চর্য্যের কথা, এই একই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বদরবারে এই তথ্য বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। আজ ১৮ বছর ধরে পাকিস্তানী শাসকগণ এই একই নীতি গ্রহণ করে বিশ্ববাসীর নিকট হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছে।

১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট জাতিসঙ্ঘ কাশ্মীরে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করে। আমাদের সরকার স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য এই প্রস্তাব মেনে নেয়। ভারতীয় বাহিনী তখন অগ্রসরমান সম্পূর্ণ জয়ের পূর্ব মুহূর্তে তাদের অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। হয়ত আর সাতদিন সময় পেলে আমাদের জওয়ানরা সমস্ত কাশ্মীরকে হানাদার-মুক্ত করতে পারতো। তাহলে তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' সৃষ্টি হ'ত না এবং নিরাপত্তা পরিষদকে আজ পাকিস্তানের এত আবদারও শুনতে হ'ত না।

অস্ত্রসংবরণের প্রস্তাবও পাকিস্তান পুরোপুরি মানেনি। প্রস্তাবে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, কাশ্মীরে তার অধিকৃত অঞ্চল থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের ঐ নির্দেশ পালন করেনি। আশ্চর্য্যের বিষয় পাকিস্তানী শাসকগণ আজ কাশ্মীরে গণভোটের জন্যে চীৎকার করছে। কিন্তু তারা বোধহয় ভুলে গেছে যে, পরিষদ গণভোটের প্রস্তাব কার্যকরী করবার পূর্বে পাকিস্তানকে কাশ্মীর থেকে সমস্ত সৈন্য অপসরণের নির্দেশ দিয়েছিল।

অবশ্য একথা সত্য যে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের অধীনে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এই সতেরো বছরে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে তার সৈন্য অপসরণ করেনি। দ্বিতীয়ত, গণভোটের উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীর বাসীদের মনোভাব যাচাই করা—তারা ভারত না পাকিস্তানে যোগদান করতে চায়। ইতিমধ্যে কাশ্মীরে তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছে—তার দ্বারা কি কাশ্মীরীদের মনোভাব যাচাই হয়নি? সুতরাং আর একবার গণভোটের দ্বারা তাদের মনোভাব যাচাই করতে গিয়ে এই উপমহাদেশে অশান্তি ডেকে আনার কোন অর্থই হয় না।

তাছাড়া পাকিস্তান যে কোনকালেই শান্তির পথ চায়না, পরবর্তীকালের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

প্রধান। আটলান্ট কর্তৃক প্রেরিত করিশনের নির্দেশ মত কাশ্মীরে এক কৃত্রিম যুদ্ধবিরতি রেখা টানা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার যদিও ঐ যুদ্ধবিরতি সীমারেখা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ঐ চুক্তিপত্রের কালি না শুকাতেই পাকিস্তান সামরিক তৎপরতা সুরু করে।

১৯৪৯ সালের ৫ই মার্চ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী করবার জন্যে ডাঃ গ্রাহামকে এই দেশে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রাহামের পর আসেন ডাঃ ডিক্সন। তিনি দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক আইন-কানুন লঙ্ঘন করে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করেছে। সুতরাং পাকিস্তান যে আক্রমণকারী তা বিশ্ববাসী সেদিন স্পষ্টভাবেই জানতে পেরেছিল।

আর কাশ্মীর যে ভারতেরই অঙ্গ-রাজ্য সে বিষয়ে বিশ্ববাসীর কোন সন্দেহের কারণ থাকেন না। কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের আইনতঃ ও নীতিগতভাবে কোন দাবীই থাকতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদও ভারতের এই দাবীর বিরোধিতা করেনি। কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাও ঘোষণা করেছিলেন যে, আইনতঃ ও শাসনতান্ত্রিক ভাবে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাকিস্তান কোনক্রমেই এর বিরোধিতা করতে পারে না।

আজও জেনারেল নিম্মোর রিপোর্টে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এই উপমহাদেশে যদি শান্তি স্থাপন করতে হয় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তান ক্রমাগত যে অন্যায় ও অশোভন আচরণ করে চলেছে তার জন্যে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। শান্তির প্রতি যে তার কোন আগ্রহই নেই তার প্রমান আজ সতেরো বছরে সে ৬০০০ বার যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্ঘন করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের কাশ্মীরের কিছু অংশ সে তার নতুন বন্ধু চীনকে উপঢৌকন দিয়েছে।

পাকিস্তান পশুবলে সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। তাই আজ আবার সে নয় আক্রমণকারী রূপে কাশ্মীরে হাজির হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত আজ অস্ত্র দিয়েই এই আক্রমণের মোকাবিলা করেছে। আজ সকল ভারতবাসী বদ্ধপরিকর—আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে কাশ্মীরের সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও পাকিস্তানকে দেব না। তার জন্যে যে কোনও ত্যাগস্বীকারে আমরা প্রস্তুত।

I CAME, I SAW, I EMBRACED

HINDALCO

EXTRUSIONS

...and why not ?
They stand out in quality, economy and versatility. For — bus-bodies, structural or decorative components in rail coaches, automobiles or aircraft... window-frames, modern shop fronts, tubular furniture, transmission towers, bus-bars, tubing... trim, frames and panels of refrigerators and air-conditioners...or for almost anything else — Hindalco Aluminium Extrusions can do a better job, with less metal, less bother, longer service life and cheaper (final) cost.

HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION LTD.

PRINCIPAL SALES & MARKETING OFFICE
P.O. Renukoot, Dt. Mirzapur, U.P.
Phone PIPRI 79 Gram : HINDALCO

ZONAL SALES OFFICES :

CALCUTTA & EASTERN ZONE : 5, Clive Row, Calcutta-1 (Phones 22-8616/8, 22-7346 Gram : HINDALCORP).

BOMBAY & WESTERN ZONE : (Also Regd. Office), Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1, (Phones : 24-5161/3, Gram HINDULCOR).

DELHI & NORTHERN ZONE : 69, Golf Links, New Delhi-3 Phone 618792, Gram : ALHINDCORP.

MADRAS & SOUTHERN ZONE : 10, Second Main Road, C.I.T. Colony, Madras-4 (Phone : 74470, Gram : HINDALCORP).

শহীদ আবদুল হামিদ

কোম্পানি কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার আবদুল হামিদ, পি. ভি. সি গ্রেনেডিয়ার্স পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে সাহসিকতা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'পরম বীরচক্র' দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এর পূর্বে আর দশজন ব্যক্তি এ পুরস্কার পেয়েছেন।

ঠিক কি উহাও খেমকরণ সড়কের উপর চিনা গ্রামের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এক ব্যাটালিয়ন গ্রেনেডিয়ার অধিকার করেছিলেন। এই অঞ্চলটা শত্রুর হাতে গিয়ে পড়লে আমাদের একটা ডিভিসন সৈন্যের পরিকল্পনা ভেঙ্গে যেত। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ভোরে পাকিস্তানীরা এক রেজিমেন্ট প্যাটন ট্যাংক নিয়ে এই এলাকা আক্রমণ করে। তার পূর্বে তারা জোর গোলাবর্ষণ করেছিল। বেলা ৯টার মধ্যে শত্রুদের কয়েকটা ট্যাংক আমাদের সৈন্যদের অগ্রবর্তী কোম্পানির মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবদুল হামিদ রিকয়েললেস কামান থেকে গোলাবর্ষণকারী একদল সৈনিককে পরিচালনা করছিলেন। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও তাঁর কামান নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যান। শত্রুপক্ষের ট্যাংক এগিয়ে এলে তিনি তাঁর রিকয়েললেস কামান নিয়ে আঘাত হেনে। তিনি তৎপরতার সহিত তাঁর গতি পরিবর্তন করে শত্রুদের আর একটা ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দেন। তখন শত্রুরা তাঁর দিকের মেশিন গান নিয়ে গোলাবর্ষণ করে। আবদুল হামিদ শত্রুদের আর একটা ট্যাংক বিনষ্ট করবার জন্য উদ্যত হলে শত্রুদের একটি গোলা এসে তাঁকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। তাঁর সাহস দেখে তাঁর সঙ্গিগণও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

আবদুল হামিদ ১৯৩৩ সালের ১লা জুলাই উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলার ধর্মপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজস্থানের নাসিরাবাদে গ্রিনেডিয়ার রেজিমেন্টাল শিক্ষাকেন্দ্রে ছিলেন। পরে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে এবং নেফার গ্রিনেডিয়ারদের সঙ্গে কাজ করেন।

হাজীপীর গিরিপথ বিজয়ীবীর লেঃ কর্নেল রণজিৎ সিং দয়াল

হাজীপীর গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,০০০ ফুট উঁচু। এই পথেই পাকিস্তান কাশ্মীরে হাজার হাজার সশস্ত্র হানাদার পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কাজেই গিরিপথটি দখল করতে না পারলে হানাদারদের প্রতিরোধ করা কঠিন। এই বিপদের মুখে লেঃ কর্নেল রণজিৎ সিং দয়াল অসাধারণ সাহস ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে তাঁর সৈন্যদল পরিচালনা করেন এবং শত্রুপক্ষের প্রবল বাধা ব্যর্থ করে দিয়ে গিরিপথটি দখল করে নেন।

গত ২৫-২৬ আগষ্ট রাত্রিতে মেজর দয়াল (তখন তিনি একটি কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন) শত্রুপক্ষের সাংক ঘাঁটির উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু শত্রুসৈন্যরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী এবং তাদের প্রবল গুলি বর্ষণের মুখে তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল বিপদের সম্মুখীন হয়। তখন তিনি কৌশলে তাঁর সৈন্যদলকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। পরের দিন রাত্রে আবার আক্রমণ করে তাঁর সৈন্যদল ঘাঁটিটি

দখল করে নেন। এর পরেও তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করেন এবং ২৭শে আগষ্ট তারিখে লেডোয়াপীসলির ঘাঁটি দখল করেন। ঠিক পরের দিনই তিনি তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে আকস্মিকভাবে শত্রুদলের উপর আক্রমণ চালিয়ে হাজীপীর গিরিপথ অধিকার করে নেন।

তিনি ২৯শে আগষ্ট তারিখে শত্রুপক্ষের একটি ঘাঁটি দখলের জন্য এক দল সৈন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শত্রু সৈন্যরা প্রবল বাধায় গুলি বর্ষণ সুরু করে। এই দলের সাহায্যে তিনি তখন আর একটি দল পাঠান। তখন দেখা যায় যে, এক কোম্পানী নিয়মিত পাক সৈন্য সেখানে রয়েছে। তাদের কাছে ছিল ৩'২ ইঞ্চি মর্টার, ৩ ইঞ্চি মর্টার ও মাঝারি মেশিন গান। সোলা ও গুলি বর্ষণে লেঃ কর্নেল দয়ালের সৈন্যদল পাক-সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। তৎসত্ত্বেও তিনি আকস্মিকভাবে পাক সৈন্যদলকে আক্রমণ করে তাদের হতচকিত করে দেন। এই সময়ে মেসিন গানের গুলি এসে তাঁকে আঘাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় গুলিটি তাঁর পোষাকের মধ্য দিয়ে চলে যায়। তাঁর নেতৃত্ব ও সাহসিকতায় ফলেই শত্রুসৈন্য পরাজিত হয়।

DA 65/R10 Bengali

রাষ্ট্রসঙ্ঘ

প্রথম মহাযুদ্ধের করাল, সর্বনাশা রূপ দেখে একদিন আতংকিত হ'য়ে পড়েছিল বিশ্ববাসী, গ'ড়ে তুলেছিল জাতিসংঘ (লীগ অব নেশনস্)। জাতিসংঘের মৃত্যু হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আবার রক্তস্নাবিত হলো পৃথিবী। বীভৎসতা, নির্মমতা আর ধ্বংসের ব্যাপকতায় ওই যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধকেও ছাড়িয়ে গেলো। পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য যুদ্ধের বিভীষিকা দূর ক'রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো মানুষ। তাদের সেই ব্যাকুলতা বাস্তব রূপ নিলো নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রসংঘের মধ্য দিয়ে। শান্তিকামী—বিশ্বের আশার উজ্জ্বল প্রতীক রাষ্ট্রসংঘ, সেখানে আজ একশো সত্তেরোটি দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকার অপূর্ব সমাবেশ।

রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় বিশবছর কেটে গেল। তাই শুধু আর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নয়, এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব আর ব্যর্থতার একটা খতিয়ান নেবার সময় আজ এসেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন এই আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে? রাষ্ট্রসংঘ কি পেরেছে পৃথিবীবাসীর দুঃখ দূর করতে, স্বাস্থ্যদানে, শিক্ষাদানে বিভিন্ন দেশের মানুষকে সাহায্য করতে, বিভিন্ন দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন করতে? সব চাইতে বড় কথা রাষ্ট্রসংঘ কি পেরেছে পৃথিবী থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা ও অনাচার অভিশাপ দূর করতে? মাত্র ক'য়েক বছরের ব্যবধানে এমন কতগুলি গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে যাতে সর্বদেশের মানুষের মনে আজ এই সব প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ করতে কোনদিন পারবে কিনা তা নির্ভর করছে এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কর্মদক্ষতা ও বিবেকবুদ্ধির উপর। খুবই দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'নিরাপত্তা পরিষদ' নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ না করে, মনে হয় বর্তমানে যেন কয়েকটি বৃহৎ শক্তির হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সোজাসুজি সমাধানের পথ না খুঁজে পরিস্থিতি অনেক জটিল ক'রে তোলা হচ্ছে, এমনকি ইচ্ছা করেই যেন সমাধানের পথ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন ভারত, কে আক্রমণকারী তা স্থির করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান দ্বিতীয়বার জোর করে কাশ্মীর দখল করতে চাইলো। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ভারতকে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হলো। যুদ্ধ-বিরতি রেখার পরিদর্শক জেনারেল নিম্মো সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করলেন তা থেকে স্পষ্ট জানা গেলো পাকিস্তানই দোষী। তবু সেক্রেটারী উ থাণ্ট রিপোর্টটি প্রকাশ করলেন না। এত কাণ্ডের পরেও রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করলো না যে পাকিস্তানই আক্রমণকারী। বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্যই এই ঘোষণার প্রয়োজন ছিল আজ সব চাইতে বেশী। অন্যায় করেও যদি কোনো রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের মতো একটি মহান ও গুরুদায়িত্বসম্পন্ন সংস্থার কাছ থেকে প্রশ্রয় পায় তবে তা বিশ্ব-শান্তির ও বিশ্ব-কল্যাণের পক্ষে খুবই মারাত্মক। শুধু কাশ্মীর প্রশ্নে নয়, আরো অনেক ব্যাপারেই রাষ্ট্রসংঘ তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে উঠতে পারেনি। রাষ্ট্রসংঘের চোখের সামনেই ভয়ংকর রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়ে গেলো উত্তর কোরিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে, যার পেছনে ছিল একদিকে চীন অন্যদিকে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার রাষ্ট্রসংঘের অনুজ্ঞা অমান্য করে বর্বর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে একদিকে চীন অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় এক অমানুষিক লড়াই চলেছে—উত্তর ভিয়েৎনাম আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে। রাষ্ট্রসংঘ কোনো প্রতিকারই করতে পারছে না।

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাকিস্তানই আক্রমণকারী এই সহজ সোজা সত্যকে স্বীকার না করে রাষ্ট্রসংঘ এক অচল এবং জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেবার পরও পাকিস্তান তা বারবার লঙ্ঘন করছে, রাষ্ট্রসংঘ তা দেখেও যেন দেখছে না। এই সব ঘটনা থেকে স্বভাবতই আশঙ্কা হয় রাষ্ট্রসংঘের পরিণতিও জাতিসংঘের মতোই হবে না তো! এই আন্তর্জাতিক বিশ্বশান্তি-সংস্থা বৃহৎ শক্তিবর্গের কথার বুলি হয়ে উঠে বসে এবং তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত হয় তবে যে জাতি-সংঘের মতোই তারও অকাল মৃত্যু হবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই আর তাহলে বিশ্বের বড়ো দুর্দিন! আমরা আশা করবো তা যেন না হয়, রাষ্ট্রসংঘ যেন সত্য এবং ন্যায়ের পথে অবিচলিত থেকে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে অগ্রসর হয়!

রাষ্ট্রসংঘকে হতে হবে একটি আদর্শ সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সার্বভৌমিক হবে তার চরিত্র, ন্যায় ও সততা হবে তার মূলমন্ত্র ও বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্বজনীন সংস্থা হবে ছোট বড়ো সকলের আশ্রয়স্থল, কোনো শ্রেণী বিশেষের ক্রীড়াভূমি নয়। সত্যের ও ন্যায়ের পথে অটল থেকে নিরপেক্ষ বিচার করে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে মৈত্রীর ভাব সঞ্চারিত করবে রাষ্ট্রসংঘ। তাকে প্রকৃত অর্থে হতে হবে শান্তির ছায়াবট—পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারীর পরম নির্ভরতার আশ্রয়, ভরসাস্থল। তবেই সমগ্র বিশ্বজাতির এই মিলন-মঙ্গল কেন্দ্রটি থেকে উৎসারিত হবে আস্থা, বিশ্বাস, মৈত্রী এবং শান্তি। তা না হলে নিরর্থক হবে এর চেষ্টা, মূল্য হবে এর তাৎপর্য এবং অচিরেই এই সংস্থাটির পরিণতি হবে জাতিসংঘের মতোই শোচনীয়।

• • • •

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক টলষ্টয়কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি যে যুদ্ধ ও শান্তির কথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, আপনিই বলুন, পৃথিবীতে সত্যি লোকে কি চায়? যুদ্ধ চায়, না শান্তি চায়।

টলষ্টয় হেসে বললেন—পৃথিবীতে বাস করতে হলে শান্তির চেয়ে বেশী কাম্য আর কি হতে পারে?

—তবে মানুষ যুদ্ধে মেতে ওঠে কেন?

—শান্তির মাহাত্ম্য সহজেই বুঝবে বলে।

—তবে কি দুটোরই প্রয়োজন?

—না, শুধু শান্তির। তবে যে পথে সহজেই শান্তি আসতে পারে, সে পথ ছেড়ে মানুষ ছোটে ভুলপথে। যুদ্ধের ভীষণতা ভাল করে বোঝবার পর যে শান্তি আসে, সেইটেই হোল স্থায়ী শান্তি। পৃথিবীতে অনেক রণতাণ্ডব দেখা গেছে, এবার আসছে শান্তির দিন, মানুষ বুঝেছে শান্তির আশীর্বাদ।

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মারোয়াড় রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু···।' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অসমাপ্ত রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে মৃতের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস··· লেলিহান হ'ল চিতার আগুন···

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভারতসেবা ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-583 A BEN

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
অগ্রহায়ণ ১৩৭২, DECEMBER 1965

অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
স্মৃতি দোলায়	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বক্সে বাজে বাঁশী (চলচ্চিত্র কাহিনী)	:	দেবব্রত আনন্দ
অমৃতের স্বাদ	:	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মৃত ব্যক্তিকে খুনের দায়ে (রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনী)	:	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
শেষের সুখই সুখ	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
সিনেমা কোথা থেকে কোথায় এলো	:	চলচ্চিত্র সম্পর্কে সচিত্র আলোচনা
তাসখন্দ	:	সচিত্র আলোচনা
শেষ মুহূর্ত	:	সমার সেট মম
		ছ গল
		বিমায়া

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা —এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা সডাক পনের টাকা

সেকালের ঐতিহ্য, একালের বাস্তবতা, আগামীকালের প্রতিশ্রুতি—ত্রিকালদর্শী জীবনের দর্পণ, যুগচেতনাসম্পন্ন, পাঠকের মনোরঞ্জন-প্রয়াসে নিত্য নব নব রূপরসের সন্ধানী, প্রগতিধর্মী সাহিত্যপত্র গল্প-ভারতীর প্রতি সংখ্যায় নব নব আকর্ষণের সরস আস্বাদ।

পৌষ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কাশ্মীর রণরঙ্গ ॥ প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় বহুবার কাশ্মীর গিয়েছেন। শেষ গিয়েছিলেন গত জুলাইএর শেষে কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে তথ্যচিত্র তোলার কাজে। সেখানে হানাদারদের সঙ্গে তাঁর মোকাবিলার মুখোমুখি সাক্ষাৎ···সারা বুক নিজের চোখে দেখা··· সেই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের ইতিকথা, কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের নেপথ্য-কাহিনী, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কূটচক্র···কাশ্মীর রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ বর্ণনা···সেই সঙ্গে কাশ্মীরতনয়া দেশের কাজে নিবেদিতপ্রাণ একজনার অপূর্ব রোমাঞ্চ···অপরূপ বর্ণাঢ্য ভাষায় রচিত এই অসাধারণ চমকপ্রদ সুদীর্ঘ রচনা—খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়। এ এক বিরল বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি! এ লেখার তুলনা নেই।

শ্বেতদ্বীপের যবনিকা কম্পমান ॥ ইংলণ্ডের রাণীর স্বামী ডিউক অফ এডিনবরা সম্বন্ধে এক সাংঘাতিক কুৎসাপূর্ণ বই যা ব্রিটিশ শাসনচক্রকে বিহ্বল হতভম্ব করেছিল এবং যার সংবাদকে পর্যন্ত রুদ্ধ করা হয়েছিল। এক আশ্চর্য রূপ।

লেখনী, সুখের খনি ॥ দেশবিদেশের কত মানুষই প্রথম পেশা ছেড়ে লেখার পেশা নিয়ে পরবর্তী জীবনে লেখকরূপে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের চিত্তাকর্ষক চিত্র।

সারা বার্ণার্ড ॥ পৃথিবীর সব সেরা অভিনেত্রীর জীবনের রোমাঞ্চকর অধ্যায়। নতুন স্বাদ।

একটি বিচিত্র রচনা ॥ উমাপদ মুখোপাধ্যায়

চার্লি চ্যাপলিন ॥ চ্যাপলিনের জীবনের এক উত্তেজনাপূর্ণ প্রেরণাময় ঘটনা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সিনেমা ॥ দেশ বিদেশের সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে সচিত্র মূল্যবান আলোচনা।

এখনই এই সংখ্যাটির জন্য অর্ডার বুক করুন। বিলম্বে না পেতে পারেন। কার্তিক সংখ্যাটি নিঃশেষে বিক্রয় হওয়াতে আমরা বহু অর্ডার সরবরাহ করতে পারিনি।

॥ দাম এক টাকা ॥

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু, কলকাতা-৬

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্প শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাস্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-৫৯

CP-103 BEN

জরুরী অবস্থায় আমাদের কর্তব্য

"যেদিন বহিরাক্রমণের সকল প্রকার আশঙ্কা আমরা সমূলে দূর করতে পারবো সেদিনই আসবে আমাদের প্রকৃত উৎসবের লগ্ন। সেই শুভ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত আমাদের ব্যয়বাহুল্য বর্জন করতে হবে। সঞ্চয় ও সংরক্ষণের পথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে হবে। খাদ্যের অপচয় নিবারণ করতে হবে। কৃষিখামার ও কলকারখানার উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। আপৎকালে অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা আমরা করেছি, প্রয়োজন বোধে, সেগুলি আরও জোরদার ক'রে তুলতে হবে।"

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

সংস্কৃতি সিরিজ

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির তথা বাঙলার মন্দিরগুলির তথ্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। আর্ট প্লেটে ৬০টি ছবি। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত বিষয়ের মর্মকথার প্রাঞ্জল পরিবেশন। [৭·৫০]

রবীন্দ্র-দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকবির জীবনবেদের সরল ব্যাখ্যা। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। [২·৫০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তর এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]

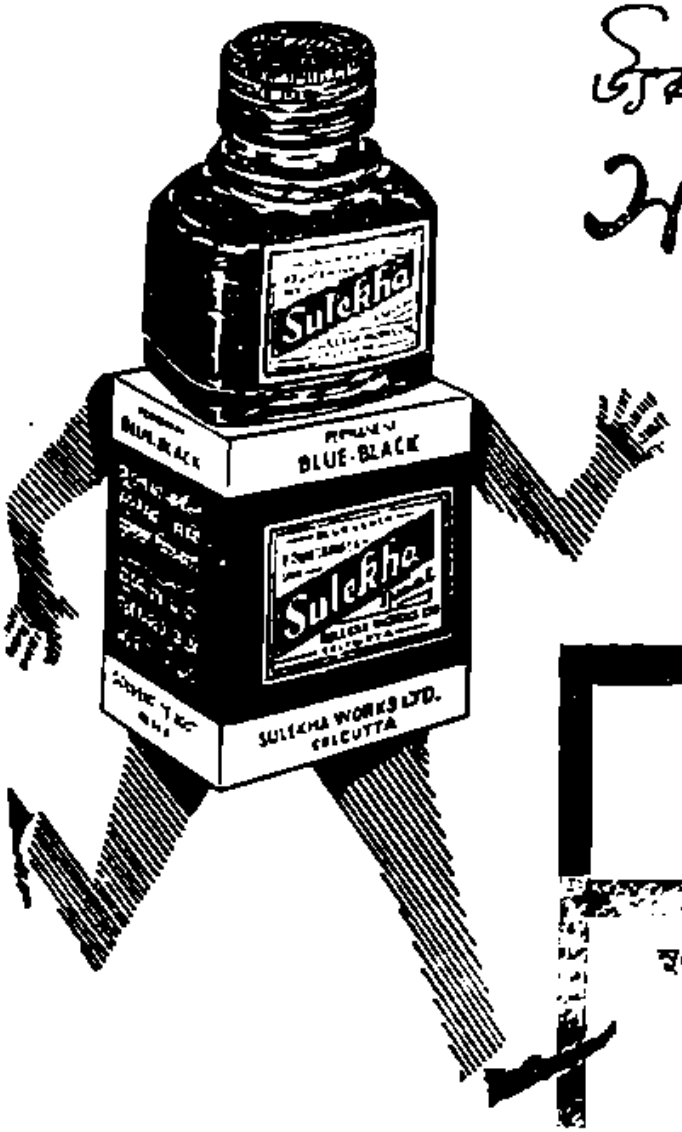

উন্নত ও উপযোগিতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্মোকলেস
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম. এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PRO/SW-13

* কয়েকটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রকাশন *

সুধীরচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত

ক থা গু চ্ছ

বিগত যুগের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের সঙ্গে অধুনাতন যুগের কথাশিল্পীদের সর্বজন-অভিনন্দিত গল্পসমূহের অনবদ্য সংকলন-গ্রন্থ।

৪র্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ ॥ মূল্য : ১২·৫০

ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন-সম্পাদিত

"History of Philosophy : Eastern & Western"

নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড : ১ম ভাগ : ৭·০০

১ম খণ্ড : ২য় ভাগ : ৮·০০

২য় খণ্ড : ১৫·০০

বন্ধনাট্গুপ্তের ভ্রমণ-কাহিনী

দ্বীপমালার দেশে

মূল্য : ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্য-সংগ্রহ

আজন্ম সুরভি

মূল্য : ৩·০০

'সুবাস্তা' রচিত উপন্যাস

দ্বিতীয় রহিত

মূল্য : ৩·০০

মণীন্দ্রলাল বসুর উপন্যাস

এ ষ ণা

মূল্য : ২·৫০

বিষ্ণু দে-র কাব্য-সংগ্রহ

একুশ বাইশ

মূল্য : ৪·০০

সুলেখা গল্প সংকলন

সাম্প্রতিককালের ছোট গল্পের গতি-প্রকৃতি নিরূপণে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

মূল্য : ৬·০০

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর ভ্রমণ-কাহিনী

মন্দিরময় ভারত (৩য় ভাগ)

মূল্য : ১২·০০

এম সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাঃ লিঃ ঃঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

Inchek Tyres Limited

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

NR/C/40

নির্মল
বার সাবানে
জামাকাপড় ঝকঝকে পরিষ্কার হয়
কম খরচে, কম সময়ে, কম পরিশ্রমে
নির্মল বার সাবানের দামও কম, ফেনাও বেশীদিন। নির্মল ব্যবহার ক'রে দেখবেন—প্রচুর ফেনা হয়, ময়লা আর গায়ের দাগ সহজেই ছেড়ে যায়, কাপড়চোপড় একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়। নির্মল বার সাবান দিয়ে কাপড় কাচলে সময় আর পরিশ্রম দুয়েরই সাশ্রয় হয়। আজ থেকেই নির্মল বার সাবান ব্যবহার করুন। ছোটবড় দু' সাইজেই পাবেন।
Nirmal
BAR SOAP
কুসুম প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
৯, ব্যাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

JWTKPN 3114

এই সংখ্যায়

অমৃতের স্বাদ (বড় গল্প)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৪৪৫

যে কথা আজও ভুলিনি (স্মৃতিকথা)—প্রফুল্লকুমার গুহ ৪৭৩

কান্নাহাসির দোলা (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৭৮

মৃত ব্যক্তিকে খুনের দায়ে (গল্প)—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৮৫

বাজে বাজে বাঁশী (চিত্রোপন্যাস)—আনন্দ দেবরাজ ৪৯২

মেয়ে মজলিশ

এবারে শীত পড়েছে চলুন তালে তালে পা ফেলে—আভা পাকড়াশী ৫০১

নতুন করে পাবো ব'লে—অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ৫০৩

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৫০৬

উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের

উজ্জ্বল কান্তি

যেমন মলাটের সঙ্গে গ্রন্থের, পাতার সঙ্গে বৃক্ষের —

তেমনি ত্বকের সঙ্গে সৌষ্ঠবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

বোরোলীন ক্রীম

নিত্য ব্যবহারে আপনার অন্তর্লীন লাবণ্য

চোখে মুখে সর্বাঙ্গে উদ্ভাসিত হবে।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৪

এই সংখ্যায়

গুপ্তচর কাহিনী—

আলেকজাণ্ডারের অভিনব কীর্তি—সুপর্ণ রায় ৫১১

মার্কিন মুলুকে মহানিশা—বররুচি ৫১৪

চলতি দুনিয়া— ৫১৭

স্মৃতি দোলায় (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫১১

বিচিত্রা— ৫২৭

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫৩০

দিন যামিনী—গোলকেন্দু ঘোষ ৫৩৭

শেষের সুখই সুখ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫৪১

খেলাধুলা—

আজকের সোভিয়েত ফুটবল ৫৪৭

দুই জার্মানির দুই অলিম্পিক টীম ৫৫২

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম. এ. ডি. লিট্ বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (কলি) ডি. লিট্ (লণ্ডন) বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদম্ কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

চ্যবনপ্রাশ :—সর্দ্দি, কাশি, শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ, হৃদ্‌রোগ দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে মহৌষধের ন্যায় কার্য করে। শক্তিহীন, ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য বলাযায়। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সকলের পক্ষে, সকল ঋতুতে সমান উপযোগী। **অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।**

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

এই সংখ্যায়

সংযোজন—

সিনেমা কোথা থেকে কোথায় এলো ৫৫৫

দেশবিদেশের রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র ৫৫৯

অন্তরীক্ষে (কার্টুন)— ৫৬৪

তাসখন্দ (প্রবন্ধ)— ৫৬৭

শেষ মুহূর্ত্ত—

সমার সেট মম ৫৬৯

জেনারেল ষিমায়া ৫৭২

জেনারেল ভ গ'ল ৫৭৪

নিকোলাই ভি. পদগরণী ৫৭৭

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রাম দুলাল সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা ১

ফোন: ৫৫-১৪৫০

৫,৬,হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন ২৩-১৮৯১

১৪,হেয়ার ষ্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেন সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে মেলিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ সিসিলেনি—গড়িয়াহাট অংশেন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আনেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাওয়ারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ রুক্মদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর দাল বিরমাদত্ত, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ধাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম ক্ষেত্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টালাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ওস্তাদ অস্রাম বলেন

"ল্যাম্পটা

Osram

হলে আপনারই লাভ"

খেলা যা কাজ যাই হোক, আলোর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কি বাড়ীতে, কি অফিসে, অস্রামই হচ্ছে ঠিক ল্যাম্প। কারণ এই ল্যাম্প টেঁকে অনেক দিন, আর আলোও দেয় অনেক বেশী। অস্রামের পেছনে রয়েছে জি.ই.সি.—যাঁরা ল্যাম্প ও আলোর ব্যাপারে দিয়ে বেড়ানীর। কাজেই যে ল্যাম্পের ওপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন, সেই ল্যাম্পটিই কিনুন

GEC আপনার গ্যারান্টি

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং. অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

GEC/G/973

সুস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

ঘাবেরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিন্ত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড এটি কার্যকরী ঔষধের নিভ্রমে তৈরী যা ব্যথায় উপশম দেয়, অবসাদ কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

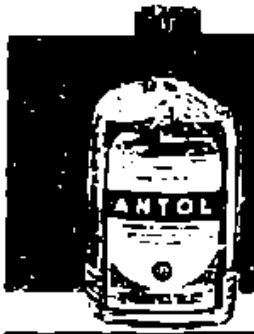

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকায় কামড়ে এ্যান্টল লাগান— সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোক্কা, কাটা, পোকায় কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নিরুপদ্রবযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

2 শিশুর কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

এ বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

পুরুষের পদমর্যাদা অটুট রাখে বাটার জুতো

Bata

নিম
টুথ পেস্ট

এর প্রচুর ফেনা দাঁত সাদা
ঝকঝকে করে আর মুখে আনে
মধুগন্ধময় স্নিগ্ধতা

NEEM TOOTH PASTE

একমাত্র
ডেন্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
"ফ্লোরাইড" প্রভৃতি
বহুবিধ আধুনিক
ভেষজ

CNC-3A BEN

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোঃ লিঃ

বিক্রয়-বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে হোর্ডিং

ভুবনেশ্বর

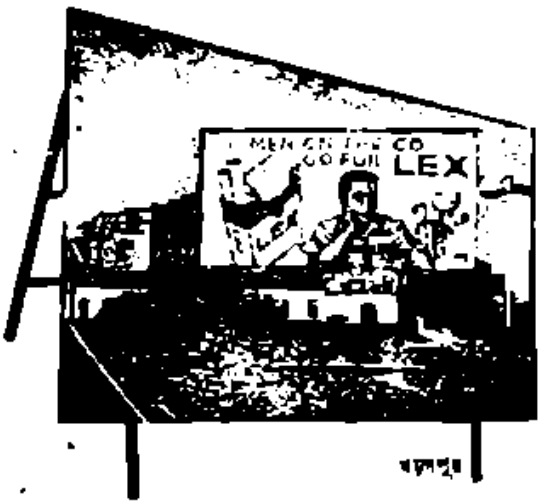

খড়্গপুর

আপনার পণ্যের বিক্রয়-বৃদ্ধি বা আপনার কাজের প্রসারে আপনি নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত, আর ঠিক এই ব্যাপারেই আমরা আপনার প্রয়োজনে আসতে পারি। আপনার খরিদ্দারের কাছে কম খরচে আপনার পণ্যের খবর পৌঁছে দেবার জন্য স্টেশন ভবনে বা তার চারদিকে হোর্ডিং-এর জায়গাগুলির আপনি সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :
কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার,
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে,
গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩
(ফোন : ৪৫-২২৩২)

বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেল-এর কর্তৃপক্ষ দ্বারা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের যে কোন স্থানে হোর্ডিং-এর কাঠামো তৈরী, তার স্থাপনা এবং অন্যান্য যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। পৌর-কর দিতে হয় না।

জায়গা :

(পশ্চিমবঙ্গ)
গার্ডেনরীচ (কলিকাতা), শালিমার (হাওড়া), খড়্গপুর, বার্নপুর, আদ্রা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, শিউরী।

(বিহার)
চক্রধরপুর, রাঁচি, টাটানগর, চাইবাসা।

(উড়িষ্যা)
ভদ্রক, বালাসোর, জাজপুর—কানজোর রোড, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর, রৌরকেলা, সম্বলপুর, বহরমপুর, ঝাড়সুগুদা।

(মধ্যপ্রদেশ)
বিলাসপুর, রায়পুর, দুর্গ।

(মহারাষ্ট্র)
গোন্ডিয়া, ইটওয়ারি।

(অন্ধ্র প্রদেশ)
ওয়ালটেয়ার, ভিজিয়ানাগ্রাম, ভিজাগাপট্টম, পার্লাকীমেডি, শ্রীকাকুলম, রবিবিলি, ইত্যাদি।

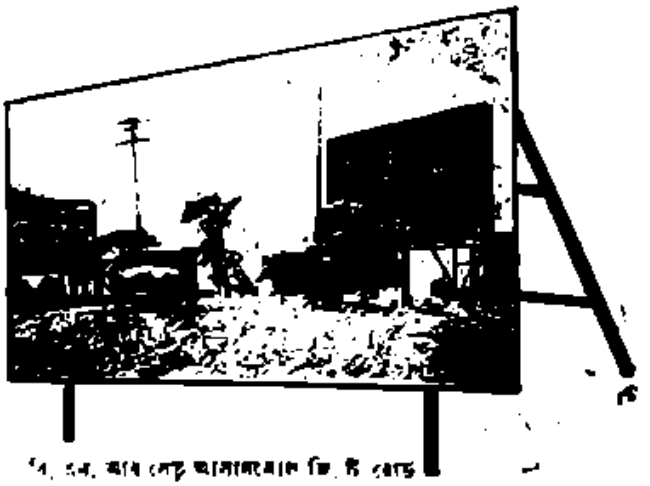

ই. এস. আর সেন্ট্রাল হাসপাতাল টি. ই রোড

সোভিয়েত দেশ

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

(১৭ই মার্চ ১৯৫৬ থেকে ইংরাজী ও বাংলায় একসঙ্গে প্রকাশিত)

উপহার

- ৫৫ নতুন গ্রাহক হলে ১৯৫৬ সালের একটি বাঁধানো রঙ্গিন দেওয়ালপঞ্জী পাবেন।
- তিন নতুন গ্রাহক হলে ১৯৫৬ সালের একটি দেওয়ালপঞ্জী ছাড়াও একটি পুস্তিকা পাবেন।

	ইংরাজী	বাংলা
এক বৎসর	টাঃ ৬.০০	টাঃ ৪.০০
তিন মাস	টাঃ ১.৫০	টাঃ ১.০০

সোভিয়েত জীবনের ও
এই ভূখণ্ডের সাম্প্রতিক
একটি দর্পণ।
সাড়ে বারো পৃষ্ঠার পত্রিকাটি
প্রতি মাসের পক্ষেই
হাতে পৌঁছবে এই

সোভিয়েত দেশ

৮৮, ৩৩ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অমৃতের স্বাদ

(বড় গল্প)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[কাহিনীকার সাবিত্রীপ্রসন্নের পরিচিতি বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজের কাছে নিষ্প্রয়োজন। সাবিত্রীপ্রসন্ন কবি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি, নিগূঢ় রসমাধুর্য্য। জীবন রসোপলব্ধির নূতন ক্ষেত্রে "অমৃতের স্বাদ" গল্পে এক নূতন অনাস্বাদিত রসের সন্ধান দিয়েছেন। কাহিনীকারের শেষ রসনীয়তম রচনা হিসাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য।]

অনিলের দেরাদুন যাওয়া হ'ল না। ব্যাঙ্কের টাকা সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, দিদিমা মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন, দিদিমাও আজ নেই। মায়ের কথা তার মনেও পড়ে না। বাবা থাকেন রেঙ্গুনে তাঁর বর্মী স্ত্রীপুত্র কন্যা নিয়ে অমজমাট সংসার। অনিল সে পরিচয় কাকেও বড় একটা দেয় না। দু'বছরের শিশু রেখে তার মায়ের মৃত্যু হয়, দিদিমার কোলেই সে মানুষ। একমাত্র মামার বিপুল সম্পত্তি, কাজেই অনিলের প্রতি তার দিদিমার সকল রকমের প্রশ্রয়কে তিনি এক রকম সমর্থনই করে এসেছেন—আহা, মা-মরা ভাগ্নে, আর ভাগ্নে বলতে তো ঐ একটি। তার মামিমারও পুত্রসন্তান নেই। তাকে নিয়ে ও সাধ-আহ্লাদ মিটাক না, মন্দ কি!

দিদিমা বেঁচে থাকলে আজ তার টাকার কোনো অভাব হ'ত না, মামার কাছে সে কখনো হাত পাতেনি, আজও পাতবে না। তা ছাড়া এমন অভ্যাস অনিলের যে টাকা হাতে এলেও থাকে না। নিজের খরচ তার বেশি নয় কিন্তু পরের অভাব মিটাতেই সে আজ নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে। দিদিমার টাকায় সে একটা চলতি ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিল, তাতে সে ঠকেনি কিন্তু বাজার মন্দা, মুনাফার উপর নির্ভর করা চলে না। তবে টাকা সে জোগাড় করে ফেলেছে বন্ধুর কাছ থেকে। মনটা ভাল নয়—মাসখানেক দেরাদুনে পিসিমার কাছে থেকে অবাধ্য মনকে বাগে আনতেই হবে। কিন্তু সব ঠিকঠাক করেও তার শেষ মুহূর্তে দেরাদুন যাওয়া হল না।

আজই টিকিট কিনে না আনলে, হাতে তার টাকা থাকবে না। টিকিট কিনতে যাবে, সময়

দরজার সামনে বিমলার চিঠি এসে দাঁড়ালো। নীল খামে মোড়া চিঠি, উপরে সেই পরিচিত হস্তাক্ষর। তবু অনিল জিজ্ঞাসা করল—"কিরে সরলা, কার চিঠি?"

"দিদিমণির।" বলে সরলা অপ্রস্তুত হয়ে দরজার এক পাশে দাঁড়ালো।

অনিল বললে—"বড্ড তাড়া আছে যে, তুই এখন যা, আমি পরে উত্তর দেব। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।"

সরলা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দিদিমণি তাকে উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন, শুধু হাতে সে কেমন ক'রে ফিরে যাবে।

সরলা বলল—"আপনি যা হয় এক কলম লিখে দেন দাদাবাবু, উত্তরটা নিয়েই যেতে বলেছেন দিদিমণি, না নিয়ে গেলে রাগ করবেন।"

অনিল বিমলার মন মেজাজ জানে; অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছে সে জীবনে। তাই মনের উত্তাপ সামান্য কারণেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথচ সেজন্য তার অনুশোচনার অন্ত থাকে না—কেঁদেকেটে সে নিজের অশেষ রকমে খোয়ার করে। হয়ত অনিলের উপরের রাগটা সরলার উপর ফেটে পড়বে, সংসারে অশান্তি বাড়বে। দাঁত পাঁচ ভেবে অনিল বলে—"আচ্ছা দাঁড়া সরলা, চিঠিখানা দেখি।"

এক নিঃশ্বাসে সে চিঠিখানা পড়ে ফেললে,—বিমলা লিখেছে:

প্রিয়.....

আজ প্রায় চারবছর পরে তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি। আশ্চর্য আমারই হওয়ার কথা। আমি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারনি—পারবেও না। তোমার কাছে আমি যখন কোনো দিনই ক্ষমা চাইনি, তখন আজ নিরুপায় হয়েছি বলেই যে তোমার কাছে ধর্না করে জবাবদিহি করব এমনি বা কী কথা আছে। তাতে ফলও নেই। পাথরের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও যে তাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, সেটা আমার চাইতে বেশি কে জানে? আমি নাস্তিক নই; মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার অপরাধের অনুপাতে ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন ঢের বেশি। কিন্তু সে কথা থাক। খোকা আজ সাতদিন একঘরী হয়ে আছে, মাথায় তার অসহ্য যন্ত্রণা; একলা মানুষ, আমার নড়ে বসবার উপায় নেই। কি করব কিছুই ঠিক করতে পারছিনে। সরলাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়েছিলাম, কোনো ফল হল না, তাই মনে হ'ল তোমাকে ডেকে পাঠাই, কিন্তু কেনই বা তোমায় ডেকে বিরক্ত করছি তাওতো বুঝিনে। তবে খোকার অসুখ শুনে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, কেন যেন মনের মধ্যে এই ভরসাটুকু পেলাম। আসবে তুমি? একবারটি এসো,—লক্ষ্মীটি।

—বিমলা

চিঠিখানা পড়া শেষ করে অনিল যেন কেমন শুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীর ভিতর সরলাকে বসিয়ে চিঠি লিখতে অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বারবার অনেক কিছু লিখে কাগজগুলি ছিঁড়ে

টুকরো টুকরো করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। খানিকক্ষণ যেন হয় নিল অনিল। অবশেষে সে আপন মনে লিখে চলল :

বিমলা,

তোমার চিঠিতে খোকার অসুখ শুনে খুব চিন্তিত হলাম। সাতদিন পর, আমাকে আগে খবর দাওনি কেন? দেরাদুন যাব সব ঠিকঠাক, টিকিট কিনতে গেছি এমন সময় সরলা এসে আমার হাতে তোমার চিঠি দিল। টিকিট কিনে ফিরবার পথে তোমার ওখান হয়ে আসব। তোমার চিঠির মধ্যে যে প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে, তা বুঝতে পারি, জবাবও দিতে পারি কিন্তু খোকার অসুখ—সে সব কথা এখন থাক। তা ছাড়া এতদিন পরে আমার জবাবে তোমার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা ভেবে দেখার মতো হাতে সময়ই বা কৈ?

—অনিল

সরলা চিঠি নিয়ে চলে গেল। অনিল অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করতে করতে কখন যে বিছানার উপর বসে পড়েছে তা টেরও পায়নি। অনিল মনে মনে ভাবে, তাইতো, একী হল? বিমলার চিঠি পড়েই সব ভুলে গেলাম। খোকার অসুখ? বেশতো, এমন অসুখ হয়ত এর আগেও অনেকবার হয়েছে। কৈ কখনো তো সে আমাকে খবর দেয়নি। অথচ এই খোকাই আমার বুক থেকে নামত না। বিমলার স্বামী বিমলাকে একটি একবছরের শিশু ছাড়া আর কিছুই দিয়ে যায় নি। অগাধ সম্পত্তি ছিল বাপের—বিমলার স্বামী নিজের খেয়ালে সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে। কৈ বিমলা তো কোনোদিন তার প্রতিবাদও করেনি। কাছাকাছি বাড়ী, অনিল কোন খবরটাই বা না জানে। তবু বিমলার স্বামী তার স্ত্রীকে একটি মহার্ঘ সম্পদ দিয়ে গিয়েছে। হেলায় হোক, শ্রদ্ধায় হোক, বিমলা তার জন্য স্বামীর নিকট নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। কিন্তু তার সর্বাঙ্গে এখনো নির্মম অত্যাচারের চিহ্ন আছে। অকারণে সময়ে অসময়ে নির্যাতন করত স্বামী; একমাত্র ভয় করত সে অনিলকে—কেন, কে জানে? সামনে দাঁড়ালে মাথা নিচু করে সে সরে যেতো অন্য ঘরে। অনিল তো সবই জানে। বিমলার শ্বশুরবাড়ীতে তার প্রতিপত্তি ছিল, আদর ছিল, সম্মানও ছিল। তার বাক্তিত্ব ও মহত্বের কাছে বিমলাও একদিন মাথা নিচু করে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আর খোকা? অনিল যে তাকে বুকে করে মানুষ করেছে। পুত্রস্নেহ কি তা সে জানে না—বিবাহ সে করেনি, করবেও না, অতএব তা অনুভব করার সুযোগ হয়ত তার কোনোদিন হবে না। কিন্তু খোকাকে সে যেভাবে তার অন্তরের সমস্ত মমতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে ভালবেসেছে, কোনো পিতা তার সন্তানকে কি এর চেয়ে বেশি ভালবাসতে পারে? না, পারে না, কিছুতেই পারে না। অনিল নিজের মনেই হেসে উঠল। তার মানসপটে অতীতের ইতিহাস যেন তার পৃষ্ঠাগুলি একের পর এক খুলে ধরল। বেশ তো! ভালই লাগে তার অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন। কিন্তু একী! সমস্ত দেহ তার কেঁপে ওঠে কেন? চোখদুটি আপনা থেকেই বুজে আসে—ঠোঁটদুটি বিবর্ণ হয়ে ওঠে. কি একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে যেন অস্থির হয়ে পড়ে। এই তো সেদিনের কথা। বিমলার স্বামী মৃত্যুর বিবাহিত জীবন পাঁচ বৎসরও অতিক্রম

করল না। না সহ্য হল তার এই গুণবতী ভার্যাকে, না ভাল লাগল তার নিষ্পাপ সরল শিশুপুত্রকে। তার চোখ নেই, হৃদয় নেই, সংসারের উপর মায়ার উপদ্রবে সে বিমলার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলল। অবশেষে কাউন্সিওয়ালার ভয়ে সে একদিন সকলের অগোচরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। স্ত্রীর কথা চিন্তা করল না, সন্তানের উপর পিতার দায়িত্বের কথা বিন্দুমাত্র তার মনে ছায়াপাত করল না। রাজপাখি যেমন অলক্ষ্যে এসে ছোঁ মেরে শিকার নিয়ে পালিয়ে যায় তেমনি এক গভীর রাত্রির অন্ধকারে বিমলার জীবনের সমস্ত সুখ যেন তীক্ষ্ণ নখে ছিঁড়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল সে। বিমলা তাতে কিন্তু বিস্মিত হল না, দুঃখ বোধ করল না, প্রবল মাতৃস্নেহে খোকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বিছানায় আশ্রয় নিল।

ভাবতে ভাবতে অনিল অস্থির হয়ে ওঠে—তার দু'চোখ ভরা জল। নিজেকে সে অত্যন্ত অসহায় মনে করতে লাগল। কিন্তু সেদিন তো সে নিজের জোরে বিমলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার কি সে ভুল করতে চলেছে? না, না, কিছুতেই সে আর বিমলার ওখানে যাবে না। কিন্তু, কিন্তু যদি খোকার অসুখটা সত্য সত্যই সাংঘাতিক হয়ে পড়ে? অনিল আর ভাবতে পারে না। দুই হাতে মাথাটা জোর করে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

দূর সম্পর্কীয় এক মামার দোতলা বাড়ীর দু'খানা নিচের তলার ঘর নিয়ে এখন অনিলের সংসার। দিদিমার দেওয়া নিবারণ চাকর মাত্র সম্বল। অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক—ত্রিসংসারে তার কেউ নেই। সেও অনিলকে ধরেই পড়ে আছে। মাসমাহিনা জমা হয় পোষ্ট অফিসে। অনিলের উপর তার মমতার আতিশয্য অনেক সময় অনিলকে বিব্রত করে; তার অভিভাবকত্বের অত্যাচার অসহ্য বোধ হলেও অনিল চুপ করে থাকে—এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলে—"এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পার নিবারণদা?"

নিবারণ এসে দু'বার স্নান করবার তাগিদ দিয়ে গেছে। অনিল যে জেরাতুন যাবে, আগে থেকে সে কথা নিবারণকে বললে, তার যাওয়া হবে না তা জানে অনিল। তাই বাজার প্রাঙ্গণে একটা মতলব করে ইচ্ছাটা প্রকাশ করলে, নিবারণ আর বাধা দিতে পারবে না। মনে মনে এই কথাটাই স্থির করে রেখেছে অনিল।

ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। নিবারণ আর একবার স্নানাহারের তাগিদ দিতেই অনিল বলল —"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে নিবারণদা, তারী জরুরী কাজ—যাই, চট্ ক'রে ঘুরে আসি। তবে দেখ, অফিস আদালতের ব্যাপার। একটু দেরিও হতে পারে। তুমি আমার খাবারটা টেবিলের উপর ঢেকে রেখে খেয়ে নিও—বুঝলে?"

নিবারণ কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। অনিল উঠে উঠানে নামতেই নিবারণ সদর দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিল। অনিল একটু হেসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

বিমলার বাড়ী বেশি দূরে নয়। সিমলা ষ্ট্রীট্ থেকে ডাক ষ্ট্রীট্ তাড়াতাড়ি গেলে বড় জোর আট দশ মিনিট লাগে। কিন্তু অনিলের মনটা আজ খুবই ভারাক্রান্ত; মন্থর পদে নিজেকে যেন সে ঠেলে নিয়ে চলতে লাগল। অনিল ভাবে—না, থাক, টিকিটটা আজ আর যাই কিনলাম। খোকা পথ্য

করুক তখন না হয় আবার দেরাদুন যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। অনিলের ভাবনার কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। বিশের যত ভাবনা যেন তার মাথায় ভর করে বসেছে। তার নিজের চিন্তা, খোকার চিন্তা, বিমলার চিন্তা, এবং সেই সঙ্গে নিবারণেরও। খোকা না হয় সেরে উঠল, তখন যদি বিমলা তাকে কাছে টানবার চেষ্টা করে, অপরাধ স্বীকার করে চোখের জলে তার অভিমানকে ভাসিয়ে দেয়, তখন? তখন কি করে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে? কিন্তু তার এ দুর্বলতাকেই বা সে প্রশ্রয় দেয় কি করে? যা হয় না, যা হবার নয়, এমন প্রত্যাশাকেই কি সে এতদিন ধরে বুকের মধ্যে লালন করে এসেছে? কোথায় তার সে সংকল্পের দৃঢ়তা? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে কি মনে প্রাণে দুর্বল হয়ে পড়েছে?

বিমলার কাছে অনিল যা চায়নি, সে তাই উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে,—ভালবাসা, মমতা, আদর আরো অনেক কিছু; সময় সময় মনে হয়েছে হৃদয় কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে, উপচে পড়ছে; কিন্তু সে তার কাছে আরো কিছু চেয়েছিল—না, সে কথা মনে ক'রে আজ সে দুঃখ পেতে চায় না। কিন্তু সন্দেহ হয়, কেন এমন হল? যে একদিন অযাচিত ভাবে নিজেকে তার কাছে সমর্পন করতে অস্থির হয়ে উঠল, গভীর অনুরাগে তার জীবনকে রাঙিয়ে তুলল, এমন কি একদিন গভীর আবেগে দুই বাহুর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তাকে চিরদিনের জন্য বন্দী ক'রে রাখতে চাইল, সে কি তবে তার ব্যর্থ যৌবনের অতৃপ্ত তৃষ্ণা? দেহ ও মনের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালা হয়ত এমনি করে আমাকে একদিন গ্রাস করতে চেয়েছিল। অথবা সে তার খেয়াল, সাময়িক ভাবাবেগ, নারীর আহত মর্যাদার প্রতিশোধ স্পৃহা? প্রেম ছিল না? অনুরাগ ছিল না? হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল না? হয়ত তাই। স্বামীকে সে ভালবাসতে পারেনি; যে স্বামী আত্মসুখ ও সম্ভোগস্পৃহা চরিতার্থের জন্য স্ত্রীর দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, বিকৃত কদর্য কামনার অগ্নিদাহে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে, মনের সকল প্রকার কোমল প্রবৃত্তিকে অপমানে লাঞ্ছনায় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে দূরে, সে আর যাই হোক ভালবাসার যোগ্য নয়। এই বিশ্বাসেই কি সে বিমলার কাছে ধরা দিয়েছিল?

ভাবতে ভাবতে অনিল অন্যমনস্ক ভাবে কখন যে সিঁড়ি বেয়ে বিমলার ঘরে এসে দাঁড়ালো তা সে জানতেই পারেনি।

খোকা শুয়ে আছে, মাথায় আইসব্যাগ ধরে পুতুলের মতো বসে আছে বিমলা—নির্বাক, নিস্পন্দ, রোগার্ত সন্তানের মুখের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এ ক'দিনে বিমলা যেন কাঠ হয়ে গেছে। একবার অনিলের দিকে সকরুণ দৃষ্টি মেলে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলল—"এলে?"

খোকার মাথার কাছ থেকে উঠে বিমলা পাশের চেয়ারে বসল। অনিল আইসব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দিয়ে খোকার পাশে বসে পড়ল। চারিদিক নিস্তব্ধ, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে রাস্তার লোকচলাচল প্রায় বন্ধ। খোকার মাথায় হাত দিয়ে অনিল বলল—"উঃ কী গরম! থার্মোমিটার আছে?"

বিমলা টিপয়ের উপর থেকে থার্মোমিটারটা অনিলের হাতে দিল—হাতটা যেন তার একবার কেঁপে উঠল। টেম্পারেচার নিয়ে অনিলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বলল—"বিনু, তুমি একটু বস আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।"

বিমলা আবার খোকার শিয়রে এসে বসল, বরফ বদলে দিয়ে আইসব্যাগটা খোকার মাথায় ধরতেই সে একবার চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করল, জড়িত কণ্ঠে বলল—"কাকু?"

বিমলা বলল,—"ঘুমোও খোকন, কাকু ডাক্তার ডাকতে গেছেন, তুমি অনেকটা ভাল আছ, শুধু পাল্টাতে হবে কিনা তাই!"

চোখ বুজে খোকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বিমলা আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করল কিন্তু চোখের জল রোধ করতে পারল না।

বিমলা ভাবে, এই সেই অনিল, বয়সের পার্থক্য বেশি নয় কিন্তু অনিল ছিল যেন তার অভিভাবক। তার সহজ ব্যবহার, এই পরিবারের বিপদে আপদে অযাচিত সেবা বিমলার স্বামীর অবিদিত ছিলনা —অনিলকে সে ভালবাসত, সমীহও করত। সমস্ত পল্লীতে অনিলের প্রভাব ছিল অসাধারণ। অনিলই তো বিমলার স্বামীর সব কিছু কেলেঙ্কারি নানাভাবে ঢেকে চলত। তারই ভয়ে তার স্বামীকে কেউ কিছু বলতে সাহস করত না; নয়তো তার উপদ্রবে পাড়ার শান্তি বিঘ্নিত হত গভীর রাত্রে। বিমলাদের বাড়ী অনিলের যাতায়াত কেউ নিন্দার চক্ষে দেখত না। এমনকি বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে কতদিন অনিল একাই বাইরে গেছে, সেজন্য কখনো কানাঘুষাও শোনা যেত না। খোকাকে অনিল বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে। আর খোকনকুমার নামটিতো অনিলেরই দেওয়া। অথচ অতি তুচ্ছ কারণে হঠাৎ একদিন কিসে থেকে কিসে হল—তাবলে আজও তার মাথা ঘুরে ওঠে। বিমলা ও অনিলকে জড়িয়ে বহুদিন পরে লোকনিন্দার যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছিল—তা নিঃশেষে স্তব্ধ করে দিতে অনিলকে যে কতখানি স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল সে কথা মনে হতেই বিমলা যেন আজ আবার নূতন করে অনিলের উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ল তার প্রসুপ্ত অনুরাগ আজ যেন স্মৃতির ইন্ধনে আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তার উত্তাপে জ্বালা নেই, স্নিগ্ধতা আছে। সমস্ত দেহ মন যেন উষ্ণতায় সচেতন হয়ে ওঠে।

সন্তানের রোগশয্যায় ব'সে আজ আবার নূতন করে বিমলা অনুভব করে, অনিলকে ছাড়া আর একদণ্ডও চলবে না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করে—অনিলকে সে ফিরিয়ে আনবেই; তার শূন্য হৃদয়ের হাহাকার, নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যর্থতা যেন তাকে আজ আবার বিহ্বল করে দেয়, একটি ব্যাকুল কাতর হৃদয়ের অসহিষ্ণুতা তাকে যেন চঞ্চল করে তোলে—বিমলা অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু আশার ক্ষীণ আলো, তার দামই কি কম?

ডাক্তার বলে গেলেন—"ভয় নেই, জ্বরটা খুব প্রবল বটে কিন্তু কোনো জটিলতা নেই, সেরে যাবে। খোকার বয়স কত?"

বিমলা বলে—"এই দশ বছরে পড়েছে।"

ডাক্তার বলেন—"কোনো কারণে 'শক্' পেয়েছে কি?"

বিমলা বলে—"কিছু দিন থেকে পড়াশোনায় মন নেই, একলাটি চুপচাপ বসে থাকে, বাইরে যায় না। কেবল বলে, চল মা, আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই। কলকাতা ভাল নয়, যেন ভয় লাগে।"

ডাক্তার আর কিছু বলেন না, ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে চলে যান।

অনিল তাঁর ভিজিটের টাকা দিল—বিমলা যেন দেখেও দেখলে না।

বেলা তিনটে বেজে গেছে। সরলা ঘরে ঢুকে যেন অনিলকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বিমলাকে বলে—

"আজ সাত দিন এক নাগাড়ে একভাবে বসে আছ, না স্নান, না খাওয়া, না শোওয়া। এইবার একটু কলঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও—আজ দুটো মুখে দিতেই হবে। আমি ঘরে খোকার কাছে বসছি।"

অনিল বলে—"না না, আমিই তো বসে আছি।"

বিমলা বলে—"সে কি হয়? তুমি যাও এসো, নিবারণ তোমার জন্ত বসে আছে। বলে আসনি তো?"

অনিল ভাবে—মন্দ নয়, একবার নিবারণকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব'লে আসি, কতদিন বেঁচে চলবে কে জানে!

খোকার মাথায় হাত দিয়ে অনিল দেখল জ্বরটা যেন কমের দিকে নামছে।

অনিল উঠতেই বিমলা বলে,—"সরলার হাতের রান্না তো অনেকদিন খেয়েছ—আজও না হয় দুটি খেতে। কিন্তু যাক, তাতে নিবারণকে কষ্ট দেওয়া হবে। তুমি একবার বাড়ী ঘুরেই এসো কিন্তু যেন বেশি দেরি করো না।"

উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করেই বিমলা কলঘরের দিকে চলে গেল।

অনিল যেন বিত্রাতের মতো একটির পর একটি সিঁড়ি গুণে গুণে নামছে। রাস্তার মোড়ে তার যেন পা আর চলছে না। সম্মুখে নিবারণকে দেখে সে যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল; বলল—'ও, তুমি এসে গেছ? চল যাই। স্বপনের মামী অসুখ।"

নিবারণ কথার কোনো জবাব দিল না, অনিলের আগে আগে চলতে লাগল।

খাওয়ার টেবিলে বসে ঠাণ্ডা ভাত দুচার গ্রাস মুখে দিতেই সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অনিলের কাছে বিস্বাদ বোধ হতে লাগল। যতই ভাবে কেন তার এই ভাবান্তর, ততই নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হয়। ভাঙা কাচ জোড়া দেওয়ার জন্ত তার এত মাথাব্যথা কেন? আপন মনে বলে—আমার কিসের এত মাথাব্যথা? খোকার অসুখ, বিমলার এই অসহায় অবস্থা—কিছুরই জন্ত তো আমি দায়ী নই।

দেওয়াল ঘড়ীতে চং চং করে পাঁচটা বেজে গেল। অনিল ব্যস্তসমস্ত হয়ে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

নিবারণ নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছেও যেন আজ অনিল অপরাধী। বলল—"নিবারণদা, তোমাকে বলতাম যে ওষাড়ীর খোকার খুব অসুখ, নিদিমণি একলাটি—গিয়ে যখন পড়েছি, তখন ছেলেটিকে বিছানা থেকে তুলে পথ্য না দিয়ে আমার ছুটি নেই। রাতে যাতায়াতি হলে আজ আর বাসায় ফিরব না। তুমি ঘরদোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ো, বুঝলে?"

নিবারণ অপ্রসন্ন চিত্তে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—"আচ্ছা।"

ইন্‌জেকসনে ফল হয়েছে—খোকা যেন আজ কিছুটা সুস্থবোধ করছে—মুখচোখের চেহারা ভাল। বিমলা আজ সাত আট দিন পরে ভাল করে স্নান করল, খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে দেরাজ খুলে যে শাড়ীখানি পরল, সেখানি গত পুজোয় অনিলেরই দেওয়া; কিনিয়ে দেব দেব ক'রে আর দেওয়া হয়নি—ইচ্ছাও তেমন ছিল না। তারপর বিমলা বারান্দার পড়ন্ত রোদে এলোচুলে

দাঁড়াতেই দেখল—ঘুরে অনিল আসছে। বিমলা নড়ল না, পথের দিকেও আর তাকালো না, ঘরের মধ্যেও এল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই বিমলার সঙ্গে অনিলের চোখোচোখি হয়ে গেল। বিমলার পরণের শাড়ীখানি দেখে অনিলের বুকটা যেন ধাঁৎ করে উঠল। সে লক্ষ্য করে দেখল, এখনো বিমলার মুখে বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি; সোনার মতো রঙে কে যেন একটু খাদ ঢেলে দিয়েছে কিন্তু তাতে যেন ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়েছে। দীর্ঘদেহী সুন্দরী নারীর সমস্ত আকর্ষণীয় লাবণ্য যেন দানা বেঁধে আছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। অপরাহ্নের স্তিমিত রৌদ্রালোকে তাকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। বিমলা যেন তপঃক্লিষ্টা উমা, কৃষ্ণাবনেও প্রায়-অতিক্রান্ত যৌবন একটি অপরূপ মহিমায় আকর্ষণীয়। মনের চাঞ্চল্য যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, তার আয়ত চোখ দুটিতে, রক্তিম ওষ্ঠপুটে ভাষা যেন মুখর হয়ে উঠেছে কিন্তু তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে সে যেন কাছে এসেও দূরে সরে যেতে চায়। বিমলাকে দেখে অনিল আর একবার চমৎকৃত, মোহিত হয়ে গেল। কিন্তু বলতে ভরসা পেল না—তোমায় আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিমলা বল্‌লে—"এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? খাওনি।"

"না না, খেয়েই এসেছি—না খেলে নিস্তারণদার কাছে রক্ষা আছে!"—বলেই অনিল হাসবার চেষ্টা করল।

খাবারঘরের পাশ দিয়ে একবার অনিলের দিকে তাকালো, তার পর 'মাগো, একটু জল দাও' বলে চোখ বুজে হাঁপাতে লাগলো। গা হাত পা যেন তার কাঁপছে। অনিল ছুটে এসে বিছানায় বসে পড়ল—গায়ে মাথায় হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করল—জ্বরটা যেন বেড়েছে। বিমলা ততক্ষণে বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"হঠাৎ কি হল বল দেখি?"—কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল বিমলা।

"তাইতো ভাবছি। ডাক্তারের দিকেই তো যাচ্ছিলাম। ডাক্তারকে একবারটি জিজ্ঞাসা করে আসি।"

বিমলা খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবছে, জানিনা কপালে কি আছে?

ডাক্তার বললেন—"কিছু ভয় নেই—'রাইগার' ইনজেকসনের পর অনেকের ওটা হয়। আমি রাত্রি ৮টা নাগাদ একবার দেখে আসব।"

ফিরে এসে অনিল দেখল—খোকা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। গায়ে হাত দিতেই সে চোখ মেলে তাকালো, বলল—"কানু, হাতে বড় ব্যথা।"

বিমলা বলল—"এক্ষুনি সেরে যাবে খোকন, আমি সেক দিয়ে দিচ্ছি।"

সেক দিতে দিতে খোকা আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

সরলা বাসন-কোসন মেজে চালের জল চাপিয়েছে। বিমলা ঘর থেকেই তাকে লক্ষ্য করে বলল—"জলটা ফুটলে আমায় ডাকিস সরলা।"

রোগীর শয্যাপার্শ্বে দু'দিকে দু'জন বসে আছে—যেন অসীম সমুদ্রের এপার ওপার—দুস্তর, দুরতিক্রম্য। উমেশ তখন ঝুলে ঝুলে আহ্নিক পড়ছে। হাত বাড়ালে যাকে ধরা যায়, তাকে মনে হচ্ছে

বহুদেশিনী—মুখ বাড়িয়ে অনিল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বিমলা একবার সচকিত দৃষ্টি ফিরালো অনিলের দিকে।

আবার দু'জনেই চুপ করে গেল। কারো মুখে কথা নেই, কেউ কারো দিকে তাকায় না। মাঝে মাঝে রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। তবুও যেন কেমন একটা অস্বস্তির ভাব ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা হয়েছে। বিমলা বিছানা থেকে উঠে সুইচটা টিপে দিতেই নীলবাতির মৃদু আলোকে দেখা গেল দুইটি প্রাণী নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে—যেন কেউ কাকে চেনে না। একটি বিষয় বিষণ্ণতায় যেমন আচ্ছন্ন—এমন পরিবেশে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না—শুধু চুপ ক'রে স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করা চলে।

সরলা ডাকতেই বিমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেতে দু'পেয়ালা চা ও একটি প্লেটে কিছু খাবার এনে ছোট একটি টেবিলের উপর রেখে দিল।

"ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—তুলে নাও।" বলেই বিমলা নিজে একটি চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। অনিলের পক্ষে না বলবার কোনো অবকাশই রইল না।

"কিন্তু এত খাবার কেন; কতক্ষণই বা খেয়েছি।" ব'লে অনিল চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

"কত যে খেয়েছ তাতো মুখ দেখেই বুঝেছি।" ব'লে বিমলা খাবারের প্লেটখানা অনিলের দিকে আস্তে আস্তে ঠেলে দিল।

অনিল হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে বসল—সত্যই তো তার ক্ষুধা পেয়েছে। দ্বিরুক্তি না ক'রে সে নিঃশব্দে খাবারের প্লেটখানি নিঃশেষ করে ট্রেতে রেখে দিল।

রাত্রে আর অনিলের বাড়ী ফেরা হল না। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে খোকা চমকে উঠছে। পায়ে হাত বুলিয়ে বিমলা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। রাত্রি তখন একটা। পাশের ঘরে বিছানা পেতে দিয়ে বিমলা অনিলকে বলল—"তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ, শোওগে যাও, আমি বরং ততক্ষণ জেগে থাকি।"

"তুমি সাত দিনে ক্লান্ত হওনি আর আমি এক বেলাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম—না?" অনিল উত্তর দিল।

"আমি যে মা।" মৃদু হাস্যে প্রতি-উত্তর দিল বিমলা।

অনিল যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, একটু যেন স্নেহের সঙ্গে বলল—"তাও তো বটে! আমি তা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"ভুলে তুমি অনেক কিছুই গেছ, অনেক কিছু ভুল বুঝেও রেখেছ। কিন্তু এ কথাটায় তুমি যে ব্যথা পাবে এটা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি। খোকার বাবা এখানে উপস্থিত থাকলে, তাকেও আমি ঠিক এই কথাই বলতাম। তবে হ্যাঁ খোকাকে তুমি—"

বিমলার মুখ থেকে আর কথা বেরুল না। ঝরঝর ক'রে চোখের জল মাটিতে পড়ছে দেখে অনিল কেমন যেন আত্মহারা হয়ে পড়ল; ভাবল, যাই বিমলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সংযত ক'রে নিস্তব্ধ হয়ে সেখানেই বসে রইল।

"যাও আর রাত করো না, দরকার বুঝলে আমি তোমায় ডেকে আনিয়ে নেব।" বিমলার কণ্ঠস্বরে অনুনয়ের কাতরতা।

অনিল আর দ্বিরুক্তি না ক'রে উঠে গেল।

অনিল শুতে গিয়ে দেখল—বিমলার ঘরে তার ফটোখানি ঠিক তেমনি ভাবেই টাঙানো আছে। সাতদিন আগে ফুলমালাতে সাজানো রজনীগন্ধার তাড় শুকিয়ে গেছে—সেগুলি ফেলে দেওয়ার অবসর বিমলার না থাকারই কথা। অনিলের উপহার দেওয়া বইগুলি সযত্নে সাজানো আছে একটি ছোট বুককেসে। অনিল দেখল, বিমলার স্বামীর কোনো ফটো সে ঘরে নেই। যে অবিচার অত্যাচার সে পাঁচ বছর ধরে মুখ বুঁজে সহ্য করেছে—একি তারই প্রতিক্রিয়া? হবেও বা। খোকার ঘরের দিকে তাকাতেই সে দেখল—তার বাবার একখানি 'এনলার্জ' করা ফটো ঠিক তার শিয়রে টাঙানো আছে। অনিলের কাছে ব্যাপারটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে গায়ের উপর পাতলা চাদরখানি টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু সারারাত্রি তার ঘুম হল না। একটি অসহ্য সুখের যন্ত্রণায় সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল। বিমলা তা জানতেও পারল না।

সকালে বিছানা থেকে উঠেই অনিল মনে করল—খোকা ভাল থাকলে সে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসবে। বিমলা ঘরে নেই—সরলা বারান্দার এককোণে বসে কি যেন করছে। খোকা জেগে কি ঘুমিয়ে বুঝতে না পেরে সে তার বিছানায় এসে বসে পড়ল। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখল—জ্বর এখন নেই বললেই হয়। বগলে থার্মোমিটার দিতেই খোকা চোখ মেলে অনিলের দিকে চেয়ে দেখল। না, এখন জ্বর নেই। সে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করল, ভাবল, যাক, তাহলে বাড়ী ঘুরে আসাটা তার পক্ষে অশোভন দেখাবে না।

বিমলা ট্রেতে দু'খানি টোষ্ট, এক পেয়ালা চা এনে টেবিলে রেখে বলল—"যাও মুখটা ধুয়ে এসো, সারারাত তো চোখের পাতা বোজনি। চা-টা খেয়ে স্নান করে নাও।"

"তুমিও জেগে ছিলে নিশ্চয়—নয়তো জানলে কি করে আমার ঘুম হয়নি!"

অনিলের একথার কোনো জবাব না দিয়ে বিমলা অনেকটা আবদারের সুরে বলল—"যাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অনিল মুখ হাত ধুয়ে এসে চা ও রুটির সদ্ব্যবহার ক'রে বিমলার দিকে চেয়ে বলল—"তুমি খাবে না?"

"আমার এখনো স্নান হয়নি—খাবো'খন, সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না।"

অনিল বলল—"আমি একবার ওবাড়ী ঘুরে আসি। নিবারণদার পাল্লায় পড়লে—না খাইয়ে সে আসতে দেবে না।"

বিমলা কথার উত্তর দিল না—তার মতামতও ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু অনিলকে একবার যেতেই হবে। তার যেন মনে হল—এক নাগাড়ে এখানে থেকে যাওয়া বোধহয় ভাল দেখাবে না। সে আস্তে আস্তে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে অনিল দেখলে—নিবারণ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। গায়ে হাত দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে তার হাতে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিল। তারপর ভাল করে স্নান করে পড়ার টেবিলে এসে বসল। আজ দু'দিন কাগজ পড়া হয়নি। কাগজ পড়তে পড়তে অনিল যে কখন ঘুমিয়ে গেছে—তা সে টেরই পায়নি। বাজার থেকে নিবারণ ফিরে এসে রান্নাবান্না সেরে

অনিলকে ঘুম থেকে তুলে আপন মনে হাসতে লাগল। বলল—"ছাগলা নড়া হলে যখন ঘুম হয় না, তখন রাত্রে ফিরে এলেই তো পার।"

অনিল বলল—"হাঁরে, রান্না করে গেছে?"

কোনো জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অনিলের খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে নিবারণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনিল কালবিলম্ব না করে খেতে বসে গেল।

নিবারণ আজ অনেক কিছু রান্না করেছে—শুক্ত, ডাল, ডালনা, মাছের ঝোল, পেঁপের চাটনি; আবার পাথরের বাটীতে ঘরে পাতা খানিকটা দইও আছে। সত্যই আজ অনিলের খিদে পেয়েছিল; সে বেশ পরিতোষ সহকারে আহার পর্ব শেষ করে আবার খবরের কাগজ নিয়ে বিছানার উপর বসে বসে পড়তে সুরু করল। কিন্তু কেমন যেন ঘুমুনি আসছে। সে এবার মা রাত পা মেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল অথবা বলা যায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হল। এক রাত্রির অনিদ্রায় কেমন একটা আলস্যের ঘোরে তার চোখ বুজে আসছে। আচ্ছা একটুখানি ঘুমিয়ে নিই—ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতেই অনিল দেখল রোদ পড়ে এসেছে। বেলা আর বেশি নেই। লজ্জায় অনিল যেন কেমন মুষড়ে পড়ল। বিমলাকে সে কি অজুহাত দেখাবে—খোকা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি—সে কী করে সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। ছিঃ ছিঃ, তার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

নিবারণকে কাছে ডেকে সে এবার বলে দিল—ক'দিন না আসতে পারলে সে যেন চিন্তা না করে। পকেট থেকে পাঁচটি টাকা তার হাতে দিয়ে অনিল প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় তাড়াতাড়ি বলে গেল—খোকা কাল সুস্থ হয়ে উঠলে সে আর দেরি করবে না—চলে আসবে।

ঘরে ঢুকেই অনিল দেখল, খোকা বেশ সুস্থ, তাকিয়ে আছে। বিমলা আস্তে আস্তে তাকে চামচ করে ফলের রস খাইয়ে দিচ্ছে।

অনিল বলল—"ভারী দেরি হয়ে গেল—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—বুঝলে? আমার আর কোনো পদার্থ নেই, খোকা অসুখে পড়ে, আর আমি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম।"

অনিলের অপ্রস্তুত ভাব দেখে বিমলা বলল—"কাল রাত্রে তোমার একটুও ঘুম হয়নি। একে শরীরের ক্লান্তি, তার উপর মনের উদ্বেগ, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। খোকা ভাল আছে, আমিও দুপুরে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিইছি।"

বিমলার কথায় অনিলের যেন অপ্রস্তুতের ভাবটা কেটে গেল। কিছুক্ষণ পরে বিমলা বলল—"ডাক্তার বিকেলে এসেছিলেন, ওষুধ পাল্টে দিয়ে গেছেন—সরলাকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছি।"

অনিল যেন শুনতেই পায়নি, এই ভাব দেখিয়ে খোকার পাশে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল—"কেমন আছ খোকা?"

"ভাল"—সে আর কোনো কথা বলল না। তার দৃষ্টি থেকে তখনো জ্বরের ঘোর কাটেনি। তবু অনিলের মনে হল, খোকার কথায় যেন অভিমানের সুর। তার দুর্বল চাহনিতে যেন কাকুতে খুব কাছে পাবার আকুতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনিল আরো সরে এসে খোকার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

বিমলা বলল—"তোমায় একটু চা এনে দিই।"

অনিল বলল—"কিন্তু শুধু চা ; নিবারণদা আজ আমার নেমন্তন্ন খাইয়েছে—রাত্রে আর কিছু খাবো না।"

বিমলা হেসে বলল—"রাতের এখনো অনেক দেরি, সে তখন দেখা যাবে'খন।"

এমনি করে একে একে পনেরটা দিন যে কেমন করে কেটে গেল—বিমলা ও অনিল তা বুঝতেও পারল না। ভাল মন্দের মধ্য দিয়ে খোকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। অনিল কখনো এবাড়ী, কখনো ওবাড়ী খেয়েছে শুয়েছে এবং কারণে অকারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় শুধু শুধু পা ছড়িয়ে গায়চারি করে বিমলার সঙ্গে আজেবাজে কথা করে কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কেউ অতীত জীবনের কোনো কথা কোনো দিন তোলেনি। সময় সময় বুকের উপর পাথরচাপা একটা ভারে দু'জনেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। দু'জনের মধ্যে সামান্য দু'হাতেরও ব্যবধান নয়, তবু তারা তাদের চারিদিকে একটা কঠিন লৌহযবনিকা বিস্তার ক'রে সেই পর্দে কখনো কেঁদেছে, কখনো হেসেছে। এমনিই তো হয়, হৃদয়কে শুষ্ক রাখতে রাখতে শুধু যে জীবনের সমস্ত রস শুকিয়ে আসে তাই নয়, আয়াসলব্ধ ঔদাসীন্য আঘাত করে, যন্ত্রণা দেয় ; বাক্যশূন্য, ভাবাবেগশূন্য কঠিনতাও বুঝি ক্রমশঃ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তখন ইচ্ছা করলেও সহজ হওয়া যায় না, পরস্পর পরস্পরের পাওয়ার পথও যেন সংকীর্ণ হয়ে আসে। সেই অনিবার্য্য বিপত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'জনেই যেন হাল ছেড়ে বসে রইল।

বিমলা ও অনিলের জীবনে খোকার অসুখ এক স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাকে বরণ করে এনেছিল কিন্তু অভিমানী মনের ঘৃণায়িত বহ্নি দুই দিকেই সমানে অন্ধকারকে ক্রমশঃ যেন ঘনীভূত করে তুলেছে। একবার ভাল করে জ্বলে উঠলে, উত্তাপ সঞ্চারের পর হয়ত আগুন নিভে যেত। কিন্তু জ্বলে উঠল না বলেই তার দাহ উভয়কে জ্বলসাতে লাগল—হঠাৎ জ্বলে উঠে নিবে গেলে উভয়েই যেন মোহমুক্ত হয়ে শান্ত হ'তে পারত। কিন্তু আপাততঃ তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

খোকা এখন স্কুলে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যার আগেই খোকার মাষ্টারমশায়ের আসার কথা। খোকাকে 'টেম্পার হর্ণ' দেখাবার জন্য টিকিট কেনা হয়েছে। অনিল ও বিমলা মুখোমুখি হয়ে বসে ছিল। জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে খোকা ঘরে এসে বলল—"কাকু, তুমি চলে যেও না, আমি ফিরে এসে তোমাকে ছবির গল্প বলব।"

অনিল খোকাকে বুকের কাছে টেনে চুমু খেতে খেতে বলল—"আচ্ছা।"

মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে খোকা চলে যেতেই অনিল চেয়ারখানা বিমলার কাছে টেনে এনে বসল।

হঠাৎ কিছুটা উত্তেজিত ভাবেই অনিল বিমলাকে বলল—"বিমলা, আমি আজ তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই। এইভাবে বেঁচে থাকা আমার সহ্য হচ্ছে না।"

"কিন্তু কিসের বোঝাপড়া শুনি ?" খুব শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করল বিমলা।

"যে অসহ্য যন্ত্রণা আমি আজ চার বছর ধ'রে মুখ বুজে সহ্য করছি, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না।" বলেই অনিল যেন হাঁপিয়ে উঠল।

"না, আমি আর তা কি করে ধারণা করব ? কিন্তু এতদিন পরে তুমি—" কথা কটি বলেই বিমলা হাসতে লাগল—অনিল দেখেও দেখল না বিমলার চোখে জল।

"এটা হাসবার কথা ?" বলেই অনিল চেয়ার ছেড়ে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগল।

"বসো, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই।" ব'লে অনিলের হাত ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল বিমলা।

"শোন তবে।" বিমলা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে যেতে লাগল :

"তোমরা পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষের মনের খবর নাকি তোমাদের নখদর্পণে। তাতেই তোমাদের গর্ব। কিন্তু সেটা যে কতখানি মিথ্যা, কতখানি আত্মপ্রবঞ্চনা—তা কি তুমি নিজে জানোনা ? আমার দুঃখ এই যে আজ তোমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে হল।"

"তার মানে ?" একটু উঁচু পর্দায়েই বলে উঠল অনিল।

"মানেটা বোঝা কি এতই কঠিন অনিলবাবু ?" নিজেকে খাটো করে আমাকে খাটো করলেই বোধ হয় ভাল হয়। আমার উপর এটুকু সুবিচারও কি আমি আশা করতে পারিনে ?" বলতে বলতে বিমলার কণ্ঠস্বর যেন ভারি হয়ে এল।

"এতদিন পরে তোমার মুখে কথাগুলো যেন কেমন লাগছে, তুমিই বল ?"

অনিল অনেকটা নরম হয়েই জিজ্ঞাসা করল বিমলাকে—"তোমার কি মনে নেই—তুমি অতি সামান্য কারণে এবাড়ী থেকে রাগ করে চলে গিয়েছিলে ? নিজের পুঁজি প্রায় ফুরিয়ে এল - চোখ বুঁজে তোমার পরসা নিতে নিতে হঠাৎ একদিন যেন আমার চোখ খুলে গেল—এই খোকার কথায়। খেলার সাথীর হাতে একটা 'টয় পিস্তল' দেখে খোকা বায়না ধরল—তাকে একটা কিনে দিতেই হবে। অর্থাৎ তার মায়ের যে কাণ্ডাকড়িরও মুরোদ নেই তা ঐটুকু বালকও বেশ বুঝেছিল।"

বিমলার কথা শেষ না হতেই অনিল বলে উঠল—"কেন ? আমার কি তাতে অপমান জ্ঞান হয়েছিল ? খোকাকে একটা খেলনা কিনে দেওয়ার অধিকারও বুঝি আমার ছিল না ?"

"নিশ্চয়ই ছিল, তবু আমার নিজের সাধ আহ্লাদ বলতে কি কিছু থাকতে নেই ? সব তাতে তোমার উপর নির্ভর ক'রে ক'রে আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।" বিমলা উত্তর দিল।

অনিল তার উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে বলল—"কিন্তু বিনু, আমি তো কোনোদিন কোনো কারণে আমার পরসা আমার বলে মনে করিনি। আমাদের দু'জনের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে কি তবে মিথ্যে ? আমার কাছে তা মিথ্যে নয়, তোমার কাছে হয়ত তাই—সবই আমার ভাগ্য !"

বিমলা পিট পিট জবাব দিল—"সম্পর্কটা সত্যি কি মিথ্যে সেটা বুঝি মোর গলায় না বললে বিশ্বাস হয় না ? তুমি শুধু নিজেকেই দেখেছ, আমাকে দেখনি।"

বিমলার কথায় এই অভিমানের সুরটি অনিলের হৃদয় স্পর্শ করল। সে লজ্জিত হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল—"তুমিই না বলেছিলে, তোমাকে যা দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—কোনো অবস্থাতেই নয় ?"

"সেটা আমি এখনো মনে করি—নিজের উপর বিশ্বাস হারাইনি ব'লে—এখনো সেকথা বলতে পারি।" বেশ দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল বিমলা।

"ওঃ তাহলে আমিই আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছি ?" জিজ্ঞাসা করে অনিল।

বিমলা বলে—"সেকথা বলছিনা, তবে অমলবাবুর সঙ্গে গিয়ে যদি রেডিওতে গান দিয়ে থাকি, তাতে আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করলাম যে তোমার কাছে হঠাৎ আমি অসহ্য হয়ে উঠলাম।

আর তুমি তো জানো, ঘরে থেকে কথা হয়ে ছিল। বাড়ী ভাড়ার টাকা সময়মত পাইনা, শ্বশুরের আমার নামে গচ্ছিত ব্যাঙ্কের টাকার সুদও পাই তিন মাস অন্তর। প্রয়োজন হল বলেই না একাজে পা বাড়ানোয়। আর অমলবাবু আমার দাদার মতো। বয়সে প্রায় আমার বাবার বয়সী। আত্মভোলা মানুষটি। নিজের মেয়ের মতো ক'রে আমায় গান শিখিয়েছিলেন। জীবনে যে কী দুঃখ আমি পেয়েছি তা তো তুমি জানো। কত কাল আর তুমি এই ভাঙা নৌকো টেনে টেনে চলবে? তাই ভেবেই—না থাক, তোমার কাছে এসব কথা বলতে আমার যে আজ .....”

বিমলা আর কিছু বলতে পারল না—বলার চেষ্টাও করল না—শুধু ঘরে বসে থাকতে থাকতে একেবারে প্রায় আর্তনাদ করেই কেঁদে উঠল।

তাকে এমনভাবে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে অনিল কখনো দেখেনি। সে তার উপর অবিচারই করেছে। বিমলা যে নিজের সবদিক উজাড় ক'রে দিয়েছিল অনিলের কাছে, সেটা তো কল্পনা নয়। এক একদিন বিমলার ভালবাসার কাছে তার নিজের ভালবাসা তুচ্ছ ব'লে মনে হয়েছে। যার পরিপূর্ণ হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে তার কামনার অসংখ্য কোরকগুলি কেবা সহস্র দলে ফুটে উঠেছিল, রূপে গন্ধে ও আস্বাদে তার নিঃসঙ্গ জীবনকে তার নিজের কাছেও পরম রমণীয় করে তুলেছিল, আজ তাকে যে নূতন করে আবিষ্কার করতে হচ্ছে এও তো তাদের বিড়ম্বনা। না, আর তাকে দুঃখ দেবে না—নিজেও দুঃখকে সাধ করে মনে স্থান দেবে না। দূরে দূরে রেখে সে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে আর তাকে দূরে থাকতে দেবে না। এতদিনের ব্যবধানকে সে নিজের পৌরুষের জোরে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে।

সমস্ত ঘরের মধ্যে তখন মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নেমে এসেছে। বাইরেও সাড়া শব্দ নেই—চারিদিকে গভীর অন্ধকার। শুধু ঘরের আলোটি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। সরলা নিচের ঘরে নিদ্রামগ্ন। সেই নীরব নির্জন পরিবেশে দু'জনেই ভাবছে—খোকা এসে পড়লে যেন বেঁচে যাওয়া যায়। বিমলা মাথা নিচু করে যেন কাঠ হয়ে বসে আছে। অনিল মাঝে মাঝে চেয়ার ছেড়ে উঠছে আবার বসছে। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল—ছবি শেষ হতে এখনো দেড়ঘণ্টা বাকি। ঘরে ফিরতে তোর না আরো আধঘণ্টা লাগবে। অনিল একটা চুরুট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পা যেন কাঁপছে, বুকের মধ্যে কেমন যেন অসহ্য যন্ত্রণা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। অনিল মুখ থেকে চুরুটটিকে টান মেরে বারান্দায় ফেলে দিল। হৃদয়ের মধ্যে যেন লাভাসমুদ্র একসঙ্গে উদ্বেলিত—না, সে আর নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারবে না।

অনিল কখন যে বিমলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে—কতক্ষণই বা তারা একটি নিবিড় তন্ময়তার মধ্যে ডুবে আছে, সে জ্ঞান যেন কারোই নেই। বিমলাকে একটু সরিয়ে দিয়ে অনিল তার মুখখানিকে চোখের সম্মুখে তুলে ধরলো—দেখলো সে মুখ যেমন শান্ত তেমনি সুন্দর, কোথাও কোনো ক্লান্তির ছাপ নেই, চোখ দুটিতে একটি স্নিগ্ধ করুণা-কাতর উন্মুখ দৃষ্টি, চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতো শোভা পাচ্ছে—বিমলা যে এতো সুন্দর, এতো আকর্ষণীয়—তা যেন সে আবার নূতন করে আবিষ্কার করল।

অনিল আর স্থির থাকতে পারল না। গভীর আবেগে সে তার তৃষ্ণার্ত বিরহবিধুর প্রেমের

বিজয়চিহ্ন বিমলার ওষ্ঠাধরে গণ্ডদেশে কপোলে একটির পর একটি অঙ্কিত করে দিল। বিমলার মুখে শুধু স্মিতহাস্য মধুর হয়ে উঠল কিন্তু সে তার প্রতিদানে দিল না, শুদ্ধ হয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল। কোনো ভাবান্তরই দেখা গেল না। অনিল বিস্মিত হল।

বিমলার উদাসীন নিরুত্তাপ আচরণে সে ব্যথিত হল কিন্তু কোনো কথাই বলল না, মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়ী ফিরে এল। মনে মনে ভাবতে লাগল এ তার জয়, না পরাজয়?

ক'দিন থেকে অনিলের শরীর ভাল নয়, মনও ভাল নয়। মাথার যন্ত্রণা, ঘাড়ে পিঠে টান ধরে। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে, শরীর আগের মতো সবল নয়। কোনো কথাই সে বিমলাকে জানায়নি। জানিয়ে লাভই বা কি? সমাজে যা নিন্দনীয় তার প্রতি তার ঘৃণা ছিল; সে তার প্রেমের মহত্বে সবকিছু জয় করে নেবে এই ছিল তার সংকল্প। অধিক দুঃসাহসে সে যা করেছে তার জন্য অনুশোচনাও নেই। দু'জনের জীবনকে সহজ সরল করে সোজা পথে চলবার উপায়ও ছিল। সে নিজেকে বা বিমলাকে ফাঁকি দেয়নি; একান্ত অপরিহার্য ভাগ্যকেই সে স্বীকার করে নিতে চেয়েছিল, ধর্ম তাতে বাদ সাধত না, সমাজ তাতে বাধা দিত না। সমাজ ধর্ম নীতি প্রেমের পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, যা কদর্য যা কুৎসিত তাকেই সে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিল। যে পথে সে জয়-ধ্বজা উড়িয়ে সগর্বে চলে যেতে পারত সে পথের বাধাকে একমাত্র বিমলাই তো নারীর মর্যাদায় সরিয়ে দিতে পারত। অনিলের মাথাটা টনটন করে উঠল। বসে থাকতে কষ্ট হয়। রাত্রে সে জলস্পর্শ করল না। বিবারণকে কিছু না বলেই সে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনিল ভাবে, এমনি ক'রে বেঁচে থাকার প্রয়োজনই বা কি, সার্থকতাই বা কি; সেতো জানে সুতোকাটা ঘুড়ির মতো একদিন সে কোথায় ছিটকে পড়বে। বহুদূরে, হয়ত লাটাই হাতে ঘুড়ির মালিক আকাশের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করবে কিন্তু অদৃষ্টে ছিটকে-পড়া এ ঘুড়ির জন্য হা-হুতাশ করার মতো কেউ আর রইল না। কিন্তু কেনই বা সে পরাজয় স্বীকার করবে বিমলার কাছে? বিমলা তো অনিলকে তার নিজের জোরে জয় করে নেয়নি, জীবনের পরীক্ষায় তারই তো অনিলের কাছে হার মানতে হয়েছে—হয়নি কি? কিন্তু এসব যুক্তিতর্কে আজ লাভই বা কি আছে? যা হবার তাতো হয়ে গেল আর আশা প্রত্যাশারই বা রইল কি?

আজ দু'দিন হল অনিল তার ব্যবসার দিকে মন ফেরাবার চেষ্টা ক'রে চলেছে কিন্তু মন বসে না। কার জন্যই বা পরিশ্রম করা। তার নিজের জন্য সে ভাবে না—এখনো সামান্য যা আছে তা সম্বল করে সে কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। নিবারণের মাইনার টাকা জমা আছে পোষ্ট অফিসে। তাকে আর কিছু দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেবে—কেউ না কেউ তার আছে নিশ্চয়ই।

ভাবতে ভাবতে অনিল উঠে পড়ল—জামাটা গায়ে দিয়ে নেমে এলো নীচের রাস্তায়। যাই, খানিকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই—অনেক দূরে—মাথার যন্ত্রণাটা কমে যাবে—মনটাও হালকা হবে। কিন্তু অনিলের আর বেশি দূর যাওয়া হলনা—চিত্রার্পিতের মতো বিমলাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। খোকা বসে বসে ছবির বই দেখছে। বিমলা তখন

কলঘরে। মা ঘুরেই বিমলা ঠাকুর ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকে সে কথা অনিল জানে। পাছে অনিল এসেছে ব'লে বিমলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাই খোকাকে নিয়ে সে বাজারের দিকে চলে গেল। যখন ফিরে এল তখন তার হিংসা ভরা ফিনিল, ব্যাট্, বল, টয় পিস্তল, কারাম বোর্ড, ব্যাগাটেলি ইত্যাদি। এছাড়া বিস্কুটের টিন, টফি প্রভৃতিতে খোকার দু'হাত ভর্তি। বিমলা তখন ঘরে ব'সে দরজার ফাঁক থেকে বাজারের হিসাব নিচ্ছে। খোকার আনন্দ কোলাহলে বিমলা খাতা বন্ধ করে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অনিল তাকে বলল—"চুপ করে থাকবে কিন্তু স্পিক্‌টি নট্।" সে আস্তে আস্তে খেলনাগুলি খোকার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে বলল—"খুব গরম গরম এক পেয়ালা চা।"

অনিলের হঠাৎ কি যেন মনে হল, বলল—"না না, থাক, তুমি ব্যস্ত হয়ো না বিমলা, আমি যাই।" বলেই সে দরজার দিকে পা বাড়ালো। বিমলা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। একবার সে অনিলের দিকে তার করুণ দৃষ্টি মেলে ধরল। কিন্তু মুখে তার কথা ফুটল না—সে যেন চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সদর দরজা পর্যন্ত অনিলকে আগিয়ে দিতেও তার ইচ্ছা হল না। বিমলা ভাবেনি যে অনিল এমনি ক'রে হঠাৎ চলে যাবে। সে দুঃখ পেল, মনক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করল না। চলতে চলতে হঠাৎ ধাক্কা খেলে যেমন টাল সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে, বিমলার অবস্থাও দাঁড়ায় ঠিক সেই রকম কিন্তু ততক্ষণ অনিল ঘরের বাইরে চলে গেছে।

হঠাৎ পিছন ফিরে অনিল ডাক দিল—"খোকা।"

"যাই কাকু।" ব'লে তাড়াতাড়ি এসে অনিলের কাছে দাঁড়াল। অনিল তার রুমালের ভিতর থেকে একটি হীরের আঙটি নিয়ে খোকার নব আঙুলের মাপ দেখতে লাগল। বিমলা একটু দূরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

"এই যে তোর মায়ের আঙুলে ঠিক লেগেছে রে।" ব'লে অনিল আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠল। খোকার হাতখানি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অনিল বলতে লাগল—"খোকন, আমার দিদিমার বয়স হয়েছিল পাঁচ কুড়ি—আমি যখন তোর মতন তখন তিনি আমার হাতে এই আঙটিটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তারি পরমন্ত এটা; আমি এম-এ পাশ করেছিলাম নাকি এই আঙটির জোরে। অনেক ধনদৌলতও পেয়েছিলাম রে কিন্তু রাখতে পারলাম কৈ সে-সব। শুধু পেয়েছিলাম তো!" বলে অনিল ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল বিমলাকে। বিমলা তখন অবাক হয়ে অনিলের কাণ্ড-কারখানা দেখছে। অনিল বলল—"তোর হাতে ওটা পরিয়ে দিয়ে আজ আমি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।" খোকা বিস্মিত ও বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার মায়ের দিকে একবার অনিলের দিকে তাকাতে লাগল। অনিল তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে সস্নেহে চুম্বন করতে লাগল। তখন তার অন্তর আলোড়িত ক'রে যেন শুধু একটি নামই বার বার ধ্বনিত হয়ে উঠছিল—বিমলা, বিমলা!

আর কথামাত্র বিলম্ব না করে অনিল ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিমলা যেখানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে যেন তার পা'দুটি মেঝের মধ্যে বসে গেছে, আর বোধ হয় সেখান থেকে নড়ে বসতে পারবে না। বুকচাপা আগুনের অসহ্য উত্তাপে সে যেন জলে পুড়ে খাক হয়ে গেল।

পর পর তিনচারদিন অনিলের আর দেখা নেই। রোজই আসবে আসবে ক'রে বিমলা অপেক্ষায় থাকে কিন্তু অনিল আর ওদিক মাড়ায় না। কী যে হল অনিলের—এতখানি নির্মম হবে

অনিল, বিমলা তা ভাবতে পারেনি। বিমলা ভাবে—কৈ, আতসারে তাকে সে তো কোনো দিন অবহেলা করেনি, অনাদর বা অসম্মান করেনি—তাকে কোনো কারণে বাধা দিয়েছে তাও তো বিমলার মনে পড়ে না। তবে কেন এমন হল। সেদিন সে অনিলের গভীর প্রেম, তীব্র অনুরাগ এবং কামনার উষ্ণ স্পর্শকে দেহ দিয়ে মন দিয়ে উপভোগ করেছে।

প্রতিদানে দেয়নি এইকি তার অপরাধ! সে তো জীবনে এমন মধুর আস্বাদ পায়নি, সুখের অসহ্য শিহরণ তাকে এমন করে কোনোদিন আবেগে আচ্ছন্নে আত্মহারা করে দেয়নি। তবে কেন সে তাকে সুদূর দূরে এড়িয়ে যেতে চায়? বিমলা ভাবে—অনিল কি আমার উপেক্ষার পাত্র? অবহেলার সামগ্রী? তাকে বাধা দিলে সে নিজেই তো বাধা পায় বেশি! বিমলা ভেবেছিল—অতীতের কথা ভুলে গিয়ে সে অনিলকে নিয়ে তার স্বপ্নলোক রচনা করবে—তার জীবনের কোনো সাধই যে মেটেনি। সে কি জানে না অনিল তাকে সর্বান্তকরণে চেয়েছে? সেও তো যা কিছু দেবার ছিল অকুণ্ঠিত চিত্তে তা বিমলার হাতে তুলে দিয়েছে। কোনোদিন কোনো অসতর্ক মুহূর্তেও জানতে দেয়নি যে তার পলাতক স্বামীর জন্য তার বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ আছে। যা সত্য নয়, মনবলে তা কি সত্য হয়? দুয়ার দুয়ারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে তাকে সমর্পণ করেছিলেন যার হাতে, তাকে প্রত্যাখ্যান করবার কোনো উপায়ই যে তার ছিল না। তাকে সে প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি; মনের ধর্মকে উপেক্ষা করে সে তো সংসারধর্ম পালন করার জন্য অন্ধের মতো নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। দয়া নেই, মায়া নেই, মানুষের প্রতি মানুষের সামান্যতম কর্তব্যজ্ঞানও যার ছিল না—সে শুধু স্বামীর দাবিতে স্ত্রীর কাছে এল সম্ভোগসুখের অবসর তাড়নায়। তাকে সে প্রত্যাখ্যানও করতে পারল না। সে সব কাহিনী তো অনিলের অবিদিত নেই—তবে? যাকে সে বন্ধুর পথের অনন্ত দুঃখের মধ্যে সহচর বন্ধু বলে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল—সেই অনিলই যে তার অজ্ঞাতসারে কখন প্রিয় হ'তে প্রিয়তম হয়ে উঠল—অদৃষ্টের এই রূপান্তরকে সে কেমন করে অস্বীকার করবে? অন্তর তার বেদনার অগ্নিঘাতে পবিত্রতর। পাপ তো সেখানে নেই—গ্লানি নেই, অনুশোচনাও নেই। সে ভয় করবে কাকে।

বিমলা আর ভাবতে পারে না—কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। না, সে আর স্থির থাকতে পারবে না! খোকার হাত ধরে সে একেবারে পাগলের মত অনিলের বাসার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

অনিলের বাড়ীর সম্মুখে লোকের ভিড়। লোকজন খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যাতায়াত করছে। বিমলার পাশ দিয়েই এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীখানা চলে যেতেই তার যেন সম্বিৎ ফিরে এল—মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কায় সে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু এ্যাম্বুলেন্সে তো কোনো রোগী নেই। তবে কি হল? বিমলা খোকার হাত ধ'রে অনিলের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করল।

অনিলের শোবার ঘরের সম্মুখে কয়েকজন মহিলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। একজন বর্ষিয়সী মহিলা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে আর বলছে—"আহা! সোনার চাঁদ ছেলে গো! লোকের বিপদে আপদে বুক দিয়ে দাঁড়াত। ওর কাছে সাহায্য পায়নি এ তল্লাটে এমন লোক কে আছে?"

আর একজন বিমলাকে অনিলের কোনো আত্মীয়া ডেকে তাকে লক্ষ্য করেই বলতে লাগল—"আজ তিন দিন তিন রাত অজ্ঞান অভিভূত; নাথার অসহ্য যন্ত্রণা, তার উপর হার্টের গোলমাল। ডাক্তার এসেছিল—কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাবে মা? আহা, কেই বা ধরে রেখে, নিরাশে তো কাছ ছেড়ে একবার ওঠেওনি। ছেলেরা সব পালা করে রাত জেগেছে। কথা যে প্রথম থেকেই বন্ধ, কিছুতো বলতেও পারেনি—হরিবোল হরিবোল!" বিমলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না, আস্তে আস্তে অনিলের ঘরে এসে দাঁড়ালো। খোকা কেমন হতচকিত হয়ে গেছে—মায়ের হাতখানা সে জোর ক'রে চেপে ধরেছে।

অনিল খাটের উপর শুয়ে আছে। শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে—সেখানে অসুখের চিহ্নমাত্র নেই—প্রশান্ত উজ্জ্বল সে মুখের দিকে চেয়ে বিমলা স্থির হয়ে গেল। ছেলেরা ফুল দিয়ে খাট সাজিয়ে দিচ্ছে। নিরাশে খাটের পায়ে মাথা দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার ধরবিগলিত অশ্রুধারা যেন আর থামবে না।

খোকা তার মাসিমার মূর্ছা দেখেছে, মুহূর্তের মধ্যে সে সবই বুঝে নিল,—"কাকু কাকু" বলে একবার সে আর্তনাদ করে উঠল। মায়ের হাত ছাড়িয়ে সে মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ল। বিমলা পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিক দেখে নিল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হ'ল না, চোখের অশ্রু যেন সব শুকিয়ে গেছে। দুই স্থির হয়ে রইল, দুটি হাত ধীরে ধীরে প্রসারিত ক'রে অনিলের পায়ের ধুলা নিয়ে সে মাথায় দিলো; মনে হল একবার সে অনিলের বুকে মাথা রেখে ঝড়ের মতো আর্তনাদ করে কাঁদে। অনিলের দেহের সৌরভ প্রাণ ভরে গ্রহণ করে তার শেষ স্পর্শের অমৃতকে সে চিরজীবনের মতো তার সমস্ত দেহে চন্দনের মতো মেখে নেয়, কিন্তু তার দেহ যেন অসাড়, সে যেন এখনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বিমলার মনে হতে লাগল যেন বুকের কোলে সারাটা বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে। সমস্ত দেহ টলতে লাগল, মনে হল যেন অনিলের সেদিনকার সেই উষ্ণ স্পর্শ তার সারা দেহে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলছে। তার শিরা উপশিরায় যেন আগুনের অসহ্য জ্বালা। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বজ্রাহত বৃক্ষের মতো জ্বলতে লাগল। এইভাবে অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে—সকলের সশ্রিষ্ট দৃষ্টি এড়িয়ে খোকার হাত ধরে বিমলা একেবারে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

———

যে কথা আজও ভুলিনি

প্রফুল্ল কুমার গুহ

নভেম্বর মাস, ১৯১২ সাল।

সাড়ে এগারটার ঘণ্টা পড়লো। একটি ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন এক বিরাট পুরুষ। ঋজু, সবল দেহ···স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতিচ্ছবি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্তর্ভেদী চোখ। অর্ধশ্বেতশ্মশ্রু, গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বের প্রতীক।

ছাত্রের দল সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। তিনি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন।

তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলো বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবক। মহাক্রমের সামনে ছোট একটি কিশোর তরু।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন এলো—তুমি? কী নাম তোমার?

প্রশ্নকর্তা—সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশবরেণ্য, রাষ্ট্রগুরু, লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বিভক্ত বাংলাকে অবিভক্ত করতে হয়েছিল যাঁর প্রচারে, সেই দেশপ্রেমিক, বাগ্মীপ্রবর তদানীন্তন বাংলার অবিসম্বাদিত জননায়ক, আর ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের পুরোধা, সুরেন্দ্রনাথ।

আর যার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, সে হচ্ছে সদ্য এম, এ পাশ নিতান্ত অনভিজ্ঞ একটি যুবক। গ্রামের গণ্ডী পা থেকে তখনও যায়নি। চার বছর কলকাতায় থেকে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিল ছেলেটি। ইডেন হিন্দু হোষ্টেলেও ছিল, কিন্তু তবুও পদ্মার ওপারের ছোট একটি গ্রামের ছায়া তার চোখেমুখে, কথায়, আচরণে, চলাফেরায়। ওকে ওর অধ্যাপক পাঠিয়েছিলেন চাকরীর খোঁজে। ও কী জানতো বাঘের মুখে পড়বে? ··ভিরে ওর তবা জড়িয়ে গেছে।

পুনরায় প্রশ্ন হলো—কী নাম তোমার? কণ্ঠ কিছু রুঢ়।

সাহস করে উত্তর দিলে ছেলেটি—প্রফুল্লকুমার গুহ।

আমার জীবনে সেইদিনটাই সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

পুরো পঞ্চাশটী বছর একটানা শিক্ষকতা করেছি—ময়মনসিং, ঢাকা, কলকাতা, যাদবপুর—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষকের জীবন থেকে অবসর নিলেও শিক্ষকতার নেশা আজও যায় নি। তাই গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে

আজও প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়—সেক্‌সপীয়র পড়াতে যাই, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, পঞ্চকেশ বৃদ্ধদের, অতিক্রান্ত যৌবন সাহিত্যরসিকদের, আর এখন যাঁরা ছাত্র পড়ান এমন শিক্ষকদের। আজও পড়াচ্ছি আর নিজেও পড়ছি। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ঐ টিট যে-দিন সুরেন্দ্রনাথ আমাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে শিক্ষকতার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে রিপন কলেজের সিঁড়িতে প্রথম সাক্ষাৎ আমার জীবনের পরমলগ্ন। আজও তাঁর স্মৃতি অমলিন। মহামূল্য স্মৃতি···সযত্নে এতদিন মনের মণিকোঠায় রেখে দিয়েছিলুম। আজ গল্প-ভারতীর আবাহনে কেমন করে দেবী ভারতীর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলুম সেই কথাই বলবো।

* * *

সবে এম, এ পাশ করে ল ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি। ল ক্লাস সুরু হবে। চাকা মেল থেকে নামলুম শেয়ালদা ষ্টেশনে। দেখা হোলো একজন আত্মীয়ের সঙ্গে। তাঁর হাতে একটি চিঠি। ট্রেন থেকে নামতেই আমাকে চিঠি দিলেন। হাতের লেখা আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের। উনি লিখছেন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে। সঙ্গে একটুকরো কাগজ, আমাকে লেখা। "এই চিঠি পেয়েই সোজা চলে যাবে পার্শী বাগানে—রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। দেখা করে, আমাকে জানাবে। শ্রীকুমার (আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) রিপন ছেড়ে প্রেসিডেন্সীতে গেছে। রিপনে ইংরেজীর অধ্যাপক চাই। হয় ত আজই ওরা নতুন লোক নেবে। দেরী না করে সোজা ষ্টেশন থেকে চলে যাবে পার্শী বাগানে।"

গেলুম পার্শী বাগানে। দেখলুম বিখ্যাত পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে। ওঁর খ্যাতি তখন সারা বাঙলা দেশে। ঘরে ঢুকলুম পায়ে। সামনে একটি ডেস্ক। বসে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। সহাস্যে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের সবই সুন্দর। ওঁর হাসি যে সুন্দর তা সেদিন—আজও ভুলিনি। পরিচয় দিলুম। সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ মশাইয়ের চিঠিও। পড়লেন। বললেন, ঠিক সাড়ে এগারটায় রিপন কলেজে অধ্যাপকদের ঘরের সামনে অপেক্ষা করতে। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময় ক্লাসের পর বেরিয়ে আসবেন। উনি পরিচয় করিয়ে দেবেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। প্রণাম করে চলে এলাম।

বেলা সাড়ে এগারটায় স্মরণীয় দেখার কথা আগেই বলেছি।

নাম শুনে সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তুমিই ইংরেজীর অধ্যাপকের কাজের জন্যে এসেছ?

বুঝলাম ত্রিবেদীমশাই আগেই আমার কথা বলে রেখেছেন। জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পড়াশোনা কী রকম করেছ? পরীক্ষার রেজাল্ট কী রকম? সংক্ষেপে বল।

বললাম।

তারপর একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মনে হলো ভেতরের সবটাই বুঝি দেখে নিলেন। এক মিনিট চুপচাপ। তারপর বললেন—নাও, এই বই। Macaulay's Essay on Addison নিজের বই দিলেন আমার হাতে।

—কুড়ি পাতা আমি পড়িয়েছি। যদি নিযুক্ত হও তোমাকে বাকী ষাট পাতা পড়াতে হবে। সেকেণ্ড ইয়ার, আই, এস, সি ক্লাসে। আর এক মাস সময়। বড় দিনের ছুটীর পরে ওদের ক্লাস

আর হবে না। পারবে? আটটা লেকচারে ষাট পাতা শেষ করতে? বললেন সুরেন্দ্রনাথ। পাশে দাঁড়িয়ে রায়েন্দ্রসুন্দর।

সর্বনাশ! Macaulay's Essay on Addison—ষাট পাতা, আট লেকচারে! সবে এম, এ পাশ করেছি। একেবারে কাঁচা—পড়ানো কাকে বলে তাই জানি না।

হঠাৎ মনে হোলো আমার অধ্যাপক H. M. Percival-এর কথা। Burke পড়াচ্ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। পড়াবার সময় উনি বলেছিলেন যেখানে বোঝা শক্ত, শুধু সেখানেই তিনি বলবেন বোঝানোর জন্য—বাকী অংশটুকুর একটা টীকা সংক্ষিপ্ত-সার দিয়ে যাবেন, যাতে মোটামুটি সবটা বোঝার সুবিধে হয়। Percival সাহেবের পড়ানোর এই ধরনটি অনুসরণ করবো—কোনোমতে এই কথাটা বললাম।

সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে দেখি অল্প হাসি। রায়েন্দ্রবাবুকে বললেন—আমার মনে হয় "I think he will do." পারবে। রায়েন্দ্রসুন্দর খুসি হলেন। আমার তো তখন পরীক্ষাপাশের আনন্দ।

নিয়ে গেলেন ওঁরা আমাকে কলেজের অফিসে। একটা খুপরীতে বসে কাজ করছিলেন যেবেনবাবু। সুরেন্দ্রনাথ বললেন—'যেবেন, ওকে রুটিন দিয়ে দাও।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—'কাল থেকে পড়াতে সুরু করবে। থার্ড ইয়ারে Paradise Lost, Bk. X. আর সেকেণ্ড ইয়ারে Macaulay.'

সেদিন ছিল শুক্রবার।

শনিবার অধ্যাপনা সুরু করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টাও নেই। তৈরী করবো কখন? সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম—সোমবার থেকে আরম্ভ করলে—

কথা শেষ হওয়ার আগেই বজ্রনিনাদ।

No! কাল থেকে আরম্ভ করতে হবে। এই সর্তেই তোমার চাকরী। "You are appointed on that condition" ছাত্ররা ঘণ্টারের অভাবে বসে থাকতে পারে না। তাদের একটা দিনও নষ্ট করা চলবে না। কালই আরম্ভ করতে হবে।

দুর্গান্ত পরীক্ষা। বিশপ কলেজের ডাকসাইটে ছাত্রের দল। তারা পড়ে সব হিকপাল বাঘা বাঘা অধ্যাপকদের কাছে—আমি গাঁয়ের ছেলে—একরাত্তিরে লেকচার তৈরী করে ম্যাকলে আর মিল্টন পড়াবো?

ছুটলুম আমাদের ছাত্রজীবনের অগতির গতি প্রফুল্ল ঘোষ মশাইয়ের বাড়ী প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে। স্মরণীয় এই বাড়ী। কত ছাত্র, কতভাবে এই বাড়ীতে এসে গুরুর সাহায্য আর আশীর্বাদ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। চারিদিকে বইয়ের পাহাড়। মাঝখানে বসে আছেন অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ। ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন—কী হোলো? চাকরী হয়েছে?

প্রণাম করে বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেই পরিচিত খুসীর হাসি! গোল মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবার পড়াতে পড়াতে কাঁদতেও দেখেছি।

হাসি থামতেই বললুম—কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি যে।

—মুস্কিল কিসের?

—কালই ক্লাস করতে হবে। Macaulays Essay on Addison—আর Paradise Lost, Bk X. কী করে করবো?

আবার উচ্চ হাসি।

—এর জন্যে-তর নাস্তি! বোকা কোথাকার। যাও, বাড়ী যাও। আজ সারা রাত জাগবে। Macaulayর যে কুড়ি পাতা সুরেন্দ্রনাথ পড়িয়ে গেছেন তার একটী summary তৈরী করে নিয়ে—কাল ক্লাসে সেটা ডিক্‌টেট করবে, তাতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তারপর রবিবার যখন সময় পাবে ভাল করে তৈরী করে নেবে। আর Paradise lost পড়ানোর জন্যে Verityর নোট ভাল করে পড়ে নিয়ে। যেখান থেকে পড়াতে হবে সেখান থেকে লাইন তিরিশ চল্লিশ ভাল করে পড়বে বুঝলে?

হাসির পেয়ে আমরা হলুম। প্রণাম করে চলে আসছি। ডাকলেন।

—শোন। একটা কথা বলে দি। পড়াবার সময় allusions ভাল করে, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে। আমাদের গুরুদেব যা করতেন, মানে Percival সাহেব। উনি যা করতেন তা কখনও ভোলো না।

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

—বুঝতে পারলে না? আরে ঐ যে, Percival সাহেব—allusion-এর জায়গায় এসেই বলতেন —"look up your notes"—মনে নেই? ঐ কাজটি কখনও করবে না। যা বলার নিজেই সব বলে দেবে। ভাল করে তৈরী করে যাবে। Allusions যেন সব মুখস্ত থাকে। গড় গড় করে বলে যাবে। ছাত্ররা ভাববে মহাপণ্ডিত! বলেই আবার হাসি।

সে হাসিতে আমিও যোগ দিলুম।

প্রণাম করে চলে এলুম।

সারারাত পড়াশোনা করে তারপরদিন গেলুম কলেজে। অধ্যাপকদের ঘরে টেবিলের একধারে গিয়ে বসেছি। সামনে উজ্জ্বলজ্যোতিষ্করাজি—অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের মধ্যমণি অধ্যক্ষ স্বয়ং শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ওঁদের কথা হচ্ছে শুনছি।

চং···চং···চং···

ঘণ্টা পড়লো। এবার ক্লাসে যেতে হবে। ভয়ে হাত পা কাঁপছে। মুখখানা বোধহয় ন্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—চলুন, ক্লাসে পরিচয় করে দিয়ে আসি।

আমি উঠলুম। তখনও পা দুটো বোধহয় সোজা হয়নি—ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্য করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন —রাম, তুমি বসো। ছোকরা ভয় পেয়েছে। আমি ওকে নিয়ে যাই।

রামেন্দ্রসুন্দর ওঁর হাতেই আমাকে ছেড়ে দিলেন।

ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরাট পণ্ডিত। ছাত্রমহলে মস্ত নাম। দুতিপরা, একটী উড়ুনী গায়ে; পায়ে তালতলার চটী। শ্বেত উপবীতটা গলা থেকে কোমর পর্যন্ত উড়নীর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। খাঁটি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতের অধ্যাপক। দেখলে মাথা আপনি নত হয়ে আসে। সরল জীবন আর

উন্নত চিন্তা, বলে ইংরিজীতে যে কথা আছে তারই জীবন্ত প্রতীক। সাহেবে পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন—ভয় কী রে? যাদের পড়াতে যাচ্ছিস তারা কী-ই বা জানে? তুই যা জানিস তাই বলে যাবি, থামবি না। গড়গড় করে ইংরিজী বলবি, ব্যস! তা হলেই হবে।

অমূল্য উপদেশ। আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কতবড় অধ্যাপক কিন্তু কী সরল মানুষটি! পিতার মত স্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়ে অভয় দিলেন। শিখিয়ে পড়িয়ে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দিলেন। ওঁর লেখা 'অভয়ের কথা' বিখ্যাত বই। দুঃখসুখ—'অভয়ের কথা' উনিই লিখতে পারেন।

ওঁর কথা শেষ হোলো। আমায় বললেন—এইবার পড়াতে আরম্ভ কর। ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়ে গেলেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্র—আজও সযত্নে চাষ করে যাচ্ছি—ফল যে কী পেয়েছি তা বলবে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা, অন্তগতাখী চাষের ফল—সারা দেশে ওরা ছড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে মেলবার পরম সুযোগ যাঁরা করে দিয়েছিলেন আজও তাঁদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।

আর আমার জীবনের স্মরণীয় দিন সেইটি যেদিন জাতীয়তার জনক আমাকে জাতি তৈরীর অর্থাৎ শিক্ষার কাজে ব্রতী করেছিলেন। বলেছিলেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে—কালই আরম্ভ করতে হবে।

সেই স্বর আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাই।

অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার গুহ:—জন্ম ১৯০৬ সালে, শ্রীহট্টে। ১৯১২ সাল থেকে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। শিক্ষক জীবনের সূত্রপাত কলকাতা বিপন কলেজে, পরবর্তী কালে ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, তার: বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (আংশিক সময়ের জন্য) পড়িয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং কলা বিভাগের ডীন হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছেন। ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ইংরেজী শিক্ষক সম্মেলনের বার্ষিক সভায় সভাপতি নির্বাচিত হন। সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র ভারতীতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের এমেরিটাস অধ্যাপক। বর্তমানে কলকাতায় সোলপার্কের কাছে রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার হলে সেক্সপীয়ার ও পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিচ্ছেন। অধ্যাপক গুহ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য বিদেশী বিদ্বানদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। সেক্সপীয়ার-এর জন্মের চতুর্থশতাব্দী পূর্তি উৎসবে অধ্যাপক গুহ বাংলার বহু শিক্ষায়তন ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় ভাষণ দিয়েছেন।)

'কাস্টমারের' তোমার

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য

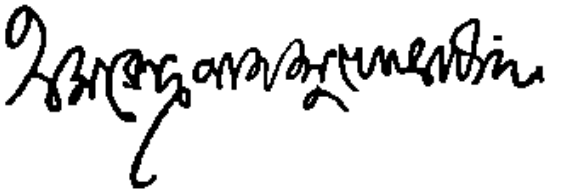

চলচ্চিত্র জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য

কীস্টোন ফিল্মস্ ছেড়ে চার্লি চ্যাপলিন এসেনে ফিল্মসে যোগ দিলেন। পারিশ্রমিকের হার দ্বিগুণ হল। তারপর আরও টাকা। আরও, আরো টাকা। অবিশ্বাস্য অর্থাগম হতে লাগল।

এসেনে থেকে গেলেন মিউচুয়াল ফিল্মস-এ। সেখান থেকে ফার্স্ট ন্যাশন্যাল-এ। অবশেষে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস আর মেরি পিকফোর্ডের সহযোগিতায় নিজের প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন—ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ ফিল্মস।

চার্লি বলেছেন, সাফল্যই আনে যশ, অর্থ, জনপ্রিয়তা। ষ্টুডিওর সকলের কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। একস্ট্রা, স্টেজকর্মী, ক্যামেরা-ম্যান সকলের কাছেই তিনি চার্লি। নিজের নামের সেই সংক্ষিপ্তকরণ তাঁর কাছে ভালই লাগত। বুঝতেন, তাঁর কাজে সবাই সন্তুষ্ট। তিনি সফল এবং সার্থক, তিনি সকলের প্রিয়পাত্র।

তাঁর নিজের মতে, মিউচুয়াল ফিল্মস-এ কাজ করেই তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছেন, সেই দিনগুলিই ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন। তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়েস। সেই বয়সেই লক্ষ লক্ষ টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে, সেই বয়েসেই জগৎজোড়া নাম তাঁর। তাঁর সাপ্তাহিক উপার্জনের হার তখন দশহাজার ডলার। টাকার অঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে ব্যাঙ্কে। এক লক্ষ ডলার, দশলক্ষ ডলার। এক কোটি ডলার। টাকার অঙ্কটা তাঁর কাছে যেন স্বপ্নের মত মনে হ'ত। এত টাকা তাঁর?

শুধু টাকাই আসছে না, তার সঙ্গে আসছে যশ প্রতিপত্তি। সারা পৃথিবী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। সারা পৃথিবীতে তিনি একটি বিশেষ "সংবাদ"। তাঁর সম্বন্ধে কোন বিশেষ খবর ছাপবার জন্যে পৃথিবীর সকল সংবাদ-পত্রই উন্মুখ।

অনেকে তাঁর কাছে আসতে লাগলেন বন্ধুত্ব করবার আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর মতামতের মূল্য আজ অপরিসীম। সভাসমিতি মজলিশে তাঁর ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে প্রখর।

চার্লি কিন্তু কোনরকম হাল্কা বন্ধুত্বকে তেমন আমল দিতে চাইতেন না। জীবনে বন্ধু তাঁর ছিল না বললেই হয়। যে দু'একজন বন্ধু তাঁর ছিল তারা কেউ নামী লোক নয়—তারা নিতান্ত সাধারণ,

সমগোত্রীয় দু'একজন অমায়িক সাধারণ অভিনেতা বা চলচ্চিত্রকর্মী। নিভৃত আসরে তাদের সঙ্গে মনের কথা বলতে ভালবাসতেন। অল্প সময় দশজনের মধ্যেও তিনি একা। সমস্ত সামাজিক মেলামেশা আর আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও তাঁর একটি পৃথক সত্তা ছিল, সে তাঁর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব।

একদিন বড় ভাই সিডনি এসে বললেন, "চার্লি, এবার তুমি সত্যিই কোটিপতি হলে। আমি এইমাত্র ফার্স্ট ন্যাশান্যালের সঙ্গে তোমার চুক্তি ঠিক করে এলাম। তাদের তরফে তুমি আটখানি ছ'রীল ছবি করবে। দক্ষিণা, বারো লক্ষ ডলার।"

চার্লি তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন, একটুও উত্তেজিত না হয়ে বললেন, "তাই নাকি! বেশ তো।"

সিডনি হেসে বললেন, "আশ্চর্য তো তুমি। এতবড় একটা খবর পেয়েও নির্বিকার।"

চার্লি হেসে জবাব দিলেন, "টাকাটা রোজগার করতে হবে দাদা। অর্থাৎ বুঝতে পারছো দায়িত্ব আর ঝুঁকি কতখানি।"

চার্লি নিজেকে বরাবর মেহনতি মানুষ বলে মনে করেছেন। টাকা তিনি রোজগার করেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ফাঁকি দিয়ে নয়। সারা পৃথিবী আজো তা স্বীকার করছে। আজো তাঁর সৃষ্টি "কিড" আর "গোল্ড রাশ" দেখে আমরা অভিভূত হচ্ছি। তার কারণ যোলকলি, কাজের মধ্যে তাঁর অপার আন্তরিকতা আর শিল্পের প্রতি গভীর নিষ্ঠা।

অর্থের প্রাচুর্য চার্লি চ্যাপলিনের জীবনধারায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আনলো না। যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন।

অবশেষে তাঁর মনে হল, যে টাকা হাতে মজুত হয়েছে তার অঙ্কটা শুনলে বোধ হয় যেন তা কাল্পনিক ব্যাপার। সে টাকা তিনি তো চোখে দেখছেন না। তাই তাঁর যে এত টাকা তা প্রমাণ করা দরকার বোধ করলেন যেন নিজের কাছেই।

একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করলেন। তার আবার একজন সহকারী। উভয়ের খাস বেয়ারা রাখলেন। সেই সঙ্গে মোটরগাড়ী আর শোফার।

মিউচুয়ালে কাজ করবার সময়কার ঘটনা এসব। সেই সময় একদিন তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে, একাকী। পথের ধারে একটা শোরুমের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ভিতরে একটি প্রকাণ্ড চমৎকার মোটর সাজানো রয়েছে। তখনকার দিনে সেই মোটরই আমেরিকার সবচেয়ে ভাল গাড়ী বলে বিবেচিত। কী তার গঠন, কী তার রাজকীয় সৌন্দর্য!

ভিতরে ঢুকে চার্লি দাম জিজ্ঞেস করলেন।

সেলসম্যান বললে, কতকটা অবহেলা ভরেই, যেন এ দামের কেনবার দামের নয় এইভাবে, "বেশি নয়। বার হাজার ন'শো ডলার।"

"মুড়ে ফ্যালো।" বললেন চার্লি।

সেলসম্যান বললে, "কী বলছেন?"

"গাড়ীটা কিনলাম।"

সেলসম্যান তবুও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, বললে, "দেখবেন না পরীক্ষা করে। এঞ্জিন কী রকম, ড্রাইভ কলকব্জা।"

চার্লি হেসে বললেন, "কলকব্জা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। অতএব দেখা না দেখা সমান।"

কেনাকাটার পদ্ধতি খুব সরল। চেকবই বার করে একটা চেকের উপর নিজের নাম আর টাকার অঙ্কটা বসিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালবেলা সেই গাড়ী এসে দাঁড়াল তাঁর দোরগোড়ায়।

টাকা খাটানোর ব্যাপারে চার্লি ছিলেন যেমন আনাড়ি, বড় ভাই সিডনি ছিলেন তেমনি ঝুনু।

নানাভাবে নানা লাভজনক পেশায় কিনে সিডনি চার্লির জমানো নগদ টাকার অঙ্কটাকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললেন।

• • • •

১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

সারা আমেরিকার সিনেমা বন্ধ বিক্রি করে যুদ্ধের জন্যে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গেল। চার্লিকে অনুরোধ করা হল এই কাজে মার্কিন সরকারকে সাহায্য করতে হবে।

তিনি সানন্দে রাজী হলেন। এবং দেশ ও বিদেশের নানাস্থানে কিছুদিন ধরে প্রচার কার্য করে বেড়ালেন। যে মিটিং বা সমাবেশে তিনি যেতেন সেখানে লোক ভেঙে পড়ত। যেন কোন সম্রাট এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে, এমনি মনোভাব জনতার। তাঁর কথা তাদের কাছে যেন বেদবাক্য।

১৯১৭ সালে বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক সাদুয়েল গোলডুইনের প্রমোদ-বাসরে মিলড্রেড হ্যারিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল।

মিলড্রেড তাঁর প্রথম স্ত্রী। তাঁর "দাম্পত্যজীবন" অধ্যায়ে সেই বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কাহিনী বলা হয়েছে।

কিছুদিন পরে চার্লি আমেরিকা থেকে লণ্ডন সফরে গেলেন। সেখানে যা অভ্যর্থনা পেলেন তা অভূতপূর্ব। বিস্ময়ে আবেগে তিনি বিহ্বল হলেন।

এই সেই লণ্ডন, তাঁর জন্মভূমি। যে শহরের একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তিনি প্রথম জীবনের আলো দেখেছেন, যে শহরে অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশব, আবার যে শহরে বসেই তিনি শুনেছেন জীবনের জয়গান, পেয়েছেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের প্রেরণা, আর যে শহরে তাঁর জীবনে এসেছে প্রেম, তাঁর প্রথম প্রেম, সেই লণ্ডন।

সারা শহর আজ তাঁকে দেখবার জন্যে তোলপাড়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে পাগল।

হলিউডে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই (১৯২৮ সাল) চার্লির মা মারা গেলেন। মায়ের স্মৃতি তিনি তাঁর জীবনচরিতে ব্যক্ত করেছেন মনের সমস্ত আবেগ আর শ্রদ্ধা উজাড় করে। তাদের মধ্যে বাহুল্য নেই, কিন্তু অন্তরের অনুভূতিটুকু তার মধ্যে স্পষ্ট।

মায়ের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদেছেন আকুল কণ্ঠে। কান্না তার্টা দুঃখের জন্যে নয়, ওটা মায়ের বিগত জীবনের দুঃখ দারিদ্র, কষ্টসহিষ্ণুতা আর ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে। তিনি বলেছেন, 'মা আমার ছিলেন যেন সর্বংসহা বসুমতী। কোন দিন তাঁর মুখে কোন অনুযোগ শুনিনি, বিরক্তি

দেখিনি। তাঁর মধ্যে দয়া ছিল, সহানুভূতি ছিল অপরিমেয়। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পাপীকে কখনো ঘৃণা করেননি। অত্যন্ত হীন অবস্থার মধ্যেও তিনি আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন, আমি যে তুচ্ছ নই, রাস্তার ছেলে নই, আমার মধ্যে আছে সুস্থ আর সুস্থতার রক্ত, আমি জীবনে এমন ধারা ছোট হয়েই চিরকাল থাকব না, আমি একদিন বড় হব, আমার নাম হবে, টাকা হবে—এই অনুপ্রেরণা তিনি আমাকে দিয়েছেন বরাবর।"

• • • • •

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের পাতায় ছড়িয়ে আছে কত বিচিত্র ঘটনা কত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। এমনি দুটি কাহিনী উল্লেখ করছি।

তিনি তখন 'দি কিড' ছবিখানি শেষ করছেন। সেই সময় ষ্টুডিওতে বেড়াতে এলো এক ক্ষুদে বাবা খেলোয়াড়। তার নাম জমুয়েল রেসেভস্কি। তার বয়স সাত। এই বয়সেই সে নাকি দেশ বিদেশের সব সেরা বাবা খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়েছে। অ্যাথেলেটিক ক্লাবে তার জন্য একটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। তার বিপক্ষে থাকবে কুড়ি জন। একসঙ্গে সে কুড়ি জনের সঙ্গে খেলবে। সেই কুড়ি জনের মধ্যে আছেন ক্যালিফোর্নিয়ার অপরাজিত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ডক্টর গ্রীভিস্‌।

চার্লি তখন লাবোরেটরিতে ছিলেন। খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন।

রেসেভস্কির ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় পরিচয় হল।

চার্লি হেসে বললেন, "বাঃ! চমৎকার ছেলে।" তারপর তার পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন, "তুমি পীচ খেতে ভালবাস নিশ্চয়?"

ছেলেটা এতক্ষণ গম্ভীরমুখে একদৃষ্টে চার্লিকে দেখছিল। তাঁর কথায় একটু হেসে বললে, "হ্যাঁ খুব ভালবাসি।"

—"তাহলে এই দেওয়ালের পাশ দিয়ে চলে যাও। কয়েকহাত দূরেই একটা গাছে চমৎকার ফল হয়েছে। পেড়ে খাও। একটা আমার জন্যে পেড়ে এনো।'

চার্লির কথায় ছেলেটা ভারি খুশী হল।

কিছুক্ষণ পরে পীচ খেতে খেতে সে ফিরে এল। একটা ফল চার্লির হাতে দিয়ে বললে, "তুমি বাবা খেলতে জান?"

ঘাড় নেড়ে চার্লি বললেন, "না তো"।

—"খুব সহজ। আমি শিখিয়ে দেব। আজ সন্ধ্যায় তোমাদের ক্লাবে আমি কুড়ি জনের সঙ্গে খেলব। দেখতে এস।"

চার্লি বললেন, "যাব। তারপর তোমাকে খুব ভাল একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাসার খাওয়াব।'

রেসেভস্কি ঘাড় নেড়ে মহাউল্লাসে বললে, "বাঃ সে তো খুব মজা হবে। আমি তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে ফেলব।"

বাবা খেলতে না জানলেও সেই রাতের সেই বাবা খেলার নাটকীয়তা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চার্লি। কুড়ি জন আধবুড়ো এবং বুড়ো লোক ক্ষুদে ছোট কাবাড়ে চিন্তাকুল মুখে ঝুঁকে

পড়েছে তাদের নিজ নিজ ছকের ওপর, কী চাল দেবে ভেবে পাচ্ছেনা, আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সাত বছরের বাচ্চা ছেলে গম্ভীর মুখে এক একবার একএকজনের টেবিলে এসে দাঁড়াচ্ছে, আর এক এক চালে তাদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে।

অবাক বিস্ময়ে চার্লি সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখেছিলেন। একটা বড় হলঘরে খেলার আসর। চার-ধারে গ্যালারি। সেখানে বসে চার পাঁচশ লোক খেলা দেখছে। সূচ পড়লে আওয়াজ পাওয়া যায় এমনি স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

চার্লি বুঝলেন ছেলেটা সত্যি জগতের এক বিস্ময়। কিন্তু যে পরিমাণ মানসিক চাপ তাকে সহ্য করতে হচ্ছে তা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে কখনো ভাল নয়।

"এদিকে।"—একজন খেলোয়াড় ওপাশ থেকে হাঁক দিল। ছেলেটি সেই দিকে গেল। প্রতি পক্ষের ছকের ওপর চোখ রাখল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর একটা চাল দিয়েই বলে উঠলো, "মাৎ।"

সত্যিই মাৎ। এমনি করে আটশজনকে পরপর চোখের পলকে সে মাৎ করে দিলে।

তারপর গিয়ে দাঁড়াল ডক্টর গ্রীফিথস-এর টেবিলের সামনে। তিনি তখন গভীর চিন্তামগ্ন।

একটা চাল দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। চার্লির সঙ্গে তার চোখোচোখি হল। মৃদু হেসে হাত তুলে সে চার্লিকে জানালে যে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা শেষ করে ফেলবে।

তারপর আরো কয়েকজন খেলোয়াড়কে মাৎ করে দিয়ে সে ডক্টর গ্রীফিথস-এর টেবিলে ফিরে এল। ছকটা দেখে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললে, "একি! এখনো চালেন নি?"

ডক্টর গ্রীফিথস্ মাথা নাড়লেন।

—"তাড়াতাড়ি করুন। আর কতক্ষণ ভাববেন।"

মুখ তুলে ডক্টর গ্রীফিথস হাসলেন।

ছেলেটা তখন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, "আপনি আমাকে হারাতে পারবেন না। আপনি যদি এই চাল দেন আমি এই চাল দেব। আর যদি এদিকে এই বলটা চালেন তা হলে আমি এই বল দিয়ে রুখবো।'

এই বলে সে তড়বড় করে ৮।১০টা চাল বলে গেল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "রাত পুইয়ে যাবে তবুও খেলা শেষ হবেনা। তারচেয়ে ধরা যাক খেলাটা ড্র হল। আমার জন্যে মিঃ চ্যাপলিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। কি বলেন? তাহলে ড্র?"

মাথা নেড়ে ডক্টর গ্রীফিথস্ সম্মতি জানালেন।

আর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁর জাপান ভ্রমণ।

লণ্ডন, প্যারিস বার্লিন সফরের পর তিনি বড় ভাই সিডনিকে নিয়ে ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

সেখানে তাঁকে হত্যা করবার জন্যে এক রীতিমত ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। বলা যেতে পারে মৈত্রক্রমেই তিনি সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন।

জাপান ভ্রমণে তাঁর জাপানী সেক্রেটারী সেইসি কোনো আগেভাগে জাপানে উপস্থিত হয়ে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। চার্লি জাপান সরকারের অতিথিরূপে একটি স্পেশাল ট্রেনে চেপে বিমান বন্দর থেকে

টোকিও পৌঁছন। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে সমবেত হয়েছিল। সে এক বিরাট রাজকীয় সংবর্ধনা।

তাঁদের মোটর যখন সম্রাটের প্রাসাদের কাছে পৌঁছল তখন সেক্রেটারী কোনো চার্লিকে এক অদ্ভুত অনুরোধ করলেন। চার্লি গাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাবেন, এই অনুরোধ।

চার্লি ভাবলেন এ আবার কেমনধারা রীতি! যাই হোক, তিনি তাঁর জাপানী সচিবের অনুরোধ মত কাজ করলেন।

কোনোকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে। যেকোন কারণেই হোক তিনি যেন বিচলিত। চার্লি এবং সিডনি দুজনেই তা লক্ষ্য করেছেন।

যাই হোক, সেদিনে বা রাতে আর কোনো বিচিত্র রীতি পালন করতে হল না। দুই ভাই তাঁদের মহলে সুনিদ্রায় কাটালেন।

পরদিন সকালেই কিন্তু সিডনিকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি চার্লির কাছে এসে বললেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মালপত্র তল্লাশী করা হয়েছে। সিডনির সন্দেহ হচ্ছে, গোপনে গোপনে কিছু একটা ব্যাপার চলছে, সেক্রেটারী কোনো তা জানে, কিন্তু সে তা বলছে না।

সিডনির সন্দেহ যে অমূলক নয় সেদিন বিকালেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কোনো এসে তাঁদের বললেন, একজন ব্যবসায়ীর কাছে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য যৌনচিত্র আছে যেগুলি সে চার্লিকে দেখাতে চায় তাঁকে এবং সিডনিকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে।

চার্লি সরাসরি কোনোকে হাঁকিয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো নাছোড়বান্দা। বললেন, লোকটার ধন আছে এবং সে একটা অবসরপ্রাপ্ত দস্য। চার্লির পক্ষে একবার তার বাড়ীতে ঘুরে আসাই ভাল।

এই কথা শুনে চার্লি মহা ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, ভয় দেখিয়ে তাঁকে কেউ কোনোদিন কোন কাজ করাতে পারেনি। অতএব এ ক্ষেত্রেও বেঁটে জাপানীরা তাঁকে আতঙ্কিত করতে পারবে না।

পরদিন রাত্রে চার্লি, সিডনি এবং কোনো একটি রেস্তোরাঁয় নৈশ ভোজন করছেন এমন সময় দু'জন জাপানী যুবক রেস্তোরাঁয় ঢুকে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াল এবং একজন খুব রাগতভাবে কোনোকে কি সব বলতে লাগল। তারা না বুঝলেও চার্লি বুঝলেন যে তাঁর সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে কোনোকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন—"এসব হচ্ছে কি। কারা এরা? কি চায়?"

কোনো আমতা আমতা করে বললেন, "আপনি এর ছবি দেখবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে এ লোকটি নিজেকে অপমানিত বোধ করেছে।"

আরো জোরে চার্লি ধমকে উঠলেন—"বলেদেন।"

এই বলে ইশারায় সিডনিকে ডেকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

পরদিন চার্লি এবং সিডনি জাপানী প্রধানমন্ত্রীর ছেলের আমন্ত্রণে একটি মধ্যাহ্নভোজের আসরে

উপস্থিত হবার কিছুক্ষণ পরেই খবর রটে গেল যে জাপানী প্রধানমন্ত্রী গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। জানা গেছে আততায়ীদের সংখ্যা ছিল ছ'জন।

অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। চার্লি এবং সিডনি নিজেদের হোটেলে ফিরে এলেন। সিডনি বললেন, "দেখ চার্লি, ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময়। এবং আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে এই রহস্যের মধ্যে আমরাও জড়িত আছি। প্রধানমন্ত্রীকে খুন করেছে ছ'জন লোক। গতকাল আমাদের ওপর হামলা করতে এসেছিল ছ'জন লোক। এই দুয়ে যোগ আছে কিনা কে জানে।"

সিডনি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। পরে সমস্ত ঘটনাটা জানা গিয়েছিল এক লেখকের লেখা একটি পুস্তকে যার মধ্যে জাপানী প্রধানমন্ত্রী হননের কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছিল।

সেই গ্রন্থের তথ্য থেকে জানা যায় যে জাপানী সরকার বিরোধী এক নৃশংস দল সেই সময় গড়ে উঠেছিল। সেই দলের নাম ব্ল্যাক ড্রাগন।

সেই দলের কয়েকজনের সঙ্গে দলের চাঁই সাকুমা কোগা-ও ধরা পড়েছিল। বিচারের সময় কোগার স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল যে তারা প্রধানমন্ত্রী এবং আরো অনেক সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার পরিকল্পনা করেছিল। সেইসঙ্গে তারা চার্লি চ্যাপলিনকেও হত্যা করবার মতলব করেছিল।

বিচারক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "বিদেশী আগন্তুক চার্লস চ্যাপলিনকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করা হয় কেন? তার তাৎপর্য কি?"

উত্তরে কোগা বলেছিল, "আমেরিকায় চার্লস চ্যাপলিনের প্রভূত জনপ্রিয়তা। তাছাড়া তিনি সেখানকার পুঁজিবাদিদের অতিপ্রিয় এবং তারা তাঁর একান্ত অনুগামী। তাই আমরা মনে করেছিলাম, তাঁকে হত্যা করলে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বেধে যাবে এবং তাহলে আমরা এক ঢিলে দুটো পাখী মারার কাজ সম্পন্ন করব।"

বিচারক প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এ পরিকল্পনা ত্যাগ করলে কেন?"

কোগা জবাব দিলে, "পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করে বুঝলাম যে একজন আমেরিকানকে হত্যা করলেই যে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তার ষোল আনা নিশ্চয়তা নেই। তাই আমরা সেদিকে আর অগ্রসর হইনি।"

কোগার স্বীকারোক্তি কাগজে পড়ে চার্লি খুব হেসেছিলেন। সিডনি তখন সেখানে উপস্থিত। বললেন, "এত হাসির কী আছে এর মধ্যে! এটা কি হাসির ব্যাপার?"

চার্লি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়? মনে কর তারা তাদের কাজ হাসিল করল। তারপর তারা শুনে অবাক হল যে, যে লোকটাকে তারা বধ করল সে লোকটা আমেরিকান-ই নয়, সে ইংরেজ। তখন সেই খুনে ছোকরাদের মানসিক অবস্থাটা ভাব তো?—"ও, সো সরি, সো সরি!"

সিডনি বললেন, "যাই বল! খুব রঙ্গ দেখে গুলী বেরিয়ে গেছে বলতে হবে।"

চার্লি আবার হেসে বললেন, "তা আর বলতে! তা না গেলে সেই বিদেশ বিভূঁয়ে তোমার কী বিপদেই না পড়তে হত! তারের লাশ কাঁধে নিয়ে ছুটোছুটি।"

———

মৃত ব্যক্তিকে খুনের দায়ে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

গুপ্ত তৈরী হয়েই ছিল। ডেপুটি জেলার জাহাঙ্গীর আলী তার সেলে ঢুকতেই হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। আলী সাহেবও হাসিমুখে বল্লেন "তা হলে এতদিনে আপনি সত্যিই স্বাধীন হতে চলেছেন, সবদিক থেকে আপনার মঙ্গল হোক তাই আমি চাই।"

গুপ্ত উত্তর দিল, "আজ থেকে আবার আমি স্বাধীন একথা যেন বিশ্বাস করতেই আমার কেমন লাগছে আলী সাহেব।" তারপর একটু চুপ করে ধরা গলায় বলে উঠলো, "কিন্তু একটা কথা আপনি কি বিশ্বাস করবেন আলী সাহেব ?···মুক্তির আনন্দের মধ্যেও আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আর তার চেয়েও এই কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি যে, আপনি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না যে, আমি দেওদেকরকে খুন করিনি।"

তিন বছর আগে এ ছেলে যখন হাজতে আসবার পর থেকেই আলী সাহেব এই শিক্ষিত, দৃঢ় চরিত্র ও আশ্চর্য কর্তব্যনিষ্ঠ কয়েদীকে নিজের 'রাইটার' বা কয়েদী কেরানী করে নিয়েছিলেন। ঘানিচক্রে একজন সহকারী কারারক্ষক আরেকজন কয়েদী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবু ইতিপূর্বে গুপ্ত বহুবার বলা সত্ত্বেও আলী সাহেব স্বীকার করেনি যে, গুপ্ত হত্যার অপরাধে নিরপরাধ হয়েও দশবছর জেল খাটছে! গুপ্তর কথার যথার্থতা যাচাই করে দেখবার জন্যে তিনি উদ্যোগী হয়ে তার সব মামলাটা আদ্যোপান্ত জানবার চেষ্টাও তিনি করে দেখেন। কিন্তু না। গুপ্তর কথায় বিশ্বাস করবার মত নিশ্চিত কারণ তো তিনি কিছু খুঁজে পাননি। সবচেয়ে বড় কথা গুপ্ত আদালতে দাঁড়িয়ে নিজেই স্বীকার করেছিল যে, সে তার ব্যবসায়ের সহযোগী দেওদেকরকে খুন করেছিল।

কথাটা মনে পড়তেই তিনি গুপ্তকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন, "গুপ্ত, আপনি নিজেই কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে ছিলেন যে, আপনি দেওদেকরকে খুন করেছিলেন।"

"নিশ্চয় করেছিলাম। তাই তো আজ দশবছর পরে মুক্তি পাচ্ছি। মামলাটা এমনি বেয়াড়া ছিলো যে অস্বীকার করতে গেলে ষড়যন্ত্র করে হত্যার অপরাধে আমার ফাঁসী হতো। কিম্বা অন্তত

বিশ বছর জেল হতো। রাগের মাথায় খুন করেছি একথা স্বীকার করার ফলে 'অপরাধটা' অনেক হাল্কা হয়ে যায়।"

আলী সাহেব বল্লেন, "দেখুন গুপ্ত, আজ ছাড়া পাবার আগে আপনি ও নিয়ে তর্ক নাই করলেন। আর ও-কথা নিয়ে আলোচনা করতে আমি আসিও নি। আমি এসেছি একটা কথা ভেবে। জেল থেকে আপনি দশবছর পরে বেরুচ্ছেন অথচ আপনার নামে মাত্র সামান্য ক'টা টাকা জমা আছে। তাই ভাবছিলাম বেরুনোর সময় কিছু টাকা যদি আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে যান! পরে যখন খুশি শোধ দিয়ে দেবেন।"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গুপ্তের চোখে গাঢ় কৃতজ্ঞতা ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তারপরেই সে সোজা আলী সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বল্লো, "আলী সাহেব, আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু ঐ টাকা নিতে আমাকে অনুরোধ করবেন না। এত করে বলা সত্ত্বেও আপনি যখন বিশ্বাস করেননি যে আমি মানুষ খুন করিনি। তখন টাকা দিয়েই বা বিশ্বাস করবেন কেন? আর আজ তিন বছরের মধ্যে যে লোক আমার প্রতিদিন এত কাছে থেকে দেখেও এত বড় একটি গুরুতর বিষয়ে আমায় বিশ্বাস করতে পারেননি,—ওঁর টাকা আমি নেবো না।"

গুপ্তের এই রূঢ় প্রত্যাখ্যানে আলী সাহেব ক্ষুণ্ণ হলেন। বল্লেন, "টাকাটা তো সামান্যই।'

"তা হোক!" গুপ্ত উত্তর দিল। "আপনাকে আরেকটা কথাও জানিয়ে যাই। আমার এক খুব পুরোণো পরিচিত লোক মাত্র তিনমাস আগে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে সে দেওধেকরকে মীরাটের রেল-ষ্টেশনে দেখেছে।"

ঈষৎ বিস্ময়ের সাথে আলী সাহেব বল্লেন, "কৈ সে চিঠির কথা তো আপনি আমায় বলেন নি। বল্লে আপনার কেসটা আবার আগাগোড়া তদন্ত করাবার জন্যে আমি নিজে উদ্যোগী হতাম।"

"আমি বিশ্বাস করি আপনি তা হতেন। কিন্তু তখন আমার জেলের আর তিন মাস মাত্র বাকি। তা ছাড়া দেওধেকর তো আর মীরাটের ষ্টেশনেই মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে নি। তাকে খুঁজে পাওয়া যেত কি করে?

ডেপুটি জেলারের ধারণা ভুল। দশ বছর জেল খেটে মুক্তি পেলেও কে. কে. গুপ্ত অর্থাৎ কালী কিঙ্কর গুপ্ত একেবারে নিঃস্ব ছিল না। তার এখানে ওখানে কিছু জমা টাকাও সম্পত্তি ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সে সব খবরাখবর একত্র করে সে আবার তার পুরোণো আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকলো। কিন্তু এবার আর কলকাতায় নয়, বোম্বাইতে। এর আগের বার তার ব্যবসায়ের ক্ষতি দেওধেকর এসেছিল বোম্বাই থেকে। পুরোনো কোম্পানীর নামটাও সে বদলে দিল।

ব্যবসা কিছুটা গুছিয়ে বসার কিছুদিন পরে অনেক ভেবে চিন্তে, রাত্রি জেগে সে একটা চিঠি লিখলো।

দিন পনেরো পরেই চিঠির উত্তর এলো। কিন্তু ডাকে নয়। এক অবসর বহুল অপরাহ্নে অফিসের দরজায় টোকা দিয়ে। পত্র-প্রাপক ইন্দ্রজিৎ দেওধেকর স্বয়ং এসে হাজির। কিন্তু সত্যিই কি সে ইন্দ্রজিৎ দেওধেকর?

পুরোণো ইন্দ্রজিৎ দেওধেকর ছিল দীর্ঘাঙ্গ, কৃশ, শ্মশ্রু ও গৌরবর্ণ। কিন্তু এ ইন্দ্রজিৎ মোটা

সোটা প্রায় খপ্‌খপে, রঙ অনেক কালো। প্রথমে বেঢ়ে যাওয়ায় আর তেমন লম্বা তো দেখাই না বরং গোলগাল অনেকটা চলন্ত পিপের মত মনে হয়। তবু গুপ্তর সন্দেহ মাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হলো। কারণ ইস্ত্রজিৎ ছাড়া তার চিঠির উত্তরে আর কেউই এসে হাজির হতে পারে না।

ইস্ত্রজিৎও কয়েক মুহূর্তের জন্যে গুপ্তর দিকে হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো। তারও যেন কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এই কি কালীকিঙ্কর গুপ্ত?

গুপ্ত উঠে দাঁড়ালো, "এসো, ইস্ত্রজিৎ, এসো। আজ ক'দিন ধরে আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ....তোমাকে তোমার বহুদিন আগেকার পার্টনার কালীকিঙ্কর গুপ্ত সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটা খবর দেবার আছে।.....

"আমিই সেই কালীকিঙ্কর!"

"কালী! সত্যিই তুমিই সেই কালীকিঙ্কর।" ইস্ত্রজিতের ভয়াট গলার আবেগে স্বরটা থমথম করে উঠলো। সে অনেক, অনেক দিন আগে মাঝে মাঝে যখন কালীকিঙ্কর দিল্লী বোম্বাই ঘুরে ব্যবসায় কোন বড় লাভের খবর নিয়ে ফিরে আসতো তখন ইস্ত্রজিতের কণ্ঠে এমনি গরম উত্তেজিত হয়ে উঠতো।

"..... কালী আমায় মন বলছিলো আজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এটা যে আমার পক্ষে কত ভাগ্যের, কত আনন্দের।"

ডেস্কের ওপারে বসে একটি বিচিত্র সঠনের কাগজকাটা ছুরি নাড়াচাড়া করতে করতে গুপ্ত তার উত্তরে শুধু বল্লো, "তা হলে তুমিই ইস্ত্রজিৎ দেওধেকর?"

এত সহজে যে দেওধেকরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেল তার সাফল্যে, তার চোখে মুখে যেন তৃপ্তি ও কৌতুক ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে অবিচল দৃঢ় কণ্ঠে সে বল্লো, "ইস্ত্রজিৎ, এ পৃথিবীতে আর যার সঙ্গেই হোক না কেন, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাক—এটা যে তুমি কিছুতেই চাওনি তাও অস্বীকার করতে চাইবে?"

ইস্ত্রজিৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমাযাল হয়ে পড়লো। তারপর আবার আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলতে লাগলো, "কালী, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করাটা আমার পক্ষে কত কঠিন, কত সঙ্কোচের ব্যাপার তা তুমি জানো। তবু দেখা আমাকে করতেই হতো। কারণ তোমার কাছে মাপ চাইতেই হবে, তোমার ক্ষমা পেতেই হবে। আর আমার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নইলে...

গুপ্ত উচ্চহাসিতে তার কথার শেষটুকু উড়িয়ে দিল। তবু দেওধেকর আত্ম-সমর্থনের শেষ চেষ্টার সঙ্কোচে বলে উঠলো, "শুধু তুমি এইটুকু বিশ্বাস করো আমি কোন কিছুই মতলব করে করিনি। সবই ঘটনাচক্র।....."

"মতলব করে নয়? সবই ঘটনাচক্র? এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?"

"আমাদের ব্যবসার সব টাকা তুমি তছরূপ করলে। তারপর এমন কৌশল করে বেমালুম না চাকা দিলে যাতে আদালতে প্রমাণ হলো যে, আমি তোমার খুন করে গায়েব করেছি। আর এখন এতদিন পরে নির্লজ্জের মত বলতে এসেছ যে, যা কিছু ঘটেছে তা সবই ঘটনাচক্র। কোন কিছুই তুমি

মতলব করে করোনি?" ওপ্তর কণ্ঠ ঘৃণায় তীব্র হয়ে উঠলো। তার মুখ ক্রোধের আভায় গণগণে হয়ে গেল।

অসহায়ের মত দেওদেকর সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তার বিপুল দেহটা চুপসে গেল। মাথাটা নীচু হয়ে গেল। আর সেই স্তব্ধ ঘরে তার কানে যেন ওপ্তর উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনগুলি বাজতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, "কালী, আমি তহবিল তছরূপ করেছি সেটা সত্যি। তবে তারপর যা কিছু ঘটেছে তা ভাগ্যের চক্রান্ত। তা আমার আয়ত্তের বাইরে ছিল।"

"আমি একটা লোভজনক ফটকা খেলতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জিৎতে পারলে তোমাকে লাভের অর্ধেকটা দেবো। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। নিজেই শুধু সর্বস্বান্ত হলাম না, কোম্পানীর তহবিলও খোয়া গেল।"

"ওপ্ত, তোমাকে চিনি। আর খুব ভালো করেই চিনি বলে জানাম যে, তুমি আমায় ক্ষমা করতে না। জেলে পাঠাতে। তুমি নিজে কোন অন্যায় করো না এবং অপরের কোন অন্যায়কেও ক্ষমা করো না।...আর আমি যা করেছিলাম তা শুধু অন্যায় নয়, তোমার মত একজন বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ।"

ওপ্ত মুখে কিছু না বলে তার দিকে শুধু নিষ্পলকচোখে তাকিয়ে থেকে সেই বিচিত্র কারুকার্যকরা ছুরিটা আঙুলে করে ঘোরাতে লাগলো।

ওদিকে দেওদেকর আবার বলে যেতে লাগলো, "সুতরাং আমি ঠিক করলাম, আমি গা ঢাকা দেবো। তা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না এবং তাও বিশেষ করে এই জন্যে যে পুরোণো হিসেবপত্রের খাতা ফাইল সবকিছু তুমি মিলিয়ে দেখবার জন্যে সেদিন এক শুক্রবার রাত্রে বাড়ী নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলে। তার জন্যে একটি প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কও কিনে আনলে। আমি নিশ্চয় জানতাম পরের সপ্তাহে অফিস খুলেই তুমি আমায় এসে কোম্পানীর হিসেবের সব গরমিলের জন্যে ধরবে...সুতরাং আমি সরে পড়লাম।"

একটানা এই পর্যন্ত বলে দেওদেকর যেন দম নেবার জন্যে কয়েক মুহূর্ত থামলো এবং সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওপ্তর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলো।

তারপর কের তার কাহিনী সুরু করে দিলো, "আমি ভেবেছিলাম তুমি ভাববে আমি আত্মহত্যা করেছি। তাই আমার জামাকাপড় আর ফলিও ব্যাগটা অফিসে ইতস্তত ছড়িয়ে রেখে গেলাম। কিন্তু তখন যদি এতটুকু জানতাম যে, এ সবেরই উল্টো ব্যাখ্যা হবে তা হলে কখনোই তা করতাম না।"

এরপরে দেওদেকর এমনভাবে ওপ্তর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল যার অর্থ যেন হচ্ছে "আমার কথা সবই তো আমি খুলেই বললাম, এবার বিচারের ভার তোমার হাতে বন্ধু।"

এতক্ষণ মাথানীচু করে ওপ্ত সব কিছুই একাগ্রভাবে শুনছিলো। দেওদেকরের কথা শেষ হতে সে সোজা হয়ে বসলো। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বলো, "কোথাও যে একটা কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে এমন আশঙ্কা করেছিলাম বলেই আমি সেই দিন খাতাপত্র ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আলিবাগেতে তুমি এসেই হাত পাকিয়েছিলে ইন্দ্র, যে সারাটা শনি রবিবার খাতাপত্র দেখেও আমি কিছুই ধরতে পারিনি। পরে সোমবার আফিস থেকে

আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আবার কাগজপত্র নিয়ে বসে গেলাম। সে প্রশ্ন মাফিকারে তোমার সব কীর্তি আমি ধরে ফেললাম; মঙ্গলবার উঠেই লালবাজারে পুলিশের কাছে দৌড়লাম।

তাদের নিয়ে আমি অফিসে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে সোমবারে আমি অফিস থেকে চলে যাবার পরই এখানে আমাদের কমিও ব্যাগ ফেলে রেখে তুমি চম্পট দিয়েছো।

পুলিশ এসে তন্নতন্ন করে অফিস তল্লাসী করলো। অফিসের মেঝের তোমার চেয়ারের গদীর তাঁজে, তোমার ড্রয়ারের ভেতরে রক্তের শুকনো ছোপ খুঁজে পেল। আর পেল সেই দেয়াল-আলমারীটার তাকে একটা কাগজকাটা ছুরি, তাতেও রক্তের ছোপ।

যখন তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে শুক্রবার সন্ধ্যে বেলায় সপ্তাহ শেষে অফিস বন্ধের আগে আমি একটি বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে বাড়ী গিয়েছি তখন তারা সোজা আমার বাড়ী চড়াও হয়ে আবার খানাতল্লাসী করলো। সত তিন দিন অতবার করে ট্রাঙ্কটা খুলেও আমার যা চোখে পড়ে নি, পুলিশের সন্ধানী চোখে তা এড়িয়ে গেলনা। ট্রাঙ্কটার তলার দিকে খানিকটা শুকনো রক্ত! তাজ্জব কাণ্ড! এমন কৌশলেই তুমি ষড়যন্ত্রের জালটি পেতে রেখেছিলে যে তা থেকে বেরোই পাবার আমার কোন পথই ছিল না। অথচ তুমি এখন বলতে এসেছ যে তুমি মতলব করে কিছুই করোনি।"

"না করিনি। কালী, সত্যিই আমি মতলব করে কিছুই করিনি।" দেওদেকর এবার জোরের সঙ্গে বলে উঠলো, "সেই শুক্রবারেই তুমি যখন লাঞ্চে বেরুলে তখন আমি ট্রাঙ্কটা তাড়াতাড়ি খুলে দেখতে গেলাম ঠিক কোন কোন কাগজপত্র তুমি নিয়ে যাচ্ছো। কিন্তু ট্রাঙ্কটা সহজে খোলা গেলনা। তাই আমি একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে চাড় মেরে ট্রাঙ্কটা খুলতে গেলাম। আমার হাতটা কেটে গেল। প্রায় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। সেই রক্তই হয়তো তোমার ট্রাঙ্কে, মেঝেতে আর ড্রয়ারে পড়ে থাকবে।"

এবার গুপ্ত প্রায় গর্জন করে উঠলো, "পড়ে থাকবে? পড়ে তো ছিলোই। তার জোরেই পুলিশ এক মিথ্যা খাড়া করলো যে, কারবারের টাকা মেরেছি আমি। আর সেই নিয়ে আমার পার্টনারের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আমি তাকে রাগের মাথায় খুন করে পরে ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিয়ে আসি। অবশ্য আমার বাড়ীর চারপাশ আর সমুদ্রপথ সব জায়গায় খোঁজ করেও তোমার লাস পাওয়া গেল না। আর আমি নিশ্চয় জানতাম যে তুমি তদবিল তছরূপ করে কোথাও সরে পড়েছো; হয় বার্মায় কিম্বা ইষ্ট আফ্রিকায়।

তবু ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমি মিথ্যে করে তোমার খুনের অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। তারপর দশটা বছর কয়েদে কেটে আজ ক'মাস হলো বেরিয়েছি।"

আবার সখেদে দেওদেকর বলতে শুরু করলো, "তোমার অনুমান অনেকটা ঠিকই। আমি প্রথমে গেলাম নাইরবী। আমার মামাতো ভাইয়ের কাছে। তার সেখানে প্রকাণ্ড ব্যবসা। তারপর মোম্বাসা ও দারেস সালাম। নামটা বদলে করে নিলাম কেশব প্যাটেল। ছিলাম মারাঠী, হয়ে গেলাম গুজরাটী। আমোই তো আমার মা ছিলেন গুজরাটী। তাই আমার কাছে মাতৃভাষা গুজরাটী আর পিতৃভাষা মারাঠী দুই-ই সমানভাবে আপনার। চেহারাতেও আমি ধাতমাফিক। তাই নাম-ধাম সব কিছুই পাল্টে নিতে কোন অসুবিধা হলোনা।

পূর্ব আফ্রিকায় কোলকাতার কোন খবর পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া পাছে কোন সূত্রে জানাজানি হয়ে যায় তাই আমি কোন খোঁজ খবর রাখা তো দূরের কথা যতটা পারা তা এড়িয়ে গেছায়।

ইতিমধ্যে ওখানে ব্যবসাটা আমি রীতিমত গুছিয়ে ফেলাম। এক ধনী গুজরাটীর একমাত্র মেয়েকে বিয়েও করলাম। ক্রমে আমাদের দুটি সন্তান হলো।

কিন্তু কালী, তোমাকে আমার অন্তত একটা কথা বিশ্বাস করতে বলছি যে, আমি যদি জানতাম যে তুমি আমাকে খুনের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করেছো তা হলে নিশ্চয়ই ফিরে আসতাম।"

"কেন? দেখেও তো তুমি আজ কম দিন ফেরোনি? এর মধ্যে কিছু করলে না কেন?" তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলো।

"কারণ প্রথম দিকে তোমার কোন খবরই আমি পাইনি। যখন পেলাম তখন শুনলাম তোমার ছেলের আর মায়ের বহুর খানেক বাদি।" .....তারপর মুহূর্তকাল চুপ করে থাকিটা মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে সে প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো, "কিন্তু তখনো যে আমি তোমাকে তোমার শাস্তি থেকে, দুর্নাম থেকে উদ্ধারের জন্যে সোজা ছুটে যাইনি সেটা আমার কাপুরুষতা কালী। আমি কাপুরুষ, আমি দুর্বল, আমি লোভী, আমি অপরাধী, তাই আমি যাইনি। আমার ব্যবসা, আমার ঐশ্বর্য, আমার সুন্দরী স্ত্রী, আমার দুটি সন্তান তাদের কথা ভেবে আমি যেতে পারিনি।

আমি যাওয়া মানেই একটা নাটকীয় মামলার যবনিকা উত্তোলিত হতো। আমার সত্যিকারের পরিচয় বেরিয়ে পড়তো, আমার সব যাক, ইজ্জৎ, সম্মান মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। আমার স্ত্রী ও তার আত্মীয়রা জানতো আমি সৎ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ী কেশব গ্যাটেল নই, আমি জালিয়াৎ ও ফেরারী ইস্তফিৎ দেওধেকর,—যে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে সরে পড়েছে। কালী, আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও আমি যা করেছি তাই করতে।"

গুপ্ত যেন ক্রোধে ফস করে জ্বলে উঠলো। ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে উঠলো, "তাই নাকি?" সেই ভ্রুকুটি যেন দেওধেকরের বুকে গিয়ে তীরের মত বিঁধলো। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কিন্তু খানিক পরেই একটা দমকা আবেগের সঙ্গে সে বলে উঠলো, "পুরোনো কথা ভুলে যাও কালী। আজ আমি এসেছি আমার সব অপরাধ মুছে ফেলতে। আমি চাই আমার কলাও ব্যবসা আজ পর্যন্ত যা কিছু লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু লাভ করবো তা তোমার সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিতে। এটা কি যথেষ্ট ন্যায্য প্রস্তাব নয়?"

"ন্যায্য প্রস্তাব হতো যদি তোমার গল্পটা সত্যি হতো।" গুপ্ত চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো।

"প্রতিটি কথা সত্যি।" দেওধেকর আর্তস্বরে বলে উঠলো।

"প্রতিটি কথাই মিথ্যে। আমাকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্যে তুমি সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিলে।" বলতে বলতে গুপ্ত একটা দেরাজের কাছে উঠে গিয়ে তার কপাটটা খুলে ফেলো। তারপরেই এক ঝটকায় দেওধেকরের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তার হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে ঝলক দিয়ে উঠলো একটি রিভলবার। আতঙ্কে পিউরে উঠে দেওধেকর একবার দাঁড়াতে গেল।

বজ্রকণ্ঠে গুপ্ত হুকুম দিল, "খবর্দার! বসো।"

কম্পিত কণ্ঠে ইন্দ্র বলতে গেল, "তুমি আবার শাস্তি পাবে কালী। এবার ফাঁসী।"

স্থিরভাবে গুপ্ত উত্তর দিল, "এবার কিছুই নয়।" সেই সঙ্গে দেওধেকরের দিকে এগিয়ে এলো খানিকটা। তারপর তার চোখের দিকে পাথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লো, "তোমার গল্পের মধ্যে একটা কথা ফাঁক থেকে গেছে। তুমি একবারও বল্লেনা যেন কেন তুমি ফেরার হবার সঙ্গে সঙ্গেই রিভিয়া বিবিও

উধাও হলো। জি, ডি, এও কোম্পানী অর্থাৎ, গুপ্ত দেওদেকর এণ্ড কোম্পানীর যুগল অংশীদারের যৌথ রক্ষিতা রিজিয়া বিবি, লক্ষ্ণৌ থেকে সংগৃহীত ইরাকী তরুণী। পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাকে রাখা হতো।"

"কেন তুমি শোনোনি যে সে সুবিরায়ার এক ট্রেন দুর্ঘটনায়……"

দেওদেকর প্রায় আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলো, কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার থেকে মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু গুপ্তর হাতে গুলি খেয়ে নয়। ক্ষিপ্র হাতে গুপ্ত তার ডেস্কের ওপর সেই বিচিত্র পেন্সিলকাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিয়েছে।

গুপ্ত নিজেই থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করলো। আবার আদালতে মামলা উঠলো। গুপ্ত নিজের জবানীতে বল্লো, "আমিই তাকে খুন করেছি। কিন্তু তার নাম কেশব প্যাটেল নয়, ইস্ত্রজিৎ দেওদেকর। আমার পুরোপো ব্যবসায়ের পার্টনার। তাকেই খুন করার অপরাধে এর আগে আমার দশ বছর জেল হোয়েছে। মাত্র ক'মাস আগে খালাস পেয়েছি।"

বিচারক বল্লেন, "আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। আপনি তাঁকে খুন করে তারপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করেন।"

"হ্যাঁ, আমার চিঠি পেয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।"

তারপর সে ইনিয়ে বিনিয়ে একটা কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করে এবং বলে যে আমার দশ বছর জেল খাটার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক টাকা দিতে চায়। দশ বছরে সে যত টাকা লাভ করেছে তার অর্ধেক টাকা। আমি তা ছুতো দেয়ে গরু মারার সমান বলে মনে করি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়। তখন আমি রেগে গিয়ে পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে তাকে খুন করি। ঠিক ঐ অপরাধে,—রেগে গিয়ে পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে ইস্ত্রজিৎ দেওদেকরকে খুন করার অপরাধে এর আগে আমি কঠোর দণ্ড ভোগ করেছি।

……যেহেতু আইনের নির্দেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি একই অপরাধে দুবার শাস্তি ভোগ করতে পারে না তাই এবার আপনি আমায় মুক্তি দিন।"

বিচারক প্রথমে বিচিত্র বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর আরো তদন্তের জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন।

মাসাধিককাল তদন্ত চল্লো। কিন্তু কেশব প্যাটেলই যে নাম ভাঁড়ানো ইস্ত্রজিৎ দেওদেকর তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল না। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ইস্ত্রজিৎ দশ বছরেরও আগে বর্তমান আসামী কালীকিঙ্কর গুপ্তর হাতেই পেন্সিলকাটা ছুরির ঘায়ে খুন হয়। কেশব প্যাটেল অন্য লোক।

———

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান।"

বজ্রে বাজে বাঁশী

(চিত্রোপন্যাস)

আনন্দ দেবরাজ

[চলচ্চিত্রের জন্য রচিত এই কাহিনীর মধ্যে পাঠক-পাঠিকা একটি বিশেষ লিখনভঙ্গী লক্ষ্য করবেন। এর মধ্যে কোন সংলাপ নেই। শুধু বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কাহিনীকে বিশ্বস্তভাবে বলা হয়েছে। এটিকে যখন চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা হবে তখন চিত্রনাট্যকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংলাপ সংযোজিত হবে। নতুন ধরণে লেখা কাহিনীটি আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।]

১

কালাপাহাড়

সারাদেশে নামটা যেন এক মহাআতঙ্কের প্রতীক।

অসমসাহসী। অসাধারণ বীর। অদ্ভুতোদ্যম যোদ্ধা। কিন্তু কী বিপরীতধর্মী! কী নিষ্ঠুর নৃশংস। কী বিকৃত তাঁর আচরণ। হিন্দু হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি এত তাঁর অকরুণ বিদ্বেষ।

কত হিন্দু মন্দির যে চূর্ণ হয়েছে তাঁর সৈন্যদের আক্রমণে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

শুধু বাংলায় নয়, উড়িষ্যায় বহু দেবদেউল কালাপাহাড়ের আঘাত সহ্য করেছে, বিকৃত বিধ্বস্ত হয়েছে।

বাংলার গ্রামে যাঁর নাম ছিল কালাচাঁদ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন দুর্দান্ত কালাপাহাড়ে।

গ্রামের মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর ছিল মিত্রতা। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা সেটা সহ্য করেনি। তারা কালাপাহাড়কে জাতিচ্যুত করেছিল।

তারই প্রতিবিধিৎসায় কালাচাঁদ আজ কালাপাহাড়। হিন্দুর দেব-দেবীকে তিনি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এই তাঁর শপথ।

২

সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। দূরে একটা গ্রাম জ্বলছে। কালাপাহাড়ের সৈন্যরা উড়িষ্যা থেকে ফেরবার পথে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে আসছে। মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করছে। চারিদিকে উৎপীড়িতের আর্তনাদ।

॥ ৩ ॥

একটি মন্দিরে আগুন লেগেছে। কালাপাহাড়ের সৈন্যরা মন্দিরের ভিতর ঢুকেছে। মন্দিরের বিগ্রহকে তারা এখুনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

সেই গ্রামের মেয়েরা আশ্রয় নিয়েছিল সেই মন্দিরে।

কালাপাহাড়ের এক সেনানায়ক তাকে দেখে অট্টহাস্য করে উঠল। এমন জিনিষ প্রভুর হাতে সমর্পণ করলে তিনি খুব খুশী হবেন নিশ্চয়ই।

॥ ৪ ॥

সেই গ্রামের প্রান্তবর্তী এক ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত প্রাসাদে কালাপাহাড় সেই সময় অবস্থান করছিলেন। ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দিগন্তের বুকে আগুনের হোলিখেলা।

বন্ধু আনন্দ এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে।

আনন্দ তাঁর নিত্যপথের সঙ্গী, বহুদিনের সহচর, অকৃত্রিম বন্ধু।

আনন্দ নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু কালাপাহাড় কখনো তাঁর এই বন্ধুটির ধর্মাচরণ বা ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করেননি। আশ্চর্য, আনন্দ একটি স্বর্ণকান্তি বিষ্ণুমূর্তির নিত্য পূজা করেন, কালাপাহাড়ের সমস্ত অভিযানে আনন্দর সঙ্গে সেই দেবমূর্তি চলে, কিন্তু সেই মূর্তির প্রতি কালাপাহাড়ের ঘৃণা কখনো প্রকাশ পায়নি।

বন্ধুকে ভালবাসেন কালাপাহাড় সমস্ত অন্তর দিয়ে। সকল আত্মীয় স্বজন, পরিজন কালাপাহাড়কে ত্যাগ করেছে। কিন্তু আনন্দ সেই যে তাঁর পথের সঙ্গী হয়েছে, সে যাত্রার আজও দু'জনে যেন এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা রয়েছেন।

হাসিমুখীতে আনন্দ সার্থকনামা। দারুণ সংঘর্ষের মধ্যেও তিনি হাসেন, হাসান। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মুখে হাসি নেই।

মুখ তার ক র আনন্দ কালাপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এরকম ভাবে আর কতদিন চলবে? এ ধ্বংসলীলার কী শেষ হবে না? এভাবে ঘুরে ঘুরে যে পায়ের পেশীগুলো শিথিল হয়ে গেল। আর তো পারা যায় না।

আনন্দর কথা শুনে হাসলেন কালাপাহাড়। বেশতো! আনন্দ ফিরে যাক তার গ্রামে। কেন এই কষ্টভোগ। কেন এই বিধর্মী বন্ধুর কাছে থেকে দুর্ভোগের ভাগী হওয়া। আনন্দ ফিরে যাক।

সর্বাঙ্গ দুলিয়ে মাথা নাড়লেন আনন্দ। সেটি হবে না। আনন্দ ফিরে যাবেন না। বন্ধুর সঙ্গে থাকবেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সেই পরমাশ্চর্য ঘটনার আর দেরী নেই।

অদূরে পদধ্বনি। সুসজ্জিত এক রাজদূত এসে দাঁড়াল কালাপাহাড়ের সামনে। আভূমি প্রণত কুর্নিশ করে কালাপাহাড়ের হাতে নবাবের সনদ অর্পণ করলে।

গৌড়ের অধিপতি সোলেমান করনানি বার্তা পাঠিয়েছেন। কালাপাহাড়কে রাজদরবারে আহ্বান করা হয়েছে। নবাব স্থির করেছেন, এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি কালাপাহাড়কে সম্বর্ধনা জানাবেন এবং তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনাদলের সর্বাধিনায়কের পদে বরণ করবেন।

। ৫ ॥

সেনানায়ক আদিত্য প্রবেশ করে কুর্নিশ করলে। তার পিছনে দু'জন সৈনিকের মাঝখানে চন্দনা।

আদিত্য খুশীমুখে চন্দনাকে দেখিয়ে বললে যে, এমন জিনিষ পেয়ে তার প্রভু নিশ্চয় আনন্দিত হবেন এবং তাকে ইনাম দেবেন।

পলকের মধ্যে কালাপাহাড় রাগে ফেটে পড়লেন। সেনানায়ক কী মনে করেছে যে, তিনি লম্পট, ব্যভিচারী! তাঁর কোনো অভিযানে তিনি কখনো নারীদের নিগৃহীত করেননি। এখবর তাঁর এই নীচমনা সেনানায়ক কি জানে না?

কালাপাহাড় সৈন্য দুজনকে আদেশ দিলেন, মেয়েটিকে মুক্ত করে দাও, তাকে তার ঘরে ফিরে যেতে দাও, তার প্রতি যেন কোনো অন্যায় না হয়।

কালাপাহাড়ের কথা শুনে চন্দনা বিস্মিত হল। এই ধ্বংসলীলার দোতার মুখে এমন বাক্য বা তাঁর এমন ব্যবহার চন্দনার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। সে ধীরে ধীরে চলে গেল। সৈন্য দুজনও কুর্নিশ করে প্রস্থান করল। দাঁড়িয়ে রইল আদিত্য।

বকশিস চাও? এগিয়ে এলেন কালাপাহাড়। তাঁর পরনে ছিল অশ্বারোহীর বেশ। হাতে চাবুক।

এই নাও বকশিস। মেয়ে এনেছিলে আমার জন্যে? শয়তান কোথাকার। সপাসপ তাঁর হাতের চাবুকের ঘা গিয়ে পড়ল আদিত্যর মুখের ওপর। বাঁদিকের কপালে কালশিটা পড়ে গেল। বিকৃত মুখে আদিত্য সেই ঘায়ের ওপর হাত বুলোতে লাগল।

কালাপাহাড় প্রস্থান করলেন। আদিত্য রক্তচোখে তাকিয়ে রইল। তার চোখে মুখে ক্রুর কঠিন প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল। ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

। ৬ ।

গ্রামের মধ্যে একটি মাটির দেওয়াল ঘেরা বাড়ীতে একা থাকে চন্দনা। সেই গ্রামেরই ছেলে শিবনাথ। চন্দনার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু নারী হয়ে চন্দনার যে সাহস আছে, পুরুষ হয়ে শিবনাথের তা নেই। কালাপাহাড়ের সৈন্যরা যখন এ অঞ্চলে হানা দিয়েছিল তখন শিবনাথকে কোথাও দেখা যায়নি।

শিবনাথের দেখা পেয়ে চন্দনা তাকে বিগত ঘটনাবলী সবিশেষ জানাল। এবং আরো জানাল যে কিছুদিন ধরে গ্রামে চোরডাকাতের উপদ্রব অত্যন্ত বেড়েছে। শিবনাথ গ্রামরক্ষীদল তৈরী করুক। সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় দিক্। এমনি করে পালিয়ে বেড়ান তো পুরুষের কাজ নয়।

শিবনাথ আমতা-আমতা করতে লাগল। জড়িত স্বরে কত কি বললে। চোর-ডাকাতকে সে ভয় করে না। দরকার হলে সে তাদের সঙ্গে লড়বে। চন্দনাকে বাঁচাবার জন্য সে নিজের প্রাণ দেবে। ইত্যাদি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ বাইরে আওয়াজ উঠল—রে, রে, রে, রে, রে!

ডাকাত। ডাকাত পড়েছে চন্দনার বাড়ীতে। ভয়ে কাঁপতে লাগল শিবনাথ। তারপর কাপুরুষের মত সে পিছনকার দরজা দিয়ে পালাল।

জনতিনেক ভীলকায় আদিবাসী। লুঠতরাজই তাদের পেশা। চারিদিকে ভয় ছিয়ে বেড়ায়। আজ এই গ্রামে এসে ঢুকেছে।

ঘটনাচক্রে কালাপাহাড় সেই সময় অশ্বারোহণে সেইদিক দিয়ে ফিরছিলেন। নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে ঘোড়া থেকে নেমে চন্দনার বাড়ীর দিকে ছুটে গেলেন।

সংঘর্ষ ঘটল তিনজন ডাকাতের সঙ্গে। কালাপাহাড়কে দেখে এবং তাঁর সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে ডাকাত তিনজন বুঝল যে এ ব্যক্তি সামান্য নয়। এবং এর লোকজন এসে পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার।

একজন ডাকাতের বর্শার ফলা বিঁধেছিল কালাপাহাড়ের ডান কাঁধে। রক্তপাত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। ডাকাতরা পালাবার পর অবসন্ন বোধ করলেন। বসে পড়লেন চন্দনার ঘরের দাওয়ায়।

ছুটে এল চন্দনা। আঁচল ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার চেষ্টা করলে। তারপর অবসন্ন কালাপাহাড়কে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে চারপাইয়ের উপর শুইয়ে দিলে।

শুশ্রূষা করবার পর চন্দনা নিকটস্থ কবিরাজকে ডেকে নিয়ে এল। কবিরাজ ওষুধ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করলেন। অন্যান্য ওষুধ দিলেন এবং পরিশেষে বললেন যে, অন্তত তিন দিন আহত ব্যক্তি যেন চলাফেরা না করেন। তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

॥ ৭ ॥

কালাপাহাড় চন্দনাকে চিনতে পারেননি। তিনি চন্দনার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করলেন। বললেন যে, তিনি নবাব সোলেমানের অধীনে একজন সামান্য সেনানী। চন্দনা তাঁকে অবশ্য চিনতে পেরেছিল। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করলে না।

॥ ৮ ॥

ক্রমে কালাপাহাড় সুস্থ হলেন। চন্দনার সেবায় মুগ্ধ হলেন তিনি। তার প্রতি গভীর অনুরাগে আকৃষ্ট হলেন।

কথায় কথায় একদিন কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গ উঠল। তাঁর নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্যে চন্দনার বেদনা ও হতাশার অভিব্যক্তি শুনে কালাপাহাড়ের মনে এক নতুন এবং গভীর অনুভূতি জাগল। তিনি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, আসলে কালাপাহাড় লোকটা হয়ত সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস নয়। ভাগ্যের চক্রান্তে তাঁর আজকের কার্যকলাপ চতুর্দিকে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। তাঁর পক্ষে এ জীবন থেকে মহত্তর জীবনে উত্তরণ কী কোনোদিন সম্ভব হবে?—চন্দনার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে কালাপাহাড় মাথা নাড়লেন। মানুষের জীবনে সবই সম্ভব। সুতরাং আশা করতে দোষ কি।

॥ ৯ ॥

ইতিমধ্যে একদিন পুকুর পাড়ে শিবনাথের সঙ্গে চন্দনার দেখা হল। শিবনাথ মহাক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত। কালাপাহাড়ের মত শত্রুকে চন্দনা কিনা শুশ্রূষা করছে, তার সেবা করছে! কিন্তু আর নয়। শিবনাথ ভিন্নগাঁয়ে চলে যাচ্ছে। চন্দনা চলুক তার সঙ্গে।

চন্দনার কণ্ঠস্বর তিরস্কারে শিবনাথ চমকে উঠল। চন্দনা তাকে প্রত্যাখ্যান করলে। শিবনাথ গন্ধরাজে গন্ধরাজে চলে গেলো।

। ১০ ।

খুশ হয়ে কালাপাহাড় চন্দনার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বললেন, যদিও তিনি একজন সামান্য সেনানী এবং তাঁর সাধ্য কম তাহলেও চন্দনার যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

তা তো করবেন। কিন্তু চন্দনা তাঁর কাছে পৌঁছবে কেমন করে? কী পরিচয়-পত্র দিয়ে সে নিজেকে সনাক্ত করবে?

কালাপাহাড় চন্দনাকে একটি ছোট তাম্র ফলক দিলেন। ফলকের উপর কয়েকটি ফার্সী অক্ষর মুদ্রিত। বললেন যে, গৌড়ে পৌঁছে সেখানকার যেকোনো রাজকর্মচারীকে এই ফলক দেখালেই, সে তাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে।

কুটীরের পিছনে কালাপাহাড়ের ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। এ'কদিন চন্দনা তার প্রতিও যথোচিত যত্ন নিয়েছে। চন্দনার কাছে বিদায় নিয়ে কালাপাহাড় ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

। ১১ ।

গৌড়ের দরবারে মহোৎসব। সেনাবিভাগের সর্বাধিনায়কের পদে কালাপাহাড়ের অভিষেক হচ্ছে। দরবার বসেছে। নবাবের সিংহাসনের ডানদিকে সুসজ্জিত আসনে কালাপাহাড় বসে আছেন। মহার্ঘ্যভূষণে সজ্জিত হয়ে সমস্ত কর্মচারী এবং নাগরিকবৃন্দ দরবারে উপস্থিত। নহবৎ বাজছে। অভিষি-দের মধ্যে আতর, গোলাপ তাম্বুল ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে।

জাফরি-কাটা অলিন্দের পিছনে বসেছেন নবাবের পুরোস্ত্রীরা। একটি পৃথক স্থানে বসেছে নবাব দুহিতা রোশেনারা তার সখীদের নিয়ে। রূপালী চিকের পর্দা সরিয়ে সে দেখছে কালাপাহাড়কে। কী সুন্দর ঐ দেবকান্তি বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রধান। রোশেনারার দুই চোখে আবেশ। অন্তরে আলোড়ন।

উৎসবের কোলাহলের মধ্যেও কালাপাহাড় অন্যমনস্ক। কয়েকদিন আগেকার এক গ্রামের কুটীরে ফেলে আসা জীবনের কথা তিনি ভাবছেন।

। ১২ ।

অসম্মানিত সেনানায়ক আদিত্য প্রতিহিংসায় ধকধকিয়ে জ্বলছিল। কালাপাহাড়ের সমস্ত গতিবিধির ওপর সে লক্ষ্য রাখছিল। ইতিমধ্যে সে শিবনাথের সঙ্গে আলাপ করেছে, তাকে সঙ্গে করে গৌড়ে এনেছে এবং রীতিমত বশ করেছে। আদিত্য শিবনাথকে বুঝিয়েছে যে চন্দনা যে শিবনাথকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার মূলে আছে কালাপাহাড়। সুতরাং প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তো তা কালাপাহাড়ের উপরই নিতে হবে।

। ১৩ ।

চন্দনাকে জোর করে মৌড় থেকে অন্যত্রে স্থানান্তরিত করবার জন্যে শিবনাথ ওঠা লাগিয়েছিল। চন্দনা জানতে পেরে একদিন সন্ধ্যার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

। ১৪ ।

দু'একদিন পরে। অশ্বপৃষ্ঠে কালাপাহাড় চন্দনাদের গ্রামে এলেন। তারপর চন্দনার কুটীরের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। মুক্ত দ্বার, উন্মুক্ত দ্বার, বিশ্বস্ত। ভিতরে গেলেন কালাপাহাড়। চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন। ছোট একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রয়েছে একটি দর্পণ। সেটিকে হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

। ১৫ ।

অপরাহ্ণকালে আনন্দ শঙ্করের প্রান্তে দীঘির ধারে বেড়াতে গিয়েছেন। স্থানটি বড় মনোরম। তিনি প্রত্যহই এদিকে আসেন। সেদিন দেখলেন দীঘির পাড়ে এক কিশোর বালক দুহাতে আঁজলা ভরে জল নিয়ে পান করছে। বালকটির পরণে চুড়ীদার পাজামা, গিলেপ। মাথায় পাগড়ী। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। তার ক্লান্ত অবসন্ন চেহারা দেখে আনন্দর প্রাণে মমতা জাগল। তার সঙ্গে কথা বলে এবং তার পরিচয়াদি নিয়ে তিনি জানলেন যে বালকটির নাম রঞ্জন। সে নিরাশ্রয়। তার আত্মীয় স্বজন কে কোথায়, তা সে জানেনা। সে জীবিকার সন্ধানে দৌড়ে এসেছে।

আনন্দ তাকে আশ্রয় দিলেন। রঞ্জন তাঁর কাছে থাকবে তাঁর সেবকরূপে। আনন্দর পূজার ঘরের সকল কাজ সে করবে।

রঞ্জন আনন্দর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে তার সম্মতি জানাল।

। ১৬ ।

নবাবের প্রাসাদের অদূরে উদ্যানের প্রান্তে সুরম্য অতিথিশালাটি কালাপাহাড়ের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দু'মহল বাড়ী। মাঝখানে প্রশস্ত চত্বর। সামনের মহল কালাপাহাড়ের। শয়নকক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ, ভোগাগারা প্রভৃতি অনেকগুলি সুসজ্জিত ঘর।

পিছনের মহলে আনন্দ তাঁর বিগ্রহ নিয়ে পূজা অর্চনায় খুব ধুম লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রতি সন্ধ্যায় আরতির সময় অনেকেই তাঁর মহলে আসেন, আনন্দ এবং রঞ্জনের বৈতকণ্ঠের ভজন শোনেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রঞ্জন আনন্দর কাছে কাজে বহাল হয়েছে। সে চমৎকার কাজ করে। সুন্দর গান করতে পারে। তাকে পেয়ে আনন্দ ভারি খুশী। শুধু আনন্দর ঘরের কাজই নয়, আনন্দর নির্দেশেই রঞ্জন কালাপাহাড়ের সেবকরূপেও কাজ করছে।

এই সুকুমার বালক-ভৃত্যটিকে দেখে এবং তার সেবায় কালাপাহাড় বিশেষ পরিতুষ্ট।

একদিন কালাপাহাড়ের শয়ন কক্ষটিকে ঝাড়ামোছা করবার সময় সেই কক্ষের একস্থানে একটি ছোট দর্পণ দেখে রঞ্জন গুরুবিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ১৭ ॥

আনন্দর বিচুমকিয়ে নবাবদুহিতা রোশেনারার সখীদের নিত্য আনাগোনা। আনন্দ এবং রঞ্জনের সঙ্গে তাদের ভারি ভাব।

এক একদিন আনন্দ এবং রঞ্জনের গানের সঙ্গে তারাও কণ্ঠ মিলিয়ে যোগ দেয়।

॥ ১৮ ॥

কী একটা কাজে রঞ্জন বাইরে বেরিয়ে ছিল। ফেরবার পথে একটা ভাঙা বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন সে আসছিল তখন শুনতে পেল ভিতরে বসে কারা যেন কথা বলছে। কালাপাহাড়ের নামটাও তার কানে গেল। সে থমকে দাঁড়াল। ভিতরে আদিত্য আর শিবনাথ ষড়যন্ত্র করছে। আদিত্য শিবনাথকে বোঝাচ্ছে যে, কালাপাহাড়কে মারতেই হবে, যেমন করে হোক। আদিত্য খবর পেয়েছে আগামীকাল কালাপাহাড় নিকটস্থ সুন্দর বনে শিকার করতে যাবে একা। সেই সুযোগ। বনের মধ্যে শিবনাথ দূর থেকে বর্শা মেরে কালাপাহাড়কে হত্যা করবে। ছদ্মবেশধারী শিবনাথের পরিচয় জানতে পেরে এবং ষড়যন্ত্রের কথা শুনে রঞ্জন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল। কী করবে সে? কেমন করে এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করবে?

॥ ১৯ ॥

কালাপাহাড় রাত্রের আহারে বসেছেন। রঞ্জন তাঁকে পরিবেশন করছে। আজকাল রঞ্জনের সঙ্গে কালাপাহাড়ের অনেক কথা হয়। এই ছেলেটিকে কাছে পেলে তিনি আনন্দ বোধ করেন। কথায় কথায় রঞ্জন জেনে নিলে যে, তিনি কাল শিকারে যাবেন। এবং রঞ্জন তাঁকে সেই শিকারে যেতে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কালাপাহাড় যখন বললেন যে, তিনি শিকারে যাবেনই তখন রঞ্জন জানাল সেও তাঁর সঙ্গে যাবে।

॥ ২০ ॥

বনের মধ্যে কালাপাহাড় শিকারের সন্ধানে ঘুরছেন। রঞ্জন তাঁর পাশে পাশে। রঞ্জনের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চতুর্দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার কৌশলে কালাপাহাড় একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। ফলে বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী শিবনাথের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

॥ ২১ ॥

গ্রামের প্রান্তে দারুণ কবীরের মত মেলা বসেছে। আনন্দ রঞ্জনকে নিয়ে সেই মেলা দেখতে গেছেন। মেলার একপাশে কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তনের আসর বসিয়েছে। কীর্ত্তন জমেছে খুব। আনন্দ তন্ময় হয়ে শুনছেন। তাঁর পাশে রঞ্জন। কিন্তু সে যেন অন্যমনস্ক। তার সুচোখে যেন কোনো আসন্ন বিপদের ছায়া।

অন্য প্রান্তে বনের মধ্যে আদিত্য শিবনাথকে উত্তেজিত করছে। এখন বাড়ীর মধ্যে কালাপাহাড় একলা। সবাই গেছে মেলায়। ভৃত্য রক্ষী কেউ নেই। কালাপাহাড় একা। নিস্তব্ধ রাত। এমন সুযোগ আর হবেনা।

শিবনাথ কোমর থেকে ছোরা বার করে সেই ছোরা সজোরে মাটীর বুকে বিদ্ধ করে বললে যে, সে আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ সমাধা করে আদিত্যর কাছে ফিরে আসবে।

মেলায় বসে রঞ্জন যেন অস্থির বোধ করছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে আনন্দ দুচোখ বুজে ভাবসমাধিচিত্তে কীর্তনের মধ্যে ডুবে গেছেন। রঞ্জন আস্তে আস্তে উঠে মেলা থেকে বেরিয়ে এল।

২২

শিবনাথ পাঁচিল টপকে কালাপাহাড়ের বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে।

ঘরের মধ্যে কালাপাহাড় গভীর নিদ্রামগ্ন।

রঞ্জন ছুটতে ছুটতে আসছে।

শিবনাথ কালাপাহাড়ের ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর কোমর থেকে তার সেই প্রকাণ্ড ছুরিখানা বার করে বাগিয়ে ধরলে। কালাপাহাড়ের বুকে সেই ছুরির ফলা বিদ্ধ হবে এখনি।

২৩

শিবনাথ ছুরি উঁচিয়ে কালাপাহাড়ের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রঞ্জন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবনাথের উপর। শিবনাথ ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ধস্তাধস্তির ফলে রঞ্জন ছিটকে পড়ে গেল। আহত হল।

শব্দ এবং চিৎকার শুনে কালাপাহাড়ের ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার দেখে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইলনা। ক্ষিপ্রহস্তে বিছানা থেকে নেমে তিনি শিবনাথের হাত মুচড়ে ধরে ছুরিখানা কেড়ে নিলেন।

ক্রোধে হতাশায় শিবনাথ তখন পাগলের মত চিৎকার করে নিজের পরিচয় দিলে এবং রঞ্জনেরও আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিলে। রঞ্জন আসলে পুরুষ নয়, সে স্ত্রীলোক। সে চন্দনা।

মাথার পাগড়ীটা খুলে গেছে, ঘন কালচুল পিঠ ছেয়ে পড়েছে, শিরাণের সামনেটা ছিঁড়ে খুলে পড়েছে, বিব্রত লজ্জিত এবং আরক্তমুখী চন্দনা বিহ্বল হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কালাপাহাড় অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকে দেখলেন। তারপর শিবনাথের ঘাড় ধরে তাকে বাড়ীর বাইরে বার করে দিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কালাপাহাড়। তারপর ফিরে এলেন নিজের ঘরে। চন্দনার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

২৪

নবাব দরবারে জনগুঞ্জন উঠেছে। পারিষদবর্গের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা। কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘটেছে। কালাপাহাড় দুশ্চরিত্র, লম্পট। নিজের বাড়ীর মধ্যে সে এক হিন্দু মেয়েকে পুরুষের বেশে লুকিয়ে রেখেছিল।

নবাব সোলেমান করনানি মহা ক্রুদ্ধ হয়ে কালাপাহাড়ের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। কিন্তু কালাপাহাড় কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করলেন। নবাব নিজেকে অপমানিত মনে করলেন এবং আদেশ

দিলেন যে, কালাপাহাড় যেন আজকের মধ্যেই পরিত্যাগ করে গৌড় থেকে চলে যায়। এই বহিষ্কারের আদেশ অমান্য করলে কালাপাহাড়কে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

॥ ২৫ ॥

রাজকর্মচারীর মুখে নবাবের আদেশ শুনে কালাপাহাড় হাসলেন। তিনি তো আগেই প্রস্তুত করে নিয়েছেন নিজেকে। জীবনের নতুন পথ তিনি দেখতে পেয়েছেন। সেই পথেই তাঁর যাত্রা শুরু হবে এবার। রাজকর্মচারীর হাতে তিনি নবাবের দেওয়া তরবারী এবং অভিজ্ঞান প্রত্যর্পণ করলেন।

॥ ২৬ ॥

সাধারণ নাগরিকের বেশে কালাপাহাড় রাজপথ দিয়ে চলেছেন। তাঁর পাশে চন্দনা। আনন্দ পিছনে পিছনে চলেছেন। আনন্দ আজ যেন মহা উল্লসিত। যে পরমার্থ ঘটনার জন্য তিনি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন, সেই ঘটনাই যেন আজ ঘটেছে।

আনন্দ গান করতে করতে চলেছেন।

রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে নাগরিকরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

একে একে বহু নাগরিক আনন্দের সঙ্গে সেই মহাপথপরিক্রমায় যোগ দিয়ে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে যেতে লাগল।

আনন্দ গাইছেন: তোমার অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করে, হে পরমেশ্বর, জগতের লোক আজ ধন্য হোল। তুমি আছ সর্বভূতে, সকল মানুষের মধ্যে। তুমি এক এবং অনন্য।

আকাশে বাতাসে মাঠে প্রান্তরে সেই গানের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সেই গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে বহু নরনারী সেই দিকে চলেছে, যেদিকে এক বিরাট জনতার আগে আগে এগিয়ে চলেছেন কালাপাহাড় চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে।

এবারে শীত পড়েছে—
চলুন তালে তালে পা ফেলে।

আভা পাকড়াশী

শীত এসে পড়েছে। শীতে মা হাত পা ফাটে। বেশী জল বা সাবান ব্যবহার করলে হাত বিশ্রী খসখসে হয়ে যায়। অনেকের পাও ফেটে বিশ্রী হয়ে যায়। তা বলে কি আমরা সংসারের কাজ করবনা, চুপকরে বসে থাকব? না করব। সবই করব। তাঁদের যেমন হাত ধোবার সাবান রেখেছেন, সেইসঙ্গে এক শিশি ভেসলিনও রেখে দিন। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে, পুঁছে নিয়ে একটু ভেসলিন হাতে ঘষে নিয়ে আবার কাজ করুন। যাঁদের পা বেশী ফাটে তাঁরা পা বেশী ভিজে রাখবেন না। ভিজে পা পুঁছে পায়ে একটু ভেসলিন লাগিয়ে নিলেন, না হোল একটু নারকেল তেলই মেখে নিলেন। স্নানের পর আর শোবার আগে একটু তৈলাক্ত কিছু মাখা খুবই ভাল। দুধ কমবেশী সকলের বাড়ীতেই আসে, দুধে সরও পড়ে, স্নানের পর হাতে মুখে সেই সর একটু মেখে নিন, কিছুক্ষণ রাখার পর ভিজে গামছা দিয়ে মুছে ফেলুন। সব সময় ব্যবহারের জন্য গ্লিসারিণ সবচেয়ে ভাল। ৪ আউন্স গ্লিসারিণ-এর সঙ্গে একটু গোলাপ জল আর লেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিন, অবসর সময়ে ব্যবহার করুন। দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যেই নিজের হাত পায়ের কোমলতা আপনাকে আনন্দ দেবে।

আজ আমাদের মেয়েরা সাজেগোজে চলায় বলায় আধুনিক হয়েছে, সৌন্দর্য্য কি তা বুঝতে শিখেছে, নানা ধরণের পাউডার, ফাউণ্ডেসন ক্রীম মেক-আপ যেন ব্যবহার করতে শিখছে কিন্তু তাদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত লাবণ্য যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন তা যাবে। অজন্তার ছবির মেয়েদের সুঠাম সুন্দর দেহের গঠন আজও আমাদের মুগ্ধ করে। কালিদাসের সেই রূপবর্ণনা আজও আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। সেই চঞ্চলাক্ষ আর লোধ্ররেণু বা কুসুমের যুগ আজ নেই তা মানছি, কিন্তু তারও পরবর্তি যুগে! সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বেগম নুরজাহান মানে—"জগতের আলো"। কোন প্রসাধন প্রণালী তাকে এমন সৌন্দর্য্যের অধিকারিনী করেছিল এ প্রশ্ন আপনার মনে জাগেনি কি?

কয়েকটি বেগমী প্রসাধনী সম্বন্ধে আমি জানি যাতে করে ত্বকের মসৃণতা ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায় এবং বং ফর্সা হয়। দুধের কাল রাগ চলে যায়। আজ তারই একটি ছুটি বলছি।

চিরতা। মেওয়ার দোকানে পাওয়া যায়। কুড়ি পঁচিশ দানা চিরতা নিয়ে এক চামচে দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে বেশ মিহি করে বেটে নেবেন। শুতে যাবার সময় ঐ গোলাটি বেশ ক্রিমের মত ক'রে হাতে মুখে গলায় ঘাড়ে ঘষে ঘষে মাখবেন। সারের সঙ্গে শুকিয়ে গিয়ে খোসাগুলি ঝরে যাবে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ফেলবেন। শীতের সময় ত্বক নরম থাকবে, এটি ত্বকের খাদ্য অর্থাৎ প্রচুর ভিটামিন ঘরে আপনার ত্বকে। কাজেই রংও ফর্সা হবে। বগড়ে বগড়ে মাখার ফলে মুখ, হাত, গলার মাংসেও হবে। অবাঞ্ছিত লোম বা অপুরণীয় টোল মিলিয়ে গিয়ে গলা, মুখ, হাত সুডৌল, সুন্দর ও নিটোল হবে।

যদি আপনার মুখের ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল না হয়, বা মুখে মেচেতা বা ব্রণের দাগ থাকে, তবে রাত্রে শোবার আগে ভাল কোন cleansing milk-এ তুলো ভিজিয়ে নিন, এবার বিকেলের সমস্ত প্রসাধন ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে তুলে ফেলুন। তারপর রোজ নিয়ম করে এই প্রলেপটি ব্যবহার করুন।

কমলা লেবুর শুকনো খোসা, যব, কুসুম ফুল এই তিনটি একসঙ্গে বেটে নিন কিম্বা একটু বেশী করে সিদ্ধ নিয়ে একটি শিশিতে রেখে দিন। মাখবার সময় চায়ের চামচের দু'চামচ এই গুঁড়ো করা জিনিষ, দু'চামচ খাঁটি মধু আর দু'চামচ গরম জল নেবেন। এগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই প্রলেপটি তৈরী হল, তারপর বেশ করে মুখে মাখুন। পনের মিনিট পর যখন বেশ শুকিয়ে যাবে তখন গরমজলে তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। এবার একটু কোল্ডক্রীম মেখে শুয়ে পড়ুন। যাঁদের একটু বয়স হয়েছে, চোখের কোণে কাকের পায়ের মত লক্ষ রেখা পড়ছে, তাঁরাও এই প্রলেপ ব্যবহার করে আবার সুষমামণ্ডিত মুখের অধিকারিনী হতে পারবেন।

ক্রীম বেশী মাখলে ব্রণ হয়। ক্রীম মাখার একটু পরে বাড়তি ক্রীমটুকু মুছে তুলে ফেলা উচিত। যাঁদের ত্বক খসখসে তাঁরা ঘন ক্রীম ব্যবহার করুন। তা'হলে বেশ ফল পাবেন। যাঁদের ত্বক এমনি তেলতেলে, তাঁরা হাল্কা ক্রীম ব্যবহার করবেন। দিনের বেলা পাউডার বেস হিসেবে ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করাই ভাল। রাত্রে কোল্ডক্রীম। কিন্তু মুছে ফেলতে ভুলে যাবেন না। তা'হলে ঐ অতিরিক্ত ক্রীম আপনার লোমকূপ বন্ধ করে ত্বকের ক্ষতিই করবে বেশী।

উপরের যে ক'টি প্রসাধনের কথা বললাম ঠিক ঠিক তা ব্যবহার করলে নিশ্চিত উপকার পাবেন। যৌবনসুলভ সুন্দর মুখশ্রী, কোমল হাত পা একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেবে আপনাকে। আপনি কালো হলেও শুনবেন—বাঃ মেয়েটির বাসা মাজামাজা রং তো! ফর্সা হলেতো কথাই নেই, রং ফেটে পড়বে। এমনটি হলে, বয়স্কা হলেও আপনাকে কম বয়সের বলেই মনে হবে আর মাসীমার বদলে মিষ্টি ডাকই শুনতে পাবেন সবার মুখে।

নতুন ক'রে পাবো ব'লে

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

অতীত হ'য়ে গেলেই কি সবকিছুকে তোলা যায়, না কেউ ভুলতে পেরেছে। গিয়েও যায় না অতীত, অগোচরে নীড় বেঁধে থাকে বর্তমানের কোলে। তারপর নতুন রূপে, কিংবা অনেক সময় পুরাতন রূপেই ঘুরে ফিরে দেখা দেয় ভবিষ্যতের দিনগুলিতে। আমাদের পিতামহীরা যে সব সোনাক-পরিচ্ছদ বা অলংকার পরতেন তার অনেকগুলি হয়তো সেকেলে কিংবা পুরোনো হ'য়ে গেছে। তবু তাঁরা কাঁখায় যে-সব নক্সা তুলতেন সে-সবের অনেকটি এখন দেখা যাবে একেবারে হালের শিফন, জর্জেট শাড়ির আঁচলে, কলকাতার রাজপথে কোনো কুমারী কিংবা বধূর ব্লাউজের হাতায়, কিংবা কোনো আধুনিক, রুচিবান, শিক্ষিত ধনপতীর শয়ন-কক্ষের বিছানার চাদরে কিংবা দরজা-জানালায় পর্দায়। এক সময়ে বাংলা দেশের মেয়েরা নূপুর পরতো। কিন্তু তা একেবারেই উঠে গিয়েছিল। দু'এক বছর আগেও কোনো মেয়ে নূপুর প'রে বাইরে বেরুবার কথা ভাবতেও পারতো না। কিন্তু এখন বহু কুমারীই আবার নিঃসঙ্কোচে নূপুর প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুল বাঁধার ফ্যাশনও একই কথা বলছে। নতুনের মাঝখানে সব সময়ই পুরাতন এসে উঁকিঝুঁকি মারে, কত কিছু গিয়েও যায়না, নতুন হয়ে নতুন সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে আসে বার বার। এই যেমন ধরুন না, কানের দুলের কথা, কানে কিছু পরা তো প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু একেবারেই কি যেতে পেরেছে? পিছু টানে, আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। এসেছে বটে, কিন্তু একেবারে নতুন সাজে নতুন ফ্যাশানে কানে সৌন্দর্যের ঝিলিক লাগিয়ে।

কিন্তু এত যে নতুন নতুন ফ্যাশন এতো একেবারেই নতুন নয়। সেই যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় তখন তো বারো-তেরো বছর থেকে আরো বেশি বয়সের মেয়েদের কানে দুল পরার বেশ রেওয়াজ ছিল। শুধু ধনী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা নয়, সাধারণ ঘরের মেয়েরাও কান ফুটো করে সখের দুল পরতো।

নিত্যনতুন ফ্যাশানের আনাগোনায় কিন্তু কানফুটো করে দুল পরার আয়ু আর বেশিদিন টিকলোনা, শিশুশীরিষ ক্লিপ দিয়ে টিপে-লাগানো দুল এলো। নতুন ঢেউ এলো ফ্যাশানের রাজ্যে, অসংখ্য নতুন ডিজাইনে ও বৈচিত্র্যে। আবার অকেজো হয়ে পড়লো সেই নাড়াজাগানো কানফুটো করা দুল।

পাশ্চাত্যদেশের খেলা তো সবকিছুতেই দেখছে। প্রকৃতিতেও আর মানুষের মনে তো বটেই। অনেক তরুণীমনের আকাঙ্ক্ষার আধার কিরে এলো হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া সেই পুরোণো ফ্যাশান নতুন রূপে কান ছুটো করে দুল পরা। আজকাল কিশোরীরা আবার দিনের বেলায় কানে ছোটদুল, সোনার বোতাম বা রিং পরাই পছন্দ করে, আর রাতের রহস্যভরা আলোয় পাথর বসানো লম্বা দুল প'রে নিজেদের করে তোলে মোহময়ী।

এই নতুন ফ্যাশানের বেশ একটা সুবিধে আছে, কেন না কানের সাথে এই দুল লেগে থাকে তাতে অলংকারটি বেশ হালকা মনে হয়। হঠাৎ সেটি হারিয়ে যাওয়ার মনোপীড়ক পরিস্থিতিও দেখা দেয় না। দামী কানের দুল হারিয়ে গেলে তো বাড়ীতে বেশ কামেলা পোয়াতেও হয়—তার ভয়ও থাকে না।

তা হ'লে এবারে জেনে নিন—কেমন ক'রে এমন দুলটি পরতে হবে। প্রথমে একটি সুচ আগুনে পুড়িয়ে নিন। সুচের আগাটি কানের নরম লতিতে ঢুকিয়ে দিন—এতে কিন্তু কোন ব্যথা লাগবে না বা রক্ত পড়বে না। এমনি করে কানে ছুটো করে নিন। এখন ছুটো যা'তে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য রেশমী সাদা সুতো ৩।৪ দিন পর্যন্ত ছুটোতে ঢুকিয়ে রেখে দিন। তারপর রেশমী সুতো খুলে রেখে সোনার সরু রিং বা সরু কাঠি পরে নিতে পারেন। সামান্য পাউডার ঐ রিং এর সাথে লাগিয়ে খুব আস্তে রিংটি ছুটোর ভেতর ঢোকাবেন এভাবে মাসখানেকের মতো রেখে দিন। তারপর অনায়াসে আপনি আপনার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর দুলটি পরতে পারবেন। তবে এসময়ের অন্ততঃ বারো সপ্তাহ পর্যন্ত আপনাকে কানে কিছু প'রে থাকতে হবে, কেননা এর আগে খুলে ফেললে ছুটো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময় কেটে গেলে আপনি যখন খুশী দুল খুলে রাখতে পারেন ও যখন ইচ্ছা আবার পরতে পারেন। এত সব করার পরও কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে তা না হ'লে আপনার হাত লেগে ছুটো বড় হয়ে যেতে পারে বা জোরে টান লাগার ফলে দুলে পেকেও উঠতে পারে। তখন হঠাৎ ডেটল বা আয়োডিন ব্যবহার করা ঠিক হবে না কারণ তার ফলে ছুটো করা কাঁচা লতিতে ছোট ঘুঘুরি উঠতে পারে, প্রথম প্রথম কানের লতির ছুটো জায়গাটা বেশ শক্ত মনে হবে কিন্তু আস্তে আস্তে তা নরম হয়ে আসবে।

এবারে আসুন অলংকার পরার পালা।

আপনি কি বান্ধবীকে খেতে বলে ভুলে যান?

বাইরে থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে শ্রীমতী দেখলেন তার তিনজন বান্ধবী হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তিনি আতংকের সঙ্গে মনে করলেন তাই তো! এদের তো আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে খেতে বলেছি। আমি তো সে কথা একেবারে ভুলে গেছি, কী হবে! ঘরে খাবার খাবার ও তো কিছুই নেই।

অবশ্য এ রকম ঘটনা হামেশা ঘটে না। তবে অন্যের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলে যাওয়া, জিনিস কিনতে গিয়ে দোকানে ঢুকে জিনিসের নামই ভুলে যাওয়া, নিমন্ত্রণের দিন ভুল হওয়া এ-রকম সব প্রায়ই ঘটে থাকে। যাত্রায় হয়তো কারো সঙ্গে দেখা হলো। সে আপনাকে

দেখে হেসে অনেকক্ষণ কথা বললো, কিন্তু আপনি কিছুতেই তার নাম মনে করতে পারলেন না। নাম মনে পড়লো অনেকদিন পরে। ভালো স্মৃতি শক্তি যাদের, তাদেরও এ-রকম হয়, তা অনেকেই জানে কিন্তু ভেবে সমাধানে আসা যায় না, কেন এ রকম হয়।

—এর কারণ অনেক।

সব চাইতে বড়ো কারণ শরীর বা মনের ক্লান্তি বা অবসাদ। তা ছাড়া নোট ক'রে না রেখে অনেক জিনিস এক সঙ্গে মনে রাখার চেষ্টা করলেও ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কোন কারণে মনে ব্যথা পেলে অনেক সময় এইরকম ভুল হয়ে থাকে। অনেক অপ্রীতিকর জিনিস আমরা মনে রাখতে চাই না বলেও অনেক সময় ভুলে যাই।

এক সঙ্গে অনেক কাজ করার চেষ্টা ও নানা ভাবনার কাজকর্ম করা অথচ সব নোট করে রেখে গুছিয়ে করার ব্যবস্থা না রাখা, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতিও এর কারণ। কাজেই সব গুছিয়ে করার জন্য সব কিছু নোট করে রাখা, সারাদিনের কাজের একটা তালিকা করে নেওয়া, যতটা সম্ভব সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করার চেষ্টা না করা ও সম্ভব মত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাই বলে সে যাই হ'ক ভুলে যাওয়া নিয়ে খুব বেশী একটা দুশ্চিন্তা করবেন না।

একদিন রাত্রে "নীল-দর্পণ" লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু বেহালা গ্রাম হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে, নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু "নীল-দর্পণ" হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজনের পদ মৃত্তিকা-স্পর্শ করিতে, সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে চর আছে।" বাস্তবিক নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চর-লগ্ন হইল; দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাতের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই মাত্র "নীল-দর্পণ" তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময়ে বেহালার ভাটা বহিতেছিল; সম্বর-ই জোয়ার আসিলে এই চর ডুবিয়া যাইবে, এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন-তরী ভাসিয়া যাইবে; এখন জীবন-রক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধু ও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতী নদীর বিষম স্রোতধ্বনি, ঝিঁচিৎ মধ্যে-মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবন-রক্ষার উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমন সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ ডাকিতে থাকায়, দূরবর্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।

দীনবন্ধু-জীবনী : বঙ্কিমচন্দ্র।

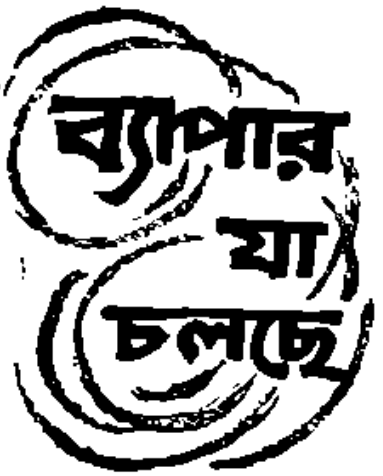

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

রাজ-রাজড়ার ব্যাপার দিয়েই এ সংখ্যার সূত্রপাত করা যাক। ইংলণ্ডের রাজ অন্তঃপুরে চাঞ্চল্য। রাণীর মনে সুখ নেই। বড় ছেলে, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী—দিন দিন তার বেয়াড়াপনা বাড়ছে। কিছুদিন আগে তার সম্বন্ধে আর একবারই 'ব্যাপার' লিখতে হয়েছিল, সে নাকি রিটল ভাষাপন্ন হয়েছিল এবং ইস্কুলে মাষ্টার মশায়দের উপরে যুবরাজসিরি ফলাতো। হেডমাষ্টার বড়া লোক রাণীর ছেলে বলে রেয়াৎ করলেন না, দিলেন 'ষ্ট্যাণ্ড আপ অন্ দি বেঞ্চ' করে আর রাণীর কাছে ঠুকলেন এক বড়া রিপোর্ট। রিপোর্ট পড়ে রাণীর তো মেজাজ সপ্তমে উঠল, উত্তরে জানালেন, বেয়াদপি করলে তার ছেলেকে বেত লাগাতে কুণ্ঠা বোধ না করেন হেডমাষ্টার মশাই।

তারপর কিছুদিন আর কোন খবর নেই, কিন্তু আর চেপে রাখা গেল না। খবর বেরিয়ে পড়ল। রাজপুত্র চার্লসকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হচ্ছে। সেখানকার এক অবৈতনিক ইস্কুলে সে পড়বে আর সেই হোস্টেলেই থাকবে। ব্যাপারটা কি? বিলেতে কি রাজপুত্তুরকে শিক্ষা দেবার মতো পাঠশালা নেই? লেখাপড়া শেখবার জন্যে তাকে একেবারে সাত সমুদ্দুর পার করে অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে হবে?

আসল ব্যাপার ফাঁস হয়েছে। রাজকুমার ইদানিং প্রেম করতে শুরু করেছিলেন। তাকেতে কাকেতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রণয়িনীর সন্ধানে। প্যারিসের এক সংবাদ-পত্র খবর জানিয়ে বলেছে, রাজকুমার চার্লস এক স্কটিশ ডুবকতনয়ার প্রেমে পড়েছেন।

ইংলণ্ডের ভাবী অধিপর, তার সঙ্গে চাষার মেয়ের প্রেম! তাও কি ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের ধাতে সয়? অতএব রাজকুমারকে নির্বাসনে যেতে হচ্ছে।

খুব সম্ভব এইবার কঠোর ব্যবস্থার বেড়াজালে পড়ে রাজকুমার চিরকালের মতো সুবোধ বালকে পরিণত হবেন। যথাসময়ে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসবেন। রাজার রাজার শিঙা ফুঁকে ওঁর

অতিরেক বিযোষিত হবে। আর সেই আনন্দ উল্লাস আর সমবিদারী বাহুবন্ধির মধ্যে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ চোখ, নয়ন চেহারার সেই গ্রাম্য কুমতলবীতার দীর্ঘশ্বাস আর তাদের শব্দ চাপা পড়ে যাবে।

• • • •

বড় ছাঁটুনি কম্বা গেরো। কলকাতা পুলিশের একটি বিভাগ আছে। ছাপার হরফে এমন কোনো লেখা যদি বেরোয় যা নাকি তাঁদের বিবেচনায় অশ্লীল, তাহলে তাঁরা সেই লেখার মুদ্রিতা এবং প্রকাশককে আদালতে অভিযুক্ত করেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ তাঁদের এক আধটা কার্যক্রমের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বছরের বেশীর ভাগ সময়েই তারা কুম্ভকর্ণ। নইলে হাল আমলে এমনধারা অশ্লীল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় বাজার ছেয়ে যায় কেমন করে? কোথায় কোথায় কোন কোন ঘাঁটিতে বা ইলে এইসব বই এবং পত্রিকার বিকিকিনি চলে তা তো তাঁদের অজানা থাকার কথা নয়। অধুনা নানা রকমের, প্রচুর সচিত্র রুচি বিগর্হিত বই ও পত্রিকার ছড়াছড়ি সেইসব দোকানে। দিনে দিনে তাঁদের আমদানী বাড়ছে বই কমছে না। বেশীর ভাগই আমেরিকান। সম্প্রতি বোবাজার উলবওয়ালার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে উক্ত বিভাগের কর্তারা বেরিয়ে ছিলেন। ঘোলোটি বুক ষ্টলে হানা দিয়ে তাঁরা শ'পাঁচেক বই এবং পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেন, যেগুলি অতীব কুরুচিপূর্ণ। সবগুলি মার্কিনী। তাদের মধ্যে আবার কিছু কিছু বাংলাও আছে। এইসব বুক ষ্টলগুলি চৌরঙ্গী পার্ক ষ্ট্রীট এলাকায় বলাও ব্যবসা করে। এই সূত্রে দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে রকম ব্যাপক ভাবে এইসব যৌন বই ও পত্র-পত্রিকার প্রচলন বেড়েছে তাতে পাঁচশো বই ও পত্র-পত্রিকা এবং দুই ব্যক্তি সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। আমরা মনে করি, এই সাংঘাতিক বিষ যাতে বেশী না ছড়ায় এবং যাতে তাকে নষ্ট করা যায় তার যথোপযুক্ত আয়োজন না করলে জাতির পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। বিদেশী বন্ধুরা তো তাই চায়। ওপরে ওপরে ভাল ভাল গ্রন্থাগারের ঠাট আর তলে তলে অপকৃষ্ট ও যৌন উদ্দীপক গ্রন্থে দেশকে ছেয়ে ফেলা—এই হচ্ছে ওদের দ্বিমুখী অভিযান। তার ওপর পি. এল. ৪৮০ তো আছেই।

• • • •

আমাদের দেশাভিমানবশতঃ সবাই কবি কালিদাস বলে নিয়েছেন। কাব্যরচয়িতা রূপে নয়। কালিদাসের নামে প্রচলিত সেই প্রবাদটির নবরূপায়ণে। গাছের ওপর উঠে যে ডালে বসেছিলেন তিনি, সেই ডালটি যেমন কাটছিলেন তেমনি আমাদের সরকারও প্রায় তাই করতে চলেছেন বলা চলে। যে ব্যবসাটি আমাদের একান্ত নিজস্ব, শুধু তাই নয়, যে ব্যবসাটি আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যকেও অনেকখানি গৌরবোজ্জ্বল করেছে, সেই ব্যবসাটির রক্ষা করা হতে চলেছে সরকারের পরিকল্পনায় (পরিকল্পনা না মতিভ্রম)!

পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের কথা বলছি। বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্র বিদেশী বই-এর প্লাবন আসছে এদেশে। তারা দেখতে সুন্দর, গড়নে মজবুত, দামে সস্তা। এবং বলা বাহুল্য লেখার গুণও তাদের যথেষ্ট। ফলে তাদের বিক্রিও প্রচুর। এদেশে প্রকাশিত সেই সেই বিষয়ের বইগুলি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কোথায় নিজের জিনিষকে বাঁচাবার চেষ্টা হবে, তা নয়, বিদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ডেকে এনে নিজের দেশের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় প্রাণকে বধ করা।

নানাভাবেই আমাদের দেশের প্রকাশকরা নাজেহাল হচ্ছেন ; প্রথমত অনেকগুলি রাজ্য-সরকার নিজেরাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্য বই-এর প্রকাশক ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন অর্থাৎ ঐসব পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করতে লেগেছেন। ফলে ঐ পর্যায়ের প্রাইভেট প্রকাশকরা উচ্ছিন্ন হয়েছেন বা হতে বসেছেন। তারপর আবার এই বিদেশী বইএর আমদানি। এর ফলে যাঁরা কলেজের বই এবং অন্যান্য টেকনিকাল বই প্রকাশের কাজে প্রশংসনীয় কর্মোদ্যমের পরিচয় দিচ্ছিলেন, এবার তাঁরা মারা পড়ছেন। অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রকাশক নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ক ভাল ভাল বই প্রকাশ করে তাদের খুব কম দামে এদেশে ছেড়েছেন বিক্রির জন্যে লাখে লাখে।

এদেশের প্রকাশকের অত কমদামে বই দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এখানে ছাপার খরচ বেশী। কাগজের দাম বেশী। পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে ভারতে কাগজের দাম বেশী। একজন প্রবীণ পরিসংখ্যানবিদের মতে ভারতে কাগজের দামের হার বিশ্ব-মূল্যের চেয়ে শতকরা তেত্রিশ টাকা বেশী।

এই তো গেল একদিকের বিপদ। অপর দিকের বিপদ গুরুতর। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি একটি নামকরা ব্রিটিশ প্রকাশকের সঙ্গে এক চুক্তি করেছেন। তাঁরা ভারতীয় ভাষার বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা ও হিউম্যানিটিজ বিষয়ক বই এদেশে প্রকাশ করবেন। ব্যস হয়ে গেল তাহলে, এমন খাল কেটে কুমীর আনার কথা বইএই পড়া গেছে এতদিন। এইবার প্রত্যক্ষ করা গেল। ইতিহাসে মোগল আমলে এই রকম ঘটনা আর একবার ঘটেছিল। ইংরেজের আদবকায়দায় আর মন ঘন কুর্নিশে বিগলিত হয়ে মোগল সম্রাট তাদের এ দেশে ব্যবসা করবার এবং বসবাস করবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ড ধরেছিল কেমন করে সে ইতিহাস আমরা জানি। আবার কি সেই ইতিহাসেরই সূত্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ?

ভারতবর্ষে পুস্তক প্রকাশক ব্যবসাটা এতদিন ভারতীয়দের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। তাও গেল।

• • •

প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা কিছুটা ভাল ফল পেয়েছি, দেশের বুক বল হাত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে কেল্লা মার দিয়া মনোভাব নিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে আত্মবিস্মৃত হবার সময় আসেনি। বরং আগের চেয়ে বেশী সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকবার প্রয়োজন হয়েছে। বাইরের ছদ্মবেশী শত্রুরা যুদ্ধে আমাদের হারাতে না পেরে ভিতোর জলে পুড়ে আমাদের নানাভাবে মারবার অনেক রকম অযন্ত ফন্দী আঁটছে। একটি ফন্দী হল, দেশের চারিধারে গুপ্তচর মারফৎ ক্ষতিসাধন করা। বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন আগেকার খবরে বলা হয়েছে, অনুসন্ধানে জানা গেল, আসামের দরং ও লখিমপুর জেলায় বিদেশী মালিকানায় কয়েকটি চা বাগান পাকিস্তানের পক্ষে "গুপ্তচর বৃত্তির সক্রিয় ঘাঁটি"। প্রামাণিক সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। কলকাতা থেকে ঐসব গুপ্তচর বৃত্তি পরিচালিত হতে দেখা গিয়েছে এবং এ কাজের টাকা যোগাচ্ছে 'কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র'। আরও জানা গিয়েছে, এসব কার্যকলাপের প্রধান দালাল হচ্ছে চা-বাগানগুলির এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজাররা এবং তাদের নিযুক্ত কিছু বিদেশী ঠিকাদার। সম্প্রতি জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে লখিমপুর জেলার দু'জন ব্রিটিশ চা করকে গ্রেফতার

করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসালিহা প্রকাশ্যেই সাবধান করে দিয়েছেন যেসব চা-কর এ ধরণের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

• • • •

শুধু আসামে নয় দেশের সর্বত্রই এই ধরণের গুপ্তচর চক্র ঘাসের নীচে সাপের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ছোবল মারবার জন্য ওৎ পেতে আছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও অনেক বেশী কঠোর ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি প্রস্তাব করি কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাজ্যে শুধু এই জন্যেই অর্থাৎ গুপ্তচর বিনাশের জন্যই একটি আলাদা দপ্তর খোলা হক এবং সেই দপ্তর মারফৎ অভিযান চালানো হক। ব্যাপারটি এতখানিই গুরুতর বলে আমি মনে করি। অন্য দেশ হলে কবেই এইরকম ব্যবস্থা বসিয়ে গুপ্তচরদের ঝাড়ে গুষ্টিতে নির্বংশ করে ছাড়তো। আমাদের সবদিকেই আলগা। কিন্তু এখন আর কোনোদিকে শিথিল হলে চলবেনা। দ্রুত নির্মম এবং অমোঘ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন ঘুঘ্টা তেমনিই তাঁটা, অর্থাৎ যেমন কুকুর তেমনিই মুগুর দরকার।

• • • •

"পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব।" সাফ কথায় একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা সম্প্রতি এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে। এটি হল একটি ঐতিহাসিক সত্যবাক্য। চিরকালের মত সত্য।

• • • •

কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় মরিশাস। আড়াই হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার সমুদ্রে এক দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটি অংশ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেখানে হিন্দুদের বসতি আছে। শুধু তাই নয় সেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মরিশাসে সাতলক্ষ বিশ হাজার মানুষের বাস। তারমধ্যে চারলক্ষ বিশহাজার হিন্দু। সেখানকার প্রধান বিচারপতি স্যার রামপ্রসাদ নিরঞ্জন। সেখানকার প্রতিটি গ্রামে হিন্দু মন্দির আছে। হোলি দেওয়ালী সংক্রান্তি প্রভৃতি পাল-পার্বন সেখানে নিয়মিত চালু অর্থাৎ এক কথায় ভারত থেকে আড়াই হাজার মাইল দূরে অসীম সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়েছে পরিপূর্ণ মাত্রায়। ইতিহাসের গবেষকরা মরিশাসের এই হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

• • • •

সর্বের মধ্যে ভূত এই প্রবাদটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের পোড়া দেশে অনেকক্ষেত্রেই এই প্রবাদের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

সাধারণতঃ উচ্চপদাসীন ব্যক্তির সমালোচনাও উচ্চ কণ্ঠে হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে তাঁর বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তখন চমক লাগে বৈকি।

আমি কাজের লোক নই, লেখক হিসেবে থার্ডক্লাস—এসব সমালোচনা চলতে পারে। কিন্তু আমি চোর, আমার চরিত্র খারাপ, আমার বিরুদ্ধে একথা বলা সহজ নয়। যে বলবে তাকে চেষ্টা করলে শ্রীঘরে কিছুদিন আটকে রাখা যেতে পারবে।

আসল কথা কারুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আনা সহজ কথা নয়। বিনা ভিজিটে অভিযোগকারীদের এতখানি সাহসই বা হবে কেমন করে। অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণাচারী। ভারতের অন্যতম অর্থভাগ্য বিধাতা তাঁরই বিরুদ্ধে অর্থসংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ। মতভেদের নেপাশেষি প্রকাশ্যেই অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন পার্লামেন্টের ১১ জন সভ্য। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

• • • •

আর চিন্তা নেই। মেয়েরা ছুরী চালাচ্ছে। মিছরীর ছুরী নয়। রীতিমত মানুষ খুন করা ইস্পাতের ছুরী। অতএব রোমাঞ্চ-রোমিওরা সাবধান।

ব্যাপারটার নিগূঢ় কারণ এখনও জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে: কয়দিন আগে এক সন্ধ্যায় আলীপুরে এ্যাণ্ডারসন হাউসে চল্লিশ পরপর পুলিশের এ. এস. আই, শ্রীসুবালকান্তি দাসকে ছুরী মারেন শ্রীদাসের সহকর্মী পুলিশের টেলিফোন অপারেটর শ্রীমতী গীতশ্রী ঘোষাল। এ. এস. আই হাসপাতালে। ডি. ও আলীপুর পুলিশ হাজতে। ঘটনাটি রহস্যজনক সন্দেহ নেই। ছুরি মারার পর পুলিশ হাজতে বসে শ্রীমতী ঘোষাল নাকি পুলিশকে সকাতরে জিজ্ঞেস করেছেন—"তিনি বেঁচে আছেন তো?"

অথ ছুরি কথা!

একদা দীনবন্ধু মিত্র যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনি আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেইদিন জানিয়াছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল 'নীল-দর্পণ।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

আলেকজাণ্ডারের অভিনব কীর্তি

সুপর্ণা রায়

সমস্ত দিন পৃথিবীকে দগ্ধ ক'রে সূর্য শেষ পর্যন্ত অস্তে গেলো। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির কালো ছায়া। সব চাইতে দীর্ঘ ছায়া ফেললো পার্থেনন। নগরীর গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রখ্যাত স্মারক।

পরাজিত হয়েও এতটুকু ম্লান হয়নি অ্যাথেন্সবাসীর দীপ্ত অহমিকা। সকলেরই যেন মনের ভাবখানা এ-রকম: ম্যাসিডনের পঁচিশ বছরের ছোকরা আলেকজাণ্ডার কেন তাদের দেশে রাজত্ব করবে? তারা সেই শাসন মুখ বুজে সহ্য ক'রেই বা যাচ্ছে কেন?

দু'ধারে বড়ো-বড়ো স্তম্ভ, মাঝখান দিয়ে পথ। সেই পথে পায়চারি করছিল জন কয়েক লোক। পরস্পরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপও করছিল। তাদের আলোচনার বিষয় বিচিত্র: দর্শন, ট্রাজেডি, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়। ক্রীতদাস, বিদ্রূপাত্মক নাটকের লেখক, দার্শনিক, মেউলিয়া ব্যবসায়ী —সবার মুখে কালো ছায়া, নগরীর আসন্ন রাত্রির মতো।

একজন মন্তব্য করলো: "সক্রেটিস কী অপমানটাই না সহ্য করলেন।"

ফিডিয়াস মন্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠলেন: "কিন্তু, তিনি তো সত্যি-সত্যি কখনো অপমানিত হননি।" এই ফিডিয়াস একদিন অ্যাথেন্সের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছেন।

এই লোকগুলি জানতো, তাদের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু, ম্যাসিডনের স্বৈরাচারী আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ক্রীতদাস কিংবা অনুচর হিসেবে যোগদানের চাইতে তার সঙ্গে লড়াই করা ঢের বেশি গৌরবের।

রাজপথের দৃশ্য কিন্তু তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে দলে-দলে লোক নাম লেখাচ্ছে আলেকজাণ্ডারের দলে। নগর কিছু অর্থ লুটেছে বরাতে। সেই মুহূর্তে টুংটাং, নতুন সৈনিকদের কণ্ঠস্বর মুখর ক'রে তুলেছে রাজপথ। আলেকজাণ্ডার নাকি গ্রীসের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে দুনিয়া জয় করতে বেরুচ্ছেন। অ্যাথেন্সের একদল যুবক যোগ দিচ্ছে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে।

তাদের থেকে অনেক কিডিয়াস। তিনি তরুণ, দুঃসাহসী, গর্বিত। তাঁর যে-সব দেশবাসীরা মাত্র কয়েকখণ্ড রুপার জন্য আলেকজাণ্ডারের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে তাদের প্রতি ঘৃণায় তাঁর মুখে ফুটে উঠলো তিক্ত হাসি। বয়সে তিনি আলেকজাণ্ডারের সমান। তিনিও যাচ্ছেন আলেকজাণ্ডারের বাহিনীতে যোগ দিতে। তবে ক'য়েকখণ্ড রুপার লোভে নয়। তিনি জানতে চান নতুন বিজেতা আলেকজাণ্ডারের শক্তির উৎস কী, তাঁর দুর্বলতাই বা কোথায়। তা জানতে পারলে অ্যাথেন্সের সাধারণতন্ত্র হয়তো আবার স্বাধীন আর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৪ সালের সে এক অদ্ভুত বসন্তকাল। গ্রীক বংশজাত স্বৈরাচারীর শাসন কতিপয় অ্যাথেন্সবাসীর পক্ষে সেদিন অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। অ্যাক্রোপোলিসের কাছাকাছি সব এলাকায় রটে গিয়েছিল যে, আলেকজাণ্ডারের মায়ের শরীরে অর্ধ-বর্বর জাতির রক্ত। উদ্ভট কল্পনা এবং আজগুবী চিন্তাধারা নাকি আলেকজাণ্ডার পেয়েছেন সেই মায়ের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তৈরি হয়েছে এশিয়াতে যাবার জন্য। ম্যাসিডন, ইলিরিয়া, থ্রেশিয়া, এবং আরো নানা অঞ্চল থেকে আলেকজাণ্ডার সমবেত করেছেন এক বিপুল বাহিনী। তোড়জোড় করছেন এশিয়া মাইনর জয় করার জন্য। তাঁর অসংখ্য সেনাদলের একটির নায়ক কিডিয়াস বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন। ট্রয় নগরীতে উপস্থিত হ'য়ে আলেকজাণ্ডার হোমারের-কাব্য-বর্ণিত বীরদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন। তারপরেই শুরু হলো তাঁর অভিযান। প্রথমেই তাঁর নজর পড়লো লিডিয়ার প্রাচীন রাজধানী সার্ডিস-এর উপর। পারস্যের নৌ-বাহিনী তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলো।

যে কৌশল, সাহসিকতা, এবং ক্ষমতা নিয়ে আলেকজাণ্ডার অভিযান পরিচালনা করছিলেন তাতে কিডিয়াস মুগ্ধ না হ'য়ে পারলেন না। তবু একমুহূর্তের জন্যেও তিনি নিজের আসল অভিপ্রায়টি ভুলে যাননি। আলেকজাণ্ডার একের পর এক যুদ্ধ জয় ক'রে চললেন; আর কিডিয়াস চেষ্টা করতে লাগলেন আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের মনে অনৈক্য এবং অসন্তোষের বিষ-বীজ রোপণ করে দিতে।

কিভাবে যেন কিডিয়াসের ষড়যন্ত্রের কথা আলেকজাণ্ডার জানতে পারলেন। তবে জন ক'য়েক বিক্ষোভকারী কতটুকু উত্তেজনা আর ছড়াতে পারে এই মনে ক'রে তিনি প্রথম-প্রথম ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু যখন হেলিকার্ণাসে তিনি পারসিক বাহিনীর বিপুল বাধার সম্মুখীন হলেন তখন তাঁর হুঁশ হলো। সেনা-বাহিনীতে যদি বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয়েই থাকে তবে এখনই তা অঙ্কুরে বিনষ্ট করা দরকার। সাময়িকভাবে যুদ্ধ থেমে ছিল। এইবার শিবিরে-শিবিরে অনুসন্ধান চালানো দরকার। পারসিকদের পরাজিত ক'রে নিজেকে পারস্যের সম্রাট ব'লে ঘোষণা করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। পারসিকদের উপর প্রভুত্ব করতে হ'লে নিজের বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য বিশ্বস্ত থাকা চাই। আর যারা বিশ্বাসঘাতক তাদেরও এই বেলা নির্মূল করা প্রয়োজন।

নিজের বাহিনীর সেনাদের মন জানবার জন্য আলেকজাণ্ডার যে উপায় উদ্ভাবন করলেন তা যেমন সহজ তেমনি অভিনব। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তিনি উর্ধতন সমস্ত সেনানায়কদের ডাকিয়ে আনলেন। তাদের উদ্দেশে বললেন: "দেখুন, আপনাদের মতো আমি আলেকজাণ্ডারও গৃহ-কাতর এবং বিষণ্ণ বোধ করছি। তবু, বছর কয়েকের আগে আর দেশে ফিরে গিয়ে প্রিয়জনদের মুখ দেখতে পাবো না। এই কারণে আমি কয়েকজন বার্তা-বহকে ম্যাসিডন, থ্রেস এবং অ্যাথেন্সে

পাঠাবো ব'লে স্থির করেছি। তারা যাবে সব চাইতে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চ'ড়ে। আমার মতো আপনারাও যদি আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি পাঠাতে চান তো এদের হাত দিয়ে পাঠাতে পারেন।"

আলেকজাণ্ডারের এই অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে সমবেত সেনা-নায়কগণ ধন্য-ধন্য ক'রে উঠলো।

এর দু'দিন পরে বীর ঘোড়াদের চিঠির বিরাট বোঝা নিয়ে বার্তাবহগণ হেলিকার্ণেসাস ছেড়ে রওনা হলো। সেই সব চিঠি সৈনিকেরা লিখছে মা-বাবা, স্ত্রী, কিংবা ছেলে-মেয়েদের কাছে। অনেক চিঠিতে আছে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী কিংবা যুদ্ধের বর্ণনা।

বার্তাবহরা কিন্তু খুব একটা দূরে গেলোনা। এ-রকম আদেশই তারা পেয়েছিল। গোপনে ফিরে এসে আলেকজাণ্ডারের কাছে নিয়ে এলো চিঠির সবগুলি থলে। নিয়ে এলো আলেকজাণ্ডারের গুপ্ত ব্যক্তিগত ঘাঁটিতে। আলেকজাণ্ডার নিজে সমস্ত চিঠি খুলে-খুলে পড়লেন। সেদিন তাঁর গুপ্ত শিবিরে এমনি ভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল চিঠির উপর সেন্সরশিপ। তারপর দু'হাজার বছর কেটে গেছে। যুদ্ধের সময় চিঠিপত্র সেন্সর করা তো এখন একটা সাধারণ প্রথা।

অসংখ্য চিঠির ভিতরে যে-গুলি ষড়যন্ত্রের গন্ধে ভরপুর ছিল, আলেকজাণ্ডার সেগুলি-আলাদা ক'রে রাখলেন। এই চিঠিগুলির ভেতরে ফিলিয়াসের কয়েকখানা চিঠিও ছিল। তাতে ছিল আলেক-জাণ্ডারের বিরুদ্ধে নানা কথা। ফিলিয়াস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও তিনি জানতে পারলেন না আলেকজাণ্ডার কেমন ক'রে তাঁর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। ফিলিয়াস নিজেকে নির্দোষ ব'লে দাবী করেছিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁর আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে ফিলিয়াসের মৃত্যুদণ্ডের রায়ই আরেকবার উচ্চারণ করলেন।

DA 65/FIO Bengali

মার্কিন মুলুকে মহানিশা

[বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিকলনে পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্ল্যাক-আউটের কাহিনী]

অরুন্ধতি

পরিবার-রজনীর সন্ধ্যা।

আমেরিকার বড় বড় শহরে কাফে রেঁস্তোরা নাচের আসর আর পানের আগারগুলি প্রাণবন্ত হয়ে মুখরিত হতে শুরু করেছে, বাজনার তালে তালে রঙ্গিনী নর্তকী তার লীলায়িত দেহভঙ্গীমা দিয়ে দর্শকদের সবেমাত্র উত্তেজনার প্রথম স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, এমন সময়, হঠাৎ একি হল!

আলোকে আলোকময় মহানগরী নিউইয়র্ক। দিনশেষের কর্মব্যস্ততা চতুর্দিকে। এমন সময় একি ব্যাপার! একি অঘটন!

সারা পৃথিবী কি সহসা অন্ধকার অতলে তলিয়ে গেল?

পৃথিবীর শেষদিন—ডুমস্ ডে—কি আজকের তারিখেই লেখা ছিল পাঞ্জিতে?

আলো নিভে গেল। হঠাৎ। একে একে সমস্ত আলো। একটি দুটি শহরে বা জনপদে নয়। সারা দেশ-জোড়ে। কী নিবিড় ভয়াবহ অন্ধকার গ্রাস করল সারা পৃথিবীকে! নিউইয়র্কের জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম।

আমেরিকার আটটি রাজ্য এবং ক্যানাডার ওন্টেরিও পর্যন্ত এই তমিস্রার বিস্তৃতি ঘটল। ৮০,০০০ বর্গ মাইল এবং ৩ কোটি লোক এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারাগুরের আকস্মিক আক্রমণে চকিত বিহ্বল স্তম্ভিত হল।

অনেকগুলি জনপদ অল্পক্ষণের মধ্যেই এই কালো দানবের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু বড়গাছেই বড় লাগে বেশী, তাই সহরকুলচূড়ামণি নিউইয়র্ক মহা-নগরের উপরেই সেই অদ্ভুতপূর্ব বিজলী-ব্যর্থতার প্রকোপটা ছিল সবচেয়ে বেশী—বারোআনা।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি? হাজার হাজার বর্গমাইল আর ৮।১০টা রাজ্য এভাবে একসঙ্গে অন্ধকারে ডুবে গেল, অর্থাৎ এতগুলো জায়গায় একসঙ্গে ইলেকট্রিসিটি অকেজো হয়ে পড়লো:.....

—এ'রে কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বিশেষ করে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে। যখন তাদের তৈরী রাউইগুলো চাঁদে গিয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ছে, মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে তারের জাহাজ্ঞ্যে ব্যোমপথে ছুটে বেড়াচ্ছে, রীতিমত সার্কাস দেখাচ্ছে সেখানে, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র যখন সারা পৃথিবীকে একসঙ্গে এক মুঠো ধুলোয় পরিণত করে দেবার ক্ষমতা রাখে বলে তাদের লড়াইবাজ নেতারা সবসময় প্রচার করছে, বিজ্ঞানের অমর মহলের সবচেয়ে গোপন ঘরে প্রবেশ করবার শেষ চাবিকাঠি যাদের

দেশের বিজ্ঞানীরা পকেটস্থ করেছেন বলে তৃপ্তিবোধ করছেন যেকে যেকেই, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির প্রয়োগকর্মে যাঁরা নিজেদের মনে করেন অভেদ্য এবং অবার্য, তাঁদেরই দেশে এতবড় বৈদ্যুতিক বৈকল্য, বিজ্ঞানের বিকৃতি, এ যে সত্যিই কল্পনা করা যায় না।

আমেরিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিশাল ভূ-ভাগকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যোগান দেবার জন্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নাম সংক্ষেপে কানেকটিস। ৮৩টি ইলেকট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। সমগ্র ব্যবস্থাটির নাম—দি সিস্টেম্। এই বিরাট বৈদ্যুতিক শক্তি বেষ্টনী নাকি এমনই নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত এবং পরিচালিত যে দেশের শ্রেষ্ঠ বিজলী বিশেষজ্ঞরাও মনে করেছেন যে এই ব্যবস্থা কোনোদিন অকেজো হয়ে পড়বেনা। তাঁরা বহুসহকারে বারবার বলেছেন, এরকম বিরাট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সরবরাহ ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এই ব্যবস্থাকে তাঁরা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলতেও দ্বিধা করেননি।

হায় সেই অষ্টম আশ্চর্য। ৯ই নভেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৫টা ১৫ মিঃ সময় সেই আশ্চর্য ব্যবস্থার শিরায় শিরায় কাঁপন জাগল। তারপরেই নিভতে লাগল আলো। এক মহল্লা থেকে আর এক মহল্লা। এক শহর থেকে আর এক শহর। তামাম দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার। কালো জমাট অন্ধকার। তারই গর্ভে বিলুপ্তি হল সারা দেশ।

অভূতপূর্ব ঘটনা আমেরিকার ইতিহাসে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী আলোক বিহীন অসহ অবস্থা।

এই দীর্ঘ বিস্তৃত জমাট অন্ধকারের মধ্যে কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা যে ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য, কোনো বিমান বিপথগামী হয়ে ধ্বংস হয়নি, রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হয়নি, কোথাও আগুন লাগেনি, বা লুঠতরাজ হয়নি।

অবশ্য এই দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নারীর শ্লীলতা হানি ঘটেছে, কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খল নরনারী এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়েছে, তাছাড়া ওয়ালপোল জনপদে ৩২০ জন ফেল করেছে চারঘণ্টা ব্যাপী এক তুমুল হাঙ্গামা বাধিয়েছে—কিন্তু অন্ধকারের সেই ভয়াবহ অবস্থায় এগুলো নিতান্তই সামান্য দুর্ঘটনা। মোটের মোটের ধাক্কা লেগেছে, কিন্তু তেমন সাংঘাতিকভাবে নয়। শুধু, লংআইল্যাণ্ডে একটি বাস ৩০ জনকে চাপা দেয়। তার মধ্যে ৯ জনের অবস্থা গুরুতর।

এই দারুণ আপৎকালে নিউইয়র্কবাসীরা কিন্তু ধীরস্থির মনোভাব এবং অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়েছে। আতঙ্ক, যাকে বলা হয় Panic, তার কবলে পড়ে তারা দিশাহারা হয়নি।

তারই মধ্যে তারা হেসেছে, খুশী করেছে, যে যতটা পারে অপরকে সাহায্য করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে। তারই মধ্যে আবার কিছু কিছু দোকানদার মোটা টাকা কামিয়েছে। ৭৫ পয়সা দামের মোমবাতির প্যাকেট ৫ টাকায় বিক্রী হয়েছে। ছেঁড়া টাকা দামের টর্চ ২০ টাকায়, সিগারেট প্যাকেট ৪ টাকায়, এক বাক্স দেশলাই ২ টাকায় বিক্রী হয়েছে।

হাসপাতালে, যাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আছে তারা তা কাজে লাগিয়েছে। অন্যেরা বাতি এবং টর্চের সাহায্যেই কাজ করেছে। আলবানির একটি হাসপাতালে একটি মেয়ে প্রসব হচ্ছে সেইসময়। মেয়েটির স্বামী বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিদারুণ উদ্বেগে কাঁপছে। বাতি হাতে নার্স এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আপনি ভাববেন না, আমাদের ডাক্তার খুব ভাল, তিনি অন্ধকারেও প্রসব করাতে পারেন।'

সত্যিই দেখেছিলেন সেই ডাক্তার। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শেফ দুটো মোমবাতির আলোর সাহায্যে তিনি নির্বিঘ্নে প্রসব করালেন—সাত পাউণ্ড ওজনের পুত্র সন্তান।

ব্রিটাইয়র্কের সেন্টলিউক হাসপাতালে অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার একটি মেয়েকে প্রসব করালেন। তারপর বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষমান মেয়েটির স্বামীকে বললেন, শিশু এবং প্রসূতি দুজনেই চমৎকার, কিন্তু ছেলে কি মেয়ে তা বলতে পারব না।'

বেলেভিউ চক্ষু হাসপাতালে টর্চের আলোর সাহায্যে একটি বড় চোখের অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করলেন সেখানকার চোখের বড় ডাক্তার।

এই ব্লাকআউটের সময় অসংখ্য মানুষ ছিল বাড়ীর বাইরে, পথে ঘাটে ট্রেনে, ভূগর্ভস্থিত যানবাহনে এবং আরো কত জায়গায়। একা ব্রিটাইয়র্ক শহরেই ৬ লক্ষ লোক ভূগর্ভে আটকা পড়েছে, একলক্ষ লোক ইলেকট্রিক ট্রেনের জন্যে ষ্টেশনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হাজার হাজার নর-নারী সুড়ঙ্গে ভূগর্ভস্থ লিফটের মধ্যে আটক পড়েছে, অগণিত মানুষ একশতলা বাড়ীর উপরতলা থেকে নামতে না পেরে আতঙ্কে বিহ্বল হয়েছে। এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। সে বাড়ীর তেরটি লিফটে ২৬ জন যাত্রী মাঝপথে আটক পড়েছিল। একটি লিফটে কেবলমাত্র ছিল তারা শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ডগেম খেলতে শুরু করে দিলে। আর একটি লিফ্‌ট থেকে গানের সুর ভেসে আসতে লাগল।

প্যান অ্যাম অষ্ট্রালিয়ার ৫২ তম তলায় সেনেটর কীটিং উপায়ান্তর না দেখে অফিস ঘরে শুয়ে ঘুমতে আরম্ভ করে দিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী উথাণ্ট একটি বাতি নিয়ে কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর ৩৮ তম তলার অফিস কক্ষ থেকে নীচে নেমে এলেন। গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল এবং অন্যান্য বড় ষ্টেশন গুলিতে হাজার হাজার নরনারী মেঝের উপরেই তাদের রাতের ঘুম উপভোগের ব্যবস্থা করলে, যে যেখানে পারলে, দোকানের মধ্যে, বাড়ীর বোওয়াকে, হোটেলের লম্বা লম্বা টেবিলে শুয়ে পড়ল এবং অনেকেই দিব্যি ঘুমতে লাগল। রেডিও বন্ধ, টেলিফোন বন্ধ, টেলিগ্রাফ বন্ধ। শুধু চলছে ট্রানসিস্টার। এক একটা ট্রানসিস্টারের উপর হাজার লোক হুমড়ী খেয়ে পড়েছে, পৃথিবী ধ্বংসে হয়ে যাচ্ছে এই খবর শোনবার জন্যেই তাদের উৎকণ্ঠা। আমেরিকার কর্ণধার প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন সেই সময় মোটরে অন্য একটি নগরে যাচ্ছিলেন। মোটর-রেডিও মারফৎ খবর পেয়েই তিনি ফিরে এলেন নিজের ডেরায় এবং প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে সারারাত্র ব্যাপী টেলিফোনে আলাপ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন। অত্রলোক সারারাত না ঘুমিয়ে চার চেয়ারে বসা। সকাল বেলা দু'চোখ জবাফুল। মাকের ডগাও লাল। গলার স্বর ভগ্ন।

ভয়ঙ্কর চাই। কেন এমন হল। ভয়ঙ্কর অবশ্যই হবে। এই অহেতু আশঙ্কা-ব্যবস্থাকে আরো ত্রুটিহীন করবার চেষ্টাও হবে, কিন্তু তবুও এ গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারবেনা যে এরকম ঘটনা আর ঘটবেনা। বৈদ্যুতিক শক্তির উপর অসহায় ভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পাশ্চাত্য মহাসভ্যতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অগ্রগতির পরিচয় দিলেও আজও যেকোনো মুহূর্তে একটি সামান্য যন্ত্রাংশের বৈকল্য-হেতু কতখানি নিষ্ফলায় কতখানি দুর্বল এবং কতখানি শক্তিহীন, তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল আমেরিকার প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্যময়ী বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবস্থার এই অচিন্তনীয় অকৃতকার্যতায়।

———

কয়েদীদের দাঙ্গায় তরুণীদের আতঙ্ক

মাত্র কিছুদিন আগে ঘটনাটা ঘটেছে নিউজিল্যাণ্ডে। গির্জার পবিত্র বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে সাতটি তরুণী স্তব-গান করছিল। সেখানে ছেলের বহু কয়েদীও হাজির। হঠাৎ তারা এমন মারপিট আর দাঙ্গা শুরু ক'রে দিলো যে মেয়েরা গান থামিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগলো। নাটের গুরু একজন কয়েদী। সে-ই প্রথমে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েদীরা প্রহরীদের মার-ধোর করতে আরম্ভ করে। মেয়েদের এবং অন্যান্য কয়েকজনকে অবিলম্বে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গির্জার বাইরে তখন জুতা, চেয়ার, টেবিলের পা ইত্যাদি ছুঁড়ে কয়েদী আর প্রহরীরা তুমুল লড়াই চালাচ্ছে।

প্রহরীদের সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীকে তলব করা হলো। ওদিকে কয়েদীরা ব্যারিকেড বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দমকলের লোকেরা এলো। তাদেরও নাজেহাল অবস্থা। কয়েদীরা তাদের দিকে ইট পাটকেল, ভাঙা বোতল ছুঁড়ছে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে এই ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো। বাধ্য হয়ে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে অবস্থা আয়ত্বে আনতে হলো। কয়েদীদের হাতকড়ি পরানো হলো।

* * *

প্রতিবেশিনীর চুম্বনে শিশুর জীবন রক্ষা

তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে কিম ডেভিস, টাল সামলাবার জন্য যেই না একটা ইলেকট্রিক চুল্লি ধ'রে দাঁড়াতে গেছে, অমনি মুখ থুবড়ে পড়লো। প্রায় তার মরে যাওয়ার অবস্থা···

ঠাকুমা তাড়াতাড়ি নাতনীকে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেন। তিনি এবং কিমের মা একটুও দেরি না ক'রে শিশুটিকে নিয়ে ছুটলেন এক প্রতিবেশিনীর বাড়ির দিকে।

প্রতিবেশিনী মিসেস সণ্ডার আগে হাসপাতালে কাজ করতেন। তিনি শিশুকে ওই অবস্থায়

দেখেই ঠোঁটে একটি চুম্বন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন ফেঁদে উঠলো। সবাই অবাক! তিনের ঠাকুরমা আর মা বিস্ময় এবং অপমানে আড়ষ্ট।

• • •

এবারের মিস ইউনিভার্স

সম্প্রতিকালের এক রাণীর কাছ থেকে তালিম নিয়ে থাইল্যাণ্ডের রূপসী অলয়া সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-বিজয়িনী হয়েছেন। অলয়ার বয়েস মাত্র আঠারো। বিজয়িনী হয়ে তিনি মুকুট গ্রহণ করেন গতবারের মিস ইউনিভার্স, গ্রীসের কোরিনা-র হাত থেকে। এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় ফ্লোরিডা-র মিয়ামি উপকূলে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত গায়ক প্যাট বুন।

অলয়ার চুল কালো। তাঁর নামের অর্থই হলো 'সুন্দর'। তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর জয়লাভের মূলে আছে থাইল্যাণ্ডের রাণী সিরিকিটের অনুপ্রেরণা। কী ক'রে চলাফেরা করতে হয়, চুল বাঁধতে হয় ইত্যাদি সবই অলয়া শিখেছেন রাণী সিরিকিটের কাছ থেকে। তাঁর জয়লাভের সংবাদে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন বোধ হয় রাণী। অলয়া থাই এয়ার কোর্সের একজন কর্ণেলের মেয়ে।

তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ১৯ বছরের তিনটী। তিনি 'মিস ফিলিপাইন' আখ্যা লাভ করেছেন। তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে 'মিস আমেরিকা' আখ্যা অর্জন করেছেন আঠারো বছরের তরুণী সু অ্যান ডাউনী।

• • •

ব্রিটেনের কিশোর কিশোরীদের যৌন জীবন

ব্রিটেনের কিশোর-কিশোরীদের যৌন জীবন সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গিয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রামাণ্য বিবরণীতে। শুভরাত্রি জানিয়ে চুম্বন থেকে শুরু ক'রে যৌন সংসর্গ—অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেরই যে অভিজ্ঞতা এ রিপোর্ট তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে।

১ লক্ষ পাঁচে রচিত এই রিপোর্টটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ৫০,০০০ পাউণ্ড। ফেলথ এডুকেশন-এর তরফ থেকে সেণ্ট্রাল কাউন্সিলের একটি দল তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রিপোর্টটি পেশ করেছেন। পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের ১,৮০০ কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে প্রত্যেক বাবা মা-ই অত্যন্ত চিন্তিত না হয়ে পারবেন না। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে আমাদের শিক্ষয়িত্রীরা এ-সব ব্যাপার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কী ক'রে এ-সব সমস্যার সমাধান করতে হয় তা-ও তাঁরা ভালো রকমই জানতেন।

রিপোর্টটি বলছে: "এ-কথা ঠিক নয় যে আধুনিক কালের কিশোর-কিশোরী মাত্রেই জীবনে ক্লান্ত, বিশৃঙ্খল, কিংবা যৌন-চিন্তায় রাত্রিদিন মশগুল।"

তবাপি, রিপোর্টটি পড়ে জানা যায় যে যৌন-সংসর্গের অভিজ্ঞতা আছে, অল্পবয়স্ক এ-রকম ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা মোটেই কিছু কম নয়।

রিপোর্ট বলছে: "বিশ বছরের নিচে বয়স এ-রকম ৩০,০০০ ছেলে-মেয়েদের সংসারে

ঢোকাবার পূর্বেই যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছে।" তার বিষময় ফলও ঘটেছে প্রায় সবক্ষেত্রেই এবং এইসব ছেলে-মেয়েদের জীবন পঙ্গু ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ হয়েছে।

এইসব ছেলেমেয়েরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, যৌনব্যাধি, ইত্যাদি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

এই কিশোর-কিশোরীদের অধিকাংশেই মা-বাবার কাছ থেকে যৌন-জীবন সম্পর্কে কোনো কথা জানতে পারেনি, বা শিক্ষা পায়নি। এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও মা-বাবাদের কড়া শাসনের অভাবেই অনেক ক্ষেত্রে এইসব ঘটতে পেরেছে।

তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে পিতৃগৃহে। আর তা অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীদের কাছে খুব অপ্রিয়ই মনে হয়েছে। অভিজ্ঞতা লাভের পর মুহূর্তেই মেয়েদের মনে দেখা দিয়েছে প্রবল লজ্জা ভয় ও পরিতাপ আর ছেলেদের মনে মোহভঙ্গের মর্মান্তিক বেদনা ও আতঙ্ক।

তাহলে এ-রকম অভিজ্ঞতার জন্য তারা পাগল হয়ে উঠেছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ১০০ জনের মধ্যে ৪৬টি ছেলে বলেছে: কারণ 'যৌন ক্ষুধা'। আর ১০০টির মধ্যে ৪২টি মেয়ে বলেছে 'প্রেমে প'ড়ে' তারা এ কাজ করেছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে আবার উত্তর দিয়েছে, নেহাৎ কৌতূহলের বশেই তারা এ অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই কাতর হয়ে পড়েছে ভয়ে ও ভাবনায়।

শতকরা ৬৩ জন ছেলে সংসর্গের সময় জন্ম-নিরোধক কোনো না কোনো উপায় অবলম্বন করেছে। তবে বেশির ভাগ ছেলেরাই এ সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। কয়েকটি স্কুলে ছেলেদের বেয়াজ খুলে কিছু 'আবরণী' উদ্ধার করা হয়েছে। একটা 'আবরণী' বেশ কয়েকবার বিক্রি এবং হাত বদল হয়েছে।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা জন্ম-নিরোধক উপায় অবলম্বন করেছে আরো কম। অনেক মেয়ে ধ'রেই নিয়েছে যে এইসব সতর্কতা গ্রহণের দায়িত্ব হলো ছেলেদের।

ছেলেদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন এবং মেয়েদের ভিতরে শতকরা ৪০ জন 'প্রত্যাহার' পদ্ধতির উপরে নির্ভর করেছে।

রিপোর্ট বলছে: যে "প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৫১ এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন গর্ভ-সঞ্চারকে ভয়ের কারণ ব'লেই বিশেষভাবে গণ্য করেছে।"

জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে শতকরা ৫০টি ছেলেমেয়েই যৌন ব্যাধির লক্ষণ বা উপসর্গ কী ও তার ফলাফল কি ভয়ঙ্কর তা কিছুই জানে না। মা বাবাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০/১৫ জন এইসব ভয়াবহ ব্যাধি বিষয়ে ছেলেমেয়েদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। শতকরা ৬৭টি ছেলে এবং ২৯টি মেয়েই যৌন-জীবন বিষয়ে মা-বাবার কাছ থেকে কোনো রকম নির্দেশ বা শিক্ষা পায়নি। বেশির ভাগ স্কুলেই যৌন—শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

বেশির ভাগ মেয়েরই বিশ্বাস ছেলেরা কুমারী মেয়েকেই ভবিষ্যৎ জীবনে বধূ অবস্থায় পেতে চায়।

উপসংহারে রিপোর্ট এ কথাই জোর দিয়ে বলেছে যে আধুনিক কিশোর-কিশোরীদের জীবনে স্বাস্থ্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তাদের বিজ্ঞান সম্মত যৌন-শিক্ষা দান ও অবাধ মেলামেশার ও অবৈধ প্রেম ও যৌন সংসর্গের বিষময় ফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা একান্ত প্রয়োজন।

• • •

মা রূপসী হলে কন্যা কেমন হবে?

অনেকের বদ্ধমূল ধারণা মা রূপসী হলে তার মেয়ে হবে রূপে সাধারণ। এ বিশ্বাস মিথ্যা বলে

প্রমাণিত হয়েছে অ্যামস্টারডামের ১৯ বছরের সুন্দরী তরুণী টিনা-র বেলায়। টিনা-র মা মেরিয়া মর্টেজও ছিলেন হলিউডের প্রখ্যাত রূপসী অভিনেত্রী।

* * *

ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে তাকে হত্যা!

১২ বছরের ছেলেটা অসুখ হয়ে এমন কষ্ট পাচ্ছিল যে সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বাবা পায়ের সাহায্যে ছেলেকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করেছেন। আদালতে এই মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি করেছেন ছেলেটির বাবা।

ছেলেটির মেরুদণ্ডে ক্যান্সার হয়েছিল। গায়ের উপর বিছানার চাদর লাগলেও তার কষ্ট হচ্ছিল। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল রাত্রিদিন। বাবা আর সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন তিনি মৃত্যুদণ্ড পেতেই উৎসুক। বিচারকরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল।

* * *

বন্ধ্যা মেয়েদের কিট

আমেরিকায় পার্সোনাল নামে একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধের এমনই প্রতিক্রিয়া যে, যে নারী তা খাবে তাকে এক সঙ্গে বহু সন্তান প্রসব করতে হতে পারে। তা জেনে শুনেও প্রতিদিন আমেরিকার বন্ধ্যা মেয়েদের লম্বা কিউ পড়ছে ওই ওষুধ সংগ্রহ করার জন্য। কারণ বিবাহের পরে সন্তান লাভ না করায় তারা অত্যন্ত অসুখী বোধ করছেন।

* * *

কড়ে আঙুলে হীরের রিঙ্গিক

ফ্রাঙ্কফোর্টের জুয়েলার কার্ল ক্রেডারিক এক অভিনব আংটি তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এই আংটি কড়ে আঙুলের সমস্তটা নতার মতো জড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া, আংটিটির চেহারা খুশি মতো বদলানো যায়। এই আংটিটি প'রে জার্মানীর এক রূপসী তরুণী মার্কিন মুলুকের —"সুন্দরী অভার" পুরস্কার লাভ করেছেন।

* * *

স্ত্রীলোকের পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চ

ইডা নামে একজন অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক গত বিশ বছর ধরে হামবুর্গে একটি রঙ্গালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুতি দোলায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চম্পা সে নির্দেশ পালন করেছে কিন্তু পুরোপুরি নয়।

তার ওপর নির্দেশ ছিল নিখিলকে সেই গভীর অরণ্যে ছায়ামূর্তির সাথে ফুলিয়ে দিয়ে যাবার পর সেখানেই কৌশলে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসা। চম্পার ফিরে আসার গোপন ব্যবস্থাও ছিল। ঝাড়ের কাছে পৌঁছাবার পর বিশেষ একটি দিকে দূর থেকে মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ আলোর সঙ্কেত দেখতে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্কেত লক্ষ্য করে আর মাইলটাক গেলেই আর ভাবনা থাকবে না। সেখানে একটি জীপ থাকবে দাঁড়িয়ে। বনের ভেতর আগুন থেকে গড়ে ওঠা ঘোরালো বাঁকা বাঁকা পথ ধরে সে জীপ চম্পাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।

চম্পা নির্দেশের প্রথম অংশটা ঠিক মত পালন করেছে। কিন্তু আলোর সংকেত অগ্রাহ্য করে দূরে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য রেখেছে নিখিলের ওপর।

নিখিল ছায়ামূর্তিকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে এদিকে ওদিকে খুঁজে যখন বনের আরো গভীরে চলে যাবার উপক্রম করেছে তখন ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেলে নিজের স্বরূপেই চম্পা তার সামনে দেখা দিয়ে নিখিলকে ফিরিয়েছে। ফিরিয়ে আনা অবশ্য সহজ হয়নি। নিখিলকে তার অলীক অন্বেষণ থেকে ফেরানো চম্পাকে বুদ্ধি কৌশলের সঙ্গে শারীরিক শক্তিও প্রয়োগ করতে হয়েছে।

নিখিলকে সেখান থেকে গোপনে তার বাড়িতে ফিরিয়ে এনে চম্পা আর দিধা সঙ্কোচ করেনি। নানা ব্যবসার প্রয়োজনে নিখিলের বাড়িতেই যথেষ্ট কাঁচা টাকা সব সময়ে থাকে। ইদানীং চম্পাকেই হিসেব পত্র রেখে তা ব্যবহার করতে হয়। যা কিছু পেয়েছে সে টাকার সবই সংগ্রহ করে নিয়ে ভোরের দিকেই একটি ট্রেন ধরে সে কলকাতায় রওনা হয়ে পড়েছে নিখিলকে নিয়ে। জঙ্গলের কুঠি বাড়ি থেকে বাড়িতে শেষ রাত্রেই পৌঁছেছিল। তারপর ভোর বেলাতেই ট্রেনে গিয়ে গাড়ি ধরায় বাধা কোথাও পায়নি। জানিয়ে শুনিয়ে গেলেও প্রকাশ্যভাবে বাধা হয়ত দেওয়া যেত না, শুধু তার গন্তব্য ঠিকানা গোপন রাখা সম্ভব হত না তাহলে।

ঠিকানা গোপন রাখা কিন্তু সম্ভব হয়নি। প্রথমে কলকাতাতেই চাচাজি যে তাদের সন্ধানে তৎপর তা জানতে পেরেছে। সেখান থেকে এই সুদূর শহরে পালিয়ে এসেও নিস্তার পায়নি। নিখিলকে বেশ কিছুকাল তার পরিচিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে একলা নিজের সঙ্গে রেখে তার মনের ভ্রান্তি দূর করতে পারে কি না তা দেখবার সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে।

চম্পার কাহিনী যখন শেষ হয়েছে তখন হায়ঘাট ছাড়িয়ে আমরা বহুদূর চলে এসেছি। বৈরাগনিয়া না ওই রকম কি একটা নামের ষ্টেশনে গাড়ি তখন থেমেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—যে ক'দিন শুধু নিখিলকে নিয়ে নির্জনে ভিন্ন পরিবেশে থাকবার সুযোগ পেয়েছ তাতে নিখিলের অবস্থার কিছু উন্নতি কি চোখে পড়েছে।

না,—হতাশ ভাবে বললে চম্পা,—শারীরিক উন্নতি হয়ত কিছু হয়েছে; কিন্তু মনের স্বপ্নচ্ছন্নতা যেন আরো বেড়ে গিয়েছে। আপনাকে জানাইনি কিন্তু এখন ক্রমশঃ আরো যেন নিজের অলীক কল্পনার জগতে হারিয়ে যাচ্ছেন। এক একদিন আমি ঘরে ঢুকলে যমুনা বলে ডেকে কথা বলতে সুরু করেন! সে ঘোর কাটতে বেশ সময় লাগে। আমি ওঁর কাছে ছায়ামূর্তি সেজেছি ওর স্ত্রীর তখনকার পোষাক প্রসাধন যতদূর সম্ভব নকল করে। সে পোষাক প্রসাধনে থাকলে ওর স্বপ্নের ঘোর হয়ত আর কাটবেই না।

চম্পার গলাটা রুদ্ধ হয়ে গেল শেষ কথাটায়। একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে এবার বিষণ্ণ তিক্ত স্বরে বললে—চাচাজি এই স্বপ্নঘোরের শেষ সুযোগই নিয়েছেন। কাল রাত্রে মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা ওর সেখান পরামর্শ মতেই করেছিলাম সত্য। ভেবেছিলাম ওঁর কপটতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনরকমে আর একবার আপনার বন্ধুকে নিয়ে ওঁকে এড়িয়ে পালাবার সুযোগ পাব। চাচাজি রেশমীকে সঙ্গে এনেছেন দেখে সন্দিগ্ধ হলেও কাল রাত্রেই আমায় বাদ দিয়ে উনি এই চাতুরী খেলবেন ভাবতে পারিনি। আপনি থাকায় রেশমীকে দিয়ে যা করতে চেয়েছিলেন তা সফল হয়নি। কিন্তু তারপর কি হয়েছে আমি নির্ভুল ভাবে জানি। আপনি যখন মন্দিরে ছুটে এসেছেন তখনই উনি নিজে গিয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন সেই মুহূর্তেই আমাকেও এ জায়গা ছেড়ে নিজের শহরের বাড়িতে ফিরে গেলেই তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হবে এ কথা ওই স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষটাকে বোঝানো মোটেই কঠিন হয়নি। হাজিপুরে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে দিয়ে রাত্রের গাড়ি ধরাবার ব্যবস্থাও চাচাজি করেছেন।

চম্পা নীরব হবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম আমরা হায়ঘাট কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি।

জানি।—চম্পা ক্লান্ত হতাশার জানলার দিকে মুখ ফেরালো।

বললাম,—নিখিলকে আবার সেই জঙ্গলের কুঠিবাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হবে বলে তোমার বিশ্বাস?

হ্যাঁ,—করুণ উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে চম্পা বললে,—এর চেয়ে সহজ নিরাপদ উপায় আর কি হতে পারে। চাচাজি পরের অমাবস্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বলেই মনে হয়, চক্রান্তটাকে গাঢ় অলৌকিক রহস্যে ঢাকবার জন্যে। কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাজ সারবার সম্ভাবনা তবু বাদ দেওয়া যায় না।

তার আগেই তাহলে নিখিলকে উদ্ধার করতে হয়। দৃঢ়স্বরেই বললাম।

কিন্তু কি করে?—চম্পা হতাশভাবে আমার দিকে তাকাল,—চাচাজি প্রকাশ্যভাবে কড়া

পাহারার ব্যবস্থা অবশ্য করবেন না। আপনার বন্ধুর সঙ্গে গোপনে আমার দেখা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু নিজেরই যার উদ্ধার পেতে আপত্তি তাকে উদ্ধার করব কি করে।

করবে,—চম্পার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম,—চিরকালের মত তার স্বপ্নলোকেই তাকে হারিয়ে যেতে দিয়ে। তাতে দোষই বা কি! সত্যিই সত্য আর স্বপ্নের মধ্যে সীমারেখা কি কোথাও আছে।

চম্পা বিমূঢ় ভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে সেখানে একটু উষ্মতার আভাস দেখা দিতেই আবার বললাম,—হ্যাঁ চম্পা এ ছাড়া অন্য উপায় আর নেই। তোমার চাচাজির লোভ'ত শুধু বৈষয়িক, তাঁকে সব কিছুর অধিকার দিয়েও নিখিলকে উদ্ধার করতে তোমার আপত্তি নিশ্চয় নেই।

না, নেই।—গাঢ়স্বরে জানালে চম্পা,—কাজ কারবার ছাড়া আমার কাছেই যা সঞ্চয় আছে তা ঐশ্বর্য না হোক সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয়।

তাহলে এই শেষ চেষ্টাই তোমায় করতে হবে। চিরকালের মত নিখিলের অলীক কল্পনার যবনা হয়েই তাকে তুমি উদ্ধার করে নিয়ে যাও। যদি পারো'ত কোথায় গেছ আমাকে জানাবারও তোমাদের দরকার নেই। রহস্য যবনিকার অন্তরাল থেকেই তোমাদের কথা আমি মনে রাখতে চাই।

চম্পা আমার কথা রেখেছে। কোন সংবাদ তার কাছ থেকে আর পাইনি, এইটুকু শুধু নিখিলের খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে নিখিল তার মফঃস্বল শহরের বাড়ি থেকে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। তার মানসিক অসুস্থতার কথা সেখানে সকলের জানা। খুব বিস্মিত বা বিচলিত কেউ বোধহয় তাই হয়নি।

একজন তার সত্য আর একজন তার স্বপ্ন নিয়ে কি ভাবে তারা দিন কাটাচ্ছে মাঝে মাঝে শুধু ভাবি।

নিখিলের এ কাহিনী অনেকদিন পর্যন্ত লিখতে চাইনি, কোথায় এর মধ্যে দুর্বোধ একটা রহস্য যেন আছে অনুমান করেও তা সঠিক ধরতে না পেরে।

ধরতে কি এখনই পেরেছি?

বিচিত্রা

বিজ্ঞাপনে "আদর্শ নারী"

পুরুষদের চোখে যে নারী আজ ধরা দেয়, সে চিত্রতারকা নয়, আত্মবিশ্বাসী স্বাধীনা নয় কিম্বা বিগত দিনের সেই দুখকাতরা বধূ নয়, সহানুভূতিশীল, সহজ স্বাভাবিক এক তরুণী নারী যে চটুল প্রসাধনে নিজেকে ঢেকে রাখেনা অথচ সাধারণ বেশবাসে সংক্ষিপ্ত রুচির পরিচয় দেয়। সে ত্রিশোত্তীর্ণা হবেনা। সে ধীরস্থির অথচ মেজাজী হবে। তার ব্যবহার হবে বন্ধুর মত, মুখে হাসিখুশী লেগে থাকবে অথচ যে কোন অবস্থায় মুখোমুখী হতে পারবে। তাকে সুশিক্ষিতা, বাধ্য ও বিশ্বাসী হতে হবে। সে হবে স্বামীর আদর্শ সাথী, আদর্শ মা, সুগৃহিণী ও অতিথিপরায়ণা। এই সেই নারী কিন্তু কল্পনার এই "আদর্শ নারী" বাস্তবে কোথায়? হয়তো একমাত্র বিজ্ঞাপনের পোষ্টারে কিম্বা পত্র-পত্রিকায় তাদের দেখা মেলে।

পুরুষদের জন্যে পুরুষদের সৃষ্ট এই "কল্পনার নারী" বাস্তবে আরও কিছু চায়। সে চায় জীবনে নিরাপত্তা, ভালো উপার্জন, বাড়ি, গাড়ি ও সাংসারিক সুখের জন্যে নানা বাড়তি সাজসরঞ্জাম।

তাইতো স্বামীরা না চাইলেও প্রতি তৃতীয় স্ত্রী কাজে যায়। তাদের উপার্জনে সংসারের নানা অভাব মেটে। শুধু কি তরুণী স্ত্রীরা কাজে যাচ্ছে? যেসব মায়েদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে তারাও কাজে ফিরে যাচ্ছে।

মিস্ত্রি মুক্তল ক্যাসালের ঘুমিয়া

পতলোম অর্থাৎ "ফার" দিয়ে তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ য়ুরোপে খুবই জনপ্রিয় কিন্তু আসল ফার দিয়ে তৈরী জামাকাপড় কেনা আজকাল সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে। সুতরাং কৃত্রিম সুতো দিয়ে তৈরী 'ফার' বাজারে বেরিয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফার ফিল'। খুব কাছে থেকে না দেখলে এই নকল ফার থেকে তৈরী জামাকাপড়ের সঙ্গে আসল ফার দিয়ে তৈরী জামা-কাপড়ের পার্থক্য বোঝা যায় না।

আসল 'ফারের' তুলনায় কৃত্রিম ফার অনেক হাল্কা, মসৃণ ও জলরোধক আর দামেও খুব সস্তা। তাছাড়া আসল ফারের একদিকে চামড়া ও একদিকে লোম থাকে কিন্তু কৃত্রিম ফারের দু'দিকেই লোম থাকে। বিভিন্ন জীবজন্তুর চামড়ার নকলে কৃত্রিম ফার তৈরী করা হচ্ছে আর তা দিয়ে শুধু জামাকাপড় তৈরী হচ্ছে না, জুতো, মনিব্যাগ, ভ্যানিটিব্যাগ, টুপি সবকিছুই তৈরী হচ্ছে। মনে রাখবে এগুলি আসল ফার থেকে যে কম আকর্ষণীয় নয়, লণ্ডনের ফ্যাশন প্রদর্শনী থেকে বেলজিয়ামের রাজকুমারী গাজা ও রাশিয়ার নভচারী ভ্যালেনিটনা তেরেশকোভা কর্তৃক জার্মানীর তৈরী 'ফার বিজ' থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাই তার প্রমাণ।

যখন বাজখাই গলায় গল্প বলে

আজ আপনাদের ক্যাপ্টেন বিলবোর গল্প শোনাব। জানেন ক্যাপ্টেন বিলবো কে? না জানলে "এক আবেগপ্রবণ বিদ্রোহী নামে" আত্মজীবনীখানা পড়লেই ক্যাপ্টেন বিলবো সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবেন। বইখানার ভূমিকা লিখেছেন যিনি, তিনি যে সে লোক নন, স্বয়ং হেনরী মিলার। বলেছেন, "ক্যাপ্টেনকে আমি গড় করি। তার বুকের পাটা যেন শক্তি না হারায়" আর কে কে ভূমিকা লিখেছেন জানেন? বার্নার্ড শ, সিনক্লেয়ার লুইস ও চেস্টারটন।

ক্যাপ্টেন বিলবোর আসল নাম হিউগো বাকুস। বেলিনের এক ধনী পরিবারের ছেলে সে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি নেয়। তারপর চল্লিশ বছর ধরে সে কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে। কখন জাহাজের ছোকরা চাকর, খালাসী মাঝার চাকরি আবার কখন বা তরমুজের, সাংবাদিক, মক ডিজাইনার, এমনকি দুর্ধর্ষ ডাকাত আল কাপোনের দেহরক্ষী পর্যন্ত। আট বছর আগে দেশে ফেরা পর্যন্ত বিদেশেই সে বেশি পরিচিত ছিল।

ক্যাপ্টেন বিলবোর বয়স এখন বাট। যাযাবরের জীবন ছেড়ে সে এখন পশ্চিম বেলিনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এখানে সে দুটো দোকান খুলেছে, একটা কিউরিওর দোকান, আরেকটা পানশালা। রাতে যখন সে তার পানশালায় অতিথিদের কড়া পানীয় তৈরী ক'রে দিয়ে তার রোমাঞ্চকর জীবনের গল্প শোনায় তখন বোঝা যায় না কতটা খাঁটি আর কতটা খাদ। নিজের মনের কথা বলতে বিলবো ভয় পায় না। নিজেকে সে একজন সমাজবাদী বলে মনে করে, তবে রোমার দলে সে নেই। যখনই সে মনে করে অন্যায় হচ্ছে, তখনই সে আইন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। নাৎসী আমলে একবার দেশে ফিরে তাদের বিরুদ্ধে বেফাঁস কথা বলায় কোনরকমে সে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। অন্যায়ভাবে শাস্তি হলে সে জেলে যেতে রাজি তবু জরিমানা দেবে না। বিরাট দশাসই চেহারা, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ক্যাপ্টেন বিলবো যখন বাজখাই গলায় গল্প বলে মুগ্ধ হয়ে সবাই শোনে।

রক্তের বিকল্প লাল জল নয়

কোন কারণে শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হলে, বাঁচাবার জন্যে অন্যের রক্ত শরীরে সঞ্চালন করা হয়। চিকিৎসকদের কাছে কিন্তু এই ব্যবস্থা খুব মনঃপুত নয় এই কারণে যে, এতে একের ব্যাধি

অন্যের দেহে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থেকে যায়। তাছাড়া সংরক্ষিত রক্তে কিছুদিনের মধ্যেই নানারকম গলদ দেখা যায়। আঠারোদিন পরে সেই রক্ত ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্য কারণেও একের দেহে অপরের রক্ত সঞ্চালন খুব আদর্শ সমাধান নয়।

উপরোক্ত নানা কারণে রক্তের একটা বিকল্প আবিষ্কারের জন্য বহুদিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। গবেষণার ফলে আবিষ্কার হয়েছে যে রক্তপাতের ক্ষতিপূরণের জন্য দেহ অন্যের রক্ত চায়না, দেহ চায় সমপরিমাণ এমন কোন তরল পদার্থ যা থেকে দেহের নিজস্ব উপাদানগুলি ও বিশেষতঃ অ্যালবুমিন দ্রুত গঠিত হতে পারে।

এই প্রচেষ্টার ফলে জৈবরসায়ন বিজ্ঞান এখন "হেমাসেল" নামে একটি বিকল্প রক্ত-রস উদ্ভাবন করেছে যেটি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। এই রক্ত-রস বিভিন্ন গবেষণাগারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। "হেমাসেল" তৈরী হয় সকল জাতের আঠাশ পদার্থ থেকে ১৮ রকম অ্যাসিড আছে। এগুলি থেকে দেহ তার অ্যালবুমিনের প্রয়োজন মেটায়। এছাড়া এর আরেক সুবিধা যে প্রচণ্ড গরমে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কোনপ্রকার সংরক্ষক ছাড়াই এটি নষ্ট হয়না। এর প্রধান গুণ যে এটি সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, রক্তের মত এর শ্রেণীবিচার করার প্রয়োজন হয়না। ফলে রক্ত সঞ্চালনের আগে রক্তের শ্রেণীবিচার করতে যে সময় নষ্ট হয়, তা বাঁচে।

অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, সেসব ক্ষেত্রে "হেমাসেল" মনোমত কাজ দেয়না। মানবদেহের লাল রক্তকণিকার মত এই বিকল্প রক্ত রস দেহে অক্সিজেন পরিচালন করতে অক্ষম। তবে প্রচুর রক্তপাত হলে "হেমাসেল" দিয়ে রক্তপাতের ঘাটতি পূরণ হয় ও নূতন রক্তসৃষ্টি করতে সাহায্য করে। "হেমাসেল" এখন পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন হাসপাতালে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে ও বহুলোকের জীবন রক্ষা করেছে।

অতি আধুনিক রঙ্গমঞ্চ

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন তার ১৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার শুধু রাজনীতিতে নয় সংস্কৃতিতেও নাম কিনেছে। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তি ও বিদেশী দূতাবাসের কূটনৈতিক অভিথিদের উপস্থিতিতে এসচিলাসের 'ওরেস্টাইয়া' দিয়ে উদ্বোধন হল য়ুরোপের সর্বাধুনিক থিয়েটার। এই থিয়েটার গৃহের পরিকল্পনা করেছেন স্টুটগার্টের স্থপতিদ্বয় ক্লাউস গেজলার ও হিলেক্রেত ব্রেক-এরদাক্ত। মোট ৮০০ জন দর্শকের আসন করা হয়েছে এই থিয়েটারে, এর অ্যালুমিনিয়ামে মোড়া ছুঁচো, পুঁথির মত কাঁচ-বসানো বহির্ভাগ ও ছন্দহীন বিশ্রামকক্ষ পশ্চিম জার্মানীর স্থাপত্যশিল্পের দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় এই থিয়েটারের আলোকসজ্জা পূর্ব ব্যবস্থানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর 'সম্পূর্ণ পরিবর্তন যোগ্য মঞ্চের কাঠামো' এযাবৎ যে চিত্রচরিত্র থেকে আধুনিক ধাঁচের যেকোন প্রকার মঞ্চস্থাপনা সম্ভব।

ধনির আবার যাদুঘর

ধনি সম্বন্ধে এই একমাত্র যাদুঘরটির অবস্থিতি পশ্চিম জার্মানীর রুর অঞ্চলে বোকুম শহরে। পৃথিবীর যেন দেশ নেই যেখান থেকে ধনি শ্রমিকেরা এসে এই অদ্ভুত যাদুঘরটি দেখে না গেছে। এযাবৎ দু'লক্ষের বেশি দর্শকের সমাগম হয়েছে এই যাদুঘরে ও তাদের এক-চতুর্থাংশ ধনিমজুর।

আদিম যুগ থেকে শুরু ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত খনির এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে আর দর্শকদের সবচেয়ে বেশি যেটি আকর্ষণ করে সেটি হল ৪২ ফুট গভীর একটি মডেল খনি। এটিতে নামলে খনিতে কি ভাবে আজকাল কাজকর্ম হয়, সে সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই খনি শ্রমিকদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। আজ থেকে ৩৯ বছর আগে এই যাদুঘরটি স্থাপন করা হয়।

ভাসমান মঞ্চে নৃত্যনাট্য

প্রতি গ্রীষ্মে পশ্চিম জার্মানীর কোবলেনজ শহরে "অপেরেটা অন্ দি রাইন" নামে এক উৎসবের আয়োজন হয়। নদীর ওপর ভাসমান দুর্গাকৃতি মঞ্চ তৈরী করে নৃত্যনাট্য অভিনয় হয় আর দর্শকরা নদীর তীরে বসে তা উপভোগ করে। গত পনের বছর ধরে এই অভিনয় দেখার জন্যে কাতারে কাতারে লোক আসে এবং সব টিকিট আগে থাকতেই বিক্রি হয়ে যায়। এবছরের উৎসবেও অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার দর্শকের সমাগম হবে। এবছরের নৃত্যনাট্যের নাম "কাউন্টেস মারিতজা"। প্রযোজনায় থাকবেন পরিচালক এইচ ডবলিউ উনগ্ এবং রাজনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও যুদাপেস্ত অপেরার অধ্যাপক মাইকলাস ফন সুলাসের তত্ত্বাবধানে এতে অভিনয় করবেন হাঙ্গেরীয় শিল্পীবৃন্দ।

জেলের অতিথিদের পরম সৌভাগ্য

য়ুরোপের অতি আধুনিক যে জেলখানা তৈরী হচ্ছে সেটি আগাগোড়া প্রিফ্যাব্রিকেটেড। এর প্রত্যেকটি সেলের আয়তন ১০×৮ ফুট এবং শৌচাগার, ওয়াশ বেসিন, আলো বাতাসের জন্য জানলা, সেন্ট্রাল হিটিং, আলো ও রেডিও নিয়ে প্রত্যেকটি সেল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রিফ্যাব্রিকেটেড পদ্ধতিতে জেলখানার জায়গায় সেলগুলি তৈরী ক'রে জুড়ে জুড়ে গোটা জেলখানা গড়ে উঠবে। জেলের কয়েদীদের আরামের জন্যে প্রত্যেক সেলে মোড়া চেয়ার, টেবিল, খাট থাকবে। সেলের জানলায় গরাদ থাকলেও মুক্ত জগতের অনেকটাই চোখে পড়বে। তবে প্রিফ্যাব্রিকেটেড জেলখানা তৈরী করতে খরচার দিক দিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হবেনা। এভাবে তৈরী করার একমাত্র সুবিধা যে তৈরী করতে অনেক কম লোক লাগবে। চলতি পদ্ধতিতে তৈরী করতে যেখানে ২৫০ জন লোক লাগে সেখানে একই সময়ে প্রিফ্যাব্রিকেটেড পদ্ধতিতে লোক লাগবে মাত্র ৪০ জন। জেলখানাটি তৈরী হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর কোলোন শহরে, ও আশা করা যায় ১৯৬৭ সালে প্রথম "অতিথিরা" এখানে সাদর সম্বর্ধনা লাভ করবে।

এখন পাড়ায় পাড়ায় লোক সংগীতের ক্লাব

য়ুরোপে আজ সংগীতের নেশা বহুকাল কেটে গেছে এবং বীটলদের কালোত্তীর্ণ যাব যাব করছে। পশ্চিম জার্মানীর যুবমহলকে এখন পেয়ে বসেছে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত, ইডিশ ও ইহুদি গান, রাশিয়ার প্রেমগাথা, ফরাসী ও জার্মান উদ্দীপনাময় সঙ্গীত ও মার্কিনী খৃষ্ট উপদেশাবলী লোক-

সঙ্গীতের আসরে আজকাল ভীড় দেখেই বোঝা যায় যে, এসব গান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাড়ায় পাড়ায় লোকসঙ্গীত গাইয়েদের ক্লাব গড়ে উঠছে ও তাদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলেছে এসব গানে নতুনত্ব আমদানি করা নিয়ে। এসব ক্লাবের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছে ২৪ বছরের মাইক ব্লাটের পরিচালনায় "হামুর্গিকাক সিঙ্গার্স ক্লাব"। ইতিমধ্যেই সিনেমা ও টেলিভিশন থেকে এদের ডাক এসেছে। এদের গানের রেকর্ড এখন বাজারে যথেষ্ট বিক্রি হচ্ছে। মাইক ব্লাটের দলে নামকরা গাইয়েদের মধ্যে আছে হামুর্গের সিভিল কিনাস্ট ও প্যারিসের অ্যালেন আর্ডি।

বিশ্রামেও বিপদ ঘটে

যারা সপ্তাহের অন্য সব দিন ছেড়ে কাজ করে আর ছুটির দিন করে ঘুম মারে, জানবেন তারা ভীষণ অন্যায় করে। পশ্চিম জার্মানীর হামুর্গের দু'জন চিকিৎসক ডাক্তার ভটংজাউয়ের ও ডাক্তার বেকে ১৯৩৪ সাল থেকে হৃদ্‌রোগে মৃত পাঁচহাজার মানুষকে পরীক্ষা করে অবাক হয়েছেন এই দেখে যে বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটেছে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে অর্থাৎ সোমবারে।

যারা খেলাধুলা দেখেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, খুব দৌড়ঝাঁপের পর খেলোয়াড়রা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েননা। যথেষ্ট কসরৎ কারার পর হঠাৎ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে শরীরে দ্রুত পরিবর্তন হয় ও তাতে অনেক সময় হার্টের ও রক্ত চলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। সেইজন্যেই খেলোয়াড়রা দৌড়ঝাঁপ করার পর আরও কিছুটা ব্যায়াম করে তারপর বিশ্রাম নেয়।

সেকালে, জীবনে যখন এত জটিলতা আসেনি, মানুষ চাষবাস করত কিম্বা নিজের বুদ্ধি নিয়ে থাকত। অবসর বা বিশ্রাম বলে কোন কথা তাদের ছিলনা। সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে হাল্কা সাদামাটা খাবার খেয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ত আর পরেরদিন ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে কাজে লেগে যেত। ছুটির দিনেও তাদের কাজের কামাই ছিল না; ঘরবাড়ির নানা কাজ করত, জীবজন্তু দেখাশোনা করত। এভাবে তারা সপ্তাহের অন্য দিনের কাজকর্মের একটা সামঞ্জস্য রাখত আর তাতেই তাদের শরীরের ঝাঁঝুনি থাকত।

এভাবে আমরাও যদি একালে ছুটির দিনটা কিছু না কিছু কাজকর্ম করে কাটাই তবে আমাদের আয়ু বেড়ে যাবে। ছুটির দিনে কোন ভারি কাজ দরকার নেই। হাল্কা কাজকর্ম, খেলাধুলা কিম্বা ব্যায়াম এসব করলেই দেখবেন শরীর ভালো থাকবে। একটু আধটু বাগান করার শখ থাকলেও সেটা শরীরের পক্ষে ভালো। খ্যাতনামা হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে, দিনের মধ্যে একবার এমন কাজ সকলের করা উচিত যাতে প্রচুর ঘাম হয়।

—— আমাদের দেখুন

জার্মানীর বিমান ।৮০—— ইতিহাস যদি জানতে চান, তাহলে মিউনিখের "জার্মান মুজিয়াম" একবার দেখে আসবেন। যেসব বিমানের আসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে সেসব বিমানের মডেল, প্রতিকৃতি ও নির্মাণ কৌশলের বিবরণ রাখা হয়েছে সেই বিমানগুলি সম্বন্ধে, মানুষের একটা ধারণা জন্মায়।

এই যাদুঘরে এলে দেখবেন পৃথিবীর প্রথম রকেট বিমান "মেসেরস্মিট ১৬৩" রয়েছে। এই বিমান শুধু যে একদিন পৃথিবীর প্রথম রকেট বিমান ছিল তা নয়, এই বিমানই প্রথম ঘণ্টায় ৮০০ মাইল বেগে উড়ে শব্দের বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৪১ সালে সেই কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন বিখ্যাত গ্লাইডার টেষ্ট পাইলট হাইনি ডিটমার। "মেসেরস্মিট' ১৬৩" বিমানের আকাশে ওঠার ক্ষমতাও ছিল আশ্চর্য ; মাত্র আড়াই মিনিটের মধ্যে এটি ত্রিশহাজার ফুট উঠে যেত ও তিনমিনিটে যেত ছত্রিশ হাজার ফুট ওপরে। এর উঠতে ওঠার সীমা ছিল পয়তাল্লিশ হাজার ফুট। এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও কিন্তু এই বিমান কোন সামরিক সম্মান পায়নি কারণ এর ওড়ার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, মাত্র আট থেকে পনের মিনিট। এই বিমান তৈরী হয়েছিল সাকুল্যে ৩৮৪ খানি।

এই যাদুঘরের আরেকটি সংগ্রহ হ'ল প্রথম জেটবিমান। এটিও একটি মেসেরস্মিট। একে বলা হয় "এম. ই. ২৬২"। এজাতীয় বিমান জার্মানীতে যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছিল মোট তেরশত। লড়াইয়ে বিমান "এম. ই. ১০৯" যাদুঘরের অপর দ্রষ্টব্য। এই জাতীয় বিমান তৈরী করেছিল জার্মানী সবচেয়ে বেশি, তেত্রিশহাজারের ওপরে। এই বিমানের একটি বিশেষ মডেল "এম ২-২০" চালিয়ে ১৯৩৯ সালে ক্যাপ্টেন ক্রিংস্ল হেনডেল ঘণ্টায় ৪০৩৪ মাইল বেগে চলে বিশ্বে গতির রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন যা আজও কেউ ভাঙতে পারেনি।

বিমান ইতিহাসের শুরু হয়েছিল যা দিয়ে ১৮৯৬ সালে সেই অটো লিলিয়েন্থালের গ্লাইডার এই মুজিয়ামের এক গর্বের বস্তু। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের ১৯০৩ সালে তৈরী প্রথম বিমানের একটি মডেল এখানে আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে জার্মানী যেসব বিখ্যাত সামরিক ও বাণিজ্যিক বিমান তৈরী করেছিল, তার প্রায় সবগুলির নমুনা এখানে আছে।

লেখকদের পক্ষে লেখা আরম্ভ করাটাই একটা মহাসমস্যা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে লেখবার আগে কুড়িটা পেনসিল কাটতেন। উইলা ক্যাথার লেখা আরম্ভ করার পূর্বে প্রত্যহ বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ পড়তেন। টমাস উলফ্, সারা রাত ধরে ব্রুকলিনের পথে পথে হাঁটতেন।

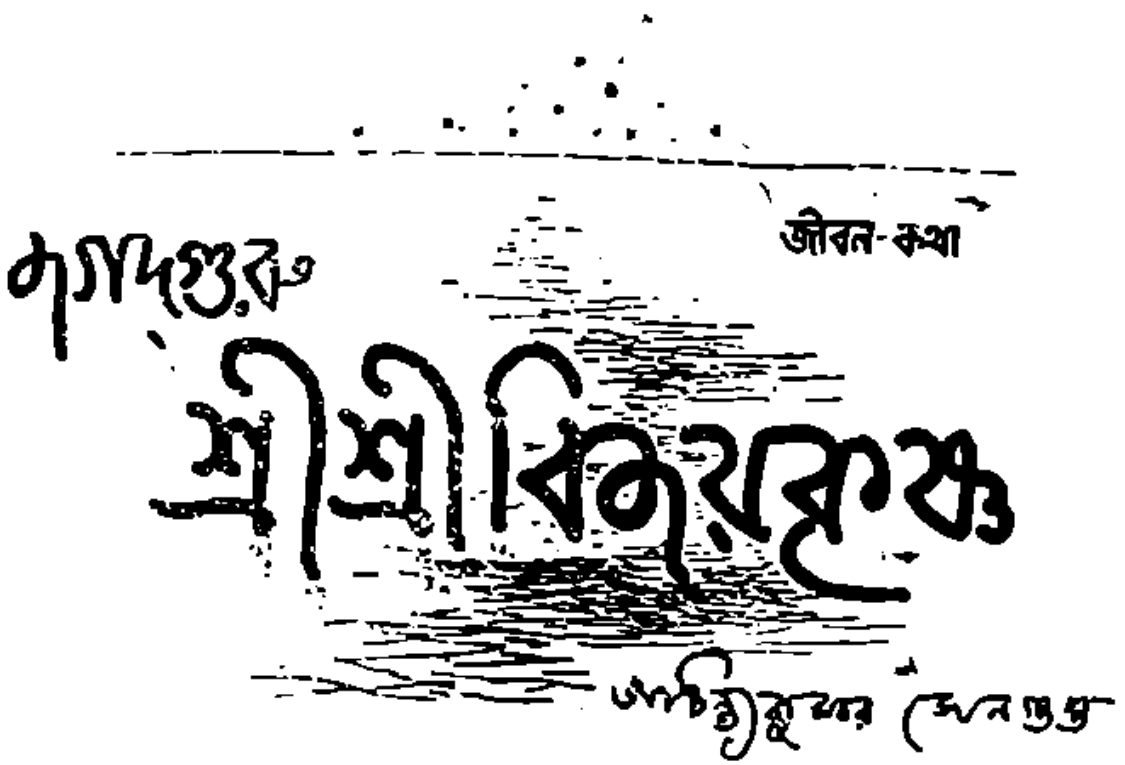

৩৫

বোলপুরে ফিরে এসে হরিদাস বললে, দীক্ষা দিলে না।

আবার যাও। বারে বারে যাও। না পাওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃত হবে না।

আবার গিয়ে উপস্থিত হল হরিদাস।

'আবার এসেছ?'

'আমি কি নিজের ইচ্ছেয় আসি? আমাকে জোর করে বারে বারে পাঠায়।'

'কে পাঠায়?'

'অঘোরনাথ।'

নাম শুনে গোঁসাইপ্রভু শিহরিত হলেন। বুঝলেন মর্মকথা। বললেন, 'তোমার সাধন দিতে আরো কিছুদিন বাকি আছে। এখন যাও, আমি পরে খবর পাঠাব।'

আবার ফিরে গেল হরিদাস।

পরে খবর পাঠাবে! যেন খবর পাঠালেই ছুটতে হবে আমাকে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই খবর যখন পাঠালেন গোঁসাইজি, হরিদাস স্থির থাকতে পারলনা। ছুটে চলে এল কলকাতা। নীরবে প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'বোসো। আজ দীক্ষা হবে।'

আসনে বসল হরিদাস। বসেও সে বুঝি নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। বললে, 'আগে আমার একটা প্রশ্নের মীমাংসা চাই। মানুষ কী করে মানুষের গুরু হয়?'

প্রভু বললেন, 'মন্ত্রদাতা গুরু মানুষ নন, তিনি ভগবান।'

হরিদাস অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল। শান্ত হল। পূর্ণ হল। দীক্ষিত হল।

আগুন তো সর্বত্র আছে, এমন কি শূন্যেও আছে, কিন্তু তাকে ধরি কী করে? যেখানে প্রদীপ জ্বলছে বা চুল্লি জ্বলছে সেইখানেই আগুন বিশেষভাবে প্রকাশিত। সেখানে গিয়ে আগুনকে ধরো। বলছেন প্রভু, তেমনি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। গুরুতেই তাঁর চিৎশক্তির সবিশেষ প্রকাশ। সুতরাং সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। গুরুই ঈশ্বর। গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।

গুরুদক্ষিণা কী?

মোক্ষার্থীদের গুরুদক্ষিণা নেই। বলেছেন প্রভু, সদ্‌গুরু তাদের আত্মসাৎ করে নেন। যে আপনার জিনিস হয়ে যায় সে কাকে দক্ষিণা দেবে? নিজের থেকে নিজের কি কোনো দক্ষিণা নেওয়া চলে?

সাধনাশ্রমে হরিদাস যেখন প্রভুর আসনে হরেকৃষ্ণ নাম ফুটে উঠেছে। কতক্ষণ পরে নাম নেই আসনে যুগলমূর্তি। যুগলমূর্তি আবার আসন ছেড়ে প্রভুর উরুর উপর।

আগে শুনলে হরিদাস গাঁজাখুরি বলত এখন স্বচক্ষে দেখে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু চোখকে বলছে, চোখ, তুমি নিষ্পলক হয়ে যাও।

দীক্ষা-অন্তে হরিদাস অন্যরকম হয়ে গেল। নামে রুচি জন্মাল, কীর্তনে আনন্দ। তার বাড়ি কুলীনগ্রাম, যে গ্রামের রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল, যার হরদম কুলীনগ্রামের সামান্য কুকুরকেও তিনি প্রিয় বলে অনুভব করেছিলেন, সেই গ্রামে হরিদাস খবর পাঠাল, গোঁসাই প্রভুর কাছ থেকে দীক্ষা নেবে তো কলকাতায় চলে এস। যাওয়া আসার খরচ আমি দেব।

প্রভু তখন ১৪।২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ৫১ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে আছেন। একদিন এক দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হল।

'আমরা কুলীন গ্রামের লোক—'

বেশির ভাগই বেশে-বাসে অসম্ভ্রান্ত। কয়েকজন গণ্যমান্য পোশাকের লোকও আছে দলের মধ্যে।

ওরা কারা? গণ্যমান্যদের জিজ্ঞেস করলে কেউ। আর আপনারা?

'ওরা, যাকে বলে ছোটজাত, হাড়ি মুচি ডোম ডুলে বাগদি—কামার কুমোর ছুতোর মিস্ত্রিও আছে আর আমরা ক'জন বামুন কায়েত। কিন্তু এখন আর ওরা-আপনারা নেই। আমরা এখন সকলে এক গাঁ—আমরা সবাই কুলীন গ্রামের।'

'ভালো হল, কিন্তু আপনাদের মতলবখানা কী?'

'বোলপুরের উকিল হরিদাস বসু এখানে আছেন না? তাকে ডাকুন।'

হরিদাসের তো চক্ষুস্থির! কী সর্বনাশ। এত লোক!

শুধু সংখ্যা? এদের অনেকের অপকীর্তি তো অজানা নয়। ওটা তো নামকরা গুণ্ডা। ওটা তো চুরি করে জেল খেটে এসেছে। আর, ছিঃ ছিঃ, শ্যামাকান্ত চাটুজ্জের কানে কানে বলে হরিদাস, 'ও মেয়েটা পতিতা।'

ভক্ত শ্যামাকান্ত বললে, 'পাতকীরাই তো বেশি করে আসবে ঠাকুরের কাছে।'

'কিন্তু গোঁসাইকে গিয়ে বলি এমন সাধ্য নেই।' হরিদাস ফাঁপরে পড়ল। 'যদি বিরক্ত হন যদি এক কথায় বিদায় করে দেন।'

'কিন্তু এরা যাঁর জিনিস তাঁর কাছে তো এদের একবার পৌঁছে দিতে হবে।'

হরিদাস ভয়ে-ভয়ে উঠে গেল উপরে। দেখল প্রভু তখন ভক্তদের কাছে শিবচতুর্দশীর কথা বলছেন। বলছেন কী করে গণ্ডযাতক ব্যাধকে উদ্ধার করলেন মহাদেব।

কথা শেষে হরিদাস বললে, মহাদেব কৃপা করে শুধু একটি ব্যাধকে উদ্ধার করেছিলেন, আজ একশোরও বেশি ব্যাধ কুলীনগ্রাম থেকে এসেছে উদ্ধার পেতে। আমাদের শিবসুন্দর কি কৃপা করবেন না?

কুলীনগ্রাম! সেই প্রিয় নাম! প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'কাল দীক্ষা হবে।'

হবে, হবে, আমাদের হবে। আমরাও প্রভুর মনোনীত। আমাদেরও তিনি পায়ের কড়ি ছুটিয়ে দেবেন।

পরদিন লোক যেন আরো বেশি দেখাল। রাত ভোর হতে না হতেই সবাই স্নানস্নান করে হাজির হয়েছে! কেউ যা অন্ধকার না কাটতেই ভিড় করেছে। তাদের মুখ আজ আলো হয়ে দেখা দেবে না, শব হয়ে ধরা দেবে।

প্রশস্ত হলঘরেও কুলিয়ে উঠছে না সকলকে। মেয়েরা একদিকে, পুরুষেরা আরেক দিকে, দু'দিকেই স্তূপীভূত ঔৎসুক্য।

প্রভু এসে আসন নিলেন। প্রারম্ভিক উপদেশ বিতরণ করে দীক্ষা দিলেন জনতাকে।

মুহূর্তে কুসুম তরঙ্গ উঠে গেল। কেউ আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, কেউ বা হাসতে লাগল উন্মেষ হয়ে। কেউ নাচতে লাগল, কেউ বা পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে। কে ছোট জাত কে বড় জাত কোনো সীমারেখা রইল না, যমুনে মুচিতে হাড়িতে কায়েতে কোলাকুলি চলল। ভক্তির দেশে আবার জাত কী। ভক্তির কৌলীন্যেই তো কুলীনগ্রাম!

'যাও ঘরে গিয়ে কীর্তন করো গে।'

কীর্তন শোনাতে এল নীলকণ্ঠ, এল গণেশদাস। গণেশদাসের সঙ্গে বৃন্দাবনের বলরাম দাস বাবাজী।

সেই বলরাম দাস, বৃন্দাবনে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গৌসাইজির। কীর্তনে 'সুখময় বৃন্দাবন' কথাটি শুনে ভাবাবেশে তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। রোমকূপ থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল দেহ ছেড়ে দেবেন বোধহয়। গৌসাইজি তাঁর বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন ভিতরে 'সুখময় বৃন্দাবন' ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তখন গোঁসাইজি নিজেই কীর্তন সুরু করলেন: সুখময় বৃন্দাবন, সুখময় বৃন্দাবন, আর অমনি হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন বলরামদাস।

বীরভূমের সূর্য নারায়ণ রায়ও কীর্তন শুনিয়ে যান।

'ও যমুনে, তোর তীরে শ্যাম আমার বাঁশী বাজাত।
ভুবন মোহন তানে ভুবন ভুলাত।
আমায় না হয় দিয়া পাষাণ
ভরসে, তোর তো তরল প্রাণ,
না হেরে সে চাঁদ বয়ান, কেমনে আছ জীবিত॥'

কৃষ্ণলীলার আরো গান গাইতে যাচ্ছিল, গোঁসাই প্রভু সূর্যনারায়ণকে বাধা দিয়ে সকাতর বিনয়ে বললেন, 'দয়া করে একটি শ্যামার গান করুন।'

সূর্যনারায়ণ তক্ষুনি গলা ছেড়ে গান ধরল :

আমার যে মন পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়
সে যে মেয়ের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।'

'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?' কীর্তনশেষে জিজ্ঞেস করল সূর্যনারায়ণ।

'করুন।'

'আপনি ওরকম বিনয় করে গানের জন্যে প্রার্থনা করলেন কেন? আমাকে আদেশ করলেই তো হত। আপনার একটা আদেশই তো যথেষ্ট।'

'না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি কৃষ্ণের গান গাইছিলে, আমি তোমাকে কালীর গান গাইতে বললাম। তার থেকে হঠাৎ ভাবান্তর ঘটালে তাদের কাছে অপরাধ হয়, তাই তোমার তাদের কাছে ক্ষমা পাবার আশায় ঐ ভাবে বলেছিলাম।'

সূর্যনারায়ণ মুগ্ধ হয়ে গেল। অমন করে ক'জন ভাবে।

'ভাবটি যেন কেমন লজ্জাবতী লতা।' বললেন গোঁসাইজি, 'স্পর্শ করলেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সামান্য অনাদর অমর্যাদা সইতে পারেন', শুকিয়ে যায়। সুতরাং দেখতে হয় কার ভাবের কাছে না অপরাধী হই।'

'নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে কালী বলি মা রাসবিহারী।' সূর্যনারায়ণ আবার গান ধরল।

সাধারণ চণ্ডীচরণ সেন এসে জিজ্ঞেস করলে, 'সমাজের মঙ্গল হবে কিসে?'

'ঋষি-প্রকাশিত শাস্ত্রমতে চললে।'

'আমাদের ব্রাহ্মসমাজ তো সেই রকমই চলেন।' বললেন চণ্ডীবাবু।

'না, চলেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মেলে তাই শুধু মানেন, যা মেলে না তা ফেলে দেন। তাতে হবে না। মানতে হলে শাস্ত্রের সমস্তটাই মানতে হবে। হ্যাঁ, সমস্ত—আগাগোড়া।' বললেন গোস্বামী প্রভু, 'আগে অভিধানে দেখে শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ করতাম, বহু অংশ পরিত্যাজ্য মনে হত। কিন্তু একদিন গুরুকৃপা হ'ল, গুরু কৃপায় ঋষিরা প্রকাশিত হলেন, আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার অন্তরে শাস্ত্রস্ফূর্তি হোক। সেই থেকে শাস্ত্র-অর্থের রহস্যভেদ হল। বুঝলাম শাস্ত্রের একটি অক্ষরও ত্যাগ করবার নয়।'

'একটি অক্ষরও নয়?'

'না, একটি অক্ষরও নয়।' গোস্বামী প্রভু জোর দিয়ে বললেন, 'শাস্ত্র কি অক্ষর, না কালি, না কাগজ? শাস্ত্র জীবন্ত, স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র স্বয়ম্পূর্ণ। তবে শুধু দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ব্যবস্থা, অধিকারী ভেদে উপদেশ।'

'ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ কী?' প্রভুর শিষ্য মণীন্দ্র মজুমদার জিজ্ঞেস করলে।

'যার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হবার কথা তা হয়ে গেলে তার আর দরকার থাকে না। যেমন কুরুক্ষেত্র বিজয়ের পর গাণ্ডীবের আর দরকার ছিল না।'

'হাঁ, কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর অর্জুন-বাহু হতে সাধারণ একটা ডাকাতের কাছে হেরে গেলেন।'

'গাণ্ডীব তুলতে গেলেন, তুলতে পারলেন না।' বললেন প্রভু, 'যদি বা তুললেন গুণ দিতে পারলেন না। পরাজিত হয়ে চলে গেলেন বদরিকাশ্রম। সেখানে গিয়ে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, এরকম কেন হল?'

'ব্যাসদেব কী বললেন?'

'বললেন, যখন কৃষ্ণ ছিলেন তখন তাঁর শক্তিতে তুমি শক্তিমান ছিলে আর সে শক্তির বাহন ছিল গাণ্ডীব। এখন কৃষ্ণ নেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও শেষ হয়েছে, এখন আর গাণ্ডীবের কী দরকার? এখন পরলোকে কিসে মঙ্গল হয় তার চিন্তা করো। তপস্যানিরত হও।' গোস্বামী প্রভু বললেন, 'তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আর প্রচার-বক্তৃতা করা বৃথা, এখন ব্রাহ্মরা যে যার মঙ্গলের জন্যে তপস্যা করো।'

'ব্রাহ্ম সমাজের প্রয়োজন কী ছিল?'

'খৃষ্টধর্ম থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচানো, দেশে সুনীতি প্রচার আর দুর্নীতির উচ্ছেদ।'

প্রতাপ মজুমদার এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, 'শুধু মানুষের মুখ চেয়ে-চেয়ে জীবন নষ্ট করলাম। কে কী বলবে কে কী ভাববে, শুধু লোকলজ্জার ভয়ে মারা গেলাম। লোকে বড়লোক বলুক বড়লোক ভাবুক শুধু এই অভিমানে আর ধর্ম হল না।'

গোস্বামী প্রভু বললেন, 'আপনি গীতা ও ভাগবত পড়বেন। শুধু ইংরেজি ভাবে থাকবেন না। আর যারা শুধু টাকা পয়সা দিয়ে টানতে যায় তারা শুধু অহংকারকেই প্রশ্রয় দেয়, আত্মাকে পায় না।'

অর্থ আর স্ত্রীলোক দুইই ভয়ানক।

বললেন প্রভু, 'দুইই ভয়ানক। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তির চেয়ে অর্থে আসক্তি বেশি অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে, অর্থে আসক্তি সহজে কাটতে চায় না। অর্থ যতই পাওনা কেন কিছুতেই তৃপ্তি নেই; আরো পাও আরো চাও। আরো চাও। কেবল চাও। দরকার নেই ক্ষমতা নেই তবুও চাও। এ আসক্তি ভয়ঙ্কর।'

এক অঘোরপন্থী সাধু এসে উপস্থিত।

গোস্বামী প্রভু তাঁকে খেয়ে যেতে বললেন।

সাধু বললে, 'কারণ চাই। 'কারণ ছাড়া আমি আহার করিনা।'

তাকে মদ আনিয়ে দিলেন প্রভু। সাধু তা যেন আনন্দ করে। প্রভু বললেন, 'এ সুরাপান নয় এ কুলকুণ্ডলিনী মুখে আহুতি।'

মদ পেয়েও সাধু তক্ষুনি আহারে বসল না, তার বুঝি অন্য কিছুতে আকর্ষণ।

সাধু যোগজীবনের ঘরে ঢুকল। প্রশ্ন করলে, 'তোমার বাক্সে কত টাকা আছে?'

'নিশ্চিন্তার' যোগজীবন বললে, 'দুশো টাকা।'

প্রভুর কাছে এসে বললে, 'আমার দুশো টাকার বিশেষ দরকার। যোগজীবনের বাক্সে দুশো টাকাই আছে। ওকে ও টাকাটা আমাকে দিয়ে দিতে বলুন।'

যোগজীবনের টাকা মানে আশ্রমের টাকা।

যোগজীবনকে ডাকলেন প্রভু। বললেন, 'ক্যাশবাক্সে যত টাকা আছে সব দিয়ে দাও সাধুকে।'

সমস্ত কুড়িয়ে কাচিয়ে দুশো টাকার কিছু বেশি হল। তাই সব দেয়া হল সাধুকে।

সাধু বললে, 'আমি আসছি।'

'সে কি, খেয়ে যাবেন না?'

'এই আসছি, এলেই খাব।'

আর এল না সাধু। বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত দিন তার ফেরার প্রতীক্ষায় উপবাস করে রইলেন।

সাধু না জোচ্চোর!

বাসিন্দেরা সাধুর নিন্দা করছে শুনে প্রভু দুঃখিত। বললেন, 'ঐ টাকা কি আমার? আমার তো অযাচক বৃত্তি। যা যেন ঈশ্বর দেন, তাই ও টাকা ঈশ্বরের।'

'তাই বলে ও টাকাও সাধু নেবে কেন?'

'সাধু নিয়েছে কে বলছে? টাকা ঈশ্বরই নিয়েছেন। দিলেও তিনি নিলেও তিনি। পূর্ণ-মুক্ত সমস্ত তিনি।'

একেই বলে অনাসক্তি।

'সেবা বন্দনা আর অধীনতা সহজে দিলবে গোঁসাই।'

দীনহীন বিনীত হওয়া ছাড়া ভগবান লাভের আর দ্বিতীয় পথ নেই। অধীনতা—অধীন থাকবার ভাব, হ্যাঁ, সবাই আমার শিক্ষক সবাই আমার গুরুজন এই অর্থে আমি সবার অধীন। সেবার মধ্যেও এই দাস্য, এই অনুরাগ। দয়ার ভাব না থাকলে সহানুভূতি না থাকলে সেবা হবে কী করে? পতি-সেবা পত্নী-সেবা সন্তান-সেবা, প্রভু-সেবা ভৃত্য-সেবা। সেবায় অভিমান হলেই সর্বনাশ। যাদের সেবা করছি সবাই আমার ঈশ্বর।

বন্দনা—বন্দনা মানে মানুষের বন্দনা, স্থানের বন্দনা, বস্তুর বন্দনা। যে কারো থেকে বা যা কিছুর থেকে সত্য পাওয়া যায়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেই বন্দনা করো। কেননা সেই তোমার ঈশ্বরের বার্তাবহ। কায়িক, বাচিক মানসিক—তিন রকম বন্দনা। নুয়ে করে নমস্কার বা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কায়িক বন্দনা, স্তবস্তুতি বাচিক, আর মনে একটি প্রীতি-উজ্জ্বল পূজার ভাব জাগিয়ে রাখাই মানসিক বন্দনা। আর অধীনতা—অধীনতাই তো আত্মীয় করে তোলে, ব্যবধান দূর করে দেয়।

'আচ্ছা, মানুষের স্বাধীনতা বলে কি কিছু আছে?'

'কিছু আছে। দড়িবাঁধা স্বাধীনতা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

'দড়িবাঁধা।'

'এর চেয়ে ভালো আর কী বলতে পারো! যেন গরুর গলায় দড়ি কে বেঁধে দিয়েছে। দড়ি যতটা লম্বা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ততদূর যাবারই তার স্বাধীনতা আছে—সেই দড়িবাঁধা স্বাধীনতাই মানুষের। দড়ির অতিরিক্ত যাবার তার ক্ষমতা নেই। তাই বলছি মানুষ দড়িবাঁধা গরুর মতই স্বাধীন।'

ভক্ত এসে দারুণ হাহাকার করে পড়ল গোঁসাইজির কাছে। বললে, 'ভিতরের যন্ত্রণা যে আর সহ্য করতে পারছিনে। নাম ধ্যান সাধনভজন সব ছুটে গিয়েছে দিন-রাত জলে-পুড়ে যাচ্ছি। এবার বোধহয় নাস্তিক হলাম।'

প্রভু শান্তস্বরে বললেন, 'না, নাস্তিক হবে না।'

'তবে কী করব?'

'দিন কতক অন্য কোথাও চলে যাও।' বললেন প্রভু 'এখানে লোকের দৃষ্টি তোমাকে শুকিয়ে দিচ্ছে।'

'লোকের দৃষ্টি?' ভক্ত চারদিকে তাকাল।

'লোকের দৃষ্টি বড় বিষম। দেখনি জীবন্ত গাছ পর্যন্ত লোকের দৃষ্টিতে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'তা আমার কী করবে?' ভক্ত বললে, 'আমি তো সর্বসময়ে আপনার স্নেহদৃষ্টিতে সুরক্ষিত।'

'তবে তোমার আর ভয় কী!' প্রভু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'যেখানেই যাও, যদি নরকেও যাও, নিশ্চয় জেনো সেখানেও তোমাকে বুকে করে রাখবার একজন আছেন।'

তবে আর কিসের অন্তর্দহি! কিসের নাস্তিক্য!

'চলো আমার সঙ্গে পুরী চলো।' গোসাইজি ঘোষণা করে উঠলেন। সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কুলদানন্দের মনে ধাক্কা লাগল। পুরী। প্রভুর জননী স্বর্গময়ী দেবী যে বলেছিলেন, পুরী গেলে বিজয় আর ফিরবে না। (ক্রমশঃ)

পরবর্তী সংখ্যার প্রচ্ছদ আকর্ষণ

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় বহুবার কাশ্মীরে গিয়েছেন। কাশ্মীরের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর জানা। শেষ গিয়েছেন গত জুলাইএর শেষে, কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে তথ্যচিত্র তোলার কাজে। সেখানে হানাদারদের সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর মুখোমুখী সাক্ষাৎ···তারপর সারা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখা···পাকিস্তানের হিংস্র বর্বরতার স্বরূপ উদঘাটন···বারমুলার উপর পাকিস্তানের পৈশাচিক ধর্ষণ··· কাশ্মীরীদের বীরত্ব · সেই সঙ্গে প্রাচীন কাশ্মীরের উৎপত্তি ও ইতিহাস··· স্বাধীনতার পর কাশ্মীরের রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির চমকপ্রদ নেপথ্য-কাহিনী ····ইংরাজের শেষ কূটচক্র···এসব ছাড়াও আছে সমস্ত কাহিনী জুড়ে একটি অপরূপ করুণ রোমান্স···দেশের কাজে নিবেদিতপ্রাণ কাশ্মীরের আশ্চর্য মেয়ে রুকায়ার প্রেম আর ভিতিক্ষা, বেদনা আর ট্রাজেডি। অপূর্ব বর্ণাঢ্য ভাষায় লেখক তাঁর বিরল বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই অসামান্য সুবৃহৎ রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি ।।

দিনযামিনী

গোলোকেন্দু ঘোষ

বর্তমানে 'সময়' সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে, দিন এবং রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টায় বিভক্ত এবং প্রতিটি ঘণ্টার ব্যাপ্তি সমান এবং সকালের একঘণ্টার সঙ্গে দুপুর বা রাত্রির একঘণ্টার ব্যাপকতার কোন তারতম্য নেই। এছাড়া যে কিছু হতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু মানুষ একদা অন্য-রকম ভাবত। মনে হয়, সমস্ত আদিসভ্যতায় 'সময়' সম্পর্কে ধারণা ছিল বর্তমান ধারণা থেকে ভিন্নতর।

দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন—এই ছন্দে মানুষ সহজেই সাড়া দিতে পেরেছিল, কিন্তু ঋতুর চক্রবৎ আবর্তনগুলো মানুষের চোখে পড়ল যখন ধীরে ধীরে কৃষির ওপর মানুষ নির্ভরশীল হচ্ছে ও তাদের জীবনযাত্রা অনেকটা উন্নত হচ্ছে। কোন্ কোন্ ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক অবশ্যই তাদের লক্ষ্যে এসে থাকবে। ঐসময়েই হয়ত সময় যে বয়ে যায়, মানুষের মনে সে ধারণা উদিত হয়ে থাকবে। দুপুরবেলা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সময় বয়ে যায় বলে ধারণাটিও হয়ত এসে থাকবে গাছের বা মাটিতে পোঁতা ছড়ির ছায়া-অপসারণ থেকে। পৃথিবীর আদি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের মধ্যে সময় মাপবার এই পোঁতা-ছড়ি যন্ত্রটি অন্যতম। এই অতি সরল সরঞ্জাম থেকে দীর্ঘ পথে সূর্য-ঘড়ির উদ্ভব হয়েছে। সূর্য-ঘড়ি উদ্ভাবনের মধ্যে মানুষ সৃজনী-শক্তির পরিচয় দিল এবং সময়কে যেন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে পারল। সূর্য মাথার ওপর দিয়ে যায়, সূর্যের ছায়াও সরে সরে যায়, দিন যায়, রাত্রি আসে—এ তো সময় বয়ে যাওয়ারই নামান্তর: মানুষের একথাটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

মিশরের সূর্য-ঘড়ি উদ্ভাবকদের একটা ধারণা হল যে, সময় সমান তালে বয় না, কখন তার গতি মন্থর, কখন দ্রুত। কিন্তু মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক হল সাযুজ্য-বিধানের দিকে; তাই মিশরীয়রা সূর্য-ঘড়ির ঘরগুলোকে সমানভাবে ভাগ করল। কিন্তু সূর্য তো ঘুরছে বৃত্তাকারে, তাই তার ছায়া-অপসারণের ব্যবধান অসমান হতে বাধ্য অর্থাৎ সমভাগে বিভক্ত সূর্য-ঘড়ির ঘরগুলো সম-সময়ে অতিক্রান্ত হতে পারে না, কোন ঘর অতিক্রম করতে নেবে কম সময়, কোন ঘর নেবে বেশী সময়।

কাজেই অসম মাপের 'ঘণ্টা'-র ধারণা প্রচলিত হল। এতে দোষ খোঁজার কিছু নেই, কারণ সভ্যতা বিকাশের অনেক পরে সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

মিশরীয়দের মনে অসম-ঘণ্টার ধারণা কত দৃঢ়বদ্ধ হয় তার নজির আছে জল-ঘড়ি তৈরির ক্ষেত্রে। জলে প্রবাহ সুসম। কাজেই জল-ঘড়ির ঘণ্টাগুলি সমভাগে বিভক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সুসম জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে অসম-ঘণ্টা নির্দেশ করা যায় তাই নিয়ে মিশরীয়দের চেষ্টার বিরাম ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে তারা অবিরাম এই চেষ্টা চালিয়ে গেছে। দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এক লিপি থেকে জানা যায় যে, রাজপুত্র আমেনহেটকে সময়-সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অবশেষে একটি নিখুঁত জল-ঘড়ি উদ্ভাবনের জন্যে অশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। এই ঘড়ির একটা আনুষাঙ্গিক ছক উদ্ধার করা গেছে পরবর্তীকালের গ্রীসীয় জল-ঘড়ি থেকে। প্রয়োগবিদ্যার জন্যে গ্রীসীয়রা চিরকালই মিশরীয়দের কাছে অশেষ ঋণী। ছবিতে বাঁদিকে যে তালুক্‌টি দেখা যাচ্ছে তা জলকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে; ঘূর্ণমান ড্রামের দাগগুলি ঘণ্টাগুলির অসম নির্দেশক। পাত্রে জল পড়লে মূর্তিটি ভেসে উঠে সময় নির্দেশ করত। বিভিন্ন ঋতুতে ঘণ্টার মাপেও পরিবর্তন হত।

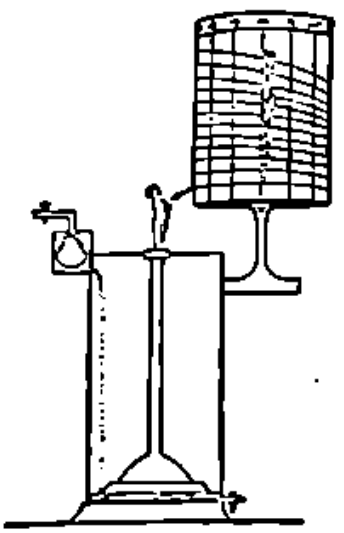

সেই প্রাচীনযুগের দুনিয়ার চিন্তানায়ক ছিল মিশরীয়রা, কাজেই সময়-সম্পর্কে তাদের ধারণাই ছিল অন্যের পক্ষে অনুকরণীয়। এথেন্সবাসীরা তাদের আবহাওয়া-নির্দেশক সম্বন্ধের জন্যে গর্ব করত; তাতে আটটা সূর্য-ঘড়ি ছিল, সেগুলি বহু দূর থেকে দেখা যেত; কিন্তু তারা যে ঘণ্টায় নির্দেশ দিত তা ছিল অসম। গ্রীসীয়দের চরিত্রে অভিনবত্ব একটি পরম প্রশংসনীয় গুণগনা। তাই ঘণ্টা-সম্পর্কে তাদের ধারণা অসম থাকলেও সময়কে তারা বহু সমান সমান টুকরোয় ভাগ করেছিল। ব্যাপারটি আপাতবিরোধী বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে, সে একই সময়ে দুটো বিপরীত ধারণাও পোষণ করে থাকতে পারে—ব্যাবিলোনীয় ও চীনারা অসম-ঘণ্টার ধারণা অনুযায়ী সূর্য-ঘড়ির সঙ্গে জল-ঘড়িকে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে নি। তাদের জল-ঘড়ির জলের প্রবাহ সমানই ছিল এবং ঘণ্টার ব্যাপ্তিও সমান ছিল। একই কালে তাদের ঘণ্টা ছিল দু-রকমের; একটিতে ঘণ্টার ব্যাপ্তি অসম, আর একটিতে সম। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে যীশুইট কাদার রিসি যখন চীনে পেণ্ডুলাম-ঘড়ির প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি কিছু পেণ্ডুলাম-ঘড়ি করেন অসম-ঘণ্টা নির্দেশক, কিছু সম-ঘণ্টা নির্দেশক।

'সময়' সম্পর্কে সঠিক ধারণা বিজ্ঞান-চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ এবং মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি সুসম্বদ্ধ। সভ্যতার উষাকালে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল মন্থরগতি এবং নানা ধর্মীয় আচরণের দ্বারা অনুশাসিত। হিন্দু গ্রীক মিশরীয় চীন ব্যাবিলন হিব্রু পারশিক রোমীয় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায় ধর্মীয় অনুশাসন ছিল মূল অঙ্গ। পূজাপার্বণ যাগযজ্ঞ সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত করার জন্যে সময়কে তাঁদের চিহ্নিত করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি থেকে এবং

সূর্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিচক্রের অতিক্রমণ থেকে তাঁদের বৎসর, মাস, সপ্তাহ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়েছিল এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান নির্দেশক পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়েছিল।*

দিনের আরম্ভ বৈদিক যুগে সূর্যোদয় হতে ধরা হত। পরবর্তীকালে আর্যভট্ট (পঞ্চম শতাব্দী) ধরলেন লঙ্কায় সূর্যোদয় হতে, বরাহমিহির (ষষ্ঠ শতাব্দী) ধরলেন মধ্যরাত্র থেকে। মোট চার রকমের দিন আরম্ভের উল্লেখ দেখা যায়; সূর্যোদয়, মধ্যদিন, সূর্যাস্ত এবং মধ্যরাত্র। কিন্তু সূর্যোদয় হতে দিন-আরম্ভই হিন্দুদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল। দিনকে কখন চার ভাগে প্রাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ বা কখন পাঁচভাগে উষা, সঙ্গব (দুধ দুইতে নিয়ে যাবার সময়), মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ এই পাঁচভাগে ভাগ করা হল। পরে দিনকে ১৫ মুহূর্তে এবং রাত্রকেও ১৫ মুহূর্তে ভাগ করা হল। মুহূর্তকে আবার ১৫ প্রতিমুহূর্তে ভাগ করা হল। মহাভারতে দিনরাত্রিকে লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। আরো অল্প বিভাগের উল্লেখ আছে যথা, নাড়িকা (২ নাড়িকা=১ মুহূর্ত), পল, মাষ, ত্রোণ, আঢ়ক প্রভৃতি। অথর্ববেদে এইভাবে কাল বিভাগ করা হয়েছে—দিনরাত্রি=৩০ মুহূর্ত; ১ মুহূর্ত=১৫ প্রতিমুহূর্ত বা ৩০ ত্রুটি; ১ ত্রুটি=৩০ কলা; ১ কলা=৩০ লব; ১ লব=১২ নিমেষ।

ইউরোপের মধ্যযুগেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা দিনকে সাতভাগে ভাগ করেছিল ১। ম্যাটুটিনা—ব্রাহ্মমুহূর্ত, শয্যাত্যাগের সময়। ২। প্রাইমা—সূর্যোদয়। ৩। টার্সিয়া—সূর্যোদয় থেকে মধ্যাহ্ণ ৪। সেকস্টা—মধ্যাহ্ণ। ৫। নোনা—মধ্য অপরাহ্ণ। ভেসপেরি—সূর্যাস্তের পূর্ববর্তী এক ঘণ্টা সময়। ৭। কমপ্লিটা—সূর্যাস্ত। গীর্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা এই সময়বিভাগগুলি ঘোষণা করা হত এবং ঋতু পরিবর্তনে স্বভাবতই সময়ের তারতম্য হত।

আমরা যে বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে, ঘণ্টাকে ৬০ মিনিটে মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করে সময় নিরূপণ করে থাকি, এর উদ্ভাবন করেন সুমেরিয়ানরা এবং মেসোপটেমিয়ার তাদের বংশোদ্ভবেরা। প্রাচীন সমস্ত সভ্যতাই কাল-নির্ণয়ের জন্যে দিনরাত্রিকে অর্থাৎ এক সৌরদিবসকে একটি একক ধরেছিলেন এবং দিনকে বার ঘণ্টায় এবং রাত্রিকে বার ঘণ্টায় ধরেছিলেন। সম্ভবত ব্যবিলনীয়রা এই সংখ্যা প্রথম ব্যবহার করেন।

চীনারা দিনরাত্রিকে অর্থাৎ এক সৌরদিনকে বারভাগে ভাগ করেছিলেন। ঘণ্টাকে তাঁরা শি (Shi) বলেন এবং একঘণ্টা বর্তমান ১২০ মিনিটের সমান। এক 'শি'-কে ৮ ভাগে ভাগ করেন, প্রতি ভাগের নাম 'খে' (khe) অর্থাৎ এক খে ১৫ মিনিটের সমান। আবার এক খে ১৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগের নাম ফেন (fen)—অর্থাৎ এক ফেন ১ মিনিটের সমান। আবার এক ফেন ৬০ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগের নাম মিয়াও (miao), অর্থাৎ এক মিয়াও ১ সেকেণ্ডের সমান। বর্তমানে অবশ্য চীনারা সর্বস্বীকৃত ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের প্রচলন অনুযায়ী সময় গণনা করে থাকেন।

কেলডীয়ানরাও দিনকে ও রাত্তকে মোট বারভাগে ভাগ করেছিলেন, দিনে সূর্য-ঘড়ি ও রাত্রিতে জল-ঘড়ি ব্যবহার করতেন।

মিশরীয়রা কিন্তু পরবর্তীকালে দিনরাত্রিকে অর্থাৎ এক সৌরদিনকে বার ঘণ্টায় ভাগ করেন। দিনের আরম্ভ হত সূর্যাস্ত থেকে, কিন্তু মধ্যরাত্র থেকে দিনের আরম্ভ হত বলে ঐতিহাসিক প্রিনি লিপিবদ্ধ

---

* সে-সব বিবরণ স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা একদিনের সময় গণনার মধ্যে এই আলোচনা সীমিত রাখব।

করে দেছেন। আরও পরবর্তীকালে দিনের আরম্ভ হত মধ্যদিন হতে এবং এক সৌরদিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করা হত।

বার চল্লিশের প্রভাবের আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। হিন্দু গণনায় এক নাড়িকা ২৪ মিনিটের সমান। হিন্দুদের জল-ঘড়িতে একটি জলপাত্রে ধাতুর তৈরী একটা বাটি ভাসিয়ে দেওয়া হত। পাত্রে যে জল রাখা হত তা তলার একটা ফুটা দিয়ে এক নাড়িকা সময়ের মধ্যে নিষ্কাষিত হত।

ব্যাবিলনীয়রা সর্বপ্রথম দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেন। তাঁদের ৭ জন দেবতা ৭টি গ্রহের অধিপতি। ১। নিনিব (সপ্তক), শনি ২। মার্দুক (রাজা), বৃহস্পতি ৩। নের্গাল (যুদ্ধ), মঙ্গল ৪। শামাশ (ন্যায়), রবি * ৫। ইশতার (প্রেম), শুক্র ৬। নাবু (লেখন), বুধ ৭। সিন (কবি), চন্দ্র *। দেবতারা প্রতি ঘণ্টার ওপর পালা করে নজর রাখতেন। একটি নতুন দিন আরম্ভ হবার সময়ে প্রথম ঘণ্টায় যে দেবতার পাহারা দেবার কথা, নাম হত সেই গ্রহাধিপতির নামে। যদি ধরা যায় শনিবারের প্রথম ঘণ্টার দায়িত্ব নিনিব দেবতার, দ্বিতীয় ঘণ্টার দায়িত্ব মার্দুকের, এইভাবে ২৪তম ঘণ্টার দায়িত্ব হবে নের্গাল দেবতার। তাহলে পরের দিন প্রথম ঘণ্টার দায়িত্ব পড়বে শামাশ দেবতার, তিনি হলেন রবির অধিপতি। কাজেই পরের দিনের নাম হল রবিবার। এইভাবে হিসাব করলে পরপর নামগুলি পাওয়া যাবে।

একথাটা লক্ষ্য করার মত যে প্রাচীন সভ্যতাগুলি প্রায় সকলেই বহুপূর্বে এক সৌরদিনকে সমভাগে বিভক্ত করে সূর্য-ঘড়ি জল-ঘড়ির সাহায্যে দিনের ঘণ্টাগুলির হিসাব রাখতেন এবং সময় সংকেত করতে পারতেন। সুমেরিয়ানরা ইতিপূর্বে বৃত্তকে ডিগ্রী, ঘণ্টাকে মিনিটে এবং মিনিটকে সেকেণ্ডে ভাগ করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জল-ঘড়ির পরে যান্ত্রিক-ঘড়ির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে যোগে তার প্রচলন ছিল। প্রবর্তন করেন বোথিয়াস (Boethius 480-525 AD) এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায় এর ব্যবহার স্বীকার করে নেন ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর বর্তমানে প্রচলিত ক্লকঘড়ি (পেণ্ডুলাম সংযুক্ত হবার আগের অবস্থা) ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে। সম্ভবত ১২৭৫ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এধরণের ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। অনুমান ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মিলিত ও ডোভারের রাজপ্রাসাদে ব্যবহৃত ঘড়িটি আজো লণ্ডনের বিখ্যাত সায়েন্স মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। সমসময়ে মিলিত অন্তঃ: কুড়িটি ঘড়ির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সম্রাট পঞ্চম চার্লস ১৩৬৪ সনে ডিক নামে এক জার্মান ঘড়ি নির্মাতাকে প্যারীর রাজপ্রাসাদের জন্যে একটি ঘড়ি তৈরি করতে দেন। ১৩৭০ সনে কাজ শেষ হয়, এই ঘড়িতে ব্যবহৃত তার-এর ওজন ছিল ৪ হন্দর।

আধুনিক পেণ্ডুলাম-ঘড়ির প্রথম তাত্ত্বিক বিবরণ দেবেন ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হিউগেন্স একটি ছোট্ট পুস্তিকায় ' The clock'। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৬৫৮ সনে। এই সূত্র ধরে পেণ্ডুলাম-ঘড়ি উদ্ভব হল। পকেট ঘড়ি, হাত ঘড়ি, আংটি ঘড়ি, ক্রনোমিটার ঘড়ি, কত ঘড়ির প্রচলন হল। ক্রমে ঘণ্টা নির্দেশক ঘড়ি হয়ে উঠল বর্তমান সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ।

আজ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই একথাটা বলতে হয় যে, ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড নির্দেশক ঘড়ি এমন অখণ্ড প্রভাবে আমাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে যে, এখন আমরা বলি Time is money ; আমরা একথাটা ভুলে বসে আছি যে Time is life এবং life ও money সমার্থক নয়।

---

* রবি ও চন্দ্র গ্রহ নয়, কিন্তু প্রাচীনকালে এ দু'টিকে গ্রহ বলে ধরা হত।

শেষের সুখই সুখ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আর কী! এবার ওঠো।' ছুটি ওরফে ছুইকি ঝিলিপত্র গুটোতে লাগল: 'লাস্ট ম্যান ইন।'

আমি বুঝি শুধু কিছু গড়িমসি করছিলাম।

'চলো। মাঠ থেকে বেরুবার আগেই শুনতে পাবে পড়ে গেছে।' ছুটি আবার তাড়া দিল: 'সবাই উঠে পড়ছে। দেখতে-দেখতে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। বেরুতে আবার পরিশ্রম।'

'সুতরাং বলে যাও।' গম্ভীর মুখে বললাম, 'সবই শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত কী হয় কেউ বলতে পারে না।'

'খুব পারে। শেষ পর্যন্ত আউট হয়।' চোখে দাঁতে একসঙ্গে ঝিলিক মারল ছুটকুন।

'তবে কখন হয়? কতক্ষণে হয়?'

'এক্ষুনি হয়ে যাবে। তোমার ঐ এগারো নম্বরের লোকটা জীবনে কখনো রান করেছে?'

'বলা যায় না, হয়তো আজ করবে। অসম্ভবও যদি কোথাও ঘটতে পারে, তা এই ক্রিকেটে।' বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম: 'এই দেখ ওভারের মাঝখান থেকে দশ নম্বর কেমন ক্রস করে চলে এল। ব্যাটের খেলাই যে সব সময়ে দেখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কখনো-কখনো বুদ্ধির খেলাও দেখতে হয়।'

'তোমার যে কী বুদ্ধি!' ছুটি রাগ করেই পাশে বসে পড়ল।

'বরং গুনগুনিয়ে একটা গান ধরো।'

'গান ধরব?' ঘাড় কাত করে পাশে হাত রাখল ছুটি: 'এই সময়ে গান?'

'শেষ বেলাকার শেষের গানই তো এখন গাওয়া উচিত। কিংবা সেই গানটা:—শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও বলে—' কের উৎসাহিত হয়ে উঠলাম: 'দেখ দেখ এগারো নম্বর কেমন বল ঠেকাচ্ছে—ও মা, দেখ খুঁচ করে কেমন একটা রানও করে বসল।'

দেখি কতক্ষণ টেঁকে—এমনি এক মুনিমুলভ জ্রূক্ষেপ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল ছুটি। দেখি কতক্ষণ জলের তিলক কপালে থাকে। কতক্ষণ!

'অন্য সময়ে যা ভাল ক্রিকেট, শেষ সময়ে তাই দারুণ থ্রিলিং। ক্ষুধার্ত বাঘের মত দাঁতে-দাঁতটা কিড়মড়ান ব্যাটের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, মস্ত প্রতিজনের মত বল, তার মধ্যে গুটিকে থাকাটাই কী প্রচণ্ড রোমাঞ্চ। বল যে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দিচ্ছে তাই কত বড় কৃতিত্ব আর যদি আজে মাটি

খেলে ঠুকে দিতে পারছে তা হলে সে তো ঝকার। এক প্রসঙ্গে যে-রীতি অসহনীয় অন্য প্রসঙ্গে তাই আবার বলিহারি।'

চার-চারটে ওভার হয়ে গেল তবু দশে-এগারোতে বিচ্ছেদ ঘটানো গেল না।

'এ কী আউট হয় না যে।' ছুটি ছটফট করে উঠল।

'সেই জন্যেই তো বলছি গান ধরো। অন্তত এখন সেই গানটা—রামের বারো হল সারা, বাজে বিদায় সুর। ব্যাটের পালা শেষ করে যে, শেষ করে যে যে, যাবি অনেক দূর।'

'এরা যে দেখছি জমে গেল।' হতাশের মত মুখ করল ছুটকি।

'বলা যায় না কী হয়। লাস্ট উইকেটে উলি আর ফিল্ডার-এর মত ২৩৪ না করে বসে।'

'উঃ, রেকর্ড, কেবল রেকর্ড। আর শুনতে পারি না।' কানে আঙুল দিল ছুটি।

'লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপের রেকর্ড অবশ্যি ৩০৭—'

'বলো কী?' শুনবে না বলেও না শুনে পারল না ছুটকুন: 'তিন শো সাত? কবে, কোথায়, কার কার মধ্যে?'

'১৯২৮-২৯ এ, ফিল্যাক্স আর ওকারের মধ্যে, মেলবোর্নে। আচ্ছা বলো তো টেস্ট ম্যাচে রেকর্ড পার্টনারশিপ কত—যে কোনো উইকেটে, যে কোনো ইনিংসে, যে কোনো দেশে—মনে থাকে যেন, টেস্ট ম্যাচে—'

'জানিনা।' ছুটি লেপা উনুনের মত মুখ করলে।

'টেস্ট ম্যাচে রেকর্ড পার্টনারশিপ হচ্ছে ৪৭১—দুটি ব্র্যাডম্যান আর পন্‌সফোর্ড, সেকেণ্ড উইকেটে, ওভ্যালে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৪এ—'

'কোন মাসে বললে না?' ছুটি প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

'অগাস্ট মাসে। অগাস্ট মাসই তো মাস, সমস্ত ইতিহাসে উজ্জ্বলতম মাস।'

'এবার মাস নিয়ে পড়বে নাকি?'

'পড়তেই হবে। মাসের কথা তুলবে কেন? অগাস্ট মাসেই আমাদের স্বাধীনতার জন্ম। অরবিন্দের জন্ম। নেপোলিয়নের জন্ম।'

'শুধু জন্ম? মৃত্যু নেই?'

'আছে। অগাস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ট্রটস্কির মৃত্যু।'

'শুধু এই?'

'অগাস্ট মাসে আবার ধ্বংসলীলা। ১৯৪৫-এর ৬ই অগাস্ট হিরোসিমার উপর এটম বোম ফেলা হল তার তিন দিন পর ফেলা হল নাগাসাকির উপর। ঐ অগাস্টেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। আবার যদি কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হয় দেখবে ঐ অগাস্ট মাসেই।'

'হচ্ছিল লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপের কথা,' ছুটকি তাড়া দিল: 'এ যে দেখছি ছাই খুঁড়তে আগুন বেরুচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এই লাস্ট ম্যান এর কথাই হোক। অভাবনীয় এই লাস্ট ম্যান। যেমন যে রামের রাজা হবার কথা সে বনবাসে যায়, তেমনি যে রাখাল বনে বেণু চরিয়ে বেড়ায় সে মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাজা হয়ে বসে।

'সাইব'র জন্যে জোকিল পুড়িয়ে খায় শুনেছি,' ছুটি টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'তুমি কেন বেকন পুড়িয়ে খাচ্ছ ?'

'খেলবার জন্যে।' সান্ত্বনে হ'লদার : 'আমিও তো খেলছি, খেলতে নেমেছি।'

'খেলতে নেমেছ ! কোথায় ?'

'তোমার জীবনে। তোমার জীবনে আমিই তো লাস্ট মান ইন।'

'দেখ দেখ, এদের নম্বরটা আবার একটা রান করল।' কথাটাকে সুন্দর করবার ছাইচ করলে ছুটি। বিরক্তি-রাঙা মুখে বললে, 'কী সর্বনাশ, লোকটা আউট হবে না নাকি ?'

'না কি ছ'শোপাঁচারের ওয়াশেল-এর মত দু'ঘণ্টায় ৯ করবে। ঐ ৯ রানের জন্যে ওয়ার-উইকশায়ারের বিরুদ্ধে হার থেকে রক্ষা পেল। তখন কে বলবে ঐ দু ঘণ্টায় ৯ রানটা ডাল্ ক্রিকেট !'

'কি আশ্চর্য, দশ নম্বরও যে পেটাচ্ছে !'

'এরা ১৯৬৩-এ সাসের বিরুদ্ধে সারডাতে আর স্যুট ব্যাটিং না হয়ে ওঠে !'

'দেখ দেখ রান আউট হতে যাচ্ছিল—'

'হয়নি, হয়নি'—সমস্ত মাঠ উল্লাস করে উঠল।

'এক চুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছে।' উল্লাসে ছুটিও যোগ দিল : 'আউট হবি তো রান-আউট কেন ?'

তার মানে ছুটিরও ভালো লাগছে।

'জানো, ১৯৬০ এর ত্রিশদের টেস্টে তিন-তিনটে রান আউট হয়ে গেল। আশি করে ডেভিডসন বিদায় নিল—সোয়া তিন ঘণ্টায় আশি রান। একটা শর্ট রান নিতে গিয়েই এই বিপদ। সাপের উপর যেমন বেজি লাফিয়ে পড়ে তেমনি ছুটন্ত বলের উপর লাফিয়ে পড়ল লোলোমন। বলটা তুলে নিয়েই এমন তাক করে ছুঁড়ল যে স্টাম্প ছিটকে পড়ল। সাত রান দূরে, আউট হয়ে গেল ডেভিডসন। সাত উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার তখন ২২৬। বেনোর সঙ্গে খেলতে এল গ্রাউট। আর সাতটা রান করতে পারলেই অষ্ট্রেলিয়া জিতে যায়। খেলার বাকি আর ছ'মিনিট। অর্থাৎ ছ'মিনিটে সাত রান।'

'গ্রাউটও রান আউট হয়ে গেল তো ?' ছুটি অসহিষ্ণুর মত বললে।

'তার আগে বেনো আউট হয়ে গেল, ফট আলেকজাণ্ডার, বউলড হল্। ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল শোনো। গ্রাউট যখন এল তখন সোবার্স বল দিচ্ছে। সোবার্সের সপ্তম বলে একটা রান করলে গ্রাউট। বেনোর ইচ্ছে ওভারের শেষ বলে সেও একটা সিঙ্গল নেয়, নিয়ে ওপারে গিয়ে হল-এর মুখোমুখি হয়। গ্রাউটকে হল-এর নিশ্চিত গ্রাস থেকে বাঁচায়। কিন্তু সোবার্সও ধুরন্ধর, শেষ বলে কিছুতেই বেনোকে সিঙ্গল করতে দিল না। অগত্যা ওপারে গ্রাউটকেই হল-এর সম্মুখীন হতে হল।'

'আর গ্রাউট এক বলেই আউট ?'

সেই শেষ ওভার। আট বলে ওভার। অষ্ট্রেলিয়া আর ছ'রান করলে জেতে। আট বল ছয় রান। হাতে আছে তিন উইকেট।

'আর ঘড়িতে ক মিনিট ?'

'চার মিনিট। অতিরিক্ত সময়ের প্রশ্ন তখন অবান্তর। যেহেতু ওভার যখন আরেকটা হবে, তখন সেটাকে সম্পূর্ণ করতেই হবে যদি না ইতিমধ্যে ফেয়ারনেস হয়ে যায়।'

'তারপর ?'

'ভাবো অবস্থাটা—আট বল, ছ'রান, তিন উইকেট। হল্-এর প্রথম বলটাই ঝুর্দান্ত বেগে গ্রাউটের কোমরে এসে লাগল। প্রচণ্ড ব্যথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল গ্রাউট, দেখল রানের জন্যে বেনো এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রাউট ব্যথা ভুলে পড়ি-মরি করে ছুটল, পৌঁছে গেল ওপ্রান্তে। ফাঁকতালে আরেকটা রান হয়ে গেল। হকচকিয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভাবতেও পারেনি এমন কৌশলে বেনো একটা রান চুরি করে নেবে।'

'তা হলে তখন সাত বল, পাঁচ রান, তিন উইকেট।'

'হ্যাঁ, বেনোর অহঙ্কার হয়েছিল হল-এর যোগ্য প্রত্যুত্তর সে নিজে, গ্রাউট নয়। কিন্তু মহাকাল হাসল। মহাকালের মতই বাউন্সার ছুঁড়ল হল্। কী প্রলোভনে ব্যাট তুলল বেনো, বলের স্পর্শ এড়াতে পারল না, ধরে ফেলল আলেকজাণ্ডার। বেনো ফিরে চলল। এল মেকিফ—ছ বল পাঁচ রান, দুই উইকেট।'

'মেকিফের তখন কী দশা! সামনে প্রচণ্ড কালানল হল্, তার বুকের ভিতরটা কী রকম করছিল কাজানি।' ছুটি হালকা মনে হাসল: 'টুয়ানকে তো শুনেছি হল-এর বলের আগে জিভে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে নেয়।'

'হ্যাঁ, তেমন প্রার্থনার ছবি একটা দেখেছি বটে, কিন্তু মেকিফ যা করল তা ভাবনার অতীত। ব্যাটের ঠিক মাঝখান দিয়ে হল-এর প্রথম বল ঠেকাল। দ্বিতীয় বলটা উইকেটের বাইরে বেরিয়ে যেতেই গ্রাউট ছুটল রান করতে। গ্রাউটকে আসতে দেখে মেকিফও ছুটল পাগলের মত। আলেকজাণ্ডার বল কুড়িয়ে মারল হল-এর দিকে। হল বল কুড়িয়ে মারল ষ্টাম্পের দিকে, লাগল না। তালগোলে একটা রান হয়ে গেল।'

'তা হলে তখন চার বল, চার রান দুই উইকেট।' ছুটি হাসল: 'এখনো তাহলে লাস্ট ম্যান আসেনি।'

'হল-এর পঞ্চম বলটা চোখ বুজে হাঁকড়াল গ্রাউট। একটা বাউণ্ডারি করবার ইচ্ছে কিন্তু লেগের দিকে ক্যাচ উঠে গেল। কানহাই বলের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ সিংহবিক্রান্ত হল তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কানহাই ক্যাচ ধরা হল না। এই ফাঁকে গ্রাউটের একটা রান হয়ে গেল।'

'তা হলে তিন বল, তিন রান, দুই উইকেট।'

'পরের বলে থাক-থাক করে মেকিফ মারলে এক চারের মার। সবাই ভাবলে বাউণ্ডারি হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু না, বাঁচিয়ে দিলে। দু'রান শেষ করে তৃতীয় রান নিচ্ছে, সীমানার প্রায় রেখার উপর থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে উইকেট-কিপার আলেকজাণ্ডারের হাতে ছুঁড়ে মারল হাল্ট। গ্রাউট মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েও রান-আউট বাঁচাতে পারল না। তৃতীয় রানটা নিতে পারলেই জিতে গিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়া। কিন্তু তা হবার নয়।'

'তারপরে এল কে ?'

'এল ক্রাইন। এই লাস্টম্যান ইন। ভাবো একবার অবস্থাটা। ছটো বলে একটা রান। কী সে রুদ্ধ নিশ্বাস প্রতীক্ষা। একদিকে হল, মূর্তিমান দুর্নিমিত্ত, অন্যদিকে ক্রাইন—জানেনা কোনটা

তার হাত কোনটা তার পা কোনটা ব্যাট। 'তবু, জানো, বল-এর সঙ্গে বলটা ঠাইন মেরে দিয়েই ছুটল রানের জন্যে। মেকিকও প্রস্তুত, সেও বেরিয়ে এল বুলেটের মত। ব'ছিত বলটা ধরে গেল বোধহয়। কিন্তু ওদের অন্তরালে আরো একজন ছুটেছে, সে লোলোমন, আর ছুটেই বলটা ধরে সরাসরি মেরে দিয়েছে স্টাম্পে। আশ্চর্য, অসম্ভবেরও অসম্ভব, স্টাম্প ছিটকে গেল, রান-আউট মেকিক। কী নিদারুণ আশা নিরাশার খেলা, উত্তাপের কী উত্থান-পতন, আর কী অভাবনীয় সমাপ্তি রানে-রানে সমান সমান।'

'কিন্তু আমাদের এদের কী গতি হবে?' ছুটি তাকাল মাঠের দিকে: 'এরা যে মরছেও না, সরেও না।'

'এরা শুধু সময় কাটায়। কখনো-কখনো চুপচাপ সময়কাটানোও ক্রিকেট। যেমন আমরা কাটাচ্ছি।'

'তারমানে আমরাও ক্রিকেট খেলছি।' শেষ-শেষ আকাশের বাকি রোদের সমস্তটুকুই যেন ঝলসে উঠল ছুটির চোখে।

'জীবনই তো ক্রিকেট—ক্রিকেট-না খেলে উপায় কী! কিন্তু ১৯৬১-র কোর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপ ১০৯ মিনিট ধরে টিকল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে জিততে দেওয়া হবে না কিছুতেই, অন্তত ড্র করতে হবে এই সংকল্প নিয়েই খেলছে অস্ট্রেলিয়া। সেবারও লাস্ট ম্যান স্ট্রাইক, খেলতে এল ম্যাকের সঙ্গে। গ্রেগ বলেন, পাথুরে-দেয়াল ব্যাটিং করে বলে ম্যাকের বদনাম, কিন্তু সেদিন সে দেখিয়ে দিল বিকারহীন নিশ্ছিদ্র খেলার মধ্যেও কত সৌন্দর্য। ছ'টা বাজতে এক মিনিট বাকি, ক্যাপটেন ওয়েল শেষ ওভার বল দিতে হলকে ডাকলে। যেমন ম্যাকের আরেক নাম 'গ্র্যাম্পার' তেমনি হল-এর আরেক নাম 'ক্ল'। হল কী করবে যদি ম্যাকে ব্যাট দিয়ে বলে না ঠোকের মারে? তাই হল, পাথুরে-দেয়াল ম্যাকে এতটুকুও প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত হল না, প্রয়োজনমত বল ছেড়ে দিতে লাগল। ফিল্ডের মত হয়ে গেল হল, শেষ বল, অষ্টম বল নো-বল করে দিল। নো-বলের ডাকটা বুঝি কেউ স্পষ্ট করে শোনেনি, বোধহয় ম্যাকেও না, ক্ল ভেবে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ল সকলে। না, আরো এক বল আছে, আর সেই শেষ বল।'

'কী হল? আউট হয়ে গেল ম্যাকে?'

'শোনোই না কী হল। শেষের সে দিনের মতই ভয়ঙ্কর বল। গা-সই দুর্দান্ত বল, হয় ব্যাট দিয়ে ঠেকাও নয়তো বুক পেতে গ্রহণ করো। ম্যাকে জানে ব্যাট দিয়ে ঠেকাতে গেলেই নির্ঘাৎ ক্যাচ উঠবে, যা ধরবার জন্যে সাত-সাতটা লোক ধারা দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই সে সে-বল শান্ত মনে নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবে বুক দিয়ে গ্রহণ করলে। বুকের কখানা পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কে খবর রাখে, ম্যাকে আউট হয়নি, ব্যাট শুদ্ধ হাত মাথার উপর তুলে ধরে তার দেশকে, অস্ট্রেলিয়াকে মাথার উপর তুলে দিয়েছে। দেশের জন্যে মার খেতে দিয়েছে বুক পেতে। কত বড় সুখ বলো তো।'

'এও একটা রেকর্ড।'

'নিশ্চয়। রেকর্ড যেমন রানে তেমনি আবার শূন্যে।'

'শূন্যে?'

'হ্যাঁ, এইখানে ক্রিকেট জীবনের চেয়ে বড়। জীবনে যে শূন্য যে ব্যর্থতার নামও লেখা

থাকে না, কিন্তু ক্রিকেটে যে শূন্য ও ব্যর্থ তার নামও লেখা থাকে। টেস্ট ম্যাচে সব সবচেয়ে বেশি শূন্য করেছে কে? ইংল্যাণ্ডের ইডাল ৯ টা ম্যাচে ১১ টা শূন্য। কে কে 'গোল্ডার' করেছে জানো? 'গোল্ডার' মানে তো?'

'মানে—সাহেব-বিবি নিশ্চয়ই নয়।' ছুটি হেসে ফেলল।

'না, দু'ইনিংসেই শূন্য করাকে গোল্ডার বলে। এমন ভাগ্যবানও আছে যারা প্রথম টেস্টেই গোল্ডার করেছে। ইংল্যাণ্ডের ডি. এফ. গ্রেস, ভারতের রামচাঁদ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভালেন্টাইন, নিউজিল্যাণ্ডের বাচকব, সাউথ আফ্রিকার ফেল্ড, সুইস, মাকরাদি। টেস্ট ম্যাচে ক্যাপটেন হয়ে গোল্ডার করেছে অষ্ট্রেলিয়ার ডার্লিং আর বেনো, আমাদের হাজারে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়েল আর পাকিস্তানের ইমতিয়াজ।'

'কিন্তু আমাদের—আমার-তোমার আর কত?' ছুটির কণ্ঠে বা একটু ব্যাকুলতার সুর।

'আমাদের গোল্ডার হবে না—'

'হবে না মানে?'

'মানে দু ইনিংসেই আমরা শূন্য করব না।'

'দু ইনিংস!'

'হাঁ, ভালোবাসা প্রথম ইনিংস—দ্বিতীয় ইনিংস সংসার। প্রথম ইনিংসে আমাদের কিছু রান হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।'

'তা কেন বলছ?' ছুটি এবার তার চোখের কাজলকে গভীর করে তুলল। বললে, 'দেখলে না আমাদের খেয়াটি কেমন টিকে রইল শেষ পর্যন্ত। ওরা তো সুখী হলই, সকলে সুখী হল। শেষের সুখই সুখ।'

'শেষ আরো বেশি। ওরা একদিন আউট হবে। কিন্তু আমরা?'

'কী আমরা?'

'আমরা কোনোদিন আউট হব না। আমরা ছুটি পাব।'

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

"পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্রীর রোমাঞ্চকর জীবনরহস্য" সারাবার্নাড ছিলেন না শুধু একজন অভিনেত্রী। দৃপ্ততেজা নারীত্বের তিনি ছিলেন অপরাজেয়া প্রতিনিধি। আর ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসম-সাহসিকা রণরঙ্গিনী। চমকের পর চমক তাঁর জীবনের প্রতি অধ্যায়ে।

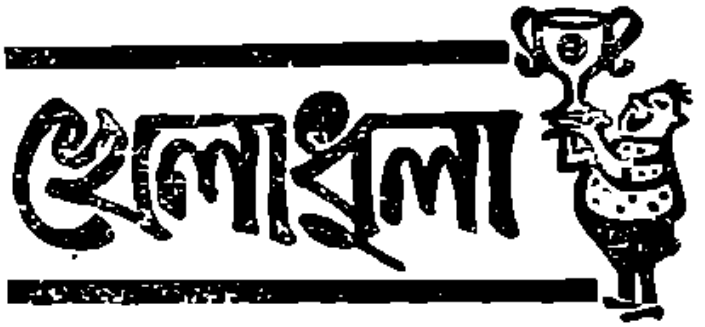

আজকের সোভিয়েত ফুটবল

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমতম খেলা হল ফুটবল। বাড়ির আঙিনায়, স্কুলে আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, কারখানায় আর যৌথখামারে সবত্র ফুটবল খেলা হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ছুড়ে ১৭ লক্ষেরও বেশি লোক ফুটবল খেলে থাকেন। পেশাদার অথবা স্বেচ্ছামূলক শিক্ষাদাতাদের (কোচ) অধীনে এঁরা দল গঠন করে নিয়মিতভাবে খেলেন। এঁদের জন্যে রয়েছে ৩০ হাজারেরও বেশি খেলার মাঠ আর দেড় হাজারেরও বেশি ষ্টেডিয়ম, কিয়েভের কেন্দ্রীয় ষ্টেডিয়ম আরৎবিলিসি, বাকু, তাশখন্দ প্রভৃতি শহরের বিরাট বিরাট ষ্টেডিয়ম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

খুব ব্যাপকভাবে সমস্ত জনগণের যোগদানই হল সোভিয়েত দেশে ফুটবল খেলার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন, রুশ ফেডারেশনে পাঁচ লক্ষেরও বেশি তরুণ এবং উক্রাইনে চার লক্ষেরও বেশি ফুটবল খেলে থাকেন। ট্রান্সককেশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে ফুটবল খেলার মান বেশ উন্নত এবং মধ্য-এশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিতে এর জনপ্রিয়তা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। এই জনপ্রিয় খেলার খুব সুষ্ঠু আর বিজ্ঞান-সম্মত এক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, জনসাধারণের মধ্যে ফুটবল খেলার ব্যাপকতার ভিত্তি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তিটি হল কারখানা, প্রকল্প, বিদ্যালয় আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফুটবল দলগুলি। কতকগুলি বড়ো বড়ো শ্রমশিল্প-প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগের (শপ) নিজস্ব দল আছে এবং এইসব বিভাগীয় দলের সংখ্যা কখনও কখনও কয়েক ডজন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এসব দলের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় প্রতিযোগিতা হয়। কারখানার দলগুলি শহরের বা জেলার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় খেলে এবং যোগ্যতা অনুসারে আঞ্চলিক ও প্রজাতান্ত্রিক চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। তাছাড়া, কারখানার দলগুলির জন্যে রয়েছে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতা এবং এতে কয়েক হাজার দল যোগদান করে।

জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের ১২টি সর্বশ্রেষ্ঠ দল (প্রথম শ্রেণীভুক্ত) "জাতীয় চ্যাম্পিয়ন" আখ্যা অর্জন করার জন্যে জাতীয় লীগ খেলায় প্রতিযোগিতা করে। এই "প্রথম" শ্রেণীভুক্ত দলগুলির প্রত্যেকটির দুটি করে টীম থাকে—প্রথম ও দ্বিতীয় টীম। এই টীমগুলি যেসব ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত, সেই সব ক্লাব তরুণ খেলোয়াড়দের জন্যে ফুটবল স্কুল পরিচালনা করে। বয়েস অনুযায়ী গ্রুপে ভাগ করে নিয়ে এদের ট্রেনিং ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও আছে স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কিশোরদের জন্যে ফুটবল ট্রেনিং কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রায় ১০০ জন তরুণ ফুটবল-উৎসাহী খেলায় অংশ নেয়, শিক্ষাদাতারা হলেন সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ফুটবল কোচ। ক্লাব-ফুটবল স্কুলগুলিতে তিন বছর ট্রেনিং নেবার পর, তরুণ খেলোয়াড়দের ওইসব "প্রথম" শ্রেণীভুক্ত দলের দ্বিতীয় টীমে খেলানো হয়। সেখান থেকে তারা প্রথম টীমে উন্নীত হতে পারে।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে—অগ্রগণ্য ক্লাবগুলির খেলোয়াড়রা প্রায় সকলেই এই তিন বছরের ট্রেনিং নিয়েছেন এবং দ্বিতীয় টীমের "পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিখিল-সোভিয়েত জাতীয় দলগুলির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অনেকেই ডি. ডোরোনিন, মানোশিন, এ. খেত্সেরনেফ, আই. চিসোলেকো, জি. গুসারফ, প্রভৃতি এই ভাবেই তাঁদের খেলোয়াড় জীবন শুরু করেন।

সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা হল—নিখিল সোভিয়েত ফুটবল কাপ-এর খেলা। এই প্রতিযোগিতাতেই সবচেয়ে বেশি ফুটবল দল যোগদান করে। এতে যোগদানকারী টীমগুলির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গত বছরে, এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন স্তরে মোট ২৫ হাজার টীম অংশ নিয়েছে।

বিশ্ব-ফুটবলের মানোন্নয়নে সোভিয়েত খেলোয়াড়দের দান উল্লেখযোগ্য। ফুটবল খেলোয়াড়দের ভালো রকম এক সর্বাঙ্গীণ ট্রেনিং দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে বহু দেশই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে।

সোভিয়েত ফুটবলের অগ্রগতির কারণগুলি হল: তার গণ-ভিত্তি অর্থাৎ, ব্যাপকভাবে সমস্ত জনগণের দ্বারা এই খেলার চর্চা; সারা বছর ধরে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা; দক্ষতা আর খেলার কলা-কৌশলের দিকে নিখুঁত মনোযোগ এবং সর্বাঙ্গীণ শারীরিক সুস্থতা।

সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে, শারীরিক ও কলা-কৌশলগত যোগ্যতা ছাড়াও সোভিয়েত ফুটবল খেলোয়াড়দের একটা খুব বড়ো বৈশিষ্ট্য হল জয়ী হবার জন্যে এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, দলগত ঐক্যবোধ এবং উচ্চমানের শৃঙ্খলাবোধ।

সোভিয়েত ফুটবল খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশনের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে এই ফুটবল দলটি গঠিত হয় কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে দলটি প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। দু'বার এই দল বিদেশে গিয়ে খেলেছে এবং সোভিয়েত দেশে আগত বিদেশী দলের বিরুদ্ধে অনেকবার খেলেছে। ১৯৬২ সালে সুইডেনে গিয়ে ছয়টি খেলা এবং এই বছরে

বুলগেরিয়ায় গিয়ে চারটি খেলায় এই দল প্রতিযোগিতা করেছে। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোভিয়েত দল জয়ী হয়েছে।

রুশ ফেডারেশনের ১৮টি বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব থেকে নির্বাচিত এই দলের ২১ জন খেলোয়াড়ের বয়েস গড়পড়তা ২১-২২ বছর মাত্র। এখানে এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :

গোলরক্ষক : ভিয়াচেস্লভ ইয়েগোরভ (বিমানবন্দর) ও মিখাইল বোকভ (স্পার্তাক)। উভয়েই পেশায় ফিটার। প্রথমোক্ত জন "স্পার্তাক" দলে খেলেন ও দ্বিতীয় জন স্থানীয় "দিনামো" দলের খেলোয়াড়।

ব্যাক : সের্গেই পুকভ শহরের ব্যায়াম-শিক্ষক ও স্থানীয় "জ্বেজ্দা" দলের খেলোয়াড় গেনাদি সের্গেনকভ; বেলগোরদ শহরের দেহ-পরিচালক ও স্থানীয় "স্পার্তাক" দলের খেলোয়াড় সের্গেই গোলভ; "ক্রুদ" (তোরোনেজ) দলের আনাতোলি নিয়োমকিন ও আলেকজান্দার স্তেপানেনকভ, "জ্বেজ্দা" (সের্গেই পুকভ) দলের নিকোলাই তালিচেঙ্কভ, "তুরবিন" (ক্রাস্নোদর) দলের সিওমিন পাখোমভ—এঁরা চারজনেই শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজের ছাত্র।

হাফব্যাক : আলেকজান্দার গোলোভ্কভ ইয়েরেভ্যান্স্ক শহরের "শিন্নিক" দলের খেলোয়াড় ও ছাত্র, আনাতোলি তারেয়েভ ছাত্র, কেমেরভো শহরের "উরালমাশ" দলে খেলেন; তাঁসেরি কোন্ত্রাশভ পেশায় কারিগর, স্বের্দলভস্ক শহরের "উরালমাশ" দলের খেলোয়াড়।

ফরোয়ার্ড লাইনের আট জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন: ভলাদিমির বাসালিয়েভ, ইলেক্ট্রো-টেকনিশিয়ান, মস্কোর "লোকোমোটিভ" দল। সের্গেই পুকভ, বিদ্যুৎ-কারিগর, ইভানোভো শহরের "তেক্স্তাল্শ্চিক" দল। লেনিনগ্রাদের "দিনামো" দলের খেলোয়াড়, ফিটার ভলাদিমির তোইনভ। গাভেল আবদুক, ফিটার, লুর্দ শহরের "ক্রাসোতিয়ে দিসাভি" দল। কিরভ শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্থানীয় "দিনামো" দলের খেলোয়াড় ভলাদিমির ভন্ত্সিন। আনাতোলি তারিসিয়েভ মোকি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সেই দলেরই খেলোয়াড়। আনাতোলি মিখিয়েভ (তোমস্কি) ও তাসেরি কোরোভিক (গ্রোজনি) শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজের ছাত্র।

ট্রেনার : ভলাদিমির ওসিপভ ও ভলাদিমির ইভাশকভ।

দলনেতা : সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রুশ অন্ত-প্রজাতন্ত্রের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব একজন অতি জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় আলেকজান্দার তারোস্তিন। তিনি ও তাঁর ভাইরা মস্কোর "স্পার্তাক" দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। তারোস্তিন "অনার্ড মাস্টার অফ স্পোর্টস্" উপাধিতে ভূষিত।

কলকাতায় সোভিয়েত ফুটবল দল

দলনেতা আলেকজান্দার তারোস্তিনের নেতৃত্বে ২৫ জন সোভিয়েত খেলোয়াড় কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অন্ত প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশনের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে এই দল গঠিত হয়েছিল। রুশ ফেডারেশনের ১৮টি বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা ক্রীড়ার উন্নতি চান, ক্রীড়াক্ষেত্রে সুস্থ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে চান তাঁরা সকলেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তে খুশি হবেন। গণতান্ত্রিক জার্মানির ক্রীড়াবিদরা এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে দুই জার্মানির দুই পৃথক টীম গঠনের কথা কেন উঠেছিল তার ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে।

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে বা ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে দুই জার্মানির যুক্ত অলিম্পিক টীম গঠনের কিছুটা ভিত্তি হয়তো ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে প্রথম স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, জার্মান প্রতিযোগীদের স্বার্থেই দুই জার্মানির পৃথক টীম গঠিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার ও প্রতিযোগীদের পরস্পরের মধ্যে যে ধরনের বোঝাপড়া থাকা দরকার তার একান্ত অভাব ছিল বিচারই জোড়াতালি-দিয়ে গড়ে-তোলা-যুক্ত জার্মান টীমের মধ্যে। আর এজন্যে পুরোপুরি দায়ী করা চলে পশ্চিম জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিকের জাতীয় অলিম্পিক কমিটিকে। ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে পশ্চিম জার্মানির অলিম্পিক কমিটি একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দুই জার্মানির ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ও দুই জার্মানির জাতীয় অলিম্পিক কমিটির মধ্যে সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্যে প্রস্তুত হতে হলে যে নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলন চাই—এই আবহাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্যে দুই জার্মানির যুক্ত টীম গঠন করা হয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সেখানে সহযোগিতার চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছিল রেষারেষি। সেখানে সমস্ত নজর ছিল কোন্ জার্মানির কতজন প্রতিযোগী শেষপর্যন্ত অলিম্পিক টীমে স্থান পাবে সেদিকে। একটি দল গড়ে তুলতে হলে দলের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যতোটুকু জানাশোনা থাকা দরকার তা এক্ষেত্রে থাকেনি। পরস্পরের সঙ্গে জোট বেঁধে বা পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় না নামলে তা সম্ভবও নয়। টোকিও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যুক্ত জার্মান টীমের কৃতকর্ম এই অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতারই একটি প্রমাণ হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৫৯ সালেই সিদ্ধান্ত করেছিল যে, দুই জার্মানির দুই অলিম্পিক কমিটিকে একটি যুক্ত জার্মান টীম গঠন করতে হবে। কিন্তু দুই জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরস্পর বিরোধী। এই রাজনৈতিক বিরোধিতার টানাপোড়েন থেকে ক্রীড়াজগতও মুক্ত থাকতে পারেনি। ফলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। টোকিও অলিম্পিকে যুক্ত জার্মান টীমের পতাকাবাহক কে হবেন তা আগে থেকে স্থির করা যায়নি, কেননা এক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিকের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির দাবি ছিল খুবই অযৌক্তিক। তারপরে টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হতে আর যখন মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি তখন উক্ত কমিটিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির নির্বাচিত প্রতিনিধিই হবেন যুক্ত জার্মান টীমের পতাকাবাহক।

বিরোধের এখানেই শেষ নয়। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অন্য সমস্ত দেশের টিম জাতীয় পতাকা নিয়ে প্যারেড করেছিল কিন্তু যুক্ত জার্মান টীমটি আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো পতাকা ছিল না—কারণ, এবারেও পতাকাবাহক কে হবেন তাই নিয়ে মতের অমিল হয়েছিল। এই বিরোধ আর অবিশ্বাসের মূল এত গভীর ছিল যে যুক্ত জার্মান টিম কোনো সময়েই টিম হিসেবে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। টোকিও অলিম্পিকে সমাগত ক্রীড়ানুরাগীই ব্যক্তিমাত্র এ-দৃশ্য দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে দুই জার্মানির দুই পৃথক অলিম্পিক টীম হওয়াটাই উভয় জার্মানির প্রতিযোগীদের পক্ষে মঙ্গলের।

এই অনভব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েই জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি দুই জার্মানির দুই পৃথক দল গঠনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালের ৬ই জুন তারিখে তাঁরা এই মর্মে আবেদনও করেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে। আবেদনপত্রে বলা হয় যে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের পক্ষ থেকে পৃথক অলিম্পিক দল গঠনের যে অধিকার চাওয়া হয়েছে তার সঙ্গে অলিম্পিক সনদের মূলনীতির বিন্দুমাত্র বিরোধিতা নেই।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, ৪৪টি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্রের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব আছে। এই সমস্ত ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব টীম যোগ দিয়ে থাকে। এবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতাতেও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র টীম মঞ্জুর করা হল। এতে শুধু যে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দেওয়া হল তাই নয়, ক্রীড়ামানের উন্নতিসাধনেও প্রভূত সহায়তা করা হল।

এখন থেকে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অলিম্পিক কমিটিকে বলা হবে "পূর্ব জার্মানির জাতীয় অলিম্পিক কমিটি"। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এবার থেকে দুই জার্মানির দুটি অলিম্পিক টিম নিরপেক্ষ জার্মান অলিম্পিক পতাকা সামনে রেখে পৃথক পৃথক দলে পর-পর মার্চ করে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবেন।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অলিম্পিক কমিটির সভাপতি ডঃ হাইনৎস শোয়েবেল বলেছেন, "এই সিদ্ধান্তের অর্থ হচ্ছে এই যে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দুই জার্মান টীমকেই পূর্ণ স্বীকৃতি দান করলেন। তার মানে, গ্রোনোব্‌ল ও মেক্সিকো নগর অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জার্মানির দুটি পৃথক জাতীয় টিম অবতীর্ণ হবে। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ক্রীড়াবিদরা অন্যান্য সকল দেশের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির ক্রীড়াবিদদের সমান অধিকারসম্পন্ন হবেন।"

সিনেমা

কোথা থেকে কোথায় এলো

সিনেমার ছবি নিয়ে বিরাট একটা আন্দোলন সুরু হয়েছে সারা পৃথিবীতে। এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল ইংলণ্ডে। সেটা সম্ভবত ১৯২৯ সালে। লণ্ডনে স্থাপিত হলো ফিল্ম সোসাইটি। এই সোসাইটির কাজ হলো নতুন আঙ্গিকে নতুন চিন্তাধারাকে সমর্থন করে যে-সব স্রষ্টা পরিচালক কাজে নামলেন তাঁদের সেই নবাগীতির ছবিগুলিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই ফিল্ম সোসাইটিকে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো সোসাইটির ওপর। হওয়া স্বাভাবিক। যে-সব তরুণ-তরুণী, অর্থাৎ সমগ্র দেশের যুব সম্প্রদায় যাদের ওপর তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভর করে সেই তারাই যদি মেতে ওঠে এই আন্দোলনে, তাহলে তাঁদের চলতি ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর।

ফিল্ম সোসাইটির সমর্থকেরা বলতে লাগলো—দেশের এবং জাতির সংস্কৃতিতে জীবনধর্মী যে নব চেতনার উন্মেষ, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পুরাতন মূল্যবোধকে আশ্রয় করে এতদিন যাঁরা ব্যবসা চালিয়ে আসছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পচেতনাশূন্য। জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁরা শিল্পের শত্রু। তাঁরা জাতীর শত্রু।

পুরাতন ব্যবসায়ীরাও আক্রমণ করতে ছাড়লেন না। তাঁরা বলতে লাগলেন—'হুজুগ' বলে একটা কথা আছে। নতুন কিছু করছি বলে জাহির করে বাজিয়ে দলে তারি তরুণ-তরুণীরা যদি মাতামাতি সুরু করে তো সেই 'হুজুগে' মাতবার লোকের অভাব হয় না। এরাও তেমনি হুজুগে-মাতা উন্নাসিক যুব-সম্প্রদায়। যেমন করে হোক্, জাতির চিন্তায় জগতে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করাই এদের উদ্দেশ্য। যা-কিছু পুরাতন তাই তাদের কাছে অশ্রদ্ধেয়। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ এদের নেই। মানুষের ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বাস্তবতাকে এবং যৌনজীবনতাকে উলঙ্গ করে দিয়ে অতি সহজে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলাই এদের লক্ষ্য। সহজ সুন্দর জীবনের কল্যাণধর্মী আদর্শের প্রতি এদের বিতৃষ্ণা। গল্প, নাটক, চরিত্র, হৃদয়ধর্ম এবং রসসৃষ্টিকে এরা বলে মেলোড্রামা। সস্তা তাকামি।

এমনি করে আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণের ভেতর দিয়েই সোসাইটির অগ্রগতি। এমনি সংঘাত সমূল পথে যাত্রা করেও আজ দেখা যাচ্ছে—ইওরোপের প্রতিটি দেশে বহু কিন্তু সোসাইটি অন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও ধীরে-ধীরে এই বস্তুটি প্রসার লাভ করছে।

এরা যে একটা জনচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে তাতে কোনও ভুল নেই। সিনেমা যে একটি মহান শিল্প দেকথা আজ সকলেই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সোসাইটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই তার একমাত্র প্রমাণ।

এর দেখাদেখি ফ্রান্সে 'অভানগার্দে' আন্দোলন সুরু হয়েছিল বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরেই। কিন্তু 'এভানগার্দে' বেশিদিন টেকেনি। না টিকলেও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিভাবান শিল্পীরা এখনও নতুন ধরণের ছবি তৈরী করে চলেছেন। নাম দিয়েছেন 'নিউওয়েভ'।

ইটালীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে—'নিউ রিয়েলিজম্', ইংলণ্ডে 'ফ্রি সিনেমা', আমেরিকায় 'নিউ সিনেমা'।

কিন্তু সোসাইটির ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট এঁদের সৃষ্টিভঙ্গী যদিও সর্বজনচিত্ত-হারী হয়ে ওঠেনি, তবু এদের অগ্রগতি অব্যাহত।

ব্যবসায়িক সাফল্য এরা এখনও অর্জন করতে পারেনি। এরা বলে—আমাদের উদ্দেশ্য শুধু অর্থলাভ নয়, আমরা চাই যুগোপযোগী সৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শিল্পসমৃদ্ধ সিনেমার ছবি তৈরি করতে।

এমনি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কোনও শক্তিমান শিল্পী যেদিন সর্বজনগ্রাহ্য অপরূপ সৃষ্টি দিয়ে জনচিত্ত জয় করতে পারবেন সেইদিন হবে এই আন্দোলন সার্থক।

এমনি করেই গদ্য কবিতা একদিন বাংলার কাব্যজগতে বিপ্লব এনেছিল। সে বিপ্লবের ধুয়া আজও চলছে। আজকাল সাহিত্য পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায়—কবিতা থেকে ছন্দ সুর এবং মিল পুরোপুরি অন্তর্হিত। তাই বলে এই সব কবিরা যদি বলতে আরম্ভ করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে একজন কবি একদিন সুর ছন্দ মিলিয়ে যে-সব কবিতা রচনা করেছেন, তিনি আসলে কবিই ছিলেন না, ছিলেন মাত্র একজন গদ্যরচয়িতা, তা'হলে সেকথাটা যেমন হাস্যকর মনে হবে, আজকার দিনের 'নিউ ওয়েভ' ধর্মী সিনেমাকারেরা যদি বলেন—আমরা যে সৃষ্টি করছি সেই সৃষ্টিই একমাত্র সৃষ্টি, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যারা সিনেমার ছবি তৈরী করছেন তাঁরা কিছুই ন'ন, তাহলে সেকথাটাও তেমনি হাস্যকর মনে হবে।

সিনেমা নিয়ে এই নব আন্দোলনের কথা বলতে হলে একটু পিছিয়ে যেতে হয়।

ছবির জগতে সর্বপ্রথম আসে হলো ফটোগ্রাফি। শিল্পী ছবি আঁকতো অনেক সময় সেটি তার হুবহু অনুকৃতি হতো না। তাই যন্ত্র দিয়ে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জকে হুবহু ঠিক তেমনিটি চিরদিনের জন্য চোখের সামনে ধরে রাখবার ইচ্ছা থেকে জন্ম হলো ফটোগ্রাফীর। কিন্তু ফটোগ্রাফী নিশ্চল। এই চলমান পৃথিবীতে নিশ্চল ফটোগ্রাফীর মোহ কেটে যেতে দেরি হলো না। মানুষ তখন চাইলে চলমান পৃথিবীর প্রতিটি চলন্ত বস্তুকে তেমনি চলমান অবস্থাতেই ধরে রাখতে। অর্থাৎ গতি প্রার্থনা করলে গতিহীন।

বিজ্ঞান এগিয়ে গেল।

যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো বায়োস্কোপের।

জল পড়তে লাগলো। পাতা নড়তে লাগল।

গতিবেগ সঞ্চারিত হলো অচল বস্তুপুঞ্জে।

কিন্তু এতো শুধু ধ্বনিল। যা আছে তাই। যা কিছু চলমান তারই হুবহু প্রতিকৃতি।

যন্ত্র যারা তৈরি করলেন তাঁরা চিন্তিত হলেন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই যন্ত্রকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহ'লে শুধু জল পড়ে, পাতা নড়েতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, চক্ষু নামক শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে তার বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। চক্ষের সঙ্গে মানুষের মনকে টানতে হবে।

এবং মনকে টানতে হলে মানুষের হৃদয়ের কাছে আবেদন প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং ওই যন্ত্র দিয়ে সেলুলয়েডের ওপর গল্প লিখতে হবে।

সুতরাং ডাক পড়লো গল্প-লেখকের। অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করিয়ে সুরু হলো গল্পের ভেতর রসসৃষ্টি।

মনে মনে মানুষ ছুটলো ছবি দেখতে।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ বিজ্ঞানের এই অভিনব আবিষ্কারকে অভিনন্দন জানালে। গল্পের ছবি তৈরি করতে লাগলো প্রায় সকলেই।

যন্ত্রের হলো জয়।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো এই যন্ত্রনির্ভর চলচ্চিত্র শিল্প। প্রতিভাধর চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো দেশে দেশে।

আমাদের দেশ তখন ইংরেজের অধীনে। রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক তখন ঘনিষ্ঠ ছিল না। কাজেই সে-দেশের ছবি আমরা দেখতে পেতাম না। অথচ কানে এসে বাজতে লাগলো রাশিয়া এবং জার্মানী নাকি এই চলচ্চিত্র শিল্পে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

ভারতবর্ষেও তার প্রভাব এসে পড়লো। বোম্বাই এবং কলকাতায় গল্পের ছবি তৈরী হতে লাগলো। কিন্তু উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের অভাবে ছবির মান তেমন উঁচু উঠলো না। টাইটেল-ভারাক্রান্ত নির্বাক ছবিগুলি দেখতে দেখতে ক্রমাগত মানুষের মনে তখন শুধু একটি ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে লাগলো—এই ছবি যদি কথা বলতে পারতো!

চলমান রূপের প্রবাহ তখন ধরা পড়ছে ছবিতে কিন্তু বাণীকে ধরে রাখবার কৌশল তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নির্বাক ছবি মনে হয় যেন অসম্পূর্ণ শুধু চক্ষুনির্ভর ছবি যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারছে না মানুষকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের খোরাক চাই।

বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন।

মাইক্রোফোন আর লাউড স্পিকার তখন আবিষ্কৃত হয়েছে। মাইক্রোফোন রেকর্ডের মত হালকা এবং শক্ত রেকর্ডের ওপর শব্দ ধরে তাই দিয়ে নাম্বার কাজ চলতে লাগলো।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনা অল্পমুক্ত হলো অচিরেই। শব্দ-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গে রূপান্তরিত হলো।

আবিষ্কৃত হলো 'ইলেকট্রো ফোটো সেল'।

একই ফিল্মের ওপর ফল এবং বাণী একই সঙ্গে পাশাপাশি ধরা পড়ে গেল।

এমনি করেই সারা পৃথিবী জুড়ে সুরু হলো সিনেমার জয়যাত্রা।

কিন্তু এতেও নিস্তার নেই।

সংঘাত বাধলো রঙমঞ্চের সঙ্গে।

রঙমঞ্চও যে-কাজ করে, সিনেমাও সেই কাজ করে। রঙমঞ্চ নাটক বলে, সিনেমা বলে নাটকেরই গল্প।

সমস্যা হলো—যার ক্ষমতা বেশি সে অন্যকে পরাস্ত করবে। অথচ দু'এরই লক্ষ্য রসসৃষ্টি।

তাই সিনেমা চেষ্টা করতে লাগলো রঙমঞ্চের আঙ্গিক থেকে নিজের চেহারাটা পৃথক করে নেবার।

সেই চেষ্টা এখনও চলছে।

এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁরা করছেন তাঁদের সঙ্গেই প্রাচীনপন্থীদের বিরোধ। তাঁদের সেই নব আঙ্গিকের ছবিগুলিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলবার জন্যই ফিল্ম সোসাইটির জন্ম।

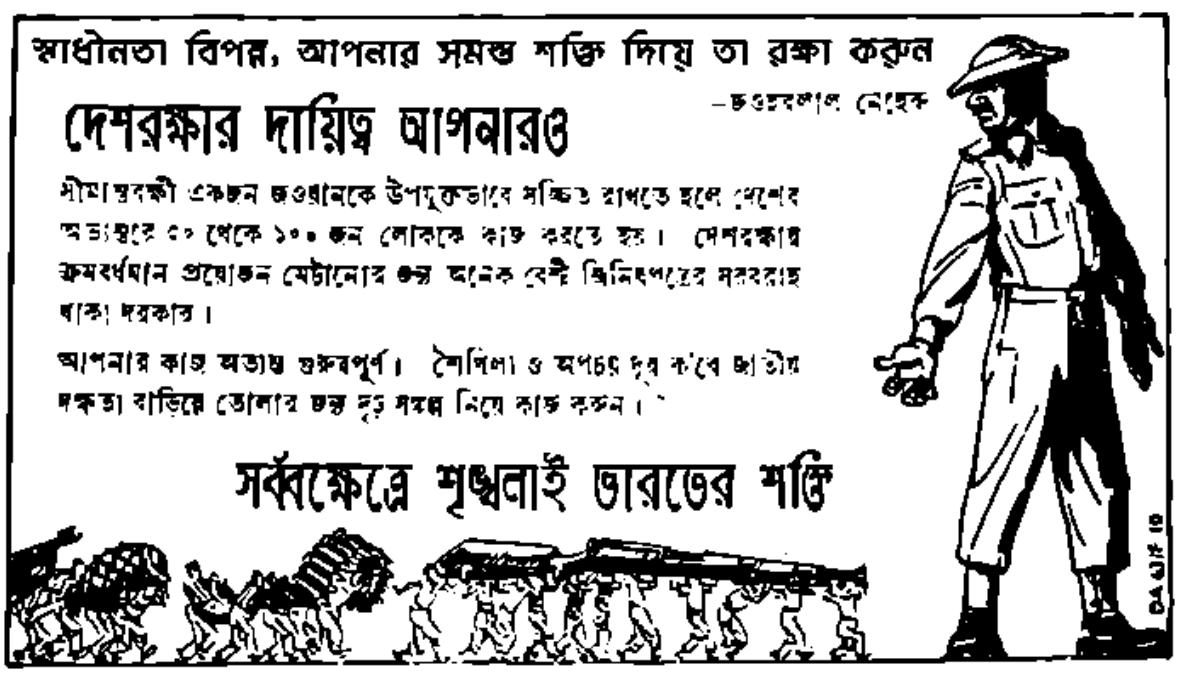

দেশ বিদেশের রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র

ব্রিটেনে বেটোল্ট ব্রেখট

লণ্ডনের ওল্ড ভিক থিয়েটারে বার্লিনের্যার অ্যাঁসেম্বল নাটক পরিবেশন করেছিলেন ৮ই থেকে ২৮শে আগষ্ট পর্যন্ত। তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ জাতীয় নাট্যশালার পক্ষ থেকে স্যার লরেন্স অলিভিয়ের। ১৯৬১ সালে পূর্বতন প্রভুর কর্তৃক বাধানিষেধ আরোপের পর থেকে ন্যাটো-ভুক্ত কোনো একটি দেশে বার্লিনের্যার অ্যাঁসেম্বল-এর সফর এই প্রথম।

অ্যাঁসেম্বল-এর প্রযোজনায় লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয় ব্রেখটের পাঁচটি নাটক : 'দ্য রেজিসটেবল্ রাইজ অব আর্টুরো উই', 'দ্য থ্রিপেনি অপেরা', 'দ্য ডেথস্ অব দ্য কমিটন', ব্রেখট কর্তৃক নাট্যরূপায়িত শেক্সপীয়রের 'কোরিওলেনাস' ও সঙ্গীত-নাট্য 'লিট্‌ল্ মহাগোনি'।

প্রত্যেকটি নাটকই অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। একটি টিকিটও অবিক্রীত থাকেনি। ব্রেখট নাট্যগোষ্ঠীর বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতাতেও অভূতপূর্ব। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অভিনয় চলাকালেই সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বারবার হাততালিতে ফেটে পড়ছিল আর পর্দা নামার পরে দর্শকদের অভিনন্দন যেন শেষ হতেই চাইছিল না।

প্রতিদিন সকালে নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা পত্রিকার সমালোচনাগুলো খুঁটিয়ে পড়তেন। বার্লিনের্যার অ্যাঁসেম্বল-এর অনুষ্ঠান যে নাট্যজগতে বৎসরের সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ঘটনা, এ-বিষয়ে সমালোচকরা সকলেই একমত হয়েছিলেন। বিশেষ করে প্রশংসিত হয়েছিল প্রযোজনার সংযম, আধুনিকতা ও যথাযথতা এবং অভিনেতৃদের বিযুক্ত অভিনয় ও শিল্পনৈপুণ্য। অন্যদিকে, অ্যাঁসেম্বল-এর অভিনয়-রীতির যা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ দলবদ্ধ অভিনয়, যা ব্যক্তিগত অভিনয়ের কৃতিত্বকে ম্লান না করে বরং আরো পরিস্ফুট করে তোলে, তা লণ্ডনের এই অভিনয়ে সমালোচকদের চোখে আরো বেশি করে ধরা পড়েছিল। দর্শকদের কাছে ও পত্রিকার সমালোচনায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন হাদায় তাইগেল, এক্‌হার্ড কাইজার, এক্‌হার্ড পাস ও হিলমার ব্লাটে।

'কোরিওলেনাস' ও 'ডেথস অফ দ্য কমিটন'—এই দুটি নাটকের অভিনয় অ্যাঁসেম্বল-এর পক্ষে হয়ে উঠেছিল কঠিনতম পরীক্ষা। সমালোচকরা মনে করেন, 'কোরিওলেনাস' শেক্সপীয়রের একটি দুর্বলতম নাটক। জার্মান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে এই নাটকের অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করা খুবই দুরূহ। ব্রিটিশ দর্শকরা খানিকটা সন্দেহ নিয়েই নাটকটি দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য পর্যন্ত দেখার পরেই দর্শকদের সমস্ত সন্দেহ ঘুচেমুছে গিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি দৃশ্যের শেষেই শোনা গিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। সব মিলিয়ে 'কোরিওলেনাস'-এর অভিনয় বিরাট সাফল্য-

আলোচনা, সঙ্গীতরচয়িতা পাউল ডেসৃসাল কর্তৃক ব্রেখটের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা সম্পর্কে ভাষণদান এবং একটি আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বেলজিয়ান ভাইগেল, মানফ্রেড ভেকওয়ার্ট, ইওয়াখিম টেনফার্ট, সুপরিচিত ব্রিটিশ প্রযোজক পিটার ব্রুক, ব্রেখট-অনুরাগী ও সাহিত্যসমালোচক জন উইলেট এবং জার্মান থিয়েটারের প্রধান নাট্য-সমালোচক কেনেথ টাইনান।

প্রত্যেকটি আলোচনা-সভায় ও বৈঠকে বহুসংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হয়েছিল। তার একটি সুফল এই যে, ব্রেখট সম্পর্কে ব্রিটেনে প্রচলিত অনেক ভুল ধারণার নিরসন হয়েছে।

এই সকলের আগে একটি বড়ো ঘটনা, অ্যাসেম্বল-এর সদস্যদের রঙ্গমঞ্চের বাইরেও সর্বত্র বিপুল অভ্যর্থনা লাভ। ব্রিটেনের সংস্কৃতি ও রাজনীতি-জগতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাও অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

মিশরের ছায়াছবি

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের চলচ্চিত্র শিল্প ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের মতন প্রাচীন এবং বিশাল না হলেও আমাদের এই শিল্পের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে তার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে দেশেরও এই শিল্পকে আমাদের মতনই অনেক বাধাবিপত্তি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদেশী উৎকর্ষতা, দেশে শিল্পীদের ঘাটতি এবং কারিগরি প্রাচীনতার রূপ তাঁদেরও আমাদের মতনই অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

এই আরবী সিনেমা শিল্পের চ্যালেঞ্জ ছিল আরও অনেকের। ইতালী, ফ্রান্স ও সোবিয়েত দেশসহ সারা পূর্ব ইওরোপে চলচ্চিত্র নির্মাণ এক নতুন আকার ধারণ করছিল এবং মিশর এই সব দেশের কাছাকাছি থাকায় তাকে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

শিল্প ১৯৩১ সালেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও বিপ্লবের পরই তার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয় চারটি স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে এই কাজ করে থাকেন। সংগঠনগুলি প্রয়োজনা আভ্যন্তরীণ পরিবেশনা বিদেশে প্রদর্শনী প্রযোজনায় সহযোগিতার কাজ দেখাশুনো করেন। কাহিনী ও প্রতিভা সন্ধান করার দায়িত্বও তাঁদেরই। বেতার, বেতার বীক্ষন ও ছায়াছবি এ সবেরই উন্নয়ন ও গবেষণার কাজ দেখাশুনো করাও এঁদেরই কাজ। এই সংগঠনগুলি অনেকটা আমাদের চলচ্চিত্র অর্থ কর্পোরেশন, চলচ্চিত্র রপ্তানি কর্পোরেশন ও চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটির মতনই।

বেতার টেলিভিসন ও সিনেমার জন্য ১৯৬০ সালেই মিশরে একটি সাধারণ সংগঠন গড়া হয়। এই সংগঠনের চলচ্চিত্র শাখাটি চারটি সরকারী কোম্পানী নিয়ে গঠিত। তাদের মোট মূলধন হল প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ মিশরী পাউণ্ড। এই সংগঠনের গবেষণা সংস্থা কারিগরি সাহায্য ছাড়াও চলচ্চিত্রের পুরস্কার ঘোষণা করেন। দেশে এবং বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করাও হল এই গবেষণা সংস্থার দায়িত্ব।

১৯৫৯ সালে স্থাপিত মোশন পিকচার ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত যাবতীয় শিক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে।

সংগঠনের পরিবেশন সংস্থাটি মিশরী ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা ছাড়া বিদেশী ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব হল বিদেশে মিশরী ছবির জন্য উপযুক্ত বাজারের সন্ধান করা।

আন্তর্জাতিক মানের ছবি তৈরীর জন্যও একটি সংস্থা আছে। আর আছে ভাল কাহিনী প্রভৃতির সন্ধান করার জন্য একটি বিভাগ। প্রথমোক্ত সংস্থাটি বিদেশী কোম্পানীর সহযোগিতায় ছবি তোলার কাজও দেখাশুনো করেন। মিশরে বিদেশী সংস্থা ছবি তুলতে এলে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করাও এই সংস্থার দায়িত্ব। প্রায়ই বিদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতারা আসেন ছবি তুলতে।

এদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের সব কিছুই সরকারী উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ চলচ্চিত্র সংগঠনের একটি শাখা ষ্টুডিও ও লাবরেটরী প্রভৃতি দেখাশুনো করেন। ষ্টুডিও ভাড়া দেওয়ার কাজও তাঁরাই করেন। মিশরের বৃহত্তম তিনটি ষ্টুডিওই ঐ সংস্থার। ষ্টুডিও তিনটি হল, ষ্টুডিও মিশর, আরব ষ্টুডিও ও পাশেল ষ্টুডিও। ষ্টুডিওগুলি আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত। তাদের মোট ৯টি ষ্টেজ আছে। আর আছে তিনটি সর্বাধুনিক লেবরেটরি যেখানে রঙীন ছবিও তোলা যায়। এই সংস্থা কায়রোর অদূরে একটি সিনেমা নগর তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই নগরে সাউণ্ড ষ্টেজ, ডাবিং ষ্টেজ, আউট ডোর ষ্টুডিং লেবরেটরি প্রভৃতি ছায়াছবি নির্মাণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে।

মিশরের ষ্টুডিওতে পাঁচটি সুসজ্জিত প্রায় ৬০০ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। বছরে তারা প্রায় ৭০টি করে ছবি তৈরী করে। প্রতিটি ছবির জন্যে গড়ে খরচ হয় প্রায় ৫০ হাজার পাউণ্ড। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তারা ১২০০ কাহিনী চিত্র ও ১০০০ নিউজরীল ছবি তৈরী করেন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী ছবি ও শিল্পীদের দেন ১ লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার।

মিশর প্রায় তিন শ বিদেশী ছবি আমদানি করে, তবে ভারতীয় ছবি আমদানি দিনে দিনে কমে আসছে। মিশর চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে হাংগেরী, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপানের সংগে সহযোগিতা করছে। মিশরী অভিনেতা ওমর শরীফ একাধিক আন্তর্জাতিক ছবিতে কাজ করছেন।

ইয়েলো রোলস রয়ে ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। এবার লরেন্স অফ আরেবিয়া ছবিতে তাঁকে আবার দেখতে পাওয়া যাবে। মিশরে সরকার স্থির করে দিয়েছেন যে, কোন শিল্পী ১২ হাজার পাউণ্ডের বেশি আয় করতে পারবেন না।

গবেষণার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় মিশরী ছবির চাহিদা বাড়ছে। চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন আস্থা ও বিশ্বাস দেখা দিয়েছে। তার ক্রমোন্নতিতে সকলেই মুগ্ধ এবং আশান্বিত হয়েছেন।

ব্রিটিশ ফিল্মস গাইড

সায়েন্টিফিক ফিল্ম এসোসিয়েশন (৪৪ এ, ওয়েলবেক ষ্ট্রীট, লণ্ডন) একটা বড় রকমের ফিল্ম ইন্‌ভেন্টরি পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা ব্রিটেনে প্রাপ্তব্য কাহিনী ছাড়া সকল প্রকার চলচ্চিত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করছেন।

কয়েক খণ্ডে এই তালিকা প্রকাশিত হবে, বিষয় অনুযায়ী খণ্ডগুলিকে ভাগ করা হবে। সব শুদ্ধ বারোটি খণ্ড হবে : দর্শন ও ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞান, কলা ভাষা ও সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও

জ্যোতির্বিদ্যা বিশুদ্ধ ও ফলিত দুখণ্ডে ; জীববিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান ; মেডিসিন, ইঞ্জিনীয়ারিং (ইঞ্জিনীয়ারিং সমেত), হুমি ম্যানেজমেন্ট, কম্যুনিকেশন ও অটোমেশন, বিল্ডিং, প্ল্যানিং ও আর্কিটেকচার ; ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণ।

প্রথম খণ্ডটি মেডিসিন—আগামী গ্রীষ্মে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হবে পদার্থবিদ্যা সহিত ও জ্যোতির্বিদ্যার খণ্ডটি।

ব্রনো'তে ৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রনো'তে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলায় ২৭টি দেশের ২০টির বেশী কারবার অংশগ্রহণ করে। ১১০টি পূর্ণ-দীর্ঘ ফীচার চলচ্চিত্র সমেত মোট ৫০০ চলচ্চিত্র এই মেলায় আসে।

এই মেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার ১৪টি পূর্ণ-দীর্ঘ এবং ৫৬টি শর্ট চলচ্চিত্র উপস্থিত করা হয়েছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৩টি, ফ্রান্স ২টি, ইতালি ২টি এবং সুইডেন ১টি পূর্ণ-দীর্ঘ চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র কেনে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেল

সম্প্রতি নব্য চলচ্চিত্র আন্দোলনে উৎসাহীদের উদ্যোগে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেল' নামে একটি নূতন সংগঠন গঠিত হয়েছে। সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বহু বিশিষ্ট শিল্পরসিক ও চিন্তাবিদ এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়েছেন।

ফিল্ম সার্কেলের উদ্যোগে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র "The Cry" ১২ ডিসেম্বর রবিবার প্রদর্শিত হচ্ছে।

গল্প-ভারতী'র কার্যালয় ২১৯। বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ সংগঠনের মূল কেন্দ্র।

এস. এফ. সিনে ক্লাব

একটি নতুন চিন্তাধারা, একটি নতুন পথের নিশানা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের সর্বপ্রথম এস্. এফ্. সিনে ক্লাব। সভাপতি হয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায় এবং সহ-সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই অভিনব সিনে ক্লাবটির উদ্দেশ্য জগতের শ্রেষ্ঠ সায়াল ফিক্‌শন ও ফ্যানটাসি ফিল্ম যাঁরা বিশেষ ভালবাসেন তাঁদের মনোরঞ্জন। সায়াল ফিক্‌শন ও ফ্যানটাসি গল্পের পত্রিকা 'আশ্চর্য!' কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্থাপিত এই এস্. এফ্. সিনে ক্লাবটি ইতিমধ্যে বহু সদস্য সংগ্রহ করেছেন এবং আগামী মাসে অনুষ্ঠানিক ভাবে ক্লাবের উদ্বোধন হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ক্লাব-সম্পাদকের সঙ্গে ৯১-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

শ্রীমুখ

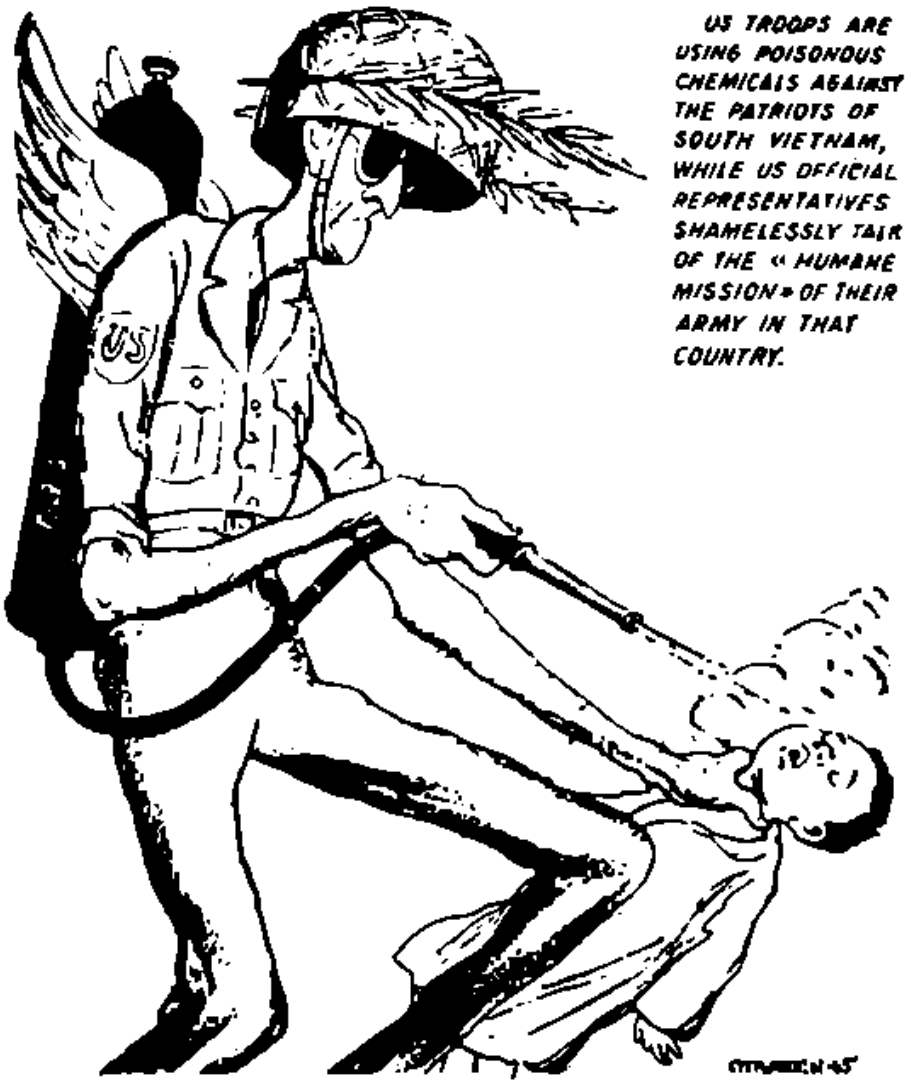

THE ASPHIXIATING HUMANISM OF « GUARDIAN ANGEL »

মানবতার নামে !

অমন প্রেমের গলায় দড়ি !

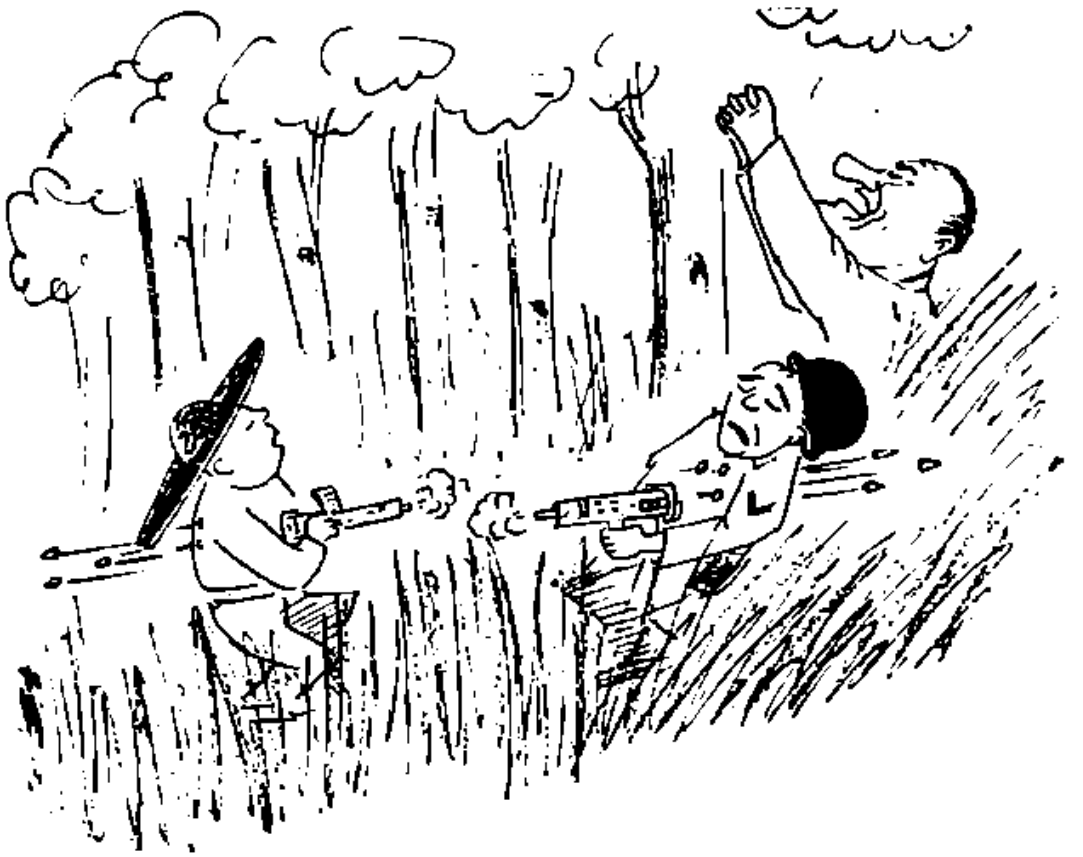

ভগবান রক্ষা কর!
—ওদের আত্মা যেন শান্তি পায়
—জনসন

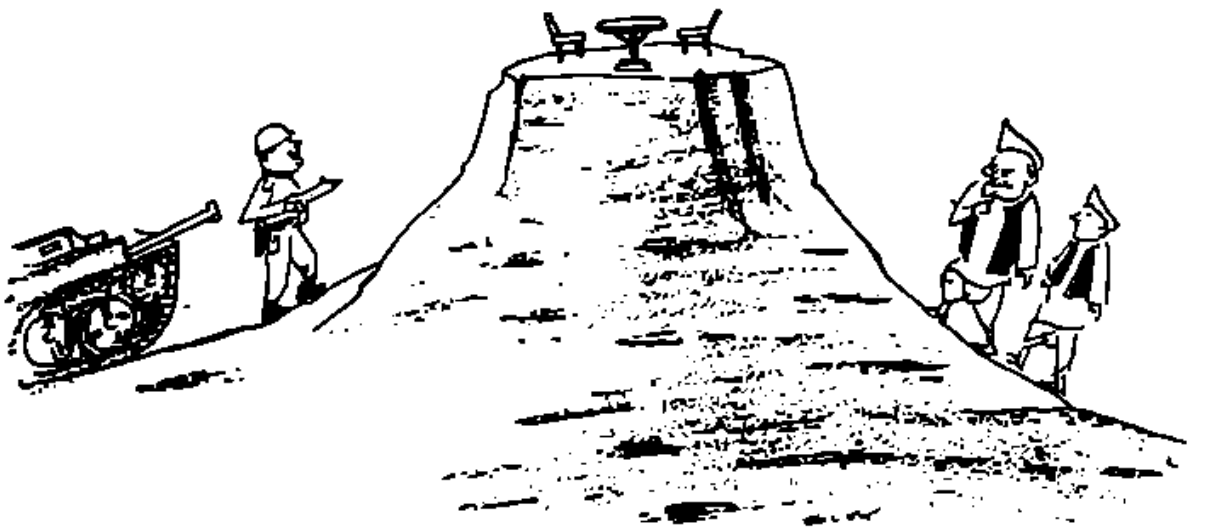

তাসখন্দের পথে……

শেষমুহূর্ত

সমারসেট ম্যম

১৯৪৬ সাল। সাহিত্যিকদের তরফ থেকে কোনো ভোজ-সভার আয়োজন করা হয়নি। সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেকেই জানতেন না যে মাত্র ক'দিন সেরা জন্য লণ্ডনে এসেছেন ছোট-গল্পের জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমারসেট ম্যম। একজন ভারতীয় সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আগে থেকেই চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন।

যে কেয়ার পার্ক লেনের একটি অভিজাত হোটেলে এসে উঠেছিলেন ম্যম। ঘর নিয়েছিলেন চারতলায়। সাংবাদিক ভদ্রলোক গিয়ে দেখলেন ম্যম দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধ একটা জানালার ধারে। নিচেই দেখা যাচ্ছে হাইড পার্ক। তাঁর গায়ে রেশমী লাল জ্যাকেট, পায়ে শয়ন-কক্ষে ব্যবহারের চটি, কালো রঙের মূল্যবান সিগ্রেট হোল্ডার ওষ্ঠে চেপে ধ'রে ধূমপান করছেন; আর কী যেন ভাবছেন।

মানুষটি ছোট-খাটো, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। কোটর-নিহিত চোখ। প্রশস্ত ললাট। চওড়া কাঁধ, গ্রীবাদেশ লৌহ-কঠিন। ১৯৪৬ সালেই তাঁর বয়েস ৮৩। বার্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে মুখে। কণ্ঠস্বরও দুর্বল। দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্বত্য অঞ্চলে নিজের প্রাসাদোপম বাড়িতে বছরের বেশির ভাগ সময় থাকেন। রৌদ্রোজ্জ্বল কোনো এলাকায় বেড়াতে না গেলে প্রতিবছর লণ্ডনে এসে শীতের দিনগুলি কাটিয়ে যান।

ভারতীয় সাংবাদিকটি জিগেস করলেন: "লণ্ডন কেন আপনার ভালো লাগে?" উত্তরে তিনি বললেন: "লণ্ডনে আমি বহুদিন কাটিয়েছি। এখানে আমি ডাক্তারী পড়েছি। তারপর যখন নাট্যকার হলুম তখন তো বাধ্য হয়েই বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছে। তাছাড়া, কেন যেন জানি না লণ্ডনে এসে আমার বেশ ভালোই লাগে।"

ম্যামকে অতি শিশু-অবস্থায় রেখে তাঁর মা এবং বাবা দু'জনেই মারা যান। প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসে তাঁর বাবা একজন ব্যবহারজীবী ছিলেন। সেখানেই ম্যামের ছেলেবেলা কাটে। বাবা মারা যাবার পরে তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে আসা হয়। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বললেন: "যখন প্রথম ইংল্যাণ্ডে এসেছিলুম, ইংরেজীতে কথা বলতে গিয়ে বেশ আটকাতো। আমার ফুল ইংরেজী উচ্চারণ শুনে লোকে তখন হাসতো।" এর পরে কিছুদিন তিনি হাইডেলবার্গের একটা স্কুলে পড়াশুনো করেন এবং জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেন।

সমারসেট ম্যম

সেণ্ট টমাস হাসপাতালে যখন ডাক্তারী পড়ছেন সেই সময়ে ম্যমের ছোটগল্প লেখার হাতে-খড়ি। "হাইডেলবার্গ থেকে চ'লে আসার পর আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বহু জল্পনা-কল্পনা করা হলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো আমি ডাক্তার হলেই ভালো।

আমার প্রথম দিকের গল্পগুলি ছিলো একেবারেই কাঁচা। ১৮৯২ সালের কথা বলছি। তখন আমার প্রথম বইয়ের নাম 'লিজা অব ল্যামবেথ'। বইটির বিষয়—লণ্ডনের বস্তী। বইখানা পাঠকেরা বেশ নিয়েছিলো।"

"একদল পাঠক অবশ্য উপন্যাসটিকে যাচ্ছে-তাই ব'লে গালাগাল করেছিলেন; কারণ লণ্ডন শহরের বস্তী-জীবনের যে বাস্তব চিত্র ওতে ছিলো তা দেখে তাঁরা আঁতকে উঠেছিলেন। তবে অনেকেই বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছিলেন। সেই প্রশংসায় ভরসা পেয়েই, মেডিক্যাল ডিগ্রী পাবার পরেই, ডাক্তারীকে নমস্কার জানিয়ে, পেশায়ার লেখক হবো স্থির করলুম।"

"তবে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি সেই সময়েই মানব-চরিত্রের নানা দিক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ভাবী লেখকের পক্ষে এর চাইতে ভালো শিক্ষানবিশী আর কিছু নেই। মানব-চরিত্রের একেবারে নিখুঁত চেহারাটি ধরা পড়ে চিকিৎসকের চোখে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকেই মুখোশ প'রে থাকি। কিন্তু মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মৃত্যু-ভয়ের সম্মুখীন হয় তখন তার মুখ থেকে মুখোশ স'রে যায়। তার আসল চেহারাটি বেরিয়ে পড়ে।"

প্রথম কয়েক বছর বেশ লড়াই ক'রেই ম্যমকে বেঁচে থাকতে হয়েছিলো। লেখক জীবনের প্রথম দশ বছরে তাঁর বার্ষিক আয় ছিলো মাত্র ১০০ পাউণ্ড। ৩৪ বছর বয়সে প্রথম তাঁর বড়ো রকমের

সার্থকতা আসে, আর তা আসে, যখন প্রকাশিত হয় তাঁর লম্বা কয়েকটী 'লেডি ফ্রেডারিক'। "প্রথম তো থিয়েটারের ম্যানেজার নাটকখানা নিতেই চায়নি। কিন্তু দর্শকরা যখন নিলো তখন আর আমাকে পায় কে? সব থিয়েটারের ম্যানেজাররা তখন আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া সুরু করলো। লণ্ডনের চার চারটি রঙ্গমঞ্চে একই সঙ্গে চললো আমার চারখানি নাটকের অভিনয়।"

১৯১২ সালে ম্যম জীবনের দিকে নতুন ক'রে তাকাতে আরম্ভ করলেন। নাট্যকারের জীবন তখন আর ভালো লাগছিলো না। রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়ে, ছ'মাস ধরে লিখে শেষ করলেন একখানা উপন্যাস: তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'অব হিউমান বণ্ডেজ'। পৃথিবীর খুব কম বইই এত বেশি বিক্রি হয়েছে। এখনো এর বিক্রি এতটুকু কমেনি।

উপন্যাসের ধীরে-ধীরে মৃত্যু হচ্ছে কিনা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ম্যম বললেন: "মানুষের চরিত্র রাতারাতি একেবারে বদলে না গেলে উপন্যাসের মৃত্যু হবে ব'লে আমি মনে করি না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জনতাকে গল্প শুনিয়ে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। ৩০০০ বছর তো বটেই, তার চাইতেও আগে থাকতে বোধহয় এই ব্যাপার চ'লে আসছে। আসল কথা, মানুষ মাত্রেই গল্প শুনতে চায়। আর গল্পই তো উপন্যাসের কাঠামো। যতদিন মানুষ গল্প শুনতে চাইবে, ততদিন উপন্যাসের মৃত্যু হতে পারে না।"

ম্যম বললেন, আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অনেকেই সত্যিকারের ঔপন্যাসিক সাংবাদিক মাত্র। অত্যন্ত সাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁরা লিখছেন।

ছোট-গল্প লিখিয়ে বলেই ম্যম বিশ্ব-বিখ্যাত। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। ছোট-গল্পের প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁর মুখ হাসিতে আলোকিত হ'য়ে উঠলো। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, নতুন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন: "ছোট-গল্পের সুবিধা হলো একটা গল্প লিখতে দু-তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। প্রথম দিকে মাথায় ছোট গল্পের প্লট এত ঘুরতো যে একটা গল্প নিয়ে বেশিদিন কাটাবার ধৈর্য আমার থাকতো না, চাইতুম নতুন আরেকটা গল্প শুরু করতে। আর ছোট-গল্প লিখেই তো জগৎ-জোড়া খ্যাতি পেয়েছি।"

তাঁর গল্প সিনেমার পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবে—এই ব্যাপারে ম্যমের তেমন আগ্রহ নেই। তিনি বলেন, ওতে টাকা রোজগার ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। তবে তাঁর অনেক উপন্যাস আর বেশ কয়েকটি গল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। চিত্র-পরিচালকরা নীতি বাঁচাতে গিয়ে তাঁর অনেক গল্প বদলে দিয়েছেন। ম্যম অসহায় ভাবে লক্ষ্য করেছেন। আপোস না ক'রে তো উপায় ছিলো না।

সমারসেট ম্যম একজন বড়ো পর্যটকও। স্পেন, ইতালী, আর্মানী, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, তুরস্ক ইত্যাদি বহু দেশ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'নিজের ঘর' নেই বলেই এই বিদেশ ভ্রমণ। "এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে আমার ভালো লাগে না। ভারতবর্ষেও আমি গিয়েছি। ওই দেশ আমার খুবই ভালো লেগেছে, সে দেশের আতিথেয়তা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। দক্ষিণ ভারতের সন্ন্যাসী মহর্ষি রমণকে নিয়ে আমি একখানা বইও লিখেছি।"

লণ্ডনে তিনি যেতেন নেহাৎই ছুটি কাটাতে। মানুষের ভিড় আর সান্নিধ্য তখন যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতেন। সেই জন্যেই লণ্ডনের খবরের কাগজে তাঁর নাম উঠতো না। সাংবাদিকেরা তাঁর খবরই রাখতেন না। নিজের বাড়িতে তিনি ছিলেন অমলস। তাঁর মতো পরিশ্রমী লেখক খুব কমই দেখা যেতো।

পৃথিবীর সারা দেশে ম্যমের গল্প উপন্যাস আর প্রবন্ধের অগণিত অনুরাগী ছড়িয়ে আছেন। ম্যমের মৃত্যু তাঁদের কাছে আত্মীয়-বিয়োগের মতোই বেদনাদায়ক। তবে তাঁর রচনার মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকালই।

জেনারেল থিমায়া

নিকোসিয়াতে হৃদরোগে থিমায়ার ইন্তেকাল ভারতবর্ষের চলমান জীবনে এক বিশেষ দুর্ঘটনা।

ছরিশত্রুর আক্রমণে দেশের নিরাপত্তা যখন বিপন্ন ঠিক সেই সময়ই থিমায়ার মত একজন দক্ষ সামরিক অফিসারের মৃত্যু ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীর পক্ষে এক চরম ক্ষতি সন্দেহ নেই।

জেনারেল থিমায়া

বৃটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিক পরিবেশের সংগে দীর্ঘকালীন যোগসূত্র স্বত্বেও জেনারেল থিমায়ার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম সর্বজন স্বীকৃত। স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠনে থিমায়ার সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের অবদান অনস্বীকার্য। কাশ্মীরে (১৯৪৮) এগার হাজার ফুট উঁচুতে জোজিলা গিরিবর্ত্মে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনীর পাকিস্তানী ঘাঁটি আক্রমণ ভারতের সামরিক ইতিহাসে এক নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অত উঁচুতে পাহাড়ী এলাকায় যে সাঁজোয়া বাহিনী আক্রমণ চালাতে পারে একথা অনেকেই এর আগে বিশ্বাস করতে পারেননি।

সেনাবাহিনীর সংগে থিমায়ার আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। থিমায়ার আগে সেনা-বাহিনীর সংগে সর্বাধিকনায়কের এরকম যোগাযোগ প্রায় কল্পনাতীত ঘটনা ছিল।

১৯৫৯ সালে কৃষ্ণ মেননের সংগে জেনারেল থিমায়ার মতদ্বৈধতা ও তাঁর পদত্যাগের কথা অনেকেরই বোধহয় আজ মনে নেই। সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কৃষ্ণমেননের নীতিবিরুদ্ধ হস্তক্ষেপ থিমায়া পছন্দ করতেন না। একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মেনন সাহেবের খামখেয়ালীপনার প্রতিবাদও জানিয়ে-

ছিলেন। দুঃখের বিষয় সে সময় থিমায়ার প্রকৃত মনোভাব অনেকেই বুঝতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজীও থিমায়াকে ভুল বুঝেছিলেন। মেনকজীর উপরোধে শেষ পর্যন্ত থিমায়া পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেছিলেন কিন্তু দেশরক্ষা মন্ত্রীর সংগে তাঁর সম্পর্ক পরবর্ত্তীকালেও বিশেষ উন্নত হয়নি।

১৯৬১ সালে থিমায়া সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন তার পরেও তিনি বহু বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু-নায়ক ছিলেন। উত্তর সীমান্তরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামরিক নিরপত্তা সম্পর্কীয় তাঁর মনোভাব তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ বিশেষ পছন্দ করতে পারেন নি।

১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর থিমায়ার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহল ওয়াকিবহাল হন—যদিও অনেক দেরীতে। সোজা সরল মানুষের মত এই সাহসী সেনানায়ক একান্ত আপন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজের মতামত প্রকাশ করে ফেলতেন; আজকের রাজনীতির মার-প্যাঁচের ঘোরালো দুনিয়ায় সেটা বোধহয় সবচেয়ে বড় দোষ। থিমায়ার মত স্পষ্টভাষী, নির্ভীক সেনানায়কের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশী তখনই থিমায়া চলে গেলেন।

দেশের ডাকে চরম প্রয়োজনের দিনে National Defence Council-এর সদস্য হিসাবে পরম বিশ্বস্ততার সংগে তিনি কাজ করে গেছেন।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার চরম দায়িত্ব বহন করে সাইপ্রাসে এই বীর সেনানায়ক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করে গেছেন।

নিকোসিয়ার থিমায়ার দেহত্যাগে শান্তির সৈনিকদের কাছে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল।

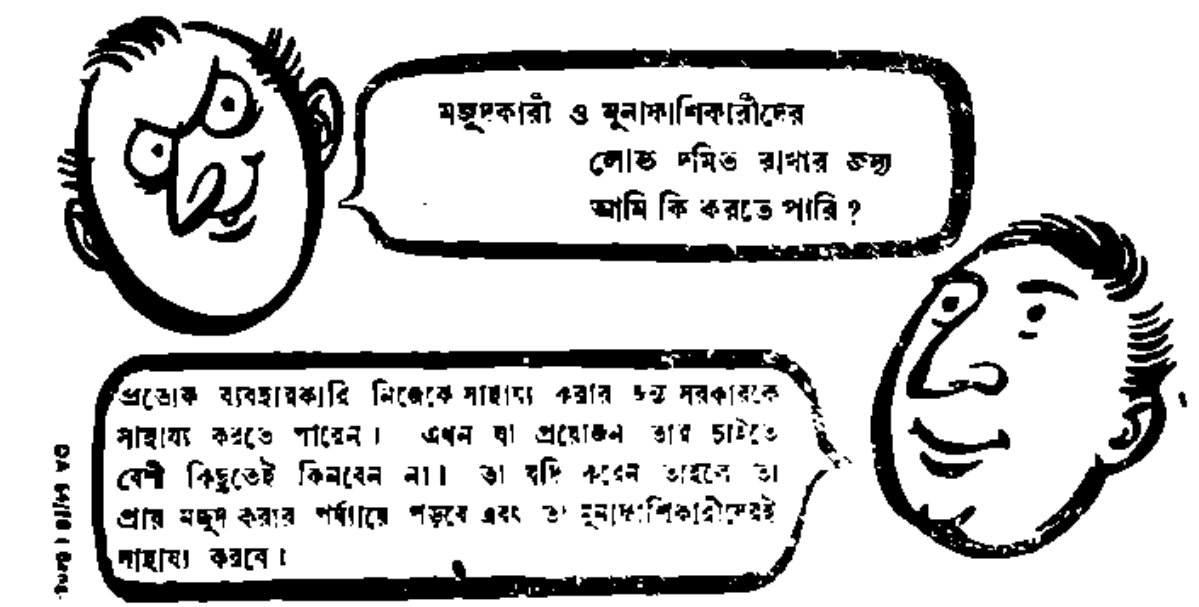

ত্যগ'ল

'৫৮ সালের ফ্রান্স—একাধারে রাজনৈতিক বিপর্যয়—অন্যদিকে চরমতম আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা—পরপর দুটি মন্ত্রীসভার পতন হল। সকালের প্রধানমন্ত্রী রাতে বিরোধীদলের দলপতি, একই লোকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ধরণের ভূমিকা পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অনিশ্চিয়তা যখন ফ্রান্সে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হতে চলেছে—সেই সময় ত্যগ'লের দেশ-বাসিরা তাঁকে আবার প্যারিসে ফিরিয়ে আনলেন।

জেনারেল ত্যগ'ল

ত্যগ'ল সেদিন যে প্যারিসে ফিরে এলেন সে প্যারিস '৪২এর প্যারিস নয় '৫৮-র প্যারিস। অগণিত রাজনৈতিক দলের মাতামাতিতে সে প্যারিস বিপর্যস্ত। আলজিরিয়ার সমস্যায় সে প্যারিস হতোদ্যম ও হতাশায় পরিম্রিয়মাণ।

ত্যগ'ল তাঁর দেশের অবস্থা সেদিন বোধহয় ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ছয় মাসের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবী করলেন। মৃতপ্রায় ফরাসীজাতি দ্বিরুক্তি না করে একনায়কতন্ত্রের মত ত্যগ'লের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিলেন।

গণতন্ত্রের কাঠামোকে বজায় রাখতে—দেশের সংহতিকে রক্ষা করতে, ত্যগ'লকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণে ফরাসীদের সেদিন কোন দ্বিধা ছিল না।

১৯৬৫ সালে প্যারিসের চেহারা আবার পাল্টেছে—আলজিরিয়ার সমস্যা নিয়ে আজকের ফরাসীরা আর বিব্রত নন। দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অবস্থাও আর নেই—ইউরোপের মধ্যে সেরা শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে ফ্রান্স আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আজকের ফ্রান্স বিশ্বরাজনীতির অন্যতম নিয়ামক—আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোরালো খেলায় অন্যতম পাকা খেলোয়াড়। ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট সম্পর্কে ফ্রান্সের মনোভাব নিয়ে আজ বিভিন্ন মহলে চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে—'ন্যাটো'র শক্তিজোটের ফ্রান্স আজ প্রধান শরিক। আণবিক শক্তির পরিমাণ আজ ফ্রান্স গর্বিত। ১৯৬৫'র ফ্রান্সে তাই এক পরিবর্তিত

অবস্থার মধ্যে ডগলকে ত্রিমুখী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল। যদিও নির্বাচন প্রধানতঃ দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—জেনারেল ডগল ও কমিউনিষ্ট সমর্থিত অকমিউনিষ্ট প্রার্থী ফ্রাঁসোয়া মিত্তারাঁদ।

১৯৬৯ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত ডগল ১৯৬৫ সালে ফ্রাঁসোয়া মিত্তারাঁদকে অনেক ভোট ছেড়ে দিতে হল (শতকরা ৫১টি ভোট)। ডগল মাত্র ৪৪ শতাংশ ভোট পেলেন।

আবার পুনর্নির্বাচনের ও সম্মুখীন হতে হল ডগলকে। যে পুনর্নির্বাচনের কথা বোধহয় কয়েকদিন আগে ডগল স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ফরাসী জাতিকে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার গৌরবে মহিমান্বিত ডগল এক বিরাট আঘাত পেলেন সন্দেহ নেই।

ডগল পুনর্নির্বাচনে অবশ্য ৫২% ভোট পেলেন এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে ও অনেকটা সংহত করলেন কিন্তু ডগলপন্থীদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনমতের প্রভাবশালী একাংশ যে সক্রিয় ভাবে কাজ করছেন এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল।

প্রতিদ্বন্দ্বী মিত্তারাঁর রাজনৈতিক সমালোচনা ছাড়াও ডগলের বৃদ্ধবয়স এবং তাঁর পক্ষে আরও ৭ বছর কাজ চালানো সম্ভবপর নয় বলেও ভোটারদের আশঙ্কিত করে তুলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ৭৩ বছরের ডগল আবার এমন সময়ে রাষ্ট্রপতি পুর্নির্বাচিত হলেন যখন তাঁর সমবয়সী ও এককালের রাজনৈতিক সহযোগীরা অনেকেই আর জীবিত নেই।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে আজকের ফ্রান্সের উন্নত অবস্থা সৃষ্টিতে ও '৫৮ সালের ফ্রান্সের চরম সঙ্কটকালে ডগলের বিরাট ভূমিকা ছিল কিন্তু অতীতের কার্যকলাপ যে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য অর্জনের একমাত্র মাপকাঠি নয় ডগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও মিত্তারাঁর এত ভোট পাওয়া তার একটি মুখ্য কারণ।

ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট, ন্যাটো প্রভৃতি সম্পর্কে ডগলের নীতির কোন পরিবর্তন হবে না, ডগল পুরনো নীতিকেই আঁকড়ে থাকবেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এব্যাপারে অবশ্য সবচেয়ে শঙ্কিত বৃটেন ও আমেরিকার সরকারী মহল—কারণ ডগলের অনুসৃত নীতি এঁদের পক্ষেই সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ন্যাটোর সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক ইদানীং যে রকম তিক্ত হয়ে উঠেছিল, এবং ডগল যেভাবে 'একলা এগিয়ে চল' এই নীতি অনুসরণ করছিলেন তাতে পশ্চিমী মহলে বিশেষতঃ জনসনের দেশে রীতিমত দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল।

ডগলের পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জয়লাভে তাঁরা যে আরও মুষড়ে পড়বেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করার জন্য ডগল হয়ত নিজের পুরনো পথেই এগিয়ে চলবেন, মার্কিনী রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই এই ধারণা। ডগলের মত ব্যক্তিত্ব-সচেতন মানুষ গণমতের দাবীর জন্য নিজের নীতিকে পুনর্নির্ধারণ করবেন এ প্রত্যাশা না করাই বোধহয় সঙ্গত।

— — —

॥ এ বছরের শ্রেষ্ঠ বই ॥

তারাশংকরের

গন্ধা বেগম ৮৲ সংকেত ৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম উপন্যাস

স্বপ্নতনু ৪৷৷০

প্রমথনাথ বিশীর

চিত্র ও চরিত্র ৬৲

নবেন্দু ঘোষের নূতন উপন্যাস

কারাহীনের কাহিনী ৫৲

বাণী রায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের নবতম উপন্যাস

প্রথম তারার আলো ১০৲

বিমল করের উপন্যাস

পরবাস ৪৷৷০ পান্থশালা ৩৷৷০

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের

নূপুরের মত ৮৲

জ্যোতিকুমার চৌধুরীর ভ্রমণকাহিনী

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪৷৷০

সুরেশচন্দ্র সান্যাল

চেরিফুলের দেশে ৪৷৷০

অবধূতের

কলিতীর্থ কালীঘাট ৫৷৷০

হিংলাজের পরে ৫৲ বশীকরণ ৪৷৷০

চিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

লাইব্রেরীতে রাখার মতন বই।

সবেমাত্র প্রকাশিত।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

আধুনিকতম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

অর্চ্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

আধুনিক কবিতার আর একখানি

উল্লেখযোগ্য বই—

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

সাগর আকাশ

দাম—২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ

7563
.0088

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

মহাশূন্যে বিচরণ

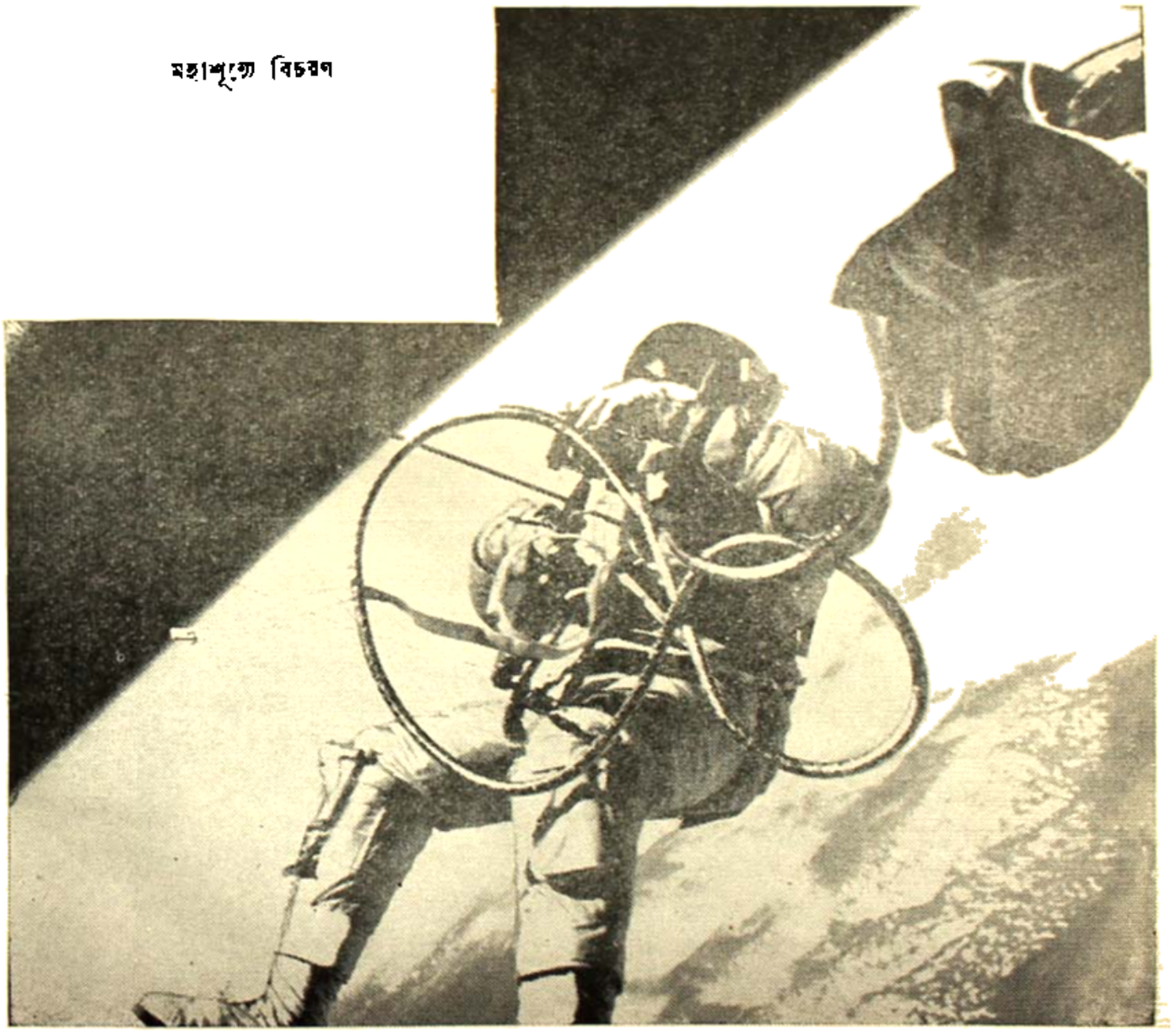

অতল সমুদ্রের রহস্য সন্ধানে :

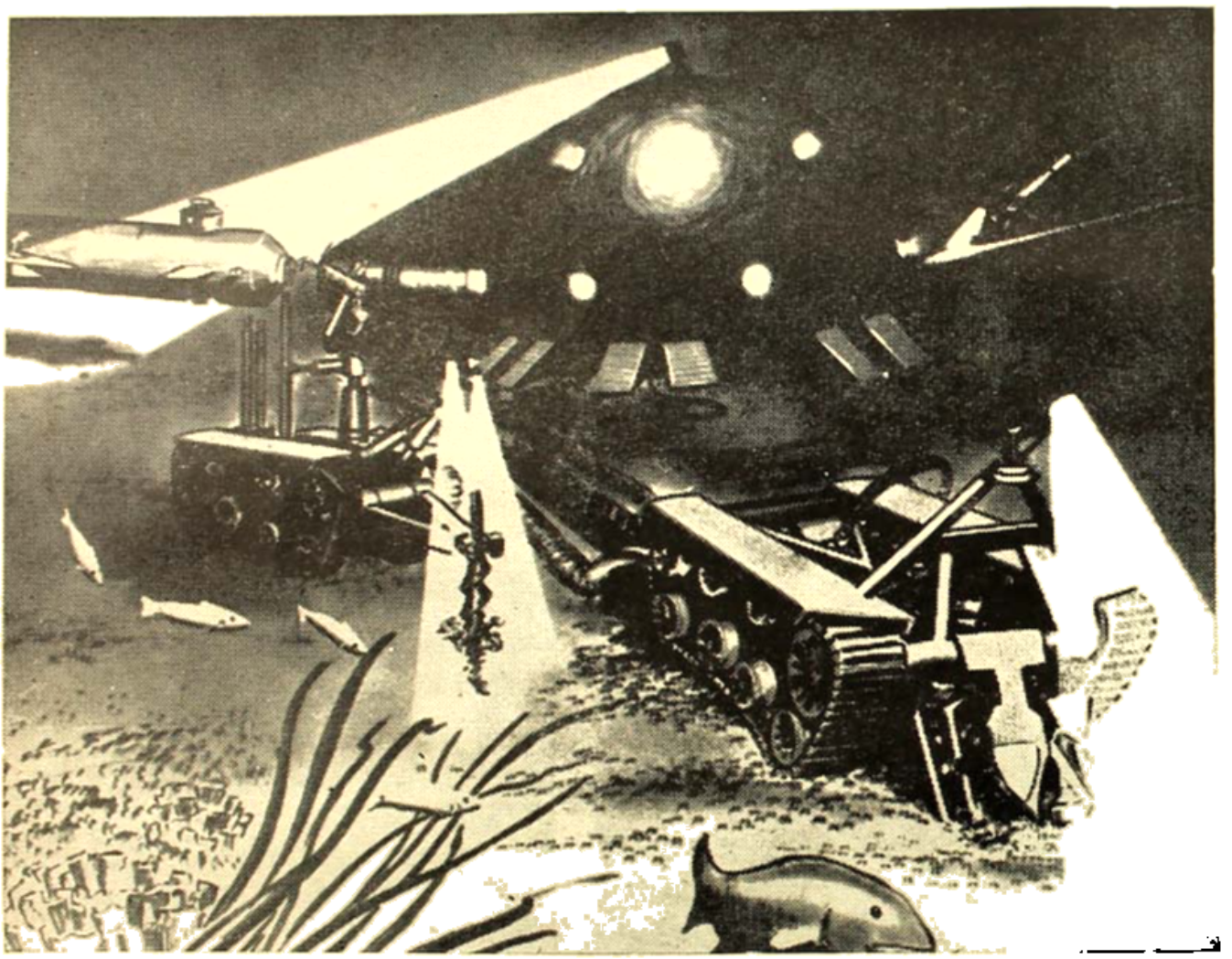

এই সব বিস্ময়কর যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতল সমুদ্রের তলার সঞ্চিত ধাতব সম্পদ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা হবে।

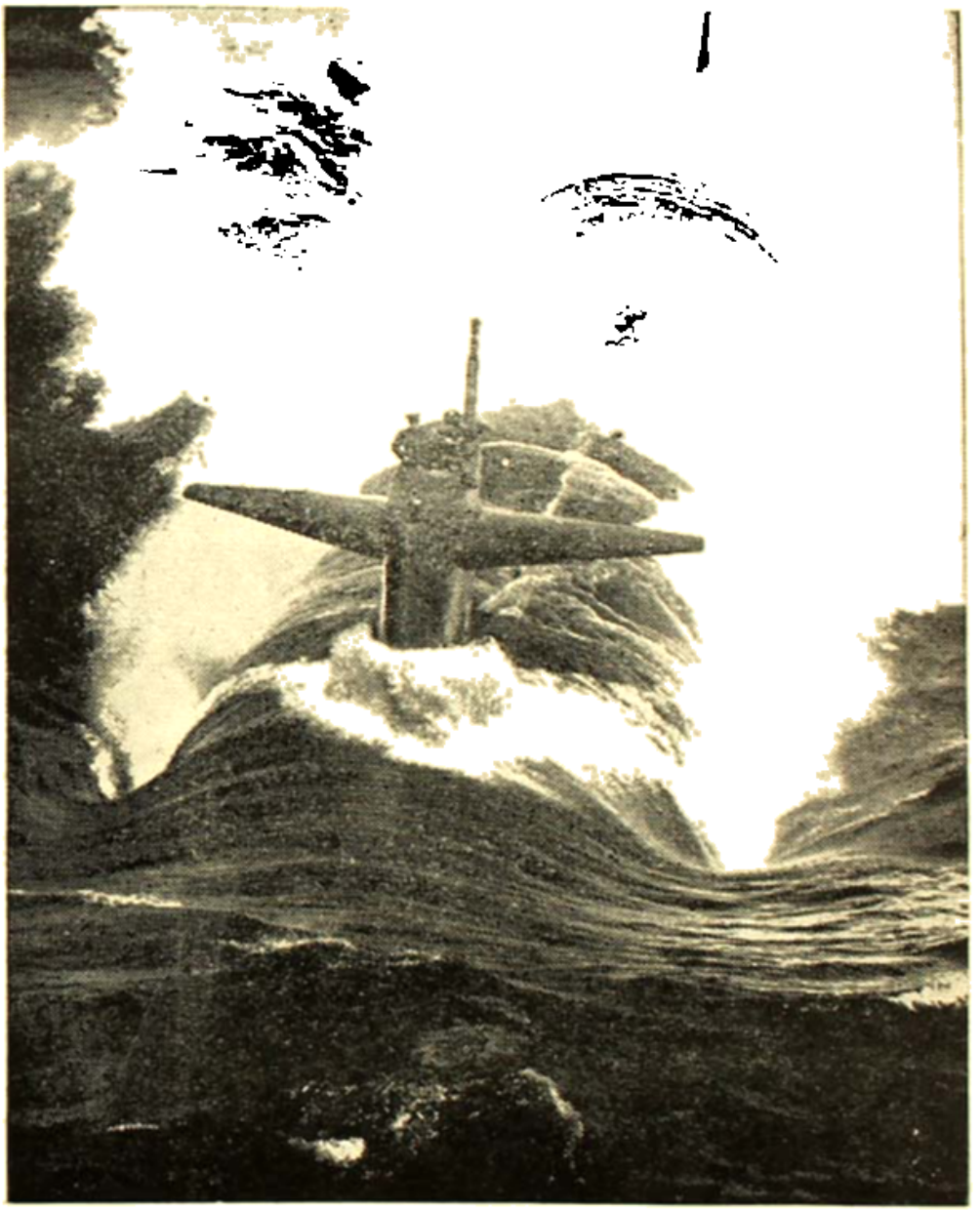

আমেরিকার বিখ্যাত পক্ষযন্ত্রচালিত ডুবো

দক্ষিণ মেরু অভিযানের নূতন প্রচেষ্টা। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ম্যাকমার্ডো সাউণ্ড তুষারাবৃত সমুদ্রের নীচে এই পর্য্যবেক্ষণ কক্ষটি স্থাপন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এর সাহায্যে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য সংগ্রহ করবেন।

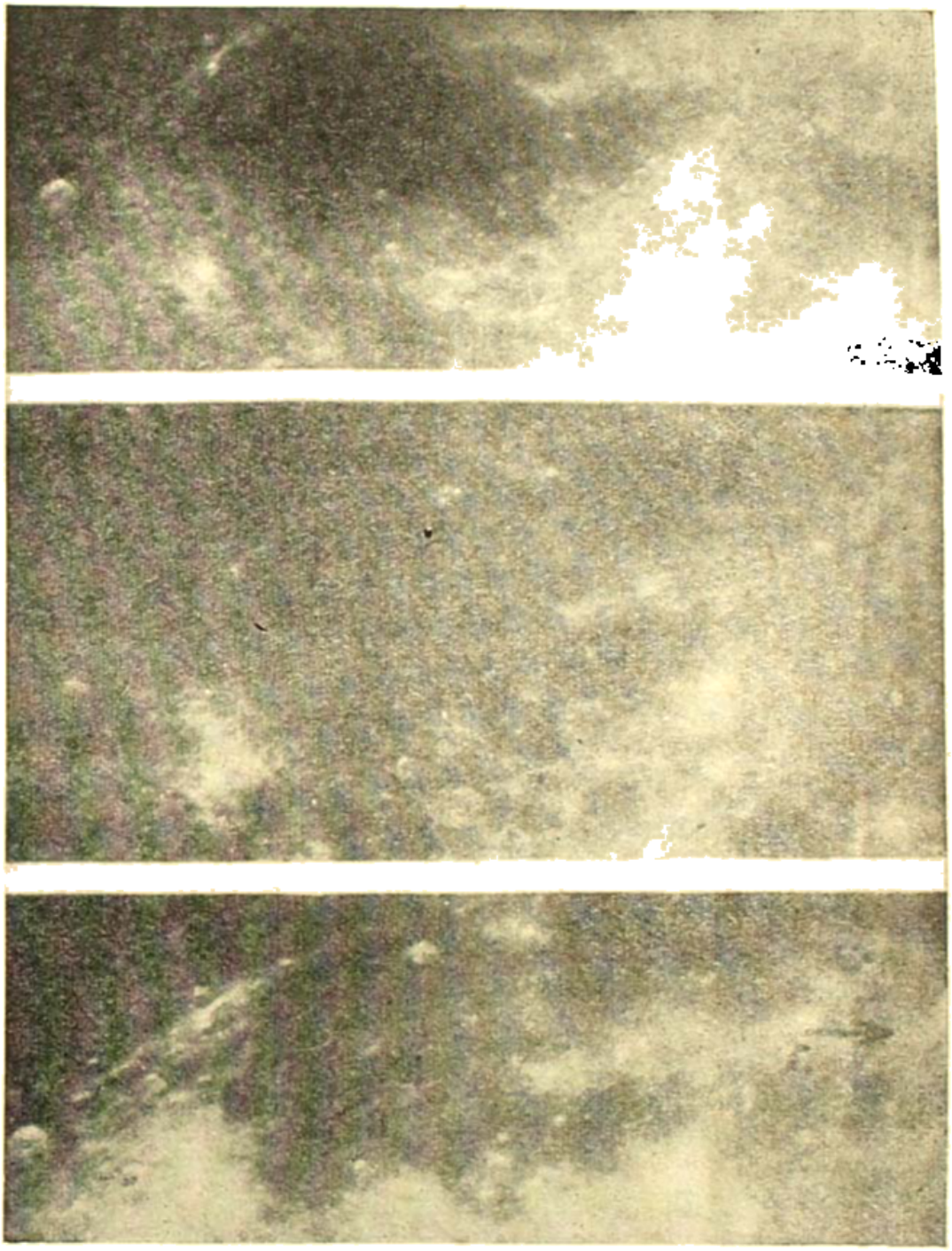

• ঐতিহাসিক 'লুনা-পাঁচের চন্দ্রে অবতরণ :
লুনা-এ সোভিয়েত দেশ থেকে ১১ই মে তে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

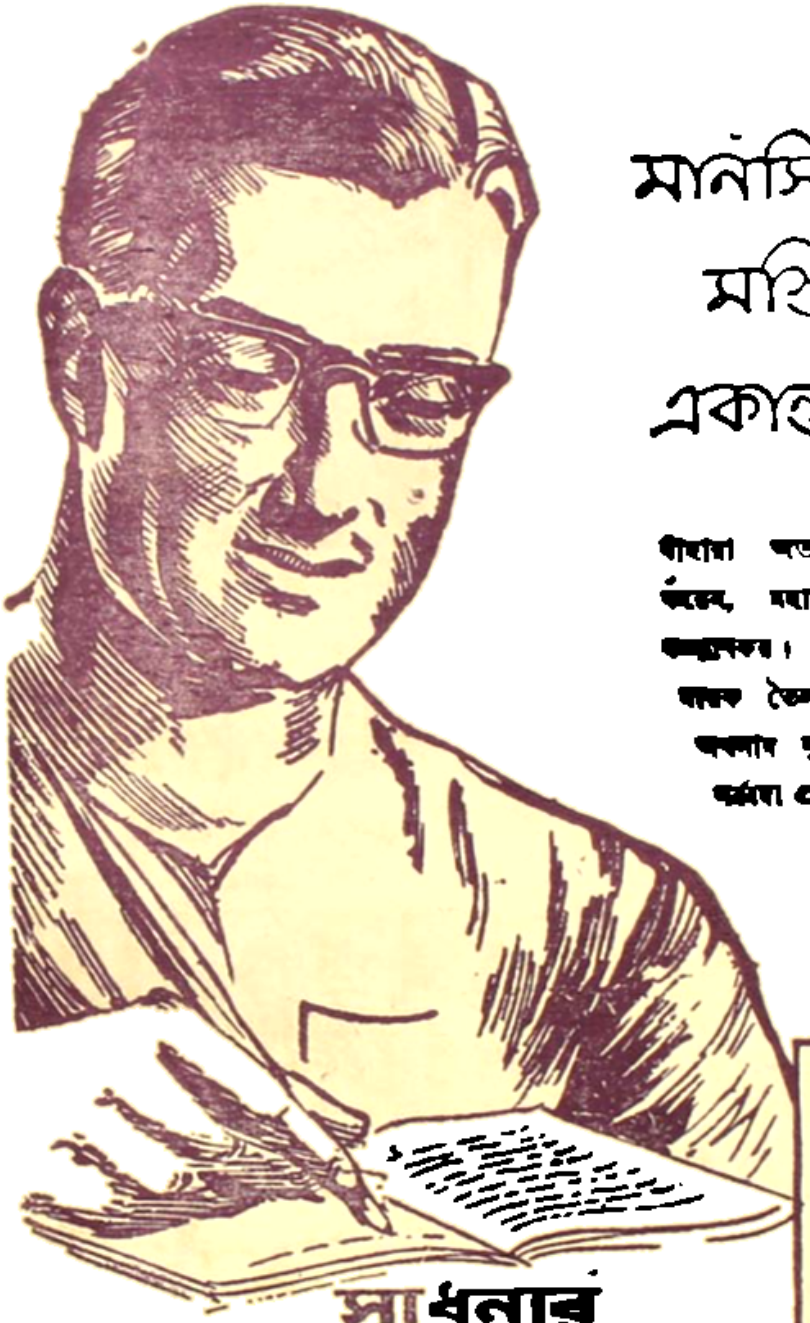

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম বন্ধুস্বরূপ। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সকলপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মস্তিষ্ক সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-চাকা

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,

ডাক্তার ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.

29 SEP 1965

একাধারে
স্বাস্থ্য ও
আনন্দ !

সুপ্রসিদ্ধ
লক্ষ্মীঘি
দুইই দেয়

½ কিলো টিনও পাবেন।

গল্প-ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৭২

লিলি বিস্কুট

সকলেই পছন্দ করেন

কয়েকটি নামকরা বিস্কুট

থিন এরারুট
বোকটন ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মাল্টো

লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নির্বাচিত ভারতীয় শিশু প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

রাশিয়া সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী :

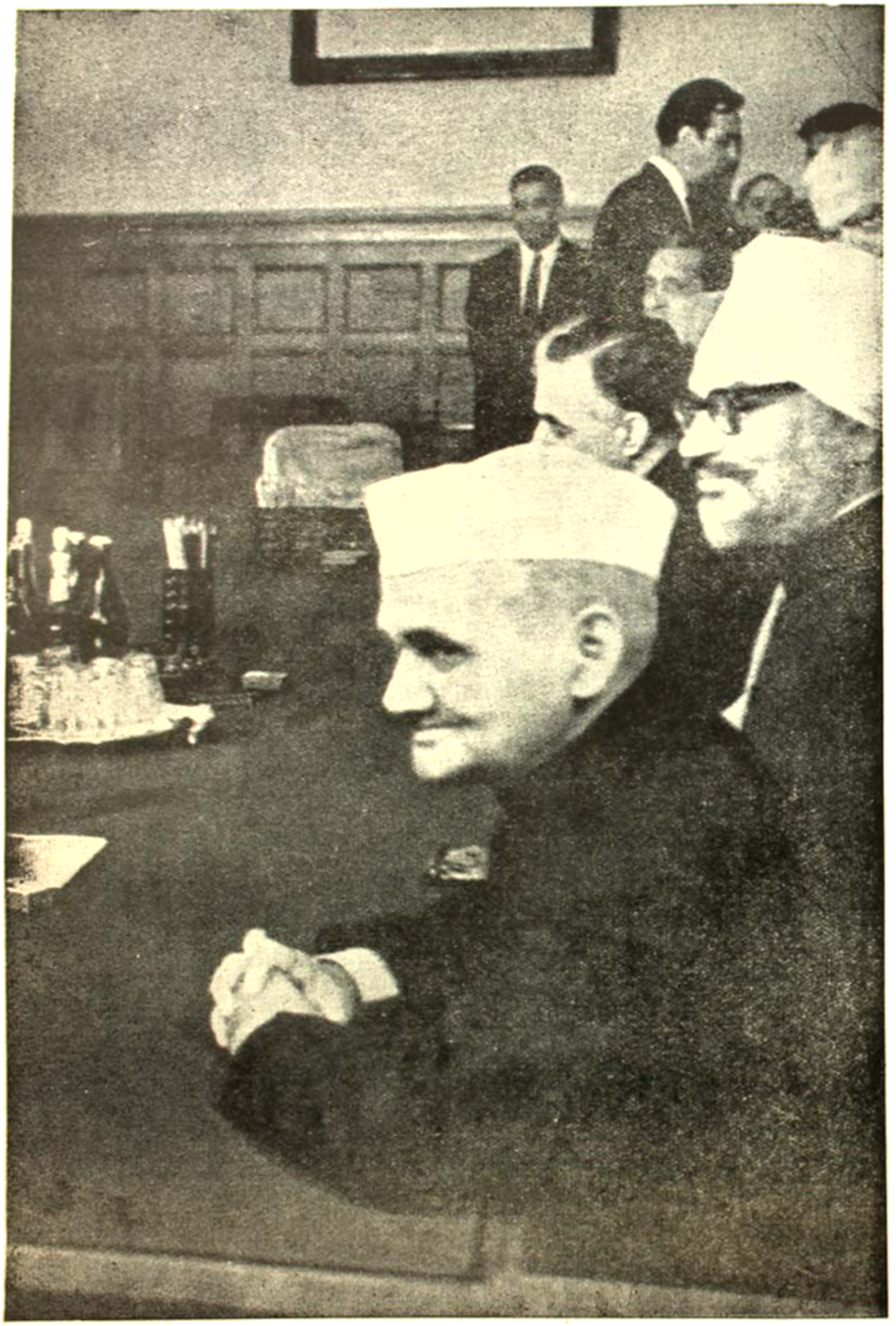

মস্কোর বিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদে ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও সর্দার শরণসিং

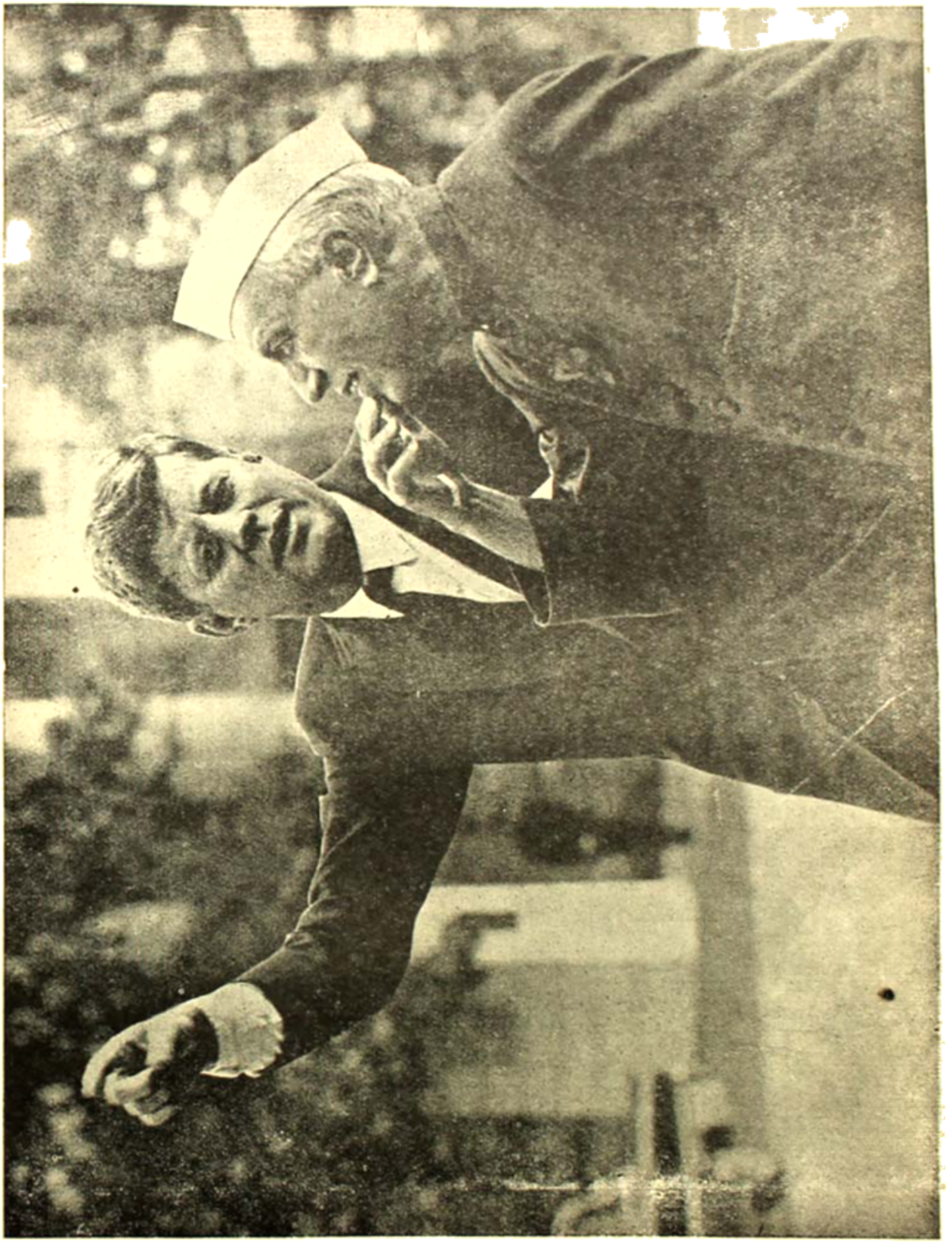

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যস্থ সিংহ—মাদীবলা হুহুর ঐতিহাসিক মূর্ত্তিতে।

বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার, এ, কুপিনের লেখা "লাল পাথরের বাজুবন্ধ" আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য।

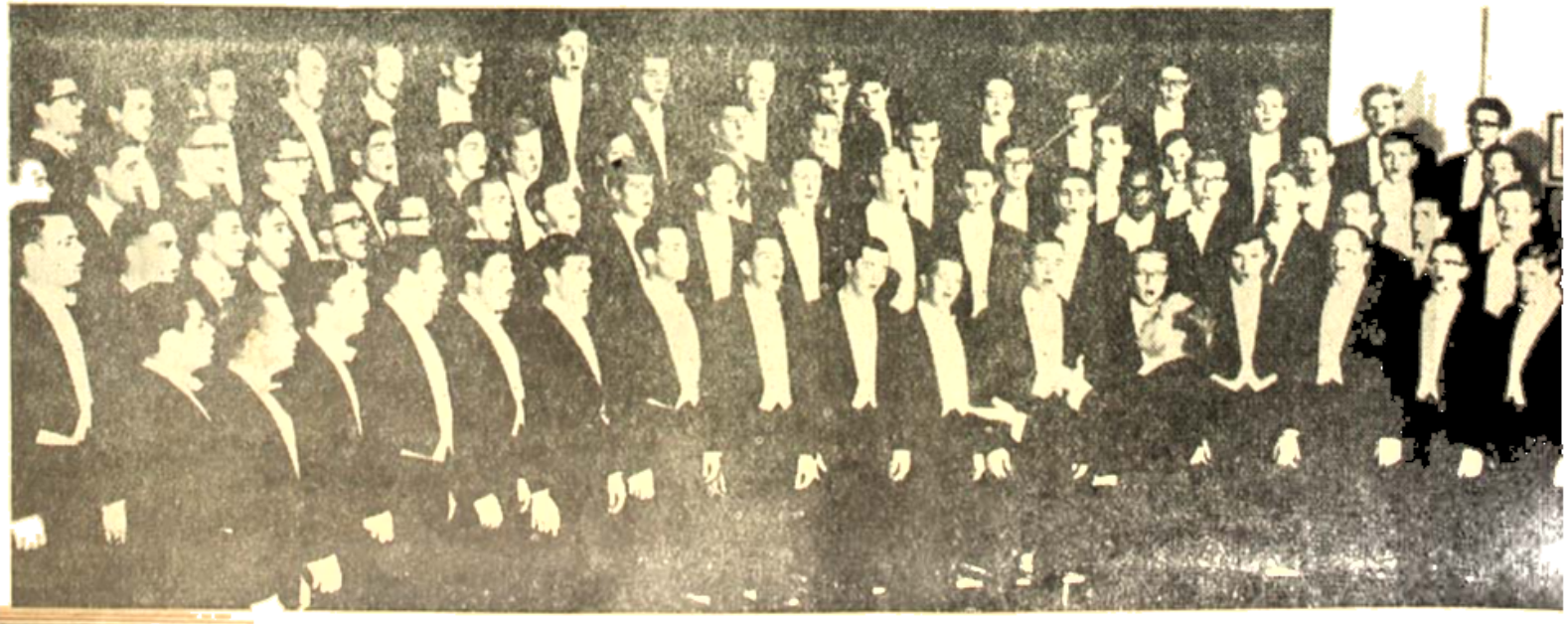

আমেরিকার

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার কুপ্রিনের লেখা "লাল পাথরের রাজবধূ" চলচ্চিত্রের নায়িকা এ যুগের জনপ্রিয় রুশচিত্রাভিনেত্রী আরিয়দনা শেলবেনায়া।

সোভিয়েত রাশিয়ার পোষাকের ফ্যাশন :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ফ্যাশনে সজ্জিতা রুশতরুণী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ফ্যাশনে সজ্জিতা রুশতরুণী।

সেলুলার জেলের পরিকল্পনা ইংরেজ শাসনকর্তাদের পক্ষে নূতন নয়। ১৮৭২ সনে ব্রিটেনে Pentonville Prison তৈরী হয় এক শ'র ওপর কয়েদীর জন্য। 'পেন্টনভিল প্রিজন'-এর ছিল পাঁচটি উইংগস্ পাঁচদিকে ছড়ানো আর ঠিক মাঝখানে প্রহরীর জন্য একটী 'ওয়'চ টাওয়ার'।

তারই অনুকরণে আন্দামানের দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের জন্য তৈরী হল সেলুলার জেল। পাঁচটির জায়গায় সাতটি উইংগস্ এবং কেন্দ্রস্থলে সেন্ট্রীর ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকে নজর রাখবার জায়গা, সমস্ত উইংগস্‌গুলি ঘিরে চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। প্রত্যেকটি উইংগস্ বা মহল তিনতলা, এক এক সারিতে তেত্রিশটী করে সেল, দুই একটী মহলে কম বেশীও আছে। সব মিলিয়ে আগে সাতশ ছাপ্পান্নটি সেল ছিল। সেলের সামনে চাকা লম্বা বারান্দা, তাতে মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো। অসংখ্য সেলের জন্য জেলখানাটির নাম হয়েছিল 'সেলুলার জেল', সেকালে যার নাম শুনলে অতি বড় দুর্দান্ত কয়েদীরও বুক কেঁপে উঠত।

মানুষ টানা লোহার ঘানি।

প্রত্যেকটি 'উইংগস'-এর মাঝখানে উঁচু পাঁচিল তোলা, যাতে কোন কয়েদী একটা থেকে অন্যটাতে পালাতে না পারে। সমস্ত জেলটি এমনভাবে তৈরী যে, যে কোন উইংগস্ থেকে কয়েদীরা বার হলে ঘুরতে ঘুরতে তাদের সেন্ট্রাল ওয়াচ টাওয়ারে এসে সেন্ট্রীর নজরে পড়তে হবে।

জেল কম্পাউণ্ডের এক কোণায় ফাঁসীর মঞ্চ। ছোট একটী ঘর তার নীচে আর একটী ঘর। এক সঙ্গে দুই জনকে ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা ছিল। ঘরের মাঝখানে দুইটি ফাঁকা গর্ত। ফাঁসীর পর মৃতদেহ সেই গর্ত দিয়ে নীচের ঘরে ফেলে দেওয়া হত। আর একটী ঘরে দেখলাম মানুষ-টানা ঘানি। হঠাৎ দেখলে বিরাট একটি লোহার হামা দিস্তা মনে হয়। জেলার মিঃ হর্ষে বললেন, ঘানি টানবার সময় কাঠের সঙ্গে জোড়া দিয়ে দিস্ত বিরাট লোহার মুগুরের মত জিনিষটি এবং কয়েদীরা সেই কাঠ ঠেলে ঠেলে ঘানির চারপাশে ঘুরত।

ঘরের উল্টো দিকে একটি মানুষ-সমান লম্বা লোহার ফ্রেম দেখে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জিনিষটা কি? মিঃ হর্ষে বললেন, সেটী হল flogging frame. ফ্রেমের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় কয়েদীকে পুরে হাত পা চাবি দিয়ে আটকে দিত এবং নিয়ম ছিল এত ঘোরে চাবুক মারতে হবে যাতে তিনঘারের বার গায়ের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে।

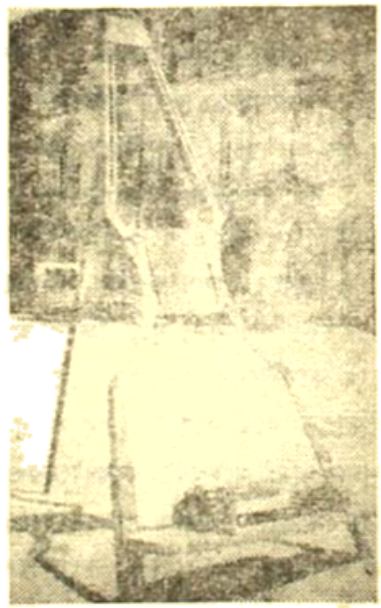

চাবুক মারার আগে উলঙ্গ অবস্থায় কয়েদীদের হাত পা বেঁধে এই লোহার ফ্রেমের মধ্যে পুরে চাবি দিয়ে আটকে দেওয়া হত।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অনন্ত চন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ বি, এম্-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ্.সি.এস. (লণ্ডন) এফ্.সি. এস.(আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব ডেমনস্ট্রেটর ডাঃ অমল চন্দ্র সেন এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

Cover printed by
EASTERN ART PRESS, CALCUTTA 12.

Regd. No. CJ643

2 9 SEP 1965

একাধারে স্বাস্থ্য ও আনন্দ !

সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীঘি

দুইই দেয়

১/২ কিলো টিনও পাবেন।

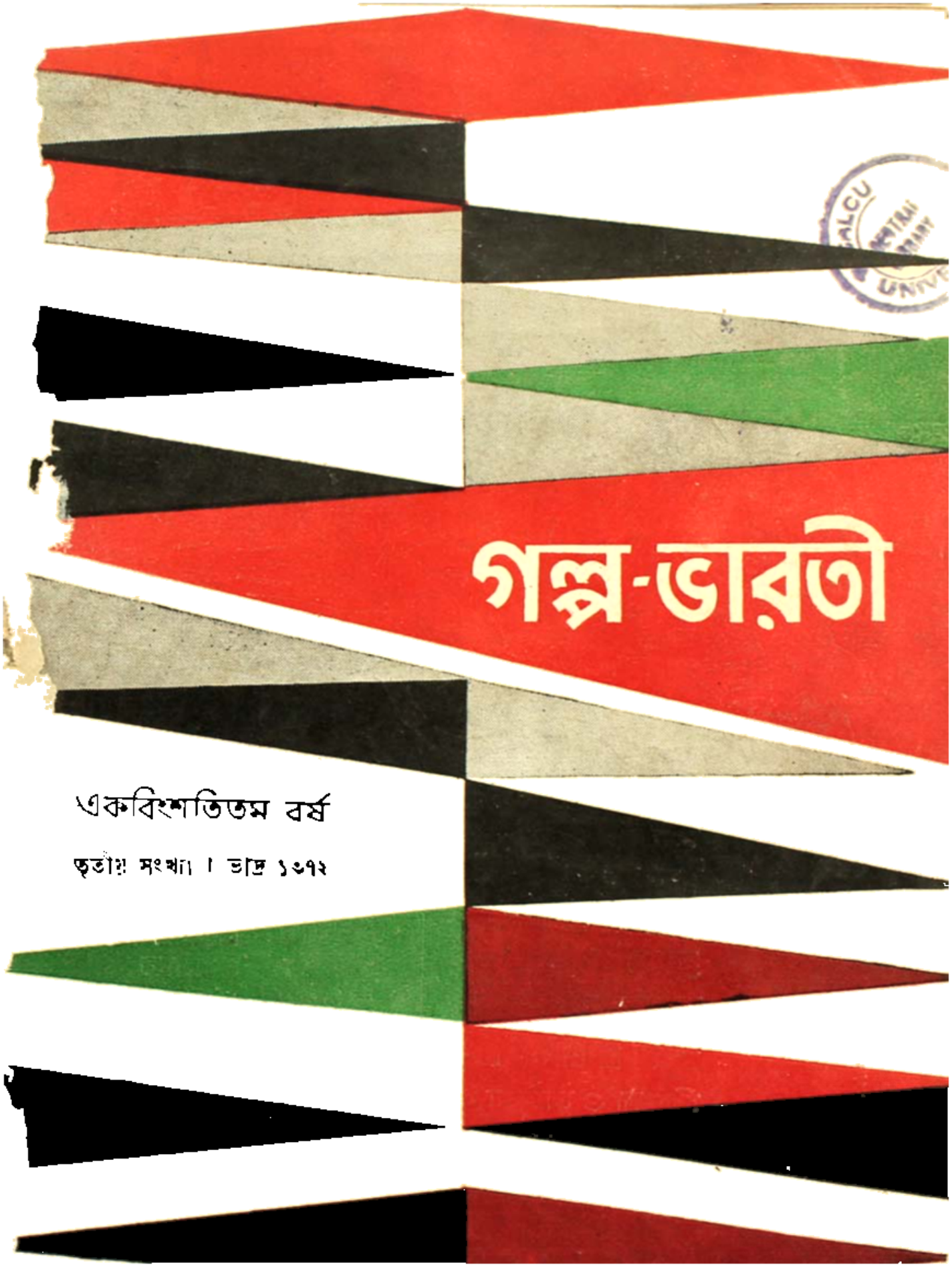

গল্প-ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা । ভাদ্র ১৩৭২

প্রসবের পূর্বে ও পরে
আদর্শ পথ্য
ও পানীয়

লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি

বিশুদ্ধ ও টাটকা

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত।

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

মহাকাশচারী গর্ডন কুপার (বামে) ও চার্লস কনরাড জে'মিনি মহাকাশযানে ৮ দিন অবস্থান করেছেন।

প্রাচ্য নৃত্যকলি প্রখ্যাত সোভিয়েত নৃত্যশিল্পী মিখাইল ঈশ্বিয়েফ।

মস্কোর বোলশয় থিয়েটারে নূতন
নৃত্যনাট্য প্রেম কাহিনী-র মেহবেনের
ভূমিকায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের
বিখ্যাত শিল্পী মায়া প্লিসেৎস্কায়া।

পৃথিবী বিখ্যাত সোভিয়েত সার্কাস শিল্পী ভালেন্তিন ফিলাতোফ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

বাণিজ্য ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

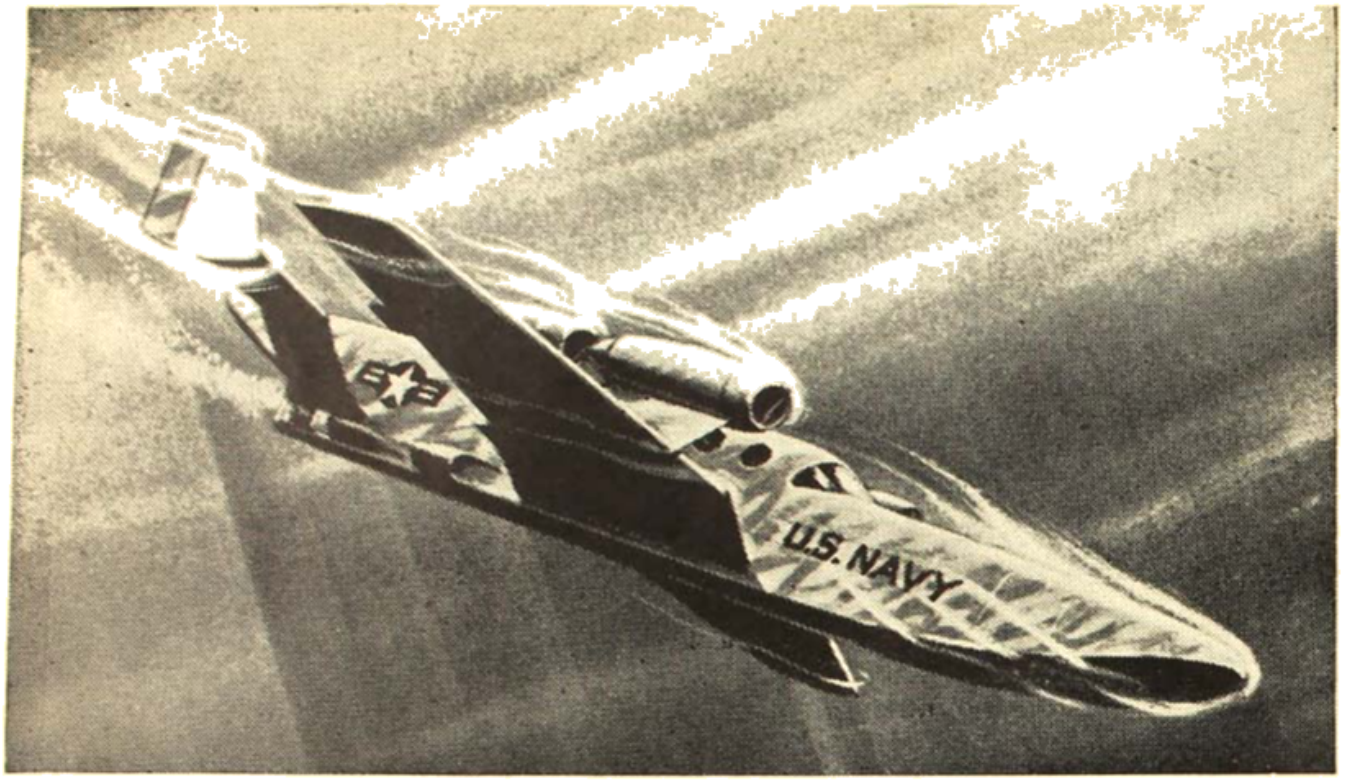

মার্কিন নৌবাহিনীর বিখ্যাত সী-প্লেন। সমুদ্রের জলের মধ্যে চলে এই উড়োজাহাজ।

আমেরিকার বিখ্যাত সানফ্রান্সিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথায় শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

সোভিয়েত রাশিয়া—

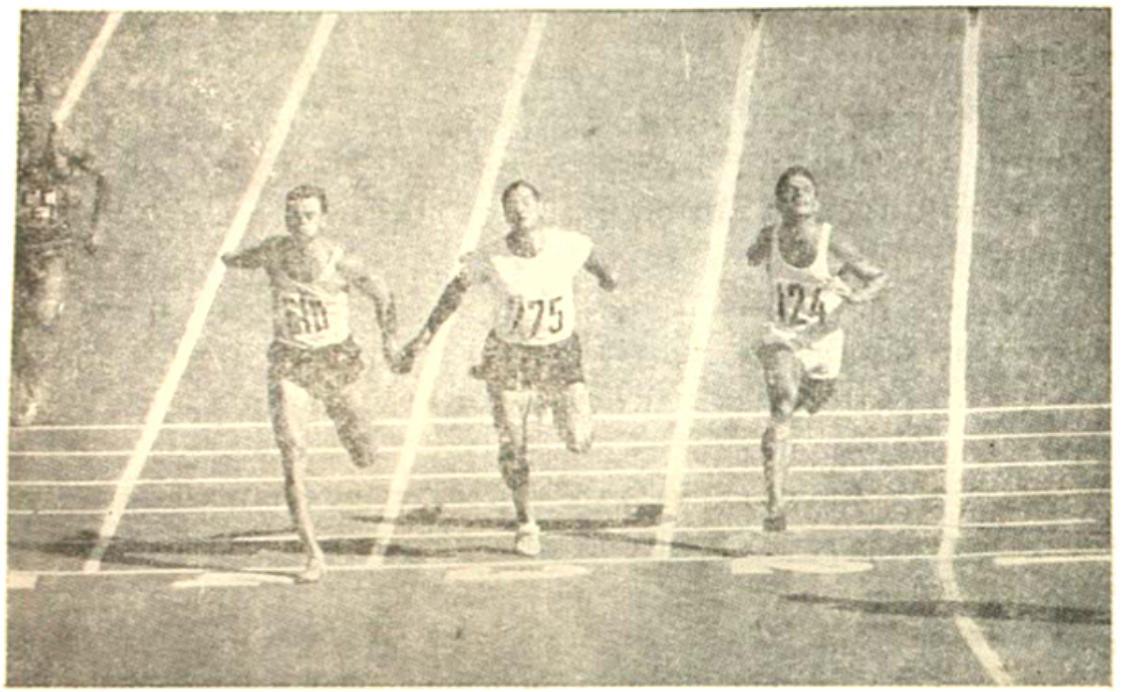

মস্কোর দেশের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতায় বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ রেইন আউন।

রাশিয়া—

আইসর নেট্টো রাশিয়ান নাইট উপাধির সমতুল্য "অর্ডার অব লেনিন" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার ১০ মিনিটের মধ্যে ভেরীনিনাহের পর খেলাটি বন্ধ রাখা হয় এবং ৩৬ বৎসর বয়স্ক নেট্টো কেপ্টেনের প্রতীক বাহুবন্ধ প্রত্যর্পণ করেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের নেতা হিসাবে তার দেশের পক্ষ হয়ে তিনি ৫০ বার এই সম্মানের প্রতীক ধারণ করেছেন।

লেফট হাফব্যাক নেট্টো তাঁহার ১৩ বৎসরের আন্তর্জাতিক খেলার জীবনে ৫৮টি বিজয়ীর শিরোভূষণ লাভ করেছেন। নেট্টো ইংরাজদের খেলার খুব প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, উহা সহজ, সরল ও প্রত্যক্ষ।

রাশিয়াতে আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় একটি নূতন উপাধির প্রবর্তন করা হয়েছে। এর নাম "মাষ্টার অব স্পোর্টস ইন্টার ন্যাশনেল ক্লাস"। যে সকল খেলোয়াড় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম ছয়জন ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন জনের মধ্যে হবেন কেবল তাঁরাই এই উপাধি লাভের যোগ্য হবেন। যে সব ক্রীড়াবিদ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এথলেটিকস্, সন্তরণ ও স্কেটিংএ বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করবেন তাঁরাও এই উপাধি লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

ব্রিটেন—

কাউন্টি ক্রিকেট খেলায় মিডল্‌সেক্সের হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে ইয়র্কশায়ার মাত্র ২০ রান করেন। ৫৪ মিনিট খেলাতে এক সময় ডেভিড হুয়াইট ১০ রানে ৭টি উইকেট লাভ করেন। ১০টি ওভার বল করিয়া তিনি ৭টি মেইডেন লাভ করেন। ইয়র্কশায়ার ক্যাপটেন ব্রায়ান ক্লোজ প্রথম শ্রেণীর বলের প্রশংসা করেন এবং বলেন, বলই তাহাদিগকে হারাইয়াছে পীচের কোনও ত্রুটির নাই।

যুক্তরাষ্ট্র—

অষ্টোত্তর শত বিশ্ব বেতিওয়েট চ্যাম্পিয়ান স্থির করার জন্য মেইন প্রদেশের লিউইস্টন সহরে যে মুষ্টিযুদ্ধ হয় তাহাতে ঘুষের রাজত্বই আমরা দেখিতে পাই। এই মুষ্টিযুদ্ধের বিজেতা খেলার নিয়মগুলি একেবারেই জানতেন না। আক্রমণে দাঁড়াতেই পারতেন না। রেফারি গণনা করতে পারতেন না এবং সময়রক্ষক সময় বলতে পারেন নি। এসবের ফলে যে ঘুষের মাশুল দিতে হয়েছে, তা হল সব চেয়ে কম সংখ্যক দর্শক-এর (মাত্র ৪ হাজার) সামনে উহা অনুষ্ঠিত হয়, টেলিভিসনে কিন্তু ৮ কোটি লোক এই প্রতিযোগিতা দেখেন।

দিল্লীতে বাস্কেট বলের এক প্রদর্শনী খেলায় আমেরিকার বিখ্যাত ফ্রিং ফিল্ড বল।

আমেরিকার বিখ্যাত সাঁতারু ডঃ ও' কোনর নয়াদিল্লীর
ন্যাশনাল ক্লাবের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছেন।

পোল্যাণ্ড—

১৯৫০ সালে রাগবি পোল্যাণ্ডে আসে। গত বছর পূর্ব জার্মানি, সুইডেন ও ডেনমার্কের উপর জয়লাভ করায় রাগবি খেলার উন্নতির জন্য পোল্যাণ্ড সরকার অর্থ প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিদেশ থেকে কোচ এনে খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার কথাও হয়েছে।

হাঙ্গেরী—বিশ্ব ছাত্রদের খেলাধূলার উদ্বোধন

২০শে আগষ্ট হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত সহরে বিশ্ব ছাত্রদের চতুর্থ বার্ষিক খেলাধূলার প্রতিযোগিতার সরকারীভাবে নেপল ষ্টেডিয়ামে আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে শত শত পটকা ফাটান হয় ও পাঁচ হাজার পায়রা উড়ান হয়।

৫৫টি দেশের দু'শত এথলিট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র হাঙ্গেরীয় হর্ষক আনন্দ ধ্বনি করতে থাকেন। এটা তাঁদের বিশেষভিত্তম প্রজাতন্ত্র বার্ষিকী।

হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করতে উঠে বলেন যে, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হবে।

নয়দিন ধরে এথলেটিকস্, সুইমিং, ডাইভিং, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, ওয়াটার-পলো, ফেন্সিং ও জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

আয়ঃ চা ঘোষ এম্ (ঘোষ), এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম্.সি.এস. (লণ্ডন) এম্.বি. এস.(অস্ট্রেলিয়া), ভাগলপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কৃতকৃতী অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র গঃ মহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

Cover printed by
EASTERN ART PRESS, CALCUTTA-12.

একাধারে
স্বাস্থ্য ও
আনন্দ !

29 SEP 1965

সুপ্রসিদ্ধ
লক্ষ্মীঘি
সুইই দেয়

½ কিলো টিনেও পাবেন।

গল্প ভারতী

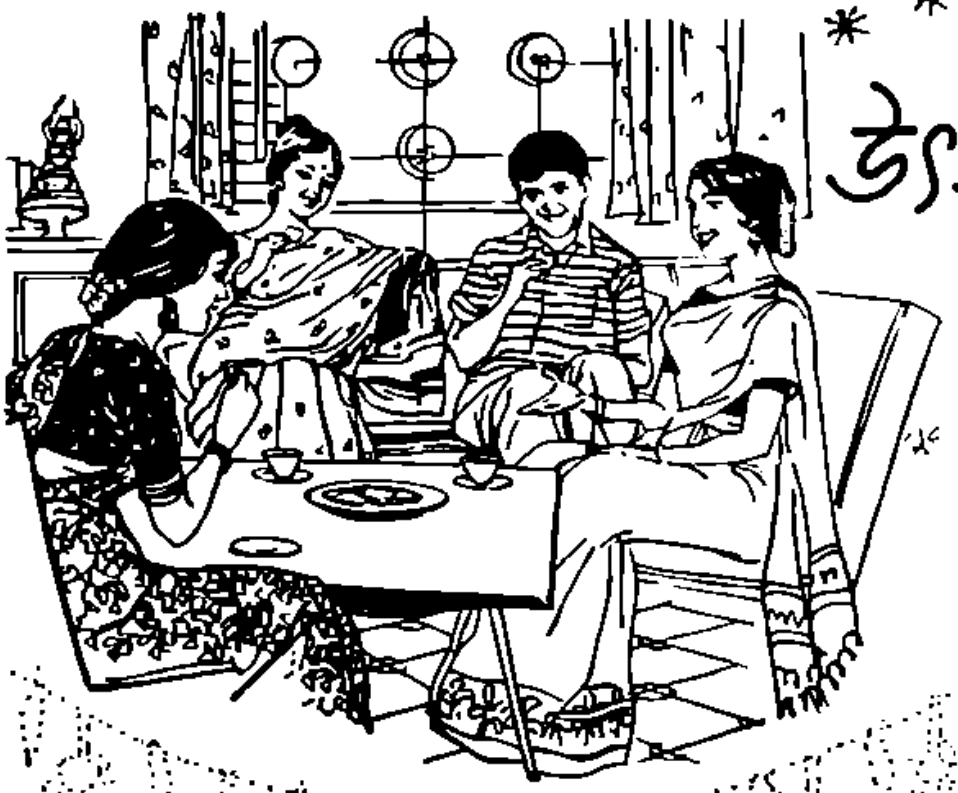

উৎসবের দিনে

লিলি বিস্কুট

অফুরন্ত আনন্দ দান করে

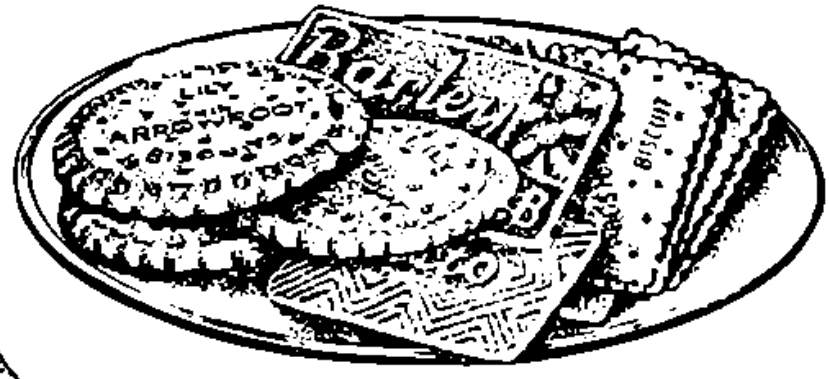

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

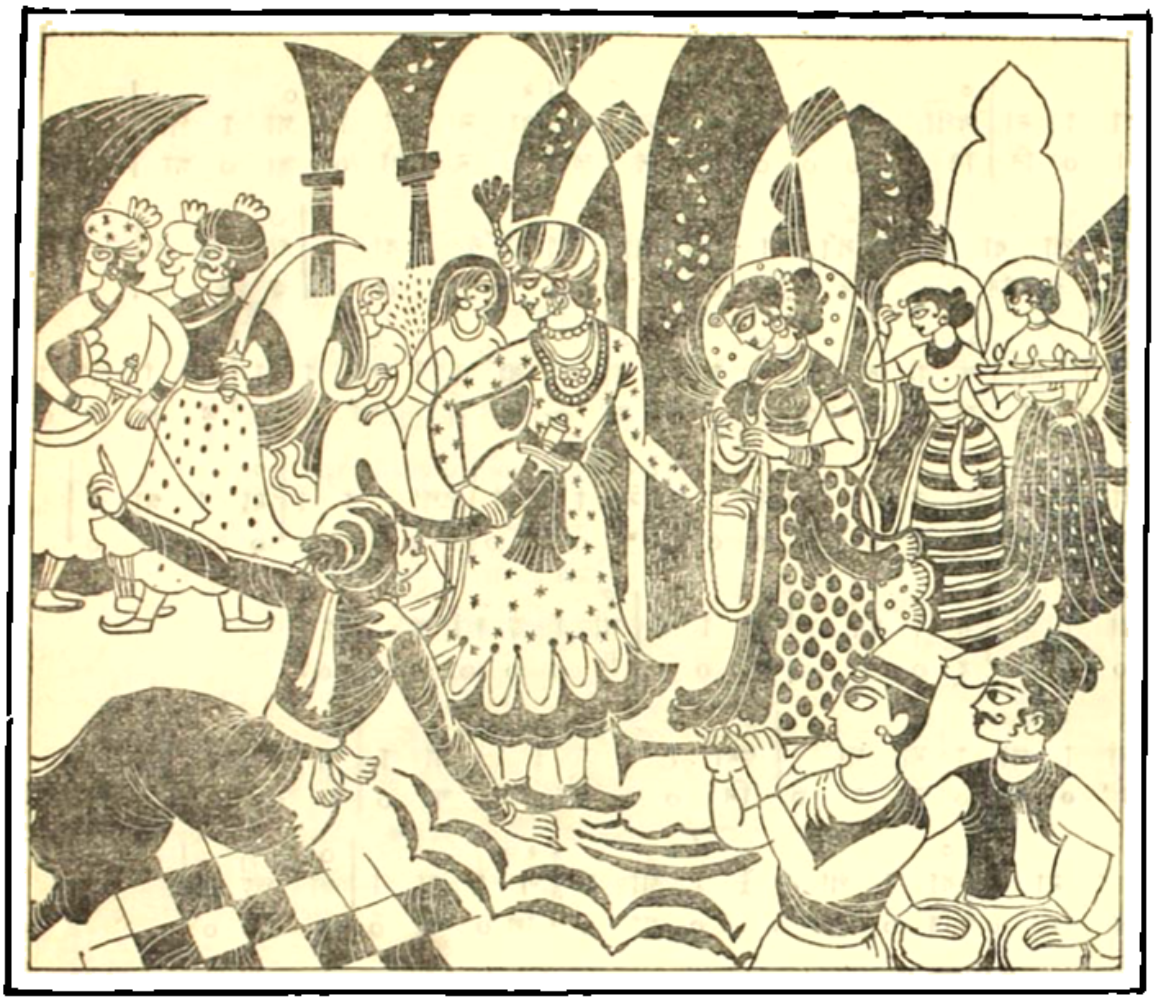

অতীতের এক গ্রামের সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে যাদোগড়ের রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু···।' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে পতিতের মিলনে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস··· লেলিহান হ'ল চিতার আগুন···

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভ্রমণ ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-SRI A 8424

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ

উৎসবের দিনগুলি
গানে গন্ধে রূপে
রসে ভরে উঠুক্—
সার্থক হোক্ মাতৃপূজা।

এনামেলের বাসন

খাস জনতা
(টাইপ ৩১)

খাস জনতা

দীপ্তি লণ্ঠন

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৬৭, ৭৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫৪১১-৩

KALPANA.OM.46

বিশেষ উৎসবে
বিশিষ্ট জিনিষটিই চাই

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

মেসার্স মেডিকেল হলস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটি, কটক,
মধুপুর, কানপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, আগ্রা ইন্দোর

PX-DMK/B-2/11

গোলাপের যুদ্ধ

মহাশ্বেতা দেবী

উপন্যাস

সেই সুরু।

তারপর কবে যে কমল ডাক্তার এ পৃথিবীতে তার আপনতম লোক হয়ে গেলেন, তাই হয়েই রইলেন, যতদিন না আলো আসে, তা' রজতের মনেও নেই।

সারাদিন কাজ করে অনেক, অনেক রাতে রজত আর কমল ডাক্তার দেবরেটরীতে ঢুকতেন।

রাজা ততদিনে আর একটু বড় হয়ে গিয়েছে, আর একটু গম্ভীর। পূর্ণবাবুর মেয়ে লতুর সঙ্গে সে নাকেমাঝে সাইকেল হাঁটিয়ে গল্প করতে করতে যায়। রাজা আর লতু, কে যেন সেই সময়েই সিনেমা হাউসের দেওয়ালে লিখে রেখেছিল। শহরে আর চইচই-এর অন্ত ছিল না। রাজা শুধু সাইকেলে যেতে যেতে বলেছিল 'বাঃ, দিব্যি দেখাচ্ছে ত? লতুকে এনে দেখাতে হবে।'

বেপরোয়া, উদ্ধত খারাপ ছেলে রাজা।

তারপর একদিন আলো এল। তাদের নতুন সিটায়। আলো যখন এল তখন জীবন গোপনাল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা
কোন টী থেকে ভুগছেন?
আমাদের
ভাস্কর লবণ
খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন,
অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩১৯৯

সুলেখা-র
রপ্তানি বাণিজ্য
দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে...

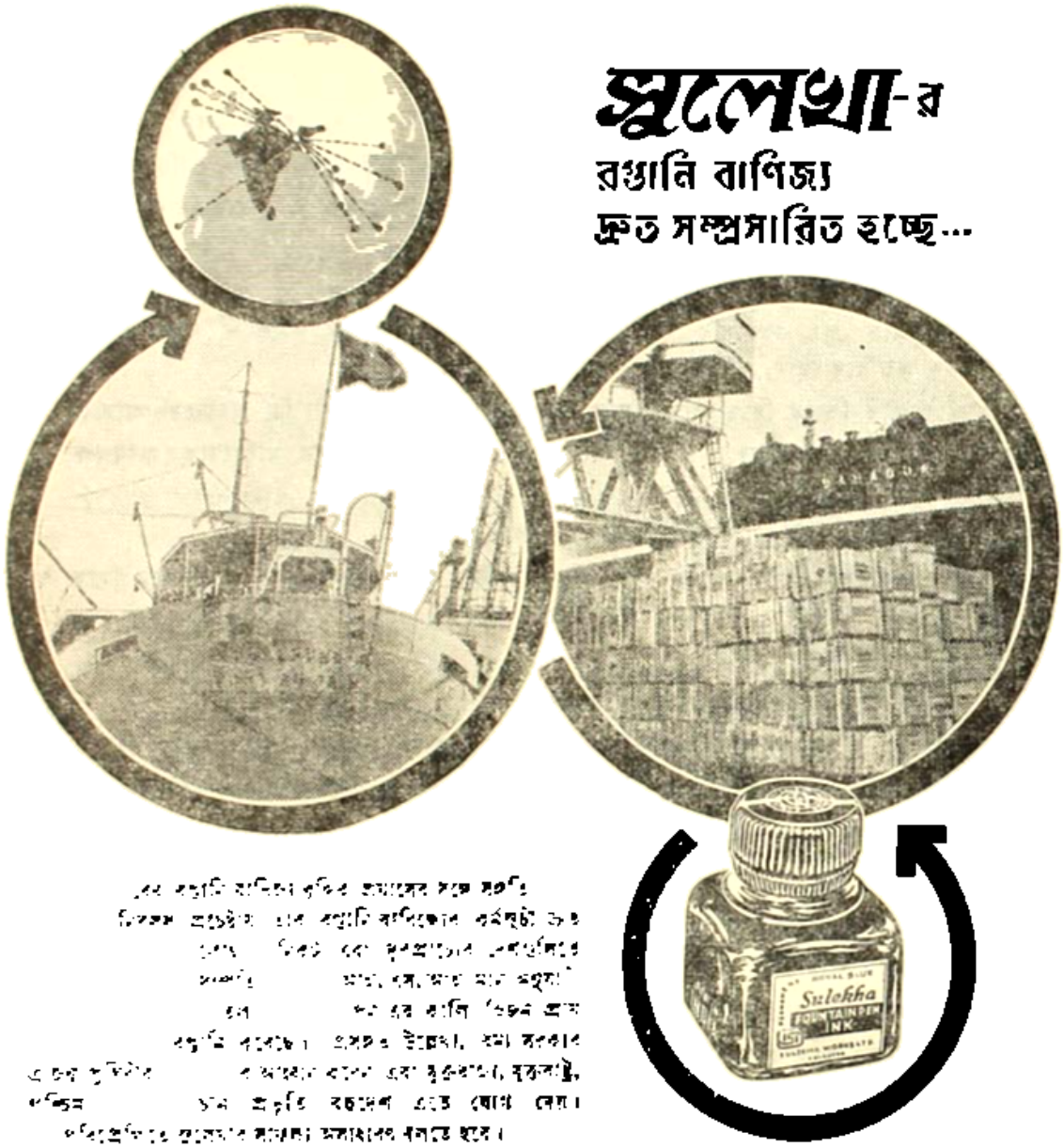

এবং বছরটি বাণিজ্য বৃদ্ধির তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি
বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং বছরটি বাণিজ্যের বর্ষপূর্তি উপ
[illegible] বিশেষ বেশ কয়েকটি দেশগুলিতে
সম্প্রতি [illegible] আরও বেশ কয়েকটি
এবং [illegible] ৩০ এর বেশি বিভিন্ন প্রকার
বস্তুটি রপ্তানি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও সরকার
এ ছাড়া [illegible] ব্যবহার করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র,
পশ্চিম [illegible] এই প্রকৃতি বহুদেশ এতে যোগ দেয়।

পরিপ্রেক্ষিতে সুলেখার কাজকে অসাধারণ বলতে হবে।
এছাড়াও [illegible] অতিরিক্ত বৈদেশিকের ওষুধপত্রে উৎপাদনের
প্রতি ক্ষেত্রে [illegible] পরিকল্পনা করে সুলেখা উৎপাদনের মান
[illegible] দিয়েছে এবং দেশবাসীর উপর
[illegible] প্রতিদিন বহন করে চলেছে।
[illegible] এই করে সুলেখা আইয়ু
আধুনিকতর [illegible] গ্রহণে কৃতসংকল্প।

সুলেখা কালি ব্লু-ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, ব্রাউন, ওয়েলেট, রেড ও গ্রীন রঙে পাওয়া যায়।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড সুলেখা পার্ক • কলিকাতা-৫২ • ভারত

তবে, এস. টি. এ.-২১ থেকে নিঃসরণের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীলতা যে আরো লক্ষ্য করা গেছে, শুধু এটাই একটি বিরাট আবিষ্কার। পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবং তার পদ্ধতি নির্ধারণের গবেষণাদি নতুন পথে উন্নীত হয়েছে।

ইহলোক-পরলোক, অলৌকিক-অতিলৌকিক, ইত্যাদি শব্দের অর্থও বহীর কিংবা লৌকাধিক ছাড়ে বেরিয়ে আসছে। এইসব শব্দকে এখন এদের স্বাভাবিক, আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করা দরকার। "অলৌকিক", "লোকাতীত", ইত্যাদি শব্দ ইংরেজী "সিয়্যাকৃদ্" শব্দটির মতো "অসম্ভব", "আজগুবি", "অতিপ্রাকৃতিক", এমনকি, "ঐশ্বরিক", ইত্যাদি অর্থেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু, যা এ লোকে, অর্থাৎ ইহলোকে—পৃথিবী গ্রহে—সম্ভাবিত নয়, কিন্তু সম্ভব অন্য লোকে—পরলোকে—সেই অর্থেই "অলৌকিক", "লোকাতীত", ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এখন সার্থক হবে। এই অর্থে চাঁদও একটি পরলোক। এই পরলোকে মানুষের মহাকাশযানের ধীর-অবতরণ সংক্রান্ত যানের সোভিয়েত পরীক্ষা দেখে মনে হচ্ছে এই পরলোক মানুষের সশরীরে গিয়ে হাজির হবার দিন আর বেশী দূরে নয়। কাজেই, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, অন্যান্য তারকা-নক্ষত্র, অন্যান্য ছায়াপথ, ইত্যাদিই এখন পরলোক। কোন পরলোকে কোন রকমের প্রাণ কিংবা প্রাণী আছে কিনা, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী আছে কিনা, থাকলে তারা আছে কোন্ পর্যায়ে, কোন কোন পরলোকে মানুষের চেয়ে উন্নততর স্তরের সভ্যতা গড়ে উঠেছে কিনা, তা হলে থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কি, এইসব প্রশ্ন ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। জ্যোতিঃপদার্থ-বিদ্যা, রেডিও-জ্যোতিষ, স্বয়ংক্রিয়াবিদ্যা, আণবিক জীববিদ্যা, ইত্যাদি বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষত গত বিশ বছরে যে-আশ্চর্য অগ্রগতি ঘটেছে তারই ফলে পরলোকে প্রাণ এবং প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ধারণ এবং অলৌকিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসাবেই দেখা দিয়েছে।

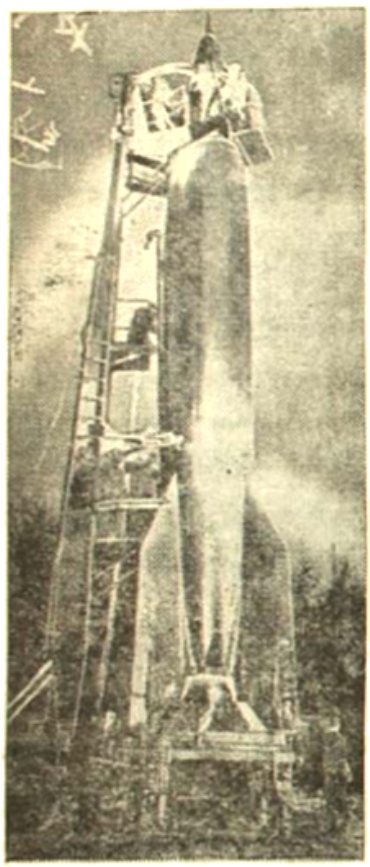

মহাবিশ্বে বিভিন্ন লোকে প্রাণ আর প্রাণীর অস্তিত্ব এবং অলৌকিক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা বিজ্ঞানের হাতে নেওয়া সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি বড় সাফল্যের ফলে।

১। ছায়াপথে অজস্র সৌরজগত যে রয়েছে সেটা একরকম নিশ্চিতই। পরোক্ষ হলেও, তার সপক্ষে প্রত্যয়জনক যুক্তি রয়েছে। তার উপর, একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও হাজির করা হয়েছে হালেই। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী তারাগুলির মধ্যে যেটির নাম "বার্নার্ড" এর "উড়ন তারা" তার একটি অদৃশ্য গ্রহ রয়েছে—এটা সালোক-জ্যোতিষক্ষেত্রে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ভ্যান্ ডা জেহ্ গত বছর নির্ধারণ করতে পেরেছেন। ছায়াপথে অজস্র সৌরজগত যে রয়েছে, তার একটি নিদর্শন হল এই আবিষ্কার।

২। আণবিক জীববিদ্যা, প্রাণ-পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণ-রসায়ন ইতিমধ্যে প্রাণের উদ্ভব এবং

জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রে মিত্রপক্ষের সহায়তায় স্বাধীন ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রের গঠন করাই ছিলো তার লক্ষ্য। যুবকটি খুবই বুদ্ধিমান এবং সাহসী। বয়সে বাতার চাইতে অনেক ছোট। ইন্দোনেশিয়ার যুবকরা তাকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতো। তার মতো যুবককে হাতে পেয়ে জাপানীদের আহ্লাদের সীমা নেই।

বাতা এবং এই যুবকের মধ্যে যে প্রেম শুরু হলো তা দুর্দম, দুর্নিবার। তবে প্রেয়সীর চাইতে দেশকেই বড়ো ব'লে জানতো যুবকটি। বাতার রূপ, বুদ্ধিমত্তা, এবং সাহস তাকে মুগ্ধ করেছিলো, তবে বাতা যে যৌবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে এ-কথা সে ভুলে যেতে পারেনি। কিন্তু বাতার কাছে ওই প্রেম ছিলো স্বর্গ-মর্ত্যবিহারী।

বাতাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলো আবদুল। আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে সে ওকে অকপটে খুলে বলেছিলো কী তার আদর্শ, স্বপ্ন, বলেছিলো গুপ্ত-সমিতির কার্যকলাপের কথা। প্রেমিকের কাছ থেকে সব শুনে বাতাও যোগ দিলো গুপ্ত বিপ্লবী সংঘে, যেমন যোগ দিয়েছিলো ইন্দোনেশিয়ার হাজার হাজার যুবক-যুবতী। জাপানীরা ইন্দোনেশিয়াতে পদার্পণ করেছিলো নিজেদের মুক্তিদূত রূপে ঘোষণা ক'রে, কিন্তু বাস্তব দেখা গেলো তারা ওলন্দাজদের চাইতেও বেশি অত্যাচারী। মশলা-দ্বীপে সমৃদ্ধির বদলে তারা নিয়ে এলো সর্বনাশ, শান্তির পরিবর্তে মৃত্যু।

একদিকে জাপানীরা অন্যদিকে ইন্দোনেশীয় বিপ্লবী দল—দুই পক্ষের হয়েই কাজ করতে লাগলো বাতা। আবদুল নতুন আন্দোলনের নেতা। জাপানের স্বৈরাচার থেকে ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত করার

সুস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৫টি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, জ্বরভাব কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

শিশুর কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেন্ট

▸ বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

একটু ছেলে চৌধুরী মশাই আবার বলেছেন, তাও জানলে হয়ত মানে সাগরে বুঝে সুঝেই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপনারা কাঁস করে দেবেন না।

না, তা করব না। পরাশর আশ্বাস দিয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করেছে—আচ্ছা সিংহ রায় মশাই-এর এ নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে এখানকার থানা পুলিশ কিছু করেনি?

বলছে ত যা করবার করেছে!—চৌধুরী মশাই বেশ একটু অপ্রসন্ন অনুযোগের সুরে বলেছেন—কিন্তু পুলিশ বিশেষ করে এই রকম অজ পাড়ার পুলিশ কতখানি উৎসাহী আর কাজের হয় তা'ত জানি। এদিক ওদিক একটু খোঁজ খবর করে তারা বরং একটু উল্টো কথারই আভাস দিয়েছে।

উল্টো কথাটি কি? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

বলছে, নিজেই হয়ত রাগারাগি করে কোথাও চলে গেছেন। মেয়ে দুটির সঙ্গে ওই গ্রামলক্ষ্মী সমবায় নিয়েই দুদিন আগে তাঁর কি ঝগড়া ঝাটির কথা নাকি পুলিশ ও বাড়ির এক মুনিষের কাছ থেকে বার করেছে।

না। এ অসম্ভব! পরাশর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিক্রম সিংহ রায় সে ধরণের মানুষই নন বলে আমি জানি। শর্মিলাকে তিনি নিজে সাগরে এখানে ডেকে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় সুরু করতে উৎসাহ সাহায্য সব দিয়েছেন।

তা কি আর আমরা জানি না। চৌধুরীমশাই পরাশরের কথায় সায় দিয়ে বলেছেন,—এ শুধু পুলিশের দায় এড়াবার একটা কিকির। যাক্ আপনারা ত এখন আড়াল বাড়িতেই যাচ্ছেন, ওদের মুখ থেকে আরো ভালো করে সব শুনতে পাবেন।

সবাইকে জানাই আন্তরিক শারদীয় শুভেচ্ছা

সবার মুখে
এককথা
বাদলরামের
'পানবাদশা'
জর্দ্দা
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

বাদলরাম লছমীরাম
১৪৪এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

॥ প্রকাশিত হলো ॥

জীবন-শিল্পের সুখ-দুঃখের সুর-মূর্ছনা। মনে রাখবার মতন প্রেম, ব্যর্থতা আর জীবন-প্রবাহের ধারা চলেছে নানা পথে, কিন্তু এসে মিশেছে একই সংগমে। সেই সংগমের রাগিনীই ধ্বনিত হয়েছে—অনিলকুমার ভট্টাচার্যের সদ্য প্রকাশিত কাহিনী ধারায়—

দ্বিতীয় বাসর

দাম : ২·৫০

অর্চনা পাবলিশার্স : ৮/বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৬

আধুনিক কবিতার আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

সাগর আকাশ

দাম : ২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : কলিকাতা-৬

সোভিয়েট
রাশিয়া

"Human Voice" নামক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রে সোভিয়েত
অভিনেত্রী গ্যালিয়া।

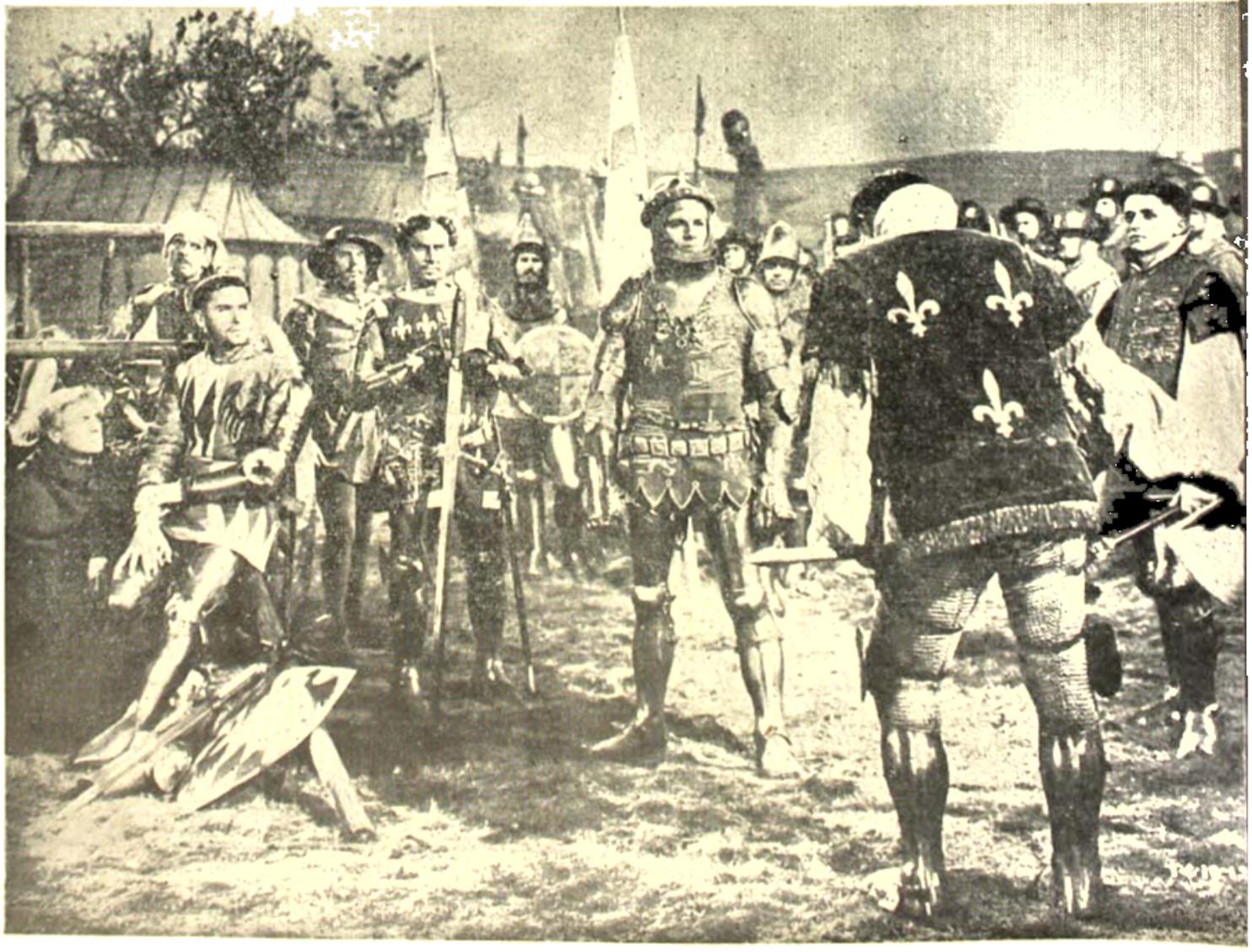

শেক্সপীয়ারের বিখ্যাত "পঞ্চম হেনরী" চলচ্চিত্রের একটি স্মরণীয় দৃশ্যে প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক স্যার লরেন্স অলিভার, রবার্ট নিউটন, রবার্ট মিথ, জর্জ রবারী প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতাগণ।

মস্কোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রখ্যাত সোভিয়েত অভিনেতা সার্গো ভ্যাকারিয়াজি, সোভিয়েত অভিনেত্রী লুডমিলা ও বিশ্ববিখ্যাত ইটালীয়ান অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন।

Sea, what are:

ঐ দেখ সমুদ্রে কী

রঙকরা আঙ্গিকে তৈরী নূতন ধরণের চলচ্চিত্র "Mrs. Hole"-এর একটি দৃশ্য।

জার্মানীর দুটি বিখ্যাত শিশু চলচ্চিত্র

জার্মান শিশু চলচ্চিত্র "Luetz Matten" এর একটি দৃশ্য

জার্মানী

টমাস মানের বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুগ্ম প্রচেষ্টায় রূপায়িত "Tonio Ktogen" এর একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্যে বিখ্যাত অভিনেতা ক্লিনক্লউডি ও অভিনেত্রী এলিজাবেথ হোটিনাহিউয়ার।

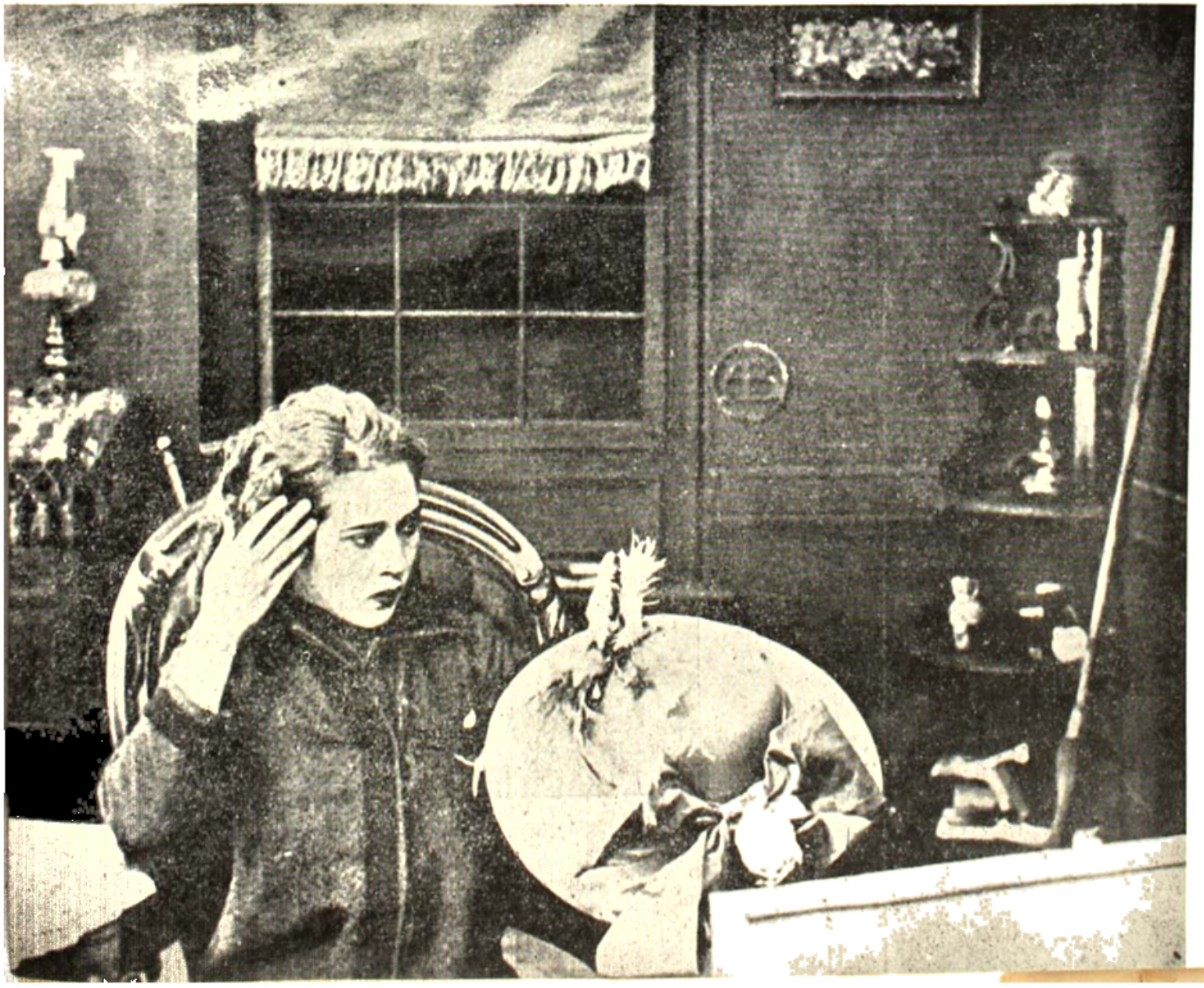

মে—আমেরিকার টেলিভিশনে প্রথম যুগের বিখ্যাত ছবি "দি লোন রেঞ্জারের একটি দৃশ্য।
ক্ষিণে—আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত ঐতিহাসিক ছবি "ব্রোকন অ্যারো (১৯৫০)

নের অভিনব
য়েটার কোম্পানীর
ামলেট" অভি-
য়র একটি বিখ্যাত
শ্য। ছবিতে
ম লে ট এবং
য়ার্টিস বন্ধুর-
হ্যামলেটের
মিকায় প্রখ্যাত
ভিনেতা জন
ভিস, লেয়া-
সর ভূমিকায়
হাস্কি।

কুলডগ মার্কা
যন্ত্রপাতি
উৎকৃষ্ট ইস্পাতে
প্রস্তুত

G·S·M·WKS·&FDRY·
BULLDOG

অধিকতর
মজবুত
ও
দীর্ঘ স্থায়ী

গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্কস এণ্ড ফাউণ্ড্রী

২১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

29 SEP 1965

উৎসব অনুষ্ঠানে

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের বার্তা
বয়ে আনে

LO 1/65

বিশেষ আকর্ষণ :

পাক-ভারত

সংঘর্ষ

সচিত্র সংযোজন

গল্প-ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ । পঞ্চম সংখ্যা

কার্তিক ১৩৭২

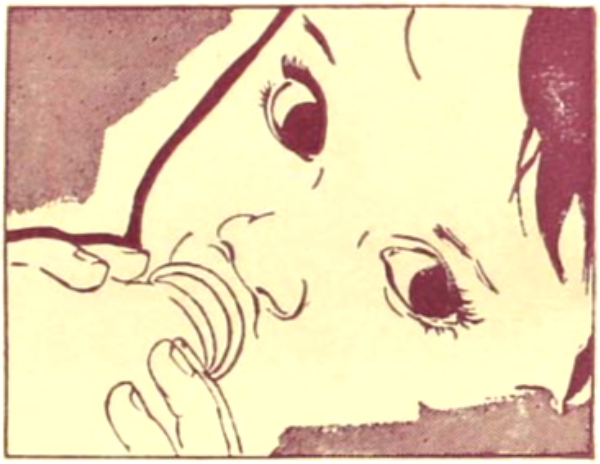

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

"আলোর উৎসব দীপালি। আলোর বন্যায় রাতের আঁধার উদ্ভাসিত করে তোলার এই তো সময়।"—বলেন **ওস্তাদ অসরাম**

অসরাম ল্যাম্প ও টিউব যেমন টেঁকে বেশীদিন, তেমনি উজ্জ্বল আলোও দেয় বেশীদিন।

Osram

ল্যাম্প ও টিউব

আঁধারে আলোর উৎস

একটি GEC উৎপাদন

জি ইলেকট্রিক কোং অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

এই সংখ্যায়

শিক্ষক (গল্প)—তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭১
আলোর স্বপ্ন (গল্প)—পরিতোষ মজুমদার ৩৭৫
চিত্র বিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ ৩৭৯
গুপ্তচর কাহিনী—
ইজরেলের মেয়ে গ্রাকাভূল—সুপর্ণ রায় ৩৮১
ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৩৮৬
স্মৃতি দোলায় (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩৯৭
কান্নাহাসির দোলা—চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪০৩
এশিয়া (গল্প)—সুশীল সিংহ ৪১৩

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

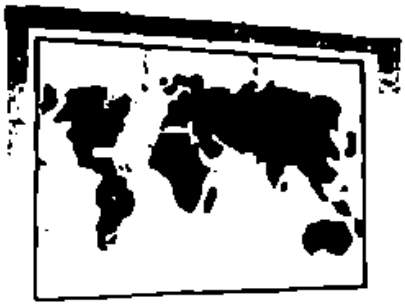

বিশ্ব-বাতায়ন

Fig. 1. Ship Nelson entering Gatun Locks on the Panama Canal

এদেশের মেয়েরা ওদেশে !

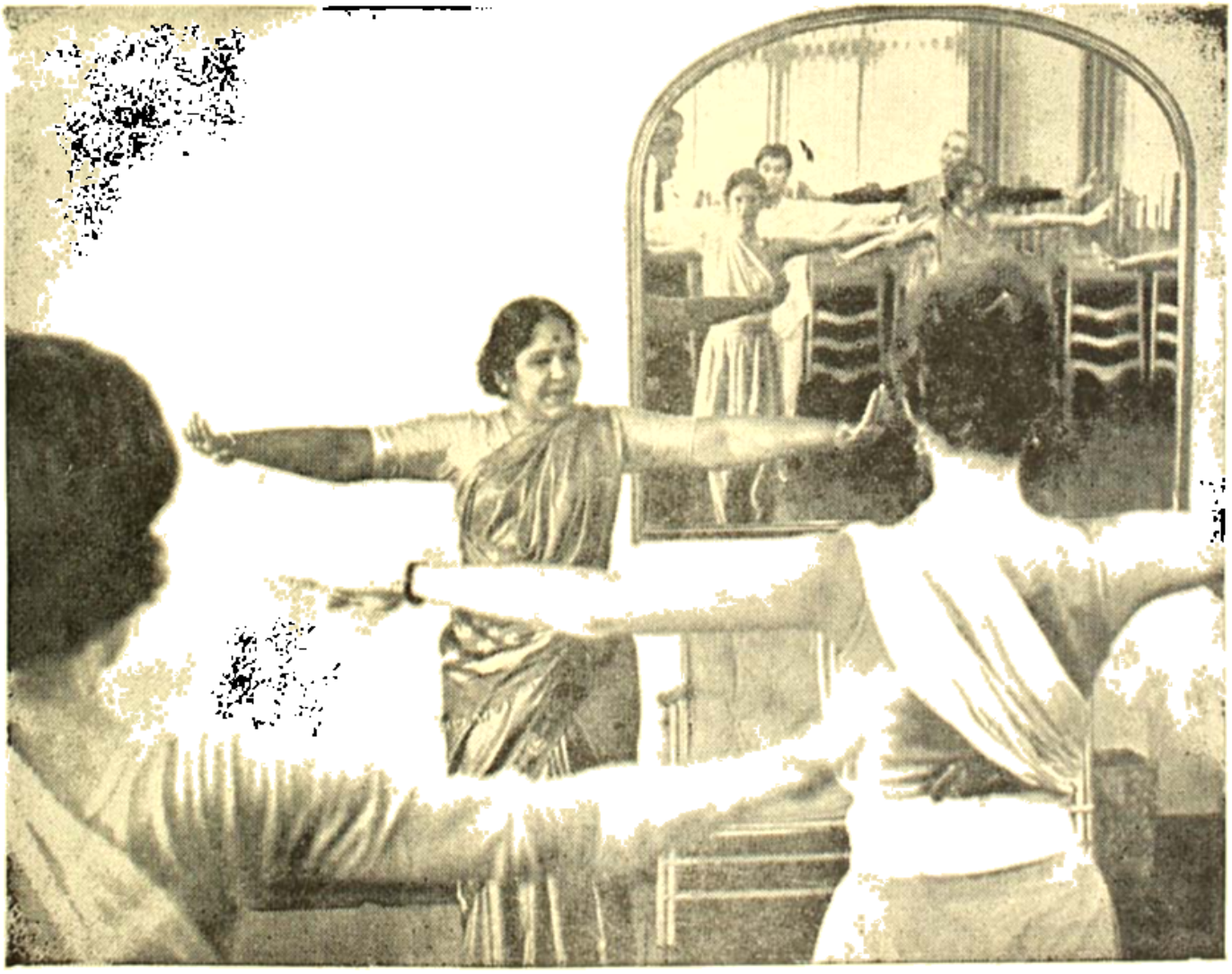

ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যাণ্ড শহরে আমেরিকান শিক্ষার্থীদের নৃত্যরতা
ভারতীয় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বালা সরস্বতী।

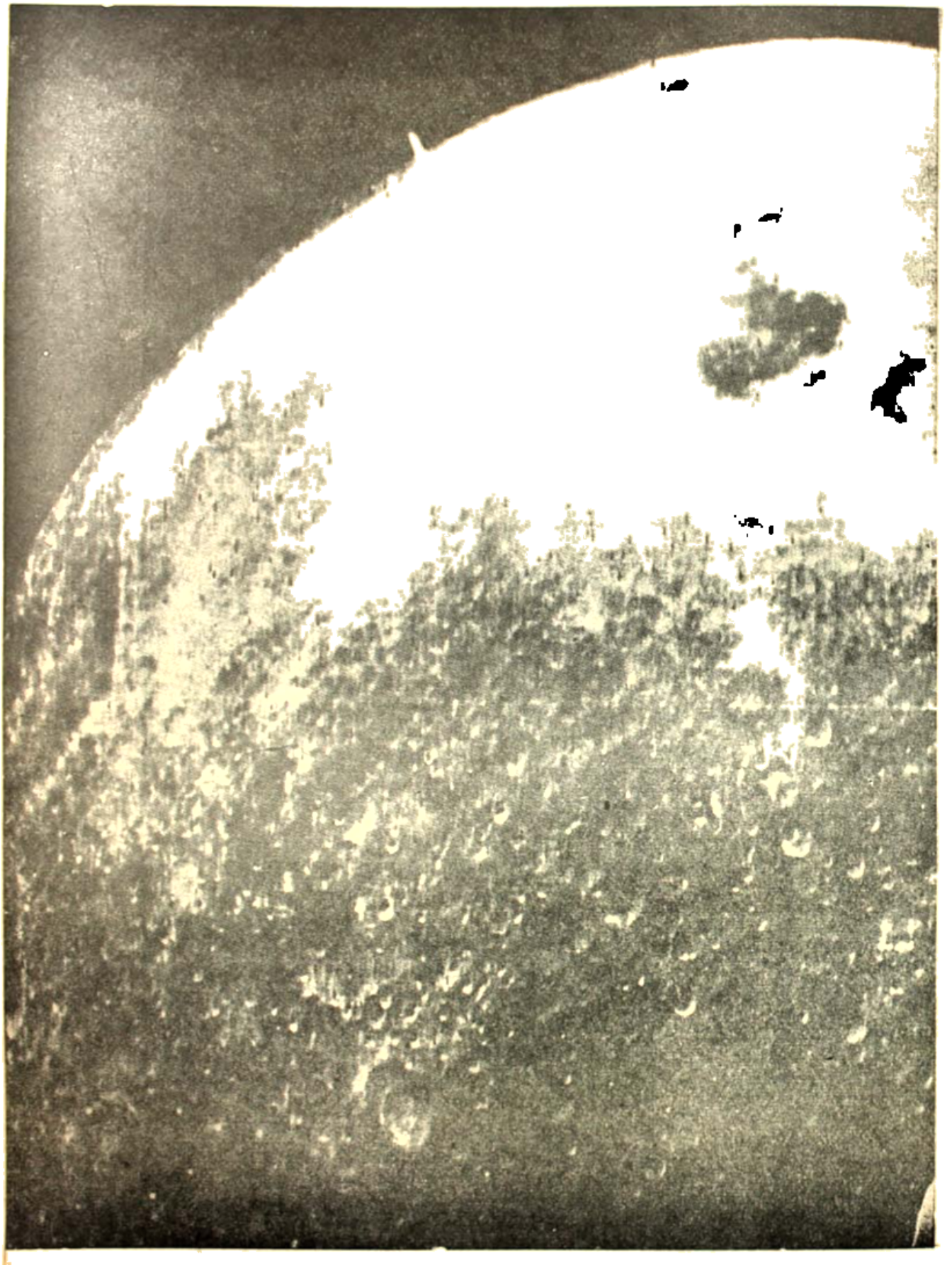

সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগার কর্তৃক প্রকাশিত চাঁদের মানচিত্র

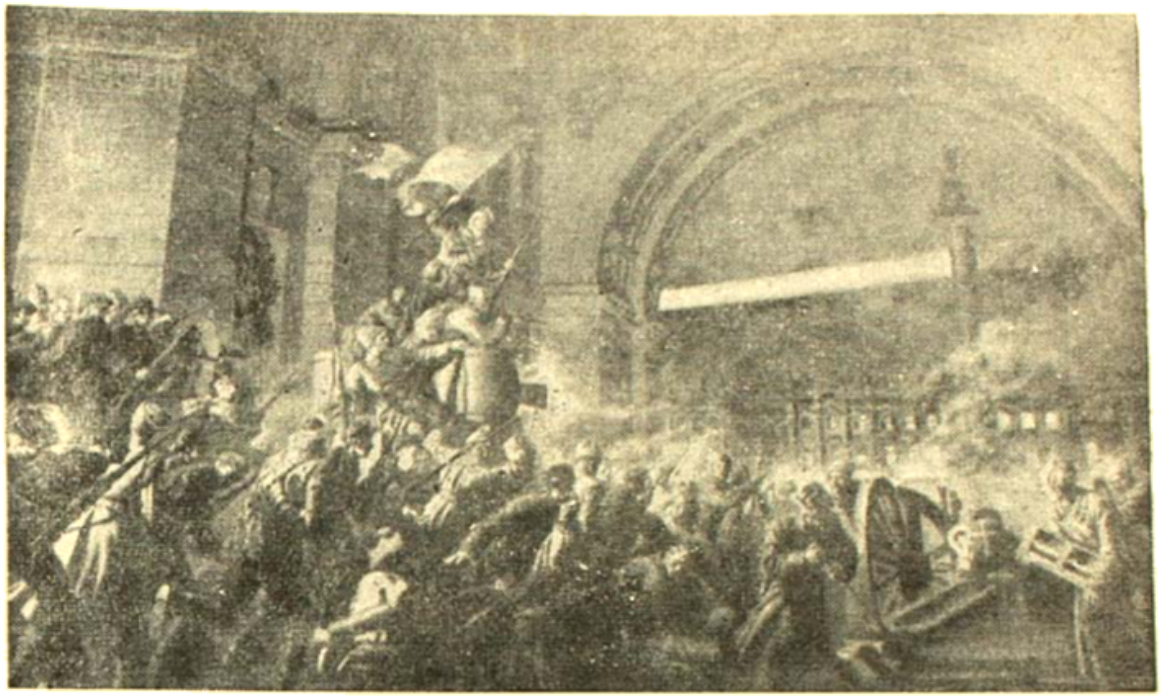

সোভিয়েত রাশিয়া

ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবের দুটি অবিস্মরণীয় চিত্র

ছবি: সৌজন্য সংগৃহীত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-১৮৭৩] ও তাঁর পরিবার [১৮৬২]

ভারতীয় ভাস্কর্য :

মাদ্রাজীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত মূর্তি পর্যবেক্ষণ করছে চারু শৈলন আমেরিকান ছাত্র জেমস্ হেমলি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার :

ভারতের বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় ও গবেষণাগারে ভারতের বৈজ্ঞানিক
ডাঃ বলরাম এবং আমেরিকার ডেভিড ফিনকেল্টাইন

রুশ ভূমির মহান প্রতিভা

এল. ম্যাক্‌সিমোভা

[বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েত লেখক মিখাইল শোলোকভ এবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সোভিয়েত সমালোচিকা ম্যাক্‌সিমোভা এই মহান লেখকের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।]

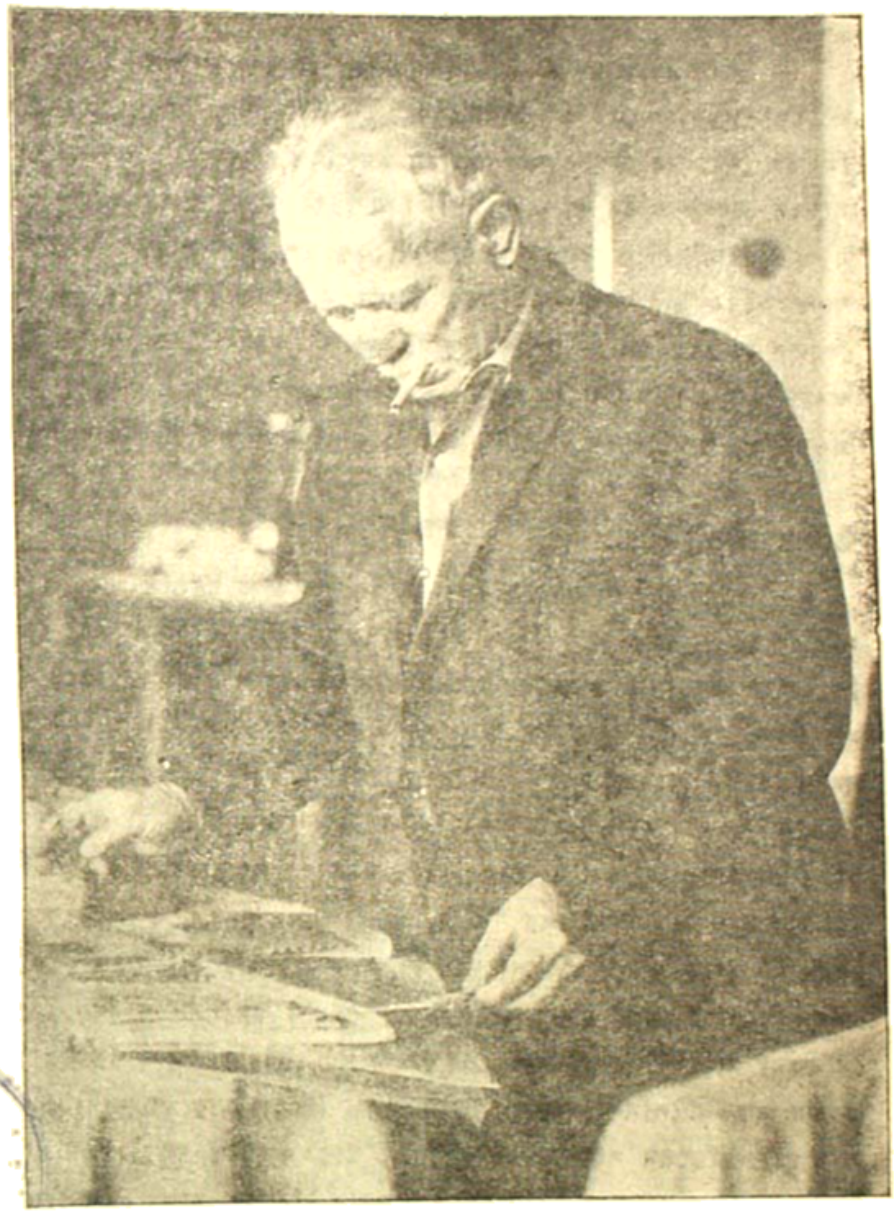

মিখাইল শোলোকভ

CALC TT

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় থেকেই সোভিয়েতের মানুষ শোলোকভের নায়কদের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু বিস্ময়কর মনে হলেও এই নায়করা কালের গতিতে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যান না, বরং আমাদের বারেবারেই শোলোকভের নায়কদের কাছে ফিরে আসতে হয়। বার বার আমরা আবিষ্কার করি যে, গ্রীগরি মেলেকভের পরস্পরবিরোধী ও জটিল চরিত্র শেক্‌স্‌পীয়রের চরিত্রগুলিরই সমগোত্র ; আবিষ্কার করি, আকসিনিয়ার গাঢ় প্রেম ও বিয়োগান্তক মৃত্যু ; জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি অপেক্ষা আমাদের কম অভিভূত করে না।

নিকট প্রতিভাত হয়েছে এমন একজন মানুষ ট্র্যাজেডি হিসাবে যে তৃতীয় এক সমাধান খুঁজছে, সে কোন পথ অনুসরণ করবে তা বেছে নিতে ইতস্তত: করছে। কিন্তু তৃতীয় সমাধান কিছু নেই। হয় হাঁ, নয় না—হয় বিপ্লবের পক্ষে নয় বিপক্ষে। মেলেকভের ট্র্যাজেডি শোলোকভ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা ঐতিহাসিকভাবে যুক্তিসিদ্ধ। তাঁর শিল্পসম্মত শব্দের চয়নকার পটে সামাজিক প্রক্রিয়াকে মনে হয় অপরিবর্তনীয়। অনন্ত চরিত্রাবলী, খুঁটিনাটির অনুকরণীয় বর্ণনা এবং মহাকাব্যের সঙ্গে মিলে এসবই "ধীর প্রবাহিনী ডন"কে করে তুলেছে প্রকৃতই এক মহাকাব্যের মর্যাদাসম্পন্ন।

স্বদেশে ও বিদেশে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা

বহু বছর আগে শোলোকভ যখন অপরিণত যুবা তখনই তিনি ডন নদীর তীরে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি ও তার ক্ষেতখামারের সৌরভ, জননী ডন নদী তাঁকে চিরতরে শৈশব ও যৌবনের লীলাক্ষেত্রে বেঁধে ফেলল। তাছাড়া, ভেশেনস্কায়ায় তাঁকে কত কিছু করতে হবে, কত লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তলগোগ্রাদ থেকে তাঁর কাছে এল তরুণ পাইওনীয়াররা। স্থানীয় যৌথ খামারের চাষীরা তাঁকে বললেন তাঁদের সভায় বক্তৃতা দিতে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা শায়েলা অবলন ও লেখক চার্লস য়ো ভেশেনস্কায়ায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এখানেই সাক্ষাৎ হল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিনল্যাণ্ডের মার্তি লার্নির সঙ্গে। কয়েকদিন ধরে শোলোকভ কথা বললেন সাহসী ও যুদ্ধে পঙ্গু এক দেশবাসীর সঙ্গে। তাঁর বইয়ের পক্ষে এই কথাবার্তা এতই প্রয়োজনীয়! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মেশিনগ্রাদ "কিরভ" কারখানার শ্রমিকরা, কারণ "অনাবাদভূমি জাগলো" উপন্যাসে যে মেয়িদান মেদিদোককে চিত্রিত করা হয়েছে সে যে তাঁদেরই শহরের বাসিন্দা।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শোলোকভের কাহিনী অবলম্বনে সোভিয়েত চলচ্চিত্র "তন-স্টোরী"র একটি দৃশ্য।

ঘনিষ্ঠ সৃজনশীল প্রতিবেশে শোলোকভ উক্রাইন, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, কাজাক ও অন্যান্য সোভিয়েত লেখকদের সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ও লেনিন পুরস্কারের অধিকারী ও অ্যাকাডেমিশিয়ান শোলোকভ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিদেশ থেকে হাজার হাজার চিঠি পেয়ে থাকেন; তাঁর কাছে আসে তাঁর বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণের বহু প্যাকেট ও নবীন প্রকাশকের পাণ্ডুলিপি।

ঘাড় নেড়ে টম বললে—"প্রস্তুতি হবেন বোধকরি মিস হ্যারিস।"

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মৃদু হেসে চার্লি বললেন—"ঠিক ধরেছো।"

নির্ধারিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। ১৯১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর।

চার্লির বিবাহের খবর শুনে সারা হলিউড স্তম্ভিত।

মিলড্রেডের সঙ্গে চার্লির মেলামেশার কথা অবশ্য সবাই জেনেছিল। কিন্তু তিনি যে এভাবে লুকিয়ে ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করবেন তা কেউ আশা করেনি।

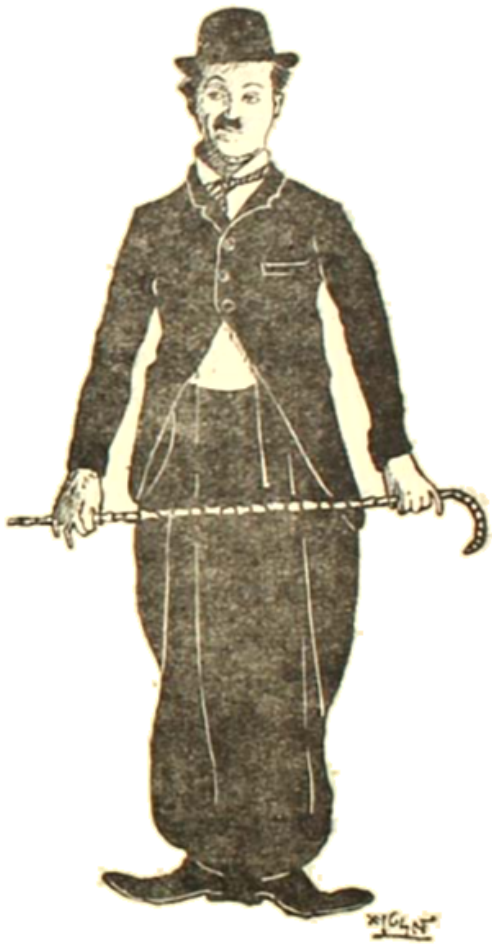

ফ্যান্সির খোলা

বোধ করি চার্লি নিজেও ভাবতে পারেন নি যে এত তাড়াতাড়ি তিনি মিলড্রেড হ্যারিসকে বিয়ে করে ফেলবেন। তাঁর বয়স উনত্রিশ। মিলড্রেড তাঁর চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। শুধু বয়সের ফারাকই নয়—জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতেও দুজনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

মিলড্রেডের কাছে বিবাহ যেন একটা অ্যাড-ভেঞ্চার। যেন একটা প্রকাণ্ড বাজী জেতা।

যাই হোক, বিবাহ যখন করেছেন তখন তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেন চার্লি। সুন্দরী বধূকে সুখী করতে কৃতসংকল্প হলেন, আর স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার রচনার পরিকল্পনায় আনন্দে উৎফুল্ল হলেন।

বিবাহের পর চিত্রপ্রযোজক টমাস ইন্স-এর প্রমোদতরীতে চেপে তাঁরা দুজনে মধুচন্দ্র যাপনে বেরুলেন।

ক্যাটালিনা দ্বীপটি ভারী সুন্দর। সেইখানে কয়েকদিন পূর্ণ আনন্দের মধ্যে চার্লি তাঁর নববধূকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনের চরিতার্থতা অনুভব করলেন।

হলিউডে ফিরে নিজের বাড়িতে উঠলেন চার্লি। মনের মত করে বাড়ি তৈরী করেছেন। এইবার তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরো সুন্দর করে তুলতে হবে।

কিন্তু মুশকিল বাধলো সংসার চালানো নিয়ে। গৃহস্থালীর ব্যাপারে মিলড্রেড কিছুই জানতো না। সে চায় ঝামেলাহীন হালকা জীবন, প্রজাপতির মতো সারাদিন পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতেই তার আনন্দ। সংসার চালনা করবার তার নেই কোন দক্ষতা, না বা কোন স্পৃহা।

মিলড্রেড-এর এই হালকা স্বভাবের পরিচয় পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন চার্লি। কিন্তু হতাশ হলেন না। ধৈর্য ধরে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এখনও মিলড্রেড ছেলেমানুষ। বয়স আর একটু বাড়ুক, ধীরেসুস্থে সব শিখে নেবে। ঘর-সংসারের কাজে মিলড্রেডকে সাহায্য করতে তাঁর নিজেরও

ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

আপনার পণ্যের বিক্রয়-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শুধু পণ্যের মূল কথাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জন-সমক্ষে তুলে ধরা।

(ক) জনপথের উপরে রেলওয়ে সেতুতে ব্যানার হোর্ডিং।

(খ) জনপথের উপরে গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রশিংগুলিতে হোর্ডিং

বিস্তারিত জানার জন্য লিখুন :
কমার্শিয়াল সাবলিসিটি অফিসার,
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে,
গার্ডেনরীচ, কলিকাতা ৪৩
(ফোন ৪১-২২৩১)

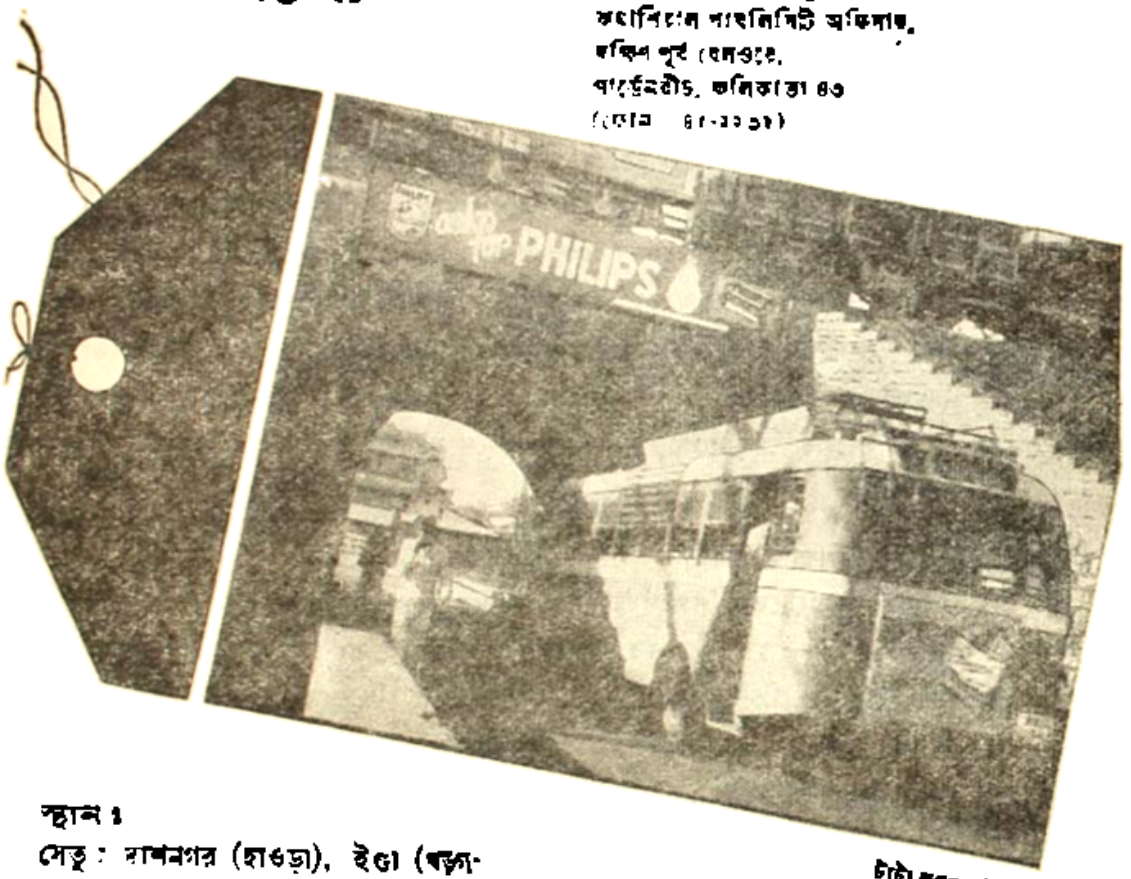

টাটা স্বর্ণরেখা সেতু

স্থান ঃ

সেতু : রাশনগর (হাওড়া), ইণ্ডা (বাঁকুড়া-পুর), ইণ্ডিয়ান স্টীল কোং লিঃ (বার্ণপুর), ক্যানাল রোড (কটক), ওয়ালটেয়ার ও ভিজিয়ানাগ্রাম।

লেভেল ক্রশিং ঃ

শালিমার, মৌরীগ্রাম (হাওড়া জেলা), খড়্গপুর, বাঁকুড়া, আদ্রা, বার্ণপুর, টাটা-নগর, রাঁচি, কটক, বালাসোর, ভুবনেশ্বর, ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেল-এর কর্তৃপক্ষ ন্যায্যহারে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের যে কোন স্থানে হোর্ডিং-এর কাঠামো তৈরী, তার স্থাপনা এবং অঙ্কন ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। পৌর কর দিতে হয় না।

মেক্সিকো শহরে অলিম্পিক খেলাধূলা

১৯৬৮র অলিম্পিক খেলাধূলার জন্য নির্বাচিত শহর মেক্সিকোর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৭৪৭৮ ফুট উঁচু আয়তনে খেলাধূলা করার সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

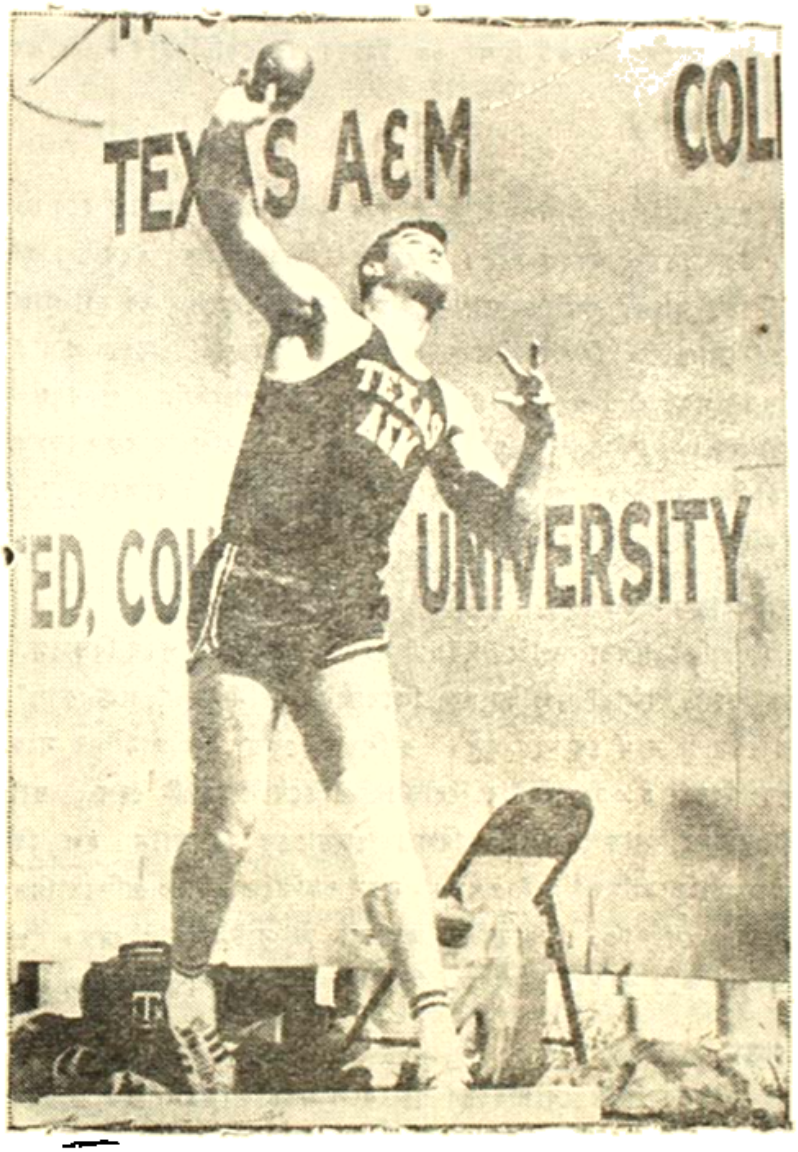

অলিম্পিক বিজয়ী তরুণ আমেরিকান ক্রীড়াবিদ রাণ্ডি ম্যাটসন শটপুটের সাম্প্রতিক রেকর্ড ভঙ্গ করে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন।

দেখা যাবে বলে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের অভিমত সে আন্দোলনের কোন যুক্তিযুক্ততা নেই এবং মেক্সিকোর উচ্চতা সম্পর্কেও চিন্তার কারণ নেই।

কমনওয়েলথ গেমসে নল্লবীর

ভারতীয় মল্লবীর ফেডারেশন ঠিক করেছেন যে, আগামী বছরের আগষ্ট মাসের জামাইকায় কমনওয়েলথ গেমসে ৮ জন মল্লবীর পাঠাবেন। নভেম্বর মাসে দিয়লাতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে।

মাঝামাঝি সময়েই ৩৭৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের (৫০ লক্ষ টাকা) গিয়েছে। শেষের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে ওয়েম্বলি ষ্টেডিয়ামে।

রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল দলের ভারত-সফর

সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল দল এক মাসের জন্য ভারত সফরে এসেছে। ভ্রমণকারী দলটি ভারতে ৫টি টেষ্ট ও ১টি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করবে। টেষ্টখেলার স্থানগুলি হল কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ। সফরকারী সোভিয়েট দলটি ১০ই নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

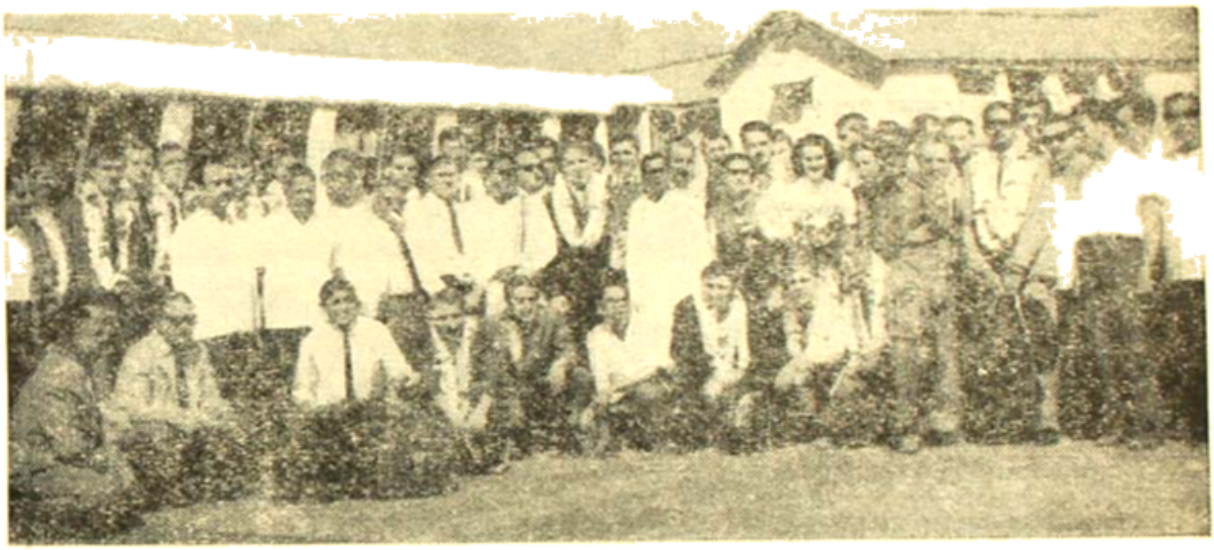

কলকাতা সফরে সোভিয়েত ফুটবল টীম—দমদম বিমান ঘাঁটিতে

আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল

দর্শক সমাকীর্ণ কলিকাটা মোহনবাগান মাঠে প্রতিরক্ষা তাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত আই. এফ. এ শীল্ডের পুনরনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গত ১৬ই অক্টোবর ইষ্টবেঙ্গল ১-০ গোলে প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে পরাজিত করে আটবার আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করে। খেলাটি শেষ হবার এক মিনিট আগে ইষ্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক দর্শনীয় সটে খেলার একমাত্র গোলটি করেন।

———

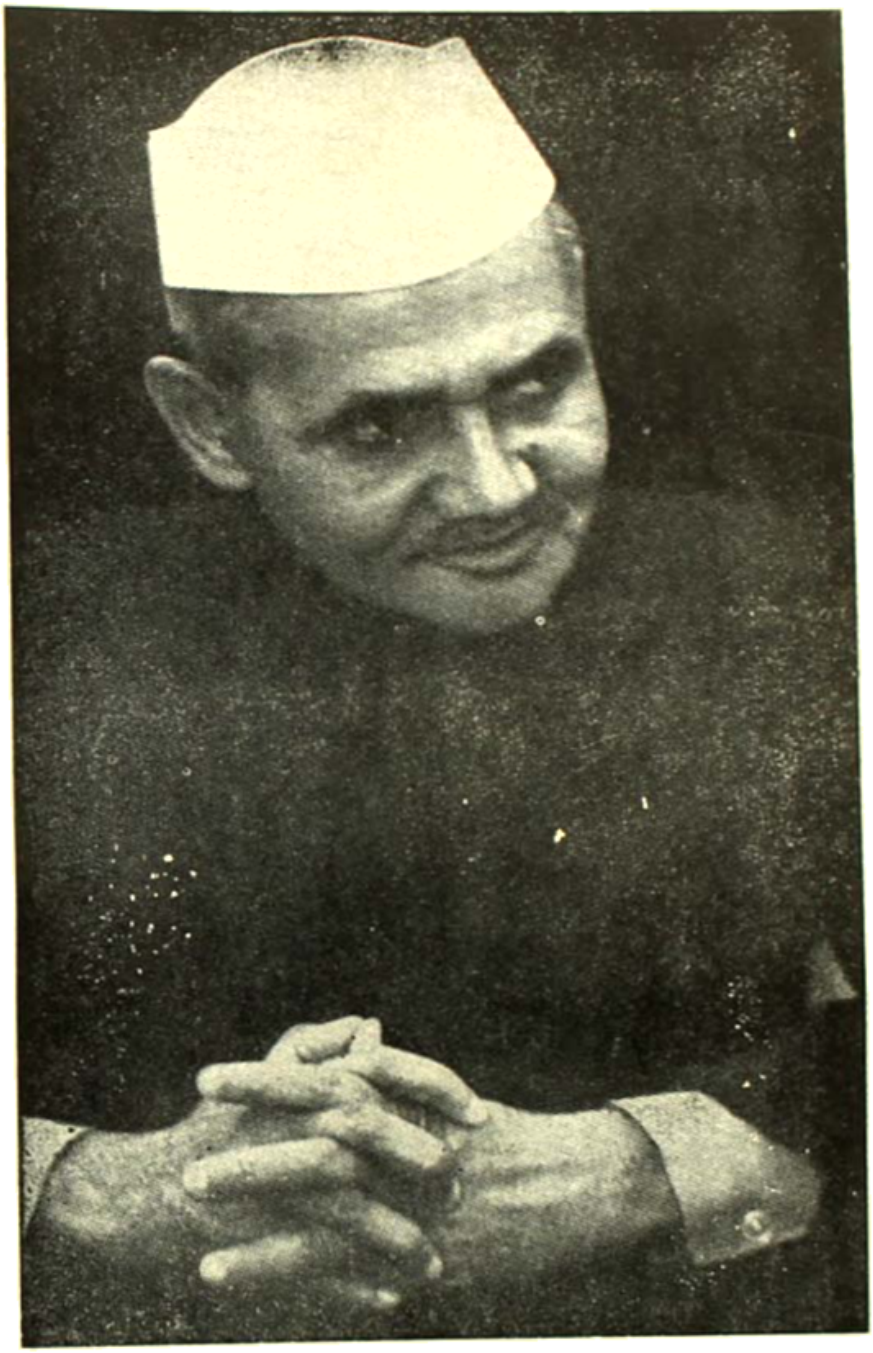

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

ভারতীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে রাজস্থান সীমান্ত সফরকালে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী একটি আধুনিক অস্ত্র দেখাচ্ছেন একজন জওয়ান।

বিমান বাহিনীর সহাধিনায়ক মার্শাল অর্জন সিং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বৈমানিক ও শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিচ্ছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং শিয়ালকোট অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনী অধিকৃ
একটি প্যাটন ট্যাংকের উপরে, সঙ্গে বিশিষ্ট সেনানায়ক মেজর জেনারেল রাজেন্দ্রসিংজি।

পাকিস্তানের পাশবিক বর্বরতার পর ভারতীয় জওয়ানরা এগিয়ে চলেছেন।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার মুখরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৩৮

অধ্যাপক ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন), এফ.সি. এস.(আমেরিকা), ঢাকা নগর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

Cover printed by—
BARTICK ART PRESS, CALCUTTA-12.

Regd. No. C3643

তাঁদের
দেখে
শিখুন

লক্ষ্মীঘি

বিশুদ্ধতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

সর্বদাই একটি টিন
ঘরে রাখুন

17 DEC 1969

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী

সকাল সন্ধ্যায়

লিলি
বিস্কুট
না হলেই নয়।

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৩

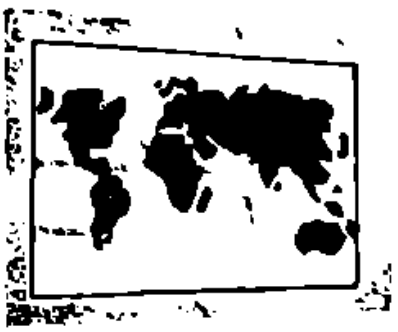

বিশ্ব-বাতায়ন

ভারতের ও আর্যান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দুই প্রধানমন্ত্রী : জওহরলাল নেহরু ও অটো গ্রোটেওহোল

সোভিয়েতের প্রবীণ
বিখ্যাত অপেরা
নৃত্যশিল্পী

সোভিয়েত রাশিয়া

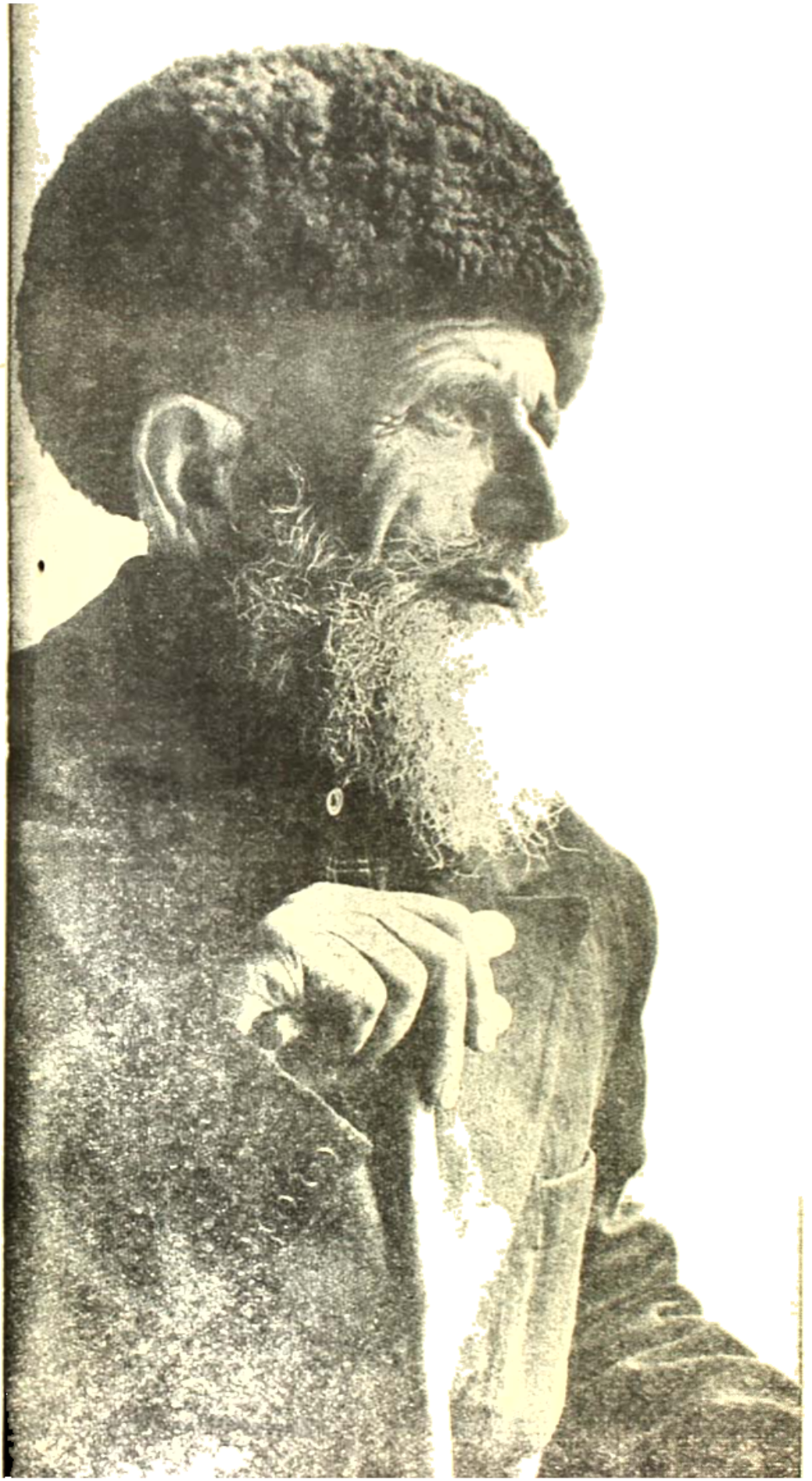

পৃথিবীর সবচেয়ে
পুরনো মানুষ :
সোভিয়েত এশিয়ার
শিরাজি মুসলিমভ।

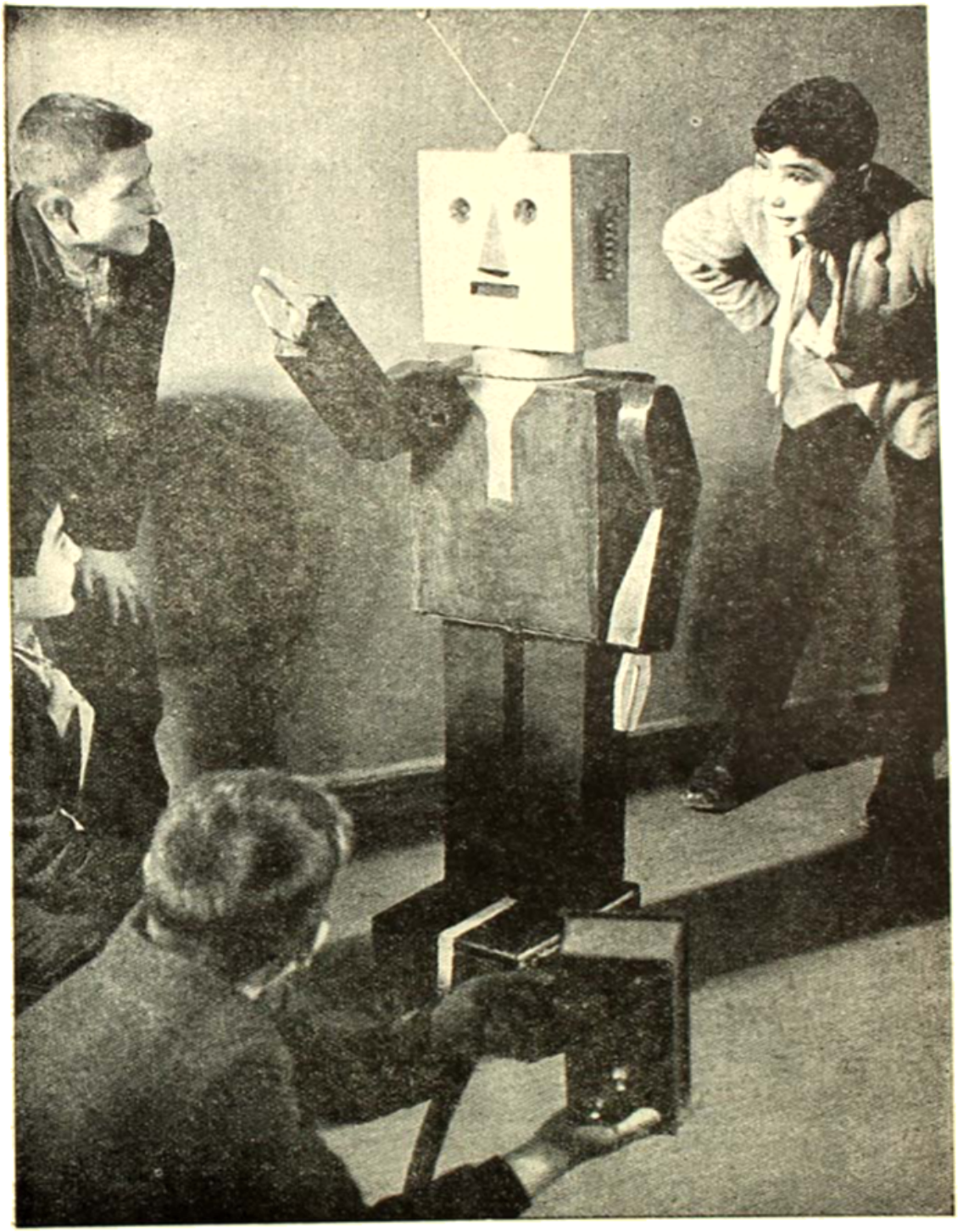

রাশিয়ার আশ্চর্য্য আবিষ্কার—যান্ত্রিক মানব।

ПАРТИЯ
ЛЕНИН —
БЛИЗНЕЦЫ
В. МАЯКОВСКИЙ

জেমিনি ৬-মহাকাশযানের পাইলট টমাস ষ্টাফোর্ড এবং ওয়ালটার শিরা অপর দুজন মহাকাশচারীর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

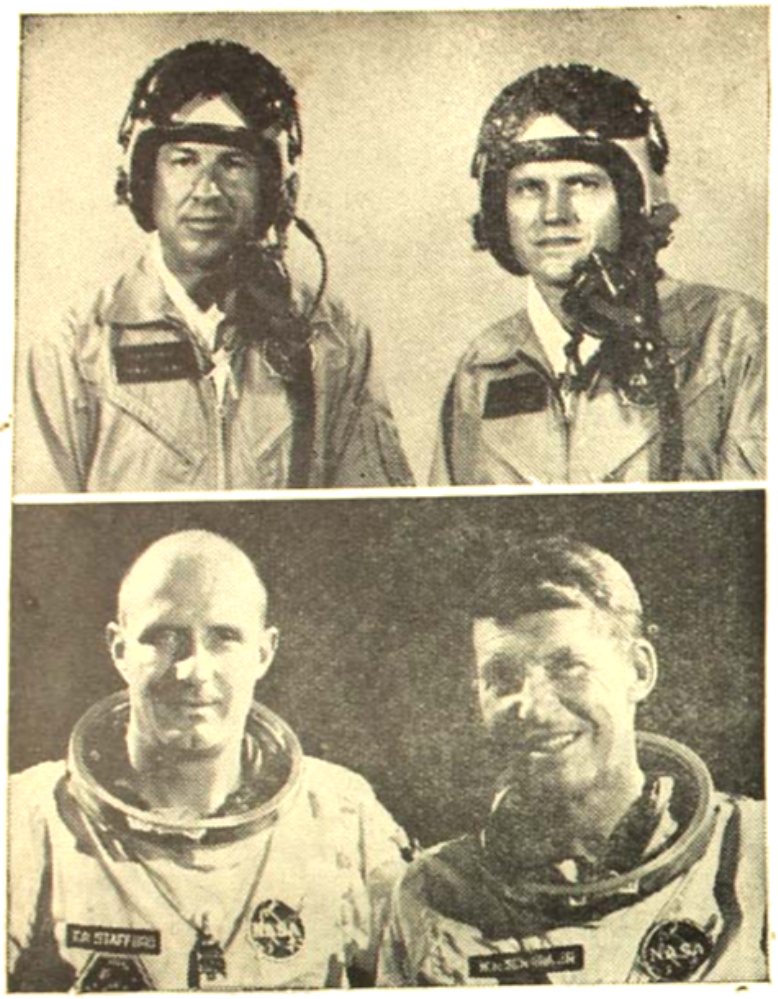

জেমিনির মহাকাশ যাত্রার পূর্বে ষ্টাফোর্ড ও ওয়ালটার শিরা।

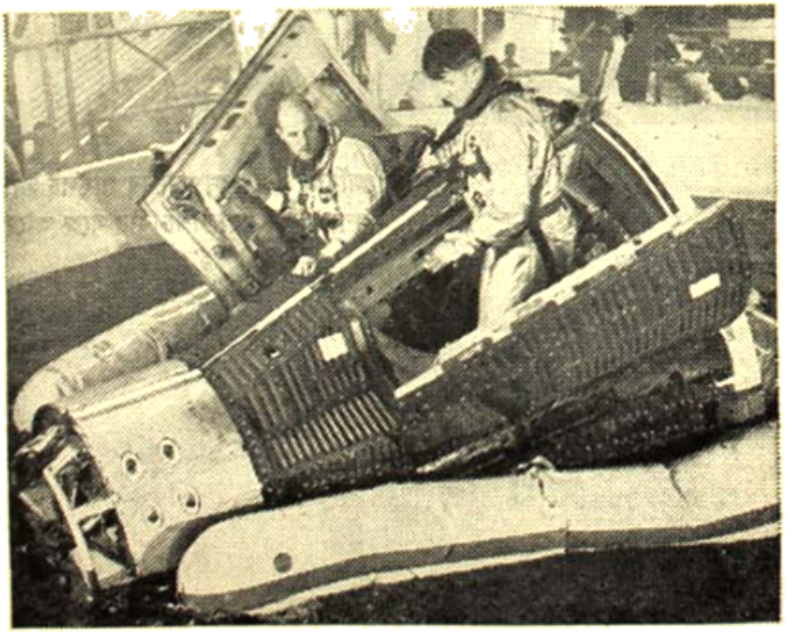

ক্রীড়া ক্লাব থেকে নির্বাচিত এই দলের ২৫ জন খেলোয়াড়ের বয়স গড়পড়তা ২১-২২ বছর মাত্র। দলনেতা গ্যাব্রোভিন মস্কোর "স্পার্টক" দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন— অনন্যসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য তাঁকে "অনার্ড মাস্টার অফ স্পোর্টস" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দিল্লীতে প্রথম টেস্টে রাশিয়া ২-১ গোলে জিতেছে। কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে সোভিয়েত রাশিয়া

খেলা আরম্ভের আগে সোভিয়েত ও ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

২-০ গোলে জয়লাভ করে। ভারত-সফররত রাশিয়ান ফুটবলদল সর্বত্রই তাদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছে। কলকাতায় ভারতবর্ষের দিকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক খেলার পর তারা ফুটবল দল, গৌহাটি, পাটনা এবং ধানবাদের প্রদর্শনী খেলায় জয়লাভ করেছে।

দুই জার্মানির দুই অলিম্পিক টীম

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন যে, দুই জার্মান রাষ্ট্রের জন্যে পৃথক পৃথক অলিম্পিক টীম অনুমোদন করা হোক। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এবার থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের পৃথক টীম।

টোকিও অলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডল প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী কারিন বাল্‌ৎসার। গত ২৪ অক্টোবর তারিখে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জননী হয়েছেন। গর্বোৎফুল্ল স্বামী ও ক্রীড়া-শিক্ষক তাকিয়ে আছেন শিশুটির দিকে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দুই জার্মানীর দুই পৃথক টীম অনুমোদন করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সে-সম্পর্কে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হলে শ্রীমতী বাল্‌ৎসার বলেন, "উভয় জার্মানির যথার্থ ক্রীড়ানুরাগীরা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল।"

রাশিয়া

সোভিয়েত রাশিয়ার
[illegible] চলচ্চিত্র
'Ivan's Childhood' ।
এর একটি রোমাঞ্চকর
দৃশ্য ।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট জাপানী চিত্র "লর্ডস অফ কুরো" (Kuro no Chushajo) এর একটি রমণীয় দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা।

জাপান

জাপানের বিখ্যাত বিজ্ঞান ভিত্তিক রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্র "ডোগোরা"র (Uchu Daikaiju Dogora) একটি নাটকীয় দৃশ্য

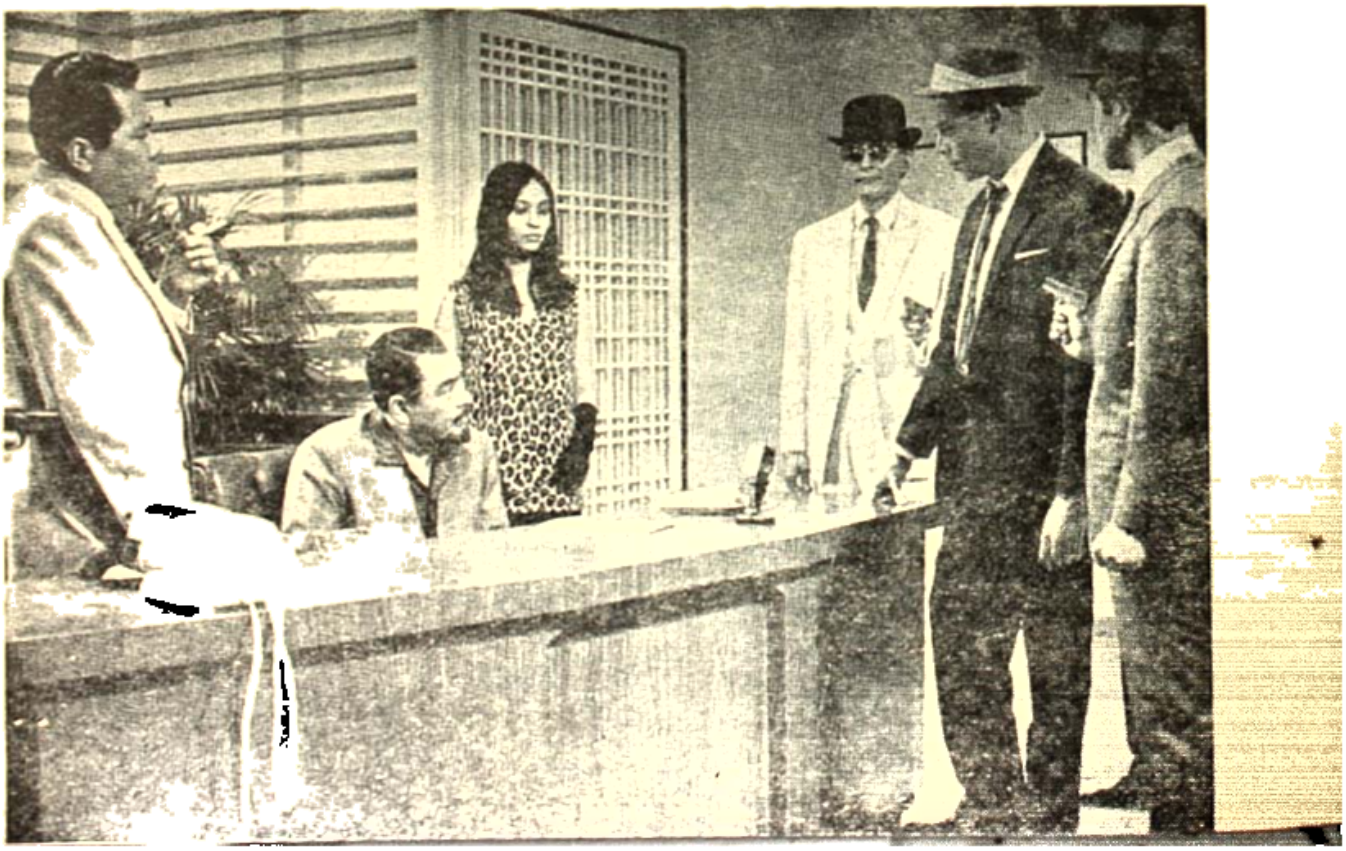

জাপান

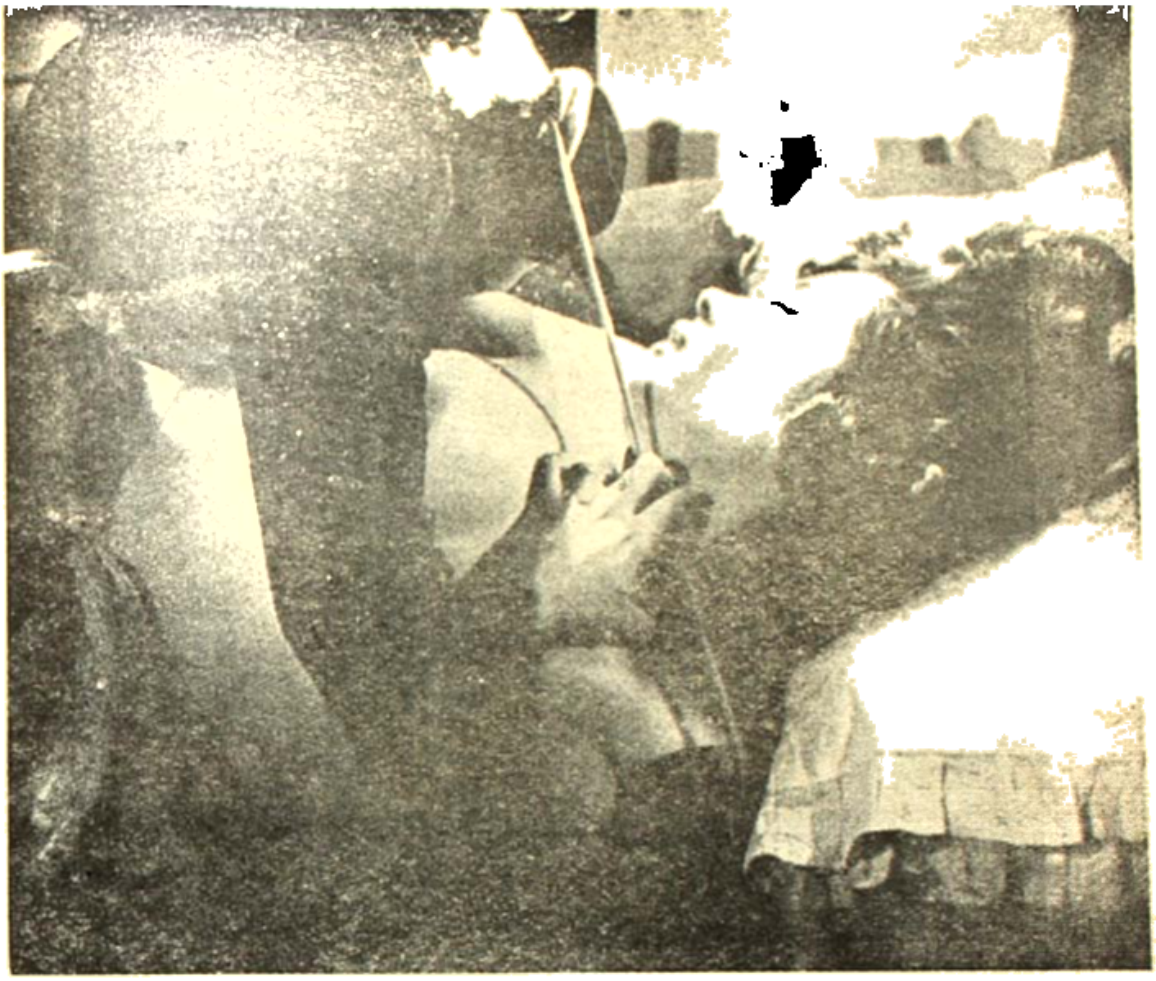

সাধারণ শিক্ষক পুরস্কার
প্রাপ্ত জাপানী
চলচ্চিত্র কিজুদরাকে
(Kizudaraka no
Sanga) থেকে একটি দৃশ্য

সোভিয়েত চিত্রাভিনেত্রী তামারা সিওমিনা।

মণ্ডিত হয়েছিল। কোনো সমালোচকের মতে লণ্ডনে শেক্সপীয়রের মত ভালো অভিনয় আগে আর কখনো হয়নি।

'ডেথ অব দ্য কমিটন' নাটকের বেলায় প্রশ্নটি ছিল অন্য। এক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কার ছিল অন্য। এক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কার ছিল রাজনীতিগত। পত্রিকার সমালোচনাতেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, নাটকের বক্তব্য ও অভিনয়ের উৎকর্ষের মধ্যে পার্থক্য টানা হচ্ছে। দর্শকরা কিন্তু দুই-ই পছন্দ করেছিলেন এবং নাটকের রাজনৈতিক অংশগুলোর অভিনয়ের সময়ে বেশি করে অভিনন্দন

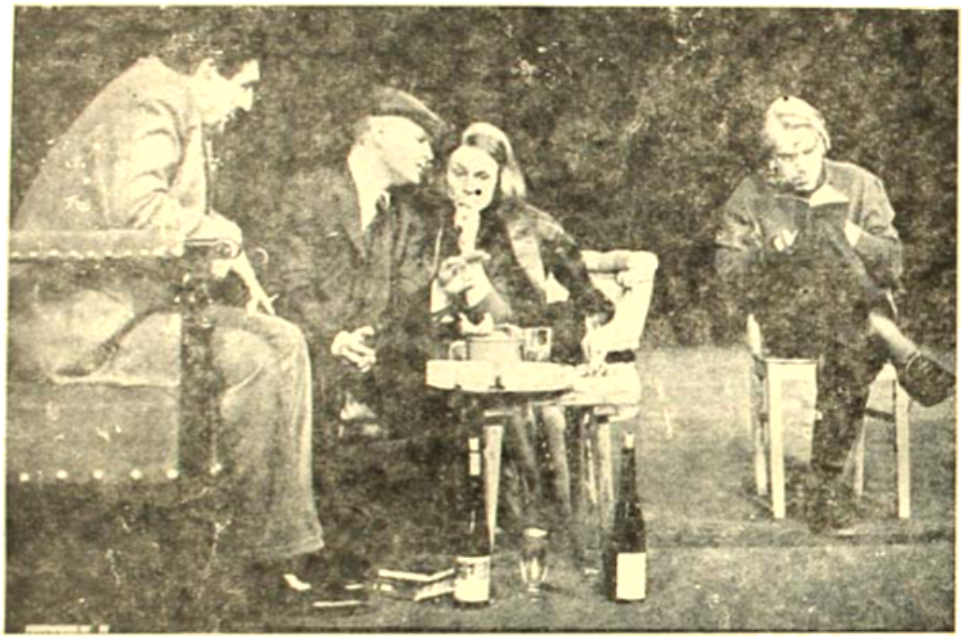

'মেসলিঙ্কাউফ' নাটকের একটি দৃশ্য

জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে হিলম্যান থাটের কমিউন সঙ্গীতের বেলায় তো তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

'আর্টুরো উই' নাটকের অভিনয়ও প্রশংসালাভ করেছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণেই। বিশেষ করে নাটকের শেষ গানটি গীত হবার সময়ে তো প্রশংসা ফেটে পড়েছিল। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই টানা চলে না যে, দর্শকরা নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে শিল্পগত উৎকর্ষের সঙ্গে উপস্থিত করতে পারার কৃতিত্বকে।

পুরো একটি সপ্তাহ ব্যয় করা হয়েছিল বার্লিনেয়ার অ্যাংসেম্বল-এর অভিনয়-রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভাষণদানে ও আলাপ-আলোচনায়। এই পর্বের শুরুতে ছিল ব্রিটিশ সহযোগীদের প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে আয়োজিত লিটল মাহাগোনি সঙ্গীত-নাট্যের বিশেষ একটি অনুষ্ঠান।

ভাষণ ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি পৃথক পর্বে। 'গ্রাস গারডেন' নাটক থেকে উদ্ধৃতি সহ এপিক থিয়েটারের ওপর একটি ভাষণ, পঞ্চাশজন ব্রিটিশ অভিনেত্রীর সঙ্গে

তাসখন্দ

মধ্য এসিয়ার মুকুটমণি

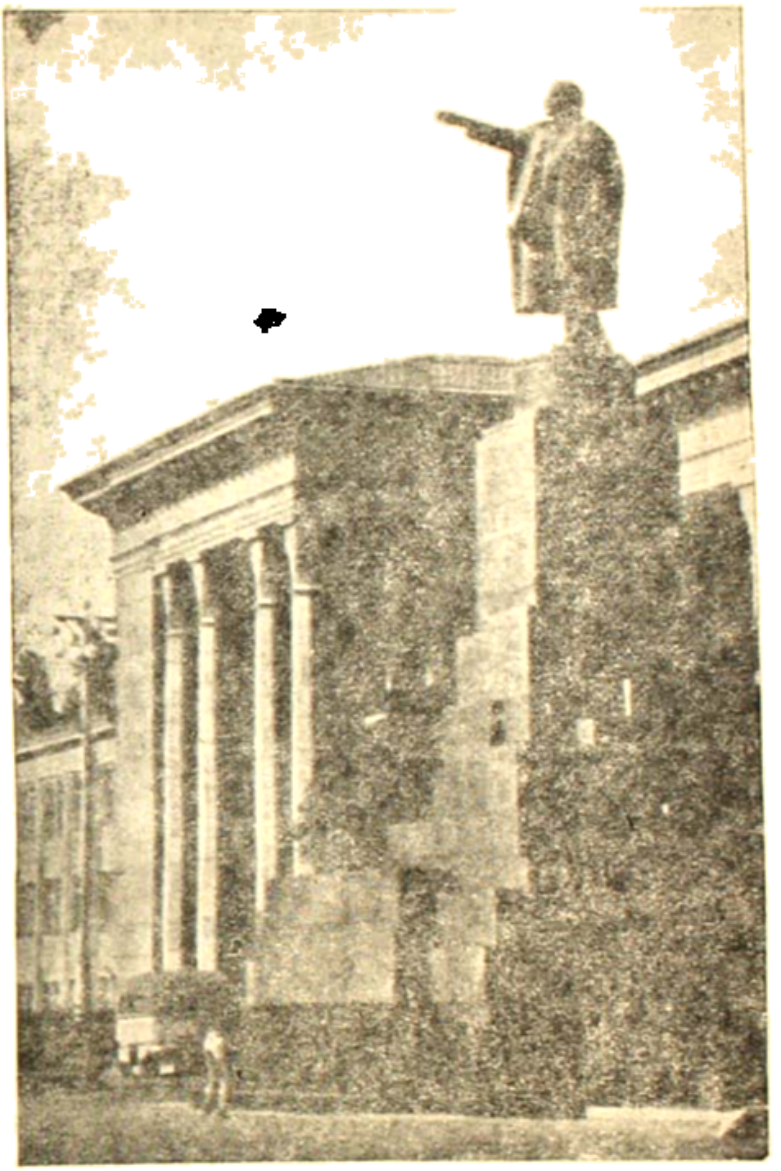

তাসখন্দের সরকারী ভবন, যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর ৪ঠা জানুয়ারী মিলিত হচ্ছেন।

তাসখন্দ। নামের মধ্যে যেন যাদু আছে।

মধ্য এসিয়ার মরুদেশে, তাসখন্দের নাম বাঙালী কবিকে প্রেরণা দিয়েছে।

হৃদয় যদি আরব বেদুইন তাহলে সমরখন্দ আর বোখারো পায়ে হেঁটে চলে যেতাম সেই মরুতীর্থে, যেখানে কালাপানির অন্ধকার কারাগার থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে, প্রাণপ্রাচুর্যে আর নবীন আনন্দে যে দেশের মানুষ আজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

জীর্ণ যা কিছু, যারা কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন
নবজীবনের গানে।

ঘুমঘুমাতের মেছিয়ে-পড়া দেশ তাসখন্দ আজ আধুনিক কালের এক শ্রেষ্ঠ জনপদে পরিণত। সেখানে আজ আর নেই দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার।

তাসখন্দ আজ জগতের বিস্ময়!

ভারতের সঙ্গে তাসখন্দের আত্মিক যোগ বহু শতাব্দীর।

তাসখন্দ আজ সোভিয়েত দেশের সিংহদ্বার। দিল্লী কাবুল হয়ে সোভিয়েত দেশে যেতে গেলে প্রথমে সে দেশের মাটি স্পর্শ করতে হবে তাসখন্দে নেমে।

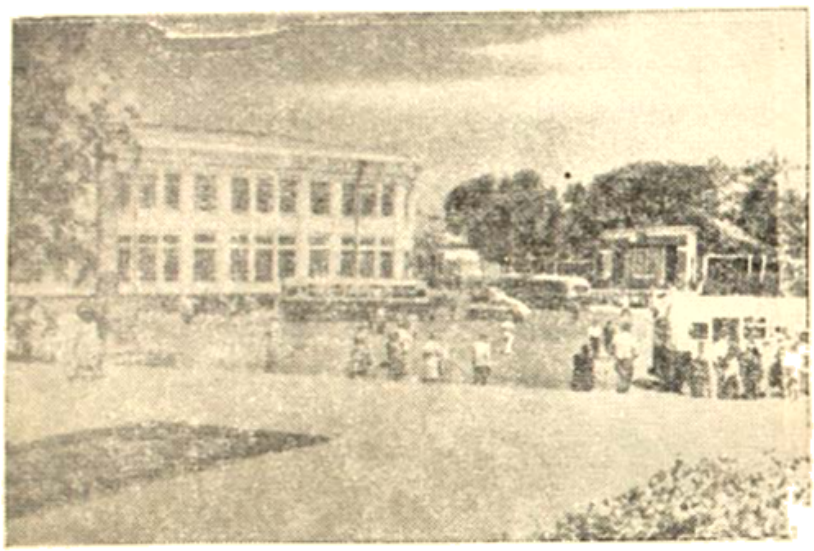

আধুনিক তাসখন্দের কালিনিন স্কোয়ার

দশলক্ষ লোকের বাস তাসখন্দে। উজবেক সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের রাজধানী, উর্বরা, কর্পোরেশনমেলা বস্ত্রশিল্পে বিস্ময়কর উন্নতির অধিকারিণী তাসখন্দ আজ সোভিয়েতের পরম গৌরবের রক্ষীরাণী।

এখানে আজ জ্ঞানবিজ্ঞানের অফুরন্ত প্রসার। বিজ্ঞান পরিষদে বহু বিজ্ঞান-তাপস নিরলস সাধনায় রত। ৪০টি বিজ্ঞান সংস্থা, ১৬টি কলেজ, একটি মানমন্দির ও একটি সংরক্ষণশালা ছাড়া সেখানে আছে তাসখন্দ মহাবিদ্যালয়, ১৯২০ সালে লেনিন কর্তৃক স্থাপিত মধ্য এসিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

সাতটি রঙশালা আছে তাসখন্দে। আছে বহু প্রাচীন স্তম্ভ, প্রাচ্যদেশের বহুস্তরের বিপনির সারি, উজবেক ইতিহাসের যাদুঘর, চিত্রশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র— নূতন এবং পুরাতনের অভূতপূর্ব সমন্বয় তাসখন্দ—রঙ আর প্রকৃতির শোভায় রঙীন এবং বিচিত্র।

মেয়েদের পোষাকেও রঙের বাহার। কবরী-বন্ধনে শত বৈচিত্র্য। মেয়েরা সেখানে আজ নতুন জীবনের আলো দেখেছে। স্বাধীন সত্তা ফিরে পেয়েছে। সেদিন আর নেই যেদিন এই জনপদে অতীতকালে মেয়েদের মনে করা হত, তারা ভৈজসের সামিল, তারা ক্রীতদাসীর মতোই পুরুষের অধীন, তাদের কোন ভাষা নেই, পুরুষ কোন প্রাণ নেই—তারা পুরুষের স্থাবর সম্পত্তির মতোই চিরকালের কেনা। আজকের তাসখন্দ শাসন পরিষদের প্রেসিডেন্ট রমিয়সী মাদাম ইয়াদগার মনোহরিনোভা সেই দুঃখের তিমির পার হোয়ে এসেছেন। তিনি।

জেমিনির মহাকাশ অভিযানে স্টাফোর্ড ও ওয়াল্টার শিরা

নিকোলাই ভি. পদগরনী, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর নূতন সভাপতি।

নিকোলাই ভি. পদগরনী ১৯০৩ সালে ইউক্রাইনে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯১৭ সালে এক কারখানায় মেকানিক্যাল শপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৩১ সালে কিয়েভ কারিগরী ইনষ্টিট্যুট থেকে তিনি স্নাতক হন। অতঃপর ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন চিনিকল ও ষ্টীল-এ ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি ইউক্রাইনের ও মস্কোতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যোৎপাদন দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মস্কোর খাদ্যোৎপাদন কারিগরী-বিজ্ঞান ইনষ্টিট্যুটের ডিরেক্টর। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কোতে ইউক্রাইন সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে এন. ভি. পদগরনী ইউক্রাইন কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কয়েক আঞ্চলিক পার্টি কমিটির প্রথম সম্পাদক, ইউক্রাইনীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্পাদক হিসাবে কাজ করার পর ১৯৫৭ সালে তিনি ইউক্রাইনীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতেরও তিনি সদস্য।

সোভিয়েত এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসাবে এন. ভি. পদগরনী রাষ্ট্র ও পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করে তিনি কিউবা, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছিলেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতির পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এন. ভি. পদগরনী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নবতম সম্পাদক ছিলেন।

শ্রী পদগরনী শীঘ্রই ভারত ভ্রমণে আসছেন।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় মুক্তা, মসৃণ ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৩৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন্ডন), এফ,সি, এস,(আমেরিকা), ভারমণ্ড হারবার কলেজের প্রাক্তন শারীর কৃষ্ণকুলী অধ্যাপক

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ এস চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

BARTER ART PRESS CALCUTTA-12.

- 7 JAN '98

একটি সুপরিচিত নাম

লক্ষ্মী ঘি

এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর,